শ্রীঅরবিন্দ

যোগসমন্বয়

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

সূচীপত্র

ভূমিকা

সমন্বয়ের শর্তাবলী

প্রথম খণ্ড

দিব্যকর্ম যোগ

দ্বিতীয় খণ্ড

পূর্ণজ্ঞান যোগ

সূচীপত্র

তৃতীয় খণ্ড

ভাগবত প্রেমের যোগ

চতুর্থ খণ্ড

আত্মসিদ্ধি যোগ

সূচীপত্র

যোগসমন্বয়

"সমগ্র জীবনই যোগ"

ভূমিকা

সমন্বয়ের শর্তাবলী

প্রথম অধ্যায়

জীবন ও যোগ

মানুষের যে সব কাজ সাধারণ ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ বা যে সবের লক্ষ্য অনন্যসাধারণ লোক ও সার্থকতা অর্থাৎ আমাদের ধারণায় ঊর্ধ্বে ও ভগবানের দিকে — এই সকল প্রকার কাজেরই বড় বড় রূপগুলির মধ্যে দেখা যায় যে প্রকৃতির কর্মপ্রণালীর দুইটি রীতি সর্বদাই সক্রিয়। প্রতি বিভিন্ন রূপের প্রবণতা হল অন্য অনেকের সঙ্গে মিশে একটি সুষম সমষ্টি গড়ে তোলা; আবার এই সমষ্টিও ভেঙে গিয়ে তা থেকে বার হয়ে আসে বিশেষ বিশেষ শক্তি ও প্রবণতার বিভিন্ন ধারা, কিন্তু এরাও আবার মিলিত হয় এক বৃহত্তর ও বলবত্তর সমন্বয়ে। দ্বিতীয়তঃ, যদিও কার্যকরী অভিব্যক্তির এক অত্যাবশ্যকীয় নিয়ম হল রূপগঠন, তবু সত্য ও সাধনাকে বিধিব্যবস্থার কঠোর কাঠামোর মধ্যে বেঁধে রাখলে তারা জীর্ণ হয়ে পড়ে এবং তাদের সব না হোক অধিকাংশ গুণই নষ্ট হয়। এদের নবজীবনের জন্য দরকার তাদের নব প্রাণধারায় সঞ্জীবিত করা যাতে মৃত বা মুমূর্ষু বাহনগুলি প্রাণবন্ত হয়ে রূপান্তরিত হতে পারে। নিরন্তর পুনর্জন্ম গ্রহণই জড়ীয় অমরত্বের শর্ত। বর্তমান যুগ নবজন্মসম্ভাবনার যন্ত্রণায় পূর্ণ; চিন্তা ও কার্যের যে সব রূপগুলির মধ্যে কার্যকারিতার বিশেষ শক্তি বা স্থায়িত্বের গূঢ় গুণ বর্তমান তারা চরম পরীক্ষাধীন; তাদের পুনর্জন্মের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। আজকের জগৎ যেন মায়াবিনীর এক বিরাট কটাহ যেখানে সব কিছুকে ফেলে, কেটে টুকরো টুকরো ক'রে, পরীক্ষা ক'রে, মিশিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা হচ্ছে; হয় তারা ধ্বংস হবে ও তাদের ধ্বংসাবশেষ থেকে গড়ে উঠবে নতুন রূপ, নয় তারা নব প্রাণে সঞ্জীবিত হয়ে পরিবর্তিত হবে নতুন ক'রে আবার এক পর্ব থাকার জন্য। ভারতীয় যোগের সার এই যে এ হল প্রকৃতির কতগুলি বড় শক্তির বিশেষ ক্রিয়া বা বিধিব্যবস্থা; তারও মধ্যে কত ভাগ, কত ধারা, কত পদ্ধতি; আর মানবজাতির ভবিষ্য জীবনের অন্যতম সক্রিয় উপাদান হবার যোগ্যতা এতে বর্তমান। কোন্ স্মরণাতীত কালে এর উৎপত্তি, আধুনিক যুগ পর্যন্ত এ টিকে রয়েছে এর প্রাণশক্তি ও সত্যের বলে; এতদিন এ আশ্রয় নিয়েছিল মরমীয়া সম্প্রদায় ও তপস্বীর আশ্রমে, এখন আবার এ বেরিয়ে আসছে সেখান থেকে যাতে এ হতে পারে মানবের ভবিষ্য জীবন্ত শক্তি ও প্রয়োজনের অন্যতম। কিন্তু এর প্রথম দরকার নিজের পুনরাবিষ্কার, প্রকৃতির যে সর্বজনীন সত্য ও বিরামহীন লক্ষ্যের প্রতিরূপ এ, তার মধ্যে নিজ অস্তিত্বের গভীরতম অর্থ উদ্ঘাটন এবং এই নতুন আত্মজ্ঞান ও আত্মমূল্যায়নের বলে নিজের পুনর্লব্ধ বৃহত্তর সমন্বয় সন্ধান। নতুন ভাবে গঠিত হলে জাতির নবগঠিত জীবনের মধ্যে এ প্রবেশ করতে পারে আরো অনায়াসে ও জোরালো হয়ে, কারণ এর প্রণালী জীবনকে নিয়ে যেতে পারে নিজের সত্তার ও ব্যক্তিভাবনার অন্তরের গহনতম পুরে এবং ঊর্ধ্বে সর্বোচ্চ শিখরে।

জীবন ও যোগকে সঠিক দৃষ্টিতে দেখলে জানা যায় যে সচেতনভাবেই হোক আর অবচেতনভাবেই হোক, সমগ্র জীবন এক যোগ। কারণ যোগ বলতে আমরা বুঝি এমন এক সুসংহত সাধনা যার লক্ষ্য হল আত্ম-সিদ্ধি, আর এই লক্ষ্য প্রাপ্তির উপায় হল সত্তার অন্তঃস্থিত সব সুপ্ত শক্তির বিকাশ এবং মানবে ও বিশ্বে আমরা যে বিশ্বাত্মক ও বিশ্বাতীত সত্তার আংশিক প্রকাশ দেখি তাঁর সঙ্গে ব্যষ্টি মানবের মিলন। বাহ্যজীবনের পিছনে তাকালে আমরা দেখি যে সমগ্র জীবন প্রকৃতির এক বিরাট যোগ, কারণ তার প্রয়াস হল তার সব গূঢ় শক্তির সদা বর্ধমান বিকাশের মাধ্যমে স্বীয় সিদ্ধিলাভ ও স্বীয় দিব্যসত্তার সঙ্গে মিলন সাধন। ক্ষিপ্রতা ও বীর্যের সঙ্গে এই মহান্ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য প্রকৃতি এই পৃথিবীতে প্রথমে মনোময় মানুষের মাঝে কার্যের আত্মসচেতন উপায় ও সঙ্কল্পিত ব্যবস্থা উদ্ভাবন করে। যেমন স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন — যোগকে বলা যায় এমন এক সঙ্কুচিত উপায় যাতে এক দৈহিক জীবনের মধ্যেই বা কয়েক বৎসর বা কয়েক মাসের মধ্যেই নিজের ক্রমবিকাশ সম্পূর্ণ করা যায়। প্রকৃতিমাতা তাঁর বিরাট উর্ধ্বগামী কর্মে বিভিন্ন সর্বজনীন পদ্ধতি অবলম্বন করে আসছেন, তবে তাঁর গতি মন্থর, প্রয়োগ শিথিল ও ব্যাপক, মনে হয় শক্তি ও উপাদানের প্রভূত অপচয় হচ্ছে, কিন্তু এতে সংহতি দৃঢ় হয়। সব যোগসাধনাই প্রকৃতির এই সব পদ্ধতির কোন না কোন অংশ বা তাদের সঙ্কুচিত সমাহার যা প্রয়োগ করা হয় সঙ্কীর্ণ রূপের মধ্যে, তবে আরো তীব্র ও প্রখরভাবে। একমাত্র যোগের এই তত্ত্বজ্ঞানই বিভিন্ন যোগপন্থার দৃঢ় ও যুক্তিযুক্ত সমন্বয় গঠনের ভিত্তি হতে পারে। কারণ তখন আর মনে হবে না যে যোগ রহস্যময় অপ্রাকৃত কিছু যা বিশ্বশক্তির সাধারণ ক্রিয়াপ্রণালীর সঙ্গে সম্পর্কশূন্য; আবার প্রকৃতির প্রত্যক্ ও পরাক্ আত্মসার্থকতার দুই মহতী ধারার উদ্দেশ্যের সঙ্গে যোগের যে কোন সম্বন্ধ নেই তাও মনে হবে না। বরং মনে হবে যে কম উন্নত কিন্তু আরো ব্যাপক ক্রিয়ায় প্রকৃতির যে সব শক্তি ইতিমধ্যেই প্রকাশ হয়েছে বা উত্তরোত্তর সংহত হচ্ছে সেই সব শক্তিরই প্রখর ও অসামান্য প্রয়োগ হল যোগ।

তড়িৎ ও বাষ্পের সাধারণ ক্রিয়ার সঙ্গে তাদের প্রাকৃতিক শক্তির বৈজ্ঞানিক ব্যবহারের যে সম্বন্ধ, মানুষের পরিচিত সাধারণ চিত্তবৃত্তিক্রিয়ার সঙ্গে যৌগিক পদ্ধতিরও সেই সম্বন্ধ। নিয়মিত পরীক্ষা, ব্যবহারিক বিশ্লেষণ, নিয়তফলপ্রাপ্তির দ্বারা সমৃদ্ধ ও দৃঢ়ীকৃত জ্ঞানের উপরেই তাদের প্রতিষ্ঠা। যেমন রাজযোগের বেলায়, দেখা যায় যে আমাদের আন্তর উপাদান, সমবায়, ক্রিয়া, শক্তিগুলিকে পৃথক বা নিবৃত্ত করা সম্ভব বা সে সবকে ভিন্নভাবে মিলিয়ে এমন নতুনভাবে প্রয়োগ করা যায় যা পূর্বে অসম্ভব ছিল বা নির্দিষ্ট আন্তর প্রণালী দ্বারা তাদের রূপান্তর ও নতুন ব্যাপক সমন্বয় গঠন সম্ভব। এই জ্ঞান ও অনুভূতির উপরেই রাজযোগ গড়ে উঠেছে। হঠযোগের ভিত্তি এইরূপ জ্ঞান ও অনুভূতি; আমাদের সাধারণ জীবন যে সব প্রাণিক শক্তি ও ক্রিয়ার অধীন এবং যাদের সাধারণ ক্রিয়া পদ্ধতি মনে হয় নির্দিষ্ট ও অপরিহার্য সে সবকে আয়ত্তে এনে তাদের ক্রিয়া পরিবর্তিত ও নিরুদ্ধ করে এমন ফল পাওয়া যায় যা অন্যথায় অসম্ভব এবং প্রণালীগুলির

যুক্তিবত্তা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞের কাছে মনে হবে অলৌকিক। অবশ্য অন্য কিছু যোগপন্থায় এরকম অসাধারণ ফল কম দেখা যায় কারণ এসব আরো বোধিময় ও কম যান্ত্রিক এবং এরা ভক্তিযোগের মত পরমতম উল্লাস বা জ্ঞানযোগের মত চেতনা ও সত্তার পরমতম আনন্ত্যের অধিকতর নিকটবর্তী। তবু এদেরও আরম্ভ আমাদের কোন না কোন প্রধান আন্তর শক্তির প্রয়োগ থেকে তবে এমন উপায়ে ও এমন উদ্দেশ্যে তার ব্যবহার করা হয় যা তার প্রাত্যহিক স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়ার পক্ষে অভাবনীয়। "যোগ" এই সাধারণ নামে পরিচিত সব বিভিন্ন পদ্ধতি কতকগুলি বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক প্রণালী; প্রকৃতির নির্দিষ্ট সত্যের উপর এদের প্রতিষ্ঠা এবং যে সব সাধারণ বৃত্তি, শক্তি ও ফল সর্বদাই গূঢ় ছিল কিন্তু সাধারণ ক্রিয়ায় যাদের সহজে বা প্রায়শঃ প্রকাশ হয় না সে সব থেকেই এদের অভ্যুদয়।

জড়বিজ্ঞানের বেলায় দেখা যায় যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর বাহুল্যের অসুবিধা অনেক; যেমন, এতে এমন এক বিজয়ী কৃত্রিমতা বেড়ে ওঠার প্রবণতা থাকে যাতে যন্ত্রের চাপে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অভিভূত হয়, আর কোন কোন ধরনের স্বাধীনতা ও প্রভুত্ব পাবার জন্য আমরা ক্রমশঃ অনেক কিছুর দাস হয়ে পড়ি। ঠিক সেই রকমে যৌগিক প্রণালী ও তাদের অসামান্য ফলে তন্ময় হয়ে থাকারও অসুবিধা ও ক্ষতি অনেক। যোগীর ঝোঁক জনজীবন থেকে সরে যাওয়া; এর ফল এই জীবনের উপর প্রভাবনাশ। অধ্যাত্ম সম্পদের জন্য সে মূল্য দিতে চায় মানবীয় ক্রিয়ার রিক্ততায়, আন্তর মুক্তির মূল্য দেয় বহির্মৃত্যুতে। সে ভগবান পায় তো জীবন হারায়, আবার জীবন জয়ের চেষ্টা করলে ভগবান হারাবার আশঙ্কা আসে। তাই দেখি, ভারতবর্ষে সাংসারিক জীবন এবং অধ্যাত্ম শ্রীবৃদ্ধি ও সিদ্ধির মাঝে তীব্র অসঙ্গতি। যদিও আন্তর আকর্ষণ ও বাহিরের দাবীর মধ্যে এক বিজয়ী সমন্বয়ের আদর্শ ও ঐতিহ্য এখনও বর্তমান কিন্তু কার্যতঃ তার কিছু নেই। বস্তুতঃ কোন মানুষ অন্তরের দিকে তার দৃষ্টি ও শক্তি ফিরিয়ে যোগের পথে এলে ধরে নেওয়া হয় যে সমষ্টি জীবনের মহাস্রোত এবং মানবজাতির ঐহিক কার্য থেকে তার বিদায় অনিবার্য। এই ধারণা এত প্রবল এবং প্রচলিত দর্শন ও ধর্মে এর উপর এত জোর দেওয়া হয়েছে যে সাধারণতঃ মনে করা হয় যে জীবন থেকে পলায়ন শুধু যে যোগের পক্ষে অপরিহার্য তা নয়, সেটি যোগের সাধারণ উদ্দেশ্যও বটে। মুক্ত ও সিদ্ধ মানবজীবনে ভগবান ও প্রকৃতির পুনর্মিলন সাধন যে যোগসমন্বয়ের উদ্দেশ্য নয় বা যার পদ্ধতি এমন যাতে আমাদের আন্তর এবং বাহ্য কর্ম ও অভিজ্ঞতাগুলিকে তাদের দুয়েরই দিব্য পূর্ণতার মধ্যে সুসঙ্গত করার অনুমতি ও উপরন্তু অনুমোদন নেই — এমন কোন যোগসমন্বয়ই সন্তোষজনক হতে পারে না। মানুষ হল এই জড় জগতে অবতীর্ণ এক উচ্চতর সত্তার ঠিক সেই সংজ্ঞা ও প্রতীক যাতে নিম্নের পক্ষে নিজেকে রূপান্তরিত করে ঊর্ধ্বের ধর্মলাভ এবং নিম্নের রূপে ঊর্ধ্বের আত্মপ্রকাশ সম্ভব। এই সম্ভাবনাকে কার্যে পরিণত করার জন্য তাকে যে জীবন দেওয়া হয়েছে তা এড়িয়ে যাওয়া কখনই তার পরম সাধনার বা আত্ম-সার্থকতার বলবত্তম উপায়ের অপরিহার্য সর্ত বা সমগ্র ও চরম

উদ্দেশ্য হতে পারে না। শুধু কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে এর আবশ্যকতা থাকতে পারে বা তা মানবজাতির মহত্তর সাধারণ সম্ভাবনার প্রস্তুতির জন্য ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ আত্যন্তিক সাধনা হতে পারে। প্রকৃতির অবচেতন যোগের মত যখন মানুষের সচেতন যোগ জীবনের সঙ্গে বাহ্যতঃ সমপরিধি হয় তখনই যোগের সত্যকার পূর্ণ উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতা সিদ্ধ হয়; আর তখনই আমরা পথ ও সিদ্ধির পানে চেয়ে আর একবার, তবে আরো পূর্ণ ও দীপ্ত অর্থে বলতে পারি "সমগ্র জীবনই যোগ"।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রকৃতির তিনটি ক্রম

অতীতে যোগ যে ভাবে গড়ে উঠেছে তাতে আমরা দেখি বিচ্ছিন্নতা ও বিশেষীকরণের প্রবণতা। প্রকৃতির সব বিষয়েরই মত এরও ন্যায়সঙ্গত, এমনকি অত্যাবশ্যক উপযোগিতা ছিল। এর ফলে যেসব বিশেষ উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে তাদের সমন্বয়-সাধন আমাদের উদ্দেশ্য। সুবিবেচনার সঙ্গে এ-কাজ করার জন্য আমাদের প্রথম জানা দরকার এই বিচ্ছিন্নতার প্রবৃত্তির মূলে কি সাধারণ তত্ত্ব ও উদ্দেশ্য নিহিত; দ্বিতীয়তঃ এক একটি যোগসম্প্রদায়ের পদ্ধতি কি বিশেষ উপকারিতার উপর প্রতিষ্ঠিত তাও জানা চাই। সাধারণ তত্ত্বের জন্য আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে প্রকৃতিরই বিশ্বব্যাপী কর্মপ্রণালীর মধ্যে; প্রকৃতিকে আমরা কুহকিনী মায়ার ছলনাপূর্ণ অলীক ক্রিয়া বলে স্বীকার না করে স্বীকার করব যে সে ভগবানেরই বিশ্বসত্তার বিশ্বশক্তি ও কর্মপ্রণালী যার বিধান ও অন্তঃপ্রেরণার উৎস হল এক বিরাট অনন্ত অথচ সূক্ষ্ম নির্ধারণী প্রজ্ঞা, গীতোক্ত "প্রজ্ঞা প্রসৃতা পুরাণী" — আদি থেকে সনাতন হতে উৎসারিত প্রজ্ঞা। বিশেষ বিশেষ উপকারিতাগুলি কী তা জানার জন্য দরকার বিভিন্ন যোগপদ্ধতির মর্মভেদী বিশ্লেষণ এবং তাদের খুঁটিনাটির স্তূপ থেকে তাদের উপাসিত নিয়ামক ভাবনা এবং সাধনপ্রণালীর উৎপত্তি ও প্রবেগের মৌলিক শক্তির নিরূপণ। এ হলে পর, যে সাধারণ তত্ত্ব ও সাধারণ শক্তি থেকে তাদের উৎপত্তি ও প্রবণতা, যার দিকে অবচেতনভাবে তাদের গতি এবং সেই হেতু যার মধ্যে তাদের সকলের মিলন-সাধন সম্ভব — তাদের জানা সহজ হবে।

মানুষের মধ্যে প্রকৃতির উত্তরোত্তর আত্ম-অভিব্যক্তি, অর্থাৎ আধুনিক ভাষায় অভিহিত বিবর্তন (evolution) তিনটি অত্যাবশ্যকীয় ক্রমিক অঙ্গের উপর নির্ভরশীল: (১) যা আগেই ব্যক্ত হয়েছে, (২) যা দৃঢ়ভাবে সচেতন অভিব্যক্তির অবস্থায় বর্তমান এবং (৩) যা ব্যক্ত হবে। তবে এই তৃতীয়টি হয়তো ইতিপূর্বেই প্রাথমিক গঠনে বা অন্য আরো উন্নত গঠনে বা এমনকি বিরল হলেও আমাদের বর্তমান মানবজাতির উচ্চতম সম্ভাব্য পরিণতির নিকটবর্তী যে সব গঠন, তাদের মধ্যেও, সর্বদা না হলেও মাঝে মাঝে বা কতকটা নিয়মিতভাবে, পুনঃপুনঃ প্রকাশ হয়ে থাকবে। কেননা, ধীর পদক্ষেপে যন্ত্রের মত বাঁধাধরাভাবে এগিয়ে চলা প্রকৃতির ধারা নয়। সে সর্বদাই নিজেকে ছাড়িয়ে চলে, এমনকি এর জন্য পরে তাকে শোচনীয়ভাবে পিছু হটতে হলেও। মাঝে মাঝে সে ছুটে চলে হুড়মুড় করে, তার বহির্বিস্ফোরণও হয় প্রচণ্ড ও চমকপ্রদ এবং উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয় বিপুল পরিমাণে। আবার কখন কখন সে জোর করে স্বর্গরাজ্য ছিনিয়ে নেবার আশায় সামনের দিকে এগিয়ে চলে ঝড়ের মত প্রচণ্ড বেগে। তার মধ্যে যা পরম দিব্য বা চরম

আসুরিক — তারই প্রকাশ এই সব স্বোত্তরণ; কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই এই স্বোত্তরণ তার লক্ষ্যের দিকে তাকে দ্রুত নিয়ে যাওয়ার পক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী।

প্রকৃতি আমাদের জন্য যা ব্যক্ত করে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে তা আমাদের দৈহিক জীবন। জড় ও প্রাণশক্তি অবর হলেও এরা পৃথিবীতে আমাদের কার্য ও উন্নতির পথে সবচেয়ে প্রধান আবশ্যকীয় উপাদান; প্রকৃতি তাদের মধ্যে এক প্রকার মিলন ও সামঞ্জস্য এনেছে। অতিমাত্রায় অপার্থিব অধ্যাত্মবাদীর কাছে জড় হেয় হলেও এই হল আমাদের সকল শক্তি ও সিদ্ধির ভিত্তি ও প্রাথমিক অবস্থা; আর প্রাণশক্তি জড়দেহে আমাদের জীবনধারণের উপায় তো বটেই, এমনকি তা আমাদের মানসিক ও অধ্যাত্ম কর্মেরও বনিয়াদ। মানবজাতির মধ্যে উত্তরোত্তর প্রকাশমান দেবতার যোগ্য আবাস ও যন্ত্র যোগাবার উদ্দেশ্যে প্রকৃতি জড়ের সতত চাঞ্চল্যের মাঝে সাফল্যের সঙ্গে এমন এক প্রকার স্থিরতা সাধন করেছে যা যুগপৎ যথেষ্ট দৃঢ় ও স্থায়ী এবং যথেষ্ট নমনীয় ও পরিবর্তনশীল। এটাই ঐতরেয় উপনিষদের উপাখ্যানের তাৎপর্য। এতে বলা হয়েছে যে দিব্য আত্মা দেবতাদের কাছে একটির পর একটি যেসব প্রাণীদেহ আনলেন, দেবতারা সেসব প্রত্যাখ্যান করলেন; কিন্তু যখন মানুষের দেহ আনা হল তখনই শুধু তাঁরা বলে উঠলেন [সুকৃতমেতৎ] "এর গঠন বেশ ভালই হয়েছে", আর তাঁরা তার মধ্যে প্রবেশ করতেও সম্মত হলেন। জড়ের নিশ্চেষ্টতা এবং সক্রিয় প্রাণ যা জড়ে বাস করে ও তা থেকেই পুষ্টি নেয় এবং যার জন্য শুধু যে জীবনযাত্রা চলে তা নয়, মানসিকতারও পূর্ণতম শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব — এ দুয়ের মধ্যে প্রকৃতি এক কাজ-চলা মিলও এনেছে। এই সাম্য হল মানুষের মাঝে প্রকৃতির মৌলিক স্থায়ী অবস্থা এবং যোগের ভাষায় একে বলা হয় অন্নকোষ (উপাদান) ও প্রাণকোষ (নাড়ীতন্ত্র) সমন্বিত তার স্থূল শরীর।

এই অবর সাম্য যদি পরম বিশ্বশক্তির অভিপ্রেত পরতর গতিক্রিয়ার ভিত্তি ও প্রাথমিক উপায় হয়, যদি এই সেই আধার হয় যাতে ভগবান এখানে আত্মপ্রকাশ করতে চান, ["শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনং"] — "আমাদের প্রকৃতির ধর্ম পালনের জন্য এই দেহযন্ত্র দেওয়া হয়েছে" — এই ভারতীয় বচন যদি সত্য হয় তাহলে দৈহিকজীবন থেকে চরম নিবৃত্তির অর্থ দিব্য প্রজ্ঞার পূর্ণতা থেকে ফিরে আসা এবং পার্থিব অভিব্যক্তিতে তার লক্ষ্য পরিহার করা। হয়তো কোন কোন লোকের পক্ষে তাদের বিকাশের গূঢ় বিধান অনুযায়ী এরকম অস্বীকার করাই সঠিক মনোভাব, কিন্তু তা কখনই মানবজাতির জন্য অভিপ্রেত লক্ষ্য হতে পারে না। সুতরাং যে যোগে দেহকে উপেক্ষা করা হয় বা পূর্ণ আধ্যাত্মিকতার জন্য এর ধ্বংস বা বর্জন অনিবার্য গণ্য করা হয় সে যোগ পূর্ণযোগ হতে পারে না। বরং দেহের পূর্ণতাসাধনই হওয়া উচিত পরম চিৎপুরুষের চরম বিজয়, আর দৈহিক জীবনকেও দিব্য করা, বিশ্বে ভগবৎ-কর্মের চরম উৎকর্ষ। অধ্যাত্ম পথে শরীর বাধা-স্বরূপ — শরীর বর্জনের পক্ষে এ কোন যুক্তিই নয়, কারণ সকল কিছুর অদৃশ্য ভগবৎ-বিধানে আমাদের বৃহত্তম বাধাসমূহ আমাদের মহত্তম সুযোগ। প্রবলতম বাধার মাঝে আছে প্রকৃতির এই ইঙ্গিত যে আমাদের সাধ্য হ'ল এক পরম বিজয় অর্জন

ও এক চরম সমস্যার সমাধান; কোন অমোচনীয় পাশ যা পরিহার করা চাই বা কোন অজেয় শত্রু যা থেকে পলায়ন করাই বিধেয় — সেরূপ কিছুর বিপদসঙ্কেত এটা নয়।

একইভাবে দেহের মতই, আমাদের অন্তঃস্থ প্রাণ ও স্নায়ু শক্তিরও উপকারিতা প্রচুর। তারাও চায় আমাদের চরম সিদ্ধির মধ্যে তাদের সম্ভাবনার দিব্য সার্থকতা। বিশ্ব-ব্যবস্থার মাঝে এই অঙ্গকে যে গুরুভার দেওয়া হয়েছে তার কথা উপনিষদের উদার জ্ঞানে বিশেষভাবে জোর করে বলা হয়েছে। "চক্রের নাভিতে সংলগ্ন অরসমূহের মত প্রাণে সব কিছুই প্রতিষ্ঠিত যথা ত্রিবিদ্যা, যজ্ঞ, সবলের তেজ (ক্ষত্র) ও জ্ঞানীর পবিত্রতা (ব্রহ্ম)"। "ত্রিদিবে এই যে সব প্রতিষ্ঠিত সে সমস্তই প্রাণের অধীন"[১]। সুতরাং যে যোগে এই সব স্নায়ুশক্তি ধ্বংস, বা এসবকে জোর করে স্নায়ুহীন নিঃস্তব্ধ বা সকল কিছু অনিষ্টকর কাজের আকর বলে তাদের মূলোৎপাটন করা হয় সে যোগ পূর্ণ যোগ নয়। যে উদ্দেশ্যে আমাদের মধ্যে তাদের সৃষ্টি ও বিকাশ তা হল তাদের শুদ্ধি; ধ্বংস নয়, তাদের রূপান্তর, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার।

যদি পরিণামধারায় প্রকৃতি আমাদের জন্য তার ভিত্তি ও প্রথম যন্ত্র হিসাবে দৈহিক জীবন দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছে, তবে অব্যবহিত পরবর্তী লক্ষ্য ও উন্নততর যন্ত্র হিসাবে সে ব্যক্ত করেছে আমাদের মনোময় জীবন। তার সাধারণ ক্রিয়ায় এই তার উচ্চ একাগ্র চিন্তা। যখনই প্রাণের ও দেহের প্রাথমিক প্রাপ্তির শৃঙ্খল থেকে সে মুক্তি পায়, তখন সর্বদা এটাই তার কাজ — অবশ্য অবসন্ন হয়ে কাজ থেকে নিবৃত্ত হবার পর যে সময় শক্তি পুনরুদ্ধারের জন্য সে তমসার মাঝে বিশ্রাম নেয় সে সময় বাদে। কারণ মানুষের এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে যার গুরুত্ব অসাধারণ। তার মানসিকতা একটি নয়, তা দ্বিবিধ ও ত্রিবিধ — জড়গত স্নায়বিক মন, শুদ্ধ বুদ্ধিগত মন যা নিজেকে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের ভ্রান্তি থেকে মুক্ত করে, এবং বুদ্ধির ঊর্ধ্বে দিব্যমন যা আবার ন্যায়ানুগ বিবেকী ও কল্পনাপ্রবণ যুক্তিবুদ্ধি থেকে নিজেকে মুক্ত করে। মানুষের মন প্রথম দেহগত প্রাণের মধ্যে পাশবদ্ধ, অপরপক্ষে উদ্ভিদের মধ্যে মন সম্পূর্ণ নিগূহিত এবং প্রাণীদের মাঝে এ সর্বদাই অবরুদ্ধ। মানুষের মনের কাছে প্রাণ যে মানসিক ক্রিয়াসমূহের শুধু প্রাথমিক অবস্থা তা নয়, এ তার সমগ্র অবস্থা, আর সে ব্যস্ত প্রাণের সব প্রয়োজন মেটাতে যেন এই সবই জীবনের সমগ্র উদ্দেশ্য। কিন্তু মানুষের দৈহিক জীবন এক ভিত্তি; এ লক্ষ্য নয়, এ তার প্রাথমিক অবস্থা, তার চরম নির্ধারক নয়। পূর্বতনদের যথাযথ ধারণায় মানুষ মূলতঃ মননশীল, মনু অর্থাৎ মনোময় পুরুষ সে প্রাণ ও শরীরের নেতা;[২] সে এদের দ্বারা চালিত পশু নয়। সুতরাং সত্যকার মানবজীবন তখনই আরম্ভ হয় যখন বুদ্ধিপ্রধান মানসিকতা জড় থেকে বাইরে আসে আর আমরা স্নায়বিক ও দেহের মোহাবেশ থেকে মুক্ত হয়ে উত্তরোত্তর বাস করতে শুরু করি মনে এবং সেই স্বাধীনতার মাপে সমর্থ হই

[১] প্রশ্ন উপনিষদ, ২।৬, ১৩

[২] মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা — মুণ্ডক উপনিষদ, ২।২।৭

দেহগত প্রাণকে যথাযথভাবে গ্রহণ ও ব্যবহার করতে। কারণ প্রভুত্বলাভের উপায় — স্বাধীনতা, কুশল অধীনতা নয়। বাধ্য হয়ে বিভিন্ন অবস্থাকে মেনে নেওয়া নয়, পরন্তু দৈহিক সত্তার প্রসারিত ও ঊর্ধ্বায়িত অবস্থাগুলিকে স্বাধীনভাবে গ্রহণ করাই হল উচ্চ মানব-আদর্শ।

এই ভাবে মানুষের মাঝে যে মনোময় জীবনের অভিব্যক্তি হচ্ছে তা বস্তুতঃ সকলের অধিকারে আসেনি। বাস্তব দৃষ্টিতে মনে হয় এ যেন কতকগুলি ব্যক্তির মধ্যেই পূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছে, এবং অনেকের মধ্যেই, এমনকি অধিকাংশের মধ্যে এটি হয় তাদের সাধারণ প্রকৃতির ক্ষুদ্র এবং মন্দগঠিত অংশ, নয় আদৌ বিকশিত হয়নি, অথবা সুপ্ত রয়েছে, সহজে তাদের সক্রিয় করা যায় না। একথা নিশ্চিত যে প্রকৃতির বিবর্তনে মনোময় জীবের বিকাশ এখনও অপূর্ণ; মানুষ-প্রাণীর মাঝে তা এখনও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এর নিদর্শন এই যে প্রাণশক্তি ও জড়ের সূক্ষ্ম ও পূর্ণ সাম্য, এবং সুস্থ, সুগঠিত, দীর্ঘজীবী মানবদেহ সাধারণতঃ দেখা যায় সেই সব জাতি ও শ্রেণীর মাঝে যারা চিন্তাশক্তির শ্রম, বিশৃঙ্খলা ও আতান (tension) পরিহার করে বা শুধু জড়গত মন দিয়ে চিন্তা করে। সভ্য মানবের মাঝে পূর্ণ সক্রিয় মন ও দেহের সাম্য প্রতিষ্ঠা এখনও বাকী, এখনও তা স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। বাস্তবিকই মনোময় জীবনকে তীব্রতর করার দিকে যত চেষ্টা করা হয়, মনে হয় মানবদেহে তত বেশী বৈষম্য বৃদ্ধি পায়; এজন্যই বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের একথা বলা সম্ভব হয়েছে যে প্রতিভা এক প্রকার উন্মত্ততা, অপকর্ষের ফল, প্রকৃতির এক ব্যাধিগ্রস্ত রুগ্নাবস্থা। এই অতিরঞ্জনের অনুকূলে যে সব ঘটনার কথা বলা হয় সেগুলিকে পৃথক-পৃথক না নিয়ে অন্য সব প্রাসঙ্গিক তথ্যের সঙ্গে নেওয়া হলে অন্য এক সত্যের সন্ধান মেলে। প্রতিভা হল বিশ্বশক্তির সেই প্রচেষ্টা যাতে আমাদের বিভিন্ন বুদ্ধিশক্তিকে এত প্রখর ও তীব্র করা হয় যে তারা বুদ্ধির ঊর্ধ্বকার মানস বা দিব্যমানসের ক্রিয়াস্বরূপ শক্তিশালী, মৌলিক ও ক্ষিপ্র বৃত্তিসমূহের উপযোগী হয়। এটা যে প্রকৃতির খেয়াল বা ব্যাখ্যার অতীত কোন ঘটনা তা নয়, বরং প্রকৃতির বিবর্তনের সঙ্গে সুসঙ্গত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক পরবর্তী ক্রম। প্রকৃতি দেহগত জীবন ও জড়গত মনের মধ্যে সামঞ্জস্য এনেছে, এখন সে এই জীবন ও বুদ্ধিগত মানসিকতার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনে রত; কারণ এতে তার পূর্ণ পাশব ও প্রাণিক তেজ মন্দীভূত হওয়ার প্রবণতা এলেও, সক্রিয় কোন বিশৃঙ্খলার উৎপত্তি হয় না বা হবার কোন হেতুও নেই। আরো উচ্চতর স্তরে যাবার চেষ্টায় সে বর্তমানের সীমানা ছাড়িয়ে আরো ছুটে চলেছে। তা ছাড়া এই সব বিশৃঙ্খলাকে যত বড় করে চিত্রিত করা হয় তারা তত বড় নয়। অন্যগুলি হল অবক্ষয়ের সরল সংশোধিত ক্রিয়া যা থেকে নতুন নতুন কার্যের উৎপত্তি হয়; যে সব সুদূরপ্রসারী ফল প্রকৃতির উদ্দেশ্য তাদের জন্য এ রকম স্বল্প মূল্য দিতেই হয়।

সকল অবস্থা বিবেচনা করে দেখলে আমরা হয়তো এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে মানুষের মাঝে মনোময় জীবনের আবির্ভাব সম্প্রতিকালের ঘটনা নয়, মানুষ আগে থেকেই এ পেয়েছিল, তবে মানবজাতির মধ্যস্থিত বিশ্বশক্তির যেমন কোন কোন ক্ষেত্রে

দুঃখজনক পশ্চাদপসরণ হয়, এ ক্ষেত্রেও তেমন হয়েছিল; এখন আবার তার দ্রুত পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। অসভ্য বর্বর হয়তো সভ্যমানুষের প্রথম পূর্বপুরুষ ততটা নয়, যত সে এক পূর্বসভ্যতার অধঃপতিত বংশধর। কারণ বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন সবার মাঝে সমভাবে না হলেও তার সামর্থ্য সর্বত্র বিস্তৃত। ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, আমরা যে জাতিগোষ্ঠীকে নিম্নতম মনে করি, যেমন মধ্য-আফ্রিকার চিরন্তন বর্বরতা থেকে সদ্য-আগত নিগ্রো, সেও প্রবল ইওরোপীয়ের মত বুদ্ধির নিপুণতা না পেলেও বুদ্ধিগত উৎকর্ষ লাভে সমর্থ, আর এর জন্য রক্তসংমিশ্রণের দরকার হয় না বা তাকে ভবিষ্য বংশের জন্য অপেক্ষাও করতে হয় না। এমনকি মনে হয় সাধারণ শ্রেণীর লোকও অনুকূল পরিবেশে কয়েক পুরুষের মধ্যেই এতদূর অগ্রসর হতে পারে যার জন্য সাধারণতঃ সহস্র সহস্র বৎসর লাগার কথা। তাহলে হয় বলতে হবে যে মানুষ মনোময় জীব হিসেবে তার বিশেষ অধিকারের বলে বিবর্তনের মন্থর বিধানের পূর্ণ ভার বহন থেকে অব্যাহতি পেয়েছে, নয় বলতে হয় যে বুদ্ধিপ্রধান জীবনের জন্য উচ্চস্তরের উপাদানগত সামর্থ্য তার মধ্যে ইতিপূর্বেই বিদ্যমান, আর সে অনুকূল অবস্থায় ও যথাযথ উদ্দীপক পরিবেশে তা সর্বদাই বাইরে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম। বর্বরসৃষ্টির কারণ যে মানসিক অসামর্থ্য তা নয়, এর কারণ দীর্ঘদিনব্যাপী সুযোগ প্রত্যাখ্যান বা তা থেকে দূরে অবস্থান এবং উদ্বোধক সংবেগের অপসারণ। বর্বরতা মধ্যবর্তী নিদ্রা, আদি অন্ধকার নয়।

অধিকন্তু পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যে আধুনিক চিন্তাধারা ও প্রচেষ্টার সমগ্র প্রবণতার তাৎপর্য এই যে তা হল মানুষের মাঝে প্রকৃতির এক বৃহৎ সচেতন সাধনা, যার উদ্দেশ্য হল মনোময় জীবনের জন্য আধুনিক সভ্যতা যে সব সুবিধা দেয় সে সবকে সর্বজনীন ক'রে বুদ্ধিবৃত্তি, সামর্থ্য, অন্যসব সম্ভাবনার সাধারণ ভূমি রচনা করা। এমনকি এই প্রবণতার নায়ক যে ইউরোপীয় বুদ্ধি, তার জড়প্রকৃতি ও জীবনের বহিরঙ্গে ব্যস্ততাও এই সাধনার আবশ্যকীয় অঙ্গ। এর লক্ষ্য মানবের পূর্ণ মানসিক সম্ভাবনার জন্য তার শারীরিক সত্তায়, প্রাণশক্তিতে ও জড়ীয় পরিবেশে উপযুক্ত ভিত্তি প্রস্তুত করা। প্রকৃতির এই মহতী গতিধারার তাৎপর্য ও অভিপ্রায় রূপায়ণের বিভিন্ন সহজবোধ্য নিদর্শন হল শিক্ষাবিস্তার, পশ্চাদ্‌বর্তী জাতির অগ্রসর, অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতি বিধান, শ্রমলাঘবকারী যন্ত্রসমূহের বহুল ব্যবহার, আদর্শ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে অগ্রগতি, সভ্য মানবজাতির মধ্যে স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও সুগঠিত দেহ লাভের জন্য বিজ্ঞানের প্রচেষ্টা। হয়তো যথাযথ বা চরম উপায়গুলি সর্বদা ব্যবহৃত হচ্ছে না কিন্তু তাদের লক্ষ্য, সঠিক প্রাথমিক লক্ষ্য — ব্যষ্টি ও সমাজের সুস্থ দেহগঠন, জড়গত মনের ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজন ও দাবীপূরণ, পর্যাপ্ত আরাম, অবকাশ ও সুযোগদান যাতে এখন আর শুধু অনুগৃহীত জাতি, শ্রেণী বা ব্যক্তি নয়, সমগ্র মানবজাতি তাদের ভাবাবেগপ্রধান ও বুদ্ধিপ্রধান সত্তাকে পূর্ণভাবে বিকশিত করার স্বাধীনতা পায়। বর্তমানে হয়তো জড়ীয় ও অর্থনৈতিক লক্ষ্যই প্রধান কিন্তু পশ্চাতে সর্বদাই উচ্চতর প্রধান সংবেগ ক্রিয়ারত বা পূর্ণশক্তি নিয়ে অপেক্ষমান।

আর যখন প্রাথমিক সর্তগুলির পরিপূরণ হবে ও তৈরী হবে মহতী প্রচেষ্টার ভিত্তি,

তখন বুদ্ধিপ্রধান জীবনের বিভিন্ন ক্রিয়াকে যে পরবর্তী সম্ভাবনা সাধনে রত হতে হবেই তার প্রকৃতি কিরকম? যদি মনই প্রকৃতির সর্বোচ্চ সংজ্ঞা হয়, তাহলে যুক্তিপ্রধান ও কল্পনাপরায়ণ বুদ্ধির পূর্ণবিকাশ এবং ভাবাবেগ ও সূক্ষ্মবোধবৃত্তির সুসমঞ্জস পরিতৃপ্তি তাদের নিজেদের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু অপর পক্ষে যদি মানুষ যুক্তিশীল ও ভাবাবেগপ্রধান প্রাণীর অতিরিক্ত কিছু হয়, যা ব্যক্ত হচ্ছে তা ছাড়িয়ে যদি এমন কিছু থাকে যাকে ব্যক্ত হতে হবে তাহলে এ কথাই সঙ্গত যে মনোময় জীবনের পূর্ণতা, বুদ্ধিশক্তির নমনীয়তা, সাবলীলতা ও বিশালসামর্থ্য, ভাবাবেগ ও সূক্ষ্মবোধবৃত্তির সুসংহত সমৃদ্ধি যাত্রার শেষ নয়, এ পথের নিশানা হল এমন উচ্চতর জীবন ও প্রখরতর বৃত্তিশক্তি গঠন করা যা পরে ব্যক্ত হয়ে নিম্নকরণকে আয়ত্তে আনবে, ঠিক যেমন মন নিজেই দেহকে এমনভাবে অধিকার করেছে যে দৈহিক সত্তা এখন আর নিজের তৃপ্তির জন্যই জীবন ধারণ করে না, বরং এক পরতর ক্রিয়ার ভিত্তি ও উপাদান হওয়ার জন্যই তার জীবন।

মনোময় জীবন অপেক্ষা এক পরতর জীবন বর্তমান — এই দৃঢ় স্বীকৃতিই ভারতীয় দর্শনের সমগ্র ভিত্তি; আর তার অর্জন ও সংহতিসাধন বিভিন্ন যোগপদ্ধতির প্রকৃত উদ্দেশ্য। মন বিবর্তনের শেষ সংজ্ঞা নয়, চরম উদ্দেশ্য নয়, এ দেহের মত এক করণ। যোগের ভাষাতেও এর নাম অন্তঃকরণ। আর ভারতীয় ঐতিহ্য এই যে যা ব্যক্ত করতে হবে তা মানবীয় অনুভূতিতে নতুন জিনিস নয়, তার বিকাশসাধন আগেই করা হয়েছে এবং এমনকি বিকাশের কোন কোন পর্বে তা মানবজাতিকে নিয়ন্ত্রণও করেছে। যাই হোক না কেন তার কথা যে জানা আছে তা থেকেই বোঝা যায় যে কোন এক সময় এর আংশিক বিকাশসাধন হয়েছিল। আর তারপর প্রকৃতি যে তার সিদ্ধি থেকে নেমে এসেছে এ বিষয়ে সন্ধান করলে পাওয়া যাবে যে এর কারণ হল কোন বিষয়ে সাম্যস্থাপনের অভাব বা যে মানসিক ও জড়গত ভিত্তিতে সে ফিরে এসেছে তার কোনরকম অসম্পূর্ণতা বা নিম্নজীবনের ক্ষতি করে উচ্চজীবনের অতিমাত্রায় বিশেষীকরণ।

এখন প্রশ্ন হবে, এই যে পরতর বা পরতম জীবনের দিকে আমাদের বিবর্তনের উন্মুখতা তার স্বরূপ কী? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাদের এমন সব অসামান্য ভাবনার কথা উল্লেখ করতে হবে যে পুরনো সংস্কৃত ভাষা ছাড়া অন্য কিছুতে এদের সঠিক বর্ণনা দুষ্কর, কারণ শুধু এই ভাষাতেই এসবকে কতকটা সুব্যবস্থিত করা হয়েছে। ইংরাজী ভাষায় এসবের কাছাকাছি সংজ্ঞাগুলির সঙ্গে অন্যরকম ধারণা সংশ্লিষ্ট, তাদের ব্যবহারে অনেক, এমনকি গুরুতর ভুল হবার সম্ভাবনা। যোগের পরিভাষা অনুসারে, আমাদের শারীরিক ও প্রাণিক সত্তার স্থিতি যার নাম দেওয়া হয় স্থূল শরীর আর যা গড়া অন্নকোষ ও প্রাণকোষ দিয়ে, তারপর শুধু মনকোষ দিয়ে গড়া আমাদের মনোময় সত্তার স্থিতি যার নাম সূক্ষ্ম শরীর, এ দুটি ছাড়া আমাদের মধ্যে আছে আর এক তৃতীয়, অতিমানস সত্তার পরম দিব্য স্থিতি, যার নাম হল কারণ-শরীর আর যা গড়া চতুর্থ ও পঞ্চম কোষ দিয়ে যাদের বর্ণনা দেওয়া হয় বিজ্ঞানকোষ ও আনন্দকোষ বলে। এই বিজ্ঞান কিন্তু মানসিক জিজ্ঞাসা ও যুক্তিপ্রসূত সুবিন্যস্ত জ্ঞান নয় বা সাময়িকভাবে

সাজানো এমন কতকগুলি সিদ্ধান্ত বা অভিমত নয় যাদের সত্যতার সম্ভাবনা খুব বেশী; বরং এ হল শুদ্ধ স্বাধিষ্ঠিত স্বয়ং-প্রকাশ সত্য। আর এই আনন্দ হৃদয় ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির এমন নিরতিশয় সুখ নয় যার পিছনে আছে দুঃখযন্ত্রণার বোধ; এই আনন্দও স্বাধিষ্ঠিত এবং কোন বিষয় ও বিশেষ অনুভূতি নিরপেক্ষ, সে আত্ম-আনন্দ, যেন তা এক বিশ্বাতীত ও অনন্ত জীবনের আত্ম-প্রকৃতি ও আত্ম-উপাদান।

কোন সম্ভাব্য বা প্রকৃত বস্তুর সঙ্গে কি এইসব মনস্তাত্ত্বিক ভাবনার মিল আছে? সকল যোগেই দৃঢ়ভাবে বলা হয় যে এসব হচ্ছে চরম অনুভূতি ও পরম লক্ষ্য। আমাদের চেতনার সর্বোচ্চ সম্ভাব্য অবস্থা, অস্তিত্বের বিশালতম সম্ভাব্য বিস্তারের নিয়ামক তত্ত্ব এরাই। আমাদের কথা এই যে প্রকাশন (শ্রুতি), চিদাবেশ ও বোধি এই তিন মানসশক্তির মোটামুটি অনুরূপ পরমা শক্তিনিচয়ের সৌষম্য বর্তমান, কিন্তু এসব এখনও বোধিময় বুদ্ধিতে বা দিব্যমানসে সক্রিয় নয়, এসব সক্রিয় আরো পরতর স্তরে; এরা সত্যকে দেখে সরাসরি ও মুখোমুখি; অথবা বলা যায়, বিষয়সমূহের বিশ্বাত্মক ও বিশ্বোত্তীর্ণ সত্যের মধ্যেই তাদের বাস ও তারই বিধান ও দীপ্ত ক্রিয়া এরা। এই সব পরমাশক্তি হল অহমাত্মক জীবনের স্থলাভিষিক্ত এক সচেতন অস্তিত্বের দীপ্তি যা একাধারে বিশ্বাত্মক ও বিশ্বোত্তীর্ণ এবং আনন্দস্বরূপ। স্পষ্টতঃ এরা দিব্য এবং মানুষের বর্তমান আপাত প্রতীয়মান গঠনের অবস্থার পক্ষে এরা চেতনা ও ক্রিয়ার অতিমানুষী অবস্থা। পরম অজ্ঞেয় তত্ত্বকে শুদ্ধ নৈর্ব্যক্তিকতা বা বিশ্বপ্রকাশক বিরাট পুরুষ বলে ভাবা হোক না কেন আমাদের প্রবুদ্ধ জ্ঞানে তাঁর যে আত্ম-বিভাবনা, পরমাত্মা তার দার্শনিক বিবরণ হল সচ্চিদানন্দ — বিশ্বোত্তীর্ণ সত্তা, আত্ম-সংবিৎ ও আত্ম-আনন্দের ত্রিত্ব। কিন্তু যোগে তাদের মনস্তাত্ত্বিক বিভাবেও তাদের গণ্য করা হয় প্রত্যক্-বৃত্ত জীবনের অবস্থা হিসেবে; তবে এইসব অবস্থার সঙ্গে এখন আমাদের জাগ্রত চেতনার কোন পরিচয় না থাকলেও তারা আমাদের মধ্যে অতিচেতন স্তরে অবস্থিত এবং সেজন্য তাতে আমাদের উত্তরণ সর্বদাই সম্ভব।

কেননা, নামেই বোঝা যায় যে, করণ নামে অভিহিত দুই শরীরের বিপরীত যে কারণ-শরীর ও যা ক্রমবিকাশের এক গৌরবমণ্ডিত পরিণতি, সে তার পূর্ববর্তী সব কিছু বাস্তব বিকাশের উৎস ও কার্যসাধিকা শক্তিও বটে। বস্তুতঃ দিব্যজ্ঞান থেকেই আমাদের সব মানসিক ক্রিয়া উৎপন্ন, এসব তারই অংশ এবং যতক্ষণ এরা তাদের গূঢ় উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন ততক্ষণ এরা দিব্যজ্ঞানের বিকৃতি। পরম আনন্দের সঙ্গে আমাদের ইন্দ্রিয়-সংবিৎ ও ভাবাবেগের, দিব্যচেতনার নেওয়া পরম সঙ্কল্প ও পরমাশক্তির বিভাবের সঙ্গে আমাদের স্নায়বিক শক্তি ও কার্যের, ঐ পরম আনন্দ ও চেতনার শুদ্ধ স্বভাবের সঙ্গে আমাদের শারীরিক সত্তারও সেই একই সম্পর্ক। যে বিবর্তনধারা আমরা দেখি এবং পার্থিব প্রকৃতিতে আমরা যার শীর্ষস্থানীয় তাকে এক অর্থে বিপরীত ক্রমবিকাশধারা মনে করা যেতে পারে; এর মাধ্যমে এই সব মহাশক্তি তাদের একত্বে ও বৈচিত্র্যে জড়, প্রাণ ও মনের অপূর্ণ ধাতু এবং ক্রিয়াসমূহকে এমনভাবে ব্যবহার করে ও এমনভাবে উন্নত ও পূর্ণ

করে তোলে যাতে তারা তাদের উৎসস্বরূপ দিব্য ও শাশ্বত অবস্থার সৌষম্য উত্তরোত্তর প্রকাশ করতে সমর্থ হয় পরিবর্তনশীল আপেক্ষিকতার মধ্যে। এই যদি বিশ্বের সত্য হয়, তা হলে বিবর্তনের লক্ষ্য যা, তার কারণও তা এবং এটাই তার উপাদানের মধ্যে অর্ন্তনিহিত রয়েছে ও সে সব থেকে মুক্ত হচ্ছে। কিন্তু যদি মুক্তির অর্থ হয় পলায়ন, যে উপাদান ও ক্রিয়ার মধ্যে এই সত্য নিহিত ছিল তাদের উন্নত ও রূপান্তরিত করাতে যদি তা ফিরে না আসে তাহলে এই মুক্তি যে অপূর্ণ থেকে যায় তা নিশ্চিত। যদি পরিমাণে এরকম এক রূপান্তর সাধন না হয় তাহলে সত্যের অর্ন্তনিহিত হওয়ারও কোন বিশ্বাসযোগ্য হেতু থাকে না। কিন্তু যদি মানুষের মন দিব্য জ্যোতির মহিমা লাভে সমর্থ হয়ে ওঠে, যদি মানুষের ভাবাবেগ ও ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে পরম আনন্দের ছাঁচে রূপান্তরিত করে তার মত বৃহৎ ও সক্রিয় করা যায়, যদি মানুষী কর্ম দিব্য অহং-শূন্য শক্তিকে শুধু ব্যক্ত না করে নিজেকে তার গতি বলে অনুভব করে আর যদি আমাদের সত্তার জড়ীয় ধাতু এই সব পরম অনুভূতি ও শক্তিকে ধারণ ও দীর্ঘস্থায়ী করার উপযোগী পরমতম স্বভাবের বিশুদ্ধতা যথেষ্ট পরিমাণে লাভ করে এবং যথেষ্ট পরিমাণে নমনীয় ও তার সাথে স্থায়ী ও দৃঢ় হয়ে ওঠে তা হলে প্রকৃতির এই সুদীর্ঘ সাধনা সার্থক হবে এক গৌরবময় পরিণতিতে, আর তার পরিণামধারায় উদ্ভাসিত হবে তার গভীর তাৎপর্য।

এই পরম জীবনের ঈষৎ আভাসও এত সমুজ্জ্বল আর এত দুর্বার এর আকর্ষণ যে একবার এর দেখা পেলে আমাদের আর দ্বিধা থাকে না যে সেই জীবনলাভের সাধনার জন্য অন্য সবকিছু অবহেলা করার সঙ্গত কারণ বর্তমান। এমনকি এক মতে বলা হয় যে মন এক অযোগ্য বিকৃতি ও প্রচণ্ড বাধা, এক ভ্রমাত্মক জগতের উৎস ও পরম সত্যের অপলাপ, আর চরম মুক্তি পাওয়ার জন্য দরকার মনকে অস্বীকার ক'রে তার সকল কাজ ও ফলের বিলোপসাধন। অবশ্য অন্য যে মতে সব কিছুকেই দেখা হয় মনে এবং মনোময় জীবনই আত্যন্তিক আদর্শ, সে মতের সম্পূর্ণ বিপরীত অতিশয়োক্তি ঐ পূর্বমত; কিন্তু এ অর্ধসত্য, এর ভুল এই যে এতে মনের বাস্তব অক্ষমতাগুলিই দেখা হয়, এর দিব্য তাৎপর্য লক্ষ্য করা হয় না। যে জ্ঞানে দেখা হয় ও স্বীকার করা হয় যে ভগবান বিশ্বের মধ্যে অথচ বিশ্বের অতীত, সেই জ্ঞানই চরম জ্ঞান। আর পূর্ণ যোগও তা-ই যা বিশ্বাতীতকে পেয়ে জগতে ফিরে এসে তাকে অধিকার করে এবং সেই সঙ্গে তাতে থাকে অস্তিত্বের বৃহৎ সোপান দিয়ে ইচ্ছামত উত্তরণ ও অবতরণ করার শক্তি। কেননা যদি শাশ্বত প্রজ্ঞা আদৌ থাকে তাহলে মনঃশক্তিরও উচ্চ ব্যবহার ও নিয়তি থাকাও নিশ্চিত। মনের এই ব্যবহার নির্ভর করে উত্তরণের অবস্থা ও প্রত্যাবর্তনের উপর, আর তার নিয়তি হল পরিপূর্ণতা ও রূপান্তর, মূলোৎপাটন বা বিলোপসাধন নয়।

তাহলে আমরা দেখি প্রকৃতির এই তিনটি ক্রম — (১) দৈহিক জীবন যা এই জড়জগতে আমাদের জীবনের ভিত্তি, (২) মনোময় জীবন যার মধ্যে আমাদের উদ্বর্তন হচ্ছে এবং যার দ্বারা আমরা এই দৈহিক জীবনকে উচ্চতর ব্যবহারে উন্নীত ও এক মহত্তর পূর্ণতায় প্রসারিত করি; এবং (৩) দিব্য অস্তিত্ব যা অন্যদুটির সাধ্য লক্ষ্য, অথচ

যা আবার ফিরে আসে ঐ দুটি জীবনের উপর তাদের মুক্ত করে নিয়ে যেতে তাদের মহত্তম সম্ভাবনার মধ্যে। আমাদের ধারণায় এদের কোনটি আমাদের নাগালের বাইরে বা প্রকৃতির নিম্নে নয়, আর চরম প্রাপ্তির জন্য এদের কোনটিরই বিনাশ অত্যাবশ্যক নয়। সুতরাং আমাদের কাছে এই মুক্তি ও পরিপূর্ণতা যোগের লক্ষ্যের অন্ততঃ একটি অংশ আর সে অংশ বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয় অধ্যায়

ত্রিবিধ জীবন

তাহলে যখন প্রকৃতি এক শাশ্বত ও গূঢ় সত্তার বিবর্তন অর্থাৎ উত্তরোত্তর আত্ম-অভিব্যক্তি আর তার তিনটি ক্রমিক রূপ যেন উত্তরণের তিনটি ক্রম, তখন আমাদের সকল ক্রিয়া এই তিনটি অন্যোন্যাশ্রয়ী সম্ভাবনার উপর নির্ভরশীল — (১) দৈহিক জীবন, (২) মনোময় জীবন এবং (৩) গোপন চিৎ-সত্ত্ব যা নিবর্তন ধারায় অন্য দুটির কারণ এবং বিবর্তন ধারায় তাদের ফল। দেহের সংরক্ষণ ও পূর্ণতাসাধন ও মনের সার্থকতা আনার পর সিদ্ধ দেহ ও মনে পরম চিৎপুরুষের বিশ্বোত্তীর্ণ ক্রিয়া প্রকট করা প্রকৃতির লক্ষ্য; আমাদেরও লক্ষ্য তা-ই হওয়া উচিত। যেমন মনোময় জীবন দৈহিক জীবনের বিলোপ ঘটায় না, বরং তার কাজ দেহের উন্নয়ন ও সুষ্ঠুতর প্রয়োগ সাধন, তেমন অধ্যাত্ম জীবনেরও উচিত আমাদের বুদ্ধি, ভাবাবেগ, সৌন্দর্যবোধ ও প্রাণের সব ক্রিয়াকে বিনাশ না করে তাদের রূপান্তরিত করা।

মানুষ পার্থিব প্রকৃতির শীর্ষস্থানীয়, একমাত্র তারই পার্থিব দেহে প্রকৃতির পূর্ণ অভিব্যক্তি সম্ভব। এই মানুষের তিনটি জন্ম। তাকে এক জীবন্ত কাঠামো দেওয়া হয়েছে, তাতে দেহ হল দিব্য অভিব্যক্তির আধার এবং প্রাণ তার স্ফুরন্ত (dynamic) সাধন। তার সব ক্রিয়ার কেন্দ্র হল এক ক্রমোন্নতিশীল মন যার লক্ষ্য, — নিজের, তার বাসগৃহের ও তার ব্যবহারের উপায়স্বরূপ প্রাণের পূর্ণতাসাধন; আর উত্তরোত্তর আত্মোপলব্ধির দ্বারা সে তার প্রকৃত স্বরূপ অর্থাৎ পরম চিৎপুরুষের রূপে উদ্বুদ্ধ হতে সমর্থ। সে যা সর্বদাই ছিল, তা-ই তার পরিণতি অর্থাৎ ভাস্বর পরমতম আনন্দময় পুরুষ; এখন তাব যে জ্যোতিঃপুঞ্জ প্রচ্ছন্ন তার দ্বারা প্রাণ ও মনকে উদ্ভাসিত করাই দিব্য অভিপ্রায়।

এই যখন মানবের মধ্যে সক্রিয় দিব্যশক্তির পরিকল্পনা তখন আমাদের সত্তার এই তিন উপাদানের পারস্পবিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই আমাদের সমগ্র জীবনধারা ও লক্ষ্যসাধনের কাজ চলা চাই। প্রকৃতির মধ্যে তাদের রূপায়ণ পৃথক হওয়ায় মানুষ এই তিন প্রকার জীবনের মধ্যে যে কোন একটি বেছে নিতে পারে: (১) সাধারণ জড়গত জীবন, (২) মানসিক ক্রিয়া ও উন্নতির জীবন, (৩) অব্যয় চিদানন্দ। তবে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সে এই তিনটি রূপ মিশিয়ে তাদের বিরোধ দূর করে তাতে আনতে পারে এক সুসমঞ্জস ছন্দ এবং এইভাবে সে নিজের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারে সমগ্র দেবতা, পূর্ণসিদ্ধ মানব।

সাধারণ প্রকৃতিতে এদের প্রত্যেকের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যসূচক নিয়ামক সংবেগ আছে।

দেহগত প্রাণশক্তির বৈশিষ্ট্য এই যে এর কাজ যতটা স্থায়িত্ব সাধনে ততটা অগ্রগতিতে নয়, যতটা আত্ম-পুনরাবৃত্তিতে, ততটা ব্যষ্টির আত্ম-প্রসারে নয়। অবশ্য জড়প্রকৃতিতে অগ্রসরতা আছে — এক জাতিরূপ থেকে অন্য জাতিরূপে, উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে, প্রাণী থেকে মানুষে; কেন না অচেতন জড়েও মন ক্রিয়ারত। কিন্তু একবার কোন জাতিরূপের জড়দেহ সুস্পষ্ট চিহ্নিত হলে মনে হয় পৃথ্বী জননীর প্রধান অব্যবহিত কাজ হল অবিরত পুনরুৎপাদনের মাধ্যমে সেই রূপটিকে বজায় রাখা। কারণ প্রাণ সর্বদাই চায় অমরত্ব; কিন্তু ব্যষ্টিরূপ অনিত্য। অবশ্য কোন রূপের ভাবনা জগৎসৃজনকারী চেতনায় নিত্য, কারণ সেখানে তার বিনাশ নেই। ব্যষ্টিরূপের অনিত্যতাহেতু যে জড়ীয় অমরত্ব সম্ভব তা হল অবিরত পুনরুৎপাদন। সেজন্য আত্ম-সংরক্ষণ, আত্ম-পুনরাবৃত্তি, আত্ম-বহুলীকরণ — এগুলিই অবশ্যম্ভাবীরূপে সব জড়গত সত্তায় প্রবল সহজাত সংস্কার হয়ে দাঁড়ায়।

শুদ্ধ মনঃশক্তির বৈশিষ্ট্য, — পরিবর্তন; যতই সে উন্নত ও সংহত হয় মনের এই বিধানে ততই সে ক্রমাগত চায় তার লাভের পরিধির বিস্তার, তাদের উন্নতি ও সুষ্ঠুতর পারিপাট্য। এইভাবে সে ক্রমাগত চায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও সরল থেকে বৃহৎ ও জটিল সংসিদ্ধি। কারণ দেহগত প্রাণ অন্যরূপ হলেও মনের ক্ষেত্র অনন্ত, তার বিস্তার সাবলীল এবং গঠন সহজেই পরিবর্তনীয়। এর যথাযথ সহজ সংস্কার হল পরিবর্তন, আত্মপ্রসার ও আত্মোন্নতি। পূর্ণতাসাধন সম্ভব — এই তার বিশ্বাস, এগিয়ে চল, 'চরৈব' — এই তার মন্ত্র।

পরম চিৎপুরুষের স্বভাবধর্ম হল স্বরূপস্থিত পূর্ণতা ও অপরিবর্তনীয় আনন্ত্য। যে অমরত্ব প্রাণের লক্ষ্য, যে পূর্ণতা মনের নিশানা সে সব সর্বদাই তাঁর অধিগত, তাঁর স্বভাব ধর্ম। সর্বভূতের অন্তরে ও তাদের ছাড়িয়েও যিনি একই সমান, বিশ্বের মধ্যে ও তা ছাড়িয়েও যিনি সমভাবে আনন্দময়, তাঁর আবাসের সব রূপের ও ক্রিয়ার অপূর্ণতা ও দীনতা যাঁকে স্পর্শ করে না, সেই তাঁকে উপলব্ধি করা ও সনাতনকে লাভ করা — এরাই হল অধ্যাত্মজীবনের জয়গৌরব।

এই তিন রূপের প্রতিটিতেই প্রকৃতির কাজ চলে ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়ভাবেই; কারণ সনাতন যেমন ব্যষ্টিরূপে প্রতিষ্ঠিত, তেমন সমভাবে প্রতিষ্ঠিত সকলপ্রকার সমষ্টি জীবনেও, অর্থাৎ বংশে, গোষ্ঠীতে, রাষ্ট্রজাতিতে বা জড় অপেক্ষা সূক্ষ্মতত্ত্বের উপর নির্ভরশীল অন্য কোন সঙ্ঘে বা মহত্তম সমষ্টিতে অর্থাৎ মানবজাতিতে । এই সব কর্মক্ষেত্রের যে কোন একটি বা সবগুলি থেকে মানুষও পারে তার নিজের ব্যষ্টি মঙ্গল খুঁজতে অথবা তাদের মধ্যে সমষ্টির সাথে একাত্ম হয়ে তার জন্যই জীবনধারণ করতে অথবা ঊর্ধ্বে উঠে এই জটিল বিশ্ব সম্বন্ধে সত্যতর দৃষ্টি পেয়ে সমষ্টির লক্ষ্যের সঙ্গে নিজের ব্যষ্টি উপলব্ধির সামঞ্জস্য আনতে। কেননা অন্তঃপুরুষের এই বিশ্বে থাকাকালীন পরাৎপরের সঙ্গে তার সঠিক সম্বন্ধ যেমন অহমিকাবশে নিজের স্বাতন্ত্র্য জাহির করা নয়, বা নিজেকে অনির্বচনীয়ের মধ্যে লোপ করা নয়, বরং ভগবান ও জগতের সঙ্গে নিজের

ঐক্য উপলব্ধি করা ও ব্যষ্টির মধ্যে তাদের মিলন সাধনই সঠিক সম্বন্ধ, সেরকম সমষ্টির সঙ্গে ব্যষ্টিরও সঠিক সম্বন্ধ হল অহমিকাবশে সঙ্গীসাথীদের উপেক্ষা করে নিজের পার্থিব বা মানসিক উন্নতি বা অধ্যাত্ম মুক্তি অন্বেষণ করা নয় বা সমষ্টির জন্য নিজের যথাযথ বিকাশ রোধ বা ক্ষুণ্ণ করা নয়, বরং নিজের মধ্যে তার উৎকৃষ্ট ও পূর্ণতম সম্ভাবনাগুলিকে একত্র করা এবং সমগ্র জাতি যাতে তার পরম ব্যক্তিভাবনা প্রাপ্তির আরো নিকটবর্তী হতে পারে সেই উদ্দেশ্যে সে সবকে মনন, ক্রিয়া ও অন্য সকল উপায়ে চতুষ্পার্শ্বের সকলের উপর বর্ষণ করাই সঠিক সম্বন্ধ।

এ থেকে বোঝা যায় যে প্রকৃতির প্রাণিক লক্ষ্য পূর্ণ করাই জড়গত জীবনের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য। জড়াসক্ত মানুষের একমাত্র লক্ষ্য — বেঁচে থাকা, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চলা আর মাঝখানে সম্ভবমতো আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া; তবে যে কোন ভাবেই হোক বেঁচে থাকাই তার লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে সে গৌণ করতে পারে, তবে তা শুধু জড়-প্রকৃতির অন্য সংস্কারের কাছে যেমন ব্যষ্টির পুনরুৎপাদন এবং বংশে, শ্রেণীতে বা সম্প্রদায়ে জাতিরূপ (type) সংরক্ষণে। ব্যক্তিজীবন, গার্হস্থ্যজীবন, সমাজ ও জাতির অভ্যস্ত বিধি — এইগুলিই জড়গত জীবনের অঙ্গ। প্রকৃতির বিধানে ও ব্যবস্থায় এর বিশাল গুরুত্ব স্বতঃসিদ্ধ এবং এইভাবে ভাবিত যে সব মানুষ তাদের গুরুত্বও অনুরূপ। তাদের দেখে প্রকৃতি নিশ্চিন্ত যে তার তৈরী কাঠামোর স্থায়িত্ব সুনিশ্চিত এবং অতীতের লাভগুলিও তারা যত্ন করে রক্ষা করবে ও পরম্পরাক্রমে বজায় রাখবে।

কিন্তু এই উপকারিতার অপরিহার্য ফল এই যে এসব মানুষ ও তাদের জীবন সীমিত, অযৌক্তিকভাবে রক্ষণশীল এবং পার্থিব বিষয়ে বদ্ধ হতে বাধ্য। চিরাচরিত জীবনধারা, প্রচলিত বিধান ও প্রতিষ্ঠান, বংশানুগত বা অভ্যস্ত চিন্তাপ্রণালী — এই সব তাদের প্রাণবায়ুস্বরূপ। প্রগতিশীল মন অতীতে যে সব পরিবর্তন এনেছে তা তারা স্বীকার করে ও আগ্রহের সঙ্গে সমর্থন ও রক্ষা করে; কিন্তু বর্তমানে তা যে সব পরিবর্তন আনছে তাদের বিরুদ্ধে সে সমান উৎসাহে সংগ্রাম করে। কারণ জড়াসক্ত মানুষের কাছে বর্তমান প্রগতিশীল চিন্তাবিৎ ভাববিলাসী, স্বপ্নবিহারী ও উন্মাদ। প্রাচীন সেমেটিক জাতির যে সব লোক ভগবদ্‌বাণী প্রচারকদের পাথর দিয়ে জীবন্ত মেরে ফেলে পরে তাদের মৃত্যুর পর তাদের স্মৃতিপূজা করত, তারা প্রকৃতির এই সংস্কারবদ্ধ বুদ্ধিহীন তত্ত্বের মূর্তিমান অবতার। প্রাচীন ভারতে একজন্মা ও দ্বিজন্মার (বা দ্বিজর) মধ্যে যে পার্থক্য করা হ'ত তাতে এই জড়াসক্ত মানুষের পক্ষেই প্রথম বিশেষণটি প্রযোজ্য। এরকম মানুষ প্রকৃতির নিম্নক্রিয়াসাধক, সে উচ্চতর ক্রিয়ার ভিত্তি রক্ষা করে, কিন্তু তার কাছে দ্বিজত্বের গৌরব সহজে উন্মুক্ত হয় না।

তথাপি অতীতকালের ধর্মের সব বহিঃপ্রকাশ তার প্রচলিত ভাবধারায় যতটা আধ্যাত্মিকতা এনেছে তা সে স্বীকার করে এবং তার বিশ্বাসমত নিরাপদ ও সাধারণ আধ্যাত্মিকতার আহার দিতে সমর্থ এমন সব পুরোহিত বা পণ্ডিত ধর্মতত্ত্ববিদদের জন্য সে তার সমাজব্যবস্থায় পূজ্য স্থান রাখে, তবে প্রায়শঃই এ তেমন কার্যকরী নয়। কিন্তু

যে নিজের জন্য আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও আধ্যাত্মিক জীবনের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক তাকে সে যদিই-বা আদৌ স্বীকার করে তবু পুরোহিতের পরিচ্ছদ দেয় না, তাকে দেয় সন্ন্যাসীর বসন। সে যদি তার বিপজ্জনক স্বাধীনতার ব্যবহার করতে চায় তাহলে তার স্থান সমাজের বাইরে। এইভাবে সে হবে পরম চিন্ময়পুরুষের তড়িৎগ্রহণের এক মানুষী তড়িৎদণ্ড যাতে সমাজসৌধকে রক্ষা করার জন্য সে ঐ তড়িৎকে দূরে চালনা করে।

এসব সত্ত্বেও জড়গত মনের উপর প্রগতির প্রথার, সচেতন পরিবর্তনের অভ্যাসের, জীবনের ধর্ম হিসাবে অগ্রসরতার বদ্ধমূল ধারণার ছাপ বসিয়ে জড়াসক্ত মানুষ ও তার জীবনকে কিছু পরিমাণে প্রগতিসম্পন্ন করা সম্ভব। এই উপায়ে ইউরোপে যে প্রগতিশীল সমাজ সৃষ্টি হয়েছে তা জড়ের উপর মনের এক মহত্তম বিজয়। কিন্তু জড়প্রকৃতি প্রতিশোধ নেয়; কারণ যে উন্নতি হয় তা অপেক্ষাকৃত স্থূল ও বহির্মুখী হবার ঝোঁক থাকায় উচ্চতর বা আরো দ্রুতগতি আনার চেষ্টার ফল হয় দারুণ ক্লান্তি, দ্রুত অবসন্নতা ও বিস্ময়কর পশ্চাদ্‌গমন।

আবার জীবনের সকল প্রতিষ্ঠান ও প্রথাসম্মত ক্রিয়াকে ধর্মভাবের দৃষ্টিতে দেখায় অভ্যস্ত করে জড়াসক্ত মানুষ ও তার জীবনে কিছু পরিমাণ আধ্যাত্মিকতা আনা সম্ভব। প্রাচ্যে এরকম আধ্যাত্মিক সঙ্ঘের সৃষ্টি জড়ের উপর পরম চিৎপুরুষের অন্যতম মহত্তম বিজয়। তবু এখানেও ত্রুটি আছে, কারণ প্রায়শঃই এর ঝোঁক হল এক ধার্মিক ভাব গঠন যা আধ্যাত্মিকতার সব চেয়ে বাহ্যরূপমাত্র। এর উচ্চতর এমনকি সবচেয়ে গৌরবময় ও বীর্যশালী অভিব্যক্তিরও ফল — হয় সমাজত্যাগী মানুষের সংখ্যা বাড়িয়ে সমাজকে দীন করা, নয় সাময়িক উন্নতি এনে সমাজের মধ্যে কিছুকালের জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। আসলে, কি মানসিক প্রচেষ্টা বা কি আধ্যাত্মিক সংবেগ, কোনটিই বিচ্ছিন্নভাবে জড়প্রকৃতির বিশাল বাধা দূর করতে সমর্থ হয় না। প্রকৃতি চায় এ দুয়ের মিলিত পূর্ণ প্রচেষ্টা, তবেই যদি মানবজাতির মধ্যে পূর্ণ পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়। কিন্তু সাধারণতঃ এই দুই বড় কার্যসাধকের কোনটিই অপরকে কিছু ছাড়তে নারাজ।

সৌন্দর্যবোধ, সুনীতি ও বুদ্ধির কাজকর্মেই মনোময় জীবনের মনোযোগ। মৌলিক মানসিকতা আদর্শপরায়ণ ও পূর্ণতা-অন্বেষু। সূক্ষ্ম আত্মা, তৈজস আত্মা[১] সর্বদাই স্বপ্ন বিহারী। দিব্য সনাতনের নতুন রূপ অন্বেষণই হোক বা পুরোনো রূপগুলিকে সঞ্জীবিত করাতেই হোক শুদ্ধ মানসিকতার প্রাণ হল ষোড়শকলা সৌন্দর্য, সিদ্ধ আচরণ ও অখণ্ড সত্যের স্বপ্ন দেখা। কিন্তু কেমন করে জড়ের বাধার মোকাবিলা করতে হয় তা সে জানে না। এখানে সে বদ্ধ ও অপটু, আনাড়ির মত ভুল তার পরীক্ষণ এবং হয় সে সংগ্রাম থেকে পিছিয়ে আসে, নয় মলিন বাস্তবতার কাছে নতিস্বীকার করে। আর না হয় জড়জীবন পর্যালোচনার পর সংগ্রামের সর্তসমূহ স্বীকার করে সে সফল হতে পারে,

[১] যিনি স্বপ্নে বাস করেন, অন্তঃপ্রজ্ঞ, প্রবিবিক্তভুক, তৈজস — মাণ্ডূক্য উপনিষদ ৪

কিন্তু তা শুধু সাময়িকভাবে এক কৃত্রিম ব্যবস্থা চাপিয়ে কেননা অনন্ত প্রকৃতি হয় তাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দূরে নিক্ষেপ করে, নয় এমনভাবে বিকৃত করে যে তাকে চেনা অসাধ্য হয়, অথবা তার সম্মতি প্রত্যাহার করে ফেলে রেখে যায় শুধু এক মৃত আদর্শের শব। স্বপ্নদ্রষ্টা মানবের খুব কম উপলব্ধিই জগৎ সাদরে গ্রহণ করেছে বা সাগ্রহে তাদের স্মরণ করে বা স্বীয় উপাদানের মধ্যে পোষণ করতে চায়।

বাস্তব জীবন ও চিন্তাবিদ্‌দের স্বভাবের মধ্যে ব্যবধান বড় বেশী হলে মন নিজের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বাধীনতার সঙ্গে কাজ করার জন্য জীবন থেকে একরকম সরে দাঁড়ায়। আগের দিনে প্রায়ই দেখা যেত, এখনও এমন দৃষ্টান্ত কম নয়, যে কবি নিজের উজ্জ্বল কল্পনার মধ্যেই নিবদ্ধ, শিল্পী তাঁর শিল্পেই তন্ময়, দার্শনিক তাঁর নিঃসঙ্গ কক্ষে বুদ্ধির সমস্যা সমাধানে সমাহিত, বৈজ্ঞানিক ও বিদ্বান তাঁদের পাঠ ও পরীক্ষণেই মগ্ন। এঁদের বলা যায় বুদ্ধিশক্তির সন্ন্যাসী। মানবজাতির জন্য তাঁরা যে কাজ করেছেন অতীত সে সবের সাক্ষ্য বহন করে।

কিন্তু কোন বিশেষ বিশেষ কর্মসাধনের জন্যই এরকম একান্ত বাস সঙ্গত হতে পারে। মন যখন জীবন-কুরুক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ ক'রে মহত্তর আত্মসিদ্ধির উপায় হিসেবে তার সকল সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধককে সমভাবে স্বীকার করে তখনই তার শক্তি ও ক্রিয়ার পূর্ণ প্রকাশ হয়। জড়জগতের সব বাধা বিপত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করেই ব্যষ্টির নৈতিক বিকাশ দৃঢ় আকার ধারণ করে ও সদাচরণের মহান্ সংঘের সৃষ্টি হয়, আর জীবনের বাস্তব ঘটনার সঙ্গে সংস্পর্শে এলেই শিল্প পায় জীবনীশক্তি, মননশক্তি নিশ্চিত হয় তার আচ্ছিন্ন প্রত্যয় সম্বন্ধে ও দার্শনিকের সামান্যীকরণ প্রতিষ্ঠিত হয় বিজ্ঞান ও অনুভূতির দৃঢ় ভিত্তির উপর।

অবশ্য জড়জীবনের রূপ বা জাতির উন্নয়ন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে ব্যষ্টিমনের জন্য এইভাবে জীবনের সঙ্গে মেশামেশি সম্ভব। এরকম উদাসীনতার চরম নিদর্শন হল (গ্রীসীয়) এপিকিউরিয়ান সম্প্রদায়ের সাধনা। স্তোয়িকরাও (Stoics) একে সম্পূর্ণ পরিহার করেনি। এমনকি পরোপকারীরও করুণার কাজ সাধারণতঃ জগৎ অপেক্ষা নিজের জন্যই বেশী। কিন্তু এও সীমিত পূর্ণতা। প্রগতিশীল মনের পরাকাষ্ঠা দেখা যায় সমগ্র জাতিকে নিজের ভূমিতে আনার প্রয়াসে; আর এ কাজের জন্য হয় সে তার নিজের ভাবনা ও পরিপূর্ণতার প্রতিরূপ সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়, নয় জাতির জড়গত জীবনকে ধর্ম, বুদ্ধিশক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্রের নব নবরূপে এমনভাবে পরিবর্তিত করে যাতে এসবে যতদূর সম্ভব ফুটে উঠতে পারে ব্যক্তির নিজের আন্তর জীবন আলো-করা সত্য, সৌন্দর্য, ন্যায়নিষ্ঠা ও সুনীতিপরায়ণতার সমুজ্জ্বল আদর্শ। এবকম কাজে বিফল হলেও কিছু যায় আসে না, কারণ শুধু প্রয়াসও স্ফুরন্ত ও সৃজনক্ষম। জীবনকে উন্নীত করার জন্য মনের যে সংগ্রাম তাতে আছে মনের চেয়েও মহত্তর শক্তির দ্বারা জীবন জয়ের আশ্বাস ও বিধান।

পরম বস্তুর অর্থাৎ অধ্যাত্মজীবনের আগ্রহ শাশ্বতে, কিন্তু সেজন্য সে যে অনিত্য

সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন তা নয়। মন যে ষোড়শকল সৌন্দর্যের স্বপ্ন দেখে, অধ্যাত্মব্যক্তির বাস্তব উপলব্ধিতে তা এমন শাশ্বত প্রেম, সৌন্দর্য ও আনন্দ যা পরনির্ভর নয় ও সকল পরাক্‌বৃত্ত দৃশ্যের পশ্চাতে সমভাবে বিদ্যমান; মন যে অখণ্ড সত্যের স্বপ্ন দেখে অধ্যাত্ম উপলব্ধিতে তা এমন স্বরূপস্থিত স্বপ্রকাশক সনাতন সত্য যা অপরিবর্তনীয় কিন্তু সকল পরিবর্তনের ব্যাখ্যা ও মূল রহস্য এবং প্রগতির লক্ষ্য; মন যে সিদ্ধ কর্মের স্বপ্ন দেখে, অধ্যাত্ম উপলব্ধিতে তা সর্বক্ষম স্বয়ংক্রিয় এমন বিধান যা সকল বিষয়ের মধ্যে চিরন্তন অনুস্যূত এবং যা জগতের ছন্দে এখানে রূপায়িত হচ্ছে। তৈজস আত্মায় যা চঞ্চল দর্শন বা সৃজনের অবিরত প্রচেষ্টা তা সর্বজ্ঞ সর্বেশ্বরের আত্মায় নিত্যবিরাজমান পরম সদ্‌বস্তু[১]।

কিন্তু নিঃসাড় বাধাদায়ী জড়গত কর্মের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা মনোময় জীবনের পক্ষে যদি প্রায়শঃই কষ্টকর হয় তাহলে এই যে জগৎ যা সত্যের বদলে সর্বপ্রকার মিথ্যা ও ভ্রান্তিতে পূর্ণ, প্রেম ও সৌন্দর্যের বদলে সর্বব্যাপী বিরোধ ও কদর্যতায় পূর্ণ, সত্যের বিধানের বদলে বিজয়ী স্বার্থপরতা ও পাপে পূর্ণ, তাতে অধ্যাত্মসত্তার পক্ষে বাস করা কতই না কষ্টকর। সেজন্য সাধু ও সন্ন্যাসীর অধ্যাত্মজীবনের স্বাভাবিক ঝোঁক হল জড়জীবন থেকে সরে যাওয়া এবং স্থূলভাবে বা অন্তর থেকে তাকে পুরোপুরি বর্জন করা। তার কাছে জগৎ অশিব বা অবিদ্যার রাজ্য আর শাশ্বত ও দিব্যের বাস — হয় সুদূর স্বর্গে, নয় জগৎ ও জীবন ছাড়িয়ে ওপারে। ঐ অপবিত্রতার সঙ্গে সে কোন সম্পর্ক রাখে না, সে বলে, অধ্যাত্মসত্যের স্থান নিরঞ্জন একান্তে। এই প্রত্যাহারে জড়জীবনেরও মহদুপকার হয় কেন না এইভাবে জড়জীবন এমন কিছুকে সম্ভ্রম, এমন কি মান্য করতে বাধ্য হয় যা তার ক্ষুদ্র আদর্শ, হীন ভাবনা ও অহং-গত আত্মতুষ্টির সোজা অস্বীকৃতি।

কিন্তু জগতে আধ্যাত্মিক শক্তির মত পরমাশক্তির কাজ এইভাবে খর্ব করা যায় না। অধ্যাত্মজীবনও জড়ে ফিরে এসে একে ব্যবহার করতে পারে তার নিজের মহত্তর পূর্ণতার উপায় হিসেবে। সে জগতের দ্বন্দ্ব ও বাহ্যরূপে বিভ্রান্ত না হয়ে সকল কিছুর মধ্যে খুঁজতে পারে একই সর্বেশ্বর, একই শাশ্বত সত্য, সুন্দর, প্রেম ও আনন্দকে। "সর্বভূতে আত্মা, আত্মায় সর্বভূত, সর্বভূত আত্মারই সম্ভূতি" — বেদান্তের এই সূত্র শুদ্ধতর ও সর্বগ্রাহী এই যোগের চাবিকাঠি।

কিন্তু মনোময় জীবনের মত অধ্যাত্মজীবনও বাহ্য জীবনকে ব্যবহার করতে পারে শুধু ব্যষ্টির মঙ্গলের জন্য আর এই যে জগৎকে সে শুধু প্রতীকরূপে ব্যবহার করে তার সমষ্টির উন্নয়নের প্রতি সে হবে সম্পূর্ণ উদাসীন। যেহেতু শাশ্বত সদ্‌বস্তু সর্বভূতে সর্বদা এক, তাঁর কাছে সর্বভূত এক, যেহেতু তার নিজের সিদ্ধিলাভের সাধনার তুলনায় কর্মের রীতি ও ফলের কোন মূল্য নেই, এই আধ্যাত্মিক উদাসীনতা নিজস্ব পরমার্থ সিদ্ধ হলেই বিদায় নিতে প্রস্তুত, আর যে কোন পরিবেশ বা ক্রিয়া আসুক না কেন সেসব সে গ্রহণ

[১] যিনি একীভূত, প্রজ্ঞানঘন, আনন্দময় ও আনন্দভুক্‌ প্রাজ্ঞ...। যিনি সর্বেশ্বর সর্বজ্ঞ, অন্তর্যামী — মাণ্ডুক্য উপনিষদ ৫,৬।

করে অনাসক্ত ভাবে। গীতার আদর্শ অনেকে এই ভাবে বুঝেছে। আর না হয় সৎকার্য সেবা ও করুণার মাধ্যমে আন্তর প্রেম ও আনন্দ এবং জ্ঞান বিতরণের মাধ্যমে আন্তর সত্য, জগতের উপর নিজেদের ঢেলে দিতে পারে, আর সেইহেতু জগতের রূপান্তর সাধনের জন্য কোন প্রয়াসও করে না। তার ধারণায় জগতের অবিচ্ছেদ্য প্রকৃতিই এমন যে তা পাপ ও পুণ্য, সত্য ও মিথ্যা, সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বসমূহের সংগ্রাম ক্ষেত্রই রয়ে যাবে।

কিন্তু যদি প্রগতিও জগৎজীবনের অন্যতম বড় কথা হয় এবং উত্তরোত্তর ভগবৎ-অভিব্যক্তিই প্রকৃতির প্রকৃত তাৎপর্য হয় তা হলে এরূপ গণ্ডি টানাও যুক্তিহীন। জগতে আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে জড়গত জীবনকে নিজের প্রতিচ্ছবিতে, ভগবানের প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব, আর তার আসল ব্রতও এই। তাই দেখি যে সব মহাসাধক সংসার ত্যাগ করে নিরালায় নিজেদের আত্মমুক্তি খুঁজেছেন এবং তা পেয়েছেনও, তাঁরা ছাড়াও এমন অনেক অধ্যাত্ম মহাগুরু এসেছেন যাঁরা অপরকেও মুক্ত করেছেন; এবং সর্বোপরি দেখতে পাই এমন সব শক্তিমান মহাপুরুষ যাঁরা পরম চিৎপুরুষের শক্তিতে জড়গত জীবনের সকল মিলিত শক্তি অপেক্ষা বলীয়ান হয়ে জগতে নেমে এসেছেন, ভালবেসেই তার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে তাকে রূপান্তরে সম্মতি দিতে চেষ্টা করেছেন। সাধারণতঃ মানবজাতির মানসিক ও নৈতিক পরিবর্তনেই এই চেষ্টা নিবদ্ধ থাকে, কিন্তু তাঁরা এর পরিধি বাড়িয়ে জীবনের বিভিন্ন রূপ ও প্রতিষ্ঠানেরও পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হন যাতে এসবও ভগবৎ-শক্তির বর্ষণ গ্রহণের উপযুক্ত আধার হয়। এইসব প্রচেষ্টা মানব আদর্শের উত্তরোত্তর বিকাশসাধন ও জাতিকে দিব্যভাবে প্রস্তুত করার কাজের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বাহ্য পরিণাম যাই হোক না কেন এ সব চেষ্টার প্রতিটিতেই পৃথিবী পেয়েছে স্বর্গশক্তি ধারণের জন্য অধিকতর সামর্থ্য এবং প্রকৃতির ক্রম-বিকাশ-যোগের মন্থর গতিরও বেগ বেড়েছে।

ভারতবর্ষে গত সহস্রাধিক বৎসর ধরে অধ্যাত্মজীবন ও জড়জীবন প্রগতিশীল মনকে বাদ দিয়ে পাশাপাশি বাস করেছে। সর্বসাধারণের জন্য অগ্রগতির চেষ্টা বর্জন করে আধ্যাত্মিকতা তার বিনিময়ে জড়ের কাছ থেকে কিছু সুবিধা আদায়ের চুক্তি করেছে। সমাজের কাছ থেকে সে পেয়েছে সন্ন্যাসীর গৈরিকবস্ত্রের মত কোন বিশেষ প্রতীকধারী ব্যক্তিগণের জন্য স্বাধীনভাবে অধ্যাত্ম উন্নতি সাধনের অধিকার আর এই স্বীকৃতিও পেয়েছে যে এরকম জীবনই মানবের লক্ষ্য এবং এই পথের পথিকরা পরম শ্রদ্ধার পাত্র; আর সমাজকে এমন এক ধর্মের ছাঁচে ফেলা হয়েছে যে মানুষের অতিপ্রচলিত কর্মানুষ্ঠানও যেন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় জীবনের অধ্যাত্ম প্রতীকার্থ ও এর চরম লক্ষ্যের কথা। অন্য দিকে সমাজকেও দেওয়া হয়েছিল নিশ্চেষ্টতা ও নিশ্চল আত্ম-সংরক্ষণের অধিকার। এই সুবিধা দেওয়াতে চুক্তির মূল্য অনেক কমে গেল। ধর্মের কাঠামো নির্দিষ্ট হওয়ায় স্মারক অনুষ্ঠানের প্রবণতা হল ছককাটা কার্যক্রমে পরিণত হওয়া, এবং তার জীবন্ত তাৎপর্য নষ্ট করা। অবশ্য নতুন নতুন সম্প্রদায় ও ধর্ম কাঠামো

পরিবর্তনের জন্য পুনঃপুনঃ চেষ্টা করেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত এদেরও পরিণতি এক এক নতুন বাঁধা কার্যক্রম বা পুরনোর কিছু অদলবদল; যে স্বাধীন ও সক্রিয় মন এই অধোগতি রোধ করতে পারত তাকে নির্বাসন দেওয়ারই এই পরিণাম। অবিদ্যাগ্রস্ত ও উদ্দেশ্যহীন অসংখ্য দ্বন্দ্ব-কবলিত এই জড়জীবন হয়ে দাঁড়াল এক গুরুভার কষ্টকর জোয়াল যা থেকে পলায়ন করাই অব্যাহতির একমাত্র উপায়।

ভারতীয় যোগসম্প্রদায়গুলিও এই আপোষ মেনে নিয়েছিল। তাদেরও লক্ষ্য করা হল ব্যষ্টির সিদ্ধি বা মুক্তি, যার জন্য দরকার সংসারের কাজ কর্ম থেকে দূরে কোন রকমের একান্ত বাস; আর এর পরিণতি সন্ন্যাস,. জীবন বর্জন। গুরু জ্ঞান বিতরণ করতেন তাঁর শিষ্যের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে। আর যদিই বা কখনও ব্যাপকতরভাবে কোন আন্দোলনের চেষ্টা করা হ'ত শেষ পর্যন্ত তারও লক্ষ্য ছিল ব্যষ্টি পুরুষের মুক্তি। নিশ্চল সমাজের সঙ্গে চুক্তি প্রায় পুরোপুরিই মানা হ'ত।

জগতের তখনকার বাস্তব অবস্থায় এই সন্ধির যে অনেক উপকারিতা ছিল তাতে সন্দেহ নেই। এর ফলে ভারতে এমন এক সমাজ গড়ে উঠল যার ব্রত হল আধ্যাত্মিকতার সংরক্ষণ ও পূজা, আর ভারত এমন এক স্বতন্ত্র দেশ হল যার দুর্গের মত আশ্রয়ে সর্বোত্তম অধ্যাত্ম আদর্শ তার চারিদিককার বিরোধী শক্তির অবরোধে অভিভূত না হয়ে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হল তার পূর্ণ বিশুদ্ধতা নিয়ে। কিন্তু এ এক আপোষ মাত্র, চরম বিজয় নয়। জড়জীবন হারাল বিকাশের দিব্যসংবেগ; আর অধ্যাত্ম জীবন নিরালায় থেকে তার তুঙ্গতা, বিশুদ্ধতা রক্ষা করল বটে, কিন্তু সে-ও হারাল তার পূর্ণশক্তি ও জগতের পক্ষে তার কার্যকারিতা। সুতরাং ভগবানের বিধানে যোগী ও সন্ন্যাসীর দেশ যে উপাদানকে অর্থাৎ প্রগতিশীল মনকে বর্জন করেছিল তারই কঠোর ও অলঙ্ঘ্য সংস্পর্শে আসতে বাধ্য হল নিজের বর্তমান অভাব পূরণের জন্য।

আমাদের একথা স্বীকার করতে হবে যে ব্যষ্টির বাস শুধু নিজের মধ্যে নয়, সমাজেও এবং ব্যষ্টির সিদ্ধি ও মুক্তি জগতে ভগবৎ-অভিপ্রায়ের একমাত্র তাৎপর্য নয়। আমাদের স্বাধীনতার অবাধ ব্যবহারের মধ্যে অপরের ও মানবজাতির মুক্তিও অন্তর্গত; আমাদের সিদ্ধির কার্যকারিতার পরাকাষ্ঠা হল নিজেদের মধ্যে দিব্য প্রতীক উপলব্ধির পর অন্যের মধ্যে তা ফুটিয়ে তোলা, বহুগুণিত করা ও অবশেষে বিশ্বজনীন করা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে প্রকৃতির সাধারণ কর্মপ্রণালী ও তার ক্রমবিকাশের তিনটি ক্রম পর্যবেক্ষণ করে আমরা যে সিদ্ধান্তে এসেছিলাম, সেই একই সিদ্ধান্তে এলাম মানবজীবনের ত্রিবিধ যোগ্যতার বাস্তব দৃষ্টিতে। এখন আমরা উপলব্ধি করছি আমাদের যোগসমন্বয়ের পূর্ণ লক্ষ্য।

পরম চিৎপুরুষ বিশ্বজীবনের শীর্ষ; জড় তার ভিত্তি এবং মন এ-দুয়ের যোগসূত্র। চিৎপুরুষই নিত্য; মন ও জড় তার কর্মপ্রণালী। যা প্রচ্ছন্ন ও যাকে প্রকাশ করতে হবে তা এই চিন্ময় পুরুষ। মন ও দেহ তাঁর ঈপ্সিত আত্মপ্রকাশের উপায়স্বরূপ। চিন্ময় পুরুষ যোগেশ্বরের বিগ্রহ; মন ও দেহ সাধন। প্রাতিভাসিক জীবনে এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করাই

তাঁর বিধান। সমগ্র প্রকৃতি হল গোপন সত্যের ক্রমবিকাশের সাধনা, উত্তরোত্তর সাফল্যের সঙ্গে দিব্য বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা।

জনসাধারণের জন্য প্রকৃতি যা সাধন করতে চায় মন্থর পরিণাম ধারায়, যোগ তা সাধন করে ব্যষ্টির জন্য দ্রুত আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে। যোগের পন্থা হল প্রকৃতির সব শক্তির উদ্দীপন, তার সকল সামর্থ্যের উর্ধ্বায়ন। প্রকৃতি আধ্যাত্মিক জীবন গড়ে তোলে অতিকষ্টে, অবর সিদ্ধির জন্য তাকে সর্বদাই আসতে হয় পিছনে; কিন্তু যোগের উর্ধ্বায়িত শক্তিতে ও একাগ্র পদ্ধতিতে একাজ নিষ্পন্ন হয় দ্রুত গতিতে এবং এর সঙ্গে মনের সিদ্ধি, এমন কি ইচ্ছা হলে দেহের সিদ্ধিলাভ সম্ভব। প্রকৃতি ভগবানকে খোঁজে নিজের সব প্রতীকের মধ্যে, যোগ প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে চলে প্রকৃতির অধীশ্বরের কাছে, বিশ্ব ছাড়িয়ে বিশ্বোত্তীর্ণের নিকট এবং সেখান থেকে ফিরেও আসতে পারে বিশ্বোত্তীর্ণ জ্যোতি ও শক্তি সমেত, সর্বশক্তিমানের আদেশসহ।

কিন্তু পরিণামে উভয়েরই লক্ষ্য এক। মানবজাতির মধ্যে যোগকে সর্বজনীন করে তোলাতেই প্রকৃতির নিজের বিলম্ব ও প্রচ্ছন্নতার উপর তার চরম বিজয়। এখন যেমন সে জড়বিজ্ঞানে প্রগতিশীল মনের মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতিকে মনোময় জীবনের পূর্ণ বিকাশের উপযুক্ত করতে চাইছে, তেমন এটা অপরিহার্য যে তাকে চেষ্টা করতে হবে যোগের মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতিকে যোগ্য করতে পরতর পরিণামের জন্য, দ্বিজন্ম, অধ্যাত্মজীবনের জন্য। আর মনোময় জীবন যেমন জড়গত জীবনকে ব্যবহার করে তাকে পূর্ণ করতে চাইছে, তেমন অধ্যাত্মজীবনও ব্যবহার ও পূর্ণ করবে জড়গত ও মনোময় জীবনকে দিব্য আত্মপ্রকাশের সাধন হিসাবে। যে-যুগে একাজ নিষ্পন্ন হবে তা হবে পৌরাণিক সত্য বা কৃত যুগ, প্রতীকের মধ্যে সত্য-অভিব্যক্তির যুগ। দীপ্ত, পরিতৃপ্ত ও আনন্দপূর্ণ মানবজাতির মধ্যে প্রকৃতি যখন তার কর্মের পরিণতিতে, কর্মের সমাপ্তিতে বিশ্রাম নেবে, এ হবে সেই মহান্ ব্রত উদ্‌যাপনের যুগ।

মানবের কর্তব্য হল বিশ্ব-মাতাকে আর ভুল না বুঝে, তাঁর অপবাদ ও অপব্যবহার থেকে বিরত হয়ে তাঁর অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করা এবং তাঁর বীর্যবত্তম উপায়ে পরমতম আদর্শের জন্য সর্বদা আস্পৃহা করা।

চতুর্থ অধ্যায়

যোগের বিভিন্ন পথ

মানুষের মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন বিভাগ ও তাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সাধনার বিভিন্ন কার্যকারিতা ও উদ্দেশ্যের মধ্যে এই যে সব সম্বন্ধ আমরা প্রাকৃতিক বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় দেখলাম, তারই পুনরাবৃত্তি আমরা দেখব বিভিন্ন যোগসম্প্রদায়ের মূল তত্ত্ব ও প্রণালী সম্বন্ধে। আর যদি আমরা তাদের সব কেন্দ্রীয় সাধনপদ্ধতি ও মুখ্য লক্ষ্য মিলিয়ে সুসমঞ্জস করতে চাই তাহলে দেখা যাবে যে প্রকৃতিদত্ত ভিত্তিই আমাদের স্বাভাবিক ভিত্তি ও তাদের সমন্বয়ের বিধান।

কিন্তু এক বিষয়ে যোগ বিশ্বপ্রকৃতির সাধারণ ক্রিয়া ছাড়িয়ে তার উর্ধ্বে উঠে যায়। কারণ বিশ্বমাতার লক্ষ্য হল তার নিজের লীলা ও সৃষ্টির মধ্যে ভগবানকে আলিঙ্গন করা ও সেখানে তাঁকে উপলব্ধি করা। কিন্তু যোগের উচ্চতম স্তরে প্রকৃতি নিজেকে ছাড়িয়ে যায় এবং ভগবানকে উপলব্ধি করে তাঁর স্বরূপে, বিশ্বোত্তীর্ণ বিভাবে, — এমন কি বিশ্বলীলা থেকে তফাত থেকে। সেই জন্য কেউ কেউ মনে করেন যে এ হল যোগের শুধু শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য নয় — এই তার একমাত্র আসল উদ্দেশ্য বা একান্ত কাম্য উদ্দেশ্য।

কিন্তু প্রকৃতি যে এইভাবে তার বিবর্তনধারা ছাড়িয়ে যায় তা সর্বদা তারই এক গঠনের মাধ্যমে। জীবের হৃদয়ই তার শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম সকল ভাবাবেগকে উর্ধ্বায়িত ক'রে বিশ্বোত্তীর্ণ আনন্দ বা অনির্বচনীয় নির্বাণ লাভ করে; ব্যষ্টি মনই তার সাধারণ ক্রিয়াধারাকে মানসিকতার উর্ধ্বের জ্ঞানে পরিবর্তিত ক'রে অনির্বচনীয়ের সঙ্গে তার একত্ব উপলব্ধি করে এবং সেই বিশ্বাতীত ঐক্যের মধ্যে তার পৃথক সত্তা ডুবিয়ে দেয়। আর সর্বদা এই জীবই অর্থাৎ যে আত্মার অভিজ্ঞতা প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ও কর্ম তারই গঠনের মধ্যে সীমিত তা-ই মিলিত হয় অনপেক্ষ, নিত্যমুক্ত বিশ্বোত্তীর্ণ আত্মায়।

কার্যতঃ যোগানুশীলন সম্ভব হবার পূর্বে তিনটি ভাবনা দরকার, অর্থাৎ সাধনার জন্য যেন তিন পক্ষ ও তাদের সম্মতি প্রয়োজন; এই তিন হল ভগবান, প্রকৃতি ও মানুষের অন্তঃপুরুষ অর্থাৎ দার্শনিক ভাষায় বিশ্বোত্তীর্ণ, বিশ্বাত্মক ও জীব। শুধু জীব ও প্রকৃতি থাকলে একটি অন্যটির কাছে আটক থাকবে, সে প্রকৃতির মন্থর গতি ছাড়িয়ে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারবে না। সুতরাং বিশ্বাতীত এমন কিছুর প্রয়োজন যা প্রকৃতির চেয়ে মহত্তর ও তার অনধীন এবং যা আমাদের উপর ও প্রকৃতির উপর সক্রিয় হয়ে আমাদের আকর্ষণ করবে তার দিকে উর্ধ্বপানে এবং জীবের উত্তরণের জন্য প্রকৃতির সম্মতি আদায় করবে স্বেচ্ছায় বা জোর করে।

এই সত্যের জন্যই প্রতি যোগদর্শনে ঈশ্বর, প্রভু, পরম পুরুষ, পরমাত্মার ভাবনা প্রয়োজনীয়; তিনিই সাধনার সাধ্য, তিনিই দেন তাঁকে পাবার শক্তি ও জ্যোতিঃপ্রদ

স্পর্শ। আবার ঠিক তেমনই সত্য, ভক্তি যোগের এই দৃঢ় ও প্রাচীন অনুপূরক ভাবনা যে যেমন জীবের কাছে বিশ্বাতীত প্রয়োজনীয় ও জীব তাঁকে চায়, তেমন এক অর্থে জীবও প্রয়োজনীয় বিশ্বাতীতের কাছে এবং বিশ্বাতীত তাকে চান। যেমন ভক্তের আকর্ষণ ভগবানের পানে, আকুল আকাঙ্ক্ষা তাঁকে পাবার জন্য, তেমন ভগবানের আকর্ষণ ও ব্যাকুলতা ভক্তের[১] জন্য। মানবরূপী জ্ঞানান্বেষু, জ্ঞানের পরম বিষয়, ও জীবের দ্বারা জ্ঞানের বিশ্বজনীন শক্তির দিব্য ব্যবহার — এই তিন ব্যতীত যেমন জ্ঞানযোগ সম্ভব হয় না, তেমন ভক্তিযোগও সম্ভব হয় না মানুষী ভগবৎপ্রেমিক, প্রেম ও আনন্দের পরম বিষয় এবং জীবের দ্বারা অধ্যাত্ম, ও রসাত্মক উপভোগের বিশ্বজনীন শক্তির দিব্য ব্যবহার বিনা; আবার তেমন মানব কর্মী, পরমসঙ্কল্প সকল কর্ম ও যজ্ঞের অধীশ্বর এবং জীবের দ্বারা শক্তি ও ক্রিয়ার বিশ্বজনীন শক্তির দিব্য ব্যবহার বিনা কর্মযোগও সম্ভব নয়। বিষয়সমূহের পরমতম সত্য সম্বন্ধে আমাদের বুদ্ধিগত ভাবনা যতই অদ্বৈতভাবাত্মক হ'ক না কেন এই সর্বব্যাপী ত্রিতত্ত্বকে স্বীকার করতে আমরা বাধ্য।

কারণ যোগের সার দিব্য চেতনার সঙ্গে মানুষী ব্যষ্টিচেতনার সংস্পর্শ। বিশ্বলীলায় যা তার নিজের প্রকৃত আত্মা, উৎস ও বিশ্বভাব থেকে বিচ্যুত হয়েছে তার সঙ্গে মিলনই যোগ। যাকে আমরা ব্যক্তিত্ব বলি সেই জটিল ও দুর্বোধ্য গঠনের চেতনার যেকোন বিন্দুতে এই সংস্পর্শ আসতে পারে। একে আনা যেতে পারে জড়ের শরীরের মাধ্যমে, প্রাণে আনা যেতে পারে আমাদের স্নায়বিক সত্তার অবস্থা ও অনুভূতির নিয়ামক বৃত্তিসমূহের ক্রিয়ার মাধ্যমে, আবার মানসিকতার মধ্য দিয়েও তা আনা সম্ভব আর এর জন্য ভাবাবেগপ্রধান হৃদয়, সক্রিয় সঙ্কল্প বা মনের ধীশক্তি অথবা আরো ব্যাপকভাবে মানসচেতনার সকল ক্রিয়ারই সাধারণ রূপান্তর — এসবের যে কোনটিই সহায় হতে পারে। ঠিক সেইভাবে মনোমধ্যস্থিত কেন্দ্রীয় অহং-এর রূপান্তর দ্বারা বিশ্বাত্মক বা বিশ্বাতীত পরমসত্য ও আনন্দের দিকে সরাসরি উদ্বোধনের মাধ্যমেও ঐ সংস্পর্শসাধন সম্ভব। আর সংস্পর্শের বিন্দু আমরা যেমন নির্বাচন করব আমাদের অনুশীলিত যোগের প্রকারও হবে তেমন।

কারণ ভারতে এখনও যে প্রধান যোগসম্প্রদায় প্রচলিত আছে তাদের বিশিষ্ট প্রণালীগুলির জটিলতা বাদ দিয়ে তাদের কেন্দ্রীয় তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য করলে তাদের মধ্যে দেখি এক উত্তরোত্তর ক্রম-বিন্যাস যেমন এক সোপানশ্রেণী যা সর্বনিম্ন সোপান অর্থাৎ দেহ থেকে শুরু করে ঊর্ধ্বে উঠেছে জীব এবং বিশ্বাতীত ও বিশ্বাত্মক পরমাত্মার সাক্ষাৎ সংস্পর্শে। সিদ্ধি ও উপলব্ধির সাধন হিসেবে হঠযোগ নির্বাচন করে দেহ ও প্রাণিক বৃত্তিসমূহ, স্থূল দেহ নিয়ে তার কারবার। রাজযোগ নির্বাচন করে বিভিন্ন অংশ সমেত মনোময় পুরুষকে তার ঊর্ধ্বারোহণের শক্তি হিসেবে; সূক্ষ্মদেহেই এর মনোযোগ। কর্ম,

[১] ভক্ত হল দিব্যপ্রেমিক, ভগবান প্রেম ও আনন্দের ঈশ্বর। ত্রয়ীর তৃতীয় তত্ত্ব হল ভাগবত অর্থাৎ প্রেমের দিব্য প্রকাশ।

প্রেম ও জ্ঞানের ত্রিমার্গ মনোময় পুরুষের কোন না কোন অংশ অর্থাৎ সঙ্কল্প, হৃদয় বা বুদ্ধিকে তার যাত্রারম্ভরূপে ব্যবহার করে, আর তাদের রূপান্তর দ্বারা উপনীত হতে চায় মুক্তিপ্রদ পরমসত্যে, আনন্দে ও আনন্ত্যে — যা অধ্যাত্মজীবনের প্রকৃতি। এর সাধন পদ্ধতি হল ব্যষ্টিদেহস্থ মানবপুরুষ এবং সর্বভূতস্থ অথচ নামরূপের অতীত দিব্য পরমপুরুষের সঙ্গে সরাসরি আদানপ্রদান।

হঠযোগের লক্ষ্য প্রাণ ও দেহকে জয় করা। আমরা আগেই দেখেছি যে অন্নকোষ ও প্রাণকোষের মধ্যে প্রাণ ও দেহের সমবায়েই স্থূলশরীর গঠিত আর তাদের ভারসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত মানুষের মধ্যে প্রকৃতির সকল কার্য। কিন্তু প্রকৃতি-স্থাপিত ভারসাম্য সাধারণ অহং-গত জীবনের পক্ষে যথেষ্ট হলেও হঠযোগীর উদ্দেশ্যের পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। মানবজীবনের সাধারণ আয়ুঃসীমা পর্যন্ত দেহযন্ত্র চালাবার জন্য এবং তার মধ্য দিয়ে এই দেহস্থ ব্যষ্টি প্রাণ ও তার নিয়ামক জগৎপরিবেশ যে সব কাজ করতে চায় সেগুলি কমবেশী পর্যাপ্তভাবে সম্পন্ন করার জন্য যে পরিমাণ প্রাণিক বা স্ফুরন্ত শক্তির প্রয়োজন সেই পরিমাণের হিসেবেই প্রকৃতির সাম্য স্থাপিত হয়েছে। সেজন্য হঠযোগ চায় প্রকৃতিকে সংশোধন করে এমন আর এক ভারসাম্য আনতে যার দ্বারা জড়দেহ আরো বেশী করে অনির্দিষ্ট পরিমাণের এমনকি প্রায় অনন্ত পরিমাণ বা তীব্রতার প্রাণশক্তি অর্থাৎ প্রাণের স্ফুরন্ত শক্তির (dynamic force) অন্তঃপ্রবাহ ধারণে সক্ষম হবে। প্রকৃতিতে ভারসাম্যের ভিত্তি হল প্রাণের এক সীমিত পরিমাণ ও শক্তির ব্যষ্টিবদ্ধতা; ব্যক্তিগত বা বংশগত অভ্যাস বশে ব্যষ্টি তার চেয়ে বেশী শক্তি ধারণ বা ব্যবহার বা আয়ত্ত করতে অক্ষম। হঠযোগে যে ভারসাম্য আনা হয় তাতে দেহের মধ্যে আরো বেশী পরিমাণে বিশ্বশক্তির ক্রিয়া এনে, ধারণ করে, ব্যবহার ও আয়ত্ত করে ব্যষ্টিপ্রাণশক্তিকে বিশ্বভাবাপন্ন করার পথ উন্মুক্ত হয়।

হঠযোগের প্রধান প্রক্রিয়া হল আসন ও প্রাণায়াম। বিশ্বপ্রাণসমুদ্র থেকে যে সমস্ত প্রাণশক্তিধারা দেহের মধ্যে আসে সে সবকে কাজ কর্মে না ব্যয় করে তাদের ধারণ করার অক্ষমতার চিহ্ন স্বরূপ যে চাঞ্চল্য আসে হঠযোগ তা দূর করে বহুবিধ আসন অর্থাৎ নির্দিষ্ট অঙ্গবিন্যাসের সাহায্যে এবং দেহে আনে অসাধারণ স্বাস্থ্য, শক্তি ও নমনীয়তা, আর এইভাবে যে সব অভ্যাসের দরুন দেহ সাধারণ জড়প্রকৃতির বশীভূত ও তার সাধারণ কাজকর্মের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে সেগুলি থেকে তাকে মুক্ত করার প্রয়াস করে। এই যোগের প্রাচীন ঐতিহ্যে এই ধারণা রয়েছে যে এই জয়ের সীমানা এতদূর বিস্তৃত করা যায় যে তাতে এমনকি মাধ্যাকর্ষণের শক্তিকেও পরাভূত করা সম্ভব। এর পর হঠযোগীর প্রয়াস হয় নানাবিধ গৌণ কিন্তু বিস্তারিত প্রক্রিয়ার দ্বারা দেহের সকল প্রকার মলিনতা শুদ্ধ করা এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের যে সমস্ত প্রক্রিয়া তা'র সব চেয়ে বড় সাধন যন্ত্র তাদের জন্য স্নায়ুমণ্ডলীকে মুক্ত রাখা। এর নাম প্রাণায়াম অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাসের বা প্রাণের সংযম, কারণ শ্বাসপ্রশ্বাসই সব প্রাণশক্তির মুখ্য দৈহিক ক্রিয়া। প্রাণায়ামে হঠযোগীর দুটি উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। প্রথম, এতে দেহের সিদ্ধি সম্পূর্ণ হয়।

জড়প্রকৃতির বহু সাধারণ রীতি থেকে প্রাণশক্তি মুক্তি পায়; লাভ হয় সতেজ স্বাস্থ্য, দীর্ঘস্থায়ী যৌবন ও প্রায়শঃই অসাধারণ আয়ু। অপরপক্ষে প্রাণায়ামের ফলে প্রাণকোষের মধ্যস্থিত প্রাণশক্তির কুণ্ডলিনী সর্পশক্তি জাগ্রত হয় আর যোগীর কাছে অপাবৃত হয় চেতনার এমন সব ক্ষেত্র, অনুভূতির এমন সব পর্যায় ও এমন সব অসাধারণ শক্তি যা থেকে সাধারণ মানবজীবন বঞ্চিত; আবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বের সাধারণ সব শক্তি ও বৃত্তি বলশালী ও প্রখর হয়। হঠযোগী এসব সুবিধাকে আরো দৃঢ় ও প্রবল করে তার অন্যান্য গৌণ প্রক্রিয়ার দ্বারা।

সেজন্য হঠযোগের ফল চোখে চমক লাগায়, আর সাধারণ বা জড়াসক্ত মনকে সহজেই অভিভূত করে। কিন্তু তবু শেষে প্রশ্ন আসে, এত বিপুল পরিশ্রমের পর আমরা কি পেলাম? অবশ্য জড়প্রকৃতির যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ জড়জীবন রক্ষা, তার সর্বোচ্চসিদ্ধি ও আর এমনকি এক অর্থে জড়জীবনের অধিকতর সামর্থ্যলাভ তা অসাধারণ পরিমাণে সিদ্ধ হয়। কিন্তু হঠযোগের ত্রুটি এই যে এর শ্রমসাধ্য দুরূহ প্রক্রিয়াগুলিতে এত সময় ও শক্তি লাগে ও সেজন্য মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রা থেকে হঠযোগীর বিচ্ছিন্নতা এত বেশী যে জাগতিক জীবনের পক্ষে এই যোগসাধনার ফল কাজে লাগান হয় অসম্ভব নয়তো অসাধারণভাবে সীমিত হয়ে পড়ে। যদি এই ক্ষতির বিনিময়ে আমরা অন্য কোন আন্তর জগতে, মনোলোকে বা প্রাণলোকে অন্য জীবন লাভ করি, তা হলেও সে সব ফলই আমরা পেতে পারি অন্যসব যোগপন্থায়, রাজযোগ বা তন্ত্রের মাধ্যমে, আর এর জন্য অত কষ্টকর পদ্ধতির দরকার হয় না বা অত কঠোর নিয়মকানুনের মধ্যে যেতে হয় না। অপরপক্ষে হঠযোগে প্রভূত প্রাণশক্তি, দীর্ঘস্থায়ী যৌবন, স্বাস্থ্য ও আয়ু প্রভৃতি যে সব স্থূল ফল পাওয়া যায় সে সবকে যদি আমরা কৃপণের মত নিজেদের ব্যবহারের জন্য ধরে রাখি, জনজীবন থেকে তফাতে রেখে তাদের অন্য কোন উদ্দেশ্যে না লাগাই, জগতে সর্বসাধারণের জন্য তাদের কোন ব্যবহার না আসে তাহলে এসবের মূল্য এমন কি? হঠযোগ ফল পায় প্রচুর কিন্তু এর জন্য দাম দিতে হয় মাত্রাতিরিক্ত, আর তা এরকম নিরর্থক।

রাজযোগের ক্ষেত্র আরো উচ্চে। অন্নময় সত্তার মুক্তি ও সিদ্ধি এর লক্ষ্য নয়, এর লক্ষ্য মনোময় সত্তার মুক্তি ও সিদ্ধি, ভাবাবেগপ্রধান ও ইন্দ্রিয়গত জীবনের নিয়ন্ত্রণ এবং মনন ও চেতনার সমগ্র উপস্করের উপর কর্তৃত্ব। চিত্তে অর্থাৎ মানসচেতনার যে উপাদানে সব মানসক্রিয়ার উদয়, এর দৃষ্টি তাতে নিবদ্ধ এবং প্রথম কাজ — তাকে শুদ্ধ ও শান্ত করা; হঠযোগেরও এই চেষ্টা, তবে তার সহায় জড়ীয় উপাদান। মানুষের সাধারণ জীবন বিক্ষোভ ও বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ, এমন এক রাজ্য যেখানে প্রজারা যে শুধু নিজেদের মধ্যেই সংগ্রামে লিপ্ত তা নয়, তারা কুশাসিত, কারণ রাজ্যেশ্বর, পুরুষ তার সব মন্ত্রীর অর্থাৎ শক্তির অধীন, এমনকি যারা তার প্রজা যেমন ইন্দ্রিয়সংবিৎ, ভাবাবেগ, ক্রিয়া ও উপভোগের করণ তাদেরও অধীন সে। এই পরাধীনতার বদলে আনতে হবে স্বারাজ্য, আত্মশাসন। সুতরাং প্রথম করণীয় — বিশৃঙ্খলার সব শক্তিকে পরাভূত করার জন্য

শৃঙ্খলার শক্তিদের সাহায্যদান। রাজযোগের প্রথম কাজ হল সযত্ন আত্মসংযম: এর সাহায্যে সরাতে হবে সেইসব বিশৃঙ্খল কর্মকে যা অধস্তন স্নায়ুসত্তাকে প্রশ্রয় দেয় ও এদের বদলে আনতে হবে মনের সদভ্যাস। সত্যানুশীলন, অহমাত্মক সকল প্রকার কামনা বর্জন, অহিংসা, পবিত্রতা, সতত ধ্যান এবং মানস-রাজ্যের প্রকৃত রাজা যে দিব্য পরম পুরুষ তার প্রতি অনুরাগ — এই সবের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় মন ও হৃদয়ের শুদ্ধ, প্রসন্ন, ও স্বচ্ছ অবস্থা।

কিন্তু এ শুধু প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। এরপর দরকার মন ও ইন্দ্রিয়ের সাধারণ ক্রিয়াগুলিকে সম্পূর্ণ প্রশমিত করা যাতে অন্তঃপুরুষ চেতনার উচ্চতর স্তরে আরোহণ ক'রে পূর্ণমুক্তি ও আত্মকর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারে। কিন্তু রাজযোগ একথা ভোলে না যে সাধারণ মনের অক্ষমতার জন্য বহুলাংশে দায়ী স্নায়ুমণ্ডলী ও দেহের সব প্রতিক্রিয়ার উপর তার অধীনতা। সেজন্য সে হঠযোগের কাছ থেকে নেয় তার আসন ও প্রাণায়ামের কৌশল, তবে তাদের প্রতিক্ষেত্রের বহুবিধ ও বিস্তারিত রূপরীতি থেকে বেছে নেয় এমন এক পন্থা যা সবচেয়ে সরল, দ্রুত ও কার্যকরী ও তার নিজের অব্যবহিত উদ্দেশ্য পূরণের পক্ষে যথেষ্ট। এইভাবে সে হঠযোগের জটিলতা ও ঝঞ্ঝাট থেকে নিস্তার পায় অথচ দেহ ও প্রাণবৃত্তিসমূহের নিয়ন্ত্রণের জন্য অনন্যসাধারণ গূঢ় শক্তিতে ভরা আন্তর স্ফুরত্তা বিকাশের জন্য অর্থাৎ যাকে যোগের ভাষায় বলা হয় কুণ্ডলিনী সেই কুণ্ডলিত সুপ্তসর্প বা আন্তর শক্তির জাগরণের জন্য সে কাজে লাগায় হঠযোগের সবচেয়ে দ্রুত ও শক্তিশালী পদ্ধতি। এ কাজের পরের কাজ হল অস্থির মনের সম্পূর্ণ প্রশমন ও উচ্চতর স্তরে এর উন্নয়ন আর তার উপায়, ক্রমান্বয়ে মানসশক্তির একাগ্রতা যার পরিণাম সমাধি।

সমাধিতে মন তার সঙ্কীর্ণ জাগ্রত সব ক্রিয়াধারা থেকে সরে চেতনার আরো মুক্ত ও উচ্চতর অবস্থায় যাবার সামর্থ্য লাভ করে; আর এইভাবে রাজযোগের দুটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সমাধির প্রথম ফল, বহিশ্চেতনার বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত শুদ্ধ মানসিক ক্রিয়া লাভ ও সেখানে থেকে পরতর মানসোত্তর ভূমিতে উত্তরণ যেখানে জীব প্রবেশ করে তার প্রকৃত অধ্যাত্ম জীবনে। কিন্তু এ ছাড়াও পাওয়া যায় বিষয়ের উপর চেতনার অবাধ ও একাগ্র শক্তিক্রিয়ার সামর্থ্য যা আমাদের দর্শনের কথায় আদি বিশ্বশক্তি ও জগতের উপর দিব্য ক্রিয়াপদ্ধতি। সমাধি অবস্থায় যোগী তো সর্বোচ্চ বিশ্বোত্তীর্ণ জ্ঞান ও অনুভূতির অধিকারী হন। এখন এই সামর্থ্য বলে তিনি জাগ্রত অবস্থাতেও পরাকবৃত্ত জগতে তাঁর কাজের জন্য সরাসরি প্রয়োজনীয় প্রভুত্ব বিস্তারে সমর্থ হন। কেন না শুধু স্বারাজ্য, আত্মশাসন বা প্রত্যক্‌বৃত্ত সাম্রাজ্য অর্থাৎ প্রত্যকবৃত্ত চেতনার দ্বারা তার স্বধামের অবস্থা ও কর্মের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা যে প্রাচীন রাজযোগ পন্থার লক্ষ্য ছিল তা নয়, তার সঙ্গে সাম্রাজ্য, বহিঃসাম্রাজ্য, প্রত্যক্‌বৃত্ত চেতনার দ্বারা তার বাইরের সব কর্ম ও পরিবেশের নিয়ন্ত্রণও তার লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আমরা দেখি যে যদিও হঠযোগের কর্মক্ষেত্র প্রাণ ও দেহ, এবং তার লক্ষ্য

শারীরিক জীবন ও তার সামর্থ্যের অনন্যসাধারণ সিদ্ধি, তবুও তা দিয়ে সে মনোময় জীবনের রাজ্যে প্রবেশ করে। তেমন যদিও রাজযোগের কাজ মন নিয়ে ও তার লক্ষ্য মনোময় জীবনের সামর্থ্যের অনন্যসাধারণ সিদ্ধি ও প্রসার, তথাপি সেও তা ছাড়িয়ে প্রবেশ করে অধ্যাত্ম জীবনের রাজ্যে। কিন্তু এই পন্থার ক্রটি এই যে সমাধির বিভিন্ন অস্বাভাবিক অবস্থার উপর সে অত্যধিক নির্ভরশীল। এই সঙ্কীর্ণতার দরুন শারীরিক জীবন থেকে দূরে থাকার প্রবৃত্তি আসে অথচ এটাই আমাদের ভিত্তি এবং এখানেই আমাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক লাভ আনা প্রয়োজন। বিশেষতঃ এই পন্থায় অধ্যাত্ম জীবন অতিরিক্ত পরিমাণে সমাধি অবস্থার সঙ্গে জড়িত। আমাদের উদ্দেশ্য হল অধ্যাত্ম জীবন ও তার সব অনুভূতিকে জাগ্রত অবস্থায়, এমনকি সব শক্তির স্বাভাবিক ব্যবহারেও পূর্ণ সক্রিয় ও পূর্ণ কার্যকরী করা। কিন্তু রাজযোগে আধ্যাত্মিক জীবনের ঝোঁক হল সমগ্র জীবনের মধ্যে না নেমে ও তাকে অধিগত না করে আমাদের স্বাভাবিক অনুভূতির পশ্চাতে এক গৌণ লোকে নিবৃত্ত হওয়া।

যে রাজ্য রাজযোগ তার এলাকার বাইরে রাখে তা জয় করতে চেষ্টা করে ভক্তি, জ্ঞান ও কর্মের ত্রিমার্গ। তবে রাজযোগ থেকে এর পার্থক্য এই যে এতে সমগ্র মানসভূমির বিস্তারিত শিক্ষাকে সিদ্ধির সর্ত গণ্য করা হয় না ও তাতেই এ নিবদ্ধ থাকে না, বরং কতকগুলি কেন্দ্রীয় তত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধি, হৃদয় ও সঙ্কল্পকে অবলম্বন ক'রে তাদের সব স্বাভাবিক বৃত্তিকে তাদের সাধারণ বাহ্য আসক্তি ও কর্ম থেকে ফিরিয়ে ভগবানে একাগ্র ক'রে তাদের রূপান্তর করাই হল এর চেষ্টা। আর একটি পার্থক্য এই যে — আর পূর্ণ যোগের দিক থেকে এ এক ক্রটি মনে হয় — ত্রিমার্গ মানসিক ও দৈহিক সিদ্ধির প্রতি উদাসীন, ভগবৎ-উপলব্ধির সর্ত হিসেবে শুধু বিশুদ্ধতা সাধন এর লক্ষ্য। অখণ্ড ভগবৎ-উপলব্ধির মধ্যে বুদ্ধি, হৃদয় ও সঙ্কল্পের কোন সমন্বয়ী সামঞ্জস্য না গড়ে তিনটি সমান্তরাল পথের যে কোন একটিকে এ নির্বাচন করে, আর অপর দুটিকে বাদ দেয় এক রকম তার বিরোধী বলে।

জ্ঞানমার্গের লক্ষ্য অদ্বিতীয় পরমাত্মার উপলব্ধি। এর সাধন প্রণালী হল বিচার অর্থাৎ বুদ্ধিগত ভাবনা, ও তা থেকে উপনীত হওয়া বিবেকে অর্থাৎ যথার্থ বিবেচনায়। এ মার্গ আমাদের দৃশ্যমান বা প্রাতিভাসিক সত্তার বিভিন্ন উপাদান পর্যবেক্ষণ ও বিচার করে এবং প্রতিটি থেকে আমি পৃথক এই জ্ঞানে সেগুলিকে এক সামান্য সংজ্ঞার অর্থাৎ প্রকৃতির উপাদান, মায়ার অর্থাৎ প্রাতিভাসিক চেতনার সৃষ্টি গণ্য করে তাদের বাদ দিয়ে আলাদা করে দেয়। এইভাবে এ উপলব্ধি করতে সমর্থ হয় যে তার প্রকৃত স্বরূপ হল শুদ্ধ ও অদ্বিতীয় আত্মা যাঁর পরিবর্তন বা বিনাশ নেই ও যিনি কোন বিষয় বা বিষয়পুঞ্জের মধ্যে ধরা দেন না। সাধারণতঃ এখান থেকে যে ভাবে এই পন্থার অনুসরণ কবা হয় তাতে যাত্রার অবসান হল চেতনা থেকে প্রাতিভাসিক সব জগৎকে বিভ্রম বলে বর্জন এবং পরব্রহ্মের মধ্যে জীবের এমন চূড়ান্ত নিমজ্জন যে সে "ন পুনরাবর্ততে", আর ফেরে না।

কিন্তু এই আত্যন্তিক পরিণতি জ্ঞানমার্গের একমাত্র বা অপরিহার্য ফল নয়। কেননা ব্যক্তিগত লক্ষ্যকে মুখ্য না করে আরো ব্যাপকভাবে এই পথ অনুসরণ করা হলে, এতে যেমন বিশ্বাতীতে পৌঁছান যায় তেমন ভগবানের জন্য বিশ্বজীবনকেও জয় করা সম্ভব হয়। প্রাচীন পথ থেকে এর পার্থক্য এই যে, এতে পরমাত্মাকে যে উপলব্ধি করা হয় তা শুধু নিজের সত্তায় নয়, সর্বভূতে তাঁর উপলব্ধি হয় ও পরিশেষে জগতের সব প্রাতিভাসিক বিভাবকেও দিব্য চেতনার স্বরূপের সম্পূর্ণ বিপরীত গণ্য না করে, তাদের উপলব্ধি করা হয় দিব্যচেতনারই লীলারূপে। আবার এই উপলব্ধিকে ভিত্তি করে আরো বৃহৎ পরিণতি সম্ভব অর্থাৎ জ্ঞানের সকল প্রকারকেই — তা তারা যতই ঐহিক হোক না কেন, দিব্যচেতনার ক্রিয়াধারারূপে রূপান্তর করা সম্ভব, যাতে তারা জ্ঞানের এক ও অনন্য পরম বিষয়কে স্বরূপে ও তাঁর সকল রূপ ও প্রতীকের লীলার মধ্যে দর্শন করবার উপযোগী হয়। এই প্রণালীতে যে আর এক ফল পাওয়া যেতে পারে, তা হল মানুষের সমগ্র বুদ্ধি দৃষ্টিরও দিব্যস্তরে উন্নয়ন, তাদের আধ্যাত্মিকীকরণ ও মানবজাতির মধ্যে দিব্যজ্ঞানের অভ্যুদয়ের জন্য বিশ্বপ্রকৃতির প্রচেষ্টার সার্থকতা সাধন।

ভক্তিমার্গের লক্ষ্য হল পরম প্রেম ও আনন্দ উপভোগ। পরমেশ্বর তাঁর পরম ব্যক্তিরূপে দিব্য প্রেমিক ও বিশ্বভোক্তা — সাধারণতঃ এই ভাবনাকেই সে কাজে লাগায়। তখন উপলব্ধি হয় যে জগৎ ঈশ্বরের লীলা, আত্মগোপন ও আত্মপ্রকাশের বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে এর গতি, আর মানবজীবন এর চরম পর্যায়। ভক্তিযোগের তত্ত্ব হল — মানবজীবনের ভাবাবেগপ্রধান সাধারণ সম্পর্কগুলিকে ব্যবহার করা, তবে এসবকে অনিত্য জাগতিক বিষয়ে আর প্রয়োগ না করে প্রয়োগ করা হয় পরমপ্রেমিক, পরম সুন্দর আনন্দঘন ভগবানের তৃপ্তি সাধনে। এতে উপাসনা ও ধ্যানেরও একমাত্র উদ্দেশ্য হল দিব্য সম্পর্ক গঠন ও তার তীব্রতা বৃদ্ধি। আর এই যোগ সর্বপ্রকার ভাবাবেগপ্রধান সম্পর্কের ব্যবহার সম্বন্ধে এত উদার যে এমনকি ভগবানের প্রতি শত্রুতা ও বিরোধিতা যা প্রেমেরই এক তীব্র, অধীর ও বিকৃত রূপ হিসেবে পরিগণিত, তাকেও গণ্য করা হয় উপলব্ধি ও মুক্তির এক সম্ভবপর উপায় হিসেবে। সাধারণতঃ যে ভাবে এই পথের অনুশীলন হয় তাতে এরও পরিণতি — জগৎ জীবন থেকে অপসারণ এবং যিনি বিশ্বোত্তীর্ণ ও বিশ্বের ঊর্ধ্বে তাঁতে সমাপত্তি, তবে এ সমাপত্তি অদ্বৈতবাদীর থেকে ভিন্ন প্রকারের।

কিন্তু এখানেও এই আত্যন্তিক ফল অপরিহার্য নয়। এই যোগের মধ্যেই এই ত্রুটি সংশোধনের ব্যবস্থা আছে, কারণ বলা হয় যে, দিব্য প্রেমলীলা শুধু পরম পুরুষ ও জীবের সম্পর্কের মধ্যেই সীমিত নয়, পরম প্রেম ও আনন্দের একই উপলব্ধি বিষয়ে যে ভক্তেরা মিলিত হন তাদের সাধারণ মনোভাব ও পারস্পরিক সমাদরও দিব্য প্রেমলীলার অন্তর্গত। আরো ব্যাপক যে একটি সংশোধনী ব্যবস্থা তা হল দিব্য প্রেমাস্পদকে উপলব্ধি করতে হবে সর্বভূতে, শুধু মানুষে নয় সকল প্রাণীতে, আবার এ সব ছাড়িয়ে সর্বরূপের মধ্যে। এখন বুঝতে পারা যায় যে, ভক্তিযোগের এই ব্যাপক প্রয়োগ এমনভাবে সম্পন্ন

করা যেতে পারে যে তাতে মানুষের সমগ্র ভাবাবেগ, ইন্দ্রিয়সংবিৎ ও সৌন্দর্যবোধের দিব্যস্তরে উন্নয়ন, তাদের আধ্যাত্মিকীকরণ ও মানবজাতির মধ্যে প্রেম ও আনন্দ আনার জন্য বিশ্বপ্রকৃতির প্রচেষ্টার সার্থকতা সাধন সম্ভবপর।

কর্মযোগের লক্ষ্য — পরম সঙ্কল্পের নিকট মানুষের সকল কর্মের উৎসর্গ। আমাদের কর্মের সকল রকম অহমাত্মক উদ্দেশ্য, স্বার্থসাধনের বা জাগতিক ফলপ্রাপ্তির জন্য কর্মপ্রচেষ্টা ত্যাগ করাই এই পথের প্রথম কথা। এই ত্যাগের দ্বারা আমাদের মন ও সঙ্কল্প এতই শুদ্ধ হয় যে আমরা সহজেই জানতে পারি যে মহতী বিশ্বশক্তিই আমাদের সকল কর্মের কর্ত্রী, এবং সেই শক্তির অধীশ্বর তাদের শাসক ও পরিচালক আর জীব শুধু এক মুখোশ, উপলক্ষ্য বা যন্ত্র বা আরো সদর্থক ভাবে ক্রিয়া ও প্রাতিভাসিক সম্পর্কের এক সচেতন কেন্দ্র। এই পরম সঙ্কল্প ও বিশ্বশক্তির কাছে ক্রিয়ার নির্বাচন ও চালনা ক্রমশঃ আরো সচেতন ভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়। অবশেষে এই "তৎস্বরূপেই" সমর্পিত হয় আমাদের সকল কর্ম ও সকল কর্মফল। এর উদ্দেশ্য হল দৃশ্যমান সবকিছুর এবং প্রাতিভাসিক কর্মের প্রতিক্রিয়ার বন্ধন থেকে পুরুষের মুক্তি। অন্যান্য যোগের মত কর্মযোগকেও ব্যবহার করা হয় প্রাতিভাসিক জীবন থেকে মুক্তি ও পরমের মাঝে মহাপ্রস্থান লাভের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এখানেও এই আত্যন্তিক ফল অপরিহার্য নয়। অন্যান্য যোগের মত এরও পরিণতি হতে পারে সকল শক্তিতে, সকল ঘটনায় সকল কর্মে ভগবৎ-উপলব্ধি এবং বিশ্বক্রিয়ায় পুরুষের মুক্ত ও অহং-শূন্য অংশ গ্রহণ। এইভাবে আসে মানুষের সকল সঙ্কল্প ও ক্রিয়ার দিব্যস্তরে উন্নয়ন, তাদের আধ্যাত্মিকীকরণ ও মানুষের মধ্যে মুক্তি, শক্তি ও সিদ্ধির জন্য বিশ্বপ্রকৃতির প্রচেষ্টার সার্থকতাসাধন।

আমরা আরো দেখি যে সম্যক্‌দৃষ্টিতে এই তিন পথই এক। সাধারণতঃ দিব্য প্রেম থেকে নিবিড় অন্তরঙ্গতার মাধ্যমে আসে পরম প্রেমাস্পদ সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান, আর এইভাবেই এ হয় জ্ঞানমার্গ; আবার দিব্য সেবাও আসে যার ফলে এ হয় কর্মমার্গ। একই রকমে পূর্ণ জ্ঞান থেকে আসে পূর্ণ প্রেম ও আনন্দ এবং যে পরম 'তৎ'-কে জানা যায় তাঁর সকল কর্মের পূর্ণ স্বীকৃতি; নিবেদিত কর্ম থেকে আসে যজ্ঞেশ্বরের প্রতি পরিপূর্ণ প্রেম এবং তাঁর পথ ও সত্তা সম্বন্ধে গভীরতম জ্ঞান। এই ত্রিমার্গেই আমরা অতি সহজেই পাই সর্বভূতে ও সমগ্র অভিব্যক্তির মধ্যে বিরাজমান পরম একের অনপেক্ষ জ্ঞান, প্রেম ও সেবা।

পঞ্চম অধ্যায়

সমন্বয়

প্রধান প্রধান যোগসম্প্রদায়ের প্রতিটি তার কাজের জন্য মানুষের জটিল অখণ্ড সত্তার এক এক অংশকে গ্রহণ করে তার শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনাগুলিকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু তাদের প্রকৃতি থেকে মনে হতে পারে যে সে সবের মধ্যে এক সমন্বয়ের ব্যাপক ভাবনাকে কার্যে পরিণত করতে পারলে তা-ই পর্যবসিত হবে পূর্ণযোগে। কিন্তু প্রবণতার দিক থেকে তারা এত বিসদৃশ, তাদের রূপ এত বেশী বিশিষ্ট ও বিস্তারিত, তাদের ভাবনা ও পদ্ধতির পারস্পরিক বিরোধিতা এত সুদৃঢ় ও দীর্ঘকালব্যাপী যে কিভাবে তাদের মধ্যে যথাযথ মিলন সম্ভব তা সহজে জানা যায় না।

বাদবিচার না করে বিভিন্ন যোগগুলিকে পুরোপুরি নিয়ে তাদের একত্র সমাবেশ করার অর্থ সমন্বয় নয়, বিশৃঙ্খলা। আবার এই স্বল্পায়ু মনুষ্যজীবনে ও সীমিত শক্তি নিয়ে ক্রমান্বয়ে প্রতিটির অনুশীলন সহজ নয়, এমন এক কষ্টকর প্রণালীতে পরিশ্রমের যে অপচয় হবে তার কথা না হয় নাই ধরা গেল। অবশ্য কখন কখন হঠযোগ ও রাজযোগের এইভাবে ক্রমান্বয়ে অনুশীলন হয়। আধুনিক কালে রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনে যে অসাধারণ দৃষ্টান্ত রয়েছে তাতে দেখি এক বিরাট অধ্যাত্ম সামর্থ্য প্রথমেই ছুটেছে সোজা ভগবৎ-উপলব্ধির জন্য, যেন জোর করে স্বর্গরাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছে এবং একটির পর একটি যোগপন্থা গ্রহণ করে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তা থেকে তার সার বার করে আবার সব কিছুর মর্মলোকে ফিরে এসেছে; অর্থাৎ প্রেমশক্তি বলে, বিভিন্ন অনুভূতির মধ্যে সহজাত আধ্যাত্মিকতা বিস্তৃত করে ও বোধিময় জ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়ার দ্বারা ভগবানকে উপলব্ধি ও অধিগত করেছে। কিন্তু এরকম উদাহরণ সর্বসাধারণের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। এর উদ্দেশ্য ছিল সাময়িক ও বিশেষ ধরনের অর্থাৎ এক শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের মহতী ও নিশ্চিত অনুভূতির মাধ্যমে সেই সত্য প্রমাণ করা যা এখন মানবজাতির মধ্যে অত্যাবশ্যক এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শাখার সুদীর্ঘ দ্বন্দ্বে দীর্ণ এই জগৎ যার দিকে বহুবাধার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। সে সত্য এই যে সকল সম্প্রদায়ই একই অখণ্ড সত্যের রূপ ও অংশ, আর সকল সাধন প্রণালীরই সাধ্য একই পরম অনুভূতি, তবে বিভিন্ন পথে। একমাত্র যা প্রয়োজনীয় তা ভগবানকে জানা, তা-ই হওয়া ও তাঁকে অধিগত করা। বাকী সব তার মধ্যেই আছে অথবা তারই পরিণাম; এই একমাত্র নিঃশ্রেয়সই হবে সাধনার সাধ্য এবং তা সিদ্ধ হলে অবশিষ্ট সব কিছুই, সকল প্রয়োজনীয় রূপ ও অভিব্যক্তি আমরা পাব ভগবানের পরম সঙ্কল্প অনুযায়ী।

সুতরাং যে সমন্বয় আমরা চাই তা অন্য সব যোগপন্থাকে একত্রে জড়ো করে বা ক্রমান্বয় অনুশীলনের দ্বারা পাওয়া যায় না। এই সমন্বয় সাধনের উপায় — অন্যসব

যৌগিক সাধন পদ্ধতির রূপ ও বহিরঙ্গ উপেক্ষা করে বরং সে সবের সাধারণ এমন কোন কেন্দ্রীয় তত্ত্ব অবলম্বন করা যার মধ্যে তাদের বিশেষ তত্ত্বগুলি থাকবে ও যথার্থ স্থানে ও পরিমাণে কার্যকরী হবে; তাছাড়া এমন কোন কেন্দ্রীয় স্ফুরন্ত শক্তি ধরা চাই যা সে সবের বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ পন্থাগুলির সাধারণ গূঢ় রহস্য হবে এবং সেজন্য যার সাহায্যে এদের বিচিত্র শক্তি ও বিভিন্ন উপকারিতার মধ্যে থেকে কতকগুলিকে স্বাভাবিকভাবে বেছে তাদের যুক্ত করা সম্ভব হবে। প্রকৃতির কার্যপ্রণালী ও যৌগিক পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনার সময় আমরা প্রথমেই এই লক্ষ্য তুলে ধরেছিলাম। বর্তমানে আমরা তাতেই ফিরে আসছি কোন নির্দিষ্ট সমাধানের সম্ভাবনার আশায়।

প্রথমেই আমাদের লক্ষ্যে পড়ে যে ভারতে এখনও এমন এক বিশিষ্ট যোগপন্থা প্রচলিত আছে যা স্বভাবতঃই সমন্বয়শীল এবং যার শুরু প্রকৃতির এক মহৎ কেন্দ্রীয় তত্ত্ব থেকে, প্রকৃতির মহতী স্ফুরন্তী শক্তি থেকে। কিন্তু এটি এক স্বতন্ত্র যোগ, অন্য সব যোগের সমন্বয় নয়। এই সাধনা তন্ত্র-মার্গ। এর কোন কোন পরিণতির জন্য তন্ত্র অতান্ত্রিকদের কাছে নিন্দার বিষয় হয়েছে; এই নিন্দার জন্য বিশেষ দায়ী বামমার্গের পরিণতি যাতে পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্বের সীমা ছাড়াবার পরও তাতে সন্তুষ্ট না থেকে এ সবের স্থলে ক্রিয়ার স্বতঃস্ফূর্ত যথার্থতা না এনে ইন্দ্রিয়পরায়ণতা এবং অসংযত সামাজিক দুর্নীতির পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। এসব সত্ত্বেও তন্ত্র আদিতে ছিল এক মহান্ বীর্যবন্ত পন্থা এবং এমন সব ভাবনার উপর এর প্রতিষ্ঠা যা সব অন্ততঃ আংশিকভাবেও সত্য। এমনকি এর যে দুই ভাগ, দক্ষিণমার্গ ও বামমার্গ তাদেরও গোড়ায় আছে এক গভীর উপলব্ধি। প্রাচীন প্রতীক অর্থে দক্ষিণ ও বাম এই দুই পদের দ্বারা জ্ঞানমার্গ ও আনন্দমার্গের পার্থক্য সূচিত হ'ত; দক্ষিণমার্গের কথা এই যে মানবের মধ্যস্থিত প্রকৃতি তার নিজের শক্তি, উপাদান ও যোগ্যতার সামর্থ্য ও ব্যবহারের মধ্যে যথার্থ সম্যক্ বিবেক বা বিচারের দ্বারা নিজেকে মুক্ত করে; আর বামমার্গে মানবের মধ্যস্থিত প্রকৃতি নিজেকে মুক্ত করে তার নিজের শক্তি, উপাদান ও যোগ্যতার সামর্থ্য ও ব্যবহারের সানন্দ স্বীকৃতি দ্বারা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুই মার্গেই দেখা দিল তত্ত্বের অজ্ঞতা, প্রতীকের বিকৃতি ও অধঃপতন।

কিন্তু এখানেও যদি আমরা বাস্তব পদ্ধতি ও ব্যবহার বাদ দিয়ে কেন্দ্রীয় তত্ত্বটি খুঁজি তাহলে আমরা প্রথম দেখি যে তন্ত্র স্পষ্টতঃই যোগের সব বৈদিক পদ্ধতি থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র রেখেছে। এক অর্থে বলা যায় আমরা এ পর্যন্ত যে সব যোগসম্প্রদায়ের কথা বলেছি সে সবই তত্ত্বের দিক থেকে বৈদান্তিক; জ্ঞানেই তাদের শক্তি, তাদের পদ্ধতিও জ্ঞানমূলক, তবে এ জ্ঞান যে সর্বদাই বুদ্ধির বিচার শক্তি তা নয়, এর বদলে তা হতে পারে প্রেম ও শ্রদ্ধায় পরিস্ফুট হৃদয়ের জ্ঞান বা কর্মের মধ্যে সক্রিয় সঙ্কল্পের জ্ঞান। এ সবেতেই যোগের প্রভু হলেন পুরুষ, চিন্ময় পুরুষ যিনি জ্ঞাতা, দ্রষ্টা, এবং আকর্ষণ ও শাসন করেন। কিন্তু তন্ত্রে প্রভু হলেন প্রকৃতি, প্রকৃতিগত পুরুষ, সক্রিয় শক্তি, বিশ্বের মধ্যে কার্যসাধক শক্তিগত সঙ্কল্প। এই শক্তিগত সঙ্কল্পের, তার পদ্ধতির, তার তন্ত্রের

অন্তরঙ্গ গূঢ় রহস্য জেনে ও তা প্রয়োগ করে তান্ত্রিক যোগী তাঁর সাধনপদ্ধতির লক্ষ্যানুসরণ করতেন; তাঁর লক্ষ্য ছিল, প্রভুত্ব, সিদ্ধি, মুক্তি ও আনন্দ। ব্যক্ত প্রকৃতি ও তার বাধা থেকে সরে না এসে তিনি তাদের সম্মুখীন হতেন এবং তাদের আয়ত্তে এনে জয় করতেন। কিন্তু অবশেষে প্রকৃতির সাধারণ প্রবণতা অনুযায়ী তান্ত্রিক যোগের অধিকাংশ তত্ত্ব নষ্ট হয়ে গেল তার আচার পদ্ধতির মধ্যে, তা হয়ে উঠল কতকগুলি নিয়ম ও রহস্যপূর্ণ গোপন ক্রিয়ার যন্ত্র। অবশ্য ঠিক মত ব্যবহৃত হলে এসব তখনও শক্তিশালী ছিল, কিন্তু তখন আর তাদের আদি তাৎপর্যের স্বচ্ছতা ছিল না।

তন্ত্রের কেন্দ্রীয় ভাবনা হল শক্তি-উপাসনা কারণ শক্তিই একমাত্র সর্বার্থসাধিকা। কিন্তু এ হল সত্যের এক দিক মাত্র। এর বিপরীত প্রান্ত হল বেদান্তর ভাবনা, যে শক্তি ভ্রমাত্মক মায়াশক্তি, আর সক্রিয়শক্তির ছলনা থেকে মুক্তি পাবার উপায় — নীরব নিষ্ক্রিয় পুরুষের অন্বেষণ। কিন্তু পূর্ণ অখণ্ড ভাবনায় চিন্ময় পুরুষই ঈশ্বর, প্রকৃতিগত পুরুষ তাঁর কার্যসাধিকা শক্তি। পুরুষের স্বরূপ, সৎ, চিন্ময় শুদ্ধ অনন্ত আত্মসত্তা; শক্তি বা প্রকৃতি চিৎস্বরূপা, এটি পুরুষের আত্মসচেতন সত্তার শুদ্ধ ও অনন্ত শক্তি। বিরাম ও ক্রিয়া — এই দুই মেরুর মধ্যে এই দুয়ের সম্পর্ক। যখন শক্তি সচেতন আত্মসত্তার আনন্দে মগ্ন তখন বিরাম; যখন পুরুষ নিজ শক্তির ক্রিয়ায় নিজেকে বাইরে ঢেলে দেন তখন ক্রিয়া, সৃষ্টি ও সম্ভূতির আনন্দ। কিন্তু যেহেতু আনন্দই সকল সম্ভূতির স্রষ্টা ও জনয়িতা, সেহেতু এর কার্যপ্রণালী হল তপঃ অর্থাৎ পুরুষের চিৎ-শক্তি যা সত্তার মধ্যে স্বীয় অনন্ত যোগ্যতায় অবস্থান করে ও যা থেকে ভাবনার সত্য অর্থাৎ ভাব-সৎ-এর, বিজ্ঞানের উদ্ভব, আর এই সব ভাব-সৎ সর্বজ্ঞ, সর্বক্ষম আত্ম-সত্তা থেকে উৎপন্ন হওয়ায় তাদের পূর্ণতাপ্রাপ্তি ধ্রুব এবং তাদের মধ্যেই বর্তমান রয়েছে মন, প্রাণ ও জড় সংজ্ঞায় তাদের স্বীয় সম্ভূতির প্রকৃতি ও ধর্ম। তপঃ-র অন্তিম সর্বশক্তিমত্তা এবং বিজ্ঞানের অভ্রান্ত পূর্ণতাপ্রাপ্তি — এরাই সকল যোগের মূল ভিত্তি। মানুষের মধ্যে এই দুই শক্তির নাম দেওয়া হয় সঙ্কল্প ও শ্রদ্ধা; শেষ পর্যন্ত এই সঙ্কল্পের আত্মসার্থকতা নিশ্চিত কারণ সে জ্ঞানময়; আর যে সত্য বা বিজ্ঞান এখনও অভিব্যক্তিতে চরিতার্থ হয়নি নিম্নচেতনায় তার প্রতিবিম্ব হল শ্রদ্ধা। ভাবনার এই আত্ম-নিশ্চয়তারই কথা গীতায় এই ভাবে বলা হয়েছে, "যোযচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ" — মানুষের শ্রদ্ধা যেমন অর্থাৎ অন্তঃস্থ ধ্রুব ভাবনা যেমন, তেমন-ই সে হয়।

তাহলে দেখা গেল প্রকৃতির যে ভাবনা থেকে আমাদের সাধনার আরম্ভ মনস্তত্ত্বের দিক থেকে সে ভাবনা কি; আর যোগ ব্যবহারিক মনস্তত্ত্ব বৈ আর কিছু নয়। স্বীয় শক্তির মাধ্যমে পুরুষের আত্ম-সার্থকতাই প্রকৃতি। কিন্তু প্রকৃতির গতি দ্বিবিধ — পরা ও অপরা, অথবা আমরা এদের নাম দিতে পারি দিব্য ও অদিব্য। কিন্তু এই পার্থক্য শুধু ব্যবহারিক অর্থেই প্রযোজ্য কারণ এমন কিছু নেই যা দিব্য নয়, আর ব্যাপকতর দৃষ্টিতে এই পার্থক্য অর্থহীন যেমন প্রাকৃতিক ও অতিপ্রাকৃতিক এই দুই পদের পার্থক্যও অর্থহীন কারণ যা কিছু সবই প্রাকৃতিক। সকল বিষয়ই প্রকৃতির মধ্যে আবার ভগবানের মধ্যেও। কিন্তু

ব্যবহারিক অর্থে এক প্রকৃত পার্থক্য আছে। অপরা প্রকৃতি যাকে আমরা জানি, বর্তমানে আমরা যা, এবং যা আমরা থাকব যতদিন না আমাদের মধ্যস্থ শ্রদ্ধার পরিবর্তন হয় — সেই অপরা প্রকৃতির কাজ সীমা ও বিভাজনের মাধ্যমে, অবিদ্যা তার স্বরূপ এবং অহমাত্মক জীবন তার পরিণতি। কিন্তু যে পরাপ্রকৃতির পানে আমাদের অভীপ্সা তার কাজ একত্ব সাধন ও সীমার উত্তরণ, বিদ্যা তার স্বরূপ এবং পরিণতি দিব্য জীবন। যোগের লক্ষ্য, অপরাপ্রকৃতি থেকে পরাপ্রকৃতিতে উত্তরণ, আর এই উত্তরণের উপায় — হয় অপরা প্রকৃতির বর্জন ও পরাপ্রকৃতিতে পলায়ন যা সাধারণ মত; অথবা অপরা প্রকৃতির রূপান্তর ও পরাপ্রকৃতিতে তার উন্নয়ন। এই শেষ উপায়টিই পূর্ণ যোগের লক্ষ্য হতে হবে।

কিন্তু যে কোন উপায়ই আমরা অবলম্বন করি না কেন, সর্বদাই আমাদের নিম্নজীবনের মধ্যকার কিছু থেকেই উচ্চতর জীবনে উঠতে হবে। সাধনপথের কোন স্থান থেকে মহাপ্রস্থান হবে বা পলায়নের দ্বার কোনটি হবে তা বিভিন্ন যোগসম্প্রদায় নিজেরাই বিভিন্নভাবে ঠিক করে। তারা অপরাপ্রকৃতির কোন কোন কাজকর্মকে বিশেষভাবে সাধনোপযোগী করে তাদের ভগবন্মুখী করে। কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রকৃতির স্বাভাবিক ক্রিয়া এক অখণ্ড গতি যাতে আমাদের সকল উপাদানের সব জটিলতা যেমন প্রভাবিত হয় পরিবেশের দ্বারা, তেমন তারা পরিবেশকেও প্রভাবিত করে। সমগ্রজীবনই প্রকৃতির যোগ। যে যোগ আমাদের লক্ষ্য তাকে প্রকৃতির সর্বাঙ্গীন ক্রিয়াও হতে হবে। আর যোগী ও প্রাকৃত মানুষের পার্থক্য এই যে যোগীর প্রয়াস হল, অহং ও ভেদের মধ্যে ও এদের সাহায্যে অপরাপ্রকৃতির যে সর্বাঙ্গীন ক্রিয়া তার মধ্যে চলে তা পরিবর্তন করে তার স্থলে ভগবান ও ঐক্যের মধ্যে ও তাদের সাহায্যে পরাপ্রকৃতির সর্বাঙ্গীন ক্রিয়া আনা। যথার্থতঃই শুধু জগৎ থেকে ভগবানের কাছে পলায়নই আমাদের উদ্দেশ্য হলে সমন্বয় নিষ্প্রয়োজন, তা সময়ের অপচয় মাত্র, কারণ তা হলে আমাদের একমাত্র কার্যকরী লক্ষ্য হবে ভগবানের কাছে যাবার সহস্র পথের মধ্যে কোন একটি অর্থাৎ হ্রস্ব পথগুলির মধ্যে সম্ভবপর হ্রস্বতমটিকে বেছে নেওয়া, আর অন্য যে সব বিভিন্ন পথে একই চরম লক্ষ্যে যাওয়া যায় তাদের অনুসন্ধানের জন্য বৃথা সময়ক্ষেপ না করা। কিন্তু যদি আমাদের লক্ষ্য হয় আমাদের সমগ্র সত্তার রূপান্তরসাধন ভগবৎসত্তায়, তাহলে সমন্বয় প্রয়োজন।

অতএব আমাদের যে পদ্ধতি অনুযায়ী চলতে হবে তা হল সমগ্র সচেতন সত্তাকে ভগবানের সম্পর্কে ও সংস্পর্শে আনা এবং আমাদের সমগ্র সত্তাকে তাঁর সত্তায় রূপান্তর করার জন্য তাঁকে অন্তরে আহ্বান করা যাতে এক অর্থে আমাদের মধ্যেকার আসল ব্যক্তি অর্থাৎ ভগবান নিজেই সাধনা[1] সাধক আবার যজ্ঞের অধীশ্বর হতে পারেন। তিনিই আমাদের অবর ব্যক্তিত্বকে ব্যবহার করেন দিব্য রূপান্তরের কেন্দ্র ও আপন সিদ্ধির যন্ত্র হিসেবে। কার্যতঃ আমাদের সমগ্র সত্তার উপর তপোশক্তির চাপ অর্থাৎ দিব্য প্রকৃতির

[1] সাধনা, যে অনুশীলনে সিদ্ধিলাভ হয়; সাধক, যে যোগীর লক্ষ্য ঐ অনুশীলন দ্বারা সিদ্ধিলাভ।

ভাবনার মধ্যে বর্তমান আমাদের অন্তঃস্থ চিৎ-শক্তির চাপ তার নিজের সিদ্ধি নিজেই আনে। সর্বজ্ঞানময়ী সর্বসাধিকা দিব্য চিৎ-শক্তি নেমে আসেন সীমা ও অন্ধকারের উপর এবং সমগ্র অপরা প্রকৃতিকে উত্তরোত্তর দীপ্ত ও বীর্যবন্ত করে অবর মানুষী আলোক ও মর্ত্য কর্মের সকল সংজ্ঞার স্থলে প্রতিষ্ঠিত করেন নিজের আপন ক্রিয়া।

মনস্তাত্ত্বিক তথ্যের দিক থেকে, এই পদ্ধতির অর্থ এই যে এর সমগ্র ক্ষেত্র ও উপস্কর সমেত অহংকে উত্তরোত্তর সমর্পণ করতে হবে তাঁর কাছে যিনি অহং-এর অতীত এবং যাঁর ক্রিয়াধারা বিরাট, অপ্রমেয় ও সর্বদাই অনিবার্য। একথা ঠিক যে এটি কোন সোজা পথ বা সহজ সাধনা নয়। এর জন্য দরকার অপরিসীম বিশ্বাস, পরম সাহস ও সর্বোপরি অকম্প ধৈর্য। কেন না এর তিনটি পর্যায়, আর তার মাত্র শেষেরটিতেই পুরো আনন্দ বা ক্ষিপ্রতা পাওয়া সম্ভব — ভগবানের সংস্পর্শে আসার জন্য অহং-এর প্রয়াস, পরাপ্রকৃতিকে গ্রহণ করা, তা-ই হওয়ার জন্য দিব্য ক্রিয়ার দ্বারা সমগ্র অপরাপ্রকৃতির বিশাল, পূর্ণ ও সেজন্য শ্রমসঙ্কুল প্রস্তুতি এবং অন্তিম রূপান্তর। বস্তুতঃ দিব্য ক্ষমতা প্রায়শঃই অলক্ষিতে ও আড়াল থেকে আমাদের দুর্বলতার স্থান অধিকার করে; আমাদের বিশ্বাস, সাহস ও ধৈর্যের বিচ্যুতির মধ্যে এই আমাদের অবলম্বন। সে অন্ধকে দৃষ্টি দেয়, পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করায়। বুদ্ধি জানতে পারে এমন এক বিধান যার নির্বন্ধ হিতৈষীর মতো, এমন এক সহায় যা রক্ষা করে; হৃদয় বলে তাঁর কথা যিনি সর্বভূতেশ্বর, মানবসুহৃৎ বা বিশ্বজনীন এবং সকল স্খলন থেকেও আমাদের তুলে ধরেন। সুতরাং এই পথ যুগপৎ অতি দুরূহ, কল্পনায় যত দুরূহ হতে পারে এটি ততটাই দুরূহ, অথচ এর উদ্দেশ্য ও প্রয়াসের বিশালতার পরিমাণে এটি তেমনই সহজতম ও সুনিশ্চিত।

অপরা প্রকৃতির উপর পরা প্রকৃতির অখণ্ড কর্মের সময় তার ক্রিয়ার তিনটি বিশিষ্ট লক্ষণ দেখা যায়। প্রথমতঃ অন্যান্য যোগের ক্রিয়াপদ্ধতি যেমন বিশেষ উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট নিয়ম ও পরম্পরার মধ্যে সীমাবদ্ধ, এর ক্রিয়াপদ্ধতি তেমন নয়; এর কাজ চলে এক রকম স্বাধীন ও বিক্ষিপ্তভাবে, তবে সাধকের স্বভাব, তার প্রকৃতির দেওয়া সহায়কর উপাদান এবং শুদ্ধীকরণ ও সিদ্ধির পথে তার প্রকৃতির আনা সব বাধা এইসব অনুযায়ী এই কাজ ক্রমশঃ হয়ে ওঠে তীব্র ও অর্থপূর্ণ। সুতরাং এক অর্থে এই পথের প্রত্যেকেরই যোগপদ্ধতি তার নিজস্ব। তথাপি তাতে এমন কতকগুলি সর্বজনপ্রযোজ্য সুস্পষ্ট কর্মপ্রণালী থাকে যা থেকে একটি সাধনা রচনা করা সম্ভব; অবশ্য সেটি কোন ছক্‌কাটা কার্যক্রম নয়, তবু তাই সমন্বয়ী যোগের একরকম শাস্ত্র বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

দ্বিতীয়তঃ এই কার্যপ্রণালী অখণ্ড হওয়ায় তাতে অতীত পরিণামজনিত আমাদের প্রকৃতির বর্তমান গঠনকে স্বীকার করা হয় এবং মৌলিক কোন কিছু বাদ না দিয়ে সব কিছুকেই বাধ্য করা হয় দিব্য পরিবর্তন সাধনে। এক শক্তিমান শিল্পী আমাদের প্রতি বিষয়টি তাঁর হাতে নেন এবং বর্তমানে এসব যে সত্য ফুটিয়ে তুলতে চায় বিশৃঙ্খলভাবে তিনি তাদের রূপান্তরিত করেন তারই সুস্পষ্ট প্রতিমূর্তিতে। সেই সদা-বর্ধমান অনুভূতিতে আমরা উপলব্ধি করতে শুরু করি এই অবর অভিব্যক্তির গঠন কিরূপ এবং

তার মধ্যে প্রতিটি বিষয়ই তা সে যতই বিকৃত বা তুচ্ছ বা নীচ বলে প্রতীয়মান হোক না কেন দিব্য প্রকৃতির সুষমাস্থিত কোন উপাদান বা ক্রিয়ার অল্পবিস্তর বিকৃত বা অসম্পূর্ণ রূপ। কামারশালায় কর্মকার যেমন অশোধিত পিণ্ডকে পুড়িয়ে পিটিয়ে গড়ে তোলে, মানুষী পূর্বপিতৃগণ সেইভাবে দেবগণকে নির্মাণ করেছেন — বৈদিক ঋষিদের এই উক্তির তাৎপর্য এখন আমাদের বোধগম্য হয়।

তৃতীয়তঃ আমাদের অন্তঃস্থ দিব্যশক্তি সমগ্র জীবনকে ব্যবহার করে পূর্ণযোগের উপায় রূপে। প্রতি অনুভূতি ও জাগতিক পরিবেশের সঙ্গে প্রতি বাহ্য সংস্পর্শ, তা সে যতই তুচ্ছ বা বিপজ্জনক হোক না কেন ব্যবহৃত হয় এই কার্যের জন্য; আর প্রতি আন্তর অনুভূতি তা সে যতই দারুণ যন্ত্রণাময় বা সবচেয়ে অপমানকর অধঃপতনের অনুভূতি হোক না কেন — সিদ্ধির পথে সোপানস্বরূপ। এবং জগতের মধ্যে ভগবানের কার্যপদ্ধতি আমরা আমাদের মধ্যেই বুঝতে পারি উন্মীলিত চক্ষে; অন্ধকারের মধ্যে আলোতে, দুর্বল ও পতিতের মধ্যে শক্তিতে, দুঃখ ও দুর্দশাগ্রস্তের মধ্যে আনন্দেতে তাঁর কি উদ্দেশ্য তা-ও আমরা বুঝতে পারি। অপরা এবং পরা উভয় ক্রিয়াতেই আমরা দেখি একই দিব্য প্রণালী, তবে একটিতে এ চলে প্রকৃতির অবচেতনার মধ্যে, অজ্ঞানের অন্ধকারে মন্থরগতিতে; আর অন্যটিতে এ হয় দ্রুত ও আত্মসচেতন, আর সাধকযন্ত্র তার মধ্যে বোধ করে প্রভুর হস্ত। সমগ্র জীবন প্রকৃতির যোগ; তার প্রয়াস নিজের অন্তর্নিহিত ভগবানকে ব্যক্ত করা। যে পর্যায়ে এই সাধনা জীবের মধ্যে আত্মসচেতন এবং সেই কারণে যথাযথভাবে সম্পন্ন হবার সামর্থ্য লাভ করে তখনই তা যোগ। নিম্ন বিবর্তনে যে সব গতিবৃত্তি বিক্ষিপ্ত ও শিথিলভাবে যুক্ত সে সবের সমাহার ও একাগ্রতাই যোগ।

যেমন সাধনাপদ্ধতি অখণ্ড পূর্ণ, তেমন ফলও অখণ্ড পূর্ণ। প্রথম আসে ভাগবত সত্তার পূর্ণ উপলব্ধি; পরম একের উপলব্ধি যে শুধু তাঁর ভেদহীন ঐক্যে হবে, তা নয়, তা হবে অসংখ্য বিভিন্ন বিভাবের মধ্যেও, কারণ সাপেক্ষ চেতনার দ্বারা তাঁর সম্যক্ জ্ঞানের জন্য এসবও প্রয়োজনীয়; শুধু আত্মার মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি নয়, অনন্ত প্রকারের ক্রিয়া, জগৎ ও সৃষ্টির জীবসকলের মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি দরকার।

সেজন্য মুক্তিও হবে পূর্ণ, অখণ্ড। এ মুক্তি শুধু ভগবানের সঙ্গে জীবের সর্বাংশে অবিচ্ছিন্ন সংস্পর্শজাত মুক্তি, সাযুজ্যমুক্তি নয় যাতে বিভেদ এমনকি দ্বন্দ্বের মধ্যেও জীব মুক্ত হয়, অথবা শুধু সালোক্য মুক্তি নয় যাতে সমগ্র সচেতন সত্তা ভগবৎসত্তার সেই একই পাদে, সচ্চিদানন্দের অবস্থায় বাস করে; এসব ছাড়াও, এ মুক্তি হল অবর সত্তাকে ভগবানের মানুষী প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরের দ্বারা দিব্য প্রকৃতি লাভ, সাধর্ম্য মুক্তি, আর সকল কিছুর সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত মুক্তি, অহং-এর অনিত্য ছাঁচ থেকে চেতনার মুক্তি এবং সেই এক পরম পুরুষের সঙ্গে এর একাত্মতা লাভ, যিনি জগৎ ও জীব উভয়ের মধ্যে বিশ্বাত্মক আবার জগতের মধ্যে ও সকল বিশ্ব ছাড়িয়ে উভয়ত্রই বিশ্বাতীতভাবে এক।

এই অখণ্ড উপলব্ধি ও মুক্তির ফল হবে জ্ঞান প্রেম ও কর্মের পরিণতির মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য, কেননা অহং থেকে মুক্তি এবং সকলের অন্তরে ও সকলের বাইরে

বিরাজমান সেই পরম একের সঙ্গে অভিন্নতা লাভ হয়েছে। কিন্তু এই প্রাপ্তির মধ্যে গ্রহিষ্ণু চেতনা সীমাবদ্ধ থাকে না; সেজন্য আমরা পাই পরম আনন্দের মধ্যে ঐক্য এবং পরম প্রেমের মধ্যে সুষম বৈচিত্র্য, এবং এই ভাবে আমাদের সত্তার তুঙ্গে পরম প্রেমাস্পদের সঙ্গে শাশ্বত একত্ব বজায় রেখেও আমাদের কাছে সম্ভব হয় লীলার সকল সম্পর্কই। চেতনার অনুরূপ ব্যাপ্তির ফলে আমরা চিৎপুরুষের মধ্যে এমন মুক্তিলাভে সমর্থ হই যাতে জীবন থেকে নিবৃত্ত হবার প্রয়োজন থাকে না, বরং যা জীবনকেও নিজের অন্তর্ভুক্ত করে, আর অহমিকা, বন্ধন ও প্রতিক্রিয়া রহিত হয়ে আমরা তখন আমাদের মন ও দেহে জগতের উপর দিব্য ক্রিয়ার অকুণ্ঠ কর্মপ্রবাহের প্রণালী হতে সমর্থ হই।

দিব্যজীবন শুধু যে মুক্ত তা নয়, সে বিশুদ্ধ, আনন্দময় ও সিদ্ধ। পূর্ণ বিশুদ্ধতা যেমন একদিকে আনে আমাদের মধ্যে ভাগবত সত্তার পূর্ণ প্রতিফলন, তেমন অন্যদিকে আনে আমাদের মধ্যে, এই জীবনের মধ্যে ও আমাদের বহিরংশে আমরা যে জটিল যন্ত্র তার যথাযথ ক্রিয়ার মাধ্যমে তার পরম সত্য ও বিধানের পরিপূর্ণ বর্ষণ, আর এই পূর্ণ বিশুদ্ধতার উপর নির্ভর করে অখণ্ড স্বাধীনতা। এই বিশুদ্ধতার ফল পূর্ণ আনন্দ যাতে জগতের সব কিছুকেই ভগবৎ-প্রতীক রূপে দেখে সে সবে আনন্দ এবং জগতের অতীত যা তাতেও আনন্দ, উভয়ই এক সাথে সম্ভব। আর তাতে রচিত হয় মানুষী অভিব্যক্তির অবস্থার মধ্যে ভগবানের সদৃশ হিসেবে আমাদের মানবজাতির পূর্ণ সিদ্ধি যে সিদ্ধির প্রতিষ্ঠা সত্তা, প্রেম ও আনন্দের, এবং জ্ঞানের ক্রিয়ার এবং শক্তির মধ্যে সঙ্কল্পের ও অহং-শূন্য কর্মের মধ্যে সঙ্কল্পের ক্রিয়ার এক প্রকার স্বচ্ছন্দ বিশ্বভাব। এই অখণ্ড পূর্ণতালাভও পূর্ণযোগে সম্ভব।

মন ও দেহের সিদ্ধিও এই সিদ্ধির অন্তর্গত। সুতরাং মানবজাতিকে শেষ পর্যন্ত যে সমন্বয় করতে হবে তার ব্যাপকতম সূত্রের মধ্যে রাজযোগ ও হঠযোগের সর্বোচ্চ সিদ্ধিও অন্তর্ভুক্ত হবে। যোগের মাধ্যমে মানবজাতির যে সকল সাধারণ মানসিক এবং শারীরিক শক্তি ও অনুভূতি লাভ হওয়া সম্ভব, অন্ততঃ সে সবের সম্পূর্ণ বিকাশ অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক অখণ্ড পূর্ণ পদ্ধতির মধ্যে। আবার এসবকে অখণ্ড মনোময় ও দৈহিক জীবনের জন্য ব্যবহার করা না হলে এদের অস্তিত্বের অর্থ থাকে না। এরূপ মনোময় ও দৈহিক জীবন স্বভাবতঃ হবে অধ্যাত্মজীবনের রূপায়ণ তার যথাযথ মানসিক ও দৈহিক মূল্যে। এইভাবে প্রকৃতির তিনটি ক্রমের ও মানবজীবনের যে তিনটি প্রকার সে ব্যক্ত করেছে বা করছে তাদের এক সমন্বয়ে আমরা উপনীত হব। আমাদের মুক্ত সত্তা ও সিদ্ধ ক্রিয়া প্রণালী সকলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে আমাদের ভিত্তিস্বরূপ জড়গত জীবন এবং আমাদের মধ্যবর্তী কারণ স্বরূপ মনোময় জীবন।

তাছাড়া যে পূর্ণতার পানে আমাদের আস্পৃহা তা যদি ব্যষ্টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে সে পূর্ণতা খাঁটি পূর্ণতা হবে না, এমনকি তা সম্ভবও হবে না। নিজেদের ও অপরের — উভয়ের মাধ্যমেই সত্তায়, প্রাণে ও প্রেমে আমাদের যে আত্মোপলব্ধি তা

আমাদের ভগবৎ-সিদ্ধির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আমাদের মুক্তি ও সিদ্ধির অপরিহার্য পরিণতি ও ব্যাপকতম উপকারিতা হবে অপরের মধ্যে আমাদের স্বাধীনতা ও তার সব ফলের প্রসার। আর এই প্রসারের সতত ও স্বাভাবিক চেষ্টার লক্ষ্য হবে উত্তরোত্তর এবং পরিণামে সর্বাঙ্গীনভাবে সমগ্র মানবজাতির মুক্তি ও সিদ্ধি।

ব্যাপকভাবে সিদ্ধ অধ্যাত্মজীবনের এই অখণ্ডতা সাধনের দ্বারা যখন মানবের সাধারণ জড়গত জীবন এবং ব্যষ্টি ও জাতির মধ্যে মানসিক ও নৈতিক আত্মোৎকর্ষ-সাধনের জন্য তার মহান্ ব্যবহারিক প্রয়াস দিব্যভাবাপন্ন হবে তখন তা হবে আমাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টি — উভয় সাধনারই বিজয় মুকুট। এই পরিণতির অর্থ অন্তরের স্বর্গরাজ্যের রূপায়ণ বাহিরের স্বর্গরাজ্যে; কাজেই জগতের সকল ধর্ম বিভিন্নভাবে যে মহান্ স্বপ্ন দেখে এসেছে এ হবে তারই প্রকৃত সার্থকতা।

উৎসর্গীকৃত দৃষ্টিতে যাঁরা মানবজাতির মধ্যে ভগবানকে প্রচ্ছন্ন দেখেছেন তাঁদের সম্পূর্ণ যোগ্য ব্রত হল সিদ্ধির যে বিশালতম সমন্বয় মননে সম্ভব তার একান্ত সাধনা।

প্রথম খণ্ড

দিব্যকর্ম যোগ

প্রথম অধ্যায়

সহায় চতুষ্টয়

যোগসিদ্ধি অর্থাৎ যে সিদ্ধি যোগসাধনের ফল তা পাবার সবচেয়ে বড় সহায় হল চারটি মহৎ করণের মিলিত ক্রিয়া। প্রথম হল শাস্ত্র অর্থাৎ যে সব সত্য, তত্ত্ব, শক্তি ও প্রক্রিয়া উপলব্ধির বিধায়ক তাদের জ্ঞান। তার পর উৎসাহ অর্থাৎ শাস্ত্রানুযায়ী ধৈর্য সহকারে বিরামহীন সাধনা, আমাদের ব্যক্তিগত প্রযত্নের শক্তি। তৃতীয় সহায় গুরু, তাঁর সাক্ষাৎ উপদেশ, দৃষ্টান্ত ও প্রভাব যার ফলে আমাদের জ্ঞান ও সাধনা উন্নীত হয় অধ্যাত্ম অনুভূতির স্তরে। সর্বশেষ করণ হল কাল, কেননা সকল বিষয়েরই ক্রিয়ার এক কালচক্র এবং দিব্যগতির এক পরিমিত সময় আছে।

পূর্ণ যোগের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র হল সনাতন বেদ যা প্রতি মননশীল প্রাণীর হৃদয়ে গুহাহিত থাকে। শাশ্বত জ্ঞান ও শাশ্বত সিদ্ধির শতদল আমাদেরই মধ্যে থাকে না-ফোটা মুদিত কুঁড়িরূপে। একবার মানুষের মন সনাতনের দিকে ফিরতে শুরু করলে, তার হৃদয় আর সসীমের আসক্তির মধ্যে সঙ্কুচিত ও আবদ্ধ না থেকে অসীমের প্রেমে মুগ্ধ হলে — তা সে যে পরিমাণেই হ'ক না কেন — তার হৃদয়-শতদল দ্রুত বা ক্রমশঃ ফুটে ওঠে পাপড়ির পর পাপড়ি মেলে, একটির পর একটি উপলব্ধি পেয়ে। তারপর থেকে সকল জীবন, সকল মনন, সকল আন্তর শক্তির উদ্দীপন, নিষ্ক্রিয় বা সক্রিয় সকল অনুভূতি আঘাতের পর আঘাত দিয়ে অন্তঃপুরুষের আবরণ বিদীর্ণ ক'রে তার অনিবার্য বিকাশের সব বাধা অপসারণ করে। অনন্তকে যে বরণ করে, তাকে অনন্ত পূর্বেই বরণ করেছেন। যে দিব্যস্পর্শ ব্যতীত চিৎপুরুষের জাগরণ হয় না, উন্মীলন হয় না সেই দিব্যস্পর্শ সে পেয়েছে; একবার এই স্পর্শ পেলে সিদ্ধিলাভ নিশ্চিত, তা সে মানুষের এক জন্মেই দ্রুত আসুক বা ব্যক্ত বিশ্বের মধ্যে বহু জন্মচক্র ধরে ধৈর্যসহকারে ধাপে ধাপে অগ্রসর হবার পর আসুক।

মনকে এমন কিছুই শিক্ষা দেওয়া যায় না যা জীবের বিকাশমান অন্তঃপুরুষের মধ্যে যোগ্য জ্ঞানরূপে পূর্বেই প্রচ্ছন্ন নেই। সেইরকম মানুষ যে সব বাহ্য সিদ্ধিলাভে সমর্থ সে সব তারই মধ্যকার চিৎপুরুষের শাশ্বত সিদ্ধির বাস্তব উপলব্ধি মাত্র। আমরা ভগবানকে যে জানি, ভগবান যে হয়ে উঠি তার কারণ পূর্ব থেকেই আমাদের গূঢ় প্রকৃতিতে আমরা তা-ই। সকল শিক্ষারই অর্থ প্রকাশ, সকল হওয়ার অর্থ উন্মীলন। আত্মপ্রাপ্তিই গূঢ় কথা; আত্মজ্ঞান ও উপচীয়মান চেতনা তার উপায় ও কার্যপ্রণালী।

সাধারণতঃ যার সাহায্যে এই প্রকাশ হয় তা বাক্ বা শ্রুতবস্তু। এই বাক্ আসতে পারে আমাদের ভিতর থেকে; আবার বাইরে থেকেও তা আসতে পারে। কিন্তু যে ভাবেই আসুক, তা গূঢ় জ্ঞানের ক্রিয়ারম্ভের সহায় মাত্র ভিতরের বাক্ হয়তো আমাদের অন্তঃস্থ অন্তরতম পুরুষের বাণী, যে পুরুষ সর্বদাই ভগবানের দিকে উন্মুক্ত; আর না হয় তা সর্বভূতের হৃদিস্থিত গূঢ় বিশ্বগুরুর বাণী। অবশ্য ক্বচিৎ কোন ক্ষেত্রে অন্য কিছুর দরকার হয় না; কারণ যোগের বাকী সব কিছুই ঐ নিরবচ্ছিন্ন স্পর্শ ও দেশনার প্রভাবে আত্ম-উন্মীলন। যিনি হৃৎকমলে নিত্য অধিষ্ঠিত তাঁর ভাস্বর জ্যোতিঃপ্রভাবে জ্ঞানের শতদল ভিতর থেকে আপনা-আপনিই প্রস্ফুটিত হয়। এইভাবে ভিতর থেকে আসা আত্মজ্ঞান যাঁদের পক্ষে যথেষ্ট এবং যাঁদের কোন লিখিত গ্রন্থ বা জীবন্ত গুরুর ঈশান প্রভাবের অধীনে চলার দরকার হয় না তাঁরা বাস্তবিকই মহান্, তবে তাঁদের সংখ্যা অল্প।

সাধারণতঃ আত্ম-উন্মীলন কার্যে সহায়তার জন্য ভগবানের প্রতিভূস্বরূপ কোন বাইরের বাক্-এর প্রয়োজন হয়; হয়তো তা অতীতের কোন মহাবাক্য অথবা জীবন্ত গুরুর আরো শক্তিশালী বাণী। কখন কখন প্রতিভূস্বরূপ বাক্য আন্তরশক্তি জাগরণ ও অভিব্যক্তির উপলক্ষ মাত্র; এ যেন প্রকৃতির সর্বজনীন বিধানের কাছে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ভগবানের মান্যতা স্বীকার। এইভাবেই উপনিষদে বলা হয়েছে যে দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ঋষি ঘোরের কাছ থেকে বাক্ পেয়ে জ্ঞান লাভ করেছিলেন। সেইরকম রামকৃষ্ণ স্বীয় আন্তর সাধনা বলে কেন্দ্রীয় দীপ্তি পাবার পর যোগের বিভিন্ন মার্গের সাধনায় কয়েকজন গুরু বরণ করেছিলেন; কিন্তু এইসব পন্থায় যত সহজে ও যত দ্রুত তাঁর উপলব্ধি হয়েছিল তাতে বোঝা যায় যে তাঁর গুরুবরণের অর্থ সেই সাধারণ বিধির স্বীকৃতি যে গুরুর কাছ থেকেই শিষ্যকে সকল জ্ঞান লাভ করতে হয়।

কিন্তু সাধারণতঃ সাধকের জীবনে দিব্য প্রতিভূ গুরুর প্রভাবেরই স্থান বেশী। যদি কোন যোগের সাধনা করা হয় কোন পাওয়া লিখিত শাস্ত্র অর্থাৎ পূর্বতন যোগীদের অনুভূতির মূর্তিস্বরূপ অতীতের কোন মহাবাক্য অনুসারে তাহলে সে যুগের অনুশীলন শুধু নিজের প্রচেষ্টায় অথবা গুরুর সাহায্যে সম্ভব। তারপর উপদেশলব্ধ সব সত্যের ধ্যানধারণা দ্বারাই অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ হয় এবং ব্যক্তিগত অনুভূতিতে সেই সব সত্য উপলব্ধি করে অধ্যাত্মজ্ঞানকে জীবন্ত ও সচেতন করে তোলা হয়; যোগ সাধনা অগ্রসর হয় কোন ধর্ম গ্রন্থের বা ঐতিহ্যের নির্দিষ্ট সব পদ্ধতির ফলানুযায়ী, যাদের দৃঢ় ও উদ্ভাসিত করা হয় গুরুর উপদেশে। এরকম সাধনা সঙ্কীর্ণ তবে তার সীমার মধ্যে নিরাপদ ও ফলপ্রসূ কারণ তা চলে বহু ব্যবহৃত জানা পথ দিয়ে দূরবর্তী পরিচিত লক্ষ্যের দিকে।

কিন্তু পূর্ণযোগের সাধকের স্মরণ রাখা দরকার যে কোন লিখিত শাস্ত্র — তা যত বড়ই তার প্রামাণ্য হ'ক বা যত বৃহৎ-ই তার আন্তরভাব হ'ক — শাশ্বত পরম জ্ঞানের আংশিক প্রকাশের বেশী হতে পারে না। সে তা ব্যবহার করবে, কিন্তু কখনও নিজেকে তা দিয়ে বাঁধবে না, এমনকি তা যদি সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ হয় তা হলেও নয়। যে ধর্মগ্রন্থ গভীর, ব্যাপক ও উদারভাবাপন্ন সাধকের উপর তার প্রভাব হতে পারে পরমকল্যাণপ্রদ

ও অমিত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেষ্ঠ সব সত্যের দিকে তার উদ্বুদ্ধ হওয়ার ও সর্বোচ্চ সব অনুভূতি উপলব্ধি করার সঙ্গে তা বিজড়িত থাকবে তার অনুভূতির মধ্যে। দীর্ঘদিন ধরে তার যোগ সাধনাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে একটি মাত্র ধর্মগ্রন্থ অথবা পরপর কয়েকটি, এই যেমন হিন্দু ঐতিহ্য অনুসারী যোগে গীতা, উপনিষদ, বেদ। আর না হয় তার বিকাশের এক প্রধান অঙ্গ এমন হবে যে তার উপাদানের মধ্যে থাকবে বহু ধর্মগ্রন্থের সত্যসমূহের সমৃদ্ধ বিভিন্ন অনুভূতি এবং তার সাহায্যে ভবিষ্যৎও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে অতীতের সর্বোত্তম সব কিছু নিয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে আত্মনির্ভর হতে হবে, কিন্তু আরো ভাল হয় যদি সে প্রথম থেকেই বাস করতে পারে তার অন্তরাত্মায় — লিখিত সত্য ছাড়িয়ে, "শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে" যা সে শুনেছে বা এখনও যা শুনতে বাকী আছে সে সব ছাড়িয়ে — "শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ" কারণ সে তো একটি বা বহু গ্রন্থের সাধক নয়, সে অনন্তের সাধক।

আর এক রকম শাস্ত্র আছে যা ধর্মগ্রন্থ নয়; সাধক যে যোগের পথ বেছে নেয় তার সত্য ও পদ্ধতি, কার্যকরী সব তত্ত্ব এবং কর্মপ্রণালী — এসবের বিবরণ এই শাস্ত্র। প্রতি যোগপন্থার নিজের শাস্ত্র আছে, এই শাস্ত্র হয় লিখিত, নয় পরম্পরাগত অর্থাৎ গুরু পরম্পরায় মুখে মুখে বহুদিন চলে আসছে। ভারতবর্ষে সাধারণতঃ এই লিখিত বা পরম্পরাগত শিক্ষাকে যথেষ্ট প্রামাণ্য, এমনকি বহু সম্মানও দেওয়া হয়। লোকের এই ধারণা যে যোগের সব সাধনধারা নির্দিষ্ট; আর যে গুরু পরম্পরায় এই শাস্ত্র পেয়েছেন এবং সাধনাবলে তার সত্য উপলব্ধি করেছেন তিনি শিষ্যকে চালনা করেন সেই স্মরণাতীত কালের পথ দিয়ে। নতুন কোন সাধন পন্থা বা যোগের নতুন কোন শিক্ষা বা কোন নতুন সূত্রের প্রচলনের বিরুদ্ধে প্রায়ই আপত্তি শোনা যায়, "ইহা শাস্ত্রানুমোদিত নয়"। কিন্তু যথার্থ তত্ত্বের দিক থেকে বা যোগীর বাস্তব সাধনার দিক থেকে নতুন সত্য, অভিনব প্রকাশ বা বিশালতর অনুভূতি আনার পথে লৌহকপাটের মত কোন কঠোর নিষেধ নেই। বহু শতাব্দীর যে জ্ঞান ও অনুভূতিরাজি সুবিন্যস্ত ও সুসংহতভাবে নতুন শিক্ষার্থীর উপযোগী করা হয়েছে তা-ই পাওয়া যায় লিখিত বা পরম্পরাগত শিক্ষায়। সুতরাং তার গুরুত্ব ও উপকারিতা প্রভূত। কিন্তু পরিবর্তন ও উন্নতি বিধানের প্রচুর স্বাধীনতা সর্বদাই কার্যতঃ সম্ভব। এমন কি রাজযোগের মত উচ্চ বৈজ্ঞানিক যোগপদ্ধতির ও অনুশীলন পতঞ্জলির সুসংহত প্রণালী ছাড়া অন্য প্রণালীতেও সম্ভব। ত্রিমার্গের[১] প্রতি পথ নানা উপপথে বিভক্ত, কিন্তু এসব আবার মিলিত হয় একই গন্তব্যস্থলে। যে সাধারণ জ্ঞানের উপর যোগ নির্ভরশীল তা নির্দিষ্ট কিন্তু তাদের বিন্যাস, অনুক্রম, প্রণালী ও রূপের কিছু অদলবদল অনুমোদন করা কর্তব্য, কারণ সর্বস্বীকৃত সব সত্য দৃঢ় ও অপরিবর্তিত থাকলেও ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও বিশেষ প্রেরণার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা দরকার।

[১] জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের ত্রিমার্গ।

বিশেষ করে সমন্বয়মূলক পূর্ণযোগকে কোন লিখিত বা পরম্পরাপ্রাপ্ত শাস্ত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়; কারণ অতীতের সব জ্ঞানকে সাদরে গ্রহণ করলেও, তা চায় এই জ্ঞানকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য নতুন ভাবে সংহত করতে। তার আত্মগঠনের জন্য একান্ত প্রয়োজন — অনুভূতি পাওয়ার ও নতুন সমবায়ে জ্ঞানের পুনর্বিবৃতি করার পূর্ণ স্বাধীনতা। পূর্ণ যোগ চায় সমগ্র জীবনকে নিজের পরিধির মধ্যে আনতে; সেজন্য তার সাধক তেমন তীর্থযাত্রী নয় যে রাজপথ দিয়ে গন্তব্যস্থলে অগ্রসর হবে, বরং সে হিসেবে সে পথিকৃৎ, অচিন বনের মধ্য দিয়ে তাকে পথ কেটে যেতে হয়। কারণ বহুকাল ধরে যোগ জীবন থেকে বিচ্যুত হয়েছে, আর আমাদের বৈদিক পূর্বতনদের মত যে সব প্রাচীন সম্প্রদায়ের লক্ষ্য ছিল জীবনকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা, তারা আজ আমাদের কাছ থেকে বহুদূরে, সাধনার কথা তাঁরা যে সংজ্ঞায় বলেছেন তা আর বোধগম্য নয়, যে রূপে তাদের প্রয়োগ করা হ'ত এখন আর তা চলে না। শাশ্বত কালের স্রোতে মানবজাতি এখন অনেক দূর এগিয়ে এসেছে, সুতরাং সেই পুরনো সমস্যার দিকে আমাদের যাত্রারম্ভ করতে হবে নতুন স্থান থেকে।

এই যোগের দ্বারা আমরা যে শুধু অনন্তকে পেতে চাই তা নয়, আমরা অনন্তকে আবাহন করি যেন তিনি মানুষের জীবনের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেন। সুতরাং আমাদের যোগশাস্ত্রে মানুষের গ্রহিষ্ণু অন্তরাত্মার অনন্ত স্বাধীনতার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজনীয়। বিশ্বাত্মক ও বিশ্বাতীতকে নিজের মধ্যে নিজস্ব ধরনে ও নিজস্বভাবে নেবার অবাধ স্বাধীনতা জীবের থাকবে — এই হল মানুষের পূর্ণ অধ্যাত্ম জীবনের যথার্থ অবস্থা। বিভিন্ন রূপের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়েই সকল ধর্মের একত্ব প্রকাশ অনিবার্য — এই উক্তির পর বিবেকানন্দ একসময় আরো বলেছিলেন যে, যখন প্রতিটি লোকের নিজস্ব ধর্ম থাকবে, আর যখন প্রত্যেকেই কোন সম্প্রদায়গত বা ঐতিহ্যগত ধর্মরূপের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে পরাৎপরের সঙ্গে তার প্রকৃতির সম্পর্ক বিষয়ে স্বাধীন আত্ম-অভিযোজন অনুসরণ করবে তখনই হবে ধর্মের মূলগত ঐক্যের প্রতিষ্ঠা। সেইরূপ বলা যায় যে পূর্ণ যোগেরও পরাকাষ্ঠা তখনই হবে যখন প্রকৃতির ঊর্ধ্বে পরমার্থের দিকে উৎসরণে প্রত্যেকে আপন প্রকৃতির বিকাশ সাধনে নিজস্ব যোগপথ অনুসরণ করতে পারবে। কারণ স্বাধীনতাই চূড়ান্ত বিধান ও চরম পরিণতি।

তবে তারই মধ্যে সাধকের ভাবনা ও অনুশীলন ঠিক পথে চালনার সহায় হিসেবে কতকগুলি সর্বগ্রাহ্য নিয়ম রচনা আবশ্যক, তবে সে সব অবশ্য পালনীয় ছককাটা কার্যক্রমের মত বাঁধাধরা কোন নির্দিষ্ট ব্যবস্থা হবে না, বরং যতদূর সম্ভব সেখানে থাকবে সর্বস্বীকৃত সত্যের কথা, তত্ত্বের সর্ব সাধারণ বিবৃতি এবং সাধনা ও উন্নতির সম্বন্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যাপক নির্দেশ। অতীত অনুভূতি থেকেই সকল শাস্ত্রের উৎপত্তি এবং ভবিষ্যৎ অনুভূতির জন্যই তার প্রয়োজনীয়তা। শাস্ত্র হল অন্যতম সহায় ও আংশিক পথপ্রদর্শক। তাতে থাকে পথ নির্দেশের সঙ্কেত এবং প্রধান সব পথের ও পূর্ব পরীক্ষিত স্থানসমূহের নাম যাতে পথিক জানতে পারে কোন্ দিকে ও কোন্ কোন্ পথ দিয়ে সে অগ্রসর হচ্ছে।

অবশিষ্ট সব নির্ভর করে ব্যক্তিগত প্রযত্ন ও অনুভূতির উপর এবং দিশারীর সামর্থ্যের উপর।

যোগসাধনার প্রারম্ভে ও তারপরও দীর্ঘদিন পর্যন্ত প্রধানতঃ সাধকের আস্পৃহা ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উপরই নির্ভর করে তার অনুভূতির বিকাশ কত দ্রুত ও প্রসারিত হবে এবং তার ফল হবে কত তীব্র ও শক্তিশালী। যোগসাধনার অর্থ — বিষয়সমূহের বাহ্যরূপে ও আকর্ষণে তন্ময় অহমাত্মক চেতনাকে পিছনে ফেলে মানবাত্মার যাত্রারম্ভ এমন এক পরতর অবস্থার পানে যাতে বিশ্বাতীত ও বিশ্বাত্মক সত্তা জীবের আধারের মধ্যে নিজেকে ঢেলে দিয়ে তার রূপান্তর সাধন করতে পারেন। নতুন পথে আসার আগ্রহের তীব্রতা ও প্রত্যক্-আত্ম হবার নির্দেশের শক্তি —এরাই হল সিদ্ধির প্রাথমিক নির্ধারক। সাধকের আস্পৃহা কত প্রবল, তার সঙ্কল্প কত জোরাল, মন কত একাগ্র ও সাধনার জন্য কত ধৈর্য ও দৃঢ়তাসহকারে উদ্যম করা হচ্ছে — এইসব হবে তীব্রতার পরিমাপ। বাইবেলের কথার প্রতিধ্বনি করে আদর্শ সাধকের বলা উচিত, "ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতাই আমাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করেছে"। প্রভুর জন্য এই উৎসাহ, তার সব দিব্য ফলের জন্য সমগ্র প্রকৃতির ব্যাকুলতা, ভগবানকে পাবার জন্য হৃদয়ের আগ্রহ — এরাই অহংকে গ্রাস ক'রে তার তুচ্ছ সঙ্কীর্ণ গণ্ডি ভেঙে দেয় যাতে গ্রহণ করতে পারা যায় পূর্ণ ও বৃহৎভাবে সেই অভীষ্টকে, যা বিশ্বাত্মক হওয়ায় বৃহত্তম ও সর্বোচ্চ ব্যষ্টি আত্মা ও প্রকৃতি অপেক্ষাও বৃহত্তর এবং বিশ্বাতীত হওয়ায় তাদের চেয়ে উচ্চতর।

কিন্তু এ শুধু সিদ্ধিবিধায়ী সাধনশক্তির একদিক মাত্র। পূর্ণযোগ প্রণালীর তিনটি পর্যায়; অবশ্য এরা যে সুস্পষ্টভাবে পৃথক বা ভিন্ন তা নয়, তবে কিছুটা ক্রমিক। প্রথম পর্যায়ে আবশ্যাক, অন্ততঃ প্রাথমিক ও শক্তিপ্রদ স্বোত্তরণ ও ভগবৎ-সংস্পর্শের জন্য প্রচেষ্টা; এরপর আবশ্যক — যা সর্বাতীত ও যার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে তাকে আমাদের মধ্যে গ্রহণ আমাদের সমগ্র সচেতন সত্তার রূপান্তর সাধনের জন্য; শেষ পর্যায়ে আসে জগতে দিব্যকেন্দ্ররূপে আমাদের রূপান্তরিত মনুষ্যত্বের নিয়োগ। যতক্ষণ না ভগবানের সঙ্গে সংস্পর্শ বেশ কিছু পরিমাণে দৃঢ় হয়, যতক্ষণ না কিছু পরিমাণে স্থায়ী সাযুজ্য লাভ হয়, ততক্ষণ সাধারণতঃ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশী। কিন্তু যে পরিমাণে এই সংস্পর্শ দৃঢ় হয়, সাধক সেই পরিমাণে জানতে পারে যে তার মধ্যে এমন এক শক্তি সক্রিয় হয়েছে যা তার নিজের নয় এবং যা তার অহংগত প্রচেষ্টা ও সামর্থ্যের অতীত; আর এই শক্তির কাছে সে উত্তরোত্তর আত্মসমর্পণ করতে শেখে এবং তার যোগের ভার দেয় তার কাছেই। পরিশেষে তার নিজের সঙ্কল্প ও শক্তি এক হয়ে যায় এই পরতর শক্তির সঙ্গে; সে তাদের ডুবিয়ে দেয় দিব্য পরম সঙ্কল্প ও তার বিশ্বাতীত ও বিশ্বাত্মক শক্তির মধ্যে। তখন থেকে সাধক বুঝতে পারে যে এই হল তার মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক সত্তার আবশ্যকীয়

রূপান্তর সাধনের চালক এবং সে কাজ এত নিরপেক্ষ প্রজ্ঞা ও ফলোৎপাদনের দূরদৃষ্টির সঙ্গে নিষ্পন্ন হচ্ছে যে উৎসুক ও স্বার্থপর অহং-এর পক্ষে তা সম্ভব নয়। এই একাত্মতা ও আত্ম-নিমজ্জন সম্পূর্ণ হলেই জগতে দিব্যকেন্দ্র প্রস্তুত হয়। শুদ্ধ, মুক্ত, নমনীয় ও জ্ঞানদীপ্ত এই কেন্দ্র তখন মানবত্ব বা অতিমানবত্বের, পৃথিবীর অধ্যাত্ম অগ্রসরতা বা তার রূপান্তর সাধনের বৃহত্তর যোগে এক পরম শক্তির সরাসরি ক্রিয়ার নিমিত্তস্বরূপ হওয়া শুরু করে।

বস্তুতঃ সর্বদাই যা কাজ করে তা এই পরতর শক্তি। অহংগত মনের ভ্রান্তভাবে ও অসম্পূর্ণরূপে নিজেকে দিব্যশক্তির কর্মধারার সঙ্গে এক করার প্রয়াসের ফলেই ব্যক্তিগত উদ্যম ও আস্পৃহাবোধের উৎপত্তি। জগতে সাধারণ অনুভূতি সম্বন্ধে এই মন মানসিকতার যে সব সাধারণ সংজ্ঞা প্রয়োগ করে সেগুলিকে সে অতিপ্রাকৃত স্তরের অনুভূতি সম্বন্ধেও প্রয়োগ করে চলে। জগতে আমরা কাজ করি অহমিকার ভাব নিয়ে; আমাদের মধ্যে যে সব বিশ্বশক্তি সক্রিয় সেগুলিকে আমরা দাবী করি নিজস্ব বলে; মন, প্রাণ ও দেহের এই আধারে বিশ্বাতীতের নির্বাচন, রূপায়ণ ও প্রগতিসাধনের ক্রিয়াকে আমরা দাবী করি আমাদের ব্যক্তিগত সঙ্কল্প, জ্ঞান, শক্তি ও পুণ্যের ফল বলে। জ্ঞানদীপ্ত হলে আমরা বুঝি অহং এক যন্ত্র মাত্র; আমাদের এই বোধ ও অনুভব হতে শুরু করে যে এইসব বিষয় আমাদের নিজস্ব এই অর্থে যে তারা আমাদের পরম ও অখণ্ড আত্মার নিজস্ব আর এই আত্মা বিশ্বাতীতের সঙ্গে এক, সে সব যন্ত্রস্বরূপ অহং-এর নয়। কর্মধারায় আমাদের দান হল গণ্ডি টানা ও বিকৃতি আনা, তার মধ্যে সত্যকার সামর্থ্য হল ভগবানের। যখন মানুষের অহং উপলব্ধি করে যে তার সঙ্কল্প একটা যন্ত্র, তার জ্ঞান অজ্ঞানতা ও বালকের নির্বুদ্ধিতা, তার শক্তি শিশুর হাতড়ান, তার পুণ্য দাম্ভিক অপবিত্রতা আর যখন সে তার ঊর্ধ্বের শক্তিকে বিশ্বাস করে তার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিতে শেখে তখনই তার পরিত্রাণ। আমাদের ব্যক্তিগত সত্তার যে আপাত স্বাধীনতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রতি আমরা এত গভীরভাবে আসক্ত তা বাহ্যমাত্র; আমরা যে সহস্র রকমের আভাসন, সংবেগ ও শক্তিকে আমাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তির বাইরে রেখেছি তাদের নিকৃষ্ট দাসত্বই তাদের প্রচ্ছন্ন আসল রূপ। আমাদের যে অহং স্বাধীনতার বড়াই করে সে প্রতি মুহূর্তে বিশ্বপ্রকৃতির অগণিত সত্তা, সামর্থ্য, শক্তি ও প্রভাবের দাস, ক্রীড়নক ও খেলার পুতুল। ভগবানের মাঝে অহং-এর আত্মবিসর্জনই তার আত্মসার্থকতা; তার অতীতে যা তার কাছে আত্মসমর্পণই বন্ধন ও সীমা থেকে তার মুক্তি, তার পূর্ণ স্বাধীনতা।

কিন্তু তবু কার্যতঃ আত্ম-বিকাশসাধনের তিনটি পর্যায়ের প্রতিটিরই প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা আছে এবং প্রত্যেককে তার উপযুক্ত সময় ও স্থান দিতে হবে। চরম ও সর্বোচ্চ অবস্থা থেকে সাধনা শুরু করা চলে না, আর তা নিরাপদ বা ফলপ্রসূও নয়। তাছাড়া অসময়ে একটি থেকে অন্যটিতে লাফ দিয়ে যাওয়াও সঠিক পন্থা হবে না। কেননা মনে ও হৃদয়ে পরতমকে স্বীকার করলেও, প্রকৃতিতে এমন সব উপাদান আছে

যারা বহুকাল এই স্বীকৃতিকে উপলব্ধ সত্য হতে দেয় না। কিন্তু বিনা উপলব্ধিতে আমাদের মানসিক বিশ্বাস স্ফুরন্ত বাস্তব সত্য হতে পারে না; তখনও এ শুধু জ্ঞানের মূর্তি, সজীব সত্য নয়, একটা ভাবনা, তখনও কোন সামর্থ্য নয়। আর যদিই বা উপলব্ধি পাওয়া শুরু হয়, তা হলেও আমরা যে পুরোপুরি পরতমের হাতের মধ্যে বা তাঁর চালিত যন্ত্র তা বেশী তাড়াতাড়ি কল্পনা করা বা ধরে নেওয়া বিপজ্জনক হতে পারে। এরকম ভাবার দরুন বিপজ্জনক মিথ্যার প্রবেশ সম্ভব; অসহায় নিশ্চেষ্টতার উৎপত্তি সম্ভব অথবা এই মনোভাব ভগবানের নাম দিয়ে অহং-এর গতিবিধিকে বড় করায় যোগের সমগ্র ধারাই বিপজ্জনকভাবে বিকৃত ও ধ্বংস হতে পারে। আন্তর প্রযত্ন ও সংগ্রামের একটা কমবেশী সুদীর্ঘ সময় আছে যাতে সাধকের নিজের সঙ্কল্পবলে অপরা প্রকৃতির অন্ধকার ও বিকৃতি বর্জন করা এবং দিব্য জ্যোতির দিকে নিজেকে সবলে ও দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। মানসিক শক্তি, হৃদয়ের ভাবাবেগ, প্রাণের কামনা এমনকি শারীর সত্তাকেও জোর করে ফেরাতে হবে তাদের যথার্থ প্রবৃত্তির দিকে অথবা এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা সঠিক সব প্রভাবকে গ্রহণ ক'রে তাতে সাড়া দিতে পারে। একমাত্র তখনই, অর্থাৎ যখন একাজ ঠিকমত করা হয়েছে শুধু তখনই ঊর্ধ্বের নিকট নিম্নের আত্মসমর্পণ সম্ভব, কারণ তখন উৎসর্গ গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

সাধকের প্রথম করণীয় — ব্যক্তিগত সঙ্কল্পশক্তি দিয়ে অহমাত্মক প্রবৃত্তিগুলি ধরে তাদের ফেরানো আলোক ও সত্যের দিকে; একবার ফেরাবার পরও তাদের এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা সর্বদা তা-ই স্বীকার করে, সর্বদা তা-ই গ্রহণ করে, সর্বদা তা-ই অনুসরণ করে। এইভাবে অগ্রসর হতে থাকাকালীন সে তখনও ব্যক্তিগত সঙ্কল্প, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, ব্যক্তিগত শক্তির প্রয়োগে অহমাত্মক সব প্রবৃত্তিকে নিয়োগ করবে পরতর শক্তির প্রতিভূ হিসেবে ও সচেতনভাবে পরতর প্রভাবের বশ্যতা স্বীকার ক'রে। আরো অগ্রসর হলে তার সঙ্কল্প, প্রচেষ্টা ও শক্তি ব্যক্তিগত বা পৃথক কিছু আর থাকে না, এসব হয় সাধকের মধ্যে এই ক্রিয়াতে সেই পরতর শক্তির ও প্রভাবের বিভিন্ন কর্ম। কিন্তু তখনও দিব্য উৎস ও বহির্গামী মানুষী প্রবাহের মাঝে থাকে এক প্রকার বিশাল ব্যবধান, আর এই কারণে যাবার পথে আসে এক তমসাবৃত প্রণালী যা সব সময় নির্ভুল নয়, এমন কি কখন কখন যা অতীব বিভ্রান্তিকর। অগ্রসরের শেষ পর্বে, অহমিকা, অশুদ্ধতা ও অবিদ্যার উত্তরোত্তর তিরোভাবে এই শেষ ব্যবধানও লোপ পায়; তখন জীবের মধ্যে সব কিছুই হয়ে ওঠে দিব্যকর্মপ্রণালী।

পূর্ণযোগের পরম শাস্ত্র যেমন প্রতি মানুষের হৃদিস্থিত গূঢ় সনাতন বেদ, তেমন তার পরম দিশারী ও গুরু হলেন আমাদের অন্তর্গূঢ় আন্তর দিশারী জগৎ-গুরু। তিনিই আমাদের অন্ধকার দূর করেন তাঁর জ্ঞানের ভাস্বর জ্যোতিতে, আর সেই জ্যোতিই হয়ে

ওঠে আমাদের মধ্যে তাঁর নিজের আত্মপ্রকাশের ক্রমবর্ধমান মহিমা। তিনি আমাদের মধ্যে উত্তরোত্তর প্রকট করেন মুক্তি, আনন্দ, প্রেম, শক্তি, অমৃতময় সত্তার আত্মপ্রকৃতি। আমাদের আদর্শ হিসেবে তিনি তুলে ধরেন আমাদের ঊর্ধ্বে তাঁর দিব্য দৃষ্টান্ত, এবং এই অবর জীবনকে রূপান্তরিত করেন তার ধ্যেয় বস্তুর প্রতিরূপে। আমাদের মধ্যে তাঁর নিজের প্রভাব ও উপস্থিতির অভিসিঞ্চন দ্বারা তিনি ব্যষ্টি সত্তাকে সামর্থ্য দেন বিশ্বাত্মক ও বিশ্বাতীতের সঙ্গে তাদাত্ম্যলাভে।

কি তাঁর পদ্ধতি, কি তাঁর বিধান (system)? তাঁর কোন পদ্ধতি নেই, আবার সব পদ্ধতিই তাঁর পদ্ধতি। প্রকৃতি যে সব উচ্চতম প্রণালী ও গতিবৃত্তি লাভে সমর্থ সে সবকে স্বাভাবিকভাবে সংহত করাই তাঁর বিধান। তাদের ক্ষুদ্রতম খুঁটিনাটি বিষয়ে পর্যন্ত এবং দৃশ্যতঃ যে কাজগুলি অতি নগণ্য সেগুলিতেও মহত্তমের মতই সযত্নে ও নিশ্ছিদ্রভাবে নিজেদের প্রয়োগ ক'রে তারা পরিশেষে সব কিছুকেই উত্তোলন করে মহাজ্যোতিতে এবং সব কিছুই রূপান্তরিত করে। কারণ তাঁর যোগে ক্ষুদ্র এমন কিছু নেই যা ব্যবহারের অযোগ্য বা বড় এমন কিছু নেই যা সাধনার অতীত। মহাগুরুর দাস ও শিষ্যের যেমন অহঙ্কার বা অহমিকার সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না, কারণ সকল কিছুই তার জন্য করা হয় ঊর্ধ্ব থেকে তেমন তাঁর ব্যক্তিগত ঊনতা বা তাঁর প্রকৃতির স্খলনের জন্য নিরুৎসাহ হবারও কোন অধিকার নেই। কারণ যে শক্তি তাঁর মধ্যে ক্রিয়ারত তা নৈর্ব্যক্তিক — বা অতিব্যক্তিক — এবং অসীম।

এই আন্তর দিশারী, যোগেশ্বর, সকল যজ্ঞ ও সাধনার প্রভু, আলোক, ভোক্তা ও লক্ষ্যকে পূর্ণভাবে স্বীকার করা অখণ্ড সিদ্ধির পথে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমে তাঁকে যে ভাবেই দেখা যাক না কেন — সকল বিষয়ের পশ্চাতে নৈর্ব্যক্তিক প্রজ্ঞা, প্রেম ও শক্তি ভাবে, না হয় সাপেক্ষের মধ্যে অভিব্যক্ত ও তার আকর্ষক পরমার্থসৎ হিসেবে অথবা নিজেরই পরমাত্মা ও সকলের পরমাত্মা বলে বা আমাদের অন্তরে ও জগতের মধ্যে দিব্য ব্যক্তি রূপে, তাঁর বহুবিধ পুরুষবাচক বা স্ত্রীবাচক আকার ও নামের যে কোন একটিতে অথবা মনোভাবিত কোন আদর্শ হিসেবে — যে ভাবেই হোক না কেন তাতে কিছু যায় আসে না। পরিশেষে আমরা বুঝি যে তিনি সব কিছু এবং এইসব বিষয়ের সমষ্টিরও বেশী তিনি। তাঁর সম্বন্ধে ভাবনার মধ্যে প্রবেশ করার মনের দ্বার অতীত পরিণাম ও বর্তমান প্রকৃতি ভেদে বিভিন্ন হতে বাধ্য।

প্রথম দিকে আমাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার অতীত তীব্রতার জন্য এবং অহং নিজেকে ও তার সব লক্ষ্যে নিবিষ্ট থাকার দরুন এই আন্তর দিশারী প্রায়শঃই প্রচ্ছন্ন থাকেন। যতই আমরা স্বচ্ছতা লাভ করি, এবং অহমাত্মক বিক্ষোভের স্থলে আসে অধিকতর শান্ত আত্ম-জ্ঞান ততই আমরা চিনতে থাকি আমাদের অন্তঃস্থ বর্ধিষ্ণু আলোকের উৎসকে। আবার যখন আমরা উপলব্ধি করি কিভাবে আমাদের সকল অজ্ঞানতাময় ও পরস্পর বিরোধী গতিবৃত্তি এমন এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিরূপিত হয়েছে যার কথা আমরা মাত্র এখনই জানতে পারছি এবং আরো উপলব্ধি করি কেমন করে আমরা যোগের পথে

আসার পূর্বেও আমাদের জীবনের বিবর্তন তার সন্ধিক্ষণের জন্য পূর্বকল্পিতভাবে চালিত হয়েছে তখন আমরা তাঁকে চিনতে পারি আমাদের অতীতের মধ্যেও। কেননা এই সময় আমরা বুঝতে শুরু করি আমাদের সংগ্রাম ও প্রচেষ্টা, সফলতা ও বিফলতার তাৎপর্য কি। পরিশেষে আমরা বুঝি আমাদের সব কঠোর পরীক্ষার ও দুঃখভোগের অর্থ কি এবং যে সব থেকে আমরা আঘাত ও বাধা পেয়েছি, সেগুলি আমাদের কত সহায় হয়েছে, এবং আমাদের পতন ও পদস্খলন কত উপকারে এসেছে তাও হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হই। এই যে দিব্য চালনার কথা আমরা পরে বুঝতে পারি, তা শুধু অতীতের ঘটনা সম্বন্ধে নয়, অব্যবহিত বর্তমান কালেও আমরা বোধ করি যে এক বিশ্বাতীত দ্রষ্টার দ্বারা আমাদের সব মননের, এক সর্বগ্রাহী সামর্থ্যের দ্বারা আমাদের সঙ্কল্প ও ক্রিয়ার, যে পরম আনন্দ ও প্রেম সকল কিছু আকর্ষণ করেন ও নিজের মধ্যে এক করে নেন তাঁর দ্বারা আমাদের ভাবপ্রধান জীবনের গঠন — এইসব বিষয়েও রয়েছে সেই দিব্য দেশনা। তাছাড়া এঁকে চিনি আমরা নিবিড় ব্যক্তিগত সম্পর্কেও তাঁর প্রথম স্পর্শে অথবা অন্তিম গ্রহণে; অনুভব করি এক পরম প্রভু, বন্ধু, প্রেমিক, গুরুর চিরন্তন সান্নিধ্য। এক মহত্তর ও বিশালতর জীবনের সারূপ্যে ও একত্বে আমাদের সত্তা বিকশিত হওয়ার সময় আমরা এঁকে চিনি আমাদের সত্তার স্বরূপে, কারণ আমাদের উপলব্ধি হয় যে এই অত্যাশ্চর্য বিকাশ আমাদের নিজের প্রচেষ্টায় হয়নি, আমাদের গড়ে তুলছেন এক নিত্য পূর্ণ সত্তা তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে। যিনি যোগদর্শনের ঈশ্বর, সচেতন জীবের মাঝে চৈত্যগুরু বা অন্তর্যামী, মনীষীর পরমার্থসৎ, অজ্ঞেয়বাদীর অজ্ঞেয়তত্ত্ব, জড়বাদীর বিশ্বশক্তি, যিনি পরম পুরুষ ও পরমাপ্রকৃতি, যিনি এক কিন্তু বিভিন্ন ধর্মে যাঁর নানা নাম ও নানা মূর্তি — তিনিই আমাদের যোগের অধীশ্বর।

আমাদের বিভিন্ন আন্তর আত্মায় ও সমগ্র বহিঃপ্রকৃতিতে এই পরম এককে দেখা, জানা, তাঁর স্বরূপে রূপায়িত হওয়া ও তাঁকে সার্থক করা — চিরদিন এই ছিল আমাদের দেহগত জীবনের গূঢ় লক্ষ্য আর এখন এই হয়ে উঠে তার সচেতন উদ্দেশ্য। আমাদের ব্যষ্টি চেতনার পূর্ণতা হল আমাদের সত্তার সকল অংশে এবং বিভাজক মন যে সবকে আমাদের সত্তার বাইরে বলে দেখে সে সবেও সমভাবে তাঁর সম্বন্ধে সচেতন হওয়া। নিজেদের মধ্যে ও সর্ব বিষয়ে তাঁর দ্বারা অধিগত হওয়া ও তাঁকে অধিগত করা এই হল সাম্রাজ্য ও ঈশিত্বের সংজ্ঞা। নিষ্ক্রিয়তা ও সক্রিয়তা, শান্তি ও সামর্থ্য, ঐক্য ও ভেদ — এই সকল কিছুর অনুভূতিতে তাঁকে ভোগ করাই সেই সুখ যার জন্য জগতে ব্যক্ত জীবের অজ্ঞানময় অন্বেষণ। বিশ্বপ্রকৃতি যে সত্য নিজের মধ্যে গোপন রেখেছে, এবং যা উদ্‌ঘাটন করার জন্য তার এত কষ্টভোগ সেই সত্যকে ব্যক্তিগতভাবে অনুভব করা — এই হল পূর্ণযোগের লক্ষ্যের সমগ্র বিবরণ। এর অর্থ মানবের অন্তঃপুরুষকে দিব্যপুরুষে, প্রাকৃত জীবনকে দিব্য জীবনধারায় রূপান্তরিত করা।

এই পূর্ণ সার্থকতা প্রাপ্তির নিশ্চিততম উপায় হল আমাদের অন্তরধিষ্ঠিত রহস্যের ঈশ্বরকে পাওয়া, অবিরত নিজেদের উন্মুক্ত রাখা দিব্যশক্তির কাছে, যা আবার দিব্য প্রজ্ঞা ও প্রেম — এবং রূপান্তর সাধনের জন্য তাঁকে বিশ্বাস করা। কিন্তু শুরুতে অহমাত্মক চেতনার পক্ষে আদৌ একাজ করা কঠিন। আর যদি আদৌ করা হয়, তাহলেও এটি সুষ্ঠুভাবে এবং আমাদের প্রকৃতির প্রতি তন্ত্রীতে সাধন করা কঠিন। প্রথমে যে এই কাজ কঠিন তার কারণ আমাদের ভাবনা, ইন্দ্রিয়সংবিৎ, বেদনার অহমাত্মক অভ্যাসগুলি আবশ্যকীয় উপলব্ধিলাভের সব পথ রুদ্ধ করে দেয়। আর পরে যে এ কাজ কঠিন তার কারণ অহং-আচ্ছন্ন অন্তঃপুরুষের পক্ষে এই পথের প্রয়োজনীয় বিশ্বাস, সমর্পণ ও সাহস সহজসাধ্য নয়। অহমাত্মক মন যে কর্মপ্রণালী কামনা বা অনুমোদন করে, দিব্যকর্মপ্রণালী তা নয় কারণ সে সত্য পাবার জন্য ব্যবহার করে ভ্রম, আনন্দ পাবার জন্য দুঃখ ভোগ, পূর্ণতা পাবার জন্য অপূর্ণতা। কোথায় তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অহং তা দেখতে পায় না; সে চালনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তার আত্ম-প্রত্যয় ও সাহস লোপ পায়। কিন্তু এসব ত্রুটি-বিচ্যুতিতে কিছু আসে যায় না; কারণ অন্তঃস্থ দিব্য দিশারী আমাদের বিদ্রোহে রুষ্ট বা আমাদের বিশ্বাসের অভাবে নিরুৎসাহ হন না বা আমাদের দুর্বলতায় বিরক্ত হয়ে ফিরে যান না; তাঁর আছে মায়ের পরিপূর্ণ স্নেহ ও শিক্ষকের অসীম ধৈর্য। কিন্তু তাঁর দেশনা থেকে সম্মতি প্রত্যাহার করার অর্থ এর উপকারিতা সম্বন্ধে চেতনা থেকে বঞ্চিত হওয়া; অবশ্য বাস্তবপক্ষে এটি পুরোপুরি নষ্ট হয় না, তাছাড়া শেষ পর্যন্ত এর ফল পাওয়া যায়ই। আর আমরা যে সম্মতি প্রত্যাহার করি তার কারণ হল তিনি যে অবর আত্মার মাধ্যমে তাঁর আত্মপ্রকাশের আয়োজন করছেন তার সঙ্গে আমাদের পরতর আত্মার পার্থক্য আমরা বুঝতে অক্ষম। যেমন জগতে, তেমন নিজেদের মধ্যে আমরা ভগবানকে যে দেখতে পাই না তার কারণ তাঁর কর্মপ্রণালী, বিশেষতঃ তিনি আমাদের মধ্যে কাজ করেন আমাদের প্রকৃতির মাধ্যমে — যথেচ্ছভাবে কতকগুলি অলৌকিক ঘটনা দিয়ে নয়। বিশ্বাস পাবার জন্য মানুষ চায় অলৌকিক ঘটনা; সে চায় চোখ ঝলসে যাক তবে যদি সে দেখতে পায়। আর এই অধৈর্য, এই অজ্ঞানতার পরিণতি হতে পারে "মহতী বিনষ্টিঃ" যদি এই দেশনার বিরুদ্ধে আমাদের বিদ্রোহে আমরা আমাদের সংবেগ ও কামনার আরো তৃপ্তিকর অন্য কোন বিকৃতকারিণী শক্তিকে আহ্বান করি ও তাকে ভগবানের নাম দিয়ে বলি, "তুমিই আমাদের পথ দেখাও"।

নিজের অন্তরে অ-দেখা কিছুকে বিশ্বাস করা মানুষের পক্ষে কঠিন, অথচ অন্য কিছুকে নিজের বাইরে কল্পনা ক'রে তাকে বিশ্বাস করা তার পক্ষে সহজ। বেশীরভাগ মানুষের পক্ষেই অধ্যাত্ম অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন কোন বাইরের অবলম্বন, বিশ্বাসের কোন বাহ্য পাত্র; এর প্রয়োজন হয় ভগবানের কোন বাহ্য প্রতিমূর্তি নয় কোন মানুষী প্রতিভূ যেমন অবতার বা দিব্যবাণী প্রচারক বা গুরু; অথবা দুয়েরই প্রয়োজন ও দুই-ই পাওয়া যায়। কারণ মানুষের অন্তঃপুরুষের প্রয়োজন অনুযায়ী ভগবান নিজেকে ব্যক্ত করেন — হয় কোন দেবতারূপে নয় কোন মানব দেবতারূপে, আর না হয় সাদাসিধে

মানবরূপেই; তাঁর দেশনা প্রেরণের উপায় হিসাবে তিনি এই পুরু ছদ্মবেশ ব্যবহার করেন যাতে দেবত্ব সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন থাকে।

অন্তঃপুরুষের এই প্রয়োজন মেটাবার জন্য হিন্দুর আধ্যাত্মিক সাধনার ইষ্ট দেবতা, অবতার ও গুরুর ভাবনা। ইষ্ট দেবতার অর্থ কোন অবর শক্তি নয়, এ হল বিশ্বাতীত ও বিশ্বাত্মক পরম দেবতার কোন নাম ও রূপ। প্রায় সকল ধর্মই ভগবানের এইরকম কোন নাম ও রূপকে হয় তাদের ভিত্তিস্বরূপ স্বীকার করে, নয় তাদের ব্যবহার করে। মানুষের অন্তঃপুরুষের পক্ষে এর প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্ট। ভগবান সর্ব এবং সর্বেরও অতিরিক্ত। কিন্তু যা সর্বের অতিরিক্ত তার ধারণা মানুষের পক্ষে কিভাবে সম্ভব? এমন কি প্রথমে সর্বও মানুষের পক্ষে অসাধ্য, কারণ মানুষ নিজেই তার সক্রিয় চেতনায় এক সসীম ও বিবিক্ত গঠন মাত্র এবং যা তার সসীম প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শুধু তার কাছেই সে পারে নিজেকে উন্মুক্ত করতে। এই সর্বের মধ্যে এমন সব বিষয় আছে যা তার ধারণাশক্তির অগম্য, অথবা তারা এত ভয়ঙ্কর যে তার সূক্ষ্ম সংবেদনশীল ভাবাবেগ ও সঙ্কোচশীল ইন্দ্রিয়সংবিতের পক্ষে অসহনীয় মনে হয়। অথবা শুধু বলা যায়, তার অজ্ঞানতাময় বা আংশিক সব ভাবনার গণ্ডির বেশী বাইরের কোন কিছুকেই ভগবানরূপে ধারণা করা বা তার দিকে অগ্রসর হওয়া বা তাকে চেনা তার পক্ষে অসম্ভব। তার পক্ষে দরকার তার নিজের প্রতিমূর্তিতে ভগবানকে ভাবনা করা বা এমন কোনরূপে ভাবনা করা যা তার অতীত অথচ তার উৎকৃষ্ট প্রবণতার সঙ্গে সুসমঞ্জস এবং তার বেদনা (feeling) বা বুদ্ধির গ্রাহ্য। নতুবা ভগবানের সঙ্গে তার সংযোগ ও মিলন-সাধন তার পক্ষে দুরূহ হবে।

তবু তার প্রকৃতি চায় এক মানুষী মধ্যস্থ, যেন সে ভগবানকে অনুভব করতে পারে এমন কিছুতে যা তার নিজের মানবতার একান্তই নিকটে ও যার মানুষী প্রভাব ও দৃষ্টান্ত তার বোধগম্য। এই চাওয়া পূর্ণ হয় যখন ভগবান আবির্ভূত হন মানবরূপে অর্থাৎ অবতার হয়ে, কৃষ্ণ, খৃষ্ট বা বুদ্ধরূপে। অথবা যদি এই ধারণাও তার পক্ষে অসাধ্য হয় তাহলে ভগবান নিজেকে প্রকট করেন কোন কম বিস্ময়কর মধ্যস্থ হিসাবে — যেমন দিব্যবাণী প্রচারক বা আচার্য হিসেবে কারণ এমন লোক আছে যারা নররূপী ভগবানের ধারণা করতে অক্ষম বা তাঁকে স্বীকার করতে অনিচ্ছুক অথচ মহত্তম মহাপুরুষের কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করতে তারা প্রস্তুত। একে তারা অবতার বলে না, বলে জগদাচার্য বা ভগবানের প্রতিভূ।

কিন্তু এও যথেষ্ট নয়; মানুষের প্রয়োজন — এক জীবন্ত প্রভাব, এক জীবন্ত দৃষ্টান্ত, সাক্ষাৎ উপদেশ। কারণ অতীত কালের আচার্য ও তাঁর দৃষ্টান্ত ও প্রভাবকে নিজ জীবনে জীবন্ত শক্তি করে তোলার ক্ষমতা খুব কম লোকেরই আছে। এই প্রয়োজনের জন্যও হিন্দুসাধনায় গুরু-শিষ্য সম্পর্কের ব্যবস্থা আছে। কখন কখন হয়ত গুরু নিজেই অবতার বা জগদাচার্য কিন্তু যতটুকু প্রয়োজন তা এই যে তিনি শিষ্যের কাছে হবেন দিব্য প্রজ্ঞার প্রতীক, তার কাছে নিয়ে আসবেন দিব্য আদর্শের কিছুটা বা তাকে অনুভব করাবেন

সনাতনের সঙ্গে অন্তঃপুরুষের উপলব্ধ সম্বন্ধ।

পূর্ণ যোগের সাধক তার প্রকৃতি অনুযায়ী এই সকল সহায়গুলিকেই কাজে লাগাবে। কিন্তু তার কর্তব্য হল এসবের সঙ্কীর্ণতা পরিহার করা; তাছাড়া অহমাত্মক মন যে ভাবে অন্য সব বাদ দিয়ে বলে; "আমার ভগবান, আমার অবতার, আমার নবী, আমার গুরু" এবং সাম্প্রদায়িকতার বা গোঁড়ামির বশে অন্যসব উপলব্ধিকে তার বিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করে সে মনোভাব পূর্ণ-যোগের সাধকের দূর করা কর্তব্য। সকল রকম সাম্প্রদায়িকতা, সকল রকম গোঁড়ামি ত্যাগ করা চাই-ই; কারণ এসব দিব্য উপলব্ধির অখণ্ডতা বিরুদ্ধ।

অপরপক্ষে যতক্ষণ না পূর্ণযোগের সাধক নিজের ভাবনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে ভগবানের সকল নাম, সকল রূপ, নিজের ইষ্ট দেবতাকে দেখে অন্য সকল ইষ্টদেবতার মধ্যে, যতদিন না সে অবতারের মধ্যে অবতীর্ণ ভগবানের ঐক্যের মধ্যে এক করে অন্য সব অবতারকে, সকল শিক্ষার সত্যকে সংহত করে শাশ্বত প্রজ্ঞার সৌষম্যের মধ্যে — ততক্ষণ তার তৃপ্তি নাই।

তার একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে এই সব বাহ্য সহায়ের লক্ষ্য হল তার অন্তঃপুরুষকে উদ্বুদ্ধ করা তার অন্তঃস্থিত ভগবানের কাছে। যতদিন না একাজ সিদ্ধ হয় ততদিন সাধনার শেষ হয় না। বাইরে কৃষ্ণ, খৃষ্ট, বুদ্ধকে পূজা করাই যথেষ্ট নয়, যদি আমাদের অন্তরের বুদ্ধ, খৃষ্ট বা কৃষ্ণের প্রকাশ না হয়, যদি না তাঁরা রূপ গ্রহণ করেন অন্তরে। ঠিক এই মত অন্য সকল সহায়েরও অপর কোন উদ্দেশ্য নেই; এদের প্রতিটি হল মানুষের অপরিবর্তিত অবস্থা ও তার অন্তঃস্থ ভগবানের প্রকাশের মধ্যকার সেতু-স্বরূপ।

পূর্ণযোগের গুরু যতদূর সম্ভব আমাদের অন্তঃস্থ গুরুর পদ্ধতি অনুসরণ করবেন। তিনি শিষ্যকে চালনা করবেন শিষ্যের প্রকৃতির মাধ্যমে। শিক্ষা, দৃষ্টান্ত, প্রভাব — এই তিনটি গুরুর যন্ত্র। কিন্তু প্রাজ্ঞ গুরু শিষ্যের গ্রহিষ্ণু মনের নিষ্ক্রিয় স্বীকৃতির উপর নিজেকে বা নিজের মতামতকে জোর করে চাপাতে চাইবেন না! তিনি শিষ্যের অন্তরে বীজাকারে নিক্ষেপ করবেন এমন কিছু যা নিশ্চিতভাবে ফলপ্রসূ এবং এই বীজ বর্ধিত হবে অন্তঃস্থ দিব্য পরিপোষণের আশ্রয়ে। উপদেশ দেওয়া অপেক্ষা প্রবুদ্ধ করাই তাঁর লক্ষ্য; স্বাভাবিক প্রণালীও স্বচ্ছন্দ প্রসারের মাধ্যমে বিভিন্ন শক্তি ও অনুভূতির বিকাশই তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি পদ্ধতির নির্দেশ দেবেন, কিন্তু তা সহায় হিসেবে, সাধনোপযোগী উপায় হিসেবে, এটি কোন অলঙ্ঘনীয় সূত্র বা বাঁধা কার্যক্রম নয়। কিন্তু তাঁকে সতর্ক থাকতে হবে যেন উপায়টি বন্ধন না হয়, সাধন প্রণালী না পরিণত হয় যান্ত্রিক অনুষ্ঠানে। তাঁর একমাত্র কাজ হল দিব্য আলোকের উন্মেষ সাধন ও দিব্য শক্তিকে সক্রিয় করা, তিনি শুধু এদের উপায় ও সহায়, আধার বা প্রবাহ প্রণালী।

উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তের শক্তি বেশী। কিন্তু যা সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ তা বাহ্যকর্মের বা ব্যক্তিগত চরিত্রের দৃষ্টান্ত নয়। অবশ্য এদেরও স্থান ও উপকারিতা আছে; কিন্তু অপরের মধ্যে আস্পৃহা জাগাবার শ্রেষ্ঠ উপকরণ হল তাঁর অন্তঃস্থ দিব্য উপলব্ধি যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাঁর সমগ্র জীবন ও আন্তর অবস্থা এবং সকল কর্ম। এই হল সার্বভৌম মূল উপাদান, বাকী সব ব্যক্তি বিশেষ বা ঘটনা বিশেষের কথা। এই স্ফুরন্ত উপলব্ধিকেই অনুভব করা এবং নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী নিজের মধ্যে জাগিয়ে তোলা সাধকের কর্তব্য; বাইরে থেকে অনুকরণের চেষ্টা করার প্রয়োজন নেই, এতে স্বাভাবিক ও সঠিক ফল পাওয়ার বদলে বরং সব কিছু হতে পারে নিষ্ফল।

দৃষ্টান্ত অপেক্ষা প্রভাব আরো গুরুত্বপূর্ণ। প্রভাবের অর্থ শিষ্যের উপর গুরুর বাহ্য কর্তৃত্ব নয়, এর অর্থ তাঁর সংস্পর্শের শক্তি, তাঁর উপস্থিতির শক্তি এবং অন্যের অন্তঃপুরুষের সঙ্গে তাঁর অন্তঃপুরুষের সান্নিধ্যের শক্তি যার বলে তিনি স্বয়ং যা এবং যা কিছু তাঁর আছে তা তিনি সঞ্চারিত করেন শিষ্যের অন্তঃপুরুষের মধ্যে যদিও তা নীরবে। এ হল গুরুর পরমোৎকৃষ্ট চিহ্ন। কারণ শ্রেষ্ঠ গুরু আচার্য ততটা নন যতটা হলেন এক উপস্থিতি যা তাঁর চারপাশের সকল গ্রহিষ্ণুদের মধ্যে বষর্ণ করে দিব্য চেতনা এবং এর উপাদান স্বরূপ আলোক, শক্তি, বিশুদ্ধতা ও আনন্দ।

পূর্ণযোগের গুরুর আর এক চিহ্ন এই যে তিনি মানুষী দম্ভ বা আত্মম্ভরিতার ভাব নিয়ে গুরুগিরি দাবী করেন না। যদি তাঁর কোন কাজ থাকে তা উর্ধ্ব থেকে ন্যস্ত হয়েছে, তিনি নিজে এক প্রণালী, এক পাত্র বা এক প্রতিভূ মাত্র। তিনি মানুষ, তাঁর ভাইদের সাহায্য করেন; বালক তিনি, অন্য বালকদের পথ দেখান; পরম বর্তিকা তিনি, অন্য বর্তিকা প্রজ্বলিত করেন, প্রবুদ্ধ পরম পুরুষ তিনি, অন্য সব অন্তঃপুরুষকে প্রবুদ্ধ করেন; আর সর্বোপরি তিনি ভগবানের এক শক্তি বা উপস্থিতি যা ভগবানের অন্য সব শক্তিকে আহ্বান করে তাঁর নিকট।

এই সকল সহায়ই যে সাধক পায় তার লক্ষ্যপ্রাপ্তি ধ্রুব। পতনও তার পক্ষে উত্থানের উপায় মাত্র, মৃত্যু সার্থকতার দিকে অগ্রসর হবার পথ। কেন না একবার সে যখন এই পথ ধরেছে, জন্ম ও মৃত্যু তার সত্তার বিকাশ সাধনের প্রণালী মাত্র, তার যাত্রাপথের বিভিন্ন পর্যায় মাত্র।

সাধন ধারায় ফলপ্রসূতার জন্য বাকী যে সহায় প্রয়োজন তা কাল। মানুষের প্রচেষ্টার কাছে কাল মনে হয় শত্রু বা মিত্র, বিঘ্ন, মাধ্যম বা যন্ত্রস্বরূপ। কিন্তু বস্তুতঃ এটি সর্বদাই অন্তঃপুরুষের সাধন যন্ত্র।

যে সকল ঘটনা ও শক্তি একত্র মিলে কাজ করার ফলে এক অগ্রসরতার উৎপত্তি হয়, কাল তাদের ক্ষেত্র ও গতিধারার পরিমাপক। অহং-এর নিকট এ এক উপদ্রব, বাধা,

ভগবানের কাছে এ হল এক যন্ত্র। সুতরাং যতদিন আমাদের প্রচেষ্টা ব্যক্তিগত থাকবে, ততদিন মনে হবে কাল এক বাধা কারণ এ আমাদের নিকট আনয়ন করে আমাদের শক্তির বিরোধী বিভিন্ন শক্তির সব বিঘ্ন। যখন আমাদের চেতনায় মিলিত হয় দিব্যকর্মধারা ও ব্যক্তিগত কর্মধারা তখন মনে হয় এটি তার মাধ্যম ও অবস্থা। এ দুই যখন এক হয়, তখন মনে হয় কাল ভৃত্য ও যন্ত্র।

কালের প্রতি সাধকের আদর্শ মনোভাব এই হবে যে তার ধৈর্য অসীম, যেন তার সার্থকতা সাধনের জন্য অনন্তকাল তার সম্মুখে, অথচ এমন শক্তিকে বিকশিত করা দরকার যা বর্তমানেই বাস্তবে রূপায়িত হবে, আর যার ঈশিত্ব ও ক্ষিপ্রতার চাপ নিরন্তরই বাড়তে থাকবে যতদিন না এ উপনীত হয় পরম দিব্য রূপান্তরের অলৌকিক তৎক্ষণত্বে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আত্মোৎসর্গ

যোগের যা প্রকৃতি তাতে এ হল এক নবজন্ম — মানবের সাধারণ মানসিক-ভাবাপন্ন জড়াসক্ত জীবন থেকে পরতর অধ্যাত্ম চেতনায় এবং মহত্তর ও দিব্যতর সত্তায় জন্ম পরিগ্রহ। বৃহত্তর অধ্যাত্ম জীবনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রবলভাবে প্রবুদ্ধ না হলে কোন যোগেরই সফল আরম্ভ ও অনুশীলন সম্ভব নয়। এই গভীর ও বিরাট পরিবর্তনের জন্য যে অন্তঃপুরুষ আহ্বান পায় সে তার নতুন পথে যাত্রারম্ভের মোড়ে আসে নানাভাবে। সে এখানে আসতে পারে তারই নিজস্ব স্বভাবের বিকাশধারায় যা তাকে তার অজ্ঞাতসারেই নিয়ে যাচ্ছিল তার জাগরণের দিকে, নয় তো কোন ধর্মের প্রভাবে বা দর্শনের আকর্ষণে, অথবা মন্থর আন্তর দীপ্তির সাহায্যে সে ধীরে ধীরে সেখানে পৌঁছয় বা হঠাৎ কোন স্পর্শ বা আঘাত পেয়ে সে সেখানে লাফ দিয়ে; না হয় বাহ্য অবস্থার চাপ বা কোন আন্তর প্রয়োজনীয়তা বা এমন একটি কথা যাতে তার মনের রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত হয় বা সুদীর্ঘ চিন্তা বা এই পথের পূর্বগামী কারও দূরাগত দৃষ্টান্ত বা তার সংস্পর্শ ও প্রাত্যহিক প্রভাব তাকে সেখানে ঠেলে বা চালিয়ে আনতে পারে। সাধকের প্রকৃতি ও অবস্থা অনুযায়ীই আহ্বান আসবে।

কিন্তু যেভাবেই এই আহ্বান আসুক না কেন, আবশ্যক হল মন ও সঙ্কল্পের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং এর ফলস্বরূপ সম্পূর্ণ ও কার্যকরী আত্মোৎসর্গ। সত্তায় এক নতুন আধ্যাত্মিক ভাবনা-শক্তি গ্রহণ এবং ঊর্ধ্বপানে উন্মুখতা, এক দীপ্তি, সঙ্কল্প ও হৃদয়ের আস্পৃহার দ্বারা উপলব্ধ এক পরাবর্তন বা রূপান্তর — এরই গুরুত্ব সমধিক, যোগ যা কিছু দিতে পারে সে সব এরই মধ্যে আছে যেমন সব ফল থাকে বীজের মধ্যে। ঊর্ধ্বতন কিছুর জন্য শুধু ভাবনা বা বুদ্ধিগত অন্বেষণ, তাতে মনের আগ্রহ যত প্রবলই হোক না কেন, নিষ্ফল হবে যদি না হৃদয় তাকে একমাত্র কাম্য এবং সঙ্কল্প তাকে একমাত্র করণীয় ব'লে আঁকড়ে ধরে। কারণ পরম চিৎপুরুষের সত্য শুধু ভাবনার বিষয় হলে হবে না, সেই সত্যকে জীবনে রূপায়িত করা চাই, আর এর জন্য দরকার সত্তার একীভূত একচিত্ততা; যে মহাপরিবর্তন যোগ আনতে চায় তা বিভক্ত সঙ্কল্প বা অল্প শক্তি বা দ্বিধাগ্রস্ত মন দিয়ে সাধিত হয় না। যে ভগবানকে পেতে চায় তার উৎসর্গ করা চাই নিজেকে ভগবানের কাছে, আর তা একমাত্র ভগবানেরই কাছে।

যদি কোন দুর্বার প্রভাবের ফলে আকস্মিক ও চূড়ান্তভাবে এই পরিবর্তন আসে তা হলে আর কোন মৌলিক বা স্থায়ী প্রতিবন্ধ থাকে না। মননের পরে বা সাথে সাথে সিদ্ধান্ত আসে, আর সিদ্ধান্তের পরে আসে আত্মোৎসর্গ। পথের উপর পা ঠিক পড়েছে যদিও প্রথমে মনে হয় অনিশ্চিতভাবে ঘোরাঘুরি হচ্ছে, এমনকি যদিও পথের দৃষ্টি অস্পষ্ট

আর গন্তব্যস্থলের জ্ঞানও অসম্পূর্ণ। গোপন গুরু, আন্তর দিশারী কাজ আরম্ভ করেছেন, যদিও তিনি এখনও নিজেকে ব্যক্ত করেননি অথবা মানুষী প্রতিভূ-আকারে দেখা দেননি। যত কিছু বাধা বা দ্বিধা আসুক না কেন, অনুভূতির যে শক্তিতে জীবনের স্রোত ফিরেছে তার বিরুদ্ধে তারা শেষ পর্যন্ত টিকতে পারবে না। যে ডাক একবার নিশ্চিতভাবে এসেছে তা যাবার নয়; যা জন্মেছে, শেষ পর্যন্ত তাকে বিনাশ করা যায় না। এমনকি যদি ঘটনা প্রভাবে নিয়মিত যাত্রা বা পূর্ণ বাস্তব আত্মোৎসর্গ প্রথম থেকে না হয়, তা হলেও মন নতুনের দিকে ফিরেছে, সে সেদিকেই ফিরে থাকে এবং তার মুখ্য কর্মে ফিরে আসে আর তার ফলও বাড়তে থাকে নিরন্তর। আন্তরপুরুষের অধ্যবসায় অমোঘ, আর তার বিরুদ্ধে সকল ঘটনাই শেষে শক্তিহীন হয়ে পড়ে, প্রকৃতিস্থ কোন দুর্বলতাই দীর্ঘদিন বাধা হয়ে থাকতে পারে না।

কিন্তু সব সময় সাধনার আরম্ভ যে এইভাবে হয় তা নয়। প্রায়শঃই সাধককে নিয়ে যাওয়া হয় ধীরে ধীরে; মনের প্রথম ফেরার সময় থেকে যার দিকে সে ফিরেছে তাতে প্রকৃতির পূর্ণ সম্মতি দেওয়ার মধ্যে অনেক ব্যবধান থাকে। প্রথম দিকে থাকতে পারে শুধু বুদ্ধির এক দীপ্ত আগ্রহ, ভাবনার দিকে এক প্রবল আকর্ষণ এবং অনুশীলনের কোন অসম্পূর্ণ রূপ। অথবা হয়তো এমন চেষ্টা থাকে যাতে সমগ্র প্রকৃতির অনুমোদন নেই, এমন প্রতিজ্ঞা বা পরিবর্তন থাকে যার মূলে আছে বুদ্ধিগত প্রভাবের চাপ বা পরতমের নিকট নিজে উৎসর্গীকৃত এমন কোন ভক্তের প্রতি ব্যক্তিগত স্নেহ ও অনুরাগের প্রবল টান। এরকম ক্ষেত্রে দীর্ঘকালব্যাপী প্রস্তুতির প্রয়োজন হতে পারে তবেই যদি অপরিবর্তনীয় উৎসর্গ আসে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তা নাও আসতে পারে। হয়তো কিছু উন্নতি হয়, বা জোরাল প্রচেষ্টা হয়, এমনকি কেন্দ্রীয় বা পরম না হলেও বহুপরিমাণে বিশুদ্ধীকরণ ও অনুভূতিও লাভ হয়, কিন্তু সমস্ত জীবন হয়তো প্রস্তুতিতেই কেটে যাবে অথবা একটা পর্যায়ে পৌঁছবার পর মনের পিছনে চালনাশক্তি কম হওয়ায় মন তার চেষ্টার সীমায় এসে তুষ্ট হয়ে বসে থাকে। অথবা সাধককে এমনকি নিম্ন জীবনেও ফিরে আসতে হতে পারে, অর্থাৎ যোগের সাধারণ ভাষায় যাকে বলা হয় পতন তা হতে পারে। এরকম পতন ঘটার কারণ মূল কেন্দ্রে কোন গলদ আছে। বুদ্ধি আগ্রহী ও হৃদয় আকৃষ্ট হয়েছে, সঙ্কল্প সাধনার জন্য প্রস্তুত হয়েছে, কিন্তু সমগ্র প্রকৃতি ভগবানের পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করেনি; আগ্রহে, আকর্ষণে বা চেষ্টায় এ শুধু সায় দিয়েছে। এক পরীক্ষণ করা হয়েছে, এমনকি তা সাগ্রহ পরীক্ষণ, কিন্তু অন্তঃপুরুষের কোন একান্ত দাবীর কাছে বা কোন অপরিত্যাজ্য আদর্শের কাছে সমগ্র আত্মদান হয়নি। এইরকম অসম্পূর্ণ যোগও নষ্ট হয় না, কেননা কোন ঊর্ধ্বমুখী প্রচেষ্টাই বৃথা যাবার নয়। এমনকি বর্তমানে এ বিফল হলেও বা শুধু কোন প্রস্তুতির পর্যায়ে এলে বা প্রাথমিক উপলব্ধি পেলেও, এর দ্বারা অন্তঃপুরুষের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়েছে।

কিন্তু এই জীবন আমাদের যে সুযোগ দিয়েছে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার যদি আমরা করতে চাই, যে আহ্বান আমরা পেয়েছি তাতে যদি পর্যাপ্তভাবে সাড়া দিই, যে লক্ষ্যের

আভাস আমরা পেয়েছি তার দিকে শুধু একটু অগ্রসর হওয়া নয়, তাতে যদি আমরা পৌঁছতে চাই তাহলে নিঃশেষে আত্মদান অপরিহার্য। যোগে সাফল্যলাভের রহস্য এই যে একে জীবনে সাধ্য বহু লক্ষ্যের মধ্যে অন্যতম মনে করা নয়, মনে করতে হবে যে এই হল সমগ্র জীবন।

যোগের সার হল — অধিকাংশ লোক যে সাধারণ জড়াসক্ত ও পশুজীবন যাপন করে তা থেকে, বা অল্প কিছু লোক যে অধিকতর মনোময় কিন্তু তবু সঙ্কীর্ণ জীবনযাত্রা নির্বাহ করে তা থেকে মহত্তর অধ্যাত্ম জীবনে, দিব্য পথে ঘুরে দাঁড়ান; সুতরাং অবর জীবনের ভাব নিয়ে ঐ জীবনের জন্য যে শক্তি ব্যয় হয় তার প্রতি অংশ আমাদের লক্ষ্য ও আমাদের আত্ম-নিবেদনের পরিপন্থী। অপরপক্ষে যে পরিমাণ শক্তি বা কর্ম আমরা অবর জীবনের বশ্যতা থেকে মুক্ত করে পরতর জীবনের কাজে নিবেদন করতে পারি, সেই পরিমাণ আমাদের লাভ যোগের পথে, আর সেই পরিমাণ হ্রাস পাবে আমাদের উন্নতির বিরোধী সব শক্তির ক্ষমতা। সর্বাঙ্গীণ রূপান্তরের এই কষ্টকরতাই যোগের পথে সকল পদস্খলনের কারণ। কেননা আমাদের সমগ্র প্রকৃতি ও তার পরিবেশ, আমাদের সমগ্র ব্যক্তিগত আত্মা ও সমগ্র বিশ্বজনীন আত্মা এমন সব অভ্যাস ও প্রভাবে পূর্ণ যারা আমাদের অধ্যাত্ম পুনর্জন্মের বিরোধী এবং আমরা যাতে সর্বান্তঃকরণে সাধনায় প্রবৃত্ত হতে না পারি তার জন্য সচেষ্ট। মানসিক, স্নায়বিক ও শারীরিক সব অভ্যাসের যে জটিল স্তূপ কতকগুলি নিয়ামক ভাবনা, কামনা ও সংসর্গের সূত্রে বাঁধা আছে অর্থাৎ কতিপয় বৃহৎ স্পন্দনের সঙ্গে অনেকগুলি ক্ষুদ্র স্বয়ং-আবর্তনশীল সংমিশ্রণ যা, আমরা এক অর্থে তা ছাড়া অন্য কিছু নই। আমাদের অতীত ও বর্তমানের যে গঠন সাধারণ জড়গত ও মনোময় মানুষের জীবনে তা পুরোপুরি ভেঙে দেওয়া এবং আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করা দৃষ্টির এক নতুন কেন্দ্র, কর্মের এক নতুন বিশ্ব যা হবে দিব্য মানবতা বা অতিমানবীয় প্রকৃতি — এই হল আমাদের যোগের উদ্দেশ্য, এর চেয়ে কম কিছু নয়।

প্রথম প্রয়োজন হল: মনের যে কেন্দ্রীয় বিশ্বাস ও দৃষ্টি মনের উন্নতি, তৃপ্তি ও স্বার্থসাধনে পুরনো বাহ্য বিষয়সমূহে মনকে একাগ্র করে তা ধ্বংস করা। এই উপরভাসা দৃষ্টিভঙ্গির বদলে একান্ত প্রয়োজন সেই গভীরতর বিশ্বাস ও দৃষ্টি যা শুধু ভগবানকে দেখে ও একমাত্র ভগবানকেই অন্বেষণ করে। পরবর্তী প্রয়োজন হল আমাদের সমগ্র অবর সত্তাকে এই নতুন বিশ্বাস ও মহত্তর দৃষ্টির নিকট প্রণত হতে বাধ্য করা। চাই আমাদের সমগ্র প্রকৃতির অখণ্ড সমর্পণ; এর প্রতি অংশে, প্রতি গতিবৃত্তিতে এ যেন নিজেকে নিবেদন করে তার কাছে যা অপ্রবুদ্ধ ইন্দ্রিয় মানসের কাছে জড় জগৎ ও তার বিভিন্ন বিষয় অপেক্ষা অনেক কম বাস্তব বলে মনে হয়। আমাদের সমগ্র সত্তাকে — অন্তঃপুরুষ, মন, ইন্দ্রিয়বোধ, হৃদয়, সঙ্কল্প, প্রাণ, দেহ নিয়ে — নিজের সকল শক্তি

উৎসর্গ করতে হবে এত নিঃশেষে ও এমনভাবে যে তা যেন নিশ্চয়ই হয়ে ওঠে ভগবানের যোগ্য বাহন। এ কাজ সহজ নয়; কারণ জগতের সবকিছুই চলে দৃঢ় অভ্যাস অনুযায়ী যা তার কাছে এক বিধান ও যা তার আমূল পরিবর্তনে বাধা দেয়। আর পূর্ণযোগে যে বিপ্লব আনার চেষ্টা হয় তার চেয়ে বেশী আমূল পরিবর্তন অন্য কিছু হতে পারে না। আমাদের মধ্যকার সবকিছুকেই নিরন্তর ফিরিয়ে আনতে হবে কেন্দ্রীয় বিশ্বাস ও সঙ্কল্প ও দৃষ্টির দিকে। প্রতি মনন ও সংবেগকে উপনিষদের ভাষায় স্মরণ করিয়ে দিতে হবে, "তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে" — তাকেই ব্রহ্ম বলে জেনো, মানুষ যাকে উপাসনা করে তাকে নয়। এতদিন যা সব তার জীবন বলে চিত্রিত হয়েছে সে সবের নিঃশেষ ত্যাগ স্বীকারে প্রাণের প্রতি তন্ত্রীকে বুঝিয়ে সম্মত করাতে হবে। মনকে মন হওয়া বন্ধ করে তার ঊর্ধ্বের কিছুর দ্বারা সমুজ্জ্বল হতে হবে। প্রাণকেও পরিবর্তিত হতে হবে বিরাট ও শান্ত এবং তীব্র ও শক্তিশালী কিছুতে যা তার পুরনো অন্ধ অধীর সঙ্কীর্ণ আত্মা বা ক্ষুদ্র সংবেগ ও কামনাকে আর চিনতে পারবে না। এমনকি দেহকেও রাজী হতে হবে পরিবর্তনে; এখন যেমন সে অশান্ত পশু বা বাধাদায়ক মৃৎপিণ্ড তেমন থাকা আর তার চলবে না; এর বদলে তাকে হতে হবে চিৎপুরুষের সচেতন সেবক, ভাস্বর যন্ত্র ও জীবন্ত রূপ।

এই কাজ এতই কঠিন যে স্বভাবতঃই সহজ ও কাটাছাঁটা সমাধানের পথই অবলম্বন করা হয়। বিভিন্ন ধর্মে ও যোগসম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রবৃত্তি জন্মেছে ও দৃঢ়মূল হয়েছে যে জাগতিক জীবনকে তফাৎ রাখা চাই আন্তর জীবন থেকে। তাদের ধারণা এই যে এই জগতের সব শক্তি ও তাদের বাস্তব ক্রিয়া আদৌ ভগবানের নয়, অথবা মায়া বা অন্য কিছু অজানা অবোধ্য কারণের দরুন তারা দিব্য সত্যের তমসাপূর্ণ বিরোধী বস্তু। আর বিপরীত দিকে দেখা হয়, সত্যের সব শক্তি ও তাদের আদর্শ ক্রিয়াবলী চেতনার অন্য এক ভূমির অন্তর্ভুক্ত, পার্থিব জীবন যে অন্ধকারাচ্ছন্ন, অবিদ্যাময় সংবেগে ও শক্তিতে বিকৃত চেতনাভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত তা থেকে পৃথক এই সত্যের চেতনাভূমি। তখনই দেখা দেয় এক বিরোধ — ভগবানের উজ্জ্বল পবিত্র রাজ্য ও শয়তানের অন্ধকার অপবিত্র রাজ্য; এই হীন পার্থিব জন্ম-মৃত্যুর সঙ্গে সমুন্নত অধ্যাত্ম দিব্য চেতনার বিরোধ আমরা অনুভব করি। আমরা সহজেই বিশ্বাস করি যে মায়াধীন জীবনের সঙ্গে অন্তঃপুরুষের শুদ্ধ ব্রহ্মসত্তায় সমাহিত অবস্থার কোন মিল নেই। সহজতম উপায় হ'ল — যা সব একটির অন্তর্গত তা থেকে সরে অন্যটির নগ্ন উত্তুঙ্গ শিখরে পলায়ন। এই ভাবেই আত্যন্তিকভাবে একমাত্র ব্রহ্মেই অভিনিবিষ্ট হবার প্রতি আকর্ষণ ও প্রয়োজনীয়তার বোধ জাগে। বিশেষ কতকগুলি যোগের মধ্যে এরকম অভিনিবেশকে বড় স্থান দেওয়া হয়েছে, কারণ এরকম অভিনিবেশের সাহায্যে আমরা জগৎকে সম্পূর্ণ বর্জন করে আমাদের অভিনিবেশের বস্তু যে পরম এক তাঁর নিকট নিঃশেষে আত্মোৎসর্গ করতে সক্ষম হই। সকল অবর কর্মকে এক নতুন ও পরতর অধ্যাত্মজীবন লাভে কষ্ট করে স্বীকার করানোতে ও তাদের এর কার্যসাধক ভৃত্য বা কার্যসাধিকা শক্তি হবার শিক্ষা

দিতে আর আমাদের বাধ্যবাধকতা থাকে না। তখন তাদের বিনাশ বা উপশম সাধনই যথেষ্ট, অথবা বড় জোর একদিকে শরীর ধারণের জন্য ও অন্যদিকে ভগবানের সঙ্গে সংযোগ রাখার জন্য যে অল্প কটি শক্তির প্রয়োজন, মাত্র সেইগুলিকে রক্ষা করা চলে।

কিন্তু পূর্ণযোগের যে লক্ষ্য ও ভাবনা তাতে এই সরল ও কষ্টকর উঁচু সুরে বাঁধা প্রণালী অবলম্বন করা যায় না। আমাদের আশা অখণ্ড রূপান্তর, সুতরাং সংক্ষিপ্ত পথ বেছে নেওয়া বা আমাদের সব প্রতিবন্ধকের বোঝা ফেলে দিয়ে দ্রুত যাত্রার সুবিধা করার জন্য নিজেদের লঘু করা আমাদের চলে না। কারণ আমাদের যাত্রার উদ্দেশ্য, — ভগবানের জন্য নিজেদের ও জগৎকে সর্বতোভাবে জয় করা। কেবলমাত্র দূরবর্তী স্বর্গে সুদূর গূঢ় ভগবৎসত্তার কাছে শুদ্ধ ও নগ্ন চিৎপুরুষকে রিক্ত নৈবেদ্যরূপে অর্পণ করা বা নিশ্চল পরমার্থসৎ-এর কাছে আহুতিতে নিঃশেষে বিলোপ করা আমাদের লক্ষ্য নয়। সম্ভূতি ও সত্তা — উভয়ই তাঁকে দান করতে আমরা কৃতসঙ্কল্প। যে ভগবানের আমরা উপাসনা করি তিনি শুধু বিশ্বের বাইরে সুদূর কোন সদ্‌বস্তু নন, তিনি অর্ধপ্রচ্ছন্ন অভিব্যক্তিরূপে এখানে, এই বিশ্বে আমাদের কাছেই সমুপস্থিত। যে দিব্য অভিব্যক্তি এখনও অসম্পূর্ণ তারই ক্ষেত্র এই জীবন। দরকার এখানে, এই জীবনে, পৃথিবীতে, এই শরীরে, উপনিষদ যেমন জোর দিয়ে বলে, "ইহৈব" — ভগবানকে প্রকট করা। তাঁর বিশ্বোত্তীর্ণ মহত্ত্ব, জ্যোতি ও মাধুর্যকে এখানে, আমাদের চেতনায় বাস্তব করতে হবে আর তা অধিগত করে যতদূর সম্ভব বহিঃপ্রকাশ করতে হবে এখানেই। সুতরাং আমাদের যোগে আমরা জীবনকে স্বীকার করি তার পূর্ণ রূপান্তর সাধনের জন্য; এই স্বীকৃতির দরুন আমাদের সংগ্রামে যে নতুন বাধা আসবে সে সব এড়িয়ে চলা আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। এর বিনিময়ে আমরা এই পারিতোষিক পাব যে যদিও পথ অধিকতর বন্ধুর, প্রচেষ্টা আরো জটিল ও অতীব শ্রমসাধ্য, তথাপি কিছুদূর অগ্রসর হবার পর আমাদের লাভও হয় প্রচুর। কারণ একবার আমাদের মন কেন্দ্রীয় দর্শনে সঙ্গত ভাবে নিবদ্ধ হলে এবং আমাদের সঙ্কল্প মোটের উপর একটি মাত্র সাধ্যের সাধনায় পরিবর্তিত হলে জীবন আমাদের সহায় হয়ে দাঁড়ায়। দৃঢ়চিত্ত, সতর্ক ও অখণ্ডভাবে সচেতন হয়ে আমরা জীবনের বিভিন্ন রূপের প্রতি খুঁটিনাটিকে, তার গতিবৃত্তির প্রতি ঘটনাকে গ্রহণ করতে সমর্থ হই আমাদের অন্তঃস্থ যজ্ঞাগ্নির সমিধরূপে। সংগ্রামে বিজয়ী হয়ে আমরা স্বয়ং পৃথিবীকে বাধ্য করতে পারি আমাদের সিদ্ধির পথে সহায় হতে, এবং আমাদের বিরোধী সব শক্তির ঐশ্বর্য ছিনিয়ে নিয়ে সমৃদ্ধ করতে পারি আমাদের উপলব্ধিকে।

যোগের সাধারণ অনুশীলনে আর একটি দিক আছে যাতে পথটিকে সরল করে নেওয়া হয়, এতে সুবিধা আছে কিন্তু এই পথ সঙ্কীর্ণ আর অখণ্ড লক্ষ্যের সাধকের পক্ষে তা স্বীকার করা চলে না। যোগ অনুশীলনের ফলে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়

আমাদের নিজ সত্তার অসাধারণ জটিলতা, আমাদের ব্যক্তিভাবনার উদ্দীপক অথচ বিব্রতকারী বহুত্ব ও প্রকৃতির বিচিত্র অন্তহীন বিশৃঙ্খলা। সাধারণ মানুষের জীবন তার জাগ্রত উপরভাসা চেতনার মধ্যেই নিবদ্ধ, আবরণের পশ্চাতে আত্মার গভীর ও বিস্তৃত সব স্তর সম্বন্ধে সে অজ্ঞ; এরূপ লোকের মনস্তাত্ত্বিক জীবন বেশ সরল। অল্পসংখ্যক তবে অশান্ত কিছু কামনা, বুদ্ধিগত সৌন্দর্যবোধের কিছু আকাঙ্ক্ষা, ও কিছু রুচি, অসম্বন্ধ বা মন্দসম্বন্ধ ও বহুলপরিমাণে তুচ্ছ মননের মহাস্রোতের মাঝে অল্প কিছু নিয়ামক বা প্রধান ভাবনা, প্রাণের কতকগুলি অল্পবিস্তর অবশ্যপালনীয় দাবী, শারীরিক স্বাস্থ্য ও পীড়ার পালাপরিবর্তন, বিক্ষিপ্ত ও নিষ্ফল সুখদুঃখের ক্রমান্বয়, মন বা দেহের পুনঃপুনঃ কতকগুলি ছোটখাট বিক্ষোভ ও বিপর্যয়ের ঘটনা, আর কদাচ কখন উঁচু ধরনের অন্বেষণ ও উৎক্ষেপের আবির্ভাব, আর এই সবের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি কিছুটা মনন ও সঙ্কল্পের সাহায্যে, কিছুটা তাদের বিনা সাহায্যেই বা তাদের অগ্রাহ্য করে যে মোটামুটি কাজচলা ব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলায় ভরা মাঝামাঝি এক প্রকার শৃঙ্খলা আনে — তাই তার জীবনের উপাদান। অতীত কালের আদিম মানুষ তার বাহ্য জীবনে যেমন অসংস্কৃত ও অনুন্নত ছিল, আজকের দিনেও সাধারণ মানুষ তার আন্তর জীবনে তেমন অসংস্কৃত ও অনুন্নত। কিন্তু যখনই আমরা আমাদের অন্তরের গহন পুরে যাই — আর যোগের অর্থ অন্তঃপুরুষের বিচিত্র গভীরতার মধ্যে ঝাঁপ দেওয়া — তখনই আমরা প্রত্যক্‌বৃত্তভাবে (Subjectively) দেখি, যেমন মানুষ তার বিকাশের সময় পরাক্‌-বৃত্তভাবে (Objectively)দেখেছিল, যে আমাদের চারিদিকে ঘিরে আছে এক জটিল জগৎ; আর একেই আমাদের জানা ও জয় করা কর্তব্য।

আর সবচেয়ে অস্বস্তিকর আবিষ্কার এই যে আমরা দেখি যে আমাদের প্রতি অংশের — বুদ্ধি, সঙ্কল্প, ইন্দ্রিয়মানস, স্নায়বিক বা কামনাময় আত্মা, হৃদয়, দেহ — সবেরই যেন অন্যদের থেকে পৃথক নিজস্ব জটিল ব্যষ্টিত্ব ও স্বাভাবিক গঠন আছে; নিজের মধ্যেই প্রতিটির বৈষম্য, অপরের সঙ্গেও বৈষম্য, আমাদের বাহ্য অবিদ্যার উপর কোন কেন্দ্রীয় ও কেন্দ্রস্থকারী আত্মার ছায়াস্বরূপ যে প্রতিভূ অহং তারও সঙ্গে প্রত্যেকের বৈষম্য। আমরা দেখি যে আমাদের ব্যক্তিত্ব একটি নয়, অনেকগুলি, আর প্রত্যেকেরই আছে নিজস্ব দাবী ও ভিন্ন প্রকৃতি। আমাদের সত্তা এক স্থূল গঠনের বিশৃঙ্খলা যার মধ্যে দিব্য শৃঙ্খলার তত্ত্ব আনা আমাদের কর্তব্য। অধিকন্তু আমরা দেখি যে বাইরের মত অন্তরেও আমরা একা নই; আমাদের অহং-এর তীক্ষ্ণ বিচ্ছিন্নতাবোধ এক প্রবল আরোপ ও ভ্রান্তি বৈ আর কিছু নয়; আমরা আপনাতে আপনি বাস করি না, বস্তুতঃ আমরা যে আন্তর গোপনীয়তা বা নির্জনতার মধ্যে আলাদা থাকি তা নয়। আমাদের মন গ্রহণ, উন্নত ও পরিবর্তন করার এমন এক যন্ত্র যার মধ্যে নিরন্তর ক্ষণে ক্ষণে আসে এক অবিরাম বাহ্য প্রবাহ, বিসদৃশ উপাদানরাশির এক স্রোত, আর তা আসে ঊর্ধ্ব থেকে, নিম্ন থেকে, বাইরে থেকে। আমাদের মনন ও বেদনার (feeling) অর্ধেকেরও বেশী যে আমাদের নয় তা এই অর্থে যে তারা আমাদের বাইরেই রূপ গ্রহণ করে; বলতে গেলে

প্রায় এমন কিছুই নেই যা আমাদের প্রকৃতির সত্যকার আদি বস্তু। এক বড় অংশ আসে অন্যদের কাছ থেকে বা পরিবেশ থেকে, হয় কাঁচা মাল হিসেবে, নয় তৈরী করা আমদানী জিনিস হিসেবে; কিন্তু আরো বেশী আসে এখানকার বিশ্বপ্রকৃতি থেকে বা অন্যান্য জগৎ ও লোক এবং তাদের সত্তা ও শক্তি ও প্রভাব থেকে; কারণ আমাদের উর্ধ্বে ও চারিদিকে ঘিরে আছে চেতনার অন্যান্য লোক — মনোলোক, প্রাণলোক, সূক্ষ্ম জড়লোক; এসব থেকেই আমাদের এখানকার জীবন ও ক্রিয়া খাদ্য পায় ও তাদের খাদ্য যোগায় আর এইসব লোক তাদের রূপ ও শক্তির অভিব্যক্তির জন্য এখানকার জীবন ও ক্রিয়ার উপর চাপ দেয়, প্রভাব বিস্তার করে ও কাজে লাগায়। এই জটিলতার দরুন ও বিশ্বের অন্তঃপ্রবহমান শক্তিসমূহের নিকট নানাভাবে উন্মুক্ত ও অধীন হওয়ার দরুন আমাদের একা একা পরিত্রাণ পাওয়া অত্যন্ত বেশী দুরূহ হয়ে পড়ে। এই সবকিছুকে আমাদের হিসেবের মধ্যে ধরতে হবে ও তাদের নিয়ে কাজ করতে হবে; এবং জানতে হবে আমাদের প্রকৃতির গূঢ় মূল উপাদান কি এবং কি তার উপাদানজনিত ও উৎপন্ন গতি; আর এই সবের মধ্যে সৃজন করা চাই এক দিব্য কেন্দ্র এবং সত্যকার সৌষম্য ও জ্যোতির্ময় শৃঙ্খলা।

যোগের সাধারণ পন্থাগুলিতে এইসব বৈষম্যপূর্ণ উপাদান সম্বন্ধে সরল ও সরাসরি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। আমাদের অন্তঃস্থ প্রধান মনস্তাত্ত্বিক শক্তির মধ্যে যে কোন একটিকে বেছে নেওয়া হয় ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় হিসেবে, বাকী সব শক্তিকে হয় শান্ত করে নিঃসাড় করা হয়, নয় অভুক্ত রাখা হয় তাদের ক্ষুদ্রতার মধ্যে। ভক্ত আশ্রয় নেয় তার সত্তার ভাবাবেগপ্রধান শক্তিসমূহের ও হৃদয়ের বিভিন্ন তীব্র কর্মের এবং এদের সাহায্যে ভগবৎপ্রেমে একাগ্রচিত্ত হয়ে সে বাস করে, সমাহিত হয়ে থাকে যেন অগ্নির একটি মাত্র একমুখী জিহ্বার মাঝে। মননের ক্রিয়া সম্বন্ধে সে উদাসীন, যুক্তির নির্বন্ধকে সে পিছনে ফেলে, মনের জ্ঞানতৃষ্ণা তার কাছে মূল্যহীন। যেটুকু জ্ঞান তার প্রয়োজন তা হল তার বিশ্বাস ও ভগবানের সঙ্গে সংযুক্ত হৃদয় থেকে উৎসারিত চিদাবেশ। যে সব কাজ পরম প্রেমাস্পদের সাক্ষাৎ পূজায় বা দেবমন্দিরের সেবায় লাগে না সে সবের এষণা তার কাছে নিষ্প্রয়োজন। জ্ঞানী স্বেচ্ছায় নিজেকে আবদ্ধ করে বিচারশীল মনের সব শক্তি ও ক্রিয়ার মধ্যে, মুক্তির সন্ধান পায় মনের আন্তর-বৃত্ত প্রচেষ্টায়। সে আত্মার ভাবনায় একাগ্রচিত্ত হয়ে সূক্ষ্ম আন্তর বিচার শক্তির সাহায্যে প্রকৃতির আবরণকারী নানাবিধ কর্মের মাঝে আত্মার নীরব উপস্থিতি পৃথক করতে সমর্থ হয় এবং প্রত্যয়জ ভাবনার মাধ্যমে উপনীত হয় বাস্তব অধ্যাত্ম অনুভূতিতে। ভাবাবেগের ঘাতপ্রতিঘাতে সে উদাসীন, বুভুক্ষু মনোবেগের আহ্বানে সে বধির, প্রাণের সব কর্মে সে নিস্পৃহ; যতশীঘ্র এসব তার মধ্য থেকে খসে যায়, এবং সে মুক্ত, শান্ত ও নীরব এবং চিরন্তন অকর্তা হয় ততই তার মঙ্গল। দেহ তার পথের অন্তরায়, প্রাণিক বৃত্তি তার শত্রু; তাদের দাবী সর্বনিম্ন সীমায় কমাতে পারাই তার মহা সৌভাগ্য। পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে যে সব অগণিত বাধা আসে তাদের সে প্রতিহত করে তাদের বিরুদ্ধে বাহ্য ভৌতিক ও আন্তর

আধ্যাত্মিক নিঃসঙ্গতার দৃঢ় প্রাকার তুলে; আন্তর নীরবতার নিরাপদ দেওয়ালের পশ্চাতে সে থাকে নির্বিকার; জগৎ ও অপর কেউ তাকে স্পর্শ করে না। এইসব যোগের প্রবণতা হল নিজে নিজেই একলা থাকা, বা ভগবানের সঙ্গে একলা থাকা, ভগবান ও তাঁর ভক্তের সঙ্গে একান্তে বিচরণ করা, মনের অনন্য আত্মমুখী প্রচেষ্টার মধ্যে বা হৃদয়ের ভগবন্মুখী প্রবল ভাবের মধ্যে নিবদ্ধ থাকা। একমাত্র নির্বাচিত প্রবর্তক শক্তির পিছনে যে একমাত্র কেন্দ্রীয় বাধা থাকে তা ছাড়া বাকী সবকিছু কেটে বাদ দিয়েই সমস্যার সমাধান করা হয়; আমাদের প্রকৃতির বিভিন্ন বৈষম্যপূর্ণ দাবীর মাঝে আত্যন্তিক একাগ্রতার তত্ত্ব হয় আমাদের পরিত্রাণের পরম সহায়।

কিন্তু পূর্ণযোগের সাধকের পথে এই আন্তর বা বাহ্য নিঃসঙ্গতা তার অধ্যাত্ম অগ্রগতির পথে শুধু হতে পারে সাময়িক ঘটনা বা অবস্থা। জীবনকে স্বীকার করার দরুন তাকে শুধু তার নিজের বোঝা বইতে হয় না, তার সঙ্গে জগতের বোঝারও এক বৃহৎ অংশ বইতে হয়; তার নিজের বোঝাই যথেষ্ট ভারী, এটি তার সাথে অতিরিক্ত কিছু ভার। সুতরাং অন্যান্যদের যোগের চেয়ে তার যোগের প্রকৃতি অনেক পরিমাণে এক সংগ্রাম বিশেষ, আর এই সংগ্রাম শুধু ব্যক্তিগত সংগ্রাম নয়, এ হল এক বিস্তৃত ক্ষেত্রব্যাপী সমষ্টি সংগ্রাম। তাকে যে শুধু তার নিজের মধ্যে অহমাত্মক মিথ্যা ও বিশৃঙ্খলার সব শক্তিকে জয় করতে হবে তা নয়, এই সবকে তার জয় করতে হবে জগতের মধ্যে সেইসব বিরুদ্ধ ও অফুরন্ত শক্তির প্রতিভূ হিসেবে। প্রতিনিধি স্থানীয় হওয়ায় তাদের বাধাদানের সামর্থ্য অনেক বেশী দৃঢ়, পুনঃপুনঃ আক্রমণের অধিকার একরকম অসীম। প্রায়শঃই সে দেখে যে অধ্যবসায় সহকারে তার নিজের ব্যক্তিগত যুদ্ধ জেতার পরও, তাকে তা জয় করতে হয় বারবার, এ যুদ্ধের যেন শেষ নেই, কারণ তার আন্তরজীবন ইতিমধ্যে এত প্রসারিত হয়েছে যে তার মধ্যে শুধু যে তার নিজের সত্তা ও তার সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন ও অনুভূতি থাকে তা নয়, অপর সকলের সত্তারও সঙ্গে সে দৃঢ়ভাবে জড়িত কারণ তার নিজের মধ্যেই আছে সমগ্র বিশ্ব।

আবার, অখণ্ড সার্থকতার সাধককে তার নিজের বিভিন্ন আন্তর অঙ্গের বিরোধও যথেচ্ছভাবে সমাধান করতে দেওয়া হয় না। মননশীল জ্ঞানের সঙ্গে সংশয়হীন বিশ্বাসের সামঞ্জস্য বিধান করা তার চাই; চাই প্রেমের কোমল অন্তঃপুরুষের সঙ্গে শক্তির দুর্ধর্ষ প্রয়োজনের সন্ধি; আর দরকার বিশ্বাতীত শান্তির মধ্যে নিশ্চিন্ত অন্তঃপুরুষের নিষ্ক্রিয়তার সঙ্গে দিব্যসহায়ক ও দিব্যযোদ্ধার সক্রিয়তার সম্মিলন। সকল চিৎপুরুষ-সাধকের মত তার কাছেও সমাধানের জন্য দেওয়া হয় যুক্তিবুদ্ধির সব বিরোধিতা, ইন্দ্রিয়সমূহের দৃঢ় আসক্তি, হৃদয়ের বিক্ষোভ, কামনার গোপন আক্রমণ ও দেহের প্রতিবন্ধক; কিন্তু এইসব পরস্পর বিরোধী আন্তরবৃত্তির সঙ্গে ও তার লক্ষ্যের পথে তাদের বাধার সঙ্গে তার মোকাবিলা করা চাই অন্যভাবে, কেননা এইসব বিদ্রোহী বস্তুর সঙ্গে কারবারে অনন্তগুণ দুরূহ সিদ্ধিলাভ করা তার প্রয়োজন। এসবকে দিব্য উপলব্ধি ও অভিব্যক্তির কারণস্বরূপ স্বীকার করার পর তার কর্তব্য হল তাদের কর্কশ বিরোধের পরিবর্তনসাধন, তাদের ঘন

অন্ধকারের উদ্ভাসন, তাদের নিজেদের মধ্যে ও পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্য এনে তাদের পৃথকভাবে ও সর্বসমেত রূপান্তর সাধন; আর একাজ করতে হবে সর্বাঙ্গীণভাবে যাতে কোন একটি ক্ষুদ্রকণা বা সূত্র বা স্পন্দন বাদ না যায়, যেন কোথাও অসম্পূর্ণতার লেশমাত্রও না থাকে। তার জটিল কর্মে সে অবলম্বন করতে পারে একটি বিষয়ে অনন্য একাগ্রতা বা পর পর এক এক বিষয়ে ঐরকম একাগ্রতা, কিন্তু তা শুধু সাময়িক সুবিধার জন্য; কিন্তু এর কার্যকারিতা শেষ হওয়ামাত্রই একে পরিত্যাগ করা চাই। যে দুরূহ কর্মের জন্য তার চেষ্টা করা চাই তা হল এক সর্বগ্রাহী একাগ্রতা।

যে কোন যোগের প্রথম সর্তই হল একাগ্রতা কিন্তু পূর্ণযোগের বিশিষ্ট প্রকৃতি হল সর্বগ্রাহী একাগ্রতাসাধন। অবশ্য এখানেও একটিমাত্র ভাবনা, বিষয়, অবস্থা, আন্তরগতি বা তত্ত্বের প্রতি মনন বা ভাবাবেগ বা সঙ্কল্পের পৃথক দৃঢ় অভিনিবেশ প্রায়ই আবশ্যক হয়, কিন্তু সে অভিনিবেশ এক গৌণ সহায় মাত্র। এই যোগের বৃহত্তর ক্রিয়া হল, যিনি পরম এক অথচ সর্ব তাঁর দিকে বিস্তৃতভাবে সবকিছুর উন্মুক্ততা, সমগ্র সত্তার সকল অংশে, সকল শক্তির মধ্য দিয়ে তাঁতেই সুসমঞ্জস একাগ্রতা। এটি ছাড়া এই যোগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে না। কারণ যে চেতনালাভ আমাদের আস্পৃহা তা পরম একে স্থিত হয়ে পরম সর্বে সক্রিয়; এই চেতনাকেই আমাদের সত্তার প্রতি উপাদানে, আমাদের প্রকৃতির প্রতি গতিতে প্রতিষ্ঠিত করা আমাদের ব্রত। এই বিস্তৃত ও একাগ্র সমগ্রতাই সাধনার মূল স্বভাব আর এই স্বভাবের দ্বারাই এর অনুশীলন নির্ধারিত হবে।

কিন্তু যদিও এ যোগের স্বরূপ ভগবানেই আমাদের সমগ্র সত্তার একাগ্রতাসাধন, তা হলেও আমাদের সত্তা এত জটিল যে, যেমন গোটা পৃথিবীকে দুই হাতে নেওয়া অসম্ভব, তেমন একেও সহজেই এক সঙ্গে নিয়ে এর সমস্ত কিছুকে পুরোপুরি একটি কাজে লাগান অসম্ভব। স্বোত্তরণের সাধনায় মানবকে সাধারণতঃ জটিল যন্ত্রস্বরূপ তার প্রকৃতির কোন স্প্রিং (spring) বা শক্তিশালী উত্তোলন দণ্ডের (leverage) আশ্রয় নিতে হয়। অন্য অনেকগুলির মধ্য থেকে সে যে স্প্রিং বা উত্তোলন দণ্ড বেছে নেয় তাকেই সে তার উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কাজে লাগায় যন্ত্রটিকে চালাবার জন্য। এই নির্বাচনে প্রকৃতিই সর্বদা তার দিশারী হওয়া উচিত। তবে এক্ষেত্রে তা হবে তার অন্তঃস্থ উচ্চতম ও প্রশস্ততম প্রকৃতি, প্রকৃতির নিম্নতম পর্যায় বা সীমিত কোন ক্রিয়াতে আবদ্ধ প্রকৃতি নয়। অবর প্রাণিক কর্মে প্রকৃতি যে সবচেয়ে শক্তিশালী উত্তোলন দণ্ড ব্যবহার করে তা হল কামনা; কিন্তু মানুষের বিশিষ্ট স্বভাব এই যে সে মনোময় পুরুষ, শুধু প্রাণময় জীব নয়। তার প্রাণের বিভিন্ন সংবেগকে সংযত ও সংশোধন করার জন্য যেমন সে তার চিন্তক মন ও সঙ্কল্প প্রয়োগ করতে পারে, তেমনই সে নিজের মধ্যে আনতে পারে আরো জ্যোতির্ময় মানসিক ক্রিয়া ও তার সাথে তার অন্তরতর অন্তঃপুরুষের, চৈত্যপুরুষের

সহায় এবং এইসব মহত্তর ও শুদ্ধতর প্রবর্তকশক্তির দ্বারা সে দূর করতে সমর্থ হয় কামনা নামে অভিহিত প্রাণিক ও ইন্দ্রিয়বোধজশক্তির প্রবল প্রভাব। মানুষ কামনাকে সম্পূর্ণ জয় ক'রে বা তাকে রাজী করিয়ে রূপান্তরের জন্য একে নিবেদন করতে পারে এর দিব্য প্রভুর নিকট। ভগবান যে দুটি আকর্ষক যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের প্রকৃতিকে করায়ত্ত করতে পারেন তা হল মানুষের এই উত্তর মানসিকতা ও তার অন্তরতর অন্তঃপুরুষ অর্থাৎ তার চৈত্যসত্তা।

মানুষের উত্তরমানস এমন কিছু যা তার যুক্তি-বুদ্ধি অর্থাৎ তর্ক-বুদ্ধি নয়, তার অপেক্ষা আরো উন্নত, শুদ্ধ, বিশাল ও শক্তিশালী কিছু। পশু এক প্রাণময় ও ইন্দ্রিয়গত সত্তা। বলা হয় যে পশু থেকে মানুষের পার্থক্য এই যে মানুষের যুক্তিবুদ্ধি আছে। কিন্তু এ তো বিষয়কে খুব ছোট ক'রে বলা আর তাও অতি অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্তভাবে বলা। কারণ যুক্তিবুদ্ধি এক বিশেষ ও সীমাবদ্ধ কার্যসাধক যান্ত্রিক কর্মশক্তি মাত্র যার উৎস তার চেয়ে অনেক মহত্তর কিছু, এমন এক শক্তি যার বাস আরো জ্যোতির্ময়, বিশাল ও অসীম ব্যোমে। আমাদের যে বুদ্ধি পর্যবেক্ষণ করে, যুক্তিতর্ক, অনুসন্ধান ও সিদ্ধান্ত করে তার অব্যবহিত বা মধ্যবর্তী গুরুত্ব অপেক্ষা যথার্থ ও চরম গুরুত্ব এই যে তা মানুষকে প্রস্তুত করে ঊর্ধ্ব থেকে আসা জ্যোতির যথাযথ গ্রহণ ও যথাযথ ক্রিয়ার জন্য; নিম্ন থেকে আসা যে অস্পষ্ট আলো পশুকে চালনা করে তার স্থান উত্তরোত্তর অধিকার করে এই ঊর্ধ্বের জ্যোতি। পশুরও প্রাথমিক যুক্তি, এক প্রকার মনন, অন্তঃপুরুষ, সঙ্কল্প ও তীক্ষ্ণ ভাবাবেগ থাকে, মানুষের মতোই তার মনস্তত্ত্ব, যদিও তা কম পরিণত। কিন্তু পশুর এই সব শক্তির কাজ চলে আপনা-আপনি, তারা কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ, এমনকি প্রায় সব কিছুই নিম্ন স্নায়বিক সত্তা দ্বারা গঠিত। পশুর সকল প্রত্যয়, ইন্দ্রিয়ানুভূতি, কাজকর্ম চালিত হয় স্নায়বিক ও প্রাণিক সব সংস্কার, আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজন ও তৃপ্তির দ্বারা, যেগুলি প্রাণের সংবেগ ও কামনার দ্বারা যুক্ত থাকে। প্রাণিক প্রকৃতির এই স্বয়ংক্রিয়ার মধ্যে মানুষও বদ্ধ তবে পশুর চেয়ে কম। মানুষ তার আত্মবিকাশের দুরূহ কাজে প্রয়োগ করতে পারে প্রদীপ্ত সঙ্কল্প, প্রদীপ্ত মনন ও প্রদীপ্ত ভাবাবেগ; কামনার অবর ব্যাপারকে সে উত্তরোত্তর এই সব অধিকতর সচেতন ও বিচারশীল দিশারীর অধীনে আনতে সমর্থ হয়। যে পরিমাণে সে এই ভাবে তার অবর আত্মাকে বশীভূত ও প্রদীপ্ত করতে সমর্থ হয়, সেই পরিমাণে সে মানুষ, আর পশু নয়। যখন সে কামনাকে সরিয়ে তার স্থলে আনতে শুরু করে মহত্তর মনন ও দৃষ্টি ও সঙ্কল্প যা অনন্তের সঙ্গে যুক্ত, সচেতনভাবে নিজের সঙ্কল্প অপেক্ষা দিব্যতর সঙ্কল্পের অধীন ও আরো বিশ্বজনীন ও বিশ্বাতীত জ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তখন অতিমানবের পানে তার উদয়ন আরম্ভ হয়েছে, ভগবানের দিকে উত্তরায়ণের যাত্রী সে।

সুতরাং প্রথম দরকার হল আমাদের চেতনাকে কেন্দ্রীভূত করা মনন ও জ্যোতি ও সঙ্কল্পের উত্তম মনে বা গভীরতম বেদনা ও ভাবাবেগের অন্তর্হৃদয়ে — যে কোন একটিতে বা সমর্থ হলে উভয়েই একত্রে — এবং তা ব্যবহার করা আমাদের উত্তোলন

দণ্ড হিসেবে ভগবানের দিকে আমাদের প্রকৃতিকে পুরাপুরি তোলার উদ্দেশ্যে। আমাদের জ্ঞানের এক বিরাট লক্ষ্যের পানে, আমাদের ক্রিয়ার এক জ্যোতির্ময় অনন্ত উৎসের অভিমুখে, আমাদের ভাবাবেগের এক অবিনশ্বর বিষয়ের দিকে প্রদীপ্ত মনন, সঙ্কল্প ও হৃদয়ের মিলিত একাগ্রতা নিবদ্ধ হওয়াই এই যোগের যাত্রারম্ভ। আর আমাদের উদ্দিষ্ট হবে যে পরম জ্যোতি আমাদের অন্তরে বৃদ্ধি পাচ্ছে তারই উৎস, যে পরমাশক্তিকে আমরা আবাহন করি আমাদের বিভিন্ন অঙ্গের চালনার জন্য তারই মূল, অন্য কিছু নয়। আমাদের এক মাত্র উদ্দেশ্য হল স্বয়ং ভগবান, যাঁর প্রতি জ্ঞাতসারেই হ'ক বা অজ্ঞাতসারেই হ'ক, আমাদের গূঢ় প্রকৃতির মধ্যস্থিত কোন কিছুর আস্পৃহা নিরন্তর বর্তমান। অদ্বিতীয় ভগবানের ভাবনা, অনুভব, দর্শন, উদ্বোধক স্পর্শ, অন্তঃপুরুষের উপলব্ধি — এসবের মননের উপর বৃহৎ, বহুমুখী অথচ অনন্য একাগ্রতা আবশ্যক। আবশ্যক পরম সর্ব ও সনাতনের প্রতি হৃদয়ে জ্বলন্ত একাগ্রতা, আর একবার তাঁর দেখা পেলে, পরম সর্ব-সুন্দরের আবেশ ও উল্লাসের মধ্যে গভীর অবগাহন ও নিমজ্জন। আর আবশ্যক ভগবান যা কিছু সব তা পাওয়ার ও সার্থক করার জন্য সঙ্কল্পের প্রবল ও অবিচলিত একাগ্রতা এবং আমাদের মধ্যে যা ব্যক্ত করা তাঁর অভিপ্রায় সে সবের দিকে হৃদয়ের স্বচ্ছন্দ ও নমনীয় উন্মীলন। এই হল যোগের ত্রিমার্গ।

কিন্তু যা আমরা এখনও জানি না তাতে আমরা একাগ্র হব কিভাবে? আবার ভগবানের উপর আমাদের সত্তার একাগ্রতা সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে জানাও সম্ভব নয়। যোগে জ্ঞান এবং জ্ঞানের সাধনা বলতে আমরা বুঝি এমন একাগ্রতা যার পরিণতি হল আমাদের মধ্যে ও আমরা যা কিছু জানি সে সবের মধ্যে পরম একের উপস্থিতির জীবন্ত উপলব্ধি ও নিত্য বোধ। শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠের সাহায্যে বা দার্শনিক যুক্তিবিচারের প্রভাবে ভগবানের বুদ্ধিগত ধারণা পাবার জন্য আত্মনিয়োগ করাই যথেষ্ট নয়; কেননা আমাদের দীর্ঘ মানসিক পরিশ্রমের পর, সনাতন সম্বন্ধে যাসব বলা হয়েছে সেসবই জানতে পারি, অনন্ত সম্বন্ধে যা কিছু চিন্তা করা যায় তা পেতে পারি, কিন্তু তবু তিনি থেকে যেতে পারেন একেবারেই অজানা। বস্তুতঃ শক্তিশালী যোগে এই বুদ্ধিগত প্রস্তুতি প্রথম পর্যায় হতে পারে, কিন্তু এটি অপরিহার্য নয়; সকলের পক্ষেই যে এ-ধাপের প্রয়োজন আছে তা নয়, বা সকলকেই এটি নিতে বলা যায় না। কল্পনাশ্রয়ী বা প্রণিধানপর যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা জ্ঞানে যে বুদ্ধিগত মূর্তি পাওয়া যায় তা-ই যদি যোগের অপরিহার্য সর্ত বা অবশ্যকরণীয় প্রাথমিক বিধান হয় তাহলে খুবই কম লোক ছাড়া, মানুষের পক্ষে যোগসাধন অসম্ভব হ'ত। ঊর্ধ্ব থেকে জ্যোতি তার কাজ আরম্ভ করার জন্য আমাদের কাছ থেকে যা চায় তা হল অন্তঃপুরুষের আহ্বান ও মনের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে তার সমর্থন। এই সমর্থন পাবার উপায় মননে ভগবানের আগ্রহ ভাবনা, স্ফুরন্ত

সব অংশে অনুরূপ সঙ্কল্প, হৃদয়ে আস্পৃহা, বিশ্বাস ও প্রয়োজনবোধ। যদি এই সব মিলিতভাবে বা সমছন্দে না আসে তাহলেও যে কোন একটি পুরোবর্তী বা প্রধান হতে পারে। ভাবনা অপ্রচুর হতে পারে, আর প্রারম্ভে তা হবেই; আস্পৃহা হতে পারে সঙ্কীর্ণ ও অপূর্ণ, বিশ্বাস মন্দদীপ্ত বা এমনকি জ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তির উপর তা প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় তা হতে পারে চঞ্চল ও অনিশ্চিত, সহজেই তা হ্রাস পায়, প্রায়শঃ তা নিভেও যেতে পারে এবং ঝটিকাসঙ্কুল গিরিপথের মাঝে মশালের মত তাকে কষ্ট করে আবার জ্বালাতে হয়। কিন্তু একবার যদি অন্তরের গহন থেকে দৃঢ় আত্মোৎসর্গ করা হয়, যদি অন্তঃপুরুষের আহ্বানে জাগরণ হয়ে থাকে তাহলে এইসব অপ্রচুর বিষয়ও দিব্য উদ্দেশ্যের জন্য উপযোগী যন্ত্র হতে পারে। সেজন্য ভগবানের দিকে যাবার বিভিন্ন পথের সঙ্কোচ করতে জ্ঞানীরা সর্বদাই অনিচ্ছুক। সঙ্কীর্ণতম দ্বার বা সবচেয়ে নীচু ও অন্ধকারময় পিছনের দরজা বা ক্ষুদ্রতম ফটক দিয়েও প্রবেশ তাঁরা বন্ধ করে দিতে চান না। যে কোন নাম, যে কোন রূপ, যে কোন প্রতীক, যে কোন অর্ঘ্যকে যথেষ্ট গণ্য করা হয় যদি তার সাথে থাকে উৎসর্গ; কারণ ব্রতীর হৃদয়ে ভগবান নিজেকে জানতে পারেন এবং যজ্ঞ গ্রহণ করেন।

কিন্তু তবু উৎসর্গের পশ্চাতে চালিকা ভাবনা-শক্তি যতই মহত্তর ও প্রশস্ততর হবে, ততই সাধকের পক্ষে মঙ্গল, ততই তার প্রাপ্তি আরো পূর্ণ ও সমৃদ্ধ হবার সম্ভাবনা। যদি পূর্ণযোগের সাধনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য হয় তাহলে ভগবানের যে ভাবনা অখণ্ড ও পূর্ণতা তা নিয়েই আরম্ভ করা ভাল। হৃদয়ের আস্পৃহা হওয়া চাই যথেষ্ট ব্যাপ্ত যাতে সর্বপ্রকার সীমাবর্জিত উপলব্ধি সম্ভব। শুধু যে আমাদের সম্প্রদায়গত ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করা উচিত তা নয়, যে সকল একদেশী দার্শনিক ভাবনায় অনির্বচনীয়কে সঙ্কীর্ণ মানসিক সূত্রের মধ্যে আবদ্ধ করার চেষ্টা হয় সে সবও আমাদের ত্যাগ করা কর্তব্য। যে স্ফুরন্ত ভাবনা বা প্রেরণাদায়ক বোধ নিয়ে আমাদের যোগ সর্বোত্তমভাবে আরম্ভ করা যেতে পারে তা স্বভাবতঃই হবে এক চিন্ময় সর্বগ্রাহী কিন্তু সর্বাতিগ অনন্তের ভাবনা ও বোধ। আমাদের উর্ধ্বদৃষ্টি নিবদ্ধ করা চাই মুক্ত, সর্বশক্তিমান, পরিপূর্ণ ও আনন্দময় পরম এক ও একত্বে যাঁর মধ্যে সকল সত্তারই বাস ও বিচরণ এবং যাঁর মধ্য দিয়ে সকলেই মিলিত হয়ে এক হতে সমর্থ। এই সনাতন সত্তার আত্মপ্রকাশে ও অন্তঃপুরুষের উপর তাঁর স্পর্শে তিনি হবেন যুগপৎ পুরুষবিধ ও নৈর্ব্যক্তিক। তিনি পুরুষবিধ কেননা তিনি সেই চিন্ময় ভগবান অনন্ত পরম পুরুষ যাঁর নিজের ভগ্ন প্রতিফলন নিক্ষিপ্ত হয় বিশ্বের অসংখ্য দিব্য ও অদিব্য ব্যক্তিসত্ত্বের মধ্যে। তিনি নৈর্ব্যক্তিক, কেননা তিনি আমাদের কাছে প্রতীয়মান হন অনন্ত সৎ, চিৎ ও আনন্দরূপে এবং আরো এই কারণে যে তিনি সকল অস্তিত্ব ও শক্তির উৎস, ভিত্তি ও উপাদান, আমাদের সত্তা ও মন প্রাণ ও দেহের উপাদান তিনিই এবং তিনি আমাদের চিৎপুরুষ ও জড়তত্ত্ব। মনন তাঁতে একাগ্র হয়ে শুধু যে বুদ্ধিগতভাবে এই মাত্র বুঝবে যে তিনি আছেন বা শুধু ভাববে তিনি এক আচ্ছিন্ন প্রত্যয় বা ন্যায়ানুগ আবশ্যকতা তা নয়; দৃষ্টিসম্পন্ন মনন হয়ে তার দেখা চাই তাঁকে

এখানে সকলের মধ্যে অধিষ্ঠাতারূপে, আমাদের মধ্যে তাঁকে উপলব্ধি করা চাই এবং পর্যবেক্ষণ ও করায়ত্ত করা চাই তাঁর সব শক্তির গতিবৃত্তিকে। তিনিই এক পরম অস্তিত্ব: তিনি সেই আদি ও সার্বিক আনন্দ যা সকল কিছুর উপাদান ও সে সবের অতিরিক্ত; তিনিই এক অনন্ত পরম চেতনা যা দিয়ে সকল চেতনা গঠিত এবং যা তাদের সব গতিবৃত্তির মধ্যে অনুস্যূত; তিনিই এক অসীম পুরুষ যিনি সকল ক্রিয়া ও অনুভূতির পরিপোষক; বিষয়সমূহের যে লক্ষ্য ও পূর্ণতা এখনও অনুপলব্ধ কিন্তু অবশ্যম্ভাবী সেই দিকে তাদের ক্রম-পরিণাম চালনা করে তাঁরই সঙ্কল্প। তাঁর কাছেই হৃদয় নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে, যেতে পারে পরম প্রেমাস্পদ বলে এবং স্পন্দন ও বিচরণ করতে পারে তাঁরই মধ্যে যেন বিশ্ব প্রেমের সর্বব্যাপী মাধুর্য ও পরমানন্দের জীবন্ত সাগরের মাঝে। কারণ সকল অনুভূতির মধ্যে অন্তঃপুরুষের অবলম্বন হল তাঁরই নিগূঢ় আনন্দ যা এমন কি ভ্রান্ত অহংকেও এ রক্ষা করে তার পরীক্ষা ও সংগ্রামের মধ্যে যতদিন না সকল দুঃখ কষ্টের অবসান হয়। তাঁর পরম প্রেম ও আনন্দ হল সেই অনন্ত দিব্য প্রেমিকের যিনি সকল কিছুকে তাদের নিজ নিজ পথ দিয়ে তাঁর সুখময় একত্বের দিকে আকর্ষণ করছেন তাঁর পরম প্রেম ও আনন্দ তাঁরই। তাঁতেই সঙ্কল্প অবিচলিতভাবে নিবদ্ধ হতে পারে যেন তিনিই সেই অদৃশ্য শক্তি যা তাকে চালনা ও সার্থক করে ও তার ক্ষমতার উৎস। নৈর্ব্যক্তিকতার মধ্যে এই কার্যকরী শক্তি এমন এক আত্মদীপ্ত শক্তি যার মধ্যে সকল ফল নিহিত এবং যা শান্তভাবে কাজ করে যায় যতদিন না সিদ্ধিলাভ হয়; এবং ব্যক্তিসত্ত্বের মধ্যে এই শক্তিই সর্বজ্ঞ ও সর্বক্ষম যোগেশ্বর। যিনি ব্যক্তিসত্ত্বকে তার লক্ষ্যে নিশ্চিত নিয়ে যাবেন, কোন কিছুই তাঁকে নিবারণ করতে পারে না। এই বিশ্বাস নিয়েই সাধককে তার অন্বেষণ ও সাধনা শুরু করতে হয়, কারণ এখানে তার সকল প্রযত্নেই এবং বিশেষতঃ অলখের পানে তার সাধনায়, মনোময় মানুষকে অগ্রসর হতে হবে বিশ্বাসের জোরেই। উপলব্ধি আসার পর এই বিশ্বাস দিব্যভাবে সার্থক ও পূর্ণ হয়ে রূপান্তরিত হয় জ্ঞানের শাশ্বত শিখায়।

আমাদের ঊর্ধ্বমুখী সকল প্রচেষ্টার মধ্যে স্বভাবতঃই প্রথমে প্রবেশ করবে কামনার অবর উপাদান। কারণ প্রদীপ্ত সঙ্কল্প যাকে দেখে সাধ্য বলে এবং জয়যোগ্য মুকুট বলে যা পাবার জন্য ছোটে, হৃদয় যাকে আলিঙ্গন করে একমাত্র আনন্দময় বিষয় বলে, তাকেই চায় আমাদের মধ্যে যা নিজেকে সীমিত ও বিরোধপীড়িত বলে অনুভব করে তার অহমাত্মক কামনার ক্ষুব্ধ প্রবল আবেগে, কারণ সীমিত হওয়ার দরুন আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রাম করাই তার স্বভাব। আমাদের অন্তঃস্থ বাসনাময় এই প্রাণশক্তিকে বা কামপুরুষকে প্রথমে স্বীকার করতে হয়, তবে তা শুধু তার রূপান্তর সাধনের জন্য। এমন কি গোড়া থেকেই তাকে শেখাতে হবে যে অন্য সকল কামনা তার ত্যাগ করা চাই ও

তাকে একাগ্র হতে হবে ভগবানের প্রতি তীব্র অনুরাগের উপর। এই মুখ্য কাজ নিষ্পন্ন হলে একে শেখাতে হবে কামনা করতে, তবে নিজের জন্য পৃথকভাবে নয়, — জগতের মধ্যকার ভগবানের জন্য ও আমাদের মধ্যকার ভগবানের জন্য। আমাদের সম্ভাব্য সকল রকম আধ্যাত্মিক লাভ নিশ্চিত হলেও, কামপুরুষ যেন নিজের জন্য কোন আধ্যাত্মিক লাভে মন না দেয়, তাকে মন দিতে হবে আমাদের ও অপরের মধ্যে মহান্ করণীয় ব্রতের উপর, সেই আগামী উচ্চ অভিব্যক্তির উপর যা হবে জগতের মধ্যে ভগবানের গৌরবময় সার্থকতা, সেই পরম সত্যের উপর যা পেতে হবে, জীবনে রূপায়িত করতে হবে ও চিরদিনের জন্য অধিষ্ঠিত করতে হবে রাজাসনে। কিন্তু পরিশেষে তার যে শিক্ষা দরকার তা তার পক্ষে অতীব দুষ্কর, যথার্থ উদ্দেশ্য নিয়ে অন্বেষণ করা অপেক্ষাও দুষ্কর; এ শিক্ষা এই যে তার কামনা তার নিজের অহমাত্মকভাবে হবে না, তা হবে ভগবদ্‌ভাবে। প্রবল বিভক্ত সঙ্কল্প যেমন সর্বদাই জেদ করে, কামপুরুষের আর তেমন জেদ করা চলবে না; সার্থকতা প্রাপ্তি সম্বন্ধে তার নিজের ধারা, লাভ সম্বন্ধে তার নিজের স্বপ্ন, শ্রেয় ও প্রেয় সম্বন্ধে তার নিজের ভাবনা — এসব ত্যাগ করা চাই। তার আস্পৃহা হওয়া চাই এক বৃহত্তর ও মহত্তর সঙ্কল্পের সার্থকতার জন্য, এবং তার রাজী হওয়া চাই আরো কম স্বার্থপর ও কম অজ্ঞানময় দেশনার অধীন হতে। এইভাবে শিক্ষা পেলে যে কামনা মানুষের অত্যন্ত অশান্ত, পীড়াদায়ক ও কষ্টকর উপাদান ও সকলপ্রকার পদস্খলনের মূল তা যোগ্য হয়ে উঠবে তার দিব্য প্রতিরূপে রূপান্তরের জন্য। কারণ কামনা ও তীব্র আবেগেরও দিব্য রূপ আছে; সকল আকাঙ্ক্ষা ও শোকের ঊর্ধ্বে আছে অন্তঃপুরুষের চাওয়ার শুদ্ধ উল্লাস, আছে আনন্দের এমন সঙ্কল্প যা পরম নিঃশ্রেয়সের অধিকারী ও মহিমোজ্জ্বল হয়ে সমাসীন।

একবার একাগ্রতার উদ্দিষ্ট বিষয় আমাদের তিনটি প্রধান করণকে অর্থাৎ মনন, হৃদয় ও সঙ্কল্পকে অধিগত করলে ও এই তিনের দ্বারা অধিগত হলে — অবশ্য আমাদের কামপুরুষ দিব্যবিধানের কাছে সমর্পণ করার পরই এ ব্যাপারে পূর্ণতাসাধন পুরোপুরি সম্ভব — আমাদের রূপান্তরিত প্রকৃতিতে মন ও প্রাণ ও দেহের সিদ্ধি সফল ও সার্থক হতে পারে। অহং-এর ব্যক্তিগত তৃপ্তির জন্য এ কাজ করা হবে না, এ-করা হবে যাতে সমগ্র সত্তা হতে পারে দিব্য উপস্থিতির উপযোগী মন্দির, দিব্য কর্মের জন্য নিখুঁত যন্ত্র। এই কাজ যথার্থভাবে সম্পন্ন হতে পারে তখনই যখন যন্ত্র উৎসর্গীকৃত ও সিদ্ধ হয়ে নিঃস্বার্থ ক্রিয়ার জন্য উপযোগী হয়ে উঠেছে — এবং তা হবে যখন মুক্ত ব্যষ্টিসত্তা বজায় রেখেও ব্যক্তিগত কামনা ও অহমিকা লোপ পায়। ক্ষুদ্র অহং লোপ পাবার পরও সত্যকার অধ্যাত্ম ব্যক্তি তখনও থাকতে পারে; আর থাকতে পারে তার মধ্যে ভগবানের সঙ্কল্প ও কর্ম ও আনন্দ এবং তার সিদ্ধি ও সার্থকতার অধ্যাত্ম ব্যবহার। তখন আমাদের সব কাজ হবে দিব্য এবং সে সব করা হবে দিব্যভাবে, ভগবানে নিয়োজিত আমাদের মন ও প্রাণ ও সঙ্কল্প ব্যবহৃত হবে আমাদের মধ্যে প্রথম আমরা যা উপলব্ধি করেছি তা অপরের মধ্যে ও জগতের মধ্যে সার্থক করে তোলার চেষ্টায় অর্থাৎ চিৎপুরুষের পার্থিব

অভিযানের লক্ষ্য যে মূর্ত ঐক্য, প্রেম, মুক্তি, ক্ষমতা, শক্তি, জ্যোতি, অমর আনন্দ, তাদের যে সব অভিব্যক্তি আমাদের দ্বারা সম্ভব তা-ই অপরের ও জগতের মধ্যে সার্থক করে তোলার চেষ্টায়।

যোগসাধনার শুরুতে এই সমগ্র একাগ্রতা পাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা বা অন্ততঃ দৃঢ় সঙ্কল্প অত্যাবশ্যক। পরতমের কাছে আমাদের সকল কিছু উৎসর্গের জন্য দৃঢ় ও অবিচলিত সঙ্কল্প, সনাতন ও সর্বময়ের নিকট আমাদের সমগ্র সত্তা ও বহুকক্ষবিশিষ্ট প্রকৃতির অর্ঘ্যদান — এই হল আমাদের কাছে যোগের দাবী। অন্য সবকিছু বাদ দিয়ে প্রয়োজনীয় যে একটি বিষয় তাতে আমাদের ঐকান্তিক একাগ্রতার ফলপ্রসূ পূর্ণতা দিয়েই মাপ করা হবে একমাত্র কাম্য পরম একের নিকট আমাদের আত্মোৎসর্গ। অবশ্য এইভাবে বাদ দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত কিছুই বাদ পড়ে না, বাদ পড়ে শুধু জগৎ সম্বন্ধে আমাদের মিথ্যা দৃষ্টিভঙ্গী ও আমাদের সঙ্কল্পের অজ্ঞানতা। কেননা সনাতনের উপর আমাদের যে একাগ্রতা মনের দ্বারা তার পূর্ণতা সাধন হবে যখন আমরা নিরন্তর ভগবানকে দেখব স্বরূপে, নিজেদের মধ্যে এবং এ ছাড়াও ভগবানকে দেখব সকল বিষয়ে ও সত্তায় ও ঘটনায়। হৃদয়ের দ্বারা তার পূর্ণতা সাধন হবে যখন সকল ভাবাবেগ একীভূত হয় ভগবৎপ্রেমে — এই প্রেম ভগবানের স্বরূপে, ও ভগবানেরই জন্য — এবং তাছাড়া বিশ্বের মধ্যে সকল সত্তা ও শক্তি ও ব্যক্তিসত্ত্ব ও রূপের মধ্যে যে ভগবান তাঁরও প্রতি প্রেমে। সঙ্কল্পের দ্বারা একাগ্রতার পূর্ণতাসাধন হবে যখন আমরা দিব্য প্রবর্তনা অনুভব ও লাভ করি এবং শুধু তাকেই স্বীকার করি আমাদের একমাত্র প্রবর্তক শক্তি বলে, কিন্তু এর অর্থ এই যে অহমাত্মক প্রকৃতির সব বিক্ষিপ্ত ও বিদ্রোহী সংযোগের শেষটি পর্যন্ত ধ্বংস করে আমরা নিজেদের বিশ্বভাবাপন্ন করে তুলেছি এবং সর্ব বিষয়ে একমাত্র দিব্য কর্ম প্রণালীকে অবিচল আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করতে আমরা সমর্থ। এটিই পূর্ণযোগের প্রথম মৌলিক সিদ্ধি।

ভগবানের কাছে জীবের পরম নিঃশেষ উৎসর্গের কথা যখন আমরা বলি তখন শেষ অবধি তার অর্থ এর চেয়ে কম কিছু নয়। কিন্তু উৎসর্গের এই পরম পূর্ণতা তখনই সম্ভব যখন নিরন্তর প্রগতির মধ্য দিয়ে জীবন থেকে কামনা-রূপান্তরের দীর্ঘ ও দুরূহ সাধনধারা অকুণ্ঠ মাত্রায় সম্পন্ন হয়। পরিপূর্ণ আত্মোৎসর্গের অর্থ পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ।

কেননা এই অবস্থায় যোগের দুটি গতি, দুটি পর্ব, আর তাদের মাঝে আছে একটি থেকে অন্যটিতে যাবার এক পর্যায় — একটি আত্মসমর্পণের প্রণালী, অন্যটি তার চরম উৎকর্ষ ও পরিণতি। প্রথমটিতে জীব নিজেকে তৈরী করে ভগবানকে নেবার জন্য তার বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে। এই প্রথম পর্ব ধরে বরাবরই তাকে কাজ করতে হয় অপরা-প্রকৃতির সব যন্ত্র দিয়ে তবে ঊর্ধ্ব থেকে সে উত্তরোত্তর সহায় পায়। কিন্তু এই গতির

শেষ পর্যায়ে অন্যটিতে যাবার পথে আমাদের ব্যক্তিগত প্রযত্ন যা ব্যক্তিগত হওয়ায় অনিবার্যরূপে অজ্ঞানময় — ক্রমশঃ কমে আসে এবং এক পরতরা প্রকৃতি সক্রিয় হয়; সনাতনী শক্তি নেমে আসেন এই সীমিত মর্ত্য আধারে এবং তাকে উত্তরোত্তর অধিগত ও রূপান্তরিত করেন। দ্বিতীয় পর্বে পূর্বেকার প্রাথমিক ক্ষুদ্রতর ক্রিয়াকে সম্পূর্ণ সরিয়ে তার স্থান নেয় মহত্তর গতি; কিন্তু আমাদের আত্মসমর্পণ সম্পূর্ণ হলেই তা করা সম্ভব। আমাদের মধ্যকার অহং-ব্যক্তি তার নিজের শক্তিতে বা সঙ্কল্পে বা জ্ঞানে বা নিজের কোন গুণের সাহায্যে নিজেকে ভগবানের প্রকৃতিতে রূপান্তর করতে অক্ষম, তার যা করবার ক্ষমতা তা এই যে সে রূপান্তরের জন্য নিজেকে যোগ্য করতে পারে, আর পারে সে যা হয়ে উঠতে চায় তার কাছে উত্তরোত্তর নিজেকে সমর্পণ করতে। যতদিন অহং আমাদের মধ্যে ক্রিয়ারত থাকে, ততদিন আমাদের ব্যক্তিগত ক্রিয়া স্বভাবতঃই সত্তার অবর পর্যায়ের অংশ ও সর্বদা তা হতে বাধ্য; এই ক্রিয়া তমসাচ্ছন্ন বা অর্ধদীপ্ত, তার ক্ষেত্র সীমিত ও ফলপ্রসূ শক্তি অতীব আংশিক। যদি অধ্যাত্ম রূপান্তর আদৌ করতে হয়, শুধু আমাদের প্রকৃতির আলো-করা পরিবর্তন নয়, তাহলে আমাদের অবশ্য কর্তব্য হল দিব্যশক্তিকে অন্তরে আহ্বান করা জীবের মধ্যে সেই অলৌকিক কর্ম সাধনের জন্য, কারণ এক মাত্র তাঁরই আছে প্রয়োজনীয় শক্তি যা অমোঘ, সর্বজ্ঞ ও অপরিসীম। কিন্তু মানুষী ব্যক্তিগত ক্রিয়ার বদলে অবিলম্বে দিব্য ক্রিয়ার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা পুরোপুরি সম্ভব নয়। নিম্ন থেকে আসা যে সব বাধা পরতর ক্রিয়ার সত্যকে মিথ্যা করতে চায়, প্রথম তাদের নিরুদ্ধ বা হীনবীর্য করা আবশ্যক; আর তা করা চাই আমাদের নিজস্ব স্বাধীন ইচ্ছায়। আমাদের কর্তব্য হল অপরাপ্রকৃতির সকল সংবেগ ও অসত্যকে অবিরত ও পুনঃপুনঃ অস্বীকার করা এবং আমাদের বিভিন্ন অঙ্গে প্রচীয়মান সত্যকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করা; কেন না যে জ্যোতি, শুদ্ধতা ও শক্তি ভিতরে আসছে ও অনুস্যূত হচ্ছে তাকে আমাদের প্রকৃতির মধ্যে উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠা করতে গেলে ও তার চূড়ান্ত সিদ্ধি আনতে হলে তার বিকাশ ও পরিপোষণের জন্য দরকার তাকে আমাদের স্বচ্ছন্দে স্বীকার করা ও তার বিরুদ্ধ, অবর বা অসঙ্গত যাসব সেসবকে দৃঢ়ভাবে বর্জন করা।

আত্মপ্রস্তুতির প্রথম গতিতে, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার পর্বে আমাদের যে পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে তা এই যে বাঞ্ছিত ভগবানের উপর সমগ্র সত্তার এইরকম একাগ্রতা এবং তার অনুসিদ্ধান্তরূপ যা সব ভগবানের খাঁটি সত্য নয় সে সবের নিরন্তর বর্জন ও বহির্নিক্ষেপ। এই নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসের ফল হবে আমরা যা আছি, চিন্তা করি, অনুভব করি ও যে কর্ম করি সে সবের সম্পূর্ণ উৎসর্গ। আবার এই উৎসর্গের ধ্রুব পরিণতি হল সর্বোচ্চের নিকট অখণ্ড আত্মদান; কারণ, সমগ্র প্রকৃতির সর্বগ্রাহী একান্ত সমর্পণই উৎসর্গের সম্পূর্ণতার পরাকাষ্ঠা ও নিদর্শন। যোগের দ্বিতীয় পর্যায়ে মানুষী ও দিব্য কর্ম প্রণালীর মধ্যবর্তী অবস্থায়, উর্ধ্ব থেকে আসবে ক্রমবর্ধমান শুদ্ধীকৃত ও সতর্ক নিষ্ক্রিয়তা, উত্তরোত্তর জ্যোতির্ময় দিব্য সাড়া ভাগবতী শক্তির দিকে — তবে অন্য কারোর দিকে নয়; এর ফলে উর্ধ্ব থেকে ভিতরে নেমে আসে এক মহান্, ও সচেতন

অলৌকিক কর্মের বর্ধিষ্ণু প্রবল ধারা। শেষ পর্বে আদৌ কোন প্রচেষ্টা থাকে না, থাকে না কোন বাঁধাধরা পদ্ধতি, কোন নির্দিষ্ট সাধনা; প্রয়াস ও তপস্যার স্থান নেবে শুদ্ধীকৃত ও সংসিদ্ধ পার্থিব প্রকৃতির কুঁড়ি থেকে দিব্য প্রসূনের স্বাভাবিক সহজ শক্তিশালী ও সুখময় বিকাশ। যোগের ক্রিয়ার স্বাভাবিক অনুক্রম এই সব।

অবশ্য এই সব গতিধারা সর্বদাই ঠিক পর পর আসে না, বা তাদের পরম্পরা যে কঠোরভাবে নির্দিষ্ট তাও নয়। প্রথমটি শেষ হবার আগে আংশিকভাবে দ্বিতীয়টি শুরু হয়। দ্বিতীয়টি সংসিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত প্রথমটি অংশতঃ বর্তমান থাকে; সর্বশেষ দিব্য কর্মপ্রণালী চূড়ান্তভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ও প্রকৃতিতে স্বাভাবিক হবার পূর্বেই তা ভবিষ্যতের আশ্বাসরূপে সময় সময় ব্যক্ত হতে পারে। আর সর্বদাই থাকে জীবের চেয়ে পরতর ও মহত্তর কিছু যা তাকে চালনা করে এমনকি তার ব্যক্তিগত পরিশ্রম ও প্রয়াসের মধ্যেও। প্রায়শঃই সে এই আড়ালে-থাকা মহত্তর দেশনা সম্বন্ধে পূর্ণসচেতন হয়ে কিছু সময় থাকতে পারে, এমনকি তার সত্তার কোন কোন অংশে স্থায়ীভাবেও সচেতন থাকতে পারে। আর তা ঘটতে পারে তার সমগ্র প্রকৃতি তার সকল অংশ সমেত অবর পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ থেকে শুদ্ধ হবার বহু পূর্বে। এমনকি সে গোড়া থেকেই ঐরকম সচেতন হতে পারে; অন্য কোন অঙ্গ না হলেও তার মন ও হৃদয় তার শক্তিশালী ও মর্মভেদী দেশনায় সাড়া দিতে পারে আর তাতে যোগের একেবারে শুরু থেকেই কিছু প্রাথমিক সম্পূর্ণতাও থাকে। কিন্তু মধ্যবর্তী অবস্থার বিশেষত্ব এই যে তা অগ্রসর হয়ে শেষ সীমায় পৌঁছান না পর্যন্ত মহান্ প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের অবিরত ও সম্পূর্ণ সমান ক্রিয়া বর্তমান থাকে। এই যে মহত্তর দিব্যতর দেশনা, যা আমাদের ব্যক্তিগত কিছু নয়, তার প্রাধান্যের অর্থ প্রকৃতি সমগ্র অধ্যাত্ম রূপান্তরের জন্য উত্তরোত্তর পরিণত হয়ে উঠছে। আত্মোৎসর্গ শুধু যে তত্ত্বতঃ স্বীকৃত হয়েছে তা নয়, ক্রিয়া ও শক্তিতেও যে এটি সার্থক হয়েছে — এ হল তারই অভ্রান্ত নিদর্শন। পরতম তাঁর জ্যোতির্ময় হাত রেখেছেন তাঁর অলৌকিক পরম জ্যোতি ও শক্তি ও আনন্দের মনোনীত মানুষী আধারের উপর।

তৃতীয় অধ্যায়

কর্মে আত্মসমর্পণ — গীতার পথ

জীবন — কোন সুদূর নীরব বা উর্ধ্বে উত্তোলিত উল্লাসভরা পরপার নয় — একমাত্র জীবনই আমাদের যোগের ক্ষেত্র। এর কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য হওয়া চাই, — আমাদের চিন্তা, দৃষ্টি, অনুভব ও সত্তার বাহ্য সঙ্কীর্ণ ও খণ্ড খণ্ড মানুষী ধারার রূপান্তর গভীর ও প্রসারিত অধ্যাত্ম চেতনায় এবং অখণ্ড আন্তর ও বাহ্যজীবনে, আর আমাদের সাধারণ মানুষী জীবনধারার রূপান্তর দিব্য জীবনধারায়। এই পরম উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হল ভগবানের নিকট আমাদের সমগ্র প্রকৃতির আত্মদান। সবকিছু দিতে হবে আমাদের অন্তঃস্থ ভগবানের কাছে, বিশ্বাত্মক সর্বের কাছে এবং বিশ্বোত্তীর্ণ পরাৎপরের কাছে। সেই এক ও বহুময় ভগবানে আমাদের সঙ্কল্প, আমাদের হৃদয় ও আমাদের মননের একান্ত একাগ্রতা, একমাত্র ভগবানের কাছে আমাদের সমগ্র সত্তার অকুণ্ঠ আত্মোৎসর্গ — এটিই জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়; এর অর্থ, যে পরম 'তৎ' অহং-এর চেয়ে অনন্ত গুণ মহত্তর তার দিকে অহং-এর ফেরা, তার আত্মদান ও অপরিহার্য সমর্পণ।

মানুষ যে সাধারণ জীবন যাপন করে তার উপাদান হল কতকগুলি অতি অপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত মনন, ধারণা, ইন্দ্রিয়সংবিৎ, ভাবাবেগ, কামনা ও ভোগ ও কর্মের অর্ধ-সংহত অর্ধ-শিথিল স্তূপ; এ সবের অধিকাংশই গতানুগতিক ও স্বতঃই পুনরাবর্তনশীল, মাত্র কিছু অংশ স্ফুরন্ত ও আত্ম-বিকাশশীল, কিন্তু সবগুলিরই কেন্দ্র বাহ্য অহং। এই সমস্ত কর্মধারার সমষ্টিগত ফলে আসে এক আন্তর বৃদ্ধি যা অংশতঃ এই জীবনে দৃশ্যমান ও কার্যকরী এবং অংশতঃ পরবর্তী জীবনে প্রগতির বীজ স্বরূপ। সচেতন সত্তার এই বৃদ্ধি, তার বিভিন্ন অঙ্গের প্রসার, উপচীয়মান আত্মপ্রকাশ, উত্তরোত্তর সুসঙ্গত বিকাশ — এই হল মনুষ্যজীবনের সমগ্র তাৎপর্য, সমস্ত সার। মানব, মনোময় পুরুষ যে জড়দেহে প্রবেশ করেছে তার উদ্দেশ্য হল — মনন, সঙ্কল্প, ভাবাবেগ, কামনা, ক্রিয়া ও অনুভূতির দ্বারা চেতনায় এই তাৎপর্যপূর্ণ বিকাশ যার শেষ পরিণতি পরম দিব্য আত্ম-আবিষ্কার। বাকি সব সহকারী ও গৌণ অথবা আকস্মিক ও নিষ্ফল; শুধু তা-ই প্রয়োজনীয় যা তার প্রকৃতির ক্রমবিকাশের ও তার আত্মা ও চিৎপুরুষের বৃদ্ধির বা অন্যভাবে বলা যায় উত্তরোত্তর বিকাশ ও উপলব্ধির পরিপোষক ও সহায়।

আমাদের যোগের যে লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হল তার অর্থ — এখানে আমাদের জীবনের এই পরমার্থসাধনকে ত্বরান্বিত করা, তার কম কিছু নয়। প্রকৃতির বিবর্তনের মাধ্যমে ধীর ও বিশৃঙ্খল বৃদ্ধির সাধারণ বিলম্বিত পদ্ধতিকে পিছনে ফেলে অগ্রসর হওয়াই এই যোগের প্রণালী। কারণ প্রাকৃতিক বিবর্তন বড় জোর আবরণের নীচে এক অনিশ্চিত বৃদ্ধি, যার কারণ কিছুটা লক্ষ্যহীন শিক্ষা ও এমন চেষ্টা যার উদ্দেশ্য ভালভাবে জানা নেই, এবং সুবিধাসমূহের এমন ব্যবহার যা আংশিক দীপ্ত ও অর্ধ-স্বয়ংক্রিয় আর

যার ভ্রম, প্রমাদ ও ত্রুটিবিচ্যুতি অনেক; এই বৃদ্ধির অধিকাংশই আপাতপ্রতীয়মান আকস্মিক ঘটনাবলী ও অবস্থা বিপর্যয় যদিও তাদের মধ্যে গূঢ় দিব্য শক্তিপাত ও দেশনা প্রচ্ছন্ন থাকে। যোগে আমরা এই বিশৃঙ্খল বক্র কর্কট গতি সরিয়ে তার স্থলে আনি দ্রুত সচেতন ও আত্মচালিত ক্রমবিকাশ যার সুকল্পিত উদ্দেশ্য হল যতদূর সম্ভব আমাদের নির্দিষ্ট গন্তব্যের পানে নিয়ে যাওয়া সরল পথে। এক অর্থে প্রগতির মাঝে কোথাও কোন গন্তব্যস্থানের কথা বলা ভুল কারণ এই প্রগতি হতে পারে অনন্ত। তবু আমরা এক নিকটবর্তী গন্তব্যের ভাবনা করতে পারি, ভাবতে পারি আমাদের বর্তমান পাওয়া ছাড়িয়ে এমন এক উত্তর উদ্দেশ্যের কথা যা মানবের অন্তঃপুরুষের আস্পৃহার যোগ্য। তার সম্মুখে আছে এক নবজন্মের সম্ভাবনা; সত্তার এক উচ্চতর ও বিশালতর লোকে উদয়ন ও তার বিভিন্ন অঙ্গের রূপান্তরের জন্য অবতরণও সম্ভব। আর সম্ভব এমন বৃহৎ ও দীপ্ত চেতনা যা তাকে পরিণত করবে এক মুক্ত চিৎপুরুষে ও সংসিদ্ধ শক্তিতে, আর সেই চেতনা যদি ব্যষ্টি ছাড়িয়ে বিস্তৃত হয় তাহলে এমন কি এক দিব্য মানবজাতি, না হয় এক নতুন, অতিমানসিক সুতরাং অতিমানবীয় জাতিও গড়ে উঠতে পারে। এই নবজন্মকেই আমরা আমাদের লক্ষ্য করি; আমাদের যোগের সমগ্র অর্থ হল দিব্যচেতনায় পরিণতিলাভ, শুধু অন্তঃপুরুষের নয়, আমাদের প্রকৃতির সকল অংশেরও অখণ্ড পরিবর্তন দিব্যত্বে।

যোগে আমাদের উদ্দেশ্য হল সীমিত বহির্মুখী অহংকে নির্বাসন দিয়ে তার জায়গায় ভগবানকে অধিষ্ঠিত করা প্রকৃতির অন্তর্বাসী রাজা রূপে। এর অর্থ, প্রথমে কামনার সব দাবী নাকচ করা এবং আর স্বীকার না করা যে কামনার ভোগই মানুষের প্রধান প্রবর্তক শক্তি। অধ্যাত্ম জীবন তার পুষ্টি সংগ্রহ করবে কামনা থেকে নয়, স্বরূপগত অস্তিত্বের শুদ্ধ ও স্বার্থশূন্য অধ্যাত্ম আনন্দ থেকে। আর শুধু আমাদের মধ্যে কামনাময় প্রাণিক প্রকৃতি নয়, মনোময় সত্তাকেও পেতে হবে নবজন্ম ও রূপান্তরকারী পরিবর্তন। আমাদের বিভক্ত, অহমাত্মক, সীমিত ও অজ্ঞানময় মনন ও বুদ্ধির অবসান চাই; তার স্থলে অন্তরে প্রবাহিত হবে ছায়াহীন দিব্য দীপ্তির সার্বভৌম ও নির্দোষ লীলাস্রোত যার শেষ পরিণতি হবে অর্ধ-সত্যের অন্ধ অন্বেষণ ও স্খলনপূর্ণ ভ্রম থেকে নির্মুক্ত স্বাভাবিক স্বাধিষ্ঠিত ঋতচেতনা। আমাদের বিশৃঙ্খল ও অভিভূত অহং-কেন্দ্রিক ক্ষুদ্র-অভিপ্রায়যুক্ত সঙ্কল্প ও ক্রিয়া বন্ধ হওয়া চাই এবং তার স্থলে আসা চাই দ্রুত ও শক্তিশালী, প্রোজ্জ্বল ও স্বতঃস্ফূর্ত দিব্যপ্রেরিত ও দিব্যচালিত শক্তির সমগ্র কর্মপ্রণালী। আমাদের সকল কাজে প্রতিষ্ঠিত ও সক্রিয় করা চাই এক পরম, নৈর্ব্যক্তিক, অকম্প ও স্খলনহীন সঙ্কল্প যা ভগবানের পরম সঙ্কল্পের সঙ্গে এক সুরে স্বতঃস্ফূর্ত ও অক্ষুব্ধভাবে গাঁথা। আমাদের ক্ষীণ অহমাত্মক সব ভাবাবেগের তৃপ্তিহীন বহির্লীলা উচ্ছেদ করে তার স্থলে প্রকট করা চাই তাদের পশ্চাতে শুভ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষমান অন্তঃস্থ গূঢ় গভীর ও বিশাল চৈত্য হৃদয়;

ভগবানের অধিষ্ঠান এই আন্তর হৃদয় দ্বারা প্রবর্তিত আমাদের সকল বেদনা (feelings) পরিবর্তিত হবে দিব্যপ্রেম ও বহুধা পরমানন্দের যুগল মনোবেগের শান্ত ও তীব্র গতিধারায়। এই হল দিব্য মানবজাতির বা অতিমানসিক জাতির সংজ্ঞা। আমাদের কাজ হল যোগের দ্বারা এইপ্রকার অতিমানবকে অভিব্যক্ত করা, মানুষী বুদ্ধি ও ক্রিয়ার অতিবর্ধিত বা এমনকি উর্ধ্বায়িত কোন শক্তিকে নয়।

সাধারণ মানবজীবনে বহির্গামী ক্রিয়া স্পষ্টতঃই আমাদের জীবনের তিনচতুর্থাংশ বা তারও বেশী। এর ব্যতিক্রম যে সাধুসন্ত, ঋষি, অসামান্য চিন্তাবিৎ, কবি ও শিল্পী তাঁরা আরো বেশী পরিমাণে নিজেদের অন্তরে বাস করতে পারেন; বস্তুতঃ তাঁরাই নিজেদের গড়ে তোলেন, — অন্ততঃ তাঁদের প্রকৃতির অন্তরতম অংশে — উপরভাসা কর্ম অপেক্ষা আরো বেশী পরিমাণে আন্তর মননে ও বেদনায়। কিন্তু যদি এদের কোন একটিকে অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন না করে বরং আন্তর ও বহির্জীবনের সুষমাকে পূর্ণতার মধ্যে এক করে তাদের অতীত কিছুর লীলায় রূপান্তরিত করা যায়, তাতেই সৃষ্ট হবে সিদ্ধ জীবনধারার রূপ। সুতরাং কর্মযোগ, আমাদের সঙ্কল্পে ও কর্মে ভগবানের সহিত মিলন — শুধু জ্ঞানে ও বেদনায় নয় — পূর্ণ যোগের এক অপরিহার্য ও প্রকাশাতীতভাবে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যদি আমাদের মনন ও বেদনার রূপান্তর হয়, কিন্তু তার সাথে অনুরূপভাবে আমাদের কর্মের ভাব ও গঠনের রূপান্তর না হয় তাহলে আমাদের সিদ্ধি হবে অপূর্ণ, হীনাঙ্গ।

কিন্তু এই সমগ্র রূপান্তর সাধনের জন্য ভগবানের কাছে যেমন আমাদের মন ও হৃদয়কে উৎসর্গ করা অত্যাবশ্যক, আমাদের সব ক্রিয়া ও বাহ্য গতিবৃত্তিকেও উৎসর্গ করা অত্যাবশ্যক। আমাদের পশ্চাতে এক মহত্তর শক্তির হাতে আমাদের সব কর্মসামর্থ্যের সমর্পণ স্বীকার ও উত্তরোত্তর সিদ্ধ করা চাই, আর চাই আমাদের কর্তা ও কর্মীর ভাবের অবসান। সম্মুখের দৃশ্যমান রূপ যে দিব্য সঙ্কল্পকে আড়াল করে রেখেছে তাঁর হাতে সবকিছু দিতে হবে আরো সরাসরি ব্যবহারের জন্য; কারণ একমাত্র সেই অনুমন্তা সঙ্কল্প দ্বারাই আমাদের ক্রিয়া সম্ভব। এক প্রচ্ছন্ন শক্তিই আমাদের সকল ক্রিয়ার প্রকৃত ঈশ্বর ও নিয়ামক দ্রষ্টা, এবং আমাদের অহং যেসব অজ্ঞানতা ও বিকৃতি ও বৈরূপ্য আনে তাদের মধ্য দিয়ে একমাত্র তিনিই জানেন তাদের সমগ্র অর্থ ও চরম উদ্দেশ্য। যে মহত্তর দিব্যজীবন, সঙ্কল্প ও শক্তি বর্তমানে আমাদের গূঢ়ভাবে ধারণ করে আছে তারই বৃহৎ ও সরাসরি বহির্ধারায় সম্পূর্ণ রূপান্তর সাধন করা চাই আমাদের সীমিত ও বিকৃত অহমাত্মক জীবন ও কর্মের। এই মহত্তর সঙ্কল্প ও শক্তিকে আমাদের মধ্যে সচেতন করতে হবে, তাকেই করতে হবে প্রভু; এখন যেমন এটি শুধু অতিচেতন, ধারক ও অনুমন্তা শক্তিমাত্র, তেমন আর তার থাকা চলবে না। যে সর্বজ্ঞ শক্তি ও সর্বসমর্থ জ্ঞান এখন প্রচ্ছন্ন, আমাদের মধ্য দিয়ে তাঁরই সকল-জানা উদ্দেশ্য ও প্রণালীর অবিকৃত প্রবাহ সিদ্ধ করা চাই আর এর ফলে আমাদের সমগ্র রূপান্তরিত প্রকৃতি পরিণত হবে এর শুদ্ধ, অব্যাহত, সুসম্মত ও সহযোগী প্রণালীতে। এই সমগ্র উৎসর্গ ও সমর্পণ এবং তার

ফলস্বরূপ এই সমগ্র রূপান্তর ও স্বচ্ছন্দ প্রবাহ — এরাই পূর্ণকর্মযোগের সমগ্র মৌলিক উপায় ও চরম লক্ষ্য।

এমনকি যাদের প্রথম স্বাভাবিক ঝোঁক ও গতি হল মননশীল মন ও জ্ঞানের উৎসর্গ, সমর্পণ ও তার ফলস্বরূপ এ সবের সমগ্র রূপান্তর অথবা হৃদয় ও তার বিভিন্ন ভাবাবেগের সমগ্র উৎসর্গ, সমর্পণ ও রূপান্তর তাদের পক্ষেও কর্মোৎসর্গ সেই পরিবর্তনের এক আবশ্যকীয় উপাদান। অন্যথায় তারা ভগবানকে অন্য জীবনে পেলেও, এ জীবনে তারা ভগবানকে সার্থক করতে সক্ষম হবে না; তাদের কাছে জীবন হবে অর্থহীন, অদিব্য, অসম্বদ্ধ, তুচ্ছ কিছু। যে আসল জয় আমাদের পার্থিব জীবনরহস্যের চাবিকাঠি হবে তা তারা পায় না; তাদের প্রেম সেই পরম প্রেম নয় যা আত্মাকে জয় করতে সমর্থ; তাদের জ্ঞান সমগ্র চেতনা ও সর্বগ্রাহী জ্ঞান হবে না। অবশ্য শুধু জ্ঞান বা ভগবন্মুখী ভাবাবেগ নিয়ে বা দুটিই একত্র নিয়ে যোগ শুরু করা সম্ভব, আর কর্মকে রেখে দেওয়া যেতে পারে যোগের শেষ সাধনার জন্য। কিন্তু তার অসুবিধা এই যে আমাদের ঝোঁক হবে অন্য সব কিছু বাদ দিয়ে অন্তরেই একান্তভাবে থাকবার, প্রত্যক্‌বৃত্ত অনুভূতির মধ্যে সূক্ষ্মভাবাপন্ন হয়ে, আমাদের বিচ্ছিন্ন সব আন্তর অংশে আবদ্ধ থেকে; সেখানে নিজেদের অধ্যাত্ম নিঃসঙ্গতার কঠিন আবরণে আচ্ছন্ন হওয়া সম্ভব, আর পরে বিজয়ীরূপে বাইরের দিকে নিজেদের ঢেলে দেওয়া ও পরাপ্রকৃতি থেকে যা লাভ করেছি তা জীবনে প্রয়োগ করা আমাদের পক্ষে কষ্টকর হতে পারে। আমাদের আন্তর বিজয়ের সাথে এই বাইরের রাজ্য জয় করতে গেলে আমরা দেখব যে আমরা বড় বেশী অভ্যস্ত হয়েছি কেবলমাত্র প্রত্যক্‌বৃত্ত ক্রিয়াতে ও অশক্ত হয়ে পড়েছি জড়ের ক্ষেত্রে। বহিঃপ্রাণ ও দেহের রূপান্তরসাধন অতীব দুরূহ হবে। আর না হয় আমরা দেখব যে আন্তর জ্যোতির সঙ্গে আমাদের ক্রিয়ার মিল নেই; তখনও ক্রিয়া চলে পুরনো অভ্যস্ত ভ্রান্ত পথে, তখনও তা পুরনোর সাধারণ অপূর্ণ প্রভাবের অধীন। আমাদের অন্তঃস্থ সত্য বিচ্ছিন্ন রয়ে যায় আমাদের বহিঃপ্রকৃতির অবিদ্যাময় যান্ত্রিক কর্মপ্রণালী থেকে আর মাঝে থাকে এক যন্ত্রণাপূর্ণ ব্যবধান। এধরনের অনুভূতি প্রায়শঃই ঘটে, কারণ এরকম প্রণালীতে জ্যোতি ও শক্তি নিজেদের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে, জীবনে নিজেদের প্রকাশ করতে বা পৃথিবী ও তার বিভিন্ন প্রণালীর জন্য নির্দিষ্ট সব স্থূল উপায় ব্যবহার করতে তারা অনিচ্ছুক। আমরা যেন বাস করি অন্য এক জগতে, এক বৃহত্তর ও সূক্ষ্মতর জগতে, আর জড় ও পার্থিব জীবনে আমাদের কোনই দিব্য প্রভাব নেই, হয়ত কোন প্রকারেরই প্রভাব একরকম নেই।

কিন্তু তবু প্রত্যেককে নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী চলতে হবে, বাধা সর্বদাই থাকে, তবে যোগের যে পথ আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক তা-ই যদি আমরা অনুসরণ করতে চাই তাহলে ঐসব বাধা কিছুদিনের জন্য স্বীকার করতে হবে। মোটের উপর যোগ প্রধানতঃ আন্তর চেতনা ও প্রকৃতির পরিবর্তন; আর আমাদের বিভিন্ন অঙ্গের ভারসাম্য যদি এমন হয় যে কোন একটি বিশেষ অঙ্গ একান্তভাবে অবলম্বন করেই যোগসাধনা শুরু করতে

হবে ও অন্যগুলিকে রেখে দিতে হবে ভবিষ্যতে নেবার জন্য, তাহলে এই প্রণালীর আপাত অপূর্ণতা আমাদের গ্রহণ করতেই হবে। তাহলেও পূর্ণযোগের আদর্শ কর্মপ্রণালী এমন এক গতিবৃত্তি হবে যার প্রণালী শুরু থেকেই অখণ্ড এবং অগ্রগতি সমগ্র ও বহুভঙ্গিম। সে যা হোক, আমাদের বর্তমান কাজের বিষয় হল এমন এক যোগ যা তার লক্ষ্য ও সম্পূর্ণ গতিবৃত্তিতে অখণ্ড কিন্তু যা শুরু করে কাজ থেকে ও অগ্রসর হয় কাজ দিয়ে, তবে প্রতি পদে তাকে উত্তরোত্তর চালনা করে এক সঞ্জীবনী দিব্য প্রেম ও উত্তরোত্তর দীপ্ত করে এক সাহায্যকারী দিব্য জ্ঞান।

জাতিকে এ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক কর্মের যে মহত্তম উপদেশবাণী দেওয়া হয়েছে, অতীত যুগের কর্মযোগের যে সর্বোৎকৃষ্ট বিধান মানুষের জানা আছে তা পাওয়া যাবে ভগবদ্‌গীতায়। মহাভারতের সেই প্রসিদ্ধ উপাখ্যানে কর্মযোগের মহান্ সূত্রগুলি চিরদিনের জন্য স্থাপিত হয়েছে অতুলনীয় দক্ষতার সঙ্গে এবং নিশ্চিত অনুভূতির অভ্রান্ত দৃষ্টি নিয়ে। একথা সত্য যে তাতে পূর্ণভাবে বলা হয়েছে শুধু পথের কথাই আর প্রাচীনেরা যে ভাবে দেখেছিলেন সেইভাবে; পরিপূর্ণ সার্থকতার কথা, সর্বোচ্চ রহস্যের কথা তেমন সুস্পষ্টভাবে না বলে মাত্র তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, তাকে প্রচ্ছন্ন রাখা হয়েছে এক পরমতম রহস্যের অপ্রকাশিত অংশ হিসেবে। এই নীরবতার কারণ সুস্পষ্ট; কেননা একথা সত্য যে সার্থকতা অনুভূতির বিষয়, কোন শিক্ষার দ্বারা তার প্রকাশ সম্ভব নয়। যে মন জ্যোতির্ময় রূপান্তরকারী অনুভূতি পায়নি সে যাতে সত্য সত্যই বুঝতে পারে তেমনভাবে তা বর্ণনা করা যায় না। আর যে অন্তঃপুরুষ বিভিন্ন উজ্জ্বল তোরণ পার হয়ে আন্তর জ্যোতির সুদীপ্তির মধ্যে দাঁড়িয়েছে তার কাছে মানসিক ও বাচনিক বর্ণনা যেমন অনাবশ্যক, অপ্রচুর ও ধৃষ্টতা তেমন অসার। মনোময় মানুষের সাধারণ অভিজ্ঞতার উপযোগী করে যে ভাষা তৈরী হয়েছে, বাধ্য হয়ে তারই অযোগ্য ও ভ্রান্তিজনক সংজ্ঞায় দিব্য সিদ্ধির কথা চিত্রিত করতে হয়; আর সেভাবে প্রকাশিত হলে তাদের অর্থ ঠিক মত বুঝতে পারে শুধু তারাই যারা আগেই তা জানে, আর জানে বলেই তারা এইসব তুচ্ছ বাহ্য সংজ্ঞাগুলির পরিবর্তিত, আন্তর ও রূপান্তরিত অর্থ দিতে সক্ষম। আদিতে যেমন বৈদিক ঋষিরা বলতেন, পরম জ্ঞানের কথা শুধু তাদেরই বোধগম্য যারা ইতিপূর্বেই জ্ঞানলাভ করেছে। যেরকম রহস্যপূর্ণভাবে গীতার সমাপ্তি হয়েছে তাতে তার নীরবতা থেকে মনে হয় যে আমরা যে সমাধান চাইছি তার দ্বারপ্রান্তে এসে তা থেমে গিয়েছে; সর্বোচ্চ অধ্যাত্মমনের সীমানায় এসে সে নিবৃত্ত রয়েছে, সীমানা পার হয়ে অতিমানসিক জ্যোতির দ্যুতির মধ্যে প্রবেশ করেনি। কিন্তু তবু কেন্দ্রীয় গুহ্য কথা হল আন্তর উপস্থিতির সঙ্গে তাদাত্ম্যের — শুধু স্থিতিশীল তাদাত্ম্যের নয়, স্ফুরন্ত তাদাত্ম্যেরও গুহ্য কথা এবং দিব্য দিশারীর নিকট নিঃশেষ সমর্পণের শ্রেষ্ঠ রহস্য। এই সমর্পণই

অতিমানসিক রূপান্তরের অপরিহার্য সাধন, আবার অতিমানসিক রূপান্তরের মধ্য দিয়েই স্ফুরন্ত তাদাত্ম্যলাভ সম্ভব।

তাহলে গীতায় কর্মযোগের কি কি সব সূত্র নির্দিষ্ট করা হয়েছে? এর মূলতত্ত্ব, আধ্যাত্মিক পদ্ধতির কথা সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই বলা যায় যে-সমত্ব ও একত্ব — চেতনার এই দুই বৃহত্তম ও উচ্চতম অবস্থা বা শক্তির মিলন এটি। এর পদ্ধতির সার এই যে ভগবানকে অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করা চাই যেমন আমাদের আন্তর আত্মায় ও চিৎপুরুষে তেমন আমাদের জীবনে। ব্যক্তিগত কামনার আন্তর সন্ন্যাসের ফলে সমত্ব আসে, ভগবানের নিকট আমাদের সমগ্র সমর্পণ সিদ্ধ হয় এবং তার সাহায্যে বিভেদজনক অহং থেকে আমরা মুক্তি পাই; আর তার ফলে আমাদের লাভ হয় একত্ব। কিন্তু এই একত্ব হওয়া চাই স্ফুরন্ত শক্তিতে, শুধু স্থিতিশীল শান্তিতে বা নিষ্ক্রিয় নিঃশ্রেয়সে নয়। গীতা আমাদের এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে সকল কর্ম ও প্রকৃতির পূর্ণ শক্তিরাজির মধ্যেও চিৎপুরুষের স্বাধীনতা অব্যাহত থাকে যদি আমরা বিভেদজনক ও সীমাকারী অহং-এর চেয়ে পরতরের নিকট আমাদের সমগ্র সত্তার অধীনতা স্বীকার করি। নিশ্চল নিষ্ক্রিয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত অখণ্ড স্ফুরন্ত সক্রিয়তাই এর বক্তব্য; অচঞ্চল শান্তির উপর অপরিবর্তনীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত সম্ভবমত বৃহত্তম ক্রিয়া, পরম আন্তরবৃত্ত নীরবতার মধ্য থেকে স্বচ্ছন্দ বহিঃপ্রকাশ — এই হল তার রহস্য।

এখানকার সবকিছুই এক ও অবিভাজ্য সনাতন বিশ্বাতীত ও বিশ্বময় ব্রহ্ম যিনি জীব ও বিষয়ের মধ্যে বিভক্তরূপে প্রতীয়মান। তিনি এইভাবে মাত্র প্রতীয়মান, কারণ যথার্থতঃই তিনি সকল বিষয়ে, সকল জীবে সর্বদাই এক ও সম; বিভাজন শুধু এক উপরের প্রাতিভাসিক বিষয়। যতদিন আমরা এই অবিদ্যাময় প্রতীয়মানতার মধ্যে বাস করি, ততদিন আমরা অহং এবং প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের অধীন। প্রাতিভাসিকের দাসত্বে শৃঙ্খলিত, দ্বন্দ্বসমূহে আবদ্ধ, শুভ ও অশুভ, পাপ ও পুণ্য, হর্ষ ও বিষাদ, সুখ ও দুঃখ, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, সফলতা ও বিফলতার মধ্যে আন্দোলিত আমরা মায়ার লৌহচক্র বা স্বর্ণমণ্ডিত লৌহচক্রের পাকে অসহায়ভাবে ঘুরি। বড় জোর আমাদের আছে মাত্র নগণ্য আপেক্ষিক স্বাধীনতা যাকে মানুষ না বুঝে বলে স্বাধীন ইচ্ছা। কিন্তু মূলতঃ এই ইচ্ছা অলীক, কারণ প্রকৃতির গুণসমূহই প্রকাশ পায় আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার মাধ্যমে; প্রকৃতির শক্তিকে আমরা করায়ত্ত করি না, সেই আমাদের করায়ত্ত করে, নির্ধারণ করে আমরা কি ইচ্ছা করব এবং কিভাবে ইচ্ছা করব। আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্তে আমরা বিচারসম্মত সঙ্কল্প বা বিবেচনাহীন সংবেগ যার দ্বারাই চালিত হয়ে যে বিষয় পেতে চাই তা নির্বাচন করে প্রকৃতি, কোন স্বাধীন অহং নয়। অপরপক্ষে যদি আমরা ব্রহ্মের একত্ববিধায়ক সত্যতার মধ্যে বাস করি, তাহলে আমরা অহং ছাড়িয়ে যাই ও প্রকৃতিকেও অতিক্রম করি। কেননা তখন আমরা ফিরে যাই আমাদের প্রকৃত আত্মায় ও হয়ে উঠি চিৎপুরুষ; চিৎপুরুষেই আমরা প্রকৃতির তাড়নার ঊর্ধ্বে থাকি, তার গুণ ও শক্তির অধিপতি হই। অন্তঃপুরুষে, মনে ও হৃদয়ে পরিপূর্ণ সমত্ব পেয়ে আমরা উপলব্ধি

করি আমাদের একত্বময় সত্যকার আত্মা যা সর্বভূতের সঙ্গে এক এবং যা তাঁর সঙ্গেও এক যিনি এই সবের মধ্যে এবং যা সব আমরা দেখি ও জানি সে সবেও নিজেকে প্রকাশ করেন। দিব্য সত্তা, দিব্য চেতনা ও দিব্য ক্রিয়ার জন্য এই সমত্ব ও এই একত্বের অপরিহার্য যুগল ভিত্তি আমাদের স্থাপন করা চাই। সকলের সঙ্গে এক না হলে আমরা অধ্যাত্মভাবে দিব্য হই না। সকল বিষয়ে, ঘটনায় ও জীবে আমাদের অন্তঃপুরুষ সমভাবাপন্ন না হলে আমরা অধ্যাত্মভাবে দেখতে, দিব্যভাবে জানতে ও দিব্যভাবে অপরের প্রতি অনুভব করতে অসমর্থ হই। পরম শক্তি, একমাত্র সনাতন ও অনন্ত সকল বিষয়ে ও সকল সত্তায় সম, এবং সম বলেই একান্ত প্রজ্ঞার সঙ্গে তার কর্ম ও শক্তির সত্যানুযায়ী ও প্রতি বিষয়ের ও প্রতি প্রাণীর সত্যানুযায়ী ক্রিয়ায় তা সমর্থ।

আবার এটিই একমাত্র প্রকৃত স্বাধীনতা যা মানুষের পক্ষে পাওয়া সম্ভব; কিন্তু এই স্বাধীনতা সে পেতে পারে না যতদিন না সে তার মানসিক বিভক্ততা অতিক্রম করে প্রকৃতির মধ্যে সচেতন অন্তঃপুরুষ হয়ে ওঠে। জগতে যে একটিমাত্র স্বাধীন ইচ্ছা আছে তা অখণ্ড দিব্য সঙ্কল্প, প্রকৃতি তাঁর কার্যসাধিকা; কেননা প্রকৃতি অপর সকল সঙ্কল্পের অধিকর্ত্রী ও সৃষ্টিকর্ত্রী। এক অর্থে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা সত্য হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতির গুণের অন্তর্গত সকল বিষয়ের মত এও শুধু আপেক্ষিকভাবে সত্য। মন প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের আবর্তের উপর আরূঢ় হয়ে অনেকগুলি সম্ভাবনার মধ্যে একটি স্থিতিভঙ্গির উপর ভারসাম্য রাখে, এদিক ওদিক ঝুঁকে স্থির হয়, আর মনে করে সে নির্বাচন করেছে; কিন্তু যে শক্তি পিছন থেকে তার নির্বাচন নির্ধারণ করেছে তাকে সে দেখে না, এমনকি অস্পষ্টভাবেও তার কথা জানে না। মনের পক্ষে সে শক্তি দেখা সম্ভব নয়, কারণ ঐ শক্তি এমন কিছু যা সমগ্র ও আমাদের চক্ষে অব্যাকৃত। এই শক্তি যে সব বিশেষ ব্যাকৃতির জটিল বৈচিত্র্যের সাহায্যে তার বিভিন্ন অমিত উদ্দেশ্য সাধন করে, বড় জোর তাদের মধ্যে কতকগুলিকে মন চিনতে পারে মাত্র কিছুটা স্পষ্ট ও নির্ভুলভাবে। মন নিজেই আংশিক, চেপে বসে যন্ত্রের একটি অংশের উপর, কাল ও পরিবেশের মধ্যে যে সব শক্তি যন্ত্রকে চালায় তাদের দশভাগের নয়ভাগই মনের অজ্ঞাত, যন্ত্রের অতীত প্রস্তুতি ও ভবিষ্যৎ গতির কথাও সে জানে না; কিন্তু যন্ত্রের উপর আরূঢ় বলেই সে মনে করে যে সে যন্ত্রটিকে চালাচ্ছে। এক অর্থে এরও মূল্য আছে: কারণ মনের এই যে সুস্পষ্ট ঝোঁক যাকে আমরা আমাদের সঙ্কল্প বলি, তার যে দৃঢ় স্থিরতা আমাদের কাছে মনে হয় বিবেচিত নির্বাচন তা প্রকৃতির অতীব শক্তিশালী নির্ধারকসমূহের অন্যতম; কিন্তু এটি কখনও স্বাধীন ও একক নয়। মানবসঙ্কল্পের এই ক্ষুদ্র তটস্থ ক্রিয়ার পশ্চাতে বিশাল ও শক্তিশালী ও শাশ্বত এমন কিছু আছে যা উপর থেকে ঝোঁকের প্রবণতা দেখে সঙ্কল্পের মোড়ের উপর চাপ দেয়। আমাদের ব্যষ্টিগত নির্বাচন অপেক্ষা মহত্তর এক সমগ্র সত্য প্রকৃতিতে আছে। আর এই সমগ্র সত্যের ভিতর, এমনকি তা ছাড়িয়েও তার পশ্চাতে এমন কিছু আছে যা সকল পরিণতির নির্ধারক; এর উপস্থিতি ও গূঢ় জ্ঞান প্রকৃতির কর্মপ্রণালীর মধ্যে অবিচলিতভাবে রক্ষা করে যথাযথ বিভিন্ন সম্বন্ধের স্ফুরন্ত, প্রায়-স্বয়ংক্রিয় বোধ, পরিবর্তনশীল বা দৃঢ় সব রীতি, গতিবৃত্তির অবশ্যম্ভাবী বিভিন্ন ক্রম।

স্ফুরন্ত এক সনাতন ও অনন্ত, সর্বজ্ঞ ও সর্বক্ষম গূঢ় দিব্য সঙ্কল্প বিদ্যমান যা নিজেকে প্রকাশিত করছে বিশ্বভাবের মধ্যে ও এইসব আপাতপ্রতীয়মান অনিত্য ও সান্ত, অচেতন বা অর্ধ-সচেতন প্রতিটি বস্তুবিশেষের মধ্যে। গীতায় যে বলা হয়েছে যে সর্বভূতের হৃদ্দেশে অধিষ্ঠিত ঈশ্বর নিজ মায়ার দ্বারা সর্বপ্রাণীকে যন্ত্রারূঢ়বৎ ঘুরাচ্ছেন তার অর্থ এই শক্তি বা উপস্থিতি।

এই দিব্য সঙ্কল্প আমাদের বাইরের ভিন্ন কোন শক্তি বা উপস্থিতি নয়; এ হল আমাদের অন্তরঙ্গ এবং আমরা নিজেরা তার অংশ; কারণ আমাদেরই পরমাত্মা এর অধিকর্তা ও ভর্তা। তবে, এটি আমাদের সচেতন মানসিক সঙ্কল্প নয়; আমাদের সচেতন সঙ্কল্প যা করে এটি প্রায়শঃই তা প্রত্যাখ্যান করে এবং আমাদের সঙ্কল্প যা প্রত্যাখ্যান করে এটি তা গ্রহণ করে। কেননা এই গূঢ় পরম এক জানেন সবকিছু, প্রতি সমগ্র ও প্রত্যেক খুঁটিনাটি, অথচ আমাদের উপরভাসা মন জানে বিষয়সমূহের এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। আমাদের সঙ্কল্প মনের মধ্যে সচেতন, আর যা সে জানে তা জানে শুধু মননের দ্বারা; দিব্য সঙ্কল্প আমাদের নিকট অতিচেতন কারণ স্বরূপতঃ তা হল অতিমানসিক আর সে সবকিছু জানে কেননা সেই সবকিছু। এই বিশ্বশক্তির অধিকর্তা ও ভর্তা আমাদের যে পরমাত্মা তিনি আমাদের অহং-আত্মা নন, আমাদের ব্যক্তিগত প্রকৃতি নন; ইনি বিশ্বাতীত ও বিশ্বাত্মক এমন কিছু যার ফেনা ও প্রবহমান উপরিভাগ মাত্র এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়। যদি আমরা আমাদের সচেতন সঙ্কল্প সমর্পণ করে এটিকে সনাতনের সঙ্কল্পের সঙ্গে এক করে দিতে রাজী হই, তাহলে, এবং শুধু এইভাবেই আমরা পাই প্রকৃত স্বাধীনতা; দিব্য স্বাধীনতার মধ্যে বাস করে আমরা আর এই শৃঙ্খলাবদ্ধ তথাকথিত স্বাধীন ইচ্ছা আঁকড়ে থাকব না; এ স্বাধীনতা পুতুলের স্বাধীনতা — অবিদ্যাময়, অলীক, আপেক্ষিক, নিজের সব স্বল্প প্রাণিক প্রেরণা ও মানসিক সঙ্কেতের ভ্রান্তিতে আবদ্ধ।

একটি পার্থক্যের বিষয় আমাদের চেতনায় দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ করা চাই — তা হল যান্ত্রিক প্রকৃতি ও প্রকৃতির স্বাধীন প্রভুর মধ্যে, ঈশ্বর বা একমাত্র জ্যোতির্ময় দিব্য সঙ্কল্প ও বিশ্বের নানা কার্যসাধক প্রকার ও শক্তির মধ্যে বিশিষ্ট পার্থক্য।

প্রকৃতি, — তবে তিনি স্বরূপতঃ তাঁর দিব্য সত্যে সনাতনের যে চিন্ময়ী শক্তি সেভাবে নয়, অবিদ্যার মাঝে তিনি যেভাবে আমাদের কাছে প্রতিভাত হন সেইভাবে — এক কার্যসাধিকা শক্তি যার পদক্ষেপ যান্ত্রিক আর তার সম্বন্ধে আমাদের যে অভিজ্ঞতা তাতে সে সচেতনভাবে বুদ্ধিসম্পন্না নয়, যদিও তার সকল কর্মই এক পরম বুদ্ধির দ্বারা অনুস্যূত। নিজে ঈশানী না হয়েও সে এমন এক আত্মবিৎ শক্তিতে[১] পূর্ণ যার ঈশিত্ব অসীম এবং এই শক্তি তাকে চালায় বলে সে সকল কিছুর নিয়ন্ত্রী এবং ঈশ্বর তার মধ্যে

[১] এই শক্তি ঈশ্বরের সচেতন দিব্য শক্তি, ইনিই বিশ্বাতীত ও বিশ্বাত্মিকা জননী।

যে কাজ অভিপ্রায় করেন তা সে সম্পন্ন করে সঠিকভাবে। সে ভোগ করে না, সে-ই ভোগ্যা আর নিজের মধ্যে সমস্ত ভোগসম্ভার বহন করে। নিসর্গরূপে এই প্রকৃতি এক অচেতন সক্রিয় শক্তি, কারণ সে সিদ্ধ করে তার উপর আরোপিত এক গতিবৃত্তিকে; কিন্তু তার মধ্যে আছেন জ্ঞাতা পরম এক, — সেখানে সমাসীন এক পরম সত্তা যিনি তার সকল গতি ও প্রণালীর কথা অবগত। প্রকৃতি কাজ করে তার সঙ্গে যুক্ত বা তার অন্তরাসীন পুরুষের জ্ঞান, ঈশিত্ব, আনন্দের আধার হয়ে, কিন্তু যা তাকে পূর্ণ করে আছে তার অধীন হয়ে ও তাকে প্রতিফলিত করেই সে ঐসবের অংশভাগী হতে সমর্থ। পুরুষ জ্ঞাতা, এবং অচঞ্চল ও নিষ্ক্রিয়; তিনি তাঁর চেতনা ও জ্ঞানের মধ্যে প্রকৃতির ক্রিয়া ধারণ করেন ও তা ভোগ করেন। তিনি প্রকৃতির কর্মের অনুমতি দেন, এবং তিনি যা অনুমতি দেন প্রকৃতি তা-ই সিদ্ধ করে তাঁর তুষ্টির জন্য। পুরুষ নিজে কার্যসাধন করেন না; তিনি প্রকৃতিকে তার ক্রিয়ার মধ্যে ধারণ করেন এবং নিজের জ্ঞানে যা অনুভব করেন প্রকৃতিকে অনুমতি দেন তা ফুটিয়ে তুলতে শক্তিতে, প্রণালীতে ও সিদ্ধ পরিণতিতে।এই পার্থক্য করা হয়েছে সাংখ্য দর্শনে; এবং যদিও এটি সমগ্র যথার্থ সত্য নয়, আর কোন প্রকারেই পুরুষ বা প্রকৃতি কারও পরতম সত্য নয়, তবুও এটি সৃষ্টির অপরার্ধে এক প্রামাণ্য ও অপরিহার্য ব্যবহারিক জ্ঞান।

এই জ্ঞাতা পুরুষ বা এই সক্রিয়া প্রকৃতির সঙ্গে রূপের মধ্যস্থ ব্যষ্টি পুরুষ বা সচেতন সত্তা নিজেকে একাত্ম করতে সক্ষম। যদি সে প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে তাহলে সে ঈশান, ভোক্তা ও জ্ঞাতা নয়, সে প্রকৃতির বিভিন্ন গুণ ও কর্মপ্রণালী প্রতিফলিত করে। এই একাত্মতার দ্বারা সে প্রকৃতির যা বৈশিষ্ট্য — অধীনতা ও যান্ত্রিক কর্মপ্রণালী তার মধ্যে প্রবেশ করে। এবং এমনকি প্রকৃতির মধ্যে সম্পূর্ণ নিমগ্ন হয়ে মাটি ও ধাতুর ন্যায় তার বিভিন্ন রূপের মধ্যে সুপ্ত ও উদ্ভিদ জীবনের মধ্যে সুপ্ত-প্রায় থেকে এই অন্তঃপুরুষ হয়ে পড়ে নিশ্চেতন বা অচেতন। সেখানে সেই নিশ্চেতনার মধ্যে সে তমঃ-এর অধিকারভুক্ত, এই তমঃ অন্ধকার ও নিশ্চেষ্টতার তত্ত্ব, শক্তি, গুণগত প্রকার; সত্ত্ব ও রজঃ সেখানে থাকে, তবে তারা তমঃ-এর পুরু আবরণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন। চেতনার নিজস্ব যথাযথ প্রকৃতির মধ্যে উদ্বর্তনের অবস্থায়, কিন্তু তখনও প্রকৃতিতে তমঃ-এর আধিপত্য বড় বেশী থাকায় দেহগত সত্তা তখনও যথার্থতঃ সচেতন না হলেও উত্তরোত্তর রজঃ-এর অধীন হয়; এই রজঃ কামনা ও সহজাত সংস্কারের দ্বারা চালিত মনোবেগ ও ক্রিয়ার তত্ত্ব, শক্তি ও গুণগত প্রকার। এই অবস্থায় গঠিত ও পুষ্ট হয় পশুপ্রকৃতি যার চেতনা সঙ্কীর্ণ, বুদ্ধি প্রাথমিক, প্রাণিক অভ্যাস ও সংবেগ রজসো-তামসিক। বিরাট নিশ্চেতনা থেকে অধ্যাত্মপাদের অভিমুখে আরো কিছুদূর উদ্বর্তনের অবস্থায় দেহগত সত্তা মুক্ত করে সত্ত্ব, আলোর প্রকার এবং লাভ করে আপেক্ষিক স্বাধীনতা ও ঈশিত্ব ও জ্ঞান এবং তার সাথে আন্তর তৃপ্তি ও সুখের সীমিত ও পরিচ্ছন্ন বোধ। মানুষ, স্থূলদেহের মধ্যে মনোময় সত্তা এই রকমেরই হওয়া উচিত, কিন্তু এই বিপুল সংখ্যক অন্তঃপুরুষ-অধ্যুষিত দেহের মধ্যে অল্প সংখ্যকেরই মনোময় সত্তা ঐ রকমের। সাধারণতঃ তার মাঝে অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথ্বী-নিশ্চেষ্টতা ও ক্লিষ্ট অবিদ্যাময় পাশব

প্রাণশক্তির আধিক্য এত বেশী যে তার পক্ষে জ্যোতি ও আনন্দের অন্তঃপুরুষ বা এমনকি সুষম সঙ্কল্প ও জ্ঞানের মনও হওয়া অসম্ভব। এখানে মানুষের মাঝে আছে মুক্ত, ঈশান, জ্ঞাতা ও ভোক্তা পুরুষের প্রকৃত স্বভাবের দিকে এক উৎক্রান্তি যা অসম্পূর্ণ ও এখনও বাধাগ্রস্ত ও ব্যাহত। কেননা, মানুষী ও পার্থিব অভিজ্ঞতায় এই সব গুণ আপেক্ষিক, কোনটিই তার একক ও অনপেক্ষ ফল দেয় না; সকলেই পরস্পরের সঙ্গে মিশ্রিত, কোন স্থানেই কোনটিরও শুদ্ধ ক্রিয়া নেই। এই সবের বিশৃঙ্খলা ও চঞ্চল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা নির্ধারিত হয় প্রকৃতির অনিশ্চিত তুলাদণ্ডে দোলায়মান অহমাত্মক মানবচেতনার সব অনুভূতি।

প্রকৃতির মধ্যে দেহগত অন্তরপুরুষের নিমজ্জনের নিদর্শন হল অহং-এর সীমার মধ্যে চেতনার আবদ্ধতা। এই সীমিত চেতনার সুস্পষ্ট ছাপ দেখা যায় মন ও হৃদয়ের সতত অসমতায় এবং অনুভূতির সংস্পর্শে তাদের বিচিত্র সব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বিশৃঙ্খল সংঘর্ষে ও বৈষম্যে। একদিকে প্রকৃতির কাছে অন্তঃপুরুষের অধীনতা ও অন্যদিকে ঈশনা ও ভোগের জন্য তার সংগ্রাম যা প্রায়শঃই তীব্র কিন্তু সঙ্কীর্ণ এবং বেশীরভাগই নিষ্ফল — এই দুয়ের দ্বারা সৃষ্ট দ্বন্দ্বসমূহের মাঝে মানুষের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সতত দোলায়মান। সফলতা ও বিফলতা, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, শুভ ও অশুভ, পাপ ও পুণ্য, হর্ষ ও বিষাদ, দুঃখ ও সুখ — প্রকৃতির এইসব লোভনীয় ও কষ্টকর বিপরীত দ্বন্দ্বের অন্তহীন পাকের মধ্যে আবর্তিত হয় অন্তঃপুরুষ। এইসব বিষয় থেকে সে মুক্ত হয়ে এই কার্যসাধিকা জগৎ-প্রকৃতির সঙ্গে তার সঠিক সম্বন্ধের সন্ধান পায় কেবল তখনই যখন সে প্রকৃতির মাঝে তার নিমজ্জন থেকে জেগে উঠে অনুভব করে পরম একের সঙ্গে তার একত্ব ও সর্বভূতের সঙ্গে তার একত্ব। তখন প্রকৃতির সব অবর প্রকারে সে হয়ে ওঠে নির্বিকার, তার দ্বন্দ্বসমূহে সমচিত্ত, আর পায় ঈশনা ও মুক্তির সামর্থ্য, স্বীয় শাশ্বত সত্তার শান্ত প্রগাঢ় অবিমিশ্র আনন্দে পূর্ণ হয়ে সে সমাসীন হয় প্রকৃতির ঊর্ধ্বে উচ্চ রাজাসনে অধিষ্ঠিত জ্ঞাতা ও সাক্ষীরূপে। দেহগত চিৎপুরুষ তার সব শক্তি প্রকাশ করতে থাকে ক্রিয়ার মধ্যে, কিন্তু আর সে অবিদ্যার মধ্যে আচ্ছন্ন নয়, আর সে তার কর্মের দ্বারা বদ্ধ নয়; তার মধ্যে আর তার ক্রিয়ার কোন ফল থাকে না, ফল শুধু বাইরে, প্রকৃতিতে। তার অনুভূতিতে প্রকৃতির সমগ্র গতিধারা হয়ে ওঠে উপরে তরঙ্গের ওঠাপড়ার মত, কিন্তু তাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না তার নিজের অতলস্পর্শী গভীর শান্তি, তার ব্যাপ্ত আনন্দ, তার বিরাট বিশ্বব্যাপী সমত্ব বা নিঃসীম ভগবৎ-জীবন।[১]

[১] গীতার দর্শনের সব কথা নির্বিবাদে স্বীকার করা কর্মযোগের পক্ষে অপরিহার্য নয়। ইচ্ছা করলে আমরা তাকে দেখতে পারি মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতির এক বিবরণ বলে যা যোগের ব্যবহারিক ভিত্তি হিসেবে প্রয়োজনীয় ও এ হিসেবে এটি সম্পূর্ণ প্রামাণিক এবং এক উচ্চ ও ব্যাপ্ত অনুভূতির সঙ্গে এর পূর্ণ সঙ্গতি আছে। এই কারণে আমি এর কথা এখানে বলা ভাল মনে করেছি, তবে যথাসম্ভব আধুনিক চিন্তার ভাষায়, আর যা সব মনোবিজ্ঞানের অন্তর্গত না হয়ে তত্ত্ববিদ্যার অন্তর্গত সে সব বাদ দিয়েছি।

এইসব আমাদের সাধনার সর্ত আর তারা তার এমন এক আদর্শ নির্দেশ করে যা প্রকাশ করা যায় এই সকল বা অনুরূপ সূত্রাবলীতে।

ভগবানের মধ্যে বাস, অহং-এ নয়, বিশাল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে সর্বভূতের অন্তঃপুরুষ ও বিশ্বাতীতের চেতনায় বিচরণ, ক্ষুদ্র অহমাত্মক চেতনায় নয়।

সকল ঘটনা ও সকল সত্তায় পরিপূর্ণভাবে সম হওয়া এবং নিজের সঙ্গে তারা এক ও ভগবানের সঙ্গে তারা এক — এইভাবে দেখা ও অনুভব করা। অনুভব করা যে সবকিছুই নিজের মধ্যে ও সবকিছুই ভগবানের মধ্যে; অনুভব করা যে ভগবান সবকিছুর মধ্যে এবং নিজেও সবকিছুর মধ্যে।

কর্ম করা ভগবানের মধ্যে থেকে, অহং-এর মধ্যে নয়। এবং এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে প্রয়োজন কর্ম নির্বাচন করা আমাদের উর্ধ্বের পরতম সত্যের আদেশ অনুযায়ী, ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও মান অনুসারে নয়। এরপর, আমরা অধ্যাত্ম চেতনায় যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হওয়া মাত্র আর আমাদের পৃথক সঙ্কল্প ও গতিবৃত্তিতে কাজ না করা, বরং যে দিব্য সঙ্কল্প আমাদের ছাড়িয়ে উর্ধ্বে বিরাজমান উত্তরোত্তর তাঁর প্রবর্তনা ও দেশনার অধীনে ক্রিয়াকে ঘটতে ও বিকশিত হতে দেওয়া। এবং পরিশেষে, আর এটিই পরম পরিণতি, জ্ঞানে, শক্তিতে, চেতনায়, কর্মে, জীবনের আনন্দে দিব্যশক্তির সঙ্গে তাদাত্ম্যে উন্নীত হওয়া; এমন এক স্ফুরন্ত গতিবৃত্তি অনুভব করা যা মর্ত্য কামনার এবং প্রাণিক সহজ সংস্কার ও সংবেগের এবং অলীক মানসিক স্বাধীন ইচ্ছার প্রভাবাধীন নয়, বরং যা অমর আত্মরতি ও অনন্ত আত্মজ্ঞানের মধ্যে দীপ্তভাবে ভাবিত ও ব্যক্ত। কারণ দিব্য পরমাত্মা ও সনাতন পরম চিৎপুরুষের মাঝে প্রাকৃত মানুষের সচেতন অধীনতা ও নিমজ্জনের দ্বারাই এই ক্রিয়ার উৎপত্তি; এই পরম চিৎপুরুষই চিরদিন জগৎপ্রকৃতির উর্ধ্বে অবস্থিত হয়ে তাকে চালনা করেন।

কিন্তু আত্মশিক্ষার কি কি কার্যকরী উপায়ের সাহায্যে আমরা এই সিদ্ধিলাভে সমর্থ?

স্পষ্টতঃ আমাদের বাঞ্ছিত সিদ্ধির চাবিকাঠি হল — সকল অহমাত্মক কর্মের ও তাদের ভিত্তি যে অহমাত্মক চেতনা তার বিলোপসাধন। এবং যেহেতু কর্মমার্গের ক্রিয়াই সেই গ্রন্থি যা আমাদের প্রথম মোচন করা চাই, সেহেতু আমাদের চেষ্টা করতে হবে এই গ্রন্থি মোচন করতে সেইখানে যেখানে এর কেন্দ্রীয় বাঁধন অর্থাৎ কামনায় ও অহং-এ; কারণ তা না হলে আমরা কাটব বিক্ষিপ্ত সব দড়ি মাত্র, বন্ধনের আসল জায়গা নয়। এই অবিদ্যাময় ও বিভক্ত প্রকৃতির নিকট আমাদের অধীনতার দুটি গ্রন্থি এই — কামনা ও অহং-বোধ আর এ দুটির মধ্যে কামনার স্বধাম হল বিভিন্ন ভাবাবেগে ও ইন্দ্রিয় সংবিতে ও সহজ সংস্কারে আর সেখানে থেকে সে প্রভাবান্বিত করে মনন ও সঙ্কল্পকে; অবশ্য এইসব গতিবৃত্তির মধ্যেই অহংবোধের বাস কিন্তু তা চিন্তাশীল মন ও তার সঙ্কল্পের

মধ্যেও গভীর শিকড় বিস্তার করে এবং সেখানেই সে হয়ে ওঠে পূর্ণ আত্মসচেতন। মোহাচ্ছন্নকারী ও জগৎজোড়া অবিদ্যার এই যে দুই তামসী শক্তি তাদের দীপ্ত ও বিলুপ্ত করাই আমাদের কর্তব্য।

ক্রিয়ার ক্ষেত্রে কামনার নানারূপ, কিন্তু এসবের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হল আমাদের কর্মফলের জন্য প্রাণিক আত্মার লালসা বা আকাঙ্ক্ষা। যে ফল আমরা আকাঙ্ক্ষা করি তা হতে পারে আন্তরসুখের পুরস্কার; কোন ভাবনা যা আমরা বেশী পছন্দ করি বা কোন সঙ্কল্প যা আমরা পোষণ করেছি তারও সিদ্ধি তা হতে পারে অথবা তা হতে পারে বিভিন্ন অহমাত্মক ভাবাবেগের তৃপ্তি আর না হয় আমাদের সর্বোচ্চ আশা আকাঙ্ক্ষার সাফল্যের গর্ব। অথবা এই ফল হতে পারে কোন বাহ্য পুরস্কার, সম্পূর্ণ জড়ীয় কোন ক্ষতিপূরণ — ধন, পদ, সম্মান, বিজয়, সৌভাগ্য অথবা প্রাণগত বা দেহগত অন্য কামনার তৃপ্তি। কিন্তু সবই এক রকমের; অহন্তা যে সব প্রলোভনের সাহায্যে আমাদের ধরে রাখে এরা তা-ই। প্রভুত্বের বোধ ও স্বাধীনতার ভাবনার সাহায্যে এই সব তৃপ্তি সর্বদাই আমাদের ভুলিয়ে রাখে, অথচ আসলে যে অন্ধ কামনা জগৎ চালায় তারই কোন স্থূল বা সূক্ষ্ম, মহৎ বা নীচ রূপ আমাদের আবদ্ধ ক'রে তার পথে নিয়ে যায় অথবা আমাদের উপর আরূঢ় হয়ে চাবুক মেরে তাড়না ক'রে। সেজন্য গীতায় ক্রিয়ার যে প্রথম বিধি নির্দিষ্ট করা হল তা এই যে কর্মফলের জন্য কামনা-শূন্য হয়ে কর্তব্য কর্ম করা চাই, অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম সাধন।

এই বিধি দেখতে সহজ কিন্তু একান্ত সরলতা ও মুক্তিপ্রদ সমগ্রতার ভাব নিয়ে এটি পালন করা কত কঠিন। আমাদের বেশীরভাগ কাজেই আমরা এই নীতি আদৌ অনুসরণ করলে তা করি খুবই সামান্য এবং যেখানে অনুসরণ করা হয়, সেখানেও প্রধানতঃ তা করা হয় কামনার সাধারণ নীতির বিপরীত টান হিসেবে এবং ঐ উৎপীড়ক সংবেগের চরম মাত্রা উপশমের জন্য। বড় জোর, আমরা আমাদের অহন্তাকে কিছু সংশোধিত ও সংযত করি যাতে আমাদের সুনীতিবোধে খুব বেশী আঘাত না লাগে ও অপরের পক্ষে তা অত্যধিক পীড়াদায়ক না হয়, আর তাতেই আমরা তুষ্ট থাকি। আর আমাদের এই আংশিক আত্মশিক্ষাকে আমরা নানা নাম ও রূপ দিই; কর্তব্যবোধ, নীতির প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা, সহিষ্ণু দার্শনিকের তিতিক্ষা বা ধর্মভাবযুক্ত নতিস্বীকার, ভগবৎ-অভিপ্রায়ের নিকট শান্ত ও উল্লাসভরা প্রপত্তি — এই সবে আমরা নিজেদের অভ্যস্ত করি অনুশীলনের দ্বারা। কিন্তু গীতার অভিপ্রেত বিষয় এই সব নয়, যদিও স্বস্থানে এদের উপকারিতা আছে, এর লক্ষ্য এমন কিছু যা অনপেক্ষ ন্যূনতাহীন, আপোষহীন, এমন এক ভঙ্গি, এমন মনোভাব যাতে অন্তঃপুরুষের সমগ্র স্থিতি পরিবর্তিত হয়। মনের দ্বারা প্রাণিক সংবেগের সংযম তার বিধি নয়, তার বিধি — অমর চিৎপুরুষের দৃঢ় অচল প্রতিষ্ঠা।

সকল পরিণতিতে, সকল প্রতিক্রিয়ায়, সকল ঘটনাতেই মন ও হৃদয়ের একান্ত সমত্বই গীতাবিহিত মান। সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, মান অপমান, যশ অপবাদ, জয় পরাজয়, সুখের ঘটনা দুঃখের ঘটনা — এ সকলে শুধু অবিচলিত থাকা নয়, সে সব যদি

আমাদের স্পর্শ না করে, ভাবাবেগে কোন চাঞ্চল্য, স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ায় কোন কম্পন, দৃষ্টিতে কোন দাগ না আসে, প্রকৃতির কোন অংশের সাড়ায় কিছুমাত্র বিক্ষোভ বা স্পন্দন না দেখা দেয়, তাহলেই আমরা গীতা-প্রদর্শিত পরমা মুক্তির অধিকারী হই; অন্যথায় নয়। কোন ক্ষুদ্রতম প্রতিক্রিয়া হলে প্রমাণ হবে যে শিক্ষা অপূর্ণ রয়েছে এবং আমাদের কোন অংশ অবিদ্যা ও বন্ধনকে তার বিধান ব'লে স্বীকার ক'রে এখনও পুরনো প্রকৃতি আঁকড়ে আছে। আমাদের আত্ম-জয় মাত্র আংশিক সিদ্ধ হয়েছে; আমাদের প্রকৃতি-ভূমির কোন বিস্তীর্ণ ভাগ জুড়ে বা কোন অংশে বা সামান্যতম স্থানে এটি এখনও অপূর্ণ বা অসিদ্ধ রয়েছে। আর অপূর্ণতার সেই ক্ষুদ্র নুড়িটি ধূলিসাৎ করতে পারে যোগের সমগ্র সিদ্ধি।

সমভাবের সদৃশ কতকগুলি ভাব আছে কিন্তু গীতা যে গভীর ও বিশাল আধ্যাত্মিক সমত্ব শিক্ষা দিয়েছে তার সঙ্গে এ সবের ভুল করা অনুচিত। নৈরাশ্যজনিত নতি স্বীকার একপ্রকার সমত্ব, গর্ব এক প্রকার সমত্ব, কাঠিন্য ও উদাসীনতা আর একপ্রকার সমত্ব, কিন্তু এ সকলেরই প্রকৃতি অহমাত্মক। সাধনার পথে এদের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু তাদের হয় বর্জন, নয় যথার্থ প্রশান্তিতে রূপান্তরিত করতে হবে। এরও উচ্চস্তরের সমত্ব হ'ল স্তোয়িক দার্শনিকের তিতিক্ষার সমত্ব, ভক্তের নতি বা জ্ঞানীর অনাসক্তির সমত্ব, সংসারে বিমুখ ও তার কর্মে উদাসীন অন্তঃপুরুষের সমত্ব। কিন্তু এ সবও যথেষ্ট নয়, চিৎপুরুষের যথার্থ ও পরম স্বাধিষ্ঠিত ব্যাপ্ত সম একত্বের মধ্যে আমাদের প্রবেশের জন্য তারা হতে পারে পথের অগ্রভাগ বা বড় জোর তারা শুধু অন্তঃপুরুষের আত্মবিকাশের প্রারম্ভিক অবস্থা বা অপূর্ণ মানসিক প্রস্তুতি।

কারণ একথা নিশ্চিত যে কোন পূর্ববর্তী পর্যায় ছাড়াই একেবারে অত বৃহৎ পরিণতিলাভ সম্ভব নয়। জগতের বিভিন্ন আঘাতে আমাদের উপরভাসা মন, হৃদয়, প্রাণ প্রবলভাবে বিচলিত হলেও প্রথম আমাদের শিখতে হবে সে সব আঘাত সহ্য করতে, তবে আমাদের সত্তার কেন্দ্রীয় অংশ যেন নির্লিপ্ত ও নীরব থাকে। সেখানে আমাদের জীবনের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর অবিচলিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমাদের কর্তব্য হল আমাদের প্রকৃতির বাহ্য কর্মপ্রণালী থেকে সেই অন্তঃপুরুষকে বিচ্ছিন্ন করা যে পিছন থেকে সবকিছু দেখছে বা নির্লিপ্ত হয়ে অন্তরের গভীরে বিরাজিত। এর পর বিচ্ছিন্ন অন্তঃপুরুষের এই নিষ্ঠা ও স্থিরতাকে তার বিভিন্ন করণে প্রসারিত করে জ্যোতির্ময় কেন্দ্র থেকে অন্ধকারময় পরিধি পর্যন্ত শান্তি বিকিরণ ধীরে ধীরে সম্ভব হয়ে উঠবে। এই কাজের ধারায় আমরা সাময়িকভাবে অনেক ছোট ছোট অবস্থার সাহায্য নিতে পারি; কিছু তিতিক্ষা, কিছু জ্ঞানীর প্রশান্তি, কিছু ধর্মীয় উচ্ছ্বাস আমাদের লক্ষ্যের কিছু কাছাকাছি ধরনের দিকে যাবার সহায় হতে পারে, অথবা এমনকি আমাদের মানসিক প্রকৃতির কম দৃঢ় ও উন্নত অথচ উপকারী বিভিন্ন শক্তির সাহায্যও নিতে পারি। পরিশেষে এই সব হয় বর্জন, নয় রূপান্তরিত করতে হবে এবং তার স্থলে পেতে হবে এক সমগ্র সমত্ব, অন্তরে এক সিদ্ধ স্বাধিষ্ঠিত শান্তি আর এমনকি আমাদের পক্ষে সম্ভব হলে আমাদের সকল

অঙ্গে এক সমগ্র অখণ্ডনীয় আত্মস্থিত ও স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ।

কিন্তু এর পর আমরা আদৌ কাজ করতে থাকব কেমন করে? কারণ সাধারণতঃ মানুষ কাজ করে তার কোন কামনা থাকে বলে, অথবা সে কোন মানসিক, প্রাণিক বা শারীরিক অভাব বা প্রয়োজন অনুভব করে বলে; দেহের প্রয়োজন, ধন, মান বা যশের লালসা, মন বা হৃদয়ের ব্যক্তিগত তৃপ্তির তৃষ্ণা অথবা ক্ষমতা বা সুখের লিপ্সা — এই সবের দ্বারা সে চালিত হয়। অথবা না হয় কোন নৈতিক প্রয়োজনবোধ কিংবা অন্ততঃ নিজের ভাবনা বা নিজের আদর্শ বা নিজের সঙ্কল্প বা নিজের দল, নিজের দেশ বা নিজের দেবতাদের জগতে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন বা কামনা তাকে পেয়ে বসে আর তাকে ঘুরিয়ে বেড়ায়। যদি এইসব কামনার কোনটিকেই বা অন্য কোন কামনাকে আমাদের ক্রিয়ার উদ্দীপক না করা হয় তাহলে মনে হয় যেন সকল প্রবৃত্তি বা প্রবর্তক শক্তি অপসারিত হয়েছে এবং সেহেতু ক্রিয়ারও অবসান অবশ্যম্ভাবী। এ বিষয়ে গীতার উত্তর পাওয়া যাবে দিব্যজীবন সম্বন্ধে তার তৃতীয় পরম রহস্যে। সকল কর্ম করা চাই উত্তরোত্তর ভগবৎ-অভিমুখী চেতনায় ও অবশেষে ভগবৎ-অধিকৃত চেতনায়; আমাদের সকল কর্ম হবে ভগবানের নিকট যজ্ঞ; এবং পরিশেষে পরম একের নিকট আমাদের সকল সত্তা, মন, সঙ্কল্প, হৃদয়, ইন্দ্রিয়বোধ, প্রাণ ও দেহের সমর্পণের ফলে ভগবৎ-প্রেম ও ভগবৎ-সেবাই হবে আমাদের একমাত্র প্রবর্তক শক্তি। কর্মের প্রবর্তক শক্তি ও তার মূল প্রকৃতির রূপান্তর সাধনই গীতার মূল তত্ত্ব; কর্ম, প্রেম ও জ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয়ের ভিত্তি এটাই। পরিশেষে কামনা নয়, সচেতনভাবে অনুভূত সনাতনের সঙ্কল্পই থাকে আমাদের ক্রিয়ার একমাত্র চালকরূপে, এর আরম্ভের একমাত্র উৎসরূপে।

সমত্ব, আমাদের কর্মফলের কামনা ত্যাগ এবং আমাদের প্রকৃতির ও সকল প্রকৃতির পরমেশ্বরের নিকট যজ্ঞরূপে ক্রিয়ানুষ্ঠান — এই তিনটিই গীতার কর্মযোগ পন্থায় ভগবানের দিকে যাবার প্রাথমিক পথ।

চতুর্থ অধ্যায়

যজ্ঞ, ত্রয়াত্মক মার্গ ও যজ্ঞেশ্বর

জগতের আদিতে যে সাধারণ দিব্যক্রিয়া জগতের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল বিশ্বের সংহতির প্রতীক হিসেবে তা যজ্ঞের বিধান। এই বিধানের আকর্ষণেই নেমে আসে এক দিব্যত্বসাধিকা উদ্ধারিনী শক্তি, — অহমাত্মক ও আত্ম-বিভক্ত সৃষ্টির সকল ভ্রান্তি সীমিত ও সংশোধিত ও ক্রমশঃ বিদূরিত করার উদ্দেশ্যে। এই অবতরণ, পুরুষের এই যজ্ঞ, শক্তি ও জড়কে অনুস্যূত ও দীপ্ত করার জন্য তাদের নিকট দিব্য পুরুষের বশ্যতা স্বীকার — এই হল অচিতি ও অবিদ্যার এই জগতের মুক্তির বীজ। কারণ, গীতার কথায় "প্রজাপতি এইসব জীব সৃষ্টি করেছিলেন যজ্ঞকে তাদের সাথী করে"। অহং-এর পক্ষে এই যজ্ঞের বিধান স্বীকার করার অর্থ তার কার্যতঃ এই মেনে নেওয়া যে সে জগতে একলা নয় বা প্রধান নয়। এ হল তার এই স্বীকৃতি যে এই বহু খণ্ডিত জীবনেও তাকে ছাড়িয়ে ও তার পশ্চাতে এমন কিছু বর্তমান যা তার নিজের অহমাত্মক ব্যক্তি নয়, যা মহত্তর ও পূর্ণতর কিছু, এক দিব্যতর সর্ব যা তার কাছে দাবী করে আনুগত্য ও সেবা। বস্তুতঃ সার্বিক জগৎ-শক্তি যজ্ঞ আরোপিত করে এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে জোর করে আদায় করে; যারা সজ্ঞানে এই বিধান স্বীকার করে না তাদের কাছ থেকেও সে এটি আদায় করে, — অবশ্যম্ভাবীরূপে কারণ এ হল বিষয়সমূহের স্বাভাবিক প্রকৃতি। আমাদের অবিদ্যা বা জীবন সম্বন্ধে আমাদের মিথ্যা অহমাত্মক দৃষ্টি প্রকৃতির এই শাশ্বত দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত সত্যের কোন ব্যতিক্রম করতে অসমর্থ। কেননা প্রকৃতির মধ্যে সত্য এই যে, — এই অহং যা নিজেকে মনে করে এক পৃথক স্বাধীন সত্তা এবং নিজেরই জন্য বাঁচার দাবী করে সে স্বাধীনও নয়, পৃথকও নয় আর তা হতেও পারে না, আবার এমনকি ইচ্ছা করলেও সে শুধু নিজেকে নিয়ে থাকতে পারে না, বরং সকল কিছুই এক নিগূঢ় একত্বের সূত্রে গাঁথা। প্রতি সত্তা বাধ্য হয়ে তার ভাণ্ডার থেকে অবিরত বাইরে দিয়ে যাচ্ছে; প্রকৃতি থেকে তার মন যা পায় তা থেকে অথবা তার প্রাণ ও দেহের বিভব ও আহরণ ও সম্পত্তি থেকে স্রোত বয়ে যায় তার চারিদিককার সব কিছুর মধ্যে। আবার সর্বদাই সে তার পরিবেশ থেকে কিছু পায় তার ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত দানের বিনিময়ে। কারণ কেবলমাত্র এই আদানপ্রদানের দ্বারাই সে তার নিজের বিকাশসাধন করে আবার সেই সঙ্গে বিষয়সমূহের সমষ্টিকেও সাহায্য করে। অবশেষে আমরা সচেতনভাবে যজ্ঞ করতে শিখি, যদিও প্রথম প্রথম তা হয় ধীরে ধীরে ও আংশিক ভাবে; এমনকি শেষে আমরা আনন্দ পাই নিজেদের এবং যা কিছু নিজেদের বলে মনে করি সে সবও প্রেম ও ভক্তিভরে সমর্পণ করতে তৎ-এর কাছে যা সেই মুহূর্তে মনে হয় আমাদের ছাড়া অন্য কিছু এবং বাস্তবিকই আমাদের সব সীমিত ব্যক্তিভাবনা থেকে অন্য কিছু। তখন যজ্ঞকে

ও আমাদের যজ্ঞের বিনিময়ে দিব্য প্রতিদানকে আমরা সানন্দে স্বীকার করি আমাদের চরম সিদ্ধিলাভের উপায় হিসেবে; কারণ এখন জানতে পারি যে এই হল শাশ্বত উদ্দেশ্য পূর্ণ করার পথ।

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যজ্ঞ করা হয় অচেতনভাবে, অহমাত্মকভাবে এবং মহতী জগৎ-ক্রিয়ার অর্থ না জেনে বা স্বীকার না করে। অধিকাংশ পার্থিব জীবই তা করে এভাবে, আর এভাবে করা হয় বলে ব্যষ্টি পায় শুধু স্বাভাবিক অবশ্যম্ভাবী লাভের যান্ত্রিক ন্যূনতম মাত্রা এবং তা দিয়ে তার যে অগ্রগতি সাধিত হয় তা-ও মন্থর ও যন্ত্রণাপূর্ণ এবং অহং-এর ক্ষুদ্রতা ও দুঃখভোগের দ্বারা সীমিত ও প্রপীড়িত। যখন হৃদয়, সঙ্কল্প ও জ্ঞানের মন বিধানের সহযোগী হয়ে সানন্দে তা অনুসরণ করে, কেবল তখনই আসতে পারে দিব্যযজ্ঞের গভীর আনন্দ ও সুখময় সফলতা। বিধান সম্বন্ধে মনের জ্ঞান ও তাতে হৃদয়ের আনন্দের পরিণতিতে এই অনুভূতি আসে যে আমরা দান করি তাঁর কাছে যিনি আমাদের নিজেদেরই পরমাত্মা ও পরম চিৎপুরুষ এবং সকলের এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা ও পরম চিৎপুরুষ। আর এমনকি যখন আমাদের আত্মনিবেদন অপর মানুষের কাছে বা নিম্নতর শক্তি ও তত্ত্বের কাছে, পরতমের কাছে নয়, তখনও সে নিবেদন হয় পরমাত্মা ও পরম পুরুষের কাছে। উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, "পত্নী যে আমাদের কাছে প্রিয় তা পত্নীর জন্য নয়, আত্মার জন্য।" ব্যষ্টিআত্মার হীন অর্থে এই উক্তি অহমাত্মক প্রেমের রঙীন ও উদ্দাম-ভাবযুক্ত বাহ্য অঙ্গীকারের পিছনের রূঢ় সত্য; কিন্তু তার উচ্চতর অর্থে এটি সেই প্রেমেরও আন্তর তাৎপর্য যা অহমাত্মক নয়, যা দিব্য। প্রাথমিক অহন্তা ও তার বিভক্ত প্রমাদ যে প্রকৃতিবিরুদ্ধ সকল প্রকৃত প্রেম ও সকল যজ্ঞ স্বরূপতঃ তার প্রমাণ, এদের মাধ্যমেই প্রকৃতি চেষ্টা করে আবশ্যকীয় প্রাথমিক খণ্ডতা থেকে পুনর্লব্ধ একত্বের দিকে যাবার জন্য। বিভিন্ন জীবের মধ্যে সকল ঐক্য স্বরূপতঃ আত্মা-প্রাপ্তি, যা থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়েছি তার সঙ্গে সম্মিলন এবং অপরের মধ্যে নিজ আত্মার আবিষ্কার।

কিন্তু একমাত্র দিব্য প্রেম ও ঐক্যই তা অধিগত করতে পারে আলোকের মধ্যে যা ঐ সবের মানুষীরূপ অন্বেষণ করে অন্ধকারের মধ্যে। কেননা জীবনের সাধারণ প্রয়োজনে মিলিত দেহস্থ কোষাণুগুলির মধ্যে যে সহযোগ ও সমাবেশ দেখা যায়, প্রকৃত ঐক্য শুধু সেইরকম নয়; এমনকি এটি ভাবগত অবধারণ, সমবেদনা, সংহতি বা একত্র সান্নিধ্যও নয়। প্রকৃতির বিভাজনের ফলে যা কিছু আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে তাদের সঙ্গে আমরা প্রকৃত মিলিত হই কেবল তখনই যখন আমরা বিভাজন লোপ করে নিজেদের দেখতে পাই তার মধ্যে যা আমাদের মনে হ'ত আমরা নই। সহযোগ হল শুধু এক প্রাণিক ও শারীরিক ঐক্য; এখানে যজ্ঞের অর্থ পরস্পরের মধ্যে সাহায্য ও সুবিধাদান। সামীপ্য, সমবেদনা, সংহতি দ্বারা এক মানসিক, নৈতিক ও ভাবগত ঐক্যের সৃষ্টি হয়; তাদের যজ্ঞের অর্থ পরস্পরের পালন ও তুষ্টি। কিন্তু প্রকৃত ঐক্য আধ্যাত্মিক, তার যজ্ঞ পারস্পরিক আত্মদান, আমাদের আন্তর ধাতুর সংমিশ্রণ। এই সম্পূর্ণ ও অকুণ্ঠ আত্মদানই প্রকৃতির মধ্যে যজ্ঞবিধানের যাত্রার পরিণতি; এর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয় যজ্ঞের

হোতা ও উদ্দিষ্টের মধ্যে একই সাধারণ আত্মার চেতনা। এমনকি যখন মানুষী প্রেম ও ভক্তি দিব্য হবার প্রয়াস করে তখন তারও পরাকাষ্ঠা যজ্ঞের এই পরিণতি; কারণ সেখানেও প্রেমের উত্তুঙ্গ শিখর প্রবেশ করে সম্পূর্ণ পারস্পরিক আত্মদানের স্বর্গের মধ্যে, এর শীর্ষ, উল্লাসভরা মিলনের ফলে দুই পুরুষের এক হয়ে যাওয়া।

জগদ্ব্যাপী বিধানের এই গভীরতর ভাবনাই কর্ম সম্বন্ধে গীতার শিক্ষার মর্মকথা; যজ্ঞের দ্বারা পরতমের সঙ্গে অধ্যাত্ম মিলন, সনাতনের নিকট অকুণ্ঠ আত্মদান — এই হল গীতার শিক্ষার সার। যজ্ঞ সম্বন্ধে লৌকিক ধারণা এই যে তা হল যন্ত্রণাপূর্ণ আত্ম-বলিদান, কঠোর আত্মনিগ্রহ, দুরূহ আত্মলোপের ক্রিয়া; এমনকি এইরকম যজ্ঞে নিজের অঙ্গহানি ও নিপীড়ন পর্যন্ত করা হতে পারে। মানুষের প্রাকৃত আত্মাকে অতিক্রম করার জন্য তার কঠোর সাধনায় এইসব সাময়িকভাবে প্রয়োজনীয় হতে পারে; যদি তার প্রকৃতিতে অহন্তা উগ্র ও দুর্দম হয় তাহলে তা দমন করার জন্য প্রবল আত্মনিগ্রহ ও উগ্রতার প্রত্যাঘাত কখন কখন আবশ্যক হয়। কিন্তু গীতার উপদেশ নিজের উপর অতিরিক্ত উৎপীড়ন না করা; কারণ ভিতরের আত্মা প্রকৃতপক্ষে বিকাশমান পরম দেবতা, তা হল কৃষ্ণ, তা-ই ভগবান। জগতের অসুররা এর উপর যেমন উপদ্রব ও উৎপীড়ন করে তেমন উপদ্রব ও উৎপীড়ন এর উপর করা উচিত নয়, দরকার তার উত্তরোত্তর পালন, পুষ্টিসাধন এবং দিব্য জ্যোতি ও ক্ষমতা ও আনন্দ ও ব্যাপ্তির দিকে উন্মীলন। নিজের আত্মাকে নয়, চিৎপুরুষের আন্তর শত্রুবাহিনীকেই আমাদের দমন, নির্বাসন ও চিৎপুরুষের বৃদ্ধির বেদীমূলে বলিদান করা চাই; এই যে সব শত্রু, এদের নাম কামনা, ক্রোধ, অসমত্ব, লোভ, বাহ্য সুখ দুঃখের প্রতি আসক্তি; এরাই সেই সব দস্যুদানবের দল যারা মানুষকে জোর করে অধিকার ক'রে অন্তঃপুরুষের প্রমাদ ও দুঃখ যন্ত্রণা সৃষ্টি করে; এই সবকেই নির্দয়ভাবে উচ্ছেদ করা যায়। ভাবতে হবে যে এরা আমাদের নিজেদের অংশ নয়, এরা অনধিকার প্রবেশকারী, এদের কাজ আমাদের আত্মার আসল ও দিব্যতর প্রকৃতিকে বিকৃত করা; "বলি" কথাটির যে কঠোর অর্থ, সেই অর্থে এদের বলি দেওয়া চাই — যাবার সময় তারা সাধকের চেতনায় প্রতিফলনের দ্বারা যত যন্ত্রণাই ফেলে যাক না কেন।

কিন্তু যজ্ঞের সত্যকার সার আত্মবলি নয়, এ হল আত্মদান; এর উদ্দেশ্য আত্মলোপ নয়, আত্মসার্থকতা; এর প্রণালী আত্মনিগ্রহ নয়, বরং মহত্তর জীবন, নিজের অঙ্গহানি নয়, বরং আমাদের প্রাকৃত মানুষী অংশগুলিকে দিব্য অঙ্গে রূপান্তরসাধন, আত্মনিপীড়ন নয়, বরং অল্প তৃপ্তি থেকে মহত্তর আনন্দের মধ্যে যাত্রা। গোড়ায় শুধু একটি জিনিস আছে যা উপরভাসা প্রকৃতির কাঁচা বা পঙ্কিল অংশের পক্ষে কষ্টকর; অপূর্ণ অহং-এর নিমজ্জনের জন্য যে অপরিহার্য শিক্ষা দাবী করা হয়, যে প্রত্যাখ্যান আবশ্যক — এটি তা-ই; কিন্তু তার বিনিময়ে পেতে পারা যায় দ্রুত ও প্রভূত ক্ষতিপূরণ — অপরের মধ্যে, সকল বিষয়ে, বিশ্বের একত্বে, বিশ্বাতীত আত্মা ও চিৎপুরুষের স্বাধীনতায়, ভগবৎ-স্পর্শের উল্লাসে যথার্থ মহত্তর বা চরম সম্পূর্ণতার সন্ধান। আমাদের যজ্ঞ এমন দান নয় অপর পক্ষ থেকে যার কোন প্রতিদান বা ফলপ্রদ গ্রহণ নেই; একদিকে দেহগত

অন্তঃপুরুষ ও আমাদের মধ্যে সচেতন প্রকৃতি এবং অন্যদিকে সনাতন পরম চিৎপুরুষ, এ হল এই উভয়ের মধ্যে আদানপ্রদান। কারণ যদিও কোন প্রতিদান দাবী করা হয় না, কিন্তু তবু আমাদের গভীর অন্তরে এই জ্ঞান থাকে যে এক পরমাশ্চর্য প্রতিদান অবশ্যম্ভাবী। অন্তঃপুরুষ জানে যে সে বৃথাই ভগবানের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করে না; কিছু দাবী না করেই সে পায় দিব্য শক্তির ও সান্নিধ্যের অনন্ত সম্পদ।

পরিশেষে, বিবেচনা করতে হবে যজ্ঞগ্রহীতার কথা ও যজ্ঞের প্রণালীর কথা। যজ্ঞ নিবেদন করা যেতে পারে অপরের উদ্দেশে, বা বিভিন্ন দিব্য শক্তির উদ্দেশে; তা নিবেদিত হতে পারে বিশ্বব্যাপী সর্বের নিকট বা বিশ্বাতীত পরাৎপরের নিকট। পূজার আকারও নানাবিধ হতে পারে; একটি পত্র বা পুষ্প বা এক ঘটি জল বা একমুঠি অন্ন বা একখানি রুটির নিবেদন থেকে আরম্ভ করে তা হতে পারে আমাদের যা কিছু আছে সে সবের উৎসর্গ, আমরা যা কিছু সে সবের সমর্পণ। গ্রহীতা যেই হোক, অর্ঘ্য যাই হোক, এমনকি অব্যবহিত গ্রহীতা অর্ঘ্য প্রত্যাখ্যান বা উপেক্ষা করলেও, সে অর্ঘ্য গ্রহণ ও স্বীকার করেন পরাৎপর, যিনি সকল কিছুর মধ্যে সনাতন। কারণ পরাৎপর বিশ্বাতীত হয়েও এখানেও, যতই প্রচ্ছন্নভাবে হোক, বিরাজিত আমাদের মধ্যে, জগতের মধ্যে, এর সকল ঘটনার মধ্যে। সেখানে তিনি আছেন আমাদের সকল কর্মের সর্বজ্ঞ দ্রষ্টা এবং গ্রহীতা ও তাদের গূঢ় অধীশ্বররূপে। আমাদের সকল ক্রিয়া, সকল প্রচেষ্টা, এমনকি আমাদের পাপ ও পদস্খলন ও কষ্ট ভোগ ও সংগ্রাম তাদের শেষ পরিণতিতে নিয়ন্ত্রিত হয় পরম একের দ্বারাই, আর একথা হয় আমরা অস্পষ্টভাবে বা সচেতনভাবে জানতে পারি ও দেখতে পারি, অথবা তা হয় আমাদের অজ্ঞাতে ও ছদ্মবেশে। তাঁর অগণিত রূপের মাঝে তাঁর উদ্দেশেই অর্ঘ্যের আয়োজন এবং সে সবের মাধ্যমে অর্ঘ্য নিবেদিত হয় সেই একক সর্বব্যাপীর নিকট। যে আকারে ও যে মনোভাবে আমরা তাঁর দিকে অগ্রসর হই, তিনি যজ্ঞ গ্রহণ করেন সেই আকারে ও সেই মনোভাবে।

আবার কর্মযজ্ঞের ফলও বিভিন্ন হয় কর্ম অনুযায়ী, কর্মের অভিপ্রায় অনুযায়ী এবং অভিপ্রায়ের পশ্চাতে যে মনোভাব আছে তদনুযায়ী। কিন্তু অপর সকল যজ্ঞই আংশিক, অহমাত্মক, মিশ্র, ঐহিক, অপূর্ণ — এমনকি যা সব নিবেদিত হয় সর্বশ্রেষ্ঠ সব শক্তি ও নীতির উদ্দেশে সে সবও ঐ প্রকারের: এসব যজ্ঞের ফলও আংশিক, সীমিত, ঐহিক, প্রতিক্রিয়ায় মিশ্র, আর শুধু ক্ষুদ্র বা মধ্যবর্তী উদ্দেশ্যের পক্ষে কার্যকরী। একমাত্র সম্পূর্ণ গ্রহণীয় যজ্ঞ হল চরম ও সর্বোচ্চ ও পরিপূর্ণ আত্মদান — এ হল সেই সমর্পণ যা করা হয় মুখোমুখি, ভক্তি ও জ্ঞানের সঙ্গে, স্বচ্ছন্দে ও অকুণ্ঠভাবে সেই পরম একের কাছে যিনি একসাথে আমাদের অন্তর্নিহিত আত্মা, পরিবেষ্টনকারী উপাদানস্বরূপ সর্ব, বর্তমান বা যে কোন অভিব্যক্তির অতীত পরম সদ্‌বস্তু এবং যিনি নিগূঢ়ভাবে এই সবকিছু একত্রে, সর্বত্র প্রচ্ছন্ন, বিশ্বগত অতিস্থিত। কারণ যে অন্তঃপুরুষ তাঁর কাছে নিজেকে পুরোপুরি বিলিয়ে দেয়, ভগবানও তার কাছে পুরোপুরি ধরা দেন । যে তার সমগ্র প্রকৃতিকে উৎসর্গ করে, একমাত্র সে-ই পায় পরমাত্মাকে। সর্বময় ভগবানকে সর্বত্র ভোগ করে কেবল সেই যে সবকিছু দিতে পারে। একমাত্র পরম আত্মোৎসর্গই পরাৎপর লাভের উপায়। আমরা যা

সব, যজ্ঞের দ্বারা সেই সবের উর্ধ্বায়নবলেই আমরা সর্বোত্তমকে মূর্ত করে এখানে বাস করতে সমর্থ হই বিশ্বাতীত চিৎপুরুষের বিশ্বগত চেতনার মধ্যে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমাদের কাছে এই দাবী করা হয় যে আমরা যেন আমাদের সমগ্র জীবনকে পরিণত করি এক সচেতন যজ্ঞে। আমাদের সত্তার প্রতি মুহূর্ত ও প্রতি গতিবৃত্তিকে পরিণত করতে হবে সনাতনের নিকট এক নিরবচ্ছিন্ন ও দৃঢ়নিষ্ঠ আত্মদানে। আমাদের সকল ক্রিয়া — যেমন বৃহত্তম, অতি অসামান্য ও মহত্তম ক্রিয়া তেমনই ক্ষুদ্রতম ও অতি সাধারণ ও তুচ্ছতম ক্রিয়া — সম্পাদন করা চাই উৎসর্গীকৃত কর্মরূপে। আমাদের অতীত ও আমাদের অহং অপেক্ষা মহত্তর এক পরম কিছুর নিকট নিবেদিত আন্তর ও বাহ্য গতিবৃত্তির একক চেতনার মধ্যে আমাদের ব্যষ্টিভাবাপন্ন প্রকৃতিকে বাস করতে হবে। আমাদের দানের বস্তু কি এবং কাকে তা দেওয়া হচ্ছে — এসবে কিছু যায় আসে না। দেবার সময় এই চেতনা থাকা চাই যে আমরা তা দিচ্ছি সর্বভূতস্থিত অদ্বিতীয় ভাগবত পুরুষকে। আমাদের সামান্যতম বা অতি স্থূল জড় ক্রিয়াও এই উর্ধ্বায়িত প্রকারের হওয়া চাই; যখন আমরা আহার করি, তখন আমাদের সচেতন হতে হবে যে আমরা খাদ্য দিচ্ছি আমাদের অন্তঃস্থ পরম উপস্থিতিকে; একে হতে হবে দেবালয়ে পবিত্র নৈবেদ্য, এ শুধু দৈহিক প্রয়োজন বা আত্মতৃপ্তি এই বোধ আমাদের লুপ্ত হওয়া চাই। নিজেদের জন্য, অপরের জন্য বা জাতির জন্য যে কোন মহৎ কর্ম, উচ্চ সংযমশিক্ষা, দুরূহ বা মহান্ উদ্যম করা হোক না কেন, সে সব বিষয়ে শুধু জাতির, নিজেদের বা অপরের ভাবনা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা আর সম্ভব হবে না। যে কাজ আমরা করছি তা কর্মযজ্ঞরূপে সচেতনভাবে নিবেদন করা চাই — এদের কাছে নয়, তবে এদের মাধ্যমে বা সরাসরি সেই এক পরম দেবতার কাছে। যে দিব্য অন্তরধিষ্ঠাতা এইসব মূর্তির দ্বারা আচ্ছন্ন ছিলেন তাঁকে আর আচ্ছন্ন অবস্থায় রাখা চলবে না, তাঁর নিত্য উপস্থিতি দরকার আমাদের অন্তঃপুরুষ, আমাদের মন, আমাদের ইন্দ্রিয়ের নিকট। আমাদের কর্মের ধারা ও পরিণতি তুলে দিতে হবে সেই পরম একেরই হাতে এই বোধ নিয়ে যে সেই পরম উপস্থিতিই অনন্ত ও সর্বোত্তম ও একমাত্র তাঁর দ্বারাই আমাদের শ্রম, আমাদের আস্পৃহা সম্ভব। কারণ সকল কিছু ঘটে তাঁরই সত্তায়; তাঁরই জন্য প্রকৃতি সকল শ্রম ও আস্পৃহা আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নিবেদন করে তাঁর বেদীমূলে। এমনকি যে বিষয়ে প্রকৃতি অতি স্পষ্টতঃ নিজেই কর্মী আর আমরা তার কর্ম প্রণালীর শুধু দ্রষ্টা ও তার আধার ও অবলম্বন সে সবেও থাকা উচিত কর্ম ও তার দিব্য অধীশ্বরের সেই সতত স্মৃতি ও সনির্বন্ধ চেতনা। আমাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসকে, আমাদের হৃদয়ের স্পন্দনকে পর্যন্ত বিশ্ব ছন্দরূপে আমাদের মধ্যে সচেতন করা যায় এবং তা-ই করা চাই।

এটা সুস্পষ্ট যে এইপ্রকার ভাবনা এবং এর ফলপ্রসূ অনুশীলনের তিনটি ফল

অবশ্যম্ভাবী, আর আমাদের অধ্যাত্ম আদর্শের পক্ষে এদের গুরুত্ব সমধিক। স্পষ্টতঃ প্রথম ফল এই যে এরূপ সাধনার প্রারম্ভে ভক্তি না থাকলেও, এটি সোজাসুজি ও অবশ্যম্ভাবীরূপে নিয়ে যায় সম্ভবপর সর্বোত্তম ভক্তির দিকে; কারণ স্বভাবতঃই এর গভীরতা বৃদ্ধি পেয়ে এটি সম্ভাব্য পূর্ণতম অনুরাগে ও গভীরতম ভাগবৎপ্রেমে পরিণত হতে বাধ্য। এর সঙ্গে জড়িত থাকে সর্ব বিষয়ে ভাগবৎ-উপস্থিতির উপচীয়মান বোধ, আমাদের সকল মননে, সঙ্কল্পে ও ক্রিয়ায় এবং আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্তে ভগবানের সঙ্গে উত্তরোত্তর নিবিড় সংযোগ, ভগবানের নিকট আমাদের সমগ্র সত্তার ক্রমবর্ধমান সক্রিয় উৎসর্গ। কর্মযোগের এইসব অনুষঙ্গ পূর্ণ ও কেবলা ভক্তিরও সার। যে সাধক সাধনার দ্বারা এইসবকে জীবন্ত করে সে নিজের মধ্যে অবিরত তৈরী করে স্বরূপ-ভক্তিভাবের স্থির, সক্রিয় ও কার্যকরী প্রতিমূর্তি; আর এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ আসে এই সেবার উদ্দিষ্ট সর্বোত্তমের প্রতি নিবিড়তম পূজা-নিবেদন। যে দিব্য উপস্থিতির সঙ্গে উৎসর্গীকৃত কর্মী সদা-বর্ধমান অন্তরঙ্গ সামীপ্যবোধ করে তাঁর প্রতি উদ্বুদ্ধ হয় তার তন্ময় প্রেম। আর এই প্রেমের সাথে আরো জন্মায় বা তার মধ্যেই থাকে ভগবানের অধিষ্ঠান এই যে সব বিভিন্ন সত্তা, প্রাণী ও জীব তাদের সবার প্রতি এক বিশ্বজনীন প্রেম; এই প্রেম ভেদগত স্বল্পস্থায়ী, অস্থির, গ্রহিষ্ণু ভাবাবেগ নয়, এ হল দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত স্বার্থশূন্য প্রেম যা একত্বের গভীরতর স্পন্দন। সাধকের ভক্তি ও সেবার যে এক পরম বিষয় তাঁকেই সে দেখতে শুরু করে সকলের মধ্যে। যজ্ঞের এই পথ দিয়ে কর্মের মোড় ফেরে ভক্তিমার্গের সঙ্গে মেশবার জন্য; হৃদয়ের কামনা যত আকাঙ্ক্ষা করতে পারে, বা মনের আবেগ যত কল্পনা করতে সক্ষম তত সম্পূর্ণ, তত তন্ময়, তত অখণ্ড ভক্তি এই কর্মমার্গ নিজেই হতে পারে।

এর পর, এই যোগানুশীলনের জন্য দরকার অন্তরে একমাত্র কেন্দ্রীয় মুক্তিপ্রদ জ্ঞানের সতত স্মরণ এবং তার সাথে এই স্মরণকে তীব্র করার উদ্দেশ্যে কর্মের মধ্যে তার সতত সক্রিয় বহিঃপ্রয়োগ। সকলের মধ্যেই এক পরমাত্মা, এক ভগবানই সবকিছু, সবকিছুই ভগবানের মধ্যে, সবকিছুই ভগবান, বিশ্বে অপর কিছু নেই — এই ভাবনা বা বিশ্বাসই কর্মীর চেতনার সমগ্র পটভূমিকা, যতদিন না এটি হয়ে ওঠে তার চেতনার সমগ্র উপাদান। এই প্রকারের স্মৃতি ও আত্ম-স্ফুরন্ত ধ্যানের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি — এবং শেষে তা হয়ও — যাকে আমরা অত প্রবলভাবে স্মরণ করি বা যাকে আমরা অত সতত ধ্যান করি তার গভীর ও নিরবচ্ছিন্ন দর্শন এবং জীবন্ত ও সর্বগ্রাহী চেতনা। কারণ এইভাবে বাধ্য হয়ে আমাদের প্রতিমুহূর্তে সতত তাঁকেই লক্ষ্য করতে হয় যিনি সকল সত্তা ও সঙ্কল্প ও ক্রিয়ার পরম উৎস; এবং সকল বিশেষ রূপ ও অবভাসকে আমরা যেমন আলিঙ্গন করি তেমন এক সাথে সে সব অতিক্রমও করি পরম 'তৎ'-এর মধ্যে যা থেকে তাদের উৎপত্তি এবং যা তাদের ধারণ করে। সর্বত্র বিশ্বাত্মক পুরুষের সব কর্ম জীবন্ত ও প্রাণবন্তভাবে না দেখা পর্যন্ত এই পথের অবসান নেই, আর সে দেখা স্থূলদৃষ্টির মতই বাস্তব, তবে তার পদ্ধতিতে। এর শীর্ষস্থানের উপর এর উদয়ন হয় অতিমানসের,

বিশ্বাতীতের সম্মুখে নিত্য অধিষ্ঠান ও মনন ও সঙ্কল্প ও ক্রিয়ার মধ্যে। আমরা যা-কিছু দেখি ও শুনি, যা-কিছু স্পর্শ করি ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানি, যে সব সম্বন্ধে আমরা সচেতন হই — এ সবকেই আমাদের জানতে ও অনুভব করতে হবে আমাদের পূজা ও সেবার পাত্র বলে; সবকিছুকে পরিণত করতে হবে ভগবানের মূর্তিতে, অনুভব করতে হবে তার দেবতার অধিষ্ঠানরূপে, শাশ্বত সর্বব্যাপিতার দ্বারা সমাবৃত বলে। এর সমাপ্তিতে — যদি-না তার অনেক আগেই তা হয়ে থাকে — দিব্য উপস্থিতি, সঙ্কল্প ও শক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগে এই কর্মমার্গ পরিণত হয় জ্ঞানের মার্গে; আর তুচ্ছ প্রাণী-বুদ্ধি যা রচনা করতে পারে বা ধী-শক্তির অন্বেষণ যা আবিষ্কার করতে সমর্থ তার চেয়ে আরো সম্পূর্ণ ও অখণ্ড এই জ্ঞান।

পরিশেষে, এই যজ্ঞ-যোগের অনুশীলনের ফলে আমরা বাধ্য হয়ে অহন্তার সকল আন্তর আশ্রয়কে আমাদের মন ও সঙ্কল্প ও ক্রিয়া থেকে দূরে নিক্ষেপ করে তাদের বর্জন করি এবং আমাদের প্রকৃতি থেকে উচ্ছেদ করি অহন্তার বীজ, এর উপস্থিতি, এর প্রভাব। যা কিছু করা সে সব করা চাই ভগবানের জন্য, ভগবানেরই দিকে সবকিছুর মোড় ফেরাতে হবে। পৃথক সত্তা হিসেবে নিজেদের জন্য কিছু করতে যাওয়া চলবে না; আবার অপরের জন্যও, তা তারা প্রতিবেশী, বন্ধু, পরিজন, দেশ, মানবজাতি বা অন্য জীব হলেও, শুধু তারা আমাদের ব্যক্তিগত জীবন ও মনন ও সমবেদনার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে বা অন্যদের চেয়ে তাদের কল্যাণের জন্য অহং-এর আগ্রহ বেশী বলে কিছু করা চলবে না। কাজের ও দেখার এই রীতিতে, সকল কর্ম সকল জীবন পরিণত হয় শুধু ভগবানেরই প্রাত্যহিক স্ফুরন্ত অর্চনা ও সেবায়, আর তা হয় তাঁরই নিজের বিরাট বিশ্বসত্তার নিঃসীম মন্দিরে। জীবন উত্তরোত্তর হয়ে ওঠে সনাতন অতিস্থিতির নিকট জীবের অন্তঃস্থ সনাতনের সতত আত্ম-নিবেদিত যজ্ঞ। এই যজ্ঞ নিবেদিত হয় সনাতন বিরাট পুরুষের ক্ষেত্রের ব্যাপ্ত যজ্ঞ ভূমিতে, আর যে শক্তি তা নিবেদন করে তা-ও সনাতনী শক্তি, সর্বব্যাপিনী মাতা। সুতরাং কর্মের দ্বারা এবং কর্ম করার ভাব ও জ্ঞানের দ্বারা মিলন ও নিবিড় সম্পর্কের এই যে পথ তা তেমনই সম্পূর্ণ ও অখণ্ড যেমন আমাদের ভগবৎ-অভিমুখী সঙ্কল্প আশা করতে বা আমাদের অন্তঃপুরুষের শক্তি সাধন করতে সক্ষম।

কর্মমার্গের সকল শক্তিই এই যজ্ঞ-যোগের আছে অখণ্ড ও পরম ভাবে, কিন্তু দিব্য পরমাত্মার নিকট এর যজ্ঞ ও আত্মদানের বিধানের দরুন এর সাথে এক দিকে থাকে ভক্তিমার্গের সমগ্র শক্তি এবং অন্যদিকে থাকে জ্ঞানমার্গের সমগ্র শক্তি। পরিশেষে এই তিন দিব্যশক্তির সবগুলিই একত্র কাজ করে, পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত ও যুক্ত হয়ে, পরস্পরের দ্বারা পরিপূর্ণ ও সিদ্ধ হয়ে।

ভগবান, সনাতন আমাদের কর্মযজ্ঞের প্রভু এবং আমাদের সকল সত্তায় ও চেতনায় ও এর বিভিন্ন বহিঃপ্রকাশশীল করণে তাঁর সঙ্গে মিলনই যজ্ঞের একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং কর্মযজ্ঞের ক্রমগুলির পরিমাপের জন্য প্রথম দেখতে হবে দিব্য প্রকৃতির আরো সন্নিকটে আমাদের নিয়ে যায় এমন কিছুর অভ্যুদয় আমাদের প্রকৃতির মধ্যে কি পরিমাণে হয়েছে; এবং এ ছাড়া দ্বিতীয়তঃ দেখতে হবে ভগবানের অনুভূতি, তাঁর উপস্থিতি, আমাদের নিকট তাঁর অভিব্যক্তি এবং সেই পরম উপস্থিতির সঙ্গে উপচীয়মান সামীপ্য ও মিলন কতদূর সাধিত হয়েছে। কিন্তু ভগবান স্বরূপতঃ অনন্ত আর তাঁর অভিব্যক্তিও বহু বিচিত্ররূপে অনন্ত। তাই যদি হয় তবে শুধু একপ্রকার উপলব্ধিবলেই সত্তায় ও প্রকৃতিতে আমাদের সত্যকার সম্যক্ সিদ্ধি সম্ভব নয়; এর জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন প্রকারের দিব্য অনুভূতির সমাহার। অন্য সব বাদ দিয়ে একমাত্র তাদাত্ম্যের পথে চরমোৎকর্ষ পর্যন্ত উন্নীত হলেও সম্যক্ সিদ্ধি লাভ হয় না। এর জন্য দরকার অনন্তের বহু বিভাবের সৌষম্যসাধন। আমাদের প্রকৃতির সম্পূর্ণ রূপান্তরের জন্য বহুবিধ স্ফুরন্ত অনুভূতিসমেত অখণ্ড চেতনা আবশ্যক।

অনন্তের সম্যক্ জ্ঞান বা বহুমুখী অনুভূতি লাভের জন্য যে মৌলিক অনুভূতি অপরিহার্য তা হল ভগবানের উপলব্ধি — তাঁর স্বরূপ আত্মায় ও সত্যে যা রূপ ও প্রতিভাসের দ্বারা পরিবর্তিত হয়নি। তা না হলে আমরা সম্ভবতঃ অবভাসের জালে আবদ্ধ থাকব, নয় নানাবিধ সামান্য বা বিশেষ বিভাবের বিশৃঙ্খলার মধ্যে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াব; আর এই বিভ্রান্তি এড়াতে গেলে আমরা হয় কোন মানসিক সূত্রে বাঁধা পড়ব, নয় আবদ্ধ হব কোন সীমিত ব্যক্তিগত অনুভূতির মধ্যে। যে একমাত্র দৃঢ় ও সর্বসমন্বয়ী সত্য বিশ্বের ভিত্তিমূল তা এই — জীবন অ-সৃষ্ট পরমাত্মা ও পরম চিৎপুরুষের অভিব্যক্তি এবং এই পরম চিৎপুরুষের নিজের সৃষ্টি সর্বভূতের সঙ্গে তাঁর নিজের সত্যকার সম্বন্ধই জীবনের প্রচ্ছন্ন রহস্যের চাবিকাঠি। এই সমগ্র জীবনের পশ্চাতে আছে সনাতন পুরুষের দৃষ্টি তাঁর বহু ও বিচিত্র সম্ভূতির উপর; চারিদিকে ও সর্বত্র আছে কালের মধ্যে অব্যক্ত কালাতীত সনাতন অভিব্যক্তির পরিবেষ্টন ও অনুপ্রবেশ। কিন্তু এই জ্ঞান যদি শুধু নিষ্প্রাণ, নিষ্ফল, বুদ্ধিগত ও দার্শনিক ধারণা হয়, তাহলে যোগসাধনায় তার কোন মূল্য নেই; সাধকের পক্ষে শুধু মানসিক উপলব্ধি যথেষ্ট নয়। কেননা যোগের লক্ষ্য শুধু মননের সত্য বা শুধু মনের সত্য নয়, সে চায় জীবন্ত ও প্রকাশক অধ্যাত্ম অনুভূতির স্ফুরন্ত সত্য। আমাদের মধ্যে জাগা চাই সর্বদা ও সর্বত্র এক সত্যময় অনন্ত উপস্থিতির সুস্পষ্ট বোধ, এক নিবিড় বেদনা (feeling) ও অন্তরঙ্গ সংযোগ, বাস্তব ইন্দ্রিয়বোধ ও স্পর্শ আর এই বোধ যে এটি সতত অন্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে আমাদের পরিবেষ্টন করে আমাদের নিকটেই বর্তমান। এই উপস্থিতি আমাদের সঙ্গে থাকা চাই এমন এক জীবন্ত সর্বব্যাপী সদ্‌বস্তুরূপে যার মধ্যে সকল কিছু ও আমরা থাকি, বিচরণ করি ও কাজ করি, এবং সর্বদা ও সর্বত্র একে আমাদের অনুভব করা চাই মূর্ত, দৃষ্টিগোচর, সর্ববিষয়ে অধিষ্ঠিত রূপে; আমরা তাকে জানব তাদের যথার্থ পরমাত্মা বলে,

স্পর্শ করব তাদের অবিনাশী স্বরূপ বলে, নিবিড়ভাবে দেখব তাদের অন্তরতম পরম চিৎপুরুষ বলে। এই পরমাত্মা ও পরম চিৎপুরুষকে এখানে সর্বভূতের মধ্যে শুধু ভাবনা করা নয়, তাঁকে সর্বপ্রকারে দেখা, অনুভব করা ও তাঁর সংস্পর্শে আসা এবং ঐরূপ সুস্পষ্টভাবে সর্বভূতকে এই পরমাত্মা ও পরম চিৎপুরুষের মধ্যে অনুভব করা — এই মৌলিক অনুভূতিই অপর সকল জ্ঞানকে পরিবেষ্টন করে থাকা চাই।

বিষয়সমূহের এই অনন্ত ও সনাতন পরমাত্মা এক সর্বব্যাপী সদ্‌বস্তু, সর্বত্র এক অখণ্ড সত্তা; এ হল অদ্বয় ও একত্বসাধক উপস্থিতি, বিভিন্ন জীবে বিভিন্ন নয়; প্রতি অন্তঃপুরুষে বা বিশ্বের প্রতিটি রূপে সম্পূর্ণভাবেই তাঁর সাক্ষাৎলাভ বা তাঁর দর্শন বা অনুভব সম্ভব। কারণ এর আনন্ত্য আধ্যাত্মিক ও মৌলিক, শুধু দেশের মধ্যে সীমাহীনতা বা কালের মধ্যে অন্তহীনতা নয়, অগণিত যুগযুগান্তরের প্রসারের মধ্যে বা সৌরমণ্ডলাদির ব্যোমের বিস্ময়কর বিশালত্বের মধ্যে অনন্তকে যেমন সুনিশ্চিতভাবে অনুভব করা যায় তেমন সুনিশ্চিতভাবেই তাকে অনুভব করা যায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুর মধ্যে বা কালের একটি ক্ষণের মাঝে। এর জ্ঞান বা অনুভূতি শুরু হতে পারে যে কোন স্থানে আর তার প্রকাশ হতে পারে যে কোন বিষয়ের মধ্য দিয়ে; কারণ সবকিছুরই মধ্যে ভগবান আছেন এবং সব কিছুই ভগবান।

তথাপি বিভিন্ন প্রকৃতির পক্ষে বিভিন্নভাবেই এই মৌলিক অনুভূতি আরম্ভ হবে, আর তার মধ্যে যে পরম সত্য প্রচ্ছন্ন থাকে তাকে তার সহস্র বিভাবে বিকাশ করতেও দীর্ঘ সময় লাগবে। প্রথম হয়তো এই সনাতন উপস্থিতিকে আমি নিজের মধ্যে বা নিজ বলেই দেখি বা অনুভব করি এবং শুধু পরে আমার এই মহত্তর আত্মার দর্শন ও বোধকে প্রসারিত করি সকল জীবে। তখন আমি জগৎকে দেখি আমার মধ্যে বা আমার সঙ্গে এক বলে। বিশ্বকে আমি দেখি আমার সত্তার মধ্যে এক দৃশ্য হিসেবে; এর গতির লীলাকে দেখি আমারই বিশ্ব চিৎপুরুষের মধ্যে বিভিন্ন রূপের ও অন্তঃপুরুষের ও শক্তির গতিবৃত্তি বলে; আমি সর্বত্র দেখি স্বয়ং নিজেকে, অন্য কাউকে নয়। কিন্তু একথা বিশেষভাবে মনে রাখা চাই যে এই দেখা অসুরের, দৈত্যের প্রমাদপূর্ণ দেখা নয়, কারণ অসুর বাস করে নিজেরই অতিরিক্ত মাত্রায় বর্ধিত ছায়ার মধ্যে, অহংকে ভুল করে তার আত্মা ও চিৎপুরুষ ব'লে এবং চারপাশের সবকিছুর উপর নিজের খণ্ড ব্যক্তিভাবনাকে জোর করে চাপাতে চেষ্টা করে একমাত্র প্রভুসত্তা রূপে। কারণ ইতিপূর্বেই জ্ঞানলাভের পর আমি এই সত্য অধিগত করেছি যে আমার প্রকৃত আত্মা অনহং, অহং নয়; সেইরকম আমি অনুক্ষণ অনুভব করি যে আমার মহত্তর আত্মা হয় এক নৈর্ব্যক্তিক বৃহত্ত্ব, নয় এক মৌলিক পুরুষ যার মধ্যে অথচ বাইরে সকল ব্যক্তিসত্ত্ব অবস্থিত, অথবা, এই উভয়ই একত্র অবস্থিত; এটি যাই হোক, নৈর্ব্যক্তিক হোক বা অসীম পরম পুরুষবিধ বা একসাথে দুই-ই হোক, এ হল অহং ছাড়িয়ে এক অনন্ত। আমি যে প্রথম একে অপরের মধ্যে না পেয়ে বরং যে রূপকে 'আমি' বলি সেই রূপের মধ্যে খুঁজে পেয়েছি, তার কারণ শুধু এই যে আমার চেতনার প্রত্যক্‌বৃত্ততার জন্য এখানেই একে পাওয়া ও তৎক্ষণাৎ

জানা ও উপলব্ধি করা আমার পক্ষে সবচেয়ে সহজ। কিন্তু যদি এই পরমাত্মাকে দেখামাত্র সঙ্কীর্ণ করণস্বরূপ অহং তাঁর মধ্যে বিলুপ্ত হতে না শুরু করে, যদি ক্ষুদ্র বাহ্য মনোগঠিত "আমি" সেই মহত্তর চিরস্থায়ী অ-সৃষ্ট অধ্যাত্ম "আমি"র মধ্যে অন্তর্হিত হতে অস্বীকার করে তাহলে আমার উপলব্ধি হয় খাঁটি নয়, আর না হয় মূলতঃ অপূর্ণ। আমার মধ্যে কোথাও না কোথাও অহমাত্মক বাধা আছে; আমার প্রকৃতির কোন অংশ নিজেকে পৃথক মনে করে নিজেকে রক্ষা করার জন্য পরম চিৎপুরুষের সর্বগ্রাসী সত্যকে অস্বীকার করে বাধা এনেছে।

পক্ষান্তরে, আমি দিব্যসত্তাকে প্রথম দেখতে পারি আমার বাইরে জগতের মধ্যে, আমার নিজের মধ্যে নয়, অপরের মধ্যে; আর কারো কারো পক্ষে এই পথই আরো সহজ। গোড়া থেকেই আমি সেখানে একে দেখি এমন এক অনন্তরূপে যা সকলের মধ্যে অধিষ্ঠিত অথচ যার মধ্যে সকল কিছু অবস্থিত, আবার এই যে সব রূপ, জীব ও শক্তিকে নিজের উপরিভাগে ধারণ করে তাদের সঙ্গে এ জড়িত নয়। আর না হয় আমি একে দেখি ও অনুভব করি শুধু নিঃসঙ্গ পরমাত্মা ও পরম চিৎপুরুষরূপে যা এইসব শক্তি ও সত্তার আধার, আর আমার চতুষ্পার্শ্বস্থ সেই নীরব সর্বব্যাপিতার মধ্যে আমার অহং-বোধ অন্তর্হিত হয়। পরে এটিই আমার করণস্বরূপ সত্তাকে ব্যাপ্ত ও অধিগত করতে শুরু করে এবং বোধ হতে থাকে যে তা থেকেই নিঃসৃত হয় আমার সকল কর্মপ্রবেগ, আমার মনন ও বাক্যের সকল আলোক, আমার চেতনার সকল গঠন এবং এই এক জগদ্ব্যাপী সৎ-এর অন্যান্য অন্তঃপুরুষ-রূপের সঙ্গে এই চেতনার সকল সম্পর্ক ও সংঘাত। ইতিমধ্যেই আমি আর এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত আত্মা নই, আমি সেই পরম 'তৎ' যার কিছুটা সম্মুখে স্থাপিত হয়ে ধারণ করে বিশ্বের মধ্যে তার কর্মপ্রণালীর এক নির্বাচিত রূপ।

অন্য একটি ভিত্তিমূলক উপলব্ধি আছে যা সকল উপলব্ধির চরম; তবু এটিও কখন কখন আসে উন্মীলনের প্রথম সন্ধিক্ষণে বা যোগের প্রাথমিক পর্যায়ে। এ হল এমন এক অনির্বচনীয় পরতর সর্বাতীত অজ্ঞেয়ের দিকে জাগরণ যা আমার ও আমি যে জগতে বিচরণ করি মনে হয় তারও ঊর্ধ্ব এক কাল ও দেশের অতীত অবস্থা বা সত্তা, আবার সেই সাথে এই হল আমার অন্তঃস্থ মৌলিক চেতনার কাছে একমাত্র প্রবল সদ্‌বস্তু ও তার পক্ষে একরকম সুনিশ্চিত ও অনস্বীকার্য। এই অনুভূতির সাথে সাধারণতঃ আর একটি অনস্বীকার্য বোধ আসে যাতে মনে হয় এখানকার সবকিছুই স্বপ্নের মত বা ছায়ার মত অলীক অথবা সে সব অনিত্য, গৌণ ও অর্ধসত্য মাত্র। অন্ততঃ কিছুকালের জন্য আমার চারদিককার সবকিছুকে মনে হতে পারে যেন তারা চলচ্চিত্রের ছায়ামূর্তির বা বাহ্যরূপের খেলা আর আমার নিজের ক্রিয়াকে মনে হবে যে এটি আমার ঊর্ধ্বে বা বাইরে অবস্থিত কোন এখনো অ-ধরা বা সম্ভবতঃ "অগ্রাহ্যম্" — ধরা যায় না এমন উৎস থেকে নিঃসৃত এক তরল গঠন। এই চেতনায় থাকা, এই প্রারম্ভিক সূত্র অনুযায়ী চলা, বা বিষয় সমূহের প্রকৃতি সম্বন্ধে এই প্রাথমিক আভাসন অনুসরণ করার অর্থ অজ্ঞেয়ের মধ্যে আত্মা ও জগতের লয়প্রাপ্তির দিকে অর্থাৎ মোক্ষ, নির্বাণের দিকে

অগ্রসর হওয়া। কিন্তু এটাই এই পথের একমাত্র পরিণতি নয়; বরং আমার পক্ষে ততদিন অপেক্ষা করা সম্ভব যতদিন না কালাতীত শূন্যগর্ভ মুক্তির নীরবতার মধ্য থেকে আমার ও আমার সব ক্রিয়ার যে উৎস এখনও অ-ধরা রয়েছে তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক স্থাপন শুরু হয়। তখন আরম্ভ হয় শূন্যতার পূর্ণ হওয়া, তার মধ্য থেকে বার হয় বা তার মধ্যে বেগে প্রবেশ করে ভগবানের সকল বহুময় সত্য, স্ফুরন্ত অনন্তের সকল বিভাব ও অভিব্যক্তি এবং বহু পর্যায়। এই অনুভূতির ফলে প্রথমে মনের উপর, পরে আমাদের সমগ্র সত্তার উপর নেমে আসে এক পরম, অগাধ, প্রায় অতলস্পর্শী শান্তি ও নীরবতা। অভিভূত ও নির্জিত, শান্ত ও নিজ থেকে মুক্ত হয়ে মন এই নীরবতাকেই স্বীকার করে পরাৎপর বলে। কিন্তু তারপর সাধক দেখতে পায় যে তার জন্য সবকিছুই আছে সেখানে বা সবকিছুই নূতন তৈরী হয় সেই নীরবতার মধ্যে বা এর মধ্য দিয়ে সবকিছুই তার উপর নেমে আসে এক মহত্তর নিগূঢ় বিশ্বাতীত অস্তিত্ব থেকে। কারণ এই বিশ্বাতীত, এই নিরালম্ব শুধু অলক্ষণ শূন্যতার শান্তি নয়, এর নিজস্ব সম্পদ ও বৈভব অনন্ত, আমাদের যা কিছু তা ঐ সবের হীনার্থক ও স্বল্পার্থক। সকল বিষয়ের এই পরম উৎস না থাকলে, বিশ্বসৃষ্টি সম্ভব হ'ত না; সকল শক্তি, সকল ক্রিয়াকর্ম অলীক হ'ত, অসম্ভব হ'ত সকল সৃষ্টি ও অভিব্যক্তি।

এই যে তিন মৌলিক উপলব্ধি, এরা এতই মৌলিক যে জ্ঞানমার্গের যোগীর কাছে মনে হয় এসব চরম, স্বয়ং-পূর্ণ আর অন্য সব উপলব্ধিকে অতিক্রম করে তাদের স্থান অধিকার করাই এদের ভবিষ্যৎ। তথাপি পূর্ণযোগের সাধকের পক্ষে এগুলি অন্যরকম, অলৌকিক কৃপাবলে এ সব তাকে সহজে ও আকস্মিকভাবে প্রথমিক পর্যায়ে দেওয়া হ'ক, বা দীর্ঘকাল সাধনার পথে উদ্যমের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার পর বহুকষ্টে এসব অর্জিত হ'ক, তার কাছে এসব একমাত্র সত্য নয় বা সনাতনের অখণ্ড সত্যের সম্পূর্ণ ও একমাত্র সূত্রও নয়, বরং এক মহত্তর দিব্য জ্ঞানের অপূর্ণ উপক্রম, বিরাট ভিত্তি তারা। অন্য আরো উপলব্ধি আছে যেগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয়, তাদের সম্ভাবনার শেষ সীমা পর্যন্ত তাদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা চাই; আর যদিও তাদের কোন কোনটির বেলায় প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যে তাদের দ্বারা শুধু সেই সব দিব্য বিভাব জানা যায় যেগুলি অস্তিত্বের সক্রিয়তার পক্ষে তটস্থ, এর স্বরূপে স্বগত, তাহলেও তাদের শেষ পর্যন্ত সেই সক্রিয়তার মধ্য দিয়ে এর শাশ্বত উৎস অবধি অনুসরণ করা হলে দেখা যাবে যে তার পরিণতিতে ভগবানের এমন এক প্রকাশ আসে যা না হলে বিষয় সমূহের পিছনের পরম সত্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান রিক্ত ও অপূর্ণ রয়ে যাবে। এইসব আপাতপ্রতীয়মান তটস্থ বিষয় এমন এক গূঢ় তত্ত্বের চাবিকাঠি যা ছাড়া মৌলিক তত্ত্বরাজি তাদের সকল রহস্য উদ্‌ঘাটিত করে না। ভগবানের প্রকাশক সকল বিভাবকেই ধরা চাই পূর্ণযোগের বিস্তৃত জালে।

যদি সাধকের লক্ষ্য হ'ত জগৎ ও তার কাজকর্ম থেকে প্রস্থান, এক পরমা মুক্তি ও অচঞ্চলতা তাহলে তার আধ্যাত্মিক জীবনের সার্থকতার জন্য এই তিন প্রধান মূল উপলব্ধিই যথেষ্ট। শুধু তাদের মধ্যেই একাগ্র হয়ে অন্য সব দিব্য বা ঐহিক জ্ঞানকে খসে পড়তে দিয়ে সে নিজে ভারমুক্ত হয়ে প্রবেশ করবে চিরন্তনী নীরবতার মধ্যে। কিন্তু জগৎ ও তার সব কাজকর্মকেও তার হিসেবের মধ্যে ধরা চাই, জানা চাই তাদের পশ্চাতে কি দিব্য সত্য থাকতে পারে, আর অধিকাংশ অধ্যাত্ম অনুভূতির সূত্রপাত যে ব্যক্ত সৃষ্টির সঙ্গে দিব্য সত্যের আপাত বিরোধিতা তার সমন্বয় সাধনও দরকার। এই পথগুলির মধ্যে যে পথেই সে অগ্রসর হ'ক না কেন, তার সম্মুখে আসে এক সতত দ্বৈত অস্তিত্বের দুই সংজ্ঞার মধ্যে এক বিচ্ছিন্নতা, আর মনে হয় এই দুই সংজ্ঞা পরস্পর বিরোধী আর এই বিরুদ্ধতাই বিশ্বপ্রহেলিকার সঠিক মূল। পরে তার জানা সম্ভব হয় আর সে জানতেও পারে যে এরা এক অদ্বয় পরম সত্তার দুই মেরু, ও এমন দুই যুগপৎ শক্তিপ্রবাহের দ্বারা তারা যুক্ত যে দুটি পরস্পরের মধ্যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক, এবং শুধু তাদের ঘাত প্রতিঘাতেই ঐ সত্তার মধ্যস্থিত বিষয়ের অভিব্যক্তি সম্ভব; আর জীবনের বিভিন্ন বৈষম্যের সমন্বয় সাধনের ও সাধকের অভীপ্সিত পূর্ণ সত্য আবিষ্কারের নির্ধারিত উপায় হল তাদের পুনর্মিলন।

কারণ এক দিকে সে সর্বত্র বোধ করে এই পরম আত্মাকে, এই চিরস্থায়ী চিন্ময় পুরুষ-ধাতুকে — ব্রহ্মকে, সনাতনকে — সেই একই আত্ম-সৎকে যা এখানে কালের মধ্যে তার দেখা বা অনুভব করা প্রতি অবভাসের পশ্চাতে অবস্থিত আবার যা বিশ্বাতীত ও কালাতীত। এক পরমাত্মার প্রবল অনুভূতিতে অভিভূত হয়ে সে উপলব্ধি করে যে এটি আমাদের সীমিত অহং নয়, বা মন প্রাণ দেহও নয়, এ হল জগদ্ব্যাপী কিন্তু বাহ্যতঃ প্রাতিভাসিক নয়, অথচ তার অন্তঃস্থ কোন চিদ্বোধের কাছে এ যে কোন রূপ বা প্রতিভাসের চেয়ে বেশী মূর্ত, এ হল বিশ্বাত্মক কিন্তু তার সত্তার জন্য এটি বিশ্বের অন্তর্গত কোন কিছুর উপর বা বিশ্বের নিখিল সমগ্রতার উপর নির্ভরশীল নয়; যদি এই সব লোপ পায়, তা হলেও এসবের নাশে তার সতত অন্তরঙ্গ অনুভূতির সনাতনের কোন ইতরবিশেষ হবে না। তার নিজের ও সকল বিষয়ের স্বরূপ এক অপ্রকাশনীয় আত্ম-সত্তা সম্বন্ধে সে নিশ্চিত; এমন এক স্বরূপচেতনা সম্বন্ধে সে অন্তরঙ্গভাবে অবগত যার মাত্র আংশিক ও খর্বীকৃত রূপ হল আমাদের চিন্তাশীল মন, প্রাণবোধ ও দেহবোধ, আবার এই চেতনার মধ্যে এমন অপরিসীম শক্তি আছে যে তা থেকেই সকল ক্রিয়াশক্তির উৎপত্তি হয় অথচ যার ব্যাখ্যা বা হিসেব এই সকল ক্রিয়াশক্তির মিলিত সমষ্টি বা সামর্থ্য বা প্রকৃতির দ্বারা মেলে না; সে অনুভব করে যে সে বাস করে এমন এক অবিচ্ছেদ্য স্বাধিষ্ঠিত পরমানন্দের মাঝে যা এই তুচ্ছ ক্ষণস্থায়ী হর্ষ বা সুখ বা আমোদ আহ্লাদ নয়। এই দৃঢ় অনুভূতির লক্ষণ চারটি — অপরিবর্তনীয় অবিনশ্বর আনন্ত্য, কালাতীত নিত্যতা, এমন এক আত্মসংবিৎ যা এই গ্রহিষ্ণু ও প্রতিক্রিয়াশীল বা ইতস্ততঃ অন্ধ অন্বেষণকারী মানসচেতনা নয়, বরং যা এর পশ্চাতে ও ঊর্ধ্বে ও নিম্নে অবস্থিত, এমনকি যাকে

আমরা অচিতি বলি তার মধ্যেও এটি বর্তমান, এবং এক একত্ব যার মধ্যে অন্য কোন অস্তিত্বের সম্ভাবনা নেই। আবার সাধক দেখে যে এই সনাতন আত্মসত্তাই চিন্ময় কাল-পুরুষ (Time-Spirit) রূপে সকল ঘটনা প্রবাহ বহন করেন, এক আত্মপ্রসারিত অধ্যাত্মদেশরূপে সকল বিষয় ও সত্তাকে নিজের মধ্যে ধারণ করেন, এক চিন্ময়পুরুষ-ধাতুরূপে আপাতপ্রতীয়মান অনাধ্যাত্মিক, ক্ষণস্থায়ী ও সান্ত সব কিছুর নিজস্ব রূপ ও উপাদান হন। কারণ সাধক অনুভব করে যে ক্ষণস্থায়ী, ঐহিক, দেশগত, সীমাবদ্ধ সব কিছুই তাদের ধাতু, ক্রিয়াশক্তি ও সামর্থ্যে সেই একম্, সনাতন, অনন্ত বৈ আর কিছু নয়।

কিন্তু তবু তার মধ্যে বা সম্মুখে শুধু যে এই সনাতন আত্মবিৎ সৎ, এই অধ্যাত্মচেতনা, আত্মদীপ্ত শক্তির এই আনন্ত্য, এই কালাতীত অন্তহীন নিঃশ্রেয়স থাকে তা নয়। আরো থাকে, আর তার অনুভূতিতে সততই থাকে পরিমেয় দেশ ও কালের মধ্যে এই বিশ্ব, যেন এক প্রকার পরিধিহীন সান্ত আর তার মধ্যে থাকে সব কিছু অনিত্য, সসীম, খণ্ড খণ্ড বহু সংখ্যক, অজ্ঞানাচ্ছন্ন, বৈষম্য ও দুঃখকষ্টের অধীন; এই সবের মধ্যে আছে একত্বের কোন অনুপলব্ধ অথচ স্বগত সামঞ্জস্যের জন্য অস্পষ্ট আকূতি; তারা অচেতন বা অর্ধচেতন বা এমন কি যখন খুবই সচেতন তখনও আদি অবিদ্যা ও অচিতিতে আবদ্ধ। সাধক সর্বদাই শান্তি বা আনন্দে ধ্যানস্থ থাকে না, আর যদি থাকতও, তাতে সমস্যার কোন সমাধান হ'ত না কারণ সে জানে যে ধ্যানমগ্ন থাকলেও এ সব তার বাইরে, অথচ তারই কোন বৃহত্তর আত্মার মধ্যে যেন চিরকাল চলতে থাকবে। কখন কখন তার চিৎপুরুষের এই দুই অবস্থা তার চেতনার অবস্থা অনুযায়ী পালাক্রমে তার জন্যে বর্তমান থাকে বলে মনে হয়; অন্য সময় মনে হয় যে তারা যেন সত্তার দুটি অংশ, বিসদৃশ অথচ এমন যে তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আনা দরকার — যেন তার জীবনের দুটি অর্ধ, একটি উপরের, অন্যটি নীচের অথবা একটি ভেতরের, অন্যটি বাইরের অংশ। সে শীঘ্রই বুঝতে পারে যে তার চেতনার মধ্যে এই বিচ্ছিন্নতার এক মহতী মুক্তিপ্রদায়িনী শক্তি আছে, কারণ এই বিচ্ছিন্নতার দরুন সে আর অবিদ্যা, অচিতিতে আবদ্ধ থাকে না; আর তার কাছে মনে হয় না যে এই বিচ্ছিন্নতা তার নিজের ও বিষয়সমূহের মূল স্বরূপ বরং মনে হয় যে এ হল এক বিভ্রম যা জয় করা যায় বা অন্ততঃ এক সাময়িক মিথ্যা আত্মানুভূতি, মায়া। একে ভগবানের একান্ত বিপরীত, এক অবোধ্য রহস্যের খেলা, অনন্তের মুখোশ বা বিকৃতি মাত্র বলে দেখা লোভনীয় এবং সেজন্য সময় সময় তার অনুভূতিতে অনিবার্যরূপে বোধ হয় যে এক দিকে আছে ব্রহ্মের জ্যোতির্ময় সত্য আর অন্যদিকে মায়ার অন্ধকারময় বিভ্রম। কিন্তু তার অন্তঃস্থ কিছু এক তাকে এই ভাবে অস্তিত্বকে চিরদিনের মত দুই খণ্ডে ভাগ করতে দেয় না; আরো নিবিষ্ট হয়ে দেখলে সে আবিষ্কার করে যে এই অর্ধ-আলোক বা আঁধারের মাঝেও রয়েছেন সনাতন, — ব্রহ্মই এখানে বিরাজিত মায়ার বেশে।

এ হল এক উপচীয়মান অধ্যাত্ম অনুভূতির উপক্রম; এই অনুভূতিতে উত্তরোত্তর প্রকাশ পায় যে সাধকের কাছে যা তামসী অবোধ্য মায়া বলে মনে হ'ত তা সকল

সময়েই সনাতনের চিৎ-শক্তি বৈ আর কিছু নয় যা বিশ্বের অতীত, কালাতীত ও অসীম, কিন্তু এখানে প্রসারিত আলো-আঁধারের ছদ্মবেশে, মন ও প্রাণ ও জড়ের মধ্যে ভগবানের অত্যাশ্চর্য মন্থর অভিব্যক্তির উদ্দেশ্যে। সমগ্র কালাতীতের প্রেষ কালের মধ্যে বিলাসের দিকে; আর কালের মধ্যে সবকিছুর প্রতিষ্ঠা কালাতীত পরম চিৎপুরুষেরই উপর ও তাঁরই চারিদিকে তাদের আবর্তন। যদি এই দুয়ের বিভক্ত অনুভূতি মুক্তিপ্রদ হয়, তাহলে এদের একাত্ম অনুভূতি স্ফুরন্ত ও কার্যকরী। কারণ এখন সাধক শুধু এই অনুভব করে না যে সে সনাতনের পুরুষ-ধাতুর অংশে, তার স্বরূপ আত্মায় ও চিৎপুরুষে সনাতনের সঙ্গে সম্পূর্ণ এক, সে আরো অনুভব করে যে তার সক্রিয় প্রকৃতিতে সে সনাতনের সর্বজ্ঞ ও সর্বক্ষম চিৎ-শক্তির করণব্যবস্থা। তার মধ্যে এর বর্তমান বিলাস যতই সীমাবদ্ধ ও আপেক্ষিক হোক, সে তার মহত্তর ও আরও মহত্তর চেতনা ও সামর্থ্যের কাছে উন্মীলিত হতে পারে আর মনে হয় এই প্রসারতার কোন নির্ধারিত সীমা নেই। এমনকি, মনে হয় ঐ চিৎ-শক্তির এক অধ্যাত্ম ও অতিমানসিক স্তর তার ঊর্ধ্বে নিজেকে প্রকাশিত করে আর সংযোগের জন্য আনত হয়, যেখানে এইসব বন্ধন ও সীমা নেই, আর এর সব শক্তিও কালের মধ্যে বিকাশের উপর চাপ দিচ্ছে সনাতনের মহত্তর অবতরণ এবং স্বল্প-প্রচ্ছন্ন অভিব্যক্তি বা আদৌ প্রচ্ছন্ন নয় এমন অভিব্যক্তির আশ্বাসসহ। ব্রহ্ম-মায়ার যে দ্বৈতভাব আগে বিরুদ্ধ ছিল, কিন্তু এখন দ্বয়াত্মক তা সাধকের নিকট প্রকাশিত হয় সকল আত্মার পরমাত্মা, সকল সত্তার অধীশ্বর, জগৎ-যজ্ঞ ও তার নিজের যজ্ঞের প্রভুর প্রথম মহান্ স্ফুরন্ত বিভাব রূপে।

অন্য এক পথে অগ্রসর হলে, সাধকের অনুভূতিতে আর এক দ্বৈতভাব আসে। একদিকে সে জানতে পারে এক সাক্ষী, গ্রহীতা, দ্রষ্টা, জ্ঞাতারূপী চিৎ যা কর্ম করে বলে মনে হয় না, কিন্তু যার জন্য মনে হয় আমাদের ভিতরের ও বাইরের এই সকল কাজকর্ম প্রবর্তিত হয় ও অনুষ্ঠিত হতে থাকে। অন্যদিকে ঐ একই সময়ে সে এমন এক কার্যসাধিকা শক্তি বা কর্মপ্রবাহের ক্রিয়াশক্তিকে জানে যাকে দেখা যায় যে এটি সকল কল্পনাসাধ্য ক্রিয়ার উপাদান, প্রেরণা ও পরিচালক, আমাদের দৃশ্য, অদৃশ্য অগণিত রূপের স্রষ্টা আর এগুলিকে এটি ব্যবহার করে তার ক্রিয়া ও সৃষ্টির নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের স্থির অবলম্বনরূপে। অন্য সব বাদ দিয়ে একান্তভাবে এই সাক্ষী চেতনায় প্রবেশ ক'রে সে হয়ে ওঠে নীরব, নির্লিপ্ত, নিশ্চল; দেখে যে এ পর্যন্ত সে প্রকৃতির সব গতিবৃত্তিকে নিষ্ক্রিয়ভাবে প্রতিফলিত করে নিজস্ব করেছে আর এই প্রতিফলনের দ্বারাই এইসব গতিবৃত্তি আপাতক অধ্যাত্ম মূল্য ও তাৎপর্য পেয়েছিল তার অন্তঃস্থ সাক্ষী পুরুষের কাছ থেকে। কিন্তু এখন সে এই আরোপজনিত বা প্রতিফলনজনিত একাত্মতা প্রত্যাহার করে নিয়েছে; সে শুধু তার নীরব আত্মা সম্বন্ধে সচেতন, এর চারিদিককার গতিশীল সবকিছু থেকে সে বিচ্ছিন্ন; সকল কাজকর্মই তার বাইরে আর সঙ্গে সঙ্গে দেখে যে এরা আর আগের মত নিবিড় সত্য নেই; এখন মনে হয় এ সব যান্ত্রিক, আর তাদের বিচ্ছিন্ন ও শেষ করা সম্ভব। আবার অন্য সব বাদ দিয়ে একান্তভাবে শুধু সক্রিয় গতিবৃত্তির মধ্যে

প্রবেশ করলে, তার এক বিপরীত আত্মবোধ জাগে; তার নিজের অনুভূতিতে সে নিজেকে মনে করে ক্রিয়াবলীর এক স্তূপ, বিভিন্ন শক্তির এক রূপায়ণ ও পরিণতি; এ সবের মধ্যে যদি কোন সক্রিয় চেতনা, এমনকি কোনপ্রকার গতিশীল সত্তা থাকে তা হলেও তার মধ্যে কোথাও কোন স্বাধীন অন্তঃপুরুষ আর নেই। সত্তার এই দুই বিভিন্ন বিপরীত অবস্থা তার মধ্যে পালাক্রমে আসে, অথবা দুইটিই একসাথে মুখোমুখি থাকে; আন্তর সত্তার মধ্যে থাকে একটি নীরব দ্রষ্টা, কিন্তু সে অচঞ্চল ও ক্রিয়ায় কোন অংশ নেয় না; অপরটি বাইরের বা উপরকার আত্মায় সক্রিয় থেকে নিজের অভ্যাসগত গতিবৃত্তি অনুসরণ করে। সাধক তখন প্রবেশ করেছে পুরুষ-প্রকৃতির, এক মহান্ দ্বৈতভাবের তীব্র বিভক্ত বোধের মধ্যে।

কিন্তু যেমন তার চেতনা গভীর হতে থাকে সে বুঝতে থাকে যে এ হল শুধু এক প্রাথমিক সম্মুখস্থ অবভাস। কারণ সে দেখে যে তার এই অন্তঃস্থ সাক্ষীপুরুষের নীরব সমর্থন, অনুমতি ও অনুমোদন বলেই এই কার্যসাধিকা প্রকৃতি তার সত্তার উপর অন্তরঙ্গভাবে বা অবিরাম কর্ম করতে সক্ষম; যদি এই পুরুষ তার অনুমোদন প্রত্যাহার করে তাহলে তার উপরে ও ভিতরে প্রকৃতির ক্রিয়ার গতিবৃত্তিগুলি পুরোপুরি যান্ত্রিক অনুবৃত্তি হয়ে ওঠে, অবশ্য প্রথমে তারা প্রবল থাকে, যেন তখনও তাদের চেষ্টা জোর ক'রে তাদের প্রভাব বজায় রাখা কিন্তু পরে ক্রমশঃ তাদের স্ফুরত্তা ও বাস্তবতা হ্রাস পায়। এই অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যানের শক্তি আরো সক্রিয়ভাবে প্রয়োগ ক'রে সে দেখে যে প্রকৃতির গতিবৃত্তি পরিবর্তন করতে সে সক্ষম, অবশ্য প্রথমে ধীরে ধীরে ও অনিশ্চিতভাবে, কিন্তু পরে আরো সুনিশ্চিতভাবে। পরিশেষে এই সাক্ষী পুরুষের মধ্যে বা পশ্চাতে তার নিকট প্রকাশিত হয় প্রকৃতির মধ্যকার এক জ্ঞাতা ও ঈশান সঙ্কল্পের উপস্থিতি এবং ক্রমশঃ দেখা যায় যে প্রকৃতির অস্তিত্বের এই অধীশ্বর যা জানেন এবং যা সক্রিয়ভাবে সঙ্কল্প করেন বা নিষ্ক্রিয়ভাবে অনুমতি দেন তারই বহিঃপ্রকাশ হল প্রকৃতির যাবতীয় ক্রিয়া। এই সময় মনে হয় প্রকৃতি স্বয়ং শুধু তার কর্মপ্রণালীর সুনিয়ন্ত্রিত বাহ্যরূপে যান্ত্রিক, কিন্তু বস্তুতঃ সে চিন্ময়ী শক্তি, তার মধ্যে অন্তঃপুরুষ বর্তমান, তার আবর্তনে আছে আত্মসচেতন তাৎপর্য, তার পদক্ষেপ ও বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয় নিগূঢ় পরম জ্ঞান ও সঙ্কল্প। এই দ্বৈতভাব দৃশ্যতঃ বিচ্ছিন্ন হলেও বস্তুতঃ অবিচ্ছেদ্য। যেখানে প্রকৃতি সেখানেই পুরুষ, আবার যেখানে পুরুষ সেখানেই প্রকৃতি বর্তমান; এমনকি তাঁর নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে পুরুষ ধারণ করেন প্রকৃতির সকল স্থির শক্তি ও সক্রিয় শক্তি, তাদের প্রস্তুত রাখেন প্রক্ষেপের উদ্দেশ্যে; এমনকি তার ক্রিয়ার প্রবেগের মধ্যেও প্রকৃতি তার বিসৃষ্টির উদ্দেশ্যের অর্থ ও অবলম্বন হিসেবে পুরুষের সমগ্র সাক্ষী ও আদেশমূলক চেতনা নিজের সঙ্গে বহন করে। আর একবার সাধকের অনুভূতিতে দেখা দেয় একই অদ্বয় পুরুষের অস্তিত্বের দুটি মেরু ও তাদের শক্তির দুটি রেখা বা প্রবাহ আর এই দুই পরস্পরের মধ্যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক এবং তাদের যুগপৎ ক্রিয়াদ্বারা তারা ব্যক্ত করে তাঁর অন্তঃস্থ সবকিছু। এখানেও সে দেখে যে এই বিভক্ত বিভাব মুক্তিপ্রদ; কেননা

অবিদ্যার মধ্যে প্রকৃতির সঙ্কীর্ণ কর্মধারার সঙ্গে নিজেকে এক মনে করার বন্ধন থেকে এ তাকে মুক্তি দেয়। এই ঐক্য-বিধায়ক বিভাব স্ফুরন্ত ও কার্যকরী, কারণ এটি সাধককে ঈশনা ও সিদ্ধিলাভে সমর্থ করে; প্রকৃতির মধ্যে যা কিছু কম দিব্য বা আপাত অদিব্য সেগুলি বর্জন করে সে নিজের মধ্যে প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ ও গতিবৃত্তিকে গঠন করতে পারে নতুনভাবে, আরো উন্নত আদর্শে ও মহত্তর জীবনের বিধান ও ছন্দে। এক বিশেষ অধ্যাত্ম ও অতিমানসিক স্তরে দ্বৈতভাব আরো পূর্ণভাবে হয়ে দাঁড়ায় দ্বৈতাদ্বৈত, একের মধ্যে দুই, অন্তরে চিন্ময়ী শক্তি সমেত ঈশান পুরুষ; আর এর যোগ্যতা কোন বাধা মানে না, বার হয়ে আসে সকল সীমা ভেঙে। পুরুষ-প্রকৃতির যে দ্বৈতভাব আগে বিভক্ত ছিল আর এখন দ্বয়াত্মক তা-ই এইভাবে সাধকের কাছে প্রকাশিত হয় তার সমগ্র সত্যে, সকল পুরুষের পরম পুরুষের, সৃষ্টির অধীশ্বরের, যজ্ঞের প্রভুর দ্বিতীয় মহৎ তটস্থ ও কার্যকরী বিভাবরূপে।

আবার অপর আর একটি পথে অগ্রসর হলে সাধক দেখে আর এক দ্বৈতভাব যা অনুরূপ হয়েও বিভাবে বিভিন্ন, এতে দ্বয়াত্মকভাব আরো অব্যবহিতভাবে প্রতীয়মান; এই হল ঈশ্বরশক্তির স্ফুরন্ত দ্বৈতভাব। একদিকে সে অনুভব করে সত্তার মধ্যে এক অনন্ত স্বয়ংস্থিত পরমদেবতা যিনি অস্তিত্বের অনির্বচনীয় যোগ্যতার মধ্যে সকল বিষয় ধারণ করে আছেন, সকল আত্মার পরমাত্মা, সকল পুরুষের পরমপুরুষ, সকল ধাতুর চিন্ময় ধাতু, এক নৈর্ব্যক্তিক অপ্রকাশনীয় সৎস্বরূপ অথচ একই সাথে এক অসীম পরম ব্যক্তি যাঁর আত্মরূপায়ণ এখানকার অগণিত ব্যক্তিসত্ত্ব, তিনি জ্ঞানের অধীশ্বর, প্রেম, আনন্দ ও সৌন্দর্যের প্রভু, জগৎ সমূহের একমাত্র উৎস, তিনিই নিজেকে ব্যক্ত করেন, নিজেকে সৃজন করেন, তিনি বিরাট পুরুষ, বিশ্বমন, বিশ্বপ্রাণ, আবার যা আমাদের ইন্দ্রিয়বোধে অচেতন প্রাণহীন জড় বলে প্রতীয়মান হয় তারও অবলম্বনস্বরূপ সচেতন জীবন্ত সদ্বস্তু তিনিই। অন্যদিকে সেই একই পরম দেবতাকে সে অনুভব করে কার্যকরী চেতনা ও সামর্থ্যে; এই চেতনা ও সামর্থ্যই প্রক্ষিপ্ত হয়েছে এমন এক আত্মসচেতন শক্তিরূপে যা সকল কিছুকেই নিজের মধ্যে ধারণ ও বহন করে এবং যার নির্দিষ্ট কাজ হল এইসবকে সার্বিক কাল ও দেশের মধ্যে ব্যক্ত করা। সে সুস্পষ্ট বোঝে যে এক পরম পুরুষই আমাদের কাছে দেখা দেন তাঁর দুই বিভিন্ন, পরস্পরের বিপরীত দিকে। পরম দেবতারই মধ্যে তাঁর সত্তায় সবকিছু নির্মিত হয় অথবা পূর্ব থেকেই বর্তমান থাকে, এসব তাঁর থেকেই নিঃসৃত আর তাঁরই সঙ্কল্প ও উপস্থিতির দ্বারা বিধৃত, সেই পরম দেবতাই শক্তিতে অধিষ্ঠিত হয়ে সকল কিছু বাইরে আনেন ও গতির মধ্যে সঞ্চালিত করেন, তাঁর দ্বারাই, তাঁর মধ্যেই সকল কিছুর পরিণতি ও সক্রিয়তা, আর এইভাবে তাদের ব্যষ্টিগত বা বিশ্বগত উদ্দেশ্যও বিকশিত হয়। আবার এটি এমন এক দ্বৈতভাব যা অভিব্যক্তির জন্য প্রয়োজনীয়; জগতের কর্মপ্রণালীর জন্য যে দুই শক্তির প্রবাহ সর্বদাই প্রয়োজনীয় মনে হয় তাদের সৃষ্টি ও কার্যক্ষম করে এই দ্বৈতভাব; এ দুই একই সত্তার দুই মেরু তবে এখানে তারা আরো কাছাকাছি, এবং অতি স্পষ্টতঃ এদের প্রতিটি সর্বদাই তার স্বরূপে ও

স্ফুরন্ত প্রকৃতিতে অপরের সব শক্তি বহন করে। দিব্য রহস্যের দুই প্রধান উপাদান — পুরুষবিধ ও নৈর্ব্যক্তিকতা এখানে সম্মিলিত হওয়ার দরুন পূর্ণ সত্যের সাধক তার পূর্ব অনুভূতির সাথে এই ঈশ্বরশক্তির দ্বৈতভাবের মধ্যে দিব্য অতিস্থিতি ও অভিব্যক্তির এমন এক অন্তরঙ্গ ও চরম রহস্যের নিবিড়তা অনুভব করে যা সে অপর কোন অনুভূতিতে পায় না।

কারণ ঈশ্বরীশক্তি, দিব্য চিৎ-শক্তি ও জগন্মাতা হয়ে ওঠেন সনাতন একম্ ও ব্যক্ত বহুর মধ্যবর্তী। একদিকে তিনি পরম একের থেকে আনা ক্রিয়াশক্তির বিলাসে নিজের প্রকাশশীল ধাতুর মধ্য থেকে অগণিত অবভাস সংবৃত্ত ও ক্রম-ব্যক্ত করে বহুময় ভগবানকে অভিব্যক্ত করেন বিশ্বের মধ্যে; অপরদিকে তিনি সেই সব শক্তিরই পুনরারোহী প্রবাহের দ্বারা সকলকে ফিরিয়ে নিয়ে যান তাদের উৎস তৎস্বরূপের অভিমুখে যাতে অন্তঃপুরুষ তার ক্রমবিকাশশীল অভিব্যক্তিতে উত্তরোত্তর প্রত্যাবর্তন করে সেখানে পরম দিব্যত্বের দিকে বা এখানেই লাভ করে তার দিব্য প্রকৃতি। যদিও তিনিই এই বিশ্বযন্ত্রের রচয়িত্রী তবু প্রকৃতির, নিসর্গশক্তির প্রথম আকৃতিতে যে নিশ্চেতন কার্যসাধিকার রূপ আমরা দেখি সে রূপ তাঁর নয়; অথবা মায়া বলতে প্রথম আমরা যা বুঝি যে এ বিভ্রম বা অর্ধ-বিভ্রমের জননী, সেই অসত্যতার অর্থও তাঁর মধ্যে নেই। অনুভবকারী অন্তঃপুরুষ সঙ্গে সঙ্গেই স্পষ্ট বোঝে যে এই ঈশ্বরীশক্তি এক চিন্ময়ীশক্তি, তাঁর ধাতু ও প্রকৃতি তাঁর উৎস পরমেরই ধাতু ও প্রকৃতি। যদি মনে হয় যে তিনি আমাদের নিমজ্জিত করেছেন অবিদ্যা ও অচিতির মধ্যে এমন এক পরিকল্পনা অনুযায়ী যা আমরা এখনও বুঝতে অক্ষম ও যদি তাঁর বিভিন্ন শক্তিকে আমরা দেখি বিশ্বের এই সব অনিশ্চিতার্থক শক্তিরূপে, তবু শীঘ্রই দেখা যায় যে আমাদের মধ্যে দিব্য চেতনা বিকাশের জন্যই তিনি কর্মরতা, আর ঊর্ধ্বে দণ্ডায়মানা তিনি আমাদের টেনে নিচ্ছেন তাঁর নিজের পরতর সত্তার দিকে আর আমাদের কাছে উত্তরোত্তর প্রকাশ করছেন দিব্যজ্ঞান, সঙ্কল্প ও আনন্দের স্বরূপ। এমনকি অবিদ্যার গতিবৃত্তির মধ্যেও সাধকের অন্তঃপুরুষ জানতে পারে যে তাঁরই সচেতন দেশনা তার পদক্ষেপের অবলম্বন স্বরূপ, এবং নিয়ে যাচ্ছে মন্থর বা দ্রুতগতিতে, সরল পথে বা আঁকাবাঁকা পথে, তমঃ থেকে মহত্তর চেতনার জ্যোতিতে, মৃত্যু থেকে অমৃতে, অশুভ ও কষ্টভোগ থেকে এমন এক পরম শুভ ও সুখের দিকে যার শুধু এক অস্পষ্ট মূর্তি মানুষের মন এ পর্যন্ত গড়তে সক্ষম। সুতরাং তাঁর শক্তি যুগপৎ মুক্তিপ্রদ ও স্ফুরন্ত, সৃজনক্ষম ও কার্যসাধক, বিষয় সমূহ এখন যেমন শুধু তা-ই নয়, ভবিষ্যতে যা হবে তা-ও এ সৃষ্টি করতে সক্ষম, কারণ সাধকের অবিদ্যার উপাদানে গঠিত অবর চেতনার কুটিল ও জটিল সব গতিবৃত্তি বাদ দিয়ে এ তার অন্তঃপুরুষ ও প্রকৃতিকে পুনর্গঠিত করে ও তাদের নবরূপ দেয় পরতরা দিব্য প্রকৃতির ধাতু ও শক্তিতে।

এই দ্বৈতভাবেও এক বিভক্ত অনুভূতি সম্ভব। এর এক মেরুতে সাধক শুধু জানতে পারে যে সৃষ্টির অধীশ্বর তার উপর তাঁর জ্ঞান, সামর্থ্য ও আনন্দের শক্তিপাত করেন

তার মুক্তি ও দিব্যত্ব সাধনের উদ্দেশ্যে; তার কাছে (ঈশ্বর) শক্তি শুধু এই সমস্ত বিষয়ের প্রকাশক এক নৈর্ব্যক্তিক শক্তি বা ঈশ্বরের এক গুণ। অপর মেরুতে দেখা দিতে পারেন জগজ্জননী, বিশ্বসৃষ্টিকর্ত্রী যিনি নিজের চিৎ-ধাতু থেকে সৃষ্টি করেন বিভিন্ন দেবতা ও জগৎ এবং সকল বিষয় ও সত্তা। অথবা যদি সে দুই বিভাবই দেখে তা হলে সেই দৃষ্টিতে এরা বিষম ও পৃথক ভাবে দেখা দিতে পারে অর্থাৎ মনে হয় একটি অপরের গৌণ, শক্তিকে মনে করা হয় ঈশ্বরের দিকে যাবার এক উপায় মাত্র। এর ফল — একদিকে যাবার প্রবণতা বা সাম্যের অভাব, সুপ্রতিষ্ঠিত নয় এমন ফলপ্রদ শক্তি বা প্রকাশের এমন আলো যা সম্পূর্ণ স্ফুরন্ত নয়। এই দ্বৈতভাবের দুইটি দিকের সম্পূর্ণ মিলন সাধন ও তার দ্বারা তার চেতনা নিয়ন্ত্রিত হলেই সাধক উন্মুক্ত হতে শুরু করে এক পূর্ণতর শক্তির দিকে যা তাকে এখানকার ভাবনা ও শক্তির বিশৃঙ্খল সংঘর্ষ থেকে সম্পূর্ণ বাইরে এনে নিয়ে যাবে এক পরতর সত্যের মধ্যে; আর ঐ সত্য যাতে এই অবিদ্যাময় জগৎকে দীপ্ত ও মুক্ত করে তার উপর একচ্ছত্রাধিপতিরূপে সক্রিয় হয় তার জন্য সেই সত্যের অবতরণ সম্ভব হবে এই শক্তির দ্বারা। এখন সে অখণ্ড রহস্যের নাগাল পেতে শুরু করে কিন্তু একে পুরোপুরি তার মুঠোর মধ্যে সে পায় তখনই যখন সে আদি অবিদ্যার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত বিদ্যার এই দ্বন্দ্বময় রাজ্যের ঊর্ধ্বে উঠে অতিক্রম করে সেই প্রান্তভূমি যেখানে অধ্যাত্মমন অন্তর্হিত হয় অতিমানসিক বিজ্ঞানের মাঝে। পরম একের এই তৃতীয় এবং সর্বাপেক্ষা স্ফুরন্ত বিভাবের মাধ্যমেই সাধক শ্রেষ্ঠ অখণ্ড সম্পূর্ণতার সঙ্গে প্রবেশ করতে শুরু করে যজ্ঞেশ্বরের সত্তার গহনতম রহস্যের মধ্যে।

কারণ আপাতপ্রতীয়মান নৈর্ব্যক্তিক বিশ্বের মাঝে ব্যক্তিসত্ত্বের উপস্থিতির রহস্যের পিছনেই প্রচ্ছন্ন আছে সৃষ্টির প্রহেলিকার সন্ধান, যেমন তা আছে নিশ্চেতনের মধ্য থেকে চেতনার, নিষ্প্রাণের মধ্য থেকে প্রাণের, অচেতন জড়ের মধ্য থেকে অন্তঃপুরুষের অভিব্যক্তির মাঝে। এখানে আবার আসে অপর একটি স্ফুরন্ত দ্বৈতভাব যা প্রথম দৃষ্টিতে জানার চেয়ে বেশী ব্যাপক এবং যা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশমান শক্তির বিলাসের জন্য গভীরভাবে প্রয়োজনীয়। এই দ্বৈতের এক মেরুতে দাঁড়িয়ে সাধকের পক্ষে তার অধ্যাত্ম অনুভূতিতে সর্বত্র এক মৌলিক নৈর্ব্যক্তিকতা দেখার বিষয়ে মনকে অনুসরণ করা সম্ভব। জড় জগতের মধ্যে বিকাশমান অন্তঃপুরুষের যাত্রা শুরু হয় এক বিরাট নৈর্ব্যক্তিক অচিতি থেকে যার মধ্যে কিন্তু আমাদের আন্তর দৃষ্টি অনুভব করে এক আচ্ছন্ন অনন্ত চিৎপুরুষের উপস্থিতি; এর অগ্রগতির পথে আবির্ভূত হয় এক অনিশ্চিত চেতনা ও ব্যক্তিসত্ত্ব যা তাদের পূর্ণতম বিকাশেও মনে হয় এক অদ্ভুত ঘটনা কিন্তু এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলে এক নিরবচ্ছিন্ন ক্রমে; প্রাণের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মন ছাড়িয়ে এটি ঊর্ধ্বে ওঠে এক অনন্ত, নৈর্ব্যক্তিক ও পরম অতিচেতনার মাঝে যেখানে ব্যক্তিসত্ত্ব, মনশ্চেতনা, প্রাণচেতনা সব কিছু যেন লোপ পায় এক মুক্তিপ্রদ বিনাশ, নির্বাণের দ্বারা। এর চেয়ে এক নিম্নস্তরে সাধক অনুভব করে যে এই মৌলিক নৈর্ব্যক্তিকতা যেন এক সর্বব্যাপী বিশাল মুক্তিপ্রদা শক্তি। এ তার জ্ঞানকে মুক্ত করে ব্যক্তিগত মনের সঙ্কীর্ণতা

থেকে, তার সঙ্কল্পকে ব্যক্তিগত কামনার কবল থেকে, তার হৃদয়কে ক্ষুদ্র অস্থির ভাবাবেগের বন্ধন থেকে, তার প্রাণকে এর ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত পথ থেকে, তার অন্তঃপুরুষকে অহং থেকে; আর সেজন্য এদের সুবিধা হয় স্থিরতা, সমত্ব, ব্যাপ্তি, সার্বিকতা, ও আনন্ত্য লাভে। মনে হতে পারে যে পরম ব্যক্তিসত্ত্ব কর্মযোগের প্রধান অবলম্বন, প্রায় তার উৎস, কিন্তু এখানেও দেখা যায় যে নৈর্ব্যক্তিকতা শ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদা শক্তি; এক ব্যাপ্ত অহংশূন্য নৈর্ব্যক্তিকতার মাধ্যমেই মুক্ত কর্মী ও দিব্য স্রষ্টা হওয়া সম্ভব। দ্বৈতভাবের নৈর্ব্যক্তিক মেরু থেকে এই অনুভূতির প্রবল শক্তিতে অভিভূত হয়ে জ্ঞানীরা যে একেই একমাত্র পথ এবং নৈর্ব্যক্তিক অতিচেতনকে সনাতনের একমাত্র সত্য বলেছেন তাতে আশ্চর্য কিছু নেই।

কিন্তু তথাপি এই দ্বৈতভাবের বিপরীত মেরুতে দণ্ডায়মান সাধকের নিকট অনুভূতির আরেকটি ধারা আসে যা হৃদয়ের পশ্চাতে ও আমাদের প্রাণ শক্তিরও মধ্যে গভীরভাবে অধিষ্ঠিত এই বোধিকে সমর্থন করে যে চেতনা, প্রাণ, অন্তঃপুরুষের মত ব্যক্তিসত্ত্বও নৈর্ব্যক্তিক শাশ্বততার মাঝে ক্ষণিকের অতিথি নয় বরং এরই মধ্যে আছে সৃষ্টির প্রকৃত অর্থ। বিশ্বক্রিয়াশক্তির এই মনোহর কুসুমের মাঝে আছে বিশ্বপ্রকৃতির সাধনার লক্ষ্যের পূর্বাভাস, এর প্রকৃত উদ্দেশ্যের আভাস। যেমন সাধকের মধ্যে গূঢ় দৃষ্টি খোলে, তেমন সে জানতে পারে পিছনের জগতের কথা যাতে চেতনা ও ব্যক্তিত্বের স্থান খুব বড়, তাদের মূল্যও সমধিক; এমনকি এখানে, এই জড় জগতের মধ্যেও এই গূঢ় দৃষ্টিতে জানা যায় যে জড়ের নিশ্চেতনাকেও ভরে আছে এক গূঢ় ব্যাপক চেতনা, এর প্রাণহীনতা এক স্পন্দনময় প্রাণের আশ্রয়, এর যন্ত্রপারিপাট্য এক অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞার কৌশল, আর ভগবান ও অন্তঃপুরুষ সর্বত্র বিরাজিত। সবার উপরে দাঁড়িয়ে আছেন এক অনন্ত চিন্ময়পুরুষ যিনি নানারূপে নিজেকে বাইরে প্রকাশ করেছেন এই সকল জগতের মধ্যে; নৈর্ব্যক্তিকতা সেই প্রকাশের এক প্রথম উপায় মাত্র। বিভিন্ন তত্ত্ব ও শক্তির ক্ষেত্র এটি, অভিব্যক্তির এক সম ভিত্তি; কিন্তু এই সব শক্তি নিজেকে প্রকাশ করে বিভিন্ন সত্তার মাধ্যমে, বিভিন্ন চিৎপুরুষ তাদের চালক, আর তাদের উৎস যে পরম চিন্ময়পুরুষ তাঁর বিভূতি তারা। সেই পরম একের প্রকাশক এক বহুময় অগণিত ব্যক্তিসত্ত্বই অভিব্যক্তির প্রকৃত অর্থ ও কেন্দ্রীয় লক্ষ্য; আর এখন যে ব্যক্তিসত্ত্বকে মনে হয় সঙ্কীর্ণ, খণ্ড-খণ্ড, নিরুদ্ধ, তার একমাত্র কারণ এই যে এটি তার উৎসের নিকট উন্মুক্ত হয়নি অথবা সার্বিক ও অনন্তের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজের দিব্য সত্য ও পূর্ণতায় প্রস্ফুটিত হয়নি। সুতরাং এই জগৎ-সৃষ্টি আর অলীক বিভ্রম নয়; এক আকস্মিক যন্ত্রপারিপাট্য বা অপ্রয়োজনীয় কোন অভিনয় নয়, অথবা কোন পরিণতিহীন প্রবাহ নয়; এ হল চিন্ময় ও জীবন্ত সনাতনের অন্তরঙ্গ স্ফুরত্তা।

একই সৎস্বরূপের দুই প্রান্ত থেকে এই দুই একান্ত বিরোধী দৃষ্টি পূর্ণযোগের সাধকের কাছে কোন মৌলিক বাধা সৃষ্টি করে না; কারণ সেই অখণ্ড সৎস্বরূপের মধ্যস্থিত বিষয়ের অভিব্যক্তির জন্য এই দুই সংজ্ঞার ও পরস্পরের মধ্যে নেতিবাচক ও ইতিবাচক তাদের দুই শক্তিপ্রবাহের প্রয়োজনীয়তা তার সমগ্র উপলব্ধিতে জানা গিয়েছে। তার কাছে পরম

ব্যক্তিসত্ত্ব ও নৈর্ব্যক্তিকতা তার অধ্যাত্ম উৎক্রান্তির দুই পক্ষ, আর সে এই ভবিষ্য দৃষ্টি পেয়েছে যে সে এমন উচ্চস্তরে উঠবে যেখানে এই দুয়ের সহায়কর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পরিণত হবে তাদের শক্তির সম্মিলনে, উদ্ঘাটিত করবে অখণ্ড সদ্‌বস্তু এবং ভগবানের আদ্যাশক্তিকে মুক্ত করবে ক্রিয়ার মধ্যে। শুধু মৌলিক বিভাবে নয়, তার সাধনার সমগ্র ধারাতেই সে অনুভব করেছে তাদের যুগ্ম সত্য এবং পরস্পরের অনুপূরক কর্মপ্রণালী। এক নৈর্ব্যক্তিক সান্নিধ্য ঊর্ধ্ব থেকে প্রভাব বিস্তার করেছে বা তার প্রকৃতির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তা অধিগত করেছে; এক জ্যোতি নেমে এসে তার মন, প্রাণশক্তি ও দেহের কোষাণু পর্যন্ত পরিপ্লুত করে তাদের উদ্ভাসিত করেছে জ্ঞানালোকে, প্রকাশ করেছে তাকে নিজের কাছে — এমন কি নিম্নে তার একান্ত ভিন্নবেশী ও সম্পূর্ণ অজানা সব গতিবৃত্তি পর্যন্ত বাদ পড়েনি; আর যা কিছু অবিদ্যার অধিকারে ছিল সে সবের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে তাদের বিশুদ্ধ ও ধ্বংস করেছে বা তাদের মধ্যে এনেছে ভাস্বর পরিবর্তন। স্রোতের ধারায় বা সাগরের মত এক পরমাশক্তি তার মধ্যে নেমে এসে সক্রিয় হয়েছে তার সত্তায় ও প্রতি অঙ্গে এবং সর্বত্র ভেঙে নতুনভাবে গড়েছে, নবরূপ দিয়েছে, রূপান্তরিত করেছে। এক পরম আনন্দ তার মধ্যে সবলে প্রবিষ্ট হয়ে দেখিয়েছে যে তা দুঃখ কষ্টকে অসম্ভব করে তুলতে ও যন্ত্রণাকেও দিব্যসুখে পরিণত করতে সমর্থ। এক অসীম প্রেম তাকে সকল প্রাণীর সঙ্গে যুক্ত করেছে অথবা তার নিকট প্রকাশিত করেছে অবিচ্ছেদ্য অন্তরঙ্গতা ও অনির্বচনীয় মাধুর্যের ও সৌন্দর্যের এক জগৎ এবং পার্থিব জীবনের বৈষম্যের মধ্যেও আরোপ করতে শুরু করেছে তার পূর্ণতার বিধান ও পরমোল্লাস। এক অধ্যাত্ম সত্য ও ঋত প্রতিপন্ন করেছে যে এই জগতের শুভ ও অশুভ হল অপূর্ণ বা মিথ্যা, আর অনাবৃত করেছে এক পরম শুভ ও সূক্ষ্ম সুষমা সম্বন্ধে এবং ক্রিয়া ও বেদনা ও জ্ঞানের ঊর্ধ্বায়ন সম্বন্ধে এর সূত্র। কিন্তু এ সকলের পশ্চাতে ও তাদের মধ্যেও সে অনুভব করেছে এক পরম দেবকে যিনি সবই — জ্যোতি আনয়নকারী, দিশারী ও সর্বজ্ঞ, শক্তির অধীশ্বর, আনন্দদাতা, সুহৃৎ, সহায়, পিতা, মাতা, জগৎলীলায় খেলার সাথী, তার সত্তার পরমস্বামী, তার অন্তঃপুরুষের প্রেমাস্পদ ও প্রেমিক। মানুষী ব্যক্তিভাবনায় যত সম্পর্ক জানা আছে সে সবই আছে ভগবানের সঙ্গে অন্তঃপুরুষের সম্পর্কে; কিন্তু তাদের উত্তরায়ণ অতিমানবতার স্তরের দিকে, তারা সাধককে বাধ্য করে দিব্য প্রকৃতির দিকে অগ্রসর হতে।

পূর্ণ যোগের লক্ষ্য হল সম্যক্ জ্ঞান, অখণ্ড শক্তি, সৃষ্টির পশ্চাতে অবস্থিত সর্বময় অনন্তের সঙ্গে মিলনের সমগ্র সমৃদ্ধি। এই যোগের সাধকের পক্ষে কোন একটিমাত্র দিব্য বিভাব — যতই না তা মানুষের মনকে অভিভূত করুক, তার গ্রহণশক্তির পক্ষে তা যতই না পর্যাপ্ত হোক, যত সহজেই না তা একমাত্র বা চরম সদ্‌বস্তু বলে গ্রহণীয় হোক — সনাতনের একমাত্র সত্য হতে পারে না। তার পক্ষে দিব্য বহুত্বের অনুভূতির পরিপূর্ণতা সাধনের দ্বারাই দিব্য একত্বের চরম অনুভূতি আরো গভীর, ব্যাপ্ত ও সমৃদ্ধ হয়। যেমন একেশ্বরবাদের তেমন বহুদেববাদের পশ্চাতে যা কিছু সত্য আছে তা-ও পূর্ণযোগীর লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মানুষী মনের কাছে এ সবের যে বাহ্য অর্থ তা

ছাড়িয়ে সে উর্ধ্বে ওঠে ভগবানের মধ্যে তাদের রহস্যময় সত্যের সন্ধানে। বিভিন্ন বিবদমান সম্প্রদায় ও দর্শনের লক্ষ্য কি তা সে দেখে, ও সদ্‌বস্তুর প্রতি দিককে তার নিজের স্থানে স্বীকার করে কিন্তু এসবের সঙ্কীর্ণতা ও প্রমাদ পরিহার করে সে আরো অগ্রসর হয় যতক্ষণ না সে আবিষ্কার করে তাদের সমন্বয়কারী এক পরম সত্যকে। ঈশ্বরকে মানুষ ভাবা, মানুষরূপে তার পূজা করা — এসব অপবাদে সে বিচলিত হয় না, কারণ সে দেখে এই সকল অজ্ঞানাচ্ছন্ন দাম্ভিক যুক্তিবুদ্ধির বিদ্বেষ, নিজেরই সঙ্কীর্ণ বৃত্তের মধ্যে বিয়োজনকারী মনের নিজস্ব আবর্তন। বর্তমানে আচরিত মানুষী সম্পর্কগুলি যদিও ক্ষুদ্রতা, দুষ্টতা ও অজ্ঞানতায় পূর্ণ তথাপি তারা ভগবানেরই মধ্যস্থিত কিছুর বিকৃত ছায়া; আর সাধক এ সবকে ভগবানের দিকে ফিরিয়ে তা-ই পায় যার ছায়া এইসব এবং তাকেই নামিয়ে আনে জীবনে অভিব্যক্তির জন্য। মানুষ নিজেকে ছাড়িয়ে পরম পূর্ণতার দিকে নিজেকে উন্মীলিত করলে তার মধ্য দিয়েই এখানে ভগবানের আত্ম-অভিব্যক্তি সম্ভব, কারণ এই হল অধ্যাত্ম বিবর্তনের গতি ও ধারার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সুতরাং মানুষের দেহে অধিষ্ঠিত, "মানুষী তনুম্ আশ্রিতম্", শুধু এই যুক্তিতে সে দেবতাকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করবে না। ভগবান সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণ মানুষী ভাবনা অতিক্রম করে সে যাবে অদ্বিতীয় দিব্য সনাতনের কাছে, কিন্তু এছাড়াও সে তাঁকে দেখবে বিভিন্ন দেবতার আননে, তাঁর জগৎ-লীলার অবলম্বন স্বরূপ তাঁর বিভিন্ন বিশ্বব্যক্তিসত্ত্বে, তাঁকে চিনতে পারবে বিভিন্ন বিভূতি, দেহধারী জগৎ-শক্তি বা মানবনেতার মুখোশের অন্তরালে, তাঁকেই ভক্তি ও মান্য করবে গুরুমূর্তিতে, পূজা করবে অবতারের মধ্যে। এ এক অসামান্য সৌভাগ্য যদি সে এমন কারুব সাক্ষাৎ পায় যিনি তাঁর সাধনার সাধ্য পরম 'তৎ'-কে উপলব্ধি করেছেন বা তা-ই হয়ে উঠেছেন আর যদি সে পরমের অভিব্যক্তি এই মানব আধারের মাঝে পরমের নিকট নিজেকে উন্মীলিত করে নিজেই পরমকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। কারণ তাই হল উপচীয়মান পূর্ণতার স্পষ্টতম চিহ্ন, জড়ের মধ্যে যে উত্তরোত্তর দিব্য অবতরণ জড়সৃষ্টির গূঢ়মর্ম ও পার্থিব জীবনের সঙ্গত ও সার্থক হেতু সেই পরম রহস্যের আশ্বাস হল তা।

এইভাবেই যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞের অধ্বর গতিতে নিজেকে প্রকট করেন সাধকের কাছে। এই আত্মপ্রকাশ আসতে পারে সাধনার যে কোন পর্যায়ে; কর্মের প্রভু যে কোন বিভাবে সাধকের অন্তরে কর্মের ভার নিতে পারেন এবং স্বীয় উপস্থিতি প্রকাশের জন্য ক্রমশঃ বেশী মাত্রায় চাপ দিতে পারেন সাধক ও কর্মের উপর। যথাসময়ে সকল বিভাবই আত্মপ্রকাশ করে, প্রথমে পৃথক পৃথক ভাবে, কিন্তু সে সব মিলে, সম্মিলিত হয়ে পরে একসাথে একীভূত হয়। পরিশেষে এই সকলের মধ্য দিয়ে উদ্ভাসিত হয় পরম অখণ্ড সদ্‌বস্তু; অবিদ্যার অংশ এই মনের কাছে তা অজ্ঞেয় হলেও জ্ঞেয় তা কারণ অধ্যাত্ম চেতনা ও অতিমানসিক জ্ঞানের আলোকে তা হল স্বয়ং-প্রজ্ঞ।

যজ্ঞের প্রথম লক্ষ্য ও তার সাথে চরম সিদ্ধিরও সর্ত হল এক সর্বোত্তম সত্যের বা সর্বোত্তম সত্তা, চিৎ, শক্তি, আনন্দ ও প্রেমের এই প্রকাশ যা যুগপৎ নৈর্ব্যক্তিক ও পুরুষ-বিধ হওয়ায় আমাদের সত্তার দুই দিকই অধিকার করে, কারণ আমাদের মধ্যেও আছে ব্যক্তিপুরুষ ও নৈর্ব্যক্তিক বিভিন্ন স্তূপীকৃত তত্ত্ব ও শক্তির অজ্ঞানময় মিলন। যে তৎস্বরূপ এইভাবে আমাদের দর্শন ও অনুভূতিতে ব্যক্ত হন তাঁর সঙ্গে আমাদের আপন সত্তার মিলনের আকারেই যজ্ঞের সিদ্ধি প্রাপ্তি। এই মিলন তিন প্রকারের। একটি মিলন অধ্যাত্মস্বরূপে, তাদাত্ম্য বোধের দ্বারা; অপর একটি হল এই সর্বোত্তম সত্তা ও চেতনার মধ্যে আমাদের অন্তর পুরুষের আন্তর অধিষ্ঠানজনিত মিলন; তৃতীয় মিলন হল তৎস্বরূপ ও এখানে আমাদের তটস্থ সত্তার মধ্যে প্রকৃতিগত সাদৃশ্য বা একত্বের স্ফুরন্ত মিলন। প্রথমটি হল অবিদ্যা থেকে মুক্তি ও পরম সৎ ও সনাতনের সঙ্গে একাত্মবোধ, মোক্ষ, সাযুজ্য; এই হল জ্ঞানযোগের বিশিষ্ট লক্ষ্য। দ্বিতীয়টি — ভগবানের সঙ্গে বা মধ্যে অন্তঃপুরুষের নিবাস, সামীপ্য, সালোক্য; এটি প্রেম ও আনন্দের সকল যোগের ঐকান্তিক আশা। তৃতীয়টি — প্রকৃতিগত তাদাত্ম্যতা, ভগবানের সঙ্গে সাদৃশ্য, তৎস্বরূপ যেমন সিদ্ধ তেমন সিদ্ধ হওয়া, সাধর্ম্য; এই হল শক্তি ও সিদ্ধির অথবা দিব্য কর্ম ও সেবার সকল যোগের পরম উদ্দেশ্য। আত্মপ্রকাশমান ভগবানের বহুময় ঐক্যের উপর এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এই তিনটি একত্রে যে মিলিত সম্পূর্ণতা লাভ করে তাই পূর্ণযোগের সমগ্র পরিণতি, ত্রিমার্গের লক্ষ্য ও ত্রিবিধ যজ্ঞের ফল।

আমরাও পেতে পারি এই তাদাত্ম্য-মিলন অর্থাৎ সাযুজ্য, — আমাদের সত্তার ধাতু মুক্ত হয়ে রূপান্তরিত হবে পরম চিৎপুরুষের ধাতুতে, আমাদের চেতনা ঐ দিব্য চেতনায়, আমাদের অন্তঃপুরুষ-অবস্থা অধ্যাত্ম নিঃশ্রেয়সের উল্লাসে অথবা সত্তার শান্ত শাশ্বত আনন্দে। আমরাও পেতে পারি ভগবানের মধ্যে এমন ভাস্বর নিবাস যাতে অন্ধকার ও অবিদ্যার এই অবর চেতনার মধ্যে পতন বা নির্বাসনের কোন আশঙ্কা থাকে না, আর অন্তঃপুরুষ বিচরণ করতে পারে অবাধে ও নিঃসংশয়ে তার নিজের স্বাভাবিক জগতে — আলোক, আনন্দ, স্বাধীনতা ও একত্বের জগতে। আবার যেহেতু এই মিলন শুধু অন্য কোন পর জীবনে পেলে চলবে না, এখানেও তা সাধনার দ্বারা আবিষ্কার করা দরকার, কাজেই তা করা চাই তার একমাত্র উপায়ে অর্থাৎ দিব্য সত্যের অবতরণের দ্বারা, দিব্য সত্যকে নামিয়ে এনে, এখানেই অন্তঃপুরুষের আলো, আনন্দ, স্বাধীনতা, একত্বের স্বধামকে প্রতিষ্ঠা করে। ভগবানের সঙ্গে শুধু যে আমাদের অন্তঃপুরুষ ও চিৎপুরুষের মিলন হবে তা নয়, তাঁর সঙ্গে আমাদের তটস্থ সত্তারও মিলন হবে আর এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে আমাদের অপূর্ণ প্রকৃতি পরিবর্তিত হবে দিব্য প্রকৃতিরই সাদৃশ্যে ও প্রতিমূর্তিতে; অপূর্ণ প্রকৃতিতে অবিদ্যার সব অন্ধ, বিকৃত, খণ্ডিত ও বিষম গতিবৃত্তি পরিহার করে তাতে স্বগত করা চাই ঐ জ্যোতি, শান্তি, আনন্দ, সুষমা, সার্বিকতা, প্রভুত্ব, বিশুদ্ধতা, সিদ্ধি; তাকে পরিণত হতে হবে দিব্যজ্ঞানের আধারে, সত্তার দিব্য সঙ্কল্প-সামর্থ্য ও শক্তির যন্ত্রে, দিব্য প্রেম, আনন্দ ও সৌন্দর্যের প্রণালীতে। এই রূপান্তরই —

আমরা এখন যা সব বা মনে হয় আমরা যা সব সে সবের অখণ্ড রূপান্তর — সাধন করা চাই সনাতন ও অনন্তের সঙ্গে কালের মধ্যে সান্ত সত্তার মিলনের দ্বারা অর্থাৎ যোগের দ্বারা।

কিন্তু এই সমস্ত দুরূহ ফল পাওয়ার জন্য এক বিশাল পরিবর্তন, আমাদের চেতনার এক সামগ্রিক পরাবর্তন, প্রকৃতির অসাধারণ সম্পূর্ণ রূপান্তর অপরিহার্য। যা একান্তই আবশ্যাক তা হল — আমাদের সমগ্র সত্তার উত্তরায়ণ, যে চিৎপুরুষ এখানে শৃঙ্খলিত, নিজের বিভিন্ন করণ ও পরিবেশের পাশে আবদ্ধ তার উত্তরায়ণ উর্ধ্বে শুদ্ধ মুক্ত পরম চিৎপুরুষে, অন্তঃপুরুষের উত্তরায়ণ কোন আনন্দময় অতিপুরুষের দিকে, মনের উত্তরায়ণ কোন ভাস্বর অতিমানসের পানে, প্রাণের উত্তরায়ণ কোন বিরাট অতিপ্রাণের অভিমুখে, আমাদের জড়দেহেরও উত্তরায়ণ কোন শুদ্ধ ও নমনীয় চিৎপুরুষ-ধাতুর মধ্যে তার উৎসে যুক্ত হবার জন্য। এ কিন্তু উর্ধ্বে একটানা দ্রুত উড়ে যাওয়া হতে পারে না, এ হল বেদে বর্ণিত যজ্ঞের উদয়নের মত এক সানু থেকে অন্য সানুতে আরোহণ যাতে প্রতি সানু থেকে সাধক উপরে দেখতে পায় আরো কত উঁচু সানুতে তাকে উঠতে হবে। সেই সঙ্গে উর্ধ্বে আমরা যা পেয়েছি তা নিম্নে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অবতরণও আবশ্যক: একেকটি শিখর জয় করার পর প্রতিটির বেলায় আমাদের ফেরা উচিত নিম্নের মর গতিবৃত্তিতে তার শক্তি ও দীপ্তি নামিয়ে আনার জন্য; একদিকে যেমন উর্ধ্বে নিত্য ভাস্বর জ্যোতির আবিষ্কার হবে তেমন অনুরূপভাবে মুক্ত হওয়া চাই সেই একই জ্যোতি যা প্রতি অংশে এমন কি অবচেতন প্রকৃতির গহনতম গুহাতে পর্যন্ত নিগূঢ় রয়েছে। উত্তরায়ণের এই তীর্থযাত্রা এবং রূপান্তর সাধনের জন্য এই অবরোহণ এক যুদ্ধবিশেষ না হয়ে উপায় নেই — এ হল আমাদের নিজেদের সঙ্গে এবং আমাদের চারপাশের নানা বিরোধী শক্তির সঙ্গে এক দীর্ঘ সংগ্রাম, আর এ এমন সংগ্রাম যে যতদিন তা চলে ততদিন মনে হয় যেন এর শেষ নেই। কারণ আমাদের তমসাচ্ছন্ন অবিদ্যাময় পুরনো প্রকৃতির সকল অংশই রূপান্তরকারী পরম প্রভাবকে পুনঃপুনঃ দৃঢ়ভাবে বাধা দেবে আর তার এই মন্থরগতি, অনিচ্ছা বা প্রবল বাধাদানে সহায় হবে পরিবেষ্টনকারিণী বিশ্বপ্রকৃতির অধিকাংশ দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত সব শক্তি; অবিদ্যার সব শক্তি ও অধিপতি ও শাসক সহজে তাদের সাম্রাজ্য ছাড়বে না।

প্রথমে যতদিন না আমাদের সমগ্র সত্তা এক মহত্তর সত্য ও জ্যোতি অথবা দিব্য প্রভাব ও সান্নিধ্যের দিকে উন্মীলনের জন্য প্রস্তুত ও উপযুক্ত হয় ততদিন হয়তো উদ্যোগ ও পরিশুদ্ধি পর্ব দীর্ঘ হবে আর প্রায়ই তা হয় ক্লান্তিকর ও কষ্টপূর্ণ। এমনকি কেন্দ্রে আমরা উপযুক্ত ও প্রস্তুত হলেও, আগেই উন্মীলিত হলেও, আমাদের মন, প্রাণ ও দেহের সকল গতিবৃত্তি, এবং আমাদের ব্যক্তিভাবনার নানাবিধ বিবদমান অঙ্গ ও উপাদান সম্মত হতে, অথবা সম্মত হলেও রূপান্তরের দুরূহ ও কঠিন সাধনা সহ্য করার উপযুক্ত হতে দীর্ঘ দিন কেটে যাবে। আবার আমাদের মধ্যকার যাবতীয় অংশ ইচ্ছুক হলেও বর্তমান চঞ্চল সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত সকল বিশ্বশক্তির বিরুদ্ধে আমাদের যে সংগ্রাম

চালাতে হবে তা সবচেয়ে কঠিন হবে যখন তারা যেটুকু মাত্র সহজে ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক — দীপ্ত অবিদ্যা মাত্র — তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে আমরা চাইব চরম অতিমানসিক রূপান্তর ও চেতনার পরাবর্তন সাধন যার সাহায্যে দিব্যসত্যকে আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে তার পূর্ণ গরিমায়।

এরই জন্য আমাদের অতিস্থিত 'তৎ'-এর নিকট সমর্পণ ও প্রপত্তি অপরিহার্য, তবেই তাঁর শক্তির পূর্ণ ও অবাধ ক্রিয়া সম্ভব। যতই আত্মদান অগ্রসর হবে, যজ্ঞকর্ম ততই আরো সহজ ও শক্তিশালী হবে, বিরোধী শক্তিবর্গের বাধার ক্ষমতা, প্রবর্তনা ও গুরুত্ব তত হ্রাস পাবে। যা এখন মনে হয় দুরূহ বা অসাধ্য তাকে সম্ভব এমনকি নিশ্চিত করে তুলতে সব চেয়ে বেশী সহায় হয় দুটি আন্তর পরিবর্তন। সম্মুখে আবির্ভূত হয় ভিতরের নিগূঢ় অন্তরতম পুরুষ যাকে এতদিন ঢেকে রেখেছিল মনের অস্থির বৃত্তি, আমাদের প্রাণিক সংবেগের দুর্দমতা এবং শারীর চেতনার আচ্ছন্নতা অর্থাৎ সেই তিন শক্তি যাদের বিশৃঙ্খল সমাহারকে আমরা এখন বলি আমাদের আত্মা। এর ফলে কেন্দ্রে মুক্তিপ্রদ জ্যোতি ও ফলপ্রসূ শক্তিসমেত দিব্যসান্নিধ্যের বিকাশ ও আমাদের প্রকৃতির সকল সচেতন ও অবচেতন স্তরের মধ্যে তার বিচ্ছুরণ কম ব্যাহত হবে। এরাই হল সেই দুটি নিদর্শন, যাদের একটিতে সূচিত হয় মহান্ লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে আমাদের পরিবর্তন ও উৎসর্গের পূর্ণতা, অন্যটিতে ভগবান কর্তৃক আমাদের যজ্ঞের গ্রহণযোগ্যতার চরম স্বীকৃতি।

পঞ্চম অধ্যায়

যজ্ঞের উদয়ন (১)

জ্ঞানের বিভিন্ন কর্ম — চৈত্য পুরুষ

তাহলে যে পরতম ও অনন্তের নিকট আমরা আমাদের যজ্ঞ নিবেদন করি তাঁর সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানের মূল কথাগুলি বলা হল, আর বলা হল এই যজ্ঞেরই প্রকৃতি সম্বন্ধে, তবে এই যজ্ঞের তিনটি বিভাব — কর্ম যজ্ঞ, প্রেম ও অর্চনার যজ্ঞ ও জ্ঞান যজ্ঞ। কারণ যখন আমরা কর্ম যজ্ঞের কথা বলি তখনো আমরা মনে করি না যে আমরা শুধু বাহ্য কর্মগুলি নিবেদন করি, আমরা মনে করি আমাদের মধ্যে যা কিছু সক্রিয় ও স্ফুরন্ত তা-ও নিবেদন করি; আমাদের বাহ্য ক্রিয়ার সঙ্গে আমাদের আন্তর গতিবৃত্তিকেও সমভাবে উৎসর্গ করা চাই একই বেদীতে। যেসব কর্মকে আমরা যজ্ঞ করে তুলি সে সবেরই আন্তর মর্ম হল আত্মশিক্ষা ও আত্মসিদ্ধির সাধনা আর এর দ্বারা আমরা আশা করি যে আমাদের মন, হৃদয়, সঙ্কল্প, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও দেহের সকল গতিবৃত্তির মধ্যে ঊর্ধ্ব থেকে বর্ষিত এক আলোকের সাহায্যে আমরা হয়ে উঠব সচেতন ও দীপ্তিমান। দিব্য চেতনার উপচীয়মান আলোক অন্তঃপুরুষসত্তায় আমাদের সমীপস্থ করবে জগৎ-যজ্ঞের অধীশ্বরের সঙ্গে এবং আমাদের অন্তরতম সত্তায় ও চিন্ময় ধাতুতে তাঁর সঙ্গে এক করবে তাদাত্ম্যবোধের দ্বারা — প্রাচীন বেদান্ত মতে এই হল জীবনের পরমার্থ; উপরন্তু আমাদের প্রকৃতিকে ভগবানের সদৃশ করে সম্ভূতিতে তাঁর সঙ্গে আমাদের এক করারও প্রবণতা তাতে থাকে; বৈদিক ঋষিদের নিগূঢ়ার্থ ভাষায় যজ্ঞপ্রতীকের রহস্যময় তাৎপর্য হল এই।

কিন্তু এটাই যদি মনোময় পুরুষ থেকে পূর্ণযোগের উদ্দিষ্ট অধ্যাত্মপুরুষে দ্রুত ক্রমবিকাশের বিশিষ্ট লক্ষণ হয় তাহলে এমন এক প্রশ্ন ওঠে যা সমস্যাসঙ্কুল, তবে তার স্ফুরন্ত গুরুত্ব অনেক বেশী। আমাদের বর্তমান জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে, আমাদের এখনো অপরিবর্তিত মানুষী প্রকৃতির উপযোগী কাজকর্ম সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য কি হবে? এক মহত্তর চেতনার দিকে উৎক্রান্তি এবং তার শক্তির দ্বারা আমাদের মন, প্রাণ ও দেহকে অধিগত করা — একেই যোগের প্রধান উদ্দেশ্য বলে স্বীকার করা হয়েছে; অথচ বলা হচ্ছে যে পরম চিৎপুরুষের ক্রিয়ার অব্যবহিতক্ষেত্র এখানকার জীবন, অন্যত্র অন্য কোন জীবন নয়; আর এই ক্রিয়া হল রূপান্তর, আমাদের করণগত সত্তা ও প্রকৃতির ধ্বংস সাধন নয়। তাহলে আমাদের সত্তার বর্তমান সব কাজকর্মের পরিণাম কি? অর্থাৎ জ্ঞানলাভ ও জ্ঞানের প্রকাশের চেষ্টায় মনের কাজ, আমাদের ভাবাবেগ ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির অংশগুলির কাজ, আমাদের বহির্মুখী আচরণ, সৃজন, উৎপাদন এবং মানুষ, বিষয়, জীবন,

জগৎ, নিসর্গ শক্তিসমূহের উপর কর্তৃত্বপ্রয়াসী সঙ্কল্পের কাজ — এ সবের কি পরিণাম? এইসব কি পরিত্যাগ করে তার জায়গায় আনতে হবে অন্য কোন জীবনপ্রণালী যাতে আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন চেতনা সন্ধান পাবে তার যথার্থ বহিঃপ্রকাশ ও রূপ? না আমাদের কর্তব্য হবে তাদের বর্তমান বাহ্যরূপ বজায় রেখে কাজের মধ্যে আন্তরভাবের দ্বারা তাদের রূপান্তরিত করা বা চেতনার পরাবর্তনের দ্বারা তাদের ক্ষেত্র বিস্তৃত ক'রে নতুন নতুন রূপের মধ্যে তাদের মুক্ত করা যেমন পৃথিবীতে দেখা গিয়েছিল যখন পশুর প্রাণিক কাজকর্ম, তাদের মধ্যে যুক্তি, চিন্তাশীল সঙ্কল্প, পরিমার্জিত ভাবাবেগ, সুগঠিত বুদ্ধি মিলিয়ে তাদের মানসিকভাবাপন্ন, প্রসারিত ও রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে মানুষ ব্রতী হয়েছিল? অথবা আমাদের কি কর্তব্য কিছু ছেড়ে দিয়ে শুধু সেইগুলি রক্ষা করা যেগুলি অধ্যাত্ম পরিবর্তন গ্রহণে সমর্থ আর বাকী সকলের জন্য এমন এক নতুন জীবন সৃজন করা যা শুধু অন্তঃপ্রেরণা ও প্রবর্তক শক্তিতে নয়, তার রূপেও সমভাবে প্রকাশ করবে মুক্তপুরুষের ঐক্য, ব্যাপ্তি, শান্তি, হর্ষ ও সুষমা? এই সমস্যাই তাদের মনকে সবচেয়ে বেশী ভাবিয়েছে যারা যোগের দীর্ঘ যাত্রায় মানুষ থেকে ভগবানের দিকে যাবার পথ খুঁজে বার করতে চেষ্টা করেছে।

সবরকম সমাধানের কথাই বলা হয়েছে; তাদের এক প্রান্তের কথা এই যে দেহের পক্ষে যতদূর সম্ভব সব কাজ ও জীবন পুরোপুরি বর্জন কর; আর অন্য প্রান্তের কথা — জীবন যেমন তেমন স্বীকার কর তবে তার মধ্যে এমন নতুন ভাব আন যাতে তার গতিবৃত্তি প্রাণবন্ত ও উত্তোলিত হয়, বাহ্যতঃ তারা দেখতে আগের মতই থাকবে কিন্তু তাদের পিছনের ভাব এবং ফলতঃ তাদের আন্তর তাৎপর্যও বদলে যাবে। সংসারত্যাগী বৈরাগী বা অন্তরাবৃত্ত রসোন্মত্ত আপনভোলা গূঢ়বাদীর চরম সমাধান স্পষ্টতঃ পূর্ণযোগের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত; কারণ যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয় জগতের মধ্যে ভগবানকে উপলব্ধি করা তাহলে জগৎক্রিয়া ও ক্রিয়ামাত্রকেই পুরোপুরি পরিহার করে সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না। এর চেয়ে কম উঁচু সুরে ধার্মিক মন প্রাচীনকালে যে বিধান দিয়েছে তা এই যে শুধু সেই সব কাজ রাখা যেগুলি স্বভাবতঃ ভগবানের অন্বেষণ, সেবা বা পূজার অঙ্গ বা তার আনুষঙ্গিক, অথবা এসবের সঙ্গে সেগুলিও রাখা যায় যেগুলি সাধারণ জীবনযাত্রার জন্য অপরিহার্য, তবে সেসব করা চাই ধর্মভাবে এবং ঐতিহ্যগত ধর্ম ও শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী। কিন্তু কর্মের মধ্যে মুক্তপুরুষের চরিতার্থতার পক্ষে এই অনুষ্ঠানপর নিয়ম উপযোগী নয়; তাছাড়া এর একমাত্র চরম উদ্দেশ্য — এক পরপারের জীবন, স্বীকারই করা হয় যে এই জাগতিক জীবন থেকে ঐ জীবনে উত্তীর্ণ হবার জন্য এ শুধু এক সাময়িক সমাধান। বরং পূর্ণযোগের বেশী অনুকূল হল গীতার উদার নির্দেশ যে মুক্তপুরুষের উচিত সত্যের মধ্যে বাস করে জীবনের সকল কর্ম করা যাতে গূঢ় দিব্য দেশনায় পরিচালিত বিশ্ব বিবর্তনের পরিকল্পনা ব্যাহত বা ক্ষুণ্ণ না হয়। কিন্তু বর্তমানে অবিদ্যার মধ্যে যে সকল রূপে ও ধারায় কর্ম করা হয় যদি সেইভাবেই কর্ম করা হয় তাহলে আমাদের লাভ হবে শুধু অন্তরের দিকে, আর বিপদ এই যে আমাদের জীবন

এমন এক অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক সূত্রে পরিণত হতে পারে যাতে আন্তর আলোকের কাজ হবে বাহ্য প্রদোষ-আলোকের কাজ, পূর্ণ পরম চিৎপুরুষ নিজেকে প্রকাশ করবেন তাঁর স্বীয় দিব্য প্রকৃতির বিসদৃশ অপূর্ণতার আধারে। যদি কিছুকালের জন্য এর চেয়ে ভাল কিছু না করা যায় — আর সংক্রমণের অবস্থায় দীর্ঘ দিন এইরকম অবস্থা অবশ্যম্ভাবী — তাহলে এই অবস্থাই চলতে থাকবে যতদিন না উদ্যোগ পর্ব শেষ হয় আর অন্তঃস্থ চিৎপুরুষ এমন শক্তিশালী হয় যাতে সে নিজস্ব রূপ আরোপ করতে পারে দেহ ও বাইরের জগতের জীবনের উপর, তবে একে স্বীকার করা যায় শুধু সংক্রমণের পর্যায় হিসেবে, আমাদের অন্তঃপুরুষের আদর্শ বা পথের চরম সীমানা হিসেবে নয়।

একই কারণে সুনীতির সমাধানও যথেষ্ট নয়; কারণ নৈতিক অনুশাসন শুধু প্রকৃতির বন্য অশ্বগুলির মুখে কাঁটা-লাগাম পরিয়ে অতিকষ্টে তাদের কিছুটা বশে আনে, কিন্তু প্রকৃতি যাতে দিব্য আত্মজ্ঞানজাত বোধি সার্থক ক'রে নিরাপদ ও স্বাধীনভাবে চলতে পারে তাকে তেমন রূপান্তরিত করার সামর্থ্য তার নেই। বড়জোর তার পদ্ধতি হল গণ্ডিটানা, শয়তানকে জোর করে দমন করা আর আমাদের চারিদিকে নিরাপত্তার প্রাকার তোলা, তবে এ নিরাপত্তা আপেক্ষিক ও খুবই অনিশ্চিত। কি সাধারণ জীবনে, কি যোগে, আত্মরক্ষার এই কৌশল বা অনুরূপ অন্য কৌশলের সাময়িক প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে, তবে যোগে এটি শুধু এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় যাবার লক্ষণ। আমাদের লক্ষ্য হল মৌলিক রূপান্তর ও অধ্যাত্ম জীবনের বিশুদ্ধ ব্যাপ্তি; আর তার জন্য আমাদের পাওয়া দরকার আরো গভীর সমাধান, নীতির উর্ধ্বে আরো নিশ্চিত কোন স্ফুরন্ত তত্ত্ব। অন্তরে আধ্যাত্মিক ও বাইরে নীতিপরায়ণ হওয়া — এই হল সাধারণ ধর্মীয় সমাধান, কিন্তু এ তো এক আপোষরফা; আন্তর সত্তা ও বহির্জীবন এই উভয়কেই আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন করা — এই হল আমাদের সাধনার লক্ষ্য, জীবন ও চিৎপুরুষের মধ্যে কোন আপোষরফা নয়। মানুষের যে ভ্রান্ত মূল্যায়নে আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকবোধের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না, বরং দাবী করা হয় যে নৈতিকবোধই আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একমাত্র সত্যকার অধ্যাত্ম উপাদান সে মূল্যায়ন আমাদের কোন কাজে লাগে না; কারণ নীতি এক মানসিক সংযম মাত্র, সীমিত প্রমাদী মন তো মুক্ত চিরদীপ্ত পরম চিৎপুরুষ নয়, আর তা হতেও পারে না। তেমনই সেই উপদেশও মানা অসম্ভব যা জীবনকেই একমাত্র লক্ষ্য করে তার বর্তমান উপাদানগুলিকেই মূল হিসেবে স্বীকার করে আর শুধু একে চকচকে ও রঙীন করার জন্য ডেকে নিয়ে আসে অর্ধ বা কৃত্রিম অধ্যাত্ম আলোক। তাছাড়া প্রায়শঃই চেষ্টা হয় প্রাণ ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে গোঁজামিল আনার — অন্তরে মরমীয়া অনুভূতির সঙ্গে বাইরে থাকে তার অনুকূল সৌন্দর্যবোধে জারিত বুদ্ধিগত ও ইন্দ্রিয়পর প্রকৃতি উপাসনা বা উন্নত ধরনের ভোগসুখবাদ যা আধ্যাত্মিক সমর্থনের আভায় নিজের মধ্যে পরিতৃপ্ত থাকে; এও পর্যাপ্ত নয় কেননা এ হল এমন আপোষরফা যা অনিশ্চিত ও কখনো সফল হয় না এবং দিব্য সত্য ও অখণ্ডতা থেকে ততটাই বহুদূরে যতটা দূরে এর বিপরীত, নীতিপরায়ণতা। উচ্চ

আধ্যাত্মিক শিখরের সঙ্গে নিম্ন স্তরের সাধারণ মন ও প্রাণের দাবীদাওয়ার যোগসাধনের সূত্রের জন্য যে প্রমাদী মানব মন হাতড়ে বেড়ায়, এ সমস্ত তারই বিভ্রান্ত সমাধান। এদের পিছনে যেটুকু আংশিক সত্য গোপন রয়েছে তা কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন তা অধ্যাত্মস্তরে উন্নীত হয়ে পরিশুদ্ধ হবে পরম ঋত চেতনায় এবং মুক্ত হবে অবিদ্যার ক্ষেত্র ও প্রমাদ থেকে।

মোট কথা এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, কোন স্থায়ী সমাধানই সম্ভব নয় যতদিন-না পৌঁছন যায় অতিমানসিক ঋত চেতনায় যার দ্বারা বিষয়সমূহের বাহ্য রূপের প্রকৃত স্থান নির্ণীত ও তাদের স্বরূপ প্রকাশিত হয়, আর প্রকাশিত হয় তাদের মধ্যকার সেই তত্ত্ব যা সরাসরি অধ্যাত্মস্বরূপ থেকে উদ্ভূত। ইতিমধ্যে আমাদের একমাত্র নিরাপদ উপায় হল অধ্যাত্ম অনুভূতির কোন নির্দেশক বিধান আবিষ্কার করা, আর না হয় অন্তরে এমন আলোক মুক্ত করা যা আমাদের যাত্রার দিশারী হবে যতদিন না সেই মহত্তর সাক্ষাৎ ঋতচেতনাকে আমরা লাভ করি ঊর্ধ্বে বা তা সঞ্জাত হয় আমাদের মধ্যে। কারণ আমাদের মধ্যে বাকী যা সব শুধু বাহ্য, যা সব অধ্যাত্ম বোধ বা দেখা নয়, বুদ্ধির রচনা, বর্ণনা বা সিদ্ধান্ত, প্রাণশক্তির ব্যঞ্জনা বা প্ররোচনা, জড়বস্তুর অনস্বীকার্য প্রয়োজনীয়তা — এ সকলই কখনো অর্ধ-আলো, কখনো মিথ্যা আলো যা বড়জোর কিছুদিনের জন্য বা অল্প পরিমাণে কাজে লাগে আর অন্য সময় হয় আমাদের বাধা দেয়, নয় বিভ্রান্ত করে। অধ্যাত্ম অনুভূতির নির্দেশক বিধান পাবার একমাত্র উপায় হল দিব্য চেতনার নিকট মানুষী চেতনার উন্মীলন; সে সামর্থ্য থাকা চাই যাতে আমরা আমাদের মধ্যে নিতে পারি দিব্যশক্তির কর্মপ্রণালী ও আদেশ ও স্ফুরন্ত উপস্থিতি, আর নিজেদের সমর্পণ করতে পারি তাঁর নিয়ন্ত্রণের নিকট; ঐ সমর্পণ ও নিয়ন্ত্রণই নিয়ে আসে সেই দেশনা। কিন্তু এই সমর্পণ ধ্রুব হয় না, দেশনারও স্থির নিশ্চয়তা থাকে না যতদিন আমরা অবরুদ্ধ থাকি মনের রূপায়ণ ও প্রাণের সংবেগ ও অহং-এর প্ররোচনার দ্বারা যা সব সহজেই আমাদের ফেলতে পারে মিথ্যা অনুভূতির ফাঁদে। এই বিপদ কাটবার একমাত্র উপায় হল আমাদের বর্তমান চৌদ্দআনা প্রচ্ছন্ন অন্তরতম পুরুষ বা চৈত্যপুরুষের উন্মীলন; এই চৈত্যপুরুষ আমাদের অন্তরে পূর্ব থেকেই আছে, কিন্তু সাধারণতঃ সক্রিয় নয়। এই আন্তর আলোককেই আমাদের মুক্ত করা চাই; কারণ যতদিন আমরা অবিদ্যার অবরোধের মধ্যে পথ চলি আর যতদিন না ঋতচেতনা আমাদের ভগবৎ-অভিমুখী সাধনার ভার পুরোপুরি গ্রহণ করে ততদিন এই অন্তরতম পুরুষের আলোকই আমাদের একমাত্র ধ্রুব জ্যোতি। এক তো আমাদের মধ্যে দিব্যশক্তির ক্রিয়া চলে সংক্রমণের অবস্থার মধ্যে, উপরন্তু চৈত্যপুরুষের আলো আমাদের সর্বদাই পথ দেখায় যাতে আমরা অবিদ্যার শক্তিসমূহের দাবী ও প্ররোচনা থেকে সরে এসে সেই পরতর প্রচোদনার কাছে সজ্ঞানে ও চোখ খুলে আনুগত্য স্বীকার করি; এই দুই মিলে সৃষ্টি করে আমাদের ক্রিয়ার এমন এক সদা অগ্রসরশীল আন্তর বিধান যা বর্তমান থাকে যতদিন-না আমাদের প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হয় আধ্যাত্মিক ও অতিমানসিক বিধান। সংক্রমণের অবস্থায় হয়তো কিছুকাল ধরে

আমরা সকল জীবন ও ক্রিয়া নিয়ে সেসব ভগবানের কাছে নিবেদন করি শুদ্ধি ও পরিবর্তনের জন্য এবং তাদের মধ্যস্থিত সত্যের মুক্তির জন্য; আর এক সময় আসতে পারে যখন আমরা পিছিয়ে এসে আমাদের চারিদিকে এক আধ্যাত্মিক দেওয়াল তুলি আর তাদের প্রবেশ পথ দিয়ে শুধু সেই সব কাজ কর্ম আসতে দিই যেগুলি অধ্যাত্ম রূপান্তরের বিধান অনুযায়ী চলতে স্বীকার করে; আর এক তৃতীয়কাল আসতে পারে যখন আবার সম্ভব করা যায় স্বচ্ছন্দ ও সর্বগ্রাহী ক্রিয়া, তবে পরম চিৎপুরুষের পূর্ণ সত্যের উপযোগী নতুন রূপে। তবে এ সমস্ত কোন মানসিক বিধির দ্বারা স্থির হবে না, স্থির হবে আমাদের মধ্যকার অন্তঃপুরুষের আলোকে এবং সেই দিব্য সামর্থ্যের নিয়ন্ত্রণী শক্তি ও বর্ধিষ্ণু দেশনার দ্বারা যা প্রথমে গূঢ়ভাবে বা প্রকাশ্যে প্রেরণা দেয়, পরে স্পষ্টভাবে নিয়ন্ত্রণ ও শাসন করতে শুরু করে এবং পরিশেষে যোগের সকল ভার তুলে নেয় নিজের হাতে।

যোগের তিন বিভাব অনুযায়ী কর্মকেও আমরা ভাগ করতে পারি তিন শ্রেণীতে, জ্ঞানের কর্ম, প্রেমের কর্ম ও প্রাণে সঙ্কল্প-শক্তির কর্ম; আর আমরা দেখতে পারি এই আরো সুনম্য আধ্যাত্মিক বিধি কেমন কার্যকরী হয় প্রতি বিভাগে এবং কেমন করে তা সাধন করে অপরা প্রকৃতি থেকে পরা প্রকৃতিতে সংক্রমণ।

যোগের দিক থেকে মানবমনের জ্ঞানান্বেষণের বিভিন্ন কর্মকে দুই বর্গে ভাগ করা স্বাভাবিক। একটি হল বুদ্ধির অতীত পরম জ্ঞান যা নিজেকে একাগ্র করে পরম এক ও অনন্তকে তাঁর অতিস্থিতিতে আবিষ্কার করতে বা চেষ্টা করে বোধি, ধ্যান, সরাসরি আন্তর সংযোগের দ্বারা প্রকৃতির অবভাসের পশ্চাতে সব চরম সত্যের মধ্যে প্রবেশ করতে; অন্যটি হল অবর প্রাকৃত বিজ্ঞান যা নিজেকে ছড়িয়ে দেয় বিভিন্ন প্রতিভাসের বাহ্য জ্ঞানে, তবে এই সব প্রতিভাস পরম এক ও অনন্তেরই বিভিন্ন ছদ্মবেশ, এই বেশেই তিনি আমাদের কাছে প্রতিভাত হন আমাদের চারিদিককার জগৎ-অভিব্যক্তির আরো বাহিরের সব রূপের ভিতর ও মধ্য দিয়ে। এই দুই, পরার্ধ ও অপরার্ধ — অর্থাৎ যে আকারে মানুষ মনের অবিদ্যাচ্ছন্ন সীমার মধ্যে তাদের রচনা বা ভাবনা করেছে — তারা এমনকি সেখানেও তাদের অভ্যুদয়ের সাথে সাথে নিজেদের মধ্যে স্পষ্ট ব্যবধান গড়ে তুলেছে। দর্শন কখনো অধ্যাত্ম বা অন্ততঃ বোধিমূলক, কখনো আচ্ছিন্ন ও বুদ্ধিগত, কখনো বা অধ্যাত্ম অনুভূতিকে বুদ্ধির ছাঁচে ফেলেছে আবার কখনো ন্যায়যুক্তির সাহায্যে চিৎপুরুষের আবিষ্কারগুলিকে সমর্থন করেছে কিন্তু সব সময়ই সে দাবী করেছে যে চরম সত্য নির্ধারণের কাজ তারই এলাকাভুক্ত। কিন্তু বুদ্ধিগত দর্শন তার আচ্ছিন্নতার অভ্যাসের দরুন জীবনের ক্ষেত্রে কদাচিৎ কোন প্রভাব বিস্তার করেছে — এমনকি যখন এ ব্যবহারিক জগৎ ও ক্ষণস্থায়ী বিষয় অন্বেষণের ক্ষেত্রে নিজেকে পৃথক না করে সূক্ষ্ম

দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞানের উচ্চ শিখরে নিবদ্ধ থাকেনি, তখনো কোন প্রভাব ছিল না। অবশ্য কখনো কখনো তার প্রভাব এসেছে ভাববিলাসপরায়ণ উচ্চ চিন্তার উপর যখন ভবিষ্যতের কোন উপকারিতা বা উদ্দেশ্য বিনাই মানসিক সত্য অন্বেষণ করা হয়েছে শুধু সত্যের জন্যই, কখনো এসেছে কথা ও ভাবনার কুয়াশাভরা উজ্জ্বল মেঘরাজ্যে মনের সূক্ষ্মক্রীড়াকৌশলের বিষয়ে। কিন্তু তার এই বিচরণ বা ক্রীড়াকৌশল ঘটেছে জীবনের আরো স্থূল বাস্তবতা থেকে বহু দূরে। ইউরোপে প্রাচীন দর্শন আরো স্ফুরন্ত ছিল কিন্তু মাত্র অল্প কয়েকজনের জন্য; ভারতবর্ষে এর যে সব রূপ আরো আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন ছিল সেগুলির দ্বারা জাতির জীবন বিশেষ প্রভাবান্বিত হয়েছিল কিন্তু রূপান্তরিত হয়নি। তবে ধর্ম দর্শনের মত একলা উচ্চ শিখরে বাস করতে চেষ্টা করেনি; বরং তার লক্ষ্য ছিল মানুষের মনের অংশ অপেক্ষা প্রাণের সব অংশকে অধিকার করে তাদের আকর্ষণ করা ভগবানের দিকে, তার ব্যক্ত অভিপ্রায় ছিল অধ্যাত্ম সত্য এবং প্রাণিক ও জড়গত জীবনের মাঝে সেতু নির্মাণ করা, সে চেষ্টা করেছিল যাতে নিম্নতনকে উর্ধ্বতনের অধীন করে তাদের মধ্যে মিল আনা, জীবনকে ভগবৎসেবার উপযোগী করা, পৃথিবীকে স্বর্গের অনুগত করা সম্ভব হয়। কিন্তু স্বীকার করতে হবে যে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এই প্রয়োজনীয় চেষ্টার ফল হয়েছে বিপরীত — স্বর্গের নামে পৃথিবীর কামনার অনুমোদন করা হয়েছে। কারণ সর্বদাই ধর্মের ভগবানকে পরিণত করা হয়েছে মানব-অহং-এর পূজা ও সেবার উপলক্ষস্বরূপ। ধর্ম বারবার তার অধ্যাত্ম অনুভূতির উজ্জ্বল মর্মলোক পরিহার করে সর্বদাই চেয়েছে প্রাণের সঙ্গে অনিশ্চিত আপোষের পরিধি বৃদ্ধি করতে আর এইভাবে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে তার বিশাল আঁধারের মাঝে; চিন্তাশীল মনকে তুষ্ট করার চেষ্টায় সে বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাকে প্রপীড়িত বা শৃঙ্খলিত করেছে ধর্মশাস্ত্রের গোঁড়া মতবাদের স্তূপে; আবার মানুষের হৃদয়কে জয় করতে গিয়ে সে নিজেই পড়েছে ধর্মানুরাগের ভাবালুতা ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সর্তে, মানুষের প্রাণিক প্রকৃতিকে বশে আনার জন্য তাকে নিজের এলাকায় আনতে গিয়ে সে নিজেই কলুষিত হয়ে পড়েছে; আর ধর্মান্ধতা, জিঘাংসার হিংস্রতা, কঠোর বা বর্বর অত্যাচার প্রবৃত্তি, রাশি রাশি মিথ্যাচার, অবিদ্যার প্রতি ঘোর আসক্তি প্রভৃতি যে সবের দিকে প্রাণিক প্রকৃতি প্রবণ তাদের কবলগ্রস্ত হয়েছে; তার ইচ্ছা ছিল মানুষের শারীর অংশকে ভগবানের দিকে নিয়ে যেতে, কিন্তু তদনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে সে নিজেই আবদ্ধ হল যাজকের যান্ত্রিকতায়, অন্তঃসারশূন্য অনুষ্ঠানে এবং নিষ্প্রাণ বিধিব্যবস্থার কঠোর বন্ধনে। উৎকৃষ্টের বিকৃতির ফল হল নিকৃষ্ট; এটি প্রাণসামর্থ্যের এক বিচিত্র রসায়ন, এ যেমন মন্দ থেকে ভাল আনতে পারে তেমন ভাল থেকেও মন্দ আনে। সঙ্গে সঙ্গে এই নিম্নমুখী আকর্ষণ থেকে আত্মরক্ষার বৃথা চেষ্টায় ধর্ম বাধ্য হল সৃষ্টিকে দুই ভাগে ভাগ করতে: জ্ঞান, কর্ম, কলা ও জীবন পর্যন্ত ভাগ হল দুই বর্গে — অধ্যাত্ম ও জাগতিক, ধর্মীয় ও ঐহিক, পবিত্র ও অপবিত্র; কিন্তু এই আত্মরক্ষামূলক পার্থক্য নিজেই হয়ে পড়ল কৃত্রিম ও আচারগত, রোগ সারার চেয়ে বরং বেড়েই গেল। অপরপক্ষে প্রাকৃত বিজ্ঞান ও ললিতকলা প্রথমে

ধর্মের অনুগত থাকলেও বা তার ছায়ায় বাস করলেও শেষে ধর্মের দাসত্ব থেকে নিজেদের মুক্ত করে নিঃসম্পর্ক বা বিরুদ্ধ হয়ে উঠল, অথবা তত্ত্ব-জ্ঞানমূলক দর্শন ও ধর্মের আদর্শকে প্রাণহীন, নিষ্ফল ও সুদূর অথবা অর্থহীন ভ্রান্তিপূর্ণ চরম অবাস্তব মনে করে তা থেকে এমন কি পিছিয়েও এসেছে উপেক্ষা, অবজ্ঞা বা অবিশ্বাসভরে। মানবমনের একদেশী অসহিষ্ণুতার ফলে বিচ্ছেদ যত পুরোপুরি হতে পারে, এক সময় এদের মধ্যে বিচ্ছেদ তত পুরোপুরি হয়েছিল, আর এমন কি আশঙ্কা হল যে এর পরিণামে পরতর বা আরো বেশী অধ্যাত্মবিদ্যা লাভের সকল চেষ্টা একেবারে নির্মূল হবে। কিন্তু তথাপি পার্থিববিষয়াসক্ত জীবনেও পরাবিদ্যাই একমাত্র বিষয় যা বরাবর প্রয়োজনে লাগে, এর বিহনে বিভিন্ন অবর বিজ্ঞান ও বৃত্তি যতই ফলপ্রদ হ'ক-না কেন, তাদের সম্পদের প্রাচুর্য যতই বিচিত্র, অবাধ ও অত্যাশ্চর্য হ'ক-না কেন সেসব সহজেই এমন যজ্ঞ হয়ে ওঠে যা নিবেদিত হয় বিধিহীনভাবে ও মিথ্যা দেবতার কাছে: মানুষের হৃদয়কে কলুষিত ও শেষে কঠিন করে, তার মনের দৃষ্টির পরিধিকে সঙ্কুচিত করে সেসব মানুষকে আবদ্ধ করে জড়ের পাষাণ কারাগারে অথবা নিয়ে ফেলে এক চরম অভেদ্য অনিশ্চয়তা ও মোহভঙ্গের মাঝে। এই যে অর্ধজ্ঞান যা অবিদ্যা বৈ আর কিছু নয় তার উজ্জ্বল জোনাকি আলোর ঊর্ধ্বে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে নিষ্ফল অজ্ঞেয়বাদ।

যে যোগের লক্ষ্য পরাৎপরের সর্বগ্রাহী উপলব্ধি সে যোগ বিরাট পুরুষের কোন কাজই বা এমনকি স্বপ্নও — যদি তা আদৌ স্বপ্ন হয় — অবজ্ঞা করবে না অথবা মানুষের মাঝে যে গৌরবোজ্জ্বল দুরূহ কর্ম ও বহুমুখী জয় সাধন করা তার অভিপ্রায় তা থেকে সে পিছিয়ে আসবে না। কিন্তু এই উদারতার প্রথম সর্ত এই যে জগতে আমাদের সব কর্মও হবে যজ্ঞের অংশ যা নিবেদিত হবে সর্বোত্তমের নিকট, অন্য কারোর কাছে নয়, দিব্যশক্তির নিকট, অন্য কোন শক্তির কাছে নয় এবং তা করা চাই সঠিক মনোভাব ও সঠিক জ্ঞান নিয়ে স্বাধীন অন্তঃপুরুষের দ্বারা, জড়-প্রকৃতির সম্মোহিত ক্রীতদাসের দ্বারা নয়। কর্মের বিভাগ যদি করতেই হয় তবে সে বিভাগ হবে, — যে সব কর্ম পবিত্র অগ্নিশিখার হৃৎকেন্দ্রের অতি সমীপস্থ এবং যে সব আরো দূরে থাকায় শিখার স্পর্শ-অল্প পেয়েছে বা তার দ্বারা স্বল্প আলোকিত হয়েছে — এই উভয়ের মধ্যে, অথবা ভাগ হবে যে সমিধের আগুন জোর ও গনগনে তার এবং ভিজে, ভারী ও বেশী বেশী চারিদিকে ছড়িয়ে থাকা মোটা মোটা কাঠ বেদীর উপর বেশী স্তূপীকৃত হলে, আগুনের তেজ জোর হতে পারে না তাদের — এ দুয়ের মধ্যে। তা নাহলে এই বিভাগ ছাড়া, জ্ঞানের যে সকল কর্ম পরম সত্য খোঁজে বা প্রকাশ করে সে সবই পূর্ণ উপযুক্ত নিবেদনের উপাদান; এমন কিছু নেই যা বাদ দেওয়া প্রয়োজন বলে দিব্য জীবনের বিশাল কাঠামোর মধ্য থেকে বাদ দিতে হবে। সকল মনোবিজ্ঞান ও জড়বিজ্ঞান যা বিষয়সমূহের বিধান ও রূপ ও ধারা পরীক্ষা করে, সেইসব বিদ্যা যা মানুষ ও প্রাণীর জীবন সম্বন্ধে ব্যাপৃত, মানুষের সমাজ, রাষ্ট্র, ভাষা ও ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করে এবং যাদের লক্ষ্য সেইসব প্রচেষ্টা ও কাজকর্ম জানা ও নিয়ন্ত্রণ করা যেসবের সাহায্যে মানুষ জগৎ ও পরিবেশকে আয়ত্তে এনে কাজে লাগায়, আবার সব মহৎ ও সুন্দর কলাবিদ্যা যা যুগপৎ জ্ঞান ও কর্মের

সমুচ্চয়, কারণ প্রতি সুরচিত ও অর্থপূর্ণ কবিতা, চিত্র, প্রতিমা ও গৃহ সৃজনী বিদ্যারই কাজ, চেতনার জীবন্ত আবিষ্কার, সত্যের মূর্তি, মানসিক ও প্রাণিক আত্মপ্রকাশ বা জগৎ-প্রকাশের স্ফুরন্ত রূপ — অর্থাৎ যা সব সন্ধান করে, যা সব সন্ধান পায়, যা কিছু স্বর বা মূর্তির মাধ্যমে নিজেদের প্রকাশ করে সে সমস্তই অনন্তের লীলার কিছুটার উপলব্ধি বিশেষ এবং তাদের সেই পরিমাণে ভগবৎ-উপলব্ধির বা দিব্য রূপায়ণের উপায় করা সম্ভব। কিন্তু যোগীকে দেখতে হবে যেন এ আর অবিদ্যাচ্ছন্ন মানসিক জীবনের অংশ হিসেবে না করা হয়; এটি তার গ্রহণযোগ্য হবে কেবল তখনই যখন এর আন্তর অনুভূতি, স্মৃতি ও নিবেদনের সাহায্যে এটি পরিণত হয় অধ্যাত্ম চেতনার গতিবৃত্তিতে এবং হয়ে ওঠে সেই চেতনার দ্বারা বিধৃত বৃহৎ ও ব্যাপক উদ্ভাসক জ্ঞানের অংশ।

কেননা সকল কিছু করা চাই যজ্ঞ হিসেবে, সকল কাজকর্মেরই উদ্দেশ্য ও নিগূঢ় অর্থ হওয়া চাই অদ্বয় ভগবান। জ্ঞানান্বেষী বিভিন্ন প্রাকৃত বিজ্ঞানে যোগীর লক্ষ্য হওয়া উচিত — মানুষ ও ইতরপ্রাণী ও বিভিন্ন বিষয় ও শক্তির মধ্যে দিব্য চিৎশক্তির কর্মপ্রণালী, তাঁর সৃজনশীল তাৎপর্য, তাঁর বিভিন্ন রহস্যের সমাধান, অভিব্যক্তি বিন্যাসের সব প্রতীক আবিষ্কার ও প্রণিধান করা। মন ও স্থূলপদার্থ বা গূঢ় ও সূক্ষ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যবহারিক বিজ্ঞানে যোগীর লক্ষ্য হওয়া উচিত ভগবানের কর্মপদ্ধতি ও ধারার মধ্যে প্রবেশ করা, আমাদের যে কর্ম দেওয়া হয়েছে তা করার উপাদান ও উপায় জানা যাতে আমরা সেই জ্ঞানকে ব্যবহার করতে পারি চিৎপুরুষের প্রভুত্ব, আনন্দ ও আত্মসার্থকতার সচেতন ও নিখুঁৎ বহিঃপ্রকাশের জন্য। বিভিন্ন কারুকার্যে যোগীর লক্ষ্য যে শুধু সৌন্দর্যবোধ, মন ও প্রাণের তৃপ্তিসাধন তা নয়, তার লক্ষ্য হবে সর্বত্র ভগবানকে দেখা, তাঁর সকল কর্মের তাৎপর্য প্রকাশের সাথে তাঁকে পূজা করা, দেবতা ও মানুষ, প্রাণী ও বস্তু সকলের মধ্যে সেই অদ্বয় ভগবানকে প্রকাশ করা। যে মতবাদ ধর্মের আস্পৃহা এবং যথার্থতম ও মহত্তর শিল্পকলার মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ দেখতে পায় তা মূলতঃ সত্য; কিন্তু ধর্মের মিশ্রিত ও অনিশ্চিত প্রবর্তক শক্তির স্থলে আমাদের আনা চাই অধ্যাত্ম অভীপ্সা, অন্তর্দৃষ্টি ও অর্থবোধক অনুভূতি। কারণ দৃষ্টি যত বেশী বিস্তৃত ও ব্যাপক হবে, যত বেশী তার মধ্যে থাকে মানবজাতি ও সকল বিষয়ের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভগবানের অর্থ, আর বাহ্য ধার্মিকতা ছাড়িয়ে তা যত বেশী ওঠে অধ্যাত্মজীবনের মাঝে, তত বেশী দীপ্ত, নমনীয়, গভীর ও বীর্যবন্ত হবে সেই শিল্পকলা যার উৎস ঐ উন্নত প্রবর্তক শক্তি। অন্য মানুষ থেকে যোগীর পার্থক্য এই যে যোগী বাস করে এক উচ্চতর ও বৃহত্তর অধ্যাত্মচেতনায়; এই হল তার সকল জ্ঞান, কর্ম বা সৃজন কর্মের উৎস; মন থেকে তা করা চলবে না — কারণ যোগীকে যা প্রকাশ করতে হবে তা মনোময় মানুষের সত্য ও অন্তর্দৃষ্টি অপেক্ষা মহত্তর, বরং বলা যায় এই মহত্তর সত্য ও দৃষ্টি চাপ দেয় যোগীর মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে ও তার কর্ম গড়ে তুলতে; আর তার এই কর্ম তার ব্যক্তিগত তৃপ্তির জন্য নয়, দিব্য উদ্দেশ্যের জন্য।

আবার যে যোগী পরাৎপরকে জানে সে যে এইসব কাজ করে কোন প্রয়োজনবশে বা বাধ্যবাধকতায় তা নয়; কারণ তার কাছে এইসব কাজ কর্তব্য বা মনের প্রয়োজনীয়

পেশা বা উঁচু ধরনের আমোদ নয়, বা এ সব যে মহত্তম মানবীয় উদ্দেশ্যের প্রেরণাতে করা হয় তা-ও নয়। কিছুতেই সে আসক্ত, বদ্ধ ও সীমিত হয় না; এইসব কাজে তার ব্যক্তিগত যশ, মহত্ত্ব বা তৃপ্তির কোন প্রশ্নই নেই; তার অন্তঃস্থ ভগবানের ইচ্ছামত সে কাজ ছাড়তেও পারে বা করতেও পারে, তবে ভগবানের ইচ্ছা না হলে পরতর সম্যক্-জ্ঞানের অন্বেষণে তার কর্মত্যাগের প্রয়োজন নেই। পরমাশক্তি যেমনভাবে কাজ করেন, ও সৃষ্টি করেন, যোগীও এইসব কাজ করবে ঠিক সেইভাবে — সৃষ্টি ও প্রকাশের আনন্দের জন্য বা ভগবানের কার্যকলাপের এই জগৎকে ধরে রাখার ও যথাযথ শাসন বা চালনার কাজে সাহায্য করার জন্য। গীতার শিক্ষা এই যে যারা এখনও অধ্যাত্মচেতনা লাভ করেনি তাদের জ্ঞানী নিজের আচরণ দিয়ে শেখাবেন যে সকল কর্মেই প্রীতি ও অভ্যাস আনাই আদর্শ, যেসব কাজ স্বভাবতঃ পুণ্য বা ধর্মের বা তপস্যার বলে স্বীকার করা হয় শুধু তা-ই করা নয়; নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে মানুষকে জগৎ-ক্রিয়া থেকে সরিয়ে আনা তার উচিত নয়। কারণ মহান্ ঊর্ধ্বমুখী অভীপ্সাপথে জগৎকে অগ্রসর হতেই হবে; মানব ও জাতিকে যেন এমনভাবে চালনা না করা হয় যে তারা এমনকি অবিদ্যাচ্ছন্ন কর্মধারা থেকেও বিচ্যুত হয়ে নৈষ্কর্ম্যের ঘোরতর অবিদ্যার মধ্যে পড়ে, অথবা তারা ডুবে যায় শোচনীয় বিয়োজন ও ধ্বংসোন্মুখতার মাঝে যা সম্প্রদায় বা জাতির উপর নেমে আসে তামসিক তত্ত্বের প্রাধান্য হলেই — তা সে তত্ত্ব অজ্ঞানাচ্ছন্ন ও প্রমাদের হ'ক বা অবসাদ ও নিশ্চেষ্টতার হ'ক। গীতায় ভগবান বলেছেন "আমারও কোন কর্তব্য নেই, কারণ এমন কিছু নেই যা আমি পাইনি বা এখনও আমায় পেতে হবে কিন্তু তবু আমিও জগতে কাজ করি, কারণ আমি যদি কাজ না করি তাহলে সকল বিধান বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে, সকল জগৎ যাবে উৎসন্নের পথে আর আমি হব প্রজাদের বিনাশকর্তা"। একথা ঠিক নয় যে আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধতার জন্য পরম অনির্বচনীয় ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে আগ্রহনাশ বা সকল বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা ও জীবনের মূলে কুঠারাঘাত প্রয়োজন। বরং পূর্ণ অধ্যাত্মজ্ঞান ও কর্মের যে পরিণাম বিশেষ সম্ভবপর তা হল — এই সবকে সঙ্কীর্ণতা থেকে ঊর্ধ্বে তুলে সে সবে আমাদের মন যে অবিদ্যাচ্ছন্ন, সীমিত, কবোষ্ণ বা উদ্বেগচঞ্চল সুখ পায় তার স্থলে আনন্দের এমন মুক্ত ও তীব্র প্রেরণার প্রতিষ্ঠা করা যা ঊর্ধ্বে নিয়ে যায় এবং এমন এক সৃজনশীল অধ্যাত্ম সামর্থ্য ও দীপ্তির নতুন উৎস সঞ্চার করা যা ঐ সব বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা ও জীবনকে নিয়ে যেতে পারে জ্ঞানের মধ্যে তাদের পরম আলোকের দিকে, তাদের এখনো অচিন্তিত সম্ভাবনা এবং আধেয় ও রূপ ও ব্যবহারের সব স্ফুরন্ত ক্রিয়া-শক্তির অভিমুখে। যে একটি বিষয় প্রয়োজনীয় তা-ই সাধন করা চাই সর্বপ্রথম ও সর্বসময়; কিন্তু বাকী সবকিছু তার সঙ্গে আসে তার ফলস্বরূপ; আর এ সব যে আসে তা আমাদের বাইরে থেকে নতুন কিছুর আমদানী ততখানি নয় যতখানি আমরা তাদের ফিরে পাই সেই বিষয়ের আত্ম-আলোকে পুনর্গঠিত হয়ে এবং তার আত্মপ্রকাশশীল শক্তির অংশ হিসাবে।

তাহলে দিব্য ও মানুষী জ্ঞানের মধ্যে এই হল সঠিক সম্বন্ধ; তাদের পার্থক্যের মূল কথা এই নয় যে তারা পবিত্র ও অপবিত্র এই দুটি বিসদৃশ ক্ষেত্রে বিভক্ত; তাদের কর্মধারার পশ্চাতে চেতনার রকমই মূল কথা। সেই সবই মানুষী জ্ঞান যাদের উৎপত্তি সাধারণ মানসিক চেতনার থেকে আর এই চেতনার আগ্রহ হবে বিষয় সমূহের বাইরের ও উপরের স্তরে, প্রণালীতে, প্রতিভাস সমূহে এবং তাদের জন্যই বা কোন উপরভাসা উপকারিতার জন্য বা কামনা বা বুদ্ধির কোন মানসিক বা প্রাণিক তৃপ্তির জন্য। কিন্তু জ্ঞানের এই একই বৃত্তি যোগের অঙ্গ হয়ে উঠতে পারে যদি তা আসে আধ্যাত্মিক বা আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন চেতনা থেকে যা সব কিছুর বাইরে হতে দেখে বা ভিতরে প্রবেশ করে সবেতেই সন্ধান পায় কালাতীত সনাতনের উপস্থিতি এবং কালের মধ্যে সনাতনের অভিব্যক্তির বিভিন্ন ধারা। এটা স্পষ্ট যে অবিদ্যার রাজ্য থেকে বার হবার জন্য যে একাগ্রতা অপরিহার্য তা পাবার জন্য সাধকের কর্তব্য হবে তার সকল শক্তি সংহত করে শুধু তাতেই তা কেন্দ্রীভূত করা যা তার সংক্রমণের সহায় হবে এবং যা সব সাক্ষাৎভাবে এই একমাত্র উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল নয় সে সবকে ফেলে রাখা বা গৌণ করা। হয়তো সে দেখবে এ পর্যন্ত সে মনের বাহ্যশক্তি দিয়ে যে সব মানুষী জ্ঞানের ধারার অনুশীলনে অভ্যস্ত ছিল এখনো তার এই বা অন্যধারা এই প্রবৃত্তি বা অভ্যাসের বশে তাকে নিয়ে আসে ভিতরের গভীরতা থেকে বাইরের উপরিভাগে বা যে উচ্চতায় সে উঠেছিল বা যার কাছে যাচ্ছিল তা থেকে নিম্নের ভূমিতে। তখন তার কর্তব্য হবে এসব কাজকর্ম স্থগিত বা সরিয়ে রাখা যতদিন না সে উচ্চতর চেতনায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে এই চেতনার শক্তিকে প্রয়োগ করতে পারে সকল মানসিক ক্ষেত্রে; তখন সেই আলোকের অধীন বা তার অন্তর্ভূত হয়ে এই সব তার চেতনার রূপান্তরের দ্বারা পরিণত হয় অধ্যাত্ম ও দিব্যরাজ্যের অংশে। যে সবকে এই ভাবে রূপান্তরিত করা যাবে না বা যে সব দিব্য চেতনার অংশ হতে অস্বীকার করে সে সবকে সে পরিত্যাগ করবে বিনা দ্বিধায়; এসব শূন্যগর্ভ বা এত অনুপযোগী যে তারা নতুন আন্তর জীবনের অঙ্গ হতে অক্ষম, আগে থাকতে তা ভেবে ও বিচার করে সে যেন তাদের বর্জন না করে। এই সব বিষয়ের জন্য পরীক্ষার কোন নির্দিষ্ট মানসিক নিকষ বা তত্ত্ব নেই; সুতরাং সাধক কোন অপরিবর্তনীয় বিধি অনুসরণ করবে না, তবে সে মনের বৃত্তিকে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করবে তার আন্তরবোধ, অন্তর্দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী যতদিন না মহত্তর শক্তি ও জ্যোতি উপস্থিত হয় নিম্নের সব কিছুকে অভ্রান্তভাবে পরীক্ষা করে দেখতে এবং দিব্য কর্মের জন্য মানবীয় বিবর্তন যা তৈরী করেছে তা থেকে তাদের উপাদান নির্বাচন বা বর্জন করতে।

সঠিক কি ভাবে বা কি কি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে এই উন্নতি ও পরিবর্তন আসবে তা নির্ভর করে ব্যষ্টি প্রকৃতির রূপ, প্রয়োজন ও শক্তির উপর। অধ্যাত্ম রাজ্যে মূল বস্তু সর্বদাই এক কিন্তু তবু বৈচিত্র্যও অনন্ত; অন্ততঃ পূর্ণযোগে কোন বাঁধাধরা নির্দিষ্ট মানসিক বিধির কঠোর প্রয়োগ কদাচিৎ সম্ভব; কারণ এমনকি যখন সবাই এক দিকে চলে তখনো দুইটি বিভিন্ন প্রকৃতির সাধক ঠিক এক রেখায় সমান সমান পা ফেলে, বা উন্নতির সম্পূর্ণ

এক পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয় না। তবু বলা যেতে পারে যে উন্নতির অবস্থার ন্যায়সম্মত অনুক্রম অনেকটা এই ভাবে হবে: প্রথমে এমন এক বৃহৎ পরিবর্তন আসে যাতে ব্যষ্টির প্রকৃতির অন্তর্গত স্বাভাবিক মানসিক বিভিন্ন বৃত্তিকে নেওয়া হয় উচ্চতর দৃষ্টির ভূমিতে বা দেখা হয় সেখান থেকে এবং আমাদের মধ্যকার অন্তঃপুরুষ, চৈত্যপুরুষ, যজ্ঞের পুরোধা সে সবকে নিবেদন করে দিব্য সেবায়; এর পর চেষ্টা হয় সত্তার উদয়ন, এবং এই উর্ধ্বমুখী চেষ্টার ফলে চেতনার যে নতুন উচ্চস্তর লাভ হয় সেখানকার উপযুক্ত আলোক ও শক্তিকে নামিয়ে আনারও চেষ্টা হয় জ্ঞানের সমগ্র ক্রিয়ার মধ্যে। এই সময় আসতে পারে চেতনার অন্তর্মুখী কেন্দ্রীয় পরিবর্তনের উপর তীব্র একাগ্রতা এবং বহির্গামী মানসিক জীবনের বৃহদংশের পরিহার, আর না হয় তাদের নির্বাসন ক্ষুদ্র ও গৌণ স্থানে। একে বা এর কোন কোন অংশকে আবার বিভিন্ন পর্যায়ে মাঝে মাঝে তুলে নেওয়া যেতে পারে এই দেখার জন্য যে এই গতিবৃত্তির মধ্যে নতুন আন্তর চৈত্য ও অধ্যাত্ম চেতনা কতদূর আনা সম্ভব; যে স্বভাব বা প্রকৃতির বশে মানুষ এক বা অপর কাজ করতে বাধ্য হয় আর মনে করে এ হল জীবনের একরূপ অপরিহার্য অংশ, সেই স্বভাব বা প্রকৃতির জোর হ্রাস পাবে, পরিশেষে তার কোন আসক্তি থাকবে না, কোথাও সে অনুভব করবে না কোন অবর বাধ্যবাধকতা বা প্রেরণাশক্তি। একমাত্র ভগবানই তার সাধ্য, শুধু ভগবানই তার সমগ্র সত্তার একমাত্র প্রয়োজন; যদি কর্মের পশ্চাতে কোন প্রেরণা থাকে, সে প্রেরণা অন্তর্নিহিত কামনার নয় বা প্রকৃতির শক্তির নয়, এ হল কোন মহত্তর চিৎ-শক্তির দীপ্ত প্রেরণা যা উত্তরোত্তর হয়ে উঠেছে সমগ্র জীবনের একমাত্র প্রবর্তক শক্তি। অপর পক্ষে এও সম্ভব যে আন্তর অধ্যাত্ম উন্নতির যে কোন পর্বে সাধক অনুভব করবে যে তার কাজকর্মের পরিধি সঙ্কুচিত না হয়ে বরং প্রসারিত হয়েছে; যোগশক্তির অলৌকিক স্পর্শে মানসিক সৃজনের নব নব সামর্থ্য, জ্ঞানের নব নব ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়েছে। সৌন্দর্যবোধ, এক বা একসঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে কলাসৃষ্টির ক্ষমতা, সাহিত্যসৃষ্টির কুশলতা বা প্রতিভা, দার্শনিক চিন্তাশক্তি, চক্ষু, কর্ণ, হস্ত বা মনের শক্তি এই সব যা কখনও দেখা যেত না তা ফুটে ওঠে। যে কাজকর্ম বা সৃষ্টির জন্য করণিক প্রকৃতি অভিপ্রেত প্রণালী বা রচয়িতা তার জন্য এই প্রকৃতিকে সুসজ্জিত করার উদ্দেশ্যে অন্তঃস্থ ভগবান এই সব গূঢ় ঐশ্বর্যকে বাইরে প্রকাশ করতে পারেন সত্তার গভীরতা থেকে যেখানে তারা প্রচ্ছন্ন ছিল অথবা উর্ধ্ব থেকে কোন শক্তি বর্ষণ করতে পারে তার বীর্য ধারা। কিন্তু যোগের প্রচ্ছন্ন অধীশ্বরের নির্বাচিত পদ্ধতি বা উন্নতির ধারা যাই হ'ক না কেন, এই অবস্থার সাধারণ পরিণতি হল, উর্ধ্বস্থিত চেতনার ক্রমবৃদ্ধি এবং এই বোধ যে এ-ই মনের সকল গতিবৃত্তির ও জ্ঞানের সকল কর্মের প্রবর্তক, নির্ধারক ও রূপকার।

অবিদ্যার ধারা থেকে মুক্ত চেতনার ধারায় সাধকের জ্ঞানের মন ও জ্ঞানের কর্মের যে রূপান্তর সাধন হয় পরম চিৎপুরুষের আলোকে প্রথমে আংশিকভাবে ও পরে সম্পূর্ণভাবে তার দুইটি লক্ষণ পাওয়া যায়। প্রথমে আসে চেতনার কেন্দ্রীয় পরিবর্তন

এবং পরাৎপর ও বিশ্বসত্তার, স্বরূপস্থ ভগবান ও সর্বভূতস্থ ভগবানের উপচীয়মান সাক্ষাৎ অনুভূতি, দর্শন ও বেদনা; মন প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ এতেই ক্রমশঃ আরো বেশী অভিনিবিষ্ট হবে এবং অনুভব করবে যে সে উপচিত ও প্রসারিত হয়ে উত্তরোত্তর হয়ে উঠছে এই একমাত্র মৌলিক জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশের দীপ্ত সাধন। আবার কেন্দ্রীয় চেতনাও তার দিক থেকে ক্রমশঃ বেশী করে জ্ঞানের বাহ্য মানসিক ক্রিয়াধারাগুলিকে নিয়ে তাদের পরিণত করবে নিজের অংশে বা অধিকৃত রাজ্যে; এবং এটি তাদের মধ্যে নিজের আরো সঠিক গতিবৃত্তি সঞ্চারিত করে বর্ধিষ্ণু আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন ও দীপ্ত মনকে তার সাধন করবে যেমন নিজের গভীরতর অধ্যাত্মসাম্রাজ্যে, তেমন এইসব নতুন জয়-করা বাইরের ক্ষেত্রেও। আর দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে, — আর এটি কিছু পরিমাণে সম্পূর্ণতা ও সিদ্ধিরও লক্ষণ বটে — ভগবান নিজেই জ্ঞাতা হয়েছেন এবং সকল আন্তর গতিবৃত্তি, এমনকি যেগুলি একসময় শুধু মানুষী মানসিক ক্রিয়ার অন্তর্গত ছিল সেগুলিও তাঁর জ্ঞানের ক্ষেত্র হয়েছে। ক্রমশঃ ব্যক্তিগত নির্বাচন, মতামত, পছন্দ হ্রাস পাবে, আর হ্রাস পাবে বুদ্ধির কাজ, মানসিক বয়ন ও ক্রীতদাসের মত মস্তিষ্কের কঠোর পরিশ্রম; অন্তরের এক আলোক যা সব দেখবার তা দেখবে, যা সব জানবার তা জানবে, প্রকাশ করবে, সৃষ্টি করবে, সংহত করবে। ব্যষ্টির মুক্ত ও বিশ্বভাবাপন্ন মনে আন্তর জ্ঞাতাই করবেন সর্বগ্রাহী জ্ঞানের সকল কর্ম।

এই দুই পরিবর্তন থেকে বোঝা যায় যে সাধনার এক প্রাথমিক ফল লাভ হয়েছে যাতে মানসিক প্রকৃতির সব ক্রিয়াধারাকে উর্ধ্বে তুলে আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন, ব্যাপ্ত, বিশ্বভাবাপন্ন ও মুক্ত করা হয় আর নিয়ে যাওয়া হয় এই চেতনায় যে তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল কালগত বিশ্বের মধ্যে ভাগবৎ-অভিব্যক্তির সৃজন ও বিকাশের কাজে তারা ভগবানের উপায় মাত্র। কিন্তু এটিই রূপান্তরের সমগ্র ক্ষেত্র হতে পারে না, কারণ এই সীমার মধ্যে যে পূর্ণযোগের সাধক তার উৎক্রান্তি থেকে বিরত হবে বা তার প্রকৃতির প্রসরণ আবদ্ধ রাখবে তা নয়। কেননা তাহলে জ্ঞান তখনও থেকে যাবে মনের এক কর্মপ্রণালী, অবশ্য এই মন মুক্ত, বিশ্বভাবাপন্ন, আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন, তবু তা তার মূল স্ফুরত্তাতে, যেমন সব মন হতে বাধ্য, অপেক্ষাকৃত সীমিত, আপেক্ষিক ও অপূর্ণ; এটি পরম সত্যের বৃহৎ সব রচনাকে উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত করবে কিন্তু যে রাজ্যে পরম সত্য সিদ্ধ, অপরোক্ষ, অপ্রতিহত ও স্বপ্রতিষ্ঠিত সেখানে সে বিচরণ করে না। এই উচ্চতা থেকে আরো এমন উৎক্রান্তি চাই যাতে আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন মন নিজেকে ছাপিয়ে রূপান্তরিত হবে জ্ঞানের অতিমানসিক সামর্থ্যে। আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন হবার ধারায় মন ইতিপূর্বেই মানুষী বুদ্ধির উজ্জ্বল দৈন্য ছাড়িয়ে উঠতে শুরু করেছে; ক্রমে সে আরো উর্ধ্বে উঠবে এক উত্তর মানসের বিশুদ্ধ বিস্তৃত ভূমিতে এবং তারপর যাবে উর্ধ্ব থেকে আসা আলোকে দীপ্ত আরো বেশী মুক্ত বুদ্ধির ভাস্বর প্রদেশে। এইখানে মন আরো মুক্তভাবে অনুভব করবে আর গ্রহণ করবে এক বোধির উজ্জ্বল সূচনা আর মনের মিশ্র প্রতিক্রিয়াও কম হবে; এই বোধি অন্য কিছুর দ্বারা দীপ্ত নয়, এ স্বয়ং-দীপ্ত, নিজেই সত্য;

তাছাড়া তখন এটি আর পুরোপুরি মানসিক নয় আর সেজন্য এতে অজস্র প্রমাদের আক্রমণও সম্ভব নয়। কিন্তু এও শেষ নয়, এ ছাড়িয়ে মনকে উঠতে হবে সেই অবিভক্ত বোধির স্বধামে, যে বোধি স্বরূপসত্তার আত্মসংবিৎ থেকে আসা প্রথম সরাসরি আলোক; আর একেও ছাড়িয়ে মনকে উঠতে হবে আলোকের উৎসে। কেননা বিশ্বমনের পশ্চাতে আছে অধিমানস; এটি আরো আদি ও স্ফুরন্ত এক শক্তি যা বিশ্বমনকে ধারণ করে, একে দেখে নিজেরই স্তিমিত কিরণচ্ছটা বলে, ব্যবহার করে নীচে আসার অববাহিকা হিসাবে বা অবিদ্যার সব সৃষ্টির যন্ত্র হিসেবে। উৎক্রান্তির শেষ পদক্ষেপ হবে অধিমানসকেও অতিক্রম করা অথবা নিজের আরো মহত্তর উৎসে ফিরে যাওয়া, দিব্য বিজ্ঞানের অতিমানসিক আলোকে রূপান্তরিত হওয়া। কারণ এই অতিমানসিক আলোকের মধ্যেই আছে দিব্য ঋতচেতনার আসন, আর এই ঋতচেতনারই সেই সহজ শক্তি আছে — তার নিম্নের অন্য কোন চেতনার নেই — যাতে সে এমন এক সত্যের কর্মধারা সংহত করতে সক্ষম যা বিশ্বব্যাপী অচিতি ও অবিদ্যার ছায়াসম্পাতে আর মলিন হয় না। সেখানে উপনীত হওয়া এবং সেখান থেকে এমন এক অতিমানসিক স্ফুরত্তাকে নামিয়ে আনা যা অবিদ্যাকে রূপান্তর করতে সক্ষম, — এই হল পূর্ণযোগের দূরবর্তী কিন্তু অবশ্যসাধ্য পরম লক্ষ্য।

এই সমস্ত পরতর শক্তির প্রত্যেকের আলো যেমন যেমন ফেলা হয় জ্ঞানের মানুষী ক্রিয়াধারার উপর, তেমন তেমন পবিত্র ও অপবিত্র, মানুষী ও দিব্য এই পার্থক্য ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে থাকে ও শেষ পর্যন্ত তা লোপ পায় নিরর্থক বলে; কারণ দিব্য বিজ্ঞান যা কিছু স্পর্শ করে ও তাতে পুরোপুরি আবিষ্ট হয় তা-ই অবর বুদ্ধির পঙ্কিলতা ও সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে রূপান্তরিত ও পরিণত হয় বিজ্ঞানের স্বীয় আলোক ও শক্তির গতিবৃত্তিতে। কতকগুলি ক্রিয়াধারাকে বিচ্ছিন্ন করা নয়, বরং সে সবকেই রূপান্তরিত করা অন্তর্গূঢ় চেতনার দ্বারা — এই হল মুক্তির পথ, এই হল জ্ঞানযজ্ঞের উদয়ন মহত্তর থেকে সদা মহত্তর আলো ও শক্তিতে। মন ও বুদ্ধির সকল কার্যকে প্রথমে উন্নত ও ব্যাপ্ত করা চাই, পরে তাদের দীপ্ত ও উন্নীত করতে হবে এক উত্তর বুদ্ধির রাজ্যে, এর পর তাদের পরিবর্তিত করতে হবে মহত্তর অমানসিক বোধির কর্মপ্রণালীতে, আবার তাদের রূপান্তরিত করতে হবে অধিমানসদীপ্তির স্ফুরন্ত বহির্বর্ষণধারায় এবং এইসবের রূপান্তর চাই অতিমানসিক বিজ্ঞানের পূর্ণ আলোক ও আধিপত্যে। এ সবই রয়েছে পূর্বকল্পিত তবে সুপ্তভাবে জগতে চেতনার ক্রমবিকাশের মাঝে তার বীজে ও তার বিকাশধারার কষ্টকর তীব্র অভিপ্রায়ে; এবং যতদিন না পরম চিৎপুরুষের বর্তমান অপূর্ণ অভিব্যক্তির স্থলে পূর্ণ অভিব্যক্তির উপযোগী করণসমূহ বিকশিত করা হয়, ততদিন এই ধারার, এই ক্রমবিকাশের সমাপ্তি সম্ভব নয়।

যদি জ্ঞান চেতনার সবচেয়ে ব্যাপ্ত শক্তি হয় আর তার কাজ হয় মুক্ত ও দীপ্ত করা তাহলে প্রেম হল চেতনার সবচেয়ে গভীর ও তীব্র শক্তি আর এর বিশেষ অধিকার এই যে এই হল দিব্যরহস্যের গভীরতম ও গূঢ়তম গহনে প্রবেশের চাবিকাঠি। মানুষ মনোময় পুরুষ বলে সে যাকে সবচেয়ে বড় স্থান দিতে চায় তা হল — চিন্তাশীল মন আর মনের যুক্তিবুদ্ধি ও সঙ্কল্প এবং সত্যের দিকে যাত্রা ও সত্যপ্রাপ্তি সম্বন্ধে তার পদ্ধতি; এমনকি সে বলতে চায় যে অন্য কোন পদ্ধতিই নেই। বুদ্ধির দৃষ্টিতে হৃদয় ও তার বিভিন্ন ভাবাবেগ ও অনির্দিষ্ট গতিবৃত্তি এমন এক অন্ধকারাচ্ছন্ন অনিশ্চিত শক্তি যা প্রায়ই বিপদে ফেলে ও বিপথে নিয়ে যায় আর একে সংযত রাখা দরকার যুক্তি এবং মানসিক সঙ্কল্প ও বুদ্ধির দ্বারা। তবু হৃদয়ের মধ্যে অথবা তার পশ্চাতে এমন এক গভীরতর রহস্যময় আলোক আছে, যা আমরা যাকে বোধি বলি তা না হলেও — কারণ বোধি মনের অন্তর্গত না হলেও মনের মধ্য দিয়েই নেমে আসে — যে আলো সরাসরি সত্যের স্পর্শ পায় আর জ্ঞানগর্বিত মানুষী বুদ্ধি অপেক্ষা ভগবানের অধিকতর নিকটবর্তী। প্রাচীন শিক্ষা অনুসারে, বিশ্বগত ভগবানের, প্রচ্ছন্ন পুরুষের আসন রহস্যময় হৃদয়ে, গূঢ় হৃদয়গুহাতে, উপনিষদের ভাষায় "হৃদয়ে গুহায়াম্", আর অনেক যোগীর অনুভূতি এই যে হৃদয়ের গহন থেকেই আসে আন্তর দিশারীর স্বর বা নিঃশ্বাস।

এই দ্ব্যর্থবোধ, গভীরতা ও অন্ধতার এই দুই বিপরীত রূপ — এদের উৎপত্তির কারণ মানুষের ভাবাবেগজনক সত্তার দ্বিবিধ স্বভাব। কেননা মানুষের মধ্যে সামনে আছে এক প্রাণিক ভাবাবেগের হৃদয় যা পশু হৃদয়ের সদৃশ, অবশ্য তা নানাভাবে পুষ্ট হতে পারে; এর সব ভাবাবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে অহমাত্মক মনোবেগ, অন্ধ সহজাত অনুরাগ এবং এমন সব প্রাণ সংবেগের সকল ক্রীড়া যাসব প্রায়শঃই ঘৃণ্য অপকর্ষে পূর্ণ — এটি এমন হৃদয় যাকে চারিদিকে ঘিরে ও দখল করে আছে তামস ও পতিত প্রাণশক্তির কাম, বাসনা, ক্রোধ, তীব্র বা প্রচণ্ড দাবী বা ছোট ছোট লুব্ধতা ও হীন তুচ্ছতা আর এসব কলুষিত হয়ে পড়েছে সবরকম সংবেগেরই দাসত্ব ক'রে। ভাবাবেগজনক হৃদয় ও ইন্দ্রিয়পর বুভুক্ষু প্রাণ — উভয়ে মিলে মানুষের মাঝে সৃষ্টি করে কামনার এক মেকী অন্তঃপুরুষ; এই হল সেই অমার্জিত ও বিপজ্জনক উপাদান যাকে যুক্তি ন্যায়সঙ্গতভাবেই অবিশ্বাস করে ও দমন করা প্রয়োজন বলে অনুভব করে, যদিও আমাদের অশুদ্ধ ও দুরাগ্রহী প্রাণ প্রকৃতির উপর এর বাস্তব শাসন বা বরং দমন সর্বদা খুবই অনিশ্চিত ও ভ্রান্তিজনক। কিন্তু মানুষের আসল অন্তঃপুরুষের বাস সেখানে নয়, এর বাস সেই সত্যকার অদৃশ্য হৃদয়ে যা লুকোনো থাকে প্রকৃতির এক জ্যোতির্ময় গুহায়: সেখানে যে দিব্য আলোক অনুপ্রবেশ করে তারই তলায় থাকে আমাদের অন্তঃপুরুষ, নীরব অন্তরতম সত্তা; এর কথা একরকম কেউই জানে না, কেননা যদিও সকলেরই অন্তঃপুরুষ আছে, তবু সত্যকার অন্তঃপুরুষ সম্বন্ধে সচেতন বা তার প্রত্যক্ষ সংবেগ অনুভব করে এমন মানুষ খুবই কম। সেখানেই অধিষ্ঠিত ভগবানের ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ যা আমাদের প্রকৃতির এই তমসাচ্ছন্ন স্তূপ ধারণ করে এবং এরই চারিদিকে উপচিত হয় চৈত্যপুরুষ, গঠিত

অন্তঃপুরুষ বা আমাদের অন্তঃস্থ আসল মানুষ। মানুষের এই অন্তঃস্থ চৈত্যপুরুষ যতই বৃদ্ধি পায়, যতই হৃদয়ের গতিবৃত্তি এর সব দিব্য প্রেরণা ও প্রচোদনাকে প্রতিফলিত করে ততই মানুষ উত্তরোত্তর অবগত হয় তার অন্তঃপুরুষের কথা, তখন আর সে উন্নত পশু নয়, তার অন্তঃস্থ দেবতার ক্ষণিক আভাসে জাগ্রত হয়ে ক্রমশঃ সে আরো বেশী মাত্রায় গ্রহণ করে গভীরতর জীবন ও চেতনার সংবাদ এবং দিব্য বিষয়সমূহের প্রতি সংবেগ। পূর্ণযোগের এটি এক সন্ধিক্ষণ যখন এই চৈত্যপুরুষকে মুক্ত ক'রে আবরণের পশ্চাত থেকে সম্মুখে আনা হয় আর সে ঢালতে পারে অজস্র ধারায় তার দিব্য প্রেরণা, দৃষ্টি ও প্রচোদনা মানুষের মন, প্রাণ ও দেহের উপর এবং শুরু করতে সমর্থ হয় পার্থিব প্রকৃতিতে দিব্যত্ব গঠনের প্রস্তুতি।

জ্ঞানের কর্মের মতো হৃদয়ের সব কর্মপ্রণালী সম্বন্ধেও আমরা দুইপ্রকার গতিবৃত্তির মধ্যে এক প্রাথমিক পার্থক্য করতে বাধ্য হই — প্রথমতঃ যেগুলি আমাদের সত্যকার অন্তঃপুরুষ দ্বারা প্রবর্তিত বা প্রকৃতিতে তার মুক্তি ও শাসনের সহায়কর; এবং দ্বিতীয়তঃ যেগুলি আমাদের অসংস্কৃত প্রাণিক প্রকৃতির তৃপ্তি অভিলাষী। কিন্তু এই অর্থে সাধারণতঃ যে সব পার্থক্য করা হয় সে সব যোগের গভীর বা আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যের পক্ষে কোন কাজে লাগে না। একদিকে ধর্মীয় ভাবাবেগ ও অন্যদিকে সাংসারিক বেদনা (feeling) — এইভাবে একপ্রকার ভাগ করা যেতে পারে; আর অধ্যাত্মজীবনের এক অনুশাসন হিসেবে এই নির্দেশ দেওয়া যায় যে শুধু ধর্মীয় ভাবাবেগেরই অনুশীলন কর্তব্য আর অন্য দিকে সকল জাগতিক বেদনা ও আবেগের বর্জন, এবং আমাদের জীবন থেকে তাদের তিরোধান অপরিহার্য। কার্যতঃ এর অর্থ এই যে সাধু বা ভক্তের ধর্মজীবন নিবদ্ধ থাকবে শুধু ভগবানেই, বা অপরের সঙ্গে যুক্ত হবে শুধু সাধারণ ভগবৎ-প্রেমে বা বড়জোর বাইরের জগতের উপর তা বর্ষণ করবে পবিত্র, ধর্মীয় বা ধর্মানুরাগীর প্রেমধারা। কিন্তু ধর্মীয় ভাবাবেগ নিজেই সর্বদা আক্রান্ত হয় প্রাণিক গতিবৃত্তির বিক্ষোভ ও তামসিকতার দ্বারা, আর প্রায়শঃই এটি অশুদ্ধ, বা সঙ্কীর্ণ বা ধর্মোন্মত্ত বা এমন সব গতিবৃত্তির সঙ্গে মিশ্রিত যা চিৎপুরুষের সিদ্ধির লক্ষণ নয়। তাছাড়া একথা সুস্পষ্ট যে ধর্মানুষ্ঠানের কঠোর শৃঙ্খলে আবদ্ধ তীব্র মূর্তিমান সাধুত্বের চরমোৎকর্ষও পূর্ণযোগের বিশাল আদর্শ অপেক্ষা ভিন্ন। পূর্ণযোগের জন্য যা অবশ্য প্রয়োজনীয় তা হল ভগবান ও জগতের সঙ্গে এমন এক বৃহত্তর চৈত্য ও ভাগবত সম্পর্ক যা স্বরূপতঃ আরো বেশী গভীর ও সুনম্য, গতিবৃত্তিতে আরো ব্যাপ্ত ও গ্রহিষ্ণু এবং সমগ্র জীবনকে নিজের ছত্রতলে নিতে আরো বেশী সমর্থ।

এই ধর্মীয় অনুশাসনের চেয়ে আরো ব্যাপক সূত্র মানুষের ঐহিক মন দিয়েছে; এর ভিত্তি নীতিবোধ; কেননা এটি যে পার্থক্য করে তার একদিকে আছে নীতিবোধের দ্বারা অনুমোদিত বিভিন্ন ভাবাবেগ ও অন্যদিকে সেইসব ভাবাবেগ যেগুলি অহমাত্মক ও স্বার্থপরতাদুষ্ট, সাধারণ ও পার্থিব। আমাদের আদর্শ হবে পরার্থপরতা, বিশ্বপ্রীতি, করুণা, বদান্যতা, মানবহিতাকাঙ্ক্ষা, সেবা এবং মানুষ ও সকল প্রাণীর মঙ্গলের জন্য কর্মসাধন;

এই মতবাদে আন্তর বিকাশের পথ হল অহমিকার নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে আত্মত্যাগের এমন এক পুরুষ হয়ে ওঠা যার জীবন কেবলমাত্র বা প্রধানতঃ "পরহিতায়" বা "জগদ্ধিতায়"। অথবা যদি মনে হয় এ আদর্শ বড় বেশী ঐহিক ও মানসিক আর তাতে আমাদের সমগ্র সত্তার তৃপ্তি হয় না — আর না হওয়ার কারণ এই যে আমাদের মধ্যে যে গভীরতর ধর্মীয় ও অধ্যাত্ম সুর আছে তা এই মানবসেবার সূত্রে গণ্য করা হয় না — তাহলে এই মতের ভিত্তি করা যেতে পারে ধর্মমূলক নীতিবোধ; আর বস্তুতঃ নীতিবোধের আদি ভিত্তি এইরকমই ছিল। হৃদয়ের ভক্তির দ্বারা ভগবানের বা পরতমের আন্তর আরাধনার সাথে বা সর্বোত্তম জ্ঞানের পথে অনির্বচনীয় তত্ত্বের সাধনার সাথে যোগ করা যেতে পারে পরোপকার সাধনের মাধ্যমে আরাধনা অথবা মানবজাতি বা প্রতিবেশীর উদ্দেশ্যে প্রেম, বদান্যতা ও সেবার কর্মের মাধ্যমে প্রস্তুতি। বস্তুতঃ বৈদান্তিক, বৌদ্ধ, খৃষ্টীয় আদর্শে যে বিশ্বমৈত্রী বা বিশ্বকরুণা বা প্রতিবেশীর প্রতি প্রেম ও সেবার বিধান আছে তার সৃষ্টি হয়েছিল এই ধর্মমূলক নীতিবোধ থেকেই; শুধু এর ধর্মীয় উপাদানের উত্তাপকে একরকম ঐহিক হিমস্পর্শে শীতল করে মানবসেবার আদর্শ নিজেকে ধর্মভাব থেকে মুক্ত করে মানসিক ও নৈতিক সদাচারের ঐহিক বিধানের শীর্ষস্থানীয় হতে পেরেছে। কারণ ধর্মের ক্ষেত্রে কর্মের এই বিধান এক উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে তার আর প্রয়োজন থাকে না; অথবা এ হল এক গৌণ বিষয়; যে ধর্মানুষ্ঠানে ভগবানকে পূজা ও অন্বেষণ করা হয় এটি তার অংশ বা নির্বাণের পথে আত্ম-বিলোপ সাধনের পূর্ববর্তী পদক্ষেপ। ঐহিক আদর্শে মানবসেবাকেই উদ্দেশ্য করে তোলা হয়েছে; এই হল মানুষের নৈতিক চরমোৎকর্ষের নিদর্শন, আর না হয়, এ হল এক সর্ত বিশেষ যার জন্য জগতে মানুষের আরো সুখী হওয়া, আরো উন্নত সমাজব্যবস্থা, জাতির আরো একতাবদ্ধ জীবন সম্ভব। কিন্তু পূর্ণযোগে অন্তঃপুরুষের যে দাবী আমাদের সামনে রাখা হয়, তা এইসবের কোনটাতেই মেটে না।

পরার্থপরতা, বিশ্বপ্রীতি, মানবহিতৈষণা, সেবা — এইসব মানসিক চেতনার কুসুম, এবং বড়জোর এরা বিশ্বজনীন দিব্য প্রেমের অধ্যাত্ম শিখার মনোসৃষ্ট শীতল ও ম্লান অনুকরণ। অহংবোধ থেকে তারা যথার্থতঃ মুক্তি দেয় না, যতদূর সম্ভব এর পরিধি বিস্তার ক'রে তারা এর উচ্চতর ও বৃহত্তর পরিতৃপ্তি সাধন করে; মানুষের প্রাণিক জীবন ও প্রকৃতির পরিবর্তন সাধন করার ক্ষমতা তাদের নেই, তারা শুধু এর ক্রিয়াকে কিছু সংযত ও শান্ত রাখে, এর অপরিবর্তিত অহমাত্মক স্বরূপের উপর রঙের প্রলেপ দেয়। আর যদিই বা আমরা সম্পূর্ণ সাধু সঙ্কল্প সমেত ঐকান্তিকভাবে ঐ আদর্শ পালন করি তা করা হবে আমাদের প্রকৃতির একদিকের অতিমাত্রায় বর্ধিত সম্প্রসারণের দ্বারা; কিন্তু ঐ অতিবৃদ্ধির মধ্যে বিশ্বাত্মক ও বিশ্বাতীত সনাতনের অভিমুখে আমাদের ব্যষ্টিভাবাপন্ন সত্তার বিভিন্নদিকের পূর্ণ ও সিদ্ধ দিব্যবিকাশের কোন সূত্র থাকা অসম্ভব। তাছাড়া এই ধর্মনৈতিক আদর্শ উপযুক্ত পথপ্রদর্শক হতে পারে না কারণ এটি ধর্মীয় প্রেরণা ও নৈতিক প্রেরণা এই দুয়ের মধ্যে তাদের পরস্পরের সহায়তার জন্য পরস্পরকে কিছু

সুবিধাদানের আপোষ বা সন্ধি; ধর্মীয় প্রেরণা চায় সাধারণ মানব প্রকৃতির উচ্চতর প্রবৃত্তিগুলিকে নিজের মধ্যে নিয়ে পৃথিবীর উপর আরো ঘনিষ্ঠভাবে প্রভাব বিস্তার করতে, আর নৈতিক প্রেরণা আশা করে ধর্মীয় উত্তাপের কিছু স্পর্শে নিজের মানসিক কাঠিন্য ও শুষ্কতা থেকে নিজেকে উর্ধ্বে তুলতে। এই সন্ধি করায় ধর্ম নিজেকে নামিয়ে আনে মানসিক স্তরে আর গ্রহণ করে মনের স্বগত সব অপূর্ণতা ও জীবনের পরিবর্তন ও রূপান্তরসাধনে এর অক্ষমতা। মন দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র, কোন অনপেক্ষ পরম সত্য পাওয়া তার সাধ্যাতীত, সে পেতে পারে শুধু আপেক্ষিক বা প্রমাদমিশ্রিত সত্য; ঠিক তেমনই কোন অনপেক্ষ শুভ পাওয়াও তার সাধ্যাতীত; কারণ নৈতিক শুভের অস্তিত্ব অশুভের প্রতিরূপ ও সংশোধক হিসেবে; অশুভ শুভের নিত্যসহচর, তার ছায়া, পরিপূরক, প্রায় তার অস্তিত্বের হেতু। কিন্তু অধ্যাত্ম চেতনার স্থান মনোভূমি অপেক্ষা এক পরতর ভূমিতে, সেখানে সব দ্বন্দ্ব অন্তর্হিত হয়; কারণ যে অনৃত এতদিন সত্যকে অন্যায়ভাবে অধিকার করে তাকে মিথ্যা করে লাভবান হত তার সামনে সত্য এসে দাঁড়ায় তার বিপক্ষ রূপে, আর অশুভের সম্মুখে আসে শুভ যার বিকৃতি বা ভয়ঙ্কর অনুকল্প এটি; সেজন্য এরা পুষ্টির অভাবে ধ্বংস হয়, আর এইভাবে তাদের সমাপ্তি ঘটে। মানসিক ও নৈতিক আদর্শের ভঙ্গুর উপাদানের উপর নির্ভর করতে অস্বীকার ক'রে পূর্ণযোগ, এক্ষেত্রে তার সমগ্র জোর দেয় তিনটি কেন্দ্রীয় স্ফুরন্ত সাধনধারার উপর — কামনার মিথ্যা অন্তঃপুরুষের স্থলে সত্যকার অন্তঃপুরুষ বা চৈত্যপুরুষকে অধিষ্ঠিত করার জন্য তার উপচয়সাধন, মানুষী প্রেমের উর্ধ্বায়ন দিব্যপ্রেমে, চেতনার উন্নয়ন তার মানসিক ভূমি থেকে তার অধ্যাত্ম ও অতিমানসিক ভূমিতে একমাত্র যার সামর্থ্যের দ্বারাই অবিদ্যার আবরণ ও অপলাপ থেকে অন্তঃপুরুষ ও প্রাণশক্তি, উভয়েরই পূর্ণ মুক্তি সম্ভব।

সূর্যমুখী ফুল যেমন ফেরে সূর্যের দিকে, অন্তঃপুরুষ বা চৈত্যপুরুষের স্বভাব হল তেমন ফিরে থাকা দিব্য সত্যের দিকে; যা সব দিব্য বা দিব্যত্বের দিকে এগিয়ে চলে সে সবকে সে গ্রহণ করে ও আঁকড়ে থাকে। আর যা সব তার বিকৃতি বা অস্বীকৃতি, যা সব মিথ্যা ও অদিব্য সে সব থেকে সে সরে আসে। কিন্তু তবু অন্তঃপুরুষ প্রথমে একটি স্ফুলিঙ্গমাত্র, আর তার পর এটি হয় ঘোর অন্ধকারের মাঝে দেবতার এক ক্ষুদ্র জ্বলন্ত শিখা; বেশীরভাগই সে ঢাকা থাকে তার আন্তর নিভৃত কক্ষে, আত্মপ্রকাশ করতে হলে তাকে ডাকতে হয় মন, প্রাণশক্তি ও শারীর চেতনাকে আর তাদের সাধ্য মতো তাকে প্রকাশ করার জন্য তাদের রাজী করাতে হয়; সে বড়জোর পারে তাদের বহির্মুখিতাকে তার আন্তর আলোকে উপর উপর আলোকিত করতে ও তার পাবনী সূক্ষ্মতার দ্বারা তাদের তামস আবিলতা বা অপেক্ষাকৃত স্থূল মিশ্রণকে কিছু বদলাতে। এমনকি যখন চৈত্যপুরুষ গঠিত হয় আর কিছুটা সাক্ষাৎভাবে জীবনের মাঝে নিজেকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয় তখনও এ অল্প কয়েকজন ছাড়া অন্য সকলের মাঝে সত্তার অতি ক্ষুদ্র অংশ — প্রাচীন ঋষিরা যার সম্বন্ধে "শরীরের মাঝে অঙ্গুষ্ঠমাত্র" পুরুষের এই রূপক ব্যবহার করেছেন — আর শারীর চেতনার তামসিকতা ও ক্ষুদ্রতাকে, মনের ভ্রান্ত নিশ্চয়তাকে,

প্রাণিক প্রকৃতির দম্ভ ও প্রচণ্ডতাকে যে সে সর্বদা জয় করতে সমর্থ হয় তা নয়। এই অন্তঃপুরুষকে বাধ্য হয়ে স্বীকার করতে হয় মানুষের বর্তমান মানসিক, ভাবাবেগজনক ও ইন্দ্রিয়ানুভূতিপূর্ণ জীবনকে, তার বিভিন্ন সম্বন্ধ ও কাজকর্মকে ও তার সব প্রিয় রূপ ও মূর্তিকে; অবিরাম ভ্রান্তিজনক প্রমাদমিশ্রিত এইসব আপেক্ষিক সত্য, পাশবদেহের সেবায় বা প্রাণিক অহং-এর তৃপ্তিসাধনে ব্যাপৃত এই প্রেম, এই যে সাধারণ মানুষের জীবন যাতে পরম দেবতার আভাস খুবই কম ও ক্ষীণ কিন্তু যা দানব ও পশুর বিভিন্ন তমসাচ্ছন্ন ভয়াল প্রবৃত্তিতে সমাকীর্ণ — এই সকলের মধ্যে যে দিব্য উপাদান আছে তাকে পৃথক ও পুষ্ট করার জন্য তাকে চেষ্টা করতে হয়। নিজের মূল সঙ্কল্প সম্বন্ধে সে অভ্রান্ত, কিন্তু তবু নিজের বিভিন্ন করণের চাপে সে প্রায়ই বাধ্য হয়ে মেনে নেয় ক্রিয়ার ভুল, বেদনার ভ্রান্ত প্রয়োগ, লোক নির্বাচনে ভ্রম, তার সঙ্কল্পের সঠিক রূপ ও অমোঘ আন্তর আদর্শের বহিঃপ্রকাশের প্রমাদ। কিন্তু তবু তার মধ্যে এমন এক অন্তর্দৃষ্টি আছে যার জন্য তা যুক্তিশক্তি বা এমনকি শ্রেষ্ঠ কামনা অপেক্ষাও আরো নিশ্চিত দিশারী এবং নিয়মনিষ্ঠ বুদ্ধি ও বিচারশীল মানসিক সিদ্ধান্ত অপেক্ষা তার নির্দেশের চালনাই আরো শ্রেয়স্কর যদিও তা হয় অনেক আপাত প্রমাদ ও স্খলনের মধ্য দিয়ে। আমরা যাকে বিবেক বলি, অন্তঃপুরুষের এই বাণী তা নয়, — কারণ এই বিবেক শুধু এক মানসিক ও প্রায়শঃই আচারমূলক প্রমাদশীল অনুকল্প; অন্তঃপুরুষের আহ্বান আরো গভীর ও কদাচিৎ শোনা যায়; তবু শুনতে পেলে তার নির্দেশমত চলাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ: এমনকি যুক্তিবুদ্ধি ও বাহ্য নৈতিক উপদেষ্টার সঙ্গে আপাত সরল পথে যাওয়ার চেয়ে নিজের অন্তঃপুরুষের আহ্বানে ঘুরে বেড়ানও শ্রেয়স্কর। কিন্তু যখন জীবন ভগবানের দিকে ফেরে, কেবল তখনই অন্তঃপুরুষ নিশ্চিতভাবে সামনে এসে বিভিন্ন বাহ্য অঙ্গের উপর নিজের শক্তি আরোপ করতে সমর্থ হয়; কেননা এটি নিজেই ভগবানের স্ফুলিঙ্গ হওয়ায়, ভগবানের দিকে শিখা হয়ে বৃদ্ধি পাওয়াই এর সত্যকার জীবন ও এর অস্তিত্বের একমাত্র কারণ।

যোগের এক পর্যায়ে যখন মনকে যথেষ্ট পরিমাণে শান্ত করা হয়েছে আর তা প্রতি পদে নিজের মানসিক সিদ্ধান্তের দৃঢ়তার উপর নির্ভর করে না, যখন প্রাণকে স্থির ও দমন করা হয়েছে ও আর সে নিজের অবিবেচক সঙ্কল্প, দাবী ও কামনাপূরণে সর্বদা জেদ করে না, যখন শরীর যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়েছে যাতে তার বহির্মুখিতা, তামসিকতা বা নিশ্চেষ্টতার স্তূপে আন্তর শিখা একেবারে চাপা পড়ে না, তখন এক অন্তরতম সত্তা যা ভিতরে প্রচ্ছন্ন থাকে, যাকে আমরা শুধু অনুভব করেছি তার বিরল প্রভাবের মাধ্যমে তা সম্মুখে এসে বাকী সবকে দীপ্ত ক'রে সাধনার ভার নিতে সমর্থ হয়। এর স্বভাবই হল ভগবান ও সর্বোত্তমের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা, ক্রিয়া ও গতিবৃত্তিতেও এ একমুখী তবে বুদ্ধির মতো এ নির্দেশের কঠোরতা বা একমুখী প্রাণিক শক্তির মতো প্রবল ভাবনা বা সংবেগের গোঁড়ামি তৈরী করে না: প্রতি মুহূর্তে ও সুনম্য নিশ্চয়তার সঙ্গে সে পরম সত্যের দিকে পথ দেখায়, আপনা আপনিই সত্য ও মিথ্যা পদক্ষেপের পার্থক্য বোঝে,

অবিদ্যার আঠাল মিশ্রণ থেকে দিব্য বা ভগবৎ-অভিমুখী গতিবৃত্তিকে মুক্ত করে। সার্চলাইটের মতো এর কাজ হল প্রকৃতিতে যা-সবের পরিবর্তন দরকার সেসব দেখিয়ে দেওয়া; এর মধ্যে সঙ্কল্পের এমন এক জ্বলন্ত শিখা আছে যা সিদ্ধির জন্য, সকল আন্তর ও বহির্জীবনের রাসায়নিক রূপান্তরের জন্য সনির্বন্ধভাবে আগ্রহী। এ সর্বত্র দেখে দিব্য স্বরূপ, কিন্তু যা শুধু মুখোশ, আবরিকা মূর্তি তা বর্জন করে। এ চায় সত্য, সঙ্কল্প ও সামর্থ্য, প্রভুত্ব ও আনন্দ, প্রেম ও সৌন্দর্য, তবে স্থায়ী বিদ্যার সত্য যা অবিদ্যার তুচ্ছ ব্যবহারিক ক্ষণস্থায়ী সত্যের ঊর্ধ্বে, আন্তর-বৃত্ত আনন্দ শুধু প্রাণিক সুখ নয়: বরং যে সব ভোগতৃপ্তি মানুষকে হীন করে সে সবের চেয়ে তার প্রিয় সেই দুঃখ ও কষ্ট যা মানুষকে পবিত্র করে: তার কাম্য এমন প্রেম যা ঊর্ধ্বগগনবিহারী, যা অহমাত্মক বাসনার খুঁটিতে আবদ্ধ নয় বা যার পা পাঁকে ডোবা নয়: এ চায় এমন সৌন্দর্য যা সনাতনের অর্থ প্রকাশের পবিত্র ব্রতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত; সামর্থ্য, সঙ্কল্প ও প্রভুত্বও এ চায়, তবে পরম চিৎপুরুষের করণ হিসেবে, অহং-এর করণ হিসেবে নয়। এর সঙ্কল্প জীবনের দিব্যত্ব সাধনের জন্য ও তার মধ্য দিয়ে পরতর সত্যের বহিঃপ্রকাশের জন্য, ভগবান ও সনাতনের নিকট তার উৎসর্গের জন্য।

কিন্তু চৈত্যপুরুষের সব চেয়ে অন্তরঙ্গ স্বভাব হল পবিত্র প্রেম, আনন্দ ও একত্বের মাধ্যমে ভগবানের দিকে তার প্রেষণা। দিব্য প্রেমই তার পরম সাধ্য, ভগবৎপ্রেমই তার প্রেরণাশক্তি, তার চরম লক্ষ্য, আমাদের মধ্যে জাত-প্রায় দেবতার জ্যোতির্ময় গুহার উপর বা নবজাত দেবতার এখনো তমসাচ্ছন্ন শয্যার উপর দীপ্তিমান সত্যের তারকা। তার উপচয় ও অপরিণত জীবনের প্রাথমিক দীর্ঘ পর্বে এ নির্ভর করে পার্থিব ভালোবাসা, স্নেহ, কোমলতা, শুভেচ্ছা, করুণা, বদান্যতার উপর, সকল প্রকার সৌন্দর্য ও নম্রতা ও চারুতা ও আলোক ও বীর্য ও শৌর্যের উপর এবং মানুষী প্রকৃতির স্থূলতা ও তুচ্ছতাকে মার্জিত ও শুদ্ধ করার কাজে যা সব সহায়কর তাদের উপর; কিন্তু এ জানে যে এই সব মানুষী গতিবৃত্তি উৎকৃষ্ট অবস্থাতেও কত মিশ্রিত, এবং নিকৃষ্ট অবস্থাতে কত অধঃপতিত, আর অহং ও আত্মপ্রতারক কোমলভাবাপন্ন মিথ্যা এবং অন্তঃপুরুষের গতিবৃত্তির অনুকরণে লাভবান অবর আত্মার ছাপে কত দূষিত। আত্মপ্রকাশ ক'রেই এ উদ্যত ও উৎসুক হয় পুরনো সকল বন্ধন, অপূর্ণ সকল ভাবপ্রবণ কর্মসূত্র ছিন্ন করতে এবং তাদের স্থলে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রেম ও একত্বের মহত্তর অধ্যাত্ম সত্য। তখনো এ মানুষী বিভিন্ন রূপ ও গতিবৃত্তিকে স্থান দিতে পারে কিন্তু এই সর্তে যে তারা ফিরবে একমাত্র পরম একের দিকে। এ স্বীকার করে শুধু সেই সব বন্ধন যেগুলি সহায়কর, গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা, ভগবৎ-অন্বেষুদের সঙ্গ, অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানব ও পশু জগৎ ও তার জীবকুলের উপর অধ্যাত্ম করুণা, সর্বত্র ভগবানের উপলব্ধিজাত সুখ ও হর্ষ এবং সৌন্দর্যের তৃপ্তি। এ প্রকৃতিকে ডুবিয়ে দেয় ভিতর দিকে অন্তঃস্থ ভগবানের সঙ্গে হৃদয়ের গূঢ় কেন্দ্রে মিলনের অভিমুখে, আর যতক্ষণ সেই আহ্বান থাকে, অহন্তার কোন অপবাদে, পরার্থপরতা বা কর্তব্য বা মানবপ্রীতি ও সেবার কোন বাইরের ডাকে সে

ভুলবে না বা তার পবিত্র আকৃতি এবং অন্তঃস্থ পরম দেবতার আকর্ষণে তার যে যাত্রা শুরু হয়েছিল তা থেকে ফিরবে না। সে সত্তাকে ঊর্ধ্বে তোলে বিশ্বাতীত পরম উল্লাসের দিকে, এবং অদ্বয় সর্বোত্তমের দিকে উৎসর্পণে জগতের সব নিম্নাভিমুখী আকর্ষণ তার পক্ষ থেকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়; কিন্তু সে এই বিশ্বাতীত প্রেম ও পরমানন্দকে নিম্নেও আহ্বান করে এই উদ্দেশ্যে যে তা যেন এই জগৎকে — ঘৃণা ও বিরোধ ও বিভেদ ও তমসা ও দ্বন্দ্বাকীর্ণ অবিদ্যার এই জগৎকে মুক্ত ও রূপান্তরিত করে। সে নিজেকে খুলে ধরে এক বিশ্বজনীন দিব্য প্রেম, অগাধ করুণা, এক তীব্র ও বিশাল সঙ্কল্পের নিকট — সকলের মঙ্গলের জন্য, সেই জগন্মাতার আলিঙ্গনের জন্য যিনি তাঁর সন্তানদের ঢেকে আছেন বা নিজের কাছে একত্র করছেন, — ইনিই সেই দিব্য অনুরাগ যা রাত্রির মধ্যে নেমে এসেছে জগৎকে সর্বব্যাপী অবিদ্যা থেকে উদ্ধার করার জন্য। অস্তিত্বের এই যে সব গভীরে অধিষ্ঠিত মহৎ সত্য তাদের মানসিক অনুকরণে বা কোন প্রাণিক অপব্যবহারে সে আকৃষ্ট হয় না বা বিপথে চলে না; এই সবকে সে খুঁজে বাইরে প্রকাশ করে তার সন্ধানী আলোকরশ্মির সাহায্যে এবং দিব্য প্রেমের সমগ্র সত্যকে আবাহন ক'রে নিচে নামিয়ে আনে এই সব হীন গঠনের নিরাময়ের জন্যে, মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক প্রেমকে তাদের অপ্রচুরতা বা বিকৃতি থেকে মুক্ত করার জন্য এবং অন্তরঙ্গতা ও একত্ব ও আরোহ উল্লাস ও অবরোহ হর্ষাবেশের মধ্যে তাদের সুপ্রচুর অংশ প্রকাশ করার জন্য।

প্রেমের ও প্রেম কর্মের সকল খাঁটি সত্যই চৈত্যপুরুষ স্বীকার করে তাদের স্থানে; কিন্তু এর শিখা সর্বদাই ঊর্ধ্ব পানে উঠতে থাকে আর এই উৎক্রান্তিকে সত্যের নিম্নতর পর্যায় থেকে উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যাবার জন্য এ উৎসুক, কারণ সে জানে যে একমাত্র কোন শ্রেষ্ঠ সত্যে আরোহণের এবং সেই শ্রেষ্ঠ সত্যের অবতরণের দ্বারাই প্রেমকে ক্রুশ থেকে মুক্ত ক'রে অধিষ্ঠিত করা যায় রাজাসনে; এই ক্রুশ এক বিশ্ববিকৃতির তির্যক রেখার দ্বারা নিবারিত ও দূষিত দিব্য অবতরণের নিদর্শন, আর এই বিশ্ববিকৃতি জীবনকে পরিণত করে কষ্ট ভোগ ও দুর্ভাগ্যের অবস্থায়। একমাত্র পরম আদি সত্যে উত্তরণের দ্বারাই এই বিকৃতির নিরাময় সম্ভব আর কেবল তখনই প্রেমের সকল কর্ম এবং জ্ঞানের ও প্রাণেরও সকল কর্ম দিব্য তাৎপর্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে পরিণত হতে পারে এক অখণ্ড আধ্যাত্মিক জীবনের অংশে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

যজ্ঞের উদয়ন (২)

প্রেমের কর্ম — প্রাণের কর্ম

সুতরাং চৈত্যপুরুষকে যজ্ঞের নেতা ও হোতা করে প্রেম, কর্ম ও জ্ঞানের যজ্ঞসাধনার মাধ্যমে সমগ্র জীবনকে রূপান্তরিত করা যায় তার নিজস্ব সত্যকার আধ্যাত্মিক মূর্তিতে। যদি যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত জ্ঞানযজ্ঞ সর্বোত্তমের নিকট আমাদের সম্ভবপর বৃহত্তম ও শুদ্ধতম নিবেদন হয় তাহলে আমাদের অধ্যাত্ম সিদ্ধির জন্য প্রেমের যজ্ঞ আমাদের কম কর্তব্য নয়; এমনকি এর একমুখিতায় এ জ্ঞানযজ্ঞ অপেক্ষা আরো প্রগাঢ় ও সমৃদ্ধ এবং তারই মতো একে বিরাট ও বিশুদ্ধ করা যায়। প্রেমযজ্ঞের প্রগাঢ়তার মধ্যে এই বিশুদ্ধ পরিব্যাপ্তি তখনই আনা যায় যখন আমাদের সকল ক্রিয়াধারার মধ্যে নেমে আসে এক দিব্য অনন্ত আনন্দের ভাব ও শক্তির বর্ষণ এবং আমাদের জীবনের সকল পরিমণ্ডল আপ্লুত হয় তাঁর একাগ্র আরাধনায় যিনি পরম এক অথচ সর্ব ও সর্বোত্তম। কারণ প্রেমের যজ্ঞ তখনই তার চরম পূর্ণতা লাভ করে যখন সর্বস্বরূপ ভগবানে নিবেদিত হয়ে তা হয়ে ওঠে অখণ্ড, উদার ও সীমাহীন এবং যখন পরমের নিকট উন্নীত হয়ে তা আর সেই ক্ষীণ, উপরভাসা ও ক্ষণস্থায়ী বৃত্তি থাকে না যাকে মানুষ প্রেম বলে, তা পরিণত হয় বিশুদ্ধ ও মহান্ ও গভীর মিলনসাধক আনন্দে।

যদিও পরম ও বিশ্বাত্মক ভগবানের প্রতি দিব্য প্রেমই আমাদের অধ্যাত্ম জীবনের বিধান হওয়া চাই তাহলেও সেজন্য সকলরকম ব্যক্তিগত প্রেম বা ব্যক্ত সৃষ্টিতে মানুষে মানুষে বন্ধন-সূত্রগুলি সম্পূর্ণ বর্জন করার কোন প্রশ্ন নেই। যা অবশ্য কর্তব্য তা হল — চৈত্যিক রূপান্তর, অবিদ্যার সকল মুখোশ উন্মোচন ও যে সব অহমাত্মক, মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক গতিবৃত্তি পুরনো অবর চেতনাকে দীর্ঘস্থায়ী করে সে সবের বিশুদ্ধীকরণ; প্রেমের প্রতি গতিবৃত্তি আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন হয়ে আর তখন মানসিক রুচি, প্রাণিক বেগ বা শারীরিক লালসার উপর নির্ভর করবে না, এর নির্ভরস্থল অন্তরাত্মায় অন্তরাত্মায় পরিচয় — এ হল সেই প্রেম যা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার মৌলিক অধ্যাত্ম ও চৈত্যিক স্বরূপে আর মন, প্রাণ ও দেহ সেই মহত্তর একত্বকে অভিব্যক্ত করার যন্ত্র ও উপাদান। এই পরিবর্তনে ব্যক্তিগত প্রেমও স্বাভাবিকভাবে উন্নীত হয়ে রূপান্তরিত হয় সেই দিব্য অধিষ্ঠাতার প্রতি দিব্য প্রেমে যিনি সর্বভূতস্থিত পরম একের দ্বারা অধিকৃত মন, অন্তঃপুরুষ ও দেহে প্রতিষ্ঠিত।

বস্তুতঃ যেসব প্রেম আরাধনা সেসবের পশ্চাতে থাকে এক অধ্যাত্মশক্তি; এমনকি যখন তা অজ্ঞানবশে কোন সসীম বিষয়েও নিবেদিত হয় তখনও অনুষ্ঠানের দৈন্য ও

পরিণামের ক্ষুদ্রতার মধ্য দিয়ে তার জ্যোতির কিছু প্রকাশ পায়। কারণ পূজাস্বরূপ প্রেম যুগপৎ অভীপ্সা ও প্রস্তুতি: এমনকি অবিদ্যার মাঝে সেই প্রেমের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে এমন এক উপলব্ধির আভাস পাওয়া যায় যা তখনও অল্পবিস্তর অন্ধ ও আংশিক হলেও অপরূপ; কারণ ক্ষণকালের জন্য হলেও সে সময়, আমরা নয়, পরম একই আমাদের মধ্যে প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ হন এবং এই অনন্ত প্রেম ও প্রেমিকের ঈষৎ আভাসে মানুষী অনুরাগও হতে পারে উন্নত ও মহিমামণ্ডিত। এজন্যই দেবপূজা, মূর্তিপূজা, আকর্ষণকারী কোন মানুষ বা আদর্শের পূজাকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়; কারণ এই সব ধাপের মধ্য দিয়েই মানবজাতি অগ্রসর হয় অনন্তের সেই আনন্দপূর্ণ অনুরাগ ও উল্লাসের দিকে; এই সমস্ত সেই অনন্তকে সীমাবদ্ধ করে বটে তথাপি প্রকৃতি আমাদের পায়ের জন্য যে সব নিম্ন ধাপ গড়েছে সে সব যখন আমাদের এখনও ব্যবহার করতে হয় এবং অগ্রগতির বিভিন্ন পর্যায় আমাদের স্বীকার করতে হয় তখন আমাদের অপূর্ণ দৃষ্টির নিকট সে সমস্ত সেই অনন্তেরই প্রতীক। আমাদের ভাবপ্রবণ সত্তার বিকাশের জন্য কোন কোন মূর্তিপূজা অপরিহার্য; আর মূর্তি যে সদ্‌বস্তুর প্রতীক সেই সদ্‌বস্তুকে পূজারীর হৃদয়ে মূর্তির বদলে বসাতে না পারলে জ্ঞানী কখনো মূর্তি চূর্ণ করতে ব্যগ্র হবে না। তাছাড়া তাদের এই বিকাশসাধনের শক্তি আছে কারণ তাদের মধ্যে সর্বদাই এমন কিছু থাকে যা তাদের বিভিন্ন রূপের চেয়ে মহত্তর এবং এমনকি যখন আমরা পূজার পরম স্তরেও পৌঁছাই তখনও সেই মহত্তর কিছু রয়ে যায় এবং হয়ে ওঠে তার এক বিস্তার বা তার উদার সমগ্রতার অংশ। সর্বরূপ ও অভিব্যক্তির অতীত তৎস্বরূপকে আমরা জানতে পারি কিন্তু তবুও আমাদের জ্ঞান অপূর্ণ, প্রেম অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে যতক্ষণ না আমরা ভগবানকে পাই প্রতি জীবে ও বস্তুতে, মানুষে, জাতিতে, পশুতে, গাছে, ফুলে, আমাদের হাতের কাজে, প্রকৃতিশক্তিতে; তখন প্রকৃতিশক্তি আমাদের কাছে আর জড়যন্ত্রের অন্ধ ক্রিয়া থাকে না, তখন এ হয় বিশ্বশক্তির মুখ ও শক্তি: কারণ এইসব বিষয়েও থাকে সনাতনের উপস্থিতি।

বিশ্বাতীত, সর্বোত্তম[১] অনুপাখ্যের নিকট আমরা যে চরম অনির্বচনীয় আরাধনা নিবেদন করি তা-ও পূর্ণ পূজা হয় না যদি না আমরা তা নিবেদন করি তাঁর সকল অভিব্যক্তিতে বা এমনকি সেখানেও যেখানে তিনি তাঁর দেবত্ব প্রচ্ছন্ন রেখেছেন — মানুষে[২] বস্তুতে ও প্রতি জীবে। একথা সত্য যে এক অবিদ্যা হৃদয়কে আবদ্ধ ক'রে আছে তার বেদনাকে বিকৃত ক'রে ও তার নিবেদনের তাৎপর্যকে আচ্ছন্ন ক'রে। সকল আংশিক পূজা, সকল ধর্ম যা কোন মানসিক বা ভৌতিক মূর্তি স্থাপন করে তার ঝোঁক হল অবিদ্যার এক আবরণ দিয়ে সত্যকে ঢেকে রক্ষা করা আর তারা সহজেই মূর্তির মধ্যে সত্য হারিয়ে ফেলে। কিন্তু যে জ্ঞান নিজেকে বাদে অন্য সবকিছু নস্যাৎ করে তার দম্ভও

[১] পরম্ ভাবম্

[২] মানুষীম্ তনুম্

এক সঙ্কীর্ণতা, এক অন্তরায়। কারণ ব্যক্তিগত প্রেমের পিছনে লুকানো ও তার অজ্ঞ মানুষী মূর্তির দ্বারা আচ্ছন্ন এমন এক রহস্য আছে যা মন ধরতে অক্ষম; এই রহস্য দিব্য বিগ্রহের রহস্য, অনন্তের রহস্যময় রূপের গূঢ় তত্ত্ব যা পাবার একমাত্র পথ হল হৃদয়ের উল্লাস এবং শুদ্ধ ও উর্ধ্বায়িত ইন্দ্রিয়ের গভীর বেগ; এবং তার যে আকর্ষণ দিব্য বংশীবাদকের আহ্বান, সর্বসুন্দরের সর্বজয়ী দুর্নিবার শক্তি, তা আমরা ধরতে পারি, আমাদেরও তা ধরতে পারে একমাত্র গূঢ় প্রেম ও আকৃতির মাধ্যমে; শেষে এই প্রেম ও আকৃতিই রূপ ও অরূপকে এক করে, এবং পরম চিৎপুরুষ ও জড়কে অভিন্ন করে। এখানে অবিদ্যার অন্ধকারের মাঝে প্রেমাবিষ্ট চিৎপুরুষ তাকেই খোঁজে এবং তারই সন্ধান সে পায় যখন ব্যক্তির মানুষী প্রেম রূপান্তরিত হয় জড়বিশ্বে আবির্ভূত বিশ্বগত ভগবানের প্রেমে।

ব্যক্তিগত প্রেমের বেলায় যে কথা, বিশ্বজনীন প্রেমের বেলাতেও সেই কথা; সমবেদনা, মৈত্রী, বিশ্বজনীন বদান্যতা ও হিতসাধন, মানবপ্রেম, জীবপ্রেম, আমাদের চারিদিককার সকল রূপ ও উপস্থিতির আকর্ষণ — এইসবের মাধ্যমে আত্মার যে ব্যাপ্তিসাধনের দ্বারা মানুষ মন ও ভাবাবেগের দিক থেকে তার অহং-এর প্রাথমিক সব গণ্ডি থেকে মুক্তি পায় সে সবকে নিতে হবে বিশ্বাত্মক ভগবানের প্রতি ঐক্যসাধক দিব্য প্রেমে। যে আরাধনা সার্থক হয় প্রেমে, যে প্রেম সার্থক হয় আনন্দে — তা-ই বিশ্বাতীত ভগবানে বিশ্বাতীত আনন্দের সেই সর্বাতিশয় প্রেম, আত্মবিভোর উল্লাস যা আমাদের জন্য থাকে ভক্তিমার্গের শেষে; এরই আরো ব্যাপ্ত পরিণাম হল সর্বভূতে বিশ্বজনীন প্রেম, সবকিছুর আনন্দ; প্রতি আবরণের পশ্চাতে আমরা অনুভব করি ভগবানকে, সকল রূপের মধ্যে অধ্যাত্মভাবে আলিঙ্গন করি সর্বসুন্দরকে। আমাদের মধ্য দিয়ে বয়ে যায় তাঁর অন্তহীন অভিব্যক্তির এক বিশ্বজনীন আনন্দ, প্রতি রূপ ও গতিবৃত্তিকে তা নেয় তার উৎসবনে অথচ কোন কিছুতেই তা আবদ্ধ বা স্তব্ধ হয় না, সর্বদাই তা এগিয়ে চলে আরো মহত্তর, আরো পূর্ণতর বহিঃপ্রকাশের দিকে। এই বিশ্বজনীন প্রেম মুক্তিপ্রদ এবং রূপান্তরের পক্ষে স্ফুরন্ত, কারণ সকল রূপ ও অবভাসের পশ্চাতে এক পরম সত্যকে যে হৃদয় অনুভব করেছে এবং তাদের পূর্ণ তাৎপর্য বুঝেছে সে আর তাদের বিরোধে বিচলিত হয় না। দিব্য প্রেমের জাদুস্পর্শে স্বার্থশূন্য কর্মী ও জ্ঞানীর অন্তঃপুরুষের নিরপেক্ষ সমত্ব রূপান্তরিত হয় সর্বগ্রাহী উল্লাসে ও অনন্ততনু পরমানন্দে। দিব্য প্রেমাস্পদের এই অনন্ত প্রমোদনিকেতনে সকল বিষয়ই হয়ে ওঠে তাঁর দেহ, সকল গতিবৃত্তিই তাঁর খেলা। এমনকি যন্ত্রণারও পরিবর্তন হয়, আর যন্ত্রণাভরা সর্ববিষয়ের প্রতিক্রিয়া ও এমনকি স্বরূপও বদলে যায়; যন্ত্রণার বিভিন্ন রূপ খসে পড়ে আর তাদের স্থলে সৃষ্ট হয় আনন্দের বিভিন্ন রূপ।

এই হল সেই চেতনা-রূপান্তরের মূল প্রকৃতি যা সমগ্র জীবনকে পরিণত করে ভগবৎপ্রেম ও আনন্দের এক গৌরবময় ক্ষেত্রে। যখন সাধক সাধারণ স্তর থেকে অধ্যাত্ম স্তরে যায় এবং জগৎ, নিজ ও অপরকে দেখে জ্যোতির্ময় দৃষ্টি ও অনুভূতির নতুন হৃদয়

নিয়ে, তখনই সারতঃ এই পরিবর্তন শুরু হয়। এর চরম অবস্থা আসে যখন অধ্যাত্ম স্তর আবার হয়ে ওঠে অতিমানসিক স্তর আর সেখানেও একে যে শুধু স্বরূপে অনুভব করা সম্ভব তা নয়, একে সমগ্র আন্তর জীবন ও সমগ্র বহির্জীবনের রূপান্তর সাধনের পরম শক্তি হিসেবেও স্ফুরন্তভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব।

প্রেমের আন্তরভাব ও প্রকৃতির এই যে রূপান্তর — বিমিশ্র ও সীমিত মানুষী আবেগ থেকে পরম ও সর্বগ্রাহী দিব্য আবেগে — তাকে বহু পার্থিব বন্ধনে আবদ্ধ মানুষী সঙ্কল্পের পক্ষে স্বীকার করা দুরূহ হলেও মনের পক্ষে তা ধারণা করা যে একান্তই দুরূহ তা নয়। তবে প্রেমের কর্মের বেলায় কিছু সংশয় আসা সম্ভব। জ্ঞানমার্গের কোন কোন উচ্চ আতিশয্যের ধারায় যেমন করা হয় তেমন এখানেও সমস্যার গ্রন্থিছেদন সম্ভব, অর্থাৎ জগৎক্রিয়ার স্থূলতার সঙ্গে প্রেমের স্বরূপের দুরূহ মিলনসাধনের সমস্যা থেকে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব এই ক্রিয়া থেকে নিবৃত্ত হয়ে; বাহ্যজীবন ও ক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ সরে এসে হৃদয়ের নীরবতার মাঝে ভগবানের আরাধনায় একলা থাকার পথ আমরা নিতে পারি। এও সম্ভব যে আমরা শুধু সেইসব কাজ করব যেগুলি হয় নিজেরাই ভগবানের প্রতি প্রেমের প্রকাশস্বরূপ যেমন প্রার্থনা, স্তুতি, পূজার প্রতীকধর্মী কর্ম, নয় সেইসব গৌণ কাজ করব যেগুলি এদের সঙ্গে যুক্ত ও তাদের আন্তর ভাবের দ্বারা অন্বিত হতে পারে, আর বাকী সব আমরা ফেলে দিতে পারি; সাধু ও ভক্তের বিভোর বা ভগবৎকেন্দ্রিক জীবন পাবার আন্তর আকৃতি মেটাবার জন্য অন্তঃপুরুষ সবকিছু থেকে সরে আসে। আবার এও সম্ভব যে জীবনের দ্বার আরো বেশী উন্মুক্ত করে আমাদের প্রতিবেশী ও জাতির সেবার কাজে আমরা ভগবানের প্রতি নিজেদের প্রেম নিয়োগ করব। তখন করা যায় বিশ্বপ্রীতি, বদান্যতা ও লোকহিতের কাজ, মানুষ, পশু ও সৃষ্টির প্রতি বিষয়ের প্রতি দাক্ষিণ্য ও সাহায্যের কাজ এবং এইসবের রূপান্তর সম্ভব একপ্রকার অধ্যাত্ম আবেগ দ্বারা, অন্ততঃ তাদের যে শুধু নৈতিক আকার তার মধ্যে আনা যায় অধ্যাত্ম প্রেরণার মহত্তর শক্তি। বস্তুতঃ এই শেষ সমাধানটিই আজকালকার ধার্মিক মন বেশী সমাদর করে আর দেখা যায় যে চারিদিকে দৃঢ়ভাবে বলা হয় যে ভগবৎ-অন্বেষুর বা দিব্য প্রেম ও জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত যার জীবন তার যথার্থ কর্মক্ষেত্র এটাই। কিন্তু পূর্ণযোগের যাত্রা পার্থিব জীবনের সঙ্গে ভগবানের সম্পূর্ণ মিলনের দিকে, এই সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে ক্ষান্ত থাকা বা বিশ্বপ্রীতি ও হিতসাধনের নৈতিক অনুশাসনের স্বল্প পরিসরের মধ্যে এই মিলনকে সীমিত রাখা তার পক্ষে সম্ভব নয়। পূর্ণযোগে আমাদের কেবল প্রেম ও জনসেবার কর্ম নয়, আমাদের জ্ঞানের কর্ম, শক্তি উৎপাদন ও সৃষ্টির কর্ম, প্রীতি, সৌন্দর্য ও অন্তঃপুরুষের সুখকর কর্ম, আমাদের সঙ্কল্প, প্রচেষ্টা ও বলের কর্ম অর্থাৎ সকল কর্মকেই করা চাই ভাগবত জীবনের অঙ্গ। এতে এইসব কর্মসাধনের পদ্ধতি

বহির্মুখী ও মানসিক হবে না, তা হবে অন্তর্মুখী ও অধ্যাত্ম এবং সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য এটি সকল কর্মের মধ্যেই — তা তারা যাই হ'ক না কেন — আনবে দিব্য প্রেমের ভাব, আরাধনা ও পূজার ভাব, ভগবানে ও ভগবৎসৌন্দর্যে সুখের ভাব যাতে সমগ্র জীবনকে করা যায় ভগবানের প্রতি অন্তঃপুরুষের প্রেমের কর্মের যজ্ঞ, তার জীবনের অধীশ্বরের উদ্দেশ্যে তার ধর্মানুষ্ঠান।

এইভাবে কর্মের আন্তরভাবের দ্বারা জীবনকে করা যায় পরাৎপরের আরাধনা; কেননা গীতা বলে, "হৃদয়ের ভক্তির সঙ্গে যে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল বা জল অর্পণ করে আমি তার সেই ভক্তির উপহারকে গ্রহণ ক'রে তৃপ্তির সঙ্গে ভোগ করি"। আর এইরূপ প্রেম ও ভক্তিভরে শুধু যে উৎসর্গীকৃত বাহ্য উপহার নিবেদন করা যায় তা নয়, আমাদের সকল মনন, সকল বেদনা ও ইন্দ্রিয়সংবিৎ, আমাদের সকল বহির্মুখী ক্রিয়া ও তাদের রূপ ও বস্তু সনাতনের কাছে ঐ রকম নিবেদিত উপহার হতে পারে। একথা ঠিক যে কোন বিশেষ ক্রিয়া বা ক্রিয়ার বিশেষ রূপের নিজস্ব মূল্য আছে, এমনকি সে মূল্য বেশ বড়, কিন্তু ক্রিয়ার আন্তরভাবই মূল বিষয়; যে আন্তরভাবের প্রতীক বা জড়ীয় বহিঃপ্রকাশ এই ক্রিয়া সেই আন্তরভাব থেকেই আসে ক্রিয়ার মূল্য, তাতেই নিরূপিত হয় তার তাৎপর্য। অথবা বলা যেতে পারে যে দিব্য প্রেম ও পূজার যে সম্পূর্ণ কর্ম তার তিনটি অংশ, এরা এক সমগ্রেরই প্রকাশ; প্রথম হল কর্মের মাধ্যমে ভগবানকে হাতে কলমে পূজা করা, দ্বিতীয় — কোন আন্তর দর্শন ও আকৃতি বা ভগবানের সঙ্গে কোন সম্পর্ক প্রকাশ করে এমন কোন কর্মের রূপে প্রতীক পূজা করা, আর তৃতীয় — হৃদয়, অন্তঃপুরুষ ও চিৎপুরুষে আন্তর আরাধনা ও একত্বের আকাঙ্ক্ষা বা একত্বের অনুভূতি আনা। সেইরকম, জীবনকে পূজায় পরিবর্তিত করার উপায় হল — তার পশ্চাতে বিশ্বাতীত ও বিশ্বজনীন প্রেমের, একত্বের এষণার, একত্বের বোধের আন্তর ভাব স্থাপন করা; প্রতি কর্মকে ভগবৎ-অভিমুখী ভাবাবেগের বা ভগবানের সঙ্গে কোন সম্পর্কের প্রতীক হিসেবে বহিঃপ্রকাশ করা; আমরা যা করি সেসবকে পরিণত করা পূজার কর্মে, অন্তঃপুরুষের সংযোগের, মনের ধারণার, প্রাণের মান্যতার, হৃদয়ের সমর্পণের কর্মে।

যে কোন ধর্মানুষ্ঠানে প্রতীক, তাৎপর্যপূর্ণ আচার বা ভাবব্যঞ্জক মূর্তি শুধু যে এক ভাবোদ্দীপক ও শ্রীবর্ধক সৌন্দর্যময় অঙ্গ তা নয়, এ হল এক স্থূল উপায় যার সাহায্যে মানুষ তার হৃদয়ের ভাবাবেগ ও আস্পৃহাকে বাহ্যতঃ স্পষ্ট, দৃঢ় ও স্ফুরন্ত করতে শুরু করে। কারণ যদি এই হয় যে অধ্যাত্ম আস্পৃহাহীন পূজা অর্থশূন্য ও নিষ্ফল, তাহলে ক্রিয়া ও রূপ বর্জিত আস্পৃহাও এমন এক অমূর্তশক্তি যা জীবনের পক্ষে সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে মানবজীবনের সকল রূপেরই নিয়তি হল কঠিন হওয়া, কেবলমাত্র আচার সর্বস্ব হওয়া ও সেজন্য জীর্ণ হয়ে পড়া; অবশ্য যদিও যারা তখনও রূপ ও অনুষ্ঠানের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম তাদের কাছে সে সবের শক্তি বরাবর বজায় থাকে, তাহলেও অধিকাংশ লোকই অনুষ্ঠানকে ব্যবহার করে এক যান্ত্রিক আচার হিসেবে, এবং প্রতীককে ব্যবহার করে এক প্রাণহীন চিহ্ন হিসেবে, আর তার ফলে ধর্মের আন্তর ভাব নষ্ট হওয়ায়

শেষে অনুষ্ঠান ও রূপের পরিবর্তন অথবা তাদের সম্পূর্ণ পরিবর্জন প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। এমন অনেক লোকও আছে যাদের কাছে এই কারণে ধর্মের সকল অনুষ্ঠান ও রূপ দূষণীয় ও বিরক্তিকর; কিন্তু খুব কম লোকই এই সব বাহ্য প্রতীকের সাহায্য না নিয়ে চলতে পারে, আর এমন কি মানবপ্রকৃতির মাঝে এমন এক দিব্য উপাদান আছে যা সর্বদাই এই সব চায় অধ্যাত্ম তৃপ্তির সম্পূর্ণতার জন্য। যদি প্রতীক যথার্থ, অকৃত্রিম, সুন্দর ও আনন্দময় হয় তাহলে তা সর্বদাই ন্যায়সঙ্গত এমনকি এ কথাও বলা চলে যে সৌন্দর্যবোধ বা ভাবাবেগবর্জিত অধ্যাত্মচেতনা পুরোপুরি বা অন্ততঃ অখণ্ডভাবে অধ্যাত্ম নয়। অধ্যাত্মজীবনে প্রতি কর্মের ভিত্তি হ'ল এমন এক চিরন্তনী এবং সঞ্জীবনী অধ্যাত্মচেতনা যার বেগ সর্বদাই নব নব রূপে আত্মপ্রকাশ করে বা যা সর্বদাই আন্তরভাবের প্রবাহ দ্বারা রূপের সত্যকে নবজীবন দিতে সক্ষম, আর এইভাবে নিজেকে প্রকাশ করা এবং প্রতি ক্রিয়াকে অন্তঃপুরুষের কোন সত্যের জীবন্ত প্রতীক ক'রে তোলাই এই অধ্যাত্মচেতনার সৃজনক্ষম আন্তর দর্শন ও সংবেগের প্রকৃতি। অধ্যাত্ম সাধকের কর্তব্য হবে — এইভাবে জীবনকে ব্যবহার করা, এইভাবে তার রূপ পরিবর্তিত ও তাকে তার স্বরূপে গৌরবময় করা।

পরম দিব্য প্রেম এক সৃজনী শক্তি, এবং যদিও এই শক্তি স্বরূপে নীরব ও অপরিবর্তনীয় থাকতে পারে, তবু বাহ্যরূপ ও বহিঃপ্রকাশের মধ্যেই তার আনন্দ; নির্বাক ও নিরাকার দেবতা থাকতে সে বাধ্য নয়। এমনকি একথাও বলা হয়েছে যে সৃষ্টি প্রেমেরই এক কর্ম বা অন্ততঃপক্ষে এমন এক ক্ষেত্রগঠন যার মধ্যে দিব্যপ্রেম নিজের বিভিন্ন সব প্রতীক উদ্ভাবন ক'রে নিজেকে সার্থক করতে সক্ষম পারস্পরিক সহযোগিতা ও আত্মদানের কাজে; আর যদি এটি সৃষ্টির প্রাথমিক প্রকৃতি না-ও হয় তাহলেও এটি তার চরম উদ্দেশ্য ও প্রেরণা। এখন যে এ রকম মনে হয় না তার কারণ যদিও দিব্যপ্রেমই এই জগতে বিভিন্ন সৃষ্ট বিষয়ের সকল ক্রমঅভিব্যক্তির ধারক তবু জীবনের ও তার ক্রিয়ার উপাদানের মালমশলা হ'ল অহমাত্মক রূপায়ণ, বিভাজন, আপাত উদাসীন, নির্দয়, এমনকি বিরুদ্ধভাবাপন্ন প্রাণহীন ও নিশ্চেতন জড় জগতে বেঁচে থাকার জন্য প্রাণ ও চেতনার সংগ্রাম। এই সংগ্রামের বিশৃঙ্খলা ও অন্ধকারের মাঝে সকলেই নিক্ষিপ্ত হয় পরস্পরের বিরুদ্ধে, প্রত্যেকেরই সঙ্কল্প, প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ নিজের জীবন প্রতিষ্ঠিত করা, আর শুধু অনুষঙ্গক্রমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা অপরের মধ্যে এবং খুবই আংশিকভাবে অপরের জন্য; কেননা এমনকি মানুষের পরার্থপরতাও মূলতঃ অহমাত্মক থাকে আর তা এরকম থাকতে বাধ্য যতদিন না অন্তঃপুরুষ খুঁজে পায় দিব্য একত্বের রহস্য। এই রহস্যকে তার পরম উৎসে আবিষ্কার করা, ভিতর থেকে আনা ও জীবনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তা বিকিরণ করা — এই হল যোগসাধনার সাধ্য। সকল ক্রিয়া, সকল সৃষ্টিকে পরিণত করা চাই ধর্মানুষ্ঠানের, পূজার যজ্ঞের এক রূপে, এক প্রতীকে; এতে এমন কিছু থাকা চাই যার জন্য তাতে এই ছাপ পড়ে যে এ হল নিবেদন, দিব্যচেতনার গ্রহণ ও রূপায়ণ, পরম প্রেমাস্পদের সেবা, আত্মদান, সমর্পণ। যেখানে সম্ভব সেখানেই

এটি করা চাই কর্মের বাহ্য দেহ ও রূপে; আর সর্বদাই তা করা চাই অন্তর্মুখী ভাবাবেগ ও প্রখরতায় যা থেকে বোঝাবে যে সনাতনের উদ্দেশে অন্তঃপুরুষ থেকে বহিঃপ্রবাহ এটি।

কর্মের মধ্যে পূজার ভাব নিজেই এক মহান্ ও সম্পূর্ণ ও শক্তিশালী যজ্ঞ যার ঝোঁক নিজেকে বহুগুণিত ক'রে পরম একের আবিষ্কার সাধন করা ও ভগবানের বিকিরণ সম্ভব করা। কারণ কর্মের মধ্যে ভক্তি মূর্ত হলে তাতে শুধু যে তার নিজের পথ প্রশস্ত ও পূর্ণ ও স্ফুরন্ত হয় তা নয়, জগতে কর্মের আরো কঠিন পথে আনন্দ ও প্রেমের এমন এক দিব্যভাবপূর্ণ বেগ আসে যা প্রায়শঃই তার প্রারম্ভে থাকে না কারণ এই সময় থাকে শুধু কঠোর অধ্যাত্ম সঙ্কল্প যা দুরারোহ উৎক্রান্তির পথে চলে এক প্রয়াসকর ঊর্ধ্বগ্রাহী আদানে আর হৃদয় তখনো থাকে নিদ্রামগ্ন বা নীরবতায় বদ্ধ। যদি এর মধ্যে দিব্য প্রেমের ভাব আসে তাহলে পথের কঠোরতা হ্রাস পায়, প্রয়াসকর চাপ লঘু হয় আর বাধাবিঘ্ন ও সংগ্রামের মর্মস্থলেও মাধুর্য ও আনন্দ আসে। বস্তুতঃ পরমের নিকট আমাদের সঙ্কল্প, কর্ম ও ক্রিয়াধারার যে সমর্পণ অপরিহার্য তা সিদ্ধ ও সর্বতোভাবে ফলপ্রসূ হয় কেবল তখনই যখন তা হয় প্রেমের সমর্পণ। যখন সমগ্র জীবন পরিণত হয় এই পূজায়, সকল কর্ম করা হয় ভগবানের প্রেমে, এবং জগৎ ও সৃষ্ট বিষয়সমূহের প্রতি প্রেমে আর এই বোধে, এই উপলব্ধিতে যে এই সব ভগবানেরই অভিব্যক্তি নানা ছদ্মবেশে তখন সেই কারণেই সকল জীবন, সকল কর্ম হয়ে ওঠে পূর্ণযোগের অংশ।

হৃদয়ের আরাধনার আন্তর নিবেদন যা প্রতীকের মধ্যে পূজার মূল তত্ত্ব, কর্মের মধ্যে পূজার আন্তরভাব — এই হল যজ্ঞের প্রাণ। যদি আমরা চাই যে নিবেদন সম্পূর্ণ ও সার্বিক হবে তাহলে আমাদের সকল ভাবাবেগকে ভগবৎ-অভিমুখী করা অত্যাবশ্যক। এই হল মানবহৃদয়কে বিশুদ্ধ করার সব চেয়ে জোরালো উপায়, যে কোন নীতিমূলক বা সৌন্দর্যবোধমূলক শুদ্ধির পন্থা তার সর্বশক্তি ও বাহ্য প্রভাবের বলে যত শক্তিশালী হতে পারে তার চেয়ে এটি আরো শক্তিশালী। অন্তরে প্রজ্বলিত করা চাই এক চৈত্য অগ্নি যাতে নিক্ষেপ করা হয় সব কিছু যার উপর আছে দিব্য নাম। সেই অগ্নির মাঝে সকল ভাবাবেগ বাধ্য হয়ে বিসর্জন দেবে তাদের সব স্থূলতর উপাদান এবং যেগুলি অদিব্য বিকৃতি সেগুলি সম্পূর্ণ দগ্ধ হবে আর অন্যগুলির অপ্রচুরতা নিরাকৃত হবে, অবশেষে শিখা, ধূপ ও ধূপগন্ধের মধ্য থেকে উঠে আসে বৃহত্তম প্রেম ও নিষ্কলঙ্ক দিব্য আনন্দ। এই ভাবে যে দিব্য প্রেমের উদ্ভব হয় তা অন্তর্মুখী বেদনায় মানব ও সর্বভূতস্থিত ভগবানে সক্রিয় বিশ্বজনীন সমত্বে প্রসারিত হলে তা ভ্রাতৃত্বের নিষ্ফল শ্রেষ্ঠ মানসিক আদর্শ অপেক্ষা জীবনের পরিপূর্ণতা সাধনের জন্য আরো শক্তিশালী হবে এবং আরো বাস্তব যন্ত্র হবে। কর্মের মধ্যে একমাত্র এই দিব্য প্রেমের বর্ষণধারাই জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সকল প্রাণীর মধ্যে সত্যকার ঐক্য সৃজনে সমর্থ; এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্য সকলেরই প্রয়াস নিষ্ফল হবে যতক্ষণ না দিব্য প্রেম আত্মপ্রকাশ করে পার্থিব প্রকৃতির মধ্যে মুক্ত অভিব্যক্তির হৃদয়রূপে।

এইখানে যজ্ঞের নেতা হিসেবে আমাদের মধ্যে নিগূঢ় চৈত্যপুরুষের আবির্ভাব

সমধিক গুরুত্বপূর্ণ; কারণ একমাত্র এই অন্তরতম পুরুষই তার সঙ্গে আনতে পারে কর্মের মধ্যকার আন্তরভাবের, প্রতীকের মধ্যকার মূল তত্ত্বের পূর্ণ শক্তি। এমনকি যতদিন অধ্যাত্মচেতনা অসম্পূর্ণ থাকে তখনও একমাত্র এটিই প্রতীকের চিরনবীনতা, অকৃত্রিমতা ও সৌন্দর্য রক্ষা করতে এবং তাকে এক প্রাণহীন রূপে বা দূষিত ও দোষজনক জাদুতে পর্যবসিত হওয়া থেকে নিবারণ করতে সমর্থ; কর্মের জন্য তার শক্তি ও তাৎপর্য বজায় রাখতে সক্ষম একমাত্র এই। আমাদের সত্তার অপর সব অঙ্গ — মন, প্রাণশক্তি, ভৌতিক বা শারীর চেতনা অবিদ্যার এত বশীভূত যে তারা পথপ্রদর্শক বা অভ্রান্ত সংবেগের উৎস হওয়া তো দূরের কথা, নিশ্চিত করণ হবার অযোগ্য। এইসব শক্তির প্রেরণা ও ক্রিয়ার অধিকাংশই সর্বদা আঁকড়ে থাকে প্রাচীন বিধান, ভ্রান্তিকর অনুশাসন ও প্রকৃতির বিভিন্ন দীর্ঘপুষ্ট অবর গতিবৃত্তি; আর যে সব স্বর ও শক্তি আমাদের আহ্বান করে, প্রেরণা দেয় যেন আমরা নিজেদের ছাপিয়ে রূপান্তর করি মহত্তর সত্তায় ও আরো ব্যাপ্ত প্রকৃতিতে সেসবকে তারা দেখে অনিচ্ছা, শঙ্কা, বা বিদ্রোহ বা প্রতিবন্ধক নিশ্চেষ্টতার সঙ্গে। তারা যে সাড়া দেয় তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় প্রতিরোধ, নয় সঙ্কুচিত বা স্বার্থপ্রণোদিত সাময়িক সম্মতি; কেননা এমনকি যখন তারা আহ্বান মতো চলে তখনো তাদের ঝোঁক — সচেতনভাবে না হলেও গতানুগতিক অভ্যাসবশে — তাদের নিজস্ব স্বাভাবিক অক্ষমতা ও প্রমাদ আনা অধ্যাত্ম ক্রিয়ার মধ্যে। প্রতি মুহূর্তেই তারা লুব্ধ হয় চৈত্য ও অধ্যাত্ম প্রভাব থেকে অহমাত্মক সুবিধা নিতে এবং লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এইসব প্রভাব যে শক্তি, আনন্দ ও আলো আমাদের মধ্যে আনে তাদের তারা ব্যবহার করছে অবর জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। এর পরেও, এমনকি যখন সাধক নিজেকে খুলে ধরেছে বিশ্বাতীত, বিশ্বজনীন বা বিশ্বগত দিব্য প্রেমের নিকট তখনও যদি সে জীবনের মধ্যে সেই দিব্য প্রেম ঢালতে চেষ্টা করে তার সম্মুখে আসে এইসব অবর প্রকৃতিশক্তির আচ্ছন্নতা ও বিকৃতির বাধা। এইসব শক্তি সর্বদাই নিয়ে যায় প্রচ্ছন্ন গহ্বরের দিকে, উচ্চতর তীব্রতার মাঝে ঢালে তাদের খর্বকারী উপাদান আর সেই অবতরণরত শক্তিকে নিজেদের জন্য ও নিজেদের স্বার্থের জন্য অধিকার করে তাকে নামাতে চায় কামনা ও অহং-এর অতিস্ফীত, মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক উপায়ের হীন স্তরে। দিব্য প্রেমকে পরম সত্য ও আলোকের নতুন স্বর্গের, নতুন পৃথিবীর স্রষ্টারূপে গ্রহণ না করে তারা তাকে এখানে বন্দী করে রাখতে চায় এই উদ্দেশ্যে যে পুরনো পৃথিবীর কর্দমকে স্বর্ণাভ করার ও ভাববিলাসী প্রাণিক ও কল্পনার মানসিক আদর্শে গঠিত স্বপ্নরাজ্যের পুরনো ধূসর অবাস্তব আকাশকে গোলাপী ও নীল রঙে অনুরঞ্জিত করার কাজে দিব্য প্রেম হবে এক প্রচণ্ড সমর্থক ও উর্ধ্বায়নের এক গৌরবদায়িকা শক্তি। যদি এই মিথ্যার কাজকে চলতে দেওয়া হয় তাহলে পরতর আলোক শক্তি ও আনন্দ সরে যায়, তখন সাধক নেমে আসে নীচের স্তরে; আর না হয় উপলব্ধি এক বিপদসঙ্কুল অর্ধপথে ও মিশ্রণে বদ্ধ থাকে অথবা সত্যকার আনন্দ নয় এমন এক অবর প্রমোদে ঢাকা পড়ে, এমনকি তার মধ্যে ডুবে যায়। এইজন্য যে দিব্য প্রেম সকল সৃষ্টির হৃৎমূলে

অবস্থিত এবং সকল পাবনী ও সৃজনী শক্তির মধ্যে প্রবলতম তা আজ পর্যন্ত পার্থিবজীবনে খুব অল্পই সম্মুখে এসেছে, উদ্ধারসাধনে তার সাফল্য অতি অল্প, আর সৃজন কার্যও অতি সামান্য। সকল দিব্য ক্রিয়াশক্তির মধ্যে এটি সবচেয়ে প্রবল, বিশুদ্ধ, দুর্লভ বলেই মানবপ্রকৃতি একে বিশুদ্ধ অবস্থায় ধারণ করতে অসমর্থ হয়েছে; যা সামান্য ধরা সম্ভব হয়েছে তা-ও তৎক্ষণাৎ বিকৃত করা হয়েছে ধার্মিকতার এক প্রাণিক উত্তাপে, সমর্থনের অযোগ্য এক ধর্মীয় বা নৈতিক ভাববিলাসে, গোলাপী রঙে রঞ্জিত মনের বা উদ্দাম আবেগময় পঙ্কিল প্রাণসংবেগের ইন্দ্রিয়পর বা এমনকি ইন্দ্রিয়ভোগবিলাসী কামুকতাদুষ্ট রহস্যবাদে; যে রহস্যময় অগ্নিশিখা তার যজ্ঞীয় জিহ্বার দ্বারা জগৎকে পুনর্গঠিত করতে পারত তাকে ধারণ করার অক্ষমতার দরুন সে আসল জিনিস না দেওয়ার ক্ষতিপূরণ বাবদ দিয়েছে এক নকল জিনিস। একমাত্র অন্তরতম চৈত্যপুরুষই অনবগুণ্ঠিত হয়ে ও তার পূর্ণ শক্তি নিয়ে বাইরে এসে তীর্থযাত্রী যজ্ঞকে নিয়ে যেতে পারে অক্ষত অবস্থায় এইসব গুপ্ত আক্রমণ ও প্রচ্ছন্ন গহ্বরের মধ্য দিয়ে; প্রতি মুহূর্তে এটি মনের ও প্রাণের অনৃতগুলি ধরে, বাইরে প্রকাশ করে তাদের প্রতিহত করে, দিব্য প্রেম ও আনন্দের সত্যকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এবং তাকে পৃথক করে মনের তীব্র অনুরাগের উত্তেজনা থেকে আর যে প্রাণশক্তি ভুল পথে চালায় তার অন্ধ উৎসাহ থেকে। কিন্তু মন, প্রাণ ও শরীরের মর্মলোকে যা কিছু সত্য সে সবকে সে মুক্ত করে নিজের সাথে নিয়ে যায় তার যাত্রাপথে যতদিন না তারা এসে দাঁড়ায় উচ্চ শিখরে নব আন্তরভাবে ও মহিমময় মূর্তিতে।

কিন্তু তবু দেখা যায় যে এই অন্তরতম চৈত্যপুরুষের পরিচালনা পর্যাপ্ত হয় না যতদিন না এটি নিজেকে তুলতে পারে এই অবর প্রকৃতির স্তূপ থেকে পরতম অধ্যাত্ম স্তরে, আর যে দিব্য স্ফুলিঙ্গ ও শিখা এখানে অবতরণ করেছিল তা আবার নিজেদের যুক্ত করে তাদের মূল অগ্নিময় ব্যোমের সঙ্গে। কারণ সেখানে আর এমন অধ্যাত্ম চেতনা থাকে না যা তখনো অপূর্ণ এবং যা নিজের কাছে নিজের অর্ধেক হারিয়ে ফেলেছে মানুষের মন প্রাণ ও দেহের ঘন আবরণে; সেখানে বিরাজমান পূর্ণ অধ্যাত্মচেতনা তার বিশুদ্ধতায়, স্বাধীনতায় ও ঘনব্যাপ্তিতে। সেখানে যেমন সনাতন পরম জ্ঞাতাই আমাদের মধ্যে জ্ঞাতা হয়ে সকল জ্ঞান প্রবর্তন ও ব্যবহার করেন, তেমন সনাতন সর্ব আনন্দময়ই পরম আরাধ্য যিনি নিজের কাছে আকর্ষণ করছেন তাঁর সত্তা ও আনন্দের সনাতন দিব্য অংশকে যা বিশ্ববিলাসে বার হয়েছিল, তিনিই অনন্ত পরম প্রেমিক যিনি সুখময় একত্বের মধ্যে নিজেকে বাইরে ঢেলে দিচ্ছেন নিজেরই অভিব্যক্ত সব আত্মার বহুত্বের মধ্যে। জগতের সর্ব সৌন্দর্যই সেখানে পরম প্রেমাস্পদের সৌন্দর্য এবং সৌন্দর্যের সকল রূপকেই দাঁড়াতে হয় সেই শাশ্বত সৌন্দর্যের আলোকতলায় এবং শরণ নিতে হয় অনবগুণ্ঠিতা দিব্য সিদ্ধির ঊর্ধ্বায়নসাধিকা ও রূপান্তরকারিণী শক্তির নিকট। সকল আনন্দ ও হর্ষ সেখানে সর্ব আনন্দময়েরই, এবং ভোগ, সুখ বা আমোদের সকল অবর রূপের উপর আসে এই আনন্দময়েরই প্লাবনের বা স্রোতধারার তীব্রতার অভিঘাত, আর

এর দণ্ডদায়ী প্রভাবে তারা হয় ভেঙে খণ্ড হয় পর্যাপ্ত নয় বলে, অথবা বাধ্য হয়ে নিজেদের রূপান্তরিত করে দিব্য আনন্দের বিভিন্ন রূপে। এইভাবে ব্যষ্টিচেতনার পক্ষে এমন এক শক্তির অভিব্যক্তি হয় যা নিরঙ্কুশভাবে মোকাবিলা করতে সক্ষম অবিদ্যার ইষ্টার্থের হ্রস্বতা ও হীনমন্যতার সঙ্গে। অবশেষে প্রেম ও হর্ষের যে বিশাল বাস্তবতা ও প্রগাঢ় মূর্ততা সনাতনের, তাকে জীবনের মধ্যেও নামিয়ে আনা সম্ভব হতে থাকে। অথবা অন্ততঃ আমাদের অধ্যাত্মচেতনার পক্ষে নিজেকে মনের সীমানার বাইরে অতিমানসিক আলোক ও শক্তি ও বৃহত্ত্বের মধ্যে তোলা সম্ভব হবে; সেখানে অতিমানস বিজ্ঞানের আলোক ও গূঢ় শক্তির মধ্যে আছে দিব্য আত্মপ্রকাশ ও আত্মসংগঠনের সামর্থ্যের জ্যোতি ও হর্ষ যা অবিদ্যার জগৎকেও উদ্ধার ক'রে তাকে পুনর্গঠিত করতে পারে পরম চিৎপুরুষের সত্যের মূর্তিতে।

সেখানে অতিমানসিক বিজ্ঞানে আছে আন্তর আরাধনার সার্থকতা, পরিণতির তুঙ্গতা, সর্বগ্রাহী পরিব্যাপ্তি, গভীর ও অখণ্ড মিলন, প্রেমের প্রদীপ্ত পক্ষ যা ঊর্ধ্বে ধারণ করে এক পরম জ্ঞানের শক্তি ও হর্ষ। কারণ অতিমানসিক প্রেম এমন এক সক্রিয় উল্লাস আনে যা মুক্ত মনের স্বর্গ যে রিক্ত নিষ্ক্রিয় শান্তি ও নিস্তব্ধতা তা ছাপিয়ে যায় অথচ তাতে অতিমানসিক নীরবতার সূত্রপাত যে গভীরতর মহত্তর স্থিরতা তা ক্ষুণ্ণ হয় না। প্রেমের যে ঐক্য নিজের মধ্যে সকল বিভেদ ধারণ করতে পারে অথচ তাদের বর্তমান সব সঙ্কীর্ণতা ও আপাত বেসুরের দ্বারা খর্ব বা বিনষ্ট হয় না তা তার পূর্ণ যোগ্যতায় উন্নীত হয় অতিমানসিক স্তরে। কারণ সেখানে ভগবানের সঙ্গে অন্তঃপুরুষের গভীর একত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত সর্বভূতের সঙ্গে প্রগাঢ় একত্ব বিভিন্ন সম্পর্কের লীলার সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপনে সক্ষম, আর এইসব সম্পর্কের দরুন একত্ব হয়ে ওঠে আরো পূর্ণ ও নিরালম্ব। অতিমানসিকভাবাপন্ন প্রেমের শক্তি সকল জীবন্ত সম্পর্ককেই নিতে পারে নিঃসঙ্কোচে ও নিরাপদে এবং সে সবকে তাদের অমার্জিত, মিশ্রিত ও তুচ্ছ মানুষী স্থাপনা থেকে মুক্ত ও দিব্য জীবনের সুখময় উপাদানে ঊর্ধ্বায়িত করে ফেরাতে পারে ভগবানের দিকে। কেননা অতিমানসিক অনুভূতির স্বভাবই এই যে সে দিব্য মিলন বা অনন্ত একত্বকে বিসর্জন না দিয়ে বা বিন্দুমাত্র খর্ব না করে ভেদের খেলাকে চিরদিন চলতে দিতে সক্ষম। মানুষ ও জগতের সকল সংযোগকে পূত অগ্নিশিখাশক্তিতে ও রূপান্তরিত তাৎপর্যে আলিঙ্গন করা অতিমানসিকভাবাপন্ন চেতনার পক্ষে সম্পূর্ণ সম্ভব; কেননা তখন অন্তঃপুরুষ সর্বদাই উপলব্ধি করবে যে প্রেম বা সৌন্দর্যের জন্য সকল আবেগের, সকল অন্বেষণের বিষয় সেই এক সনাতন, এবং সর্ববিষয়ে ও সর্বভূতে সেই এক ভগবানের সাক্ষাৎ পাবার ও তাঁর সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য সে অধ্যাত্মভাবে ব্যবহার করতে পারবে এক ব্যাপ্ত ও মুক্ত প্রাণ-প্রেষণা।

যজ্ঞ কর্মের তৃতীয় ও শেষ বর্গে নেওয়া যায় সেই সবকিছু যা কর্মযোগের জন্য সাক্ষাৎভাবে প্রশস্ত; কারণ এই হল তার সংসাধনের ক্ষেত্র ও বৃহত্তর প্রদেশ। জীবনের যেসব কাজকর্ম আরো বেশী দৃষ্টিগোচর সে সবই এর অন্তর্ভুক্ত; জড় জীবনের পূর্ণ ব্যবহারের জন্য যে প্রাণৈষণা নিজেকে বাইরে প্রক্ষিপ্ত করে তার বহুবিধ শক্তিও এর অন্তর্গত। এখানেই বৈরাগ্যনিষ্ঠ বা পরলোককামী আধ্যাত্মিকতা অনুভব করে তার সাধ্য পরম সত্যের এক অলঙ্ঘ্য অস্বীকার, আর বাধ্য হয়ে সে সরে যায় পার্থিব জীবন থেকে, একে প্রত্যাখ্যান করে এই বলে যে এ হল অশোধনীয় অবিদ্যার চিরন্তন তামস ক্রীড়াক্ষেত্র। তবু ঠিক এইসব কাজকর্মকেই পূর্ণযোগ চায় আধ্যাত্মিক বিজয় ও দিব্য রূপান্তরের জন্য। যেসব সাধনপন্থা বেশীমাত্রায় বৈরাগ্যনিষ্ঠ তারা এই জীবনকে ত্যাগ করে একেবারে পুরোপুরি, অন্যেরা একে নেয় শুধু এক সাময়িক পরীক্ষাক্ষেত্র হিসেবে বা প্রচ্ছন্ন চিৎপুরুষের ক্ষণস্থায়ী বাহ্য ও দুর্বোধ্য লীলাক্ষেত্র হিসেবে; কিন্তু পূর্ণ যোগের সাধক তাকে পরিপূর্ণভাবে আলিঙ্গন ও বরণ করে এই ব'লে যে এ হল সার্থকতা সাধনের ক্ষেত্র, দিব্য কর্মের ক্ষেত্র, প্রচ্ছন্ন ও অন্তরধিষ্ঠিত পরম চিৎপুরুষের সমগ্র আত্ম-আবিষ্কারের ক্ষেত্র। নিজের মধ্যে পরম দেবতাকে আবিষ্কার করা তার প্রথম উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু জগতের পরিকল্পনা ও বিভিন্ন মূর্তির দ্বারা উপস্থাপিত আপাত অস্বীকৃতির পশ্চাতে জগতের মধ্যে তাঁকে সমগ্রভাবে আবিষ্কার করাও এক উদ্দেশ্য; আবার সর্বশেষ উদ্দেশ্য হল কোন বিশ্বাতীত সনাতনের স্ফুরত্তার সমগ্র আবিষ্কার; কারণ এর অবতরণবলেই এই জগৎ ও আত্মা এমন শক্তিমান হবে যে তারা তাদের ছদ্ম আবরণ বিদীর্ণ করে দিব্য হয়ে উঠবে আত্মপ্রকাশরূপে ও অভিব্যক্তিশীল ধারায়, যেমন তারা এখন আছে গূঢ়ভাবে তাদের প্রচ্ছন্ন স্বরূপে।

পূর্ণযোগের এই উদ্দেশ্যকে সমগ্রভাবে স্বীকার করা পূর্ণযোগের সাধকদের অবশ্য কর্তব্য; কিন্তু সিদ্ধির পথে যে বিশাল সব অন্তরায় আছে তা না জেনে যেন এই উদ্দেশ্য স্বীকার করা না হয়; অপরপক্ষে জাগতিক জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য যে এর মধ্যে ভগবানের আবিষ্কার এবং তা-ই যে আমাদের অবশ্য কর্তব্য তা স্বীকার করা দূরের কথা, তা যে সম্ভব এ কথাও যে অন্য অনেক সাধনপন্থা অস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল তার কারণ সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত হওয়া সাধকের অবশ্য কর্তব্য। কারণ এই জীবনের কর্মের মধ্যেই এই পার্থিব প্রকৃতিতে আছে এই বাধার মর্মস্থল যার জন্য দর্শন পালিয়েছে বিবিক্ততার চরমে আর এমনকি ধর্মেরও উৎসুক দৃষ্টি মরদেহে জন্মের ব্যাধি থেকে সরে নিবদ্ধ হয়েছে দূরস্থ স্বর্গে বা নির্বাণের নীরব শান্তিতে। আমাদের বিভিন্ন মর্ত্য ন্যূনতা ও অবিদ্যার সব প্রচ্ছন্ন গর্ত সত্ত্বেও শুদ্ধ জ্ঞানের পথ সাধকের চলার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সরল ও সহজ; শুদ্ধ ভক্তির পথে নানা বাধাবিপত্তি, দুঃখযন্ত্রণা ও পরীক্ষা থাকলেও এটিও অন্যের সঙ্গে তুলনায় উন্মুক্ত নীলাকাশে বিহঙ্গমের উড্ডয়নের মতো সহজ হতে পারে। কারণ জ্ঞান ও প্রেম স্বরূপতঃ বিশুদ্ধ তবে তারা মিশ্রিত, ব্যাহত, দূষিত ও অবনমিত হয়ে ওঠে কেবল তখনই যখন তারা এসে পড়ে প্রাণশক্তির সন্দেহজনক সব

গতিবৃত্তির মধ্যে আর এসব তাদের অধিকার করে বাহ্যজীবনের সব অশুদ্ধ গতিবৃত্তি ও সুদৃঢ় নিকৃষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। এই সকল শক্তির মধ্যে একমাত্র প্রাণ অথবা অন্ততঃপক্ষে কোন প্রবল প্রাণসঙ্কল্প হচ্ছে আপাতদৃষ্টিতে এমন কিছু যা স্বরূপতঃ অশুদ্ধ, অভিশপ্ত বা অধঃপতিত। দিব্যশক্তিগুলিও এর সংস্পর্শে এসে তার মলিন কোষে ঢাকা পড়ে অথবা তার চকচকে জলাভূমিতে আবদ্ধ হয়ে সাধারণ ও কর্দমাক্ত হয়ে ওঠে, আর নিম্নে আকৃষ্ট হয়ে বিকৃত এবং দানব ও অসুরের কবলিত হওয়ার দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি থেকে কদাচ নিস্তার পায়। এর মূলে আছে এক তামস ও নিস্তেজ নিশ্চেষ্টতার তত্ত্ব; দেহ ও তার প্রয়োজন ও কামনা সবকিছুকে বেঁধে রাখে এক তুচ্ছ মনের কাছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামনা ও ভাবাবেগের এবং নগণ্য অসার সব প্রবৃত্তি, প্রয়োজন, উদ্বেগ, বৃত্তি, দুঃখ, সুখের অকিঞ্চিৎকর পুনরাবৃত্তির কাছে; এইসব নিজেদের ছাড়িয়ে অন্য কোথাও নিয়ে যায় না, আর তাদের উপর এমন অবিদ্যার ছাপ আছে যা নিজের উৎপত্তির কারণ বা গতিবিধির লক্ষ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ। এই নিশ্চেষ্টতাপূর্ণ শারীর মন তার সব ক্ষুদ্র পার্থিব দেবতা ছাড়া অন্য কোন দিব্যশক্তিতে বিশ্বাস করে না; হয়ত আরো বেশী আরাম, শৃঙ্খলা ও সুখের দিকে তার আস্পৃহা আছে, কিন্তু কোন উন্নতি বা আধ্যাত্মিক মুক্তি সে চায় না। আমরা কেন্দ্রস্থলে দেখা পাই প্রাণের এক আরো বলশালী সঙ্কল্প, এর ভোগের প্রবৃত্তি আরো বেশী প্রবল কিন্তু এ হল এক বিবেচনাহীন দেবতা, এক বিকৃত.শক্তি, এর উল্লাস সেইসব জিনিসে যা জীবনকে করে তোলে দ্বন্দ্বময় বিশৃঙ্খলা ও দুঃখজনক জটিল অবস্থা। এ হল মানবীয় বা দানবীয় কামনার পুরুষ যা আঁকড়ে থাকে ভালো ও মন্দ, সুখ ও দুঃখ, আলো ও আঁধার, মত্ত হর্ষ ও তিক্ত যন্ত্রণামিশ্রিত প্রবাহের জমকালো রঙ, বিশৃঙ্খল কাব্য, প্রচণ্ড বিয়োগান্ত বা উত্তেজনাপূর্ণ মিলনসূচক নাটক। এইসব জিনিসই এর প্রিয়, আরো বেশী করে সে এইসব পেতে চায় আর এমনকি কষ্ট পেয়ে এসবের বিরুদ্ধে প্রবল অভিযোগ করেও সে অন্য কিছু নিতে পারে না বা আনন্দ পায় না; আরো উচ্চস্তরের সব জিনিসকে সে ঘৃণা করে, তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, আর যদি কোন দিব্যতর শক্তি ধৃষ্টতাবশতঃ জীবনকে শুদ্ধ, প্রদীপ্ত ও সুখময় করতে এগিয়ে আসে আর তার মুখ থেকে উত্তেজক পদার্থে মিশ্রিত অগ্নিময় সুরা কেড়ে নিতে চায় — সে ক্রোধোন্মত্ত হয়ে চাইবে তাকে পদদলিত, বিদীর্ণ বা ক্রুশবিদ্ধ করতে। আর এক প্রাণসঙ্কল্প আছে যা উন্নতিকামী আদর্শগত মনকে অনুসরণ করতে প্রস্তুত; এবং এই মন জীবনের মধ্য থেকে কিছু সুষমা, সৌন্দর্য, আলো, মহত্তর শৃঙ্খলা বার করতে চাইলে সে প্রলুব্ধ হয়; কিন্তু সে প্রাণিক প্রকৃতির এক আরো ক্ষুদ্র অংশ আর তার আরো প্রচণ্ড বা আরো তমসাচ্ছন্ন ও মলিন জোয়ালসঙ্গীরা তাকে সহজেই অভিভূত করতে সক্ষম; তাছাড়া মনের ঊর্ধ্বের কোন ডাকে সে সহজে কাজ করতে চায় না যদি না সেই ডাক নিজেকে ব্যর্থ করে — যেমন ধর্ম সাধারণতঃ করে — তার দাবীকে আমাদের তমসাচ্ছন্ন প্রাণিক প্রকৃতির আরো বোধগম্য অবস্থায় নামিয়ে এনে। এই সব শক্তির উপস্থিতি অধ্যাত্ম সাধক নিজের মধ্যে ক্রমে অবগত হয়, তাদের সে দেখে তার চারিদিকে এবং তাদের মুষ্টিবন্ধন থেকে মুক্তি

পাবার জন্য ও তারা তার নিজের সত্তার উপর ও চারিদিককার মানবজীবনের উপর যে দীর্ঘকালব্যাপী সুরক্ষিত প্রভুত্ব খাটিয়ে এসেছে তা উৎখাত করার জন্য তাকে নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা ও সংগ্রাম করতে হয়। এ হল অতি দুরূহ সাধন, কারণ তাদের অধিকার এত শক্তিশালী, আপাতদৃষ্টিতে এত অজেয় যে অবজ্ঞাসূচক প্রবচনে মানব প্রকৃতিকে কুকুরের লেজের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তা যথার্থ বলেই প্রতিপন্ন হয় — কারণ, নীতি, ধর্ম, যুক্তি অথবা অন্য কোন মুক্তিসূচক চেষ্টার দ্বারা তাকে যতই সোজা করা যাক না কেন তা আবার ফিরে আসে তার প্রকৃতিগত বক্র কুণ্ডলীতে। যে প্রাণসঙ্কল্প আরো বেশী মাত্রায় বিক্ষুব্ধ তার শক্তি, তার বদ্ধমুষ্টি এত প্রবল, তার মত্ত বেগ ও প্রমাদের বিপদ এত বিশাল, স্বর্গের দ্বার পর্যন্ত এত দুর্দম তার আক্রমণের প্রচণ্ডতা বা তার বাধাবিঘ্নের ক্লান্তিকর প্রতিরোধ এত সূক্ষ্মভাবে সনির্বন্ধ বা অক্লান্তভাবে অন্তর্ভেদী, যে এমনকি সাধু ও যোগীও তার চক্রান্ত ও দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে নিজেদের মুক্ত বিশুদ্ধতা বা অনুশীলিত আত্মকর্তৃত্বের ক্ষমতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারে না। সাধকের সংগ্রামরত সঙ্কল্পের নিকট মনে হয় যে এই স্বাভাবিক বক্রতা দূর করার সকল পরিশ্রমই নিরর্থক; পলায়ন, সুখময় স্বর্গলোকে প্রয়াণ বা শান্তিময় লয় প্রাপ্তি — এদেরই কদর সহজে বাড়ে একমাত্র বুদ্ধিমানের কাজ হিসেবে; এবং পার্থিব জীবনের নিরানন্দ দাসত্ব বা হীন তুচ্ছ প্রলাপ বা অর্থহীন ও অনিশ্চিত সুখ ও সাফল্যের একমাত্র প্রতিবিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় পুনর্জন্ম-নিবৃত্তির উপায় উদ্ভাবন।

তবু একটা প্রতিবিধান থাকা উচিত এবং তা আছেও, এই বিক্ষুব্ধ প্রাণিক প্রকৃতির সংশোধনের উপায় আছে ও রূপান্তরের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এর জন্য উন্মার্গগমনের কারণ সন্ধান ও তার প্রতিকার সাধন করা চাই প্রাণেরই হৃৎমূলে এবং তার নিজেরই তত্ত্বের মধ্যে, কারণ প্রাণ বাস্তব দৃষ্টিতে যতই তমসাচ্ছন্ন বা বিকৃত মনে হ'ক এও ভগবানের শক্তি, কোন দুরাশয় দৈবের বা ঘোর দানবীয় সংবেগের সৃষ্টি নয়। প্রাণের মধ্যেই আছে তার নিজের পুনরুদ্ধারের বীজ, প্রাণশক্তি থেকেই আমাদের পেতে হবে উত্তোলনের শক্তি কারণ যদিও জ্ঞানের মধ্যে মুক্তিপ্রদ আলোক আছে, প্রেমের মধ্যে নিস্তারিণী রূপান্তরকারিণী শক্তি আছে, তবু এইসব এখানে ফলপ্রসূ হতে পারে না যদি না তারা প্রমাদশীল মানুষী প্রাণশক্তিকে দিব্য প্রাণশক্তিতে উর্ধ্বায়নের জন্য প্রাণের সম্মতি পায় ও ব্যবহার করতে পারে প্রাণের কেন্দ্রে কোন মুক্ত শক্তি কার্যসাধনের সহায় হিসেবে। যজ্ঞের সব কর্মকে ভাগ ক'রে জোর করে সমস্যার শেষ করা সম্ভব নয়; যদি আমরা স্থির করি যে আমরা শুধু প্রেম ও জ্ঞানের কর্ম করব, আর সঙ্কল্প ও শক্তি, অধিকার ও প্রাপ্তি, উৎপাদন ও সামর্থ্যের সকল প্রয়োগ, যুদ্ধ, বিজয় ও প্রভুত্ব প্রভৃতির সব কাজ ফেলে রাখি ও যেহেতু এইসব কাজ, কামনা ও অহং-এর উপাদানে তৈরী এবং সেহেতু বৈষম্য, শুধু বিরোধ ও বিশৃঙ্খলার ক্ষেত্র হতে বাধ্য এই মনে ক'রে জীবনের বৃহত্তর অংশকেই বাদ দিই তা হলেও আমরা সমস্যা থেকে নিষ্কৃতি পাব না। এর কারণ এই যে বাস্তব ক্ষেত্রে ঐ বিভাজন সম্ভব নয়; আর যদি আমরা তা চেষ্টা করি তাহলে মূল

উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে কারণ তাতে আমরা জগৎ-সামর্থ্যের সমগ্র ক্রিয়াশক্তি থেকে আলাদা হয়ে পড়ব আর অখণ্ড প্রকৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ নির্বীর্য হবে অথচ এই অংশেই আছে সেই একমাত্র শক্তি যা জগতের যে কোন সৃজনক্ষম উদ্দেশ্যসাধনের প্রয়োজনীয় যন্ত্র। প্রাণশক্তি এক অপরিহার্য মধ্যবর্তী অঙ্গ, এখানে প্রকৃতির মধ্যে এই হল কার্যসাধক উপাদান; যদি মনের সব কাজকে অমূর্ত উজ্জ্বল আন্তর রূপায়ণ হিসেবে না রাখতে হয় তাহলে মনের পক্ষে প্রাণশক্তির মিত্রতা প্রয়োজন; চিৎপুরুষেরও একে দরকার তার অভিব্যক্ত সম্ভাবনাগুলিকে বাহ্যশক্তি ও রূপ দেবার জন্য এবং জড়ের মধ্যে রূপায়িত হয়ে আত্মপ্রকাশকে সম্পূর্ণ করার জন্য। চিৎপুরুষের অন্যান্য ক্রিয়াধারায় যদি প্রাণ তার মধ্যবর্তী শক্তির সাহায্য দিতে অস্বীকার করে বা সাহায্য দিতে চাইলেও তা না নেওয়া হয় তাহলে এই সব কাজের ফল এখানে যতদূর হওয়া সম্ভব তা হওয়ার বদলে তারা স্থাণু হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে অথবা পরিণত হয় স্বর্ণময় অক্ষমতায়; অথবা যদিই বা কিছু করা হয় তা হবে আমাদের যে সব কাজ পরাক্‌বৃত্ত অপেক্ষা বেশী প্রত্যক্‌বৃত্ত তাদের আংশিক বিচ্ছুরণ, তাতে হয়ত জীবন কিছু সংযত হয় কিন্তু জীবনকে রূপান্তর করার শক্তি তার নেই। অথচ যদি প্রাণ তার সব শক্তিকে অশুদ্ধ অবস্থায় পরম চিৎপুরুষের কাছে আনে তা হলে তার ফল আরো খারাপ হতে পারে কারণ সম্ভবতঃ প্রেম বা জ্ঞানের আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকে প্রাণ পরিণত করবে স্তিমিত ও দূষিত গতিবৃত্তিতে অথবা তাদের করবে নিজের হীন বা বিকৃত কুকার্যের সহচর। সৃজনশীল আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সম্পূর্ণতার জন্য প্রাণ অপরিহার্য কিন্তু এই প্রাণ হওয়া চাই বন্ধনমুক্ত, রূপান্তরিত, উন্নীত; এটি সাধারণ মানসিকভাবাপন্ন মানব-পশুর প্রাণ নয়, বা দানবীয় কি আসুরিক প্রাণ নয়, এমনকি দিব্য ও অদিব্য মেশানো প্রাণও নয়। অন্যান্য জগৎ-ত্যাগী বা স্বর্গকামী সাধনপন্থায় যা-ই করা হ'ক না কেন, পূর্ণযোগে এ হল এক দুরূহ কিন্তু অপরিহার্য সাধন; জীবনের সব বহির্মুখী কর্মের সমস্যার সমাধান না ক'রে তার উপায় নেই, এদের মধ্যে তার পাওয়া চাই এদের স্বকীয় দিব্যত্ব এবং এই দিব্যত্বকে তার যুক্ত করা চাই দৃঢ়ভাবে ও চিরদিনের জন্য প্রেম ও জ্ঞানের দিব্যত্বের সঙ্গে।

আবার, যতদিন না প্রেম ও জ্ঞান এত ক্রমোন্নত হয় যে তারা প্রাণশক্তিকে শুদ্ধ করার জন্য তার উপর অপ্রতিহত ও নিরাপদ আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয় ততদিন জীবনের সব কর্মের সঙ্গে কারবার স্থগিত রাখাও সমস্যার কোন সমাধান নয়; কেন না আমরা দেখেছি যে এদের প্রথম ওঠা চাই অমিত উচ্চতায় তবে যদি তারা নিরাপদ হতে পারে প্রাণিক বিকৃতি থেকে যা তাদের মুক্তিপ্রদ শক্তিকে ব্যাহত বা পঙ্গু করে। কিন্তু একবার যদি আমাদের চেতনা অতিমানসিক প্রকৃতির উত্তুঙ্গ শিখরে উঠতে পারত তাহলে নিশ্চয়ই এই সব অসামর্থ্যের অবসান হ'ত। কিন্তু এখানে আমরা এক উভয় সঙ্কটে পড়ি; — একদিকে যেমন অশুদ্ধ প্রাণশক্তির বোঝা কাঁধে নিয়ে অতিমানসিক উচ্চতায় পৌঁছন অসম্ভব, অন্যদিকে তেমন অধ্যাত্ম ও অতিমানসিক স্তরের অভ্রান্ত আলোক ও অজেয় শক্তি না নামিয়ে আনলে প্রাণৈষণারও আমূল সংস্কার সমানই

অসম্ভব। অতিমানসিক চেতনা শুধু জ্ঞান, আনন্দ, অন্তরঙ্গ প্রেম ও একত্ব নয়, অধিকন্তু এ হল সঙ্কল্প, সামর্থ্য ও শক্তির তত্ত্ব, আর এর অবতরণ সম্ভব হয় না যতদিন না এই ব্যক্ত প্রকৃতির মধ্যকার সঙ্কল্প সামর্থ্য ও শক্তির উপাদান তাকে গ্রহণ ও ধারণ করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে বিকশিত ও ঊর্ধ্বায়িত হয়। কিন্তু সঙ্কল্প, সামর্থ্য ও শক্তি প্রাণশক্তিরই স্বকীয় ধাতু আর এই যে প্রাণ শুধু জ্ঞান ও প্রেমের প্রাধান্য স্বীকার করতে রাজী হয় না, এই যে এর তাড়না এমন কিছুর তৃপ্তি সাধনের দিকে যা অত্যধিক অবিবেচক, হঠকারী ও বিপজ্জনক, তার সমর্থনে যুক্তি এই যে এটি আবার ভগবান ও পরব্রহ্মের দিকেও এগিয়ে যাবার সাহস রাখে তার নিজস্ব নির্ভীক ও ব্যগ্র পথে। প্রেম ও প্রজ্ঞাই ভগবানের একমাত্র বিভাব নয়, শক্তিও তার এক বিভাব। যেমন মন হাতড়ায় পরম জ্ঞানের জন্যে, যেমন হৃদয় খুঁজে বেড়ায় পরম প্রেমের জন্য, প্রাণশক্তিও তেমন, — তা সে যতই আনাড়ীর মত বা ভয়ে ভয়ে হোক — ভুল করতে করতে চলে পরম শক্তি ও শক্তিদত্ত আধিপত্যের সন্ধানে। শক্তি স্বভাবতঃই দোষজনক ও অশুভ এই যুক্তিতে একে নেওয়া বা একে পাবার জন্য চেষ্টা করা অনুচিত বলে নৈতিক বা ধার্মিক মন যে এর নিন্দা করে তা ঠিক নয়; অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে এই নিন্দার সমর্থন পাওয়া গেলেও, মূলতঃ এটি এক অন্ধ ও অযৌক্তিক পূর্বধারণা। শক্তির বিকৃতি ও অপব্যবহার যতই হ'ক না কেন — আর প্রেম ও জ্ঞানেরও তো বিকৃতি ও অপব্যবহার আছে — শক্তি দিব্যবস্তু, তাকে এখানে রাখা হয়েছে দিব্য ব্যবহারের জন্য। শক্তি, সঙ্কল্প, সামর্থ্য — এ-ই সব জগৎ চালায়, আর তা জ্ঞানশক্তি বা প্রেমশক্তি বা প্রাণশক্তি বা ক্রিয়াশক্তি বা দেহশক্তি হ'ক সে সর্বদাই মূলতঃ আধ্যাত্মিক ও স্বভাবতঃ দিব্য। অবিদ্যার মধ্যে পশু, মানব বা অসুর এর যে ব্যবহার করে তা-ই বর্জন করা চাই, আর তার বদলে আনা চাই এমন এক মহত্তর স্বাভাবিক ক্রিয়া — আমাদের কাছে তা অতিসাধারণ হলেও — যা পরিচালিত হয় অনন্ত ও সনাতনের সঙ্গে একসুরে বাঁধা অন্তর চেতনার দ্বারা। পূর্ণযোগ প্রাণের সব কর্ম বর্জন করে শুধু আন্তরবৃত্ত অনুভূতিতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারে না; তাকে আন্তরবৃত্ত হতে হয় বাইরে পরিবর্তন করার জন্য আর এই পরিবর্তনের উপায় হল প্রাণশক্তিকে সেই যোগশক্তির অংশ ও কর্মপ্রণালী করা যার যোগাযোগ আছে ভগবানের সঙ্গে এবং দেশনাতে যা দিব্য।

প্রাণের সব কর্মকে আধ্যাত্মিকভাবে ব্যবহারের পথে এই যে সব বাধাবিপত্তি তার কারণ — প্রাণৈষণা অবিদ্যার মধ্যে তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একরকম মিথ্যা কামপুরুষ সৃষ্টি করেছে, আর তাকে বসিয়েছে সেই দিব্য স্ফুলিঙ্গের জায়গায় যা আসল চৈত্যসত্তা। এই কামনার পুরুষ দ্বারাই বর্তমানে আমাদের জীবনের সমস্ত বা অধিকাংশ কর্ম প্রবর্তিত বা দূষিত হয় বা তা মনে হয়; এমনকি যে সব কাজ নৈতিক বা ধর্মীয়, এমনকি যেগুলি পরার্থপরতা, মানবপ্রীতি, আত্মোৎসর্গ বা আত্মত্যাগের ছদ্মবেশ ধারণ করে, তাদের মধ্যেও এর তৈরী সব সূতোর ঘন বুনন আছে। এই কামপুরুষ হল অহং-এর এক বিভক্ত অন্তঃপুরুষ আর পৃথক আত্মপ্রতিষ্ঠার দিকেই এর সহজাত সব প্রবৃত্তির ঝোঁক। হয় খোলাখুলি, নয় অল্পবিস্তর চকচকে মুখোশের আড়ালে সে সর্বদা তাড়না করে

নিজের বৃদ্ধির জন্য, অধিকার ও ভোগের জন্য, বিজয় ও সাম্রাজ্যের জন্য। যদি প্রাণ থেকে অশান্তি ও বৈষম্য ও বিকৃতির অভিশাপ তুলতে হয় তাহলে প্রকৃত অন্তঃপুরুষ, চৈত্যপুরুষকে বরণ করা চাই তার নেতৃত্ব পদে আর চাই কামনা ও অহং-এর এই মিথ্যা অন্তঃপুরুষের সম্পূর্ণ বিলোপ। কিন্তু তার এই অর্থ নয় যে স্বয়ং প্রাণকেই নিগৃহীত করতে হবে ও সার্থকতা সাধনের জন্য তার স্বাভাবিক ধারায় তাকে চলতে দেওয়া হবে না; কারণ এই বাহ্য কামপুরুষের পশ্চাতে আমাদের মধ্যে আছে এক আন্তর ও সত্যকার প্রাণময় পুরুষ যাকে ধ্বংস না করে বরং তাকে সুপ্রকাশিত ক'রে মুক্ত করতে হবে তার আসল কর্মধারায় দিব্যপ্রকৃতির শক্তি হিসেবে। আমাদের অন্তঃস্থ প্রকৃত অন্তরতম পুরুষের অধীনে এই সত্যকার প্রাণময় পুরুষের সুপ্রকাশ হলেই প্রাণশক্তির উদ্দেশ্য সমূহের দিব্য সার্থকতা সম্ভব। এমনকি এই সব উদ্দেশ্য মুলতঃ একই থাকবে কিন্তু সে সব রূপান্তরিত হবে তাদের আন্তর প্রবর্তক শক্তিতে ও বাহ্য লক্ষণে। দিব্য প্রাণসামর্থ্যও হবে বৃদ্ধির সঙ্কল্প, আত্মপ্রতিষ্ঠার শক্তি কিন্তু তা হবে আমাদের মধ্যে ভগবানের প্রতিষ্ঠা, উপরভাসা ক্ষুদ্র সাময়িক ব্যক্তিসত্তার প্রতিষ্ঠা নয় — বৃদ্ধি হবে সত্যকার দিব্য ব্যষ্টি পুরুষে, কেন্দ্রীয় সত্তায়, গূঢ় অবিনশ্বর ব্যক্তিতে যার আবির্ভাবের একমাত্র উপায় হল অহং-এর অবনমন ও তিরোভাব। এই হল প্রাণের প্রকৃত উদ্দেশ্য — বৃদ্ধি, কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে চিৎপুরুষের শ্রীবৃদ্ধি, মনে, প্রাণে ও দেহে নিজের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশসাধন; অধিকার, কিন্তু এই অধিকার সর্ব বিষয়ে ভগবানের দ্বারা ভগবানের অধিকার, অহং-এর কামনা দ্বারা বিষয়কে তার নিজের জন্য অধিকার নয়; ভোগ, কিন্তু এ ভোগ বিশ্বের মধ্যে দিব্য আনন্দের ভোগ; সংগ্রাম, বিজয় ও সাম্রাজ্য, কিন্তু এ হল তমসার বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে বিজয়ী সংঘর্ষ, সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক আত্মশাসন ও আন্তর ও বাহ্য প্রকৃতির উপর প্রভুত্বজ্ঞান, প্রেম ও দিব্য সঙ্কল্পের দ্বারা অবিদ্যার রাজ্য জয়।

প্রাণের সব কর্মের দিব্য সম্পাদনের এবং ত্রিবিধ যজ্ঞের তৃতীয় অঙ্গস্বরূপ তাদের উত্তরোত্তর রূপান্তর সাধনের বিধান এইসব এবং এইসব তাদের লক্ষ্যও হওয়া চাই। যোগের উদ্দেশ্য জীবনকে যুক্তি বিচার দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা নয়, অতিমানসিক ভাবাপন্ন করা, তাকে নীতিগত করা নয়, আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন করা। এর মুখ্য উদ্দেশ্য যে বাহ্য বিষয় বা উপরভাসা সব মনস্তাত্ত্বিক প্রবর্তক শক্তি নিয়ে কাজ করা তা নয় বরং জীবন ও তার ক্রিয়াকে তাদের গোপন দিব্য উপাদানের উপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা; কারণ একমাত্র জীবনের ঐরকম পুনঃপ্রতিষ্ঠার দ্বারাই সম্ভব হয় এর উপর আমাদের ঊর্ধ্বস্থ নিগূঢ় দিব্য শক্তির প্রত্যক্ষ শাসন এবং এর রূপান্তর পরম দেবতার ব্যক্ত বহিঃপ্রকাশে, — এখনকার মতো সনাতন অভিনেতার ছদ্মবেশে ও বিকৃতিকারী মুখোশে নয়। প্রাণ এখন যা আছে তা থেকে তাকে অন্য কিছু করতে এবং তার বর্তমান দুর্দশাগ্রস্ত ও অবোধ্য মূর্তি থেকে তাকে উদ্ধার করতে যা সমর্থ তা একমাত্র চেতনার আধ্যাত্মিক মৌলিক পরিবর্তন, — মন ও যুক্তিবুদ্ধির যে পদ্ধতি উপর উপর নাড়াচাড়া করে তা নয়।

তাহলে, যে উপায়ে পূর্ণযোগ জীবনকে প্রকৃতির উদ্বেগপূর্ণ ও অবিদ্যাচ্ছন্ন গতিবৃত্তি থেকে প্রদীপ্ত ও সুসমঞ্জস গতিবৃত্তিতে পরিবর্তিত করতে চায় তা তার প্রকাশের বাহ্য কুশল নাড়াচাড়া নয়, তা তার তত্ত্বমূলক রূপান্তরসাধন। এই কেন্দ্রীয় আন্তর বিপ্লব সাধন ও নবরূপ গঠনের জন্য তিনটি সর্ত পালন অপরিহার্য; এদের কোনটিই একাকী এ কার্য সাধনে সক্ষম নয়, তবে তাদের ত্রিবিধ যুক্ত শক্তিতে এই উন্নয়ন সম্ভব, আর সম্ভব তাদের রূপান্তর সাধন ও তা সম্পূর্ণভাবেই। কারণ প্রথমতঃ জীবন এখন যা তা কামনার গতিবৃত্তি, আর আমাদের মধ্যে সে তার কেন্দ্রস্বরূপ যে কামপুরুষ গঠন করেছে তা জীবনের সকল গতিকেই নিজের বলে বিবেচনা করে তাতে আরোপ করে তার নিজেরই রঙ ও যন্ত্রণা যা অবিদ্যাচ্ছন্ন, অর্ধ-আলোকিত, ব্যাহত চেষ্টার অন্তর্ভুক্ত; দিব্য জীবনযাত্রার জন্য কামনার উচ্ছেদ অবশ্য কর্তব্য, আর তার স্থলে আনা চাই শুদ্ধতর, প্রবর্তক শক্তি, দরকার কামনার সন্তপ্ত পুরুষের বিলোপ আর তার স্থলে বর্তমানে আমাদের মধ্যে যে সত্যকার প্রাণময় পুরুষ প্রচ্ছন্ন আছে তার স্থিরতা, ক্ষমতা ও সুখের আবির্ভাব। দ্বিতীয়তঃ এখন এই জীবনকে চালায় বা টেনে নিয়ে যায় কিছুটা প্রাণশক্তির সংবেগ আর কিছুটা মন যা প্রধানতঃ অজ্ঞানময় প্রাণসংবেগের দাস ও কুকার্যের সহায়ক, কিন্তু যা কিছু পরিমাণে আবার এর দিশারী ও উপদেষ্টা কিন্তু এমন দিশারী ও উপদেষ্টা যা নিজেই উদ্বেগপূর্ণ ও যথেষ্ট দীপ্ত ও উপযুক্ত নয়। দিব্যজীবনের পক্ষে মন ও প্রাণ-সংবেগ হবে শুধু যন্ত্র, এ ছাড়া অন্য কিছু হওয়া তাদের আর চলবে না আর তাদের স্থলে অধিষ্ঠিত হওয়া চাই অন্তরতম চৈত্য পুরুষ, — পথের নেতা হিসেবে, দিব্য দেশনার নির্দেশক হিসেবে। সর্বশেষ, বর্তমান জীবনের লক্ষ্য বিভক্ত অহং-এর তৃপ্তিসাধন; অহং-এর অবসান চাই-ই আর তার স্থলে আনা চাই প্রকৃত অধ্যাত্ম ব্যক্তি, কেন্দ্রীয় সত্তা, আর জীবনকে ফেরাতে হবে এই পার্থিব সৃষ্টিতে ভগবানের সার্থকতা সাধনের দিকে: তার অনুভব করা চাই যে তার মধ্যে এক দিব্যশক্তি জেগে উঠছে আর তাকে হয়ে উঠতে হবে এই শক্তির উদ্দেশ্যসাধনের এক বাধ্য যন্ত্র।

রূপান্তরকারী এই তিনটি আন্তর গতিবৃত্তির মধ্যে প্রথমটিতে এমন কিছু নেই যা প্রাচীন ও পরিচিত নয়; কারণ এ হল বরাবরই অধ্যাত্ম শিক্ষার প্রধান সব উদ্দেশ্যের অন্যতম। গীতায় সুস্পষ্ট ভাষায় যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তাতেও বলা হয়েছে যে অধ্যাত্ম পুরুষের সাধারণ অবস্থা হ'ল ক্রিয়ার প্রবর্তক শক্তি হিসেবে ফলাকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ ত্যাগ, স্বয়ং কামনারই সম্পূর্ণ লোপ ও সম্যক্‌ভাবে পূর্ণ সমত্ব সাধন। কামনা নিবৃত্তির একমাত্র সত্যকার অভ্রান্ত নিদর্শন হল পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক সমত্ব — সর্ববিষয়ে সমচিত্ত হওয়া; সুখ ও দুঃখ, প্রিয় ও অপ্রিয়, সফলতা ও বিফলতা এ সবেই অবিচলিত থাকা; উচ্চ ও নীচ, মিত্র ও অমিত্র, পুণ্যবান ও পাপী সকলকেই সমদৃষ্টিতে দেখা: সর্বভূতে পরম একের বহুবিধ অভিব্যক্তি দেখা, সর্ব বিষয়ে মূর্ত পরম চিৎপুরুষের নানা বিচিত্র লীলা বা তাঁর মন্থর মুখোশপরা ক্রমপ্রকাশ দেখা। যে সমত্বর অবস্থা আমাদের লক্ষ্য তা কোন মানসিক উদ্বেগশূন্যতা, উদাসীনতা, উপেক্ষা নয়, কোন নিশ্চেষ্ট প্রাণিক উপশম

নয়, শারীর চেতনার এমন কোন নিষ্ক্রিয়তা নয় যা কোন গতিবৃত্তিতেই সম্মতি দেয় না বা যে কোন গতিবৃত্তি আসে তাতেই সম্মতি দেয়, যদিও কখন কখন এগুলিকেই এই অধ্যাত্ম অবস্থা বলে ভুল করা হয়; যে সমত্ব আমাদের লক্ষ্য তা প্রকৃতির পশ্চাতে সাক্ষীপুরুষের অবস্থার মতো এক পরিব্যাপ্ত সর্বগ্রাহী অবিচলিত বিশ্বজনীনতা। কেননা এখানে মনে হয় সবকিছুই বিভিন্ন শক্তির এক চঞ্চল অর্ধ-সুশৃঙ্খল, অর্ধ-বিশৃঙ্খল সংগঠন, কিন্তু অনুভব করা যায় যে তার পশ্চাতে তাকে ধারণ করে আছে এক শান্তি, নীরবতা, ব্যাপ্তি যা নিশ্চেষ্ট নয়, তবে স্থির, যা শক্তিহীন নয় বরং সুপ্তভাবে এমন সর্বশক্তিমান, যার মধ্যে আছে বিশ্বের সকল গতি ধারণে সমর্থ এক ঘনীভূত স্থির নিশ্চল ক্রিয়াশক্তি। পিছনের এই উপস্থিতি সর্ব বিষয়ে সমভাবাপন্ন: যে ক্রিয়াশক্তিকে তা ধারণ করে তা যে কোন ক্রিয়ার জন্য মুক্ত করা যেতে পারে, কিন্তু সাক্ষীপুরুষের কোন কামনার দ্বারা সে ক্রিয়ার নির্বাচন হবে না; এমন এক পরম সত্য কাজ করে যা ক্রিয়া বা তার আপাত সব রূপ ও সংবেগের অতীত ও তাদের চেয়ে মহত্তর, মন, প্রাণশক্তি বা দেহের অতীত ও তাদের চেয়ে মহত্তর যদিও এটি তার অব্যবহিত উদ্দেশ্যের জন্য কোন মানসিক, প্রাণিক বা শারীরিক আকার নিতে পারে। যখন এইভাবে কামনার মৃত্যু হয় আর চেতনার মধ্যে সর্বত্র বিরাজ করে এই শান্ত, সম ব্যাপ্তি তখনই আমাদের অন্তঃস্থ সত্যকার প্রাণময় পুরুষ আবরণ থেকে বাইরে আসে আর প্রকাশ করে তার শান্ত, প্রগাঢ় শক্তিমান সান্নিধ্য। কারণ প্রাণময় পুরুষের সত্যকার প্রকৃতিই এইরকম; এ হল প্রাণের মধ্যে দিব্য পুরুষের প্রক্ষেপ — অক্ষুব্ধ, সবল, প্রদীপ্ত, বহুবীর্যধারাসমন্বিত, দিব্য সঙ্কল্পের অনুগত, অহংশূন্য অথচ, বরং সেই জন্যই সকল ক্রিয়া, সম্পাদনা, উচ্চতম বা বৃহত্তম দুষ্কর কর্মে সমর্থ। সত্যকার প্রাণশক্তিও তখন আত্মপ্রকাশ করে, তবে আর এই উদ্বেগপূর্ণ ক্লিষ্ট, বিভক্ত, প্রয়াসী বাহ্য ক্রিয়াশক্তি হিসেবে নয় — পরন্তু এক মহান্ জ্যোতির্ময় দিব্য সামর্থ্যরূপে, যা শান্তি ও বল ও আনন্দে পূর্ণ, প্রাণের বিততপথ দেবদূত যা বিশ্বকে আবৃত করে রেখেছে তার বীর্যবন্ত পক্ষ দিয়ে।

কিন্তু তবু বিশাল বল ও সমত্বে এই রূপান্তরও যথেষ্ট নয়, কারণ এতে দিব্য জীবন সাধনের পথ আমাদের কাছে উন্মুক্ত হলেও, তার প্রশাসন ও প্রবর্তনের কোন ব্যবস্থা এর মধ্যে নেই। এইখানে মুক্ত চৈত্য পুরুষের উপস্থিতি সক্রিয় হয়; সর্বোৎকৃষ্ট প্রশাসন ও পরিচালনা তা দেয় না, — কেননা তা তার কাজ নয় — কিন্তু অবিদ্যা থেকে দিব্য বিদ্যার যাত্রাপথে আন্তর ও বাহ্য জীবন ও ক্রিয়ার জন্য ক্রমশঃ বেশী করে নির্দেশ দেয় তা; প্রতি মুহূর্তে তা দেখিয়ে দেয় কি পদ্ধতিতে, কি পথে, কোন কোন ধাপ বেয়ে এমন সার্থক অধ্যাত্ম অবস্থায় পৌঁছান সম্ভব যেখানে সর্বদা এক স্ফুরন্ত প্রেরণা উপস্থিত থেকে দিব্যভাবাপন্ন প্রাণশক্তির সর্ব কর্ম চালনা করতে থাকবে। এটি যে আলো বিকিরণ করে তাতে প্রকৃতির অন্যান্য সেই সব অংশও আলোকিত হয় যেগুলি নিজেদের বিশৃঙ্খল ও হাতড়ে-বেড়ানো সব শক্তি ছাড়া অন্য কোন আরো উৎকৃষ্ট দেশনার অভাবে অবিদ্যার আবর্তে ঘুরে বেড়ায়; এ মনে আনে ভাবনা ও বোধ সম্বন্ধে এক সহজ অনুভূতি, প্রাণে

জাগায় এমন এক বোধ যাতে অভ্রান্তভাবে জানা যায় কোন্ গতিবৃত্তিগুলি বিপথগামী, বা বিপথে নিতে প্রবণ আর কোন্‌গুলির উৎপত্তি শুভ প্রেরণা থেকে; শান্ত দৈববাণীর মতো কিছু এক ভিতর থেকে দেখিয়ে দেয় আমাদের পদস্খলনের কারণ কি কি, সে সবের আর পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্য সময় মতো সতর্ক করে, আর অভিজ্ঞতা ও বোধি থেকে বার ক'রে আনে আমাদের কর্মের সঠিক চালনা, যথাযথ প্রণালী ও নির্ভুল সংবেগের এমন এক বিধান যা কঠোর নয়, বরং নমনীয়। এমন এক সঙ্কল্পের সৃষ্টি হয় যা জিজ্ঞাসু প্রমাদের ঘূর্ণায়মান ও বিলম্বিত গোলকধাঁধা অপেক্ষা বরং বিকাশমান সত্যের সঙ্গে বেশী সুসঙ্গত। মানস বিচারের বাহ্য প্রখরতা ও প্রাণশক্তির সাগ্রহ ধারণের স্থলে আসতে শুরু করে ভবিষ্য মহত্তর আলোকের দিকে এক দৃঢ় উন্মুখতা, বিষয়সমূহের যথার্থ উপাদান, গতি ও তাৎপর্য সম্বন্ধে অন্তঃপুরুষের সহজ সংস্কার, সূক্ষ্ম নিপুণতা ও অন্তর্দৃষ্টি যা সর্বদা অধ্যাত্ম দৃষ্টি এবং আন্তর সংযোগ, আন্তর দৃষ্টি, এমনকি তাদাত্ম্যবোধ দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞানের ক্রমশঃ বেশী নিকটবর্তী হয়। প্রাণের কর্মগুলি নিজেদের সংশোধন ক'রে নেয়, বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্তি পায় এবং বুদ্ধির দ্বারা আরোপিত কৃত্রিম বা আইন সম্মত শৃঙ্খলা ও কামনার স্বেচ্ছাচারী শাসনের স্থলে আনে অন্তঃপুরুষের আন্তর তীক্ষ্ণদৃষ্টি এবং প্রবেশ করে পরম চিৎপুরুষের গভীর পথে। সর্বোপরি চৈত্যপুরুষ জীবনের উপর আরোপ করে ভগবান ও সনাতনের নিকট অর্ঘ্য হিসেবে তার সকল কর্মের যজ্ঞের বিধান। প্রাণ হয়ে ওঠে প্রাণের অতীত যা তার দিকে আহ্বান; এর ক্ষুদ্রতম কাজও বৃহৎ হয়ে ওঠে অনন্তের বোধে।

যেমন আন্তর সমত্ব বৃদ্ধি পায় আর তার সাথে বৃদ্ধি পায় এই বোধ যে সত্যকার প্রাণময় পুরুষ অপেক্ষা ক'রে আছে তার পালনীয় মহত্তর নির্দেশের জন্য, যেমন আমাদের প্রকৃতির সকল অঙ্গের মধ্যে চৈত্য আহ্বান বৃদ্ধি পায়, তেমন সেই তৎস্বরূপ যাঁর উদ্দেশে এই আহ্বান, নিজেকে প্রকট করতে শুরু করেন, নেমে আসেন জীবন ও তার বিভিন্ন ক্রিয়াশক্তিকে অধিকার করতে ও তাদের পূর্ণ করেন তাঁর সান্নিধ্য ও উদ্দেশ্যের উচ্চতা, অন্তরঙ্গতা ও বৃহত্ত্ব দিয়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে না হলেও, অনেক ক্ষেত্রেই সমত্ব ও প্রকাশ্য চৈত্যিক প্রেরণা বা দেশনা আসবার আগেই তিনি নিজের কিছু ব্যক্ত করেন। বাহ্য অবিদ্যারাশির দ্বারা নিপীড়িত, মুক্তির জন্য ব্যাকুল প্রচ্ছন্ন চৈত্যিক উপাদানের আহ্বান, সাগ্রহ ধ্যান ও জ্ঞানান্বেষণের চাপ, হৃদয়ের আকুতি, তখনো অবিদ্যাচ্ছন্ন হলেও অকপট বেগবান সঙ্কল্প — এই সব ভেঙে দিতে পারে অপরা প্রকৃতি থেকে পরা প্রকৃতিকে আটক রাখা আচ্ছাদন এবং উন্মুক্ত করতে পারে এক প্লাবনদ্বার। দিব্য পরম ব্যক্তির সামান্য কিছু হয়ত প্রকট করতে পারে নিজেকে অথবা অনন্তের মধ্য থেকে কিছু আলোক, শক্তি, আনন্দ, প্রেম। হতে পারে এটি এমন এক ক্ষণিক প্রকাশ, আলোর এক ঝলক বা স্বল্পস্থায়ী প্রভা যা শীঘ্র সরে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে প্রকৃতির তৈরী হওয়ার জন্য; আবার এর পুনরাবৃত্তি, বৃদ্ধি ও দীর্ঘস্থায়ী হওয়াও সম্ভব। ইতিমধ্যে এক দীর্ঘ ও অতিব্যাপক কর্মধারা আরম্ভ হয়েছে, যা কখনো দীপ্ত বা তীব্র, কখনো আবার মন্থর ও অস্পষ্ট। সময়ে সময়ে এক দিব্য শক্তি সামনে এসে চালনা ও বাধ্য করে অথবা

উপদেশ দিয়ে প্রবুদ্ধ করে; অন্য সময় তা পিছনে সরে যায়, মনে হয় যেন সত্তাকে ছেড়ে দিয়েছে তার নিজের সামর্থ্যের উপর। সত্তার মধ্যে যা সব অজ্ঞানময়, তমসাচ্ছন্ন, বিকৃত বা শুধু অপূর্ণ ও অবর সে সবকে সেই শক্তি তুলে ধরে, হয়ত তাদের চরম অবস্থায় নিয়ে আসে আর তাদের উপর কাজ ক'রে তাদের সংশোধিত ও নিস্তেজ করে, দেখায় এ সবের বিষম ফল কি আর তাদের বাধ্য করে এই চাইতে যে তাদের নিবৃত্তি বা রূপান্তর হ'ক বা অসার ও সংশোধনের অযোগ্য বলে প্রকৃতি থেকে তারা বহিষ্কৃত হ'ক। এই কাজের ধারা বরাবর মসৃণ ও সমান হতে পারে না; পর্যায়ক্রমে আসে দিন ও রাত্রি, দীপ্তি ও অন্ধকার, স্থিরতা ও গঠন বা সংগ্রাম ও উৎক্ষেপ, বর্ধিষ্ণু দিব্য চেতনার উপস্থিতি বা অভাব, উত্তুঙ্গ আশা বা অতলস্পর্শী নৈরাশ্য, পরম প্রেমাস্পদের আলিঙ্গন বা তা না পাওয়ার যাতনা, বিরোধী শক্তিসমূহের অভিভূতকারী আক্রমণ, দুর্বার প্রবঞ্চনা, প্রচণ্ড বাধা, শক্তিহারী বিদ্রূপ অথবা বিভিন্ন দেবতার ও ভগবৎ-দূতের সাহায্য, সান্ত্বনা বা সহযোগ। প্রাণসমুদ্রে জোর ক'রে শুরু করা হয় এক বিরাট ও দীর্ঘ আলোড়ন ও মন্থন, যার ফলে প্রবলভাবে বার হয় সুধা ও গরল যতদিন না সব কিছু প্রস্তুত হয়, আর বর্ধিষ্ণু অবতরণ এমন এক সত্তা ও প্রকৃতি পায় যা তাঁর সম্পূর্ণ শাসন ও সর্বব্যাপী উপস্থিতির জন্য উদ্যত ও উপযুক্ত। কিন্তু যদি এর সাথে সমত্ব ও চৈত্য আলোক ও সঙ্কল্পও থাকে তাহলে এই ধারা পরিহার করা না গেলেও তাকে অনেক পরিমাণে লঘু ও সুগম করা যায়; সবচেয়ে দুস্তর বিপদগুলি কেটে যাবে, রূপান্তর সাধনে সকল বাধাবিপত্তি ও পরীক্ষার মধ্যে প্রতি পদক্ষেপে আন্তর শান্তি, সুখ ও প্রত্যয় অবলম্বন হবে, আর প্রকৃতির পূর্ণ সম্মতিপুষ্ট বর্ধিষ্ণু শক্তি দ্রুত বিরোধী শক্তিরাজির সামর্থ্য ক্ষীণ ও অপনীত করবে। বরাবর উপস্থিত থাকবে এক নিশ্চিত দেশনা ও আশ্রয়, কখনো তা থাকে সামনে, কখনো আবরণের আড়ালে, শেষের সামর্থ্য পূর্ব হতেই থাকে সাধনার প্রারম্ভে ও সুদীর্ঘ সব মধ্যবর্তী পর্যায়ে। কেননা সর্বদাই সাধক উপলব্ধি করবে দিব্য দিশারী ও রক্ষকের উপস্থিতি বা পরমা মাতৃশক্তির কর্মধারা; সে জানবে সকল কিছুই করা হয় পরম মঙ্গলের জন্য, তার অগ্রগতি সুনিশ্চিত, বিজয় অনিবার্য। উভয় ক্ষেত্রেই প্রণালী একই ও অপরিহার্য — এটিতে সমগ্র প্রকৃতি, সমগ্র জীবন, আন্তর ও বাহ্য সবই নেওয়া হয় যাতে ঊর্ধ্ব থেকে এক দিব্যতর প্রাণের চাপে এর বিভিন্ন শক্তি ও তাদের গতিবৃত্তিকে প্রকাশ, ব্যবহার ও রূপান্তরসাধন করা হয় যতদিন না এখানকার সব কিছু অধিগত হয় বিভিন্ন মহত্তর অধ্যাত্ম সব শক্তির দ্বারা এবং পরিণত হয় অধ্যাত্ম ক্রিয়ায় ও দিব্য উদ্দেশ্য সাধনের উপায়ে।

এই প্রণালীতে আর গোড়ার দিকেই এটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে নিজেদের সম্বন্ধে, আমাদের বর্তমান সচেতন সত্তা সম্বন্ধে আমরা যা জানি তা প্রচ্ছন্ন সত্তার বিরাট স্তূপের এক প্রতিনিধিস্থানীয় গঠন, এক উপরভাসা কর্মধারা, এক পরিবর্তনশীল বাহ্য পরিণাম। আমাদের যে জীবন দৃষ্টিগোচর তা ও তার বিভিন্ন ক্রিয়া কতকগুলি তাৎপর্যপূর্ণ বহিঃপ্রকাশের বেশী কিছু নয়, কিন্তু যা প্রকাশ করার জন্য এসবের প্রয়াস তা উপরে

থাকে না; এই যে আমাদের প্রকাশ্য সম্মুখস্থ সত্তা যাকে আমরা নিজ বলে মনে করি ও যাকে আমরা উপস্থাপিত করি আমাদের চারিদিককার জগতের কাছে তার চেয়ে অনেক বড় কিছু আমাদের সত্তা। এই সম্মুখস্থ ও বাহ্য সত্তা হচ্ছে মনোবৃত্তি, প্রাণের গতিবৃত্তি ও দৈহিক প্রবৃত্তির বিশৃঙ্খল এক সংমিশ্রণ যাদের বিভিন্ন অঙ্গের অংশের ও যন্ত্রের পূর্ণ বিস্তারিত বিশ্লেষণেও সমগ্র রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। এই রহস্য আমরা জানতে পারি তখনই যখন আমরা যাই পশ্চাতে, নিম্নে, উর্ধ্বে আমাদের সত্তার সব গোপন প্রদেশে। উপরভাসা পরীক্ষা ও নাড়াচাড়া যতই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ও সূক্ষ্মভাবে করা হ'ক না কেন, তাতে আমাদের জীবন ও তার বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও কর্মধারা সম্বন্ধে আমাদের প্রকৃত ধারণা বা সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ শাসন সম্ভব হয় না; বস্তুতঃ যুক্তিশক্তি, নৈতিকতা ও অন্য সব বাহ্য ক্রিয়া মানবজাতির জীবনকে যে সংযত, মুক্ত ও সিদ্ধ করতে অসমর্থ হয়েছে তার কারণ ঐ অক্ষমতা। কারণ আমাদের সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন শারীর চেতনারও নিম্নে এক অবচেতন সত্তা আছে আর এর মধ্যে — যেন ঢাকা দেওয়া আশ্রয়স্বরূপ মাটির মধ্যে — আছে সকল প্রকার প্রচ্ছন্ন বীজ যেগুলি উপরে অঙ্কুরিত হয়, তবে কেমন করে তা আমরা বুঝি না; আর এই সত্তার মধ্যে আমরা অনবরত নতুন বীজ ফেলছি যা আমাদের অতীতকে দীর্ঘায়িত করে ও ভবিষ্যৎকে করবে প্রভাবান্বিত; এই অবচেতন সত্তা অন্ধকারাচ্ছন্ন, তার সব গতিবৃত্তি ক্ষুদ্র, এটি এমন অযৌক্তিক যে এ কোন নিয়ম মানে না, চলে প্রায় খেয়ালখুসি মত অথচ পৃথ্বীজীবনের পক্ষে এর গূঢ় শক্তি বিশাল। আবার আমাদের মন, আমাদের প্রাণ, আমাদের সচেতন শরীরের পশ্চাতে আছে এক বৃহৎ অধিচেতনা — আছে আন্তর মানসিক, আন্তর প্রাণিক, আন্তর সূক্ষ্মতর শারীর ক্ষেত্রসমূহ আর এ সবকে ধরে আছে এক অন্তরতম চৈত্য সত্তা যা বাকী সবের যোগসাধক অন্তঃপুরুষ; আর এইসব গোপন ভূমিতেও থাকে বহুবিধ পূর্বস্থিত ব্যক্তিভাবনার স্তূপ আর এটিই জোগায় আমাদের বিকাশমান বাহ্য জীবনের উপাদান ও বিভিন্ন প্রবর্তক শক্তি ও প্রচোদনা। কেননা এখানে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এক কেন্দ্রীয় ব্যক্তি ছাড়াও এমন অনেক অধস্তন ব্যক্তিসত্ত্ব থাকতে পারে যাদের সৃষ্টির কারণ — কেন্দ্রীয় সত্তার অভিব্যক্তির অতীত ইতিহাস অথবা এই বাইরের জড়ীয় বিশ্বের মধ্যে তার বর্তমান খেলার আশ্রয়স্বরূপ আন্তর ভূমির উপর তার বহিঃপ্রকাশ। আমাদের উপরভাসা জীবনে আমরা আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন, — যোগ আছে শুধু বাহ্য মন ও ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ দ্বারা যা আমাদের অতি নগণ্য অংশই দেয় আমাদের জগতের কাছে অথবা আমাদের জগতের নগণ্য অংশমাত্র দেয় আমাদের কাছে, অথচ এইসব আন্তর প্রদেশে আমাদের ও অস্তিত্বের বাকী সবের মধ্যকার প্রাকার ক্ষীণ ও সহজেই ভেঙে যায়; সেখানে আমরা অনুভব করতে পারি — শুধু তাদের ফল থেকে যে অনুমান করি তা নয়, সরাসরি অনুভব করি — সেইসব গূঢ় জগৎশক্তির, মনোশক্তির, প্রাণশক্তির, সূক্ষ্ম শারীর শক্তির ক্রিয়া যা সব দিয়ে এই বিশ্ব জীবন ও ব্যষ্টি জীবন গঠিত; আর এমনকি এই যে সব জগৎ-শক্তি আমাদের উপর বা আমাদের

চারিদিকে নিজে নিজে এসে পড়ে, তাদের আমরা — অবশ্য যদি আমরা সেইভাবে নিজেদের শিক্ষা দিই — ধরতে পারব এবং উত্তরোত্তর সমর্থ হব আমাদের ও অন্যাদের উপর তাদের ক্রিয়া, তাদের গঠন, তাদের গতিবৃত্তি পর্যন্ত আয়ত্তে আনতে অথবা অন্ততঃপক্ষে জোরালোভাবে তাদের সংযত করতে। আবার এমনকি আমাদের মানুষী মনের উপর তার অতিচেতন আরো মহত্তর প্রদেশ আছে এবং সেখান থেকে গূঢ়ভাবে নেমে আসে এমন সব প্রভাব, শক্তি ও স্পর্শ যা এখানকার বিষয়সমূহের আদি নির্ধারক, আর যদি তাদের নীচে আবাহন ক'রে আনা হ'ত তাদের পূর্ণ মহিমায় তাহলে তারা সম্পূর্ণ বদলে দিতে পারত এই জড়ীয় বিশ্বে জীবনের সমগ্র গঠন ও বিধান। এইসব সুপ্ত অনুভূতি ও জ্ঞানকে দিব্যশক্তি আমাদের কাছে প্রকাশ করে আমাদের উপর সক্রিয় হয়ে যখন আমরা পূর্ণযোগে তার কাছে নিজেদের খুলে ধরি এবং তা এসবকে ব্যবহার করে ও তাদের পরিণামগুলিকে আরো ফুটিয়ে তোলে আমাদের সমগ্র সত্তা ও প্রকৃতির রূপান্তরসাধনের উপায় ও সোপান হিসেবে। তখন থেকে আমাদের জীবন আর উপরকার এক ক্ষুদ্র ঘূর্ণায়মান তরঙ্গ থাকে না, বরং বিশ্বজীবনের সঙ্গে একীভূত না হলেও তা এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে যায়। আমাদের চিৎপুরুষ, আমাদের আত্মা শুধু যে কোন পরিব্যাপ্ত বিশ্বাত্মার সঙ্গে আন্তর তাদাত্ম্যের মধ্যে উঠে যায় তা নয়, সে উঠে বিশ্বাত্মার অতীত কিছুরও সংস্পর্শে আসে, কিন্তু বিশ্বক্রিয়ার কথা অবগত ও তার অধিপতি থাকে।

এইভাবে আমাদের বিভক্ত সত্তার অখণ্ডতা সাধনের দ্বারাই যোগমধ্যস্থ দিব্য শক্তি অগ্রসর হবে তার উদ্দেশ্যের অভিমুখে; কারণ এই অখণ্ডতা সাধনের উপরই নির্ভর করে মুক্তি, সিদ্ধি, কর্তৃত্ব, কেননা উপরিস্থ ক্ষুদ্র তরঙ্গের পক্ষে তার চারদিককার বিরাট জীবনের উপর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ করতে পারা দূরের কথা, সে তার নিজের গতিবৃত্তিই নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম। এই শক্তি, যা হল অনন্ত ও সনাতনের সামর্থ্য, আমাদের মধ্যে নেমে আসে, সক্রিয় হয়ে ভেঙে ফেলে আমাদের বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক রূপায়ণ, প্রতি প্রাচীর চূর্ণ করে ব্যাপ্তি ও মুক্তি আনে, সর্বদা আমাদের দেয় অন্তর্দর্শন, ভাবনা ও উপলব্ধির নবতর ও মহত্তর সব শক্তি এবং প্রাণের নবতর ও মহত্তর সব প্রবর্তকশক্তি, ক্রমশঃ বেশী করে অন্তঃপুরুষ ও তার বিভিন্ন করণকে প্রসারিত ও নবভাবে গঠন করে, প্রতি অপূর্ণতাকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে তাদের দোষ দেখিয়ে বিনাশ করার জন্য, মহত্তর এক সিদ্ধির দিকে উন্মুক্ত করে, অল্প সময়ের মধ্যে বহু জন্ম বা যুগেব কর্ম সাধন করে যাতে আমাদের মধ্যে সর্বদা উদঘাটিত হয় নতুন নতুন জন্ম, নতুন নতুন দৃশ্য। এই শক্তির স্বভাবই হল তার ক্রিয়ার পরিধি বিস্তার করা এবং সেজন্য সে চেতনাকে দেহের মধ্যে আটক অবস্থা থেকে মুক্তি দেয়, সে তখন সমাধি বা সুষুপ্তি বা এমনকি জাগ্রত অবস্থাতেও বাইরে যেতে বা অন্যসব লোকে বা এই ইহলোকেরই অন্যান্য অঞ্চলে প্রবেশ করে সেখানে কাজ করতে অথবা তার অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে আসতে পারে। এটি বাইরে ছড়িয়ে পড়ে, দেহকে মনে করে তার নিজের এক ক্ষুদ্র অংশ

মাত্র এবং যা আগে তাকে ধারণ করতো তাকেই সে ধারণ করতে শুরু করে; বিশ্বচেতনা লাভ করে সে এবং বিশ্বের সঙ্গে সমপরিমাণ হবার জন্য নিজেকে প্রসারিত করে। তখন সে জগতের মধ্যে সক্রিয় সব শক্তিকে অন্তর্মুখীভাবে ও সরাসরি জানতে শুরু করে — শুধু বাহ্য পর্যবেক্ষণ ও সন্নিকর্ষের দ্বারা নয়, তাদের গতিবৃত্তি অনুভব করে, তাদের ব্যাপ্রিয়া পৃথক করে, এবং বৈজ্ঞানিক যেমন জড়শক্তির উপর কাজ করে, এও তেমন ঐসব শক্তির উপর অব্যবহিতভাবে কাজ করতে সমর্থ হয়, আমাদের মন, প্রাণ, দেহের মধ্যে তাদের ক্রিয়া ও ফল গ্রহণ বা বর্জন বা কিছু অদলবদল, পরিবর্তন করতে পারে বা তাদের নতুন আকার দিতে পারে এবং প্রকৃতির পুরনো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপ্রিয়ার স্থলে সৃষ্টি করতে পারে বিভিন্ন নতুন বিশাল সামর্থ্য ও গতিবৃত্তি। আমরা বিশ্বমনের বিভিন্ন শক্তির কর্মপ্রণালীও অনুভব করতে শুরু করি আর জানতে শুরু করি কেমন করে ঐ কর্মপ্রণালী দ্বারা আমাদের সব মননের সৃষ্টি হয়, ভিতর থেকেই আমরা আমাদের সব অনুভূতির সত্য ও মিথ্যা পৃথক করতে, তাদের ক্ষেত্র বিস্তৃত, এবং তাদের তাৎপর্য ব্যাপক ও দীপ্ত করতে, আমাদের নিজেদের মন ও ক্রিয়ার প্রভু হয়ে উঠতে এবং আমাদের চারিদিককার জগতের মধ্যস্থিত মনের গতিবৃত্তি গঠনে সমর্থ ও সক্রিয় হতে শুরু করি। আমরা অনুভব করতে শুরু করি বিভিন্ন বিশ্ব প্রাণশক্তির প্রবাহ ও তরঙ্গায়ন, আর আমাদের সব বেদনা, ভাবাবেগ, ইন্দ্রিয়সংবিৎ, মনোবেগের উৎপত্তি ও বিধানের সন্ধান পেতে; এইসবকে গ্রহণ বা বর্জন করার, নতুন সৃষ্টি করার, প্রাণসামর্থ্যের উচ্চতর স্তরে ওঠার স্বাধীনতা আমাদের থাকে। জড়প্রহেলিকা সূত্রও আমরা বুঝতে শুরু করি; এটির উপর মন, প্রাণ ও চেতনার পারস্পরিক ক্রীড়া অনুসরণ করা এবং তার কারণিক ও পরিণামগত প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর আবিষ্কার করাও শুরু হয়, অবশেষে আমরা জড়ের এই শেষ রহস্যেরও সন্ধান পেতে শুরু করি যে জড় শুধু ক্রিয়াশক্তির এক রূপ নয়, এ হল সংবৃত্ত ও অবরুদ্ধ অথবা অস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত ও সীমাবদ্ধ চেতনারও এক রূপ আর এও দেখতে আরম্ভ করি যে এটির মুক্তি সম্ভব ও পরতর সামর্থ্যের দিকে সাড়া দেওয়ার নমনীয়তাও সম্ভব, আবার এও সম্ভব যে এটি আর পরম চিৎপুরুষের অর্ধেকেরও বেশী নিশ্চেতন বিগ্রহ ও আত্মপ্রকাশ না হয়ে হবে তাঁর সচেতন বিগ্রহ ও আত্মপ্রকাশ। এইসব এবং আরো কিছু ক্রমশঃ বেশী করে সম্ভব হয় যতই আমাদের মধ্যে দিব্যশক্তির কর্মধারা বাড়তে থাকে; আর আমাদের তমসাচ্ছন্ন চেতনার অনেক প্রতিরোধ বা সাড়া দেওয়ার কষ্ট সত্ত্বেও এক অর্ধ-নিশ্চেতন ধাতুর চেতন ধাতুতে প্রগাঢ় রূপান্তরের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক সংগ্রামের এবং এগিয়ে যাওয়া, পিছিয়ে আসা, আবার নতুন করে এগিয়ে যাওয়া এইভাবে চলার মধ্য দিয়ে দিব্যশক্তির কর্মধারা অগ্রসর হয় মহত্তর বিশুদ্ধতায়, সত্যে, উচ্চতায় ও প্রসারে। সবকিছু নির্ভর করে আমাদের মধ্যে চৈত্য জাগরণের উপর, আর দিব্যশক্তির নিকট আমাদের সাড়ার সম্পূর্ণতার উপর ও আমাদের বর্ধিষ্ণু সমর্পণের উপর।

কিন্তু এইসবের দ্বারা সম্ভব শুধু এক আন্তরজীবন গঠন যাতে বাহ্য ক্রিয়ার সম্ভাবনা

আরো বৃহৎ; এ হল এক মধ্যবর্তী সিদ্ধিমাত্র; পূর্ণ রূপান্তরসাধনের একমাত্র পন্থা হল যজ্ঞের উদয়ন তার উত্তুঙ্গ শিখরে আর দিব্য অতিমানসিক বিজ্ঞানের শক্তি, আলোক ও পরমানন্দের সঙ্গে জীবনের উপর তার ক্রিয়া। কারণ যেসব শক্তি বিভক্ত এবং জীবন ও তার সব কর্মের মধ্যে অপূর্ণভাবে নিজেদের প্রকাশ করে, একমাত্র তখনই তারা উন্নীত হয় তাদের আদি ঐক্যে, সামঞ্জস্যে, একমাত্র সত্যে, সঠিক অনপেক্ষতায় ও পরিপূর্ণ তাৎপর্যে। সেখানে জ্ঞান ও সঙ্কল্প এক, প্রেম ও শক্তি একটিমাত্র গতিবৃত্তি; যেসব দ্বন্দ্ব এখানে আমাদের পীড়া দেয় সেসব পর্যবসিত হয় তাদের সমন্বিত ঐক্যে; শুভের মধ্য থেকে বিকশিত হয় তার পরম শিব, আর অশুভ নিজেকে তার প্রমাদ থেকে মুক্ত করে ফিরে যায় তার শুভে যা পিছনে ছিল; পাপ ও পুণ্য তিরোহিত হয় এক দিব্য পবিত্রতা ও অভ্রান্ত সত্য-ক্রিয়ার মধ্যে; সুখের অনিশ্চিত ক্ষণিকতা মিলিয়ে যায় এমন এক পরমানন্দের মাঝে যা শাশ্বত ও সুখময় আধ্যাত্মিক নিশ্চয়তার লীলা, আর দুঃখ বিনষ্ট হয়ে আবিষ্কার করে এমন আনন্দের স্পর্শ যা বিপথগামী হয়েছিল কোন তমসাচ্ছন্ন বিকৃতির ও তা নিতে অচিতির সঙ্কল্পের অসামর্থ্যের দ্বারা। এই যে সব জিনিস মনের কাছে কল্পনা বা রহস্য সেসব সুস্পষ্ট ও অনুভূতির যোগ্য হয়ে ওঠে যখন চেতনা উঠে যায় সীমাবদ্ধ দেহধারী জড়-মনের বাইরে অতিবুদ্ধির ঊর্ধ্বস্থিত উচ্চতর ও আরো উচ্চতর স্তরের স্বাতন্ত্র্য ও পরিপূর্ণতার মধ্যে; কিন্তু তারা পুরোপুরি সত্য ও স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে কেবল তখনই যখন অতিমানসিক হয়ে ওঠে প্রকৃতির বিধান।

সুতরাং যদি এই উদয়ন সিদ্ধ করা যায় ও এইসব উচ্চতম স্তর থেকে পূর্ণ স্ফুরত্তার অবতরণ সম্ভব হয় পৃথ্বী চেতনার মাঝে, তবেই বোঝা যায় প্রাণ, এর মুক্তি, রূপান্তরিত পার্থিব প্রকৃতির মধ্যে দিব্য প্রাণে এর রূপান্তর — এসবের অর্থ ও সার্থকতা।

যে পূর্ণ যোগ সম্বন্ধে এইরকম আমাদের ভাবনা বা যা সাধনের বিভিন্ন সর্ত এইসব, যা অগ্রসর হয় এইসব আধ্যাত্মিক উপায়ে এবং প্রকৃতির পূর্ণ রূপান্তরকেই ভিত্তি করে যার আবর্তন তার প্রকৃতি থেকেই জীবনের সাধারণ কাজকর্ম ও যোগে তাদের স্থান সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর স্বতঃই পাওয়া যায়।

তপস্বী বা ধ্যানী বা রহস্য সাধকের মত জীবন ও কর্মের সম্পূর্ণ পরিত্যাগ, অভিনিবিষ্ট ধ্যান ও নিষ্ক্রিয়তার শিক্ষা, প্রাণশক্তি ও তার ক্রিয়াধারার উচ্ছেদ বা নিন্দাবাদ, পৃথ্বী প্রকৃতিতে অভিব্যক্তি বর্জন — এ সবের স্থান নেই, থাকতেও পারে না। অবশ্য যতদিন না কোন বিশেষ আন্তর পরিবর্তন সাধিত হয় বা এমন কিছু পাওয়া যায় যার অভাবে জীবনের উপর আরো বেশী ফলপ্রসূ ক্রিয়া দুরূহ বা অসম্ভব হয়ে উঠেছে ততদিন সাধকের পক্ষে যে কোন সময় নিজের মধ্যে সরে গিয়ে তার আন্তর সত্তায় মগ্ন থাকা ও অবিদ্যার জীবনের কোলাহল ও উপদ্রব তার কাছে আসা বন্ধ করা প্রয়োজন

হতে পারে। কিন্তু এটি হতে পারে শুধু এক পর্ব বা আনুষঙ্গিক ঘটনা, সাময়িক প্রয়োজন বা প্রস্তুতিসূচক অধ্যাত্ম কৌশল; এ তার যোগের বিধি বা তত্ত্ব হতে পারে না।

ধর্ম বা নীতির ভিত্তিতে বা একসাথে উভয়েরই ভিত্তিতে মনুষ্যজীবনের কাজকর্মকে ভাগ করা, এসবকে শুধু পূজার কাজে বা মানবপ্রীতি ও পরোপকারের কাজে নিবদ্ধ রাখা পূর্ণ যোগের আন্তরভাবের বিরুদ্ধ। শুধু মানসিক কোন বিধি বা শুধু মানসিক স্বীকৃতি বা প্রত্যাখ্যান এই সাধনার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির পরিপন্থী। সবকিছুকে নেওয়া চাই আধ্যাত্মিক শিখরে, প্রতিষ্ঠিত করা চাই আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর, সমগ্র জীবনের উপর, কেবলমাত্র জীবনের এক অংশের উপর নয়, জোর করে আনা চাই এক আন্তর অধ্যাত্ম পরিবর্তন ও বাহ্য রূপান্তরের উপস্থিতি। যা সব এই পরিবর্তনের সহায়ক বা তাকে স্বীকার করে নেয় সে সবের গ্রহণ আর যা কিছু অক্ষম বা অনুপযুক্ত বা এই রূপান্তরকারী গতিবৃত্তির প্রভাবে আসতে অস্বীকার করে সেসবের বর্জন অবশ্য কর্তব্য। বিষয় বা জীবনের কোন রূপে, কোন বস্তুতে, কোন কাজকর্মে কোনরকম আসক্তি থাকা চলবে না; যদি প্রয়োজন হয় সকল কিছু ত্যাগ করতে হবে, আবার ভগবান দিব্য জীবনের জন্য উপাদান হিসেবে যা সব নির্বাচন করেন সে সবকে স্বীকার করতে হবে। কিন্তু যা গ্রহণ বা বর্জন করে তা কখনই মন বা কামনার প্রকাশ্য বা ছদ্মবেশী প্রাণিকসঙ্কল্প বা নৈতিকবোধ হবে না, তা হওয়া চাই চৈত্যপুরুষের নির্বন্ধ, যোগের দিব্য দিশারীর আদেশ, পরতর আত্মা বা চিৎপুরুষের দর্শন; ঈশ্বরের দীপ্ত দেশনা। চিৎপুরুষের পথ কোন মানসিক পথ নয়: কোন মানসিক বিধি বা মানসিক চেতনা এর নির্ধারক বা নেতা হতে পারে না।

সমভাবে, আধ্যাত্মিক ও মানসিক বা আধ্যাত্মিক ও প্রাণিক এই দুইরকম চেতনার সম্মিলন বা আপোষরফা, জীবনকে বাইরে অপরিবর্তিত রেখে ভিতর থেকে শুধু তার উর্ধ্বায়ন, — যোগের বিধান বা লক্ষ্য হতে পারে না। সমগ্র জীবনকেই নেওয়া চাই কিন্তু সমগ্র জীবনের রূপান্তরও চাই; সকল কিছুরই হয়ে ওঠা চাই অতিমানসিক প্রকৃতির মধ্যে অধ্যাত্মপুরুষের এক অংশ, এক রূপ, এক পর্যাপ্ত বহিঃপ্রকাশ। জড়জগতে আধ্যাত্মিক বিবর্তনের এই হল শিখর ও সার্থক অভিযান; যেমন প্রাণময় পশু থেকে মনোময় মানুষে পরিবর্তন প্রাণকে মৌলিক চেতনা, প্রসার ও তাৎপর্যে একেবারে অন্য জিনিস করেছিল, তেমন জড়ভাবাপন্ন মনোময় পুরুষের অধ্যাত্ম ও অতিমানসিক পুরুষে পরিবর্তন জড়কে ব্যবহার করে কিন্তু তার প্রভাবাধীন না হয়ে, প্রাণকে নিয়ে তাকে এমন এক জিনিস করবে যা এই দোষত্রুটিভরা অপূর্ণ সীমাবদ্ধ প্রাণ থেকে একেবারে অন্যরূপ, তার মৌলিক চেতনা, প্রসার ও তাৎপর্যে সম্পূর্ণ আলাদা। প্রাণের যে সমস্ত রূপ এই পরিবর্তন সহ্য করতে অক্ষম তাদের বিদায় নিতে হবে, আর যাসব সহ্য করতে পারবে তারা টিকে গিয়ে প্রবেশ করবে পরম চিৎপুরুষের রাজ্যে। এক দিব্যশক্তি কর্মরতা, তিনি প্রতিমুহূর্তে নির্বাচন করবেন কি কর্তব্য বা কি কর্তব্য নয়, কি সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে নিতে হবে আর কি সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে ত্যাগ করতে হবে। কারণ যদি আমরা এই শক্তির স্থানে আমাদের কামনা বা অহং-কে না বসাই — আর তা না করার জন্য অন্তঃপুরুষকে

সর্বদা জাগ্রত, সর্বদা সতর্ক ও দিব্য দেশনা সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে আর আমাদের ভিতর বা বাইরে থেকে আসা অদিব্য ভুল পরিচালনাকে বাধা দিতে হবে — তাহলে সেই শক্তি পর্যাপ্ত ও একাই সক্ষম আর তিনি আমাদের নিয়ে যাবেন সার্থকতায় এমন সব পথ দিয়ে, এমন সব উপায়ে যা এত বৃহৎ, এত আন্তরবৃত্ত, এত জটিল যে মনের পক্ষে সে সম্বন্ধে কিছু আদেশ দেওয়া দূরের কথা, তা বোঝাই তার পক্ষে অসম্ভব। এই পথ শ্রমসাধ্য ও দুরূহ ও বিপদসঙ্কুল কিন্তু "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" — আর কোন পথ নেই।

দুটি বিধি আছে যাতে দুরূহতা কমে ও বিপদ দূরীভূত হয়। অহং থেকে, প্রাণিক কামনা থেকে, হামবড়া যুক্তিবুদ্ধির অক্ষমতা থেকে যা আসে তা বর্জন করা চাই এবং অবিদ্যার এই সকল প্রতিনিধির সহায়ক যাসব সেই সবও বর্জন করা চাই। সাধককে শিখতে হবে অন্তরতম পুরুষের বাণী, গুরুর নির্দেশ, ঈশ্বরের আদেশ, ভগবতী মাতার কর্মপ্রণালী শুনতে ও অনুসরণ করতে। দেহের কামনা ও দুর্বলতা, বিক্ষুব্ধ অবিদ্যাচ্ছন্ন প্রাণের লালসা ও উচ্চণ্ড বেগ, মহত্তর জ্ঞানের দ্বারা নিঃস্তব্ধ ও দীপ্ত হয়নি এমন ব্যক্তিগত মনের নির্দেশ — এইসব যে আঁকড়ে থাকে সে প্রকৃত আন্তর বিধানের সন্ধান পেতে পারে না, সে দিব্য সার্থকতার পথে স্তূপীকৃত করে বাধার রাশি। আর যে এই আচ্ছাদনকারী ক্রিয়া খুঁজে বার করে সেসব ত্যাগ করতে পারে আর সক্ষম হয় ভিতরের ও বাইরের প্রকৃত দিশারীকে চিনে তাঁর অনুবর্তী হতে, সে-ই আবিষ্কার করবে আধ্যাত্মিক বিধান ও উপনীত হবে যোগের লক্ষ্যে।

চেতনার আমূল ও সমগ্র রূপান্তর পূর্ণযোগের শুধু যে সমগ্র অর্থ তা নয়, এ হল তার সমগ্র সাধন পদ্ধতিও, তবে এই সাধনা অগ্রসর হয় ধাপে ধাপে ও উপচীয়মান শক্তিতে।

সপ্তম অধ্যায়

আচরণের বিভিন্ন মান ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা

যে জ্ঞানের উপর কর্মযোগীর সকল ক্রিয়া ও বিকাশ প্রতিষ্ঠিত করা দরকার তার কাঠামোর নাভিকেন্দ্র হল ঐক্যের উত্তরোত্তর বাস্তব উপলব্ধি, এক সর্বব্যাপী একত্বের জীবন্ত বোধ; সকল জীবন এক অখণ্ড সমগ্র — এই উপচীয়মান চেতনার মধ্যেই তার বিচরণ: সকল কর্মও এই দিব্য অখণ্ড সমগ্রের অংশ। এই সমূহের মধ্যে জীব নিজে যে পৃথক কিছু ও তার ব্যক্তিগত ক্রিয়া ও এর বিভিন্ন পরিণাম যে তার অহমাত্মক "স্বাধীন" ইচ্ছা দ্বারা প্রধানতঃ বা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত — একথা তখন আর সত্য হতে পারে না বা বোধ হবে না। আমাদের সব কর্ম এক অখণ্ড বিশ্বক্রিয়ার অঙ্গীভূত; সমগ্র থেকেই তাদের উৎপত্তি, তার মধ্যেই তাদের নিজ নিজ স্থানে রাখা হয়, অথবা আরো সঠিকভাবে বলা যায় যে তারা নিজেরাই তাদের স্থান করে নেয় তার মধ্যে আর তাদের ফল নিয়ন্ত্রিত হয় এমন সব শক্তির দ্বারা যা আমাদের আয়ত্তের বাইরে। যে পরম এক এই বিশ্বের মধ্যে নিজেকে উত্তরোত্তর অভিব্যক্ত করছেন তাঁরই অখণ্ড গতিবৃত্তি এই জগৎক্রিয়া — যেমন এর বিরাট সমগ্রতায়, তেমন এর প্রতি ক্ষুদ্র অংশে। মানুষও যতই বোধ করতে থাকে এই পরম এককে তার নিজের অন্তরে ও তার বাইরে এবং প্রকৃতির গতির মধ্যে তাঁর বিভিন্ন শক্তির নিগূঢ়, অত্যাশ্চর্য ও তাৎপর্যপূর্ণ ক্রিয়াধারাতে ততই সে উত্তরোত্তর জানতে পারে তার নিজের সত্য ও বিষয়সমূহের সত্য। এই যে ক্রিয়া, এই যে গতিবৃত্তি, তার পরিসর — এমনকি আমাদের মধ্যে ও আমাদের চারিদিককার সবার মধ্যে যে ক্রিয়া ও গতিবৃত্তি তারও পরিসর শুধু সেইটুকু নয় যেটুকু আমরা আমাদের বাহ্য চেতনায় বিশ্বের যাবতীয় কর্মের সামান্য অংশ সম্বন্ধে জানি; একে ধরে আছে এক বিশাল অধঃস্থিত পরিবেষ্টনকারী সত্তা যা আমাদের মনের কাছে অধিচেতন বা অবচেতন এবং একে আকর্ষণ করছে এক বিশাল অতিস্থিত সত্তা যা আমাদের প্রকৃতির কাছে অতিচেতন। যেমন আমরা নিজেরা উদ্ভূত হয়েছি, তেমন আমাদের ক্রিয়াও উদ্ভূত হয় এক সার্বিকতা থেকে যার কথা আমরা জানি না, আমরা তার আকার গড়ি আমাদের ব্যক্তিগত স্বভাব, ব্যক্তিগত মন ও মননের সঙ্কল্প অথবা সংবেগ বা কামনার শক্তি দিয়ে; কিন্তু বিষয়সমূহের প্রকৃত সত্য, ক্রিয়ার প্রকৃত বিধান এইসব ব্যক্তিগত ও মানুষী রূপায়ণের সীমা ছাড়িয়ে যায়। যেসব দৃষ্টিভঙ্গিতে, যেসব মনুষ্যসৃষ্ট বিধিতে বিশ্ব-গতিবৃত্তির অখণ্ড সমগ্রতা উপেক্ষা করা হয় সে সবগুলি কার্যক্ষেত্রে যতই উপকারী হ'ক না কেন, অধ্যাত্ম সত্যের কাছে তাদের প্রতিটিই এক অপূর্ণ দৃষ্টি ও অবিদ্যার বিধান।

এমনকি যখন আমরা এই ভাবনার কিছু আভাস পেয়েছি বা একে মনের জ্ঞান হিসেবে ও তার ফলে অন্তঃপুরুষের এক ভাব হিসেবে আমাদের চেতনায় [illegible] করতে

সফল হয়েছি তখনও আমাদের পক্ষে আমাদের বহির্মুখী অংশে ও সক্রিয় প্রকৃতিতে এই সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত মত, আমাদের ব্যক্তিগত সঙ্কল্প, আমাদের ব্যক্তিগত ভাবাবেগ ও কামনার মিল আনা দুষ্কর। তখনও আমরা বাধ্য হয়ে এই অখণ্ড গতিবৃত্তিকে এমনভাবে ব্যবহার করে চলি যেন এটি নৈর্ব্যক্তিক উপাদানের এক স্তূপ আর আমাদের, অহং-এর, ব্যক্তির কাজ হল আমাদের নিজেদের সঙ্কল্প ও মানসিক অলীক কল্পনা অনুযায়ী ব্যক্তিগত সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার দ্বারা এ থেকে কিছু কেটে বার করা। পরিবেশ সম্বন্ধে এই হল মানুষের সাধারণ মনোভাব, কিন্তু এই মনোভাব প্রকৃতপক্ষে মিথ্যামূলক, কারণ আমাদের অহং ও তার সঙ্কল্প বিভিন্ন বিশ্ব-শক্তির সৃষ্টি ও খেলার পুতুল; একমাত্র যখন আমরা অহং থেকে সরে এসে ঐসব শক্তির মধ্যে যে সনাতন কাজ করেন তাঁর দিব্য জ্ঞানসঙ্কল্পের চেতনার মধ্যে যেতে পারি তখনই আমরা এক প্রকার ঊর্ধ্ব থেকে নিযুক্ত হয়ে তাদের প্রভু হতে সমর্থ হই। কিন্তু যতদিন মানুষ তার ব্যষ্টিত্ব পোষণ করে আর তাকে পূর্ণভাবে বিকশিত না করে, ততদিন এই ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গিই মানুষের সঠিক মনোভাব, কারণ এই দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রবর্তকশক্তি না থাকলে অহং-এর মধ্যে তার বৃদ্ধি হয় না, আর সে সমর্থও হয় না অবচেতন বা অর্ধচেতন বিশ্বজনীন সমষ্টিসত্তা থেকে নিজেকে যথেষ্টভাবে বিকশিত ও পৃথক করতে।

কিন্তু যখন আর আমাদের বিকাশের এই বিভক্ত, ব্যষ্টিভাবাত্মক, আক্রমণশীল অবস্থার প্রয়োজন থাকে না, যখন আমরা চাই শিশু-অন্তঃপুরুষের এই ক্ষুদ্রতার আবশ্যকতা থেকে এগিয়ে যেতে ঐক্য ও সার্বিকতার দিকে, বিশ্ব চেতনার দিকে, এবং তা-ও ছাড়িয়ে আমাদের বিশ্বাতীত চিৎপুরুষের উৎকর্ষের দিকে তখন আমাদের জীবনের সবকিছু অভ্যাসের উপর এই অহং-চেতনার দখল উচ্ছেদ করা দুঃসাধ্য। একথা সুস্পষ্টভাবে প্রণিধান না করে উপায় নেই — আর এ প্রণিধান শুধু আমাদের মননের ক্রিয়াতে হবে না তা হবে আমাদের অনুভূতির, ইন্দ্রিয়বোধের ও কর্মেরও ধারাতে — যে এই বিশ্বক্রিয়া শুধু সত্তার এমন এক অসহায় নৈর্ব্যক্তিক তরঙ্গ নয় যে তাকে নিয়ে অহং তার ক্ষমতা ও জিদ অনুযায়ী যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারে। এ হল এক বিশ্বপুরুষের গতিবিধি যিনি তাঁর ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ, এ হল এক পরম দেবতার পদক্ষেপ যিনি স্বীয় প্রচীয়মান ক্রিয়াশক্তির অধীশ্বর। এই গতিবিধি যেমন এক ও অখণ্ড, তেমন যিনি এর মধ্যে বর্তমান তিনিও এক, অদ্বয় ও অখণ্ড। শুধু যে সকল ফল তাঁর দ্বারা নির্ধারিত হয় তা নয়, সকল প্রবর্তনা, ক্রিয়া ও ধারা তাঁরই বিশ্বশক্তির গতির উপর নির্ভরশীল, তাদের উপর জীবের কর্তৃত্ব শুধু গৌণভাবে, শুধু তাদের রূপে।

কিন্তু তাহলে ব্যষ্টিকর্মীর আধ্যাত্মিক স্থান কোথায়? স্ফুরন্ত প্রকৃতির মধ্যে এই অদ্বয় বিশ্ব পুরুষের সঙ্গে এবং এই অদ্বয় সমগ্র গতিবৃত্তির সঙ্গে তার প্রকৃত সম্বন্ধ কি? সে এক কেন্দ্র মাত্র — অদ্বয় ব্যক্তিগত চেতনার বিকাশ-বৈচিত্র্যের এক কেন্দ্র, এক সমগ্র গতিবৃত্তির বিশেষ ধারার এক কেন্দ্র; তার ব্যক্তিসত্ত্ব হল এক অবিশ্রান্ত ব্যষ্টিত্বধারার তরঙ্গে অদ্বয়, বিশ্বাত্মক পরম ব্যক্তির, বিশ্বাতীতের, সনাতনের প্রতিফলন। অবিদ্যার

মধ্যে এই প্রতিফলন সর্বদাই আংশিক ও বিকৃত, কারণ তরঙ্গের চূড়া যা আমাদের সচেতন জাগ্রত আত্মা প্রতিফলিত করে তা দিব্য চিৎপুরুষের শুধু এক অপূর্ণ ও মিথ্যা সাদৃশ্য। এই ভগ্ন, প্রতিফলনকারী, বিকৃতকারী দর্পণে বিশ্বব্যাপী অগ্রসরমান সমগ্র ক্রিয়ার ও ভগবানের কোন চরম আত্মপ্রকাশের দিকে এর বহুমুখী গতিবৃত্তির কিছুটা ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস হল আমাদের বিভিন্ন মতামত, মান, রূপায়ণ ও তত্ত্ব। আমাদের মন যতটা পারে তার এমন এক প্রতিরূপ ফুটিয়ে তোলে, মূল বস্তুর সঙ্গে যার সাদৃশ্য খুবই কম, তবে যতই তার মননের ব্যাপ্তি ও আলো ও সামর্থ্য বাড়তে থাকে ততই এই অপূর্ণতা কমে আসে; তবে এই প্রতিরূপ সর্বদাই এক কাছাকাছি সাদৃশ্য, কখনই তার আংশিকভাবেও আসল মূর্তি নয়। দিব্য সঙ্কল্প যুগযুগান্ত ধরে কর্মরত তার দিব্য রহস্যের ও অনন্তের প্রচ্ছন্ন সত্যের কিছু উত্তরোত্তর প্রকাশ করার জন্য, — তবে শুধু বিশ্বের ঐক্যের মধ্যে নয়, শুধু সজীব ও চিন্তাশীল প্রাণীর সমষ্টিতে নয়, প্রতি জীবেরই অন্তঃপুরুষের মধ্যে। সে জন্যই বিশ্বের মধ্যে, সমষ্টির মধ্যে, ব্যষ্টিজীবের মধ্যে এক বদ্ধমূল সহজ সংস্কার বা বিশ্বাস আছে যে তার নিজের পূর্ণতাসাধন সম্ভব, আর আছে এক অবিরাম প্রেরণা — সদা বর্ধমান, ও আরো পর্যাপ্ত আরো সুসমঞ্জস এমন আত্মবিকাশের দিকে যার অর্থ বিষয়সমূহের গূঢ় সত্যের আরো নিকটবর্তী হওয়া। মানুষের গঠনশীল মনের কাছে এই প্রচেষ্টাকে যেসব বিভিন্ন রূপ দেওয়া হয় তা হল — জ্ঞানের, বেদনার, চরিত্রের, সৌন্দর্যবোধের ও ক্রিয়ার বিভিন্ন মান, — বিভিন্ন বিধি, আদর্শ নিয়ম ও বিধান — যেগুলিকে সে চেষ্টা করে বিভিন্ন সর্বজনপ্রযোজ্য ধর্মে পরিণত করতে।

যদি আমরা চাই পরম চিৎপুরুষের মধ্যে স্বাধীন হতে, অধীন থাকতে একমাত্র পরমসত্যের নিকট তাহলে আমাদের এই ভাবনা পরিহার করা কর্তব্য যে অনন্তের উপর আমাদের বিভিন্ন মানসিক বা নৈতিক বিধানের কোন বাধ্যবাধকতা আছে, অথবা এমনকি আমাদের বর্তমান সর্বোত্তম আচরণের ও মানের মধ্যে অলঙ্ঘনীয়, অনপেক্ষ বা শাশ্বত কিছু আছে। যতদিন প্রয়োজন আছে ততদিন উচ্চতর ও আরো উচ্চ সাময়িক মান তৈরী করার অর্থ ভগবানকে সেবা করা তাঁর জগৎ-প্রগতিতে; কিন্তু কঠোরভাবে কোন অপরিবর্তনীয় মান স্থাপন করার অর্থ চিরন্তন প্রবাহধারার পথে বাঁধ দেওয়ার চেষ্টা। প্রকৃতিবদ্ধ অন্তঃপুরুষ একবার এই সত্য উপলব্ধি করলে সে শুভ ও অশুভের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পায়। কেননা যাসব জীব ও জগৎকে সাহায্য করে তাদের দিব্য পরিপূর্ণতার পথে সেই সবই শুভ আর যাসব ঐ বর্ধিষ্ণু সিদ্ধিকে ব্যাহত করে বা ভেঙে দেয় সেসব অশুভ। কিন্তু যেহেতু এই সিদ্ধি আসে উত্তরোত্তর পর্যায়ে, কালের মধ্যে ক্রমবিকাশের ধারায়, শুভ ও অশুভের মান বদলে যায়, আর সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে তাদের অর্থ ও

মূল্যেরও পরিবর্তন হয়। যে বিষয় এখন অশুভ এবং তার বর্তমান আকারে একান্তই বর্জনীয় তা-ই এক সময় ছিল সাধারণ ও ব্যষ্টির প্রগতির পক্ষে সহায়ক ও প্রয়োজনীয়। আর অপর যে বিষয়কে এখন আমরা মনে করি অশুভ তা হয়তো অন্য কোন রূপে ও পরিবেশে কোন ভবিষ্যৎ সিদ্ধির উপাদান হবে। আবার আধ্যাত্মিক স্তরে আমরা এই পার্থক্যকেও ছাড়িয়ে যাই, কারণ এই যে সব বিষয়কে আমরা শুভ ও অশুভ বলি আমরা তখন দেখতে পাই তাদের উদ্দেশ্য ও দিব্য উপকারিতা। তখন সকল বিষয়ের মধ্যকার — যেমন যা শুভ বলা হয় তার, তেমন যা অশুভ বলা হয় তারও — অসত্য এবং যা কিছু সব বিকৃত, অজ্ঞানময় ও তমসাচ্ছন্ন আমাদের বর্জন করা চাই। কারণ তখন আমাদের নিতে হবে শুধু সত্য ও দিব্যকে, শাশ্বত ধারাগুলির মধ্যে অন্য কোন পার্থক্য করা চলবে না।

যারা কাজ করতে সক্ষম শুধু এক কঠোর বাঁধা মানের উপর, যারা অনুভব করতে সক্ষম শুধু মানুষী মূল্য, দিব্য মূল্য নয়, তাদের কাছে মনে হতে পারে যে এ হল এক বিপজ্জনক স্বীকৃতি যার ফলে নীতির মূল পর্যন্ত ধ্বংস হবে, সকল আচরণ বিপর্যস্ত হবে, স্থাপিত হবে এক চরম নৈরাজ্য। অবশ্য একথা ঠিক যে যদি বেছে নেওয়ার মাত্র দুটি পথ থাকে — একদিকে এক শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় নীতি এবং অন্যদিকে আদৌ কোন নীতি না থাকা — তাহলে অজ্ঞানতার মধ্যে মানুষের পক্ষে সেই পরিণাম আসবে। কিন্তু মানুষীস্তরেও যদি আমাদের এতটা আলো ও এতটা নমনীয়তা থাকে যে আমরা বুঝতে পারি যে আচরণের কোন মান সাময়িক হলেও সেই সময়ের পক্ষে তা প্রয়োজনীয় আর তার স্থলে আরো উন্নত মান প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত এটাই নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা উচিত, তাহলে আমাদের এরকম কোন ক্ষতি হয় না, হয় শুধু এক অপূর্ণ ও অসহিষ্ণু ধর্মের গোঁড়ামি নাশ । তার স্থলে আমরা লাভ করি উন্মুক্ততা, অবিরত নৈতিক অগ্রসরতার সামর্থ্য, দাক্ষিণ্য, আর লাভ করি, — এই যে সব জীব কষ্ট করছে, হোঁচট খেয়ে পড়ছে তাদের সঙ্গে এক জ্ঞানমূলক সমবেদনাবোধের শক্তি আর সেই দাক্ষিণ্যবলে তাদের চলার পথে সাহায্য করার আরো উপযুক্ত অধিকার, আরো বেশী ক্ষমতা। পরিশেষে যেখানে মানুষীস্তর শেষ হয় আর দিব্যস্তর আরম্ভ হয়, যেখানে মানসিক চেতনা অন্তর্হিত হয় অতিমানসিক চেতনার মধ্যে আর সান্ত নিজেকে সজোরে নিক্ষেপ করে অনন্তের মধ্যে সেখানে সকল অশিব তিরোহিত হয় এক বিশ্বাতীত দিব্য পরম শিবের মধ্যে যা চেতনার যে স্তরই স্পর্শ করুক না কেন তাতে হয়ে ওঠে সর্বজনীন।

তাহলে আমাদের জন্য এই স্থির হল যে যেসব মানের দ্বারা আমরা আমাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাই সে সব শুধু আমাদের সাময়িক, অপূর্ণ ও ক্রমোন্নত চেষ্টা — নিজেদের কাছে এই দেখাবার জন্য যে প্রকৃতি যে বিশ্বজনীন আত্মোপলব্ধির দিকে চলে তার মধ্যে আমাদের স্খলনপূর্ণ মানসিক প্রগতি কিরকম। কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিধি ও ভঙ্গুর শুচিতা দিয়ে দিব্য অভিব্যক্তিকে বাঁধা যায় না; কারণ তার পিছনের চেতনা এত বৃহৎ যে এইসব বিষয়ের মধ্যে তাকে ধরা যায় না। একবার আমরা এই তথ্য

ভালভাবে ধরতে পারলে — অবশ্য আমাদের যুক্তিবুদ্ধির একান্তবাদের পক্ষে তা নিতান্তই অপ্রীতিকর — আমরা বরং সমর্থ হব সেইসব ক্রমান্বয়ী মানগুলিকে তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যে তাদের যথাযথ স্থানে রাখতে যেগুলি ব্যষ্টির বিকাশ সাধনে ও মানবজাতির সমষ্টিগত প্রগতিতে বিভিন্ন পর্যায় নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের মধ্যে যেগুলি সর্বাপেক্ষা ব্যাপক সেগুলির দিকে আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে নজর দিতে পারি। কেননা আমাদের জানা চাই এদের কি সম্বন্ধ সেই অপর মনোতীত আধ্যাত্মিক ও অতিমানসিক ক্রিয়াপ্রণালীর সঙ্গে যার জন্য যোগের অন্বেষণ ও যার দিকে তা চলে দিব্য সঙ্কল্পের কাছে ব্যষ্টি সঙ্কল্পের সমর্পণের দ্বারা এবং আরো ফলপ্রসূভাবে এই সমর্পণের দ্বারা সেই মহত্তর চেতনায় তার উৎক্রান্তির মাধ্যমে, যে চেতনাতে সম্ভব হয়ে ওঠে স্ফুরন্ত সনাতনের সঙ্গে একপ্রকার তাদাত্ম্য।

উত্তরোত্তর পর্যায়ে মানব আচরণের চারটি প্রধান মান। প্রথমটি হল ব্যক্তিগত প্রয়োজন, পছন্দ, অপছন্দ ও কামনা; দ্বিতীয়টি সমষ্টির বিধান ও মঙ্গল; তৃতীয়টি আদর্শ নীতি; সর্বশেষ হল প্রকৃতির সর্বোত্তম দিব্য বিধান।

মানুষ তার ক্রমবিকাশের দীর্ঘ পথে যাত্রা শুরু করে এই চারটির শুধু প্রথম দুটি নিয়ে তার পথের আলো ও নেতা হিসেবে; কারণ এরাই তার জান্তব ও প্রাণিক জীবনের বিধান আর দেহপ্রাণময় পশু-মানবরূপেই সে তার যাত্রা শুরু করে লক্ষ্যের দিকে। পৃথিবীতে মানুষের সত্যকার কাজ হল মানবের জাতিরূপের মধ্যে ভগবানের বর্ধিষ্ণু প্রতিরূপ ফুটিয়ে তোলা; সে জানুক বা না জানুক, এই উদ্দেশ্যেই প্রকৃতি তার মধ্যে কর্মরতা তার আন্তর ও বাহ্যধারার ঘন আবরণের নীচে। কিন্তু জড়গত বা পশুসুলভ মানব জীবনের এই আন্তর লক্ষ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ; সে জানে শুধু এর প্রয়োজন ও কামনার কথা, আর তার ফলে করণীয় কি সে বিষয়ে প্রয়োজন সম্বন্ধে তার নিজের বোধ এবং কামনার তাড়না ও নির্দেশ ছাড়া তার আর অন্য কোন দিশারী থাকে না। সুতরাং তার আচরণের প্রথম স্বাভাবিক বিধি হল — সর্বাগ্রে তার শরীরের ও প্রাণের দাবী ও প্রয়োজন মেটানো এবং তারপরে তার মধ্যে যেসব ভাবপ্রবণ বা মানসিক আকাঙ্ক্ষা বা কল্পনা বা স্ফুরন্ত ধারণা জেগে ওঠে সেসব পূরণ করা। একমাত্র যে সমীকারক ও অভিভবকারী বিধান এই জোরালো স্বাভাবিক দাবী বদলাতে বা খণ্ডন করতে পারে তা হল সে যে বংশ, সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী, যূথ বা দলের অন্তর্ভুক্ত তার ভাবনা, প্রয়োজন ও কামনার দাবী।

যদি মানুষ নিজেকে নিয়েই থাকতে পারত — আর সে এটা করতে পারত যদি ব্যষ্টির উন্নতিসাধনই জগতে ভগবানের একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ত — তাহলে এই দ্বিতীয় বিধান কার্যকরী হওয়ার আদৌ কোন প্রয়োজন হত না। কিন্তু সকল জীবনের অগ্রগতির

পদ্ধতি হল — সমগ্র ও বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, বিভিন্ন অবয়ব ও অবয়বীর মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের প্রয়োজন, গোষ্ঠী ও গোষ্ঠীভুক্ত ব্যষ্টিসমূহের অন্যোন্যনির্ভরতা। ভারতীয় দর্শনের ভাষায় ভগবান সর্বদা নিজেকে প্রকট করেন "ব্যষ্টি" ও "সমষ্টি" — বিভক্ত ও সংহত, এই দুই রূপে। মানুষ আগ্রহী তার বিভক্ত ব্যষ্টিত্বের বৃদ্ধি ও পূর্ণতা ও স্বাধীনতার জন্য কিন্তু অন্য মানুষের সহযোগ বিনা সে এমনকি তার নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও কামনাও পূরণ করতে অক্ষম: সে নিজের মধ্যে এক সমগ্র কিন্তু তবু অন্য সবের বিহনে অসম্পূর্ণ। এই বাধ্যবাধকতার জন্য তার ব্যক্তিগত আচরণের বিধান গোষ্ঠীবিধানের অন্তর্ভুক্ত হয় আর এই গোষ্ঠীবিধানের উৎপত্তি হয় এক স্থায়ী গোষ্ঠীসত্তার রূপায়ণ থেকে; এই গোষ্ঠীসত্তার নিজস্ব সমষ্টিগত মন ও প্রাণ আছে আর ব্যষ্টির নিজের দেহাশ্রয়ী মন ও প্রাণকে তার অধীন করে তোলা হয় এক অস্থায়ী একক হিসেবে। কিন্তু তার মধ্যে এমন কিছু আছে যা অমর ও স্বাধীন এবং যা এই গোষ্ঠীদেহে বাঁধা নয়; এই গোষ্ঠীদেহ ব্যষ্টির দেহাশ্রয়ী জীবনের চেয়ে বেশী স্থায়ী তবে এটি যে মানুষের সনাতন চিৎপুরুষের চেয়ে বেশী স্থায়ী হবে অথবা চাইবে যে নিজের বিধান দিয়ে তাকে বাঁধবে তা হতে পারে না।

এই আপাত প্রতীয়মান বৃহত্তর ও প্রবলতর বিধানকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে ব্যষ্টি প্রাথমিক মানুষ যে প্রাণিক ও পাশব তত্ত্বের নিয়ন্ত্রণাধীন এ তার বিস্তার ছাড়া আর কিছু নয়; পশুর যূথ বা দলের বিধান হল এই। ব্যষ্টি তার জীবনকে আংশিকভাবে এক করে অপর কিছু সংখ্যক ব্যষ্টির জীবনের সঙ্গে যাদের সঙ্গে সে জন্মের দ্বারা, স্বেচ্ছায় বা ঘটনাপ্রবাহে মিলিত হয়েছে। আর ব্যষ্টির নিজের অস্তিত্ব ও তৃপ্তির জন্য গোষ্ঠীর অস্তিত্ব প্রয়োজন বলে, প্রথম থেকে না হলেও কালক্রমে গোষ্ঠীর সংরক্ষণ, তার অভাব পূরণ, এবং যেসব সমষ্টিগত ধারণা, কামনা ও জীবনযাত্রার অভ্যাস ছাড়া গোষ্ঠী একতাবদ্ধ থাকে না সে সবের চরিতার্থ সাধন — এ সবের স্থান মুখ্য হয়ে ওঠা অনিবার্য। ব্যক্তিগত ভাবনা ও বেদনা, প্রয়োজন ও কামনা, প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের পরিতৃপ্তিসাধন সর্বদাই গৌণ করতে হয় সমগ্র সমাজের — এই বা অপর ব্যষ্টির বা কয়েকজনের নয় — ভাবনা ও বেদনা, প্রয়োজন ও কামনা, প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের নিকট, আর তা করতে হয় অবস্থার চাপে, কোন নৈতিক বা পরার্থপরতামূলক উদ্দেশ্যে নয়। এই সামাজিক প্রয়োজনই নীতিবোধ ও মানুষের নৈতিক সংবেগের প্রচ্ছন্ন গর্ভাশয়।

কোন কোন পশুর মত মানুষও যে কোন আদিমকালে একাকী বা শুধু তার সঙ্গিনী নিয়ে থাকত — এ তথ্য জানা নেই। তার সম্বন্ধে সকল বিবরণ থেকে আমরা দেখি যে সে সামাজিক প্রাণী — কোন বিচ্ছিন্ন দেহ ও চিৎপুরুষ নয়। সর্বদা যূথের বিধানই তার আত্মবিকাশের ব্যষ্টি বিধানকে নিয়ন্ত্রণ করেছে; মনে হয় চিরকাল সমূহের মধ্যে একক হিসেবে তার জন্ম, স্থিতি ও গঠন। কিন্তু মনস্তত্ত্বের দিক থেকে ন্যায়তঃ ও স্বভাবতঃ ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও কামনার বিধানই মুখ্য, সামাজিক বিধান এসেছে এক গৌণ শক্তি, জবরদখলকার হিসেবে। মানুষের মধ্যে দুটি পৃথক প্রধান সংবেগ আছে — একটি

ব্যষ্টিগত ও অপরটি সমষ্টিগত, একটি ব্যক্তিগত জীবন, অন্যটি সামাজিক জীবন, আচরণের একটি ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য, অন্যটি সামাজিক উদ্দেশ্য। মানবসভ্যতার মূলে আছে এই দুয়ের দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা ও তাদের সমীকরণের প্রয়াস, আর যখন মানুষ প্রাণিক পশুর স্তর অতিক্রম করে উচ্চ ব্যষ্টিভাবাপন্ন মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির স্তরে যায় তখনো তা থাকে অন্য মূর্তিতে।

ব্যষ্টির বাইরে সামাজিক বিধান থাকাতে, মানুষের মধ্যে দিব্যত্ব বিকাশের পক্ষে এতে এক সময় প্রচুর সুবিধা হয়, আবার অন্য সময় অসুবিধাও হয়। প্রথমে যখন মানুষ অমার্জিত থাকে ও আত্ম-সংযম ও আত্ম-আবিষ্কারে অক্ষম, তখন সামাজিক বিধান এক সহায়, কারণ এটি মানুষের ব্যক্তিগত অহন্তা ছাড়া এমন এক শক্তি খাড়া করে যার মাধ্যমে ঐ অহন্তাকে বুঝিয়ে রাজী বা জোর করে বাধ্য করা যেতে পারে তার বন্য দাবীদাওয়া কমাতে, তার অযৌক্তিক ও প্রায়শঃই উগ্র গতিবৃত্তি সংযত করতে এবং এমনকি কখনও কখনও নিজেকে হারিয়ে ফেলতে এক বৃহত্তর ও আরো কম ব্যক্তিগত অহন্তার মাঝে। কিন্তু যে পরিণত চিৎপুরুষ মানবত্ব অতিক্রম করতে প্রস্তুত, তার কাছে এটি অসুবিধাজনক, কারণ এ হল এক বাহ্য মান যা বাইরে থেকে তার উপর চেপে বসতে চায় অথচ তার সিদ্ধির জন্য তাকে বিকশিত হতে হবে ভিতর থেকে আর বর্ধিষ্ণু স্বাধীনতার মধ্যে, তার সিদ্ধ ব্যষ্টিত্বকে দমন করে নয়, তাকে অতিক্রম করে; তার উপর চাপানো এমন কোন বিধান দ্বারা এ কাজ আর হবে না যা তার বিভিন্ন অঙ্গকে শিক্ষা দেবে ও সংযত করবে, তা হবে ভিতর থেকে অন্তঃপুরুষের দ্বারা যা সকল পূর্বতন রূপ ভেঙে ভেদ করে যাবে তার সব অঙ্গকে নিজের আলো দিয়ে অধিগত ও রূপান্তরিত করার জন্য।

ব্যক্তির দাবীর সঙ্গে সমাজের দাবীর সংঘর্ষে আমরা দেখি দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ আদর্শ ও একান্ত সমাধান। গোষ্ঠীর দাবী এই যে ব্যষ্টি কম বেশী সম্পূর্ণভাবে তার অধীন হ'ক বা এমনকি সমষ্টির মধ্যে তার স্বাধীন সত্তার বিনাশ হ'ক, ছোটকে বলি দিতে হবে বা আত্মোৎসর্গ করতে হবে বড়র কাছে। সমাজের প্রয়োজনই তার নিজের প্রয়োজন, সমাজের কামনাই তার নিজের কামনা — এই তার স্বীকার করা চাই; তাকে বাঁচতে হবে নিজের জন্য নয়, যে গোষ্ঠী, কুল, সঙ্ঘ (Commune) বা রাষ্ট্রজাতির সে অন্তর্ভুক্ত তার জন্য। ব্যষ্টির দিক থেকে আদর্শ ও একান্ত সমাধান এই যে সমাজের অস্তিত্ব তার নিজের নয়, অন্য সকলের উদ্দেশ্য নাকচ করে নিজের সমষ্টিগত উদ্দেশ্যের জন্যে নয়, তার অস্তিত্ব ব্যষ্টির মঙ্গল ও সার্থকতা সাধনের জন্য, তার অন্তর্ভুক্ত সকল ব্যক্তির মহত্তর ও পূর্ণতর জীবনের জন্য। যতদূর সম্ভব এটি ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ আত্মার প্রতিভূ হয়ে তাকে সাহায্য করবে তা বাস্তবে পরিণত করতে আর এই কাজে সে তার সদস্যের প্রত্যেকের

স্বাধীনতা সম্ভ্রমের সঙ্গে মেনে নেবে, তার অস্তিত্ব রক্ষা করবে আইন ও শক্তির জোরে নয়, তার অন্তর্ভুক্ত সব ব্যক্তির স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত অনুমোদনে। এই যে দুই প্রকার আদর্শ সমাজ — তার কোনটিই কোথাও নেই, আর যতদিন ব্যক্তি তার অহন্তাকেই আঁকড়ে থাকে তার জীবনের মুখ্য প্রবর্তক শক্তি হিসেবে ততদিন এরকম সমাজ সৃষ্টি করা অতীব দুঃসাধ্য এবং আরো দুঃসাধ্য তার অনিশ্চিত জীবন রক্ষা করা। সহজতর উপায় হল ব্যক্তির উপর সমাজের সাধারণ প্রভুত্ব, তবে সম্পূর্ণ প্রভুত্ব নয় আর এই পন্থাই প্রকৃতি প্রথম থেকে সহজাত সংস্কার বশে অবলম্বন করে এবং তাদের মধ্যে সমতা বজায় রাখে কঠোর বিধি-বিধান ও অবশ্য পালনীয় প্রথা দিয়ে ও যে মানব এখনও পরতন্ত্র ও অপরিণতবুদ্ধি তার সযত্ন শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রে।

আদিম সমাজে ব্যষ্টির জীবন অধীন থাকে গোষ্ঠীর কঠোর ও অপরিবর্তনীয় প্রথা ও বিধির কাছে; এই হল মানবযূথের সেই প্রাচীন বিধান যার ইচ্ছা শাশ্বত হওয়া ও যার অবিরত প্রয়াস হল নিজেকে জাহির করা যে এই হল অবিনাশী পুরুষের সনাতন অনুজ্ঞা, "এষ ধর্মঃ সনাতনঃ" (এই হল সনাতন ধর্ম)। মানবমনে এই আদর্শ আজও মুছে যায়নি; মানবপ্রগতির সব চেয়ে আধুনিক প্রবণতা হল মানবাত্মাকে সমষ্টি জীবনের দাসত্বে বাঁধার এই প্রাচীন ব্যবস্থার এক বর্ধিত ও জমকালো সংস্করণ প্রতিষ্ঠিত করা। এক মহত্তর জীবন ও পৃথিবীর বুকে এক মহত্তর সত্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধনের পথে এ এক বিষম বিপত্তি। কারণ ব্যষ্টির সব কামনা ও স্বাধীন অন্বেষণ তাদের আশুরূপে যতই অহমাত্মক, যতই মিথ্যা বা বিকৃত হ'ক না কেন, তাদের তমসাচ্ছন্ন কোষাণুর মধ্যে নিহিত আছে সমগ্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিকাশের বীজ; তার অন্বেষণ ও পদস্খলনের পশ্চাতে যে শক্তি আছে তাকে রক্ষা ক'রে রূপান্তরিত করতে হবে দিব্য ভাবনার প্রতিরূপে। সেই শক্তিকে প্রদীপ্ত ও শিক্ষিত করা দরকার, তাকে দমন করা বা একান্তভাবে সমাজের গুরুভার শকট টানবার জন্য নিযুক্ত করা চলবে না। চরম সিদ্ধির জন্য গোষ্ঠীভাবের পিছনকার শক্তি যেমন প্রয়োজনীয়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যও তেমন প্রয়োজনীয়; ব্যষ্টির কণ্ঠরোধের অর্থ হতে পারে মানুষের মাঝে দেবতার কণ্ঠরোধ। আর মানবজাতির বর্তমান স্থিতাবস্থায় অত্যধিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যে সমাজের গঠন ভেঙে দেবে তার কোন বাস্তব বিপদ একরকম নেই বললেই চলে। বরং এ বিপদ সর্বদাই রয়েছে যে সামাজিক জনপুঞ্জের অনালোকিত যান্ত্রিক গুরুভারের অত্যধিক চাপে ব্যষ্টি পুরুষের স্বাধীন বিকাশ দমিত বা অযথা স্তিমিত হবে। কারণ ব্যষ্টির মধ্যকার মানুষ আরো সহজে আলোকিত, সচেতন ও স্বচ্ছ প্রভাবের নিকট উন্মুক্ত হতে সক্ষম; সমূহের মধ্যকার মানুষ এখনো তমসাচ্ছন্ন ও অর্ধসচেতন, এমন সব বিশ্বশক্তির অধীন যা তার আয়ত্তের ও জ্ঞানের অতীত।

এই দমন ও অচলায়তনের বিরুদ্ধে ব্যষ্টির মধ্যস্থ প্রকৃতি প্রত্যাঘাত করে। এই প্রত্যাঘাত হতে পারে বিভিন্ন ধরনের বিচ্ছিন্ন প্রতিরোধ — দুষ্কর্মসাধনের সহজাত ও নৃশংস বিদ্রোহ থেকে আরম্ভ করে নিঃসঙ্গ বৈরাগীর অস্বীকার পর্যন্ত। আবার এর অন্যরূপ হল সামাজিক ভাবনায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভাব স্বীকার ক'রে গণচেতনার উপর তা আরোপ

করা এবং ব্যক্তি ও সমাজের দাবীর মধ্যে আপোষ আনা। কিন্তু আপোষ সমাধান নয়; এতে সমস্যার দুরূহতা কিছুকালের জন্য স্থগিত থাকে মাত্র, শেষ পর্যন্ত সমস্যার জটিলতা আরো বৃদ্ধি পায় ও নানাবিধ প্রশ্ন দেখা দেয়। এই দুই পরস্পর বিরোধী সহজাত প্রবৃত্তি ছাড়া তাদের চেয়ে উচ্চতর এমন এক নতুন তত্ত্ব আহ্বান করা দরকার যা এত শক্তিশালী হবে যে সে এক সাথে তাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনবে আবার তাদের মধ্যে মিলন সাধন করবে। স্বাভাবিক ব্যক্তিগত বিধান আচরণের যে মান উপস্থাপিত করে তার অর্থ — আমাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন, রুচি ও কামনাপূরণ; আর স্বাভাবিক গোষ্ঠীগত বিধানে আচরণের যে আরো উন্নত মান আনা হয় তার অর্থ — সমগ্র গোষ্ঠীর প্রয়োজন, রুচি ও কামনাপূরণ; এই দুয়ের অপেক্ষা উচ্চতর এমন এক আদর্শ নৈতিক বিধানের ভাবনার উৎপত্তি হতে হল যা প্রয়োজন ও কামনা পূরণ নয়, এটি বরং তাদের নিয়ন্ত্রণ করে এবং এমনকি জোর ক'রে তাদের দমন বা বাতিল করে এমন এক আদর্শ ব্যবস্থার প্রয়োজনে যা পাশব নয়, বা প্রাণিক ও শারীরিক নয়, পরন্তু যা মানসিক, যা আলো ও জ্ঞানের, সঠিক বিধি ও সঠিক গতিবৃত্তির ও সত্যকার ব্যবস্থার জন্য মনের অন্বেষণের সৃষ্টি। যে মুহূর্তে এই ভাবনা মানুষের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে, তখনই সে যে প্রাণগত ও জড়গত জীবনে নিবিষ্ট ছিল তা ছেড়ে যেতে শুরু করে মনোময় জীবনের মধ্যে; সে প্রকৃতির ত্রিপর্বা ঊর্ধ্বারোহণের প্রথম পর্যায় থেকে উত্তীর্ণ হয় দ্বিতীয় পর্যায়ে। তার সব প্রয়োজন ও কামনাও স্পর্শ পায় উদ্দেশ্যের এক আরো সমুন্নত আলোর, আর মানসিক প্রয়োজন, সৌন্দর্যবোধান্বিত, বুদ্ধিগত ও ভাবপ্রবণ কামনা শুরু করে শারীরিক ও প্রাণিক প্রকৃতির দাবীর উপর আধিপত্য করতে।

আচরণের স্বাভাবিক বিধান অগ্রসর হয় বিভিন্ন শক্তি, প্রচোদনা ও কামনার সংঘর্ষ থেকে তাদের সাম্যাবস্থার দিকে; উচ্চতর নৈতিক বিধান অগ্রসর হয় মানসিক ও নৈতিক প্রকৃতির বিকাশ দ্বারা এক নির্দিষ্ট আন্তর মানের দিকে, আর না হয় বিভিন্ন একান্ত গুণের এক আত্মগঠিত আদর্শের দিকে — ন্যায়পরায়ণতা, সদাচার, প্রেম, সঠিক যুক্তিবুদ্ধি, যথার্থ শক্তি, সৌন্দর্য, আলোর দিকে। সুতরাং এটি মূলতঃ এক ব্যক্তিগত মান; এটি গণমনের কোন সৃষ্টি নয়। ব্যষ্টিব্যক্তিই ভাবুক, সে-ই সে সবকে বার ক'রে রূপ দেয় যেগুলি অন্যথায় অমূর্ত সমগ্র মানবজাতির মধ্যে অবচেতন হয়ে থাকত। নৈতিক যোদ্ধাও ব্যষ্টিব্যক্তি; যে আত্মসংযম করা হয় কোন বাহ্য বিধানের চাপে নয়, বরং কোন আন্তর আলোকের নির্দেশে তা-ও মূলতঃ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা। তবে নিজের ব্যক্তিগত মানকে এক একান্ত নৈতিক আদর্শের রূপান্তর হিসেবে স্থাপন ক'রে ভাবুক তা চাপিয়ে দেয় শুধু নিজের উপর নয়, সেই সব ব্যক্তিরও উপর যাদের কাছে তার মনন পৌঁছায় ও ভিতরে প্রবেশ করে। আর যেহেতু লোকেরা দলে দলে এটিকে ক্রমশঃ বেশী ক'রে

ভাবনায় গ্রহণ করে, — অবশ্য কার্যতঃ তার প্রয়োগ অসম্পূর্ণ হয় বা আদৌ হয় না — সেহেতু সমাজও এই নতুন উন্মুখতা মেনে নিতে বাধ্য হয়। এই ভাবনাগত প্রভাবকে এটি নিজের মধ্যে নিয়ে চেষ্টা করে তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে এমন নতুন রূপে পুনর্গঠন করতে যা এই সব উচ্চতর আদর্শের স্পর্শ পেয়েছে; তবে একাজে যে এটি দেখবার মতো সাফল্য লাভ করে তা নয়। কিন্তু সর্বদাই এর সহজাত প্রবৃত্তি হল সে সবকে রূপান্তর করা অবশ্য পালনীয় বিধানে, আদর্শস্থানীয় রূপে, যান্ত্রিক প্রথায় ও তার মধ্যস্থিত সজীব একককদের উপর এক বাহ্য সামাজিক বাধ্যবাধকতায়।

কারণ যখন ব্যক্তি অংশতঃ স্বতন্ত্র হয়েছে, এমন এক নৈতিক প্রাণী হয়েছে যে সচেতনভাবে বৃদ্ধি পেতে সমর্থ, অন্তর্মুখী জীবন সম্বন্ধে সজাগ, অধ্যাত্ম উন্নতির জন্য উৎসুক, তারও পরে দীর্ঘ কাল পর্যন্ত সমাজ তার বহির্মুখী পদ্ধতিসব নিয়ে চলতে থাকে; এ এক জড়গত ও অর্থনৈতিক সত্তা, এবং যান্ত্রিক — বৃদ্ধি ও আত্মপূর্ণতা অপেক্ষা স্থিতি ও আত্মসংরক্ষণে বেশী আগ্রহী। সহজাত প্রবৃত্তিচালিত স্থিতিশীল সমাজের উপর ভাবুক ও প্রগতিশীল ব্যক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ আধুনিক বিজয় এই যে সে তার মননসঙ্কল্প দিয়ে পাওয়া শক্তি বলে এই সমাজকেও বাধ্য করেছে চিন্তা করতে, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সদাচার এবং গোষ্ঠীগত সমবেদনা ও পারস্পরিক করুণার ভাবনার নিকট উন্মুক্ত হতে, এই অনুভব করতে যে তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিচারের নিরিখ অন্ধ প্রথা না হয়ে হওয়া উচিত যুক্তির বিধান এবং এটাও স্বীকার করতে যে তার বিভিন্ন বিধানের বৈধতার অন্ততঃ এক মূল উপাদান হল তার অন্তর্গত সব ব্যক্তির মানসিক ও নৈতিক সম্মতি। গোষ্ঠীমানসে সম্প্রতি এই ধারণা আসতে শুরু করেছে যে অন্ততঃ আদর্শ হিসেবে গোষ্ঠী ব্যবস্থার আদেশের মূলে শক্তি অপেক্ষা আলোর প্রভাবই বেশী, এমনকি তার শাস্তি বিধানের উদ্দেশ্য হল নৈতিক বিকাশ সাধন, প্রতিহিংসা বা নিগ্রহ নয়। ভবিষ্যতে ভাবুকের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয় হবে সেইদিন যেদিন তার কথায় ব্যষ্টি একক ও সমষ্টি সমগ্র তাদের জীবন-সম্বন্ধ ও তার মিলন ও স্থায়িত্বকে প্রতিষ্ঠিত করবে স্বচ্ছন্দ ও সুসমঞ্জস সম্মতি ও আত্ম-অভিযোজনের উপর, বাহ্য রূপ ও কাঠামোর উৎপীড়নে আন্তর ভাবকে সঙ্কুচিত করা অপেক্ষা বরং বহির্ভাগকে গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করবে আন্তর সত্য দ্বারা।

কিন্তু এই যে সাফল্য সে লাভ করেছে এটি তার বাস্তব সিদ্ধি অপেক্ষা বরং এমন কিছু, যার যোগ্যতা আছে আরো করার। ব্যষ্টির নৈতিক বিধান এবং তার সব প্রয়োজন ও কামনার বিধানের মধ্যে, আবার সমাজের জন্য প্রস্তাবিত নৈতিক বিধান এবং জাত, কুল, ধর্ম, সম্প্রদায়, সমাজ, রাষ্ট্রজাতির বিভিন্ন প্রাণিক প্রয়োজন, কামনা, প্রথা, দুরাগ্রহ, আগ্রহ, ও উচ্চণ্ড বেগের মধ্যে সর্বদাই বৈষম্য ও বিরোধ বর্তমান। নীতিবাদী যে তার একান্ত নৈতিক মান গঠন করে আর সকলকে উপদেশ দেয় যে ফলের দিকে না তাকিয়ে তা-ই পালন করা কর্তব্য — এসবই বৃথা। তার কাছে ব্যক্তির প্রয়োজন ও কামনা অবৈধ যদি সে সব নৈতিকবিধানের বিরুদ্ধ হয়; আর যদি সমাজবিধান এমন হয় যে তা তার ন্যায়বোধের বিরুদ্ধে এবং তার বিবেক তাকে স্বীকার করে না তাহলে সেই সমাজবিধান

পালনে তার কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না। ব্যক্তির জন্য তার একান্ত সমাধান এই যে প্রেম, সত্য ও ন্যায়ের সঙ্গে সঙ্গতি নেই এমন কোন কামনা ও দাবী পোষণ করা ব্যক্তির পক্ষে অনুচিত। সম্প্রদায় বা রাষ্ট্রজাতির কাছে তার দাবী এই যে সত্য, ন্যায়, মানবতা ও শ্রেষ্ঠ জনকল্যাণের তুলনায় তা যেন সকল জিনিসকেই, এমনকি তার নিরাপত্তা ও পরম আগ্রহের বস্তুকেও তুচ্ছ বোধ করে।

তীব্রভাবের সময় ছাড়া কোন ব্যক্তিই কোন সময় এত উচ্চ শিখরে ওঠে না, এ পর্যন্ত এমন কোন সমাজ সৃষ্ট হয়নি যা এই আদর্শ পালন করেছে। আর নীতিবোধ ও মানববিকাশের বর্তমান অবস্থায় কারো পক্ষে তা পালন করা সম্ভব নয় বা উচিত নয়। প্রকৃতি তা করতে দেবে না, প্রকৃতি জানে যে তা করা উচিত নয়। প্রথম কারণ এই যে আমাদের নৈতিক আদর্শগুলিই অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিৎপুরুষের শাশ্বত সত্যের প্রতিলিপি অপেক্ষা বরং স্বল্পোন্নত, অবিদ্যাচ্ছন্ন ও ইচ্ছামত মানসিক রচনা। এই সব আদর্শ আজ্ঞাসূচক ও যুক্তিহীন, তারা কাগজেকলমে কতকগুলি একান্ত মানের কথা বলে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রচলিত প্রতিটি নীতিশাস্ত্র হয় প্রয়োগের অযোগ্য অথবা যে একান্ত মানকে সেই আদর্শ গ্রহণ করেছে ব'লে ভান করে বস্তুতঃ এটি সর্বদাই তার নিম্নস্তরের। যদি আমাদের নীতিশাস্ত্র আপোষরফা বা জোড়াতালি হয় তাহলে তা থেকে সহজেই বুঝতে পারা যায় সমাজ ও ব্যক্তি তার সঙ্গে যে তাড়াতাড়ি আরো সব নিষ্ফল আপোষ করে তার সমর্থনের যুক্তি কি। আর যদি নীতিবাদ আপোষহীনভাবে দাবী করে যে একান্ত প্রেম, ন্যায়পরায়ণতা ও ঋতম্-ই অবশ্য পালনীয়, তাহলে তা মানুষের নাগালের বাইরে যায়, মানুষ তাকে মুখে শ্রদ্ধা দেখালেও, কার্যতঃ অগ্রাহ্য করে। এমনকি দেখা যায় যে এতে মানবের সেই সব অন্য উপাদানকে লক্ষ্য করা হয় না যেগুলি সমান জোরের সঙ্গে টিকে থাকতে চায় অথচ নীতিসূত্রের মধ্যে আসতে চায় না। কারণ যেমন কামনার ব্যষ্টিবিধানের মধ্যে অনন্ত সমগ্রের এমন সব অমূল্য উপাদান থাকে যেগুলিকে সর্বগ্রাসী সামাজিক ভাবনার উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করা দরকার, তেমন ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত মানুষের বিভিন্ন অন্তর্জাত সংবেগের মধ্যেও এমন সব অমূল্য উপাদান থাকে যেগুলি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত কোন নৈতিক সূত্রের সীমার মধ্যে ধরা পড়ে না অথচ অন্তিম দিব্য সিদ্ধির পরিপূর্ণতা ও সামঞ্জস্যের জন্য প্রয়োজনীয়।

উপরন্তু, বিভ্রান্ত ও অপূর্ণ মানব যখন বর্তমানে একান্ত প্রেম, একান্ত ন্যায়পরায়ণতা ও একান্ত সৎ-যুক্তি প্রয়োগ করে তখন সহজেই সেসব তত্ত্বের মধ্যে বিরোধ দেখা যায়। ন্যায়পরায়ণতা অনেক সময় যা চায়, প্রেম তা ঘৃণা করে। সৎ-যুক্তি একটা সন্তোষজনক আদর্শ বা বিধানের সন্ধানে প্রকৃতির সব তথ্য ও মানুষের নানা সম্বন্ধ শান্ত ও নিরপেক্ষভাবে বিচার করে দেখে যে একান্ত ন্যায়পরায়ণতা বা একান্ত প্রেমের শাসনকে বিনা পরিবর্তনে স্বীকার করা যায় না। আর বস্তুতঃ মানুষের একান্ত ন্যায়পরায়ণতা কার্যক্ষেত্রে সহজেই হয়ে দাঁড়ায় ঘোর অন্যায়; কারণ তার মন যা রচনা করে তা একদেশী ও কঠোর হয় বলে সে যে পরিকল্পনা বা মূর্তি খাড়া করে তা-ও একদেশী,

আংশিক ও কঠোর হয়, অথচ মন দাবী করে যে এটি সমগ্র ও একান্ত, সে একে প্রয়োগ করতে চায় কিন্তু এই প্রয়োগে বিষয়সমূহের সূক্ষ্মতর সত্য ও জীবনের নমনীয়তা উপেক্ষা করা হয়। প্রয়োগের সময় আমাদের সকল মানই হয় আপোষরফার প্রবাহের উপর তাদের দৃঢ়তা হারায় আর না হয় এই আংশিকতা ও অনমনীয় গঠনের জন্য ভ্রমে পড়ে। মানব এক দিক থেকে অন্য দিকে দুলে বেড়ায়; জাতি বিভিন্ন বিরোধী দাবীর দ্বারা চালিত হয়ে অগ্রসর হয় আঁকাবাঁকা পথে এবং সে যা কামনা করে বা ন্যায়সঙ্গত মনে করে বা দেহধারী চিৎপুরুষের কাছে উপর থেকে সর্বোত্তম আলো যা দাবী করে সে সবের বদলে বরং প্রকৃতি যা চায় তা-ই সহজ সংস্কার বশে করে যায় তবে প্রভূত অপচয় ও দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে।

আসল কথা এই যে আমরা একান্ত নৈতিক গুণের মতবাদে এসে অবশ্য পালনীয় হিসেবে এক আদর্শ বিধান স্থাপন করেছি বলেই যে আমাদের অন্বেষণ শেষ হয়েছে বা আমরা মুক্তিপ্রদ সত্যের স্পর্শ পেয়েছি তা নয়। একথা নিঃসন্দেহ যে এখানে এমন কিছু আছে যা আমাদের মধ্যকার দেহগত ও প্রাণগত মানুষের সঙ্কীর্ণতা ছাড়িয়ে উর্ধ্বে উঠতে আমাদের সাহায্য করে, আর আছে জড়ের জীবন্ত মৃত্তিকাতে প্রতিষ্ঠিত ও এখনো বদ্ধ মানবজাতির ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সব প্রয়োজন ও কামনার উর্ধ্বে ওঠার এক প্রবল নির্বন্ধ এবং এমন এক আস্পৃহা যা আমাদের মধ্যে মানসিক ও নৈতিক সত্তা বিকাশসাধনের সহায়কর; সুতরাং এই নতুন উর্ধ্বায়ণকারী উপাদান আমাদের পক্ষে এক খুবই গুরুত্বপূর্ণ লাভ; পার্থিব প্রকৃতির দুরূহ বিবর্তনে এর ক্রিয়াধারা অগ্রগতির এক বৃহৎ পদক্ষেপ। আবার এইসব নৈতিক ভাবনার অপ্রচুরতার পিছনে আরো কিছু প্রচ্ছন্ন আছে যা পরমসত্যের সঙ্গে সংযুক্ত; এমন এক আলো ও সামর্থ্যের ক্ষীণ আভা এখানে আছে যা এখনো অনধিগত দিব্যপ্রকৃতির অংশ। কিন্তু এইসব বিষয়ের মানসিক ভাবনা সে আলো নয়, তাদের নৈতিক রূপায়ণ সে সামর্থ্য নয়। যে মন দিব্য চিৎপুরুষকে মূর্ত করতে অক্ষম তার শুধু প্রতিরূপ রচনা এইসব; তাদের অমোঘ সূত্রের মধ্যে এই পুরুষকে আটক রাখার জন্য তাদের চেষ্টা বৃথা। আমাদের মধ্যকার মানসিক ও নৈতিকসত্তার উর্ধ্বে আছে এক মহত্তর দিব্য সত্তা যা আধ্যাত্মিক ও অতিমানসিক; কারণ যে বৃহৎ আধ্যাত্মিক লোকে মনের সব সূত্র সাক্ষাৎ অনুভূতির শুভ্র শিখায় বিলীন হয় তার মাধ্যমেই আমরা মন ছাড়িয়ে তার সব রচনা ফেলে যেতে পারি অতিমানসিক সব সদ্‌বস্তুর বৃহত্ত্বে ও স্বাধীনতায়। শুধু সেইখানেই আমরা পেতে পারি সেইসব দিব্য সামর্থ্যের সুসঙ্গতির স্পর্শ যেগুলি আমাদের মনে আসে বিকৃত প্রতিরূপ হয়ে বা নৈতিক বিধানের পরস্পর বিরুদ্ধ বা অস্থির উপাদানের মিথ্যা সূত্রের আকারে। শুধু একমাত্র সেখানেই, সেই অতিমানসিক চিৎপুরুষের মধ্যে যিনি যুগপৎ আমাদের মন, প্রাণ ও

দেহের গূঢ় উৎস ও গন্তব্যস্থল — সম্ভব হয়ে ওঠে রূপান্তরিত প্রাণময়, অন্নময় ও দীপ্ত মনোময় মানুষের একত্বসাধন। একমাত্র সেখানেই সম্ভব একান্ত ন্যায়, প্রেম ও সত্যতা — তবে আমরা যা কল্পনা করি তা থেকে এসব প্রভূত বিভিন্ন — আর এসব পরম দিব্য জ্ঞানের আলোকে পরস্পরের সঙ্গে সম্পূর্ণ সুসমঞ্জস। একমাত্র সেখানেই সম্ভব আমাদের বিভিন্ন অঙ্গের বিরোধের মিলনসাধন।

অন্য কথায় এক এক বৃহৎ অসীম চেতনার এমন এক মহত্তর সত্য আছে যা সমাজের বাহ্যবিধান ও মানুষের নৈতিক বিধানের ঊর্ধ্বে এবং তাদের অতীত, অথচ এদের মধ্যে কিছু একটা তাকেই পেতে চায় — অবশ্য ক্ষীণভাবে ও তাকে না জেনে; এ হল এক দিব্যবিধান আর এই দুই অন্ধ ও স্থূল রূপায়ণ হল পশুর প্রাকৃত বিধান ছেড়ে আরো উন্নত আলো বা বিশ্বজনীন বিধিতে যাবার চেষ্টায় সেই দিব্যবিধানের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হবার স্খলিত পদক্ষেপ। আমাদের অন্তঃস্থ দেবতা আমাদেরই চিৎপুরুষ যিনি নিজের প্রচ্ছন্ন সিদ্ধির দিকে চলেছেন, সুতরাং ঐ দিব্য মান নিশ্চয়ই আমাদের প্রকৃতির এক পরম আধ্যাত্মিক বিধান ও সত্য। আবার যেহেতু, আমরা জগতে সাধারণ জীবন ও প্রকৃতি বিশিষ্ট দেহধারী সত্তা, অথচ বিশ্বাতীতের সঙ্গে সরাসরি সংস্পর্শলাভে সমর্থ ব্যষ্টি অন্তঃপুরুষ, সেহেতু আমাদের এই পরম সত্যেরও দুটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। এ হবে নিশ্চয়ই এমন এক বিধান ও সত্য যা এক মহৎ আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন সমষ্টিগত জীবনের নিখুঁত গতিবৃত্তি, সামঞ্জস্য ও ছন্দ আবিষ্কার করে আর সঠিকভাবে নির্ণয় করে প্রকৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ একত্বের মধ্যে প্রতি সত্তা ও সকল সত্তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক। সেই সঙ্গে এ হবে এমন বিধান ও সত্য যা প্রতি মুহূর্তে আমাদের কাছে ব্যক্ত করে ব্যষ্টি জীবের অন্তঃপুরুষ, মন, প্রাণ, দেহের মধ্যে ভগবানের সরাসরি প্রকাশের ছন্দ ও সঠিক ক্রমগুলি[১]। আর আমরা অনুভূতিতে দেখতে পাই যে এই পরম আলোক ও ক্রিয়াশক্তি তার সর্বোচ্চ প্রকাশে এক সাথে এক অমোঘ বিধান এবং একান্ত স্বাধীনতা। এ এক অমোঘ বিধান কেননা এটি আমাদের প্রতি আন্তর ও বাহ্য গতিবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করে এক অপরিবর্তনীয় সত্যের দ্বারা। অথচ প্রতি মুহূর্তে ও প্রতি গতিবৃত্তিতে পরাৎপরের একান্ত স্বাধীনতা চালনা করে আমাদের সচেতন ও মুক্ত প্রকৃতির পূর্ণ নমনীয়তা।

নৈতিক আদর্শবাদী এই পরম বিধান আবিষ্কার করতে চেষ্টা করে তার নিজের নীতিসম্বন্ধীয় তথ্যের মধ্যে, সেইসব অবর শক্তি ও উপাদানের মধ্যে যেগুলি মানসিক ও নৈতিক সূত্রের অন্তর্গত। এবং তার রক্ষণ ও সংহতির জন্য সে আচরণের এমন এক মৌলিক তত্ত্ব নির্বাচন করে যা মূলতঃ ত্রুটিপূর্ণ এবং বুদ্ধি, কার্যকারিতা, সুখবাদ, যুক্তিবিচার, বোধিময় বিবেক বা অন্য কোন সাধারণ মান দ্বারা রচিত। এইসব চেষ্টা যে নিষ্ফল হতে বাধ্য তা জানা কথা। আমাদের আন্তর প্রকৃতি সনাতন পরম চিৎপুরুষের ক্রমোত্তর প্রকাশ, আর এ হল এমন এক জটিল শক্তি যাকে কোন একটিমাত্র প্রবল

[১] সুতরাং যে ধর্ম কথাটির অর্থ নৈতিকতা বা ইংরাজী শব্দ "রিলিজিয়ন্"-এর চেয়ে বেশী কিছু, গীতায় তার সংজ্ঞা হল আমাদের আত্মসত্তার স্বরূপ ভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ক্রিয়া।

মানসিক বা নৈতিক তত্ত্ব দিয়ে বাঁধা যায় না। একমাত্র অতিমানসিক চেতনাই সক্ষম এর বিষম ও বিরোধপূর্ণ বিভিন্ন শক্তির নিকট তাদের আধ্যাত্মিক সত্য প্রকাশ করতে এবং তাদের সব বৈষম্য সুসঙ্গত করতে।

পরবর্তী বিভিন্ন ধর্মের চেষ্টা হল আচরণের পরমসত্যের এক প্রতিরূপ নির্দিষ্ট করা, এক শাস্ত্র রচনা করা এবং অবতার বা ভগবৎপ্রেরিত মহাপুরুষের মাধ্যমে ভগবদ্‌বিধান ঘোষণা করা। শুষ্ক নৈতিক ভাবনা অপেক্ষা এইসব শাস্ত্র আরো শক্তিশালী ও স্ফুরন্ত বটে, তবু তাদের বেশীরভাগই ধর্মভাব ও অতিমানবিক উৎসের ছাপ দিয়ে পবিত্র-করা নৈতিক তত্ত্বের আদর্শভাবাপন্ন মহিমাকীর্তন ছাড়া বেশী কিছু নয়। তাদের কোন কোনটিকে যেমন চরম খৃষ্টীয় নীতিকে, প্রকৃতি প্রত্যাখ্যান করে কারণ তারা এক অসাধ্য অন্তিম বিধি পালনের জন্য অন্যায়ভাবে জিদ করে। অন্যগুলিও শেষ পর্যন্ত ক্রমোন্নতিমূলক আপোষরফা হয়ে দাঁড়ায় এবং কালের অগ্রগতিতে অপ্রচলিত হয়ে পড়ে। এইসব মানসিক মেকি জিনিসের অন্যরূপ যে সত্যকার দিব্য বিধান তা এমন সব অনমনীয় নৈতিক অনুশাসনের শাস্ত্র হতে পারে না যা আমাদের সব প্রাণের গতিবৃত্তিকে তাদের লোহার ছাঁচের মধ্যে চেপে রাখে। দিব্য বিধান জীবনের সত্য, চিৎপুরুষের সত্য; আর আমাদের ক্রিয়ার প্রতি ধাপ ও আমাদের জীবনসমস্যার সকল জটিলতাকে তার নেওয়া চাই এক স্বচ্ছন্দ জীবন্ত নমনীয়তার সঙ্গে এবং তাদের অনুপ্রাণিত করা চাই তার শাশ্বত আলোকের সাক্ষাৎ স্পর্শ দিয়ে। কোন বিধি ও সূত্র হিসেবে এর কাজ করা চলবে না, এর কাজ করা চাই এক বেষ্টনকারী ও অন্তর্ভেদী সচেতন সান্নিধ্য হিসেবে যা তার অভ্রান্ত সামর্থ্য ও জ্ঞানবলে নির্ধারণ করে আমাদের সকল মনন, কাজকর্ম, বেদনা, সঙ্কল্পের প্রচোদনা।

প্রাচীন ধর্মগুলি স্থাপন করেছিল তাদের জ্ঞানীর অনুশাসন, মনু বা কনফিউসিয়াস কথিত তাদের বাণী, এক জটিল শাস্ত্র যার মধ্যে তাদের চেষ্টা ছিল সামাজিক বিধি ও নৈতিক বিধানকে আমাদের সর্বোত্তম প্রকৃতির কতকগুলি শাশ্বত তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত করে এক প্রকার ঐক্যসাধক মিশ্রণ তৈরী করা। এই তিনটিকে তারা দেখত সমান ভূমিতে যেন তিনটিই নিত্য সত্যের, "সনাতন ধর্মে"র সমান অভিব্যক্তি। কিন্তু এই উপাদানগুলির মধ্যে দুটি ক্রমোন্নতিশীল, সাময়িকভাবে সত্য, সনাতনের সঙ্কল্পের মানসিক রচনা, মানুষী ভাষ্য; তৃতীয়টি কতকগুলি সামাজিক ও নৈতিক সূত্রের সঙ্গে যুক্ত ও তাদের অধীন হওয়ায় তার সব রূপের যা দশা হল তারও সেই দশা হল। হয় এই শাস্ত্র অপ্রচলিত হয়ে পড়ে আর তাকে উত্তরোত্তর বদলাতে হয় বা শেষে একেবারে ফেলে দিতে হয়; আর না হয়, ব্যষ্টি ও জাতির আত্মবিকাশের পথে তা এক অনড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শাস্ত্র খাড়া করে এক সমষ্টিগত বাহ্য মান; কিন্তু তাতে ব্যক্তির আন্তর স্বভাব ও তার অন্তঃস্থ গূঢ় আধ্যাত্মিক শক্তির অনির্ণেয় উপাদানগুলিকে উপেক্ষা করা হয়। কিন্তু ব্যক্তির স্বভাবকে উপেক্ষা করা যাবে না, তার দাবী রদ করা চলে না। তার বহির্মুখী সংবেগের অবাধ প্রশ্রয়ের ফলে আসে নৈরাজ্য ও বিনাশ, কিন্তু বাঁধাধরা যান্ত্রিক বিধির দ্বারা তার অন্তঃপুরুষের স্বাধীনতাকে দমন ও নিগ্রহ করার অর্থ নিশ্চলতা বা আন্তর

মৃত্যু। তার যে পরম বিষয় আবিষ্কার করা চাই তা বাইরে থেকে এইরকম কোন নিগ্রহ বা নিয়ন্ত্রণ নয়, তা হল তার সর্বোত্তম চিৎপুরুষকে এবং এক শাশ্বত গতিবৃত্তির সত্যকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করা।

উচ্চতর নৈতিক বিধানকে ব্যক্তিই আবিষ্কার করে তার মনে ও সঙ্কল্পে ও চৈত্যবোধে, আর তারপর তা বিস্তৃত হয় জাতিতে। পরমবিধানকেও ব্যক্তিরই আবিষ্কার করা চাই তার চিৎপুরুষে। একমাত্র তখনই তা প্রসারিত করা যায় অপরের মধ্যে আধ্যাত্মিক অনুভবের মাধ্যমে, মানসিক ভাবনা দিয়ে নয়। বিধি বা আদর্শ হিসেবে নৈতিক বিধান সেইসব ব্যক্তির উপর আরোপ করা যেতে পারে যারা চেতনার এমন স্তরে পৌঁছয়নি বা মন ও সঙ্কল্প ও চৈত্যবোধে তেমন সূক্ষ্ম হয়নি যাতে এটি তাদের কাছে হয়ে উঠতে পারে বাস্তব সত্য বা জীবন্ত শক্তি। আদর্শ হিসেবে একে শ্রদ্ধা করা যায়, পালন করার প্রয়োজন নেই। বিধি হিসেবে একে পালন করা যায় এর বহিরঙ্গে, এমনকি আন্তর মর্ম একেবারে না বুঝলেও। অতিমানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে এইভাবে যান্ত্রিক করা যায় না, তাকে কোন মানসিক আদর্শে বা বাহ্য বিধিতে পরিণত করা সম্ভব নয়। তার নিজস্ব বিভিন্ন বৃহৎ গতিধারা আছে, কিন্তু এসবকে বাস্তব করা চাই, এদের হওয়া চাই এমন এক সক্রিয় শক্তির কর্মপ্রণালী যাকে ব্যক্তির চেতনায় অনুভব করা হয়েছে, আর হওয়া চাই মন, প্রাণ ও দেহকে রূপান্তর করতে সক্ষম এক সনাতন সত্যের প্রতিলিপি। আর এটি এইরকম বাস্তব, কার্যকরী ও অমোঘ হওয়ায় অতিমানসিক চেতনা ও আধ্যাত্মিক জীবনের সার্বজনীনতাই একমাত্র শক্তি যা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীবের মধ্যে আনতে পারে ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সিদ্ধি। দিব্য চেতনা ও তার অনপেক্ষ সত্যের সঙ্গে আমাদের অবিরত সংস্পর্শে আসাই একমাত্র উপায় যা দিয়ে চিন্ময় ভগবানের, স্ফুরন্ত পরমার্থসৎ-এর কোন রূপ আমাদের পৃথ্বী জীবনকে নিয়ে তার সংঘর্ষ, পদস্খলন, সব দুঃখকষ্ট ও মিথ্যাকে রূপান্তরিত করতে পারে পরম আলোক, সামর্থ্য ও আনন্দের প্রতিমূর্তিতে।

পরতমের সঙ্গে অন্তঃপুরুষের অবিরত সংস্পর্শের পরাকাষ্ঠা হল সেই আত্মদান যাকে আমরা বলি দিব্যসঙ্কল্পের নিকট সমর্পণ এবং সর্বময় পরম একের মধ্যে বিভক্ত অহং-এর নিমজ্জন। অতিমানসিক চেতনা ও আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি ও স্থায়ী অবস্থা হল অন্তঃপুরুষের বিরাট বিশ্বজনীনতা, সকলের সঙ্গে প্রগাঢ় ঐক্য। একমাত্র এই বিশ্বজনীনতা ও ঐক্যের মধ্যেই আমরা পেতে পারি দেহধারী চিৎপুরুষের জীবনে দিব্য অভিব্যক্তির পরম বিধান; একমাত্র তার মধ্যেই আমরা আবিষ্কার করতে পারি আমাদের ব্যষ্টি প্রকৃতির পরম গতি ও যথার্থ ক্রিয়া। একমাত্র তার মধ্যেই এইসব অধস্তন বৈষম্য তাদের বিরোধ ঘুচিয়ে পরিণত হতে পারে, যে সব অভিব্যক্ত সত্তা একই পরম দেবতার অংশ, এক বিশ্বজননীর সন্তান, তাদের সত্যকার বিভিন্ন সম্বন্ধের বিজয়ী সামঞ্জস্যে।

সকল আচরণ ও ক্রিয়া এমন এক পরম সামর্থ্য, শক্তির গতিবৃত্তির অংশ যা অনন্ত এবং উৎসে ও গূঢ় তাৎপর্যে ও সঙ্কল্পে দিব্য যদিও তার যে সব রূপ আমরা দেখি সে সব মনে হয় নিশ্চেতন বা অজ্ঞানময়, জড়ীয়, প্রাণিক, মানসিক সান্ত; এই শক্তিই ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত প্রকৃতির অন্ধকারের মধ্যে ভগবান ও অনন্তের কিছু উত্তরোত্তর প্রকট করার জন্য কর্মরত। এই সামর্থ্যই নিয়ে যাচ্ছে পরম আলোকের দিকে, তবে এখনও অবিদ্যার মধ্য দিয়ে। এটি মানুষকে নিয়ে যায় প্রথম তার বিভিন্ন প্রয়োজন ও কামনার মধ্য দিয়ে, পরে সে তাকে চালনা করে এমন সব প্রয়োজন ও কামনার মধ্য দিয়ে যেগুলির পরিধি আরো বৃহৎ ও যেগুলি মানসিক ও নৈতিক আদর্শ দ্বারা সংযত ও আলোকিত। এখন তার উদ্যোগ চলছে তাকে এমন এক আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে নিয়ে যাবার জন্য যা এইসব জিনিসকে বাতিল করে দেয়, অথচ আবার, তাদের সার্থক ও সুসঙ্গত করে যা সব তাদের আন্তর ভাব ও উদ্দেশ্যে দিব্যভাবে সত্য তাদের মধ্যে। প্রয়োজন ও কামনাকে সে রূপান্তরিত করে দিব্য সঙ্কল্প ও আনন্দে। মানসিক ও নৈতিক আস্পৃহাকে রূপান্তরিত করে তাদের অতীত পরম সত্য ও সিদ্ধির সব শক্তিতে। ব্যষ্টি প্রকৃতির বিভক্ত কষ্টকর প্রয়াসের, পৃথক অহং-এর উচ্চণ্ড বেগ ও সংঘর্ষের বদলে সে আনে আমাদের অন্তঃস্থ বিশ্বভাবাপন্ন ব্যক্তির অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সত্তার, যে চিৎপুরুষ পরম চিৎপুরুষের অংশ তার প্রশান্ত, গভীর, সুসঙ্গত ও সুখময় বিধান। আমাদের অন্তঃস্থ এই সত্যকার ব্যক্তি বিশ্বাত্মক হওয়ায় সে নিজের পৃথক পরিতৃপ্তিসাধন চায় না, সে শুধু চায় প্রকৃতির মধ্যে তার বহির্মুখী প্রকাশে তার আসল উচ্চ অবস্থায় নিজের শ্রীবৃদ্ধি, তার আন্তর দিব্য আত্মার বহিঃপ্রকাশ, আর চায় নিজের মধ্যে সেই বিশ্বাতীত আধ্যাত্মিক সামর্থ্য ও সান্নিধ্য যা সকলের সঙ্গে এক এবং প্রতি বিষয় ও জীবের সঙ্গে এবং দিব্য সৃষ্টিতে সকল সমষ্টিগত ব্যক্তিসত্ত্ব ও বিভিন্ন শক্তির প্রতি সমবেদনাপূর্ণ, অথচ আবার সে এসবকে ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বে অবস্থিত এবং কোন জীব বা সমষ্টির অহন্তার দ্বারা আবদ্ধ নয় অথবা তাদের অপরা প্রকৃতির অজ্ঞানময় সব নিয়ন্ত্রণের দ্বারা সীমিত নয়। এ হল সেই উচ্চ উপলব্ধি যা আমাদের সকল অন্বেষণ ও উদ্যমের সম্মুখে থাকে আর এই আমাদের প্রকৃতির সকল উপাদানের পূর্ণ সুসঙ্গতি ও রূপান্তরের নিশ্চিত আশ্বাস দেয়। শুদ্ধ, সমগ্র ও নিখুঁত ক্রিয়া সম্ভব হয় কেবল তখনই যখন তা সাধিত হয়, আর আমরা উপনীত হই আমাদের এই অন্তঃস্থ গূঢ় দিব্যসত্তার উত্তুঙ্গ শিখরে।

সিদ্ধ অতিমানসিক ক্রিয়া কোন একটিমাত্র তত্ত্ব বা সীমিত বিধি অনুযায়ী চলবে না। তা যে অহমাত্মক ব্যক্তির বা কোন সুগঠিত গোষ্ঠীমানসের মান পূরণ করবে তারও সম্ভাবনা নেই। সংসারের বস্তুবাদী কাজের লোক, বা ন্যায়নিষ্ঠ নীতিবাদী বা দেশপ্রেমিক বা ভাববিলাসী মানবহিতৈষী বা আদর্শপরায়ণ দার্শনিক — এদের কারোরই দাবী অনুযায়ী তা চলবে না। এক দীপ্ত ও উন্নত সত্তা, সঙ্কল্প ও জ্ঞানের সমগ্রতার মধ্যে উচ্চ শিখরসমূহ থেকে স্বতঃপ্রবাহিত বহির্ধারার পথ ধরেই তা এগিয়ে যাবে, বুদ্ধিগত যুক্তি বা নীতিগত সঙ্কল্পের দৌড় যে নির্বাচিত, হিসেব করা মানসম্মত ক্রিয়া সে অনুযায়ী নয়।

তার একমাত্র লক্ষ্য হবে আমাদের মধ্যে যা দিব্য তার বহিঃপ্রকাশ করা এবং জগৎ ও ভবিষ্যৎ পরমা অভিব্যক্তির দিকে তার অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখা। এমনকি এটি ততটা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে না যতটা হবে সত্তার স্বতঃস্ফূর্ত বিধান এবং দিব্য সত্যের আলোকে এবং তার স্বয়ংক্রিয় প্রভাবের দ্বারা ক্রিয়ার বোধিত নির্ধারণ। যেমন প্রকৃতির ক্রিয়ার উদ্ভব হয় তার পশ্চাতে এক সমগ্র সঙ্কল্প ও জ্ঞান থেকে, তেমন এরও উদ্ভব হবে সমগ্র সঙ্কল্প ও জ্ঞান থেকে তবে এই সঙ্কল্প ও জ্ঞান চিন্ময়ী পরাপ্রকৃতির দ্বারা আলোকিত, তখন আর তারা এই অবিদ্যাময়ী প্রকৃতির মধ্যে তমসাচ্ছন্ন নয়। এ হবে এমন ক্রিয়া যা সব দ্বন্দ্বের দ্বারা আবদ্ধ না হয়ে হবে সৃষ্টিতে চিৎপুরুষের নিরপেক্ষ আনন্দের মধ্যে পূর্ণ ও বৃহৎ। আর্ত ও অবিদ্যাচ্ছন্ন অহং-এর সব বিমূঢ়তা ও ত্রুটিবিচ্যুতি সরিয়ে তার স্থলে আসবে এমন দিব্য সামর্থ্য ও প্রজ্ঞার সুখময় ও অনুপ্রাণিত সঞ্চরণ যা আমাদের দেয় পথের নির্দেশ, চলার বেগ।

যদি দিব্য শক্তিপাতের কোন অলৌকিক ক্রিয়ার দ্বারা সমগ্র মানব জাতিকে এক সাথে এই স্তরে ওঠান সম্ভব হ'ত তাহলে আমরা পৃথিবীর উপর এমন কিছু পেতাম যা লোকশ্রুতির স্বর্ণযুগ, সত্যযুগ অর্থাৎ সত্যময় জীবনের সদৃশ। কারণ সত্যযুগের লক্ষণ এই যে প্রতি জীবের মধ্যে পরম বিধান স্বতঃস্ফূর্ত ও সচেতন আর তা তার নিজের কাজ করে পূর্ণ সুসঙ্গতি ও স্বাধীনতার মধ্যে। জাতির চেতনার ভিত্তি হবে ঐক্য ও বিশ্বজনীনতা, কোন ভেদগত বিভেদ নয়; প্রেম হবে একান্ত, সাম্য এমন হবে যা শ্রেণী বিভাগের সঙ্গে সুসমঞ্জস, পার্থক্যের মধ্যেও পরিপূর্ণ; একান্ত ন্যায়পরায়ণতা সুপ্রতিষ্ঠিত হবে সত্তার এমন স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়ার দ্বারা যা বিষয়সমূহের সত্য ও নিজের ও অপর সবের সত্যের সঙ্গে সুসঙ্গতিপূর্ণ এবং সেজন্য সত্যকার ও যথার্থ ফল সম্বন্ধে নিশ্চিত; যে যথার্থ যুক্তিশক্তি আর মানসিক নয়, অতিমানসিক সে কৃত্রিম সব মান অনুসরণ ক'রে তৃপ্ত হবে না, তার তৃপ্তি হবে যথার্থ সম্বন্ধের স্বচ্ছন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ত বোধে এবং কার্যের মধ্যে তাদের অবশ্যম্ভাবী সম্পাদনায়। ব্যষ্টি ও সমাজের মধ্যে বিবাদ, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে সর্বনাশা সংঘর্ষ — এসব থাকার কোন কারণ থাকবে না, দেহধারী সব সত্তার মধ্যে অন্তর্নিহিত বিশ্বচেতনার ফলে একত্বের মধ্যে সুসমঞ্জস বৈচিত্র্যের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ সম্ভব হবে।

মানবজাতির বর্তমান অবস্থায় এই উচ্চস্তরে আরোহণের দায়িত্ব ব্যক্তিরই, — পথিকৃৎ ও অগ্রদূত হিসেবে। সে যদি বিচ্ছিন্ন থাকে তাহলে তার সব বাহ্য কর্মের ধারা ও রূপ এমন হতে বাধ্য যা সচেতনভাবে দিব্য সমষ্টিগত ক্রিয়ার সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। তার সব কর্মের মূল যে আন্তর অবস্থা তা একই হবে, কিন্তু আসল কর্মগুলি অবিদ্যামুক্ত পৃথিবীতে যেমন হওয়া উচিত তা না হয়ে হতে পারে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তবু তার চেতনা ও তার আচরণের দিব্য কর্মকৌশল — অবশ্য এমন মুক্ত বিষয় সম্বন্ধে যদি এরকম পদের ব্যবহার সঙ্গত হয় — এমন হবে যা আগে বলা হয়েছে অর্থাৎ আমরা যাকে পাপ বলি সেই প্রাণিক অশুচিতা ও কামনা ও অনুচিত সংবেগের অধীনতা থেকে

সে মুক্ত হবে, আমরা যাকে পুণ্য বলি সেই নির্দিষ্ট নৈতিক সব সূত্রের শাসনের মধ্যে সে আবদ্ধ থাকবে না, সে হবে মনের চেতনা অপেক্ষা বৃহত্তর এক চেতনার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নিশ্চিত ও শুদ্ধ পূর্ণ এবং তার সকল পদক্ষেপে তাকে নিয়ন্ত্রণ করবে পরম চিৎপুরুষের আলোক ও সত্য। কিন্তু অতিমানসিক সিদ্ধিলাভ করেছে এমন সব ব্যক্তি নিয়ে যদি কোন সমষ্টি বা গোষ্ঠী রচনা সম্ভব হয়, তাহলে বাস্তবিকই কোন দিব্য সৃষ্টির রূপ পরিগ্রহও সম্ভব হয়, আর এও সম্ভব যে এক নতুন পৃথিবী নেমে আসবে আর তা হবে এক নতুন স্বর্গ, পার্থিব অবিদ্যার অন্ধকার সরে যেতে থাকবে আর তার মাঝে এখানে সৃষ্ট হবে এক অতিমানসিক আলোকের জগৎ।

অষ্টম অধ্যায়

পরম সঙ্কল্প

যে পরম চিৎপুরুষ প্রথমে মনে হয় অবিদ্যার মধ্যে আবদ্ধ আর পরে অনন্তের সামর্থ্য ও প্রজ্ঞায় স্বাধীন, তাঁর এই উত্তরোত্তর অভিব্যক্তির আলোকে আমরা আরো ভালোভাবে বুঝতে পারি কর্মযোগীর প্রতি গীতার মহান্ ও সর্বশ্রেষ্ঠ অনুশাসন, "সকল ধর্ম, আচরণের সকল তত্ত্ব ও বিধান ও বিধি পরিত্যাগ ক'রে শরণ লও একমাত্র আমাতে"। সকল মান ও বিধি সাময়িক রচনা; জড় থেকে পরম চিৎপুরুষে অহং-এর সংক্রমণের পথে তার বিভিন্ন প্রয়োজনের উপরই সে সবের প্রতিষ্ঠা। এই সব সাময়িক কৌশল আপেক্ষিকভাবে অবশ্য পালনীয় যতদিন আমরা সংক্রমণের বিভিন্ন পর্যায়ে তৃপ্ত, শারীরিক ও প্রাণিক জীবনেই সন্তুষ্ট, মানসিক গতিবৃত্তিতে আসক্ত অথবা এমনকি মনোলোকের যে সব স্তর আধ্যাত্মিক দীপ্তির স্পর্শ পেয়েছে তাদের মধ্যেও নিবদ্ধ থাকি। কিন্তু এসবের ওপারে আছে অতিমানসিক অনন্ত চেতনার অবারিত ব্যাপ্তি, আর সেখানে অবসান হয় সকল সাময়িক গঠনের। সর্বভূতের অধীশ্বর, জীবের সুহৃৎ-এর হাতে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের ছেড়ে দেবার এবং আমাদের সব মানসিক সীমাবন্ধন ও মানদণ্ড পুরোপুরি আমাদের পিছনে ফেলে যাবার উপযোগী বিশ্বাস ও সাহস আমাদের যদি না থাকে, তাহলে সনাতন ও অনন্তের আধ্যাত্মিক সত্যের মধ্যে পূর্ণ প্রবেশ সম্ভব হয় না। বিনা দ্বিধায়, বিনা কুণ্ঠায়, ভয়ে বা সঙ্কোচে কোন এক মুহূর্তে আমাদের ঝাঁপ দেওয়া চাই মুক্ত, অনন্ত, পরমার্থসৎ-এর মহাসমুদ্রে। বিধানের পরে আসে স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত সাধারণ ও বিশ্বজনীন বিভিন্ন মানের পরে আছে মহত্তর কিছু, নৈর্ব্যক্তিক নমনীয়তা, দিব্য স্বাধীনতা, অতিস্থিত শক্তি এবং স্বর্গীয় সংবেগ। উত্তরণের সঙ্কীর্ণ পথের শেষে আছে শিখরের উপর বিস্তৃত সব সমতলক্ষেত্র।

উত্তরণের তিনটি পর্যায় — সর্বনিম্নে দেহগত জীবন যা প্রয়োজন ও কামনার দাসত্বের চাপে পিষ্ট; মধ্যে মানসিক উচ্চতর ভাবপ্রবণ ও চৈত্য রাজত্ব যা পেতে চায় সব মহত্তর স্বার্থ, আস্পৃহা, অনুভূতি, ভাবনা; আর শিখরসমূহে আছে প্রথম এক গভীরতর চৈত্য ও আধ্যাত্মিক অবস্থা এবং তারপর এক অতিমানসিক শাশ্বত চেতনা যার মধ্যে আমাদের সকল আস্পৃহা ও অন্বেষণ আবিষ্কার করে তাদের নিজস্ব অন্তরঙ্গ তাৎপর্য। দেহগত জীবনে প্রথমে প্রয়োজন ও কামনা এবং পরে ব্যষ্টি ও সমাজের ব্যবহারিক মঙ্গলই মুখ্য বিবেচনার বিষয়, এরাই প্রবল শক্তি। মনোময় জীবনে ভাবনা ও আদর্শের প্রভাবই বেশী, কিন্তু ভাবনাগুলি সত্যের বেশধারী অর্ধ-আলোক, আদর্শগুলি মনের তৈরী — এক উপচীয়মান কিন্তু এখনো অপূর্ণ বোধি ও অনুভূতিসঞ্জাত। যখনই মনোময় জীবনের প্রভাব বাড়ে এবং দেহগত জীবনের পাশব দাবি কমে আসে তখনই মানুষ,

মনোময় পুরুষ অনুভব করে যে মনোময় প্রকৃতির প্রেষণার তাড়নায় সে বাধ্য হচ্ছে ভাবনা বা আদর্শের তাৎপর্যে ব্যষ্টির জীবনকে নতুন রূপ দিতে; এবং পরিশেষে আরো অস্পষ্ট, আরো জটিল যে সমাজজীবন, এমনকি তা-ও বাধ্য হয় এই সূক্ষ্ম প্রণালী অনুযায়ী কাজ করতে। আধ্যাত্মিক জীবনে বা যখন মন অপেক্ষা কোন উচ্চতর শক্তি ব্যক্ত হয়ে প্রকৃতিকে অধিগত করেছে তখন, এই সব সীমিত প্রবর্তক শক্তি সরে যায়, হ্রাস পায়, ধ্বংস হয়। একমাত্র আধ্যাত্মিক বা অতিমানসিক পরমাত্মা, দিব্য পরমপুরুষ, পরম ও সর্বগত সদ্‌বস্তুই আমাদের অন্তঃস্থ প্রভু হওয়া চাই, আর চাই যে তিনিই যেন আমাদের চরম বিকাশ স্বচ্ছন্দে গঠন করেন আমাদের প্রকৃতির বিধানের সম্ভবপর সর্বাপেক্ষা উচ্চ, ব্যাপ্ত ও অখণ্ড বহিঃপ্রকাশ অনুযায়ী। পরিশেষে ঐ প্রকৃতি কাজ করে ষোড়শকল সত্য ও এর স্বতঃস্ফূর্ত স্বাধীনতার মধ্যে, কারণ এটি একমাত্র পালন করে সনাতনের প্রদীপ্ত সামর্থ্যের নির্দেশ। জীবের আর কিছু পাবার থাকে না, পূরণের কোন কামনাও থাকে না; সে হয়ে উঠেছে সনাতনের নৈর্ব্যক্তিকতার বা বিশ্বাত্মক ব্যক্তিসত্ত্বের অংশ। জীবনের মধ্যে দিব্য চিৎপুরুষের অভিব্যক্তি ও লীলা এবং দিব্য লক্ষ্যের দিকে জগতের অগ্রগতিতে জগৎ পালন ও পরিচালনা করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য তাকে কর্মে প্রবৃত্ত করতে পারে না। মানসিক ভাবনা, মতামত, রচনা — এসব আর তার নয়, কারণ তার মন নিঃস্তব্ধ হয়ে পড়েছে, এ হল দিব্যজ্ঞানের আলোক ও সত্যের প্রবাহ প্রণালী মাত্র। তার চিৎপুরুষের বিশালতার পক্ষে আদর্শগুলি অতি সঙ্কীর্ণ, অনন্তের মহাসমুদ্রই তার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, তাকে চালনা করে চিরকাল।

যে কেউ অকপটভাবে কর্মমার্গে প্রবেশ করে তার অবশ্য কর্তব্য হল সেই পর্যায় পিছনে ফেলা যাতে প্রয়োজন ও কামনা আমাদের সব ক্রিয়ার প্রথম বিধান। কেননা যদি সে যোগের উচ্চ লক্ষ্য স্বীকার করে, তাহলে যেসব কামনা এখনো তার সত্তাকে কষ্ট দেয়, তার উচিত সে সবকে নিজের থেকে সরিয়ে আমাদের অন্তঃস্থ প্রভুর হাতে তুলে দেওয়া। পরমা শক্তি তাদের ব্যবহার করবেন সাধকের মঙ্গলের জন্য ও সকলের মঙ্গলের জন্য। বস্তুতঃ আমরা দেখি যে একবার এই সমর্পণ করা হলে — অবশ্য যদি বর্জন সর্বদাই অকপট হয় — অতীত প্রকৃতির এখনো বর্তমান সংবেগের বশে কিছুকাল কামনার অহমাত্মক তোষণের পুনরাবৃত্তি হতে পারে, কিন্তু তা হবে শুধু তার সঞ্চিত বেগ নিঃশেষ করার জন্য এবং দেহধারী সত্তার যে অংশকে শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত দুরূহ তাকে অর্থাৎ তার স্নায়বিক, প্রাণিক ও ভাবপ্রবণ প্রকৃতিকে এই শিক্ষা দেবার জন্য যে অহমাত্মক কামনা মুক্তিকামী বা স্বীয় আদি দেবপ্রকৃতির অভীপ্সু অন্তঃপুরুষের বিধান নয়; আর এই শিক্ষা দেওয়া হয় কামনার সব প্রতিক্রিয়ার দ্বারা, এর ক্লেশ ও চাঞ্চল্যের দ্বারা যেগুলি অতীব তিক্ত লাগে তাদের বিপরীত যে উচ্চতর শান্তির প্রসন্ন মুহূর্তগুলি বা

দিব্য আনন্দের অপরূপ সঞ্চরণ তাদের তুলনায়। পরে ঐ সব প্রচোদনার মধ্যকার কামনার উপাদান বাইরে নিক্ষিপ্ত করা হবে বা অধ্যবসায়ের সঙ্গে বাদ দেওয়া হবে তাকে অস্বীকার ও রূপান্তরসাধন করার অবিরাম চাপে। রাখা হবে একমাত্র তাদের মধ্যকার শুদ্ধ কর্ম প্রবৃত্তি যার সমর্থনে থাকে ঊর্ধ্ব থেকে অনুপ্রাণিত বা আরোপিত সকল কর্ম ও ফলে সম আনন্দ আর তা থাকবে চরম সিদ্ধির সুখময় সামঞ্জস্যের মধ্যে। কাজ করা, ভোগ করা স্নায়বিক সত্তার সাধারণ বিধান ও অধিকার; কিন্তু ব্যক্তিগত কামনার দ্বারা এর ক্রিয়া ও ভোগ নির্বাচন করা শুধু এর অজ্ঞানময় সঙ্কল্প, এর অধিকার নয়। নির্বাচন করবেন একমাত্র পরম ও বিশ্বজনীন সঙ্কল্প; ক্রিয়ার পরিবর্তন দরকার ঐ সঙ্কল্পের স্ফুরন্ত গতিবৃত্তিতে; ভোগের স্থলে আনা চাই শুধু আধ্যাত্মিক আনন্দের খেলা। সকল ব্যক্তিগত সঙ্কল্প হয় উপর থেকে আসা এক সাময়িক নিয়োগ বা অজ্ঞানময় অসুরের অবৈধ আত্মসাৎ।

আমাদের অগ্রগতির দ্বিতীয় পর্যায় যে সামাজিক বিধান তা উন্নতির এক উপায়স্বরূপ; অহং-কে এর নিয়ন্ত্রণে আনা হয় যাতে সে এক বৃহত্তর সমষ্টিগত অহং-এর অধীন হয়ে আত্মসংযম শিখতে পারে। এই বিধানের মধ্যে নীতির বিষয় কিছু না থাকতে পারে, হয়ত তা প্রকাশ করে সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজন বা তার ধারণা অনুযায়ী তার বৈষয়িক মঙ্গল। অথবা হয়ত তা সেইসব প্রয়োজন ও সেই মঙ্গলই প্রকাশ করে তবে সেগুলিকে এক উচ্চতর নৈতিক বা আদর্শ বিধানের দ্বারা কিছু পরিবর্তিত, রঞ্জিত ও পরিপূরিত করে। বিকাশ চলছে কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ বিকশিত হয়নি ব্যক্তির পক্ষে সামাজিক কর্তব্য, পারিবারিক দায়, গোষ্ঠীগত বা জাতীয় দাবি হিসেবে এই সামাজিক বিধান পালন অবশ্য কর্তব্য যতদিন না তা এক পরতর ঋতের বর্ধিষ্ণু বোধের সংঘর্ষে আসে। কিন্তু এটিকেও কর্মযোগের সাধক কর্মের প্রভুর কাছে সমর্পণ করবে। এই সমর্পণ করার পর তার সব সামাজিক সংবেগ ও সিদ্ধান্তকে ব্যবহার করা হবে, — তার সব কামনার মতই, — শুধু তাদের নিঃশেষ করার জন্য অথবা যাতে সে তার নিম্নের মানসিক প্রকৃতিকে সমগ্র মানবজাতির বা মানবজাতির কোন গোষ্ঠীর সঙ্গে তার সব কাজে আশায় ও আস্পৃহায় এক করতে পারে সেজন্য তখনো দরকার থাকলে তাদের ব্যবহার করা যেতে পারে কিছু সময়ের জন্য। কিন্তু এই স্বল্প সময়ের পর তাদের সরিয়ে নেওয়া হবে, তখন দৃঢ়ভাবে বিরাজ করবে শুধু দিব্য প্রশাসন। ভগবানের সঙ্গে ও অন্য সকলের সঙ্গে সে এক হবে শুধু দিব্য চেতনার মাধ্যমে, মানসিক প্রকৃতির মাধ্যমে নয়।

কেননা মুক্ত হবার পরও সাধক জগতে থাকবে আর জগতে থাকার অর্থ কাজের মধ্যে থাকা। কিন্তু কামনাশূন্য হয়ে কাজে থাকার অর্থ সমগ্র জগতের মঙ্গলের জন্য অথবা মানব বা জাতির অথবা পৃথিবীর উপর ক্রমবিকশিত হবে এমন কোন নতুন সৃষ্টির জন্য বা তার অন্তঃস্থ দিব্য সঙ্কল্পের দ্বারা আরোপিত কোন কর্মের জন্য কাজ করা। আর এটি করা চাই, — হয় যে পরিবেশ বা সমাজের মধ্যে সে জন্মেছে বা স্থাপিত হয়েছে তার আবেষ্টনের মধ্যে অথবা এমন এক আবেষ্টনের মধ্যে যা তার জন্য নির্বাচন বা সৃষ্টি

করা হয়েছে কোন দিব্য নির্দেশে। সুতরাং যে মানব, গোষ্ঠী বা ভগবানের অন্য কোন সমষ্টিগত প্রকাশকে চালনা, সাহায্য বা সেবা করার জন্য মনোময় পুরুষ অভিপ্রেত তার সঙ্গে আমাদের সমবেদনা ও স্বচ্ছন্দ একাত্মতার বিরোধী বা নিবারণকারী কোন কিছু তার মধ্যে থাকবে না আমাদের সিদ্ধির অবস্থাতে। কিন্তু পরিশেষে এই স্বচ্ছন্দ একাত্মতা গড়ে ওঠা চাই ভগবানের সঙ্গে তাদাত্ম্যের মাধ্যমে, এটি মিলনের এমন কোন মানসিক বা নৈতিক বন্ধন নয় বা প্রাণিক সাহচর্য নয় যা কোন ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতিগত, সম্প্রদায়গত বা ধর্মমতমূলক অহন্তার প্রভাবাধীন। যদি কোন সামাজিক বিধান পালন করা হয় তা যে কোন স্থূল প্রয়োজনের অথবা কোন ব্যক্তিগত বা সাধারণ স্বার্থের বা সাময়িক সুবিধার জন্য বা পরিবেশের চাপে বা কর্তব্যবোধে করা হয় তা নয়, তা করা হয় একমাত্র কর্মের প্রভুর জন্য, আর এই কারণে যে অনুভব করা হয় বা জানা যায় যে দিব্যসঙ্কল্প হল এই যে, সামাজিক বিধান বা বিধি বা সম্বন্ধ এখন যা আছে তাকে আন্তর জীবনের প্রতিরূপ হিসেবে এখনও রাখা যেতে পারে আর তা লঙ্ঘন ক'রে মানুষের মনকে বিক্ষুব্ধ করা উচিত নয়। অপরপক্ষে যদি কোন সামাজিক বিধান বা বিধি বা সম্বন্ধ অগ্রাহ্য করা হয় তা-ও কামনা বা ব্যক্তিগত সঙ্কল্প বা ব্যক্তিগত মতকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য নয়, তা করা হবে এই কারণে যে পরম চিৎপুরুষের বিধান প্রকাশ করে এমন এক মহত্তর বিধি অনুভব করা হয় অথবা এটি জানা যায় যে দিব্য সর্বসঙ্কল্পের যাত্রার মধ্যে এমন এক গতিবৃত্তি আছে যার লক্ষ্য হল জগতের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় এক আরো স্বচ্ছন্দ ও বৃহৎ জীবনের জন্য প্রচলিত সব বিধান ও রূপের পরিবর্তন, অতিক্রমণ বা বিলোপসাধন।

এখনো নৈতিক বিধান বা আদর্শ বিধানের কথা বাকী আছে; যারা নিজেদের স্বাধীন মনে করে, এমনকি তাদেরও অনেকের কাছে এইসব বিধান চির পবিত্র ও মানসিক ধারণার অতীত। কিন্তু সাধক তার দৃষ্টি সর্বদাই উচ্চশিখরের দিকে নিবদ্ধ রেখে এ সবকে সঁপে দেয় তাঁর কাছে যাঁকে প্রকাশ করার জন্য সকল আদর্শ চেষ্টা করে অপূর্ণ ও খণ্ড খণ্ড ভাবে; সকল নৈতিক গুণ তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত ও সীমাহীন পূর্ণতার দীন, আড়ষ্ট ও বিকৃত অনুকরণ মাত্র। স্নায়বিক কামনা লোপের সাথে সাথে পাপ ও অশুভের বন্ধনেরও অবসান হয়; কারণ এটি আমাদের প্রাণিক বেগ, প্রচোদনা ও প্রবৃত্তির তাড়নার অর্থাৎ রজোগুণের অন্তর্গত, আর প্রকৃতির ঐ গুণের রূপান্তরের সাথে সাথে এর নিবৃত্তি হয়। কিন্তু আচারগত বা অভ্যাসগত অথবা মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা এমনকি কোন উচ্চ বা নির্মল সাত্ত্বিক গুণের সোনালি বা স্বর্ণময় শৃঙ্খলে বাঁধা থাকাও অভীপ্সুর কর্তব্য নয়। মানুষ যাকে বলে সদ্‌গুণ (Virtue), সেই ক্ষুদ্র অপ্রচুর বিষয় অপেক্ষা আরো গভীর ও আরো মৌলিক কিছু তার স্থলে আসবে। ইংরাজী পদটির আদি অর্থ ছিল "মনুষ্যত্ব" (Manhood), যা নীতিগত মন ও তার রচিত বিষয় অপেক্ষা আরো অনেক বৃহৎ ও গভীর। কর্মযোগের চরম সিদ্ধি আরো এক উচ্চতর ও গভীরতর অবস্থা, যাকে হয়তো বলা যায় "অন্তঃপুরুষত্ব" (Soulhood), কারণ অন্তঃপুরুষ মানুষ অপেক্ষা মহত্তর,

মানুষী গুণের স্থলে আসবে স্বাধীন অন্তঃপুরুষত্ব যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হবে পরম সত্য ও প্রেমের সব কর্মে। কিন্তু এই পরম সত্যকে ব্যবহারিক যুক্তিশক্তির ক্ষুদ্র গৃহে বাস করতে বাধ্য করা যায় না, এমনকি আরো সম্ভ্রমজনক বৃহত্তর ভাবনাপর যুক্তিশক্তির অট্টালিকাতেও আটকে রাখা যায় না, যদিচ এই বৃহত্তর ভাবনা নিজ প্রতিরূপাবলীকে বিশুদ্ধ সত্য বলে সীমিত মনুষ্যবুদ্ধির উপর আরোপ করে। এই পরম প্রেমের অর্থ মানুষী আকর্ষণ, সমবেদনা ও অনুকম্পার আংশিক, দুর্বল, অজ্ঞানাচ্ছন্ন ও ভাবাবেগ তাড়িত সব গতিবৃত্তি তো নয়ই; এদের সঙ্গে তার যে কোন সঙ্গতি থাকবেই তা-ও আবশ্যিক নয়। ক্ষুদ্র বিধান বৃহত্তর গতিবৃত্তিকে বাঁধতে পারে না; অন্তঃপুরুষের চরম সার্থকতা সাধন সম্বন্ধে মনের আংশিক সিদ্ধি যে তার কোন সর্ত আরোপ করবে তা হতে পারে না।

প্রথমে পরতর প্রেম ও সত্য সাধকের মধ্যে এর গতিবৃত্তি সার্থক করবে তার আপন প্রকৃতির মূল বিধান বা ধারা অনুযায়ী। কারণ তাই দিব্য প্রকৃতির বিশেষ দিক, পরমা শক্তির বিশেষ শক্তি যা থেকে তার অন্তঃপুরুষ বার হয়েছে লীলার মধ্যে, তবে অবশ্য অন্তঃপুরুষ এই বিধান বা পথের কোন রূপের মধ্যে সীমিত নয়, কারণ সে অনন্ত। কিন্তু তবু তার প্রকৃতিজাত উপাদানে সেই ছাপ থাকে, সেইসব ধারা অনুযায়ী স্বচ্ছন্দভাবে উপাদানের ক্রমবিকাশ হয় বা তারই প্রবল প্রভাবের কম্বুরেখার পথে তা আবর্তিত হয়। সে দিব্য সত্যের গতিবৃত্তিকে ব্যক্ত করবে জ্ঞানীর বা বীরকেশরীর, বা প্রেমিক ও ভোক্তার বা কর্মী ও দাসের স্বভাব অনুসারে অথবা মূল গুণসকলের যে কোন সমবায়ের আকারে যা তারই নিজস্ব আন্তর প্রেরণা তার সত্তাকে দিয়েছে। তার সব কাজে এই আত্মপ্রকৃতিরই স্বচ্ছন্দ খেলা লোকে দেখবে তার মধ্যে, কোন নিম্নতর বিধি বা বাইরের কোন বিধানের দ্বারা গঠিত, নিরূপিত ও কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রিত কোন আচরণ নয়।

কিন্তু এর চেয়েও পরতরা সিদ্ধি আছে, এমন এক আনন্ত্য আছে যার মধ্যে এই শেষ গণ্ডিও অতিক্রম করা হয়, কারণ সেখানে প্রকৃতি পায় চরম সার্থকতা আর লুপ্ত হয় তার সকল সীমানা। সেখানে অন্তঃপুরুষ বাস করে সীমার বন্ধন রহিত হয়ে; কারণ সে সকল রূপ ও ছাঁচ ব্যবহার করে তার অন্তঃস্থ দিব্য সঙ্কল্প অনুযায়ী, কিন্তু সে যে শক্তি বা রূপ ব্যবহার করে তাতে তার গতি রুদ্ধ হয় না, সে বাঁধা পড়ে না, তার মধ্যে সে আবদ্ধ থাকে না। এই হল কর্মমার্গের চূড়ান্ত আর এই হল কর্মের মধ্যে অন্তঃপুরুষের চরম স্বাধীনতা। বাস্তবিকপক্ষে, সেখানে তার কোন ক্রিয়া নেই; কারণ তার সকল কাজকর্মই পরাৎপরের ছন্দ এবং অপ্রতিহত স্বাধীনভাবে উৎসারিত হয় একমাত্র তাঁর কাছ থেকেই অনন্তের মাঝ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত সঙ্গীতের মতো।

তাহলে কর্মযোগের পথ ও সিদ্ধি হল — অহং-গত প্রকৃতির সাধারণ কর্মপ্রণালী সরিয়ে তার স্থলে এক পরম ও বিশ্বজনীন সঙ্কল্পের নিকট আমাদের সকল ক্রিয়ার সমগ্র

সমর্পণ, আমাদের অন্তঃস্থ শাশ্বত কিছুর প্রশাসনের নিকট আমাদের সকল কর্মের নিঃসর্ত ও মানাতীত সমর্পণ। কিন্তু এই দিব্য পরম সঙ্কল্প কি আর কি করেই বা আমাদের সব বিভ্রান্ত করণের ও আমাদের অন্ধ কারারুদ্ধ বুদ্ধির পক্ষে তাকে চেনা সম্ভব?

সাধারণতঃ নিজেদের সম্বন্ধে আমাদের ভাবনা এই যে আমরা বিশ্বের মধ্যে এক পৃথক "আমি", যা এক পৃথক দেহ ও মানসিক ও নৈতিক প্রকৃতির শাসক, পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজেই বেছে নেয় নিজের ইচ্ছানুযায়ী সব কাজ, অন্যের উপর নির্ভরশীল নয় এবং সেজন্য নিজের কাজের একমাত্র কর্তা ও ফলের জন্যও দায়ী সে। এই আপাতপ্রতীয়মান অহং ও তার সাম্রাজ্য ছাড়া আমাদের মধ্যে আরো সত্যকার, আরো গভীর ও শক্তিশালী কোন কিছু যে কেমন করে থাকতে পারে তা কল্পনা করা সাধারণ মনের পক্ষে, যে মন নিজের গঠন ও উপাদান সম্বন্ধে চিন্তাও করেনি, গভীরভাবে লক্ষ্যও করেনি তার পক্ষে সহজ নয়, এমনকি যেসব মন চিন্তা করেছে কিন্তু যাদের কোন আধ্যাত্মিক দর্শন ও অনুভূতি নেই তাদের পক্ষেও তা কল্পনা করা দুরূহ। কিন্তু বাইরের ঘটনাবলী সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভের পথের মত আত্মজ্ঞানলাভের পথেরও প্রথম সোপান হল বিষয়সমূহের আপাত সত্যের পিছনে গিয়ে তাদের সব বাহ্যরূপ যে প্রকৃত কিন্তু মুখোশ দেওয়া মূল ও স্ফুরন্ত সত্য ঢেকে রাখে তা খুঁজে বার করা।

এই অহং বা "আমি" আমাদের মূল অংশ হওয়া দূরের কথা কোন স্থায়ী সত্যও নয়; এ হল প্রকৃতির এক গঠন মাত্র, বিষয়গ্রাহী বিবেকী মনে মনন-কেন্দ্রীকরণের এক মানসিক রূপ, আমাদের প্রাণের বিভিন্ন অংশে বেদনা ও ইন্দ্রিয়সংবিৎ কেন্দ্রীকরণের এক প্রাণিক রূপ, এমন শারীরিক সচেতন গ্রহণের রূপ যা আমাদের দেহের ধাতু ও ধাতুর ক্রিয়া কেন্দ্রীভূত করে। আন্তরভাবে আমরা যা সব তা অহং নয়, তা চেতনা, অন্তঃপুরুষ বা চিৎপুরুষ। বাহ্যতঃ ও উপরভাসাভাবে আমরা যা সব ও যা করি তা অহং নয়, প্রকৃতি। এক কার্যসাধিকা শক্তি আমাদের গঠন করে আর এইভাবে আমাদের যে স্বভাব, পরিবেশ বা মানসিকতা গঠিত হয় তাদের মধ্য দিয়ে, বিশ্বশক্তিসমূহের যে ব্যষ্টিভাবাপন্ন রূপায়ণ আমাদের, তার মধ্য দিয়ে এ নির্ধারণ করে আমাদের সব কর্ম ও তাদের ফল। বস্তুতঃ আমরা চিন্তা করি না বা সঙ্কল্প করি না বা কাজ করি না, তবে চিন্তা আমাদের মধ্যে ঘটে, সঙ্কল্প আমাদের মধ্যে ঘটে, সংবেগ ও কর্ম আমাদের মধ্যে ঘটে, আর প্রকৃতির এইসব কাজকর্মের প্রবাহকে আমাদের অহংবোধ নিজের চারিদিকে একত্র করে আর নিজেকে মনে করে তাদের কারণ। যা মনন তৈরী করে, সঙ্কল্প আরোপ করে, সংবেগ সঞ্চার করে তা বিশ্বশক্তি, প্রকৃতি। আমাদের দেহ, মন ও অহং সেই ক্রিয়ারও শক্তিসমূহের এক তরঙ্গ, তারা এই শক্তিকে শাসন করে না, বরং শক্তিই তাদের শাসন করে, চালনা করে। সত্য ও আত্মজ্ঞানের দিকে তার অগ্রগতির পথে সাধককে এমন এক স্থানে আসতে হবে যেখানে অন্তঃপুরুষ তার দর্শনের নেত্র খুলে অহং-এর এই সত্য, কর্মের এই সত্য স্বীকার করে। এক মানসিক, প্রাণিক, শারীরিক "আমি" কাজ করে বা সব ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে — এই ভাবনা সে পরিহার করে, সে প্রণিধান করে যে প্রকৃতি বা

বিশ্বনিসর্গের শক্তি তার নির্দিষ্ট সব পদ্ধতি অনুসরণ করে — তা-ই তার মধ্যে ও সকল বিষয় ও জীবের মধ্যে একক ও একমাত্র কর্মী।

কিন্তু প্রকৃতির এইসব পদ্ধতি নির্দিষ্ট করেছে কে? কে-ই বা শক্তি সঞ্চরণের উৎস ও শাসক? পিছনে এক চেতনা বা চিন্ময়সত্তা আছেন যিনি তার সকল কর্মের প্রভু, সাক্ষী, জ্ঞাতা, ভোক্তা, ধারক ও অনুমন্তা, এই চেতনাই পুরুষ। প্রকৃতি আমাদের মধ্যে ক্রিয়ার আকার দেয়; পুরুষ প্রকৃতির মধ্যে বা পশ্চাতে থেকে সেই ক্রিয়া দেখেন, সম্মতি দেন, বহন ও ধারণ করেন। প্রকৃতি আমাদের মধ্যে মনন গঠন করে, পুরুষ তার মধ্যে বা পশ্চাতে থেকে সেই মনন ও তার মধ্যকার সত্য জানেন। প্রকৃতি ক্রিয়ার ফল নির্ধারণ করে, পুরুষ তার মধ্যে বা পশ্চাতে থেকে সেই আনন্দ বা কষ্ট ভোগ করেন। প্রকৃতি মন ও দেহ গঠন করে, তাদের নিয়ে কাজ করে, তাদের বিকাশ সাধন করে, পুরুষ এই গঠন ও বিবর্তনকে ধারণ করেন ও প্রকৃতির প্রতি ধাপ অনুমোদন করেন। প্রকৃতি সঙ্কল্পশক্তি প্রয়োগ করে আর তাই সকল বিষয় ও মানুষের মধ্যে কাজ করে; এই সঙ্কল্পশক্তিকে পুরুষ করণীয় কর্মে প্রবৃত্ত করেন তাঁর অন্তর্দৃষ্টিবলে। এই পুরুষ আমাদের উপরভাসা অহং নয়, এ হল অহং-এর পশ্চাতে এক নীরব আত্মা, শক্তির উৎস, জ্ঞানের প্রবর্তক ও গ্রহীতা। আমাদের মানসিক আমি এই আত্মার, এই শক্তির, এই জ্ঞানের এক মিথ্যা প্রতিবিম্ব মাত্র। সুতরাং এই পুরুষ বা অবলম্বনস্বরূপ চেতনাই প্রকৃতির সকল কর্মের কারণ, গ্রাহক ও অবলম্বন, কিন্তু নিজে কর্তা নয়। বিশ্বে যা কিছু করা হয় তার হেতু — সম্মুখে প্রকৃতি, নিসর্গশক্তি ও তার পশ্চাতে শক্তি, চিন্ময়ীশক্তি, পুরুষশক্তি, কেন-না বিশ্বজননীর আন্তর ও বাহ্য আনন এই দুই। বিশ্ব জননী, প্রকৃতিশক্তিই একক ও একমাত্র কর্মী।

পুরুষ-প্রকৃতি, চিৎ-শক্তি, প্রকৃতির সাথে তার অবলম্বন পুরুষ, — কারণ এই দুই তাদের বিচ্ছিন্নতাতেও এক ও অবিচ্ছেদ্য — যুগপৎ এক বিশ্বাত্মক ও বিশ্বাতীত শক্তি। কিন্তু জীবের মধ্যেও এমন কিছু আছে যা মানসিক অহং নয়, যা এই মহত্তর সদ্‌বস্তুর সঙ্গে স্বরূপে এক: এ হল অদ্বয় পুরুষের বিশুদ্ধ প্রতিবিম্ব বা অংশ, এই হল অন্তঃ-পুরুষ, পরম ব্যক্তি বা দেহধারী সত্তা, ব্যষ্টি আত্মা, জীবাত্মা; এই সেই আত্মা যে মনে হয় তার শক্তি ও জ্ঞান সীমিত করেছে এক বিশ্বাতীত ও বিশ্বজনীন প্রকৃতির ব্যষ্টি ক্রীড়াকে ধারণ করার জন্য। গভীরতম সত্য এই যে যিনি অনন্তবিধ এক তিনিই অনন্তবিধ বহু; আমরা যে শুধু তার প্রতিবিম্ব ও অংশ তা নয়, আমরা তা-ই; আমাদের অহং আমাদের বিশ্বাত্মক ও বিশ্বাতীত বিভাবের অন্তরায়, কিন্তু আমাদের আধ্যাত্মিক ব্যষ্টিত্ব নয়। কিন্তু বর্তমানে আমাদের মধ্যকার অন্তঃপুরুষ বা আত্মা প্রকৃতির মধ্যে ব্যষ্টিগঠনে আগ্রহী হয়ে অহং ভাবনা স্বীকার ক'রে স্বেচ্ছায় বিভ্রান্ত হয়েছে; তাকে এই অবিদ্যা দূর করতে হবে, জানতে হবে যে সে পরম ও বিশ্বাত্মক আত্মার প্রতিবিম্ব বা অংশ বা সত্তা আর জগৎক্রিয়াতে তাঁর চেতনার এক কেন্দ্র মাত্র, আর কিছু নয়। কিন্তু যেমন অহং বা সাক্ষী ও জ্ঞাতার অবলম্বনস্বরূপ চেতনা কর্মের কর্তা নয়, এই জীব

পুরুষও তেমন কর্মের কর্তা নয়। সর্বদাই বিশ্বাতীত ও বিশ্বাত্মক শক্তিই একমাত্র কর্ত্রী। কিন্তু তাঁর পিছনে আছেন অদ্বয় পরতম যিনি শক্তির মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হচ্ছেন পুরুষপ্রকৃতি, ঈশ্বরশক্তি[১] এই যুগল শক্তি রূপে। পরতম স্ফুরন্ত হন শক্তিরূপে এবং তাঁর দ্বারাই তিনি হন বিশ্বে সকল কর্মের একমাত্র প্রবর্তক ও অধীশ্বর।

এই যদি কর্মের সত্য হয় তাহলে সাধকের প্রথম কর্তব্য হল কাজের বিভিন্ন অহমাত্মক রূপ থেকে সরে আসা এবং এক "আমি" কাজ করছে এই ভাব ত্যাগ করা। তার দেখা ও অনুভব করা চাই যে তার মধ্যে সব কিছুই ঘটে অধ্যাত্ম, মানসিক, প্রাণিক ও জড়ীয় প্রকৃতির শক্তির দ্বারা চালিত তার সব মানসিক ও দৈহিক যন্ত্রের নমনীয় চেতন বা অবচেতন বা কখনো কখনো অতিচেতন স্বয়ংক্রিয়তার দ্বারা। তার উপরে এক ব্যক্তিসত্ত্ব আছে যা নির্বাচন ও সঙ্কল্প করে, হার মানে আবার সংগ্রাম করে, প্রকৃতিকে সমর্থন বা তার উপর কর্তৃত্ব করতে চেষ্টা করে, কিন্তু এই ব্যক্তিসত্ত্ব নিজেই প্রকৃতির এক রচনা, এবং তার এমন প্রভাবাধীন ও তার দ্বারা এমন তাড়িত ও নির্ধারিত যে এ স্বাধীন হতে পারে না। এ হল প্রকৃতির মধ্যে পরমাত্মার এক গঠন বা বহিঃপ্রকাশ, পরমাত্মার অপেক্ষা বরং প্রকৃতিরই এক আত্মা এ, পরমাত্মার প্রাকৃত ও গতিশীল সত্তা, তাঁর অধ্যাত্ম ও স্থায়ী সত্তা নয়, এক সাময়িক গঠিত ব্যক্তিসত্ত্ব, সত্যকার অমর পরম ব্যক্তি নয়। ঐ পরম ব্যক্তিই তার হওয়া চাই। তার অবশ্য কর্তব্য হল — আন্তরভাবে শান্ত হয়ে বাইরের সক্রিয় ব্যক্তিসত্ত্ব থেকে দ্রষ্টার মত বিচ্ছিন্ন থাকা এবং নিজের মধ্যে বিশ্বশক্তিরাজির খেলার বিভিন্ন পাক ও গতিবৃত্তির মধ্যে অন্ধের মতো নিবিষ্ট না হয়ে তা থেকে পিছনে সরে দাঁড়িয়ে সেই খেলার অর্থ উপলব্ধি করা। এইভাবে শান্ত, বিচ্ছিন্ন, আত্মসন্ধানী ও স্বীয় প্রকৃতির সাক্ষী হয়ে সে উপলব্ধি করে যে সে-ই ব্যষ্টিপুরুষ যে প্রকৃতির সব কাজ পর্যবেক্ষণ করে, তার সব ফলাফল শান্তভাবে গ্রহণ করে এবং তার বিভিন্ন ক্রিয়ার

[১] ঈশ্বরশক্তি আর পুরুষপ্রকৃতি ঠিক এক নয়, কারণ পুরুষ ও প্রকৃতি পৃথক কিন্তু ঈশ্বর ও শক্তির প্রত্যেকেই অন্যের মধ্যে অবস্থিত। ঈশ্বর সেই পুরুষ যিনি প্রকৃতির আধার এবং শাসন করেন পুরুষের মধ্যস্থ শক্তির সামর্থ্যে। শক্তি সেই প্রকৃতি, যার মধ্যে পুরুষ বর্তমান, এই শক্তি কাজ করেন ঈশ্বরের সঙ্কল্প বলে, এই সঙ্কল্প তাঁর নিজেরই সঙ্কল্প আর তিনি সর্বদাই তাঁর গতিবৃত্তিতে তাঁর সঙ্গে বহন করেন ঈশ্বরের সান্নিধ্য। কর্মমার্গের সাধকের পক্ষে পুরুষ-প্রকৃতির উপলব্ধি তার সাধনায় প্রথম প্রয়োজনীয়, কারণ সচেতন পুরুষ ও ক্রিয়াশক্তির বিচ্ছিন্নতা এবং ক্রিয়াশক্তির কর্মপ্রণালীর নিকট পুরুষের বশ্যতা এরাই আমাদের অবিদ্যা ও অপূর্ণতার কার্যসাধক। কারণ এই উপলব্ধি বলে পুরুষ প্রকৃতির যান্ত্রিক ক্রিয়া থেকে নিজেকে মুক্ত করে স্বাধীন হতে পারে এবং প্রকৃতির উপর পেতে পারে এক প্রাথমিক আধ্যাত্মিক নিয়ন্ত্রণ। পুরুষ-প্রকৃতির সম্বন্ধ ও এর অবিদ্যাময় ক্রিয়ার পশ্চাতে ঈশ্বরশক্তি দণ্ডায়মান, তিনিই এই ক্রিয়াকে কাজে লাগান বিবর্তনের উদ্দেশ্যে। ঈশ্বরশক্তির উপলব্ধি বলে সম্ভব হয় এক পরতর স্ফুরত্তায়, এক দিব্য কর্মপ্রণালীতে এবং এক অধ্যাত্ম প্রকৃতির মধ্যে সত্তার সমগ্র ঐক্য ও সুসঙ্গতিতে অংশ গ্রহণ।

সংবেগের অনুমতি দেয় বা তা দেওয়া বন্ধ রাখে। বর্তমানে এই অন্তঃপুরুষ বা পুরুষ এক মৌন সম্মতিদাতা দ্রষ্টার বেশী কিছু নয়, হয়ত তার প্রচ্ছন্ন চেতনার চাপে সত্তার ক্রিয়া ও বিকাশ কিছু প্রভাবিত হয়, কিন্তু প্রধানতঃ তার বিভিন্ন শক্তি বা তাদের কিছু অংশ সে বাহ্য ব্যক্তিসত্ত্বের কাছে ন্যস্ত করে অর্থাৎ বাস্তবিকপক্ষে ন্যস্ত করে প্রকৃতির কাছে, কারণ এই বাহ্য আত্মা প্রকৃতির প্রভু নয়, তার অধীন, "অনীশ"; কিন্তু একবার আবরণ উন্মোচিত হলে সে সক্ষম হয় তার অনুমোদন বা অস্বীকৃতিকে কার্যকরী করতে, ক্রিয়ার অধীশ্বর হতে এবং অপ্রতিহত শক্তিতে প্রকৃতির রূপান্তরের নির্দেশ দিতে। এমনকি যদি দীর্ঘকাল পর্যন্ত পুরুষের বিনা সম্মতিতেই অভ্যস্ত গতিবৃত্তি চলতে থাকে শক্তির স্থায়ী সাহচর্য ও অতীত সঞ্চয়ের ফলস্বরূপ, এমনকি যে গতিবৃত্তি অনুমোদন করা হয়েছে প্রকৃতি যদি তা বারবার অস্বীকার করে পূর্বে তার এই অভ্যাস না থাকার দরুন, তবু সে দেখতে পাবে যে শেষ পর্যন্ত তার সম্মতি বা অস্বীকারই জয়ী হয় আর প্রকৃতি নিজেকে ও তার কর্মপ্রণালীকে পরিবর্তিত করে পুরুষের আন্তরদৃষ্টি বা সঙ্কল্পের নির্দেশ অনুযায়ী পথে, তবে তা করে, হয় ধীরে ধীরে অনেক বাধা দিয়ে, নয় তাড়াতাড়ি তার কারণ ও প্রবণতাগুলিকে নতুনের সঙ্গে দ্রুত খাপ খাইয়ে। এইভাবে মানসিক সংযম বা অহমাত্মক সঙ্কল্পের বদলে সে শিক্ষা করে আধ্যাত্মিক সংযম যার বলে সে তার মধ্যে যে সব প্রকৃতিশক্তি কাজ করে সে সবের অধীশ্বর হয়, তাদের অচেতন যন্ত্র বা যন্ত্রসদৃশ ক্রীতদাস নয়। তার ঊর্ধ্বে ও চারিদিকে আছেন পরমাশক্তি, বিশ্বজননী; আর যদি তাঁর সব উপায় সম্বন্ধে তার সত্যকার জ্ঞান থাকে ও তাঁর মধ্যস্থিত দিব্য সঙ্কল্পের নিকট সে প্রকৃত আত্মসমর্পণ করে তাহলেই সে তাঁর কাছ থেকে সব কিছুই পেতে পারে যা তার অন্তরতম পুরুষের প্রয়োজন ও অভীষ্ট। পরিশেষে সে জানতে পারে তার নিজের মধ্যকার ও প্রকৃতির মধ্যকার সেই সর্বোত্তম স্ফুরন্ত পরমাত্মাকে যিনি তার সকল দেখা ও জানার উৎস, অনুমোদনের উৎস, গ্রহণের উৎস ও বর্জনের উৎস। ইনিই প্রভু, পরতম সর্বভূতস্থিত এক, ঈশ্বরশক্তি; আর জীবের অন্তঃপুরুষ এঁরই অংশ, তাঁর সত্তার এক সত্তা, তাঁর শক্তির এক শক্তি। কর্মের প্রভু যে সব বিভিন্ন উপায়ে জগতের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে তাঁর সঙ্কল্প ব্যক্ত করেন ও সেসব সম্পাদন করেন বিশ্বাতীত ও বিশ্বজনীন শক্তির মাধ্যমে সেই সব উপায় সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে আমাদের উন্নতির বাকী অংশ।

ঈশ্বর (প্রভু) তাঁর সর্বজ্ঞতায় দেখেন কি করা দরকার। এই দেখাই তাঁর সঙ্কল্প, এ হল সৃজনক্ষম সামর্থ্যের এক রূপ, আর তিনি যা দেখেন সর্বচিন্ময়ী মা যিনি প্রভুর সঙ্গে এক সে সব গ্রহণ করেন নিজের স্ফুরন্ত আত্মার মধ্যে এবং মূর্ত করে তোলেন আর কার্যসাধিকা প্রকৃতিশক্তি তা সম্পাদন করে তাঁদের সর্বক্ষম সর্বজ্ঞতার যন্ত্ররূপে। কিন্তু কি হবে ও সেহেতু কি করা চাই — এই সম্বন্ধে এই যে দর্শন তার উৎপত্তি ঈশ্বরেরই সত্তা থেকে, তা সরাসরি নির্ঝরিত হয় তাঁরই সৃষ্টির চেতনা ও আনন্দ থেকে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে, যেমন আলো ঝরে সূর্য থেকে। প্রকৃতির ক্রিয়া ও উদ্দেশ্যের সত্য অথবা তার ন্যায্য দাবি

দেখার জন্য আমাদের মরমানবের যে প্রয়াস এ তা নয়, কষ্ট করে আমাদের যে পাওয়া এ তাও নয়। যখন ব্যষ্টি পুরুষ তার সত্তায় ও জ্ঞানে ঈশ্বরের সঙ্গে পুরোপুরি এক হয় আর আদ্যাশক্তির, বিশ্বাতীতা জননীর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসে তখন আমাদেরও মধ্যে পরম সঙ্কল্প উচ্চ দিব্যভাবে আসতে পারে এমন এক বিষয় হিসেবে যা প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়ার দ্বারা সম্পন্ন হবেই আর হয়ও। তখন আর কোন কামনা থাকে না, কোন দায়িত্ব থাকে না, থাকে না কোন প্রতিক্রিয়া; সবকিছু ঘটে ভগবানের শান্তি প্রসন্নতা আলো ও শক্তির মধ্যে যিনি আমাদের ধরে আছেন, ঢেকে আছেন ও অন্তরেও অধিষ্ঠিত।

তবে তাদাত্ম্যের দিকে সর্বোচ্চ অবস্থা পাবার পূর্বেও পরম সঙ্কল্পের কিছুটা আমাদের মধ্যে ব্যক্ত হতে পারে এক অবশ্যপালনীয় প্রচোদনা, এক ঈশ্বর চালিত কর্মরূপে; তখন আমরা কাজ করি এক স্বতঃস্ফূর্ত আত্মনিয়ন্ত্রণকারী শক্তির বলে কিন্তু অর্থ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে আরো পূর্ণ জ্ঞানের উদয় হয় শুধু তার পরে। অথবা ক্রিয়ার দিকে এক সংবেগ আসতে পারে চিদাবেশ বা বোধিরূপে তবে তা আসে মন অপেক্ষা বরং হৃদয় ও দেহে; এসময় এক কার্যকরী দৃষ্টি আসে কিন্তু সম্পূর্ণ ও সঠিক জ্ঞান তখনও স্থগিত থাকে আর যদি আদৌ আসে তা আসে পরে। কিন্তু এও সম্ভব যে দিব্য সঙ্কল্প অবতরণ করে সঙ্কল্পের মধ্যে বা মননের মধ্যে এক প্রদীপ্ত একমাত্র আদেশ হিসেবে বা কি কর্তব্য সে সম্বন্ধে এক সমগ্র বোধ বা বোধের অবিরাম স্রোতের রূপে অথবা তা আসে উর্ধ্ব থেকে এমন এক নির্দেশ রূপে যাকে অধস্তন সব অঙ্গ সার্থক করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। যোগের অপূর্ণ অবস্থায় শুধু কোন কোন কাজ এইভাবে করা যেতে পারে আর না হয় ঐভাবে এক সাধারণ ক্রিয়া হতে পারে, তবে তা হয় শুধু উন্নতি ও দীপ্তির সময়ে। কিন্তু যোগের পূর্ণ অবস্থায় সকল ক্রিয়াই এই প্রকৃতির হয়ে ওঠে। বস্তুতঃ আমরা বর্ধিষ্ণু উন্নতির তিনটি অবস্থা পৃথক ক'রে দেখতে পারি — প্রথম, ব্যক্তিগত সঙ্কল্প মাঝে মাঝে বা প্রায়শঃই আলোকিত বা চালিত হয় তার অতীত এক পরম সঙ্কল্প দ্বারা বা চিন্ময়ী শক্তি দ্বারা, পরে তার স্থলে অনবরত আসে ঐ দিব্য সামর্থ্যক্রিয়া এবং শেষে এর সঙ্গে ব্যক্তিগত সঙ্কল্প এক ও মগ্ন হয়ে যায়। প্রথমটি সেই অবস্থা যাতে আমরা তখনও বুদ্ধি, হৃদয় ও বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের শাসনাধীন; এদের কর্তব্য দিব্য প্রেরণা ও নির্দেশ সন্ধান করা বা তার জন্য অপেক্ষা করা, আর তারা সর্বদা তা খুঁজে পায় না বা গ্রহণ করে না। দ্বিতীয়টি সেই অবস্থা যখন মানুষী বুদ্ধির স্থলে উত্তরোত্তর আসে উচ্চ প্রভাস বা বোধিত আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন মন, বাহ্য মানুষী হৃদয়ের স্থলে আসে আন্তর চৈত্য হৃদয়, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের স্থলে আসে পূত ও স্বার্থশূন্য প্রাণিক শক্তি। তৃতীয়টি সেই অবস্থা যখন আমরা এমনকি আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন মন ছাড়িয়ে উঠি অতিমানসিক ভূমিসমূহে।

এই তিন অবস্থার সকলগুলিতে মুক্ত ক্রিয়ার মূল স্বভাব একই — প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত কর্মপ্রণালী, তবে তা আর অহং-এর মাধ্যমে বা তার জন্য নয়, তা পরম পুরুষের ইচ্ছাতে ও তাঁর আনন্দসম্ভোগের জন্য। আরো উচ্চ স্তরে এটি হয়ে ওঠে অনপেক্ষ ও বিশ্বাত্মক পরতমের সত্য যা প্রকাশিত হয় ব্যষ্টি পুরুষের মাধ্যমে আর

সম্পাদিত হয় সচেতনভাবে প্রকৃতির মাধ্যমে — তবে আমাদের মধ্যস্থ অপরা প্রকৃতির যে অজ্ঞানাচ্ছন্ন ক্রিয়াশক্তি পদে পদে স্খলিত হয় ও সব কিছুকে বিকৃত করে তার দ্বারা এটি আর অর্ধবোধের মাধ্যমে খর্ব বা বিকৃতভাবে সম্পাদিত হয় না, এটি সম্পাদিত হয় সর্বজ্ঞা বিশ্বাতীতা ও বিশ্বাত্মিকা জননীর দ্বারা। ঈশ্বর নিজেকে ও নিজের পরম প্রজ্ঞা ও শাশ্বত চেতনাকে আবৃত করেছেন অজ্ঞানাচ্ছন্ন প্রকৃতিশক্তির মাঝে আর এই শক্তিকে অনুমতি দেন ব্যষ্টি পুরুষকে তারই সহযোগে অহংরূপে চালনা করার জন্য; এমনকি মহত্তর উদ্দেশ্য ও শুদ্ধতর আত্মজ্ঞানের জন্য মানুষের অর্ধ-আলোকিত অপূর্ণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রকৃতির এই অবর ক্রিয়া প্রায়শঃই বলবতী হয়। আমাদের মধ্যে প্রকৃতির বিগত সব ক্রিয়ার শক্তি, তার বিগত বিভিন্ন রূপায়ণ, তার দীর্ঘদিনের বদ্ধমূল সব সাহচর্য — এই সব কারণে সিদ্ধির জন্য আমাদের মানুষী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় বা অতি অসম্পূর্ণভাবে সফলতার দিকে অগ্রসর হয়; এক যথার্থ ও ঊর্ধ্বারোহী সাফল্যের পথে এটি মোড় ফেরে কেবল তখনই যখন আমাদের চেয়ে এক মহত্তর জ্ঞান বা শক্তি আমাদের অবিদ্যার আবরণ ভেদ করে আমাদের ব্যক্তিগত সঙ্কল্পকে চালনা করে বা তার ভার নেয়। কারণ আমাদের মানুষী সঙ্কল্প এমন এক বিপথে চালিত ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ কিরণ যা পরম সামর্থ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এই অবর কর্মপ্রণালীর মধ্যে থেকে পরতর আলোক ও শুদ্ধতর শক্তির মধ্যে মন্থর উদ্বর্তনের সময়টিই সিদ্ধিপ্রয়াসী সাধকের পক্ষে মৃত্যুছায়ার উপত্যকা, এ হল এক ভয়ঙ্কর পথ, নানাপ্রকার পরীক্ষা, কষ্টভোগ, দুঃখ, অন্ধকার, পদস্খলন, প্রমাদ, প্রচ্ছন্ন গহ্বরে পূর্ণ। এই অগ্নিপরীক্ষাকে সংক্ষিপ্ত ও লাঘব করার জন্য বা একে দিব্য আনন্দ দিয়ে ভেদ করার জন্য দরকার বিশ্বাস, দরকার ক্রমশঃ বেশী করে মনের সমর্পণ সেই জ্ঞানের নিকট যা ভিতর থেকে নিজেকে আরোপ করে, আর সর্বোপরি দরকার সত্যকার আস্পৃহা এবং যথার্থ ও অবিচল ও অকপট অভ্যাস। গীতা বলে, "হৃদয়কে নৈরাশ্যমুক্ত ক'রে অবিচলিতভাবে যোগ অভ্যাস কর", কারণ যদিও পথের প্রথম অবস্থাতে আমরা পান করি আন্তর বিরোধ ও দুঃখকষ্টের চরম তিক্ত গরল, তবু এই পাত্রের শেষ আস্বাদন হল অমরত্বসুধার মাধুর্য, এক শাশ্বত আনন্দের মধুমদিরা।

নবম অধ্যায়

সমত্ব ও অহং-নাশ

নিঃশেষ আত্মোৎসর্গ, সম্পূর্ণ সমত্ব, নির্মম অহং-লোপ, নিজের অজ্ঞানাচ্ছন্ন সব ক্রিয়াধারা থেকে প্রকৃতির রূপান্তরকারী উদ্ধার — এইসব উপায়ে প্রস্তুত ও সিদ্ধ করা যায় দিব্য সঙ্কল্পের নিকট সমগ্র সত্তা ও প্রকৃতির সমর্পণ — সত্যকার সমগ্র ও অকুণ্ঠ আত্মদান। প্রথম প্রয়োজন হল আমাদের সর্বকর্মে এক সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গভাব; পরাৎপরের নিকট এবং আমাদের মধ্যে ও সর্বভূতের মধ্যে ও বিশ্বের সকল কর্মপ্রণালীর মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন শক্তি অবস্থিত তাঁর নিকট যজ্ঞরূপে সকল কর্ম করার জন্য ঐ আত্মোৎসর্গভাব প্রথম হবে এক নিত্যজাগ্রত সঙ্কল্প, পরে হবে সকল সত্তায় এক মজ্জাগত প্রয়োজন এবং সর্বশেষ এটি হবে তার স্বয়ংক্রিয় তবে জীবন্ত ও সচেতন অভ্যাস, স্বপ্রতিষ্ঠ প্রবৃত্তি। এই যজ্ঞের বেদী হল জীবন, আমাদের নৈবেদ্য হল সর্ব কর্ম; আর যে পরম দেবতাকে আমরা এই সব নিবেদন করি তিনি বিশ্বাতীত ও বিশ্বজনীন শক্তি ও সান্নিধ্য যাঁকে আমরা এ পর্যন্ত জানা বা দেখার চেয়ে বরং অনুভব করেছি বা যাঁর আভাস পেয়েছি। এই যজ্ঞ, এই আত্মোৎসর্গের দুটি দিক — প্রথম হল কর্ম আর দ্বিতীয় হল যে ভাবে এটি করা হয় সেই আন্তরভাব, আমরা যা কিছু দেখি, চিন্তা বা অনুভব করি সে সবেতেই কর্মাধ্যক্ষের প্রতি পূজার ভাব।

কর্ম প্রথম ঠিক করা হয় আমরা আমাদের অজ্ঞানতার মাঝে যে শ্রেষ্ঠ আলো পেতে পারি তার সাহায্যে। এ হল তা আমাদের ধারণায় যা আমাদের কর্তব্য। আমাদের কর্তব্যবোধ বা মানুষভাইদের প্রতি সমবেদনা, পরের মঙ্গল বা জগতের মঙ্গল সম্বন্ধে আমাদের ভাবনা বা এমন একজনের নির্দেশ যাঁকে আমরা মানুষী পরমগুরু বলে স্বীকার করি, যিনি আমাদের চেয়ে জ্ঞানী এবং সকল কর্মের যে অধীশ্বরকে আমরা বিশ্বাস করি অথচ যাঁকে আমরা এখনও জানি না তাঁর প্রতিভূ যিনি আমাদের কাছে — এই সবের মধ্যে যে কোনটির দ্বারাই করণীয় কর্ম সম্বন্ধে আমাদের ধারণা তৈরী হ'ক না কেন সকল ক্ষেত্রেই মূল নীতি এক। কর্মের মধ্যে থাকা চাই কর্মযজ্ঞের সার জিনিস; এই সার হল আমাদের "কর্মফলস্পৃহাত্যাগ", যে ফলের জন্য আমরা এখনও কর্ম করি তাতে সকল আসক্তি বর্জন। যতদিন আমরা ফলে আসক্তি নিয়ে কাজ করি, ততদিন যে যজ্ঞ নিবেদন হয় তা ভগবানের কাছে নয়, তা হয় আমাদের অহং-এর কাছে। আমরা হয়ত ভাবি তা নয়, কিন্তু তা আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র, আদতে আছে অহমাত্মক তৃপ্তিসাধন ও অভিরুচি, কিন্তু তাদের ঢেকে রাখি ভগবান সম্বন্ধে আমাদের ভাবনা, আমাদের কর্তব্যবোধ, মানুষভাইদের জন্য সমবেদনা, অপরের বা জগতের মঙ্গল সম্বন্ধে আমাদের ভাবনা, এমনকি পরম অধীশ্বরের নির্দেশ পালন — এই সবের মুখোশ দিয়ে, আর আমাদের

প্রকৃতি থেকে কামনার মূলোচ্ছেদ করার জন্য আমাদের কাছে যে দাবি করা হয় তা চাপা দেবার জন্য এ সবকে ব্যবহার করি এক রমণীয় কিন্তু মিথ্যা যুক্তির আবরণ হিসেবে।

যোগের এই অবস্থায়, এমনকি যোগের সকল অবস্থাতেই যে শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে অতন্দ্র মনোযোগ দিয়ে তা হল কামনার এই রূপ, অহং-এর এই মূর্তি। যখন আমরা দেখতে পাই যে সে আমাদের মধ্যে লুকিয়ে আছে ও নানারূপ ছদ্মবেশ ধারণ করছে তখন আমাদের নিরুৎসাহ হলে চলবে না, আমাদের উচিত তাকে তার সকল মুখোশের মধ্যে সযত্নে খুঁজে বার করা এবং কঠোরভাবে তার প্রভাব দূর করা। এই পথে চলার জন্য আলোকদাত্রী মহতী বাণী হল গীতার দৃঢ় মহাবাক্য — "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" — শুধু কর্মেই তোমার অধিকার কিন্তু কোন অবস্থাতেই তার ফলে তোমার অধিকার নেই। কর্মফলের অধিকার একমাত্র কর্মের ঈশ্বরের; ফলের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ শুধু সযত্নে প্রকৃত ক্রিয়ার দ্বারা সাফল্য প্রস্তুত করা আর যদি তা আসে তা নিবেদন করা দিব্য অধীশ্বরের নিকট। এর পর দরকার ফলে আসক্তি ত্যাগের মত কর্মেও আসক্তি ত্যাগ; আমাদের এমন প্রস্তুত হওয়া চাই যে অধীশ্বরের সুস্পষ্ট আদেশ পেলে আমরা যেন যে কোন মুহূর্তে যে কোন কর্ম, পথ বা কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন করে নিতে পারি; অন্য কর্ম, পথ বা ক্ষেত্র অথবা পরিত্যাগ করতে পারি সকল কর্মই। তা না হলে আমাদের কাজ করা তাঁর জন্য হয় না, তা হয় কর্মে আমাদের তৃপ্তি ও সুখ আছে বলে বা সক্রিয়া প্রকৃতির কর্মের প্রয়োজনবশে বা আমাদের বিভিন্ন প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য; কিন্তু এ সবই অহং-এর আবাস ও আশ্রয়স্থল। আমাদের সাধারণ জীবনযাত্রার জন্য এগুলি যতই প্রয়োজনীয় হ'ক না কেন, অধ্যাত্ম চেতনা বৃদ্ধিতে তাদের ত্যাগ ক'রে তাদের বদলে আনা চাই তাদের সব দিব্য প্রতিরূপ: অনালোকিত প্রাণিক তৃপ্তি ও সুখকে দূরে নিক্ষেপ করবে বা তাদের স্থানে আসবে আনন্দ, এক নৈর্ব্যক্তিক ও ভগবৎ-প্রেরিত আনন্দ, সক্রিয় প্রয়োজনের স্থানে আসবে দিব্য ক্রিয়াশক্তির এক উল্লাসভরা প্রেরণা; প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা আর কোন উদ্দেশ্য হবে না বা তার প্রয়োজনও থাকবে না, তার পরিবর্তে আসবে মুক্ত পুরুষ ও প্রদীপ্ত প্রকৃতির স্বাভাবিক স্ফুরন্ত সক্রিয় সত্যের মধ্যে দিয়ে দিব্য সঙ্কল্পের পরিপূরণ। পরিশেষে যেমন হৃদয় থেকে কর্মফলে ও কর্মেও আসক্তি দূর করা হয়েছে তেমন আমরা কর্মের কর্তা ব'লে আমাদের ভাবনায় ও বোধে আমাদের যে শেষ আসক্তি তখনো আঁকড়ে থাকে তা-ও ত্যাগ করা চাই: আমাদের ঊর্ধ্বে ও অন্তরে দিব্যশক্তিকে জানতে ও অনুভব করতে হবে যে প্রকৃত ও একমাত্র কর্মী তিনিই।

কর্ম ও কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ থেকেই শুরু হয় এক বিশাল যাত্রা যার লক্ষ্য মনে ও অন্তঃপুরুষে একান্ত সমত্ব, আর যদি আমরা সিদ্ধ হতে চাই চিৎপুরুষের মধ্যে তাহলে

সেই'সমত্ব এমন হওয়া চাই যা সব কিছুকে ঢেকে রাখে। কারণ কর্মের অধীশ্বরের পূজার জন্য আমাদের আবশ্যক তাঁকে আমাদের মধ্যে, সর্ববিষয়ে ও সকল ঘটনায় সুস্পষ্টভাবে চেনা ও আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করা। সমত্ব এই আরাধনার চিহ্ন: এই হল অন্তঃপুরুষের ভূমি যার উপর সত্যকার যজ্ঞ ও পূজা করা সম্ভব। ঈশ্বর সর্বভূতে সমভাবে বিদ্যমান; আপন ও পর, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী, মিত্র ও শত্রু, মানুষ ও পশু, সাধু ও পাপী — এদের মধ্যে কোন মৌলিক ভেদ করা আমাদের উচিত নয়। কারো প্রতি আমাদের ঘৃণা বা অবজ্ঞা থাকবে না, কারুর দিক থেকেই আমরা মুখ ফিরিয়ে নেব না; কারণ সকলেরই মধ্যে আমাদের দেখা চাই পরম এককে যিনি তাঁর ইচ্ছামত ভিন্নবেশ ধারণ করেন বা অভিব্যক্ত হন। কোথাও তিনি স্বল্প প্রকট, কোথাও বা বেশী প্রকট, অন্য কোথাও বা সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন ও সম্পূর্ণ বিকৃত; এরকম তিনি হন তাঁর ইচ্ছামত এবং এদের মধ্যে যে রূপ গ্রহণ করা ও এদের প্রকৃতিতে কাজের মধ্যে যা করা তাঁর অভিপ্রায় তার পক্ষে যা সর্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর তার জ্ঞান অনুযায়ী। সকলই আমাদের আত্মা — এক আত্মা যিনি বহু আকার ধারণ করেছেন। কোন এক স্তরে ঘৃণা ও দ্বেষ, অবজ্ঞা ও তৃষ্ণা, মোহ, আসক্তি ও অভিরুচি স্বাভাবিক, প্রয়োজনীয় ও অবশ্যম্ভাবী: প্রকৃতি আমাদের মধ্যে যা নির্বাচন করে তার পরিপোষক এইসব বা এইসব সেই নির্বাচন গঠন ও রক্ষণের সহায়ক। কিন্তু কর্মযোগীর কাছে এরা পুরাতনের শেষ জের, পথের বাধা, অবিদ্যার ধারা আর তার উন্নতির সাথে সাথে তার প্রকৃতি থেকে তারা খসে পড়ে। শিশু অন্তঃপুরুষের বৃদ্ধির জন্য এ সবের প্রয়োজন থাকে কিন্তু দিব্য সাধনায় যারা পরিণত তাদের কাছ থেকে এসব চলে যায়। যে ভগবৎ-প্রকৃতিতে আমাদের উন্নীত হওয়া চাই তার মধ্যে বজ্রতুল্য, এমনকি ধ্বংসসাধক কঠোরতা থাকা সম্ভব কিন্তু ঘৃণা নয়, দিব্য ব্যঙ্গ থাকতে পারে কিন্তু অবজ্ঞা নয়, শান্ত, স্বচ্ছদর্শী ও শক্তিশালী বর্জন থাকতে পারে কিন্তু জুগুপ্সা ও দ্বেষ নয়। এমনকি যা আমাদের ধ্বংস করতে হবে আমাদের কর্তব্য তাকেও ঘৃণা না করা বা তা যে সনাতনেরই এক ভিন্নবেশী সাময়িক গতিবৃত্তি তা চিনতে ভুল না করা।

এবং যেহেতু সকল বিষয়ই এক পরমাত্মা তার অভিব্যক্তি বিভাবে, সেহেতু কুৎসিৎ ও সুন্দর, বিকলাঙ্গ ও পূর্ণাঙ্গ, মহৎ ও নীচ, প্রীতিকর ও অপ্রীতিকর, শুভ ও অশুভ সবেতেই আমাদের থাকা চাই অন্তঃপুরুষের সমত্ব। এখানেও কোন ঘৃণা, অবজ্ঞা ও বিতৃষ্ণা থাকবে না, বরং এসবের স্থলে থাকবে সেই সমদৃষ্টি যা সব বিষয়কেই দেখে তারা আসলে যা সেইভাবে এবং তাদের নির্দিষ্ট স্থানে। কারণ আমরা জানব যে সকল বিষয়ই প্রকাশ করে বা প্রচ্ছন্ন রাখে, বিকশিত বা বিকৃত করে ভগবানেরই এমন কোন সত্য বা তথ্য, কোন ক্রিয়াশক্তি বা যোগ্যতা যা উত্তরোত্তর অভিব্যক্তির মধ্যে নিজের উপস্থিতির দ্বারা বিষয়সমূহের বর্তমান সমষ্টির সমগ্রতার পক্ষে এবং অন্তিম ফলের পূর্ণতার জন্য — উভয়ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয়, আর তারা তা করে তাদের জন্য অভিপ্রেত পরিবেশের মধ্যে, তাদের প্রকৃতির অব্যবহিত অবস্থা বা ক্রিয়া বা ক্রমবিকাশের পক্ষে সম্ভবপর প্রণালীতে যথাসম্ভব সুচারুরূপে অথবা অপরিহার্য কোন ত্রুটি সমেত। সেই সত্যকেই আমাদের

অন্বেষণ ক'রে আবিষ্কার করা চাই অনিত্য প্রকাশের মধ্যে বাহ্যরূপে, বহিঃপ্রকাশের ন্যূনতা বা বিকৃতিতে নিবৃত্ত না হয়ে আমরা তখন পূজা করতে পারি ভগবানকে যিনি তাঁর মুখোশের অন্তরালে চিরনির্মল, চিরশুদ্ধ, চিরসুন্দর ও চিরপূর্ণ। বস্তুতঃ সবকিছুরই পরিবর্তন দরকার, যা কুৎসিৎ তাকে গ্রহণ করা নয়, নিতে হবে দিব্য সৌন্দর্যকে, অপূর্ণতাতে থেমে থাকলে চলবে না, পূর্ণতার জন্য সচেষ্ট হতে হবে, পরম শিবকেই করা চাই সার্বজনীন লক্ষ্য, অশুভকে নয়। তবে আমরা যা করি তা করা চাই আধ্যাত্মিক বোধ ও জ্ঞানের দ্বারা আর দিব্য শিব, সুন্দর, পূর্ণতা, সুখকেই আমাদের অনুসরণ করা চাই, এ সবের কোন মানুষী মান নয়। যদি আমাদের সমত্ব না থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে এখনো অবিদ্যা আমাদের পথের অনুচর, প্রকৃতপক্ষে আমরা কিছুই বুঝব না, আর খুব সম্ভব আমরা পুরাতন অপূর্ণতাকে বিনষ্ট করে সৃষ্টি করব অন্য অপূর্ণতা: কারণ আমরা দিব্য মূল্যের স্থলে আনছি আমাদের মানুষী মনের ও কামপুরুষের মূল্যায়নকে।

সমত্বের অর্থ যে এক নতুন অজ্ঞান বা অন্ধতা তা নয়; দৃষ্টির ধূসরতা ও সকল বর্ণের অবসান সমত্বের কাম্য নয়, আর তা আনার প্রয়োজনও নেই। পার্থক্য আছে, প্রকাশের বৈচিত্র্য আছে আর এই বৈচিত্র্যের তাৎপর্য আমরা উপলব্ধি করব; আংশিক ও প্রমাদশীল, প্রেম ও ঘৃণা, প্রশংসা ও অবজ্ঞা, সমবেদনা ও বিদ্বেষ, আকর্ষণ ও বিতৃষ্ণা — এসবের দ্বারা যখন আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন থাকত তখন যা উপলব্ধি করা সম্ভব হ'ত তার চেয়ে আরো সঠিকভাবে বৈচিত্র্যের তাৎপর্য উপলব্ধি সম্ভব হবে। কিন্তু এই বৈচিত্র্যের পশ্চাতে আমরা সর্বদাই দেখব তার মধ্যে অধিষ্ঠিত পরম পূর্ণকে ও অক্ষরকে, আর কোন বিশেষ অভিব্যক্তি আমাদের মানুষী মানের পক্ষে সুসঙ্গত ও পূর্ণ হ'ক বা অমার্জিত ও অসম্পূর্ণ হ'ক বা এমনকি তা মিথ্যা ও অশুভ হ'ক আমরা তার জ্ঞানময় উদ্দেশ্য ও দিব্য প্রয়োজন অনুভব করব, জানব, অথবা তা যদি আমাদের কাছ থেকে লুকান থাকে তাহলে অন্ততঃ তাতে বিশ্বাস রাখব।

আবার সেই রকম, মন ও অন্তঃপুরুষের একই সমত্ব আমরা পাব সকল ঘটনাতেই — অর্থাৎ দুঃখ বা সুখ, পরাভব ও সাফল্য, সম্মান ও অপমান, সুযশ ও অপযশ, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য সবেতেই। কারণ সকল ঘটনাতেই আমরা দেখব সকল কর্ম ও ফলের অধীশ্বরের সঙ্কল্প, ভগবানের ক্রমবিকাশমান বহিঃপ্রকাশের মধ্যে একটি ধাপ। যাদের আন্তর নেত্র আছে — আর এটিই তো দেখে — তাদের কাছে তিনি নিজেকে ব্যক্ত করেন যেমন সর্ব বিষয়ে ও সর্ব ভূতে, তেমন বিভিন্ন শক্তিতে ও তাদের লীলা ও পরিণামে। সব কিছুই চলেছে এক দিব্য ঘটনার দিকে; প্রতি অনুভূতিই — যেমন সুখ ও তৃপ্তি, তেমন কষ্টভোগ ও অভাব এক বিশ্বগতিবৃত্তির পরিচালনায় এক প্রয়োজনীয় সংযোগ আর আমাদের কাজ হল এই গতিবৃত্তিকে প্রণিধান করা ও সাহায্য করা। বিদ্রোহ করা, নিন্দা করা, প্রতিবাদ করা — এ সব আমাদের অসংশোধিত ও অজ্ঞানাচ্ছন্ন সহজাত প্রবৃত্তির সংবেগ। অন্য সব কিছুর মতো এই লীলার মধ্যে বিদ্রোহেরও উপকারিতা আছে আর এমনকি দিব্য বিকাশের জন্য তার নিজের সময়ে ও স্তরে এটি

আবশ্যক, সহায়কর ও ভগবৎ-নির্দিষ্ট। কিন্তু অজ্ঞানবশে বিদ্রোহ করা হয় অন্তঃপুরুষের শৈশবাবস্থায় বা তার অপরিণত যৌবনাবস্থায়। পরিণত অন্তঃপুরুষ নিন্দা করে না, সে চায় বুঝতে ও জয় করতে, সে প্রতিবাদ করে না, বরং গ্রহণ করে বা তার উন্নতি ও পূর্ণতাসাধনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে, ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহ করে না বরং সে চেষ্টা করে তা পালন করতে, সার্থক ও রূপান্তরিত করতে। অতএব আমরা পরম অধীশ্বরের কাছ থেকে সকল বিষয়ই গ্রহণ করব অন্তঃপুরুষের সমত্বসহ। দিব্য বিজয়মুহূর্ত না আসা পর্যন্ত আমরা সাফল্যেরই মতো বিফলতাকেও গ্রহণ করব শান্তভাবে জয়যাত্রার পথ হিসেবে। যদি দিব্য বিধান অনুসারে তীক্ষ্নতম দুঃখ, কষ্ট ও যন্ত্রণা আসে তাহলে আমাদের অন্তঃপুরুষ, মন ও দেহ সে সবে অবিচলিত থাকবে, আবার তীব্রতম সুখ ও হর্ষেও তারা অভিভূত হবে না। এইভাবে সব দোটানা জয় ক'রে একান্ত অবিচলিত থেকে আমরা আমাদের পথে অগ্রসর হতে থাকব দৃঢ়ভাবে, সর্ববিষয়কেই দেখব সম স্থিরতাসহ যতদিন না আমরা প্রস্তুত হই আরো উন্নত অবস্থার জন্য ও প্রবেশ করতে পারি পরম ও বিশ্বজনীন আনন্দে।

সুদীর্ঘ অগ্নিপরীক্ষা ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে আত্মসংযম শিক্ষা বিনা এই সমত্ব লাভ হয় না; যতদিন কামনা প্রবল থাকে ততদিন তার সাময়িক উপশম ও অবসন্নতার মুহূর্তগুলি ছাড়া সমত্ব আসা আদৌ সম্ভব নয়; আর তখনো যা আসে তা সত্যকার স্থিরতা ও আধ্যাত্মিক একত্ব অপেক্ষা অসাড় উদাসীনতা বা কামনার স্বীয় প্রতিক্ষেপ হওয়াই বেশী সম্ভব। উপরন্তু এই আত্মসংযম বা চিৎপুরুষের সমত্বে বিকশিত হওয়ার প্রয়োজনীয় কাল ও পর্যায় আছে। সাধারণতঃ আমাদের আরম্ভ করতে হয় তিতিক্ষার পর্ব দিয়ে; কারণ আমাদের দরকার সকল সংস্পর্শের সম্মুখীন হওয়া, সে সব সহ্য ক'রে ভোগ করা এবং নিজেদের অঙ্গীভূত করা। আমাদের প্রতি স্নায়ুকে শিক্ষা দিতে হবে যে তা যেন কষ্টকর বা বিতৃষ্ণাজনক কোন কিছু থেকে পালিয়ে না আসে, সুখকর ও লোভনীয় কিছুর দিকে সাগ্রহে ছুটে না যায় বরং তা যেন সে সব স্বীকার করে আর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাদের সহ্য ও জয় করে। আমাদের এমন সবল হওয়া দরকার যেন আমরা সক্ষম হই সকল স্পর্শ সহ্য করতে, যেগুলি যথার্থতঃ আমাদের ও ব্যক্তিগত শুধু সেগুলি নয়, অপর সেই সব স্পর্শও সহ্য করতে যে সব আমাদের চারিদিককার, উপরের বা নীচের বিভিন্ন জগৎ ও তাদের অধিবাসীদের প্রতি সমবেদনা বা সংঘর্ষপ্রসূত। ধীরস্থিরভাবে আমরা সহ্য করব আমাদের উপর মানুষ ও বিষয় ও শক্তিসমূহের ক্রিয়া ও আঘাত, দেবতাদের চাপ ও অসুরদের আক্রমণ; অন্তঃপুরুষের অনন্ত অভিজ্ঞতার পথ বেয়ে যে সবের আসা সম্ভব সে সবেরই মুখোমুখি হয়ে তাদের ডুবিয়ে দেব আমাদের চিৎপুরুষের অক্ষুব্ধ সমুদ্রে। এই হল সমত্ব সাধনের কঠোর তিতিক্ষার অবস্থা, এর একেবারে আদি পর্ব কিন্তু আবার তার

শৌর্য পর্বও বটে। কিন্তু দেহ, হৃদয় ও মনের এই অবিচলিত তিতিক্ষাকে দৃঢ় করা চাই দিব্য সঙ্কল্পের নিকট আধ্যাত্মিক প্রপত্তির এক স্থায়ী বোধ দ্বারা; এই জীবন্ত মাটির কর্তব্য হল যে দিব্য হস্ত তার সিদ্ধির জন্য আয়োজন করছেন তাঁর স্পর্শের কাছে শুধু কঠোর বা সাহসিক মৌন সম্মতিসহ ধরা দেওয়া নয়, চাই কষ্টভোগের মধ্যেও সজ্ঞানে বা বিনা ক্ষোভে ভগবৎ-বিধান শিরোধার্য করা। ভগবৎ-প্রেমিকের জ্ঞানময়, ভক্তিপূর্ণ বা এমনকি কোমল তিতিক্ষাও সম্ভব আর অবিশ্বাসীর শুধু আত্মনির্ভরশীল যে তিতিক্ষায় ভগবৎ-আধার অতিরিক্ত মাত্রায় কঠিন হয়ে উঠতে পারে তার চেয়ে শ্রেয়স্কর ভগবৎ-প্রেমিকের ঐসব তিতিক্ষা। ভগবৎ-প্রেমিকের তিতিক্ষা এমন এক ক্ষমতা গড়ে তোলে যা প্রজ্ঞা ও প্রেম উভয়ই পেতে সমর্থ; এর স্থৈর্য এমন এক গভীর হৃদয়স্পর্শী স্থিরতা যা সহজেই পরিণত হয় আনন্দে। এই নতি ও তিতিক্ষার পর্যায়ে যা লাভ হয় তা হল অন্তঃপুরুষের এমন ক্ষমতা যা সকল অভিঘাত ও সংস্পর্শ সহ্য করতে সক্ষম।

এর পর হল উচ্চাসীন নিরপেক্ষতা ও উপেক্ষার পর্ব, যখন অন্তঃপুরুষ অত্যধিক উল্লাস ও অবসাদশূন্য হয়ে যেমন মুক্তি পায় দুঃখ ও কষ্টভোগের যন্ত্রণাময় তামস পাশ থেকে তেমন নিস্তার পায় সুখের অধীরতার ফাঁদ থেকে। সকল বিষয় ও ব্যক্তি ও শক্তিকে, নিজের, ও তেমন অপরেরও, সকল মনন ও বেদনা ও ইন্দ্রিয়সংবিৎকে ঊর্ধ্ব থেকে দেখে এক চিৎপুরুষ, যা সর্বদাই অক্ষয় ও অক্ষর, এবং এ সব বিষয়ের দ্বারা অবিক্ষুব্ধ। এই হল সমত্ব সাধনের দার্শনিক পর্ব — এক বিশাল ও মহান্ উদ্যম। কিন্তু উপেক্ষা যেন কখনই না হয়ে দাঁড়ায় ক্রিয়া ও অভিজ্ঞতা থেকে এক অসাড় বিমুখতা; আবার তার পরিণতি যেন না হয় ক্লান্তি, বিরক্তি, ও বিরাগজনিত বিতৃষ্ণা, ব্যর্থ বা অতিতৃপ্ত কামনার প্রতিক্ষেপ, অথবা উচ্চণ্ড আবেগের লক্ষ্য থেকে প্রতিহত হয়েছে এমন বিফলকাম ও অসন্তুষ্ট অহং-ভাবের ক্ষোভ। অপরিণত অন্তঃপুরুষে এই সব প্রতিক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী, আর অধীর কামনাতাড়িত প্রাণিক প্রকৃতিকে নিরুৎসাহ ক'রে তারা হয়ত উন্নতির এক প্রকার সহায় হয়, কিন্তু যে সিদ্ধি আমাদের সাধনার লক্ষ্য এ সব তা নয়। যে উপেক্ষা বা নিরপেক্ষতার জন্য আমাদের সাধনা করা দরকার তা হল বিষয়সমূহের বিভিন্ন সংস্পর্শের উর্ধ্বে উচ্চাসীন অন্তঃপুরুষের শান্ত শ্রেষ্ঠতা[১]; এ সবকে সে দেখে আর হয় গ্রহণ করে বা বর্জন করে কিন্তু বর্জন করেও চঞ্চল হয় না বা গ্রহণ ক'রেও তাদের অধীন হয় না। সে বোধ করতে শুরু করে যে সে নিজে এমন এক নীরব পরমাত্মা ও পরম চিৎপুরুষের সমীপস্থ, সদৃশ ও তাঁর সঙ্গে এক যিনি স্বপ্রতিষ্ঠ ও যিনি প্রকৃতির বিভিন্ন কর্মধারা ধারণ ও সম্ভব করেও সে সব থেকে পৃথক, আর এমন এক অচঞ্চল শান্ত সদ্‌বস্তুর অংশ বা তার মধ্যে নিমগ্ন যা বিশ্বের গতি ও ক্রিয়ার অতিস্থিত। উচ্চ অতিস্থিতির এই সময়ের লাভ হল অন্তঃপুরুষের এমন প্রশান্তি যা জগৎক্রিয়ার সুখময় ক্ষুদ্র তরঙ্গে অথবা ঝড়ে বিক্ষুব্ধ উত্তাল তরঙ্গেও অটল ও স্থির থাকে।

[১] উদাসীন

যদি আমরা আন্তর পরিবর্তনের এই দুই পর্যায় পার হতে পারি কোথাও নিবৃত্ত বা নিবিষ্ট না হয়ে, তাহলে আমরা এমন এক দিব্য সমত্বের মধ্যে প্রবেশ করি যাতে পাওয়া যেতে পারে অধ্যাত্ম উদ্দীপনা ও আনন্দের শান্ত প্রবেগ, সিদ্ধ অন্তঃপুরুষের এক উল্লাসভরা সমত্ব যা সবকিছু বোঝে ও সবকিছু অধিকার করে, পাওয়া যেতে পারে তার সত্তার এক প্রগাঢ় ও সমান সর্বগ্রাহী ব্যাপ্তি ও পূর্ণতা। এই হল পরম পর্ব ও সেখানে পৌঁছবার পথ হল ভগবান ও বিশ্বজননীর কাছে সমগ্র আত্মদানের আনন্দের মধ্য দিয়ে। কারণ তখন ক্ষমতা ভূষিত হয় সুখময় আধিপত্যের বিজয় মুকুটে, প্রশান্তি গভীর হয়ে পরিণত হয় পরমানন্দে, দিব্য স্থিরতার অধিকার উন্নীত হয়ে পরিণত হয় দিব্য সঞ্চরণ লাভের প্রতিষ্ঠাভূমিতে। কিন্তু এই মহত্তর সিদ্ধি আসবার পূর্বে দরকার, — অন্তঃপুরুষের যে নিরপেক্ষ উদাসীনতা ঊর্ধ্ব থেকে নিম্নে বিভিন্ন রূপ ও ব্যক্তিভাবনা ও গতিবৃত্তি ও শক্তির প্রবাহকে নিরীক্ষণ করে তার পরিবর্তন, একে পরিবর্তিত হতে হবে সবল ও শান্ত প্রপত্তির ও শক্তিশালী ও প্রগাঢ় আত্মসমর্পণের নতুন বোধে। এই প্রপত্তি তখন আর আনতশির সম্মতি হবে না, তা হবে সানন্দ গ্রহণ, তখন আর এ বোধ থাকবে না যে আমি কষ্ট পাচ্ছি বা বোঝা বইছি বা অপরের দুঃখের ভার নিচ্ছি; প্রেম ও আনন্দ ও আত্মদানের সুখই তার সমুজ্জ্বল বুনন। আর এই সমর্পণও শুধু সেই দিব্য সঙ্কল্পের নিকট হবে না যা আমরা বুঝতে পারি, স্বীকার করি ও পালন করি, তা হবে আবার সঙ্কল্পের মধ্যে এক দিব্য প্রজ্ঞার নিকট যা আমরা প্রণিধান করি এবং তার মধ্যে এক দিব্য প্রেমের নিকট যা আমরা অনুভব করি ও উল্লাসের সঙ্গে যার অধীন হই; এই প্রজ্ঞা ও প্রেম হল আমাদের ও সকলের সেই পরম চিৎপুরুষ ও পরমাত্মার প্রজ্ঞা ও প্রেম যাঁর সঙ্গে আমরা স্থাপন করতে পারি সুখময় ও পরিপূর্ণ ঐক্য। জ্ঞানীর দার্শনিক সমত্বের শেষ কথা হল নিঃসঙ্গ সামর্থ্য, প্রশান্তি ও নিঃস্তব্ধতা, কিন্তু অখণ্ড উপলব্ধির অধিকারী অন্তঃপুরুষ এই আত্মসৃষ্ট অবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে প্রবেশ করে সনাতনের অনাদি অনন্ত নিঃশ্রেয়সের পরম ও সর্বগ্রাসী উল্লাসের সাগরে। তখন আমরা অবশেষে সমর্থ হই সকল সংস্পর্শ গ্রহণ করতে আনন্দময় সমত্বের সঙ্গে কারণ আমরা তাদের মধ্যে অনুভব করি অক্ষয় প্রেম ও আনন্দের স্পর্শ, অনপেক্ষ সুখ যা চিরদিন প্রচ্ছন্ন আছে বিষয়সমূহের অন্তরে। বিশ্বজনীন ও সম উল্লাসের এই চরম অবস্থা লাভ হল অন্তঃপুরুষের আনন্দ, এবং লাভ হল সেই সব তোরণদ্বার উন্মোচন যেখানে পরম অনন্ত আনন্দ ও সকল বোধের অতীত রভস বর্তমান।

কামনা বিনাশ ও অন্তঃপুরুষের সমত্ব জয়ের এই সাধনা সম্পূর্ণ সিদ্ধ ও ফলপ্রসূ হবার পূর্বে আধ্যাত্মিক প্রগতি এতদূর নিষ্পন্ন হওয়া আবশ্যক যাতে অহং-বোধের বিলোপ সাধিত হয়। কিন্তু কর্মীর পক্ষে এই পরিবর্তনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান

হল ক্রিয়ার কর্তৃত্বাভিমানত্যাগ। কারণ যজ্ঞের অধীশ্বরের কাছে কর্মফল ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ ক'রে রাজসিক কামনার অহং-ভাবকে বিদায় দিলেও, এমন হতে পারে যে তখনো আমাদের থেকে যায় কর্মীর অহং-ভাব। তখনো আমরা এই বোধের অধীন যে আমরাই কর্মের কর্তা, আমরাই তার উৎস, আবার আমরাই তার অনুমন্তা। তখনো "আমি"ই নির্বাচন ও নির্ধারণ করে, তখনো "আমি"ই দায়িত্ব নিয়ে দোষ, গুণ বোধ করে। আমাদের যোগের এক মূল লক্ষ্য হল এই বিভক্ত অহং-বোধের সম্পূর্ণ অপসারণ। যদি আমাদের মধ্যে কোন অহংকে কিছুদিনের জন্য থাকতে হয়, তাহলে তা হবে শুধু তার এমন এক রূপ যা নিজেকে এক রূপমাত্র ব'লেই জানে এবং লোপ পেতে প্রস্তুত থাকে যখনই আমাদের মধ্যে ব্যক্ত বা গঠিত হয় চেতনার কোন সত্যকার কেন্দ্র। সেই সত্যকার কেন্দ্র হল অদ্বয় পরম চেতনারই এক প্রদীপ্ত রূপায়ণ এবং অদ্বয় সৎস্বরূপেরই শুদ্ধ প্রবাহ প্রণালী ও যন্ত্র। বিশ্বশক্তির ব্যষ্টি অভিব্যক্তি ও ক্রিয়ার আশ্রয়স্বরূপ এই কেন্দ্র ক্রমশঃ তার পশ্চাতে প্রকাশ করে আমাদের মধ্যকার সত্যকার পরম ব্যক্তিকে — এই হল কেন্দ্রীয় সত্তা, পরতমের সনাতন সত্তা, বিশ্বাতীতা শক্তির এক সামর্থ্য ও অংশ[১]।

এই যে ধারা যাতে অন্তঃপুরুষ ক্রমশঃ নিজে থেকে খুলে ফেলে অহং-এর তামস পরিচ্ছদ, তাতেও উন্নতি হয় সুস্পষ্ট পর্যায়ে। কারণ শুধু কর্মফলের অধিকারই যে একমাত্র অধীশ্বরের তা নয়, আমাদের সব কর্মও হতে হবে তাঁরই; আমাদের সব ফলের মত আমাদের ক্রিয়ারও সত্যকার অধীশ্বর তিনি। শুধু চিন্তার মন দিয়ে এটি দেখলে চলবে না, এটি সম্পূর্ণ সত্য হয়ে ওঠা চাই আমাদের সমগ্র চেতনা ও সঙ্কল্পের কাছে। সাধকের সব কাজ আদৌ তার নয়, পরম সৎ-স্বরূপ থেকেই সেসব আসছে তার মধ্য দিয়ে — একথা সাধকের শুধু ভাবলে ও জানলে চলবে না, — এটি তার দেখা ও অনুভব করা চাই বাস্তবভাবে ও প্রগাঢ়ভাবে, — এমনকি কাজ করার মুহূর্তেও এবং তার প্রারম্ভে ও সমগ্র ধারায়। সর্বদাই তার এই বোধ থাকা চাই যে এক শক্তি, এক উপস্থিতি, এক সঙ্কল্প তার ব্যষ্টি প্রকৃতির মধ্য দিয়ে কাজ করে। কিন্তু এইভাবে মোড় ফেরায় এই বিপদ যে সে নিজেরই ছদ্মবেশী বা ঊর্ধ্বায়িত অহংকে বা কোন অবরশক্তিকে অধীশ্বর ব'লে ভুল করে তার সব দাবিকেই নিতে পারে পরম আদেশের স্থলে। হয়ত সে এই অপরা প্রকৃতির এক সাধারণ ফাঁদে পড়ে মনে করবে যে সে কোন পরতরা শক্তির নিকট সমর্পণ করছে আর এই ধারণাকে ছুতো করে বিকৃতভাবে নিজেরই জিদ এমন কি তার কামনা ও উদ্দাম সব আবেগেরও অতিমাত্রায় অসংযত প্রশ্রয় দেবে। তাই দাবি করা হয় ঐকান্তিক অকপটতা, আর তা শুধু সচেতন মনে আনলে চলবে না, বরং তা আরো বেশী করে আনতে হবে আমাদের অধিচেতন অংশে যা নানা গুপ্ত গতিবৃত্তিতে পূর্ণ। কারণ সেখানেই, বিশেষতঃ আমাদের অধিচেতন প্রাণিক প্রকৃতিতে আছে এমন এক প্রতারক ও অভিনেতা যার সংশোধন অসম্ভব। কামনাবিলোপ এবং সকল কর্মপ্রণালীতে ও সকল

[১] অংশ সনাতনঃ, পরা প্রকৃতির্জীবভূতা

বিষয়ে তার অন্তঃপুরুষের দৃঢ় সমত্ব প্রতিষ্ঠা — এই কাজে সাধককে প্রথম অনেক দূর এগোতে হবে, তবেই তার পক্ষে সম্ভব হবে তার কর্মের বোঝা পুরোপুরি ভগবানকে দেওয়া। সাধনার পথে এগোবার সময় তাকে প্রতিমুহূর্তে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে অহং-এর সব প্রবঞ্চনার উপর এবং বিপথে নিয়ে যায় সেই সব তামসশক্তির অতর্কিত আক্রমণের উপর, যারা সর্বদাই নিজেদের জাহির করে পরম আলোক ও সত্যের একমাত্র উৎস ব'লে এবং বিভিন্ন দিব্য মূর্তির অনুরূপ কপট রূপ গ্রহণ করে সাধকের অন্তঃপুরুষকে বন্দী করার জন্য।

তখনই তার কর্তব্য আর এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া — তা হল নিজেকে সাক্ষীর স্থানে বসানো। প্রকৃতি থেকে পৃথক হয়ে, নৈর্ব্যক্তিক ও বীতরাগ হয়ে তার কর্তব্য হল তার মধ্যে কার্যসাধিকা কর্মরতা প্রকৃতিশক্তিকে নিরীক্ষণ করা এবং এর ক্রিয়া প্রণিধান করা; প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে তার দরকার প্রকৃতির বিভিন্ন বিশ্বশক্তির খেলা চিনতে শেখা, আলো ও রাত্রি, দিব্য ও অদিব্য নিয়ে তার মিশ্র বুননে কোনটি কি তা বুঝতে শেখা এবং আরো দরকার প্রকৃতির যে সব দুর্ধর্ষ শক্তি ও সত্তা অবিদ্যাচ্ছন্ন মানবজীবকে ব্যবহার করে তাদের খুঁজে বার করতে শেখা। গীতায় বলা হয়েছে, প্রকৃতি আমাদের মধ্যে কাজ করে তার তিন গুণের মাধ্যমে — আলো ও শুভের গুণ, উচ্চণ্ড আবেগ ও কামনার গুণ এবং অন্ধকার ও জড়তার গুণ। তার প্রকৃতির এই রাজ্যের মধ্যে যা সব ঘটে তাদের নিরপেক্ষ ও বিচারশীল সাক্ষী হয়ে সাধকের কর্তব্য হল কোনটি এইসব গুণের পৃথক ক্রিয়া আর কোনটি তাদের মিশ্র ক্রিয়া তা বুঝতে শেখা; তার আরো উচিত — তার মধ্যে বিভিন্ন বিশ্বশক্তির কর্মপ্রণালীগুলিকে তাদের সূক্ষ্ম অদেখা সব ধারা ও ছদ্মবেশের গহন প্রদেশের মধ্য দিয়ে অনুসরণ করে এই গোলকধাঁধার প্রতি রহস্য অবগত হওয়া। এই জ্ঞানের পথে অগ্রসর হতে হতে সে সমর্থ হবে অনুমন্তা হয়ে উঠতে, আর তখন সে প্রকৃতির অজ্ঞানময় যন্ত্র থাকবে না। প্রথমে তার কর্তব্য হল, — তার বিভিন্ন করণের উপর প্রকৃতিশক্তির ক্রিয়া সম্বন্ধে প্রকৃতিশক্তিকে শিক্ষা দেওয়া যেন সে নিম্নতর দুটি গুণের কর্মপ্রণালীকে দমন করে তাদের আনে আলো ও শুভের গুণের অধীনে এবং পরে তার উচিত একেও রাজী করান নিজেকে নিবেদন করতে যাতে সব তিনটিই এক পরতরা শক্তির দ্বারা রূপান্তরিত হতে পারে তাদের দিব্য প্রতিরূপে — পরম বিশ্রাম ও স্থিরতায়, দিব্য জ্যোতি ও আনন্দে, শাশ্বত দিব্য স্ফুরত্তাতে, তপোশক্তিতে। এই শিক্ষা ও পরিবর্তনের প্রথম অংশটি তত্ত্বতঃ দৃঢ়ভাবে সাধিত হতে পারে আমাদের মধ্যে মনোময় পুরুষের সঙ্কল্পের দ্বারা; কিন্তু এর পূর্ণ সম্পাদন ও পরবর্তী রূপান্তরসাধন কেবল তখনই সম্ভব যখন গভীরতর চৈত্য পুরুষ প্রকৃতির উপর তার প্রভাব আরো বাড়িয়ে তার অধিপতি হয় মনোময় পুরুষের স্থলে। আর যখন এই ঘটে, তখন সে প্রস্তুত হবে পরম সঙ্কল্পের নিকট তার সকল কর্ম সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে — আর তা যে শুধু আস্পৃহা ও অভিপ্রায় ও এক প্রাথমিক ও উত্তরোত্তর আত্মবিসর্জনের সঙ্গে হবে তা নয়, তা হবে স্ফুরন্ত আত্মদানের প্রগাঢ়তম বাস্তবতার সঙ্গে। ক্রমশঃ তার অপূর্ণ

মানুষী বুদ্ধির মনকে সরিয়ে আসবে এক অধ্যাত্ম ও প্রভাস মন, এবং শেষে এ-ই সমর্থ হবে অতিমানসিক সত্য-জ্যোতির মধ্যে প্রবেশ করতে; এই যে তার অবিদ্যাময় প্রকৃতি যার তিন গুণের কাজ বিশৃঙ্খল ও অপূর্ণ, তখন তা থেকে সে আর কাজ করবে না, সে কাজ করবে অধ্যাত্ম স্থিরতা, আলোক, শক্তি ও আনন্দের দিব্যতর প্রকৃতি থেকে। যে অজ্ঞানাচ্ছন্ন মন ও সঙ্কল্পের সঙ্গে মিশ্রিত থাকে আরো অজ্ঞানাচ্ছন্ন ভাবাবেগের হৃদয়ের তাড়না ও প্রাণসত্তার কামনা ও দেহের প্রেরণা ও সহজাত প্রবৃত্তি তা থেকে সে কাজ করবে না, সে কাজ করবে প্রথমে এক আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন আত্মা ও প্রকৃতি থেকে এবং শেষে এক অতিমানসিক ঋতচিৎ এবং এর পরা প্রকৃতির দিব্য শক্তি থেকে।

এইভাবে শেষ ধাপগুলি অতিক্রম করা সম্ভব হয়, তখন প্রকৃতির অবগুণ্ঠন সরে যায়, সাধক সামনা সামনি এসে দাঁড়ায় সকল সৃষ্টির অধীশ্বরের সম্মুখে, আর তার সকল কাজকর্ম ডুবে যায় এমন এক পরমা শক্তির ক্রিয়ায় যা চিরদিন শুদ্ধ, সত্যময়, পূর্ণ ও আনন্দময়। এইভাবে সে সক্ষম হয় অতিমানসিক পরাশক্তির কাছে নিঃশেষে ত্যাগ করতে তার সকল কর্ম ও সকল কর্মফল আর কাজ করতে সনাতন কর্মীর শুধু সচেতন যন্ত্ররূপে। তখন আর সে অনুমতি দেয় না, বরং সে তার সব করণের মধ্যে নেবে এক দিব্য আদেশ এবং তা পালন করবে সেই পরাশক্তির হাতের মধ্যে থেকে। আর সে কাজ করে না, পরাশক্তি তাঁর অতন্দ্র শক্তি দিয়ে তার মাধ্যমে যে কর্ম সম্পাদন করেন, সে শুধু স্বীকার করবে সেই সম্পাদনা। আর সে নিজের বিভিন্ন মানসিক রচনার পরিপূরণ বা ভাবাবেগময় সব কামনার পরিতৃপ্তি চায় না, সে এমন এক সর্বক্ষম সঙ্কল্পের অনুগামী ও সহযোগী হয় যা আবার এক সর্বদর্শী জ্ঞান এবং এক রহস্যময়, যাদুময়, অগাধ প্রেম এবং অস্তিত্বের শাশ্বত আনন্দের এক বিশাল অতল সাগর।

দশম অধ্যায়

প্রকৃতির গুণত্রয়

অন্তঃপুরুষকে নিজের আত্মায় স্বাধীন ও তার বিভিন্ন কর্মে স্বাধীন হতে হলে তার পক্ষে অপরিহার্য হল অপরা প্রকৃতির স্বাভাবিক ক্রিয়া অতিক্রম করা। এই বাস্তব বিশ্বপ্রকৃতির নিকট সুসঙ্গত বশ্যতা, প্রাকৃত করণগুলির জন্য শুভ ও নিখুঁত কর্মের অবস্থা — এটি অন্তঃপুরুষের আদর্শ নয়, অন্তঃপুরুষের বরং অধীন হওয়া উচিত ভগবানের ও তাঁর পরমাশক্তির কিন্তু প্রভু হওয়া উচিত আপন প্রকৃতির। মন, প্রাণ ও দেহ — এইসব প্রাকৃত করণের কর্মের জন্য প্রকৃতি যে ক্রিয়াশক্তির ভাণ্ডার, পরিবেশের বিভিন্ন অবস্থা, মিশ্র গতিবৃত্তির ছন্দ জোগায় তাদের কিভাবে ব্যবহার করা হবে তা অন্তঃপুরুষের নির্বাচন করা কর্তব্য পরম সঙ্কল্পের প্রতিভূ বা প্রবাহপ্রণালী হিসেবে নিজের অন্তর্দর্শন ও অনুমতি বা অসম্মতির দ্বারা। কিন্তু এই অবর প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনা সম্ভব হয় কেবল তখনই যখন আমরা তাকে অতিক্রম করে ব্যবহার করি উর্ধ্ব থেকে। আর তা করা যায় একমাত্র তার ক্রিয়ার বিভিন্ন শক্তি, গুণ ও পদ্ধতির অতীত হয়ে; তা না হলে আমরা তার সব অবস্থার অধীন থেকে অসহায়ের মতো তার তাঁবেদার হই, চিৎপুরুষের মধ্যে স্বাধীন হই না।

প্রকৃতির তিনটি মৌলিক প্রকার বা গুণের ভাবনা হল প্রাচীন ভারতীয় মনীষীদের সৃষ্টি আর এর সত্য প্রথমেই সুস্পষ্ট হয় না কারণ এটি পাওয়া গিয়েছে দীর্ঘ মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষণ ও গভীর আভ্যন্তরীণ অনুভূতির ফলস্বরূপ। সেজন্য দীর্ঘ আন্তর অনুভূতি, নিবিড় আত্মপর্যবেক্ষণ ও প্রকৃতি-শক্তিসমূহ সম্বন্ধে বোধিত উপলব্ধি না থাকলে সঠিকভাবে এই বিষয়টি ধারণ করা বা দৃঢ়ভাবে তা ব্যবহার করা দুরূহ। তবু কতকগুলি সাধারণ নির্দেশ দেওয়া হলে কর্মমার্গের সাধকের পক্ষে সেগুলি সহায় হতে পারে তার নিজের প্রকৃতির বিভিন্ন সমবায় অবধারণ করায়, বিশ্লেষণ করায় ও তার সম্মতি বা অসম্মতি দ্বারা তাদের নিয়ন্ত্রিত করায়। ভারতীয় গ্রন্থে এই প্রকারগুলির সংজ্ঞা হল 'গুণ' আর নাম দেওয়া হয় — সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। সত্ত্ব সাম্যের শক্তি, তার প্রকাশ হয় শুভ ও সামঞ্জস্য ও সুখ ও আলোর গুণে; রজঃ গতির শক্তি আর তার প্রকাশ হয় সংঘর্ষ ও প্রচেষ্টা, উচ্চণ্ড ভাবাবেগ ও ক্রিয়ার গুণে; তমঃ নিশ্চেতনা ও স্থিতির শক্তি আর তার প্রকাশ হয় অন্ধকার ও অসামর্থ্য ও নিষ্ক্রিয়তার গুণে। সাধারণতঃ এই বিভাগ ব্যবহার করা হয় মনস্তাত্ত্বিক আত্মবিশ্লেষণের জন্য, তবে জড় প্রকৃতির ক্ষেত্রেও এরা প্রযোজ্য। অপরা প্রকৃতির প্রতি বিষয় ও প্রতি অস্তিত্বের মধ্যে এই তিন গুণ বর্তমান, আর এদের শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলেই ঘটে প্রকৃতির ধারা ও স্ফুরন্ত রূপ।

সজীব বা নির্জীব — প্রতিটি বিষয়েরই রূপ হল কতকগুলি গতিসম্পন্ন প্রাকৃতিক

শক্তির এমন স্থিতি যা সর্বদাই একভাবে থাকে আর তার উপর আসে তার চারিদিককার অন্যান্য শক্তির সমবায় থেকে অনুকূল বা প্রতিকূল বা বিধ্বংসী সব সংস্পর্শের এক অবিরাম স্রোত। আমাদের নিজেদেরই মন, প্রাণ ও দেহের প্রকৃতি এইরকম এক গঠনক্ষম সমবায় ও স্থিতি ছাড়া আর কিছু নয়। চারিদিককার বিভিন্ন সংস্পর্শ কেমনভাবে নেওয়া হয় ও প্রতিদানে তাদের উপর কি ক্রিয়া হয় তা থেকেই বোঝা যায় গুণত্রয়ের দ্বারা নির্ধারিত গ্রহীতার স্বভাব ও প্রতিক্রিয়ার ধরন। নিশ্চেষ্ট ও অনুপযুক্ত হয়ে সেগুলি সে নিতে বাধ্য হয় প্রত্যুত্তরে কোনরকম প্রতিক্রিয়া বা আত্মরক্ষার চেষ্টা না ক'রে অথবা নিজের অঙ্গীভূত করায় বা নিজের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে অসমর্থ হয়ে; এই হল তমোগুণ, স্থিতিধর্মিতার রীতি। তমোগুণের কলঙ্কচিহ্ন হল অন্ধতা ও অচৈতন্য, ও অসামর্থ্য ও নির্বুদ্ধিতা, জড়তা ও আলস্য ও নিষ্ক্রিয়তা আর যন্ত্রের মতো কার্যক্রম পালন, এবং মনের অসাড়তা ও প্রাণের সুপ্তি ও অন্তঃপুরুষের তন্দ্রা। যদি অন্য কোন উপাদান দিয়ে এসবের সংশোধন না হয় তা হলে এর ফল হল প্রকৃতির রূপ বা স্থিতির বিয়োজন আর তা এমন যে যাতে নতুন কোন সৃষ্টি বা নতুন সাম্য বা গতিশীল উন্নতিও হয় না। এই অসাড় শক্তিহীনতার মর্মস্থলে আছে অবিদ্যার তত্ত্ব এবং চারিদিককার সব শক্তির উদ্দীপক বা আক্রমণকারী সংস্পর্শ ও তাদের ব্যঞ্জনা এবং নতুন অভিজ্ঞতার জন্য তাদের প্রেরণা প্রণিধান, ধারণ ও পরিচালনা করার অক্ষমতা বা নিশ্চেষ্ট অনিচ্ছা।

তবে অন্য প্রকারেও প্রকৃতির সংস্পর্শগুলি গ্রহণ করা সম্ভব, গ্রহীতা প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির স্পর্শে উদ্দীপিত, আকৃষ্ট বা আক্রান্ত হয়ে তাদের চাপে অনুকূল সাড়া দিতে পারে অথবা বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে। প্রকৃতিই তাকে সম্মতি, উৎসাহ ও প্রেরণা দেয় উদ্যোগী হতে, বাধা দিতে, চেষ্টা করতে, তার পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে বা সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনতে, তার সঙ্কল্প প্রতিষ্ঠার এবং সংগ্রাম, সৃষ্টি ও জয়ের উদ্দেশ্যে। এই হল রজোগুণ, উচ্চণ্ড ভাবাবেগ ও ক্রিয়া এবং কামনা তৃষ্ণার রীতি। সংগ্রাম ও পরিবর্তন ও নব সৃজন, জয় ও পরাজয় এবং সুখ ও কষ্টভোগ, আশা ও নিরাশা — এসব তারই সন্তান, এরাই তৈরী করে জীবনের নানা রঙের রঙীন প্রিয় আবাস। কিন্তু এর জ্ঞান অপূর্ণ বা মিথ্যা জ্ঞান আর এর সাথী হল অজ্ঞানময় প্রচেষ্টা, প্রমাদ, নিরন্তর অসঙ্গতি, আসক্তির ব্যথা, ব্যর্থ কামনা, ক্ষতি ও বিফলতার বিষাদ। রজোগুণের দান সক্রিয় শক্তি, বীর্য, উদ্যম, এবং এমন এক সামর্থ্য যা সৃষ্টি করে, কাজ করে ও পরাস্ত করতে সক্ষম; কিন্তু এর গতি অবিদ্যার ভ্রান্ত বা অর্ধ আলোকের মধ্যে; অসুর, রাক্ষস ও পিশাচের স্পর্শে এটি বিকৃত হয়। মানবমনের উদ্ধত অজ্ঞানতা এবং এর সব আত্মতৃপ্ত বিকৃতি ও ধৃষ্ট প্রমাদ, গর্ব, আত্মগরিমা ও উচ্চাভিলাষ, নৃশংসতা ও স্বেচ্ছাচারিতা এবং পাশব ক্রোধ ও অত্যাচার, স্বার্থপরতা ও ক্ষুদ্রতা, ভণ্ডামি ও বিশ্বাসঘাতকতা ও ঘৃণ্য নীচতা, কাম ও লোভ ও লুণ্ঠন প্রবৃত্তি, পরশ্রীকাতরতা, ঈর্ষা ও চরম অকৃতজ্ঞতা — এই যে সব পৃথ্বী-প্রকৃতির কলঙ্ক তারা প্রকৃতির এই অপরিহার্য কিন্তু সবল ও বিপজ্জনক প্রবৃত্তির স্বভাবজাত সন্তান।

কিন্তু দেহধারী সত্তা প্রকৃতির এই দুই গুণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; তার পক্ষে তার চারিদিককার সংঘাত ও জগৎশক্তির স্রোতকে আরো শ্রেয়স্কর ও প্রবুদ্ধভাবে ব্যবহার করা সম্ভব। সে সবকে সে নিয়ে তাতে সাড়া দিতে পারে স্বচ্ছ অবধারণ, স্থৈর্য ও বিবেচনার সঙ্গে। প্রাকৃত সত্তার এই রীতির এমন সামর্থ্য যে সে প্রণিধান করে ব'লে তার সমবেদনাও থাকে; সে প্রকৃতির প্রেরণা ও বিভিন্ন প্রণালীর আন্তর মর্মে প্রবেশ ক'রে তাদের নিয়ন্ত্রিত ও বিকশিত করে: তার এমন এক বুদ্ধি আছে যা প্রকৃতির বিভিন্নধারা ও তাৎপর্যের গভীরে প্রবেশ ক'রে তাদের নিজের অঙ্গীভূত ক'রে কাজে লাগাতে সক্ষম; তার প্রতিক্রিয়া এমন স্বচ্ছ যে সে অভিভূত হয় না, বরং সব কিছুকে যথাস্থানে স্থাপন করে, তাদের ভুল সংশোধন করে, তাদের মধ্যে মিল আনে ও সব কিছুর মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা বাইরে আনে। এই হল সত্ত্ব গুণ, প্রকৃতির সেই প্রবৃত্তি যা আলোক ও স্থৈর্যে পূর্ণ, যার লক্ষ্য মঙ্গল ও জ্ঞান, আনন্দ ও সৌন্দর্য, সুখ, সঠিক বোধ, যথাযথ সাম্যাবস্থা ও যথার্থ শৃঙ্খলা, এর স্বভাব জ্ঞানের উজ্জ্বল স্বচ্ছতার সমৃদ্ধি এবং সমবেদনা ও নিবিড়তার দীপ্ত উষ্ণতা। সাত্ত্বিক প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ পরিণতি হল সমগ্র সত্তার চারুতা ও প্রবুদ্ধতা, সুনিয়ন্ত্রিত শক্তি এবং সংসিদ্ধ সৌষম্য ও স্থৈর্য।

সৃষ্টির কোন বিষয়ই বিশ্বশক্তির এই তিন গুণের কোন একটিমাত্রেরই ছাঁচে তৈরী হয়নি; প্রতি বিষয়ে ও সর্বত্র এই তিন গুণ বর্তমান। পরস্পরের মধ্যে তাদের সম্বন্ধ নিত্য পরিবর্তনশীল, একের প্রভাব অন্যের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, সর্বদাই এই সব সম্পর্ক ও প্রভাবের সংযোগ ও বিয়োগ ঘটছে, প্রায়শঃই ঘটছে বিভিন্ন শক্তির সংঘর্ষ ও মল্লযুদ্ধ, পরস্পরকে বশে আনার জন্য সংগ্রাম। কম বা বেশী মাত্রায়, — হয়ত কখন কখন এত কম যে তা বোঝা যায় না — প্রত্যেকেরই মধ্যে আছে তাদের সাত্ত্বিক অবস্থা এবং আলোক, স্বচ্ছতা ও প্রসন্নতার, পরিবেশের সঙ্গে সূক্ষ্ম অভিযোজনা ও সমবেদনার, বুদ্ধি, স্থৈর্য ও ঋজু মনের, সাধু সঙ্কল্প, বেদনা ও সংবেগের, সদ্গুণ ও সুশৃঙ্খলার সুস্পষ্ট ক্ষেত্র বা প্রাথমিক প্রবণতা। সকলেরই আছে বিভিন্ন রাজসিক প্রবৃত্তি ও সংবেগ এবং কামনা ও উচ্চণ্ড ভাবাবেগ ও সংগ্রামের, বিকৃতি ও মিথ্যা ও প্রমাদের, অসম সুখ ও দুঃখের, উৎকট কর্ম প্রবৃত্তির, অধীর সৃজনের এবং পরিবেশের চাপ ও জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতি সবল বা নির্ভীক, উদ্দীপ্ত অথবা উগ্র প্রতিক্রিয়ার পঙ্কিল অংশ। সকলেরই আছে বিভিন্ন তামসিক অবস্থা, ও চিরঅন্ধকার অংশ, অচৈতন্যের বিভিন্ন মুহূর্ত বা কেন্দ্র, ভগবৎ-বিধানের প্রতি তাদের ক্ষীণ আনুগত্য বা নিস্তেজ স্বীকৃতির দীর্ঘ অভ্যাস বা সাময়িক অক্ষম ইচ্ছা, তাদের স্বভাবজাত দুর্বলতা বা শ্রান্তি, অবহেলা ও আলস্যের প্রবৃত্তি, অজ্ঞানতা ও অসামর্থ্য, অবসাদ ও ভয়ের মধ্যে তাদের পতন, পরিবেশের নিকট বা মানুষ, ঘটনা ও শক্তিসমূহের চাপের নিকট কাপুরুষোচিত পশ্চাদপসরণ বা নতিস্বীকার। আমাদের প্রত্যেকেই আমাদের প্রকৃতিগত শক্তির কোন না কোন দিকে, মনের বা চরিত্রের কোন না কোন অংশে সাত্ত্বিক, আবার অন্য কিছু দিকে বা অংশে রাজসিক এবং অন্য কিছু দিকে বা অংশে তামসিক। সাধারণ স্বভাবে, মনের ধরনে বা

কর্মের প্রবৃত্তিতে যে এক বা অন্য গুণের প্রভাব বেশী সেই গুণ অনুযায়ী লোককে সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক বলা হয়, কিন্তু সর্বদাই একই গুণ সম্পন্ন এমন লোক খুব অল্প, আর পুরোপুরি এক প্রকার গুণের লোক কেউই নয়। জ্ঞানী সর্বদাই বা পুরোপুরি জ্ঞানী নন, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ, সাধুর মধ্যেও অনেক অসাধু প্রবৃত্তি থাকে, তিনি সেগুলি দমন ক'রে রাখেন, আর অসাধুও পুরোপুরি দুষ্ট নয়; একান্ত নিস্তেজ লোকেরও অনেক অপ্রকাশিত বা অব্যবহৃত ও অপরিণত সামর্থ্য থাকে, অতি ভীরুও মাঝে মাঝে সাহস দেখায় বা নিজস্ব ধরনে সাহসের কাজ করে, অসহায় ও অতি দুর্বলেরও প্রকৃতিতে বলের কিছু সুপ্ত অংশ থাকে। প্রধান গুণগুলি দেহী জীবের অন্তঃপুরুষের মূল চরিত্র নয়, তাদের দ্বারা শুধু বোঝা যায় এই জীবনের জন্য বা এর বর্তমান জীবনের মধ্যে আর কালের মধ্যে তার ক্রমবিকাশের এক নির্দিষ্ট মুহূর্তে কি রূপায়ণ সে গড়ে তুলেছে।

যখন সাধক তার মধ্যে বা তার উপর প্রকৃতির ক্রিয়া থেকে একবার পিছনে সরে দাঁড়িয়ে কোনরকম হস্তক্ষেপ, সংশোধন বা নিয়ন্ত্রণ বা নির্বাচন বা সিদ্ধান্ত না করে তার খেলাকে চলতে দিয়ে সেই কর্মপ্রণালী বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ করে, তখন সে শীঘ্রই দেখতে পায় যে প্রকৃতির গুণগুলি আত্মনির্ভর এবং কোন যন্ত্রকে একবার চালিয়ে দিলে যেমন তা নিজের গঠন ও সঞ্চালিকা সব শক্তির বলে কাজ করে, তারাও তেমনভাবেই কাজ করতে থাকে। শক্তি ও চালনা প্রকৃতি থেকে আসে, জীবের কাছ থেকে নয়। তখন সে উপলব্ধি করে যে তার মনই যে তার সব কর্মের কর্তা তার এ ধারণা কত ভুল; তার মন তার এক ক্ষুদ্র অংশমাত্র এবং প্রকৃতির সৃষ্টি ও যন্ত্র। প্রকৃতিই সর্বক্ষণ নিজের পদ্ধতিতে কাজ করছিল তিনটি সাধারণ গুণকে চারিদিকে চালিয়ে যেমন ছোট মেয়ে খেলা করে তার পুতুল নিয়ে। সাধকের অহং সব সময়ই ছিল এক উপকরণ ও খেলনা; তার চরিত্র এবং বুদ্ধি, তার সব নৈতিকগুণ ও মানসিক শক্তি, তার বিভিন্ন সৃজন ও কর্ম ও কীর্তিকলাপ, তার ক্রোধ ও সহিষ্ণুতা, তার নিষ্ঠুরতা ও দয়া, তার ভালোবাসা ও ঘৃণা, তার পাপ ও পুণ্য, তার আলো ও অন্ধকার, তার আনন্দের বেগ ও দুঃখের ব্যথা — এসকলই ছিল প্রকৃতির খেলা আর অন্তঃপুরুষ এই খেলায় আকৃষ্ট, পরাস্ত ও বশীভূত হয়ে তার নিষ্ক্রিয় সম্মতি দিয়েছিল তাতে। কিন্তু তবু প্রকৃতির বা শক্তির এই যান্ত্রিক নির্ধারণই সব নয়; এ বিষয়ে অন্তঃপুরুষেরও কিছু বলার আছে, তবে তা গূঢ় অন্তঃ-পুরুষের বা পুরুষের, তা মনের বা অহং-এর নয়, কারণ এরা স্বতন্ত্র সত্তা নয়, এরা প্রকৃতিরই অংশ। কারণ খেলার জন্য অন্তঃপুরুষের অনুমতি প্রয়োজনীয়, এবং প্রভু ও অনুমন্তা হিসেবে আন্তর নীরব সঙ্কল্প দ্বারা সে খেলার তত্ত্ব নির্ধারণ ও তার বিভিন্ন সমবায়ে অংশ গ্রহণ করতে সক্ষম, যদিও মনন ও সঙ্কল্প, ক্রিয়া ও সংবেগের মধ্য দিয়ে কর্ম সম্পাদন প্রকৃতিরই করণীয় ও তারই অধিকারভুক্ত। পুরুষ প্রকৃতিকে আদেশ দিতে

পারে কোন এক সঙ্গতি গড়ে তুলতে, তবে তার ক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ না ক'রে, সে তা করে তার উপর এক সচেতন অবলোকনের দ্বারা আর প্রকৃতি তা রূপান্তরিত করে তখনই বা অনেক বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে অনুরূপ ভাবনায়, স্ফুরন্ত সংবেগে ও অর্থপূর্ণ মূর্তিতে।

যদি আমরা চাই আমাদের বর্তমান প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করতে দিব্য চেতনার সামর্থ্যে ও রূপে এবং তার সব শক্তির করণে, তাহলে অতি স্পষ্টতঃই দুই অবর গুণের ক্রিয়া থেকে নিস্তার পাওয়া আমাদের পক্ষে অপরিহার্য। তমঃ দিব্যজ্ঞানের আলোককে আচ্ছাদন করে, তাকে আমাদের প্রকৃতির অন্ধকারময় নিষ্প্রভ অংশগুলির মধ্যে আসতে দেয় না। দিব্য সংবেগে সাড়া দেওয়ার সামর্থ্য, পরিবর্তন সাধনের বীর্য, উন্নতিসাধন ও মহত্তর শক্তির নিকট আমাদিগকে নমনীয় করার সঙ্কল্প — এসবকে তমঃ অশক্ত করে, বিনষ্ট করে। রজঃ জ্ঞানকে বিকৃত করে, আমাদের যুক্তিশক্তিকে করে মিথ্যার সহকর্মী ও প্রতিটি অন্যায় বৃত্তির প্ররোচক; এ আমাদের প্রাণশক্তি ও তার বিভিন্ন সংবেগের মধ্যে বৈষম্য ও জটিলতা আনে, শরীরের সমতা ও স্বাস্থ্য বিপর্যস্ত করে। উর্ধ্বে জাত সকল ভাবনা ও উচ্চে আসীন সকল গতিবৃত্তিকে রজঃ অধিকার ক'রে তাদের ব্যবহার করে মিথ্যাময় অহমাত্মক কাজে; এমনকি দিব্য সত্য ও বিভিন্ন দিব্য প্রভাবও পার্থিব ভূমিতে নেমে এলে এই অপব্যবহার ও অধিকার থেকে নিস্তার পায় না। যতদিন তমঃ আলোকিত না হয়, রজঃ অপরিবর্তিত থাকে ততদিন কোন দিব্য রূপান্তর বা কোন দিব্য জীবন সম্ভব নয়।

মনে হতে পারে যে অপর দুটিকে বাদ দিয়ে শুধু সত্ত্বগুণের আশ্রয় নেওয়াই উদ্ধারের পথ; কিন্তু মুস্কিল এই যে কোন একটি গুণ নিজে তার দুটি সঙ্গী ও প্রতিযোগীকে পরাস্ত করে জয়ী হতে অক্ষম। বিক্ষোভ, কষ্টভোগ, পাপ ও দুঃখের কারণ মনে করে যদি আমরা কামনা ও উচ্চণ্ড ভাবাবেগের গুণকে শান্ত ও বশীভূত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করি তাহলে রজোগুণ নীচে নামে বটে কিন্তু তমোগুণ উপরে ওঠে। কারণ সক্রিয়তার তত্ত্ব নিস্তেজ হলে তার স্থানে আসে নিশ্চেষ্টতা। অবশ্য আলোকের তত্ত্ব আনতে পারে অচঞ্চল শান্তি, সুখ, জ্ঞান, প্রেম, যথাযথ ভাব কিন্তু যদি রজঃ না থাকে বা তাকে সম্পূর্ণরূপে চেপে রাখা হয় তাহলে অন্তঃপুরুষের মধ্যকার শান্তির সম্ভাব্য পরিণাম হল নিষ্ক্রিয়তার স্থৈর্য, এটি আর স্ফুরন্ত পরিবর্তনের দৃঢ় ভূমি হয় না। প্রকৃতিতে সাধু চিন্তা, সাধু কর্মপ্রবৃত্তি আসতে পারে, সে হতে পারে সৎ, মৃদু ও বিক্ষোভহীন কিন্তু এ সব অকেজো থাকে ব'লে প্রকৃতির স্ফুরন্ত অংশগুলি হয়ে ওঠে সত্ত্ব-তামসিক, নিস্পৃহ, নিষ্প্রভ, সৃষ্টিশক্তিহীন বা সামর্থ্যরহিত। মানসিক ও নৈতিক আচ্ছন্নতা না থাকতে পারে কিন্তু তেমন আবার ক্রিয়ার তীব্র প্রেরণাসমূহ থাকে না, আর এও এক প্রতিবন্ধক, সীমাবদ্ধতা, অন্যপ্রকারের অক্ষমতা। কারণ তমোতত্ত্বের কাজ দ্বিবিধ; তা রজঃকে খণ্ডন করে নিশ্চেষ্টতার দ্বারা আর সত্ত্বকে খণ্ডন করে সঙ্কীর্ণতা, আচ্ছন্নতা ও অজ্ঞানতার দ্বারা; আর সত্ত্ব ও রজঃর মধ্যে যে কোন একটিকে অবনত করা হলে তার স্থান পূরণ করার জন্য আসে তমসের প্রবাহ।

আবার যদি আমরা রজঃকে ডাকি এই ভুল সংশোধনের জন্য আর তাকে বলি

সত্ত্বকে সাহায্য করতে এবং যদি আমরা তাদের মিলিত শক্তির সাহায্যে তামসিক তত্ত্ব থেকে মুক্তি পেতে চেষ্টা করি তাহলে আমরা দেখি যে আমাদের ক্রিয়াকে আমরা উপরে তুলেছি বটে কিন্তু আবার আমরা রাজসিক অধীরতা, উচ্চণ্ড ভাবাবেগ, নৈরাশ্য, কষ্টভোগ ও ক্রোধের অধীন হয়েছি। এই বৃত্তিগুলির ক্ষেত্র ও আন্তর ভাব ও ক্রিয়া আগের চেয়ে বেশী উন্নত হতে পারে কিন্তু যে শান্তি, স্বাধীনতা, সামর্থ্য, আত্ম-কর্তৃত্বলাভ আমাদের কাম্য সে সব এরা নয়। যেখানেই কামনা ও অহং আশ্রয় নেয়, সেখানেই তাদের সঙ্গে উচ্চণ্ড ভাবাবেগ ও চাঞ্চল্য আশ্রয় নিয়ে তাদের জীবনের অংশীদার হয়। আর যদি আমরা চেষ্টা করি সত্ত্বকে নেতা ও অন্য দুটিকে তার অধীন করে তিনটি গুণের মধ্যে একটা আপোষ আনতে, তাহলেও তাতে আমরা শুধু পাই প্রকৃতির ক্রীড়ার এক আরো সংযত ক্রিয়া। তখন এক নতুন স্থৈর্য অধিগত হয় বটে কিন্তু অধ্যাত্ম স্বাধীনতা ও প্রভুত্বের দেখা মেলে না, অথবা তখনও তারা এক সুদূর প্রত্যাশামাত্র।

গুণগুলি থেকে আমাদের সরিয়ে এনে তাদের উর্ধ্বে আমাদের তোলার জন্য দরকার অন্য এক প্রচেষ্টা যা মূলতঃ ভিন্ন ধরনের। যে প্রমাদে প্রকৃতির গুণত্রয়ের ক্রিয়াকে স্বীকার করা হয় সে প্রমাদ দূর করা চাই; কেননা যতদিন এই স্বীকৃতি থাকবে ততদিন অন্তঃপুরুষও তাদের কাজের মধ্যে জড়িত হয়ে তাদের বিধানের অধীন থাকবে। রজঃ ও তমঃর মত সত্ত্বেরও উর্ধ্বে ওঠা অত্যাবশ্যক। লৌহনিগড় ও মিশ্রধাতুর দাসত্বসূচক অলঙ্কারের মত স্বর্ণশৃঙ্খলও ভাঙা চাই। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গীতায় আত্মশিক্ষার এক নতুন পদ্ধতির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই পদ্ধতি হল গুণের ক্রিয়া থেকে সরে এসে আত্মস্থ হয়ে থাকা এবং এই অস্থির প্রবাহকে দেখা প্রকৃতির সব শক্তির তরঙ্গের উর্ধ্বে সমাসীন দ্রষ্টার মত। সে তখন এমন একজন যে পর্যবেক্ষণ করে কিন্তু নিরপেক্ষ ও উদাসীন, তাদের ভূমিতে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন আর স্বকীয় স্থানে তাদের অনেক উর্ধ্বে। প্রকৃতির শক্তির তরঙ্গগুলি ওঠে, নামে, দ্রষ্টা চেয়ে থাকে, পর্যবেক্ষণ করে কিন্তু সে তাদের গ্রহণও করে না বা তখনকার মত বাধাও দেয় না তাদের গতিপথে। প্রথম আসা চাই নৈর্ব্যক্তিক দ্রষ্টার স্বাধীনতা, তবেই পরে সম্ভব হয় প্রভুর, ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ।

বিচ্ছিন্নতার এই প্রণালীর প্রথম সুবিধা এই যে সাধক বুঝতে শুরু করে নিজের আপন প্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতি। বিচ্ছিন্ন সাক্ষীর দৃষ্টি অহং-ভাবের দ্বারা এতটুকুও ব্যাহত হয় না ব'লে সে সক্ষম হয় অবিদ্যাময় প্রকৃতির সব গুণের ক্রিয়াকে পুরোপুরি দেখতে এবং তাদের অনুসরণ করতে তাদের সকল শাখা-প্রশাখা, সকল আবরণ ও সকল চাতুর্যের মধ্যে — কারণ এই খেলা, চাতুরী ও ছদ্মবেশ ও ফাঁদ ও বিশ্বাসঘাতকতা ও কৌশলে পূর্ণ। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার শিক্ষা পেয়ে, সকল কর্ম ও অবস্থা যে গুণের ক্রিয়া-

প্রতিক্রিয়ার ফল তা জেনে, তাদের সব প্রণালীর অর্থ বুঝে সাক্ষী আর তাদের আঘাতে অভিভূত হয় না, অতর্কিতে তাদের জালে আবদ্ধ হয় না বা প্রতারিত হয় না তাদের ছদ্মবেশে। সেই সঙ্গে সে দেখে যে অহং এক কৌশল ও তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ধারক এক গ্রন্থি ছাড়া আর কিছু নয় আর একথা বুঝতে পেরে সে অপরা অহমাত্মক প্রকৃতির ভ্রান্তি থেকে নিস্তার পায়। সে নিস্তার পায় পরোপকারী ও সাধুসন্ত ও ভাবুকের সাত্ত্বিক অহং-ভাব থেকে; তার প্রাণসংবেগের উপর স্বার্থান্বেষীর রাজসিক অহং-ভাবের যে নিয়ন্ত্রণ তা সে দূরে ফেলে, আর সে স্বার্থপূরণের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে না বা উচ্চণ্ড ভাবাবেগ ও কামনার আদুরে বন্দী বা একঘেয়ে ক্লান্তিকর খাটুনির ক্রীতদাস থাকে না; মানবজীবনের গতানুগতিক ধারায় আসক্ত অবিদ্যাচ্ছন্ন বা নিষ্ক্রিয় নিস্তেজ, বুদ্ধিহীন সত্তার তামসিক অহংভাবকে সে বিনাশ করে জ্ঞানালোকের সাহায্যে। আমাদের সকল ব্যক্তিগত ক্রিয়ায় অহংবোধের মূল পাপ সম্বন্ধে নিশ্চিত ও সচেতন হয়ে সে আর রাজসিক বা সাত্ত্বিক অহং-এর মধ্যে আত্মসংশোধন ও আত্মমুক্তির উপায় খোঁজে না, বরং সে তাকায় ঊর্ধ্বে, কারণসমূহ ও প্রকৃতির কর্মধারার অতীত একমাত্র কর্মের অধীশ্বরের দিকে ও তাঁর পরমা শক্তি, পরা প্রকৃতির দিকে। একমাত্র সেখানেই সমগ্র সত্তা শুদ্ধ ও মুক্ত, সেখানেই সম্ভব দিব্য সত্যের রাজত্ব।

এই অগ্রসরতার প্রথম ধাপ হল প্রকৃতির গুণত্রয় সম্পর্কে একপ্রকার নিরাসক্ত কর্তৃত্ব। অন্তঃপুরুষ আন্তরভাবে অপরা প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন ও মুক্ত থাকে, তার পাকে আবদ্ধ হয় না, তার ঊর্ধ্বে থাকে উদাসীন ও হৃষ্ট হয়ে। প্রকৃতি তার পুরনো অভ্যাস মত তিন গুণের আবর্তের মধ্য দিয়ে কাজ করে চলতে থাকে — হৃদয়ে আসে কামনা, বিষাদ ও হর্ষের আক্রমণ, করণগুলি হয়ে পড়ে নিষ্ক্রিয়, তমসাচ্ছন্ন ও ক্লান্ত; হৃদয় ও মনে ও দেহে ফিরে আসে আলোক ও শান্তি; কিন্তু এসব পরিবর্তন অন্তঃপুরুষকে স্পর্শ করে না, তার কোন পরিবর্তন হয় না। অধস্তন অঙ্গসমূহের বিষাদ ও কামনা সে দেখে কিন্তু তাতে বিচলিত হয় না, তাদের হর্ষ ও পরিশ্রমে তার হাসি আসে, মননের ব্যর্থতা ও অন্ধকার, হৃদয় ও সব স্নায়ুর উদ্দামতা বা দুর্বলতা সে লক্ষ্য করে কিন্তু তাতে অভিভূত হয় না, মনের দীপ্তি ও আলোক ও প্রসন্নতা ফিরে আসায় তার স্বস্তি এবং আরাম বা সামর্থ্যবোধে সে বশীভূত বা আসক্ত হয় না; এসবের কোনটিরই মধ্যে সে জড়িয়ে পড়ে না, বরং অচঞ্চল হয়ে অপেক্ষা করে পরতর সঙ্কল্পের বার্তার জন্য এবং মহত্তর দীপ্ত জ্ঞানের বোধির জন্য। তার অবিরত এই আচরণের ফলে শেষপর্যন্ত সে এমনকি তার স্ফুরন্ত অংশেও মুক্ত হয় গুণত্রয়ের বিরোধ থেকে এবং তাদের অপ্রচুর মূল্য ও সীমার গণ্ডি থেকে। কেননা এখন এই অপরা প্রকৃতি উত্তরোত্তর অনুভব করে এক পরতরা শক্তির নিয়ন্ত্রণ। যে সব পুরনো অভ্যাস সে আঁকড়ে থাকত সে সবের জন্য আর অনুমোদন পাওয়া যায় না, তাদের ঘন ঘন পুনরাবৃত্তি ও শক্তি নিশ্চিতভাবে ক্রমশঃ কমে আসে। পরিশেষে সে বুঝতে পারে যে এক পরতর ক্রিয়া ও শ্রেয়স্কর অবস্থার জন্য সে উদ্দিষ্ট আর যতই মন্থরভাবে হ'ক, যতই অনিচ্ছা, যতই প্রাথমিক বা দীর্ঘস্থায়ী বিদ্বেষ ও

বিচ্যুতিপূর্ণ অজ্ঞানতা থাকুক না কেন, শেষ পর্যন্ত সে নতি স্বীকার করে ও ফিরে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে রূপান্তরের জন্য।

তখন অন্তঃপুরুষ আর শুধু সাক্ষী ও জ্ঞাতা নয়, তার নিশ্চল স্বাধীনতার বিজয়মণ্ডিত পরিণাম হল প্রকৃতির স্ফুরন্ত রূপান্তর। আমাদের তিনটি করণের মধ্যে পরস্পর ক্রিয়াশীল গুণত্রয়ের অবিরাম মিশ্রণ ও অসম কার্যের ফলে যে সব সাধারণ বিশৃঙ্খল, উদ্বেগপূর্ণ ও অযথা ক্রিয়া ও গতিবৃত্তি জন্মায় সে সবের অবসান ঘটে। আর একটি ক্রিয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠে, এটি শুরু হয়, বৃদ্ধি পায় ও চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে; এই কর্মপ্রণালী আরো যথার্থভাবে ঋজু, আরো প্রদীপ্ত, এটি পুরুষ ও প্রকৃতির পরস্পরের গভীরতম দিব্য খেলার পক্ষে স্বাভাবিক ও সাধারণ যদিও আমাদের বর্তমান অপূর্ণ প্রকৃতির পক্ষে এটি অতিপ্রাকৃত ও অসাধারণ। স্থূল মনের নিয়ন্তা দেহ সেই তামসিক নিশ্চেষ্টতার জন্য আর জিদ ধরে না যাতে সর্বদাই একই অজ্ঞানাচ্ছন্ন গতিবৃত্তির পুনরাবৃত্তি ঘটে; এটি হয়ে ওঠে এক মহত্তর শক্তি ও আলোকের নিষ্ক্রিয় ক্ষেত্র ও করণ, চিৎপুরুষের শক্তির প্রতি দাবীতেই সে সাড়া দেয়, নব দিব্য অনুভূতির সকল বৈচিত্র্য ও তীব্রতাকে সে ধারণ করে। আমাদের সক্রিয় ও স্ফুরন্ত প্রাণিক অংশগুলির, আমাদের স্নায়ুগত ও ভাবাবেগপ্রধান ও ইন্দ্রিয়-অনুভূতিশীল ও সঙ্কল্পপর সত্তার সামর্থ্যের প্রসার হয়, এদের দ্বারা সম্ভব হয় ক্লান্তিহীন ক্রিয়া ও অনুভূতির আনন্দময় উপভোগ, তবে একই সঙ্গে তারা শেখে এক ব্যাপ্ত স্বাধিকৃত ও স্বরূপস্থিত স্থিরতার ভিত্তির উপর দাঁড়াতে, তখন তারা শক্তিতে মহিমময়, স্থৈর্যে দিব্য, তারা উল্লসিত বা উত্তেজিত বা দুঃখ যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হয় না; কামনা ও দুরাগ্রহী সব সংবেগ এদের পীড়া দেয় না, অক্ষমতা ও আলস্য এদের নিস্তেজ করে না। বুদ্ধি অর্থাৎ যে মন চিন্তা করে, বোঝে ও বিবেচনাশীল সে তার সাত্ত্বিক সব সঙ্কীর্ণতা পরিহার করে নিজেকে খুলে ধরে এক মৌলিক আলোক ও শান্তির কাছে। এক অনন্ত জ্ঞান আমাদের কাছে আনে তার জ্যোতির্ময় ভূমিগুলি — এমন এক জ্ঞান যা মানসিক রচনার দ্বারা গঠিত নয়, মত ও ভাবনার দ্বারা সীমিত নয়, প্রমাদপূর্ণ অনিশ্চিত ন্যায় এবং ইন্দ্রিয়ের তুচ্ছ সমর্থনের উপর নির্ভর করে না, বরং যা আত্ম-নিশ্চিত, স্বয়ং-সিদ্ধ, সবকিছুর মধ্যে প্রবেশ করে, সবকিছু প্রণিধান করে; আর তার সঙ্গে আসে এক অশেষ আনন্দ ও শান্তি যা সৃজনক্ষম শক্তি ও স্ফুরন্ত ক্রিয়ার ব্যাহত উদ্যম থেকে মুক্তির উপর নির্ভর করে না, যা কতকগুলি সীমিত সুখভোগের দ্বারা গঠিত নয় বরং যা স্বপ্রতিষ্ঠ এবং সর্বগ্রাহী; আর প্রকৃতিকে অধিগত করার জন্য এই জ্ঞান, শান্তি ও আনন্দ প্রবাহিত হয় নিত্য প্রসারশীল সব ক্ষেত্রের মধ্যে আর এমন সব প্রণালীর মধ্য দিয়ে যেগুলির বিস্তার ও সংখ্যা অনবরতই বৃদ্ধি পায়। মন ও প্রাণ ও দেহের অতীত এক উৎস থেকে আগত এক পরতর শক্তি, আনন্দ ও জ্ঞান তাদের অধিকার করে তাদের দিব্যতর প্রতিরূপে পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে।

এইখানে অতিক্রম করা হয় আমাদের অবর জীবনের গুণত্রয়ের সব বৈষম্য আর শুরু হয় দিব্য প্রকৃতির মহত্তর ত্রিগুণ। তমঃ বা নিশ্চেষ্টতার অন্ধকার থাকে না। তমসের স্থলে আসে এক দিব্য প্রশান্তি ও শান্ত শাশ্বত বিশ্রাম আর তা থেকে নির্ঝরিত হয় যেন

স্থির একাগ্রতার পরম গর্ভাশয় থেকে ক্রিয়া ও জ্ঞানের খেলা। কোন রাজসিক গতি থাকে না, থাকে না কোন কামনা অথবা ক্রিয়া, সৃষ্টি বা অধিকারের জন্য সুখ ও দুঃখে ভরা প্রচেষ্টা, থাকে না উদ্বেগপূর্ণ সংবেগের ফলপ্রসূ নৈরাজ্য। রজসের স্থলে আসে স্বাধিকৃত সামর্থ্য ও শক্তির অপরিসীম ক্রিয়া কিন্তু এর প্রচণ্ডতম তীব্রতাতেও অন্তঃপুরুষের অচঞ্চল স্থৈর্য বিচলিত হয় না বা তার প্রশান্তির বিরাট ও গভীর আকাশে ও প্রদীপ্ত সব গহ্বরে কোন কলঙ্ক রেখা পড়ে না। সত্যকে ধরে বন্দী করার জন্য জাল ফেলে বেড়ায় মনের এমন কোন গঠনশীল আলোক থাকে না; থাকে না অনিশ্চিত বা নিষ্ক্রিয় বিশ্রাম। সত্ত্বের স্থলে আসে এমন এক জ্যোতি ও অধ্যাত্ম আনন্দ যা অন্তঃপুরুষের গভীরতা ও অনন্ত অস্তিত্বের সঙ্গে এক এবং নিগূঢ় সর্বজ্ঞতার প্রচ্ছন্ন মহিমা থেকে অব্যবহিতভাবে জাত এক অপরোক্ষ ও স্বয়ংসিদ্ধ জ্ঞানে অনুপ্রাণিত। এই সেই মহত্তর চেতনা যাতে আমাদের অবর চেতনাকে রূপান্তরিত করা চাই, আর পরিবর্তিত করা চাই অবিদ্যার এই প্রকৃতিকে ও ত্রিগুণের অশান্ত বিষম সক্রিয়তাকে এই মহত্তরা জ্যোতির্ময়ী পরাপ্রকৃতিতে। প্রথমে তিনটি গুণের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে আমরা হই নিরাসক্ত ও অনুদ্বিগ্ন "নিস্ত্রৈগুণ্য"; তবে এ হল অন্তঃপুরুষের, আত্মার, চিৎপুরুষের স্বকীয় অবস্থার পুনঃপ্রাপ্তি — যে পুরুষ মুক্ত হয়ে অবিদ্যাময়ী শক্তির মধ্যে প্রকৃতির গতিকে দেখে অবিচলিত স্থিরতার সঙ্গে। যদি একে ভিত্তি করে (জীবের) প্রকৃতিকেও, বিশ্বপ্রকৃতির গতিকেও মুক্ত হতে হয় তবে তা হওয়া চাই এমন প্রদীপ্ত শান্তি ও নীরবতার মধ্যে ক্রিয়ার উপশমের দ্বারা যাতে আবশ্যকীয় সকল কর্মই করা হয় মনের বা প্রাণসত্তার সচেতন প্রতিক্রিয়া বা সহযোগ বা প্রবর্তন ছাড়াই আর তাতে থাকে না মননের কোন ক্ষুদ্র তরঙ্গ বা প্রাণিক অংশের সামান্য আবর্তও: এটি করা চাই এক নৈর্ব্যক্তিক বিশ্বশক্তি বা বিশ্বাতীত শক্তির প্রচোদনায়, প্রবর্তনায় ও পদ্ধতি অনুযায়ী। এক বিশ্বমন, বিশ্বপ্রাণ, বিশ্বধাতুকেই কাজ করতে হবে, অথবা কাজ করতে হবে এমন এক শুদ্ধ বিশ্বাতীত আত্মাশক্তি ও আনন্দকে যা আমাদের স্বকীয় ব্যক্তিগত সত্তা বা প্রকৃতির কোন গঠন থেকে ভিন্ন। এই যে মুক্তির অবস্থা তা কর্মযোগে আসতে পারে অহং ও কামনা ও ব্যক্তিগত প্রবর্তন ত্যাগের এবং বিশ্বাত্মা বা বিশ্বশক্তির কাছে সত্তার সমর্পণের মাধ্যমে; জ্ঞানযোগে তা আসতে পারে মননের নিবৃত্তি, মনের নীরবতা, বিশ্বচেতনা, বিশ্বাত্মা, বিশ্বস্ফুরত্তা বা পরম সদ্‌বস্তুর নিকট সমগ্র সত্তার উন্মীলনের দ্বারা: ভক্তিযোগে তা আসতে পারে আমাদের জীবনের আরাধ্য ঈশ্বরস্বরূপ সর্বানন্দময়ের হাতে আমাদের হৃদয় ও সমগ্র প্রকৃতির সমর্পণের মাধ্যমে। কিন্তু চরম পরিবর্তন আসে এক আরো সদর্থক ও স্ফুরন্ত অতিস্থিতির দ্বারা; এমন এক মহত্তর আধ্যাত্মিক অবস্থায়, "ত্রিগুণাতীত" অবস্থায় সংক্রমণ বা রূপান্তর হয় — যার মধ্যে আমরা এক মহত্তর আধ্যাত্মিক স্ফুরত্তাতে অংশ নিই; কেননা তিনটি অবর অসম গুণ পরিবর্তিত হয় এক সম ত্রিদলগুণে — শাশ্বত শান্তি, আলোক ও শক্তিতে, দিব্য প্রকৃতির বিশ্রাম, গতি, জ্যোতিতে।

এই পরম সৌষম্য আসা সম্ভব নয় যতক্ষণ না অহমাত্মক সঙ্কল্প ও রুচি ও কর্মের

নিবৃত্তি হয় এবং আমাদের সীমিত বুদ্ধির উপশম হয়। ব্যষ্টি অহং-এর সচেষ্ট হওয়া বন্ধ হওয়া চাই, মনকে হতে হবে নীরব, কাম-সঙ্কল্প যেন শেখে কোন কিছু সূচনা না করতে। আমাদের ব্যক্তিভাবনাকে মিলিত হতে হবে তার উৎসের সঙ্গে, আর সকল মনন ও প্রবর্তনা আসা চাই ঊর্ধ্ব থেকে। ধীরে ধীরে আমাদের নিকট অপাবৃত হবেন আমাদের ক্রিয়ারাজির নিগূঢ় অধীশ্বর এবং তিনি পরম সঙ্কল্প ও জ্ঞানের নিশ্চিততা থেকে দিব্য শক্তিকে অনুমতি দেবেন; এই শক্তিই আমাদের মধ্যে সকল কর্ম সম্পাদন করবেন তাঁর করণস্বরূপ এক পবিত্র-করা উন্নীত প্রকৃতি নিয়ে; ব্যক্তিভাবনার ব্যষ্টিকেন্দ্রটি হবে শুধু তাঁর এখানকার সকল কর্মের ধারক, তাদের গ্রহীতা ও প্রণালী, তাঁর সামর্থ্যের দর্পণ, এবং তাঁর আলোক, হর্ষ ও শক্তির জ্যোতির্ময় সহযোগী। কাজ করেও সে কাজ করবে না আর অপরা প্রকৃতির কোন প্রতিক্রিয়াই তাকে স্পর্শ করবে না। এই পরিবর্তনের প্রথম অবস্থা হল প্রকৃতির গুণত্রয়ের ঊর্ধ্বে ওঠা আর তার চূড়ান্ত ধাপ হল তাদের রূপান্তর যার দ্বারা কর্মযোগ আমাদের তমসাবৃত মানুষী প্রকৃতির সঙ্কীর্ণতার গর্ত থেকে বার হয়ে আরোহণ করে আমাদের ঊর্ধ্বে পরম সত্য ও পরম আলোকের অবাধ প্রসারের মধ্যে।

একাদশ অধ্যায়

কর্মের অধীশ্বর

যিনি আমাদের কর্মের অধীশ্বর ও চালক, তিনি পরম এক, বিশ্বাত্মক ও পরাৎপর, সনাতন ও অনন্ত। তিনি বিশ্বাতীত অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় পরমার্থসৎ, আমাদের ঊর্ধ্বে অপ্রকাশিত ও অব্যক্ত অনির্বচনীয়; তবে তিনিই আবার সকল সত্তার পরমাত্মা, সকল জগতের অধীশ্বর, সকল জগতের অতীত, পরম আলোক ও দিশারী, সর্ব-সুন্দর ও সর্ব-আনন্দময়, প্রেমাস্পদ ও প্রেমিক। তিনি বিরাট পুরুষ আর আমাদের চারিদিকের এইসব সৃজনশীলা শক্তি; তিনিই আমাদের অন্তরে অধিষ্ঠাতা পুরুষ। যা কিছু, সবই তিনি, আবার তিনি সবকিছুর অতিরিক্ত, আর আমরা না জানলেও, তাঁরই সত্তার সত্তা, তাঁরই শক্তির শক্তি আমরা, তাঁর চেতনা থেকে উৎপন্ন চেতনায় আমরা সচেতন; এমনকি আমাদের মর্ত্যজীবন তাঁরই ধাতুতে নির্মিত, আর আমাদের মধ্যে অমর এমন কিছু আছে যা শাশ্বত আলোক ও আনন্দের স্ফুলিঙ্গ। যেভাবেই হ'ক — জ্ঞান, কর্ম, প্রেমের দ্বারা অথবা অন্য যে কোন উপায়েই হ'ক আমাদের সত্তার এই সত্য জানা ও উপলব্ধি করা এবং এখানে বা অন্যত্র একে সার্থক করাই সকল যোগের উদ্দেশ্য।

কিন্তু দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার ও কঠোর পরিশ্রম করার পরই আমরা তাঁকে দেখতে পাই সত্যদর্শী চক্ষুতে; আর যদি আমরা চাই আমাদের পুনর্গঠন করতে তাঁর সত্যকার প্রতিমূর্তিতে, তাহলে আমাদের সাধনা হতে হবে আরো দীর্ঘ, আরো কঠোর। কর্মের অধীশ্বর প্রথমেই সাধকের কাছে আত্মপ্রকাশ করেন না। সর্বদা তাঁরই সামর্থ্য আবরণের পশ্চাতে সক্রিয় তবে এটি ব্যক্ত হয় কেবল তখনই যখন আমরা পরিহার করি কর্মীর অহং-ভাব, আর যে পরিমাণে এই ত্যাগ আরো বেশীমাত্রায় বাস্তব হয়ে উঠতে থাকে, সেই পরিমাণে সেই সামর্থ্যের সাক্ষাৎ গতিও বাড়তে থাকে। তাঁর দিব্যশক্তির কাছে আমাদের সমর্পণ চরম একান্ত হলেই আমরা অধিকার পাই তাঁর একান্ত সান্নিধ্যে থাকার। আর কেবল তখনই আমরা দেখতে পাব যে, আমাদের কর্ম সহজ, স্বাভাবিক ও সম্পূর্ণভাবে গড়ে উঠছে দিব্যসঙ্কল্পের ছাঁচে।

সুতরাং প্রকৃতির যে কোন ভূমিতেই যেমন সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হবার পথে বিভিন্ন পর্যায় ও ক্রম থাকে, তেমন এই সিদ্ধির দিকেও আমাদের যাত্রাপথে বিভিন্ন পর্যায় ও ক্রম থাকা অবশ্যম্ভাবী। সিদ্ধির পূর্বেই পূর্ণ মহিমার দর্শন আমরা পেতে পারি অকস্মাৎ বা ধীরে ধীরে, একবার বা বহুবার কিন্তু যতক্ষণ না ভিত্তি সম্পূর্ণ হয়, ততদিন সে-দর্শন

সংক্ষিপ্ত ও ঘনীভূত থাকে, এটি কোন দীর্ঘস্থায়ী ও সর্বগ্রাসী অনুভূতি নয়, বা কোন চিরস্থায়ী সান্নিধ্যও নয়। দিব্য আত্মপ্রকাশের প্রাচুর্য, অনন্ত সমৃদ্ধি পরে আসে এবং তাদের সামর্থ্য ও তাদের তাৎপর্য উন্মুক্ত করে ক্রমে ক্রমে। অথবা এমনকি নিরন্তর-দর্শনও আসা সম্ভব আমাদের প্রকৃতির শিখরদেশে কিন্তু অধস্তন অঙ্গসমূহের সাড়া আসে শুধু ক্রমে ক্রমে। সকল যোগেই প্রথম প্রয়োজন হল বিশ্বাস ও ধৈর্য। হৃদয়ের যে উদ্দীপনা ও অধীর সঙ্কল্পের যে প্রচণ্ডতা স্বর্গের রাজত্বকে ছিনিয়ে নিতে চায় ঝড়ের মত বেগে, তাদের প্রতিক্রিয়ার ফল বিষময় হতে পারে যদি এইসব দীন ও শান্ত সহায়কদের উপর তাদের উগ্রতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে উপেক্ষা করা হয়। আর এই দীর্ঘ ও দুরূহ পূর্ণযোগে অখণ্ড বিশ্বাস ও অবিচলিত ধৈর্য অপরিহার্য।

যোগের বন্ধুর ও সঙ্কীর্ণ পথে এই বিশ্বাস ও দৃঢ়তা লাভ করা বা অভ্যাস করা দুরূহ, কারণ হৃদয় ও মন উভয়ই অধীর এবং আমাদের রাজসিক প্রকৃতির সঙ্কল্পও উৎসুক কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত। মানুষের প্রাণময় প্রকৃতি সর্বদাই লালায়িত তার পরিশ্রমের ফলের জন্য, আর যদি দেখা যায় যে, ফল পাওয়া যাচ্ছে না বা অনেক দেরী হবে, তাহলে আদর্শে ও নির্দেশে তার বিশ্বাস আর থাকে না। কেননা তার মন সর্বদাই বিচার করে বিষয়ের বাহ্য রূপ দিয়ে, কারণ যে যুক্তিবুদ্ধিকে সে অতিমাত্রায় বিশ্বাস করে তার মজ্জাগত অভ্যাস এটাই। যখন আমরা অনেকদিন কষ্টভোগ করি বা অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে পড়ি, তখন মনে মনে ভগবানকে দোষী করাই বা যে আদর্শ আমরা আমাদের সামনে রেখেছি, তা বর্জন করাই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে সহজ। কারণ আমরা বলি, "আমি সর্বশ্রেষ্ঠকে বিশ্বাস করেছি, কিন্তু তিনি আমাকে ফেলেছেন কষ্টভোগ, পাপ ও প্রমাদের মধ্যে"। আর না হয় বলি, "আমার সমস্ত জীবন আমি দিতে চেয়েছি এমন এক ভাবনার জন্য যা অভিজ্ঞতার রূঢ় ঘটনাবলীতে দেখা যায় ভুল ও নিরুৎসাহকর। অন্য সব মানুষ যেমন তাদের সব সঙ্কীর্ণতা স্বীকার ক'রে সাধারণ অভিজ্ঞতার শক্ত মাটিতে বিচরণ করে, তাই করলেই আমার ভাল হ'ত"। এমন সব মুহূর্তে — আর এগুলি কখনো কখনো বারবার আসে, দীর্ঘকাল থাকে — সব উচ্চতর অনুভূতির কথা মানুষ ভুলে যায়, তার হৃদয় নিবদ্ধ থাকে শুধু তার তিক্ততায়। এই সমস্ত অন্ধকার পথের মধ্যেই সম্ভব হয় চিরদিনের মত অধঃপতন বা দিব্য প্রচেষ্টা থেকে নিবৃত্তি।

কিন্তু যে সাধক দীর্ঘকাল দৃঢ়ভাবে এই পথে চলেছে, তার হৃদয়ের বিশ্বাস বজায় থাকে প্রবলতম বিরুদ্ধ চাপেও; এমনকি যদি তা চাপা পড়ে বা মনে হয় পরাস্ত হয়েছে, তবু তা প্রথম সুযোগেই আবার দেখা দেয়। কারণ হীনতম বিচ্যুতি সত্ত্বেও, সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী বিফলতার মধ্যেও হৃদয় বা বুদ্ধি অপেক্ষা মহত্তর কিছু তাকে ধরে থাকে। কিন্তু এরকম স্খলন বা মেঘাচ্ছন্নতাতে অভিজ্ঞ সাধকেরও উন্নতি ব্যাহত হয়, আর নবীনের পক্ষে তারা তো অত্যন্ত বিপজ্জনক। সুতরাং প্রথম থেকেই দরকার পথের কঠিন দুরূহতার কথা প্রণিধান করে তা স্বীকার করা, আর দরকার এমন বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যা ধীশক্তির কাছে মনে হতে পারে অন্ধ কিন্তু তবু যুক্তিবুদ্ধির চেয়ে যা বেশী জ্ঞানী। কারণ এই বিশ্বাস ঊর্ধ্ব থেকে পাওয়া এক অবলম্বন; বুদ্ধি ও তার

সব তথ্য ছাড়িয়ে যে এক নিগূঢ় আলোক আছে, তারই প্রোজ্জ্বল ছায়া এটি; এ হল এমন এক প্রচ্ছন্ন জ্ঞানের মর্ম যা অব্যবহিত বাহ্য ঘটনার অধীন নয়। যদি আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় থাকে, তাহলে কর্মের মধ্যে তার সাফল্য পাওয়া যাবে এবং পরিশেষে এটি উন্নীত ও রূপান্তরিত হবে এক দিব্য জ্ঞানের আত্মপ্রকাশে। গীতার এই আদেশ আমাদের সর্বদা পালন করা উচিত — "নিরুৎসাহ না হয়ে দৃঢ়চিত্তে অবিরত যোগাভ্যাস কর"। সংশয়ী বুদ্ধির কাছে সর্বদাই ঈশ্বরের এই প্রতিজ্ঞা আবৃত্তি করতে হবে, "অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি, মা শুচঃ" — আমি তোমাকে সকল পাপ ও অশুভ থেকে মুক্ত করব, শোক ক'রো না। পরিশেষে বিশ্বাসের চাঞ্চল্য বন্ধ হবে; কারণ আমরা দেখতে পাব তাঁর মুখমণ্ডল, আর সর্বদা অনুভব করব দিব্য সান্নিধ্য।

আমাদের কর্মের অধীশ্বর আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে ব্যবহার করেন সমবেদনার সঙ্গে, এমনকি যখন তিনি এর রূপান্তর সাধন করেন তখনও; তিনি সর্বদা কাজ করেন প্রকৃতির মধ্য দিয়েই, কোন ইচ্ছামত খামখেয়ালের দ্বারা নয়। আমাদের এই অপূর্ণ প্রকৃতির মধ্যেই আছে আমাদের পূর্ণতার সব উপাদান কিন্তু এরা অপক্ক, বিকৃত, স্থানভ্রষ্ট ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিক্ষিপ্ত বা এমন এক শৃঙ্খলা থাকে যা সামান্য ও অপূর্ণ। ধৈর্যের সঙ্গে এইসব উপাদানের সিদ্ধি, শুদ্ধি, পুনর্বিন্যাস, পুনর্গঠন ও রূপান্তর সাধন দরকার; শুধু জোর করে, অস্বীকার করে তাঁদের টুকরো টুকরো করে কেটে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া, বিনষ্ট বা বিকৃত বা নিশ্চিহ্ন করা চলবে না। এই যে জগৎ ও আমরা তার অধিবাসী — এসব তাঁরই সৃষ্টি ও অভিব্যক্তি, আর তিনি এসবকে এমনভাবে ব্যবহার করেন, যা আমাদের সঙ্কীর্ণ ও অজ্ঞান মন বুঝতে পারে না যদি না তা নীরব হয়ে দিব্য জ্ঞানের নিকট উন্মুক্ত হয়। আমাদের সব প্রমাদের মধ্যেও এমন এক সত্যের সারবস্তু আছে, যা আমাদের হাতড়ে বেড়ানো বুদ্ধির কাছে তার অর্থ প্রকাশ করতে সচেষ্ট। মানুষী বুদ্ধি প্রমাদকে আর তার সাথে সত্যকে কেটে বাদ দেয়, আর তার স্থলে আনে এক অর্ধ-সত্য, অর্ধ-প্রমাদ, কিন্তু দিব্য প্রজ্ঞা জেনেও এসব ভুল চলতে দেন যতদিন না আমরা সেই সত্যে উপনীত হতে পারি যা সকল রকম মিথ্যা আবরণের পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন ও সুরক্ষিত থাকে। আমাদের সব পাপ এমন এক অন্বেষু সামর্থ্যের ভ্রান্ত পদক্ষেপ যার লক্ষ্য পাপ নয়, যার লক্ষ্য সিদ্ধি, এমন কিছু যাকে আমরা বলতে পারি দিব্য পুণ্য। অনেক সময় তারা এমন এক গুণের অবগুণ্ঠন যাকে রূপান্তরিত করে মুক্ত করা চাই এই কুৎসিত ছদ্মবেশ থেকে; তা নাহলে নিখুঁত বিশ্ববিধানের মধ্যে তাদের স্থান দেওয়া হ'ত না, বা স্থান হলেও বেশী দিন চলতে দেওয়া হ'ত না। আমাদের কর্মের অধীশ্বর ভুল-করা বোকা বা উদাসীন দ্রষ্টা নন বা অপ্রয়োজনীয় অমঙ্গলের বিলাস করে মজা দেখেন না। তিনি আমাদের যুক্তিবুদ্ধি থেকে, আমাদের পুণ্য থেকে বেশী বোঝেন।

আমাদের প্রকৃতি শুধু যে সঙ্কল্পে ভ্রান্ত ও জ্ঞানে অবিদ্যাচ্ছন্ন তা নয়, সামর্থ্যেও তা

দুর্বল, কিন্তু দিব্যশক্তি ঠিকই আছে এবং যদি আমরা এতে বিশ্বাস রাখি তাহলে এ আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে ও আমাদের সব ত্রুটিকে ও আমাদের সামর্থ্যকে ব্যবহার করবে দিব্য উদ্দেশ্যের জন্য। যদি আমাদের অব্যবহিত লক্ষ্য ব্যর্থ হয় তার কারণ তিনিই এই ব্যর্থতা চেয়েছেন, অনেক সময় অব্যবহিত ও সম্পূর্ণ সাফল্যে আমরা যে সিদ্ধি লাভ করি তার চেয়ে আরো সত্যকার সিদ্ধি আসে আমাদের ব্যর্থতা বা মন্দ ফলের সঠিক পন্থায়। আমরা যদি কষ্ট পাই, তার কারণ আমাদের মধ্যে এমন কিছু আছে যাকে প্রস্তুত করা চাই সেই আনন্দের জন্য যা বিরল হলেও সম্ভব। যদি আমরা হোঁচট খাই, তার কারণ আমাদের শেষ পর্যন্ত শিখতে হবে আরো সুষ্ঠুভাবে চলার রহস্য। এমনকি শান্তি, শুদ্ধি ও সিদ্ধি পাবার জন্যও যেন আমরা অতিরিক্ত মাত্রায় না তাড়াহুড়ো করি। শান্তি আমাদের চাই-ই কিন্তু কোন রিক্ত বা বিধ্বস্ত প্রকৃতির শান্তি নয় বা এমন সব বিনষ্ট বা বিকৃত সামর্থ্যের শান্তি নয় যেগুলির তীব্রতা, তেজ ও শক্তি নষ্ট করায় তারা চঞ্চল হতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। শুদ্ধি আমাদের লক্ষ্য হওয়া চাই কিন্তু কোন শূন্যতা বা নিরানন্দ ও কঠোর শীতলতার শুদ্ধি নয়। সিদ্ধিলাভ আমাদের কর্তব্য কিন্তু এমন সিদ্ধি নয় যার অস্তিত্ব নির্ভর করে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকার উপর বা অনন্তের সদা আত্মপ্রসারশীল পটের যথেচ্ছ পূর্ণ বিরতির উপর। আমাদের উদ্দেশ্য দিব্য প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হওয়া কিন্তু দিব্য প্রকৃতি কোন মানসিক বা নৈতিক অবস্থা নয়, এ হল এক আধ্যাত্মিক অবস্থা যা সাধন করা দুরূহ, এমনকি বুদ্ধি দিয়ে যার ধারণা করাও দুরূহ। কি করণীয় তা আমাদের কর্মের ও আমাদের যোগের অধীশ্বর জানেন, আর আমাদের উচিত তাঁর হাতে ছেড়ে দেওয়া যাতে তিনি আমাদের মধ্য দিয়ে তা করেন নিজের উপায়ে ও নিজের ধারায়।

অবিদ্যার গতিবিধির মর্ম অহমাত্মক, আর যতদিন আমরা ব্যক্তিসত্ত্ব স্বীকার করি ও আমাদের সম্পূর্ণ প্রকৃতির অর্ধ-আলোক ও অর্ধ-শক্তির ক্রিয়ায় নিযুক্ত থাকি ততদিন আমাদের পক্ষে অহং-ভাব ত্যাগ করার মতন দুরূহ আর কিছু নেই। কর্মের সংবেগ বর্জন করে অহংকে অভুক্ত রাখা বা আমাদের মধ্য থেকে ব্যক্তিসত্ত্বের সকল চেষ্টা ছিন্ন করে অহংকে বিনাশ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। প্রশান্তির ভাব-সমাধিতে বা দিব্য প্রেমের উল্লাসে নিমগ্ন আত্মবিস্মৃতির মধ্যে তার উন্নয়নও অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু আমাদের যে সমস্যা আরো দুরূহ, তা হল সত্যকার ব্যক্তিকে মুক্ত করে এমন দিব্য মানবত্বলাভ, যে মানবত্ব হবে দিব্যশক্তির বিশুদ্ধ আধার ও দিব্যক্রিয়ার নিখুঁত যন্ত্র। দৃঢ়ভাবে একটির পর একটি পদক্ষেপে এগুতে হবে, কষ্টের পর কষ্ট পুরোপুরি ভোগ করে সে সবকে সম্পূর্ণ জয় করতে হবে। একমাত্র দিব্য প্রজ্ঞা ও সামর্থ্যই সক্ষম আমাদের জন্য এইসব সাধন করতে আর সে এইসব করবেও যদি আমরা তার নিকট আত্মসমর্পণ করি পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে এবং তার সব কর্মপ্রণালী অনুসরণ করি ও তাতে সম্মতি দিই অচঞ্চল সাহস ও ধৈর্যের সঙ্গে।

এই দীর্ঘ পথে প্রথম পদক্ষেপ হল আমাদের ও জগতের অন্তঃস্থ ভগবানের কাছে

আমাদের সকল কর্ম যজ্ঞরূপে উৎসর্গ করা; এ হল মন ও হৃদয়ের এমন এক ভঙ্গি যা আরম্ভ করা তত দুরূহ নয় কিন্তু যাকে একান্তভাবে অকপট ও সর্বব্যাপী করা অতি দুরূহ। দ্বিতীয় পদক্ষেপ হল সর্ব কর্মফলত্যাগ; কারণ যজ্ঞের যে একমাত্র সত্যকার অবশ্যম্ভাবী ও পরম কাম্য ফল ও যা একমাত্র প্রয়োজনীয়, তাহল আমাদের মধ্যে দিব্য সান্নিধ্য ও দিব্য চেতনা ও শক্তি; আর যদি তা পাওয়া যায়, তাহলে অন্য সব কিছুও তার সাথে যোগ হবে। এর অর্থ আমাদের প্রাণময় সত্তার, আমাদের কামপুরুষের ও কামপ্রকৃতির মধ্যকার অহমাত্মক সঙ্কল্পের রূপান্তর আর এই কাজ অপরটির চেয়ে অনেক বেশী দুরূহ। তৃতীয় পদক্ষেপ হল কেন্দ্রীয় অহং-ভাব এবং এমনকি কর্মীর অহং-বোধও ত্যাগ করা; এইটিই সর্বাপেক্ষা দুরূহ রূপান্তর আর এর নিখুঁত সাধন সম্ভব হয় না যদি প্রথম দুটি কাজ নিষ্পন্ন না হয়; কিন্তু এই প্রথম কাজগুলিও সম্পূর্ণ শেষ করা যায় না, যদি না তৃতীয়টি আসে সাধনার গতিকে বিজয়মণ্ডিত করতে আর যদি অহং-ভাবকে ধ্বংস করে তা কামনার মূলোচ্ছেদ না করে। যখন প্রকৃতি থেকে অহং-বোধ উৎপাটিত হয়, কেবল তখনই সাধক জানতে পারে তার আসল ব্যক্তিকে যে ঊর্ধ্বে অবস্থিত — ভগবানের অংশ ও সামর্থ্য হিসেবে, আর কেবল তখনই সে সক্ষম হয় দিব্যশক্তির সঙ্কল্প ছাড়া অন্য সকল প্রবর্তকশক্তি বর্জন করতে।

এই সর্বশেষ অখণ্ডতাসাধিকা প্রচেষ্টার মধ্যেও বিভিন্ন পর্যায় আছে; কারণ এটি সদ্য সদ্য বা দীর্ঘ পথ অতিক্রম না ক'রে নিষ্পন্ন করা যায় না, দীর্ঘ সাধনার পরই ক্রমশঃ লক্ষ্যের নিকটবর্তী হওয়া যায় এবং পরিশেষে তথায় উপনীত হওয়া সম্ভব হয়। প্রথম যে মনোভাব নিতে হবে তা এই যে, আমরা যে কর্মী এই ধারণা যেন আমাদের আর না থাকে, আর দৃঢ়ভাবে এই উপলব্ধি করা দরকার যে, আমরা বিশ্বশক্তির এক যন্ত্র মাত্র। প্রথম মনে হয় যে একটি শক্তি নয়, বহু বিশ্বশক্তি আমাদের চালনা করছে; কিন্তু এই শক্তিগুলিকে অহং-এর পরিপোষক করে তুলতে পারা যায়, এই দৃষ্টি মনকে মুক্ত করে, কিন্তু প্রকৃতির বাকী অংশকে নয়। এমনকি যখন আমরা সব কিছুকে একই বিশ্বশক্তির ক্রিয়া বলে জানতে পারি আর জানি যে তার পশ্চাতে ভগবান আছেন, তখনো তাতে মুক্তি না আসতে পারে। যদি কর্মীর অহং-ভাব দূর হয় তাহলে যন্ত্রের অহং-ভাব এসে তার স্থান নিতে পারে বা ছদ্মবেশে তাকে দীর্ঘস্থায়ী করতে পারে। জগতের ইতিহাসে এই রকম অহং-ভাবের দৃষ্টান্ত অনেক, আর অন্য প্রকার অহং-ভাব থেকে এই অহং-ভাব আরো সর্বগ্রাসী ও বিশাল হতে পারে; যোগেও সেই একই বিপদ রয়েছে। কোন লোক বড় বা ছোট পরিধির মধ্যে জননেতা বা প্রধান হয়ে ওঠে, আর অনুভব করে যে, এমন এক শক্তিতে সে পূর্ণ যা সে জানে তার অহং-শক্তির অতীত; সে হয়ত বুঝতে পারে যে, তার মধ্য দিয়ে কাজ করছে কোন অদৃষ্ট বা অজ্ঞেয় রহস্যময় সঙ্কল্প বা অন্তরে অতি

সমুজ্জ্বল কোন আলোক। তার মননের, ক্রিয়ার বা সৃজনশীল প্রতিভার ফলও হয় অসাধারণ। সে হয় কোন প্রচণ্ড ধ্বংস সাধন করে যাতে মানবজাতির পথ পরিষ্কার হয়, নয় এমন মহান্ কিছু নির্মাণ করে যা এর সাময়িক বিশ্রামস্থান হয়। সে হয় উৎপীড়ক, নয় আলোক ও শান্তিদাতা, সৌন্দর্যস্রষ্টা বা জ্ঞানের দূত হয়। অথবা যদি তার কর্ম ও তার পরিণাম নিম্ন ধরনের হয় ও তাদের পরিসরও সীমাবদ্ধ হয়, তবু এসবের সাথে তার এক দৃঢ় বোধ থাকে যে, সে এক যন্ত্র এবং তার ব্রত ও কার্যের জন্য তাকে নির্বাচন করা হয়েছে। যেসব ব্যক্তির এই নিয়তি ও এইসব সামর্থ্য থাকে, তারা সহজেই বিশ্বাস করে ও ঘোষণাও করে যে, তারা ভগবান বা অদৃষ্টের হাতে যন্ত্র মাত্র; কিন্তু এই ঘোষণার মধ্যেও আমরা দেখতে পাই যে, এমন এক তীব্র ও অতিস্ফীত অহং-ভাব তাদের মধ্যে আসতে বা আশ্রয় নিতে পারে যা সাধারণ মানুষের জাহির করার সাহস নেই বা নিজেদের মধ্যে ধরে রাখার ক্ষমতা নেই। আর যদি এই রকমের লোকেরা ভগবানের কথা বলে তাহলে প্রায়শঃই তার অর্থ হল, তাঁর এমন এক প্রতিমূর্তি খাড়া করা যা তাদের নিজেদের বা নিজেদের প্রকৃতির বৃহৎ ছায়া ছাড়া আর কিছু নয়, যেন এটি তাদের সঙ্কল্প ও মনন, গুণ ও শক্তির সদৃশ লোকের পরিপোষক দেবতাস্বরূপ। তারা যে অধীশ্বরের সেবা করে, তা তাদের অহং-এর এই বর্ধিত মূর্তি। যোগের পথে এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে যখন প্রবল কিন্তু অশুদ্ধ সব প্রাণিক প্রকৃতি বা মন অতি সহজেই উন্নতি লাভ করে তাদের মহত্ত্বের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, গর্ব বা কামনাকে তাদের আধ্যাত্মিক অন্বেষণের মধ্যে প্রবেশ করতে দিয়ে এর উদ্দেশ্যের শুদ্ধতা দূষিত করে; তাদের ও তাদের প্রকৃত সত্তার মধ্যে এক বর্ধিত অহং এসে দাঁড়ায় আর দিব্য বা অদিব্য যে বৃহত্তর অদেখা শক্তি তাদের মাধ্যমে কাজ করে, যার অস্তিত্ব তারা অস্পষ্ট বা তীব্রভাবে বোধ করে, তার থেকে পাওয়া ক্ষমতাকে সেই অহং অধিকার করে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে। আমাদের শক্তির চেয়ে এক বৃহত্তর শক্তি আছে আর আমরা তার দ্বারা চালিত হচ্ছি — এরকম কোন বুদ্ধিগত অনুভূতি বা প্রাণিক বোধ অহং থেকে মুক্ত করার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়।

আমাদের মধ্যে বা ঊর্ধ্বে আমাদের চালক এক বৃহত্তর শক্তির এই অনুভূতি, এই বোধ কোন ভ্রান্তি বা আত্মগরিমার উন্মাদনা নয়। যারা এরকম বোধ করে ও দেখে, তাদের দৃষ্টি সাধারণের অপেক্ষা বৃহত্তর এবং তারা সীমিত দেহগত বুদ্ধি ছাড়িয়ে এক পা অগ্রসর হয়েছে বটে কিন্তু তারা পূর্ণদৃষ্টি বা প্রত্যক্ষ অনুভূতি পায়নি। কেননা তারা মনে স্বচ্ছ নয়, অন্তঃপুরুষেও সচেতন নয়, তারা যে প্রবুদ্ধ হয়েছে তা তাদের প্রাণিক অংশেই বেশী, আত্মার অধ্যাত্ম ধাতুতে ততটা নয়; এইসব কারণে তারা ভগবানের সচেতন যন্ত্র হতে বা অধীশ্বরের সম্মুখে আসতে অক্ষম, তাদের ব্যবহার করা হয় তাদের প্রমাদশীল অপূর্ণ প্রকৃতির মধ্য দিয়ে। ভগবানকে বড়জোর তারা জানে এক অদৃষ্ট বা বিশ্বশক্তি ব'লে, আর না হয় কোন সীমিত দেবতাকে ভগবান নামে অভিহিত করে, অথবা যা আরো খারাপ, এমন কোন আসুরিক বা দানবীয় শক্তিকে তারা ভগবান বলে যা ভগবানকে ঢেকে রাখে। এমনকি কোন কোন ধর্মপ্রতিষ্ঠাতাও সাম্প্রদায়িক ভগবানের বা

জাতীয় ভগবানের বা ভয় ও শাস্তির, শক্তির বা সাত্ত্বিক প্রেম ও করুণা ও পুণ্যের দেবতার মূর্তি খাড়া করেছে — মনে হয় তারা পরম এক ও সনাতনের দেখা পায়নি। ভগবানের যে মূর্তি তারা তৈরী করে ভগবান তা স্বীকার করে নিয়ে তার মাধ্যমে তাদের মধ্যে নিজের কাজ করেন। কিন্তু যেহেতু সেই এক শক্তিকে অনুভব করা হয় আর তা কাজ করে তাদের অপূর্ণ প্রকৃতির মধ্যে এবং অপরদের চেয়ে আরো বেশী তীব্রভাবে, সেহেতু অহং-ভাবের প্রবর্তক তত্ত্বও অপরদের অপেক্ষা তাদের মধ্যেই আরো বেশী তীব্র হতে পারে। তখনো এক উন্নত রাজসিক সাত্ত্বিক অহং তাদের অধিকার করে রাখে এবং এসে দাঁড়ায় তাদের ও অখণ্ড সত্যের মাঝে। এমনকি এটিও কিছু একটা, এক উপক্রম, যদিও প্রকৃত ও সিদ্ধ অনুভূতি থেকে তা অনেক দূরে। যারা মানুষী বন্ধনের কিছু ভেঙেছে কিন্তু শুদ্ধতা পায়নি, জ্ঞান পায়নি, তাদের ভাগ্যে আরো বেশী দুর্দশা আসার সম্ভাবনা, কারণ তারা যন্ত্র হতে পারে তবে ভগবানের যন্ত্র নয়; অধিকাংশ সময়ই তারা ভগবানের নাম নিয়ে অজ্ঞাতসারেই সেবা করে বৃত্রদের — ভগবানের সব মুখোশকে ও তাঁর তামসী সব বিপরীত শক্তিকে, তমসার সব সামর্থ্যকে।

আমাদের প্রকৃতি বিশ্বশক্তির আধার হবে বটে কিন্তু এর অবর দিকের বা রাজসিক কি সাত্ত্বিক গতির নয়; এটি বিশ্বসঙ্কল্প অনুযায়ী কাজ করবে তবে এক মহত্তর মুক্তিপ্রদ জ্ঞানের আলোয়। যন্ত্রের মনোভাবে কোনপ্রকার অহং-ভাব থাকা চলবে না, এমনকি যখন আমরা আমাদের মধ্যে শক্তির মহত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন হই, তখনো নয়। জ্ঞাতসারে হ'ক বা অজ্ঞাতসারে হ'ক, প্রতি মানুষটিই কোন না কোন বিশ্বশক্তির যন্ত্র, আর আন্তর সান্নিধ্য বাদ দিলে, এক ক্রিয়ার সঙ্গে অপর ক্রিয়ার, একরকম উপায়ের সঙ্গে অন্যরকম উপায়ের এমন কোন মৌলিক পার্থক্য নেই যাতে অহমাত্মক গর্বের মুর্খামিকে সঙ্গত বলা যেতে পারে। জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যে যা পার্থক্য তা হল পরম চিৎপুরুষের অনুগ্রহ; দিব্যশক্তি প্রবাহিত হয় যেখানে খুসি সেখানে, আজ একজনকে, আগামীকাল অপর একজনকে পূর্ণ করে বাক্ বা শক্তি দিয়ে। যদি পাত্র-নির্মাতার তৈরী একটি পাত্র অপর একটির চেয়ে বেশী ভাল হয়, সে কৃতিত্ব পাত্রের নয়, পাত্র-নির্মাতার। আমাদের মনের ভাব কখনো এমন হবে না — "এই আমার ক্ষমতা" বা "দেখ আমার মধ্যে ভগবানের শক্তি"। বরং তা হবে — "এই মন ও দেহে এক দিব্য শক্তি কাজ করছে, আর এটি সেই একই শক্তি যা কাজ করে সকল মানুষের মধ্যে ও প্রাণীর মধ্যে, উদ্ভিদে ও ধাতুতে, চেতন ও সজীব বিষয়ে এবং সেইসব বিষয়েও যেগুলি মনে হয় নিশ্চেতন ও নিষ্প্রাণ"। এই যে উদার দৃষ্টি যে পরম এক সকলের মধ্যে কর্মরত এবং সকল জগৎই দিব্য ক্রিয়া ও ক্রম-আত্মপ্রকাশের সম যন্ত্র — এই যদি আমাদের সমগ্র অনুভূতি হয়, তাহলে এটি আমাদের মধ্য থেকে রাজসিক অহং-ভাব দূর করার সহায় হবে, আর এমনকি আমাদের প্রকৃতি থেকে সাত্ত্বিক অহং-বোধও শুরু করবে বিলীন হতে।

অহং-এর এই রূপটির বিনাশের অনিবার্য পরিণাম হল প্রকৃত যান্ত্রিক ক্রিয়া আর এই হল পূর্ণ কর্মযোগের সার। কারণ যতদিন আমাদের মধ্যে যান্ত্রিক-অহং বজায় থাকে,

ততদিন আমরা নিজেদের কাছে ভান করতে পারি যে, আমরা ভগবানের সচেতন যন্ত্র কিন্তু আসলে আমাদের চেষ্টা হল দিব্যশক্তিকেই আমাদের নিজেদের সব কামনার বা অহমাত্মক উদ্দেশ্যের যন্ত্র করা। আর এমনকি যখন অহংকে বশে আনা হয় কিন্তু বাদ দেওয়া হয় না, তখনো আমরা দিব্যকর্মের যন্ত্র হতে পারি কিন্তু আমরা হব অপূর্ণ যন্ত্র আর আমাদের সব মানসিক প্রমাদ, প্রাণিক বিকৃতি বা দৈহিক প্রকৃতির বদ্ধমূল অসামর্থ্য দিয়ে বিচ্যুত বা ব্যাহত করব ক্রিয়ার ধারা। যদি এই অহং বিলীন হয়, তাহলে আমরা সত্যই শুধু যে এমন শুদ্ধ যন্ত্র হয়ে উঠতে পারি যা আমাদের চালক দিব্য হস্তের প্রতি নির্দেশে সচেতনভাবে সম্মতি দেয়, তা নয়, আমরা আরো জানতে পারি আমাদের আসল প্রকৃতি — জানব যে আমরা সেই এক সনাতন অনন্তের চিন্ময় অংশ যাকে পরমা শক্তি নিজের মধ্যে বাইরে রেখেছেন নিজের কাজের জন্য।

দিব্যশক্তির কাছে যান্ত্রিক অহং সমর্পণ করার পর দরকার আর একটি বৃহত্তর পদক্ষেপ নেওয়া। এই দিব্যশক্তি যে এক বিশ্বশক্তি যা মন, প্রাণ ও জড়ের ভূমিতে আমাদের ও সকল সৃষ্ট বিষয়কে পরিচালিত করে — এই জানাই যথেষ্ট নয়; কারণ এ হল অপরা প্রকৃতি এবং যদিও সেখানে দিব্য জ্ঞান, আলোক, সামর্থ্য প্রচ্ছন্ন থাকে এবং অবিদ্যার মধ্যে কর্মরত থেকে তার আবরণ আংশিকভাবে ছিন্ন করে তাদের স্বরূপের কিছুটা ব্যক্ত করতে অথবা ঊর্ধ্ব থেকে নেমে এসে এইসব অবর ক্রিয়াধারাগুলিকে ঊর্ধ্বে তুলতে সক্ষম তবু — এমনকি যদিও আমরা পরম একেকে আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন মনে, আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন প্রাণগতিতে, আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন শারীর চেতনায় উপলব্ধি করি তাহলেও —- স্ফুরন্ত অংশগুলিতে অপূর্ণতা রয়ে যায়। পরম সামর্থ্যের দিকে সাড়াতে বিচ্যুতি থাকে, ভগবানের মুখের উপর আবরণ থাকে, সর্বদাই থাকে অবিদ্যার মিশ্রণ। যখন আমরা দিব্যশক্তির নিকট উন্মুক্ত হই তাঁর সেই শক্তির সত্যের মধ্যে যা এই অপরা প্রকৃতির ঊর্ধ্বে, কেবল তখনই আমরা সক্ষম হই তাঁর শক্তি ও জ্ঞানের নিখুঁত যন্ত্র হতে।

কর্মযোগের যা লক্ষ্য হওয়া চাই তা শুধু মুক্তি নয়, সিদ্ধি। ভগবান কাজ করেন আমাদের প্রকৃতির মধ্য দিয়ে এবং আমাদের প্রকৃতি অনুযায়ী; যদি আমাদের প্রকৃতি অপূর্ণ হয়, তাহলে কর্মও হবে অপূর্ণ, মিশ্রিত, অপ্রচুর। এমন কি এটি দূষিত হতে পারে নানাবিধ বিষম ভ্রান্তি, অনৃত নৈতিক দুর্বলতা, বিক্ষেপকারী প্রভাবের দ্বারা। এমনকি এখনো আমাদের মধ্যে ভগবানের কাজ হবে, তবে তা হবে আমাদের দুর্বলতা অনুযায়ী, তা এর উৎসের শক্তি ও বিশুদ্ধি অনুযায়ী হবে না। যদি আমাদের যোগ পূর্ণযোগ না হ'ত, যদি আমরা চাইতাম শুধু আমাদের মধ্যকার আত্মার মুক্তি বা প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন পুরুষের নিশ্চল স্থিতি, তাহলে এই স্ফুরন্ত অপূর্ণতাতে কিছু এসে যেত না। শান্ত ও অক্ষুব্ধ থেকে, অবসন্ন বা উৎফুল্ল না হয়ে, পূর্ণতা বা অপূর্ণতা, দোষ বা গুণ, পাপ বা পুণ্য — কোন কিছুকেই আমাদের নিজেদের বলে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, এই মিশ্রণ যে

প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের ক্ষেত্রে তার গুণের ক্রিয়ার ফল তা বুঝে আমরা চিৎপুরুষের নীরবতার মধ্যে সরে গিয়ে প্রকৃতির সব ক্রিয়াকে দেখতে পারতাম শুদ্ধ ও নির্লিপ্ত ভাবে। কিন্তু এক অখণ্ড উপলব্ধির মধ্যে এটি হতে পারে পথের এক সোপান মাত্র, আমাদের শেষ বিশ্রামস্থান নয়। কারণ আমাদের লক্ষ্য ভগবানকে উপলব্ধি করা শুধু পরম চিৎপুরুষের নিশ্চলতায় নয়, প্রকৃতির গতিবৃত্তিরও মধ্যে। আর এই উপলব্ধি পূর্ণ হয় না যদি না আমরা ভগবানের সান্নিধ্য ও শক্তি অনুভব করি আমাদের কর্মের প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি গতিতে, প্রতি আকারে, আমাদের সঙ্কল্পের প্রতি আবর্তনে, প্রতিটি মনন, বেদনা ও সংবেগে। অবশ্য এটা নিশ্চিত যে, এক অর্থে অবিদ্যার প্রকৃতির মধ্যেও আমরা তা অনুভব করতে পারি, কিন্তু তখন যে দিব্য শক্তি ও সান্নিধ্য অনুভব করব, তা তার ছদ্মবেশে, তার খর্ব ও অবর মূর্তিতে। আমাদের দাবী আরো মহত্তর, আমরা চাই যে, আমাদের প্রকৃতি ভগবানের সামর্থ্য হবে ভগবানের সত্যের মধ্যে, আলোকের মধ্যে, সনাতন আত্মসচেতন সঙ্কল্পের শক্তির মধ্যে, শাশ্বত বিদ্যার প্রসারের মধ্যে।

অহং-এর আবরণ দূর হলে দূর হবে প্রকৃতি ও তার যেসব অবর গুণ আমাদের মন, প্রাণ ও দেহকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের আবরণ। যে মুহূর্তে অহং-এর গণ্ডি মিলিয়ে যেতে শুরু করে, তখনই আমরা দেখি কিভাবে ঐ আবরণ গঠিত আর আমাদের মধ্যে দেখতে পাই বিশ্বপ্রকৃতির ক্রিয়া এবং বিশ্বপ্রকৃতির ভিতরে বা পশ্চাতে আমরা অনুভব করি বিশ্বাত্মার সান্নিধ্য ও জগদ্‌ব্যাপী ঈশ্বরের সব স্ফুরত্তা। এই সব ক্রিয়াধারার পশ্চাতে দাঁড়িয়ে আছেন যন্ত্রের অধীশ্বর, আর এমনকি ক্রিয়াধারার মধ্যেও আছে তাঁর স্পর্শ এবং এক মহান্ নির্দেশক বা ব্যবস্থাপক প্রভাবের প্রেরণা। আর আমরা অহং বা অহং-শক্তির সেবা করি না, আমরা মান্য করি জগদীশ্বরকে ও তাঁর বিবর্তনের সংবেগকে। প্রতি পদে আমরা সংস্কৃত শ্লোকের ভাষায় বলি, "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" — [হে প্রভু, আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে তুমি আমায় যেমন নিযুক্ত কর, আমি সেই মতো কাজ করি]। কিন্তু তবু এই ক্রিয়াটি দুইটি বিভিন্ন রকমের হতে পারে — একটি শুধু প্রদীপ্ত, অন্যটি মহত্তর পরাপ্রকৃতিতে রূপান্তরিত ও উন্নীত। কারণ আমরা ক্রিয়ার সেই পথ দিয়েই আগের মতো চলতে পারি, যে পথ আমাদের প্রকৃতি অনুমোদন ও অনুসরণ করত যখন আমরা তার দ্বারা ও তার অহং-ভাবের ভ্রান্তির দ্বারা "যন্ত্রারূঢ়বৎ" আবর্তিত হতাম, তবে এখন তা করি যন্ত্রপ্রণালীকে ও তার পশ্চাতে যে কর্মের অধীশ্বরকে আমরা অনুভব করি তাঁর দ্বারা তাঁর জগৎ-উদ্দেশ্যের জন্য এর ব্যবহারকে সম্যক্ প্রণিধান করে। বস্তুতঃ আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন মনের স্তরে অনেক মহাযোগী যতদূর পৌঁছেছেন এই জ্ঞান তত দূরেরই জ্ঞান; কিন্তু সর্বক্ষেত্রে শুধু যে এটাই করা প্রয়োজন তা নয়, কারণ আরো এক মহত্তর অতিমানসিক সম্ভাবনা আছে। আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন মন ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বে ওঠা সম্ভব, আর সম্ভব পরমা মাতার আদি দিব্য সত্যশক্তির জীবন্ত সান্নিধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করা। আমাদের গতি তাঁর গতির সঙ্গে এক হয়ে তার মধ্যে মগ্ন হবে, আমাদের সঙ্কল্প এক হবে তাঁর সঙ্কল্পের সঙ্গে, আমাদের ক্রিয়াশক্তি নির্মুক্ত হবে তাঁর ক্রিয়াশক্তির মধ্যে, আমরা অনুভব করব যে তিনি আমাদের মধ্য দিয়ে কাজ করছেন

এক পরমা প্রজ্ঞাশক্তিতে ব্যক্ত ভগবান রূপে। আর আমরা রূপান্তরিত মন, প্রাণ, দেহকে জানব তাদের অতীত এমন এক পরমা জ্যোতি ও শক্তির প্রণালী হিসেবে যা তার পদক্ষেপে অভ্রান্ত কারণ তা অতিস্থিত এবং জ্ঞানে সমগ্র। এই জ্যোতি ও শক্তির শুধু যে গ্রহীতা, প্রণালী, যন্ত্র আমরা হব তা নয়, আমরা তার অংশও হব এক পরম উন্নীত স্থায়ী অনুভূতির মধ্যে।

এই শেষ সিদ্ধিলাভের আগেই আমরা ভগবানের সঙ্গে কর্মে মিলিত হতে পারি, তাঁর পরম জ্যোতির্ময় শিখরসমূহে না হলেও তার চরম প্রসারের মধ্যে, কারণ তখন আর আমরা শুধু প্রকৃতি বা প্রকৃতির করণগুলি দেখি না, আমরা আমাদের বিভিন্ন দৈহিক সঞ্চালনের মধ্যে, আমাদের বিভিন্ন স্নায়বিক ও প্রাণিক প্রতিক্রিয়া ও আমাদের বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়াধারার মধ্যে এমন এক শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হই যা আমাদের দেহ, প্রাণ ও মন অপেক্ষা মহত্তর এবং যা আমাদের সীমিত করণসমূহ অধিকার ক'রে চালনা করে তাদের সব গতিকে। তখন আর এ বোধ থাকে না যে আমরা চলছি, চিন্তা বা অনুভব করছি, বোধ করি যে আমাদের মধ্যে সেই শক্তিই চলছে, অনুভব ও চিন্তা করছে। এই যে শক্তি আমরা অনুভব করি তা ভগবানেরই বিশ্বশক্তি; এই আবৃত বা অনাবৃত হয়ে কাজ করে — হয় সরাসরি, নয় বিশ্বের মধ্যে সকল সত্তাকে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে, এই সেই অদ্বয় ক্রিয়াশক্তি একমাত্র যা অবস্থিত এবং একমাত্র যার দ্বারাই সম্ভব হয় সার্বিক ও ব্যষ্টি ক্রিয়া। কারণ এই শক্তি হল স্বয়ং ভগবান তাঁর সামর্থ্যের শরীরে; সকল কিছুই সেই কর্মসামর্থ্য, মনন ও জ্ঞানের সামর্থ্য, প্রভুত্ব ও ভোগের সামর্থ্য, প্রেমের সামর্থ্য। যে কর্মের অধীশ্বর নিজেই এই শক্তি, আর এই শক্তির মাধ্যমে সকল ভূত, সকল ঘটনা অধিগত, অধিষ্ঠান ও উপভোগ করছেন ও এই সব হচ্ছেন, তাঁর সম্বন্ধে আমরা সর্বদাই ও সর্ববিষয়ে আমাদের মধ্যে ও অপরের মধ্যে সচেতন হয়ে কর্মের মাধ্যমে উপনীত হব দিব্য মিলনে এবং কর্মে সেই সার্থকতার দ্বারা সেই সব কিছুই লাভ করব যা অন্যেরা লাভ করেছে পরা ভক্তির বা শুদ্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে। কিন্তু এর পরও আর এক পদক্ষেপ নেওয়া আমাদের কর্তব্য — এই বিশ্বের সঙ্গে তাদাত্ম্য থেকে দিব্য অতিস্থিতির তাদাত্ম্যে উত্তরণ। কর্মের ও আমাদের অধীশ্বর শুধু যে আমাদের মধ্যে এক দেবতা বা শুধু যে এক বিরাট পুরুষ বা কোনপ্রকার বিশ্বশক্তি তা নয়। এক ধরনের সর্বেশ্বরবাদ বিশ্বাস করাতে চাইলেও ভগবান ও জগৎ এক ও একই সমান বস্তু নয়। জগৎ একটা পুরঃক্ষেপ, প্রতিরূপ; এটি এমন কিছুর উপর নির্ভর করে যা এর মধ্যে অভিব্যক্ত হয় কিন্তু এর দ্বারা সীমিত নয়: ভগবান যে কেবল এখানেই আছেন তা নয়; এর অতীত কিছু আছে — এক সনাতন অতিস্থিতি। ব্যষ্টি সত্তাও তার আধ্যাত্মিক অংশে বিশ্ব অস্তিত্বের মধ্যে কোন রূপায়ণ নয় — আমাদের অহং, আমাদের মন, আমাদের প্রাণ, আমাদের দেহ তাই; কিন্তু আমাদের অক্ষর চিৎপুরুষ, মধ্যকার অব্যয় অন্তঃপুরুষ বার হয়ে এসেছে অতিস্থিতি থেকে।

এক অতিষ্ঠা (বিশ্বাতীত) যিনি সকল জগৎ ও সকল প্রকৃতির অতীত অথচ জগৎ ও এর প্রকৃতিকে অধিগত করেন, যিনি নিজের কিছু নিয়ে এর মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং একে এমন কিছুতে তৈরী করছেন যা এ এখনো হয়নি — তিনিই আমাদের সত্তার উৎস, আমাদের সকল কর্মের উৎস এবং তাদের অধীশ্বর। কিন্তু বিশ্বাতীত চেতনার আসন উর্ধ্বে দিব্য সন্মাত্রের একান্ততার মধ্যে — আর সেখানেও আছে সনাতনের একান্ত শক্তি, সত্য, আনন্দ, — যার সম্বন্ধে আমাদের মানসিকতা কোন ধারণা করতে অক্ষম, এমনকি আমাদের মহত্তম আধ্যাত্মিক অনুভূতিও আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন মন ও হৃদয়ে এর এক ক্ষীণ প্রতিফলন, অস্পষ্ট ছায়া, শীর্ণ সৃষ্টি। তবু এ থেকেই নিঃসৃত হয়েছে আলোক, সামর্থ্য, আনন্দ ও সত্যের একপ্রকার স্বর্ণময় জ্যোতির্মণ্ডল — প্রাচীন রহস্যবাদীদের অভিহিত দিব্য ঋতচেতনা এক অতিমানস, এক পরম বিজ্ঞান যার সঙ্গে অবিদ্যাজাত হ্রস্বতর চেতনার এই জগৎ গূঢ়ভাবে সম্পৃক্ত; একমাত্র এই অতিমানসই জগৎকে পালন করে আর নিবারণ করে তার চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে নির্ঋতির মধ্যে পতন। এখন যে সামর্থ্যগুলিকে আমরা বিজ্ঞান, বোধি বা জ্যোতি নাম দিয়ে তৃপ্ত তারা শুধু তাদের পূর্ণ ও জ্বলন্ত উৎস সেই অতিমানসেরই অস্পষ্টতর আলোক; আর সর্বোত্তম মানুষী বুদ্ধি ও এর মাঝখানে আছে উর্ধ্বগামী চেতনার নানা স্তর — উত্তম মানসিক বা অধিমানসিক, আর এ সবকে আমাদের জয় করা চাই, তবেই যদি আমরা তথায় উপনীত হতে পারি বা এখানে নামিয়ে আনতে পারি এর মহত্ত্ব ও মহিমাকে। তথাপি যতই দুরূহ হ'ক ঐ উত্তরণ, ঐ বিজয়ই মানবের চিৎপুরুষের নিয়তি আর দিব্যসত্যের ঐ জ্যোতির্ময় অবতরণ বা তাকে নিম্নে আনয়ন করাই পৃথ্বীপ্রকৃতির বিঘ্নসঙ্কুল বিবর্তনের অনিবার্য পরিণাম; সেই অভিপ্রেত পরিণতিই এর ন্যায়সঙ্গত তাৎপর্য, আমাদের চূড়ান্ত অবস্থা এবং আমাদের পার্থিব জীবনের ব্যাখ্যা। কারণ যদিও বিশ্বাতীত ভগবান পূর্ব থেকেই এখানে পুরুষোত্তমরূপে বিদ্যমান আমাদের রহস্যের গোপন হৃদয়ে, তবু তিনি তাঁর প্রহেলিকাপূর্ণ জগদ্ব্যাপী যোগমায়ার নানাবিধ প্রলেপ ও ছদ্মবেশে সমাবৃত; এখানে, এই দেহের মধ্যেই অন্তঃপুরুষের উত্তরণ ও বিজয়ের দ্বারাই ছদ্মবেশগুলির অপসরণ সম্ভব আর সম্ভব — যে অর্ধসত্য সৃজনক্ষম প্রমাদ হয়ে ওঠে তার জটিল বুননের পরিবর্তে আর এই যে উদ্বর্তনশীল বিদ্যা জড়ের নিশ্চেতনায় নিমজ্জিত হয়ে পরে নিজের দিকে তার মন্থর আংশিক প্রত্যাবর্তন দ্বারা কার্যকরী অবিদ্যায় পরিণত হয়, তার স্থলে পরম সত্যের স্ফুরত্তার আগমন।

কারণ যদিও এখানে, এই জগতে বিজ্ঞান নিগূঢ়ভাবে সত্তার পশ্চাতে থাকে তবু যা কাজ করে তা বিজ্ঞান নয়, তাহল বিদ্যা-অবিদ্যার এক প্রহেলিকা, এক অনির্ণেয় কিন্তু আপাতপ্রতীয়মান যান্ত্রিক অধিমানসী মায়া। এক দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা এখানে ভগবানকে মনে করি যে তিনি এক সম, নিষ্ক্রিয় ও নৈর্ব্যক্তিক সাক্ষী চিৎপুরুষ, এক অক্ষর সম্মতিদাতা পুরুষ যিনি গুণ বা দেশ বা কালের দ্বারা বদ্ধ নন, যাঁর সমর্থন বা অনুমতি নিরপেক্ষভাবে দেওয়া হয় সেই সকল ক্রিয়া ও শক্তির বিলাসে বিশ্বাতীত সঙ্কল্প যাদের একবার অনুমতি ও ক্ষমতা দিয়েছেন নিজেদের সার্থক করার জন্য। মনে হয় এই

সাক্ষীপুরুষ, বিষয়সমূহের মধ্যে এই নিশ্চল আত্মা কিছুই সঙ্কল্প করেন না, কিছুই নির্ধারণ করেন না; তবু আমরা জানতে পারি যে তাঁর নিষ্ক্রিয়তাই, তাঁর নীরব উপস্থিতিই সকল বিষয়কে বাধ্য করে তাদের অজ্ঞানতার মধ্যেও দিব্য লক্ষ্যের দিকে চলতে আর বিভাজনের মাধ্যমে আকর্ষণ করে এক এখনো অনুপলব্ধ একত্বের দিকে। তথাপি মনে হয় কোন পরম অভ্রান্ত দিব্যশক্তিই সেখানে নেই, আছে শুধু এক বিস্তৃতভাবে বিন্যস্ত বিশ্বশক্তি, অথবা এক যান্ত্রিক কার্যসাধিকা ধারা, প্রকৃতি। এ হল বিশ্বাত্মার এক দিক; অন্যদিকে দেখি তিনি এক বিশ্বাত্মক ভগবান, যিনি সত্তায় এক কিন্তু ব্যক্তিসত্ত্ব ও সামর্থ্যে বহু আর যখন আমরা তাঁর বিশ্বশক্তির চেতনার মধ্যে প্রবেশ করি তিনি আমাদের কাছে নিয়ে আসেন অনন্ত গুণ ও সঙ্কল্প ও কর্মের বোধ এবং জগদ্‌ব্যাপী জ্ঞান এবং এক অদ্বয় অথচ অসংখ্য রকমের আনন্দ; কারণ তাঁরই মাধ্যমে আমরা সর্বভূতের সঙ্গে এক হয়ে উঠি — শুধু তাদের স্বরূপে নয়, তাদের ক্রিয়ার বিলাসেও, নিজেকে দেখি সকলের মধ্যে ও সকলকে দেখি নিজের মধ্যে, উপলব্ধি করি যে সকল জ্ঞান ও মনন ও বেদনা এক অদ্বয় মন ও হৃদয়ের গতি, সকল ক্রিয়াশক্তি ও ক্রিয়া এক সর্বসমর্থ অদ্বয় সঙ্কল্পের গতিবিধি, সকল জড় ও রূপ এক অদ্বয় দেহের কণিকা, সকল ব্যক্তিসত্ত্ব এক পরম ব্যক্তির পুরঃক্ষেপ, সকল অহং হল সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র এক আসল "আমি"র বিকৃত রূপায়ণ। তাঁর মধ্যে আর আমরা পৃথক থাকি না, আমাদের সক্রিয় অহং-এর বিনাশ হয় বিশ্বের গতিবৃত্তির মধ্যে; — যেমন বিনাশ হয় আমাদের নিষ্ক্রিয় অহং-এর বিশ্বশান্তির মধ্যে সেই পরম সাক্ষীদ্বারা যিনি নির্গুণ ও চিরদিন নিরাসক্ত ও নির্লিপ্ত।

কিন্তু তবু এক বিরোধ থেকে যায় এই দুই সংজ্ঞার মধ্যে — কূটস্থ দিব্য নীরবতা ও সর্বব্যাপী দিব্য ক্রিয়ার মধ্যে; — অবশ্য নিজেদের মধ্যে এই বিরোধকে কোন একপ্রকারে, কিছু বেশী মাত্রাতেই মিটিয়ে নেওয়া সম্ভব; মনে হতে পারে বিরোধ সম্পূর্ণ মিটেছে, কিন্তু এ মিল সম্পূর্ণ নয়, কারণ এটি পুরোপুরি রূপান্তরসাধনে ও বিজয়লাভে অক্ষম। এক সার্বিক শান্তি, আলোক, শক্তি, আনন্দ আমরা পাই বটে কিন্তু এর সফল প্রকাশ যে ঋতচেতনার, দিব্য বিজ্ঞানের তা নয়; যদিও এ হল আশ্চর্যকরভাবে মুক্ত, উন্নীত ও প্রদীপ্ত, তবু এ শুধু বিরাট পুরুষের বর্তমান আত্মপ্রকাশকে ধারণ করে, কিন্তু বিশ্বাতীতের অবতরণ যেমন এই অবিদ্যার জগতের সব দ্ব্যর্থবোধক প্রতীক ও প্রচ্ছন্ন রহস্যে রূপান্তরিত করতে সক্ষম, এটি তেমন করে না। আমরা নিজেরা মুক্ত হই বটে কিন্তু পৃথ্বীচেতনা বন্ধনদশার মধ্যেই থেকে যায়; আরো উন্নত এক বিশ্বাতীতে উত্তরণ ও তার অবতরণই একমাত্র সক্ষম এই বিরোধ সম্পূর্ণ মেটাতে এবং রূপান্তর ও মুক্তি সাধনে।

কারণ এ ছাড়াও কর্মাধীশ্বরের এক তৃতীয় অতীব নিবিড় ও ব্যক্তিগত বিভাব আছে যা তাঁর সবচেয়ে মহিমময় প্রচ্ছন্ন রহস্য ও উল্লাসের চাবিকাঠি; কারণ তিনি প্রচ্ছন্ন অতিস্থিতির রহস্য ও বিশ্ব গতিবৃত্তির দুর্বোধ্য বিলাস থেকে বিচ্ছিন্ন করেন ভগবানের এক ব্যষ্টি সামর্থ্য যা দুটির মধ্যে মধ্যস্থতা ক'রে একটি থেকে অন্যটিতে আমাদের যাবার

পথের সেতু হতে পারে। এই বিভাবে ভগবানের বিশ্বাতীত ও বিশ্বাত্মক ব্যক্তি আমাদের ব্যষ্টিভাবাপন্ন ব্যক্তিসত্ত্বের অনুরূপ হয়ে আমাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্বীকার করেন; একই সময় তিনি আমাদের সঙ্গে অভিন্ন আমাদের পরমাত্মারূপে আবার তবু অন্তরঙ্গ ও ভিন্ন হন আমাদের প্রভু, সখা, প্রেমিক, গুরুরূপে, আমাদের পিতা ও আমাদের মাতারূপে, বৃহৎ জগৎ-লীলায় খেলার সাথীরূপে; তিনিই বরাবর নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখেছেন বন্ধু ও শত্রুর, সহায় ও বিরোধীর ছদ্মবেশে এবং যে সকল সম্পর্ক ও ক্রিয়াধারার সঙ্গে আমরা যুক্ত তাদের মধ্যে দিয়ে আমাদের নিয়ে গেছেন আমাদের সিদ্ধি ও আমাদের মুক্তির দিকে। এই আরো ব্যক্তিগত অভিব্যক্তির মধ্য দিয়েই আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাতীত অনুভূতি লাভের সম্ভাবনা আসে; কারণ তাঁর মধ্যে আমরা পরম একের দেখা পাই শুধু যে এক মুক্ত নিস্তব্ধতা ও প্রশান্তির মধ্যে তা নয়, শুধু যে আমাদের কর্মের মধ্যে নিষ্ক্রিয় বা সক্রিয় প্রপত্তির সঙ্গে তা নয়, অথবা আমাদের পূর্ণ করে, চালনা করে এমন যে সার্বিক বিদ্যা ও সামর্থ্য শুধু যে তাদের সঙ্গে মিলনরহস্যের মধ্য দিয়ে তা-ও নয়, বরং এমন মিলনের মধ্য দিয়ে যাতে থাকে সেই দিব্য প্রেম ও দিব্য আনন্দের উল্লাস যা নীরব সাক্ষী ও সক্রিয় জগৎ-সামর্থ্য ছাড়িয়ে বেগে উঠে যায় এক মহত্তর আনন্দঘন রহস্যের কিছু নিশ্চিত অলৌকিক উপলব্ধির দিকে। কারণ, যে জ্ঞান কোন অনির্বচনীয় ব্রহ্মে নিয়ে যায় অথবা যে সব কর্ম জগৎ-ধারা ছাড়িয়ে আমাদের ঊর্ধ্বে উত্তোলন করে তার উৎস পরম জ্ঞাতা ও অধীশ্বরের কাছে সেই জ্ঞান বা কর্ম ততখানি নয়, যতখানি বরং এই আমাদের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ অথচ বর্তমানে অতীব তমসাচ্ছন্ন বিষয় যা আমাদের জন্য তার আবেগময় অবগুণ্ঠনের মধ্যে আবৃত রাখে বিশ্বাতীত পরমদেবতার গভীর ও উল্লাসভরা রহস্য এবং তাঁর সিদ্ধ সত্তা, তন্ময়-করা পরম সুখ, রহস্যময় আনন্দের কিছু একান্ত নিশ্চয়তা।

কিন্তু ভগবানের সঙ্গে ব্যষ্টি সম্পর্ক যে সব সময়ই বা শুরু থেকেই ব্যাপ্ততম প্রসার বা সর্বোচ্চ স্বোত্তরণ সক্রিয় করে তা নয়। এই যে পরম দেবতা আমাদের সত্তার সমীপস্থ বা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত তাঁকে প্রথম পরিপূর্ণভাবে অনুভব করা যায় শুধু আমাদের ব্যক্তিগত প্রকৃতি ও অনুভূতির পরিধির ভিতর, তিনি নেতা ও অধ্যক্ষ, দিশারী ও গুরু, সখা ও প্রেমিক, আর না হয় তিনি পরম চিৎপুরুষ, সামর্থ্য বা উপস্থিতি যিনি আমাদের ঊর্ধ্বমুখী ও প্রসারশীল গতিবিধি গঠন ও উত্তোলন করেন তাঁর সেই অন্তরঙ্গ সত্যের শক্তি দ্বারা যে সত্য হৃদয়ে বিরাজিত বা আমাদের সর্বোত্তম বুদ্ধিরও ঊর্ধ্ব থেকে আমাদের প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা। আমাদের ব্যক্তিগত ক্রমবিকাশই তাঁর বড় কাজ, এক ব্যক্তিগত সম্পর্কই আমাদের হর্ষ ও সার্থকতা, আমাদের প্রকৃতিকে তাঁর দিব্য প্রতিমূর্তিতে গঠন করাই আমাদের আত্মপ্রাপ্তি ও সিদ্ধি। মনে হয় বাইরের জগৎ আছে শুধু এই বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদানের সরবরাহকারী রূপে অথবা বৃদ্ধির ক্রমিক পর্যায়ের জন্য সহায়কর ও বিরোধী শক্তিসমূহের ক্ষেত্র রূপে। এই জগতে আমরা যে সব কাজ করি সে সব তাঁরই কাজ, তবে যখন তারা কোন সাময়িক বিশ্বজনীন উদ্দেশ্য সাধন করে তখনো তাদের

প্রধান উদ্দেশ্য হল এই সর্বগত ভগবানের সঙ্গে আমাদের বিভিন্ন সম্পর্ককে বাহ্যতঃ স্ফুরন্ত করা বা তাদের অন্তরমুখী সামর্থ্য দেওয়া। অনেক সাধক এর বেশী চায় না অথবা দেখে যে এই আধ্যাত্মিক প্রস্ফুটন চলছে ও সার্থক হচ্ছে শুধু জগদতীত দিব্যধামসমূহে; তাঁর সিদ্ধি, আনন্দ ও সৌন্দর্যের এক নিত্য অধিষ্ঠানে এই মিলন পূর্ণ ও শাশ্বত করা হয়। কিন্তু পূর্ণযোগের সাধকের পক্ষে এই যথেষ্ট নয়; যতই প্রগাঢ় ও সুন্দর হ'ক, ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন সিদ্ধি তার সমগ্র লক্ষ্য বা তার সমস্ত জীবন হতে পারে না। একটা সময় আসতে বাধ্য যখন ব্যক্তিগতসত্তা উন্মীলিত হয় বিশ্বসত্তার দিকে; আমাদের গোটা ব্যক্তিত্বই — আধ্যাত্মিক, মানসিক, প্রাণিক ও এমনকি শারীরিক ব্যষ্টিত্বও — বিশ্বভাবাপন্ন হয়ে ওঠে; একে দেখা যায় তার বিশ্বশক্তি ও বিশ্ব চিৎপুরুষের সামর্থ্য হিসেবে, অথবা এ বিশ্বকে ধারণ করে সেই অনির্বচনীয় প্রসারতার মধ্যে যা ব্যষ্টিচেতনায় আসে যখন তা তার সব বন্ধন ভেঙে উর্ধ্বে প্রবাহিত হয় বিশ্বাতীতের দিকে এবং সকল দিকে অনন্তের মধ্যে।

যে যোগজীবন পুরোপুরি আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন মনোময় ভূমিতেই নিবদ্ধ থাকে তাতে সম্ভবতঃ, এমনকি সাধারণতঃ, ভগবানের এই তিনটি মৌলিক বিভাব — জীব বা ব্যষ্টিগত অন্তরাত্মা, বিশ্বাত্মক ও বিশ্বাতীত সত্তা — পৃথক পৃথক উপলব্ধি রূপে দেখা দেয়। তখন মনে হয় প্রত্যেকটি পৃথকভাবে সাধকের আকূতি পূরণের পক্ষে যথেষ্ট। আন্তর হৃদয়ের জ্যোতির্দীপ্ত গোপন পুরে পুরুষবিধ ভগবানের সঙ্গে একলা থেকে সে তার সত্তাকে গঠন করতে পারে পরম প্রেমাস্পদের মূর্তিতে এবং পতিত প্রকৃতির বাইরে উর্ধ্বে উঠতে পারে তাঁর সঙ্গে পরম চিৎপুরুষের কোন দিব্যধামে বাস করার জন্য। সে বিশ্ব ব্যাপ্তির মধ্যে নির্মুক্ত, অহং-এর বন্ধনমুক্ত, তার ব্যক্তিসত্ত্ব পর্যবসিত হয়েছে বিশ্বশক্তির ক্রিয়াধারার এক কেন্দ্রে, সে নিজে বিশ্বজনীনতার মধ্যে শান্ত, মুক্ত ও মৃত্যুহীন, সাক্ষী আত্মার মধ্যে নিশ্চল অথচ সে সময় সে অন্তহীন দেশ ও কালের মধ্যে সীমাহীনভাবে প্রসারিত — এইভাবে সে জগতের মধ্যে ভোগ করতে পারে কালাতীতের মুক্তি। কোন অনুপাখ্য অতিস্থিতির প্রতি একাগ্র হয়ে, তার ব্যক্তিসত্ত্ব বিসর্জন দিয়ে, নিজের মধ্যে বিশ্বব্যাপী স্ফুরত্তার পরিশ্রম ও উদ্বেগ বর্জন করে সে পলায়ন করতে পারে এক অনির্বচনীয় নির্বাণের মধ্যে আর সকল কিছু লোপ করে দিতে পারে অব্যবহার্যের মধ্যে পলায়নের অসহিষ্ণু উৎসাহে।

কিন্তু পূর্ণযোগের ব্যাপ্ত সম্পূর্ণতা যে চায়, তার পক্ষে এইসব উপলব্ধির কোনটিই যথেষ্ট নয়। তার কাছে নিজের ব্যক্তিগত মুক্তি পর্যাপ্ত নয়; কারণ সে দেখতে পায় সে উন্মুক্ত হচ্ছে, এমন এক বিশ্বচেতনার দিকে যা তার বিস্তার ও বিরাটত্বর দ্বারা, সীমিত ব্যক্তিগত সার্থকতার সঙ্কীর্ণতর তীব্রতাকে অনেক ছাড়িয়ে যায়। আর সে চেতনার আহ্বান অলঙ্ঘনীয়। এর বিপুল প্রেরণার বশে সে বাধ্য হয় সকল পৃথক-করা সীমা

ভেঙে ফেলে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে জগৎ প্রকৃতির মধ্যে ও বিশ্বকে ধারণ করতে নিজের মধ্যে। আবার ঊর্ধ্বেও তার উপর আছে এক সনির্বন্ধ স্ফুরন্ত উপলব্ধি যা পরাৎপর থেকে চাপ দেয় এই জীবকুলের জগতের উপর, আর যে জ্যোতির বর্ষণ এখনো হয়নি তার অভিব্যক্তির ধারাকে এখানে মুক্ত করতে সক্ষম একমাত্র বিশ্বচেতনার একপ্রকার সর্বাবেষ্টন ও অতিক্রমণ। কিন্তু বিশ্বচেতনাও যথেষ্ট নয়; কারণ এ তো সমগ্র দিব্য সদ্‌বস্তু নয়, অখণ্ড নয়। ব্যক্তিসত্ত্বের পশ্চাতে যে দিব্য রহস্য আছে তা তার আবিষ্কার করা চাই; সেখানে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে অতিস্থিতির মূর্তিমত্তার রহস্য কালের মধ্যে এখানে মুক্ত হবার জন্য। বিশ্বচেতনার শেষ প্রান্তে এমন এক পরমা বিদ্যার ছেদ, অসম সমীকরণ থেকে যায় যা মুক্তি দিতে পারে কিন্তু শক্তি দিয়ে কার্য সাধনে অক্ষম কারণ মনে হয় এই শক্তি সীমিত বিদ্যা ব্যবহার করে বা এক উপরভাসা অবিদ্যা দিয়ে নিজেকে ঢেকে রাখে এবং সেজন্য সে সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েও সৃষ্টি করে অপূর্ণতা বা এমন এক পূর্ণতা যা নশ্বর, সীমাবদ্ধ ও শৃঙ্খলিত। একদিকে আছে এক মুক্ত নিষ্ক্রিয় সাক্ষী আর অন্য দিকে এক বদ্ধ ক্রিয়া-নিষ্পাদিকা যাকে ক্রিয়ার সকল উপায় দেওয়া হয়নি। মনে হয় এই দুই বিপরীতভাবাপন্ন সঙ্গীদের মিলন সাধন, সংবরণ ক'রে, স্থগিত ক'রে, ধরে রাখা হয়েছে — এখনো আমাদের অতীত এক অব্যক্তের মাঝে। কিন্তু আবার এও সত্য যে কোন একান্ত অতিস্থিতির মধ্যে শুধু পলায়নে ব্যক্তিসত্ত্ব সার্থকতা পায় না, বিশ্বক্রিয়াও থাকে অসমাপ্ত; আর পূর্ণযোগের সাধক তাতে তৃপ্তি পায় না। তার অনুভব হয় যে শাশ্বত সত্য যেমন এক স্থির সন্মাত্র তেমন এক শক্তি যা সৃষ্টি করে; একমাত্র ভ্রান্তিপূর্ণ বা অবিদ্যাচ্ছন্ন অভিব্যক্তির শক্তি এ নয়। শাশ্বত সত্য তার সব সত্যকে ব্যক্ত করতে পারে কালের মধ্যে; তা বিদ্যার মধ্যেও সৃষ্টি করতে সক্ষম, শুধু অচিতি ও অবিদ্যার মধ্যে নয়। ভগবানে উত্তরণ যেমন সম্ভব, তেমনই সম্ভব ভগবানের অবতরণ; এক ভবিষ্যৎ সিদ্ধি ও এক বর্তমান মুক্তি নামিয়ে আনার প্রত্যাশা সম্মুখে অপেক্ষমান। যেমন তার জ্ঞানের বিস্তার হয় তেমন এটি তার কাছে উত্তরোত্তর স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এই জন্যই কর্মের অধীশ্বর তাঁর মধ্যকার অন্তঃপুরুষকে এখানে নিক্ষেপ করেছিলেন অন্ধকারের মধ্যে তাঁর অগ্নির স্ফুলিঙ্গের মতো যাতে সে বৃদ্ধি পেয়ে হয়ে উঠতে পারে শাশ্বত আলোকের এক কেন্দ্র।

সমগ্র অভিব্যক্তিকে ঊর্ধ্ব তোরণের মত ঘিরে, নিম্নে তার ভিত্তি হয়ে ও ভিতরে অনুস্যূত হয়ে আছে তিন শক্তি — বিশ্বাতীত, বিশ্বাত্মক ও ব্যষ্টিগত; এই হল তত্ত্বত্রয়ের প্রথম। চেতনার উন্মীলনেও এই তিনটি মূল কথা আর যদি আমরা সৃষ্টির সমগ্র সত্যের উপলব্ধি পেতে চাই তাহলে এদের কোনটিকেই অবহেলা করা চলে না। জীবচেতনা থেকে আমরা জাগ্রত হই এক আরো বিরাট মুক্ত বিশ্বচেতনায়, বিভিন্ন রূপ ও শক্তির জটিল গ্রন্থিযুক্ত বিশ্বচেতনা থেকেও বার হয়ে আরো মহত্তর স্রোত্তরণের দ্বারা আমাদের প্রবেশ করা চাই এক অসীম চেতনার মধ্যে যা প্রতিষ্ঠিত পরমার্থসৎ-এর উপর। কিন্তু তবু এই উৎক্রান্তির মধ্যে আমরা যা ফেলে যাই বলে মনে হয় সে সবকে বিলোপ করি

না, বরং তাদের তুলে নিয়ে রূপান্তরিত করি। কারণ এমন এক উচ্চতা আছে যেখানে এই তিনটি চিরন্তন বাস করে পরস্পরের মধ্যে, সেই শিখরের উপর তারা পরমানন্দে মিলিত হয়ে আছে তার সুসঙ্গত একত্বের বন্ধনে। কিন্তু সেই শিখর হল উচ্চতম ও বৃহত্তম আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন মানসিকতার ঊর্ধ্বে, যদিই বা এখানে তার কিছু প্রতিফলনের উপলব্ধি সম্ভব হয়। সেখানে যেতে হলে, বাস করতে হলে মনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক হল নিজেকে ছাপিয়ে গিয়ে রূপান্তরিত হওয়া অতিমানসিক বিজ্ঞানময় আলোক, সামর্থ্য ও ধাতুতে। অবশ্য এই অবর ক্ষীণ চেতনায় এক সুসঙ্গতি স্থাপনের চেষ্টা করা যেতে পারে কিন্তু তা সর্বদাই অপূর্ণ থাকতে বাধ্য; পরস্পরের মধ্যে এক শৃঙ্খলা আনা সম্ভব, কিন্তু তাদের পুরোপুরি মিশিয়ে একসাথে সার্থকতাসাধন সম্ভব নয়। যে কোন মহত্তর উপলব্ধির জন্য মন ছাড়িয়ে উত্তরণ করা অবশ্য কর্তব্য। আর না হয় দরকার উত্তরণের সাথে বা তার পরিণামস্বরূপ সেই স্বয়ম্ভূ সত্যের স্ফুরন্ত অবতরণ যে সত্য শাশ্বত, প্রাণ ও জড়ের অভিব্যক্তির পূর্বস্থ, নিজেরই আলোকের মধ্যে উন্নীত হয়ে সর্বদা অধিষ্ঠিত মনের ঊর্ধ্বে।

কারণ মন হল মায়া, সৎ-অসৎ; এমন এক ক্ষেত্র আছে যেখানে সত্য ও অনৃত, সৎ ও অসৎ পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ, আর এই দ্ব্যর্থবোধক ক্ষেত্রেই মন রাজত্ব করে বলে মনে হয়, কিন্তু এমনকি নিজের রাজত্বেও এ হল বস্তুতঃ এক ক্ষীণ চেতনা, সনাতনের আদি ও পরম উৎপাদক সামর্থ্যের অংশ নয়। এমনকি যদিই বা মন তার ধাতুতে স্বরূপ সত্যের কিছু মূর্তি প্রতিফলিত করতে সক্ষম হয়, তবু তার মধ্যে সত্যের স্ফুরন্ত শক্তি ও ক্রিয়া সর্বদাই মনে হয় ভগ্ন ও বিভক্ত। মন বড়জোর পারে টুকরোগুলিকে একত্র করে জোড়া দিতে বা একটি ঐক্য অনুমান করতে, মনের সত্য শুধু এক অর্ধসত্য, অথবা এক ধাঁধার অংশ। মানসিক জ্ঞান সর্বদাই আপেক্ষিক, আংশিক ও অনিশ্চিতার্থক আর তার বহির্গামী ক্রিয়া ও সৃষ্টি পদে পদে আরো বিশৃঙ্খল হয়ে বাইরে আসে অথবা যথাযথ হয় শুধু সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে ও অপূর্ণ জোড়া অংশগুলিতে। এমনকি এই ক্ষীণ চেতনার মধ্যেও ভগবান ব্যক্ত হন মনোগত পরম চিৎপুরুষরূপে যেমন তিনি বিচরণ করেন প্রাণগত পরম চিৎপুরুষরূপে বা আরো আচ্ছন্ন হয়ে অধিষ্ঠিত থাকেন জড়গত পরম চিৎপুরুষরূপে; কিন্তু এখানে তাঁর পরিপূর্ণ স্ফুরন্ত প্রকাশ নেই, এখানে নেই সনাতনের সিদ্ধ তাদাত্ম্যরাজি। কেবল যখন আমরা সীমা পেরিয়ে প্রবেশ করব এক বৃহত্তর জ্যোতির্ময় চেতনা ও আত্মবিৎ ধাতুর মধ্যে যেখানে দিব্য সত্য আপনজন, অপরিচিত নয় তখন আমাদের কাছে প্রকাশিত হবেন আমাদের জীবনের অধীশ্বর তাঁর সত্তা ও তাঁর সব শক্তির ও ক্রিয়াধারার অব্যয় অখণ্ড সত্যে। উপরন্তু, কেবল সেখানেই আমাদের মধ্যে তাঁর সব কর্ম পাবে তাঁর অব্যর্থ অতিমানসিক উদ্দেশ্যের নিখুঁত গতি।

কিন্তু এ তো এক দীর্ঘ ও দুরূহ যাত্রার শেষ, তবে কর্মের অধীশ্বর যোগের পথে সাধককে দেখা দিতে এবং তার উপর ও তার আন্তর জীবন ও সব ক্রিয়ার উপর তাঁর গোপন বা অর্ধপ্রকট হাত রাখতে ততদিন অপেক্ষা করেন না। সকল কর্মের প্রবর্তক ও গ্রহীতারূপে তিনি পূর্ব থেকেই জগতে ছিলেন নিশ্চেতনার ঘন আবরণের পশ্চাতে, প্রাণের শক্তির মধ্যে ছদ্মবেশে, বিভিন্ন প্রতীক দেবতা ও মূর্তির মাধ্যমে মনের গোচর হয়ে। খুব সম্ভবতঃ এইসব ছদ্মবেশেই তিনি দেখা দেন পূর্ণযোগের পথে উদ্দিষ্ট অন্তঃপুরুষকে। অথবা এমনকি আরো বেশী অস্পষ্ট ছদ্মবেশে তিনি আমাদের ভাবনায় আসেন কোন আদর্শ হিসেবে বা মানসপথে উদিত হন প্রেম, শিব, সুন্দর বা জ্ঞানের আচ্ছিন্ন শক্তি হিসেবে; অথবা হয়ত যখন আমরা তাঁর দিকে যাবার পথে ফিরি, তখন তিনি আসেন মানবজাতির আহ্বানের ছদ্মবেশে বা বিষয়সমূহের মধ্যে সেই সঙ্কল্পের ছদ্মবেশে যে সঙ্কল্পের প্রেরণা হল অবিদ্যার প্রবল চতুঃশক্তির — অন্ধকার ও অনৃত ও মৃত্যু ও কষ্টভোগের কবল থেকে জগৎকে উদ্ধার করা। তারপর আমরা পথে প্রবেশ করার পর তিনি আমাদের আবৃত করেন ব্যাপ্ত ও শক্তিশালী মুক্তিপ্রদ নৈর্ব্যক্তিকতার দ্বারা অথবা আমাদের কাছে আসেন এক ব্যক্তিদেবতার আনন ও আকার নিয়ে। আমাদের মধ্যে ও চারিদিকে আমরা অনুভব করি এমন এক সামর্থ্য যা ধারণ করে, রক্ষা ও পোষণ করে; আমরা এক স্বর শুনি যা আমাদের পথ দেখায়; আমাদের চেয়ে মহত্তর এক চিৎসঙ্কল্প আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে; আমাদের মনন ও সব ক্রিয়া এবং আমাদের দেহ পর্যন্ত চালিত হয় এক অলঙ্ঘনীয় শক্তির দ্বারা; এক সদাপ্রসারী চেতনা আমাদের চেতনাকে আত্মসাৎ করে, জ্ঞানের এক প্রাণবন্ত আলোক আলোকিত করে ভিতরকার সব কিছু অথবা আমরা অভিভূত হই এক পরমানন্দের দ্বারা; ঊর্ধ্ব থেকে চাপ দেয় এক বাস্তব, বিশাল ও বিজয়ী পরাক্রম যা আমাদের প্রকৃতির উপাদানের মধ্যেও প্রবেশ ক'রে নিজেকে ঢেলে দেয়; সেখানে সমাসীন এক প্রশান্তি, এক আলোক, আনন্দ, বীর্য ও মহত্ত্ব। অথবা তথায় আছে ব্যক্তিগত সব সম্পর্ক যারা জীবনের মতই অন্তরঙ্গ, প্রেমের মত মিষ্ট, আকাশের মত সর্বব্যাপী, অগাধ সাগরের মত গভীর। আমাদের পাশে চলেন এক বন্ধু; আমাদের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের গোপন পুরে থাকেন এক প্রেমিক; কর্মের ও অগ্নিপরীক্ষার অধীশ্বর আমাদের পথ দেখান, এক সর্বভূতস্রষ্টা আমাদের ব্যবহার করেন তাঁর যন্ত্ররূপে; আমরা থাকি এক সনাতনী জননীর ক্রোড়ে। এই যে সব আরো গ্রাহ্য বিভাবে অনুপাখ্য আমাদের দেখা দেন সে সব সত্য, সেগুলি শুধু সহায়কর প্রতীক বা উপকারী কল্পনা নয়; কিন্তু যতই আমরা অগ্রসর হই, ততই তাদের যে সব প্রাথমিক অপূর্ণ রূপায়ণ আমাদের অনুভূতিতে আসে সেগুলি সরে যেতে থাকে আর তাদের স্থানে আসে তাদের পশ্চাতে বিদ্যমান একমাত্র সত্যের বৃহত্তর দৃষ্টি। প্রতি পদক্ষেপে পরিত্যাক্ত হয় তাদের সব মুখোশ যেগুলি মানসিক মাত্র, আর তারা লাভ করে এমন এক তাৎপর্য যা আরো বৃহৎ, আরো গভীর, আরো অন্তরঙ্গ। অবশেষে অতিমানসিক সীমানায় এইসব দেবতারা তাঁদের বিভিন্ন রূপ একত্র করেন, আর আদৌ বিলুপ্ত না হয়ে তাঁরা একসঙ্গে

মিশে যান। এই পথে যেসব দিব্য বিভাব আত্মপ্রকাশ করেছে তা যে শুধু বর্জন করা হবে বলে তা নয়; তারা কোন সাময়িক আধ্যাত্মিক সুযোগ নয় অথবা কোন ভ্রান্তিজনক চেতনার সঙ্গে বা পরমার্থসৎ-এর অব্যবহার্য অতিচেতনার দ্বারা আমাদের উপর রহস্যজনকভাবে নিক্ষিপ্ত সব স্বপ্নমূর্তির সঙ্গে আপোষ নয়; অপরপক্ষে, যে পরম সত্য থেকে তাদের আবির্ভাব তারা যতই তার নিকটবর্তী হয়, ততই তাদের শক্তি বৃদ্ধি পায় আর আত্মপ্রকাশ করে তাদের অনপেক্ষতা।

কেননা সেই অতিস্থিতি যা এখন অতিচেতন, সে যেমন এক সন্মাত্র তেমন এক শক্তিও। অতিমানসিক অতিস্থিতি কোন ফাঁকা আশ্চর্য নয়, এমন কিছু অনির্বচনীয় যে তাঁর থেকে আবির্ভূত সকল মূল বিষয়কেই তিনি তাঁর মধ্যে ধারণ করেন চিরদিন; তিনি তাদের ধারণ করেন তাদের পরম চিরস্থায়ী বাস্তবতায় এবং তাদের নিজস্ব বিশিষ্ট অনপেক্ষ তত্ত্বে। যে হ্রস্বতা, বিভাজন, অপকর্ষ এখানে এক দুর্বোধ্য ধাঁধার, এক মায়া রহস্যের বোধ সৃষ্টি করে তারা নিজেরাই আমাদের উৎক্রান্তিতে হ্রাস পেয়ে যায়, আর দিব্য সামর্থ্যগুলি তাদের সত্যময় রূপ গ্রহণ করে উত্তরোত্তর প্রতিভাত হয় এখানে প্রকাশমান এক সত্যের সংজ্ঞারূপে। ভগবানের এক অন্তঃপুরুষ এখানে ধীরে ধীরে জেগে উঠছেন জড়ীয় নিশ্চেতনার মধ্যে তার নিগূহন ও প্রচ্ছন্নতা থেকে। আমাদের কর্মের অধীশ্বর প্রহেলিকার অধীশ্বর নন, বরং তিনি এক পরম সদ্‌বস্তু আর যে সব আত্মপ্রকাশশীল সদ্‌বস্তুকে বিবর্তনমূলক অভিব্যক্তির উদ্দেশ্যে কিছুকালের জন্য সুপ্ত রাখা হয়েছিল অবিদ্যার গুটির মধ্যে, সেখান থেকে তাদের ধীরে ধীরে মুক্ত করে তিনি তাদের ফুটিয়ে তুলেছেন। কারণ অতিমানসিক অতিস্থিতি এমন বিষয় নয়, যা আমাদের বর্তমান জীবন থেকে একান্তই পৃথক ও বিযুক্ত। এ হল এক মহত্তর আলোক যা থেকে এই সব বার হয়ে এসেছে অন্তঃপুরুষের অভিযানের জন্য, যে অন্তঃপুরুষ নিশ্চেতনার মধ্যে ভ্রষ্ট হয়ে আবার তা থেকে বাইরে আসছে এবং যতদিন এই অভিযান চলে ততদিন এটি অতিচেতন হয়ে আমাদের মনের উর্ধ্বে অপেক্ষা করে যতক্ষণ না তা আমাদের মধ্যে সচেতন হয়ে ওঠে। এর পর তা নিজেকে আবরণমুক্ত করবে আর আবরণমুক্তির দ্বারা আমাদের কাছে প্রকাশ করবে আমাদের নিজ সত্তা ও আমাদের সব কাজের পূর্ণ তাৎপর্য; কারণ তা ভগবানকেই ব্যক্ত করবে আর জগতে তাঁর আরো পূর্ণ অভিব্যক্তি মুক্ত ও সিদ্ধ করবে সেই গোপন তাৎপর্য।

সেই প্রকাশের মধ্যে আমাদের কাছে উত্তরোত্তর জানান হবে যে বিশ্বাতীত ভগবান পরম সন্মাত্র এবং আমরা যা সব সে সবের সিদ্ধ উৎস; তবে সমভাবেই আমরা তাঁকে দেখব সব কর্ম ও সৃষ্টির অধীশ্বররূপে যিনি তাঁর অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে ক্রমশঃ আরো বেশী করে নিজেকে ঢেলে দিতে উদ্যত। তখন আর মনে হবে না যে বিশ্বচেতনা ও তার ক্রিয়া এক বিশাল নিয়ন্ত্রিত যদৃচ্ছা, মনে হবে এটি হল অভিব্যক্তির ক্ষেত্র; সেখানে ভগবানকে দেখা যায় এক অধিষ্ঠাতা ও বিশ্বব্যাপী বিরাট পুরুষরূপে যিনি অতিস্থিতির মধ্য থেকে সব গ্রহণ করেন এবং যা অবতরণ করে তাকে ফুটিয়ে তোলেন এমন সব রূপে যেগুলি

এখন অস্বচ্ছ ছদ্মবেশ অথবা অবোধ্য অর্ধছদ্মবেশ কিন্তু যেগুলির নিয়তি হল স্বচ্ছ প্রকাশ হওয়া। জীবচেতনা ফিরে পাবে তার সত্যকার অর্থ ও ক্রিয়া; কারণ এ তো পরাৎপর থেকে বাইরে পাঠান এক অন্তঃপুরুষেরই রূপ আর এখন তার যে বেশই থাকুক না কেন, এ হল এক বীজস্বরূপ বা তরল উপাদান যার মধ্যে ভগবতী মাতৃশক্তি কর্মরতা কাল ও জড়ের মধ্যে কালাতীত ও নীরূপ ভগবানের বিজয়ী মূর্তিমত্তার জন্য। আমাদের দৃষ্টি ও অনুভূতিতে এটিই ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করবে কর্মের অধীশ্বরের সঙ্কল্পরূপে ও তাদের নিজেদেরই চরম তাৎপর্য হিসেবে আর একমাত্র এতেই পাওয়া যায় জগৎসৃষ্টির ও জগতের মধ্যে আমাদের ক্রিয়ার এক আলোক ও অর্থ। ঐ বিষয় উপলব্ধি করা ও একে সফল করার জন্য সাধনা করাই পূর্ণযোগে দিব্য কর্মমার্গের সমগ্র গুরুভার।

দ্বাদশ অধ্যায়

দিব্য কর্ম

যখন কর্মযোগের সাধকের সাধনা তার স্বাভাবিক পরিণতিতে আসে বা মনে হয় এসেছে তখন সাধকের একটি প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকে — মুক্তির পর অন্তঃপুরুষের জন্য কি কোন কর্ম থাকে বা কী কর্ম থাকে ও কী তার উদ্দেশ্য? প্রকৃতিতে সমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অথবা সমগ্র প্রকৃতি সমত্বের শাসনাধীনে এসেছে; অহং-ভাবনা, ব্যাপক অহং-বোধ, অহং-এর সকল বেদনা ও প্রচোদনা এবং এর জিদ ও সব কামনা থেকে নিঃশেষে মুক্তি লাভ হয়েছে। পূর্ণ আত্মোৎসর্গ সাধিত হয়েছে, শুধু মননে ও হৃদয়ে নয়, সত্তার সকল গ্রন্থির মধ্যে। সুসঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতা বা ত্রিগুণাতীত অবস্থা। অন্তঃপুরুষ তার কর্মের অধীশ্বরের দেখা পেয়ে হয় তাঁর সান্নিধ্যে বাস করে নয় তাকে সচেতনভাবে রাখা হয় তাঁর সত্তার মধ্যে অথবা তাঁর সঙ্গে সে মিলিত হয় বা তাঁকে অনুভব করে হৃদয়ে বা ঊর্ধ্বে এবং পালন করে তাঁর আদেশ। সে তার প্রকৃত সত্তা জেনে অবিদ্যার অবগুণ্ঠন ফেলে দিয়েছে। তখন মানুষের মধ্যে কর্মীর জন্য কোন্ কর্ম থাকে, কি-ই বা তার প্রেরণা, কি-ই বা উদ্দেশ্য, কি আন্তর ভাব নিয়েই বা তা করা হবে?

এক উত্তর আছে যার সঙ্গে ভারতে আমরা খুবই পরিচিত; আদৌ কোন কর্ম থাকে না, কারণ বাকী সব উপশম। যখন অন্তঃপুরুষ পরাৎপরের শাশ্বত সান্নিধ্যে বাস করতে সক্ষম হয় বা অনপেক্ষর সঙ্গে মিলিত হয় তখনই নিবৃত্ত হয় জগতের মধ্যে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য যদি অবশ্য বলা যায় যে জীবনের কোন উদ্দেশ্য আছে। আত্মবিভাজন ও অবিদ্যার অভিশাপ হতে মুক্ত হলে মানুষ অপর যে কষ্ট কর্মের অভিশাপ তা থেকেও মুক্তি পায়। তখন সকল কর্ম হবে পরম অবস্থা থেকে এক পতন ও অবিদ্যার মধ্যে প্রবেশ। জীবন সম্বন্ধে এই মনোভাবের অনুকূলে যে ভাবনা তার মূলে আছে প্রাণিক প্রকৃতি সম্বন্ধে এই প্রমাদ যে কর্ম করা হয় শুধু এই তিনটি অবর প্রেরণার একটি বা সকলগুলিরই বশে — প্রয়োজন, চঞ্চল সহজাত বৃত্তি ও সংবেগ বা কামনা। যখন সহজাত বৃত্তি বা সংবেগ শান্ত হয়, কামনা নিভে যায়, তখন সেখানে কর্মের স্থান কোথায়? কিছু যান্ত্রিক কর্মের প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু অন্য কিছু নয় আর এমনকি তা-ও চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে যাবে শরীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু একথা মেনে নিলেও, স্বীকার করতে হবে যে যতক্ষণ জীবন থাকে, ততক্ষণ ক্রিয়া অপরিহার্য। শুধু চিন্তা করা, অথবা চিন্তার অভাবে শুধু বেঁচে থাকাই একটা কাজ ও অনেক কার্যের কারণ। জগতে সকল কিছুই কর্ম, শক্তি, যোগ্যতা; আর কোন কিছু থাকারই অর্থ সমগ্রের

উপর তার স্ফুরন্ত ফল, — এমনকি মাটির ঢেলার নিঃসাড়তার, নির্বাণের দ্বারে অচঞ্চল বুদ্ধের নীরবতারও সম্বন্ধে এই কথা খাটে। শুধু প্রশ্ন হল — ক্রিয়ার প্রণালী সম্বন্ধে, যে যন্ত্রগুলি ব্যবহার করা হয় বা নিজেরাই কাজ করে সেগুলির সম্বন্ধে ও কর্মীর আন্তর ভাব ও জ্ঞান সম্বন্ধে। কারণ আসলে কোন মানুষই কাজ করে না, তার মধ্য দিয়ে কাজ করে প্রকৃতি, ভিতরকার এমন এক শক্তির আত্মপ্রকাশের জন্য যা আসে অনন্ত থেকে। এই কথা জানা এবং কামনা ও ব্যক্তিগত প্রেরণার ভ্রান্তি থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃতির অধীশ্বরের সান্নিধ্যে ও তাঁর সত্তায় বাস করা — এই হল একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয়। প্রকৃত মুক্তি এই, ক্রিয়ার শারীরিক নিবৃত্তি নয়; কারণ তাতেই অচিরে বদ্ধ হয় কর্মের বন্ধন। কোন লোক চিরদিন স্থির ও নিশ্চল হয়ে বসে থাকতে পারে কিন্তু তবু পশু বা কীটপতঙ্গের মতই সে থাকতে পারে অবিদ্যায় বদ্ধ হয়ে। কিন্তু যদি সে এই মহত্তর চেতনাকে নিজের মধ্যে স্ফুরন্ত করতে সক্ষম হয় তাহলে সকল জগতের সকল কর্ম তার মধ্য দিয়ে বয়ে গেলেও সে থাকে স্থির, পরম নিস্তব্ধ ও প্রশান্ত, সর্ব বন্ধনমুক্ত। জগতে আমাদের কর্ম দেওয়া হয় প্রথম আমাদের আত্মবিকাশ ও আত্মসার্থকতা সাধনের উপায় হিসেবে; কিন্তু এমনকি যদি এক সম্ভবপর শেষ দিব্য আত্মসম্পূর্ণতা লাভ করা যায় তাহলেও কর্ম তখনো থাকে জগতে দিব্য অভিপ্রায় পূরণের উপায় হিসেবে, কর্ম থাকে বৃহত্তর বিশ্বাত্মার সার্থকতা সাধনের উপায় হিসেবে, যে বিশ্বাত্মার এক অংশ প্রতি জীব — এমন অংশ যা তার সঙ্গে নিম্নে এসেছে অতিস্থিতি থেকে।

এক অর্থে যোগের এক বিশেষ পরিণত অবস্থায় মানুষের পক্ষে কর্মের অবসান হয়; কারণ তখন নিজের জন্য তার আর কর্মের প্রয়োজন থাকে না, সে যে কর্ম করছে এ বোধও থাকে না; কিন্তু কর্ম থেকে পলায়নের বা আনন্দপূর্ণ নিশ্চেষ্টতার মধ্যে আশ্রয় নেওয়ার কোন দরকার নেই। কারণ এখন তার কাজ দিব্য সন্মাত্রের কাজের মত — কোন প্রয়োজনের বাধ্যবাধকতা নেই, নেই অবিদ্যার জুলুম। এমনকি কর্ম করেও সে আদৌ কর্ম করে না; নিজ থেকে কোন কাজ সে প্রবর্তন করে না। দিব্যশক্তিই কাজ করেন তার মধ্যে তার প্রকৃতির মাধ্যমে; তার ক্রিয়ার উপচয় হয় এক পরমাশক্তির স্বতঃস্ফূর্ততার মাধ্যমে; এই শক্তিই তার সব করণ অধিগত করেন, সে তাঁরই এক অংশ, তাঁর সঙ্কল্প ও সাধকের সঙ্কল্প এক, সাধকের সামর্থ্য তাঁরই সামর্থ্য। তার অন্তঃস্থ চিৎপুরুষ এই ক্রিয়ার ধর্তা, ভর্তা ও দ্রষ্টা; সেই হল জ্ঞানের মধ্যে ক্রিয়ার অধিষ্ঠাতা কিন্তু সে আসক্তি বা প্রয়োজনবশে কর্মে লিপ্ত বা জড়িত হয় না, কর্মফলের আকাঙ্ক্ষার দ্বারা বদ্ধ নয়, অধীনও নয় কোন গতিবৃত্তি বা সংবেগের।

সাধারণতঃ মনে করা হয় যে কামনা না থাকলে ক্রিয়া অসম্ভব অথবা অন্ততঃ অর্থশূন্য, তা ভুল। বলা হয় যে কামনা বন্ধ হলে ক্রিয়াও বন্ধ হতে বাধ্য। কিন্তু এই কথাটি অন্যান্য অতি সরল-করা ব্যাপক সামান্যীকরণের মত মনের প্রিয় বটে, কেন না মন সবকিছু খণ্ড করে সীমাবদ্ধ করে, কিন্তু আসলে এটি তত সত্য নয়। বিশ্বে যে কাজ করা হয় তার বেশীরভাগেই কামনার কোন সংস্রব নেই; তা চলে প্রকৃতির শান্ত আবশ্যকতা ও স্বতঃস্ফূর্ত বিধানে। এমনকি মানুষও নানাবিধ কর্ম করে স্বতঃস্ফূর্ত সংবেগ,

বোধি, সংস্কারবশে, অথবা কাজের পিছনে থাকে বিভিন্ন শক্তির স্বাভাবিক রীতি ও বিধানের প্রেরণা, তাতে যে কোন মানসিক পরিকল্পনা বা প্রাণের কোন সচেতন সঙ্কল্পের তাড়না বা ভাবাবেগময় কামনা থাকে তা-ও নয়। প্রায়শঃই তার কাজ হয় তার অভিপ্রায় বা কামনার বিপরীত; তার ভিতর থেকে কর্ম আসে — হয় কোন প্রয়োজন বা বাধ্যবাধকতার চাপে, কোন সংবেগের তাড়নায়, তার মধ্যে আত্মপ্রকাশে সচেষ্ট কোন শক্তির বশে অথবা সে সচেতনভাবে কোন উচ্চতর তত্ত্ব অনুসরণ করে বলে। কামনা একটি অতিরিক্ত প্রলোভন আর প্রকৃতি একে এক বড় অংশ দিয়েছে সজীব প্রাণীর জীবনে, যাতে তার মধ্যবর্তী উদ্দেশ্যের জন্য প্রয়োজনীয় এক প্রকার রাজসিক ক্রিয়া উৎপন্ন হয় কিন্তু এই তার একমাত্র যন্ত্র নয়, এমনকি প্রধান যন্ত্রও নয়। যতক্ষণ এটি বর্তমান থাকে ততক্ষণ এর উপকারিতা অনেক; নিশ্চেষ্টতা থেকে উপরে উঠতে এ আমাদের এক সহায়; অনেক তামসিক শক্তি এটি খণ্ডন করে, তা নাহলে এদের দ্বারা ক্রিয়া ব্যাহত হ'ত। কিন্তু যে সাধক কর্মমার্গে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে সে এই যে মধ্যবর্তী অবস্থা যেখানে কামনা এক সহায়কর যন্ত্র তা অতিক্রম করেছে। তার কাজের জন্য কামনার তাড়না আর অপরিহার্য নয়, বরং এ হল এক ভীষণ বাধা, এবং পদস্খলন, অপটুতা ও বিফলতার উৎস। অন্যেরা বাধ্য হয়ে ব্যক্তিগত পছন্দ বা প্রেরণার অনুবর্তী হয় কিন্তু তাকে কাজ করা শিখতে হবে নৈর্ব্যক্তিক বা সার্বিক মন নিয়ে বা এক অনন্ত পরম ব্যক্তির অংশ বা যন্ত্র হিসেবে। চাই এক শান্ত উদাসীন ভাব, সুখময় নিরপেক্ষতা অথবা দিব্য শক্তিতে সানন্দে সাড়া দেওয়া তা এর আদেশ যাই হ'ক না কেন — তবেই সম্ভব হবে তার সকল কর্ম সম্পাদন বা উপযুক্ত কর্মে ভার গ্রহণ। কামনা বা আসক্তি তার প্রেরণা হলে চলবে না, তার প্রেরণা হওয়া চাই এমন সঙ্কল্প যা এক দিব্য শান্তির মধ্যে সচল, এমন জ্ঞান যা আসে বিশ্বাতীত আলোক থেকে, এমন উৎফুল্ল সংবেগ যা পরম আনন্দের শক্তি।

যোগের এক পরিণত অবস্থায়, সাধক তার ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ অনুযায়ী কি কাজ করবে বা না করবে, — এ প্রশ্ন অবান্তর, এমনকি সে আদৌ কাজ করবে কি না করবে তা-ও তার ব্যক্তিগত নির্বাচন বা তৃপ্তির দ্বারা ঠিক হবে না। যা কিছু পরম সত্যের সঙ্গে সুসঙ্গত বা ভগবান যা কিছু দাবী করেন তার প্রকৃতির মাধ্যমে সর্বদা তা-ই করতে সে প্রবৃত্ত হয়। এ থেকে কখন কখন লোকে ভুল সিদ্ধান্ত করে যে আধ্যাত্মিক মানুষ অদৃষ্ট বা ভগবান বা তার অতীত কর্ম দ্বারা যে অবস্থায় পড়েছে তা-ই সে স্বীকার করে নেয়, জন্ম বা ঘটনাচক্রে বংশ, কুল, জাত, রাষ্ট্রজাতি, বৃত্তির যে ক্ষেত্র ও পদ সে পেয়েছে তাতে কাজ করতেই সে সন্তুষ্ট, সুতরাং সে এগুলি অতিক্রম করতে বা অন্য কোন বৃহৎ পার্থিব লক্ষ্য অনুসরণ করতে চেষ্টা করবে না, আর এমনকি হয়ত এরকম কোন চেষ্টা

করা উচিত হবে না। যেহেতু প্রকৃতপক্ষে তার করার কোন কাজ নেই, যেহেতু কর্ম যাই হ'ক না কেন, তার শরীর যতক্ষণ আছে ততক্ষণ তার কর্তব্য হল সব কর্ম ব্যবহার করা শুধু মুক্তি পাবার জন্য অথবা মুক্তি পাবার পর তার কর্তব্য, — শুধু পরম সঙ্কল্পের অনুবর্তী হয়ে তা যা সব আদেশ দেয় সে সবই করা, সুতরাং যে বাস্তব ক্ষেত্র তাকে দেওয়া হয়েছে উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে তা-ই যথেষ্ট। একবার মুক্ত হলে তার কর্তব্য হল শুধু কাজ করে চলা সেই ক্ষেত্রে যা তাকে দেওয়া হয়েছে অদৃষ্ট ও ঘটনাচক্রের দ্বারা যতক্ষণ না সেই পরম মুহূর্ত আসে যখন সে অবশেষে সক্ষম হয় অনন্তের মাঝে বিলীন হতে। কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য আগ্রহী হওয়ার বা কোন বড় পার্থিব উদ্দেশ্যের জন্য কাজ করার অর্থ কর্মের ভ্রান্তিতে পড়া; এর অর্থ এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা যে পার্থিব জীবনের কোন বোধগম্য অভিপ্রায় আছে এবং অনুসরণের অনেক যোগ্য বিষয়ও এতে আছে। এই সেই প্রবল মায়াবাদ যাতে কার্যতঃ জগতের মাঝে ভগবানকে অস্বীকার করা হয় যদিও তার ভাবনায় থাকে ভগবৎ-উপস্থিতির স্বীকৃতি। কিন্তু এখানে, এই জগতেই ভগবান আছেন — শুধু স্থিতিতে নয়, স্ফুরত্তাতেও, শুধু যে অধ্যাত্ম আত্মা ও সান্নিধ্যরূপে তা নয়, সামর্থ্য, শক্তি, ক্রিয়াশক্তিরূপেও, এবং সেহেতু জগতে দিব্য কর্ম সম্ভবপর।

কর্মযোগীর উপর কোন সঙ্কীর্ণ তত্ত্ব কোন সীমাবদ্ধ কর্মের পরিসর তার বিধান বা ক্ষেত্র হিসেবে চাপান যায় না। একথা সত্য যে মুক্তির দিকে অগ্রগতির কাজে বা আত্মশিক্ষার জন্য সবরকম কাজই — তা সে কাজ মানুষের কল্পনায় ছোট হ'ক বা বড় হ'ক, তার পরিধি সঙ্কীর্ণ বা বিস্তৃত হ'ক — সমভাবে ব্যবহার করা যায়। এ কথাও সত্য যে মুক্তির পর মানুষ জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে ও যে কোন প্রকার কাজের মধ্যে থেকে সেখানেই সার্থক ক'রে তুলতে পারে তার জীবন ভগবানের মধ্যে। পরম চিৎপুরুষ তাকে যে ভাবে চালান সেইভাবে সে থাকতে পারে জন্ম ও ঘটনাচক্রের দেওয়া ক্ষেত্রের মধ্যে অথবা সেই পরিবেষ্টন ভেঙ্গে সে বাইরে যেতে পারে অবাধ ক্রিয়ার মধ্যে যা হবে তার সমুন্নত চেতনা ও উচ্চতর জ্ঞানের যোগ্য ক্ষেত্র। লোকের বহিশ্চক্ষুতে হয়ত মনে হয় যে আন্তর মুক্তির দ্বারা তার বাইরের কাজে কোন পার্থক্য হয়নি; অথবা বিপরীতভাবে এমন হয় যে অন্তরের স্বাধীনতা ও আনন্ত্য বাইরে এরকম বৃহৎ ও নতুন স্ফুরন্ত কর্মধারার মধ্যে প্রকাশ হতে পারে যে সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তার অভিনব শক্তিতে। তার অন্তঃস্থ পরতমের অভিপ্রায় হলে মুক্ত পুরুষ সেই মত তার পুরনো মানুষী পরিবেশের মধ্যেই সূক্ষ্ম ও সীমাবদ্ধ কাজ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারে আর সেই সব পরিবেশের বাহ্য রূপ পরিবর্তনের কোন চেষ্টাও হবে না। আবার এমনও হতে পারে যে তাকে এমন কাজে ডাকা হবে যাতে শুধু যে তার নিজের বাহ্য জীবনের সব রূপ ও ক্ষেত্র বদলে যাবে তা নয়, তার চারিপাশের কোন কিছুই অপরিবর্তিত বা অক্ষুণ্ণ থাকবে না, সৃষ্টি হবে এক নতুন জগৎ বা নতুন সমাজ।

এক প্রচলিত ভাবনা আমাদের স্বীকার করাতে চায় যে মুক্তির এক মাত্র লক্ষ্য হল্ বিশ্বের চপল জীবনের মধ্যে ব্যষ্টিপুরুষকে দৈহিক পুনর্জন্ম থেকে নিস্তার দেওয়া। যদি এই নিস্তার একবার নিশ্চিত হয় তাহলে এখানে বা অন্যত্র জীবনে আর কোন কাজ থাকে না বা মাত্র সেইটুকু থাকে যা তার আরো কিছুকাল শরীর ধারণের জন্য দরকার বা অতীত জীবনসমূহের কর্মের অসম্পূর্ণ ফল হিসেবে অবশ্যম্ভাবী। যে সামান্যটুকু থাকে তাও যোগাগ্নির দ্বারা শীঘ্র নিঃশেষিত বা দগ্ধ হয়ে বন্ধ হয়ে যায় দেহ থেকে মুক্ত পুরুষের প্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে। অন্তঃপুরুষের পরমার্থরূপে পুনর্জন্ম থেকে নিস্তার প্রাপ্তির লক্ষ্য ভারতীয় মানসিকতায় এখন বহুদিন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আর বহুধর্ম তাদের দিব্য প্রলোভন হিসেবে ওপারে যে স্বর্গসুখ ভোগকে ভক্তের মানসিকতায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল এটি তার স্থান নিয়েছে। যখন বৈদিক স্তোত্রের স্থূল বাহ্য ব্যাখ্যা প্রধান ধর্মমত ছিল তখন ভারতীয় ধর্মও ঐ পূর্বতন অবর প্রেরণাকে সমর্থন করেছে, এবং পরবর্তী কালে ভারতীয় দ্বৈতবাদীরাও তাকেই রেখেছে তাদের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক প্রেরণার অংশ হিসেবে। একথা নিঃসন্দেহ যে স্বর্গে মানসিক সুখভোগের বা চিরকাল ধরে দৈহিক আমোদ করার আশ্বাস অপেক্ষা মন ও দেহের সসীমতা থেকে পরম চিৎপুরুষের শাশ্বত শান্তি, বিশ্রাম, নীরবতার মধ্যে মুক্তির আকর্ষণ আরো মহত্তর, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এও তো এক প্রলোভন; জগতের প্রতি মনের বৈরাগ্য, নতুন জন্মের অজানা রহস্য থেকে প্রাণসত্তার জুগুপ্সা — এই সবে এটি যে জোর দেয় তাতে দুর্বলতার সুরই বাজে, এ কখনো শ্রেষ্ঠ প্রেরণা হতে পারে না। ব্যক্তিগত মুক্তির কামনা যত উচ্চ রূপেরই হ'ক না কেন এ হল অহং-এরই পরিণাম; এর মূলে আছে আমাদের নিজেদের পৃথক ব্যষ্টিত্বের ভাবনা, এবং নিজের শুভ বা মঙ্গলের জন্য এর কামনা, কষ্টভোগ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বা সম্ভূতির দুঃখযন্ত্রণার বিলোপের জন্য আকুল প্রার্থনা আর এ সবকেই এটি করে আমাদের জীবনের পরম লক্ষ্য। অহং-এর এই ভিত্তিকে সম্পূর্ণ উৎখাত করার জন্য দরকার ব্যক্তিগত কামনার উর্ধ্বে আরোহণ। আমরা যদি ভগবানকে চাই, তাহলে তা হওয়া উচিত ভগবানের জন্য, অন্য কিছুর জন্য নয়, কারণ তাই আমাদের সত্তার পরম আকৃতি, চিৎপুরুষের গভীরতম সত্য। মুক্তি, অন্তঃপুরুষের স্বাধীনতা, আমাদের প্রকৃত ও সর্বোত্তম আত্মার উপলব্ধি ও ভগবানের সঙ্গে মিলন — এই সবের জন্য সাধনার একমাত্র যুক্তিসঙ্গত কারণ এই যে এই আমাদের প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ বিধান, পরতমের দিকে আমাদের অবর অংশের আকর্ষণ এই, এই হল আমাদের মধ্যে দিব্যসঙ্কল্প। এই কারণই যথেষ্ট, আর এই একমাত্র সত্যকার যুক্তি, অন্য সব প্রেরণা অপ্রয়োজনীয় বাড়তি জিনিস, ক্ষুদ্র বা প্রাসঙ্গিক সত্য বা উপকারী প্রলোভন কিন্তু যে মুহূর্তে এদের উপকারিতা শেষ হয় আর পরতমের ও সর্বভূতের সঙ্গে একত্বের অবস্থা আমাদের সাধারণ চেতনা হয়ে ওঠে এবং সেই অবস্থার আনন্দ হয়ে ওঠে আমাদের আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল সে মুহূর্তে ঐ সবকে পরিত্যাগ করা অন্তঃপুরুষের অবশ্য কর্তব্য।

অনেক সময় আমরা দেখি যে ব্যক্তিগত মুক্তির এই কামনাকে অপর এক আকর্ষণ পরাভূত করেছে যা আমাদের প্রকৃতির উচ্চতর প্রবণতার অন্তর্গত আর এতে বোঝা যায়

মুক্ত পুরুষের যে কাজ করা উচিত তার মূল প্রকৃতি কি। অমিতাভ বুদ্ধ সম্বন্ধে মহান্ উপাখ্যানের তাৎপর্য এই — যখন তাঁর চিৎপুরুষ নির্বাণের দ্বারে উপস্থিত তখন বুদ্ধ সেখান থেকে ফিরে এসে প্রতিজ্ঞা করলেন যে যতদিন একটি প্রাণীও দুঃখ ও অবিদ্যার মধ্যে থাকবে ততদিন তিনি কখনো সেই দ্বারসীমা অতিক্রম করবেন না। এই হল ভাগবত পুরাণের সেই সুমহান শ্লোকের আন্তর অর্থ — "অষ্টসিদ্ধিযুক্ত পরম অবস্থা বা পুনর্জন্মের নিবৃত্তি আমার কাম্য নয়, আমি যেন সকল আর্তজনের দুঃখভার নিয়ে তাদের মধ্যে থাকতে পারি যাতে তারা দুঃখমুক্ত হয়।" স্বামী বিবেকানন্দের এক পত্রের এক অপূর্ব অংশের প্রেরণা হল এই; সেই মহান্ বৈদান্তিক লিখেছিলেন, "আমার নিজের মুক্তির সকল ইচ্ছা চলে গেছে, আমি যেন বারবার জন্ম নিয়ে সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করি যাতে আমি পূজা করতে পারি সেই একমাত্র বিদ্যমান ভগবানকে যে একমাত্র ভগবানে আমি বিশ্বাসী যিনি নিখিল পুরুষের সমষ্টি — এবং সর্বোপরি পাপী নারায়ণ, তাপী নারায়ণ, সর্বজাতির, সকল শ্রেণীর দরিদ্র নারায়ণই আমার বিশেষ আরাধ্য। যিনি উচ্চ ও নীচ, সাধু ও পাপী, দেব ও কীট — সর্বরূপী সেই প্রত্যক্ষ, জ্ঞেয়, সত্য ও সর্বব্যাপীকে উপাসনা কর, অন্যসব প্রতিমা ভেঙে ফেল। যাঁর মধ্যে পূর্ব জীবন নেই, পরজন্ম নেই, মৃত্যু নেই, গমনাগমন নেই, যাঁর মধ্যে আমরা সর্বদা অখণ্ডত্ব লাভ করেছি ও ভবিষ্যতেও করব, তাঁর উপাসনা কর, অন্য সব প্রতিমা ভেঙে ফেল।"

বস্তুতঃ এই শেষের দুটি বাক্যের মধ্যে বিষয়টির সমগ্র সার বর্তমান। যেমন প্রকৃত সন্ন্যাসের অর্থ শুধু বাহ্যভাবে পরিবারবর্গ ও সমাজ ত্যাগ নয়, তেমন প্রকৃত মোক্ষের বা পুনর্জন্মের শৃঙ্খল থেকে প্রকৃত মুক্তির অর্থ পার্থিব জীবন বর্জন নয় অথবা আধ্যাত্মিক আত্মবিলোপের দ্বারা জীবের পলায়ন নয়; এর অর্থ ভগবানের সঙ্গে আন্তর তাদাত্ম্য যে ভগবানের মধ্যে পূর্ব জীবন ও পরজন্মের সসীমতা নেই, তার স্থলে আছে অজাত পুরুষের শাশ্বত জীবন। গীতা বলে, যে আন্তর মুক্ত সে সব কর্ম করলেও আদৌ কিছু করে না; কারণ প্রকৃতিই তার মধ্যে কাজ করে প্রকৃতির প্রভুর নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে। সমভাবে বলা যায় যে যদি সে শতবার দেহধারণ করে তবু সে জন্মের শৃঙ্খল বা জীবনের যান্ত্রিক চক্র থেকে মুক্ত, কারণ সে বাস করে অজ ও অমর চিৎপুরুষের মধ্যে, দেহগত জীবনে নয়। সুতরাং পুনর্জন্ম থেকে নিস্তার পাওয়ার আসক্তি এমন এক প্রতিমা যা অন্য যে কেউ রাখুক না কেন পূর্ণযোগের সাধকের কর্তব্য তা ভেঙে তার কাছ থেকে দূরে ফেলে দেওয়া। কারণ তার যোগ শুধু ব্যষ্টি পুরুষের দ্বারা সকল জগতের অতীত বিশ্বাতীতের উপলব্ধিতেই সীমিত নয়, বিশ্বাত্মকের "নিখিল পুরুষের সমষ্টি"র উপলব্ধিও এর অন্তর্গত; সুতরাং তার যোগকে ব্যক্তিগত মুক্তি ও নিস্তার পাওয়ার সাধনাতেই নিবদ্ধ রাখা চলে না। এমনকি বিশ্বের সকল সীমার ঊর্ধ্বে তার অতিস্থিতিতেও সে তখনো ভগবানের মধ্যে সকলের সঙ্গে এক; তার জন্য থাকে বিশ্বের দিব্য কর্ম।

ঐ কর্ম কোন মনগড়া নিয়ম বা মানুষী মান দিয়ে নির্ধারিত করা যায় না; কারণ তার চেতনা চলে গেছে মানুষী বিধান ও সীমার গণ্ডি ছাড়িয়ে দিব্য স্বাধীনতার মধ্যে, বাহ্য ও অনিত্যের শাসন ছাড়িয়ে আন্তর ও নিত্যের আত্মশাসনের মধ্যে, সান্তের রূপের বন্ধন থেকে অনন্তের আত্মনিরূপণের স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে। গীতা বলে, "যে ভাবেই সে বাস ও কর্ম করুক, সে বাস ও কর্ম করে আমারই মধ্যে"। মানুষের বুদ্ধি যে সব নিয়ম ব্যবস্থা করে মুক্ত পুরুষের পক্ষে সে সব খাটে না — যে সব বাহ্য মাপকাঠি ও নিরিখ তার সব মানসিক সংস্কার ও পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রচিত, সে সবের দ্বারা এরকম লোকের বিচার চলে না; এই সব ভ্রমপ্রবণ বিচারালয়ের সঙ্কীর্ণ এলাকার বাইরে তিনি। তিনি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করেন, না গৃহীর পূর্ণ জীবন যাপন করেন; তিনি দিন কাটান তথাকথিত পুণ্য কর্মে, না জগতের বহুমুখী কাজকর্মে; বুদ্ধ, খৃষ্ট বা শঙ্করের মত তিনি মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে আলোকের দিকে নিয়ে যাবার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন, না জনকের মত রাজ্য শাসন করেন, না শ্রীকৃষ্ণের মত রাজনীতিবিদ বা সেনানায়ক হয়ে জনসাধারণের সম্মুখে দাঁড়ান; — এসবে কিছু আসে যায় না। তাঁর খাদ্য বা পানীয় কি, কি কি তাঁর অভ্যাস বা কি কি তাঁর কাজ, তিনি বিফল, না সফল হয়েছেন, তাঁর কাজ কি গঠনের না ধ্বংসের, তিনি কি পুরনো সমাজ রক্ষা করেন, না একে পুনঃস্থাপন করেন, না চেষ্টা করেন এর পরিবর্তে নতুন সমাজ গড়তে, তাঁর সঙ্গীসাথীরা কি সেই সব লোক যাদের জনসাধারণ সানন্দে সম্মান করে, না সেইসব লোক যারা তাদের উচ্চতর ন্যায়নিষ্ঠতাবোধে পতিত ও পাপাসক্ত, সমকালীন লোকেরা কি তাঁর জীবন ও কার্য অনুমোদন করে, না তাঁকে নিন্দা করে এই বলে যে তিনি জনসাধারণকে বিপথে নেন, প্রচলিত ধর্ম, নীতি বা সমাজের বিরুদ্ধ মতের প্ররোচনা দেন — এইসব প্রশ্নও অর্থশূন্য। সাধারণ মানুষের বিচার বা অজ্ঞানীর তৈরী বিধান অনুযায়ী তিনি চলেন না, তিনি চলেন আন্তর বাণীর নির্দেশ অনুযায়ী, তাঁকে চালায় এক অদৃশ্য শক্তি। তাঁর প্রকৃত জীবন অন্তরে, আর তার পরিচয় এই যে তিনি বাস করেন, বিচরণ করেন, কার্য করেন ভগবানের মধ্যে, দিব্য চেতনার মধ্যে, অনন্তের মধ্যে।

কিন্তু তাঁর ক্রিয়া কোন বাহ্য বিধির নিয়ন্ত্রণাধীন না হলেও, এটি এমন এক বিধি অনুযায়ী চলে যা বাহ্য নয়; এর মূলে কোন ব্যক্তিগত কামনা বা লক্ষ্যের প্রেরণা থাকবে না; এটি হবে জগতের মধ্যে এক সচেতন দিব্যকর্মপ্রণালীর অংশ যে প্রণালী স্বনিয়ন্ত্রিত হওয়ায় শেষ পর্যন্ত সুনিয়ন্ত্রিত। গীতা বলে, — মুক্তপুরুষের ক্রিয়া কামনার দ্বারা চালিত হবে না, তার লক্ষ্য হবে "লোক সংগ্রহ" — জগৎকে একত্র রাখা, এবং তার নির্ধারিত পথে তাকে চলার নির্দেশ ও বেগ দেওয়া ও রক্ষা করা। গীতার এই অনুচ্ছেদকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যে যেহেতু জগৎ এক মায়া এবং বেশীরভাগ লোকই মুক্তির অনুপযুক্ত বলে তাদের সেই মায়ার মধ্যেই বাধ্য হয়ে রাখা দরকার, সেহেতু মুক্ত পুরুষের উচিত বাহ্যতঃ এমন কাজ করা যাতে সামাজিক বিধানে নির্দিষ্ট বিভিন্ন প্রচলিত কর্মের প্রতি তাদের আসক্তি বজায় থাকে। এই ব্যাখ্যা সত্য হলে, অনুজ্ঞাটি এমন এক নগণ্য ও

ক্ষুদ্র বিধি হবে যা উন্নত সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রই প্রত্যাখ্যান করবে, সে বরং অনুসরণ করবে অমিতাভ বুদ্ধের প্রতিজ্ঞা, ভাগবতের মহতী প্রার্থনা, বিবেকানন্দের আবেগময়ী আস্পৃহা। কিন্তু যদি আমরা এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করি যে জগৎ হল প্রকৃতির এমন এক ভগবৎ-চালিত গতিধারা যা মানবের মধ্যে প্রকট হয়ে ভগবৎ-অভিমুখে চলেছে আর এটি যদি সেই কর্ম হয় যাতে, গীতায় ভগবান বলেছেন, তিনি সর্বদাই ব্যাপৃত যদিও তাঁর নিজের অপ্রাপ্য এমন কিছু নেই যা তাকে এখনো পেতে হবে তাহলে আমরা এই মহতী অনুজ্ঞার এক গভীর ও প্রকৃত অর্থ পাব। এই দিব্য কর্মে সহযোগী হওয়া, ভগবানের জন্য জগতে বাস করা — এই হবে কর্মযোগীর নিয়ম; ভগবানের জন্য কাজ করা চাই, সুতরাং এমনভাবে কাজ করা চাই যে ভগবান যেন উত্তরোত্তর নিজেকে ব্যক্ত করতে পারেন আর যে পথেই হ'ক না কেন জগৎ যেন এগিয়ে যায় তার অজানা তীর্থযাত্রায় এবং ক্রমশঃ নিকটবর্তী হয় দিব্য আদর্শের।

কেমনভাবে তিনি এটি করবেন, কি বিশেষ উপায়েই বা তা করা হবে — এ কোন সাধারণ নিয়মে স্থির করা যায় না। ভিতর থেকেই এটি নিজে নিজে ফুটে উঠবে বা আকার নেবে; এই সিদ্ধান্তের ভার ভগবান ও আমাদের আত্মার উপর, পরমাত্মা ও যে ব্যষ্টি আত্মা কর্মের যন্ত্র তাদের উপর; এমনকি মুক্তির পূর্বেও যখনই আমরা আন্তর আত্মা সম্বন্ধে সচেতন হই তখনই আসে এই পথের অনুমোদন, অধ্যাত্মভাবে নির্ধারিত নির্বাচন। করণীয় কর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান আসা চাই সম্পূর্ণ অন্তর থেকেই। এমন কোন বিশেষ কর্ম, কোন বিধান বা রূপ বা বাহ্যভাবে নির্দিষ্ট বা অপরিবর্তনীয় কর্মপন্থা নেই যার সম্বন্ধে বলা যায় যে এটাই মুক্ত পুরুষের কর্ম বা বিধান ইত্যাদি। এই করণীয় কর্ম প্রকাশ করতে গীতায় যে কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ এই করা হয়েছে যে আমাদের উচিত কর্তব্য কর্ম করা ফলের দিকে না তাকিয়ে। কিন্তু এই ধারণা ইউরোপীয় সংস্কৃতির ফল, যে সংস্কৃতির ভাবনাগুলি আধ্যাত্মিক অপেক্ষা নৈতিক, আন্তরভাবে গভীর অপেক্ষা বরং বাহ্য। কর্তব্য কর্ম বলে কোন সর্বজনীন বিষয় নেই; আমাদের আছে শুধু বিভিন্ন কর্তব্য কর্ম আর প্রায়শঃই এদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ থাকে, আর এই সব কর্ম নির্ধারিত হয় আমাদের পরিবেশ, আমাদের সামাজিক সম্পর্ক ও জীবনে আমাদের বাহ্য মর্যাদার দ্বারা। অপরিণত নৈতিক প্রকৃতিকে শিক্ষা দেওয়ার কাজে এবং স্বার্থপর কামনার ক্রিয়াকে নিরুৎসাহ করে এমন মান স্থাপন করায় এদের মূল্য অনেক। পূর্বেই বলা হয়েছে যে যতদিন সাধক কোন আন্তর আলোক না পায় ততদিন তাকে চলতে হবে তার যে সর্বোত্তম আলোক আছে তা দিয়েই আর যে সব মান সে সাময়িকভাবে খাড়া ক'রে পালন করতে পারে তাদের মধ্যে আছে কর্তব্য কর্ম, নীতি, মহান্ উদ্দেশ্য। কিন্তু যতই এইসব কর্তব্য কর্ম মূল্যবান হ'ক এরা বাহ্য বিষয়, এরা অন্তঃপুরুষের উপাদান নয়, এই পথের ক্রিয়ার চরম মান হওয়ার অনুপযুক্ত এরা। সৈনিকের কর্তব্য হল আদেশ পালন করে যুদ্ধ করা, এমনকি নিজের আত্মীয় স্বজনের ওপর গুলি করা; কিন্তু এরকম কোন মান বা অনুরূপ কিছু মুক্ত পুরুষের উপর চাপান যায় না। অপরপক্ষে ভালবাসা বা করুণা

করা, আমাদের সত্তার শ্রেষ্ঠ সত্যের অনুবর্তী হওয়া, ভগবানের আদেশ পালন করা — এইসব কর্তব্য কর্ম নয়, প্রকৃতি যখন ভগবানের দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় তখনকার প্রকৃতির বিধান এইসব, এরা অন্তঃপুরুষের কোন বিশেষ অবস্থা থেকে ক্রিয়ার বহিঃপ্রবাহ, চিৎপুরুষের উচ্চ বাস্তবতা। মুক্ত কর্মীরও ক্রিয়া হওয়া চাই অন্তঃপুরুষ থেকে এইরকম এক বহিঃপ্রবাহ, ভগবানের সঙ্গে তার অধ্যাত্ম মিলনের স্বাভাবিক পরিণামস্বরূপ তার নিকট এর আসা বা তার মধ্য হতে বার হওয়া চাই; মানসিক মনন ও সঙ্কল্পের ব্যবহারিক যুক্তি বুদ্ধি বা সামাজিক বোধের কোন উৎকৃষ্ট রচনার দ্বারা এর সৃষ্টি হলে চলবে না। সাধারণ জীবনে কোন ব্যক্তিগত বা সামাজিক বা ঐতিহ্যগত কৃত্রিম নিয়ম, মান বা আদর্শই আমাদের পথপ্রদর্শক, কিন্তু একবার আধ্যাত্মিক পথে যাত্রা শুরু হলে এর স্থলে আনা চাই এমন এক আন্তর বা বাহ্য বিধি বা জীবনধারা যা আমাদের আত্মশিক্ষা, মুক্তি ও সিদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয়, এমন এক জীবনধারা যা আমাদের অনুসরণ করা পথের উপযোগী অথবা অধ্যাত্ম দিশারী ও অধীশ্বর গুরুর দ্বারা বিহিত আর না হয় আমাদের অন্তঃস্থ পরম দিশারীর দ্বারা নির্দিষ্ট। কিন্তু অন্তঃপুরুষের আনন্ত্য ও মুক্তির চরম অবস্থায় সকল বাহ্য মান সরিয়ে ফেলা হয় বা পাশে রাখা হয় আর অবশিষ্ট থাকে শুধু আমরা যে ভগবানের সঙ্গে মিলিত তাঁর প্রতি এক স্বতঃস্ফূর্ত ও অখণ্ড মান্যতা আর থাকে এমন ক্রিয়া যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সার্থক করে আমাদের সত্তা ও প্রকৃতির অখণ্ড আধ্যাত্মিক সত্য।

এই গভীরতর অর্থেই আমাদের নেওয়া উচিত গীতার নির্দেশ যে স্বভাব দ্বারা নিরূপিত ও নিয়ন্ত্রিত ক্রিয়াই হওয়া উচিত আমাদের কর্মের বিধান। একথা ঠিকই যে "স্বভাব" কথাটির অর্থ বাহ্য মেজাজ বা চরিত্র বা অভ্যাসগত সংবেগ নয়; সংস্কৃত পদটির যে আক্ষরিক অর্থ এ হল তাই — আমাদের "আপন সত্তা", আমাদের মূল প্রকৃতি, আমাদের সব অন্তঃপুরুষের দিব্য উপাদান। যা কিছুর উৎপত্তি এই মূল থেকে বা প্রবাহ এইসব উৎস থেকে তাই গভীর, মৌলিক, যথার্থ; বাকীসব যেমন মতামত, বিভিন্ন সংবেগ, অভ্যাস, কামনা — হয়ত সত্তার শুধু উপরভাসা বিভিন্ন রূপায়ণ বা ক্ষণিক খেয়াল বা বাইরে থেকে আরোপ। তারা আসা যাওয়া করে, তাদের পরিবর্তন হয় কিন্তু এই যে স্বভাব তা স্থির থাকে। প্রকৃতি আমাদের মধ্যে কার্য সাধনের জন্য যেসব রূপ নেয় সেগুলি আমরা নই অথবা আমাদের স্থায়ী, স্থির এবং প্রকাশশীল বিভিন্ন আকারও আমরা নই, আমাদের মধ্যে যে অধ্যাত্ম সত্তা — আর অন্তঃপুরুষরূপে এর যে সম্ভূতি তাও এই সত্তার অন্তর্গত — বিশ্বে কালের মধ্যে চিরস্থায়ী তাই আমাদের আপন সত্তা।

অবশ্য আমাদের সত্তার এই সত্যকার আন্তর ধর্মকে সহজে অন্য সব থেকে বুঝতে পারা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়; যতক্ষণ হৃদয় ও বুদ্ধি অহং-ভাব থেকে মুক্ত না হয়ে অশুদ্ধ থাকে ততদিন একে আমাদের কাছ থেকে আড়ালে রাখা হয়; ততদিন আমরা

আমাদের পরিবেশ-থেকে-আসা সকল রকম বাহ্য ও চঞ্চল ভাবনা, সংবেগ, কামনা, আভাসন ও আরোপ অনুযায়ী চলি অথবা ফুটিয়ে তুলি আমাদের সাময়িক মানসিক, প্রাণিক, শারীরিক ব্যক্তিভাবনার বিভিন্ন রূপায়ণগুলি — যে ব্যক্তিভাবনা এমন এক অস্থায়ী পরীক্ষামূলক আত্মা, যা আমাদের জন্য গঠিত হয়েছে একদিকে আমাদের সত্তা ও অন্য দিকে অপরা বিশ্বপ্রকৃতির চাপ এই দুয়ের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ। যে পরিমাণে আমরা শুদ্ধ হয়ে উঠি সেই পরিমাণে আমাদের ভিতরকার আসল সত্তা নিজেকে প্রকট করে; আমাদের সঙ্কল্প বাইরে-থেকে-আসা আভাসনগুলির মধ্যে কম জড়িত হয় বা আমাদের নিজস্ব বাহ্য মানসিক রচনাসমূহের মধ্যে কম আবদ্ধ থাকে। অহং-ভাব বর্জিত হলে, প্রকৃতি শুদ্ধ হলে ক্রিয়া আসবে অন্তঃপুরুষের নির্দেশ থেকে, চিৎপুরুষের গহন বা উচ্চস্তর থেকে আর না হয় প্রকাশ্যভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে ভগবানের দ্বারা যিনি সকল সময়ই গূঢ়ভাবে সমাসীন ছিলেন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে। যোগীর প্রতি গীতার পরম ও চরম বাণী এই যে তার কর্তব্য হল বিশ্বাস ও ক্রিয়ার সকল প্রচলিত সূত্র, আচরণের সকল নির্দিষ্ট বা বাহ্য বিধি, বহির্মুখী উপরভাসা প্রকৃতির সকল রচনা, "সর্বধর্ম" পরিত্যাগ ক'রে শরণ লওয়া একমাত্র ভগবানের। সে কামনা ও আসক্তি থেকে মুক্ত ও সর্বভূতের সঙ্গে এক হয়ে বাস করে অনন্ত সত্য ও বিশুদ্ধির মধ্যে ও কাজ করে তার আন্তর চেতনার গহনতম অন্তঃস্থল থেকে, নিয়ন্ত্রিত হয় তার অমর দিব্য ও সর্বোত্তম আত্মার দ্বারা; সেজন্য তার সকল কর্ম চালিত হবে ভিতরের পরম শক্তির দ্বারা আমাদের অন্তঃস্থ সেই মূল চিৎপুরুষ ও প্রকৃতির মধ্য দিয়ে যা জ্ঞাত হয়ে, যুদ্ধ ক'রে, কাজ ক'রে, ভালবেসে, সেবা ক'রে সর্বদাই দিব্য আর এসব কর্মের লক্ষ্য হল জগতের মধ্যে ভগবানের সার্থকতা, কালের মধ্যে সনাতনের বহিঃপ্রকাশ।

এই পূর্ণ কর্মযোগের চরম অবস্থা হল এমন এক দিব্য ক্রিয়া যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে, স্বচ্ছন্দে ও অভ্রান্তভাবে উদ্গত হয় ভগবানের সঙ্গে যুক্ত আমাদের চিন্ময় আত্মার আলোক ও শক্তি থেকে। মুক্তি সন্ধান করা আমাদের যে দরকার তার সবচেয়ে যথার্থ কারণ জগতের দুঃখতাপ থেকে এককভাবে মুক্ত হওয়া নয়, যদিও এই মুক্তিও আমাদের দেওয়া হবে, — আমাদের মুক্তি প্রচেষ্টার দরকার এইজন্য যে আমরা যেন এক হতে পারি ভগবান, পরাৎপর, সনাতনের সঙ্গে। সিদ্ধি, পরম অবস্থা, শুদ্ধি, জ্ঞান, ক্ষমতা, প্রেম ও সামর্থ্য যে কেন আমাদের সন্ধান করা দরকার তার যথার্থতম কারণ এই নয় যে আমরা ব্যক্তিগতভাবে দিব্য প্রকৃতি ভোগ করতে বা এমনকি দেবতাদের মত হতে পারব — যদিও সে ভোগও আমাদের হবে, তার সত্য কারণ এই যে এই মুক্তি ও সিদ্ধি আমাদের মধ্যে দিব্য সঙ্কল্প, প্রকৃতির মধ্যে আমাদের আত্মার শ্রেষ্ঠ সত্য, বিশ্বের মধ্যে উত্তরোত্তর অভিব্যক্তির চির-অভিপ্রেত লক্ষ্য। মুক্ত ও সিদ্ধ ও আনন্দময় দিব্য প্রকৃতিকে জীবের মধ্যে ব্যক্ত করা অবশ্য কর্তব্য যাতে জগতের মধ্যে এর অভিব্যক্তি সম্ভব হয়। এমনকি অবিদ্যার মধ্যেও জীব প্রকৃতপক্ষে বাস করে বিশ্বাত্মকের মধ্যে এবং বিশ্বজনীন উদ্দেশ্যের জন্য; কেননা তার অহং-এর সব উদ্দেশ্য ও কামনার পশ্চাতে ছোটার

কাজেও প্রকৃতি তাকে বাধ্য করে তার অহমাত্মক কাজ দিয়ে জগৎসমূহের মধ্যে প্রকৃতির কাজ ও উদ্দেশ্য পূরণে সহায়তা করতে; কিন্তু এই সহায়তা সে জেনেশুনে ইচ্ছা ক'রে করে না, আর যা করে তাও অসম্পূর্ণভাবে ও প্রকৃতির অর্ধবিকশিত ও অর্ধচেতন, তার অপূর্ণ ও অশুদ্ধ ক্রিয়াধারাতে। অহং থেকে নিস্তার পেয়ে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়াই একসাথে তার ব্যষ্টিত্বের মুক্তি ও পূর্ণতা; এইভাবে মুক্ত, শুদ্ধ ও সিদ্ধ হয়ে জীব, দিব্যপুরুষ সচেতনভাবে ও পুরোপুরি বাস করে — যেমন প্রথম থেকেই অভিপ্রেত ছিল, — বিশ্বগত ও বিশ্বাতীত ভগবানের মধ্যে ও তাঁর জন্য এবং বিশ্বের মধ্যে তাঁর সঙ্কল্পের জন্য।

জ্ঞানমার্গে আমাদের এমন এক স্থানে পৌঁছান সম্ভব যেখান থেকে আমরা সমর্থ হই ব্যক্তিসত্ত্ব ও বিশ্ব থেকে বাইরে লাফ দিয়ে সকল মনন ও সঙ্কল্প ও ক্রিয়া ও প্রকৃতির সকল ব্যাপার থেকে নিস্তার পেতে এবং শাশ্বতত্বের মধ্যে অঙ্গীভূত ও গৃহীত হয়ে আমরা সমর্থ হই মগ্ন হতে অতিস্থিতির মধ্যে; আর ভগবৎ-জ্ঞাতার পক্ষে বাধ্যতামূলক না হলেও তাই হতে পারে অন্তঃপুরুষের সিদ্ধান্ত, আমাদের অন্তঃস্থ আত্মার যাত্রার শেষ সীমা। ভক্তিমার্গে আমাদের পক্ষে সম্ভব ভক্তি ও আনন্দের তীব্রতার মধ্য দিয়ে পরম প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলিত হওয়া এবং একমাত্র তাঁতেই একাগ্রচিত্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে একই আনন্দধামে অন্তরঙ্গভাবে অনন্তকাল তাঁর সান্নিধ্যের উল্লাসে থাকা; তখন তাই হবে আমাদের সত্তার প্রচোদনা, এর আধ্যাত্মিক নির্বাচন। কিন্তু কর্মমার্গে অন্য এক সম্ভাবনার পথ খুলে যায়; কেননা এই পথ অনুসরণ ক'রে আমরা সনাতনের সঙ্গে প্রকৃতির বিধান ও সামর্থ্যে এক হয়ে সমর্থ হই মুক্তি ও সিদ্ধি পেতে; আমরা তাঁর সঙ্গে একাত্ম হতে পারি যেমন আমাদের আধ্যাত্মিক পাদে তেমন আমাদের সঙ্কল্প ও স্ফুরন্ত আত্মায়; এই মিলনের স্বাভাবিক পরিণতিই হবে এক দিব্য কর্ম পন্থা; আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার মধ্যে দিব্য জীবনযাপনই হবে এর আত্মপ্রকাশের মূর্তি। পূর্ণযোগে এই তিন পথ তাদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিশে এক হয় অথবা পরস্পরের মধ্য থেকে বার হয়; আত্মার উপর মনের আচ্ছাদন থেকে মুক্ত হয়ে আমরা বাস করি অতিস্থিতির মধ্যে, হৃদয়ের ভক্তির দ্বারা প্রবেশ করি পরম প্রেম ও আনন্দের একত্বের মধ্যে, আবার আমাদের সত্তার সকল শক্তি এক মহাশক্তিতে উন্নীত এবং আমাদের সঙ্কল্প ও সব কর্ম এক অখণ্ড সঙ্কল্প ও সামর্থ্যে সমর্পিত হওয়ার ফলে আমরা লাভ করি দিব্য প্রকৃতির স্ফুরন্ত সিদ্ধি।

ত্রয়োদশ অধ্যায়*

অতিমানস ও কর্মযোগ

পূর্ণযোগের সমগ্র ও চরম লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত এক অত্যাবশ্যকীয় ও অপরিহার্য উপাদান হল সমগ্র সত্তার পরিবর্তন এক পরতর আধ্যাত্মিক চেতনায় ও এক বৃহত্তর দিব্য সত্তায়। আমাদের সঙ্কল্প ও ক্রিয়ার বিভিন্ন অংশ, আমাদের জ্ঞানের বিভিন্ন অংশ, আমাদের চিন্তাশীল সত্তা, আমাদের ভাবাবেগময় সত্তা, আমাদের প্রাণের সত্তা, আমাদের সকল আত্মা ও প্রকৃতি — এ সকলেরই অবশ্য কর্তব্য হল ভগবানকে চাওয়া, অনন্তের মধ্যে প্রবেশ করা, সনাতনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। কিন্তু মানুষের বর্তমান প্রকৃতি সীমিত, বিভক্ত, অসম — তার পক্ষে সর্বাপেক্ষা সহজ হল তার সত্তার প্রবলতম অংশে একাগ্র হয়ে তার প্রকৃতির উপযোগী উন্নতির কোন নির্দিষ্ট ধারা অনুসরণ করা: একেবারে সোজা দিব্য আনন্ত্যের সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার ক্ষমতা আছে এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম। সুতরাং কারো কারোর পক্ষে যাত্রার সূচনা হিসেবে মননের একাগ্রতা বা ধ্যান বা মনের একমুখিতা নির্বাচন করা দরকার যাতে তারা নিজেদের মধ্যে সন্ধান পায় পরমাত্মার শাশ্বত সত্যতা; অন্যদের পক্ষে আরো সহজ হল হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ ক'রে সেখানে ভগবানের সনাতনের সাক্ষাৎ পাওয়া: এছাড়া অপর কিছু লোক আছে যারা প্রধানতঃ স্ফুরন্ত ও সক্রিয়, এদের পক্ষে উৎকৃষ্ট পথ হল সঙ্কল্পে নিজেদের কেন্দ্রীভূত ক'রে কর্মের মাধ্যমে তাদের সত্তাকে বৃহৎ করা। যিনি পরমাত্মা ও সকল কিছুর উৎস তাঁর আনন্ত্যের মধ্যে নিজেদের সঙ্কল্প সমর্পণ ক'রে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে, অন্তঃস্থ গূঢ় পরমদেবতার দ্বারা তাদের সকল কর্মে চালিত হয়ে, তাদের মনন, বেদনা, কার্যের সকল ক্রিয়াশক্তির অধীশ্বর ও প্রবর্তক হিসেবে বিশ্ব ক্রিয়ার অধীশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে, সত্তার বৃহত্ত্বের দ্বারা স্বার্থশূন্য ও বিশ্বজনীন হয়ে তারা কর্মের মাধ্যমে পেতে সমর্থ হয় এক আধ্যাত্মিক অবস্থার কিছু প্রাথমিক পরিপূর্ণতা। কিন্তু যেখান থেকেই সাধনা শুরু করা হ'ক না কেন প্রত্যেক সাধন পথকেই তার সঙ্কীর্ণতা থেকে বার হয়ে প্রবেশ করতে হবে বিশালতর রাজ্যে; অবশেষে একে অগ্রসর হতে হবে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান, ভাবাবেগ, স্ফুরন্ত ক্রিয়ার সঙ্কল্প এবং সত্তার ও সম্পূর্ণ প্রকৃতির সিদ্ধির সমগ্রতার মাধ্যমে। অতিমানসিক চেতনায়, অতিমানসিক জীবনস্তরে, এই অখণ্ডতা সাধন পরিপূর্ণ হয়, সেখানে জ্ঞান, সঙ্কল্প, ভাবাবেগ, আত্মা এবং স্ফুরন্ত প্রকৃতির সিদ্ধির প্রত্যেকটি তার নিজস্ব একান্তে ওঠে আর সকলে পরস্পরের সঙ্গে সম্পূর্ণ সুসঙ্গতভাবে সম্মিলিত হয়ে উত্থিত হয় দিব্য অখণ্ডতায়,

* গ্রন্থকার এই গ্রন্থের যে আরো বিস্তারসাধন আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু শেষ করেননি, তারই এক অংশ এটি।

দিব্য সিদ্ধিতে। কারণ অতিমানস এমন এক ঋতচেতনা যার মধ্যে দিব্য সদ্‌বস্তু সম্পূর্ণ ব্যক্ত, এটি আর অবিদ্যাকে যন্ত্র ক'রে কাজ করে না; সত্তার স্থিতির যে এক সত্য, একান্ত স্ফুরন্ত তা হয়ে ওঠে সত্তার ক্রিয়াশক্তি ও সক্রিয়তার এমন এক সত্যের মধ্যে যা স্বপ্রতিষ্ঠ ও সিদ্ধ। সেখানে প্রতি গতিবৃত্তিটি ভগবানের আত্ম-চিৎ সত্যের গতিবৃত্তি এবং প্রত্যেক অংশই সমগ্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ সুসমঞ্জস। এমনকি সর্বাপেক্ষা সীমিত ও সান্ত ক্রিয়াও ঋতচেতনার মধ্যে সনাতন ও অনন্তেরই গতি এবং সনাতন ও অনন্তের স্বগত একান্ততা ও সিদ্ধির অধিকারী। অতিমানসিক সত্যের মধ্যে উত্তরণের ফলে শুধু যে আমাদের আধ্যাত্মিক ও মৌলিক চেতনা সেই উচ্চতায় উন্নীত হয় তা নয়, এই আলোক ও সত্যের অবতরণও সাধিত হয় আমাদের সমগ্র সত্তার মধ্যে ও আমাদের প্রকৃতির সকল অংশের ভিতর। তখন সকল কিছুই হয়ে ওঠে দিব্য সত্যের অংশ, পরম মিলন ও একত্বের উপাদান ও উপায়; সুতরাং এই উত্তরণ ও অবতরণ যে এই যোগের এক চরম লক্ষ্য হবে তা নিশ্চিত।

আমাদের সত্তা ও সর্বসত্তার দিব্য সদ্‌বস্তুর সঙ্গে মিলনই যোগের একমাত্র মূল উদ্দেশ্য। এটি আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন; আমাদের স্মরণ রাখা চাই যে শুধু অতিমানসলাভের জন্য যোগসাধন করা হয় না, যোগসাধন করা হয় ভগবানের জন্য; আমরা যে অতিমানস চাই তা তার আনন্দ ও মহত্ত্বের জন্য নয়, আমরা অতিমানস চাই মিলনকে একান্ত ও সম্পূর্ণ করতে, তাকে অনুভব করতে, অধিগত ও স্ফুরন্ত করতে আমাদের সত্তার সকল রকম সম্ভবপর প্রণালীতে, তার উচ্চতম তীব্রতায়, বৃহত্তম প্রসারতায় এবং আমাদের প্রকৃতির প্রতি স্তরে, প্রতি বাঁকে, প্রতি কোণে ও নিভৃত স্থানে। এ মনে করা ভুল, যেমন অনেকে সহজেই মনে করতে পারে যে অতিমানসিক যোগের উদ্দেশ্য — অতিমানবত্বের বিশাল মহিমা লাভ, এক দিব্য সামর্থ্য ও মহত্ত্ব, এক স্ফীত ব্যষ্টি ব্যক্তিসত্ত্বের আত্মসার্থকতা লাভ। কিন্তু এই ভাবনা মিথ্যা ও বিপজ্জনক — বিপজ্জনক কারণ এর ফলে দেখা দিতে পারে আমাদের রাজসিক প্রাণিক মনের দর্প, দম্ভ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আর এদের দমন ও অতিক্রম না করা হলে আধ্যাত্মিক পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে; আর এ মিথ্যা এইজন্য যে এ হল এক অহমাত্মক ভাবনা অথচ অতিমানসিক রূপান্তরের প্রথম সর্তই হল অহং-নাশ। দৃঢ়সঙ্কল্প কর্মতৎপর লোকের সক্রিয় ও স্ফুরন্ত প্রকৃতির পক্ষে এ হল অতীব বিপজ্জনক কারণ এটি সহজেই ক্ষমতার সন্ধানে পথভ্রষ্ট হতে পারে। অতিমানসিক রূপান্তরের এক অনিবার্য ফল হল ক্ষমতা, সুষ্ঠু ক্রিয়ার জন্য তা থাকা চাই-ই: কিন্তু যা আসে আর প্রকৃতি ও জীবনকে অধিগত করে তা দিব্যশক্তি, পরম একের সামর্থ্য যা অধ্যাত্ম জীবের মাধ্যমে সক্রিয়; এ ব্যক্তিগত শক্তির মহোন্নতি নয় বা বিভক্ত মানসিক ও প্রাণিক অহং-এর চরম পূর্ণতার মুকুটমণি নয়। আত্মপূর্ণতা যোগের অন্যতম ফল বটে কিন্তু এর লক্ষ্য ব্যষ্টির মহত্ত্ব নয়। একমাত্র লক্ষ্য হল অধ্যাত্ম সিদ্ধি, প্রকৃত আত্মার সন্ধান লাভ এবং দিব্য চেতনা ও প্রকৃতি[১] লাভ ক'রে ভগবানের

[১] সাধর্ম্য মুক্তি

সঙ্গে মিলন। বাকী সব এরই মধ্যকার খুঁটিনাটি ও আনুষঙ্গিক অবস্থা। অহং-কেন্দ্রিক সংবেগ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ক্ষমতা ও মহত্ত্বের কামনা, আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রেরণা — এসবের স্থান এই মহত্তর চেতনায় নেই, আর এসব এমন এক অনতিক্রমণীয় বাধা যে তাতে অতিমানসিক রূপান্তরের ধারেও যাবার সম্ভাবনা থাকে না। মহত্তর আত্মাকে পেতে হলে পরিহার করা চাই নিজের ক্ষুদ্র অবর আত্মাকে। সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য হবে ভগবানের সঙ্গে মিলন; এমনকি নিজের সত্তার ও সর্বসত্তার সত্যের আবিষ্কার সেই সত্য ও এর মহত্তর চেতনার মধ্যে জীবন, প্রকৃতির সিদ্ধি — এইসব সেই প্রচেষ্টার স্বাভাবিক ফল মাত্র। এরা এই প্রচেষ্টার পরিপূর্ণ সিদ্ধির পক্ষে অপরিহার্য বিধান বটে কিন্তু এরা কেন্দ্রীয় লক্ষ্যের অংশ শুধু এই কারণে যে তারা এক প্রয়োজনীয় বিকাশ ও এক প্রধান ফল।

একথাও মনে রাখা চাই যে অতিমানসিক রূপান্তর দুরূহ, দূরবর্তী, এক চরম পর্যায়; মনে রাখতে হবে যে এ হল এক সুদূর দীর্ঘ পথের শেষ প্রান্ত; এটি যে কোন প্রাথমিক লক্ষ্য বা সতত দেখা যায় এমন কোন গন্তব্যস্থান বা অব্যবহিত উদ্দেশ্য তা হতে পারে না আর তা করাও উচিত নয়। কারণ একে পাবার সম্ভাবনা আমরা শুধু দেখতে পাই অনেক দুষ্কর আত্মজয় ও স্বোত্তরণের পর, প্রকৃতির দুরূহ আত্মবিবর্তনের বহু দীর্ঘ ও কষ্টকর অবস্থা পার হবার শেষে। সাধকের প্রথম দরকার এক আন্তর যৌগিক চেতনা লাভ এবং বিষয়সমূহ সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ দৃষ্টি, স্বাভাবিক গতিবিধি, জীবনের বিভিন্ন উদ্দেশ্যের স্থলে এর প্রতিষ্ঠা; চাই আমাদের সত্তার বর্তমান গঠনের সর্বত্রই এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। পরে আমাদের আরো গভীরে গিয়ে আবিষ্কার করা চাই আমাদের প্রচ্ছন্ন চৈত্য সত্তাকে আর দরকার তার আলোকে ও নিয়ন্ত্রণাধীনে আমাদের আন্তর ও বাহ্য অংশগুলিকে চৈত্যভাবাপন্ন করা এবং মন-প্রকৃতি, প্রাণ-প্রকৃতি, দেহ-প্রকৃতি ও আমাদের সকল মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক ক্রিয়া, অবস্থা ও গতিবিধিকে পরিণত করা অন্তঃপুরুষের সচেতন যন্ত্রে। পরে বা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কর্তব্য হল সত্তার সকল অংশকেই আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন করা, দিব্য আলোক, শক্তি, শুদ্ধতা, জ্ঞান, স্বাধীনতা ও প্রসারতার অবতরণের দ্বারা। ব্যক্তিগত মন, প্রাণ ও দৈহিকতার বন্ধন ভেঙে, অহংকে বিলীন করে বিশ্বচেতনায় প্রবেশ করা প্রয়োজন, আর প্রয়োজন আত্মার উপলব্ধি এবং এক আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন ও বিশ্বভাবাপন্ন মন ও হৃদয়, প্রাণশক্তি ও শারীরিক চেতনা অর্জন। কেবল তখনই অতিমানসিক চেতনায় প্রবেশের সম্ভাবনা দেখা দেয়, কিন্তু তখনো বাকী থাকে এক দুরূহ আরোহণ আর এর প্রতি পর্যায়ই এক পৃথক দুষ্কর সিদ্ধি। সত্তার দ্রুত ও একাগ্র সচেতন বিকাশই যোগ কিন্তু তা যত দ্রুতই হ'ক, এমনকি তটস্থ প্রকৃতিতে যা সাধন করতে বহু শতাব্দী বা সহস্র বৎসর, এমনকি শত শত জীবন লাগে, যোগ যদি তা সাধন করে মাত্র এক জীবনের মধ্যে, তাহলেও সকল বিবর্তনকেই চলতে হবে ক্রম অনুযায়ী; এমনকি গতির সর্বাপেক্ষা দ্রুত ও একাগ্র অবস্থাতেও ক্রমগুলি লোপ করা সম্ভব নয়, অথবা সম্ভব হয় না স্বাভাবিক ধারাকে উজানে নেওয়া, শেষকে শুরুর নিকট আনা। অতিব্যস্ত অজ্ঞানাচ্ছন্ন মন, অতি আগ্রহী শক্তি এই রীতির কথা সহজেই ভুলে যায়; অতিমানসকে অব্যবহিত লক্ষ্য করতে তারা বেগে এগিয়ে চলে আর আশা

করে তাকে কাঁটা দিয়ে নীচে টেনে আনবে অনন্তের উচ্চতম সব শীর্ষস্থান থেকে। এ যে শুধু এক অসঙ্গত আশা তা নয়, এতে বিপদও অনেক। কারণ প্রাণের কামনা এমন সব তামস বা প্রবল প্রাণিক শক্তিকে সক্রিয় করে তোলে যা তাকে অবিলম্বে তার অসম্ভব চাহিদা পূরণের আশ্বাস দেয়; এর সম্ভাব্য ফল হল নানাবিধ আত্মপ্রবঞ্চনার মধ্যে নিমজ্জন, তামসশক্তিবর্গের মিথ্যা ও প্রলোভনের নিকট আত্মসমর্পণ, অনন্যসাধারণ শক্তির জন্য অন্বেষণ; তাছাড়া সাধক দিব্য প্রকৃতি থেকে সরে আসতে পারে আসুরিক প্রকৃতিতে আর নিজেকে মারাত্মকভাবে স্ফীত ক'রে পরিণত হতে পারে এক অস্বাভাবিক, অমানুষিক ও অদিব্য অতিকায় অহং-এ। অবশ্য সত্তা ক্ষুদ্র হলে, প্রকৃতি দুর্বল ও অসমর্থ হলে এই রকম বড় দুর্দশা হয় না; তবে যে সব অবাঞ্ছিত ফল আসতে পারে তা হল ভারসাম্যের হানি, মনের শিথিলতা ও অযৌক্তিক হয়ে পড়া অথবা প্রাণের শিথিলতা ও তার পরিণামস্বরূপ নৈতিক স্খলন অথবা প্রকৃতি বিকৃত হয়ে একরকম অসুস্থ অস্বাভাবিক হয়ে পড়তে পারে। এই যোগে আত্মসার্থকতা বা আধ্যাত্মিক উপলব্ধির উপায় হিসেবে কোন প্রকার অস্বাভাবিকতার — এমনকি কোন উন্নত অস্বাভাবিকতারও স্থান নেই। এমনকি যুক্তি বুদ্ধির অতীত অনন্যসাধারণ অনুভূতি পেলেও স্থৈর্যের মধ্যে কোনরূপ বিক্ষোভ আসা উচিত নয়, সমগ্র চেতনাতেই — শিখর থেকে তলদেশ পর্যন্ত স্থৈর্যকে রাখা চাই অটল, অচল; যে চেতনায় অনুভূতি আসে তাতে রাখা চাই শান্ত সাম্য, দৃষ্টির অটুট স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা, এক প্রকার ঊর্ধ্বায়িত কাণ্ডজ্ঞান, আত্মসমালোচনার অব্যর্থ শক্তি, সব বিষয় যথাযথভাবে বিচার করার ক্ষমতা, তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন ও তাদের সম্বন্ধে দৃঢ় অন্তর্দৃষ্টি; সেখানে সর্বদা থাকা চাই তথ্যের উপর বিবেচনাপূর্ণ অধিকার ও এক উচ্চ আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন বাস্তববোধ। অযৌক্তিক বা অবযৌক্তিক হয়ে কেউ সাধারণ প্রকৃতি ছাড়িয়ে পরাপ্রকৃতিতে যেতে পারে না; সেখানে যেতে হলে যুক্তিশক্তির মধ্য দিয়ে মহত্তর যুক্তিশক্তির বৃহত্তর আলোকের প্রবেশ করা দরকার। এই মহত্তর যুক্তিশক্তি সাধারণ যুক্তিশক্তির মধ্যে নেমে এসে তাকে নিয়ে যায় উচ্চতর সব স্তরে, যদিও তখন তার সব সীমা ভেঙে যায়; এই যুক্তিশক্তি নষ্ট হয় না, বরং এটি পরিবর্তিত হয়ে পরিণত হয় স্বকীয় সত্যকার অসীম আত্মাতে, পরাপ্রকৃতির সমন্বয়সাধক সামর্থ্যে।

আর একটি প্রমাদ সম্বন্ধেও সতর্ক হওয়া দরকার, আর এ প্রমাদটি আমাদের মানসিকতা সহজেই করতে চায়; এই ভুল হল কোন উচ্চতর মধ্যবর্তী চেতনাকে বা এমন কি যে কোন রকমের অনন্যসাধারণ চেতনাকেই অতিমানস বলে গ্রহণ করা। অতিমানসলাভের জন্য মানুষী মনের সাধারণ গতিবৃত্তির ঊর্ধ্বে যাওয়াই যথেষ্ট নয়; কোন মহত্তর আলোক, মহত্তর শক্তি, মহত্তর আনন্দ পাওয়া বা মানুষের সাধারণ স্তরের উপরের জ্ঞান, দৃষ্টি, কার্যক্ষম সঙ্কল্পের সামর্থ্য বিকাশ করাও যথেষ্ট নয়। সকল আলোকই চিৎপুরুষের আলোক নয়, আর চিৎপুরুষের আলোক অতিমানসের আলোক হওয়ার সম্ভাবনা আরো কম; মন, প্রাণ, দেহেরও নিজের নিজের বিভিন্ন আলোক আছে, এগুলি এখনো প্রচ্ছন্ন কিন্তু এগুলিরও প্রেরণা ও শিক্ষা দেবার এবং উন্নতি আনার ক্ষমতা যথেষ্ট

আর তাদের কার্যসাধিকা শক্তিও প্রচুর। বিশ্ব চেতনার মধ্যে প্রবেশ করলে চেতনা ও শক্তিরও বিশাল প্রসারতা আসে। আন্তর মন, আন্তর প্রাণ, আন্তর শরীর, অধিচেতনার যে কোন স্তরে উন্মিষিত হলে জ্ঞান, ক্রিয়া বা অনুভূতির অস্বাভাবিক বা অনন্যসাধারণ শক্তির এমন এক সক্রিয়তা মুক্ত হতে পারে যেগুলিকে অবোধ মন সহজেই ভুল করতে পারে আধ্যাত্মিক প্রকাশ, চিদাবেশ, বোধি বলে। উপরের দিকে উচ্চতর মানস সত্তার বৃহত্তর ক্ষেত্রের মধ্যে উন্মীলন নিম্নে এতবেশী আলোক ও শক্তি আনতে পারে যে তাতে বোধিভাবাপন্ন মন ও প্রাণসামর্থ্যের তীব্র ক্রিয়া সৃষ্টি হয় অথবা এই সব ক্ষেত্রে আরোহণ করার ফলে এমন এক সত্যকার কিন্তু তখনও অসম্পূর্ণ আলোক আসতে পারে যা সহজেই অন্য বিষয়ের সঙ্গে মিশ্রিত হতে পারে; এই আলোকের উৎস আধ্যাত্মিক, যদিও এটি যখন নিম্নে অপরা প্রকৃতির মধ্যে আসে তখন তার সক্রিয়তায় এটি সর্বদা আধ্যাত্মিক থাকে না। কিন্তু এদের মধ্যে কোনটিই অতিমানসিক আলোক নয়, অতিমানসিক শক্তি নয়; তাকে দেখা ও ধরা কেবল তখনই সম্ভব যখন আমরা মনোময় সত্তার শিখরে পৌঁছে অধিমানসে প্রবেশ করে দণ্ডায়মান হই এক আধ্যাত্মিক জীবনের বৃহত্তর পরার্ধের সীমানায়। এই যে অবিদ্যা, অচিতি, আদি তমসাপূর্ণ নির্জ্ঞান যা এক অর্ধবিদ্যার দিকে ধীরে ধীরে জেগে উঠছে, এবং জড় প্রকৃতির ভিত্তি ও আমাদের মন ও প্রাণের সকল শক্তিকে ঘিরে থাকে, তাদের মধ্যে প্রবেশ করে ও তাদের প্রবলভাবে সীমাবদ্ধ করে — এইসব সেখানে একেবারে বিলুপ্ত হয়; কেননা সেখানে এক অবিমিশ্র ও অবিকৃত ঋতচেতনা সর্বসত্তার ধাতু, এর শুদ্ধ আধ্যাত্মিক বুনন। অবিদ্যার প্রবৃত্তির মধ্যে থাকাকালীন, তা সে অবিদ্যা-আলোকিত বা দীপ্ত হলেও — যদি আমরা ভাবি যে আমরা এইরকম অবস্থায় এসেছি তাহলে সে ভাবার অর্থ এই যে আমরা নিজেরাই উদ্যত হই দুর্দশাগ্রস্ত ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হতে, নয় সত্তার বিকাশ রুদ্ধ করতে। কারণ যদি আমরা কোন অবর অবস্থাকে অতিমানস বলে ভুল করি তাহলে আমাদের সেই সব বিপদের সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা আসে যেগুলি আমরা দেখেছি সিদ্ধি লাভের জন্য ধৃষ্ট অহং-এর অতিব্যস্ততার পরিণাম। আর যদি আমরা উচ্চতর অবস্থার কোন একটিকে সর্বোচ্চ বলে মনে করি তাহলে অনেক কিছু লাভ করলেও আমাদের সত্তার বৃহত্তর ও পূর্ণতর লক্ষ্য থেকে আমরা দূরে থাকব; কারণ সিদ্ধির সদৃশ কিছু পেয়েই আমরা সন্তুষ্ট থাকব, পরম রূপান্তর লাভ আর হবে না। এমনকি সম্পূর্ণ আন্তরমুক্তি এবং উচ্চ আধ্যাত্মিক চেতনাও সে পরম রূপান্তর নয়; কারণ সেই সিদ্ধি, সেই অবস্থা যা নিজের মধ্যে সিদ্ধ তা পেলেও তখনো আমাদের স্ফুরন্ত অংশগুলি তাদের কর্মে প্রবুদ্ধ ও আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন মনের অন্তর্গত থাকতে পারে এবং সেজন্য সকল মনের মত ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে এমনকি তার মহত্তর সামর্থ্য ও জ্ঞানেও আর তখনো সেগুলি থাকতে পারে সঙ্কীর্ণকারী আদি নির্জ্ঞানের দ্বারা আংশিক বা স্থানীয় তমসাচ্ছন্নতার বা কোন সীমাবদ্ধতার অধীন।

দ্বিতীয় খণ্ড

পূর্ণজ্ঞান যোগ

প্রথম অধ্যায়

জ্ঞানের বিষয়

সকল আধ্যাত্মিক অন্বেষণেরই গতি হল এমন এক জ্ঞানের বিষয়ের দিকে যার প্রতি সাধারণতঃ মানুষ মনের চক্ষু ফেরায় না; এ হল এমন কেউ বা এমন কিছু যা সনাতন, অনন্ত, পরমার্থসৎ যা আমাদের জানা সব ঐহিক বিষয় বা শক্তি নয়, যদিও তিনি বা এটি এসবের মধ্যে বা পশ্চাতে থাকতে পারেন অথবা তাদের উৎস বা স্রষ্টা হতে পারেন। এর লক্ষ্য — এমন এক জ্ঞানের অবস্থা যা দিয়ে আমরা এই সনাতন, অনন্ত ও পরমার্থসৎকে স্পর্শ করতে পারি, তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারি অথবা তাদাত্ম্যের দ্বারা তা জানতে পারি, এমন এক চেতনা যা ভাবনা ও রূপ ও বিষয়সমূহ সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ চেতনা থেকে ভিন্ন, এমন জ্ঞান যা আমরা যাকে জ্ঞান বলি তা নয় বরং এমন কিছু যা স্বাধিষ্ঠিত, চিরস্থায়ী ও অনন্ত। আর যেহেতু মানব মানসিক জীব সেহেতু এই অণ্বেষণ আরম্ভ হতে পারে, অথবা এমনকি আরম্ভ হতে বাধ্য আমাদের জ্ঞানের সাধারণ করণগুলি থেকে, অথচ তাহলেও একে সেসব ছাড়িয়ে যেতে হবেই এবং অতীন্দ্রিয় ও অতিমানসিক উপায় ও শক্তি ব্যবহার করতে হবে, কারণ এ এমন কিছু অন্বেষণ করছে যা নিজেই অতীন্দ্রিয় ও অতিমানসিক এবং মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের নাগালের বাইরে, যদিও মন ও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এর এক প্রাথমিক আভাস বা প্রতিফলিত মূর্তি আসা সম্ভব।

চিরাচরিত সাধনপন্থাগুলির মধ্যে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন তারা সকলেই এই বিশ্বাস বা বোধ নিয়ে চলে যে সনাতন ও পরমার্থসৎ শুধু হবে বা অন্ততঃ তার বাসভূমি হবে এক বিশ্বশূন্য অস্তিত্বের অথবা না হয় এক অসৎ-এর বিশ্বাতীত স্থিতি। সকল বিশ্বজনীন অস্তিত্ব অথবা যা কিছু আমরা অস্তিত্ব বলি সেসব এক অজ্ঞানতার অবস্থা। এমনকি সর্বোত্তম ব্যক্তিগত সিদ্ধি, এমনকি আনন্দময় বিশ্বজনীন অবস্থাও পরম অজ্ঞানতার বেশী কিছু নয়। যাসব ব্যক্তিগত, যাসব বিশ্বজনীন, সেসবকে নির্মমভাবে বর্জন করাই পরম সত্যান্বেষুর কর্তব্য। পরম শান্ত আত্মা, আর না হয় একান্ত অসৎই একমাত্র সত্য, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের একমাত্র বিষয়। যে জ্ঞানের অবস্থা, এই ঐহিক চেতনা ছাড়া যে চেতনা আমাদের লাভ করা চাই তা হল নির্বাণ, অহং-লয়, সকল মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক ক্রিয়ার নিবৃত্তি, যে কোন কর্মই হ'ক না কেন তাদের অবসান, এক পরম দীপ্ত শান্ত অবস্থা, এক নৈর্ব্যক্তিক আত্মনিমগ্ন ও অনির্বচনীয় শান্ত অবস্থার শুদ্ধ আনন্দ। আর এই সাধনের উপায় হল ধ্যান, অন্য সকল বিষয় বাদ দিয়ে তাতেই একাগ্রতা, আপন লক্ষ্য বিষয়ের মধ্যে মনের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি। তবে শুধু অন্বেষণের প্রথম অবস্থায় সাধকের শুদ্ধির জন্য এবং তাকে জ্ঞানের জন্য নৈতিকভাবে ও স্বভাবের দিক থেকে যোগ্য আধার করার উদ্দেশ্যে কর্ম করা যেতে পারে। এমনকি এই কর্মকেও নিবদ্ধ

রাখতে হবে হিন্দুশাস্ত্রের দ্বারা কঠোরভাবে বিহিত পূজার অনুষ্ঠান পালনে ও জীবনের নির্দিষ্ট কর্তব্যকার্যে অথবা বৌদ্ধ নিয়মানুযায়ী কর্ম করা চাই অষ্টবিধ মার্গ অনুযায়ী যাতে করুণাকর্মের পরম অনুশীলনের দ্বারা লাভ করা যায় অপরের মঙ্গলের মধ্যে কার্যতঃ আত্মনাশ। পরিশেষে যে কোন কঠোর ও শুদ্ধ জ্ঞানযোগে সকল কর্ম ত্যাগ করা চাই সম্পূর্ণ শান্ত অবস্থার জন্য। কর্ম মোক্ষলাভের সহায়ক মাত্র, এতে মোক্ষ আসে না। কর্মে সদা প্রবৃত্ত হয়ে থাকলে তা চরম উন্নতির পরিপন্থী হবে এবং আধ্যাত্মিক লক্ষ্যপ্রাপ্তির পক্ষে অলঙ্ঘনীয় বাধা হতে পারে। পরম শান্ত অবস্থা ক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত এবং যারা কর্মে প্রবৃত্ত থাকে তারা তা পায় না। আর এমনকি ভক্তি, প্রেম ও পূজা অপক্ক পুরুষের পক্ষে সংযমশিক্ষা, বড়জোর এরা অজ্ঞানতার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। কারণ এদের নিবেদন করা হয় এমন কিছুর উদ্দেশে যা আমাদের নিজেদের অপেক্ষা ভিন্ন, উচ্চতর ও মহত্তর; কিন্তু পরম জ্ঞানে এরকম কোন বিষয় থাকতে পারে না, যেহেতু হয় একই আত্মা আছে, না হয় আদৌ কোন আত্মাই নেই এবং সেহেতু হয় পূজা করার বা প্রেম ও ভক্তি নিবেদন করার কেউ নেই, না হয় তা নেবার কেউ নেই। তাদাত্ম্যের অথবা শূন্যতার একক চেতনার মধ্যে এমনকি মননক্রিয়াও লোপ পাবে এবং নিজের উপশমের দ্বারা সমগ্র প্রকৃতির উপশম আনবে।

এই শুদ্ধ জ্ঞানযোগ ধী-শক্তি দিয়ে আসে যদিও এর পরিণতি হল ধী-শক্তির ও এর সব ক্রিয়া প্রণালীর অতীত অবস্থা। আমাদের মধ্যে যে চিন্তক সে আমরা প্রাতিভাসিকরূপে যা সেই বাকী সব থেকে নিজেকে পৃথক করে, হৃদয় বর্জন করে, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়সমূহ থেকে সরে আসে, দেহ থেকে পৃথক হয় তবে যদি সে উপনীত হতে পারে সে নিজে স্বয়ং যা তার এবং তার ক্রিয়ার অতীত কিছুর মধ্যে স্বীয় সর্বব্যতিরেকী সার্থকতায়। এই মনোভাবের পিছনে যেমন এক সত্য আছে তেমন এক অনুভবও আছে যা মনে হয় একে সমর্থন করে। এমন এক স্বরূপ-অবস্থা আছে যার প্রকৃতি হল উপশম, এক পরম নীরবতা সেই পুরুষের মধ্যে যিনি নিজের আপন বিকাশ ও সব পরিবর্তনের অতীত, অক্ষর এবং সেহেতু সকল কাজকর্ম অপেক্ষা মহত্তর; বড়জোর তিনি এই সব কাজকর্মের এক সাক্ষী মাত্র। আর আমাদের চিত্তবৃত্তির ক্রমপরম্পরায় মননই একপ্রকার এই আত্মার সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী, অন্ততঃ এর সর্ব-বিৎ জ্ঞাতার বিভাবের নিকটতম যে জ্ঞাতা সকল ক্রিয়া অবলোকন করেন তবে সেসব থেকে সরে থাকতে সমর্থ। হৃদয়, সঙ্কল্প ও আমাদের অন্যান্য সব আন্তর শক্তি মূলতঃ সক্রিয়, স্বভাবতঃই তারা ক্রিয়ার দিকেই ফেরে, তাতেই তাদের সার্থকতা পায় — যদিও তাদেরও স্বতঃই একরকম উপশম পাওয়া সম্ভব তাদের বিভিন্ন কাজের তৃপ্তির পূর্ণতার দ্বারা, আর না হয় বিপরীত ধারায় অনবরত নৈরাশ্য ও অতৃপ্তিজনিত অবসাদের দ্বারা। মননও এক সক্রিয় শক্তি কিন্তু এর পক্ষে তার নিজের পছন্দ ও সঙ্কল্প দ্বারাই শান্ত হওয়া বেশী সহজ। এই যে নীরব সাক্ষী আত্মা আমাদের সকল ক্রিয়া অপেক্ষা পরতর, তাঁর প্রদীপ্ত বুদ্ধিগত বোধেই মনন আরো সহজে সন্তুষ্ট হয় এবং সেই নিশ্চল চিৎপুরুষকে একবার দেখা গেলে মনন

তার সত্য-অন্বেষণের ব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে মনে ক'রে নিজেই নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চল হয়ে উঠতে উদ্যত হয়। কারণ তার যা সবচেয়ে বিশিষ্ট বৃত্তি, তাতে কর্মে আগ্রহের সঙ্গে যোগ দিয়ে উদগ্র কর্মী হওয়া অপেক্ষা বিষয়সমূহের নিস্পৃহ সাক্ষী, বিচারক ও পর্যবেক্ষক হওয়াতেই তার প্রবণতা বেশী এবং অতি সহজেই সে সক্ষম হয় এক আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক শান্তি এবং বিচ্ছিন্ন বিবিক্ততালাভে। এবং যেহেতু মানুষ মনোময় জীব, সেহেতু তার অজ্ঞানতাকে প্রবুদ্ধ করার পক্ষে মনন বাস্তবিকপক্ষে তার উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ সাধন না হলেও, এটি অন্তত তার সব চেয়ে ধ্রুব, সাধারণ ও ফলপ্রসূ সাধন। তথ্যসংগ্রহ ও বিচার, ধ্যান, স্থির চিন্তন, বিষয়ে মনের তন্ময় অভিনিবেশ অর্থাৎ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন — এই সব বৃত্তি সম্পন্ন হওয়ায় মনন আমাদের অভীষ্ট প্রাপ্তির এক অপরিহার্য সহায় হিসেবে শ্রেষ্ঠ আর এর যে দাবী যে এ যাত্রার নেতা, একমাত্র উপযোগী দিশারী অথবা অন্ততঃ মন্দিরের সোজাসুজি সবচেয়ে আন্তর দ্বার, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

বস্তুতঃ মনন শুধু পথের খোঁজ দেয় ও অগ্রণী হয়ে চলে; এ পথের নির্দেশ দিতে পারে কিন্তু আদেশদানে বা কার্যসাধনে অক্ষম। যাত্রার নেতা, অভিযানের নায়ক, আমাদের যজ্ঞের প্রথম ও প্রাচীনতম পুরোহিত হল সঙ্কল্প, ক্রতু। হৃদয়ের যে অভিলাষ বা মনের যে দাবী বা অভিরুচিকে আমরা প্রায়ই সঙ্কল্প বলি, এই সঙ্কল্প তা নয়। এ হল আমাদের সত্তার ও সর্বসত্তার সেই অন্তরতম প্রবল চিৎ-শক্তি যা প্রায়ই প্রচ্ছন্ন থাকে — তপঃ, শক্তি, শ্রদ্ধা; এই আমাদের শ্রেষ্ঠ দিক্-নির্ণায়ক আর হৃদয় ও বুদ্ধি এর কম বেশী অন্ধ ও স্বয়ংক্রিয় ভৃত্য ও যন্ত্র। যে আত্মা শান্ত, নিষ্ক্রিয়, 'অলক্ষণ' (বিষয় ও ঘটনারহিত) তা প্রপঞ্চের অবলম্বন ও পশ্চাদ্‌ভূমি, পরমতম কিছুর নীরব প্রণালী বা সারবস্তু: এটি স্বয়ং একমাত্র পূর্ণ অস্তিত্ব নয়, স্বয়ং পরমতম নয়। সনাতন, পরমসৎই পরমেশ্বর, সর্বপ্রভব চিৎপুরুষ। তিনি সকল ক্রিয়ার ঊর্ধ্বে, এদের কোনটির দ্বারাই তিনি বদ্ধ নন, অথচ তিনিই সকল ক্রিয়ার উৎস, অনুমতি, উপাদান, নিমিত্ত, সামর্থ্য ও অধ্যক্ষ। এই পরমাত্মা থেকেই সকল কর্মের উদ্ভব, তাঁর দ্বারা এসব নির্ধারিত; সবই তাঁর ক্রিয়া, তাঁরই নিজের চিৎশক্তির ধারা, পরমাত্মার বিসদৃশ কিছুর নয়, এই চিৎপুরুষ ছাড়া অন্য কোন সামর্থ্যের নয়। এইসব কর্মের মধ্যে প্রকট হয় চিৎপুরুষের চিন্ময় সঙ্কল্প বা শক্তি, যে চিৎপুরুষ প্রবৃত্ত হন তাঁর সত্তাকে অনন্তভাবে ব্যক্ত করতে; এই সঙ্কল্প বা সামর্থ্য অজ্ঞানাচ্ছন্ন নয়, বরং নিজের আত্মজ্ঞানের সঙ্গে ও যা সব প্রকট করতে এটি প্রযুক্ত হয় সে সব সম্বন্ধে তার জ্ঞানের সঙ্গে এক। এবং আমাদের মধ্যে এই সামর্থ্যের এক নিগূঢ় আধ্যাত্মিক সঙ্কল্প ও অন্তঃপুরুষ-শ্রদ্ধা, আমাদের প্রকৃতির প্রধান প্রচ্ছন্ন শক্তিই ব্যষ্টিযন্ত্র, পরমসৎ-এর সঙ্গে এর যোগাযোগ আরো নিকটতর, আর একবার একে পেয়ে অধিগত করতে পারলে, এই হয় আমাদের ধ্রুবতর দিশারী ও প্রবুদ্ধকারক, কারণ এটি আমাদের বিভিন্ন মনন সামর্থ্যের সব উপরভাসা ক্রিয়াসমূহ অপেক্ষা গভীরতর এবং "একম্" ও পরমার্থসৎ-এর আরো অন্তরঙ্গভাবে নিকট। সেই সঙ্কল্পকে আমাদের নিজেদের মধ্যে ও বিশ্বের মধ্যে জানা এবং তার সব দিব্য পরিণতি পর্যন্ত তার অনুবর্তী হওয়া — তা সেসব

পরিণতি যাই হোক না কেন, — তাই জীবনসাধকের পক্ষে, যোগসাধকের পক্ষে যেমন কর্ম, তেমন জ্ঞানের জন্য, সম্ভবতঃ হবে, নিশ্চয়ই হতে হবে শ্রেষ্ঠ পন্থা, যথার্থতম পরাকাষ্ঠা।

মনন প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ বা বলবত্তম অংশ নয়, এমনকি এটি সত্যের একমাত্র বা গভীরতম নির্দেশকও নয়; সুতরাং অন্য সব বাদ দিয়ে শুধু নিজের তৃপ্তিসাধনে তৎপর হওয়া অথবা এই তৃপ্তিকেই পরমজ্ঞান প্রাপ্তির চিহ্ন বলে স্বীকার করা তার পক্ষে অনুচিত। কিছুদূর পর্যন্ত এ হল এখানে হৃদয়, প্রাণ ও অন্যান্য অঙ্গের দিশারীস্বরূপ, কিন্তু তাদের স্থলাভিষিক্ত হতে এ হল অক্ষম; নিজের চরম তৃপ্তি সাধন কি শুধু এই দেখাই তার কাজ নয়, তার আরো দেখা দরকার এইসব অন্যান্য অঙ্গের কিছু চরম তৃপ্তি আছে কিনা। যদি বিশ্বের মধ্যে পরম সঙ্কল্পের উদ্দেশ্য শুধু এই হ'ত যে এটি দৃষ্টিনাশক যন্ত্ররূপী অবরোধক মনের দ্বারা মিথ্যা ভাবনা ও ইন্দ্রিয়সংবিৎ-এর মাধ্যমে চালিত হয়ে অজ্ঞানের ক্রিয়ার মধ্যে অবতরণ করবে এবং সমভাবে আলোকদাতা পরিত্রাতারূপী মনের দ্বারা সঠিক মননের মাধ্যমে জ্ঞানোপশমের মধ্যে উত্তরণ করবে — আর এর বেশী অন্য উদ্দেশ্য না থাকত — তাহলে আচ্ছিন্ন মননের এই সর্বব্যতিরেকী পন্থা সঙ্গত হ'ত। কিন্তু সম্ভবতঃ জগতে এমন এক লক্ষ্য আছে যা এটি অপেক্ষা কম অযৌক্তিক ও কম উদ্দেশ্যহীন, পরমার্থসৎ-এর দিকে এমন এক সংবেগ আছে যা কম শুষ্ক ও কম আচ্ছিন্ন, জগতের এমন এক সত্য আছে যা আরো বৃহৎ ও জটিল, অনন্তের এমন উচ্চতা আছে যা আরো অন্তহীনভাবে সমৃদ্ধ। একথা নিশ্চিত যে প্রাচীন দর্শনের মত আচ্ছিন্ন তর্কশাস্ত্রের ধ্রুব পরিণতি হল এক অনন্তশূন্য "নাস্তি" অথবা ঐরকম সমানই রিক্ত অনন্ত "অস্তি" কারণ আচ্ছিন্ন হওয়ায় এর টান সর্বদাই এক আচ্ছিন্ন প্রত্যয়ের দিকে, আর শুধু এই দুটি আচ্ছিন্ন প্রত্যয়ই সম্পূর্ণ অনপেক্ষ। কিন্তু সঙ্কীর্ণ ও অযোগ্য মানবমনের ধৃষ্ট আচ্ছিন্ন যুক্তি অপেক্ষা যে বাস্তব প্রজ্ঞা অনন্ত অনুভূতির বর্ধিষ্ণু সমৃদ্ধির ফলস্বরূপ এবং সর্বদা গভীর হতে থাকে তাই সম্ভবতঃ দিব্য অতিমানবীয় জ্ঞানের চাবিকাঠি। মননের মতই হৃদয়, সঙ্কল্প, প্রাণ এবং এমনকি দেহও দিব্য চিন্ময় পুরুষের অংশ এবং মহান্ তাৎপর্যের নির্দেশক। এদেরও এমন সব সামর্থ্য আছে যাদের দ্বারা অন্তঃপুরুষ ফিরে পেতে পারে তার সম্পূর্ণ আত্মসংবিৎ অথবা তাদের এমন সব সাধন আছে যাদের দ্বারা অন্তঃপুরুষ তা উপভোগ করতে পারে। সম্ভবতঃ পরম সঙ্কল্পের উদ্দেশ্য এমন এক চরম পরিণতি যাতে সমগ্র সত্তারই তার দিব্য পরিতৃপ্তিলাভ অভিপ্রেত, উচ্চ শিখরসমূহ আলোকিত করবে গভীর তলদেশ, আর পরম অতিচেতনার স্পর্শে জড়ীয় নিশ্চেতন নিজের কাছে প্রকাশিত হবে ভগবানরূপে।

চিরাচরিত জ্ঞানমার্গের সাধনা চলে বর্জনের পথে; শান্ত পরমাত্মা বা পরম শূন্য বা অলক্ষিত পরমার্থসৎ-এ নিমজ্জিত হবার উদ্দেশ্যে পর পর বর্জন করা হয় দেহ, প্রাণ, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, হৃদয় ও এমনকি মননকেও। পূর্ণ জ্ঞানমার্গে ধরে নেওয়া হয় যে এক সর্বাঙ্গীণ আত্মসার্থকতা লাভই আমাদের নিয়তি আর যে একটিমাত্র বিষয় বাদ দিতে হবে

তা হল আমাদের নিজেদের অচেতনতা, অবিদ্যা এবং অবিদ্যার সব ফল। অহংরূপী সত্তার অসত্যতা বাদ দাও; তাহলে আমাদের মধ্যে প্রকট হবে আমাদের সত্যকার সত্তা। যে প্রাণকে দেখা যায় শুধু প্রাণিক লালসা ও দৈহিক জীবনের যান্ত্রিক আবর্তনরূপে তার অসত্যতা বাদ দাও, তখন আবির্ভূত হবে পরমেশ্বরের সামর্থ্য ও অনন্তের হর্ষের মধ্যে অবস্থিত আমাদের সত্যকার প্রাণ। জড়ীয় দৃশ্য ও দ্বন্দ্বাত্মক সব ইন্দ্রিয়সংবিৎ-এর বশীভূত ইন্দ্রিয়গ্রামের অসত্যতা দূর কর; আমাদের মধ্যে এক মহত্তর ইন্দ্রিয় আছে যা ঐসব ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উন্মুক্ত হতে পারে বিষয়সমূহের মধ্যস্থিত ভগবানের কাছে এবং তাঁর কাছে উত্তরও দিতে পারে দিব্যভাবে। নানাবিধ পঙ্কিল উগ্র ভাবাবেগ ও কামনা এবং দ্বন্দ্বাত্মক ভাবাবেগযুক্ত হৃদয়ের অসত্যতা দূর কর; আমাদের মধ্যে উন্মুক্ত হতে পারে এক গভীরতর হৃদয় যাতে আছে সর্ববিষয়ের প্রতি তার দিব্য প্রেম ও পরম অনন্তের সাড়ার জন্য তার অসীম তীব্র আবেগ ও আকূতি। দূর কর মননের অসত্যতা, তার সব অপূর্ণ মানসিক রচনার, তার উদ্ধত স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতির, তার সীমিত ও অন্যব্যতিরেকী একাগ্রতার অসত্যতা; পিছনে আছে বিদ্যার এক মহত্তর শক্তি যা উন্মুক্ত হতে পারে ভগবান ও অন্তঃপুরুষ এবং প্রকৃতি ও বিশ্বের যথার্থ সত্যের কাছে। সর্বাঙ্গীণ আত্মসার্থকতার অর্থ — হৃদয়ের বিভিন্ন অনুভূতির জন্য, প্রেম, হর্ষ, ভক্তি ও পূজার প্রতি তার সহজপ্রবৃত্তির জন্য পরমার্থতা, পরাকাষ্ঠা; ইন্দ্রিয়গ্রামের জন্য বিষয়সমূহের বিভিন্ন রূপের মধ্যে দিব্য সৌন্দর্য, শুভ ও আনন্দের অন্বেষণের জন্য পরমার্থতা, পরাকাষ্ঠা; প্রাণের জন্য, কর্ম এবং দিব্য সামর্থ্য, প্রভুত্ব ও সিদ্ধির জন্য তার যে প্রচেষ্টা তার জন্য পরমার্থতা, পরাকাষ্ঠা; মননের জন্য, সত্য ও আলোক এবং দিব্য প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের প্রতি তার বুভুক্ষার জন্য তার সীমার অতীত পরমার্থতা, পরাকাষ্ঠা। যাদের থেকে এইসব পরিত্যাগ করা হয় তাদের থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন কিছু যে আমাদের প্রকৃতির মধ্যে এইসব বিষয়ের পরিণাম তা নয়, বরং তাদের পরিণাম এমন কিছু পরম বস্তু যার মধ্যে তারা অবিলম্বে নিজেদের অতিক্রম করে লাভ করে তাদের নিজ নিজ পরমার্থতা ও অনন্ততা, তাদের অপরিমেয় সব সৌষম্য।

চিরাচরিত জ্ঞানমার্গের পিছনে এবং এর এই যে বর্জন ও অপসরণের মনন প্রণালী তার সমর্থনে আছে এক প্রবল শক্তিশালী অধ্যাত্ম অনুভূতি। যারা সক্রিয় মনঃস্তরের কিছু সীমা পার হয়ে দিগন্তহীন আন্তর দেশে প্রবেশ করেছে, তাদের সকলের কাছেই এই সাধারণ অনুভূতি গভীর, তীব্র ও সুনিশ্চিত — এই হল মুক্তির মহান্ অনুভব — আমাদের ভেতর আছে এমন কিছুর চেতনা যা বিশ্ব এবং তার সকল রূপ, আগ্রহ, লক্ষ্য, প্রসঙ্গ, ঘটনার পিছনে ও বাইরে অবস্থিত, এবং যা শান্ত, নির্লিপ্ত, নিস্পৃহ, অসীম, নিশ্চল, মুক্ত, এক ঊর্ধ্বদৃষ্টি উপরিস্থ কিছুর প্রতি যা অনির্বচনীয় ও "অগ্রাহ্য" এবং যার মধ্যে আমরা প্রবেশ করতে সক্ষম আমাদের ব্যক্তিসত্ত্ব লোপ ক'রে, এক সর্বব্যাপী নিত্য সাক্ষীপুরুষের সান্নিধ্য, এক আনন্ত্য বা কালাতীততার বোধ যা আমাদের সকল অস্তিত্বের মহনীয় অস্বীকৃতি হতে নিম্নে আমাদের দিকে অবলোকন করে এবং যা একাই একমাত্র

সদ্‌বস্তু। যে আধ্যাত্মিক মন তার নিজের সত্তার অতীতে দৃঢ়ভাবে তাকায় তার সর্বোচ্চ উর্ধ্বায়ন এই অনুভূতি। যে এই মুক্তির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়নি সে মন ও তার সব পাশ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে অক্ষম, তবে কেউই চিরদিনের মতো এই অনুভূতির মধ্যেই অবস্থান করতে বাধ্য নয়। যদিও এই অনুভূতি বিশাল তবু এ হল মনের নিজের ও তার সকল ভাবনার অতীত কিছু সম্বন্ধে শুধু মনের এক অতি প্রবল অনুভূতি। এ হল এক পরম অসদর্থক অনুভূতি কিন্তু এরও উজানে আছে এক অনন্ত চেতনার, এক অসীম জ্ঞানের, এক সদর্থক একান্ত উপস্থিতির বিপুল আলোক।

আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিষয় হল পরমসৎ, ভগবান অনন্ত, পরমার্থসৎ। এই পরমসৎ-এর সম্বন্ধ আছে আমাদের ব্যষ্টি সত্তার সঙ্গে এবং বিশ্বেরও সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ আছে আর অন্তঃপুরুষ ও বিশ্ব — উভয়েরই অতীত তিনি। বিশ্ব বা জীব — কেউই যথার্থতঃ তা নয় যা তারা প্রতীয়মান হয় কারণ এদের সম্বন্ধে আমাদের মন ও আমাদের সব ইন্দ্রিয় যে বিবরণ দেয়, সে বিবরণ — যতদিন মন ও ইন্দ্রিয় পরতর অতিমানসিক ও অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের শক্তির দ্বারা প্রবুদ্ধ না হয় ততদিন — এক মিথ্যা বিবরণ, এক অপূর্ণ রচনা এবং এক ক্ষীণ ও প্রমাদপূর্ণ সঙ্কেত। অথচ তবুও বিশ্ব ও জীব যা প্রতীয়মান হয়, তা তারা বস্তুতঃ যা তারই এক সঙ্কেত, এমন এক সঙ্কেত যা নিজেকে ছাড়িয়ে নির্দেশ করে তার পশ্চাতে অবস্থিত সদ্‌বস্তুকে। আমাদের মন ও ইন্দ্রিয় এর যে অর্থ আমাদের দেয় তা সংশোধন করেই সত্য উদিত হয়; এর প্রথম পর্যায় আসে উচ্চতর বুদ্ধির ক্রিয়ার দ্বারা যাতে অজ্ঞানাচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়মানসের ও সীমিত স্থূল বুদ্ধির সিদ্ধান্তগুলি যথাসম্ভব আলোকিত ও সংশোধিত হয়; এই হল সকল মানবীয় জ্ঞান ও প্রাকৃতবিজ্ঞানের পদ্ধতি। কিন্তু একে ছাড়িয়ে এমন এক জ্ঞান, এক ঋতচেতনা আছে, যা আমাদের বুদ্ধিশক্তির অতীত এবং আমাদের নিয়ে যায় সত্যকার আলোকের মধ্যে; এই আলোকেরই এক বক্রীভূত রশ্মি আমাদের বুদ্ধিশক্তি। সেখানে সাত্ত্বিকী বুদ্ধির আচ্ছিন্ন সংজ্ঞাগুলি ও মনের সব রচনা অন্তর্হিত হয়, অথবা পরিণত হয় অন্তঃপুরুষের বাস্তব দৃষ্টিতে এবং আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিপুল যথার্থতায়। এই জ্ঞান অনপেক্ষ সনাতনের দিকে ফিরে অন্তঃপুরুষ ও বিশ্বের দৃষ্টি হারাতে পারে; কিন্তু এটি ঐ সৃষ্টিকে দেখতেও পারে সনাতন থেকে। যখন তা-ই করা হয়, তখন আমরা দেখি যে মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের অবিদ্যা ও মানবজীবনের আপাত সব বিফলতা চিন্ময় পুরুষের নিরর্থক আমোদ ভ্রমণ নয়, কোন অলস ভ্রম নয়। তারা এখানে পরিকল্পিত হয়েছিল অনন্ত থেকে আসা পরম পুরুষের আত্ম-অভিব্যক্তির বন্ধুর ভূমি হিসেবে, বিশ্বের সংজ্ঞায় তার আত্মবিকাশ ও আত্ম-অধিকারের জড়ীয় ভিত্তি হিসেবে। একথা সত্য যে নিজেদের মধ্যে তাদের এবং এখানে যা সব আছে সেসবেরও কোন তাৎপর্য নেই, আর তাদের জন্য পৃথক তাৎপর্য রচনা করার অর্থ ভ্রান্তির মধ্যে, মায়ার মধ্যে বাস করা; কিন্তু পরমসৎ-এর মধ্যে তাদের এক পরম তাৎপর্য আছে, পরমার্থসৎ-এর মধ্যে তাদের এক একান্ত সামর্থ্য আছে এবং তা-ই নির্দিষ্ট করে তাদের বর্তমান আপেক্ষিক অর্থ, আর এদের যুক্ত করে সেই পরমসত্যের সঙ্গে। এই যে অনুভূতি সকল

কিছুকে যুক্ত করে, এই হল গভীরতম অখণ্ড ও সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ আত্মজ্ঞান ও জগৎ-জ্ঞানের ভিত্তি।

জীবের সঙ্গে সম্বন্ধে, পরমসৎ আমাদের আপন সত্যকার ও পরতম আত্মা, আমরা চরম অবস্থায় স্বরূপতঃ যা তা-ই পরমসৎ, আমাদের ব্যক্ত প্রকৃতিতে আমরা তাঁরই অন্তর্ভুক্ত। যেমন চিরাচরিত জ্ঞানমার্গ সকল ভ্রান্তিজনক প্রাতিভাসিক বর্জন করে, তেমন যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান আমাদের অন্তঃস্থ প্রকৃত আত্মাকে পেতে প্রবৃত্ত হয় তারও বর্জন করা চাই সকল ভ্রান্তিজনক প্রাতিভাসিক। এর আবিষ্কার করা চাই যে দেহ আমাদের আত্মা নয়, আমাদের জীবনের প্রতিষ্ঠা নয়; এ হল অনন্তের এক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ। যে অনুভূতিতে জড়ই জগতের একমাত্র প্রতিষ্ঠা, স্থূল মস্তিষ্ক ও সব স্নায়ু, ও কোষ ও পরমাণু আমাদের মধ্যে সকল বিষয়ের একমাত্র সত্য, সেই যে অনুভূতি জড়বাদের গুরুভার অনুপযুক্ত ভিত্তি তা ভ্রমপূর্ণ, এ হল এক অর্ধ-দৃষ্টি যাকে নেওয়া হয় সমগ্র দৃষ্টি ব'লে, বিষয়সমূহের অন্ধকারময় তলদেশ বা ছায়া যাকে ভুল ক'রে মনে হয় জ্যোতির্ময় সারবস্তু ব'লে, শূন্যের কার্যকরী আকার পূর্ণাঙ্কের বদলে। জড়বাদীর ভাবনায় সৃষ্টিকে ভুল করা হয় সৃজনশীল সামর্থ্য ব'লে, প্রকাশের উপায়কে ভুল করা হয় সেই তৎস্বরূপ ব'লে যিনি প্রকাশিত হচ্ছেন ও প্রকাশ করছেন। এই যে জড় ও আমাদের স্থূল মস্তিষ্ক ও স্নায়ুজাল ও দেহ — এসব এমন প্রাণিক শক্তির এক ক্রিয়ার ক্ষেত্র ও ভিত্তি যার কাজ হল আত্মাকে যুক্ত করা এর সব কাজের রূপের সঙ্গে এবং যা তাদের রক্ষা করে তার প্রত্যক্ষ স্ফুরত্তার দ্বারা। জড়ীয় সব গতিবৃত্তি এক বাহ্য সঙ্কেত, যার দ্বারা অন্তঃপুরুষ অনন্তের কতকগুলি সত্য সম্বন্ধে তার সব বোধকে প্রকাশ করে এবং সে সবকে কার্যকরী করে ধাতুর সংজ্ঞায়। এইসব বিষয় এক ভাষা, সঙ্কেত, চিত্রলিপি, প্রতীকপদ্ধতি, যেসব বিষয়ের কথা তারা জানায় তাদের গভীরতম সত্যতম অর্থ তারা নিজেরা নয়।

সেইরকম প্রাণতত্ত্বও অর্থাৎ প্রাণশক্তি, মস্তিষ্কে, স্নায়ুজালে ও দেহে সক্রিয় শক্তিও আমাদের আত্মা নয়, প্রাণ অনন্তের এক সামর্থ্য কিন্তু সমগ্র সামর্থ্য নয়। এক অনুভূতি আছে যাতে প্রাণশক্তিই জড়কে করণরূপে ব্যবহার করে এবং সকল বিষয়ের প্রতিষ্ঠা, উৎস ও সত্যকার সারাংশ তা আর এই হল প্রাণাত্মবাদের কম্পমান অস্থির ভিত্তি, কিন্তু এ অনুভূতিও ভ্রমপূর্ণ, এক অর্ধ-দৃষ্টি যাকে নেওয়া হয় সমগ্র দৃষ্টি ব'লে, এ হল নিকটস্থ তীরের উপর জোয়ারের প্লাবন যাকে ভুল করা হয় সমগ্র মহাসাগর ও তার বারিরাশি ব'লে। প্রাণবাদীর ভাবনায় এক শক্তিশালী কিন্তু বাহ্য কিছুকে নেওয়া হয় সার হিসেবে। প্রাণশক্তি এমন এক চেতনার স্ফুরন্তভাব যা একে অতিক্রম করে যায়। ঐ চেতনাকে অনুভব করা হয়, এটি কার্যও করে কিন্তু যতক্ষণ না আমরা উপনীত হই এর উচ্চতর সংজ্ঞায় অর্থাৎ মনে যা বর্তমানে আমাদের সর্বোচ্চ অবস্থা ততক্ষণ এটি আমাদের বুদ্ধিতে সত্য হিসাবে সিদ্ধ হয় না। এখানে মনে হয় মন যেন প্রাণের এক সৃষ্টি কিন্তু বস্তুতঃ তা প্রাণেরই এবং এর পশ্চাতে যা আছে তার এক উত্তর তাৎপর্য কিন্তু অন্তিম তাৎপর্য নয় এবং তার রহস্যের এক আরো সচেতন রূপায়ণ; মন প্রাণের বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং তা

এমন কিছুর বহিঃপ্রকাশ যার আরো কম দীপ্ত বহিঃপ্রকাশ প্রাণ স্বয়ং।

কিন্তু মনও অর্থাৎ আমাদের মানসিকতা, আমাদের চিন্তার ও বোধের অংশও আমাদের আত্মা নয়, এটি 'তৎ' নয়, আদিও নয়, অন্তও নয়, এ হল অনন্ত থেকে নিক্ষিপ্ত এক অর্ধ-আলোক। যে অনুভূতিতে মন সকল রূপ ও বিষয়ের স্রষ্টা এবং এইসব রূপ ও বিষয় শুধু মনেই অবস্থিত, যা বিজ্ঞানবাদের শীর্ণ সূক্ষ্মভিত্তি তা-ও এক ভ্রম, এক অর্ধ-দৃষ্টি যাকে সমগ্র বলে নেওয়া হয়, এক ম্লান বক্রীভূত আলো যাকে ভাবা হয় সূর্যের জ্বলন্ত দেহ ও তার জ্যোতি ব'লে। এই বিজ্ঞানবাদীর দৃষ্টিও সত্তার স্বরূপে উপনীত হয় না, এমনকি শুধু প্রকৃতির এক অবর ক্রিয়া ছাড়া তাকে স্পর্শও করে না। মন এমন এক চিন্ময় সত্তার অস্পষ্ট বাহ্য উপচ্ছায়া যা মানসিকতার মধ্যে আটক থাকে না, তাকে ছাড়িয়ে যায়। যে চিরাচরিত জ্ঞানমার্গের পদ্ধতিতে এই সবকিছু বর্জন করা হয় তাতে এমন এক শুদ্ধ চিন্ময় সত্তার ভাবনা ও উপলব্ধি আসে যা আত্ম-বিৎ, আত্ম-আনন্দময়, মন ও প্রাণ ও দেহের অনপেক্ষ, আর এর চরম সদর্থক উপলব্ধিতে এ হল আত্মা, আমাদের অস্তিত্বের মূল ও স্বরূপপ্রকৃতি। অবশেষে এখানেই পাওয়া যায় এমন কিছু যা কেন্দ্রীয়ভাবে সত্য কিন্তু এই সত্যে পৌঁছবার তাড়ায় এই জ্ঞান ধরে নেয় যে চিন্তাশীল মন ও সর্বোত্তমের মাঝখানে কিছু নেই, "বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ" আর সমাধিতে তার চোখ বুজে মাঝখানে যাসব থাকে সেগুলির মধ্য দিয়ে ছুটে চলে যেতে চেষ্টা করে এমনকি তাকায়ও না পরম চিৎপুরুষের এইসব মহান্ জ্যোতির্ময় রাজ্যের দিকে। হয়ত তা তার লক্ষ্যে পৌঁছায় কিন্তু তা শুধু অনন্তের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ার জন্য। অথবা যদি তা জেগে থাকে, সে জাগা পরমসৎ-এর সর্বোত্তম অনুভূতির মধ্যে যার মধ্যে আত্মবিনাশী মন প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু পরাৎপরের মধ্যে নয়। মন আত্মাকে জানতে পারে শুধু এক মানসিকভাবাপন্ন আধ্যাত্মিক শীর্ণতার মধ্যে, জানে শুধু মনে প্রতিফলিত সচ্চিদানন্দকে। সর্বোত্তম সত্য, অখণ্ড পূর্ণ আত্মজ্ঞান পাবার উপায় এইভাবে নিজেকে অন্ধকারে পরমার্থসৎ-এর মধ্যে লাফ দেওয়া নয়, তা পেতে হলে ধৈর্যের সঙ্গে যেতে হবে মন ছাড়িয়ে ঋতচেতনার মধ্যে যেখানে অনন্তকে জানা যাবে, অনুভব করা যাবে, দেখা যাবে, উপলব্ধি করা যাবে তার অফুরন্ত ঐশ্বর্যের পরিপূর্ণতায়। আর সেখানে আমরা আবিষ্কার করি যে আমরা যে আত্মা তা শুধু এক স্থিতিক শীর্ণ শূন্য আত্মা নয়, তা হল এক মহান্ স্ফুরন্ত চিৎপুরুষও যা ব্যষ্টিগত, বিশ্বাত্মক ও বিশ্বাতীত। ঐ আত্মা ও চিৎপুরুষকে মনের আচ্ছিন্ন সামান্য ভাবনার দ্বারা প্রকাশ করা যায় না; ঋষি ও মরমীয়াদের সকল আন্তর উচ্ছ্বসিত বর্ণনাও তার ভাণ্ডার ও মহিমা শেষ করতে অক্ষম।

বিশ্বের সঙ্গে সম্বন্ধে পরমসৎ হলেন ব্রহ্ম, একমাত্র সদ্‌বস্তু যা শুধু যে বিশ্বের সকল ভাবনা ও শক্তি ও রূপের আধ্যাত্মিক, জড়ীয় ও চিন্ময় ধাতু তা নয় বরং তাদের মূল, আশ্রয় ও অধিকারী বিরাট পুরুষ ও বিশ্বাতীত পুরুষ। বিশ্বকে আমরা যেসব চরম সংজ্ঞায় আনতে পারি যেমন "শক্তি ও জড়", "নাম ও রূপ", "পুরুষ ও প্রকৃতি", তবু বিশ্ব বস্তুতঃ স্বরূপে বা প্রকৃতিতে যা তা পুরোপুরি নয়। যেমন আমরা যাকিছু সে সবই এমন এক

পরমাত্মার খেলা ও রূপ, মানসিক, চৈত্য, প্রাণিক ও শারীরিক বহিঃপ্রকাশ যা মন ও প্রাণ ও শরীরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, তেমন বিশ্বও এমন এক পরম সন্মাত্রের খেলা ও রূপ, জাগতিক পুরুষ-প্রকাশ ও প্রকৃতি-প্রকাশ যা শক্তি ও জড়ের অনপেক্ষ, ভাবনা ও নাম ও রূপের অনপেক্ষ, পুরুষ ও প্রকৃতির মৌলিক পার্থক্যেরও অনপেক্ষ। আমাদের পরমাত্মা এবং এই পরমসন্মাত্র যা এই বিশ্ব হয়েছে — এরা একই চিৎপুরুষ, একই আত্মা ও একই সত্তা। জীব প্রকৃতিতে বিশ্বাত্মক পুরুষের এক প্রকাশ, আর চিৎপুরুষে সে অতিস্থিতির এক পুরঃক্ষেপ। কারণ যদি সে তার আত্মার সন্ধান পায় সে এও দেখে যে তার নিজের সত্যকার আত্মা এই প্রাকৃত ব্যক্তিসত্ত্ব নয়, এই সৃষ্ট ব্যষ্টিত্ব নয়, বরং এ হল অপর সকলের ও প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্বন্ধে এক বিশ্বজনীন সত্তা, আবার তার উর্ধ্বগামী সংজ্ঞায় পরম সর্বাতিরিক্ত চিৎপুরুষের অংশ বা জীবন্ত অগ্রভাগ।

এই পরম সন্মাত্র জীব বা বিশ্বের অনপেক্ষ। সুতরাং এক অধ্যাত্মজ্ঞানে পরম চিৎপুরুষের এই দুই শক্তিকে অতিক্রম বা এমনকি বাদ দিয়ে এমন কিছুর ভাবনায় উপনীত হওয়া যায় যা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাতীত, অব্যপদেশ্য ও মনের পক্ষে অজ্ঞেয়, শুদ্ধ পরমার্থসৎ। চিরাচরিত জ্ঞানমার্গ জীব ও বিশ্বকে বাদ দেয়। এটি যে পরমার্থসৎকে অন্বেষণ করে তা অলক্ষণ, অনির্দেশ্য, অসঙ্গ, এ নয়, এ নয়, নেতি নেতি। আবার তবু আমরা এর সম্বন্ধে বলতে পারি যে এ হল এক, এ হল অনন্ত, এ হল অনির্বচনীয় আনন্দ, চিৎ, সৎ। যদিও মনের কাছে অজ্ঞেয় তবুও আমরা আমাদের ব্যষ্টিসত্তা এবং বিশ্বের সব নাম ও রূপের মধ্য দিয়ে পরমাত্মার অর্থাৎ ব্রহ্মের উপলব্ধির দিকে অগ্রসর হতে পারি, আর এই আত্মার উপলব্ধির দ্বারা আমরা এই শুদ্ধ পরমার্থসৎ-এর একপ্রকার উপলব্ধি পাই; আমাদের প্রকৃত আত্মা আমাদের চেতনার মধ্যে এই পরমার্থসৎ-এর স্বরূপ। যদি মানবমন নিজের কাছে এক বিশ্বাতীত ও নিরালম্ব পরমার্থসৎ-এর আদৌ কোন ভাবনা গঠন করতে চায় তাহলে সে বাধ্য হয় এইসব কৌশল অবলম্বন করতে। তার নিজের সব পরিচ্ছন্নতা ও সীমিত অনুভূতি থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে এই নেতিবাচক পদ্ধতি তার পক্ষে অপরিহার্য; এক অস্পষ্ট অলক্ষিতের মধ্য দিয়েই সে বাধ্য হয়ে পলায়ন করে অনন্তের মধ্যে। কেননা তার বাস বিভিন্ন রচনা ও প্রতিরূপের বদ্ধ কারাগারের মধ্যে; এসব তার ক্রিয়ার পক্ষে প্রয়োজনীয় কিন্তু জড় বা প্রাণ বা মন বা চিৎপুরুষ কারুরই স্বপ্রতিষ্ঠ সত্য তারা নয়। কিন্তু যদি আমরা একবার সমর্থ হই মনের সীমান্তের ক্ষীণ আলোক ছাড়িয়ে অতিমানসিক জ্ঞানের বৃহৎ লোকে প্রবেশ করতে, তাহলে এইসব কৌশল আর অপরিহার্য থাকে না। পরম অনন্ত সম্বন্ধে অতিমানসের সম্পূর্ণ অন্য এক সদর্থক ও প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত অনুভূতি আছে। পরমার্থসৎ ব্যক্তিসত্ত্বের অতীত, নৈর্ব্যক্তিকতার অতীত, আবার তবু এ হল একসাথে নৈর্ব্যক্তিক ও পরমব্যক্তি ও সকল ব্যক্তি। পরমার্থসৎ ঐক্য ও বহুত্বের পার্থক্যের অতীত, আবার তবু এই এক ও সকল বিশ্বসমূহে অগণিত বহু। এ গুণের সকল সীমাবদ্ধতার অতীত, আবার তবু এ নির্গুণ শূন্য দ্বারাও সীমাবদ্ধ নয়, সকল অনন্ত-গুণও এটি। এই হল ব্যষ্টির অন্তঃপুরুষ ও সকল

অন্তপুরুষ এবং এসবের অতিরিক্ত; এ হল নীরূপ ব্রহ্ম ও বিশ্ব। এই হল বিরাট পুরুষ ও বিশ্বাতীত চিৎপুরুষ, পরম প্রভু, পরম আত্মা, পরম পুরুষ ও পরমাশক্তি, নিত্য অজাত যিনি অন্তহীনভাবে জন্মগ্রহণ করেন, ইনিই হলেন অনন্ত যিনি অগণিতভাবে সান্ত, বহুময় এক, জটিলতাময় সরল, বহুমুখী একমাত্র, অনির্বচনীয় নীরবতার বাক্, নৈর্ব্যক্তিক সর্বব্যাপী পুরুষ, পরম রহস্য যা নিজের চিৎপুরুষের কাছে উত্তম চেতনায় সুস্পষ্ট অথচ ক্ষীণতর চেতনার কাছে নিজের অতিরিক্ত আলোর দ্বারা আবৃত ও চিরদিনের জন্য অভেদ্য। পরিমাণাত্মক মনের কাছে এইসব এমন পরস্পরবিরোধী যে তাদের মধ্যে সমন্বয় অসম্ভব, কিন্তু ঋতচেতনার স্থির দর্শন ও অনুভূতিতে তারা এত সহজ ও অনিবার্যরূপে পরস্পরের আন্তর প্রকৃতি যে তাদের বিপরীত বলে ভাবাও অকল্পনীয় ও অসঙ্গত। সেখানে পরিমাপক ও বিভেদকারী বুদ্ধিশক্তির দ্বারা গঠিত সব প্রাচীর বিলুপ্ত হয়েছে, আর সত্য প্রকাশিত হয় তার সরলতায় ও সৌন্দর্যে আর সব কিছুকে পরিণত করে তার সামঞ্জস্য, ঐক্য ও আলোকের সংজ্ঞায়। বিভিন্ন পরিমাণ ও পার্থক্য থাকে কিন্তু তা থাকে ব্যবহারের উপযোগী সঙ্কেত হিসেবে, আত্মভোলা চিৎপুরুষের বিভেদকারী কারাগার হিসেবে নয়।

যে চেতনায় বিশ্বাতীত পরমার্থসৎকে জানা যায় আর জানা যায় যে জীব ও বিশ্ব তাঁরই পরিণাম — সেই চেতনাই সর্বশেষ শাশ্বত জ্ঞান। এই জ্ঞানকে আমাদের মন নানাভাবে ব্যবহার করতে পারে, এর উপর বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী দর্শনশাস্ত্র রচনা করা সম্ভব, জ্ঞানের বিভিন্ন দিক সঙ্কুচিত বা পরিবর্তিত করতে পারে বা কোনটির উপর বেশী গুরুত্ব ও কোনটির উপর কম গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব, তা থেকে সত্য বা মিথ্যা সিদ্ধান্ত করাও সম্ভব; কিন্তু আমাদের বুদ্ধিগত সব পার্থক্য ও অপূর্ণ বিবরণ সত্ত্বেও এই চরম তথ্য সমানই থাকে যে মনন ও অনুভূতিকে তাদের শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হলে তাদের পরিণতি হয় এই জ্ঞানেই। এই সনাতন সদ্‌বস্তু, এই পরমাত্মা, এই ব্রহ্ম, এই বিশ্বাতীত যিনি সকলের উর্ধ্বে ও সকলের মধ্যে অধিষ্ঠিত, জীবের মধ্যে ব্যক্ত অথচ গূঢ়, বিশ্বের মধ্যে ব্যক্ত তবে ছদ্মবেশে — তিনি ছাড়া আর কোন বিষয় আধ্যাত্মিক জ্ঞানযোগের কাম্য হতে পারে না।

জ্ঞানমার্গের চূড়ান্ত পরিণতিতে যে প্রপঞ্চের লয় অনিবার্য তা নয়। কারণ যে পরমসৎ-এর অঙ্গীভূত আমরা হই, যে পরমার্থসৎ ও বিশ্বাতীতের মধ্যে আমরা প্রবেশ করি, তার সর্বদাই সেই সম্পূর্ণ ও চরম চেতনা বর্তমান থাকে যা আমরা পেতে চাই, আর তবু এর দ্বারাই তিনি তাঁর এই জগৎলীলাকে ধারণ করেন। আমরা এই বিশ্বাস করতেও বাধ্য নই যে জ্ঞানলাভের দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য বা সিদ্ধি পূর্ণ হওয়ায় এর পর এখানে আমাদের জন্য আর কিছু থাকে না। কেননা এই জ্ঞানলাভজনিত মুক্তি ও অপরিমেয় নীরবতা ও অচঞ্চলতার সঙ্গে আমরা প্রথম যা লাভ করি তা হল শুধু জীবের দ্বারা তার চিন্ময় সত্তার স্বরূপের মধ্যে আত্মোপলব্ধি; কিন্তু তখনো এই নীরবতার দ্বারা নিরাকৃত না হয়ে, মুক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে এক হয়ে সেই প্রতিষ্ঠার উপর থাকবে ব্রহ্মের আত্মপূর্ণতা

সাধনের অনন্তবিধ প্রবৃত্তি, জীবের মধ্যে ব্রহ্মের স্ফুরন্ত দিব্য অভিব্যক্তি এবং তার উপস্থিতি, দৃষ্টান্ত ও ক্রিয়ার দ্বারা অপর সকলের ও সারা বিশ্বের মধ্যে; আর এই সেই কর্ম যা সাধনের জন্য মহাপুরুষগণ থাকেন। যতদিন আমরা অহমাত্মক চেতনার মধ্যে, প্রদীপ-আলোকিত মানস-অন্ধকারের মধ্যে, বন্ধন-অবস্থার মধ্যে থাকি, ততদিন আমাদের স্ফুরন্ত আত্মচরিতার্থতা-সাধন সম্ভব হয় না। আমাদের বর্তমান সীমিত চেতনা শুধু এক প্রস্তুতির ক্ষেত্র হতে পারে, কিন্তু কিছু সিদ্ধ করার ক্ষমতা এর নেই; কারণ এ যা সব ব্যক্ত করে সে সব সম্পূর্ণভাবে অহংচালিত অজ্ঞান ও প্রমাদের দ্বারা কলুষিত। অভিব্যক্তির মধ্যে ব্রহ্মের প্রকৃত ও দিব্য আত্মচরিতার্থতা-সাধনের একমাত্র উপায় হল একে প্রতিষ্ঠিত করা ব্রহ্মচেতনার উপর; সুতরাং সেজন্য দরকার মুক্ত পুরুষের দ্বারা, জীবন্মুক্তের দ্বারা জীবন স্বীকার যার মাধ্যমে তা সম্পন্ন হবেই।

এই হল পূর্ণ জ্ঞান কারণ আমরা জানি যে সর্বত্র এবং সকল অবস্থাতে যে চোখ দেখে তার কাছে সবকিছুই "একম্", দিব্য অনুভূতিতে সকল কিছুই ভগবানের এক অখণ্ড পিণ্ড। শুধু আমাদের মনই চেষ্টা করে তার নিজের মনন ও আস্পৃহার সাময়িক সুবিধার জন্য শাশ্বত একত্বের একদিক ও অন্যদিকের মধ্যে কঠোর বিভাজনের কৃত্রিম রেখা টানতে এবং তাদের মধ্যে চিরন্তন অসঙ্গতির এক মিথ্যা রচনা করতে। বদ্ধ জীব ও অজ্ঞানাচ্ছন্ন মনের মতই মুক্ত জ্ঞাতাও জগতের মধ্যে থাকেন ও কাজ করেন কিন্তু পার্থক্য এই যে তিনি থাকেন সর্বকর্মে ব্যাপৃত হয়ে, "সর্বকৃৎ", তবে প্রকৃত জ্ঞান ও মহত্তর সচেতন সামর্থ্যের সঙ্গে। আর এইভাবে কাজ করে তিনি যেমন পরম ঐক্য হারান না, তেমন বিচ্যুত হন না পরম চেতনা ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান থেকে। কারণ পরম সৎ এখন আমাদের কাছে যতই প্রচ্ছন্ন থাকুন না কেন তিনি এখানে জগতের মধ্যে তেমন সমানই আছেন যেমন তিনি থাকতে পারেন একান্ত চরম অনির্বচনীয় আত্মলয়ের মধ্যে, সর্বাপেক্ষা অসহিষ্ণু নির্বাণের মধ্যে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জ্ঞানের পাদ

দেখা গেল যে পরমাত্মা, ভগবান, পরম সদ্‌বস্তু, 'সর্বং', বিশ্বাতীত — এই সকল বিভাবের মধ্যে "একম্" — একই যৌগিক জ্ঞানের বিষয়। সাধারণ বিষয়সমূহ, প্রাণ ও জড়ের বাহ্য সব রূপ, আমাদের সব মনন ও ক্রিয়ার মনস্তত্ত্ব, প্রাতিভাসিক জগতের বিভিন্ন শক্তির বোধ — এইসব এই জ্ঞানের অঙ্গ হতে পারে, তবে শুধু পরম একের অভিব্যক্তির অংশ হিসেবে। একথা সহজেই বোঝা যায় যে যোগসাধনার লক্ষ্য যে জ্ঞান তা জ্ঞান বলতে লোকে সাধারণতঃ যা বোঝে তা থেকে ভিন্ন। কেননা সাধারণতঃ আমরা জ্ঞান বলতে বুঝি প্রাণ, মন ও জড়ের বিভিন্ন তথ্যের এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ করে যেসব নিয়ম তাদের এক বুদ্ধিগত বিবেচনা। এই জ্ঞানের ভিত্তি হল আমাদের ইন্দ্রিয়বোধ আর বিভিন্ন ইন্দ্রিয়বোধ থেকে যুক্তি এবং এই জ্ঞানার্জনের চেষ্টার উদ্দেশ্য — কিছুটা বুদ্ধির শুদ্ধ তৃপ্তি এবং কিছুটা সেই ব্যবহারিক কুশলতা ও অধিকতর শক্তি যা এই জ্ঞান থেকে পাওয়া যায় আমাদের ও অন্য সকলের জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে, মানুষের স্বার্থে প্রকৃতির প্রকট বা গূঢ় শক্তিসমূহকে কাজে লাগাতে আর আমাদের মানবভাইদের সাহায্য বা ক্ষতি করতে, উদ্ধার ও উন্নত করতে অথবা উৎপীড়ন ও ধ্বংস করতে। বস্তুতঃ যোগ সমগ্র জীবনের সমব্যাপক এবং এই সকল বিষয় ও উদ্দেশ্যই তার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এমনকি এক যোগ[১] আছে যা ব্যবহার করা যায় যেমন আত্মজয়ের জন্য তেমন আত্মপ্রশ্রয়ের জন্য, যেমন অপরের মোক্ষের জন্য তেমন তাদের অনিষ্টসাধনের জন্য। কিন্তু "সমগ্রজীবনের" অর্থ শুধু যে মানবজাতি এখন যে জীবন যাপন করে সেই জীবন তা নয়, এমনকি প্রধানতঃও সে জীবন নয়। বরং সে কল্পনা করে ও মনে করে যে তার একমাত্র আসল উদ্দেশ্য হল এক পরতর প্রকৃতই সচেতন জীবন যা আমাদের অর্ধচেতন মানবজাতি এখনো পায়নি আর যা সে পেতে পারে শুধু এমন এক আধ্যাত্মিক উৎক্রান্তির দ্বারা যাতে নিজেকে অতিক্রম করা যায়। এই মহত্তর চেতনা ও পরতর জীবনই যোগসাধনার বিশিষ্ট ও উপযুক্ত সাধ্য।

এই মহত্তর চেতনা, এই পরতর জীবন এমন কোন প্রবুদ্ধ বা প্রদীপ্ত মানসিকতা নয় যা এক মহত্তর স্ফুরন্তশক্তির উপর নির্ভরশীল বা যার উপর শুদ্ধতর নৈতিক জীবন ও চরিত্র নির্ভরশীল। সাধারণ মানবচেতনা অপেক্ষা তাদের যে শ্রেষ্ঠতা তা মাত্রায় নয়, তা

[১] যোগের দ্বারা শক্তির বিকাশ হয়, এমনকি আমরা তা না চাইলেও বা তা সচেতনভাবে আমাদের লক্ষ্য না হলেও, শক্তির বিকাশ যোগের এক ফল; আর শক্তি এমন এক অস্ত্র যা দুদিকেই ধারালো, একে যেমন সাহায্য ও উদ্ধারের কাজে ব্যবহার করা যায়, তেমন অনিষ্ট বা ধ্বংস সাধনেও ব্যবহার করা যায়। এও মনে রাখা ভাল যে সকল ধ্বংসই অশুভ নয়।

হল প্রকারে ও সারে। আমাদের সত্তার শুধু যে উপরভাসা অংশের বা তটস্থ ধারার পরিবর্তন হয় তা নয়, এর সমগ্র ভিত্তি ও স্ফুরন্ত নীতিই পরিবর্তিত হয়। যৌগিক জ্ঞানের প্রয়াস এমন এক মানসোত্তর গূঢ় চেতনার মধ্যে প্রবেশ করা যা এখানে শুধু নিগূঢ়ভাবে অবস্থিত সর্বসত্তার ভিত্তিতে প্রচ্ছন্ন হয়ে। কারণ একমাত্র এই চেতনার জ্ঞানই সত্য এবং শুধু তাকে পেলেই আমরা ভগবানকে পেতে পারি আর সঠিকভাবে জানতে পারি জগতকে আর তার আসল প্রকৃতি ও সব গূঢ় শক্তিকে। এই যে সমগ্র জগৎ আমরা দেখতে পাই বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানতে পারি এবং এর মধ্যে সে সবও যা আমরা দেখতে পাই না — এসব এক মানসোত্তর ও অতীন্দ্রিয় কিছুর শুধু প্রাতিভাসিক বহিঃপ্রকাশ। বিভিন্ন ইন্দ্রিয় এবং তাদের দেওয়া সব তথ্য থেকে যুক্তিবুদ্ধি যে জ্ঞান আমাদের দেয় তা প্রকৃত জ্ঞান নয়; এ হল বিভিন্ন বাহ্যরূপের প্রাকৃত বিজ্ঞান। আবার এমনকি বাহ্যরূপগুলিরও সঠিক জ্ঞান সম্ভব হয় না যতক্ষণ না আমরা প্রথমে জানি সেই সদ্‌বস্তুকে যার প্রতিমূর্তি তারা। এই সদ্‌বস্তুই তাদের আত্মা এবং তাদের সকলেরই এক আত্মা; যখন এই সদ্‌বস্তুকে ধরা যায় তখন অপর সকল বিষয়কে জানা যায় তাদের সত্যরূপে, তখন আর এখনকার মত শুধু তাদের বাহ্যরূপে নয়।

স্পষ্টতঃই, ভৌতিক ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সব বিষয়কে আমরা যতই বিশ্লেষণ করি না কেন আমরা সেই উপায়ে আত্মা সম্বন্ধে বা নিজেদের সম্বন্ধে বা যাকে আমরা ভগবান বলি তার সম্বন্ধে বিদ্যালাভে সমর্থ হই না। দূরবীক্ষণ, অনুবীক্ষণ, লঘুছুরিকা, বকযন্ত্র, পাতনপাত্র — এইসব যন্ত্রের দৌড় ভৌতিকের বাইরে নয়, যদিও তাদের সাহায্যে ভৌতিক সম্বন্ধে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ও তাদের স্থূল উপকরণগুলি আমাদের কাছে যা প্রকাশ করে শুধু তাতেই যদি আমরা আবদ্ধ থাকি আর গোড়া থেকেই অন্য কোন সদ্‌বস্তুর বা অপর কোন জ্ঞানের উপায়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করি তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হই যে ভৌতিক ছাড়া আর কিছুই বাস্তব নয়, আমাদের মধ্যে বা বিশ্বের মধ্যে কোন আত্মা নেই, ভিতরে কি বাইরে কোন ভগবান নেই, এমনকি আমরাও মস্তিষ্ক, স্নায়ুমণ্ডলী ও দেহের এই সমাহার ছাড়া অন্য কিছু নই। কিন্তু এই যে সিদ্ধান্ত তা আমাদের কাছে অনিবার্য হয় শুধু এই কারণে যে আমরা গোড়া থেকেই তা স্বীকার করে নিয়েছি এবং সেজন্য সেই মূল স্বীকৃতির চারিদিকে ঘুরে বেড়ান ছাড়া আর উপায় থাকে না।

সুতরাং যদি ইন্দ্রিয়গোচর নয় এমন কোন আত্মা, সদ্‌বস্তু থাকে তাহলে ভৌতিক বিজ্ঞানের করণ থেকে ভিন্ন করণ দিয়ে তাকে খোঁজা ও জানা দরকার। বুদ্ধি সেই করণ নয়। একথা নিঃসন্দেহ যে বুদ্ধি তার নিজের প্রণালীতে অনেক অতীন্দ্রিয় সত্য পেতে ও সেগুলিকে বুদ্ধিগত প্রত্যয় হিসেবে অনুভব ক'রে তাদের বিবরণ দিতে সমর্থ। উদাহরণস্বরূপ, যে শক্তির কথা প্রাকৃত বিজ্ঞান অত জোর দিয়ে বলে সে-ও এমন এক ভাবনা, এমন এক সত্য যা শুধু বুদ্ধিই পেতে সমর্থ হয় তার সব তথ্য ছাড়িয়ে গিয়ে; কারণ এই বিশ্বশক্তিকে আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে জানি না, ইন্দ্রিয় দিয়ে জানি শুধু তার বিভিন্ন

ফলগুলি আর শক্তিকে আমরা অনুমান করি এইসব ফলের আবশ্যকীয় কারণ রূপে। সেইভাবেই বুদ্ধি কঠোর বিশ্লেষণের এক বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে আত্মা সম্বন্ধে এক বুদ্ধিগত ভাবনা ও বুদ্ধিগত বিশ্বাসলাভে সমর্থ হয় আর এই বিশ্বাস অন্য সকল ও মহত্তর সব বিষয়ের শুরু হিসেবে অতীব বাস্তব, অতীব প্রোজ্জ্বল, অতীব শক্তিশালী হতে পারে। তবু শুধু বুদ্ধিগত বিশ্লেষণ দিয়ে পাওয়া যেতে পারে শুধু কতকগুলি স্বচ্ছ প্রত্যয়ের বিন্যাস, হয়ত এগুলি সঠিক প্রত্যয়ের যথার্থ বিন্যাস কিন্তু যোগ যে জ্ঞান পেতে চায় এ তা নয়। কারণ এ নিজে কোন ফলপ্রসূ জ্ঞান নয়। কোন লোক এই জ্ঞানে সিদ্ধ হতে পারে, কিন্তু তবু সে আগে যেমন ছিল ঠিক তেমনই থাকতে পারে — শুধু এই পার্থক্য যে তার বুদ্ধি আরো বেশী পরিমাণে দীপ্ত হয়েছে। কিন্তু যোগের যা লক্ষ্য — আমাদের সত্তার পরিবর্তন তা আদৌ না ঘটতে পারে।

একথা সত্য যে বুদ্ধিগত বিবেচনা ও সঠিক বিচার জ্ঞানযোগের এক প্রধান অঙ্গ; কিন্তু এই পথের অন্তিম ও সদর্থক ফল পাওয়া অপেক্ষা বরং তার এক বাধা দূর করাই তাদের উদ্দেশ্য। আমাদের সাধারণ বুদ্ধিজ ভাবনাগুলি জ্ঞানের পথে অন্তরায়স্বরূপ; কারণ তারা সব ইন্দ্রিয়ের প্রমাদের অধীন আর তাদের মূলে এই ধারণা বর্তমান যে জড় ও শরীর সদ্‌বস্তু, প্রাণ ও শক্তি সদ্‌বস্তু, উগ্র আবেগ ও ভাবাবেগ সদ্‌বস্তু, মনন ও ইন্দ্রিয়বোধ সদ্‌বস্তু; আর এইসব বিষয়ের সঙ্গে আমরা নিজেদের এক মনে করি আর তাদের সঙ্গে নিজেদের এক করি বলে আমরা সত্যকার আত্মাতে উপনীত হতে পারি না। সুতরাং জ্ঞান-সাধকের পক্ষে এই অন্তরায় দূর করা দরকার আর দরকার তার নিজের ও জগৎ সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা লাভ করা: কারণ প্রকৃত আত্মা কি সে সম্বন্ধে যদি আমাদের কোন ধারণা না থাকে বরং এমন সব ভাবনায় আমরা বোঝাই থাকি যেগুলি সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত তাহলে কেমন করে জ্ঞানের দ্বারা আমাদের আত্ম-অন্বেষণ সম্ভব হবে? সুতরাং পূর্বসাধন হিসেবে সঠিক মনন আবশ্যক আর একবার যদি ইন্দ্রিয়-প্রমাদ ও কামনা ও পূর্বসংস্কার ও বুদ্ধিজ পূর্বনির্ণয় থেকে মুক্ত সঠিক মননের অভ্যাস গঠিত হয় তাহলে বুদ্ধি শুদ্ধ হয় আর তা থেকে জ্ঞানের পরবর্তী প্রক্রিয়ায় কোন প্রকাণ্ড বাধা আসে না। তবু, সঠিক মনন ফলপ্রসূ হয় কেবল তখনই যখন শুদ্ধ-করা বুদ্ধিতে অন্যান্য সব ক্রিয়া, দর্শন, অনুভূতি, উপলব্ধিও আসে ঐ মননের পিছু পিছু।

কি কি এইসব ক্রিয়া? তারা শুধু মনস্তাত্ত্বিক আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মনিরীক্ষণ নয়। সঠিক মননের মত এরূপ বিশ্লেষণ ও নিরীক্ষণের মূল্য প্রচুর এবং কার্যকরী পন্থা হিসেবে তারা অপরিহার্য। এমনকি যদি এগুলি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় তাহলে এইভাবে এমন এক যথার্থ মনন আসে যার শক্তি ও কার্যকারিতা প্রচুর। ধ্যানপর মনন প্রণালীর দ্বারা বুদ্ধিগত বিচারের মত তাদের থেকেও শুদ্ধি আসবে, তারাও আনবে একপ্রকার আত্মজ্ঞান এবং অন্তঃপুরুষ, হৃদয় ও এমনকি বুদ্ধিরও মধ্যে সব বিশৃঙ্খলার সঙ্গতি। নিজের সম্বন্ধে সকল প্রকারের জ্ঞানই প্রকৃত আত্মার জ্ঞানের সঠিক উপক্রমণিকা স্বরূপ। উপনিষদ আমাদের বলে যে অন্তঃপুরুষের দ্বারগুলি স্বয়ম্ভূ স্থাপন করেছেন বহির্মুখীভাবে

আর বেশীরভাগ লোকই তাকায় বাইরের দিকে সব বিষয়ের বাহ্যরূপের প্রতি; শুধু ধীর মনন ও স্থির প্রজ্ঞার জন্য উপযুক্ত বিরল পুরুষই অন্তরের দিকে চোখ ফিরিয়ে আত্মাকে দর্শন করেন ও অমৃতত্ব লাভ করেন। এইভাবে অন্তর্মুখী হবার কাজে মনস্তাত্ত্বিক আত্মনিরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ এক গুরুত্বপূর্ণ কার্যকরী উপক্রম। আমাদের বাইরের সব বিষয়ের ভিতর দেখা অপেক্ষা আমাদের নিজেদের ভিতরে দেখা আমাদের পক্ষে বেশী সহজ কারণ আমাদের বাইরের সব বিষয় সম্বন্ধে আমরা প্রথমতঃ বিব্রত হই তাদের রূপের দ্বারা এবং দ্বিতীয়তঃ তাদের মধ্যে তাদের ভৌতিক ধাতু ছাড়া অন্য কিছু যে আছে সে সম্বন্ধে আমাদের স্বভাবতঃই কোন পূর্ব জ্ঞান নেই। শুদ্ধ-করা বা শান্ত-করা মনে জগতের মধ্যে ভগবানের, প্রকৃতির মধ্যে আত্মার প্রতিফলন আসা বা প্রবল একাগ্রতার দ্বারা তাদের আবিষ্কার সম্ভব হতে পারে — এমনকি আমাদের নিজেদের মধ্যে সে উপলব্ধি হবার আগেই, — কিন্তু এরকম সচরাচর হয় না এবং হওয়া কঠিন[১]। আর শুধু আমাদের নিজেদের মধ্যেই আমরা পর্যবেক্ষণ করে জানতে পারি আত্মার সম্ভূতির ধারা আবার অনুসরণ করতে পারি তার আত্মসত্তার মধ্যে নিবৃত্তির ধারা। সুতরাং সেই প্রাচীন উপদেশ "আত্মানং বিদ্ধি" (নিজেকে জান) চিরকাল বর্তমান থাকবে প্রকৃত জ্ঞানের দিকে চলার নির্দেশক প্রথম মন্ত্র রূপে। তথাপি মনস্তাত্ত্বিক আত্মজ্ঞান শুধু আত্মার বৃত্তির অনুভূতিমাত্র, শুদ্ধ সত্তায় স্থিত আত্মার উপলব্ধি তা নয়।

সুতরাং জ্ঞানের যে পাদের দিকে যোগের দৃষ্টি নিবদ্ধ তা শুধু সত্যের এক বুদ্ধিগত প্রত্যয় বা স্বচ্ছ বিচার নয় অথবা আমাদের সত্তার বৃত্তির কোন প্রবুদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতিও নয়। এ হল এক বাস্তব উপলব্ধি (realisation), ইংরাজী পদটির পূর্ণ অর্থে; এর অর্থ আত্মাকে, বিশ্বাতীত ও বিশ্বাত্মক ভগবানকে আমাদের নিজেদের কাছে ও আমাদের নিজেদের মধ্যে বাস্তব (real) করা, আর এই করা যেন সত্তার বৃত্তিগুলিকে আত্মার আলোয় ছাড়া দেখা অসম্ভব হয় এবং সেগুলি যে আমাদের জগৎ-জীবনের মনস্তাত্ত্বিক ও ভৌতিক অবস্থার মধ্যে আত্মারই সম্ভূতির প্রবাহ, এই হিসেবে তাদের সত্যকার রূপে দেখা ছাড়া অন্যভাবে দেখাও অসম্ভব হয়। এই উপলব্ধির তিনটি পর পর পর্যায় আছে — অন্তর্দর্শন, সম্পূর্ণ আভ্যন্তরীণ অনুভূতি ও তাদাত্ম্য।

এই অন্তর্দর্শন বা 'দৃষ্টি' অর্থাৎ যে শক্তি প্রাচীন জ্ঞানীদের কাছে এত বেশী মূল্যবান ছিল, যে শক্তিবলে মানব ঋষি বা কবি হ'ত, আর শুধু মনীষী থাকত না সেই দৃষ্টি অন্তঃপুরুষের মধ্যকার এমন একপ্রকার আলো যার সাহায্যে অদেখা সব বিষয় তার কাছে — অন্তঃপুরুষের কাছে, শুধু বুদ্ধির কাছে নয় — স্থূল চোখে দেখা সব বিষয়ের মতই স্পষ্ট ও বাস্তব হয়। ভৌতিক জগতে সর্বদাই দুই প্রকার জ্ঞান আছে — প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, চোখের সামনে উপস্থিত বিষয়ের জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান আর আমাদের দৃষ্টির দূরে

[১] কিন্তু এক হিসেবে এ আরো সহজ, কারণ বাহ্য বিষয় সম্বন্ধে আমরা সঙ্কীর্ণ অহংবোধের দ্বারা ততটা বাধাগ্রস্ত হই না যতটা হই নিজেদের আন্তর বিষয় সম্বন্ধে; সুতরাং ভগবৎ-উপলব্ধির একটি বাধা দূর হয়।

ও অতীতে অবস্থিত সব বিষয়ের জ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞান। বিষয়টি দৃষ্টির অতীত হলে আমরা বাধ্য হয়ে তার এক ভাবনায় আসি অনুমান, কল্পনা বা উপমানের সাহায্যে, যারা দেখেছে তাদের বর্ণনা শুনে, অথবা পাওয়া গেলে তাদের ছবি বা অন্যরূপ প্রতিকৃতি আলোচনা ক'রে। এইসব সহায় একত্র ক'রে আমরা অবশ্য বিষয়টি সম্বন্ধে অল্পবিস্তর একটি পর্যাপ্ত ভাবনা বা ব্যঞ্জনাশীল প্রতিমূর্তি পেতে পারি কিন্তু স্বয়ং বস্তুটিকে আমরা বাস্তবে পাই না; তখনো এটি আমাদের কাছে আয়ত্তাধীন সদ্‌বস্তু নয়, এক সদ্‌বস্তু সম্বন্ধে এটি আমাদের প্রত্যয়গত প্রতিরূপ মাত্র। কিন্তু একবার যদি আমরা একে চোখে দেখি — কারণ অন্য কোন ইন্দ্রিয় পর্যাপ্ত নয় — তাহলে আমরা তাকে অধিগত করি, বাস্তবে উপলব্ধি করি; এটি আমাদের তৃপ্ত সত্তার মধ্যে সুরক্ষিত হয়ে থাকে আমাদেরই জ্ঞানগত অঙ্গ হয়ে। সব আধ্যাত্মিক বিষয় ও আত্মা সম্বন্ধেও ঠিক এই একই নিয়ম খাটে। দার্শনিক বা শিক্ষক বা প্রাচীন গ্রন্থ থেকে আমরা আত্মা সম্বন্ধে অনেক প্রাঞ্জল ও জ্ঞানদীপ্ত শিক্ষা পেতে পারি; মনন, অনুমান, কল্পনা, উপমান বা অন্য কোন উপযোগী উপায়ে আমরা এর এক মানসিক মূর্তি বা প্রত্যয় গঠনের চেষ্টা করতে পারি; আরো পারি আমরা ঐ প্রত্যয়কে আমাদের মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে ধরে একে এক সমগ্র ও অনন্য একাগ্রতার দ্বারা নিবদ্ধ করতে[১]; কিন্তু তখনো আমরা একে বাস্তবে উপলব্ধি করিনি, আমরা ভগবানকে দেখিনি। কেবল যখন দীর্ঘ ও অক্লান্ত একাগ্রতার পর বা অন্য কোন উপায়ে মনের আবরণ বিদীর্ণ বা দূরে অপসারিত হয়, কেবল যখন প্রবুদ্ধ মানসিকতার উপর নেমে আসে এক আলোর বন্যা, "জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম", আর প্রত্যয়ের স্থলে আসে এমন এক জ্ঞানদৃষ্টি যাতে আত্মা স্থূল চক্ষুর কাছে স্থূল বিষয়ের মতই প্রত্যক্ষ, বাস্তব ও মূর্ত, তখনই কেবল আমরা তাকে পাই জ্ঞানের মধ্যে; কারণ আমরা তাকে দেখতে পেয়েছি। ঐ সত্যদর্শনের পর আলোর নিষ্প্রভতা যা-ই হ'ক না কেন, যতবারই না অন্ধকার ক্লিষ্ট করুক অন্তঃপুরুষকে, একবার যাকে এ ধরেছে, তাকে আর তা চিরদিনের মত হারাতে পারে না। এই অনুভূতির পুনরাবৃত্তি অনিবার্য, এবং তা ক্রমশঃ দ্রুত হতে বাধ্য যতক্ষণ না সেটি স্থায়ী হয়; কবে ও কত শীঘ্র এই স্থায়িত্ব আসে তা নির্ভর করে সাধনপথে আমাদের ভক্তি ও নিষ্ঠার উপর — কতটা সঙ্কল্প বা ভালবাসা সহকারে আমাদের প্রচ্ছন্ন দেবতাকে পরিবেষ্টিত করি, তার উপর।

এই অন্তর্দৃষ্টি একপ্রকার মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতি; কিন্তু এ শুধু ঐ দেখার মধ্যেই আবদ্ধ নয়; দৃষ্টি শুধু উন্মুক্ত করে, আলিঙ্গন করে না। যেমন চক্ষু উপলব্ধির প্রাথমিক বোধ আনতে একলাই পর্যাপ্ত হলেও, তাকে স্পর্শ ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরও অনুভূতির সাহায্য নিতে হয়, তেমন আত্মার দর্শনকেও সম্পূর্ণ করা উচিত আমাদের সকল অঙ্গের মধ্যে তার অনুভূতির দ্বারা। শুধু আমাদের ভাস্বর জ্ঞান-নেত্র নয়, আমাদের সমগ্র সত্তারই

[১] জ্ঞানযোগের যে তিনটি প্রক্রিয়া — শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তাদের অর্থ এই — শোনা, চিন্তা করা বা মনন করা এবং একাগ্রতায় নিবদ্ধ করা।

উচিত ভগবানকে পেতে দাবী করা। কারণ যেহেতু আমাদের মধ্যকার প্রতি তত্ত্বটিই আত্মার এক অভিব্যক্তিমাত্র, সেহেতু প্রত্যেকেই সমর্থ আপন সদ্‌বস্তুতে ফিরে গিয়ে তার অনুভূতি পেতে। আত্মার এক মানসিক অনুভূতি পেতে আমরা সমর্থ হই আর সমর্থ হই সেইসব আপাত আচ্ছিন্ন বিষয়গুলিকে মূর্ত সদ্‌বস্তু হিসেবে ধরতে যেগুলি মনের কাছে সত্তাস্বরূপ — চেতনা, শক্তি, আনন্দ এবং তাদের নানাবিধ রূপ ও ক্রিয়া: এইভাবে মন তৃপ্ত হয় ভগবান সম্বন্ধে। আত্মার এক ভাবগত অনুভূতি পেতে আমরা সমর্থ হই প্রেমের মাধ্যমে ও ভাবগত আনন্দের মাধ্যমে, আমাদের অন্তঃস্থ আত্মার, বিশ্বভাবের মধ্যস্থিত আত্মার এবং যাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আছে সেই সকলের মধ্যস্থিত আত্মার প্রেম ও আনন্দের মাধ্যমে: এইভাবে হৃদয় তৃপ্ত হয় ভগবান সম্বন্ধে। আমরা আত্মার এক কান্ত অনুভূতি পেতে পারি সৌন্দর্যের মধ্যে, পেতে পারি সেই অনপেক্ষ সদ্‌বস্তুর আনন্দবোধ ও আস্বাদন যিনি আমাদের বা প্রকৃতির সৃষ্ট সবকিছুর মধ্যে রসগ্রাহী মন ও সব ইন্দ্রিয়ের বোধে সর্বসুন্দর; ভগবান সম্বন্ধে ইন্দ্রিয় তৃপ্ত হয় এইভাবে। এমনকি আমরা পেতে পারি আত্মার প্রাণিক, স্নায়বিক অনুভূতি ও কার্যতঃ শারীরিক বোধও সকল জীবন ও রূপায়ণে এবং আমাদের বা অন্যদের মধ্য দিয়ে বা জগতে যেসব সামর্থ্য, শক্তি বা ক্রিয়াশক্তি ক্রিয়াশীল তাদের সকল কর্মপ্রণালীর মধ্যে; এইভাবে প্রাণ ও দেহ তৃপ্ত হয় ভগবান সম্বন্ধে।

এইসব জ্ঞান ও অনুভূতি হল তাদাত্ম্যে পৌঁছবার এবং তা অধিগত করার প্রাথমিক উপায়। আমাদের আত্মাকেই আমরা দেখি ও অনুভব করি, সুতরাং আমাদের দর্শন ও অনুভূতি অসম্পূর্ণ রয়ে যায় যদি না তাদের পরিসমাপ্তি হয় তাদাত্ম্যে, যদি না আমরা সমর্থ হই আমাদের সমগ্র সত্তায় জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করতে সেই পরম বৈদান্তিক জ্ঞান, "সোঽহমস্মি" — আমিই তিনি। আমাদের যে শুধু ভগবানকে দেখা ও আলিঙ্গন করা দরকার তা নয়, পরন্তু আমাদের দরকার সেই সদ্‌বস্তু হওয়া। অহং ও তার অন্তর্ভুক্ত সবকিছুকে তাদের প্রভব তৎস্বরূপের মধ্যে পরিণত, ঊর্ধ্বায়িত ও স্ব-নির্মুক্ত ক'রে আমাদের এক হওয়া চাই আত্মার সঙ্গে সকল রূপ ও অভিব্যক্তির অতীত এর অতিস্থিতিতে, আবার তেমনই হওয়া চাই সেই আত্মার সকল ব্যক্ত সত্তা ও সম্ভূতির মধ্যে যাতে এর সঙ্গে এক হই অনন্ত সত্তায়, চেতনায়, শান্তিতে, আনন্দে যেসবের দ্বারা এটি আমাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করে এবং এক হই এর সঙ্গে কর্মে, রূপায়ণে ও আত্ম-বিভাবনার লীলায় যা দিয়ে এ নিজেকে আচ্ছাদন করে জগতের মধ্যে।

আধুনিক মনের কাছে একথা বোঝা কঠিন আত্মা বা ভগবান সম্বন্ধে বুদ্ধিগত ভাবনার বেশী কিছু করা কিভাবে আমাদের পক্ষে সম্ভব; কিন্তু এই দর্শন, অনুভূতি ও সম্ভূতির একটু আভাস সে পেতে পারে প্রকৃতির প্রতি সেই আন্তর জাগরণ থেকে যা এক বড় ইংরাজ কবি বাস্তবায়িত করেছেন ইউরোপীয় কল্পনার কাছে। যে কবিতাগুলিতে Wordsworth (ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ) প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর উপলব্ধি প্রকাশ করেছেন আমরা যদি সেগুলি পড়ি তাহলে উপলব্ধি যে কি সে সম্বন্ধে আমরা এক দূরবর্তী ভাবনা পেতে

পারি। কারণ প্রথমতঃ আমরা দেখি যে তিনি জগতের মধ্যে এমন কিছুর দর্শন পেয়েছিলেন যা এর মধ্যস্থিত সকল কিছুরই প্রকৃত আত্মা এবং যা এর বিভিন্ন রূপের অতিরিক্ত এক সচেতন শক্তি ও সান্নিধ্য অথচ যা বিভিন্ন রূপের কারণ ও তাদের মধ্যে অভিব্যক্ত। আমরা দেখি, তিনি যে শুধু এই আত্মার এবং এর সান্নিধ্যজনিত হর্ষ ও শান্তি ও বিশ্বভাবের দর্শন পেয়েছিলেন তা নয়, এর এক মানসিক, কান্ত, প্রাণিক ও শারীরিক বোধও পেয়েছিলেন; তিনি যে শুধু নিজের সত্তায় আত্মার এই বোধ ও দর্শন পেয়েছিলেন তা নয়, তিনি তা পেয়েছিলেন নিকটতম পুষ্পে, সরলতম মানুষে ও অচল প্রস্তরে; আর সর্বশেষ দেখি যে, তিনি মাঝে মাঝে পেয়েছিলেন সেই ঐক্য, নিজের উৎসর্গের বিষয়ের সহিত একাত্মতা যার একটি দিক জোরালো ও গভীরভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর এই কবিতায়, "A slumber did my spirit seal" (তন্দ্রাঘোরে স্তব্ধ হল আমার চেতনা); এখানে তিনি নিজের সম্বন্ধে বলেছেন যে তিনি তাঁর সত্তায় পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে "আবর্তন করিনু তার প্রতিদিনের পথে — পাদপ, প্রস্তর স্থাণু ল'য়ে মোর সাথে"। এই উপলব্ধিকে ভৌতিক প্রকৃতির চেয়ে গভীরতর আত্মায় উন্নয়ন করলে আমরা পাই যৌগিক জ্ঞানের উপাদান। কিন্তু যে বিশ্বাতীত তাঁর সকল বিভাবের অতীত তাঁর অতীন্দ্রিয় অতিমানসিক উপলব্ধির শুধু বহির্দ্বার মাত্র এইসব অনুভূতি, আর জ্ঞানের চরম পরাকাষ্ঠা পাবার একমাত্র উপায় হল অতিচেতনার মধ্যে প্রবেশ ক'রে সেখানে অন্য সকল অনুভূতি নিমজ্জন ক'রে দেওয়া অনুপাখ্যের স্বর্গীয় ঐক্যের মধ্যে। এই হল সকল দিব্য জানার পরাকাষ্ঠা; এই হল আবার সকল আনন্দ ও দিব্য জীবনযাত্রার উৎস।

অতএব জ্ঞানের ঐ পাদই (ব্রাহ্মীস্থিতিই) এই পথের এবং বস্তুতঃ সকল পথেরই চরম প্রান্তের লক্ষ্য; আর এই লক্ষ্য প্রাপ্তির জন্য বুদ্ধিগত বিচার ও প্রত্যয় এবং সকল একাগ্রতা ও মনস্তাত্ত্বিক আত্মজ্ঞান এবং প্রেমের মধ্য দিয়ে হৃদয়ের, সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে ইন্দ্রিয়সমূহের, সামর্থ্য ও কর্মের মাধ্যমে সঙ্কল্পের, শান্তি ও হর্ষের মাধ্যমে অন্তঃপুরুষের সকল এষণা সেই উত্তরণ পথের শুধু চাবিকাঠি, রাজপথ, প্রাথমিক সামীপ্য ও উপক্রমমাত্র, যে পথ ধরে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ না পাওয়া যায় বিস্তীর্ণ ও অনন্ত সব স্তর আর দিব্য দ্বার উদঘাটিত করে অনন্ত আলোক।

তৃতীয় অধ্যায়

শোধিত বুদ্ধি

জ্ঞানের যে পাদ আমরা আস্পৃহা করি তার বর্ণনা থেকেই নির্ধারিত হয় আমরা জ্ঞানের কি সাধন ব্যবহার করব। সংক্ষেপে বলা যায় যে ঐ জ্ঞানের পাদ এমন এক অতিমানসিক উপলব্ধি যা তৈরী হয় মানসিক সব প্রতিরূপ দ্বারা আমাদের অন্তঃস্থ নানাবিধ মানসিক তত্ত্বের মাধ্যমে এবং একবার তা পাওয়া গেলে তা আরো ভালো ক'রে ফুটে ওঠে সত্তার সকল অঙ্গে। এর অর্থ বিষয়সমূহের বাহ্য রূপের এবং আমাদের বাহ্য সত্তার বহিরঙ্গের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের সমগ্র জীবনকে নতুন করে দেখা এবং সেজন্য তাকে পুনর্গঠন করা ভগবান ও পরম এক ও সনাতনের আলোয়।

এই যে অতিক্রমণ মানুষী থেকে দিব্যে, বিভক্ত ও বিষম থেকে পরম একে, প্রাতিভাসিক থেকে শাশ্বত সত্যে, অন্তঃপুরুষের এরকম এক সম্পূর্ণ পুনর্জন্ম বা নবজন্ম — এর দুটি পর্যায় অপরিহার্য — একটি উদ্যোগপর্ব যাতে অন্তঃপুরুষ ও এর করণগুলি উপযুক্ত হয়ে ওঠা দরকার, আর অন্যটিতে আসে প্রস্তুত অন্তঃপুরুষের মধ্যে তার সব যোগ্য করণের মাধ্যমে বাস্তব উদ্ভাসন ও উপলব্ধি। অবশ্য এই দুই পর্যায়ের মধ্যে কালের পরম্পরায় কোন কঠোর সীমারেখা নেই; বরং প্রত্যেকেই অপরের পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং দুটিই একসঙ্গে চলতে থাকে। কারণ যে অনুপাতে অন্তঃপুরুষ যোগ্য হয় সেই অনুপাতে সে বেশী বেশী দীপ্তি পায় এবং উচ্চ থেকে উচ্চতর, পূর্ণ থেকে পূর্ণতর উপলব্ধিতে ওঠে, আবার যে অনুপাতে এইসব দীপ্তি ও উপলব্ধি বৃদ্ধি পায়, সেই অনুপাতে অন্তঃপুরুষ যোগ্য হয় আর তার সব করণ তাদের কার্যের পক্ষে আরো সমর্থ হয়। অন্তঃপুরুষের এমন সব সময় আসে যখন শুধু প্রস্তুতি চলে, দীপ্তি থাকে না, আবার অন্য সময় সে দীপ্তি পায় ও বিকশিত হয়, এমন সব চরম মুহূর্ত আসে যেগুলি অল্পবিস্তর দীর্ঘস্থায়ী দীপ্ত প্রাপ্তিতে ভরা, এমন কতক মুহূর্তও আসে যেগুলি বিদ্যুৎ চমকের মত ক্ষণস্থায়ী কিন্তু তাতেই সমগ্র আধ্যাত্মিক ভবিষ্যৎ পরিবর্তিত হয় আবার এমন সব মুহূর্তও আসে যেগুলিতে মানুষী মানের বহু ঘণ্টা, দিন ও সপ্তাহ ব্যেপে থাকে সত্যসূর্যের নিরন্তর আলোক বা তীব্র প্রভা। আর এই সকলের মধ্য দিয়ে অন্তঃপুরুষ একবার ভগবন্মুখী হলে সে বিকশিত হতে থাকে তার নব জন্ম ও প্রকৃত জীবনের চিরস্থায়িত্ব ও সিদ্ধির দিকে।

প্রস্তুতির অবস্থায় প্রথম প্রয়োজন হল আমাদের সত্তার সকল অঙ্গকেই শুদ্ধ করা; বিশেষ করে, জ্ঞানমার্গের পক্ষে বুদ্ধির শুদ্ধীকরণ প্রথম প্রয়োজনীয় কারণ এই সেই চাবিকাঠি যাতে সত্যের দ্বার খোলা যাবে; কিন্তু শোধিত বুদ্ধি সম্ভব হয় না অন্য সব অঙ্গের শুদ্ধি বিনা। অশুদ্ধ হৃদয়, অশুদ্ধ ইন্দ্রিয়, অশুদ্ধ প্রাণ বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে, তার

সব তথ্যের মধ্যে বিশৃঙ্খলা আনে, তার সিদ্ধান্ত বিকৃত করে, দৃষ্টিকে আঁধার দিয়ে ঢাকে, জ্ঞানকে ব্যবহার করে অন্যায়ভাবে; অশুদ্ধ শরীর এর ক্রিয়াকে রুদ্ধ বা ব্যাহত করে। সুতরাং সর্বাঙ্গীণ শুদ্ধি চাই-ই। এখানে এক অন্যোন্যনির্ভরতা দেখা যায়; কারণ যে কোন একটিকে নির্মল করা হলে অন্যগুলির শুদ্ধি সহজ হয়; উদাহরণস্বরূপ ভাগবত হৃদয়ের উত্তরোত্তর অচঞ্চলতাসাধন বুদ্ধির শুদ্ধির সহায় হয় আবার সমভাবেই শোধিত বুদ্ধি শান্তি ও আনন্দ আনে এখনো অশুদ্ধ সব ভাবাবেগের পঙ্কিল ও তমসাচ্ছন্ন ক্রিয়াধারার উপর। এমনকি একথা বলা যায় যে যদিও আমাদের সত্তার প্রতি অঙ্গেরই শুদ্ধি সম্বন্ধে তার নিজস্ব উপযোগী তত্ত্ব আছে, তবু মানুষের মধ্যে শোধিত বুদ্ধিই তার পঙ্কিল ও বিশৃঙ্খল সত্তার সবচেয়ে শক্তিশালী পাবক এবং সবচেয়ে দৃপ্তভাবে আরোপ করে তাদের সঠিক ক্রিয়াধারা তার অপর সব অঙ্গের উপর। গীতা বলে, "জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র কিছু নেই"। সকল স্বচ্ছতা ও সঙ্গতির উৎস যেমন আলো, তেমন আমাদের সকল বিচ্যুতির কারণ অজ্ঞানতার অন্ধকার। উদাহরণস্বরূপ প্রেম হৃদয়কে শুদ্ধ করে, আর আমাদের সব ভাবাবেগ যদি পরিণত হয় দিব্য প্রেমের রূপে তাহলে হৃদয় তার পূর্ণতা ও চরিতার্থতা পায়; তবু প্রেমের নিজেরও দরকার দিব্য জ্ঞানের দ্বারা নির্মল হওয়া। ভগবানের প্রতি হৃদয়ের প্রেম অন্ধ, সঙ্কীর্ণ ও অজ্ঞানাচ্ছন্ন হতে পারে, তার ফলে আসতে পারে ধর্মান্ধতা ও জ্ঞানের প্রতি বিদ্বেষ; এমনকি অন্য প্রকারে শুদ্ধ হলেও এ প্রেম ভগবানকে সীমিত ব্যক্তিরূপে ছাড়া দেখতে অস্বীকার করে এবং সত্য ও অনন্ত দর্শন থেকে প্রতিনিবৃত্ত হয়ে আমাদের সিদ্ধিকে গণ্ডীবদ্ধ করতে পারে। সমভাবে মানবের প্রতি হৃদয়ের প্রেমের পরিণতিতে বেদনায়, ক্রিয়ায় ও জ্ঞানে বিকৃতি ও আতিশয্য আসা সম্ভব আর এসবকে সংশোধন ও নিবারণ করা দরকার বুদ্ধির শুদ্ধীকরণ দ্বারা।

কিন্তু আমাদের গভীর ও স্বচ্ছভাবে বিবেচনা করা দরকার যে ইংরাজী পদ understanding (বুদ্ধি) ও তার শুদ্ধীকরণ বলতে আমরা কি বুঝি। এই ইংরাজী কথাটি আমরা ব্যবহার করি সংস্কৃত দার্শনিক পদ 'বুদ্ধি'র নিকটতম সমার্থক পদ হিসেবে; সুতরাং তা থেকে আমরা ইন্দ্রিয়মানসের ক্রিয়া বাদ দিই যাতে শুধু সকল প্রকার বোধই পার্থক্য না করে লিপিবদ্ধ করা হয় — তা তারা যথার্থ বা মিথ্যা, সত্য বা শুধু প্রাতিভাসিক, সূক্ষ্মভেদী বা বাহ্য যাই হ'ক না কেন। আমরা সেই বিশৃঙ্খল প্রত্যয়রাশিও বাদ দিই যা এই বোধগুলির শুধু সামান্যীকরণ আর তাদের মতোই বিচার বিবেচনার উচ্চতর তত্ত্ববিহীন। তাছাড়া অভ্যাসগত মননের সেই অবিরত লম্ফমান স্রোতকেও তার মধ্যে ধরা যায় না যদিও সাধারণ চিন্তা-না-করা মানবের মনে তাই বুদ্ধির কাজ করে, কিন্তু এ শুধু অভ্যাসগত সাহচর্য, কামনা, পক্ষপাত, পূর্বনির্ণয়, অন্যদের থেকে পাওয়া বা বংশানুগত অভিরুচি প্রভৃতির অবিরত পুনরাবৃত্তি যদিও সম্ভবতঃ তা সর্বদাই সমৃদ্ধ হচ্ছে পরিবেশ থেকে স্রোতের মতো আসা এমন সব নতুন নতুন ভাবনার দ্বারা যেগুলি নেওয়া হয় শক্তিশালী বিবেচনাশীল যুক্তির দ্বারা পরীক্ষা না করেই। অবশ্য একথা নিঃসন্দেহ যে পশু থেকে মানবের বিকাশে এই প্রকার বুদ্ধি অনেক কাজে লেগেছে;

কিন্তু এ শুধু পশুমনের এক ধাপ উপরে; এ হল এক অর্ধ-পাশবিক যুক্তিবুদ্ধি যা অভ্যাস, কামনা ও বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দাস আর যা কি বৈজ্ঞানিক কি দার্শনিক কি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অন্বেষণের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। একে অতিক্রম করে যাওয়া চাই; একে শুদ্ধ করার একমাত্র উপায় — হয় একে সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন বা নিস্তব্ধ করা, নয় একে প্রকৃত বুদ্ধিতে রূপান্তরিত করা।

বুদ্ধি (understanding) বলতে আমরা সেই জিনিস বুঝি যা একসঙ্গে দেখে, বিচার ও বিবেচনা করে, মানুষের সেই সত্যকার যুক্তিবুদ্ধি যা ইন্দ্রিয়সমূহের, কামনার বা অভ্যাসের অন্ধশক্তির দাস নয়, বরং যা প্রভুত্বের জন্য, জ্ঞানের জন্য নিজের অধিকারেই কাজ করে। অবশ্যই, বর্তমানে মানুষ যা তাতে তার শ্রেষ্ঠ যুক্তিবুদ্ধিও এইরূপ সম্পূর্ণ স্বাধীন ও অপ্রতিহতভাবে কাজ করে না; কিন্তু তার এই বিফলতার কারণ এই যে প্রথমতঃ এটি এখনো নিম্ন অর্ধ-পাশবিক ক্রিয়ার সঙ্গে মিশ্রিত থাকে, আর দ্বিতীয়তঃ এ হল অশুদ্ধ ও সর্বদাই বাধাগ্রস্ত ও নিজের বিশিষ্ট ক্রিয়া থেকে একে নিম্নে টেনে আনা হয়। শুদ্ধ অবস্থায় এর উচিত নয় এই সব নিম্ন গতিবৃত্তিতে জড়িত হওয়া, বরং এর উচিত বিষয় থেকে সরে এসে নিস্পৃহভাবে পর্যবেক্ষণ করা, সদৃশ ও বিসদৃশের সঙ্গে তুলনা ও উপমানের শক্তির দ্বারা সমগ্রের মধ্যে তাকে সঠিক স্থানে স্থাপন করা, অবরোহ ও আরোহক্রমে অনুমানের দ্বারা সুনিরীক্ষিত সব তথ্য থেকে বিচার করা এবং সব কিছুকে স্মৃতিতে রেখে এবং পরিশুদ্ধ ও সুপরিচালিত কল্পনার দ্বারা সে সবকে সমৃদ্ধ ক'রে সব কিছুকে দেখা শিক্ষিত ও সংযত সিদ্ধান্তের আলোয়। এই হল শুদ্ধ মানসিক বুদ্ধি, আর নিঃস্বার্থ অবেক্ষা, সিদ্ধান্ত ও অনুমান এর বিধান ও বিশিষ্ট ক্রিয়া।

কিন্তু 'বুদ্ধি' কথাটি অন্য এক ও গভীরতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। মানসিক বুদ্ধি শুধু অবর বুদ্ধি, অন্য এক পরা বুদ্ধি আছে যা মানসিক বুদ্ধি নয়, বরং এক দর্শন, এ জ্ঞানের নিম্নস্থানীয় নয়, বরং ঊর্ধ্বে অবস্থিত[১], জ্ঞানের জন্য এ অন্বেষণ করে না বা দেখা তথ্যের উপর এর জ্ঞানলাভ নির্ভর করে না; বরং তার পূর্বেই সত্য এই বুদ্ধির অধিগত, এ সত্যকে শুধু বাইরে আনে এক প্রকাশক ও বোধিসম্পন্ন মননের সংজ্ঞায়। এই ঋতচিৎ জ্ঞানের যে নিকটতম অবস্থা মানবমন পেতে পারে তা এমন এক জ্যোতির্ময় প্রাপ্তির অপূর্ণ ক্রিয়া যা আসে যখন মননের এক প্রবল চাপ হয় এবং ধীশক্তি আবরণের পিছন থেকে অভ্রান্ত স্ফুরণের দ্বারা তেজঃপূর্ণ হয়ে এক উচ্চতর উদ্দীপনার বশে ভিতরে গ্রহণ করে জ্ঞানের বোধিত ও চিদাবিষ্ট শক্তির প্রচুর প্রবাহ। কারণ মানবের মধ্যে এক বোধিতমন আছে যা অতিমানসিক শক্তি থেকে আসা এইসব অন্তঃপ্রবাহধারার গ্রহীতা ও প্রণালী স্বরূপ। তবে আমাদের মধ্যে বোধি ও চিদাবেশের কার্য যেমন প্রকৃতিতে অপূর্ণ তেমন ক্রিয়ায় সবিরাম; সাধারণতঃ এ আসে অনলস ও সচেষ্ট হৃদয় বা ধীশক্তির দাবীর

[১] ভাগবত পুরুষকে বলা হয় অধ্যক্ষ, অর্থাৎ যিনি সকল কিছুর ঊর্ধ্বে পরম ব্যোমে সমাসীন হয়ে সে সব দেখেন ও নিয়ন্ত্রণ করেন ঊর্ধ্ব থেকে।

উত্তরে আর এমনকি তার সব দান সচেতন মনে আসার আগেই তারা তাদের উদ্দেশে উত্থিত মনন ও আস্পৃহার দ্বারা ইতিপূর্বেই প্রভাবিত হয়ে পড়ে এবং আর শুদ্ধ থাকে না বরং হৃদয় ও ধীশক্তির প্রয়োজনানুসারে পরিবর্তিত হয়, আবার তারা সচেতন মনে প্রবেশ করার পর তারা তৎক্ষণাৎ মানসিক বুদ্ধি দ্বারা অধিকৃত হয়ে বিকীর্ণ বা ছিন্নভিন্ন হয় যাতে তারা আমাদের অপূর্ণ সাধারণ বুদ্ধিগত জ্ঞানের সঙ্গে মিলতে পারে অথবা তারা হৃদয়ের কবলে এসে তার দ্বারা এমনভাবে পুনর্গঠিত হয় যাতে তারা আমাদের অন্ধ বা অর্ধ-অন্ধ ভাবময় সব তৃষ্ণা ও অভিরুচির উপযোগী হয় অথবা এমনকি তারা হীন সব লালসার আয়ত্তাধীন হয়ে বিকৃত হয় আমাদের বুভুক্ষা ও প্রচণ্ড সব আবেগের উগ্র ব্যবহারে।

যদি এই পরা বুদ্ধি এই সব অবর অঙ্গের প্রভাব মুক্ত হয়ে কাজ করতে পারে তাহলে এ সত্যের শুদ্ধ রূপ দিতে সক্ষম; এমন এক অন্তর্দর্শন পর্যবেক্ষণকে তার প্রভাবাধীন করবে বা পর্যবেক্ষণের স্থলাভিষিক্ত হবে যা ইন্দ্রিয়মানস ও বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যের উপর দাসসুলভ নির্ভরতাশূন্য হয়েই দেখতে সক্ষম; কল্পনার স্থলে আসবে সত্যের এক স্বয়ংনিশ্চিত চিদাবেশ, যুক্তিবিচারের স্থলে আসে বিভিন্ন সম্বন্ধে স্বতঃস্ফূর্ত বোধ এবং যুক্তিবিচার থেকে সিদ্ধান্তের স্থলে আসে এমন এক বোধি যার মধ্যে ঐসব সম্বন্ধ নিহিত, যা ঐসবের উপর কষ্ট ক'রে কিছু নির্মাণ করে না, নির্ণয়ের স্থলে আসে এমন এক মনন-দর্শন যার আলোয় সত্য প্রকট হবে অর বর্তমানে ব্যবহৃত যে আবরণকে আমাদের বুদ্ধিগত নির্ণয়কে ভেদ করতে হয় তা থেকে মুক্ত হয়ে; আবার স্মৃতিও নেবে তার ব্যাপকতর অর্থ যা সে পেয়েছিল গ্রীসীয় ভাবনায়, ব্যক্তি তার বর্তমান জীবনে যে ভাণ্ডার গঠন করে তা থেকে এক তুচ্ছ নির্বাচন এ আর হবে না, বরং এ হবে এমন এক জ্ঞান যা সব কিছুকে লিপিবদ্ধ করে নিগূঢ়ভাবে ধরে রাখে, এবং সর্বদাই নিজে থেকে সব কিছু দেয় অথচ এখন আমাদের মনে হয় যে আমরা কষ্ট করে আহরণ করছি কিন্তু প্রকৃত অর্থে তা স্মরণ করা, এমন এক জ্ঞান যার মধ্যে অতীতের মতো ভবিষ্যৎও[১] নিহিত থাকে। এ কথা নিশ্চিত যে ঋত-চিৎ জ্ঞানের এই উচ্চতর শক্তি গ্রহণে সক্ষম হবার জন্য বিকশিত হওয়াই আমাদের জীবনের তাৎপর্য কিন্তু এখনো পর্যন্ত এর পূর্ণ ও অনাবৃত প্রয়োগ দেবতাদের বিশিষ্ট অধিকার, আমাদের বর্তমান মানবীয় উচ্চতার অতীত।

তাহলে আমরা দেখি আমরা সঠিক কি বুঝি বুদ্ধি বলতে এবং কি বুঝি সেই উচ্চতর শক্তি বলতে যাকে আমরা সুবিধার জন্য নাম দিতে পারি আদর্শ শক্তি এবং যার সঙ্গে বিকশিত ধীশক্তির অনেকটা তেমন সম্বন্ধ যেমন অবিকশিত মানবের অর্ধপাশব যুক্তিবুদ্ধির সঙ্গে ধীশক্তির সম্বন্ধ। এও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে যথার্থ জ্ঞানলাভের বিষয়ে বুদ্ধি তার কাজ ঠিক মতো করতে সক্ষম হবার পূর্বে কি প্রকার শুদ্ধীকরণ আবশ্যক। সকল

[১] এই অর্থে ভবিষ্যদ্বাণীর সামর্থ্যকে ঠিকই বলা হয় ভবিষ্যতের স্মৃতি।

অশুদ্ধতাই কর্মপ্রণালীর বিশৃঙ্খলা, বিষয়সমূহের ধর্ম থেকে অর্থাৎ তাদের উচিত ও স্বকীয় যথার্থ ক্রিয়া থেকে বিচ্যুতি অথচ বিষয়গুলি তাদের সঠিক ক্রিয়ায় শুদ্ধ এবং আমাদের সিদ্ধির সহায়কর; সাধারণতঃ এই বিচ্যুতি ঘটে বিভিন্ন ধর্মের অজ্ঞানময় 'সংকর' থেকে যাতে বৃত্তির ক্রিয়া চলে অপর এমন সব প্রবণতার দাবী অনুযায়ী যেগুলি যথার্থতঃ তার নিজের নয়।

বুদ্ধিতে অশুদ্ধির প্রথম কারণ হল চিন্তাবৃত্তিতে কামনার সংমিশ্রণ, আর কামনা স্বয়ং আমাদের সত্তার প্রাণিক ও ভাবাবেগময় অংশের মধ্যে জড়িত সঙ্কল্পের এক অশুদ্ধি। যখন প্রাণিক ও ভাবাবেগময় সব কামনা শুদ্ধ জ্ঞানৈষণাকে বাধা দেয় তখন মননবৃত্তি তাদের অধীন হয়ে পড়ে, তার যোগ্য উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য সব উদ্দেশ্যসাধনে প্রবৃত্ত হয় আর তার সব বোধ রুদ্ধ ও বিশৃঙ্খল হয়। কামনা ও ভাবাবেগের আক্রমণের অতীতে নিজেকে উত্তোলন করা বুদ্ধির অবশ্য কর্তব্য আর যাতে সে সম্পূর্ণভাবে তাদের প্রভাবমুক্ত হতে পারে সেজন্য তার কর্তব্য সব প্রাণিক অংশ ও ভাবাবেগকেই শুদ্ধ করা। ভোগ করা প্রাণসত্তার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত কিন্তু ভোগের নির্বাচন বা অনুসরণ করা নয়; এসব নিরূপণ ও অর্জন করা চাই উচ্চতর বৃত্তির দ্বারা; সুতরাং প্রাণসত্তাকে এই শিক্ষা দেওয়া চাই যে তার উচিত শুধু সেই লাভ বা ভোগ স্বীকার করা যা তার কাছে আসে দিব্য সঙ্কল্পের কর্মপ্রণালী অনুযায়ী প্রাণের যথার্থ ব্যাপ্রিয়াতে; আরো উচিত নিজেকে লালসা ও আসক্তি থেকে মুক্ত করা। সেইরকম হৃদয়কে মুক্ত করা চাই প্রাণ-তত্ত্ব ও সব ইন্দ্রিয়ের লালসার বশ্যতা থেকে এবং এইভাবে হৃদয়ের কর্তব্য ভয়, ক্রোধ, ঘৃণা, কাম প্রভৃতি যে মিথ্যা ভাবাবেগগুলি হৃদয়ের প্রধান অশুদ্ধি সেসব থেকে নিজেকে মুক্ত করা। প্রেমের সঙ্কল্প হৃদয়ের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত কিন্তু এক্ষেত্রেও প্রেমের নির্বাচন ও তা পাবার চেষ্টা ত্যাগ করা বা শান্ত করা চাই; হৃদয়কে অবশ্যই শেখান চাই গভীর ও তীব্রভাবে ভালবাসতে কিন্তু সে গভীরতা হবে শান্ত, সে তীব্রতা হবে সুস্থির ও সম, তা বিক্ষুব্ধ ও বিশৃঙ্খল হবে না। বুদ্ধিকে প্রমাদ, অজ্ঞান ও কুটিলতার প্রভাব থেকে মুক্ত করার প্রথম সর্তই হল ঐ সব অঙ্গকে শান্ত ও বশীভূত করা'। এই শুদ্ধির ফলে স্নায়বিক সত্তা ও হৃদয়ের উপর সম্পূর্ণ সমত্ব বিরাজ করে; সুতরাং সমত্ব যেমন কর্মমার্গের প্রথম কথা তেমন এ হল জ্ঞানমার্গেরও প্রথম কথা।

বুদ্ধিতে অশুদ্ধির দ্বিতীয় কারণ হল ইন্দ্রিয়সমূহের ভ্রান্তি এবং চিন্তাবৃত্তির মধ্যে ইন্দ্রিয়মানসের সংমিশ্রণ। এমন কোন জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান হতে পারে না যা ইন্দ্রিয়সমূহের অধীন অথবা সেসবকে প্রথম নির্দেশক হিসেবে ছাড়া অন্যভাবে ব্যবহার করে কারণ তাদের দেওয়া সব তথ্যকে সর্বদাই সংশোধন ও অতিক্রম করা দরকার। আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় বিশ্বশক্তির কর্মপ্রণালীগুলিকে যে সব আপাতরূপে চিত্রিত করে তাদের মূলে যেসব সত্য আছে সেসবের পরীক্ষাতেই শুরু হয় প্রাকৃত বিজ্ঞান; আর

[1] শম ও দম

বিষয়সমূহের যেসব তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ভ্রান্ত ধারণা জন্মায় সেগুলির পরীক্ষাতে শুরু হয় দর্শনশাস্ত্র; আর অধ্যাত্ম জ্ঞান শুরু হয় যখন আমরা ইন্দ্রিয়পর জীবনের সব সঙ্কীর্ণতাকে সত্য বলে গ্রহণ করতে অথবা দৃশ্যমান ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহকে সদ্‌বস্তুর প্রাতিভাসিকের বেশী কিছু বলতে অস্বীকার করি।

সমভাবে ইন্দ্রিয়মানসকে নিস্তব্ধ করা চাই আর তাকে শেখান চাই যে তার কর্তব্য মননের ব্যাপারকে মনের হাতে ছেড়ে দেওয়া কারণ মনই বিচার করে ও বোঝে। যখন আমাদের বুদ্ধি ইন্দ্রিয়মানসের ক্রিয়া থেকে পিছিয়ে দাঁড়িয়ে তার মিশ্রণকে প্রতিহত করে তখন ইন্দ্রিয়মানস বুদ্ধি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে আর তখন দেখা সম্ভব হয় যে এটি পৃথকভাবে কর্মরত। তখন তার যে স্বরূপ সে প্রকট করে তাতে দেখা যায় যে সে অভ্যাসগত সব প্রত্যয়, সাহচর্য, বোধ, কামনার এমন এক অশ্রান্ত ঘূর্ণায়মান ও আবর্তনশীল নিম্নস্রোত যার মধ্যে কোন প্রকৃত পরম্পরা, শৃঙ্খলা বা আলোর তত্ত্ব থাকে না। এ হল বৃত্তাকারে এক অবিরাম পুনরাবৃত্তি — নির্বোধ ও নিরর্থক। সাধারণতঃ মানববুদ্ধি এই নিম্নস্রোতকে স্বীকার ক'রে চেষ্টা করে তার মধ্যে কিছুটা শৃঙ্খলা ও পরম্পরা গড়তে; কিন্তু এইভাবে কাজ করায় সে নিজেই তার অধীন হয়ে পড়ে আর তার নিজের মধ্যেই আসে বিশৃঙ্খলা, অস্থিরতা, অভ্যাসের নিকট নির্বোধ দাসত্ব এবং অন্ধ উদ্দেশ্যহীন পুনরাবৃত্তি; তার ফলে সাধারণ মানবীয় যুক্তিবুদ্ধি পরিণত হয় এক ভ্রান্তিজনক, সীমিত এবং এমনকি তুচ্ছ ও নিরর্থক যন্ত্রে। এই চপল, অস্থির, উগ্র ও চাঞ্চল্যজনক বিষয়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রেখে আমাদের উচিত তা থেকে মুক্ত হওয়া, — হয় তাকে প্রথম বিচ্ছিন্ন করে ও পরে নিস্তব্ধ করে অথবা মননে এমন একাগ্রতা ও অনন্যতা এনে যাতে সে নিজেই বর্জন করতে পারে এই ভিন্নধর্মী বিভ্রান্তিকর উপাদান।

অশুদ্ধির এক তৃতীয় কারণের উৎপত্তি হয় বুদ্ধি থেকেই; এই কারণ হল জ্ঞানৈষণার অযথার্থ ক্রিয়া। ঐ এষণা বুদ্ধির স্বভাব কিন্তু এখানেও নির্বাচন এবং জ্ঞানের জন্য অসম প্রচেষ্টা ব্যাহত ও বিকৃত করে। তাদের থেকে এমন এক পক্ষপাতিত্ব ও আসক্তি আসে যার ফলে ধীশক্তি কতকগুলি ভাবনা ও মতামত আঁকড়ে থাকে আর অল্পবিস্তর একগুঁয়েমির সঙ্গে অন্য সব ভাবনা ও মতামতের সত্য উপেক্ষা করে, কোন সত্যের কতকগুলি অংশ আঁকড়ে থাকে আর অন্য যেসব অংশ তার পূর্ণতার পক্ষে তখনো প্রয়োজনীয় সেসব স্বীকার করতে সঙ্কুচিত হয়, জ্ঞানের কতকগুলি পূর্বানুরাগের ধারা আঁকড়ে থাকে আর যে সকল জ্ঞান ভাবুকের অতীতের দ্বারা গঠিত মননের ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির প্রতিকূল তা বর্জন করে। এসবের প্রতীকারের জন্য দরকার মনের সম্পূর্ণ সমত্ব, ধীশক্তির সম্পূর্ণ সত্যনিষ্ঠা এবং মানসিক নিস্পৃহতার পূর্ণতা। শোধিত বুদ্ধি যেমন কোন কামনা বা লালসার অনুগত হবে না তেমন কোন বিশেষ ভাবনা বা সত্যের প্রতি পূর্ব আকর্ষণ বা বিতৃষ্ণার বশবর্তী হবে না এবং এমনকি যেসব ভাবনা সম্বন্ধে এ অতীব নিশ্চিত সেসবেও আসক্ত হতে সে অস্বীকার করবে, অথবা তাদের উপর এমন

কোন অযথা গুরুত্ব দেবে না যাতে সত্যের ভারসাম্য নষ্ট হয় অথবা সম্পূর্ণ ও নিখাদ জ্ঞানের অন্যান্য উপাদানের মূল্য হ্রাস পায়।

এইভাবে শুদ্ধ-করা বুদ্ধি হল ধীসম্পর্কীয় মনন ও সত্তার এক সম্পূর্ণ, সমগ্র ও নিখুঁত যন্ত্র যা বাধা ও বিকৃতির সব নিম্নতর উৎস থেকে মুক্ত হয়ে আত্মা ও বিশ্বের বিভিন্ন সত্য সম্বন্ধে ধীশক্তির পক্ষে যতদূর সম্ভব ততদূর প্রকৃত ও সম্পূর্ণ বোধ লাভ করতে সমর্থ হবে। কিন্তু সত্যজ্ঞানের জন্য আরো কিছু প্রয়োজনীয় কারণ সত্যজ্ঞান আমাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এমন কিছু যা ধীশক্তির অতীত। যাতে বুদ্ধি আমাদের সত্য-জ্ঞানলাভে কোন বাধা না দিতে পারে, সেজন্য আমাদের দরকার সেই অতিরিক্ত কিছুতে উন্নীত হওয়া এবং এমন এক সামর্থ্য বিকাশ করা যা সক্রিয় ধীসম্পন্ন চিন্তাবিৎ-এর পক্ষে অতীব দুরূহ এবং তার স্বাভাবিক প্রবণতার পক্ষে অরুচিকর অর্থাৎ ধীশক্তির নিষ্ক্রিয়তার সামর্থ্য। এতে দুটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, সুতরাং দুটি বিভিন্ন প্রকারের নিষ্ক্রিয়তা অর্জন করা দরকার।

প্রথমতঃ আমরা দেখেছি যে ধীশক্তির মনন নিজেই অপূর্ণ এবং শ্রেষ্ঠ চিন্তন সে নয়; শ্রেষ্ঠ তাই যা আসে বোধিত মনের মাধ্যমে এবং অতিমানসিক শক্তি থেকে। যতদিন আমরা বুদ্ধিগত অভ্যাস এবং অবর কর্মপ্রণালীর বশে থাকি ততদিন বোধিত মন আমাদের কাছে তার সব বাণী পাঠাতে পারে শুধু অবচেতনভাবে, আর সচেতন মনে তা পৌঁছবার আগেই সেসব কম বেশী সম্পূর্ণভাবেই বিকৃত হয়ে পড়ে; অথবা যদি তা সচেতনভাবে সক্রিয় হয়, তাহলে তা হয় শুধু অপ্রচুর সূক্ষ্মতার সঙ্গে এবং তার ব্যাপ্রিয়াতেও থাকে অতীব অপূর্ণতা। আমাদের মধ্যকার পরতরা জ্ঞানশক্তিকে সুদৃঢ় করার জন্য আমাদের দরকার আমাদের মননের বোধিত ও ধীসম্পর্কীয় উপাদানগুলির মধ্যে সেই বিচ্ছিন্নতা আনা যা আমরা ইতিপূর্বেই এনেছি বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়মানসের মধ্যে; আর এ সহজ কাজ নয়, কারণ শুধু যে আমাদের বোধিগুলি বুদ্ধিগত ক্রিয়ার আবরণে আসে তা নয়, এমন অনেক মানসিক ক্রিয়াও আছে যেগুলি পরতরা শক্তির বেশে তার আকার অনুসরণ করে। এর প্রতিকার হল ধীশক্তিকে প্রথম এমন শিক্ষা দেওয়া যাতে তা আসল বোধিকে চিনতে ও মিথ্যা বোধি থেকে তার পার্থক্য বুঝতে সক্ষম হয় আর তারপর তাকে অভ্যস্ত করা চাই যে সে যখন কোন বুদ্ধিগত অনুভব পায় বা সিদ্ধান্তে পৌঁছয়, সে যেন তাকেই শেষ কথা না ভেবে বরং ঊর্ধ্বে তাকায়, এবং সব কিছুকে দিব্য তত্ত্বের নিকট স্থাপন করে যথাশক্তি সম্পূর্ণ নীরব হয়ে অপেক্ষা করে ঊর্ধ্ব থেকে আলোর জন্য। এইভাবে আমাদের অধিকাংশ বুদ্ধিগত চিন্তাকে জ্যোতির্ময় ঋতচিৎ দর্শনে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয় — যদিও আদর্শ হল সমগ্র সংক্রমন — অথবা অন্ততঃপক্ষে সম্ভব হয় ধীশক্তির পশ্চাতে কর্মরত আদর্শ জ্ঞানের পুনরাবৃত্তি, শুদ্ধতা ও চিৎশক্তির সম্যক্ বৃদ্ধিসাধন। ধীশক্তির এই শিক্ষা দরকার যে সে যেন আদর্শ শক্তির অধীনস্থ হয় ও তার কাছে নিষ্ক্রিয় থাকে।

কিন্তু আত্মার জ্ঞানের জন্য দরকার ধীশক্তির সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তার সামর্থ্য, সকল মনন

বিসর্জন করার সামর্থ্য, আদৌ চিন্তা না করার জন্য মনের সামর্থ্য পাওয়া; একস্থলে গীতাও এই নির্দেশ দিয়েছে। পাশ্চাত্ত্য মনের কাছে এ এক দুর্বোধ্য বিষয় কারণ তার কাছে মননই শ্রেষ্ঠ বিষয় এবং সে সহজেই ভুল করবে যে মনের চিন্তা না করার যে সামর্থ্য, এর সম্পূর্ণ যে নীরবতা — তা মননের অক্ষমতা। কিন্তু এই নীরবতার সামর্থ্য এক ক্ষমতা, অক্ষমতা নয়, এ এক সামর্থ্য, দুর্বলতা নয়। এ হল এক গভীর ও অন্তঃসমৃদ্ধ নিস্তব্ধতা। যখন সমগ্র সত্তার পরিপূর্ণ শুদ্ধতা ও শান্তির মধ্যে মন এইভাবে পুরোপুরি নিস্তব্ধ হয় স্বচ্ছ, নিশ্চল, নিস্তরঙ্গ জলের মত আর অন্তঃপুরুষ উর্ধ্বে ওঠে মনন ছাড়িয়ে কেবল তখনই আত্মা যা সকল ক্রিয়া ও সম্ভূতির অতীত ও উৎস, পরম নীরবতা যা থেকেই সকল কথার উৎপত্তি, পরমার্থসৎ যার আংশিক প্রতিফলন এই সকল সাপেক্ষ বিষয় — নিজেকে অভিব্যক্ত করতে সক্ষম হন আমাদের সত্তার শুদ্ধ স্বরূপে। শুধু সম্পূর্ণ নীরবতার মধ্যেই শোনা যায় পরম নীরবতা; শুধু বিশুদ্ধ শান্তির মধ্যেই প্রকট হয় তার পরম সত্তা। অতএব আমাদের কাছে 'তৎ'-এর নাম "নীরবতা" ও "শান্তি"।

চতুর্থ অধ্যায়

একাগ্রতা

শুদ্ধতার সাথে সাথে আর তা আনার সহায় হিসেবে একাগ্রতাও দরকার। বস্তুতঃ শুদ্ধি ও একাগ্রতা একই অবস্থার দুই দিক, — একটি স্ত্রী-প্রকৃতি, অন্যটি পুং-প্রকৃতি, নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয়; শুদ্ধতা সেই অবস্থা যাতে একাগ্রতা হয়ে ওঠে নিশ্ছিদ্র, যথার্থ ফলপ্রদ, সর্বসমর্থ; আবার শুদ্ধতা তার কাজ করে একাগ্রতার দ্বারা, একাগ্রতা না থাকলে শুদ্ধতার ফল হ'ত শুধু এক শান্তিপূর্ণ উপশম ও চিরন্তন বিশ্রামের অবস্থা। তাদের বিপরীতগুলিও নিবিড়ভাবে জড়িত; কারণ আমরা দেখেছি যে অশুদ্ধি হল বিভিন্ন ধর্মের সংকর, সত্তার বিভিন্ন অঙ্গের এক শিথিল, মিশ্রিত ও পরস্পরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্রিয়া; দেহধারী অন্তঃপুরুষের মধ্যস্থ সত্তার বিভিন্ন শক্তির উপর এর জ্ঞানের সঠিক একাগ্রতার অভাবেই এই বিশৃঙ্খলার উৎপত্তি। আমাদের প্রকৃতির দোষ প্রথমতঃ এই যে বিভিন্ন সব বিষয় যখন শৃঙ্খলাবিহীন বা নিয়ন্ত্রণবিহীন হয়ে মনের উপর এলোমেলোভাবে এসে পড়ে তখন তাদের সব সংস্পর্শে[১] এটি অসাড়ভাবে তাদের প্রভাবের অধীন হয় আর দ্বিতীয়তঃ তার বিবেচনাহীন অপূর্ণ একাগ্রতা যা আনা হয় অস্থির ও অনিয়মিতভাবে আর তাতে আকস্মিকভাবে কমবেশী গুরুত্ব দেওয়া হয় এই বা অপর সেই বিষয়ের উপর যাতে আমাদের নিম্ন মন আগ্রহী, — উচ্চতর অন্তঃপুরুষ বা বিচারক ও বিবেচক ধীশক্তি নয়; অথচ এই নিম্ন মন অস্থির, লম্ফমান, চঞ্চল, সহজেই ক্লান্ত হয়, সহজেই বিক্ষিপ্ত হয় আর এই হল আমাদের উন্নতির প্রধান শত্রু। এরকম অবস্থায় শুদ্ধতা, বৃত্তিসমূহের সঠিক ক্রিয়া, সত্তার বিশদ, অকলুষ ও জ্ঞানদীপ্ত শৃঙ্খলা অসম্ভব; পরিবেশ ও বাইরের সব প্রভাবের যদৃচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া বিভিন্ন কর্মধারা পরস্পরের মধ্যে সংঘাতে এসে রুদ্ধ, পথভ্রষ্ট. বিক্ষিপ্ত ও বিকৃত করতে বাধ্য। ঠিক সেই রকম, শুদ্ধতা না থাকলে, সঠিক মননে, সঠিক সঙ্কল্পে, সঠিক বেদনায় বা আধ্যাত্মিক অনুভূতির নিরাপদ স্থিতিতে সত্তার সম্পূর্ণ, সম, নমনীয় একাগ্রতা সম্ভব নয়। সুতরাং এই দুটির একসাথে অগ্রসর হওয়া চাই যেন একে সাহায্য করে অপরের বিজয়ে যতক্ষণ না আমরা লাভ করি সেই শাশ্বত শান্তি যা থেকে মানুষের মাঝে উদ্ভব হতে পারে সনাতন, সর্বসমর্থ ও সর্বদর্শী কার্যের কিছু আংশিক প্রতিমূর্তি।

কিন্তু ভারতবর্ষে জ্ঞানমার্গের যেভাবে অনুশীলন হয় তাতে একাগ্রতা এক বিশেষ ও সঙ্কীর্ণতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ মনের সকল বিক্ষেপকারী ক্রিয়া থেকে মননের সেই অপসারণ ও পরম একের ভাবনার উপর তার সেই একাগ্রতা যার দ্বারা অন্তঃপুরুষ

[১] বাহ্যস্পর্শ

উত্তরণ করে প্রাতিভাসিক থেকে এক সদ্‌বস্তুর মধ্যে। মননের দ্বারাই আমরা আমাদের বিকীর্ণ করি প্রাতিভাসিকের মধ্যে; আর মননকে তার নিজের মধ্যে আবার একত্র করেই আমাদের নিজেদের ফিরিয়ে নেওয়া চাই সত্যের মধ্যে। একাগ্রতার তিনটি সামর্থ্য আছে যার দ্বারা এই লক্ষ্যসাধন সম্ভব। যে কোন বিষয়ের উপর একাগ্রতার দ্বারা আমরা সমর্থ হই সেই বিষয়টিকে জানতে, তাকে তার প্রচ্ছন্ন সব রহস্য উন্মুক্ত করাতে। এই সামর্থ্যকে আমাদের ব্যবহার করা চাই বিভিন্ন বিষয় জানার জন্য নয়, অনপেক্ষ সদ্‌বিষয় জানার জন্য। আবার একাগ্রতার দ্বারা সমগ্র সঙ্কল্পকে একত্র করা সম্ভব হয় সেই বস্তু আহরণের জন্য যা এখনো অধরা, এখনো আমাদের অতীত; যদি এই সামর্থ্যকে পর্যাপ্ত শিক্ষা দেওয়া হয় আর এই সামর্থ্য যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে এক-চিত্ত ও অকপট, আত্ম-নিশ্চিত ও একমাত্র নিজের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয় আর তার শ্রদ্ধা যদি একান্ত হয় তাহলে যে কোন বিষয়েরই আহরণের জন্য তাকে আমাদের ব্যবহার করা সম্ভব, কিন্তু জগৎ যে নানাবিধ বিষয় আমাদের কাছে উপস্থাপিত করে সেসবের জন্য নয়, বরং তা ব্যবহার করা চাই আধ্যাত্মিকভাবে সেই বিষয় ধরার জন্য যা অন্বেষণের একমাত্র উপযুক্ত বস্তু এবং যা আবার জ্ঞানেরও একমাত্র উপযুক্ত বিষয়। আমাদের সমগ্র সত্তাকে তার যে কোন একটি স্থিতির উপর একাগ্র করে আমরা যা ইচ্ছা করি তাই হয়ে উঠতে পারি; উদাহরণস্বরূপ, যদি আমরা আগে নানাবিধ দুর্বলতা ও ভয়ের পিণ্ডই হয়ে থাকি, তবুও আমরা তার বদলে হয়ে উঠতে পারি ক্ষমতা ও সাহসের পাহাড় অথবা অতীব শুদ্ধতা, পবিত্রতা ও শান্তিপূর্ণ বা প্রেমের একমাত্র বিশ্বজনীন অন্তঃপুরুষ; কিন্তু বলা হয় যে এইসব জিনিস হবার জন্য এই সামর্থ্যকে ব্যবহার করা আমাদের উচিত নয়, যদিও আমরা বর্তমানে যা তার তুলনায় এইসব জিনিস অনেক উচ্চস্তরের, বরং আমাদের উচিত, ঐ সামর্থ্য ব্যবহার করা তাই হবার জন্য যা সকল বিষয়ের ঊর্ধ্বে, সকল ক্রিয়া ও গুণমুক্ত অর্থাৎ শুদ্ধ ও অনপেক্ষ পুরুষ। বাকী সবের, অপর সব একাগ্রতার যা মূল্য তা শুধু উচ্ছৃঙ্খল ও আত্মবিক্ষেপকারী মনন, সঙ্কল্প ও সত্তাকে তাদের সুমহান্ ও অন্যান্য উদ্দেশ্যসাধনের পথে প্রস্তুত করার জন্য, প্রাথমিক পদক্ষেপের জন্য, উত্তরোত্তর শিক্ষার জন্য।

একাগ্রতার অন্যপ্রকার অনুশীলনের মত এইপ্রকার অনুশীলন থেকেও বোঝা যায় পূর্বে এক শুদ্ধিসাধন হয়েছে; আরো বোঝা যায় যে এর পরিণতি ত্যাগ, নিবৃত্তি এবং সর্বশেষে সমাধির একান্ত ও বিশ্বাতীত অবস্থায় উত্তরণ; যদি এই সমাধি পরাকাষ্ঠা লাভ করে ও স্থায়ী হয় তাহলে বোধ হয় লাখে একজন ছাড়া আর কেউই ফিরে আসে না। কারণ ঐ উপায়ে আমরা যাই "সনাতনের পরম ধামে যেখান থেকে পুরুষ আর প্রত্যাবর্তন করে না" প্রকৃতির কর্মচক্রের মধ্যে[১]; যে যোগীর লক্ষ্য জগৎ থেকে মোক্ষলাভ সে শরীর ত্যাগের সময়ে চায় এই সমাধিরই মধ্যে চিরদিনের মত চলে যেতে। রাজযোগ সাধনায় আমরা এই পরম্পরা দেখি। কারণ রাজযোগীর কর্তব্য হল

[১] যতো নৈব নিবর্তন্তে তৎ ধাম পরমম্ মম।

প্রথম কিছু নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শুদ্ধতা লাভ; মনের নিম্ন বা অধোমুখী কাজকর্ম থেকে নিজেকে মুক্ত করা তার দরকার, আর পরে তার কর্তব্য হল মনের সকল ক্রিয়াই বন্ধ ক'রে নিজেকে সেই একটিমাত্র ভাবনায় একাগ্র করা যা নিয়ে যায় ক্রিয়া থেকে উপশমের অবস্থায়। রাজযোগে একাগ্রতার অনেকগুলি পর্যায় আছে, যেমন এক পর্যায়ে বিষয়টিকে গ্রহণ করা হয়, দ্বিতীয় পর্যায়ে তাকে ধারণ করা হয়, তৃতীয় পর্যায়ে মন সেই স্থিতির মধ্যে লীন হয়, যে স্থিতিকে বিষয়টি সূচিত করছে বা একাগ্রতা স্থিতিকে যেখানে নিয়ে গিয়েছে; আর শুধু শেষ পর্যায়টিকে রাজযোগে বলা হয় সমাধি যদিও পদটির আরো ব্যাপকতর অর্থে প্রয়োগ সম্ভব, যেমন গীতায় করা হয়েছে। কিন্তু রাজযোগের সমাধির মধ্যেও স্থিতিভেদে বিভিন্ন পর্যায় আছে যেমন এক পর্যায়ে মন বাইরের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হলেও তখনো মননের জগতে ধ্যান করে, চিন্তা করে, অনুভব করে; আর একটি পর্যায়ে মন তখনো প্রাথমিক মনন রূপায়ণে সমর্থ, এবং অন্য এক পর্যায়ে মনের সব বহির্ধাবন, এমনকি তার নিজের মধ্যেও, নিবৃত্ত হওয়ায় অন্তঃপুরুষ মন ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বে ওঠে অব্যবহার্য ও অনুপাখ্যের নীরবতার মধ্যে। বস্তুতঃ সকল যোগেই মননের একাগ্রতাসাধনের সহায়স্বরূপ অনেক বিষয় আছে, যেমন রূপ, মননের বাচনিক সূত্র, অর্থপূর্ণ নাম; এ সকলই এই সাধন-করার কাজে মনের অবলম্বনস্বরূপ,[১] এ সকলেরই ব্যবহার দরকার আবার তাদের অতিক্রম করাও দরকার; উপনিষদ বলে, শ্রেষ্ঠ অবলম্বন হল রহস্যপূর্ণ পদ "অউম্" যার তিনটি অক্ষর ব্রহ্ম বা পরমাত্মার তিনটি পাদের সূচক — জাগ্রত পুরুষ, স্বপ্ন পুরুষ ও সুষুপ্তি পুরুষ আর সমগ্র শক্তিশালী নাদ ঊর্ধ্বে ওঠে তার দিকে যা যেমন ক্রিয়ার অতীত, তেমন স্থিতিরও অতীত[২]। কারণ সকল জ্ঞানযজ্ঞেরই অন্তিম লক্ষ্য হল বিশ্বাতীত (অতিষ্ঠা)।

কিন্তু পূর্ণযোগের লক্ষ্য সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা তাতে এই লক্ষ্য আরো জটিল ও কম ব্যতিরেকী — কম ব্যতিরেকী এইভাবে যে আমরা যেমন অন্তঃপুরুষের পরতম অবস্থাকে সৎ বলি ও বাদ দিই না, তেমন দিব্য বিকিরণকেও অসৎ বলি না ও বাদ দিই না। একথা ঠিক যে আমাদের তাঁকে পাওয়া দরকার যিনি সর্বোত্তম, সকল কিছুর উৎস, আবার সর্বাতীত, কিন্তু যা তিনি অতিক্রম করেন তা বাদ দিয়ে নয়, বরং অন্তঃপুরুষের এক দৃঢ় অনুভূতি ও পরম অবস্থার উৎস হিসেবে যা অপর সকল অবস্থাকে রূপান্তরিত করে আমাদের জগৎ সম্বন্ধীয় চেতনাকে পুনর্গঠিত করবে তার নিগূঢ় পরম সত্যের রূপে। বিশ্ব সম্বন্ধে সকল চেতনাকে আমরা আমাদের সত্তা থেকে উচ্ছেদ করতে চাই না, আমরা চাই ভগবান, সত্য এবং পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে যেমন বিশ্বের মধ্যে তেমন তার অতীতেও। সুতরাং আমরা যে শুধু অনুপাখ্যকে চাইব তা নয়, আমরা তাঁর অভিব্যক্তিকেও চাইব যাতে তিনি অনন্ত সত্তা, চেতনা ও আনন্দরূপে বিশ্বকে আলিঙ্গন

[১] অবলম্বন

[২] মাণ্ডুক্য উপনিষদ

করে আছেন ও তার মধ্যে লীলারত। কারণ সেই ত্রিবিধ আনন্ত্যই তাঁর পরম অভিব্যক্তি এবং আমাদের আস্পৃহা হবে তা জানা, তাতে অংশ নেওয়া ও তা-ই হওয়া; আবার যেহেতু আমরা এই পরম ত্রিত্বকে উপলব্ধি করতে চাই শুধু তাঁর স্বরূপে নয়, তাঁর বিশ্বলীলার মধ্যেও, সেহেতু আমাদের আরো আস্পৃহা হবে তাঁর যে গৌণ অভিব্যক্তি, তাঁর যে দিব্য সম্ভূতি সেই বিশ্বাত্মক দিব্য সত্য, জ্ঞান, সঙ্কল্প, প্রেমের জ্ঞানলাভে ও তাতে যোগদানে। এর সঙ্গেও নিজেদের এক করতে আমাদের আস্পৃহা হবে, এর দিকেও উঠতে আমাদের চেষ্টা হবে, আর এই চেষ্টার পর্ব শেষ হলে আমরা আমাদের সকল অহং-ভাব ত্যাগ করে একে সুযোগ দেব যেন এ আমাদের সত্তাতে নিজের মধ্যে উপরে আমাদের টেনে নেয় এবং আমাদের মধ্যে নেমে এসে আমাদের আলিঙ্গন করে তার সকল সম্ভূতিতে। এই সাধনা করা হবে শুধু যে তাঁর পরম অতিস্থিতির দিকে অগ্রসর হবার ও তাতে প্রবেশ করার উপায় হিসেবে তা নয়, তা করা হবে অ-তিষ্ঠাকে অধিগত করলেও ও তাঁর দ্বারা অধিগত হলেও বিশ্বের অভিব্যক্তির মধ্যে দিব্য জীবন সম্ভব করার জন্য।

আমাদের পক্ষে তা করা সম্ভব হতে হলে 'একাগ্রতা' ও 'সমাধি' এই দুটি কথার অর্থ আমাদের কাছে আরো সমৃদ্ধ ও গভীর হওয়া দরকার। আমাদের সকল একাগ্রতা দিব্য "তপঃ"-র শুধু এক প্রতিমূর্তিমাত্র আর এর দ্বারাই আত্মা যেমন নিজের মধ্যে সমাহিত হয়ে অবস্থান করেন, তেমন নিজের মধ্যে অভিব্যক্ত হন, অভিব্যক্তিকে পালন ও অধিগত করেন, আবার সকল অভিব্যক্তি থেকে নিবৃত্ত হন তাঁর পরম একত্বের মধ্যে। যখন সত্তা আনন্দের জন্য নিজের উপরেই চেতনার মধ্যে অধিষ্ঠান করেন তখন এ হল দিব্য তপঃ, আর যখন জ্ঞানসঙ্কল্প চেতনার শক্তিতে নিজের উপর ও তাঁর সব অভিব্যক্তির উপর অধিষ্ঠিত হন, তখন এ হল দিব্য একাগ্রতার সার, যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ। ভগবানের যে আত্ম-বিশেষণের মধ্যে আমরা বাস করি তা স্বীকার করা হলে একাগ্রতা সেই উপায় যার দ্বারা ব্যষ্টি পুরুষ নিজেকে এক করে আত্মার যে কোন রূপ, অবস্থা বা মনস্তাত্ত্বিক আত্ম-অভিব্যক্তির (ভাব) সঙ্গে এবং সেসবে প্রবিষ্ট হয়। ভগবানের সঙ্গে একাত্মতা লাভের জন্য এই উপায় অবলম্বনই দিব্যজ্ঞান লাভের সর্ত এবং সকল জ্ঞানযোগের মূলসূত্র।

এই একাগ্রতা অগ্রসর হয় পরম ভাবনার দ্বারা আর তা মনন, রূপ ও নাম ব্যবহার করে চাবিকাঠি রূপে যা একাগ্র মনের কাছে উপস্থাপিত করে সকল মনন, রূপ ও নামের পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন সত্যকে; কারণ এই ভাবনার মাধ্যমেই মনোময় পুরুষ উর্ধ্বে ওঠে সকল প্রকাশ ছাড়িয়ে সেই বস্তুতে যা প্রকাশিত হয়, সেই বস্তুতে যার শুধু যন্ত্র ঐ ভাবনা। ভাবনার উপর একাগ্রতার দ্বারা, বর্তমানে আমরা যা সেই মনোময় সত্তা আমাদের মানসিকতার প্রাকার ভেঙে ফেলে উপনীত হয় চেতনার সেই অবস্থায়, সত্তার সেই অবস্থায়, চিন্ময়সত্তার সামর্থ্যের ও চিন্ময়সত্তার আনন্দের সেই অবস্থায় যার অনুরূপ ও যার প্রতীক, গতিবিধি ও ছন্দ ঐ ভাবনা। সুতরাং ভাবনার দ্বারা একাগ্রতা হল শুধু এক

উপায়, এক চাবিকাঠি যা দিয়ে আমাদের কাছে উন্মুক্ত করা যায় আমাদের সত্তার বিভিন্ন অতিচেতন "লোক"; আত্ম-বিৎ, আত্ম-আনন্দময় সত্তার সেই অতিচেতন সত্য, ঐক্য ও আনন্ত্যের মধ্যে উত্তোলিত আমাদের সমগ্র সত্তার এক বিশেষ আত্ম-সমাহিত অবস্থাই লক্ষ্য ও পরাকাষ্ঠা; আর এই অর্থই আমরা দেব "সমাধি" কথাটিতে। এর অর্থ শুধু যে বাহ্য জগতের চেতনা থেকে নিবৃত্ত হয়ে, এমনকি আন্তর জগতের চেতনা থেকেও নিবৃত্ত হয়ে এমন এক অবস্থায় প্রবেশ করা যা উভয়েরই উর্ধ্বে অবস্থিত — তা সে উভয়ের বীজস্বরূপে হ'ক বা এমনকি তাদের বীজাবস্থারও অতীত হয়েই হ'ক — তা নয়; বরং এ হল পরম এক ও অনন্তে যুক্ত ও একাত্ম হয়ে তাঁর মধ্যে দৃঢ় স্থিতি, আর এই স্থিতি অক্ষুণ্ণ থাকে যেমন আমাদের জাগ্রত অবস্থায় যখন আমরা বিষয়সমূহের রূপ সম্বন্ধে সচেতন থাকি; তেমন তখনও যখন আমরা নিবৃত্ত হই সেই আন্তর ক্রিয়ার মধ্যে যা বিষয়সমূহের বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে, তাদের নাম ও জাতিরূপের লীলার মধ্যে অধিষ্ঠিত; অথবা তখনও যখন আমরা উর্ধ্বে উঠি স্থিতিক আন্তরচেতনার অবস্থায় যেখানে আমরা উপনীত হই বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে এবং সকল তত্ত্বের মূল তত্ত্ব যে নাম ও রূপের বীজ তার মধ্যে[১]। কারণ যে অন্তঃপুরুষ গীতার অর্থে আসল সমাধিতে উপনীত হয়ে তাতে প্রতিষ্ঠিত (সমাধিস্থ) হন — তিনি সকল অনুভূতির যে মূল বস্তু তার অধিকারী হন এবং অন্য কোন অনুভূতিই তাঁকে সেখান থেকে বিচ্যুত করতে পারে না তা এইসব অনুভূতি শিখরে-আরোহণ-করেনি এমন ব্যক্তির পক্ষে যতই বিক্ষেপকারী হ'ক না কেন। তিনি সকল কিছুকেই আলিঙ্গন করতে সক্ষম হন তাঁর সত্তার পরিধির মধ্যে, কোন কিছুর দ্বারাই তিনি আবদ্ধ বা বিভ্রান্ত বা সীমিত হন না।

যখন আমরা এই অবস্থায় উপনীত হই যাতে আমাদের সকল সত্তা ও চেতনা একাগ্র থাকে তখন আর পরম ভাবনার উপর একাগ্রতার আবশ্যকতা থাকে না। কারণ সেখানে, সেই অতিমানসিক অবস্থায়, বিষয়সমূহের সবকিছুই উল্টে যায়। মন এমন এক জিনিস যা বাস করে আকীর্ণতায়, পরম্পরায়; এ শুধু এক সময়ে একটি জিনিসের উপরই একাগ্র হতে সক্ষম, আর যখন এ একাগ্র হয় না তখন সে অনেকটা উদ্দেশ্যহীনভাবে এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে ছোটাছুটি করে। সুতরাং তার একাগ্র হওয়া দরকার একটিমাত্র ভাবনায়, ধ্যানের একটিমাত্র প্রসঙ্গে, মনোনিবেশের একটিমাত্র বিষয়ে, সঙ্কল্পের একটিমাত্র উদ্দেশ্যে তবেই যদি এ সক্ষম হয় তাকে পেতে বা আয়ত্তে আনতে, আর এ তার করা চাই অন্ততঃ সাময়িকভাবে অন্য সবকিছু বাদ দিয়ে। কিন্তু যে তত্ত্ব মানসোত্তর এবং যার মধ্যে আমরা উঠতে চাই তা মননের চঞ্চল ধারা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ভাবনাসমূহের বিভাজন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভগবান নিজের মধ্যে কেন্দ্রীভূত এবং যখন তিনি বিভিন্ন ভাবনা ও কার্য বাইরে নিক্ষেপ করেন, তখন তিনি নিজেকে বিভক্ত করেন না বা তাদের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করেন না, বরং তাদের ও তাদের গতিবিধিকে তিনি

[১] অন্তঃপুরুষের জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থা।

ধারণ করেন তাঁর আনন্ত্যের মধ্যে; অবিভক্ত হয়েও তাঁর সমগ্র আত্মা থাকে প্রতি ভাবনা ও প্রতি গতিবিধির পশ্চাতে এবং একই সময় এটি থাকে সকল কিছুর সমষ্টির পশ্চাতে। তাঁর দ্বারা বিধৃত হয়ে প্রতি বিষয়টি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেকে বিকশিত করে, কোন পৃথক সঙ্কল্প-ক্রিয়ার মাধ্যমে নয়, বরং তার পশ্চাতের চেতনার সাধারণ শক্তির দ্বারা; যদি আমাদের মনে হয় যে প্রত্যেকের মধ্যে দিব্য সঙ্কল্প ও জ্ঞানের একাগ্রতা বর্তমান তবে সে একাগ্রতা বহুবিধ ও সম, এ কোন ব্যতিরেকী একাগ্রতা নয়, বরং আত্মসমাহিত ঐক্য ও আনন্ত্যের মধ্যে স্বচ্ছন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ত কর্মপ্রণালীই এর বাস্তবতা। যে অন্তঃপুরুষ দিব্য সমাধিতে উঠেছেন তিনি তাঁর প্রাপ্তির মাপ অনুযায়ী যোগদান করেন বিষয়সমূহের পরাবর্তিত অবস্থায়, — আর এই পরাবর্তিত অবস্থাই সত্যকার অবস্থা, কারণ যা আমাদের মানসিকতার উল্টো অর্থাৎ পরাবর্তিত অবস্থা তাই সত্য। এই কারণেই, যেমন প্রাচীন গ্রন্থসমূহে বলা হয়েছে — যে ব্যক্তি আত্মার অধিকার লাভ করেছেন, তাঁর আর মননে ও চেষ্টায় একাগ্রতার প্রয়োজন থাকে না, তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই জ্ঞান বা ফল লাভ করেন যা তাঁর অন্তঃস্থ ভাবনা বা সঙ্কল্প আলিঙ্গন করতে বাইরে প্রবৃত্ত হয়।

সুতরাং এই দৃঢ় দিব্যস্থিতি লাভ করাই আমাদের একাগ্রতার লক্ষ্য হওয়া চাই। একাগ্রতাসাধনে প্রথম করণীয় হল চঞ্চল মনকে সর্বদা শিক্ষা দেওয়া যেন সে কোন একটিমাত্র প্রসঙ্গ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট মননের একটিমাত্র ধারা স্থির ও অচঞ্চলভাবে অনুসরণ করায় অভ্যস্ত হয় আর এ তার করা চাই-ই এমনভাবে যাতে এ তার মনোযোগ বিচ্যুত করার সকল প্রলোভন ও প্রতিকূল আহ্বান অগ্রাহ্য ক'রে অবিক্ষিপ্ত থাকে। আমাদের সাধারণ জীবনে এরকম একাগ্রতা প্রায়ই আসে, কিন্তু মনকে নিযুক্ত রাখার জন্য যখন কোন বাহ্য বস্তু বা ক্রিয়া থাকে না তখন আন্তরভাবে এই একাগ্রতাসাধন আরো দুরূহ হয়ে ওঠে; অথচ এই আন্তর একাগ্রতাই জ্ঞানসাধকের অবশ্য সাধ্য[১]। আবার এও দরকার যে এ যেন শুধু বুদ্ধিগত চিন্তাবিৎ-এর সেই ক্রমান্বয়ী মনন না হয় যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল অবধারণ করা ও প্রত্যয়গুলিকে বুদ্ধিগত ভাবে যুক্ত করা। সম্ভবতঃ প্রথম অবস্থায় ছাড়া যা চাওয়া হয় তা যুক্তির ধারা ততটা নয়, যতটা সেই ভাবনার ফলপ্রদ সারতত্ত্বের উপর যথাসম্ভব অধিষ্ঠান করা যা তার উপর অন্তঃপুরুষের সঙ্কল্পের আগ্রহের জন্য সত্যের সকল দিকই প্রকাশ করতে বাধ্য। এইরকম যদি দিব্য প্রেম ধ্যানের প্রসঙ্গ হয় তাহলে প্রেমস্বরূপ ভগবানের ভাবনার সারতত্ত্বের উপর মনের এমনভাবে একাগ্র হওয়া উচিত যাতে দিব্য প্রেমের নানাবিধ অভিব্যক্তির জ্যোতির্ময় অভ্যুদয় হয় সাধকের শুধু মননে নয়, তার হৃদয়ে, সত্তায় ও দর্শনেও। হয়ত প্রথম আসে মনন ও তার পর অনুভূতি কিন্তু এও সমানই সম্ভব যে অনুভূতি প্রথম আসে আর অনুভূতি থেকেই জ্ঞানের উদয়

[১] আভ্যন্তরীণ বিতর্ক ও বিচারের প্রাথমিক পর্যায়ে মিথ্যা ভাবনাসমূহের সংশোধন করার জন্য এবং বুদ্ধিগত সত্যে পৌঁছানর জন্য।

হয়। পরে উপলব্ধ অনুভূতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে তাকে উত্তরোত্তর অধিগত করতে হবে যতক্ষণ না এটি স্থায়ী অনুভূতিতে পরিণত হয় এবং শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে সত্তার ধর্ম বা বিধান।

এই হল একাগ্রতাপূর্ণ ধ্যানের প্রণালী; কিন্তু আরো আয়াসসাধ্য পদ্ধতি হল সমগ্র মনকে একাগ্রতায় শুধু ভাবনার সারতত্ত্বে নিবদ্ধ করা যাতে উপনীত হওয়া যায় ভাবনার পশ্চাতে বস্তুটির স্বরূপে, প্রসঙ্গটির মনন জ্ঞানে নয়, বা মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতিতে নয়। এই প্রণালীতে মনন নিবৃত্ত হয়ে পরিণত হয় বিষয়ের তন্ময় বা আনন্দপূর্ণ অবধারণে অথবা আন্তর সমাধিতে তার মধ্যে নিমজ্জনে। যদি এই প্রণালী অনুসরণ করা হয় তাহলে পরে আমাদের কর্তব্য হল আমরা যে অবস্থাতে উঠি সে অবস্থাকে আবার নিম্নে আহ্বান করা যাতে এটি অবর সত্তাকে অধিগত করে ও তার আলো, সামর্থ্য ও আনন্দ বর্ষণ করে আমাদের সাধারণ চেতনার উপর। কারণ তা না হলে আমরা তাকে উন্নত অবস্থায় বা আন্তর সমাধির মধ্যে অধিগত করতে পারি, যেমন অনেকেই করে, — কিন্তু যখন আমরা জেগে উঠব অথবা জগতের সব সংস্পর্শের মধ্যে অবতরণ করব তখন তা আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে; আর এই অর্ধছিন্ন উপলব্ধি পূর্ণযোগের লক্ষ্য নয়।

আর একটি তৃতীয় প্রণালী আছে যাতে প্রথমে বিষয়টি সম্বন্ধে আয়াসসাধ্য ধ্যানের একাগ্রতাসাধন বা মননদৃষ্টির বিষয়টির আয়াসসাধ্য অবধারণ করা হয় না, বরং তাতে প্রথমেই মনকে সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ করা হয়। এই নিস্তব্ধতা আনা যায় নানা উপায়ে; একটি উপায় হল মানসিক ক্রিয়া থেকে পুরোপুরি সরে দাঁড়িয়ে তাতে যোগ না দিয়ে, শুধু তা নিরীক্ষণ করা যতক্ষণ না ঐ ক্রিয়া তার অননুমোদিত লাফালাফি ও ছোটাছুটিতে ক্লান্ত হয়ে উত্তরোত্তর শান্ত হতে থাকে ও শেষে সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে পড়ে। আর একটি উপায় হল সব মনন-আভাসন প্রত্যাখ্যান করা, যখনই সেগুলি আসে তখনই মন থেকে সেসব দূরে নিক্ষেপ করা এবং দৃঢ়ভাবে সত্তার সেই প্রশান্তিকে ধরে থাকা যা মনের বিক্ষোভ ও উদ্দামতার পশ্চাতে সর্বদা সত্যই বিরাজমান। যখন এই নিগূঢ় প্রশান্তির আবরণ উন্মোচিত হয় তখন সত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এক মহতী শান্তি আর তখন তার সঙ্গে সাধারণতঃ আসে সর্বব্যাপী নীরব ব্রহ্মের বোধ ও অনুভূতি, আর অন্য সবকিছু প্রথমে মনে হয় শুধু রূপ ও ছায়া। এই শান্তিকে ভিত্তি করে আর সবকিছু গঠন করা সম্ভব, তবে তা আর বিষয়সমূহের বাহ্যরূপের জ্ঞান ও অনুভূতিতে হবে না, তা হবে দিব্য অভিব্যক্তির গভীরতর সত্যের জ্ঞান ও অনুভূতিতে।

সাধারণতঃ একবার এই অবস্থা লাভ হলে আয়াসসাধ্য একাগ্রতার প্রয়োজন আর অনুভব হয় না। তার স্থলে আসবে সঙ্কল্পের[১] স্বচ্ছন্দ একাগ্রতা যা মননকে ব্যবহার করবে বিভিন্ন অবর অঙ্গকে আভাসন ও আলোক দেওয়ার জন্য। এই সঙ্কল্প তখন জোর করে চাইবে যে অন্নময় সত্তা, প্রাণিক জীবন, হৃদয় ও মন যেন নিজেদের পুনর্গঠন করে

[১] এই বিষয়টি আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে আত্মসিদ্ধি যোগের প্রসঙ্গে।

ভগবানের সেইসব রূপে যেগুলি নিজেদের প্রকট করে নীরব ব্রহ্ম থেকে। অঙ্গসমূহের পূর্ব প্রস্তুতি ও শুদ্ধি অনুযায়ী তারা দ্রুত বা মন্থর গতিতে বাধ্য হবে, অল্পবিস্তর সংগ্রামের পর সঙ্কল্প ও এর মনন-আভাসনের বিধান মেনে চলতে, যাতে শেষ পর্যন্ত ভগবানের জ্ঞান আমাদের চেতনাকে অধিগত করে এর সকল ভূমিতে এবং ভগবানের প্রতিমূর্তি নির্মিত হয় আমাদের মানব সত্তায় যেমন হয়েছিল প্রাচীন বৈদিক সাধকদের দ্বারা। পূর্ণযোগের জন্য এই হল সবচেয়ে সরল ও শক্তিশালী সাধনা।

পঞ্চম অধ্যায়

ত্যাগ

শুদ্ধীকরণ ও একাগ্রতার দ্বারা আমাদের সত্তার সকল অঙ্গের শিক্ষাকে যদি বলা যায় যোগ-শরীরের দক্ষিণ হস্ত, তাহলে ত্যাগ হল তার বাম হস্ত। শিক্ষা বা সুনির্দিষ্ট অনুশীলনের দ্বারা আমরা আমাদের মধ্যে সুদৃঢ় করি বিষয়সমূহের সত্য, সত্তার সত্য, জ্ঞানের সত্য, প্রেমের সত্য, কর্মের সত্য আর এইসব দিয়ে সরিয়ে দিই সেইসব মিথ্যা যা আমাদের প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন বা বিকৃত করেছিল; ত্যাগের দ্বারা আমরা মিথ্যাগুলিকে ধরে, তাদের মূল উৎপাটন করে সেসবকে আমাদের পথ থেকে দূরে ফেলে দিই যাতে তারা টিকে থাকার চেষ্টা করে, প্রতিরোধ তুলে বা বার বার ফিরে এসে আমাদের দিব্য জীবনযাত্রার সুখময় ও সুসঙ্গত উপচয়কে আর না ব্যাহত করে। ত্যাগ হল আমাদের সিদ্ধিলাভের জন্য এক অপরিহার্য যন্ত্র।

এই ত্যাগের পরিধি কতদূর বিস্তৃত? কি তার প্রকৃতি হবে, কিভাবেই বা তার প্রয়োগ হবে? মহতী ধর্মসম্বন্ধীয় শিক্ষা এবং গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতিশীল মহাপুরুষগণ দীর্ঘকাল ধরে যে এক সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যকে অনুমোদন করে এসেছেন তার কথা এই যে ত্যাগ যে শুধু শিক্ষা হিসেবে সম্পূর্ণ হবে তা নয়, সাধ্য হিসেবেও এটি সুনির্দিষ্ট ও চরম হবে, নিজের জীবন ও আমাদের ঐহিক সত্তাকেও ত্যাগ করা চাই, তার কম হলে চলবে না। এই বিশুদ্ধ, উন্নত ও মহীয়ান্ ঐতিহ্য গড়ে ওঠার কারণ অনেক। প্রথম গভীরতর কারণ হল আমাদের মানব বিবর্তনের বর্তমান পর্যায়ে এখনকার জাগতিক জীবনের কলুষময় ও অপূর্ণ প্রকৃতির সঙ্গে আধ্যাত্মিক জীবনযাত্রার প্রকৃতির আমূল বিরোধ; আর এই বিরোধের পরিণাম হল জাগতিক জীবনের সম্পূর্ণ বর্জন এই যুক্তিতে যে এ হল এক মিথ্যা, অন্তঃপুরুষের উন্মত্ততা, উদ্বেগপূর্ণ দুঃখের স্বপ্ন অথবা বড় জোর এক দোষযুক্ত আপাতসুন্দর নিঃসারপ্রায় বস্তু, আর না হয় বর্ণনা করা হয় যে এ হল প্রলোভনের রাজত্ব আর সুতরাং ভগবৎ-চালিত ও ভগবৎ-আকৃষ্ট পুরুষের পক্ষে এ শুধু অগ্নিপরীক্ষা ও প্রস্তুতির স্থান, অথবা এ হল বড়জোর সর্বভূত ভগবানের এক লীলা, পরস্পরবিরোধী উদ্দেশ্যসমূহের এক ক্রীড়া যা তিনি শ্রান্ত হয়ে পরিত্যাগ করেন। দ্বিতীয় কারণ হল ব্যক্তিগত মোক্ষের জন্য অন্তঃপুরুষের বুভুক্ষা, পরিশ্রম ও সংগ্রামের উদ্বেগ থেকে মুক্ত অবিমিশ্র আনন্দ ও শান্তির কোন উচ্চতর বা উচ্চতম শিখরে পলায়নের আকাঙ্ক্ষা; আর না হয় দিব্য আলিঙ্গনের নিবিড় আনন্দ ছেড়ে কর্ম ও সেবার অবর ক্ষেত্রে ফিরে আসায় তার অনিচ্ছা। কিন্তু তাছাড়া অন্য ছোট ছোট কারণও আছে যা আধ্যাত্মিক অনুভূতির সঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে জড়িত — আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও উপলব্ধির জীবনের সঙ্গে কর্মবহুল জীবনের সংযোগসাধন যে অতীব দুরূহ একটা প্রবলভাবে বোধ করা ও সে সম্বন্ধে

কার্যতঃ প্রমাণ পাওয়া এক কারণ, আবার আমরা ইচ্ছা করে এই দুরূহতাকে বাড়িয়ে বলি যে এই কাজ অসম্ভব; অন্য এক কারণ হল ত্যাগের কাজে ও অবস্থাতে মন যে আনন্দ পেতে শুরু করে তা — আর বাস্তবিকই মন যা কিছু পায় বা যাতে নিজেকে অভ্যস্ত করে তাতেই সে আনন্দ পায় — আর এই ত্যাগের আনন্দের সঙ্গে আছে জগৎ এবং মানুষের কামনার সব বস্তুগুলির প্রতি উদাসীনতা থেকে পাওয়া প্রশান্তি ও মুক্তির বোধ। সবচেয়ে হীনতম কারণগুলি হল — দুর্বলতা যা সংগ্রাম থেকে পিছিয়ে আসে, মহান্ জাগতিক পরিশ্রমে ভগ্নোদ্যম পুরুষের বিতৃষ্ণা ও নৈরাশ্য, সেই স্বার্থপরতা যাতে আমরা মৃত্যু ও পুনর্জন্মের সদাঘূর্ণায়মান করাল চক্র থেকে নিজেরা মুক্তি পেলেই সন্তুষ্ট থাকি, কিন্তু যারা আমাদের পিছনে পড়ে রইল তাদের কি হল সে সম্বন্ধে মাথা ঘামাই না, আয়াসরত মানবকুল থেকে যে আর্তনাদ ওঠে তার প্রতি উপেক্ষা।

পূর্ণযোগের সাধকের পক্ষে এসব কারণের কোনটিই যুক্তিযুক্ত নয়। দুর্বলতা ও স্বার্থপরতার সঙ্গে তার কোন কারবারই থাকতে পারে না, তা তারা যতই অধ্যাত্মপ্রবণ বা আধ্যাত্মিকবেশী হ'ক; দিব্য বল ও সাহস, দিব্য করুণা ও পরোপকারিতা এই সবকেই সে করতে চাইবে তার জীবনের উপাদান, এরাই ভগবানের সেই প্রকৃতি যা সে পরিধান করতে চাইবে আধ্যাত্মিক আলো ও সৌন্দর্যের পরিচ্ছদ হিসেবে। সেই বিরাট চক্রের আবর্তনে তার কোন ভয় বা বিভ্রান্তির বোধ আসে না; সে তার অন্তঃপুরুষের মধ্যে এর ঊর্ধ্বে উঠে উপর থেকে জানে তাদের দিব্য বিধান, তাদের দিব্য উদ্দেশ্য। মানবজীবন যাত্রার সঙ্গে দিব্য জীবনের সুসঙ্গতি সাধন, ভগবানের মধ্যে থাকা, অথচ আবার মানবের মধ্যে থাকা — এটি দুরূহ হলেও, এই দুরূহ সমস্যা সমাধানের জন্যই এখানে সে ব্রতী, এই সমস্যা এড়াবার জন্য নয়। এই জ্ঞান তার হয়েছে যে আনন্দ, প্রশান্তি ও মোক্ষ এক অপূর্ণ বিজয়মুকুট, কোন আসল প্রাপ্তি নয় যদি না তারা এমন এক অবস্থা গড়ে তোলে যা নিজেতেই নিরাপদ, অন্তঃপুরুষের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, নিঃসঙ্গতা বা নিষ্ক্রিয়তার উপর নির্ভরশীল নয় বরং ঝড়ঝঞ্ঝা, ছোটাছুটি ও যুদ্ধবিগ্রহেও দৃঢ় থাকে, জগতের আনন্দে বা তার কষ্টভোগে কলুষিত হয় না। দিব্য আলিঙ্গনের নিবিড় আনন্দ থেকেও সে বঞ্চিত হবে না কারণ সে কাজ করে মানবজাতির মধ্যে ভগবানের প্রতি দিব্য প্রেমের টানে; অথবা যদি মনে হয় যে সে ঐ আনন্দ থেকে কিছুক্ষণের জন্য বঞ্চিত হয়েছে তাহলেও সে অভিজ্ঞতার দ্বারা বোঝে যে তা পাবার জন্য তার নিজের পদ্ধতিতে যে অপূর্ণতা আছে তা তার থেকে দূর করার জন্যই তাকে আর একটু পরীক্ষা করা হচ্ছে। ব্যক্তিগত মোক্ষের জন্য সে আগ্রহী নয়, তবে সে তা চায় মানবের পরিপূর্ণতার জন্য আর এইজন্য যে যে ব্যক্তি নিজে বন্ধনের মধ্যে, সে সহজে অপরকে মুক্ত করতে অক্ষম — যদিও ভগবানের কাছে কিছুই অসম্ভব নয়; ব্যক্তিগত আনন্দের স্বর্গে যেমন তার আকাঙ্ক্ষা নেই, তেমন ব্যক্তিগত কষ্টভোগের নরকেও তার ভয় নেই। যদি আধ্যাত্মিক জীবন ও জাগতিক জীবনের মধ্যে কোন বিরোধ থাকে এখানে সে রয়েছে সেই ব্যবধান দূর করতে, সেই বিরোধকে সুসঙ্গতিতে রূপান্তরিত করতে। যদি জগৎ দেহপরায়ণতা ও

শয়তানের রাজত্ব হয়, তাহলে সেই কারণেই তো অমৃতের পুত্রদের আরো বেশী কর্তব্য হবে এখানে এসে তাকে জয় করা ভগবান ও পরম চিৎপুরুষের জন্য। যদি জীবন উন্মত্ততা হয় তাহলে কর্তব্য হবে লক্ষ লক্ষ মানবকে দিব্য যুক্তির আলোর মধ্যে আনা; এ যদি স্বপ্ন হয় আর সে স্বপ্ন যখন অত লোকের কাছে বাস্তব সত্য, তাহলে কর্তব্য হবে তাদের আরো মহৎ স্বপ্ন দেখান, নয়তো জাগিয়ে তোলা; যদি এ মিথ্যা হয়, তাহলে দরকার হল বিভ্রান্তদের সত্য দেওয়া। আর যদি বলা হয় যে জগৎ থেকে পলায়নের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দিয়েই জগৎকে আমরা বেশী সাহায্য করতে পারি, সেকথাও আমরা স্বীকার করব না কারণ আমরা এই বিপরীত দৃষ্টান্ত দেখি যে বড় বড় অবতারগণ এখানে আসেন এই দেখাতে যে বর্তমান জাগতিক জীবন বর্জন করে যে আমরা শুধু জগতের সাহায্য করতে পারি তা নয়, বরং আরো বেশী সাহায্য করতে পারি ঐ জীবন স্বীকার করে ও উন্নত করে। আর যদি এ জীবন সর্বসত্তার খেলা হয় তাহলে তো আমরাও সেই খেলায় নেমে আমাদের যে খেলা তা খেলতে পারি খুশী মনে ও সাহসের সঙ্গে, আমরাও সেই লীলায় আনন্দ পেতে পারি আমাদের দিব্য লীলাসহচরের সাথে।

কিন্তু সবচেয়ে বড় কারণ এই যে জগৎকে আমরা যে দৃষ্টিতে দেখি তাতে জগৎ-জীবন ত্যাগ করার প্রশ্ন আসে না যতক্ষণ আমরা এর উদ্দেশ্যসাধনে ভগবান ও মানবের কোন সহায় হতে পারি। আমরা জগৎকে শয়তানের রচনা বা অন্তঃপুরুষের আত্মবিভ্রম বলে দেখি না, আমরা দেখি তাকে ভগবানের অভিব্যক্তিরূপে, যদিও এখনো এ হল আংশিক অভিব্যক্তি, তবে উত্তরোত্তর প্রকাশমান ও বিবর্তনশীল। সুতরাং আমাদের কাছে যেমন জীবনত্যাগ জীবনের লক্ষ্য হতে পারে না তেমন জগৎ-বর্জনও জগৎ-সৃষ্টির উদ্দেশ্য হতে পারে না। আমরা চাই ভগবানের সঙ্গে আমাদের ঐক্য উপলব্ধি করতে কিন্তু আমাদের কাছে এই উপলব্ধির অর্থ মানবের সঙ্গে আমাদের ঐক্যের সম্পূর্ণ ও একান্ত অনুভব আর আমরা এ দুটিকে আলাদা করতে অক্ষম। খৃষ্টীয় ভাষায় বলা যায় ভগবানের পুত্রই আবার মানবের পুত্র আর সম্পূর্ণ 'খৃষ্টত্ব'র জন্য দুইটি উপাদানই প্রয়োজনীয়; অথবা ভারতীয় মননের প্রকাশ ভঙ্গিতে বলা যায় যে ভগবান নারায়ণের একটিমাত্র রশ্মি এই বিশ্ব, তিনি নরের মধ্যে প্রকট ও চরিতার্থ হন; সম্পূর্ণ নর, নর-নারায়ণ আর এই সম্পূর্ণতার মধ্যেই তিনি সৃষ্টির পরম রহস্যের প্রতীক।

সুতরাং আমাদের কাছে ত্যাগ হওয়া চাই এক সাধন মাত্র, কোন উদ্দেশ্য নয়; আবার এটি যে একমাত্র বা প্রধান সাধন হবে তাও নয়, কারণ আমাদের উদ্দেশ্য হল মানুষের মাঝে ভগবানের চরিতার্থতা, আর এই সদর্থক লক্ষ্যসাধন নেতিবাচক উপায়ে সম্ভব নয়। নেতিবাচক উপায় অবলম্বন করা যায় শুধু চরিতার্থতা সাধনের অন্তরায়ের অপসারণের জন্য। অবশ্য ত্যাগ চাই-ই — যা সব দিব্য চরিতার্থতা সাধনের বিপরীত বা বিরুদ্ধ সেসবের সম্পূর্ণ ত্যাগ আর যা সব কম বা আংশিক সিদ্ধি সেসবের উত্তরোত্তর ত্যাগ। আমাদের জাগতিক জীবনের প্রতি কোন আসক্তি রাখা চলবে না; যদি কোন আসক্তি থাকে, সে আসক্তি ত্যাগ করা চাই, আর তা ত্যাগ করা চাই সম্পূর্ণভাবে; কিন্তু

সেইরকম জগৎ থেকে পলায়ন বা মোক্ষ বা মহান্ আত্মনাশেরও প্রতি আমাদের কোন আসক্তি থাকা চলবে না; আর যদি এইরকম আসক্তি থাকে, তাও আমাদের ত্যাগ করা চাই, আর তা ত্যাগ করা চাই সম্পূর্ণভাবে।

আবার স্পষ্টতঃই আমাদের ত্যাগ হওয়া চাই আন্তর ত্যাগ; বিশেষতঃ এবং সর্বোপরি আমাদের ত্যাগ করা চাই — ইন্দ্রিয় ও হৃদয়ের মধ্যে আসক্তি ও কামনার লালসা, মনন ও ক্রিয়াতে একগুঁয়েমি, এবং চেতনার কেন্দ্রে অহং-ভাব। কারণ এই তিনটি তিন গ্রন্থিস্বরূপ যার দ্বারা আমরা অবর প্রকৃতির সঙ্গে বদ্ধ থাকি, আর যদি এগুলিকে আমরা সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করতে সক্ষম হই তাহলে আর এমন কোন কিছু নেই যা আমাদের বাঁধতে পারে। সুতরাং আসক্তি ও কামনা বর্জন করা চাই নিঃশেষে; জগতে এমন কিছুই নেই যাতে আমাদের আসক্ত থাকতেই হবে, ধন নয়, দারিদ্র্য নয়, আনন্দ নয়, কষ্টভোগ নয়, জীবন নয়, মৃত্যু নয়, মহত্ত্ব নয়, ক্ষুদ্রতা নয়, পাপও নয়, পুণ্যও নয়, বন্ধু, স্ত্রী, কি সন্তান কেউ নয়, দেশ বা আমাদের কর্ম, ব্রত নয় বা স্বর্গ, মর্ত্য নয়, এদের মধ্যে কিছু নয়, এদের বাইরেও কিছু নয়। তবে এর অর্থ এই নয় যে আমাদের ভালবাসার আদৌ কিছু নেই, আমাদের আনন্দ পাবার কিছু নেই; কারণ আসক্তি হল ভালবাসার মধ্যে অহং-ভাব, স্বয়ং ভালবাসা অর্থাৎ প্রেম নয়, কামনা হল আমোদ ও তৃপ্তির জন্য বুভুক্ষার মাঝে সঙ্কীর্ণতা ও অস্থিরতা, এটি বিষয়সমূহের মধ্যে দিব্য আনন্দলাভের অন্বেষণ নয়। আমাদের পাওয়া চাই এক বিশ্বজনীন প্রেম যা শান্ত অথচ চিরন্তন প্রখর — এত প্রখর যে সবচেয়ে প্রচণ্ড ভাবাবেগের ক্ষণিক তীব্রতাকেও এ ছাড়িয়ে যায়; আর চাই বিষয়সমূহের মধ্যে সেই আনন্দ যা দৃঢ়মূল ভগবৎ-আনন্দের, যা বিষয়সমূহের বিভিন্ন রূপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, তবে সংশ্লিষ্ট তার সঙ্গে যাকে তারা নিজেদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রেখেছে এবং যা বিশ্বকে আলিঙ্গন করে তার জালে আবদ্ধ না হয়ে[১]।

আমরা আগেই দেখেছি যে দিব্য কর্মমার্গে সিদ্ধি পেতে হলে মনন ও ক্রিয়াতে আমাদের একগুঁয়েমি সম্পূর্ণ বর্জন করা দরকার; দিব্যজ্ঞানেও সিদ্ধি পেতে হলে একে ঠিক তেমনই সম্পূর্ণ ত্যাগ করা প্রয়োজন। এই একগুঁয়েমির অর্থ মনের অহং-ভাব কারণ মন আসক্ত থাকে তার সব রুচি অরুচিতে, অভ্যাসে এবং মনন ও দৃষ্টিভঙ্গি ও সঙ্কল্পের অতীত বা বর্তমান গঠনে কেননা এসবকে সে মনে করে নিজ বা নিজের বলে আর তাদের চারিদিকে 'অহন্তা ও মমতা'-র সূক্ষ্ম সূতোর জাল বুনে মাকড়সার মত বাস করে সেই জালের মধ্যে। যেমন মাকড়সা তার জালের উপর কোন আক্রমণে বিরক্ত হয়, মনও তেমন বর্তমান অবস্থার কোন নাড়ানাড়ি ভালবাসে না, আর মাকড়সা যেমন নিজের জাল ছাড়া অন্য জালে অপরিচিত বোধ করে, তেমন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও গঠনের মধ্যে নিয়ে আসা হলে মনও অপরিচিত ও অসুখী বোধ করে। এই আসক্তিকে মন থেকে

[১] নির্লিপ্ত — বিষয়সমূহে দিব্য আনন্দ নিষ্কাম ও নির্লিপ্ত অর্থাৎ কামনাশূন্য ও সেজন্য নিরাসক্ত।

সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা চাই। অপ্রবুদ্ধ মন যেভাবে জগৎ ও জীবনের সঙ্গে তার স্বাভাবিক অঙ্গ হিসেবে লিপ্ত থাকে শুধু যে সেই সাধারণ মনোভাব আমাদের ত্যাগ করা দরকার তা নয়; আমাদের নিজেদের কোন মানসিক রচনায় বা কোন বুদ্ধিগত মনন-গঠনে বা ধর্মীয় মতবাদে বা ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্তেও আবদ্ধ থাকা আমাদের উচিত নয়; আমাদের যে শুধু মন ও ইন্দ্রিয়ের জাল ছিন্ন করা কর্তব্য তা নয়, চিন্তাবিৎ-এর জাল, ধর্মোপদেষ্টা ও সম্প্রদায়ের জাল, কথার ফাঁদ ও ভাবনার বাঁধনেরও ঊর্ধ্বে আমাদের যাওয়া দরকার। এইসব আমাদের মধ্যে অপেক্ষা করে আছে চিৎপুরুষকে রূপের মধ্যে আবদ্ধ করতে; কিন্তু আমাদের কর্তব্য সর্বদা উপরে যাওয়া, সর্বদাই ক্ষুদ্রকে ত্যাগ করা চাই আরো বৃহতের জন্য, সান্তকে ত্যাগ করা চাই অনন্তের জন্য; আমাদের প্রস্তুত হতে হবে যেন আমরা অগ্রসর হতে পারি এক জ্যোতি থেকে অন্য জ্যোতিতে, এক অনুভূতি থেকে অন্য অনুভূতিতে, অন্তঃপুরুষের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায়, তবেই তো আমরা পেতে পারি ভগবানের চরম অতিস্থিতি, তাঁর চরম বিশ্বভাব। এমনকি যে সত্যগুলি আমরা অকাট্য মনে করি সেগুলিতেও আমাদের আসক্ত থাকা উচিত নয়, কেননা এসব অনুপাখ্যের রূপ ও বহিঃপ্রকাশ অথচ অনুপাখ্যকে কোন রূপ বা প্রকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না; উপর থেকে আসা যে পরতর বাক্ নিজের অর্থের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না তার দিকে, যে দিব্য মনন নিজের মধ্যেই নিজের বিপরীত বহন করে তার আলোর দিকে আমাদের কর্তব্য নিজেদের উন্মুক্ত রাখা।

কিন্তু সকল প্রতিরোধের কেন্দ্র হল অহং-ভাব, আর আমাদের কর্তব্য হল একে খোঁজা প্রতি গুপ্ত স্থানে ও ছদ্মবেশে, আর সেখান থেকে টেনে বার করে তাকে বধ করা; কারণ এর ছদ্মবেশের অন্ত নেই, সম্ভবপর আত্মগোপনের সকল স্থানেই সে আঁকড়ে থাকে। প্রায়শঃই পরোপকারিতা ও উপেক্ষা তার সবচেয়ে সফল ছদ্মবেশ; তাকে খুঁজে বার করার জন্য যেসব দিব্য দূতকে পাঠান হয় তাদের সামনেই সে ঐ বেশে দাপটের সঙ্গে তার তাণ্ডব লীলা চালায়। এই ক্ষেত্রে পরম জ্ঞানের সূত্র আমাদের সহায় হয়; আমাদের মূল স্থিতিতে এইসব পার্থক্য আমাদের কাছে নিরর্থক, কারণ কোন আমি নেই, কোন তুমি নেই, আছেন শুধু এক দিব্য আত্মা যিনি সকল মূর্ত রূপের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান, ব্যষ্টি ও সমষ্টিতে সম, আর তাঁকে উপলব্ধি করা, তাঁকে প্রকাশ করা, তাঁকে সেবা করা এবং তাঁকে চরিতার্থ করাই একমাত্র কাজের কাজ। আত্মতৃপ্তি ও পরোপকারিতা, ভোগ ও উপেক্ষা — এসব মূল জিনিস নয়। যদি 'একমেব' পরমাত্মার উপলব্ধি, চরিতার্থতা ও সেবার জন্য আমাদের এমন কাজ করা দরকার হয় যা অপরের কাছে মনে হয় অহং-ভাবপূর্ণ আত্মসেবা বা আত্মপ্রচার বা মনে হয় অহমাত্মক ভোগ ও আত্মপরায়ণতা তাহলেও সে কাজ করা আমাদের কর্তব্য; লোকের মতামত অপেক্ষা অন্তঃস্থ দিশারীর নির্দেশ অনুসারেই আমাদের চলা চাই। পরিবেশের প্রভাবের কাজ প্রায়শঃই হয় অতি সূক্ষ্মভাবে; বাইরে থেকে লোকের চোখে আমাদের যাতে সবচেয়ে ভাল দেখায় আমরা তা-ই বেশী পছন্দ করি আর একরকম না জেনেই সেই বেশ ধরি,

আর ভিতরের চোখের উপর পর্দা পড়তে দিই। দারিদ্র্যের প্রতিজ্ঞার, বা সেবার বেশের বা উদাসীনতা বা ত্যাগ ও নিষ্কলঙ্ক সাধুত্বের বাহ্য প্রমাণের সাজ পরতেই আমাদের আকর্ষণ, কারণ ঐতিহ্য ও জনমত তাই-ই চায়; আর এইভাবেই আমরা বেশী সক্ষম হই আমাদের পরিবেশের উপর ছাপ রাখতে। কিন্তু এসবই মিথ্যা আত্মগরিমা ও বিভ্রান্তি। হয়ত আমাদের এইসব বেশ পরা দরকার হবে, কারণ হয়ত তা আমাদের সেবার সাধারণ বেশ হবে, কিন্তু আবার তা না হবার সম্ভাবনাও সমানই আছে। মানুষের বাইরের চক্ষুর মূল্য কিছু নেই; ভিতরের চক্ষুই সবকিছু।

আমরা গীতার শিক্ষায় দেখি অহং-ভাব থেকে যে মুক্তি দাবী করা হয় তা কত সূক্ষ্ম। অর্জুন যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছিলেন ক্ষমতার অহং-ভাবের বশে, ক্ষত্রিয়ের অহং-ভাবের বশে; আবার যুদ্ধ থেকে বিমুখ হলেন দুর্বলতার এক বিপরীত অহং-ভাবের বশে অর্থাৎ জুগুপ্সা, বিতৃষ্ণা ও মিথ্যা কৃপার ভাবে যা তার মন, স্নায়বিক সত্তা ও বিভিন্ন ইন্দ্রিয় আচ্ছন্ন করেছিল; আর এই কৃপা সেই দিব্য করুণা নয় যা বাহুতে বল দেয় ও জ্ঞানের স্বচ্ছতা আনে। কিন্তু এই দুর্বলতা আসে ত্যাগের বেশে, পুণ্যের পরিচ্ছদে: "বরং ভিক্ষুকের জীবন শ্রেয়ঃ, তবু এই রুধিরদগ্ধ ভোগ নয়, সমগ্র পৃথিবীর আধিপত্য আমি চাই না, এমনকি দেবগণের রাজ্যও আমি চাই না"। আমরা বলতে পারি দিব্যগুরু কি নির্বোধ যে তিনি এই মনোভাব দৃঢ় না করে আর একটি মহাপুরুষকে সন্ন্যাসীর দলভুক্ত করার মহান্ সুযোগ নষ্ট করলেন, নষ্ট করলেন জগতের সম্মুখে পবিত্র ত্যাগের আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু পরম দিশারী দেখেন অন্যরূপে; এই দিশারীকে কথা দিয়ে ভুল বোঝান যায় না। "তোমার মধ্যে যারা কথা কইছে তারা দুর্বলতা ও মোহ ও অহং-ভাব। আত্মাকে দর্শন কর, জ্ঞানের দিকে চোখ খোল, তোমার অহং-ভাবাচ্ছন্ন অন্তঃপুরুষকে শুদ্ধ কর।" এর পরও কি বললেন? "যুদ্ধ কর, জয়লাভ কর, সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর।" অথবা প্রাচীন ভারতীয় লোক-ইতিহাসের আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। মনে হবে রাম যে লঙ্কাধিপতির কাছ থেকে নিজের স্ত্রীর পুনরুদ্ধারের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করে শত্রুকুল ধ্বংস করেছিলেন তা-ও অহং-ভাব। কিন্তু এটি কি কম অহং-ভাব হত যদি তিনি উপেক্ষার নামাবলী গায়ে দিয়ে জ্ঞানের বাঁধা সূত্রের অপব্যবহার করে বলতেন, "আমার স্ত্রী নেই, শত্রু নেই, কামনা নেই, এসব ইন্দ্রিয়ের মায়া; আমার কাজ ব্রহ্মবিদ্যা অনুশীলন করা, জনকনন্দিনীকে নিয়ে রাবণ যা খুশি করুক"।

কিন্তু যেমন গীতা জোর দিয়ে বলে, আসল মানদণ্ড ভিতরে। অন্তঃপুরুষকে লালসা ও আসক্তি থেকে মুক্ত করা চাই, তবে যেমন কর্মের প্রতি অহমাত্মক প্রেরণা থেকে মুক্তি দরকার, তেমন দরকার নৈষ্কর্ম্যের প্রতি আসক্তি থেকেও মুক্তি; যেমন পাপের দিকে আকর্ষণ থেকে মুক্ত হওয়া চাই, তেমন মুক্ত হওয়া চাই পুণ্যের রূপের আসক্তি থেকে। দরকার "আমিত্ব" ও "আমারত্ব" শূন্য হয়ে 'একমেব' আত্মায় বাস করা, 'একমেব' আত্মায় কাজ করা; অপর সকলকে বাদ দিয়ে শুধু নিজের মন, প্রাণ ও দেহের সেবা করার অহং-ভাব পরিত্যাগ করা যেমন দরকার তেমন দরকার বিশ্বাত্মক পুরুষের ব্যষ্টি

কেন্দ্রের মাধ্যমে কাজ করতে অস্বীকার করার অহং-ভাব পরিত্যাগ করা। আত্মায় বাস করার অর্থ যে নৈর্ব্যক্তিক আত্মরতির মহাসাগরে মগ্ন হয়ে সকল কিছু বিস্মৃত হয়ে অনন্তের মধ্যে শুধু নিজের জন্য বাস করা তা নয়, এর অর্থ এই দেহের মধ্যে, সকল দেহের মধ্যে, সকল দেহ অতিক্রম করেও সমভাবে আত্মার মধ্যে ও আত্মা হয়ে বাস করা। এই হল পূর্ণ জ্ঞান।

দেখা যাবে যে আমরা ত্যাগের ভাবনার যে অর্থ করি তা তার প্রচলিত অর্থ থেকে ভিন্ন। এর প্রচলিত অর্থ হল, — আত্মসংযম, সুখভোগের নিবৃত্তি, সুখের বিষয় বর্জন। মানবের অন্তঃপুরুষের জন্য আত্মসংযম এক প্রয়োজনীয় শিক্ষা, কারণ তার হৃদয় অজ্ঞানভাবে আসক্ত হয়; সুখ থেকে নিবৃত্ত হওয়া প্রয়োজনীয় কারণ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পঙ্কিল মধুতে তার ইন্দ্রিয় ধরা পড়ে তাতে আটক থাকে; সুখের বিষয় বর্জনের আদেশ দেওয়া হয় কেননা মন বিষয়েই নিবদ্ধ হয়, তা ছাড়িয়ে বা নিজের ভিতরে যাবার জন্য সে তা ত্যাগ করবে না। যদি মানুষের মন এইরূপ অজ্ঞানাচ্ছন্ন, আসক্ত, এমনকি অশান্ত অস্থিরতারও মধ্যে আবদ্ধ, বিষয়সমূহের রূপে বিভ্রান্ত না হত তাহলে ত্যাগের প্রয়োজন থাকত না; অন্তঃপুরুষ চলতে পারত আনন্দের পথে, ক্ষুদ্র থেকে আরো বৃহতে, হর্ষ থেকে দিব্যতর হর্ষে। কিন্তু বর্তমানে তা সম্ভব নয়। তার কর্তব্য হল সে যেসব বিষয়ে আসক্ত সেসব ভিতর থেকে ত্যাগ করা যাতে তাদের প্রকৃত স্বরূপ লাভ সম্ভব হয়। বাহ্য ত্যাগ মূল বস্তু নয়, কিন্তু কিছু সময়ের জন্য এমনকি তারও প্রয়োজন থাকে, অনেক জিনিসেই তা অপরিহার্য এবং সকল জিনিসেই কখন কখন উপকারী; এমনকি একথা বলা চলে যে অন্তঃপুরুষের অগ্রগতির এক পর্বে সম্পূর্ণ বাহ্য ত্যাগের অবস্থার মধ্য দিয়ে তাকে যেতেই হবে যদিও এই ত্যাগ সর্বদা এমন হওয়া চাই যাতে সেইসব স্বেচ্ছাকৃত নিগ্রহ ও উৎকট আত্মনিপীড়ন না থাকে যেগুলি আমাদের অন্তরে আসীন ভগবানের কাছে অপরাধস্বরূপ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই ত্যাগ বা আত্মসংযম সর্বদাই এক সাধন, আর তার ব্যবহারের পালা কখনো না কখনো শেষ হয়। যখন বিষয় আমাদের আর জালে আটকাতে পারে না, তখন বিষয় বর্জনেরও প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় কারণ তখন অন্তঃপুরুষ আর বিষয়কে বিষয় হিসেবে উপভোগ করে না, সে উপভোগ করে তার মধ্যে প্রকাশমান ভগবানকে। সুখ থেকে নিবৃত্ত হওয়ারও প্রয়োজন থাকে না যখন অন্তঃপুরুষ আর সুখ খোঁজে না, বরং সকল বিষয়েই সমভাবে ভগবানের আনন্দ অধিগত করে, তখন আর কোন বিষয়কে ব্যক্তিগতভাবে বা স্থূলভাবে পাওয়ার প্রয়োজন থাকে না; যখন অন্তঃপুরুষ আর কোন কিছু চায় না বরং সর্বভূতস্থ সেই এক আত্মার ইচ্ছানুযায়ী সচেতনভাবে চলে তখন আত্মসংযমেরও কোন ক্ষেত্র থাকে না। তখনই আমরা বিধান থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে মুক্ত হই পরম চিৎপুরুষের স্বাধীনতার মধ্যে।

যা আমরা অশুভ বলে নিন্দা করি শুধু তাই যে আমাদের সাধনার পথে পিছনে ফেলে যেতে প্রস্তুত হতে হবে তা নয়, যা আমাদের কাছে মনে হয় শুভ অথচ একমাত্র শুভ নয় তা-ও ফেলে যেতে প্রস্তুত হতে হবে। এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলি

আমাদের মঙ্গল করেছে, সাহায্য করেছে, হয়ত একসময় তাদের মনে হত একমাত্র কাম্য বিষয় অথচ একবার তাদের কাজ শেষ হলে, একবার সেসব পাওয়া হয়ে গেলে, তারা বাধা ও এমনকি বিরুদ্ধশক্তি হয়ে দাঁড়ায় তখন আমাদের আহ্বান আসে সেসব ছাড়িয়ে যেতে। অন্তঃপুরুষের এমন অনেক অবস্থা আছে যেগুলিকে আয়ত্তে আনার পর সেসবে বিশ্রাম করা বিপজ্জনক কারণ তাহলে তো তাদের অতীত ভগবানের সব রাজ্যে আমাদের যাত্রা হয় না। এমনকি যেসব ভগবৎ-উপলব্ধি চরম পূর্ণ ও স্বরূপগত ভগবৎ-উপলব্ধি নয়, সেসবেও আমাদের আঁকড়ে থাকা উচিত নয়। সর্বময় ভগবানের কম কিছুতে, চরম অতিস্থিতির নিম্ন কিছুতে আমাদের থামা চলবে না। আর যদি আমরা এইভাবে চিৎপুরুষের মধ্যে স্বাধীন হতে পারি, তাহলে আমরা খুঁজে পাব ভগবানের কার্যলীলার সকল অপরূপ বৈচিত্র্য; আমরা দেখব যে সবকিছু আন্তরভাবে ত্যাগ করে আমরা কিছুই হারাইনি। "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" — এই সবকিছু ত্যাগ করেই তুমি সমর্থ হবে সর্বকে ভোগ করতে। কারণ সবকিছুই আমাদের জন্য রাখা হয় ও আমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয় তবে সেসব বিস্ময়করভাবে পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয় তাঁর সর্ব-মঙ্গলে ও সর্ব-সুন্দরে, সর্ব-জ্যোতিতে ও সর্ব-আনন্দে যিনি চির শুদ্ধ ও অনন্ত, যাঁর রহস্য ও অলৌকিকতা যুগ যুগ ধরে চলে অশ্রান্তভাবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জ্ঞানের বিভিন্ন সাধনার সমন্বয়

পূর্ব অধ্যায়ে আমরা ত্যাগের কথা বলেছি অত্যন্ত ব্যাপকভাবে যেমন তার পূর্বে বলেছি একাগ্রতার কথা ও তার সম্ভবপর পরিণতি সম্বন্ধে; সুতরাং যা বলা হয়েছে তা যেমন প্রযোজ্য জ্ঞানমার্গে, তেমন সমভাবেই প্রযোজ্য কর্মমার্গ ও ভক্তিমার্গে; কারণ এই তিন মার্গেই ত্যাগ ও একাগ্রতা আবশ্যক যদিও তাদের প্রয়োগের রীতি ও ভাবনা বিভিন্ন হতে পারে। তবে এখন আমাদের বিশেষ করে দেখতে হবে জ্ঞানমার্গের বাস্তব পদ্ধতিগুলি কি, কারণ এই মার্গে অগ্রসর হবার জন্য একাগ্রতা ও ত্যাগ — এই দুই শক্তির সহায়তা একান্তই আবশ্যক। কার্যতঃ এই পথ হল সত্তার সেই মহান্ সোপানপথ দিয়ে পুনরুত্তরণ যে পথ বেয়ে অন্তঃপুরুষ অবতরণ করেছে জড় জীবনের মধ্যে।

জ্ঞানের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য হল আত্মার, আমাদের সত্যকার আত্ম-সত্তার পুনঃপ্রাপ্তি, আর এই লক্ষ্যের অর্থ এই স্বীকার করা যে আমাদের সত্তার বর্তমান অবস্থা আমাদের আসল আত্ম-সত্তা নয়। অবশ্য যেসব তীক্ষ্ণ সমাধানে বিশ্বপ্রহেলিকার গ্রন্থি ছেদন করা হয় সেসব আমরা ত্যাগ করেছি; আমরা স্বীকার করি যে বিশ্ব শক্তিসৃষ্ট কোন কাল্পনিক জড়রূপ নয়, বা মনের রচিত কোন অসদ্‌বস্তু নয় বা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়সংবিৎ ও ভাবনা ও তাদের সব পরিণামের এমন সমষ্টি নয় যার পিছনে আছে আমাদের সাধ্য এক মহাশূন্য বা এক মহান্ আনন্দময় শূন্য আমাদের সনাতন অসত্তার প্রকৃত সত্য হিসেবে। আমরা স্বীকার করি যে আত্মা এক সদ্বস্তু, আর বিশ্বও আত্মার এক সদ্বস্তু, এ শুধু জড়শক্তি ও রূপের সদ্বস্তু নয়, এ হল আত্মার চেতনার এক সদ্বস্তু এবং এজন্য যে এর বাস্তবতা কম তা নয়, বরং এতে আরো বেশী প্রমাণিত হয় যে এ হল সত্য। তবু, যদিও বিশ্ব একটি তথ্য, মিথ্যা কল্পনা নয়, যদিও এ হল দিব্য ও বিশ্বাত্মার তথ্য, ব্যষ্টি-আত্মার মিথ্যা কল্পনা নয়, তথাপি এখানে আমাদের জীবনের অবস্থা এক অজ্ঞানময় অবস্থা, এটি আমাদের সত্তার আসল সত্য নয়। নিজেদের সম্বন্ধে আমাদের যা ধারণা তা মিথ্যা, আমরা যা নই সেইভাবে আমরা নিজেদের দেখি, আমাদের পরিবেশের সঙ্গে এক মিথ্যা সম্পর্কের মধ্যে আমাদের বাস, কারণ আমরা বিশ্বকে বা নিজেদের সঠিকভাবে জানি না, আমরা জানি এক অপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে যার ভিত্তি হল পুরুষ ও প্রকৃতির এক সাময়িক মিথ্যা রচনা যা তারা নিজেদের মধ্যে স্থাপন করেছে বিকাশমান অহং-এর সুবিধার জন্য। আর এই মিথ্যাই মূল কারণ যার জন্য আমরা আমাদের আভ্যন্তরীণ জীবনে ও আমাদের পরিবেশের সঙ্গে আমাদের সব সম্পর্কে প্রতি পদে এক সাধারণ বিকৃতি, বিশৃঙ্খলা ও কষ্টভোগের আক্রমণে হয়রাণ হই। আমাদের ব্যক্তিগত জীবন ও আমাদের গোষ্ঠীগত জীবন, নিজেদের সঙ্গে ও [illegible] সঙ্গে আমাদের ব্যবহার — এসব প্রতিষ্ঠিত এক

মিথ্যার উপর এবং সেজন্য সকল নীতি ও পদ্ধতিও মিথ্যা যদিও এই সকল প্রমাদের মধ্য দিয়ে এক বর্ধিষ্ণু সত্য অবিরত চেষ্টা করছে নিজেকে প্রকাশ করতে। এইজন্যই মানবের কাছে জ্ঞানের পরম গুরুত্ব, তবে এ জ্ঞান জীবনের ব্যবহারিক জ্ঞান নয়, এ হল আত্মা ও প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীরতম জ্ঞান,[১] আর এই জ্ঞানেরই উপর জীবনের খাঁটি ব্যবহার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

এই প্রমাদের উৎপত্তি হয় এক মিথ্যা একাত্মতা থেকে। প্রকৃতি তার জড়ীয় ঐক্যের মধ্যে দেখতে স্বতন্ত্র নানা দেহ তৈরী করেছে আর জড়প্রকৃতির মধ্যে অভিব্যক্ত অন্তঃপুরুষ এসবকে আবিষ্ট ক'রে তাতে বাস করে ও তাদের অধিগত করে, ব্যবহার করে; অন্তঃপুরুষ নিজেকে বিস্মৃত হয়ে জড়ের মধ্যকার শুধু এই একমাত্র গ্রন্থিকে অনুভব করে আর বলে, "আমি এই দেহ"। সে নিজেকে দেহ বলে ভাবে, দেহের সঙ্গে কষ্ট পায়, দেহের সঙ্গে আনন্দ ভোগ করে, দেহের সাথে জন্মায় ও দেহের সাথেই ধ্বংস হয়; অথবা অন্ততঃ এইভাবেই সে নিজেকে দেখে। আবার প্রকৃতি তার বিশ্বপ্রাণের ঐক্যের মধ্যে দেখতে স্বতন্ত্র এমন সব প্রাণের ধারা তৈরী করেছে যেগুলি নিজেদের নিয়ে প্রতি দেহের চারিদিকে ও অভ্যন্তরে প্রাণশক্তির এক আবর্ত গড়ে তোলে আর প্রাণ-প্রকৃতির মধ্যে অভিব্যক্ত অন্তঃপুরুষ সেই ধারাকে ধরে ও তার দ্বারা নিজে ধৃত হয়ে প্রাণের সেই ক্ষুদ্র ঘূর্ণায়মান আবর্তের মধ্যে সাময়িকভাবে আবদ্ধ হয়। অন্তঃপুরুষ তখনো নিজেকে বিস্মৃত হয়ে বলে "আমি এই প্রাণ"; সে নিজেকে প্রাণ মনে করে তার লালসা বা কামনার সঙ্গে নিজেও লালায়িত হয়, তার সুখের মধ্যে গড়াগড়ি দেয়, তার আঘাতে রক্তাপ্লুত হয়, তার চলাতে নিজে ছোটে বা হোঁচট খায়। তখনো যদি সে প্রধানতঃ দেহবোধের প্রভাবাধীন থাকে, সে আবর্তের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবন এক মনে করে ভাবে, "যে দেহের চারিদিকে এই আবর্ত গড়ে উঠেছে সেই দেহনাশের পর যখন এই আবর্তেরও নাশ হবে, তখন আমি আর থাকব না"। তবে যে প্রাণের ধারা ঐ আবর্ত গড়ে তুলেছে সেই ধারার বোধ যদি সে পেতে সমর্থ হয় তাহলে সে নিজেকে ঐ ধারা মনে ক'রে বলে, "আমি এই প্রাণের স্রোত; আমি এই দেহের অধিকার পেয়েছি, আমি একে ছেড়ে অন্য দেহ অধিকার করব; আমি অমর প্রাণ, সতত পুনর্জন্মের চক্রে ঘুরছি"।

কিন্তু আবার প্রকৃতি বিশ্বমনে গঠিত মানসিকতার ঐক্যের মধ্যে যেন মানসিকতার এমন সব দেখতে স্বতন্ত্র শক্তিউৎপাদক যন্ত্র তৈরী করেছে যেগুলি মানসিক শক্তি ও বিভিন্ন মানসিক বৃত্তির উৎপাদন, বিতরণ ও পুনঃসঞ্চয়ের স্থির কেন্দ্র, যেন মানসিক টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার বিভিন্ন স্টেশন (ঘাঁটি) যেখানে বিভিন্ন বার্তা ভাবা, লেখা, পাঠান ও নেওয়া হয় ও তাদের অর্থ উদ্ধার করা হয় আর এইসব বার্তা ও বৃত্তি অনেক প্রকারের — [illegible]ক, ভাবাত্মক, বোধাত্মক, প্রত্যয়াত্মক ও বোধিজ, আর মানসিক প্রকৃতির মধ্যে অভিব্যক্ত অন্তঃপুরুষ সেসব গ্রহণ ও ব্যবহার করে জগৎকে দেখার জন্য

[১] আত্মজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান

এবং সে মনে করে যে সে-ই এইসব আঘাত বাইরে ফেলছে এবং গ্রহণ করছে এবং সেসবের পরিণামে কষ্ট পাচ্ছে বা তাদের আয়ত্ত করছে। প্রকৃতি যেসব জড়দেহ গঠন করেছে তাদের মধ্যে প্রকৃতি এইসব শক্তিউৎপাদক যন্ত্রগুলির আধার প্রতিষ্ঠিত করে, দেহগুলিকে ব্যবহার করে তার স্টেশনের ভূমি হিসেবে এবং জড়ের সঙ্গে মনকে যুক্ত করে এমন এক স্নায়ুমণ্ডলীর দ্বারা যা বিভিন্ন প্রাণধারার সঞ্চালনে পরিপূর্ণ এবং যার মধ্য দিয়ে মন প্রকৃতির জড়জগৎ সম্বন্ধে এবং ইচ্ছামত প্রাণজগৎ সম্বন্ধে সচেতন হয়। তা নাহলে মন প্রথম ও প্রধানতঃ মানসিক জগতের কথা জানতে পারত এবং শুধু পরোক্ষভাবে আভাস পেত জড় জগতের। বর্তমানে তার মনোযোগ নিবদ্ধ শুধু দেহে ও যে জড়জগতে দেহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাতে আর সৃষ্টির বাকী সব সে জানে, শুধু অস্পষ্ট, পরোক্ষ বা অবচেতনভাবে তার নিজেরই বিশাল অবশিষ্ট অংশের মধ্যে যে অংশ সম্বন্ধে সে এখন বাহ্যতঃ নিঃসাড় ও বিস্মৃত।

অন্তঃপুরুষ নিজেকে এই মানসিক শক্তিউৎপাদক যন্ত্র বা স্টেশনের সঙ্গে এক মনে ক'রে বলে, "আমি এই মন"। আর যেহেতু মন দেহগত প্রাণেই আচ্ছন্ন থাকে সে ভাবে "আমি এই প্রাণবন্ত দেহে এক মন" অথবা আরো সাধারণতঃ সে ভাবে "আমি এমন এক দেহ যা প্রাণধারণ ও চিন্তা করে"। সে দেহধারী মনের বিভিন্ন মনন, ভাবাবেগ; ইন্দ্রিয়সংবিৎ-এর সঙ্গে নিজেকে এক মনে করে কল্পনা করে যে দেহনাশের সঙ্গে এসবেরও যখন নাশ হবে তখন তার নিজের অস্তিত্বও আর থাকবে না। অথবা যদি সে মানসিক ব্যক্তিভাবনার নিত্যধারা সম্বন্ধে সচেতন হয় সে নিজের সম্বন্ধে ভাবে যে সে এক মনোময় অন্তঃপুরুষ যে একবার বা বারবার দেহধারণ করে এবং পার্থিব জীবন থেকে ফিরে যায় তার অতীত মনোলোকে; এইভাবে মনোময় সত্তা যে কখনো কখনো দেহে, কখনো বা প্রকৃতির মনোলোকে বা প্রাণলোকে মানসিকভাবে সুখ বা দুঃখভোগ করে টিকে থাকে একেই সে বলে তার অমর জীবন। অথবা না হয়, যেহেতু মন আলো ও জ্ঞানের একটা তত্ত্ব — তা সে তত্ত্ব যতই অপূর্ণ হ'ক — আর তাকে ছাড়িয়ে কি আছে সে সম্বন্ধে কিছু ধারণা পেতে সে সক্ষম, সেজন্য সে দেখে যে সেখানে যা আছে — হয় কোন শূন্য নয় কোন শাশ্বত সন্মাত্র — তার মধ্যে তার বিলীন হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে আর বলে, "সেখানে আমার, এই মনোময় অন্তঃপুরুষের কোন অস্তিত্ব থাকে না"। দেহবদ্ধ মন ও প্রাণের বর্তমান খেলার প্রতি তার আসক্তি বা বিতৃষ্ণার পরিমাণ অনুযায়ী সে এই লয়প্রাপ্তির ভয় বা কামনা করে, অস্বীকার বা স্বীকার করে।

তবে এ সবই সত্য মিথ্যায় মেশানো। প্রকৃতির তথ্য হিসাবে মন, প্রাণ ও জড় আছে আর মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক ব্যক্তিভাব গঠনও আছে, কিন্তু অন্তঃপুরুষ যে নিজেকে তাদের সঙ্গে একাত্ম করে, সেই একাত্মতা মিথ্যা। মন, প্রাণ ও জড় যে আমরা, তা শুধু এই অর্থে যে তারা সত্তার এমন সব তত্ত্ব যেসবকে প্রকৃত আত্মা বিকাশ করেছে পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে আর তা এই উদ্দেশ্যে যেন তার অদ্বয় সত্তার এক রূপ প্রকাশ পায় শৃঙ্খলাবদ্ধ জগৎ হিসেবে। ব্যষ্টি মন, প্রাণ ও দেহ

এইসব তত্ত্বের এক বিলাস মাত্র; পুরুষ ও প্রকৃতির পরস্পরের আদানপ্রদানের মধ্যে তাকে উপস্থাপিত করা হয় অদ্বয় সন্মাত্রের নিজের সেই বহুত্ব প্রকাশ করার উপায় হিসেবে যে বহুত্বকে তিনি নিজের ঐক্যের মধ্যে গূঢ়ভাবে শাশ্বতকাল ধারণ করেন ও তা প্রকাশ করতে নিত্য সমর্থ। ব্যষ্টি মন, প্রাণ ও দেহ আমাদের বিভিন্ন রূপ এই কারণে যে আমরা "একমেব"-এর বহুত্বের বিভিন্ন কেন্দ্র; বিশ্ব মন, প্রাণ ও দেহও আমাদের আত্মার রূপ কারণ আমরা আমাদের সত্তায় সেই "একমেব"। কিন্তু আত্মা বিশ্ব বা ব্যষ্টি মন, প্রাণ ও দেহের অতিরিক্ত কিছু আর যখন আমরা এইসব বিষয়ের সঙ্গে নিজেকে এক মনে করে নিজেদের সীমাবদ্ধ করি তখন আমাদের জ্ঞান মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, আর শুধু আমাদের আত্মসত্তা সম্বন্ধে নয়, আমাদের বিশ্বজীবন ও আমাদের ব্যক্তিগত সব কাজকর্ম সম্বন্ধেও আমাদের নির্ধারিকা দৃষ্টি ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা মিথ্যাময় করে তুলি।

আত্মা এক সনাতন কেবল পুরুষ ও শুদ্ধ সৎ আর এইসব বিষয় তাঁর সম্ভূতি। এই জ্ঞান থেকে আমাদের যাত্রা করতে হবে; এই জ্ঞান আমাদের উপলব্ধি করা চাই এবং একেই করা চাই ব্যষ্টির আন্তর ও বহির্জীবনের ভিত্তি। জ্ঞানযোগ এই প্রাথমিক সত্য থেকে আরম্ভ করে সাধনার এক নঞর্থক ও সদর্থক পন্থা উদ্ভাবন করেছে যার সাহায্যে আমরা এইসব মিথ্যা একাত্মতাবোধ মুক্ত হয়ে সেসব থেকে ফিরে যাব প্রকৃত আত্মজ্ঞানের মধ্যে। 'নঞর্থক' পদ্ধতি হল সর্বদা এই বলা, "আমি দেহ নই", যাতে "আমি দেহ" এই মিথ্যা ভাবনা খণ্ডন ও উচ্ছেদ করা যায়, এই জ্ঞানের উপর একাগ্র হওয়া এবং দেহের প্রতি অন্তঃপুরুষের আসক্তি ত্যাগ ক'রে দেহবোধ মুক্ত হওয়া। আমরা আরো বলি, "আমি প্রাণ নই", এবং এই জ্ঞানের উপর একাগ্র হয়ে ও প্রাণিক সব বৃত্তি ও কামনার প্রতি আসক্তি ত্যাগ ক'রে প্রাণবোধ মুক্ত হই। পরিশেষে আমরা বলি, "মন, গতি, বোধ, মনন — এসব কিছুই আমি নই", এবং এই জ্ঞানের উপর একাগ্র হয়ে ও মানসিক সব বৃত্তি ত্যাগ করে মনোবোধ মুক্ত হই। যখন আমরা এইভাবে আমাদের ও যেসব বিষয়ের সঙ্গে আমরা নিজেদের এক করেছিলাম তাদের মধ্যে এক ব্যবধান গড়ে তুলি তখন আমাদের থেকে তাদের আবরণ উত্তরোত্তর খসে পড়ে, আর আত্মা দেখা দিতে শুরু করেন আমাদের অনুভূতিতে। সেই সম্বন্ধে আমরা তখন বলি, "আমি শুদ্ধ, নিত্য, আত্মানন্দময় তৎস্বরূপ", এবং আমাদের মনন ও সত্তাকে তাঁর উপর একাগ্র করে আমরা তৎস্বরূপ হয়ে উঠি এবং শেষে সমর্থ হই ব্যষ্টিসত্তা ও বিশ্ব ত্যাগ করতে। অপর এক সদর্থক পদ্ধতি আছে যা প্রকৃতপক্ষে রাজযোগের অন্তর্ভুক্ত তা হল ব্রহ্মের মননের উপর একাগ্র হয়ে আমাদের মধ্যে অন্য কোন ভাবনা আসা বন্ধ করা যাতে আমাদের বাহ্য অথবা বৈচিত্র্যপূর্ণ আন্তর সত্তার উপর মনরূপী এই উৎপাদক যন্ত্রের কাজ বন্ধ হয়ে যায়; মানসিক নিবৃত্তির দ্বারা প্রাণের ও শরীরের খেলাও স্তিমিত হয়ে পড়বে এক চিরন্তন সমাধিতে, সত্তার কোন অবর্ণনীয় গভীরতম সমাধিতে, যাতে আমরা প্রয়াণ করব অনপেক্ষ সন্মাত্রের মধ্যে।

স্পষ্টতঃ এই সাধনা এমন এক আত্ম-কেন্দ্রগত ও ব্যতিরেকী আন্তর ক্রিয়া যাতে

জগৎকে বর্জন করা হয় মননের মধ্যে তাকে অস্বীকার ক'রে এবং তার দর্শন থেকে অন্তঃপুরুষের চোখ বন্ধ ক'রে। কিন্তু ব্যষ্টিপুরুষ তার দিকে চোখ বন্ধ করলেও বিশ্ব রয়ে যায় ভগবানের মধ্যে এক সত্য হিসেবে, আর আত্মাও বিশ্বের মধ্যে বর্তমান থাকেন সত্যসত্যই, মিথ্যারূপে নয়; যা সব আমরা বর্জন করেছি সেসব তিনি ধারণ ক'রে আছেন, সকল বিষয়ের মধ্যে তিনি সত্যই প্রতিষ্ঠিত, সত্যসত্যই তিনি জীবকে আলিঙ্গন ক'রে আছেন বিশ্বের মধ্যে, আবার বিশ্বকেও আলিঙ্গন ক'রে আছেন তাঁর মধ্যে যা বিশ্বের অতিরিক্ত ও অতিস্থিত। যতবারই আমরা বাইরে আসি আন্তর ধ্যানের সমাধি থেকে, ততবারই এই যে স্থায়ী বিশ্বকে আমরা দেখি আমাদের চারিদিকে ঘিরে আছে, তার মধ্যে এই সনাতন আত্মাকে নিয়ে আমরা কি করব? যে অন্তঃপুরুষ বিশ্বের দিকে তাকিয়ে দেখে তার জন্য জ্ঞানের বৈরাগ্যমার্গে এক সমাধান ও সাধনা আছে। এই সাধনা হল সর্বগত, সর্বব্যাপী ও সকল কিছুর উপাদানস্বরূপ আত্মাকে আকাশের রূপে দেখা — যার মধ্যে সকল রূপ বর্তমান, যা সকল রূপের মধ্যে বর্তমান এবং যা দিয়ে সকল রূপ গঠিত। ঐ আকাশের মধ্যে বিশ্বপ্রাণ ও মন সঞ্চরণ করে বিষয়সমূহের নিঃশ্বাসরূপে, আকাশের মধ্যে বায়ুসমুদ্ররূপে, এবং তারাই আকাশ থেকে গঠন করে এই সকল রূপ; কিন্তু তারা যা গঠন করে তা শুধু নাম ও রূপ, কোন সদ্‌বস্তু নয়; ঘটের যে রূপ আমরা দেখি তা মাটিরই এক রূপ, আর তা ফিরে যায় মাটির পৃথিবীতেই; মাটিও এক রূপ যা পর্যবসিত হয় বিশ্বপ্রাণে, আর বিশ্বপ্রাণও এক গতি যা শান্ত হয় সেই নিস্তব্ধ নির্বিকার আকাশে। এই জ্ঞানের উপর একাগ্র হয়ে, সকল প্রাতিভাসিক ও বাহ্যরূপ বর্জন করে আমরা উপলব্ধি করি যে সারা জগৎ আকাশ-ব্রহ্মে নামরূপের এক ভ্রম, মায়া; এ আমাদের কাছে অসৎ হয়ে ওঠে; আর বিশ্ব অসৎ হয়ে ওঠায় তার মধ্যে ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠাও অসৎ হয়, থাকেন শুধু আত্মা যাঁর উপর আমাদের মন মিথ্যা আরোপ করেছে নামরূপাত্মক বিশ্ব। সুতরাং পরমার্থসৎ-এর মধ্যে ব্যষ্টি আত্মার লয়সাধন যুক্তিযুক্ত।

তথাপি, আত্মার লীলা চলতে থাকে — সবকিছুর অন্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকার অবিনশ্বর বিভাবে, সবকিছুকে দিব্যভাবে আবৃত করার অক্ষর বিভাবে, আর তার সঙ্গে থাকে প্রতি জিনিস হওয়া ও সবকিছু হওয়ার অফুরন্ত চাতুরী; আমরা যে এই চাতুরী বুঝতে পারি ও সরে আসি তাতে আত্মা বা বিশ্বের এক বিন্দুও আসে যায় বলে মনে হয় না। তাহলে আমাদের কি জানা কর্তব্য নয় যে কি এটি যা এইভাবে আমাদের স্বীকার বা প্রত্যাখ্যানের ঊর্ধ্বে নিত্য বিরাজিত, আর এত মহান্ ও এত সনাতন যে এসব তাকে স্পর্শ করে না? এখানেও নিশ্চয় কোন অজেয় সদ্‌বস্তু কর্মরত, আর জ্ঞানের অখণ্ডতার জন্য আমাদের কর্তব্য তা দেখা ও উপলব্ধি করা; নচেৎ এটাই প্রমাণ হতে পারে যে আমাদের নিজেদের জ্ঞানই চাতুরী ও ভ্রম, বিশ্বের মধ্যকার ঈশ্বর নন। সুতরাং আমাদের কর্তব্য আবার একাগ্র হয়ে এই যে সদ্‌বস্তু এত অপ্রতিহতভাবে বিরাজিত তাকে দেখা ও উপলব্ধি করা আর এই জানা যে এই আত্মা সেই পরম পুরুষ ছাড়া আর কিছু নয় যিনি প্রকৃতির অধীশ্বর, এই প্রপঞ্চের ধর্তা যাঁর অনুমতিতে এ চলে, যাঁর সঙ্কল্প এর অনন্তবিধ

ক্রিয়ার প্রভব এবং এর চিরন্তন যুগ চক্রসমূহের নির্ধারক। আবার তবু আমাদের কর্তব্য হবে আরো একবার একাগ্র হয়ে এই দেখা, উপলব্ধি করা ও জানা যে আত্মাই সেই "একম্ সৎ" যিনি সকলের পুরুষ ও সকলের প্রকৃতি, — উভয়ই, একই সাথে পুরুষ ও প্রকৃতি, এবং সেজন্য বিষয়সমূহের এইসব রূপের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করতে এবং আবার এইসব রূপায়ণ হতেও সমর্থ। তা নাহলে আত্মা যা বাদ দেন না, আমরা তা বাদ দিই এবং ইচ্ছামত ঠিক করি কি আমরা জানব।

জ্ঞানের প্রাচীন বৈরাগ্যমার্গ বিষয়সমূহের ঐক্য এবং এক সন্মাত্রের এই সকল বিভাবের উপর একাগ্রতা স্বীকার করত, তবে তাতে এক পার্থক্য ও ক্রম-পরম্পরা থাকত। যে আত্মা বিষয়ের এইসব রূপ হন তিনি বিরাট বা বিশ্বপুরুষ; যে আত্মা এই সকল রূপ সৃষ্টি করেন তিনি হিরণ্যগর্ভ, তৈজস বা সৃজনশীলভাবে দ্রষ্টা পুরুষ; যে আত্মা এই সকল বিষয়কে নিজের মধ্যে নিগূহিত করে ধারণ করেন তিনি প্রাজ্ঞ, চিন্ময় কারণ বা আদি নির্ধারক পুরুষ; এসবের অতীতে আছেন পরমার্থসৎ যিনি এইসব অসৎ সৃষ্টিতে মত দেন কিন্তু তাদের সঙ্গে তাঁর কোন ব্যবহার থাকে না। এই 'তৎ'-এর মধ্যে আমাদের লয় পাওয়া ও বিশ্বের সঙ্গে আর কোন সংস্রব না রাখা কর্তব্য, কেননা জ্ঞানের অর্থ অন্তিম জ্ঞান, সুতরাং দরকার এইসব অপূর্ণ উপলব্ধিকে ছেড়ে দেওয়া বা 'তৎ'-এর মধ্যে নিমজ্জিত করা। কিন্তু স্পষ্টতঃ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এইসব ব্যবহারিক পার্থক্য মনের তৈরী, বিশেষ কোন কোন উদ্দেশ্যের জন্য তাদের মূল্য থাকতে পারে কিন্তু চরম মূল্য কিছু নেই। জগৎ সম্বন্ধে আমাদের কথা হল যে সব এক, বিশ্বাত্মা যে দ্রষ্টা ও স্রষ্টা আত্মা থেকে ভিন্ন তা নয়, দ্রষ্টা আত্মাও কারণ-আত্মা থেকে ভিন্ন নয়, তেমন কারণ-আত্মাও পরমার্থসৎ থেকে ভিন্ন নয়, ইনি হলেন একই আত্মসত্তা যিনি সকল সম্ভূতি হয়েছেন, "সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্", ইনি সেই ঈশ্বর যিনি এইসব ব্যষ্টিসত্তারূপে নিজেকে প্রকট করেন, অন্য কিছু নয়, আবার এই ঈশ্বরও সেই 'একমেব' ব্রহ্ম বৈ অন্য কিছু নয় যিনি বস্তুতঃ এই সবকিছু যা আমরা দেখতে পাই, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন দ্বারা জানতে পারি। সেই আত্মা, ঈশ্বর ও ব্রহ্মকে আমরা জানতে চাই, তবেই তো আমরা উপলব্ধি করতে পারব আমাদের ঐক্য তাঁর সঙ্গে এবং তিনি যা সব ব্যক্ত করেন সেসবের সঙ্গে, আর সেই ঐক্যের মধ্যেই আমরা বাস করতে চাই। জ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের দাবী হল যে এ হবে ঐক্যসাধক; যে জ্ঞান ভাগ করে তা সর্বদাই এক আংশিক জ্ঞান হতে বাধ্য, তার উপকারিতা হল কোন কোন ব্যবহারিক উদ্দেশ্যের জন্য। যে জ্ঞান ঐক্য সাধন করে তাই আসল জ্ঞান।

সুতরাং আমাদের পূর্ণযোগ এইসব বিবিধ সাধনা ও একাগ্রতা গ্রহণ করবে কিন্তু এমন এক সমন্বয়ের দ্বারা তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আনবে এবং সম্ভব হলে তাদের মিশিয়ে এক করবে যাতে তাদের পরস্পরের ব্যতিরেকী ভাব দূর হয়। পূর্ণজ্ঞানের সাধক ঈশ্বর ও সর্বকে যে উপলব্ধি করবেন তা অন্য ব্যতিরেকী বিশ্বাতীত ব্রহ্মবাদীর মত শুধু সেসব বর্জন করে নীরব আত্মা বা অজ্ঞেয় পরমার্থসৎকে একমাত্র সত্য বলার জন্য নয় অথবা

অন্য ব্যতিরেকী ঈশ্বরবাদী যোগ বা অন্য ব্যতিরেকী সর্বেশ্বরবাদী যোগের মত শুধু ঈশ্বরের জন্যই বা সর্বের মধ্যে যে তিনি বাস করবেন তা-ও নয়, কি মননে, কি অনুশীলনে বা কি উপলব্ধিতে তিনি কোন ধর্মমত বা দার্শনিক সিদ্ধান্তের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করবেন না। তাঁর সাধ্য সৃষ্টির সম্পূর্ণ সত্য। প্রাচীন সাধনাগুলি তিনি বর্জন করবেন না, কারণ এরা প্রতিষ্ঠিত শাশ্বত সত্যের উপর, তবে তিনি তাদের ফেরাবেন তাঁর লক্ষ্যের অনুরূপ নতুন দিকে।

আমাদের স্বীকার করতে হবে যে জ্ঞানমার্গে আমাদের যা মুখ্য লক্ষ্য হওয়া চাই তা যতটা আমাদের নিজেদের পরমাত্মাকে উপলব্ধি করা, ততটা ঐ আত্মাকে অপরের মধ্যে বা প্রকৃতির অধীশ্বর হিসেবে বা সর্ব হিসেবে উপলব্ধি করা নয়; কারণ জীবের জরুরী প্রয়োজন হল তার নিজের সত্তার সর্বোত্তম সত্যপ্রাপ্তি, এর বিভিন্ন বিশৃঙ্খলা, বিভ্রম, মিথ্যা একাত্মবোধ সংশোধন করা, এর সঠিক একাগ্রতা ও শুদ্ধতা সাধন করা এবং নিজের উৎসকে জানা ও তাতে উত্তরণ করা। কিন্তু আমরা তা করি আমাদের সত্তার উৎসে বিলীন হবার জন্য নয়, আমাদের উদ্দেশ্য হল আমাদের সমগ্র জীবন এবং এই আন্তর রাজ্যের সকল অঙ্গ যেন তাদের সঠিক ভিত্তি পায়, তারা যেন বাস করতে পারে আমাদের সর্বোত্তম আত্মার মধ্যে এবং এই বাস যেন হয় শুধু সর্বোত্তম আত্মার জন্য এবং তারা যেন পালন করে শুধু সেই বিধান — অন্য কোন বিধান নয় — যা আসে আমাদের সর্বোত্তম আত্মা থেকে, আর যা আমাদের শুদ্ধ-করা সত্তাকে দেওয়া হয় সঞ্চারক মানসিকতার মধ্যে কোন প্রকার মিথ্যা বিকৃতি বিনা। আর যদি আমরা সঠিকভাবে তা করি তাহলে আমরা দেখতে পাব যে এই পরমাত্মাকে পেয়ে আমরা পেয়েছি তাঁকে যিনি সকলের মধ্যে একমাত্র আত্মা, প্রকৃতির ও সকল প্রকৃতির একমাত্র অধীশ্বর, আমাদের নিজেদের সর্ব যিনি এই বিশ্বেরও সর্ব। কারণ এই যাঁকে আমরা নিজেদের মধ্যে দেখি তাঁকে আমরা নিশ্চয়ই ঐ কারণে দেখতে পাব সর্বত্র কারণ তা-ই তাঁর ঐক্যের সত্য। আমাদের সত্তার এই সত্যকে জানলে ও সঠিকভাবে প্রয়োগ করলে, আমাদের ব্যষ্টিত্ব ও বিশ্বের মাঝের অন্তরায় জোর করে উন্মুক্ত ও পরিত্যক্ত হতে বাধ্য, আর যে সত্যকে আমরা আমাদের আপন সত্তার ভিতরে উপলব্ধি করি তা আমাদের কাছে নিজেকে বিশ্বভাবের মধ্যে সার্থক না করে পারে না, আর এই বিশ্বভাবই তখন হবে আমাদের আত্মা। নিজেদের মধ্যে বেদান্তর "সোঽহম্" (আমিই তিনি) এই উপলব্ধি করার পর, এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ আমরা আমাদের চারিদিককার সকল কিছুর দিকে তাকিয়ে উপলব্ধি করব তার অপর দিকের একই সমান জ্ঞান "তত্ত্বমসি" (তুমি তাহাই)। আমাদের শুধু দেখতে হবে কার্যতঃ কেমনভাবে এই সাধনার অনুশীলন করা হবে যাতে আমরা সফল হতে পারি এই মহান্ একীকরণে।

সপ্তম অধ্যায়

দেহের অধীনতা থেকে বিমুক্তি

একবার যখন আমরা আমাদের ধীশক্তিতে ঠিক করি যে যা প্রতীয়মান হয় তা সত্য নয়, আত্মা এই দেহ, কি প্রাণ, কি মন নয় কারণ এসব তার রূপমাত্র তখন এই জ্ঞানমার্গে আমাদের প্রথম কাজ হবে প্রাণ ও দেহের সঙ্গে আমাদের মনের ব্যবহারিক সম্বন্ধে মনকে যথাস্থানে স্থাপন করা যাতে তার পক্ষে আত্মার সঙ্গে তার সঠিক সম্বন্ধ পাওয়া সম্ভব হয়। যে কৌশলে এটি সাধন করা সবচেয়ে সহজ তা আমরা আগেই জেনেছি কারণ কর্মযোগ সম্বন্ধে আমাদের যে দৃষ্টি তাতে এর গুরুত্ব ছিল অনেক; এই কৌশল হল প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে এক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা। পুরুষ অর্থাৎ যে অন্তঃপুরুষ জানে ও আদেশ দেয় সে তার কার্যসাধিকা চিন্ময়ী শক্তির কর্মধারাতে এমনভাবে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে যে এর এই যে স্থূল কর্মধারাকে আমরা দেহ বলি তাকে সে নিজ বলে ভুল করে; সে যে জ্ঞাতা ও আদেশকর্তা অন্তঃপুরুষ, আর এই তার আপন প্রকৃতি তা সে ভুলে যায়; সে বিশ্বাস করে যে তার মন ও অন্তঃপুরুষ দেহের বিধান ও কর্মপ্রণালীর অধীন; সে ভুলে যায় যে এ ছাড়া সে আরো অনেক কিছু যা শারীরিক রূপের চেয়ে মহত্তর; মন যে সত্যই জড়ের চেয়ে মহত্তর এবং জড়ের বিভিন্ন তামসবৃত্তিতে, প্রতিক্রিয়ায় ও নিশ্চেষ্টতার ও অক্ষমতার অভ্যাসে বশীভূত হওয়া যে তার কর্তব্য নয় তা সে ভুলে যায়; সে ভুলে যায় যে সে এমনকি মনের চেয়েও বেশী কিছু, এমন এক সামর্থ্য যা মনোময় পুরুষকে নিজের উর্ধ্বে তুলতে সক্ষম; সে ভুলে যায় যে সে অধীশ্বর সে বিশ্বাতীত; কিন্তু অধীশ্বর যে তার নিজের কর্মপ্রণালীর দাস হয়ে থাকবে, বিশ্বাতীত যে এমন এক রূপের মধ্যে আবদ্ধ হবে যা তার নিজেরই সত্তার মধ্যে থাকে শুধু এক তুচ্ছ বস্তু হিসেবে তা ঠিক নয়। পুরুষের কর্তব্য এইসব বিস্মৃতিপরায়ণতা দূর করা আর তা করার উপায় হল পুরুষের নিজের আসল প্রকৃতি স্মরণ করা আর এই স্মরণ করা যে দেহ শুধু এক কর্মধারা এবং প্রকৃতির অনেকগুলি কর্মধারার মধ্যে এ একটি মাত্র।

তখন আমরা মনকে বলি, "এ হল প্রকৃতির কর্মধারা, এ তুমিও নয়, আমিও নয়, এ থেকে পিছিয়ে দাঁড়াও"। আমরা দেখতে পাব যে চেষ্টা করলে এই বিচ্ছিন্ন করার সামর্থ্য মনের আছে আর মন দেহ থেকে পিছিয়ে দাঁড়াতে পারে — শুধু যে ভাবনায় তা নয়, কর্মেও সে তা করতে সমর্থ আর তা যেন শারীরিকভাবে বা আরও সঠিক অর্থে প্রাণিকভাবে। দেহের বিষয় সম্বন্ধে একপ্রকার উপেক্ষার ভাব নিয়ে মনের এই বিচ্ছিন্নতাকে দৃঢ় করা চাই; এর নিদ্রা কি জাগরণ, এর চলাফেরা বা বিশ্রাম, এর যন্ত্রণা বা সুখ, স্বাস্থ্য বা অস্বাস্থ্য, এর স্ফূর্তি বা ক্লান্তি, এর স্বাচ্ছন্দ্য বা অস্বাচ্ছন্দ্য বা এ কি খায়, না খায় — সেসবকে অত্যাবশ্যক ভাবা ও সেই ভেবে ব্যস্ত হওয়া আমাদের কর্তব্য নয়।

এর এই অর্থ নয় যে আমরা দেহকে যতদূর সম্ভব ঠিকমতো রাখব না; উগ্র কৃচ্ছ্রতা সাধন বা শরীরকে ইচ্ছা করে অবহেলা করা আমাদের উচিত নয়। তবে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অস্বাচ্ছন্দ্য বা অস্বাস্থ্য — এসবের দ্বারা মন যেন বিচলিত না হয়, অথবা শারীরিক ও প্রাণিক মানুষ দেহের সব বিষয় সম্বন্ধে যে গুরুত্ব দেয় সে গুরুত্ব যেন আমরা না দিই, অথবা বস্তুতঃ এক সম্পূর্ণ গৌণ এবং কেবলমাত্র যন্ত্রের গুরুত্ব ছাড়া আর বেশী কিছু গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু এই যন্ত্রের গুরুত্বও যেন এত বেশী না হয় যে তা অবশ্য প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়; উদাহরণস্বরূপ, আমরা যেন কখনো না মনে করি যে আমাদের খাদ্য কি পানীয়ের উপর মনের শুদ্ধতা নির্ভর করে যদিও এক বিশেষ অবস্থায় কিছু সংযম বা নিষেধ আমাদের আন্তর উন্নতির পক্ষে উপকারী; আবার অপরপক্ষে আমাদের আগের মতো ভাবা উচিত নয় যে খাদ্য ও পানীয়ের উপর মনের, এমনকি প্রাণের যে নির্ভরতা তা এক অভ্যাসের অথবা এই সব তত্ত্বের মধ্যে প্রকৃতির দ্বারা স্থাপিত এক ব্যবহারিক সম্পর্কের বেশী কিছু। বস্তুতঃ যে খাদ্য আমরা গ্রহণ করি তার পরিমাণ বিপরীত অভ্যাস ও নতুন সম্পর্ক দ্বারা ন্যূনতম মাত্রায় কমান যেতে পারে আর তাতে মানসিক বা প্রাণিক উদ্যম এতটুকুও হ্রাস পায় না; এমনকি বিপরীতপক্ষে স্থূল আহারের গৌণ সহায় অপেক্ষা মানসিক ও প্রাণিক শক্তির যেসব গূঢ় উৎসের সঙ্গে তারা সংশ্লিষ্ট সেসবের উপর বেশী নির্ভর করতে শিখে তাদের বিচক্ষণতার সঙ্গে বিকশিত ক'রে আরো অধিক পরিমাণে শক্তির যোগ্যতায় শিক্ষিত করা সম্ভব। অবশ্য আত্মশিক্ষার এই দিকটি জ্ঞানযোগ অপেক্ষা আত্মসিদ্ধি যোগেই বেশী প্রয়োজনীয়; আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্যের পক্ষে প্রধান কথা হল দেহের বিষয়সমূহের প্রতি মনের আসক্তি বা তাদের উপর তার নির্ভরতা ত্যাগ করা চাই।

এইভাবে শিক্ষিত হলে মন ক্রমশঃ শিখবে দেহের প্রতি পুরুষের সঠিক মনোভাব নিতে। প্রথমতঃ এ জানবে যে মনোময় পুরুষই দেহের ভর্তা, সে কোন প্রকারেই নিজে দেহ নয়; কারণ মনের দ্বারা ও প্রাণিক শক্তির সহায়ে সে যে ভৌতিক সত্তা ধারণ করে তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন সে। স্থূল দেহের প্রতি সমগ্র সত্তার এই মনোভাব ক্রমশঃ এত বেশী স্বাভাবিক হয়ে উঠবে যে এই দেহ আমাদের কাছে মনে হবে যেন এ আমাদের পরিধানের পোষাকের মতো বা হাতে নেওয়া যন্ত্রের মতো বাইরের কিছু যা আলাদা করা যায়। এমনকি আমাদের ক্রমশঃ এই অনুভব আসা সম্ভব যে দেহ আমাদের প্রাণিক শক্তি ও মানসিকতার শুধু এক প্রকার আংশিক প্রকাশ আর এই ছাড়া এক অর্থে এর কোন অস্তিত্ব নেই। এই সব অনুভূতি থেকে বোঝা যায় যে মন দেহ সম্বন্ধে এক সঠিক স্থিতিতে আসছে আর এটি স্থূল ইন্দ্রিয়সংবিৎ দ্বারা অভিভূত ও অধিগত মানসিকতার মিথ্যা দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করছে আর তার স্থলে গ্রহণ করছে বিষয়সমূহের আসল সত্যের দৃষ্টিভঙ্গি।

দ্বিতীয়তঃ দেহের ক্রিয়া ও অনুভূতি সম্বন্ধে মন জানতে পারে যে এর মধ্যে আসীন পুরুষ প্রথমতঃ বিভিন্ন ক্রিয়ার সাক্ষী বা দ্রষ্টা এবং দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন অনুভূতির জ্ঞাতা বা

বোদ্ধা। এ আর মননে ভাববে না বা ইন্দ্রিয়সংবিৎ-এ অনুভব করবে না যে এইসব ক্রিয়া ও অনুভূতি তার নিজের, বরং বিবেচনা ও অনুভব করবে যে এই সব তার নিজের নয়, এইসব প্রকৃতির ক্রিয়া যা নিয়ন্ত্রিত হয় প্রকৃতির বিভিন্ন গুণ ও তাদের পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা। এই বিচ্ছিন্নতাকে এত স্বাভাবিক করা যায় এবং এত দূর নেওয়া যায় যে মন ও দেহের মধ্যে একপ্রকার বিভাজন আসবে আর মন দেখবে ও অনুভব করবে যে শরীরের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যন্ত্রণা, ক্লান্তি, অবসাদ প্রভৃতি যেন অন্য কোন লোকের অনুভূতি আর এই লোকের সঙ্গে তার এত নিবিড় সংযোগ থাকে যে তার মধ্যে যা কিছু ঘটছে সে তা জানতে পারে। প্রভুত্বলাভের পক্ষে এই বিভাজন এক বড় উপায়, এক বড় পদক্ষেপ; কারণ মন প্রথমে এইসব বিষয় দেখতে শুরু করে অভিভূত না হয়ে আর অবশেষে এ আদৌ তাদের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সেসব দেখে নিস্পৃহভাবে ও স্বচ্ছ বুদ্ধির সঙ্গে তবে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে। এই হল দেহের দাসত্ব থেকে মনোময় পুরুষের প্রাথমিক মুক্তি; কারণ যথার্থ জ্ঞান অবিচলিতভাবে অনুশীলন করা হলে মুক্তি অনিবার্য।

সবশেষে মন জানতে পারবে যে মনের মধ্যকার পুরুষ প্রকৃতির অধীশ্বর আর তার ক্রিয়ার জন্য এই পুরুষের অনুমতি আবশ্যক। এ দেখবে যে প্রকৃতির পূর্বেকার সব অভ্যাসে সে গোড়ায় যে আদেশ দিয়েছিল সেই আদেশ সে অনুমন্তা হিসাবে প্রত্যাহার করতে সমর্থ আর শেষ পর্যন্ত সেই অভ্যাস হয় বন্ধ হবে, নয় পুরুষের সঙ্কল্পের দ্বারা নির্দিষ্ট দিকে তার গতি পরিবর্তিত হবে; তবে তৎক্ষণাৎ তা হবে না কারণ প্রকৃতির অতীত কর্ম নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত তার দুরপনেয় ফল হিসেবে পূর্বেকার অনুমতি বজায় থাকে, আর অনেকখানি নির্ভর করে অভ্যাসের শক্তির উপর এবং মন একে কতটা মৌলিক আবশ্যক বলে আগে ভেবে রেখেছিল সেই ভাবনার উপর; তবে মন, প্রাণ ও দেহের সম্পর্কের জন্য প্রকৃতি যেসব মৌলিক অভ্যাস স্থাপিত করেছে, যদি এই অভ্যাস সেই সবের অন্তর্গত না হয় আর যদি পুরনো অনুমতিকে মন নতুন করে না দেয় বা অভ্যাসটিকে ইচ্ছা করে প্রশ্রয় দেওয়া না হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত পরিবর্তন আসবে। এমনকি ক্ষুধা তৃষ্ণার অভ্যাসও কম করা, রোধ করা ও ত্যাগ করা সম্ভব; অনুরূপভাবে ব্যাধির অভ্যাসও কম করা ও ক্রমশঃ দূর করা সম্ভব, আর ইতিমধ্যে মনের যে সামর্থ্যে প্রাণিক শক্তির সচেতন প্রয়োগে বা শুধু মানসিক আদেশে দেহের বিভিন্ন অসুখ নিরাময় করা যায় তা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। অনুরূপ প্রক্রিয়ার দ্বারা সেই অভ্যাসের সংশোধন সম্ভব যার দরুন দৈহিক প্রকৃতি কাজের কোন কোন রূপ ও পরিমাণকে মনে করে কষ্টকর, ক্লান্তিজনক বা অসাধ্য এবং এই দৈহিক যন্ত্রের দ্বারা সাধ্য শারীরিক বা মানসিক কর্মের সামর্থ্য, স্বাচ্ছন্দ্য, ক্ষিপ্রতা ও কার্যকারিতা আশ্চর্যরকম বৃদ্ধি করা সম্ভব, তাকে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, দশগুণ করা যায়।

সাধনপদ্ধতির এই দিকটি যথার্থতঃ আত্মসিদ্ধি যোগের অন্তর্ভুক্ত; তবে এখানে এইসব বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলা ভাল, এর প্রথম কারণ এই যে পূর্ণযোগের এক অংশ হিসেবে আত্মসিদ্ধি সম্বন্ধে আমাদের যা বলা প্রয়োজন আমরা তার এক ভিত্তি স্থাপন

করি এইভাবে; আর দ্বিতীয় কারণ এই যে জড়বিজ্ঞান যেসব মিথ্যা ধারণা সাধারণের মধ্যে প্রচার করেছে সেসবের সংশোধন করা আমাদের কর্তব্য। এই বিজ্ঞানের কথায়, আমাদের অতীত বিবর্তনের দ্বারা যেসব সাধারণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা এবং মন ও দেহের মধ্যে যেসব সম্পর্ক বাস্তবভাবে গড়ে উঠেছে সেইগুলি সঠিক, স্বাভাবিক ও সুস্থ অবস্থা, আর এইসব ছাড়া অন্য কিছু, এদের বিপরীত কিছু হয় ব্যাধিগ্রস্ত ও বেঠিক, নয় মতিভ্রম, আত্মবঞ্চনা ও উন্মত্ততা। বলা বাহুল্য যে বিজ্ঞান নিজেই এই রক্ষণশীল নীতি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে, কারণ মানুষ যাতে প্রকৃতির উপর আরো বেশী প্রভুত্ব পায় তার জন্য এ কত পরিশ্রম করে সফলতার সঙ্গে প্রকৃতির সাধারণ সব ক্রিয়ার উন্নতিসাধন করে। এখানে বরাবরের মত এই বলাই যথেষ্ট যে মানসিক ও শারীরিক অবস্থার এবং মন ও দেহের সম্পর্কের যে পরিবর্তনে সত্তার শুদ্ধতা ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায়, অনাবিল হর্ষ ও প্রশান্তি আসে, মনের নিজের উপর ও শারীরিক সব ক্রিয়ার সামর্থ্য বহুগুণিত হয়, এককথায় যাতে মানুষ তার নিজের প্রকৃতির উপর অধিকতর প্রভুত্বলাভ করে, সেই পরিবর্তন স্পষ্টতঃই ব্যাধিগ্রস্ত নয়, এ যে মতিভ্রম বা আত্মপ্রবঞ্চনা তা-ও বলা যায় না কারণ এর সব ফল প্রত্যক্ষ ও সুনিশ্চিত। প্রকৃতির দ্বারা ব্যষ্টিজীবের যে বিকাশ সাধন হবে, বস্তুতঃ এ শুধু তার এক ইচ্ছাকৃত অগ্রবর্তী অবস্থা, প্রকৃতি এই বিকাশ যে কোন ভাবেই সম্পাদন করবে, তবে এই ক্ষেত্রে সে মানবসঙ্কল্পকে তার প্রধান সহায়ক হিসেবে কাজে লাগাতে ঠিক করে, কারণ তার মূল লক্ষ্য হল পুরুষ যাতে প্রকৃতির উপর সচেতন প্রভুত্ব লাভ করে সেইমত তাকে চালনা করা।

এই কথা বলার পর আমাদের আরো বলা দরকার যে জ্ঞানমার্গের সাধনায় মন ও দেহের সিদ্ধি আদৌ কোন বিবেচনার বিষয় নয়, আর না হয় এ শুধু বিবেচনার গৌণ বিষয়। একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয় হল প্রকৃতি থেকে আত্মায় উত্তরণ; আর তা করা চাই সম্ভবপর সবচেয়ে দ্রুত বা সবচেয়ে সম্পূর্ণ ও কার্যকরী পদ্ধতিতে; আর যে পদ্ধতির বিবরণ আমরা দিচ্ছি তা সর্বাপেক্ষা দ্রুত না হলেও ফলপ্রসূতাতে সর্বাপেক্ষা সম্পূর্ণ। আর এইখানে শারীরিক ক্রিয়া বা নিষ্ক্রিয়তার প্রশ্ন ওঠে। সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, যোগী যথাসম্ভব কর্ম থেকে সরে আসবে, আর বিশেষতঃ এই ভাবা হয় যে খুব বেশী কর্ম এক বাধা কারণ এতে বাইরের দিকে ক্রিয়াশক্তির অপচয় হয়। এর মধ্যে কিছু সত্য আছে; আর আমাদের আরো মনে রাখা দরকার যে যখন মনোময় পুরুষ শুধু সাক্ষী ও দ্রষ্টার মনোভাব গ্রহণ করে তখন সত্তার উপর নীরবতা, নিঃসঙ্গতা, শারীরিক শান্তি ও দৈহিক নিষ্ক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। যতক্ষণ এর সঙ্গে নিশ্চেষ্টতা, অসামর্থ্য বা কর্মে অনিচ্ছা অর্থাৎ এককথায় তামসিক গুণের বৃদ্ধি না আসে ততক্ষণ এ হল মঙ্গলকর। কিছু না করার সামর্থ্য এক বড় সামর্থ্য, এক বড় প্রভুত্ব; আলস্য, অসামর্থ্য বা ক্রিয়ায় বিতৃষ্ণা ও নিষ্ক্রিয়তায় আসক্তি থেকে এ সম্পূর্ণ ভিন্ন; জ্ঞানযোগীর পক্ষে মনন থেকে নিবৃত্ত হওয়ার সামর্থ্য, একান্ত নিভৃতে ও নীরবে অনির্দিষ্টকালের জন্য থাকার সামর্থ্য, অবিচলিত শান্তির সামর্থ্য যেমন প্রয়োজনীয় তেমনই প্রয়োজনীয় ক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিরত হওয়ার

সামর্থ্য। যে এইসব অবস্থা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয়, সে এখনো পরমজ্ঞানাভিমুখী পথের যোগ্য হয়নি; যে এই সবের দিকে অগ্রসর হতে অক্ষম সে এখনো ঐ জ্ঞানলাভের অযোগ্য।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা উচিত যে সামর্থ্য থাকাই যথেষ্ট; সকল শারীরিক ক্রিয়া থেকে নিবৃত্তি অপরিহার্য নয়; মানসিক বা দৈহিক ক্রিয়াতে বিতৃষ্ণা কাম্য নয়। জ্ঞানের পূর্ণ অবস্থার সাধকের কর্তব্য — যেমন কর্মে আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়া, তেমন সমভাবে মুক্ত হওয়া নৈষ্কর্ম্যে আসক্তি থেকে। বিশেষতঃ মনের বা প্রাণের বা দেহের শুধু নিশ্চেষ্টতার সকল প্রবণতাই অতিক্রম করা চাই, আর যদি দেখা যায় যে প্রকৃতির উপর ঐ অভ্যাস বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাহলে একে দূর করার জন্য পুরুষের সঙ্কল্প প্রয়োগ করা অত্যাবশ্যক। শেষ পর্যন্ত এমন একটা অবস্থা আসে যখন দেহ ও প্রাণ কাজ করে মনের মধ্যে পুরুষের সঙ্কল্পের শুধু যন্ত্র হিসেবে, তাতে কোন কষ্টবোধ বা আসক্তি থাকে না, আর তারা যে কর্মে প্রবৃত্ত হয় তাতে সেই হীন, অধীর ও প্রায়শঃই উত্তেজনাপূর্ণ শক্তি থাকে না; যা সাধারণ কর্মপ্রণালীর প্রকৃতি। যেমন প্রকৃতির সব শক্তি কাজ করে, দেহ ও প্রাণও কাজ করতে আসে তেমনভাবে — বিনা উদ্বেগে, বিনা পরিশ্রমে, বিনা প্রতিক্রিয়ায়; এইসব হল সেই দেহবদ্ধ প্রাণের বৈশিষ্ট্য যা এখনো ভৌতিক সত্তার প্রভু হয়নি। যখন আমরা এই সিদ্ধি লাভ করি, তখন ক্রিয়ায় বা নিষ্ক্রিয়তায় কিছু আসে যায় না, কারণ এদের কোনটিই অন্তঃপুরুষের মুক্তি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করে না, অথবা আত্মার দিকে তার এষণা থেকে বা আত্মার মধ্যে তার স্থিতি থেকে তাকে সরিয়ে আনে না। কিন্তু যোগে এই সিদ্ধির অবস্থা আসে পরে, আর তা না আসা পর্যন্ত গীতাবিহিত মিতাচারের নিয়মই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে প্রশস্ত; সুতরাং অত্যধিক মানসিক বা শারীরিক ক্রিয়া ভাল নয়, কারণ অত্যধিক পরিশ্রমে অত্যধিক ক্রিয়াশক্তির অপচয় হয়, আর আধ্যাত্মিক অবস্থার উপর এর প্রতিক্রিয়া অশুভজনক; আবার খুব কম কাজ করাও ভালো নয়, কারণ এই ত্রুটির ফলে নিষ্ক্রিয়তার, এমনকি অক্ষমতার অভ্যাস জন্মায়, আর একে আবার জয় করতে হয় কষ্ট করে। তবু, মাঝে মাঝে একান্ত শান্তি, নিঃসঙ্গতা ও কর্ম থেকে নিবৃত্তি অতীব বাঞ্ছনীয় এবং অন্তঃপুরুষের নিজের মধ্যে অপসরণের জন্য এইসব যত ঘন ঘন সম্ভব তত ঘন ঘন পাওয়া উচিত, কারণ এইরকম অপসরণ জ্ঞানের পক্ষে অপরিহার্য।

এইভাবে দেহের সঙ্গে ব্যবহারে, প্রাণ অর্থাৎ প্রাণশক্তিরও সঙ্গে আমাদের ব্যবহার করা দরকার। কাজের জন্য, প্রাণশক্তিকে দুই পৃথক ভাগে ভাগ করা দরকার — স্থূলপ্রাণ অর্থাৎ প্রাণশক্তি যখন দেহের মধ্যে কাজ করে, এবং সূক্ষ্মপ্রাণ অর্থাৎ প্রাণশক্তি যখন মানসিক ক্রিয়ার সমর্থনে কাজ করে। কারণ আমরা সর্বদাই এক দ্বিবিধ জীবন যাপন করি — মানসিক ও শারীরিক; আর একই প্রাণশক্তি যখন যেটির কাজ করে তখন সেইমত ভিন্নভাবে সক্রিয় হয় এবং ভিন্নরূপ ধারণ করে। দেহের মধ্যে এ আনে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, স্বাস্থ্য, রোগ, শারীরিক স্ফূর্তি প্রভৃতি অর্থাৎ যেগুলি দেহের প্রাণিক অনুভূতি।

কারণ মানুষের স্থূল দেহ পাথর বা মাটির মত নয়; প্রাণকোষ ও অন্নকোষ — এই দুই কোষের সমষ্টি এ, আর এই দুয়ের অবিরত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই এর জীবন। তবু প্রাণশক্তি ও শরীর — দুটি ভিন্ন ভিন্ন জিনিস; আর দেহের মধ্যে নিবিষ্ট থাকার বোধ থেকে মন যত সরে আসে তত বেশী আমরা সচেতন হই প্রাণ ও দেহযন্ত্রের মধ্যে তার ক্রিয়া সম্বন্ধে, আর সমর্থ হই এর কাজ নিরীক্ষণ করতে এবং উত্তরোত্তর নিয়ন্ত্রণ করতে। কার্যতঃ দেহ থেকে সরে এসে আমরা স্থূল প্রাণশক্তি থেকেও পিছিয়ে আসি, আর তা আসি এমনকি যখন আমরা দুটির মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারি আর অনুভব করি যে নিছক দৈহিক যন্ত্র অপেক্ষা এই স্থূল প্রাণশক্তি আমাদের অধিকতর নিকটবর্তী। বস্তুতঃ দেহকে সম্পূর্ণ জয় করার উপায় হল স্থূল প্রাণশক্তিকে জয় করা।

দেহ ও এর বিভিন্ন কর্মের প্রতি আসক্তির সঙ্গে দেহমধ্যস্থ প্রাণের প্রতি আসক্তিও জয় করা হয়। কারণ যখন আমরা অনুভব করি যে এই স্থূল শরীর "আমরা" নয়, এ হল শুধু এক পরিচ্ছদ বা যন্ত্র তখন দেহনাশের প্রতি যে জুগুপ্সা প্রাণিক মানবের এত প্রবল ও দুর্বার সহজসংস্কার তা হ্রাস পেতে বাধ্য এবং তাকে বাইরে নিক্ষেপ করা সম্ভব। একে বাইরে নিক্ষেপ করতেই হবে এবং তা করা চাই সম্পূর্ণভাবে। মানবের যে মৃত্যুভয় ও দেহনাশের প্রতি বিতৃষ্ণা তা তার পূর্ব পশুজন্ম থেকে পাওয়া কলঙ্ক। সে কালিমা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করা চাই।

অষ্টম অধ্যায়

হৃদয় ও মন থেকে বিমুক্তি

কিন্তু ঊর্ধ্বগামী অন্তঃপুরুষ শুধু যে দেহমধ্যস্থ প্রাণ থেকে নিজেকে পৃথক করবে তা নয়, মনের মধ্যে প্রাণশক্তির ক্রিয়া থেকেও তার নিজেকে পৃথক করা দরকার; পুরুষের প্রতিনিধিরূপে তার মনকে বলা চাই, "আমি প্রাণ নই, প্রাণ পুরুষের আত্মা নয়, এ হল প্রকৃতির এক ক্রিয়ামাত্র, আর তাও অনেকগুলি ক্রিয়ার মধ্যে একটিমাত্র।" প্রাণের বৈশিষ্ট্য হল ক্রিয়া ও গতি, ব্যক্তির নিকট যা বাহ্য তা ভিতরে গ্রহণ করে আত্মসাৎ করার জন্য উদ্যম এবং এ যা ধরে বা যা এর কাছে আসে তাতে তৃপ্তি বা অতৃপ্তির এক তত্ত্ব; এই তত্ত্বটি আকর্ষণ ও বিকর্ষণের সর্বব্যাপী তথ্যের সঙ্গে সহচরিত। প্রকৃতির সর্বত্র এই তিনটি বিষয় বিদ্যমান, কারণ প্রাণ বিদ্যমান প্রকৃতির সর্বত্র। কিন্তু আমরা মনোময় পুরুষ হওয়ায় এসবকে আমাদের ভিতর এক মানসিক মূল্য দেওয়া হয়, আর এই মূল্য হয় সেই মন অনুযায়ী যে মন এসব দেখে ও গ্রহণ করে। তারা নেয় ক্রিয়ার, কামনার এবং পছন্দ ও অপছন্দের, সুখ ও দুঃখের রূপ। প্রাণ আমাদের মধ্যে সর্বত্র বিদ্যমান, এ যে শুধু আমাদের দেহের ক্রিয়ার অবলম্বন তা নয়, এ হল আমাদের ইন্দ্রিয়মানস, ভাবমানস, আমাদের ভাবনামানসেরও ক্রিয়ার অবলম্বন, আর এই সবের মধ্যে এ তার নিজের বিধান বা ধর্ম এনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, গণ্ডি টানে, তাদের সঠিক ক্রিয়াকে বৈষম্যের মধ্যে ফেলে এবং সেই অব্যবস্থার অশুদ্ধতা ও ব্যামিশ্রভাব উৎপাদন করে যা আমাদের মনস্তাত্ত্বিক জীবনের সামগ্রিক অশুভ। সেই বিশৃঙ্খলার মধ্যে যে বিধানের আধিপত্য বেশী মনে হয় তা হল কামনার বিধান। যেমন সর্বগ্রাহী, সর্বাধিকারী বিশ্বাত্মক ভাগবত সত্তা কাজ করেন, সঞ্চরণ করেন, উপভোগ করেন কেবলমাত্র দিব্য আনন্দের তৃপ্তির জন্য, তেমন ব্যষ্টিপ্রাণ কাজ করে, সঞ্চরণ করে, সুখ ও কষ্টভোগ করে প্রধানতঃ কামনার তৃপ্তির জন্য। সুতরাং সূক্ষ্ম প্রাণশক্তি আমাদের অনুভূতিতে আবির্ভূত হয় একপ্রকার কাম-মানস রূপে, আর একে জয় করা আমাদের দরকার যদি আমরা ফিরে পেতে চাই আমাদের প্রকৃত আত্মাকে।

কামনা হল একই কালে আমাদের সকল ক্রিয়ার সঞ্চালক, ক্রিয়া সম্পাদনের মেরুদণ্ড, আবার আমাদের জীবনের পক্ষে সর্বনাশা। যদি আমাদের ইন্দ্রিয়মানস, ভাবমানস, ভাবনামানস, কাজ করতে পারত প্রাণশক্তির অযথা প্রবেশ ও তার আনা বিষয়সমূহ থেকে মুক্ত হয়ে আর যদি ঐ শক্তিকে আমাদের জীবনের উপর তার নিজের শাসন আরোপ না ক'রে তাদের সঠিক ক্রিয়া অনুযায়ী চলতে বাধ্য করা হ'ত তাহলে মানুষের বিভিন্ন সমস্যা সামঞ্জস্যের সঙ্গে তাদের সঠিক সমাধানের দিকে অগ্রসর হ'ত। প্রাণশক্তির যথার্থ কাজ হল, — আমাদের অন্তঃস্থ দিব্য তত্ত্ব তাকে যা আদেশ দেয় তা-ই

করা, ঐ অন্তরধিষ্ঠিত ভগবান তাকে যা দেন তা গ্রহণ করা ও উপভোগ করা এবং মোটেই কামনা না করা। ইন্দ্রিয়মানসের যথার্থ কাজ হল প্রাণের বিভিন্ন স্পর্শের নিকট নিষ্ক্রিয় ও দীপ্তভাবে উন্মুক্ত থাকা, এবং তাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়সংবিৎ এবং তাদের মধ্যস্থ রস অর্থাৎ সঠিক আস্বাদন ও আনন্দের তত্ত্ব ঊর্ধ্বতর ক্রিয়ার নিকট প্রেরণ করা; কিন্তু দেহমধ্যস্থ প্রাণশক্তির আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান, তৃপ্তি ও অতৃপ্তি, ক্ষমতা ও অক্ষমতার দ্বারা ব্যাহত হওয়ায়, প্রথমতঃ এর পরিধি সঙ্কুচিত হয়, এবং দ্বিতীয়তঃ এটি এইসব গণ্ডির মধ্যে জড়গত প্রাণের এই সকল বৈষম্যের সঙ্গে যুক্ত হতে বাধ্য হয়। জীবনের আনন্দের যন্ত্র না হয়ে এ হয়ে ওঠে সুখ ও দুঃখের যন্ত্র।

অনুরূপভাবে ভাবমানস এইসব বৈষম্য লক্ষ্য করতে এবং তাদের ভাবগত বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার বশীভূত হতে বাধ্য হওয়ায় এ হয়ে ওঠে এমন এক দ্বন্দ্বময় রণক্ষেত্র যেখানে চলে হর্ষ ও শোক, প্রেম ও ঘৃণা, ক্রোধ, ভয়, সংগ্রাম, আস্পৃহা, বিরক্তি, পছন্দ, অপছন্দ, উপেক্ষা, সন্তোষ, অসন্তোষ, আশা, নিরাশা, কৃতজ্ঞতা, প্রতিহিংসা প্রভৃতির অর্থাৎ প্রচণ্ড ভাবাবেগের বিরাট ক্রীড়া; আর এই তো জগতের জীবননাটক। এই নৈরাজ্যকেই আমরা বলি আমাদের অন্তঃপুরুষ। কিন্তু প্রকৃত অন্তঃপুরুষ, প্রকৃত চৈত্যসত্তা আমাদের অধিকাংশের কাছেই অদেখা, মানবজাতির মধ্যে খুব কম লোকেরই মধ্যে তার বিকাশ হয়েছে; এ হল শুদ্ধ প্রেম, হর্ষ ও দীপ্ত প্রযত্নের এমন এক যন্ত্র যার কাজ হল ভগবান ও আমাদের জীব-ভাইদের সঙ্গে সম্মিশন ও ঐক্যলাভ। এই চৈত্যসত্তা আবৃত থাকে সেই মনোভাবাপন্ন প্রাণের অর্থাৎ কামমানসের ক্রীড়ার দ্বারা যাকে আমরা অন্তঃপুরুষ ব'লে ভুল করি; ভাবমানস আমাদের অন্তঃস্থ প্রকৃত অন্তঃপুরুষকে, আমাদের হৃদিস্থিত ভগবানকে প্রতিফলিত করতে অসমর্থ, তার পরিবর্তে এ বাধ্য হয় কামমানসকে প্রতিফলিত করতে।

তেমন ভাবনামানসেরও যথার্থ কাজ হল জ্ঞানে আবেগহীন আনন্দ নিয়ে পর্যবেক্ষণ, অবধারণ ও বিচার করা এবং নিজেকে উন্মুক্ত রাখা সেইসব বার্তা ও দীপ্তিচ্ছটার দিকে যেসব সক্রিয় হয় তার সব দেখা বিষয়ের উপর এবং সেসবেরও উপর যেগুলি তখনো তার কাছে গোপন থাকে তবে উত্তরোত্তর প্রকাশ হতে বাধ্য আর এইসব বার্তা ও দীপ্তিচ্ছটা আমাদের মানসিকতার ঊর্ধ্বে আলোকের মধ্যস্থিত গোপন দিব্য বাণী থেকে আমাদের নিকট গূঢ়ভাবে নিম্নে ঝলক দেয় তবে মনে হতে পারে তারা হয় বোধিত মনের মাধ্যমে নিম্নে আসে, নয় দ্রষ্টা হৃদয় থেকে উপরে ওঠে। কিন্তু এই কাজ ভাবনামানস সঠিকভাবে করতে পারে না, আর তার কারণ এই যে এটি ইন্দ্রিয়স্থিত প্রাণশক্তির সসীমতায় ও ইন্দ্রিয়সংবিৎ ও ভাবাবেগের বৈষম্যের সসীমতায় আবদ্ধ থাকে এবং আবদ্ধ থাকে নিজেরই সেইসব বুদ্ধিগত রুচি, নিশ্চেষ্টতা, প্রয়াস, একগুঁয়েমির সসীমতায় যেসব রূপ সে নিজের মধ্যে নেয় এই কামমানস, সূক্ষ্ম প্রাণের প্রভাবে। যেমন উপনিষদে বলা হয়েছে — আমাদের সমগ্র মানসচেতনা এই প্রাণের এই প্রাণশক্তির সূত্র ও স্রোতধারায় ওতপ্রোতভাবে জড়িত; এই প্রাণ চেষ্টা করেও গণ্ডি

টানে, ধারণ করেও হারিয়ে ফেলে, কামনা করে ও কষ্টভোগ করে, আর একে বিশুদ্ধ করা হলেই আমরা সক্ষম হই আমাদের প্রকৃত ও সনাতন আত্মাকে জানতে ও অধিগত করতে।

একথা সত্য যে এইসব অনর্থের মূল হল অহং-বোধ আর সচেতন অহং-বোধের আসন স্বয়ং মনের মধ্যে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সচেতন মন শুধু প্রতিফলিত করে এমন এক অহং যা ইতিপূর্বেই বিষয়সমূহের অবচেতন মনে সৃষ্ট হয়েছিল, — এই সেই প্রস্তর ও উদ্ভিদের মধ্যস্থ মূক অন্তঃপুরুষ যা সকল দেহ ও প্রাণের মধ্যে উপস্থিত থাকে আর শুধু শেষ পর্বে স্বর পায় ও জেগে ওঠে; এ কিন্তু আদিতে সচেতন মনের দ্বারা সৃষ্ট হয়নি। আর এই উত্তরায়ণে প্রাণশক্তিই হয়ে উঠেছে অহং-এর কঠিন গ্রন্থি; কামমানস এই গ্রন্থি শিথিল করতে দেয় না; এমনকি যখন বুদ্ধি ও হৃদয় তাদের অনর্থের কারণ বুঝতে পারে ও তা দূর করতে পারলে খুসী হয় তখনও না; কারণ তাদের মধ্যকার প্রাণই সেই পশু যে বিদ্রোহ করে ও তাদের জ্ঞানকে আচ্ছন্ন ও বিভ্রান্ত করে এবং তার অস্বীকৃতির দ্বারা জোর ক'রে তাদের সঙ্কল্প দমন করে।

সুতরাং মনোময় পুরুষের কর্তব্য নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা যাতে এই কামমানসের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ না থাকে ও তাকে নিজ ব'লে সে মনে না করে। তাকে বলতে হবে, "আমি এই জিনিস নয় যা সংগ্রাম করে ও কষ্টভোগ করে, যা শোক ও আনন্দ, প্রেম ও ঘৃণা, আশা ও ব্যর্থতা, ক্রোধ ও ভয় ও সুখ ও অবসাদের বশীভূত, অর্থাৎ যা প্রাণিক বৃত্তি ও উগ্র ভাবাবেগের অধীন। এইসব শুধু ইন্দ্রিয়গত ও ভাবগত মনে প্রকৃতির ক্রিয়া ও অভ্যাস।" তখন মন তার সব ভাবাবেগ থেকে সরে এসে দৈহিক ক্রিয়া ও অনুভূতির মত এদেরও দ্রষ্টা বা সাক্ষী হয়ে ওঠে। আবার আসে এক আন্তর বিভাজন। একদিকে এই ভাবগত মন যার মধ্যে প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের অভ্যাস অনুযায়ী সব বৃত্তি ও উগ্র ভাবাবেগ পূর্বের মত চলতে থাকে, আর অন্যদিকে দ্রষ্টা মন যে এইসব দেখে, বিচার করে ও অবধারণ করে কিন্তু সেসব থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। এ এইসব দেখে যেন এ ছাড়া অন্য সব অভিনেতা মানসিক রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করছে; প্রথমে তার আগ্রহ থাকে ও মাঝে মাঝে আগের মত নিজেকে তাদের সাথে এক মনে করে, পরে দেখে সম্পূর্ণ শান্তভাবে ও বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং সবশেষে এ যে শুধু শান্ত থাকে তা নয়, নিজের নীরব সত্তার শুদ্ধ আনন্দ ভোগ করে আর ছোট ছেলে যেমন খেলতে খেলতে খেলার মধ্যে ডুবে গিয়ে দুঃখকষ্ট পেলে আমরা তার কল্পনার দুঃখকষ্টে হাসি, এও তেমন সেই অভিনয়ের অবাস্তবতায় হাসে। দ্বিতীয়তঃ এ জানতে পারে যে এ নিজেই অনুমতির কর্তা আর অনুমতি প্রত্যাহার করে এ অভিনয় বন্ধ ক'রে দিতে সক্ষম। অনুমতি প্রত্যাহার করা হলে অপর এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে; ভাবগত মন সাধারণতঃ শান্ত ও শুদ্ধ হয়ে উঠে এইসব প্রতিক্রিয়া থেকে নিস্তার পায়, আর এমনকি এইসব এলেও তারা আর ভিতর থেকে আসে না, মনে হয় তারা যেন বাইরে থেকে আসে আর মনের উপর তাদের ছাপ পড়ে যেসব ছাপে মনের তন্তুগুলি তখনো সাড়া দিতে সক্ষম; কিন্তু সাড়া দেবার এই

অভ্যাস চলে যায় আর যথাসময়ে ভাবগত মন তার পরিত্যক্ত সব উগ্র ভাবাবেগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়। আশা ও ভয়, হর্ষ ও শোক, পছন্দ ও অপছন্দ, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, সন্তোষ ও অসন্তোষ, আনন্দ ও অবসাদ, ত্রাস ও ক্রোধ ও ভয় ও বিরক্তি ও লজ্জা এবং প্রেম ও ঘৃণার প্রচণ্ড ভাবাবেগ — এসব খসে পড়ে মুক্ত চৈত্যপুরুষ থেকে।

কি আসে তাদের জায়গায়? আমরা জোর ক'রে চাইলে আসতে পারে সম্পূর্ণ শান্তি, নীরবতা ও উপেক্ষা। কিন্তু যদিও এই অবস্থার মধ্য দিয়ে অন্তঃপুরুষকে সাধারণতঃ যেতে হয় তাহলেও আমাদের যে চরম লক্ষ্য তা এ নয়। সুতরাং পুরুষ আবার হয়ে ওঠে অধীশ্বর যে সঙ্কল্প করে, আর যার সঙ্কল্প হল অনুচিত উপভোগ সরিয়ে তার স্থানে আনা চৈত্যজীবনের উচিত উপভোগ। সে যা সঙ্কল্প করে প্রকৃতি তা নিষ্পাদন করে। যা ছিল কামনা ও প্রচণ্ড ভাবাবেগের উপাদান তা-ই হয়ে ওঠে শুদ্ধ, সম ও শান্ত প্রগাঢ় প্রেম ও হর্ষ ও একত্বের সত্যবস্তু। প্রকৃত অন্তঃপুরুষ বার হয়ে অধিষ্ঠিত হয় কামমানসের শূন্য স্থানে। যে পাত্র পরিষ্কার ও শূন্য করা হয়েছে তা পূর্ণ করা হয় দিব্য প্রেম ও আনন্দের মদিরায়, তাতে আর দেওয়া হয় না প্রচণ্ড ভাবাবেগের মিষ্ট ও তিক্ত গরল। সকল প্রচণ্ড ভাবাবেগই, এমনকি মঙ্গলের জন্যও এরকম ভাবাবেগ দিব্য প্রকৃতির মিথ্যা রূপ। কৃপার উগ্রভাব আর তার সব অশুদ্ধ উপাদান যেমন শারীরিক জুগুপ্সা ও অপরের দুঃখকষ্ট সহ্য করার ভাবগত অক্ষমতা — এসব বর্জন ক'রে তার স্থলে আনতে হবে পরতরা দিব্য করুণা যা অপরের ভার দেখে, বোঝে ও গ্রহণ করে এবং সাহায্য ও সুস্থ করতে সক্ষম, তবে নিজের ইচ্ছামতো জগতের দুঃখকষ্টে বিদ্রোহ ক'রে নয়, অথবা কিছু না জেনে বিষয়সমূহের বিধান ও তাদের উৎসকে মিথ্যা দোষ দিয়ে নয়; সে তা করে আলোক ও জ্ঞানের সঙ্গে এবং ভগবানের প্রকট হওয়ার ব্যাপারে তাঁর যন্ত্ররূপে। সেইরকম যে প্রেম কামনা করে ও সাগ্রহে গ্রহণ করে, আর হর্ষে উদ্বিগ্ন হয় এবং শোকে ভেঙে পড়ে — তা-ও বর্জন ক'রে আনতে হবে সেই সব সর্বগ্রাহী প্রেম যা এই সব থেকে মুক্ত, যার থাকা না থাকা কোন বিশেষ অবস্থার উপর নির্ভর করে না এবং প্রত্যুত্তর আসুক বা না আসুক যার কোন তারতম্য হয় না। এইভাবে আমরা অন্তঃপুরুষের সব গতির সঙ্গে মোকাবিলা করব; কিন্তু এসব সম্বন্ধে আমরা পরে আরো বলব আত্মসিদ্ধি যোগের আলোচনা প্রসঙ্গে।

কর্ম ও নৈষ্কর্ম্য সম্বন্ধে যেমন, ঠিক তেমনি এই দুই সম্ভাবনার মধ্যে — একদিকে উপেক্ষা ও শান্তি, অন্যদিকে সক্রিয় হর্ষ ও প্রেম। সমত্বই ভিত্তি, উপেক্ষা নয়। হর্ষ ও শোকের কারণগুলি সম্বন্ধে সম তিতিক্ষা, নিরপেক্ষ উপেক্ষা, এমন শান্ত প্রপত্তি যাতে শোক বা হর্ষের কোন প্রতিক্রিয়া থাকে না — এইসব সমত্বের প্রস্তুতি ও নঞর্থক ভিত্তি; কিন্তু সমত্ব পূর্ণ হয় না যতক্ষণ না তা প্রেম ও আনন্দের সদর্থক রূপ নেয়। ইন্দ্রিয়মানসকে পেতে হবে সর্বসুন্দরের সম রস, হৃদয়কে পেতে হবে সকলের জন্য সম প্রেম ও আনন্দ, আর সূক্ষ্মপ্রাণের পাওয়া চাই এই রস, প্রেম ও আনন্দের উপভোগ। অবশ্য এই হল সেই সদর্থক সিদ্ধি যা আসে মুক্তির দ্বারা; কিন্তু জ্ঞানমার্গে আমাদের

প্রথম উদ্দেশ্য বরং সেই মুক্তি যা পাওয়া যায় কামমানস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ও এর সব প্রচণ্ড ভাবাবেগ ত্যাগ ক'রে।

মনন-যন্ত্র থেকেও কামমানসকে বর্জন করা অবশ্য কর্তব্য, আর তা করার প্রকৃষ্ট উপায় হল মনন ও মতামত থেকে পুরুষের বিচ্ছিন্ন হওয়া। সত্তার সম্যক্ শুদ্ধীকরণ কি — সে সম্বন্ধে যখন আমরা আগে বিবেচনা করেছিলাম তখনই আমরা এই বিচ্ছিন্নতা সম্বন্ধে বলেছি। কারণ জ্ঞানসাধনার এই যে সব প্রক্রিয়ার কথা আমরা বর্ণনা করছি তা হল শুদ্ধীকরণ ও মুক্তিসাধনের পদ্ধতি যার সাহায্যে সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত আত্মজ্ঞান সম্ভব হয়ে ওঠে, আর উত্তরোত্তর আত্মজ্ঞান নিজেই শুদ্ধি ও মুক্তির এক করণ। সত্তার বাকী সব অংশ সম্বন্ধে যে পদ্ধতি নেওয়া হয় ভাবনামানস সম্বন্ধেও সেই একই পদ্ধতি। পুরুষ প্রথমে ভাবনামানসকে ব্যবহার করবে প্রাণ ও দেহের সঙ্গে এবং কামনা ও বিভিন্ন ইন্দ্রিয়সংবিৎ ও ভাবাবেগের মনের সঙ্গে নিজের একাত্মতাবোধ থেকে বিমুক্ত হবার জন্য এবং পরে স্বয়ং ভাবনামানসের দিকেই ঘুরে বলবে "আমি এও নই; আমি মনন নই, মননকর্তাও নই; ধীশক্তির এইসব ভাবনা, মতামত, কল্পনা, প্রচেষ্টা, এর বিভিন্ন পূর্বানুরাগ, পছন্দ, মত, সংশয়, আত্মসংশোধন — এসব আমি নয়; এইসব শুধু ভাবমানসের মধ্যে প্রকৃতির ক্রিয়া।" এইভাবে এক বিভাজন সৃষ্টি হয় — এক মন যে চিন্তা ও সঙ্কল্প করে, অন্য মন যা পর্যবেক্ষণ করে, আর পুরুষ হয়ে ওঠে শুধু সাক্ষী; সে তার মননের ধারা ও সব বিধান দেখে, অবধারণ করে, কিন্তু তা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে। এর পর অনুমতি দাতা হিসেবে সে মানসিক নিম্নস্রোত ও যুক্তিবুদ্ধির ব্যামিশ্রতা থেকে তার পূর্ব অনুমতি প্রত্যাহার ক'রে উভয়কেই বাধ্য করে তাদের সব দুরাগ্রহ থেকে নিবৃত্ত হতে। চিন্তাশীল মনের অধীনতা থেকে সে মুক্ত হয়ে ওঠে আর সমর্থ হয় পূর্ণ নীরবতা পেতে।

সিদ্ধির জন্য আরো যা দরকার তা হল স্বীয় প্রকৃতির অধীশ্বর হিসেবে নিজের স্থান পুনরায় গ্রহণ করা, আর গ্রহণ করা সেই সঙ্কল্প যা দিয়ে ক্ষুদ্র মানসিক নিম্নস্রোত ও ধীশক্তি সরিয়ে উপর থেকে উদ্ভাসক ঋতচেতন মনন আনা সম্ভব। কিন্তু নীরবতা আবশ্যক; মননে নয়, নীরবতার মধ্যেই আমরা আত্মাকে পাব, তাকে জানতে পারব, শুধু যে তার প্রত্যয় পাব তা নয়, আর মনোময় পুরুষ থেকে বাইরে সরে এসে প্রবেশ করব তার মধ্যে যা মনের উৎস। কিন্তু এই সরে আসার জন্য আবশ্যক এক অন্তিম মুক্তি, মনস্থিত অহং-বোধ থেকে বিমুক্তি।

নবম অধ্যায়

অহং-বিমুক্তি

বিশ্বপ্রাণের উত্তরোত্তর বিবর্তনে তার প্রথম বড় কাজ হল দেহবোধে আবদ্ধ এক মানসিক ও প্রাণিক অহং গঠন; কারণ জড় থেকে সচেতন জীব সৃষ্টি করার জন্য এই উপায়টিই সে পেয়েছিল। আবার এই বিশ্বপ্রাণের দিব্য পরিণতি লাভেরও একমাত্র সর্ত, প্রয়োজনীয় উপায় হল এই সীমাকারী অহং-এর লয়; কারণ একমাত্র এইভাবেই সচেতন জীব পেতে পারে তার বিশ্বাতীত আত্মা অথবা তার প্রকৃত ব্যক্তি। এই দ্বিবিধ গতিকে সাধারণতঃ চিত্রিত করা হয় এক পতন ও উদ্ধার রূপে অথবা সৃষ্টি বা ধ্বংস রূপে — যেন একটি আলো জ্বালা ও তার নিভে যাওয়া অথবা প্রথমে এক অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অস্থায়ী ও অসত্য আত্মার গঠন এবং তা থেকে আমাদের সত্যকার আত্মার শাশ্বত বৃহত্ত্বে বিমুক্তি। কারণ মানব মনন দুইটি বিপরীত প্রান্তের দিকে বিভক্ত হয়ে পড়ে — একটি ঐহিক ও অর্থক্রিয়াকারী যাতে ব্যষ্টিগত বা সমষ্টিগত মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক অহং-বোধের চরিতার্থতা ও তৃপ্তিসাধনকেই জীবনের উদ্দেশ্য ব'লে গণ্য করা হয় আর তার বেশী কিছু দেখা হয় না; অন্যটি আধ্যাত্মিক, দার্শনিক বা ধর্মীয় যাতে অন্তঃপুরুষের, বা চিৎপুরুষের বা অন্য কিছু চরম সত্তার জন্য অহং জয় করাই একমাত্র পরম কর্তব্য ব'লে গণ্য করা হয়। এমনকি অহং-এর শিবিরেও দুইটি বিভিন্ন মত আছে যাতে বিশ্ব সম্বন্ধে ঐহিক বা জড়বাদকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। একটি চিন্তাধারায় মনে করা হয় যে মানসিক অহং আমাদের মানসিকতার সৃষ্টি আর দেহের মৃত্যুর দ্বারা মনের লয়ের সাথে এরও লয় হবে; একমাত্র স্থায়ী সত্য হল চিরন্তনী প্রকৃতি যা এই বা অন্য জাতির মধ্যে কর্মরতা আর তারই উদ্দেশ্য পালন করা উচিত, আমাদের নয়। জাতির, সমষ্টিগত অহং-এর চরিতার্থতাসাধনই জীবনের বিধি হওয়া উচিত, ব্যষ্টির চরিতার্থতা নয়। অপর চিন্তাধারাটির প্রবণতা প্রাণবাদের দিকেই বেশী; তাতে স্থির করা হয় যে সচেতন অহং-ই প্রকৃতির পরম অবদান, — তা সে যতই স্বল্পস্থায়ী হ'ক; এতে অহং-কে এক মহৎ স্থান দিয়ে বলা হয় যে এ হল "হওয়ার সঙ্কল্পের" (will-to-be) মানবীয় প্রতিনিধি আর এর মহত্ত্ব ও তৃপ্তিসাধনই আমাদের জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য। অন্য যে আরো অনেক দর্শন কোন প্রকার ধর্মভাবনা বা আধ্যাত্মিক সাধনার উপর প্রতিষ্ঠিত সেসবেও অনুরূপ পার্থক্য আছে। বৌদ্ধ মতে কোন প্রকৃত আত্মা বা অহং নেই, এতে কোন বিশ্বাত্মক বা বিশ্বাতীত পুরুষ স্বীকার করা হয় না। অদ্বৈতবাদী বলে আপাতপ্রতীয়মান ব্যষ্টিপুরুষ পরমাত্মা ও ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নয়, এর ব্যষ্টিত্ব মায়া; ব্যষ্টি জীবন পরিহার করাই একমাত্র সত্যকার মোক্ষ। আবার অন্য কিছু দর্শন এই মতের সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলে; তাদের মতে মানবের অন্তঃপুরুষ চিরস্থায়ী; এ হল পরম একের মধ্যে বহুল চেতনার ভিত্তি, আর না

হয় এ নির্ভরশীল কিন্তু তবু পৃথক এক সত্তা, এ হল নিত্য, সত্য, অবিনশ্বর।

এইসব বিভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী মতের মধ্য থেকে জ্ঞানসাধকের নিজে ঠিক করা চাই তার পক্ষে কোন্ জ্ঞান প্রশস্ত। কিন্তু যদি আধ্যাত্মিক মোক্ষ বা আধ্যাত্মিক চরিতার্থতা আমাদের লক্ষ্য হয় তাহলে অহং-এর এই ক্ষুদ্র গঠন অতিক্রম করা অবশ্য কর্তব্য। মানুষের অহং-ভাব ও তার তৃপ্তির মধ্যে কোন দিব্য পরিণতি ও উদ্ধার সম্ভব নয়। এমনকি নৈতিক অগ্রগতি ও উন্নতিরও জন্য, সামাজিক মঙ্গল ও পূর্ণতারও জন্য অহং-ভাবের কিছু শুদ্ধি অত্যাবশ্যক; আর আন্তর শান্তি, বিশুদ্ধতা ও হর্ষের জন্য এ তো আরো বেশী অপরিহার্য। কিন্তু যদি আমাদের লক্ষ্য হয় মানবপ্রকৃতিকে দিব্য প্রকৃতিতে উন্নীত করা, তাহলে শুধু অহং-ভাব থেকে নয়, অহং-ভাবনা ও অহং-বোধ থেকেও আরো অধিক মৌলিক উদ্ধার প্রয়োজনীয়। অনুভূতিতে দেখা যায় যে যতই আমরা এই সীমাকারী মানসিক ও প্রাণিক অহং থেকে নিজেদের উদ্ধার করি ততই আমরা আয়ত্ত করি বিশালতর জীবন, বৃহত্তর সত্তা, উচ্চতর চেতনা, আরো সুখময় আত্মস্থিতি, এমনকি মহত্তর জ্ঞান, সামর্থ্য ও ক্ষেত্র। এমনকি অতি ঐহিক দর্শনও যে লক্ষ্যের প্রয়াসী অর্থাৎ ব্যষ্টির চরিতার্থতা, পূর্ণতা ও তৃপ্তি তা পাবারও সবচেয়ে নিশ্চিত উপায় সেই একই অহং-এর তৃপ্তিসাধন নয়, সে উপায় হল এক উচ্চতর ও বৃহত্তর আত্মায় মুক্তিলাভ। শাস্ত্র বলে "সত্তার ক্ষুদ্রতায় সুখ নেই, সুখ আসে বৃহৎ সত্তালাভে" (যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি)। স্বভাবতঃই অহং সত্তার ক্ষুদ্রতা; এ চেতনাকে সঙ্কুচিত করে আর এই সঙ্কোচনের সঙ্গে আনে জ্ঞানের সসীমতা ও অসামর্থ্যকারী অজ্ঞান, — আনে আবদ্ধতা ও সামর্থ্য-হ্রাস এবং এই হ্রাসের দ্বারা অক্ষমতা ও দুর্বলতা, আনে একত্বের ছেদ এবং ঐ ছেদের দ্বারা অসামঞ্জস্য এবং সমবেদনা ও প্রেম ও বুদ্ধির হানি, আনে সত্তার আনন্দের নিবৃত্তি বা অংশীকরণ এবং এই অংশীকরণের দ্বারা দুঃখ যন্ত্রণা। যা আমরা হারিয়েছি তা ফিরে পাবার জন্য আমাদের কর্তব্য হল অহং-এর সব জগৎ থেকে জোর ক'রে বার হয়ে আসা। অহং-কে হয় নৈর্ব্যক্তিকতার মধ্যে বিলীন হতে হবে, নয় এক বৃহত্তর 'আমি'র মধ্যে মিশে এক হতে হবে; দরকার এর সম্মিশন, — হয় সেই বিশালতর বিশ্ব "আমি"র মধ্যে যার অন্তর্গত এই সকল ক্ষুদ্রতর আত্মা, নয় বিশ্বাতীতের মধ্যে এই বিশ্বাত্মাও যার এক ক্ষীণ প্রতিমা।

কিন্তু এই বিশ্বাত্মা স্বরূপে ও অনুভূতিতে আধ্যাত্মিক; এ যে কোন সমষ্টিগত সত্তা বা কোন গোষ্ঠী-পুরুষ বা কোন মানবসমাজের অথবা এমনকি সমগ্র মানবজাতির প্রাণ ও দেহ তা ব'লে একে ভুল করা অনুচিত হবে। মানবজাতির উন্নতি ও সুখের কাছে অহংকে অধীন করা — বর্তমানে এই হল জগতের মনন ও নীতিতে এক নিয়ামক ভাবনা; কিন্তু এ হল এক মানসিক ও নৈতিক আদর্শ, কোন আধ্যাত্মিক আদর্শ নয়। কারণ ঐ উন্নতির অর্থ মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক পরিবর্তনের এক অবিরাম পরম্পরা, এর কোন দৃঢ় আধ্যাত্মিক উপাদান নেই, মানবের অন্তঃপুরুষের জন্য কোন নিশ্চিত প্রতিষ্ঠাও এতে লাভ হয় না। সমষ্টিগত মানবজাতির চেতনা শুধু ব্যষ্টি অহং-সমূহের এক বৃহত্তর ব্যাপক

সংস্করণ অথবা তাদের যোগফল। একই উপাদানে গঠিত ও প্রকৃতির একই ছাঁচে গঠিত হওয়ায় এর মধ্যে কোন মহত্তর আলোক নেই, নিজের সম্বন্ধে শাশ্বতের অধিকতর কোন বোধ নেই, শান্তি, হর্ষ ও উদ্ধারের কোন পবিত্রতর উৎসও নেই। বরং এ হল আরো পীড়িত, উদ্বিগ্ন ও তমসাচ্ছন্ন এবং এ যে আরো অস্পষ্ট, বিভ্রান্ত ও অনগ্রসরশীল তাতে সন্দেহ নেই। এই হিসেবে জনসমূহ অপেক্ষা ব্যষ্টি মহত্তর এবং ঐ অধিকতর তামস সত্তার নিকট ব্যষ্টির আরো উজ্জ্বল সব সম্ভাবনাকে গৌণ করতে বলা অনুচিত। যদি আলো, প্রশান্তি, নিষ্কৃতি, আরো উৎকৃষ্ট জীবন আসতে হয় — সেসব অন্তঃপুরুষের মধ্যে অবতরণ করা দরকার এমন কিছু থেকে যা ব্যষ্টির চেয়ে আরো ব্যাপ্ত তবে আবার এমন কিছু থেকে যা সমষ্টিগত অহং থেকে পরতর। পরোপকারিতা, বিশ্বপ্রীতি, মানবজাতির সেবা — এসব নিজেদের মধ্যে মানসিক বা নৈতিক আদর্শ, এরা আধ্যাত্মিক জীবনের বিধান নয়। যদি আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের মধ্যে ব্যক্তিগত আত্মত্যাগের বা মানবজাতির অথবা সমগ্র জগতের সেবা করার টান আসে তাহলে সে টান অহং থেকে বা জাতির কোন সমষ্টিগত বোধ থেকে আসে না, তা আসে এমন কিছু থেকে যা আরো গূঢ় ও গভীর এবং এই দুয়েরই অতিস্থিত; কারণ এর প্রতিষ্ঠা সর্বভূতস্থ ভগবানের বোধের উপর এবং এ যে কাজ করে তা অহং বা জাতির জন্য নয়, এ কাজ করে ভগবানের জন্য এবং ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা সমষ্টিগত মানবের মধ্যে ভগবানের উদ্দেশ্যের জন্য। এই অতিস্থিত প্রভবকেই আমাদের অন্বেষণ ও সেবা করা চাই, এই সেই বৃহত্তর সত্তা ও চেতনা যার নিকট জাতি ও ব্যষ্টি এর সত্তার গৌণ সংজ্ঞা।

বস্তুতঃ ফলকামী সংবেগের পশ্চাতে এক সত্য আছে যাকে বর্জনধর্মী একদেশীয় আধ্যাত্মিকতা উপেক্ষা বা অস্বীকার বা হেয় করতে প্রবণ। এই সত্য এই যে যেহেতু ব্যষ্টি ও বিশ্বভাব উভয়ই ঐ পরতর ও বৃহত্তর পুরুষের সংজ্ঞা তাদের পূর্ণতারও এক বাস্তব স্থান থাকা চাই পরম সৎ-এর মধ্যে। তাদের পশ্চাতে নিশ্চয়ই এমন কোন মহৎ উদ্দেশ্য থাকবে যা পরম প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, এমন কোন শাশ্বত সুর থাকবে যা পরম আনন্দের অন্তর্গত; তারা যে মিছামিছি সৃষ্ট হয়েছে তা হতে পারে না, আর সত্যই তাদের সৃষ্টি মিছামিছি হয়নি। ব্যষ্টির পূর্ণতা ও তৃপ্তির মতো মানবজাতির পূর্ণতা ও তৃপ্তিও সম্ভব হয় একমাত্র যদি তারা দৃঢ়ভাবে সাধিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় বিষয়সমূহের এমন এক সত্য ও যথার্থতার উপর যা আরো শাশ্বত কিন্তু এখনো অনায়ত্ত। যেহেতু তারা এক মহত্তর সন্মাত্রের গৌণ সংজ্ঞা, সেহেতু তারা নিজেদের চরিতার্থ করতে সক্ষম কেবল তখনই যখন যার সংজ্ঞা তারা তাকে জানা ও অধিগত করা হয়। মানবজাতির প্রকৃষ্ট সেবার, এর উন্নতি, সুখ ও পূর্ণতার সর্বাপেক্ষা সুনিশ্চিত ভিত্তি হল সেই পথ তৈরী করা বা বার করা যা দিয়ে ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত মানব অহং অতিক্রম ক'রে বাস করতে পারে তার প্রকৃত আত্মার মধ্যে — অবিদ্যা, অক্ষমতা, বৈষম্য ও দুঃখে আর আবদ্ধ না হয়ে। আমাদের আধুনিক ভাবনা ও আদর্শবাদ আমাদের সম্মুখে যে বিবর্তনমূলক সমষ্টিগত পরোপকারপরায়ণ লক্ষ্য স্থাপিত করেছে তা সর্বাপেক্ষা সুনিশ্চিতভাবে পাবার উপায় হল

শাশ্বতের সাধনা, সে উপায় প্রকৃতির মন্থর সমষ্টিগত বিবর্তনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে বাস করা নয়। কিন্তু এ স্বয়ং হল এক গৌণ লক্ষ্য; দিব্য সত্তা, চেতনা ও প্রকৃতি পাওয়া, জানা ও অধিগত করা, এবং ভগবানের জন্য তার মধ্যে বাস করা — এই হল আমাদের প্রকৃত লক্ষ্য, আর এই একমাত্র সিদ্ধি যার জন্য আমাদের অভীপ্সা করা চাই-ই।

সুতরাং পরতম জ্ঞানের সাধকের কর্তব্য, — পৃথ্বীবদ্ধ জড়বাদের পথে না চলে আধ্যাত্মিক দর্শন ও ধর্মের পথেই চলা, যদিও তা করা হবে আরো সমৃদ্ধ লক্ষ্য ও আরো ব্যাপক আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু অহং-বর্জনের ব্যাপারে তাকে কতদূর অগ্রসর হতে হবে? প্রাচীন জ্ঞানমার্গে আমরা সেই অহং-বোধ বাদ দিতে সক্ষম হই যা দেহে, প্রাণে ও মনে আসক্ত হয়ে এগুলির সকলেরই বা যে কোন একটির সম্বন্ধে বলে, "এ আমি"। যেমন কর্মমার্গে, আমরা যে শুধু কর্মীর "আমি" থেকে মুক্ত হয়ে একমাত্র ঈশ্বরকেই দেখি সকল কর্মের ও কর্মের অনুমতির প্রকৃত প্রভব ব'লে এবং তাঁর নির্বাহক প্রকৃতি-সামর্থ্যকে অথবা তাঁর পরমা শক্তিকে দেখি একমাত্র প্রতিভূ ও কর্মী হিসেবে তা নয়, আমরা সেই অহং-বোধ থেকেও মুক্ত হই যাতে আমাদের সত্তার বিভিন্ন করণ বা প্রকাশগুলিকে ভুল করা হয় আমাদের প্রকৃত আত্মা ও চিৎপুরুষ ব'লে। কিন্তু এই সব করার পরও, তবু কিছু রয়ে যায়; তখনো রয়ে যায় এই সকলের এক মূল, পৃথক "আমি"র এক সাধারণ বোধ। এই মূল অহং এমন কিছু যা অস্পষ্ট, অনির্দেশ্য ও প্রতারক; এ আত্মার মতো কোন বিশেষ বিষয়ে নিজেকে আসক্ত করে না, বা করার দরকার হয় না; এ নিজেকে কোন সমষ্টির সঙ্গে একাত্ম করে না; এ মনের একপ্রকার মৌলিক রূপ বা সামর্থ্য যার জন্য মনোময় পুরুষ নিজের সম্বন্ধে এই অনুভব করতে বাধ্য হয় যে সে হয়ত অনির্দেশ্য কিন্তু তবু এক সীমাবদ্ধ সত্তা যা মন, প্রাণ বা দেহ নয় অথচ যার অধীনে তাদের কাজকর্ম চলে প্রকৃতির মধ্যে। পূর্বকথিতেরা ছিল পরিচ্ছিন্ন অহং-ভাবনা ও অহং-বোধ আর তাদের অবলম্বন ছিল প্রকৃতির ক্রীড়া; কিন্তু এ হল শুদ্ধ মৌলিক অহং-সামর্থ্য যার অবলম্বন — মনোময় পুরুষের চেতনা। আর যেহেতু মনে হয় যে এ ক্রীড়ার উপরে বা পশ্চাতে, এর ভিতরে নয়, যেহেতু এ বলে না, "আমি মন, প্রাণ বা দেহ", তবে বলে, "আমি এমন এক সত্তা যার উপর মন, প্রাণ ও দেহের ক্রিয়া নির্ভরশীল," অনেকে নিজেদের বিমুক্ত মনে করে আর এই প্রতারক অহংকে ভুল ক'রে ভাবে যে এই সেই "একমেব", ভগবান, প্রকৃত পুরুষ অথবা অন্ততঃ তাদের অন্তঃস্থ সত্যকার ব্যক্তি — এইভাবে অনির্দেশ্যকে ভুল ক'রে ভাবে অনন্ত ব'লে। কিন্তু যতদিন এই মৌলিক অহং-বোধ থাকে, ততদিন কোন একান্ত মোক্ষ হয় না। আর এই অবলম্বন নিয়ে অহমাত্মক জীবন আগের মতো ভালোই চলতে পারে, যদিও তার শক্তি ও প্রখরতা হ্রাস পায়। যদি তাদাত্ম্যবোধে কোন প্রমাদ থাকে তাহলে সেই মিথ্যা দাবীতে অহং-জীবনের তীব্রতা ও শক্তি বরং আরো বৃদ্ধি পেতে পারে। এমনকি যদি এরকম কোন প্রমাদ নাও থাকে তবু অহং-জীবন অধিকতর ব্যাপ্ত, শুদ্ধ ও নমনীয় হতে পারে, এখন মোক্ষ আরো অনেক সহজলভ্য হয়, এবং সমাপ্তির আরো নিকটবর্তী হয়, কিন্তু তবু

তখনো পর্যন্ত কোন নিশ্চিত মোক্ষ আসে না। আরো অগ্রসর হয়ে এই অনির্দেশ্য অথচ মৌলিক অহং-বোধ থেকে মুক্ত হওয়া এবং যে পুরুষ এর অবলম্বন, যার ছায়া এ তাতে ফিরে যাওয়াই অবশ্য কর্তব্য; ছায়াকে অন্তর্হিত হতে হবে এবং তার অন্তর্ধানের দ্বারা প্রকট করতে হবে চিৎপুরুষের অমলিন "ধাতু" (বা দ্রব্য)।

ঐ দ্রব্য হল মানবের আত্মা যাকে ইওরোপীয় ভাবনায় বলা হয় Monad (মনাড়্), আর ভারতীয় দর্শনে বলা হয় জীব বা জীবাত্মা, অর্থাৎ জীবন্ত সত্তা, প্রাণীর আত্মা। এই জীব সেই মানসিক অহং-বোধ নয় যা প্রকৃতির সাময়িক উদ্দেশ্যের জন্য তার ক্রিয়াধারার দ্বারা গঠিত হয়। মনোময় সত্তা, প্রাণময় সত্তা বা অন্নময় সত্তা যেমন প্রকৃতির সব অভ্যাস, বিধান বা ধারার দ্বারা বদ্ধ, — এই জীব তেমন কোন বদ্ধ বিষয় নয়। জীব চিৎপুরুষ ও আত্মা, প্রকৃতির চেয়ে মহত্তর। অবশ্য একথা সত্য যে সে প্রকৃতির ক্রিয়ায় সম্মতি দেয়, তার সব বৃত্তি প্রতিফলিত করে এবং মন, প্রাণ, দেহ, — এই ত্রিবিধ মাধ্যম ধারণ করে যাদের মধ্য দিয়ে সে বৃত্তিগুলিকে অন্তঃপুরুষের চেতনার উপর প্রক্ষেপ করে; কিন্তু এ হল স্বয়ং বিশ্বাত্মক ও বিশ্বাতীত চিৎপুরুষের জীবন্ত প্রতিবিম্ব, অথবা এক পুরুষরূপ অথবা এক আত্মসৃষ্টি। যে এক চিৎপুরুষ তাঁর সত্তার কোন কোন বিভাবকে জগৎ ও অন্তঃপুরুষের মধ্যে প্রতিফলিত করেছেন তিনি জীবের মধ্যে বহুময়। ঐ চিৎপুরুষই আমাদের প্রকৃত আত্মা, তিনিই সেই এক পরতম ও পরম যাঁকে উপলব্ধি করা আমাদের কর্তব্য, তিনিই সেই অনন্ত সত্তা যাঁর মধ্যে আমাদের প্রবেশ করা চাই। এই পর্যন্ত সকল গুরুই একসাথে চলেন, কারণ এই আত্মাই যে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির পরম লক্ষ্য সে বিষয়ে সকলেই একমত, তাঁরা এই বিষয়েও একমত যে যদি আত্মাকে পেতে হয় তাহলে জীবের কর্তব্য অপরা প্রকৃতির বা মায়ার অন্তর্গত অহং-বোধ থেকে নিজেকে মুক্ত করা। কিন্তু এইখান থেকে তাদের ছাড়াছাড়ি হয় আর প্রত্যেকে নিজের নিজের পথে চলে। অদ্বৈতবাদী আত্যন্তিক জ্ঞানমার্গে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আমাদের জন্য যে একমাত্র আদর্শ স্থাপন করে তা হল পরমের মধ্যে জীবের সম্পূর্ণ প্রত্যাবর্তন, লয়, নিমজ্জন বা বিনাশ। দ্বৈতবাদী বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ভক্তিমার্গের দিকে তাকিয়ে আমাদের উপদেশ দেয়, — অবর অহং ও জড়গত জীবন ত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য, তবে দেখতে হবে যে মানবের চিৎপুরুষের সর্বোত্তম নিয়তি বৌদ্ধদের আত্মনাশ নয়, অদ্বৈতবাদীর আত্মনিমজ্জন নয়, একের দ্বারা বহুকে গ্রাস করা নয়, তার নিয়তি হল পরমের, একের, সর্ব-প্রেমিকের মননে, প্রেমে ও রসাস্বাদনে বিভোর শাশ্বত জীবন।

এ বিষয়ে পূর্ণযোগের শিষ্যের কোন দ্বিধা থাকতে পারে না; জ্ঞানসাধক হিসেবে পূর্ণজ্ঞানই তার সাধ্য হওয়া চাই, এমন কিছু নয় যা মাঝপথে সমাপ্ত ও চিত্তাকর্ষক অথবা উচ্চশিখরে আসীন ও আত্যন্তিক। তার যে শুধু চরম তুঙ্গে উড়ে যাওয়া দরকার তা নয়, তার আরো দরকার সর্বাপেক্ষা সর্বগ্রাহী প্রসারতার চারিদিক ঘুরে তাতে বিস্তৃত হওয়া, আর তা এমনভাবে হবে যেন সে দার্শনিক ভাবনার কোন কঠোর গঠনে না আবদ্ধ হয়, বরং স্বচ্ছন্দে গ্রহণ ও ধারণ করতে পারে অন্তঃপুরুষের উচ্চতম ও মহত্তম ও পূর্ণতম ও

সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক সব অনুভূতি। ব্যষ্টি ও বিশ্বের অতিরিক্ত যে বিশ্বাতীত তাঁর সঙ্গে অন্তঃপুরুষের আত্যন্তিক মিলনই যদি হয় আধ্যাত্মিক অনুভূতির সর্বোচ্চ উচ্চতা, সকল উপলব্ধির অনন্য শিখর তাহলে সেই মিলনের সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত ক্ষেত্র হল এই আবিষ্কার করা যে ঐ বিশ্বাতীতই দিব্য স্বরূপ ও দিব্য প্রকৃতির এই দুই অভিব্যক্তিকারী সামর্থ্যের প্রভব, অবলম্বন, আধেয়, আন্তর প্রেরণাদায়ক ও উপাদানস্বরূপ চিৎপুরুষ ও দ্রব্য। তার পথ যাই হ'ক না কেন, এই হবে তার নিশানা। কর্মযোগও সার্থক হয় না, একান্ত হয় না, বিজয়ীভাব সম্পূর্ণ হয় না যতক্ষণ না সাধক পরমের সঙ্গে তার স্বরূপস্থ ও অখণ্ড একত্ব অনুভব করে ও তাতে বাস করে। দিব্য সঙ্কল্পের সঙ্গে তাকে এক হতেই হবে, আর তা হতে হবে তার সর্বোচ্চ ও অন্তরতম ও তার ব্যাপ্ততম সত্তায় ও চেতনায়, কর্মে, তার সঙ্কল্পে, তার ক্রিয়ার সামর্থ্যে, তার মনে, দেহে, প্রাণে। তা নাহলে সে শুধু তার ব্যষ্টি কর্ম থেকে নিষ্কৃতি পায়, কিন্তু পৃথক সত্তা ও তটস্থতার মায়া থেকে নিষ্কৃতি পায় না। সে কাজ করে ভগবানের সেবক ও যন্ত্ররূপে কিন্তু তার পরিশ্রমের মুকুট এবং এর সুষ্ঠু ভিত্তি বা প্রেরণা হল সে যাঁকে সেবা করে ও সার্থক করে তাঁর সঙ্গে একত্ব। ভক্তিযোগও সম্পূর্ণ হয় কেবল তখনই যখন প্রেমিক ও (দিব্য) প্রেমাস্পদ মিলিত হয়ে এক হয় এবং ভেদ বিলুপ্ত হয় দিব্য একত্বের উল্লাসে, কিন্তু তবু এই মিলনের রহস্যের মধ্যে থাকে একমাত্র প্রেমাস্পদের অস্তিত্ব তবে প্রেমিকের বিনাশ বা সমাপত্তি হয় না। জ্ঞানমার্গের স্পষ্ট লক্ষ্য হল সর্বোচ্চ ঐক্য, একান্ত একত্বের প্রতি আহ্বানই তার সংবেগ, এর অনুভূতিই তার আকর্ষণী শক্তি, কিন্তু এই সর্বোচ্চ ঐক্যই তার মধ্যে তার অভিব্যক্তির ক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করে সম্ভবপর বৃহত্তম বিশ্বপ্রসারতা। আমাদের ত্রিবিধ প্রকৃতির ব্যবহারিক অহং-ভাব এবং এর মৌলিক অহং-বোধ থেকে ক্রমান্বয়ে সরে আসার আবশ্যকতা অনুযায়ী কাজ করে আমরা এই ব্যষ্টি মানুষী অভিব্যক্তির চিৎপুরুষ, আত্মা ও ঈশ্বরের উপলব্ধি লাভ করি, কিন্তু আমাদের জ্ঞান পূর্ণ হয় না যদি না আমরা ব্যষ্টির মধ্যে এই আত্মাকে এক করি বিরাট পুরুষের সঙ্গে এবং তাদের মহত্তর সত্যতা খুঁজে পাই ঊর্ধ্বে অনির্বচনীয় কিন্তু অজ্ঞেয় নয় এমন অতিস্থিতির মধ্যে। আত্মবান হয়ে ঐ জীবের অবশ্য কর্তব্য হল ভগবানের সত্তার মধ্যে নিজেকে সর্মপণ করা। মানবের আত্মাকে এক করা চাই সর্বভূতের আত্মার সঙ্গে; সান্ত জীবের আত্মার কর্তব্য নিজেকে ঢেলে দেওয়া সীমাহীন সান্তের মধ্যে আর ঐ বিরাট পুরুষকে অতিক্রম করে যেতে হবে বিশ্বাতীত অনন্তের মধ্যে।

এটি করা সম্ভব হয় না যদি না অহং-বোধকে নির্মমভাবে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা হয় তার মূল উৎস থেকে। জ্ঞানমার্গে এই উচ্ছেদসাধনের নঞর্থক উপায় হল অহং-এর বাস্তবতা অস্বীকার করা আর সদর্থক উপায় হল মননকে অবিরত নিবদ্ধ রাখা একম্‌ ও অনন্তের স্বরূপের ভাবনায় অথবা সর্বত্র একম্‌ ও অনন্তের ভাবনায়। অধ্যবসায়ের সঙ্গে এটি করা হলে, পরিশেষে নিজের ও সমগ্র জগতের উপর মানসিক দৃষ্টির পরিবর্তন হয় এবং একপ্রকার মানসিক উপলব্ধি আসে; কিন্তু পরে ক্রমশঃ অথবা হয়ত দ্রুত ও

নিশ্চিতভাবে এবং প্রায় শুরুতেই মানসিক উপলব্ধি গভীর হয়ে পরিণত হয় অধ্যাত্ম অনুভূতিতে যা হল আমাদের সত্তার সার ধাতুর মধ্যে উপলব্ধি। ক্রমশঃ বেশী ঘন ঘন যে সব অবস্থা আসে তা হল — অনির্দেশ্য ও অসীম কিছুর অবস্থা, অনির্বচনীয় প্রশান্তি, নীরবতা, হর্ষ ও আনন্দের অবস্থা, একান্ত নৈর্ব্যক্তিক সামর্থ্যের শুদ্ধ সত্তার, শুদ্ধ চেতনার, সর্বব্যাপী সান্নিধ্যের এক বোধ। অহং নিজের মধ্যে বা তার অভ্যস্ত সব ক্রিয়ার মধ্যে তখনো টিকে থাকে কিন্তু একটির শান্তি উত্তরোত্তর স্থায়ী হয়, অন্যগুলি ভেঙে, চূর্ণ হয়ে ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হয়, আর তাদের তীব্রতা ক্ষীণ হয়ে আসায়, তাদের ক্রিয়া পঙ্গু বা যান্ত্রিক হয়ে ওঠে। পরিশেষে সমগ্র চেতনার অবিরত সমর্পণ হতে থাকে পরমের সত্তার মধ্যে। প্রথম প্রথম যখন আমাদের বহির্মুখী প্রকৃতির অস্থির বিশৃঙ্খলা ও আচ্ছন্নকারী অশুদ্ধতা সক্রিয় থাকে, যখন মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক অহং-বোধ তখনো বলবান থাকে, তখন এই নতুন মানসিক দৃষ্টিকে, এইসব অনুভূতিকে সাতিশয় দুরূহ দেখা যাবে; কিন্তু একবার ত্রিবিধ অহং-ভাব অবসন্ন বা মৃতপ্রায় হলে, আর চিৎপুরুষের করণগুলি সংশোধিত ও শুদ্ধ করা হলে — সম্পূর্ণ শুদ্ধ, নীরব, নির্মল, প্রসারিত চেতনার মধ্যে একম্-এর শুদ্ধতা, আনন্ত্য, নিস্তব্ধতা প্রতিফলিত হয় স্বচ্ছ সরোবরে আকাশের মতো। প্রতিফলনকারী চেতনার দ্বারা প্রতিফলিত পরম চেতনার সঙ্গে মিলিত হওয়া বা তাকে ভিতরে গ্রহণ করা উত্তরোত্তর প্রয়োজনীয় ও সম্ভবপর হয়ে ওঠে, তখন আর ঐ নির্বিকার আকাশীয় নৈর্ব্যক্তিক বৃহত্ত্ব এবং ব্যক্তিগত জীবনের এই একসময়ের চঞ্চল আবর্তের বা সঙ্কীর্ণ স্রোত — এই দু'য়ের মাঝে বায়বীয় ব্যবধানের সেতুবন্ধন বা বিলুপ্তিসাধন কোন দুঃসাধ্য অসম্ভব কাজ কিছু নয়, আর সে অনুভূতি তখনো সম্পূর্ণ চিরস্থায়ী অবস্থা না হলেও, এটি প্রায়শঃই আসতে থাকে। কেননা এমনও হয় যে সম্পূর্ণ শুদ্ধীকরণ হবার আগেই, যদি অহমাত্মক হৃদয় ও মনের সূত্রগুলি আগেই যথেষ্ট চূর্ণ ও শিথিল করা থাকে, জীব প্রধান রজ্জুগুলি হঠাৎ ছিঁড়ে ফেলে আকাশের মধ্যে বন্ধনমুক্ত পাখীর মতো উঠে গিয়ে অথবা বাঁধ-ভাঙা বন্যার মতো প্রসারিত হয়ে পলায়ন করে একম্ ও অনন্তের মধ্যে। প্রথমে আসে বিশ্বচেতনার এক আকস্মিক বোধ, নিজেকে বিশ্বাত্মকের মধ্যে নিক্ষেপ করা; সেই বিশ্বভাব থেকে সাধকের পক্ষে আরো সহজ হয় বিশ্বাতীতের জন্য অভীপ্সা করা। আমাদের চিন্ময় সত্তা যেসব প্রাচীরের দ্বারা আবদ্ধ ছিল সেইসব পিছনে হঠে যায় ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় অথবা ভূমিসাৎ হয়; ব্যষ্টিত্ব ও ব্যক্তিত্বের, দেশ বা কালের মধ্যে বা প্রকৃতির ক্রিয়া ও বিধানের মধ্যে অবস্থানের সকল বোধ অন্তর্হিত হয়; তখন আর কোন অহং থাকে না, কোন নিশ্চিত ও নির্দিষ্ট ব্যক্তি থাকে না, থাকে শুধু চেতনা, শুধু সত্তা, শুধু প্রশান্তি ও আনন্দ; জীব হয়ে ওঠে অমরত্ব, হয়ে ওঠে শাশ্বতত্ব, হয়ে ওঠে আনন্ত্য। ব্যক্তিগত অন্তঃপুরুষের যা বাকী থাকে তা হল প্রশান্তি ও স্বাধীনতা ও আনন্দের স্তুতিগান যা ঝঙ্কৃত হতে থাকে সনাতনের মধ্যে কোন এক স্থানে।

যখন মনোময় পুরুষের মধ্যে শুদ্ধতা কম থাকে তখন মোক্ষ প্রথম মনে হয় আংশিক ও সাময়িক; মনে হয় জীব যেন আবার নেমে আসে অহমাত্মক জীবনের মধ্যে

আর তার কাছ থেকে প্রত্যাহার ক'রে নেওয়া হয় পরতর চেতনা। বস্তুতঃ যা ঘটে তা এই যে অপরা প্রকৃতি ও পরতর চেতনার মধ্যে একটি মেঘ বা আবরণ এসে পড়ে, আর প্রকৃতি আবার কিছু সময়ের জন্য তার ক্রিয়ার পুরনো অভ্যাস আরম্ভ করে; তাতে সেই উচ্চ অনুভূতির চাপ থাকে তবে সর্বদা যে এই অনুভূতির জ্ঞান বা বর্তমান স্মৃতি থাকে তা নয়। এর মধ্যে তখন যা কাজ করে তা হল পুরনো অহং-এর এক ভূত যা সত্তার মধ্যে তখনো বিদ্যমান বিশৃঙ্খলা ও অপবিত্রতার অবশিষ্ট অংশের উপর ধরে থাকে পুরনো সব অভ্যাসের যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি। মেঘ আড়াল করে, আবার চলে যায়, আরোহণ ও অবরোহণের ছন্দ চলতে থাকে যতদিন না অশুদ্ধতার সম্পূর্ণ নিরসন হয়। আলোছায়ার, ওঠানামার এই পর্বটি পূর্ণযোগে দীর্ঘ হবার সম্ভাবনাই বেশী; কেননা এখানে দরকার আধারের সমগ্র সিদ্ধি; একে এত সমর্থ হতে হবে যেন এটি সকল সময়েই, সকল অবস্থাতেই, ক্রিয়া বা নিষ্ক্রিয়তার সকল পরিস্থিতির মধ্যে সক্ষম হয় পরম সত্যের চেতনা নিতে এবং পরে তার মধ্যে বাস করতে। সাধকের পক্ষে এই চরম উপলব্ধি শুধু সমাধিমগ্ন অবস্থায় বা নিশ্চল শান্তির মধ্যে পাওয়া যথেষ্ট নয়, তাকে সমর্থ হতে হবে যেন সে কি সমাধির বা জাগরণের অবস্থায়, কি নিষ্ক্রিয় চিন্তায় বা ক্রিয়ার শক্তিপ্রবাহের মধ্যে থাকতে পারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মীচেতনার[১] সতত সমাধির মধ্যে। কিন্তু যদি বা যখন আমাদের চিন্ময় সত্তা যথেষ্ট পরিমাণে শুদ্ধ ও নির্মল হয়, তখন পরতর চেতনায় দৃঢ় স্থিতি লাভ হয়। [illegible]ভাবাপন্ন জীব বিশ্বাত্মকের সঙ্গে এক হয়ে অথবা বিশ্বাতীতের দ্বারা অধিগত হয়ে বাস করে ঊর্ধ্বে উদাসীন[১] হয়ে আর অক্ষুব্ধভাবে নিম্নে তাকিয়ে দেখে প্রকৃতির পুরনো ক্রিয়ার সেই সব অবশিষ্টাংশ যা তার আধারে আবার আবির্ভূত হতে পারে। তার অবর সত্তার মধ্যে প্রকৃতির ত্রিগুণের বিভিন্ন ক্রিয়া তুচ্ছ ক'রে সে অবিচলিত থাকে, এমনকি দুঃখ ও কষ্টভোগের আক্রমণও জয় ক'রে সে অটল থাকে তার স্থিতিতে এবং পরিশেষে, মাঝখানে আর আবরণ না থাকায়, পরতরা প্রশান্তি অভিভূত করে অবর ক্ষোভ ও চঞ্চলতাকে। এক স্থির নীরবতা প্রতিষ্ঠিত হয় যার মধ্যে অন্তঃপুরুষ অপ্রতিহতভাবে নিজেকে অধিগত করে ঊর্ধ্বে, নিম্নে ও সর্বসমেত।

অবশ্য এরূপ অধিকার চিরাচরিত জ্ঞানযোগের লক্ষ্য নয়; বরং এর উদ্দেশ্য হল ঊর্ধ্ব ও নিম্ন ও সর্ব থেকে সরে এসে প্রবেশ করা অনির্দেশ্য পরমার্থসৎ-এর মধ্যে। কিন্তু লক্ষ্য যাই হ'ক না কেন, জ্ঞানযোগের প্রথম যে একটি অবশ্যম্ভাবী ফল তা হল একান্ত শান্তি; কেননা আমাদের মধ্যে প্রকৃতির পুরনো ক্রিয়া পুরোপুরি শান্ত করা না হলে কোন সত্যকার পুরুষ অবস্থা বা কোন দিব্য কর্ম অসম্ভব না হলেও দুরূহ। আমাদের প্রকৃতি যে কাজ করে তার ভিত্তি হ'ল বিশৃঙ্খলা ও ক্রিয়ার প্রতি অস্থির প্রেরণা, আর ভগবান কাজ করেন স্বচ্ছন্দভাবে, অতলস্পর্শী শান্তির মধ্য থেকে। অন্তঃপুরুষের উপর এই

[১] উদাসীন — এই কথাটি ব্যবহৃত হয় আধ্যাত্মিক "উপেক্ষা"র অর্থে — অর্থাৎ পরমজ্ঞানের পর্শযুক্ত অন্তঃপুরুষের অনাসক্ত স্বাতন্ত্র্য।

অপরাপ্রকৃতির প্রভুত্বকে যদি আমরা নাশ করতে চাই তাহলে আমাদের কর্তব্য সেই অক্ষুব্ধতার গভীর সাগরে ডুব দেওয়া ও তা-ই হওয়া। সুতরাং বিশ্বভাবাপন্ন জীব প্রথম উত্তরণ করে নীরবতার মধ্যে; এ হয়ে ওঠে বৃহৎ, অক্ষুব্ধ ও ক্রিয়াশূন্য। যা কিছু ক্রিয়া ঘটে, তা দেহের ও অন্যান্য অঙ্গের বা কোন প্রক্রিয়ার হ'ক না কেন, জীব সেসব দেখে কিন্তু তাতে অংশ নেয় না বা অনুমতি দেয় না বা তার সঙ্গে কোনভাবে নিজেকে জড়ায় না। ক্রিয়া থাকে কিন্তু কোন ব্যক্তিগত কর্তা, কোন বন্ধন, কোন দায়িত্ব থাকে না। যদি ব্যক্তিগত ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে জীবকে রাখতে হবে বা ফিরে পেতে হবে তথাকথিত অহং-এর রূপ, এক "আমি"র এক প্রকার মানসিক প্রতিমূর্তি যা জ্ঞাতা, ভক্ত, সেবক বা যন্ত্র, কিন্তু এ হল শুধু এক প্রতিমূর্তি, কোন সদ্‌বস্তু নয়। আর যদি তা না-ও থাকে তবু ক্রিয়া পূর্বের মতো চলতে পারে শুধু প্রকৃতির পুরনো শক্তিবলে, — তাতে কোন ব্যক্তিগত কর্তা থাকে না, বস্তুতঃ কর্তার কোন বোধও আদৌ থাকে না; কারণ যে আত্মার মধ্যে জীব তার সত্তা নিক্ষেপ করেছে তা ক্রিয়াশূন্য অতল নিস্তব্ধতা। কর্মমার্গে ঈশ্বরের উপলব্ধি আসে, কিন্তু এখানে এমনকি ঈশ্বরকেও জানা যায় না; থাকে শুধু নীরব আত্মা ও কর্মরতা প্রকৃতি, তবে এমনকি, প্রথম যা মনে হয়, তার কাজ কোন সত্যকার জীবন্ত সত্তা নিয়ে নয়, তা শুধু আত্মার মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন নাম ও রূপ নিয়ে, কিন্তু এগুলিকে আত্মা সত্য বলে স্বীকার করে না। অন্তঃপুরুষ এমনকি এই উপলব্ধিও ছাড়িয়ে যেতে পারে; হয় এ উঠতে পারে ব্রহ্মে যা আত্মার সকল ভাবনার বিপরীত দিকে যেন এক শূন্য যাতে এখানকার কোন কিছু নেই, এমন এক অব্যপদেশ্য শান্তির শূন্যতা যাতে লোপ পায় সকল কিছু, এমনকি 'সৎ' ও এমনকি সেই সত্তাও যা সকল ব্যষ্টি বা বিশ্ব ব্যক্তিত্বের নৈর্ব্যক্তিক ভিত্তি; আর না হয় অন্তঃপুরুষ এর সঙ্গে মিলিত হতে পারে যেন এ এক অনুপাখ্য "তৎ" যার সম্বন্ধে কোন কিছু বলা যায় না; কারণ বিশ্ব এবং যা কিছু আছে সেসবের অস্তিত্বও 'তৎ'-এর মধ্যে নেই, তবে মনের কাছে এগুলি যেন স্বপ্ন; কিন্তু আজ পর্যন্ত যত স্বপ্ন দেখা বা কল্পনা করা হয়েছে তার চেয়ে এমন আরো অসার এই স্বপ্ন যে স্বপ্ন কথাটিও মনে হয় এমন 'সদর্থক' যে কথাটি এর সম্পূর্ণ অসত্যতা প্রকাশ করার অনুপযুক্ত। এইসব অনুভূতির উপরই সেই সমুন্নত মায়াবাদ প্রতিষ্ঠিত যার প্রভাব মানবমনের উপর এত দৃঢ় তার স্বোত্তরণের সর্বোচ্চ অবস্থাসমূহে।

জীবের নতুন স্থিতির তখনো যে মানসিকতা বজায় থাকে তার মধ্যেই স্বপ্ন ও মায়ার এইসব ভাবনা ঘটে কারণ জীব তখন তার পুরনো মানসিক সংস্কারের এবং জীবন ও সত্তা সম্বন্ধে তার পুরনো দৃষ্টির দাবী অস্বীকার করে। বস্তুতঃ প্রকৃতি যে কাজ করে তা তার নিজের জন্য নয় অথবা নিজের গতির দ্বারা নয়, সে কাজ করে আত্মার সঙ্গে, এই আত্মাকেই তার ঈশ্বর করে; কারণ ঐ নীরবতা থেকেই উচ্ছলিত হয় এই সকল ক্রিয়া, এই আপাতপ্রতীয়মান শূন্যই যেন বিগলিত হয় বিভিন্ন অনুভূতির এই সব অনন্ত ঐশ্বর্যরাশির বিলাসে। এই উপলব্ধিতেই পূর্ণ যোগের সাধকের উপনীত হওয়া দরকার, তবে যে প্রণালীতে সে সাধনা হবে তার কথা পরে বলা হবে। যখন সাধক বিশ্বের উপর

ঐ ভাবে তার দখল পুনর্বার গ্রহণ করে এবং জগতের মধ্যে আর নিজেকে না দেখে বরং বিশ্বকেই দেখে নিজের মধ্যে, তখন জীবের স্থান কি হবে বা তার নতুন চেতনায় অহং-বোধের অংশটি কিসের দ্বারা পূর্ণ হবে? কোন অহং-বোধ থাকবে না, এমনকি যদি ব্যষ্টিমন ও দেহে বিশ্বচেতনার ক্রিয়ার প্রয়োজনের জন্য একপ্রকার ব্যষ্টিভাব থাকে; এবং এই কারণে ঐ সকল হবে অবিস্মরণীয়ভাবে 'একম্' আর প্রতি ব্যক্তি বা পুরুষ তার কাছে হবে বহুরূপে 'একম্' বা বরং বহু বিভাবে ও ভঙ্গিতে 'একম্', ব্রহ্ম ক্রিয়ারত ব্রহ্মের উপর, সর্বত্র একই নর-নারায়ণ। ভগবানের সেই বৃহত্তর লীলার মধ্যে দিব্য প্রেমের বিভিন্ন সম্পর্কের হর্ষও সম্ভব হয়, অহং-বোধের মধ্যে স্খলিত না হয়েই — যেমন মানবপ্রেমের পরম অবস্থাকে অনুরূপভাবে বর্ণনা করা হয় যে এ হল দুই দেহে একটি অন্তঃপুরুষের ঐক্য। যে জগৎলীলার মধ্যে অহং-বোধ এত সক্রিয় এবং বিষয়সমূহের সত্যকে মিথ্যায় এত বিকৃত করে, তার জন্য কিন্তু অহং-বোধ অপরিহার্য নয়; সত্য এই যে, — সর্বদা পরম একই নিজের উপর কর্মরত, নিজের সঙ্গে লীলারত, ঐক্যে অনন্ত, বহুত্বে অনন্ত। যখন ব্যষ্টিভাবাপন্ন চেতনা বিশ্বলীলার ঐ সত্যে উত্তরণ ক'রে তার মধ্যে বাস করে, তখন পূর্ণ ক্রিয়ার মধ্যে অবর সত্তা ধারণ করেও জীব তবু ঈশ্বরের সঙ্গে এক; তখন কোন বন্ধন থাকে না, কোন মোহ থাকে না। সে আত্মার অধিকারী, অহং-বিমুক্ত।

দশম অধ্যায়

বিশ্বাত্মার উপলব্ধি

যখন আমরা মন, প্রাণ, দেহ থেকে এবং আমাদের সত্তা নয় এমন বাকী সব কিছু থেকে সরে আসি, তখন আমাদের প্রথম ও আবশ্যিক লক্ষ্য হল আত্মার সেই মিথ্যা ভাবনা থেকে মুক্ত হওয়া যার দ্বারা আমরা নিজেদের এক করি অবর জীবনের সঙ্গে আর শুধু এই উপলব্ধি করতে সক্ষম হই যে আমাদের এই প্রতীয়মান সত্তা এক নশ্বর বা সদা পরিবর্তনশীল জগতের মধ্যে নশ্বর বা পরিবর্তনশীল সৃষ্ট বিষয়। আমাদের জানতে হবে যে আমরা আত্মা, চিৎপুরুষ, সনাতন; আমাদের বাস করতে হবে সচেতনভাবে আমাদের প্রকৃত সত্তার মধ্যে। সুতরাং জ্ঞানমার্গে এটি আমাদের সর্বপ্রথম, একমাত্র, সর্বগ্রাহী ভাবনা ও সাধনা না হলেও একেই হতে হবে মুখ্য ভাবনা ও সাধনা। যে সনাতন আত্মা আমরা, তাকে যখন আমরা উপলব্ধি করি, যখন আমরা অচ্ছেদ্যভাবে তাই হই, তখনো আমাদের এক গৌণ লক্ষ্য থাকে, আর তা হল, — একদিকে এই সনাতন আত্মা যা আমরা এবং অন্যদিকে এই পরিবর্তনশীল জীবন ও পরিবর্তনশীল জগৎ যাকে আমরা এ পর্যন্ত আমাদের প্রকৃত সত্তা ও আমাদের একমাত্র সম্ভবপর অবস্থা বলে মিথ্যা ধারণা করে এসেছি — এ দুয়ের মধ্যে সত্যকার সম্বন্ধ স্থাপন করা।

কোন সম্বন্ধ যদি বাস্তব হতে হয়, তাহলে সে সম্বন্ধ হওয়া চাই দুই সদ্‌বস্তুর মধ্যে। পূর্বে আমরা ভাবতাম যে সনাতন আত্মা মায়া ও অসৎ না হলেও এ হল এমন এক পরোক্ষ প্রত্যয় যা ঐহিক জীবন থেকে দূরবর্তী, কারণ বিষয়সমূহের যা প্রকৃতি তাতে আমরা নিজে কালের প্রবাহের মধ্যে পরিবর্তনশীল ও চরিষ্ণু এই মন, প্রাণ ও দেহ ছাড়া যে অন্য কিছু তা ভাবা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু একবার যখন আমরা এই অবর স্থিতির মধ্যে আমাদের আটক অবস্থা থেকে মুক্তি পাই তখন আমরা সাধারণতঃ আত্মা ও জগতের মধ্যে ঐ ভ্রমাত্মক সম্বন্ধের বিপরীত দিকটির আশ্রয় নিই; তখন এই যে শাশ্বত সত্তা যা আমরা উত্তরোত্তর হই বা যার মধ্যে আমরা বাস করি তাকেই আমরা একমাত্র সদ্‌বস্তু ব'লে গণ্য করতে চাই এবং সেখান থেকে নিম্নে তাকিয়ে জগৎ ও মানুষকে মনে করি তারা এক দূরবর্তী মায়া ও অসৎ, কারণ এই স্থিতিটি আমাদের নতুন প্রতিষ্ঠার সম্পূর্ণ বিপরীত, তাতে আমরা আর আমাদের চেতনাকে আবদ্ধ রাখি না, সেখান থেকে আমরা উত্তোলিত হয়ে রূপান্তরিত হয়েছি, মনে হয় তার সঙ্গে আর আমাদের কোন বন্ধনসূত্র নেই। আর এরকম হবার সম্ভাবনা বেশী হয় যদি অবর ত্রিবিধ সত্তা থেকে সরে আসার বিষয়ে আমরা সনাতন আত্মার উপলব্ধিকে শুধু মুখ্য উদ্দেশ্য না ক'রে একে করি আমাদের একমাত্র ও সর্বগ্রাহী উদ্দেশ্য; কারণ তখন আমরা সম্ভবতঃ শুদ্ধ মন থেকে তীরের মতো ছুটে একেবারে প্রবেশ করব শুদ্ধ চিৎপুরুষের মধ্যে — এই

মধ্যবর্তী স্থান ও ঐ শীর্ষস্থানের মাঝের ধাপগুলি না মাড়িয়েই; আর আমাদের চেতনার উপর আমরা এমন এক ব্যবধানের গভীর বোধ নিবদ্ধ করতে চাইব যে যন্ত্রণাময় পতন বিনা তার উপর যে কোন সেতু রচনা করে আবার তা পার হয়ে আসব তা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

কিন্তু আত্মা ও জগতের মধ্যে এক চিরন্তন নিবিড় সম্বন্ধ বর্তমান, আর তাদের মধ্যে সংযোগও আছে, এমন কোন ব্যবধান নেই যা লাফ দিয়ে পার হতে হবে। চিৎপুরুষ ও জড় অস্তিত্ব হল এক সুশৃঙ্খল ক্রমোন্নত শ্রেণীর উচ্চতম ও নিম্নতম ধাপ। সুতরাং দুটির মধ্যে এক বাস্তব সম্বন্ধ ও সংযোগসূত্র অবশ্যই থাকবে যার সাহায্যে সনাতন ব্রহ্ম একই সাথে শুদ্ধ চিৎপুরুষ ও আত্মা হতে সমর্থ অথচ নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারেন তার নিজের হওয়া বিশ্ব; আর যে অন্তঃপুরুষ সনাতনের সঙ্গে এক বা যুক্ত তার পক্ষে নিশ্চয়ই সম্ভব হবে বর্তমানে জগতের মধ্যে আমাদের অজ্ঞানময় মগ্ন অবস্থার বদলে দিব্য সম্বন্ধের ঐ একই স্থিতি অবলম্বন করা। সংযোগের এই তত্ত্বটি হ'ল আত্মা ও সর্বভূতের মধ্যে চিরন্তন ঐক্য; মোক্ষপ্রাপ্ত পুরুষকে সমর্থ হতে হবে এই চিরন্তন ঐক্য স্থাপনে যেমন নিত্যমুক্ত বন্ধনহীন ভগবান তাতে সমর্থ, আর যে শুদ্ধ আত্মসত্তা আমাদের প্রথম লক্ষ্য হবে তার সঙ্গে সমভাবে ঐ ঐক্য উপলব্ধি করা আমাদের কর্তব্য। অখণ্ড আত্মপ্রাপ্তির জন্য আমাদের যে শুধু আত্মার সঙ্গে, ভগবানের সঙ্গে এক হতে হবে তা নয়, সর্বভূতেরও সঙ্গে আমাদের এক হওয়া চাই। এই যে আমাদের অভিব্যক্ত অস্তিত্বের জগৎ যা আমাদের মানুষভাইদের দ্বারা আকীর্ণ এবং যা থেকে আমরা সরে এসেছি তাকে আমাদের ফিরে নেওয়া কর্তব্য সঠিক সম্বন্ধে এবং এক সনাতন সত্যের স্থিতিতে কারণ আমরা এসবে বদ্ধ ছিলাম এক অনুচিত সম্বন্ধে ও মিথ্যার স্থিতিতে যা কালের মধ্যে সৃষ্ট হয়েছিল সকল বিরোধ, বৈষম্য ও দ্বন্দ্বসমেত বিভক্ত চেতনার তত্ত্বের দ্বারা। আমাদের নবচেতনার মধ্যে সকল বিষয় ও সত্তাকে আমাদের পুনর্গ্রহণ করা কর্তব্য তবে সকলের সঙ্গে এক হয়ে, অহমাত্মক ব্যষ্টিত্বের দ্বারা সেসব থেকে বিভক্ত না হয়ে।

অর্থাৎ, শুধু শুদ্ধ, স্বপ্রতিষ্ঠ, কালাতীত, দেশাতীত, বিশ্বাতীত আত্মার চেতনা নয়, বিশ্বচেতনাও গ্রহণ করা ও হওয়া আমাদের কর্তব্য, আমাদের সত্তাকে একাত্ম করতে হবে অনন্তের সঙ্গে যিনি নিজেকে জগৎসমূহের ভিত্তি ও আধেয় করেন এবং সর্বভূতের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকেন। এই উপলব্ধির কথাই প্রাচীন বেদান্তবাদীরা এইভাবে বলেছিলেন — আত্মার মধ্যে সর্বভূতকে দেখা ও সর্বভূতের মধ্যে আত্মাকে দেখা; আবার এর উপর তারা বলেন সেই মানবের মহত্তম উপলব্ধির কথা যার মধ্যে সৃষ্টির আদি রহস্যের পুনরাবৃত্তি হয়েছে — আত্মসত্তাই এই সর্বভূত হয়েছে যা সম্ভূতির বিভিন্ন জগতের অন্তর্গত।[১] আত্মা ও জগতের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধের সমগ্র কথাই মূল রূপে প্রকাশ করা হয়েছে এই তিনটি সূত্রের মধ্যে আর এই সম্বন্ধকেই আমাদের আনতে হবে

[১] ঈশোপনিষদ

সঙ্কীর্ণতাজনক অহং যে মিথ্যা সম্বন্ধ সৃষ্টি করে তার পরিবর্তে। অনন্তসত্তার যে নবদর্শন ও বোধ আমাদের লাভ করা চাই এ হল তা-ই, সকলের সঙ্গে যে ঐক্য আমাদের স্থাপন করা কর্তব্য তার ভিত্তি হল এ।

কারণ আমাদের আসল আত্মা এই ব্যষ্টি মানসিক সত্তা নয়, এ হল শুধু এক সঙ্কেত, এক বাহ্যরূপ; আমাদের আসল আত্মা বিশ্বব্যাপী, অনন্ত, তা সর্বভূতের সঙ্গে এক এবং সর্বভূতের মধ্যে অধিষ্ঠিত। আমাদের মন, প্রাণ ও দেহের পশ্চাতে যে আত্মা এবং আমাদের মানবভাইদের মন, প্রাণ ও দেহের পশ্চাতে যে আত্মা — এই দুই একই আত্মা, আর যদি আমরা আমাদের আত্মাকে অধিগত করি এবং তারপর যখন আমরা আমাদের মানবভাইদের দিকে তাকাই, তখন স্বভাবতঃই আমরা চাই তাদের সঙ্গে এক হতে আমাদের চেতনার নতুন ভিত্তিতে। একথা সত্য যে মন এরকম তাদাত্ম্যকরণে বাধা দেয় আর যদি আমরা একে এর পুরনো সব অভ্যাস ও কাজকর্ম বজায় রাখতে দিই তাহলে এটি বিষয় সমূহের এই সত্য ও শাশ্বত দর্শন অনুযায়ী নিজেকে গঠন ও নিয়ন্ত্রণ না ক'রে বরং চেষ্টা করবে আবার আমাদের নতুন আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রাপ্তির উপর তার সব বৈষম্যের আবরণ আনতে। কিন্তু প্রথমতঃ যদি আমরা আমাদের যোগের পথে সঠিকভাবে অগ্রসর হয়ে থাকি তাহলে আমরা আত্মাকে যে পেয়েছি তা শুদ্ধ-করা মন ও হৃদয়ের মাধ্যমে, আর শুদ্ধ-করা মন এমন কিছু যা স্বভাবতঃই নিষ্ক্রিয় ও জ্ঞানের নিকট উন্মুক্ত। দ্বিতীয়তঃ মনের গণ্ডি টানার ও ভাগ করার প্রবণতা সত্ত্বেও মনকে শেখান যায় যেন সে সঙ্কীর্ণতাজনক বাহ্যরূপের খণ্ডিত সংজ্ঞায় না ভেবে ভাবে ঐক্যবিধায়ক সত্যের ছন্দে। সুতরাং আমাদের কর্তব্য ধ্যান ও একাগ্রতার দ্বারা মনকে অভ্যস্ত করা যেন এ আর না ভাবে যে বিভিন্ন বিষয় ও সত্তা নিজে নিজে পৃথকভাবে বিদ্যমান, বরং যেন এ সর্বদাই ভাবে যে সর্বত্রই "একম্" এবং সকল বিষয়ই "একম্"। যদিও আমরা এ পর্যন্ত বলে এসেছি যে জ্ঞানের জন্য প্রথম প্রয়োজন হল বাইরে থেকে জীবের সরে আসা আর যেন এই একমাত্র অনন্য সাধনা, তথাপি পূর্ণযোগের সাধকের পক্ষে এই দুই সাধন পন্থাই একত্র অবলম্বন করা বাস্তবিকই আরো ভাল। একটির দ্বারা সে আত্মাকে দেখবে ভিতরে আর অপরটির দ্বারা সে সেই আত্মাকে দেখবে সেই সবের মধ্যে যেসব এখন মনে হয় আমাদের বাইরে অবস্থিত। অবশ্য এই শেষ পন্থাটি দিয়ে শুরু করাও সম্ভব অর্থাৎ প্রথমেই উপলব্ধি করা যে এই নয়নগোচর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৃষ্টিতে যা কিছু সে সবই ভগবান বা ব্রহ্ম বা বিরাট পুরুষ এবং পরে তা ছাড়িয়ে যাওয়া বিরাটের পশ্চাতে অবস্থিত সর্বে। কিন্তু এতে অসুবিধা আছে এবং সেজন্য সম্ভব হলে দুটি পন্থা যুক্ত করাই ভাল।

এই যে উপলব্ধি যে সকল বিষয়ই ভগবান বা ব্রহ্ম তার, যেমন আমরা পূর্বে দেখেছি, তিনটি দিক আছে, আর এগুলিকে আমরা সুবিধামতো অনুভূতির পরপর তিনটি অবস্থা করতে পারি। প্রথম উপলব্ধি হল আত্মা যার মধ্যে সকল সত্তা অবস্থিত। চিৎপুরুষ, ভগবান নিজেকে অভিব্যক্ত করেছেন এক অনন্ত আত্মপ্রসারিত সত্তা রূপে যিনি স্বপ্রতিষ্ঠ, শুদ্ধ, কাল ও দেশের অনধীন, বরং কাল ও দেশকে বহন করেন চেতনার

সঙ্কেত রূপে। তিনি সকল বিষয়ের অতিরিক্ত, তাদের সকলকেই ধারণ করেন ঐ আত্মপ্রসারিত সত্তা ও চেতনার মধ্যে, যা কিছু তিনি সৃজন করেন, ধারণ করেন বা হন তাদের কোনটিরই দ্বারা বদ্ধ নন, বরং মুক্ত, অনন্ত ও সর্বানন্দময়। যেমন প্রাচীন উপমায় বলা হয় তিনি ধারণ করেন যেমন অনন্ত আকাশ সর্ববিষয় ধারণ করে নিজের মধ্যে। কোন কোন সাধকের কাছে ব্রহ্মধ্যান দুরূহ হয় কারণ তার কাছে এটি প্রথম মনে হয় এক আচ্ছিন্ন ও অগ্রাহ্য ভাবনা; তাদের কাছে আকাশ ব্রহ্মের এই উপমাটি বাস্তবিকই কার্যক্ষেত্রে অনেক সহায় হতে পারে। এই পরমসৎকে সে মন দিয়ে দেখতে এবং তার মানসিক সত্তায় অনুভব করতে চেষ্টা করে যেন এ হল আকাশ, ভৌতিক আকাশ নয়, তবে এক বিরাট সত্তা, চেতনা ও আনন্দের সর্বব্যাপী আকাশ, আর একেই সে একত্বে এক করে তার অন্তঃস্থ আত্মার সঙ্গে। এইরকম ধ্যানের দ্বারা মনকে উন্মুখতার এমন এক অনুকূল অবস্থায় আনা যেতে পারে যাতে আবরণ ছিন্ন বা অপসারণ করা হলে অতিমানসিক দর্শনের দ্বারা আমাদের মানসিকতা আপ্লুত এবং আমাদের সকল দেখা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হওয়া সম্ভব। আর যখন এই দেখার পরিবর্তন উত্তরোত্তর শক্তিশালী ও দুর্বার হয়ে আমাদের সমগ্র চেতনা অধিকার করে তখন সেই পরিবর্তনের উপর শেষ পর্যন্ত আসে সম্ভূতির পরিবর্তন আর তার ফলে আমরা যা দেখি তা-ই হই। আমাদের আত্মচেতনায় আমরা ততটা বিশ্বাত্মক হব না যতটা হব বিশ্বাত্মকের অতিরিক্ত কিছু, অনন্ত। মন ও প্রাণ ও দেহ তখন হবে সেই যে আনন্ত্য আমরা হয়েছি তার অন্তর্গত গতিবৃত্তি মাত্র; আর আমরা দেখব যে যা আছে তা আদৌ জগৎ নয়, এ শুধু চিৎপুরুষের এই আনন্ত্য যার মধ্যে সঞ্চরণ করে আত্মসচেতন সম্ভূতির নিজেরই বিভিন্ন মূর্তির শক্তিশালী বিশ্ব সামঞ্জস্যসমূহ।

কিন্তু তাহলে এই যে সব রূপ ও সত্তা নিয়ে এই সামঞ্জস্য তৈরী তাদের অবস্থা কি? তারা কি আমাদের কাছে হবে শুধু প্রতিমূর্তি, অন্তঃস্থ সদ্‌বস্তু-রহিত শূন্য নাম ও রূপ, নিজেরা স্বয়ং তুচ্ছ ও অসার আর একসময় এগুলিকে আমাদের মানসিক দর্শনে যতই না জমকালো, শক্তিশালী বা সুন্দর দেখা যেত, এখন তাদের বর্জন করতে হবে, মনে করতে হবে যে তাদের কোন মূল্য নেই? না, তা নয়; যদিও এটাই হবে প্রথম স্বাভাবিক ফল যদি সাধক সর্বাশ্রয়ী আত্মার আনন্ত্যে অত্যন্ত প্রগাঢ়ভাবে বিভোর থাকে আর তাঁর আশ্রয়স্থিত অনন্ত সব সত্তাকে বাদ দেয়। কিন্তু এইসব বিষয় শূন্য নয়, এক বিশ্বমনের দ্বারা কল্পিত অসত্য নাম ও রূপমাত্র নয়; আমরা যেমন বলেছি তারা তাদের সদ্‌বস্তুতে আত্মার আত্মসচেতন সম্ভূতি, অর্থাৎ আত্মা যেমন আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত, তেমন তাদের সকলেরই মধ্যে অধিষ্ঠিত, তাদের সম্বন্ধে সচেতন, তাদের গতিবিধির নিয়ন্তা এবং যা সব তিনি হয়েছেন তাদের আলিঙ্গন করে তিনি যেমন আনন্দময়, সেসবের অধিষ্ঠান হয়েও তেমন আনন্দময়। যেমন আকাশ ঘট ধারণ করে আবার যেন তার মধ্যে ধরা থাকে, তেমন এই আত্মা সর্বভূতকে ধারণ করেন আবার তাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকেন — তবে ভৌতিক অর্থে নয়, আধ্যাত্মিক অর্থে, এবং তিনি সর্বভূতের সদ্‌বস্তু। আত্মার এই অন্তরধিষ্ঠানের অবস্থা আমাদের উপলব্ধি করা চাই; সর্বভূতের মধ্যে আত্মাকে

আমাদের দেখতে হবে এবং আমাদের চেতনায় নিজেদের ঐ আত্মা হতে হবে। ধীশক্তি ও মানসিক সংস্কারের সকল দাম্ভিক বাধা সরিয়ে দিয়ে আমাদের জানতে হবে যে ভগবান এই সকল সম্ভূতির মধ্যে অবস্থিত এবং তাদের প্রকৃত আত্মা ও চিন্ময় চিৎপুরুষ, আর শুধু বুদ্ধিগতভাবে জানা নয়, এমন এক আত্ম-অনুভূতির দ্বারা জানতে হবে যা মানসিক চেতনার সকল অভ্যাসকে জোর ক'রে পরিবর্তিত করবে তার নিজের দিব্যতর গঠনে।

এই যে আত্মা, যা আমরা, তাকে সর্বশেষে আমাদের আত্মচেতনায় হতে হবে সর্বভূতের সঙ্গে সম্পূর্ণ এক, যদিও এ হল তাদের অতিরিক্ত। আমাদের একে দেখা চাই শুধু যে সকল কিছুর আধার ও অন্তর্বাসীরূপে তা নয়, দেখা চাই যে এই সব; দেখা চাই এ শুধু অন্তরধিষ্ঠাতা চিৎপুরুষ নয়, এই আবার নাম ও রূপ, গতিবৃত্তি ও গতিবৃত্তির ঈশ্বর, মন ও প্রাণ ও দেহ। এই সর্বশেষ উপলব্ধিবলেই আমরা সঠিক স্থিতিতে এবং সত্যের দর্শনে সম্পূর্ণভাবে পুনর্গ্রহণ করব সেইসব যে সব থেকে আমরা সাধনার প্রথম ক্রিয়ায় অর্থাৎ পশ্চাদ্‌গমন ও প্রত্যাহারে পিছিয়ে এসেছিলাম। যে ব্যষ্টি মন, প্রাণ ও দেহ থেকে আমরা সরে এসেছিলাম আমাদের প্রকৃত সত্তা নয় ব'লে, সে সবকে আমরা ফিরে পাব আত্মার প্রকৃত সম্ভূতিরূপে, তবে আর শুধু ব্যষ্টি সঙ্কীর্ণতায় নয়। আমরা এই যে মনকে নেব তা এক ক্ষুদ্র গতির মধ্যে আবদ্ধ পৃথক মানসিকতা রূপে নয়, একে নেব বিশ্বমনের এক বৃহৎ গতিরূপে; যে প্রাণ নেব তা প্রাণশক্তি ও ইন্দ্রিয়সংবিৎ ও কামনার অহমাত্মক ক্রিয়া রূপে নয়, একে নেব বিশ্বপ্রাণের স্বচ্ছন্দ গতিরূপে, যে দেহকে নেব তা অন্তঃপুরুষের ভৌতিক কারাগার রূপে নয়, একে নেব এক গৌণ যন্ত্র ও বিছিন্ন করা যায় এমন পরিচ্ছদ রূপে এবং এই উপলব্ধিতে যে এ হল বিশ্বজড়ের এক গতি, বিশ্বশরীরের এক কোশ। আমাদের এই অনুভব আসবে যে ভৌতিক জগতের সকল চেতনা আমাদের শারীরচেতনার সঙ্গে এক, চারিদিককার বিশ্বব্যাপী প্রাণের সকল ক্রিয়াশক্তি আমাদেরই আপন ক্রিয়াশক্তি, বৃহৎ বিশ্ব সংবেগ ও আকুতির সকল হৃৎ-স্পন্দন আমাদেরই সব হৃৎ-স্পন্দনের অন্তর্গত যেগুলি দিব্য আনন্দের ছন্দে সমতানবদ্ধ; বিশ্বমনের সকল ক্রিয়া আমাদেরই মানসিকতার মধ্যে প্রবহমান, আর আমাদের মনন-ক্রিয়া প্রবাহিত হয়ে বাইরে এসে পড়ছে এর উপর সেই বিশাল সমুদ্রের মধ্যে এক তরঙ্গের মতো। এই যে ঐক্য যা সকল মন, প্রাণ, জড়কে আলিঙ্গন ক'রে থাকে এক অতিমানসিক সত্যের আলোকে ও আধ্যাত্মিক আনন্দের স্পন্দনে এই আমাদের কাছে হবে সম্পূর্ণ বিশ্বচেতনার মধ্যে আমাদের আভ্যন্তরীণ ভগবৎ-চরিতার্থতা।

কিন্তু যেহেতু এই সকলকে আমাদের আলিঙ্গন করা চাই সত্তা ও সম্ভূতি — এই দুই সংজ্ঞায়, সেহেতু যে জ্ঞান আমরা অধিগত করব তা সম্পূর্ণ ও অখণ্ড হতে বাধ্য। শুদ্ধ আত্মা ও চিৎপুরুষের উপলব্ধিতেই এ জ্ঞান শেষ হলে চলবে না, এতে চিৎপুরুষের সেই সকল বিভাবও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যার দ্বারা এটি নিজেকে ধারণ, বিকশিত ও নিক্ষেপ করে নিজেরই বিশ্বঅভিব্যক্তির মধ্যে। আত্মজ্ঞান ও জগৎ-জ্ঞানকে এক করা চাই ব্রহ্মের সর্ব-আবেষ্টন-করা জ্ঞানের মধ্যে।

একাদশ অধ্যায়

আত্মার বিভিন্ন বিভাব

জ্ঞানমার্গে যে আত্মার উপলব্ধি আমরা লাভ করি তা যে শুধু আমাদের মনস্তাত্ত্বিক সত্তার বিভিন্ন অবস্থা ও গতিবৃত্তির পশ্চাতে অবস্থিত ও অবলম্বন স্বরূপ সদ্‌বস্তু তা নয়, এ হল আবার সেই বিশ্বাতীত ও বিশ্বাত্মক সন্মাত্র যা নিজেকে অভিব্যক্ত করেছে বিশ্বের সকল গতির মধ্যে; সুতরাং আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞানে এও সমাবিষ্ট — সত্তার মূল তত্ত্বাবলী, তার বিভিন্ন মৌলিক বিভাব এবং প্রাতিভাসিক বিশ্বের মূল তত্ত্বাবলীর সঙ্গে তার সম্পর্কাবলী। এই হল উপনিষদের সেই কথার অর্থ যাতে ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে যাকে জানলে সব কিছু জানা হয় তা-ই ব্রহ্ম।[১] উপনিষদ বলে, একে প্রথম উপলব্ধি করতে হবে শুদ্ধ সৎ-তত্ত্ব হিসেবে এবং পরে যে অন্তঃপুরুষ একে উপলব্ধি করে তার কাছে এর মূল বিভাবগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবশ্য উপলব্ধির আগেই আমরা সত্তা কি, জগৎ কি, — তা দার্শনিক যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করতে আর এমনকি বুদ্ধিগতভাবে বুঝতেও চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু এরকম দার্শনিক বোধ জ্ঞান নয়। তাছাড়া, জ্ঞানে ও দর্শনে আমরা উপলব্ধি পেতে পারি বটে কিন্তু এটি অসম্পূর্ণ থাকে যদি অন্তঃপুরুষের সমগ্র অনুভূতির মধ্যে উপলব্ধি না হয় এবং আমরা যা উপলব্ধি করি তার সঙ্গে আমাদের সমগ্র সত্তার ঐক্য না আসে।[২] যোগশাস্ত্রে পরতমকে জানা যায় ও যোগসাধনায় তাঁর সঙ্গে মিলন সাধিত হয় আর তার উদ্দেশ্য হল, — যে বিশ্বাতীত ভগবানকে সকল বিষয় ও জীব তাদের বিভিন্ন অঙ্গের অবর বিধানের মাধ্যমে অজ্ঞানে বা আংশিক জ্ঞান ও অনুভূতি দিয়ে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে তাঁর সঙ্গে শুধু চিন্ময় স্বরূপে নয়, আমাদের সত্তার সচেতন বিধানেও এক হয়ে আত্মার মধ্যে বাস করা এবং সেই পরম স্থিতি থেকে কার্য করা। পরম সত্য জানা ও এর সঙ্গে সামঞ্জস্যে থাকা — এই হল যথার্থ সত্তার অবস্থা; আর আমরা যা সব হই, যা সব আমরা অনুভব করি ও সম্পাদন করি সে সবের মধ্যে এই সত্য প্রকাশ করা — এই হল যথার্থ জীবনযাপনের অবস্থা।

কিন্তু পরতমকে সঠিকভাবে জানা ও প্রকাশ করা মনোময় পুরুষ, মানুষের পক্ষে সহজ নয় কারণ পরম সত্য এবং সেহেতু সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বিভাবগুলি অতিমানসিক। তাদের ভিত্তি হল সেই সবের মূল ঐক্য যেগুলি ধীশক্তি ও মনের ধারণায় এবং জগৎ সম্বন্ধে আমাদের মানসিক অনুভূতিতে সত্তা ও ভাবনার বিপরীত মেরু এবং সেহেতু এমন বিপরীত এবং পরস্পরবিরোধী যে তাদের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য অসম্ভব, অথচ

[১] যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বম্ বিজ্ঞাতম্ — শাণ্ডিল্য উপনিষদ।

[২] গীতায় সাংখ্য ও যোগের মধ্যে যে পার্থক্য করা হয়েছে তা এই; পূর্ণ জ্ঞানের জন্য উভয়ই প্রয়োজনীয়।

অতিমানসিক অনুভূতিতে এই সব একই সত্যের অনুপূরক বিভাব। আত্মা যে যুগপৎ এক ও বহু, — এই উপলব্ধি করার প্রয়োজনীয়তায় আমরা এটি আগেই দেখেছি; কারণ আমাদের উপলব্ধি করা চাই যে প্রতি বিষয় ও সত্তা — সেই 'তৎ'; সকলের ঐক্যকে উপলব্ধি করা চাই 'তৎ' হিসেবে — যেমন সমষ্টির ঐক্যে, তেমন স্বরূপের একত্বে; আর আমাদের উপলব্ধি করা চাই যে 'তৎ'ই বিশ্বাতীত আর এই যে সকল ঐক্য ও বহুত্ব আমরা সর্বত্র দেখি দুই বিপরীত হিসেবে অথচ যেগুলি সৃষ্টির সহচর মেরু তিনি সে সবের অতীতে অবস্থিত। কারণ প্রতিটি ব্যষ্টি সত্তাই হল আত্মা, ভগবান — তা যতই সীমাসঙ্কীর্ণ হোক তার বর্তমানের মানসিক ও ভৌতিক রূপ যার মধ্য দিয়ে সে নিজেকে উপস্থাপিত করছে এই বিশেষ ক্ষণে, দেশের এই বিশেষ ক্ষেত্রে, আর যেসব আন্তর অবস্থা ও বাহ্য ক্রিয়া ও ঘটনার জালের মাধ্যমে আমরা কোন ব্যষ্টিকে চিনি বা জানি, তাদের উপাদানস্বরূপ পরিস্থিতিসমূহের বিশেষ পরম্পরার মধ্যে। সেরকম, সমভাবেই, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ প্রতি সমষ্টিই আত্মা, ভগবান যা নিজেকে প্রকাশ করে এই অভিব্যক্তির অবস্থাসমূহের মধ্যে। কোন ব্যষ্টি বা সমষ্টিকেই আমরা যথার্থতঃ জানতে পারি না যদি আমরা একে জানি শুধু সেইভাবে যেমন এটি নিজের কাছে আন্তরভাবে বা আমাদের কাছে বাহ্যভাবে প্রতীয়মান হয়; একে সঠিকভাবে জানা সম্ভব হয় কেবল তখনই যখন আমরা জানি যে এ হল ভগবান, একম্, আমাদেরই আপন আত্মা যিনি আত্ম-অভিব্যক্তির নানাবিধ মূল বিভাব ও তাঁর নৈমিত্তিক পরিস্থিতিসমূহ প্রয়োগ করছেন। যতদিন না আমরা আমাদের মানসিকতার অভ্যাসগুলি এমন রূপান্তরিত করি যাতে এটি সম্পূর্ণভাবে সেই জ্ঞানের মধ্যে বাস করবে যাতে "একম্"-এর মধ্যে সকল বিভেদের সামঞ্জস্য সাধিত হয়, ততদিন আমরা প্রকৃত সত্যের মধ্যে বাস করি না, কেননা আমরা প্রকৃত ঐক্যের মধ্যে বাস করি না। ঐক্যের সিদ্ধ বোধ তা নয় যাতে সকল কিছুকে দেখা হয় এক সমগ্রের বিভিন্ন অংশ রূপে, এক সমুদ্রের বিভিন্ন তরঙ্গ হিসেবে; এ হল সেই বোধ যাতে যেমন সর্বকে, তেমন প্রত্যেকটিকে এক পরম তাদাত্ম্যে পুরোপুরি দেখা হয় ভগবান বলে, পুরোপুরি দেখা হয় আমাদের আত্মা বলে।

আবার তথাপি, অনন্তের মায়া এতই জটিল যে এমন এক অর্থ আছে যাতে সকলকে সমগ্রের বিভিন্ন অংশরূপে, সমুদ্রের বিভিন্ন তরঙ্গ হিসাবে, এমনকি এক অর্থে বিভিন্ন পৃথক সত্তা রূপেও দেখা পূর্ণ সত্য ও পূর্ণ জ্ঞানের প্রয়োজনীয় অঙ্গ হয়ে ওঠে। কারণ যদিও আত্মা সর্বদাই সকলের মধ্যে এক, তবু আমরা দেখি যে অন্ততঃ সৃষ্টিচক্রের উদ্দেশ্যে এটি নিজেকে প্রকাশ করে বিভিন্ন নিত্য অন্তঃপুরুষের রূপে যা সব বিভিন্ন জগতের মধ্য দিয়ে যুগ যুগ ধরে আমাদের ব্যক্তিভাবনার গতিবৃত্তির উপর অধ্যক্ষতা করে। এই স্থায়ী পুরুষ-সত্তাই প্রকৃত ব্যষ্টিত্ব, আর আমরা যাকে আমাদের ব্যক্তিভাবনা বলি তার নিরন্তর পরিবর্তনের পশ্চাতে এটি দণ্ডায়মান। এ সীমাবদ্ধ অহং নয়, বরং এমন এক কিছু যা নিজের মধ্যে অনন্ত; এ হল সত্যই নিজে অনন্ত তবে এর সত্তার এক স্তর থেকে এ সম্মত হয়েছে এক চিরন্তন অন্তঃপুরুষ-অনুভূতির মধ্যে নিজেকে প্রতিফলিত

করতে। এই হল সাংখ্যের সেই বহুপুরুষবাদের মূল সত্য যাতে বলা হয় যে বহু মৌলিক, অনন্ত, মুক্ত ও নৈর্ব্যক্তিক পুরুষ প্রতিফলিত করে একমাত্র বিশ্ব ক্রিয়াশক্তির সব গতিবৃত্তিকে। যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সাংখ্য থেকে অত্যন্ত ভিন্ন এক দর্শন এবং বৌদ্ধ শূন্যবাদ ও মায়াবাদী অদ্বৈত দর্শনের আতিশয্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ উদ্ভূত হয়েছিল একরকম তারও পশ্চাতে এটি অবস্থিত। প্রাচীন অর্ধ-বৌদ্ধ অর্ধ-সাংখ্য মতে শুধু শান্তকেই দেখা হয়, জগতে অন্য কিছু নেই; আছে শুধু পঞ্চভূতের নিরন্তর সমবায় এবং অচেতন ক্রিয়াশক্তির তিনটি গুণ যা শান্তের মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে তার চেতনার দ্বারা পঞ্চভূতের ক্রিয়াধারা আলোকিত করে; কিন্তু এটি ব্রহ্মের সমগ্র সত্য নয়। আমরা যে শুধু পরিবর্তনশীল মানসিক, প্রাণিক ও দৈহিক উপাদানের স্তূপ, জন্মজন্মান্তরে মন ও প্রাণ ও দেহের বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করি আর তার ফলে কোন সময়েই এই সকল প্রবাহের পশ্চাতে কোন সত্য আত্মা বা জীবনের কোন সচেতন যুক্তি থাকে না অথবা কিছুই থাকে না, এক সেই "শান্ত" ছাড়া যা এই সকলকিছু সম্বন্ধে উদাসীন — একথা ঠিক নয়। আমাদের মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক ব্যক্তিভাবনার নিরন্তর পরিবর্তনের পশ্চাতে আছে আমাদের সত্তার এক সত্য ও স্থির সামর্থ্য, আর একেই আমাদের জানা ও রক্ষা করা দরকার যাতে এর মাধ্যমে অনন্ত তাঁর ইচ্ছামতো নিজেকে ব্যক্ত করতে পারেন তাঁর শাশ্বত বিশ্বক্রিয়াধারার যে কোন স্তরে ও যে কোন উদ্দেশ্যের জন্য।

আর এই একম্ যা সকল কিছুর উৎস এই বহু যার সারতত্ত্ব ও প্রভব হল "একম্" এবং এই ক্রিয়াশক্তি, সামর্থ্য বা প্রকৃতি যার মাধ্যমে এক ও বহুর সম্বন্ধগুলি রক্ষা করা হয় — এই তিনের সম্ভবপর চিরন্তন ও অনন্ত সম্বন্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা সৃষ্টিকে বিবেচনা করি তাহলে আমরা দেখব যে, যেসব দ্বৈতবাদী দর্শন ও ধর্মে মনে হয় সত্তাসমূহের ঐক্য জোরের সঙ্গে অস্বীকার করা হয় আর ঈশ্বর ও তাঁর সৃষ্ট সব বিষয়ের মধ্যে এক অলঙ্ঘনীয় বিভেদ রচিত হয় তাদেরও সমর্থনে কিছু যুক্তি আছে। যদিও এইসব ধর্মের স্থূলতর রূপগুলিতে একমাত্র লক্ষ্য হল নিম্ন স্বর্গের অজ্ঞানময় সুখভোগ করা, তথাপি এক অতি উচ্চতর ও গভীরতর অর্থ আছে যাতে আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারব ভক্ত কবির সেই আকুল কথা; যাতে এক সাদাসিধে জোরালো উপমায় তিনি চেয়েছিলেন যে চিরদিন ধরে পরমের আলিঙ্গনের আনন্দ উপভোগ করার অধিকার অন্তঃপুরুষের আছে। তিনি লিখেছিলেন, "আমি চিনি হতে চাই না, আমি চিনি খেতে চাই"। সকলের মধ্যে এক আত্মার স্বরূপগত তাদাত্ম্যের উপর আমরা নিজেদের যত দৃঢ়ভাবেই না প্রতিষ্ঠিত করি, একথা মনে করার প্রয়োজন নেই যে ঐ আকুল ডাক একপ্রকার আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আস্পৃহা অথবা আসক্ত ও অজ্ঞানপূর্ণ জীবের দ্বারা পরম সত্যের শুদ্ধ ও উন্নত কঠোরতা বর্জন। বরং, সদর্থকভাবে এর লক্ষ্য পরম পুরুষের এমন এক গভীর ও রহস্যময় সত্য যা মানুষের ভাষা ব্যক্ত করতে অসমর্থ, মানুষের যুক্তি যার কোন ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম; এখানে প্রবেশ করার চাবি আছে হৃদয়ের, আর যে জ্ঞানের পুরুষ শুধু নিজের শুদ্ধ কঠোরতায় আগ্রহী তার অহঙ্কার তাকে লোপ করতে

সক্ষম নয়। তবে এই বিষয়টি ভক্তিমার্গের শিখরের কথা, আর সেখানে আমরা তার কথা আবার বলব।

পূর্ণ যোগের সাধক তার সাধ্য সম্বন্ধে এক পূর্ণ দৃষ্টি নেবে এবং সে চাইবে তার পূর্ণ উপলব্ধি। ভগবানের যে চিরন্তন আত্ম-অভিব্যক্তি তার স্বরূপগত বিভাব অনেকগুলি, তিনি নিজেকে অধিগত করেন ও খুঁজে পান অনেক লোকের উপর এবং তাঁর সত্তার অনেক মেরুর মধ্য দিয়ে; প্রতি বিভাবে তার উদ্দেশ্য আছে এবং প্রতি লোকেই বা মেরুতেই এর সার্থকতা আছে — আর তা আছে শাশ্বত ঐক্যের শিখরে ও পরমক্ষেত্রে — উভয়েই। ব্যষ্টি-আত্মার মাধ্যমেই আমাদের 'একম্'-এ উপনীত হতে হবে; এ হল অনিবার্য, কারণ ব্যষ্টি আত্মাই আমাদের সকল অনুভূতির ভিত্তি। বিদ্যার দ্বারা আমরা একম্-এর সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভ করি; কারণ দ্বৈতবাদী যাই বলুক একটি স্বরূপগত তাদাত্ম্য আছে যার দ্বারা আমরা আমাদের উৎসের মধ্যে ডুব দিয়ে সক্ষম হই ব্যষ্টিভাবের সকল বন্ধন থেকে, আবার এমনকি বিশ্বভাবেরও সকল বন্ধন থেকে নিজেদের মুক্ত করতে। আর ঐ তাদাত্ম্যের অনুভূতি যে শুধু জ্ঞানের পক্ষে বা আচ্ছিন্ন সত্তার শুদ্ধ অবস্থার পক্ষে এক লাভ তা নয়। আমরা দেখেছি যে আমাদের সকল ক্রিয়ার পরাকাষ্ঠা হল কর্মের পথে দিব্য সঙ্কল্প বা চিৎ-সামর্থ্যের সঙ্গে ঐক্যে ঈশ্বরের মধ্যে নিজেদের নিমজ্জন; প্রেমের পরাকাষ্ঠা হল আমাদের প্রেম ও আরাধনার বিষয়ের সঙ্গে উল্লাসভরা আনন্দের ঐক্যে নিজেদের হর্ষবিভোর নিমজ্জন। কিন্তু আবার জগতে দিব্য কর্মের জন্য ব্যষ্টি আত্মা নিজেকে চেতনার এক কেন্দ্রে রূপান্তরিত করে আর এর মধ্য দিয়ে দিব্য সঙ্কল্প যা দিব্য প্রেম ও আলোকের সঙ্গে এক নিজেকে বাইরে ঢেলে দেয় বিশ্বের বহুত্বের মধ্যে। এই একই প্রকারে পরমের সঙ্গে এবং অপর সকলের অন্তঃস্থ আত্মার সঙ্গে এই আত্মার তাদাত্ম্যের মাধ্যমে আমরা লাভ করি আমাদের সকল মানবভাইদের সঙ্গে আমাদের ঐক্য। একই সময়ে প্রকৃতির ক্রিয়ার মধ্যে আমরা এর দ্বারা একম্-এর অন্তঃপুরুষরূপ হিসেবে এক বিশেষত্ব রক্ষা করি যার জন্য আমরা অপর সব সত্তার সঙ্গে এবং স্বয়ং পরমের সঙ্গে একত্বের মধ্যেও ভেদের বিভিন্ন সম্বন্ধ রক্ষা করতে সমর্থ হই। তবে একথা অনিবার্য যে এই সম্বন্ধগুলি এমন হবে যে যখন আমরা পুরোপুরি অবিদ্যার মধ্যে বাস করতাম আর একত্ব ছিল শুধু এক নাম বা অপূর্ণ প্রেম, সমবেদনা বা আকৃতির এক কষ্টকর আস্পৃহা তখন যেসব সম্বন্ধ আমাদের ছিল সেসব থেকে এইগুলি সারে ও ভাবে অতীব ভিন্ন। ঐক্যই হবে বিধান, ভেদ থাকবে শুধু ঐ ঐক্যকে নানাভাবে উপভোগ করার জন্য। বিভাজনের যে লোক অহং-বোধের বিচ্ছিন্নতা আঁকড়ে থাকে তাতে আবার না নেমে এসে, অথবা ভেদের কোন লীলার সঙ্গে সম্পর্করহিত শুদ্ধ তাদাত্ম্যের জন্য আত্যন্তিক সাধনায় আসক্ত না হয়ে, আমরা বরং সত্তার এই দুই মেরুকে আলিঙ্গন ক'রে তাদের মধ্যে সঙ্গতি আনব সেইখানে যেখানে তারা মিলিত হয় পরতমের আনন্ত্যের মধ্যে।

আত্মা, এমনকি ব্যষ্টি আত্মাও যেমন আমাদের মানসিক অহং-বোধ থেকে ভিন্ন,

তেমন ভিন্ন আমাদের ব্যক্তিভাবনা থেকে। আমাদের ব্যক্তিভাবনা কখন এক থাকে না; এ হল এক সতত পরিবর্তন ও নানাবিধ সমবায়। এটি কোন মূল চেতনা নয়, তবে চেতনার বিভিন্ন রূপের বিকাশ — সত্তার কোন সামর্থ্য নয়, তবে সত্তার বিভিন্ন আংশিক সামর্থ্যের বৈচিত্র্যপূর্ণ লীলা — আমাদের জীবনের আত্ম-আনন্দের ভোক্তা নয় বরং অনুভূতির যে নানাবিধ স্বর ও তান ঐ আনন্দকে কম বা বেশী মাত্রায় বিভিন্ন সম্পর্কের পরিবর্তনশীলতায় পরিণত করবে তাদের জন্য অন্বেষণ। এও পুরুষ ও ব্রহ্ম কিন্তু এ হল ক্ষর পুরুষ, সনাতনের প্রাতিভাসিক, কিন্তু এর স্থায়ী সদ্‌বস্তু নয়। গীতায় তিন পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে, এই তিন পুরুষ দিয়েই দিব্য পরম পুরুষের সমগ্র অবস্থা ও ক্রিয়া গঠিত হয়; এরা ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম যিনি অপর দুটিকে ধারণ করেন আবার তাদের অতীত। ঐ পুরুষোত্তমই ঈশ্বর যাঁর মধ্যে আমাদের বাস করা চাই, তিনিই আমাদের মধ্যে ও সকলের মধ্যে অবস্থিত পরমাত্মা। অক্ষর পুরুষ সেই নীরব, নিষ্ক্রিয়, সম ও নির্বিকার আত্মা যা আমরা লাভ করি যখন আমরা নিবৃত্ত হই সক্রিয়তা থেকে নিষ্ক্রিয়তায়, চেতনা ও শক্তির লীলা ও আনন্দের অন্বেষণ থেকে সেই চেতনা ও শক্তি ও আনন্দের শুদ্ধ ও ধ্রুব ভিত্তিতে যার মাধ্যমে মুক্ত, আত্মস্থ ও অনাসক্ত পুরুষোত্তম লীলা অধিগত ও ভোগ করেন। ব্যক্তিভাবনার যে পরিবর্তনশীল প্রবাহের মাধ্যমে আমাদের বিশ্বজীবনের বিভিন্ন সম্পর্ক সম্ভবপর হয় তার ধাতু (দ্রব্য) ও অব্যবহিত প্রবর্তক হল ক্ষর পুরুষ। ক্ষরের মধ্যে নিবদ্ধ মনোময় পুরুষ এর প্রবাহের মধ্যে বিচরণ করে, শাশ্বত প্রশান্তি, সামর্থ্য ও আত্ম-আনন্দের অধিকার সে পায়নি; অক্ষরের মধ্যে নিবদ্ধ অন্তঃপুরুষ এই সবকে নিজের মধ্যে ধারণ করে কিন্তু জগতে কাজ করতে অক্ষম; কিন্তু যে অন্তঃপুরুষ পুরুষোত্তমের মধ্যে বাস করতে সক্ষম সে সত্তার শাশ্বতপ্রশান্তি ও সামর্থ্য ও আনন্দ ও ব্যাপ্তি উপভোগ করে। নিজের আত্মজ্ঞান ও আত্মসামর্থ্যে তা চরিত্র বা ব্যক্তিভাবনার দ্বারা অথবা নিজের চেতনার শক্তি ও অভ্যাসের বিভিন্ন রূপের দ্বারা বদ্ধ নয় অথচ জগতের মধ্যে ভগবানের আত্মপ্রকাশের জন্য এসবকে সে ব্যবহার করে বিশাল স্বাধীনতা ও সামর্থ্যের সঙ্গে। এখানেও এই যে পরিবর্তন তার অর্থ যে আত্মার মূল বিভাবগুলির কোন বিকার তা নয়, এর অর্থ পরতমের স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে আমাদের উদ্‌বর্তন এবং আমাদের সত্তার দিব্য বিধানের যথার্থ প্রয়োগ।

আত্মার এই তিন বিভাবের সঙ্গে জড়িত রয়েছে ভারতীয় দর্শনের সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে পার্থক্য; ইওরোপীয় ভাবনায় এ হল ব্যক্তিরূপী ও নৈর্ব্যক্তিক ভগবানের পার্থক্য। এই বিরোধ যে আপেক্ষিক তা উপনিষদের সেই কথাটিতে সুস্পষ্ট হয় যাতে বলা হয়েছে যে পরব্রহ্ম "সগুণ অথচ নির্গুণ"[১]। আবার আমরা পাই সনাতন সত্তার দুই স্বরূপগত বিভাব, দুই মৌলিক দিক, দুই মেরু আর উভয়কেই অতিক্রম করা হয়েছে বিশ্বাতীত দিব্য সদ্‌বস্তুর মধ্যে। কার্যতঃ এই দুই নীরব ও সক্রিয় ব্রহ্মের অনুরূপ। কারণ

[১] নির্গুণো গুণী

এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মনে করা হতে পারে যে বিশ্বের সমগ্র ক্রিয়া হল ব্রহ্মের অসংখ্য ও অনন্ত গুণের নানাভাবে প্রকাশ ও রূপায়ণ। চিন্ময় সঙ্কল্পের দ্বারা তাঁর সত্তা চিন্ময় সত্তার উপাদানের সকল প্রকার ধর্ম ও রূপায়ণ গ্রহণ করে, এগুলি যেন স্ফুরন্ত আত্মচেতনার বিশ্বস্বভাব ও সামর্থ্যের বিভিন্ন অভ্যাস, অর্থাৎ বিভিন্ন গুণ, আর এই সবেই সকল বিশ্বক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করা যায়। কিন্তু এদের কোনটির দ্বারাই বা তাদের সকলগুলির দ্বারাও বা তাদের চরম অনন্ত যোগ্যতার দ্বারাও তিনি বদ্ধ হন না; তিনি তাঁর সব গুণের ঊর্ধ্বে এবং সত্তার এক বিশেষ স্তরে সেসব থেকে মুক্ত হয়ে অবস্থান করেন। নির্গুণ ব্রহ্ম যে গুণধারণে অসমর্থ তা নয়, বরং এই নির্গুণ ব্রহ্মই নিজেকে ব্যক্ত করেন সগুণরূপে, অনন্ত গুণরূপে কারণ তিনি সব কিছু ধারণ করেন তাঁর অসীম বিচিত্র আত্মপ্রকাশের একান্ত সামর্থ্যে। তিনি যে এই সব থেকে মুক্ত তা এই অর্থে যে তিনি এসবের অতিরিক্ত; আর বাস্তবিকই যদি তিনি এসব থেকে না মুক্ত হতেন, তিনি অনন্ত হতে পারতেন না; ভগবান তাঁর সব গুণের অধীন হতেন, নিজের প্রকৃতির দ্বারা বদ্ধ হতেন, প্রকৃতিই পরম সত্তা হ'ত আর পুরুষ হ'ত এর রচনা ও ক্রীড়নক। গুণ বা গুণের অভাব, ব্যক্তিসত্ত্ব বা নৈর্ব্যক্তিকত্ব — কিছুরই দ্বারা সনাতন বদ্ধ নন, তিনি স্বয়ং তাঁর পরিচয়, আমাদের সকল সদর্থক ও নঞর্থক বিবরণের অতীত।

কিন্তু যদিও আমরা সনাতনের বিবরণ দিতে অক্ষম, তবু আমরা তাঁর সঙ্গে নিজেদের এক করতে সক্ষম। বলা হয় যে আমরা নৈর্ব্যক্তিক হতে পারি কিন্তু পুরুষবিধ ভগবান হতে পারি না, কিন্তু এটি সত্য শুধু এই অর্থে যে কেউই ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বসমূহের ঈশ্বর হতে অক্ষম; কিন্তু আমরা সক্ষম নিজেদের মুক্ত করতে যেমন নীরবতার সত্তার মধ্যে তেমন সক্রিয় ব্রহ্মের সত্তার মধ্যে; আমরা উভয়ের মধ্যেই বাস করতে সক্ষম, উভয়েরই মধ্যে আমাদের সত্তায় ফিরে যেতে সক্ষম কিন্তু তা হবে প্রতিটির উপযোগীভাবে, — নির্গুণের সঙ্গে স্বরূপে এক হয়ে আর সগুণের সঙ্গে এক হয়ে আমাদের সক্রিয় সত্তার স্বাধীনতায়, আমাদের প্রকৃতিতে[১]। এক শাশ্বত প্রশান্তি, স্থিতি ও নীরবতার মধ্য থেকে পরম নিজেকে ঢেলে দেন এমন চিরন্তন সক্রিয়তার মধ্যে যা অবাধ ও অনন্ত, তিনি নিজের জন্য নিজের আত্মবিশেষণ নির্ধারণ করেন ইচ্ছামতো, অনন্ত গুণ ব্যবহার করেন যাতে তা থেকে রচিত হয় গুণের বিচিত্র সমবায়। সেই প্রশান্তি, স্থিতি ও নীরবতায় আমাদের ফিরে যেতে হবে; আর তার মধ্য থেকে কাজ করতে হবে গুণের বন্ধন থেকে দিব্যভাবে মুক্ত হয়ে কিন্তু তবু জগতে দিব্য কর্মের জন্য আমরা সব গুণ, এমনকি, যেগুলি অত্যন্ত বিপরীত সেগুলিও ব্যবহার করব বৃহৎ ও নমনীয়ভাবে। শুধু পার্থক্য এই যে, ঈশ্বর কাজ করেন সকল বিষয়ের কেন্দ্রের মধ্য থেকে, আর আমরা কাজ করি ব্যষ্টি কেন্দ্রের অর্থাৎ আমরা যে তাঁর অন্তঃপুরুষ-রূপ তার মধ্য দিয়ে তাঁর সঙ্কল্প ও সামর্থ্য ও আত্মজ্ঞান সঞ্চালন ক'রে। ঈশ্বর কোন কিছুর অধীন

[১] সাধর্ম্য মুক্তি

নন; ব্যষ্টি অন্তঃপুরুষ-রূপ তার নিজের সর্বোচ্চ আত্মার অধীন, আর এই অধীনতা যত বেশী ও যত একান্ত হয় তত বেশী হয় তার একান্ত শক্তি ও স্বাধীনতার বোধ।

(পাশ্চাত্যদর্শনের) পুরুষবিধ (Personal) ও নৈর্ব্যক্তিকের (Impersonal) পার্থক্য মূলতঃ ভারতীয় পার্থক্যের সমান কিন্তু ইংরাজী কথাগুলির সঙ্গে এমন এক সীমার অর্থ জড়িত আছে যা ভারতীয় ভাবনায় নেই। ইওরোপীয় ধর্মগুলির পুরুষবিধ ভগবান এমন ব্যক্তি যার অর্থ মানবীয় ব্যক্তি, তিনি সর্বশক্তি ও সর্বজ্ঞতার অধিকারী হয়েও তাঁর গুণের দ্বারা সীমাবদ্ধ; শিব বা বিষ্ণু বা ব্রহ্মা বা সকলের ভগবতী মাতা, দুর্গা বা কালী — এইসব ভারতীয় বিশেষ ভাবনার অনুরূপ তা। বস্তুতঃ প্রতি ধর্মই তার নিজস্ব হৃদয় ও ভাবনা অনুযায়ী পূজা ও সেবার জন্য এক ভিন্ন ব্যক্তিরূপী দেবতা খাড়া করে। ক্যালভিনের (Calvin) উগ্র ও কঠিন-হৃদয় ভগবান আর সাধু ফ্রান্সিসের (St. Francis) মধুর ও প্রেমময় ভগবান দুই ভিন্ন সত্তা, যেমন, ভিন্ন প্রসন্ন বিষ্ণু আর ভীষণা কালী যদিও ইনি সর্বদাই স্নেহশীলা ও মঙ্গলময়ী, নিধনের মধ্যেও করুণাময়ী, ধ্বংসের দ্বারাই উদ্ধার করেন। শিব যিনি কৃচ্ছ্র ত্যাগের দেবতা ও সকল কিছুর সংহারকর্তা তাঁকে মনে হয় বিষ্ণু ও ব্রহ্মা থেকে ভিন্ন যাঁরা কাজ করেন দয়া, প্রেম দিয়ে, জীব রক্ষা ক'রে অথবা জীবন ও সৃষ্টির জন্য। স্পষ্টতঃই এইরকম সব প্রত্যয়ে বিশ্বের অনন্ত ও সর্বব্যাপী স্রষ্টা ও রাজ্যেশ্বরের যে বিবরণ পাওয়া যায় তা শুধু অত্যন্ত আংশিক ও আপেক্ষিক অর্থে সত্য হওয়া সম্ভব। তাছাড়া ভারতীয় ধর্মের ভাবনায় বলা হয় না যে এই সব বিবরণ পর্যাপ্ত। পুরুষবিধ ভগবান তাঁর গুণের দ্বারা সীমিত নন, তিনি অনন্ত গুণ, অনন্ত গুণধারণে সমর্থ এবং সে সবের অতীত, তিনি এসবের ঈশ্বর ও তাদের ব্যবহার করেন ইচ্ছামতো, আর ব্যষ্টি অন্তঃপুরুষের নিজস্ব প্রকৃতি ও ব্যক্তিভাবনা অনুযায়ী তার কামনা ও প্রয়োজন পূরণের জন্য তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন তাঁর অনন্ত দেবত্বের নানাবিধ নাম ও রূপে। এই কারণেই সাধারণ ইওরোপীয় মনের পক্ষে বেদান্ত বা সাংখ্য দর্শন থেকে ভিন্ন যে ভারতীয় ধর্ম তা বুঝতে এত কষ্ট হয়। কারণ অনন্তগুণসম্পন্ন এক পুরুষবিধ ভগবান এমন পুরুষবিধ ভগবান যিনি একটি ব্যক্তি নন বরং যিনি একমাত্র আসল ব্যক্তি ও সকল ব্যক্তিসত্ত্বের উৎস — এরকম ভাবনা এর পক্ষে সহজ নয়। কিন্তু দিব্য ব্যক্তিসত্ত্ব সম্বন্ধে এই একমাত্র যথার্থ ও সম্পূর্ণ সত্য।

আমাদের সমন্বয়ে দিব্য ব্যক্তিসত্ত্বের কি স্থান তা পরে ভক্তিযোগের আলোচনায় সম্যক্‌ভাবে বিবেচনা করা হবে, তবে এখানে এইটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে পূর্ণ যোগে এর স্থান আছে এবং মুক্তিলাভের পরও এর স্থান থাকে। কার্যতঃ ব্যক্তিদেবতার দিকে যাবার পথের তিনটি পর্যায় আছে; প্রথমটিতে ভাবা হয় যে আমাদের প্রকৃতি ও ব্যক্তিভাবনা দেবতার যে নাম ও রূপ পছন্দ করে সেই অনুযায়ী দেবতার বিশেষ রূপ বা বিশেষ সব গুণ বর্তমান[১]; দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনিই একমাত্র প্রকৃত ব্যক্তি, সর্ব-ব্যক্তিসত্ত্ব,

[১] ইষ্টদেবতা

অনন্তগুণ; তৃতীয় পর্যায়ে আমরা ফিরে যাই ব্যক্তিসত্ত্ব সম্বন্ধে সকল ভাবনা ও তথ্যের চরম উৎসে অর্থাৎ তার মধ্যে যার নির্দেশ উপনিষদ দেয় কোন বিশেষণ প্রয়োগ না ক'রে একটিমাত্র কথা — "সঃ"র দ্বারা। পুরুষবিধ ও নৈর্ব্যক্তিক ভগবানের সম্বন্ধে আমাদের সকল উপলব্ধিই এখানে মিলিত হয়ে এক হয় একান্ত দেবত্বের মধ্যে। কারণ নৈর্ব্যক্তিক ভগবান তাঁর চূড়ান্ত পাদে কোন আচ্ছিন্ন প্রত্যয় বা শুধু এক তত্ত্ব বা সত্তার শুধু এক অবস্থা বা সামর্থ্য বা মাত্রা নয়, যেমন আমরা নিজেরা বস্তুতঃ এরকম আচ্ছিন্ন প্রত্যয় নই। এইরকম সব প্রত্যয়ের মধ্য দিয়ে ধীশক্তি প্রথম এর দিকে অগ্রসর হয়, কিন্তু উপলব্ধির পরিণতি হল সে সবের অতিক্রমণ। সত্তার উত্তরোত্তর উচ্চ তত্ত্বগুলির ও সচেতন জীবনের উত্তরোত্তর উচ্চ অবস্থাগুলির উপলব্ধির মাধ্যমে আমরা যেখানে উপনীত হই তা কোন একপ্রকার সদর্থক শূন্যের মধ্যে অথবা এমনকি অস্তিত্বের কোন অনির্বচনীয় অবস্থার মধ্যে সব কিছুর বিলোপ নয়; আমরা উপনীত হই বিশ্বাতীত সৎ স্বরূপে যা আবার সদ্‌ব্রহ্ম যিনি ব্যক্তিসত্ত্বের সকল বিবরণের অতীত অথচ সর্বদাই ব্যক্তিসত্ত্বের সারতত্ত্ব।

যখন "তৎ"-এর মধ্যে বাস করি ও আমাদের সত্তাকে লাভ করি, আমরা একে অধিগত করতে সমর্থ হই এর দুই বিভাবে — নৈর্ব্যক্তিককে পাই সত্তা ও চেতনার এক পরম অবস্থায়, আত্মাধিকারী সামর্থ্য ও আনন্দের অনন্ত নৈর্ব্যক্তিকত্বের মধ্যে আর পুরুষবিধকে পাই দিব্য প্রকৃতির দ্বারা যা কাজ করে ব্যষ্টি অন্তঃপুরুষরূপের মধ্য দিয়ে এবং ওটি ও এর যে বিশ্বাতীত ও বিশ্বাত্মক আত্মা — এ দুয়ের মধ্যকার সম্বন্ধের দ্বারা। এমনকি পুরুষবিধ দেবতারও সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন রূপ ও নামের মধ্যে আমাদের সম্বন্ধ রাখা আমাদের পক্ষে সম্ভব; দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি আমাদের কর্ম হয় প্রধানতঃ প্রেমের কর্ম, তাহলে প্রেমের ঈশ্বররূপেই আমরা তাঁকে সেবা ও প্রকাশ করতে চাইব, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সকল নাম ও রূপ ও গুণের মধ্যে তাঁর অখণ্ড উপলব্ধিও পাব আর জগতের প্রতি আমাদের মনোভাবে তাঁর যে সম্মুখভাগ প্রধান তাকেই সমগ্র অনন্ত ভগবান বলে ভুল করব না।

দ্বাদশ অধ্যায়

সচ্চিদানন্দের উপলব্ধি

পূর্ব অধ্যায়ে আমরা "আত্মার বিভিন্ন বিভাব" সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছি তার সম্বন্ধে প্রথম মনে হতে পারে যে এটি উচ্চ ধরনের তত্ত্বজ্ঞানমূলক, আর এমনসব বুদ্ধিগত প্রত্যয় যেগুলি সাধনার উপলব্ধির চেয়ে বরং দার্শনিক বিশ্লেষণের পক্ষে বেশী উপযোগী। কিন্তু এ হল এক মিথ্যা পার্থক্য, আমাদের মানসশক্তির বিভাজনের দ্বারাই এই পার্থক্যের সৃষ্টি। প্রাচীন মনীষার, অর্থাৎ যে প্রাচ্য মনীষার উপর আমরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করছি তার অন্ততঃ এক মৌলিক নীতি এই যে দর্শন যে শুধু এক বুদ্ধিগত আমোদের খেলা বা সূক্ষ্ম তর্কশাস্ত্রের ক্রীড়া অথবা এমনকি তত্ত্বগত সত্যের জন্য এরকম সত্যের অন্বেষণ হবে তা ঠিক নয়, বরং তা হবে সকল সঠিক উপায়ে সর্বসত্তার মূল সত্যগুলির সন্ধান, আর তারপর এইসব সত্য হওয়া উচিত আমাদের আপন জীবনের পথের নির্দেশ। সাংখ্য অর্থাৎ সত্যের আচ্ছিন্ন ও বিশ্লেষণমূলক উপলব্ধি হল জ্ঞানের এক দিক; যোগ অর্থাৎ আমাদের অনুভূতিতে আন্তর অবস্থায় ও বহির্জীবনে এই সত্যের বাস্তব ও সমন্বয়ী উপলব্ধি হল অন্য এক দিক। এই দুইটি উপায়ের সাহায্যেই মানব মিথ্যা ও অবিদ্যা থেকে উদ্ধার পেয়ে বাস করতে সক্ষম হয় সত্যের মধ্যে ও সত্যের দ্বারা। আর যেহেতু প্রতি চিন্তাশীল মানবের লক্ষ্য হওয়া উচিত সেই পরম বস্তু যা সে জানতে পারে অথবা হতে সমর্থ, সেহেতু অন্তঃপুরুষের কর্তব্য হবে মননের দ্বারা সেই পরম সত্য সন্ধান করা ও জীবনের দ্বারা তা সমাধা করা।

এইখানেই জ্ঞানযোগের সেই অংশের সমগ্র গুরুত্ব যা আমরা বর্তমানে বিবেচনা করছি অর্থাৎ সত্তার যেসব মূল তত্ত্বগুলির উপর, আত্ম-অস্তিত্বের যেসব মূল বিভাবগুলির উপর অনপেক্ষ ভগবান তাঁর আত্ম-অভিব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাদের সম্বন্ধে জ্ঞান[১]। যদি আমাদের সত্তার সত্য এই হয় যে এ হল এক অনন্ত ঐক্য ও একমাত্র এর মধ্যেই আছে সম্পূর্ণ ব্যাপ্তি, আলোক, জ্ঞান, সামর্থ্য, আনন্দ এবং আমরা যে অন্ধকার, অজ্ঞানতা, দুর্বলতা, দুঃখ, খণ্ডতার সম্পূর্ণ অধীন তার কারণ যদি এই হয় যে আমরা সৃষ্টিকে দেখি এক অনন্ত সংখ্যক পৃথক পৃথক সত্তার সংঘর্ষরূপে, তাহলে স্পষ্টতঃই সবচেয়ে কার্যোপযোগী ও বাস্তব ও উপকারী অথচ সবচেয়ে উন্নত ও দার্শনিক জ্ঞান হবে এমন উপায় বার করা যার সাহায্যে আমরা প্রমাদ থেকে নিস্তার পেয়ে বাস করতে সমর্থ হই সত্যের মধ্যে। সেইরকম আবার যদি এই একম্ স্বভাবতঃ সেই সব গুণের ক্রিয়ার বন্ধন থেকে মুক্তি হয় যেগুলির দ্বারা আমাদের মনোভূমি গঠিত আর যদি

[১] তত্ত্বজ্ঞান

ঐ ক্রিয়ার অধীনতা থেকেই এই সংঘর্ষ ও বৈষম্য উৎপন্ন হয় যার মধ্যে আমরা বাস করি ও চিরদিন ছটফট করি শুভ ও অশুভ, পাপ ও পুণ্য, তৃপ্তি ও বিফলতা, হর্ষ ও বিষাদ, সুখ ও যন্ত্রণা এই সব দ্বন্দ্বের মধ্যে তাহলে এই সব গুণের অতীতে গিয়ে সে সবের ঊর্ধ্বে যা সর্বদাই অবস্থিত তার দৃঢ় প্রশান্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই একমাত্র কার্যোপযোগী জ্ঞান। নিজেদের সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা, নিজের সঙ্গে ও জীবনের সঙ্গে ও অন্যদের সঙ্গে আমাদের বৈষম্য ও বিবাদ — এই সবের কারণ যদি হয় ক্ষর ব্যক্তিভাবনার প্রতি আসক্তি, আর যদি এমন এক নৈর্ব্যক্তিক একম্ থাকে যার মধ্যে এরকম কোন বৈষম্য, অজ্ঞানতা, নিরর্থক ও কোলাহলময় চেষ্টা থাকে না, কারণ তা হল নিজের সঙ্গে চিরন্তন তাদাত্ম্য ও সামঞ্জস্যে অবস্থিত তাহলে আমাদের অন্তঃপুরুষের মধ্যে সত্তার সেই নৈর্ব্যক্তিকত্ব ও অক্ষুব্ধ একত্ব লাভই হবে মানবের সাধনার একমাত্র পন্থা ও উদ্দেশ্য আর একেই আমাদের যুক্তিবুদ্ধি কার্যোপযোগিতার নাম দিতে সম্মত হতে পারে।

প্রকৃতির সকল সম্বন্ধের সত্যকার সূত্র ও রহস্যের জন্য মন ও দেহের মাধ্যমে প্রকৃতির চিরন্তন অন্বেষণে তার যে সংঘর্ষ ও উচ্ছ্বাস তাদের ঊর্ধ্বে আমাদের উত্তোলন করে এমন এক ঐক্য, নৈর্ব্যক্তিকত্ব ও বিভিন্ন গুণের ক্রিয়া থেকে মুক্তি বিদ্যমান। আর মানবজাতির প্রাচীন ও সর্বশ্রেষ্ঠ অনুভূতি হল যে একমাত্র ঐখানেই উপনীত হয়ে, একমাত্র নিজেকে নৈর্ব্যক্তিক, এক, শান্ত, আত্মসমাহিত ক'রে, মানসিক ও প্রাণিক জীবন অপেক্ষা চিরন্তন মহত্তর তত্ত্বের মধ্যে ঐ জীবন অপেক্ষা মহত্তর হয়ে অর্জন করা যায় এক স্বপ্রতিষ্ঠ এবং সেহেতু দৃঢ় প্রশান্তি ও আভ্যন্তরীণ মুক্তি। সুতরাং এই হল জ্ঞানযোগের প্রথম উদ্দেশ্য, এক অর্থে বিশিষ্ট ও মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু একথা আমরা আগেই জোর দিয়ে বলেছি যে এটি প্রথম হলেও সমগ্র উদ্দেশ্য নয়; এটি মূল উদ্দেশ্য হতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য নয়। জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না যদি এ শুধু দেখায় কেমন করে যাওয়া যায় বিভিন্ন সম্বন্ধ থেকে সকল সম্বন্ধের অতীতে, ব্যক্তিভাবনা থেকে নৈর্ব্যক্তিকত্বে, বহুত্ব থেকে অলক্ষণ ঐক্যে। আমাদের কাছে এর আরো দেওয়া দরকার — বিভিন্ন সম্বন্ধের সমগ্র লীলার, বহুত্বের সমগ্র বৈচিত্র্যের, বিভিন্ন ব্যক্তিভাবনার সমগ্র সংঘর্ষ ও প্রতিক্রিয়ার সেই সূত্র, সেই রহস্য যার জন্য বিশ্বজীবন অন্বেষণে তৎপর। আর জ্ঞান তখনো অসম্পূর্ণ রয়ে যায় যদি এ দেয় শুধু ভাবনা, আর অক্ষম হয় অনুভূতিতে তার সত্যতা নির্ধারণ করতে; আমরা যে সন্ধানসূত্র চাই, রহস্য চাই তা এই জন্য যে আমরা যেন প্রাতিভাসিককে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি এ যার প্রতিরূপ সেই সদ্‌বস্তু দিয়ে, এর সব বৈষম্যকে নিরাময় করতে পারি তাদের পশ্চাতে অবস্থিত সামঞ্জস্য ও মিলনের গূঢ় তত্ত্বের দ্বারা, আর উপনীত হই জগতের মিলনেচ্ছু ও বিভেদেচ্ছু প্রচেষ্টা থেকে এর সার্থকতার সৌষম্যে। জগতের হৃদয়ের যে আকৃতি এবং একে পূর্ণ ও কার্যকরী আত্মজ্ঞানের যা দেওয়া আবশ্যক তা শুধু প্রশান্তি নয়, তা সার্থকতা; প্রশান্তি শুধু হতে পারে আত্মসার্থকতার শাশ্বত অবলম্বন, অনন্ত অবস্থা, স্বাভাবিক আবহাওয়া।

উপরন্তু যে জ্ঞান বহুত্বের, ব্যক্তিভাবনার, গুণের বিভিন্ন সম্বন্ধের লীলার প্রকৃত

চেতনা বাস্তবিকই মানসিক চেতনা অপেক্ষা নিম্নতর বা আরো সীমিত প্রকার নয়, বরং বিপরীত পক্ষে অনেক নিষ্প্রাণ রূপের মধ্যে এ হল আরো প্রখর, দ্রুত, তীব্র যদিও উপরদিকে কম বিকশিত। কিন্তু চিৎ-এর তুলনায়, এও অর্থাৎ প্রাণিক ও জড়প্রকৃতির এই চেতনা এক নিম্নতর এবং সেহেতু সীমিত রূপ, প্রকার ও গতিবৃত্তি। এই নিম্নপ্রকার বা বিভাবগুলি একই অবিভাজ্য অস্তিত্বের অবর স্তরের চিৎ-সত্ত্ব। আমাদের মধ্যেও আমাদের অবচেতন সত্তার মধ্যে এমন এক ক্রিয়া আছে যা ঠিক "নিষ্প্রাণ" জড়প্রকৃতিরই ক্রিয়া যা থেকে আমাদের শারীর সত্তার ভিত্তি গঠিত হয়েছে, আর এক ক্রিয়া আছে যা উদ্ভিদজীবনের ক্রিয়া এবং অন্য একটি ক্রিয়া আছে যা আমাদের চারিদিককার নিম্ন পশুজগতের ক্রিয়া। এই সবের উপর আমাদের মধ্যস্থ চিন্তাশীল যুক্তিশীল চেতনসত্তার প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ এত বেশী যে এই সব নিম্ন স্তর সম্বন্ধে আমাদের কোন সত্যকার সংবিৎ নেই; আমাদের এই সব অংশ যে কি করছে তা আমরা তাদের নিজস্ব ভাবে জানতে অক্ষম, আমরা তাদের ক্রিয়াকে নিই অতি অপূর্ণভাবে, চিন্তাশীল যুক্তিশীল মনের সংজ্ঞায় ও মূল্যে। তবু আমরা বেশ ভালোভাবেই জানি যে আমাদের মধ্যে যেমন পরিচিত মানবসত্তা আছে, তেমন পশুও আছে — সচেতন সহজপ্রবৃত্তি ও সংবেগের অধীন এবং চিন্তাশীল বা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন নয়, এমন কিছু আছে, আবার তা-ও আছে যা মননে ও সঙ্কল্পে নিজের অভিজ্ঞতার দিকে ফিরে উপর থেকে এর সঙ্গে মিলিত হয় উচ্চতর স্তরের আলো ও শক্তি নিয়ে এবং কিছু মাত্রায় একে নিয়ন্ত্রণ, ব্যবহার ও পরিবর্তন করে। কিন্তু মানবের মধ্যে পশু তো শুধু আমাদের অবমানবীয় সত্তার শীর্ষ; এর নিম্নে অনেক কিছু আছে যা পশুর নিম্নস্তরের, শুধু প্রাণিক মাত্র, অনেক কিছু যা কাজ করে এমন সহজপ্রবৃত্তি ও সংবেগের বশে যার গঠনকারী চেতনা উপরিভাগ থেকে নিবৃত্ত হয়েছে। এই অবপাশবিক সত্তার নিম্নে আরো গভীরে আছে অবপ্রাণিক। যোগে যে অতিপ্রাকৃত আত্মজ্ঞান ও অনুভূতি পাওয়া যায় তার মধ্যে যখন আমরা অগ্রসর হই তখন আমরা অবগত হই যে দেহেরও নিজস্ব এক চেতনা আছে; এর বিভিন্ন অভ্যাস, সংবেগ, সহজাত প্রবৃত্তি আছে, আর আছে এমন এক নিঃসাড় অথচ কার্যকরী সঙ্কল্প যা আমাদের সত্তার বাকী অংশ থেকে বিভিন্ন এবং একে বাধা দিতে ও এর কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ। আমাদের সত্তার মধ্যে সংঘর্ষের বেশীর ভাগেরই কারণ এই মিশ্র জীবন এবং পরস্পরের উপর এই সব বিভিন্ন ও বিষম স্তরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। কারণ এখানে মানব এক বিবর্তনের পরিণাম আর সে নিজের মধ্যে ঐ বিবর্তনের সব কিছু ধারণ করে — যা শুধু শারীরিক ও অবপ্রাণিক সচেতন সত্তা তা থেকে আরম্ভ ক'রে এখন শীর্ষে যা সে সেই মনোময় জীব পর্যন্ত।

কিন্তু বস্তুতঃ এই বিবর্তন এক অভিব্যক্তি, এবং যেমন আমাদের মধ্যে এই সব অবসাধারণ আত্মা ও অবমানবীয় স্তর আছে, ঠিক তেমনই আমাদের মধ্যে আমাদের মনোময় সত্তার উর্ধ্বে আছে অতিপ্রাকৃত ও অতিমানবীয় বিভিন্ন স্তর। অস্তিত্বের বিশ্বাত্মক চিৎ-সত্ত্ব হিসেবে চিৎ যেখানে অন্যান্য স্থিতি গ্রহণ করে, আর বিচরণ করে

অন্যবিধ বিভাবে, অন্যবিধ নীতি অনুযায়ী এবং ক্রিয়ার অন্যবিধ শক্তির দ্বারা। যেমন প্রাচীন বৈদিক ঋষিরা উপলব্ধি করেছিলেন, মনের ঊর্ধ্বে আছে এক সত্যলোক অর্থাৎ এক আত্মদীপ্ত, আত্মকার্যকরী ভাবনালোক যাকে আমাদের মন, যুক্তিবুদ্ধি, বিভিন্ন সূক্ষ্মভাব, সংবেগ, ইন্দ্রিয়সংবিৎ-এর উপর আলোক ও শক্তিতে প্রয়োগ করা সম্ভব এবং যা এদের ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বিষয়সমূহের আসল সত্যের অর্থে, ঠিক যেমন আমরা আমাদের মানসিক যুক্তিবুদ্ধি ও সঙ্কল্প প্রয়োগ করি আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও পশুপ্রকৃতির উপর যাতে আমরা সে সবকে ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হই আমাদের বিচারবুদ্ধিসম্মত ও নৈতিক বোধের অর্থে। সেখানে কোন অন্বেষণ থাকে না, যা থাকে তা বরং স্বাভাবিক অধিকার; সঙ্কল্প ও যুক্তিবুদ্ধির মধ্যে, সহজাতপ্রবৃত্তি ও সংবেগের মধ্যে, কামনা ও অনুভূতির মধ্যে, ভাবনা ও সৎ-এর মধ্যে কোন সংঘর্ষ বা বিচ্ছিন্নতা থাকে না; বরং সকল কিছুই সামঞ্জস্যপূর্ণ, সহচারী, পরস্পরের মধ্যে ফলপ্রসূ, আর তাদের উৎপত্তিতে, তাদের বিকাশে ও তাদের কার্যকারিতায় একীভূত। কিন্তু এই লোকের অতীতে এবং এর মধ্য দিয়ে পাওয়া যায় এমন অন্য বিভিন্ন লোক আছে যেগুলিতে এই চিৎ নিজেই প্রকট হয় — এই যেসব বিচিত্র চেতনা এখানে ব্যবহৃত হয় নানাবিধ রূপায়ণ ও অভিজ্ঞতার জন্য তার মূল প্রভব ও আদ্য সম্পূর্ণতা হল এই চিৎ। সেখানে জ্ঞান ও সঙ্কল্প ও ইন্দ্রিয়সংবিৎ ও আমাদের বিভিন্ন বৃত্তির, সামর্থ্যের, অনুভূতির প্রকারের বাকী সব শুধু যে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সহচারী, একীভূত তা নয়, সেসব চেতনার এক সত্তা ও চেতনার এক সামর্থ্য। এই চিৎ নিজেকে এমন পরিবর্তিত করে যে সে সত্যলোকে হয়ে ওঠে অতিমানস, মনোলোকে মানসিক যুক্তিবুদ্ধি, সঙ্কল্প, ভাবাবেগ, ইন্দ্রিয়সংবিৎ, এবং অবর লোকসমূহে বিভিন্ন প্রাণিক বা শারীরিক সহজাতপ্রবৃত্তি, সংবেগ, তমসাচ্ছন্ন শক্তির অভ্যাসসমূহ, যে শক্তি বাহ্যত নিজেকে সচেতন অধিকারে পায়নি। সবই চিৎ কারণ সবই সৎ; সবই এক আদি চেতনার নানাবিধ গতিবৃত্তি, কেননা সবই এক আদি সত্তার নানাবিধ গতিবৃত্তি।

যখন আমরা চিৎ-কে খুঁজে পাই, দেখি বা জানি, তখন আমরা এও দেখি যে এর স্বরূপ, — আনন্দ অর্থাৎ আত্ম-অস্তিত্বের আনন্দ। আত্মাকে অধিগত করার অর্থ আত্ম-আনন্দ অধিগত করা; আত্মাকে না অধিগত করার অর্থ অস্তিত্বের আনন্দের জন্য অল্পবিস্তর অজ্ঞানময় অন্বেষণের মধ্যে থাকা। চিৎ শাশ্বতকাল এর আত্ম-আনন্দের অধিকারী; আর যেহেতু চিৎ, সত্তার বিশ্বব্যাপী চিৎ-সত্ত্ব, সেহেতু চিন্ময় বিরাট পুরুষও চিন্ময় আত্ম-আনন্দের অধিকারী, অস্তিত্বের বিশ্বব্যাপী আনন্দের প্রভু। ভগবান যেভাবেই নিজেকে অভিব্যক্ত করুন — সর্বগুণের মধ্যে অথবা নির্গুণের মধ্যে, ব্যক্তিরূপের মধ্যে অথবা নৈর্ব্যক্তিকত্বের মধ্যে, বহুশোষক একের মধ্যে অথবা স্বরূপগত বহুত্ব প্রকাশমান একের মধ্যে — তিনি সর্বদাই আত্ম-আনন্দ ও সর্ব-আনন্দের অধিকারী কারণ এ হল সর্বদাই সচ্চিদানন্দ। আমাদের পক্ষেও, স্বরূপগত ও সর্বগতের মধ্যে আমাদের প্রকৃত আত্মাকে জানা ও অধিগত করার অর্থ অস্তিত্বের স্বরূপগত ও বিশ্বব্যাপী আনন্দ, আত্ম-

আনন্দ ও সর্ব-আনন্দ উপলব্ধি করা। কারণ সর্বগত শুধু স্বরূপগত সৎ, চিৎ ও আনন্দের বহির্বর্ষণ; এবং যেখানেই ও যে রূপেই এটি অস্তিত্ব হিসেবে অভিব্যক্ত হয় সেখানে স্বরূপগত চেতনা থাকতে বাধ্য আর সুতরাং স্বরূপগত আনন্দও থাকতে বাধ্য।

ব্যষ্টিপুরুষ তার নিজের এই সত্যকার প্রকৃতির অধিকারী নয় অথবা তার অভিজ্ঞতার এই সত্যকার প্রকৃতি উপলব্ধি করে না কারণ এটি স্বরূপগত ও সর্বগত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিজেকে এক করে পৃথক পৃথক উৎপাতের সঙ্গে, গৌণ রূপ ও প্রকারের সঙ্গে এবং পৃথক বিভাব ও বাহনের সঙ্গে। এইভাবে এটি তার মন, দেহ ও প্রাণধারাকে নিজের মূল আত্মা বলে গ্রহণ করে। সে এসবকে তাদের নিজেদের হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করে সর্বগতের বিরুদ্ধে এবং সর্বগত যার অভিব্যক্তি তারও বিরুদ্ধে। ব্যষ্টি ও সর্বগত অপেক্ষা মহত্তর ও এদের অতীত কিছুর জন্য নিজেকে সর্বগতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ও সার্থক করার চেষ্টা করা সঙ্গত কিন্তু সর্বগতের বিরুদ্ধে সর্বগতের এক আংশিক বিভাবের নির্দেশ অনুযায়ী সেরকম করার চেষ্টা অসঙ্গত। এই আংশিক বিভাবকে বা আরো সঠিকভাবে বিভিন্ন আংশিক অনুভূতির সমষ্টিকে এ একত্র করে মানসিক অনুভূতির এক কৃত্রিম কেন্দ্রের চারিদিকে অর্থাৎ মানসিক অহং-এর চারিদিকে আর একেই সে নিজ ব'লে জানে, এই অহংকেই সে সেবা করে; আর সেই যে মহত্তর ও অতীত কিছু যার আংশিক অভিব্যক্তি সকল বিভাবগুলি, এমনকি সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত ও সর্বাপেক্ষা ব্যাপক বিভাবও যার আংশিক অভিব্যক্তি তার জন্য সে জীবনধারণ না ক'রে, জীবনধারণ করে অহং-এর জন্য। এই জীবনযাত্রা মিথ্যা আত্মার মধ্যে, আসল আত্মার মধ্যে নয়; এই জীবনযাত্রা অহং-এর জন্য, অহং-এর নির্দেশ অনুযায়ী, ভগবানের জন্য নয়, ভগবানের নির্দেশ অনুযায়ী নয়। এই পতন কিভাবে ঘটেছে, আর কি উদ্দেশ্যেই এটি করা হয়েছে — এই প্রশ্ন যোগের এলাকার চেয়ে বরং সাংখ্যের এলাকারই অন্তর্গত। আমাদের এই কাজের কথাটি হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে এই আত্মবিভাজনের ফলেই এই আত্ম-সীমাবদ্ধতা এসেছে যার দ্বারা আমরা সত্তা ও অনুভূতির আসল প্রকৃতি অধিগত করতে অক্ষম হয়েছি এবং সেজন্য আমরা আমাদের মনে, প্রাণে ও দেহে অবিদ্যা, অসামর্থ্য ও কষ্টভোগের অধীন। ঐক্যের অপ্রাপ্তিই মূল কারণ; ঐক্য ফিরে পাওয়াই প্রকৃষ্ট পন্থা আর এই ঐক্য হবে সর্বগতের সঙ্গে এবং সর্বগত যাকে প্রকাশ করার জন্য এখানে উপস্থিত তার সঙ্গে। আমাদের উপলব্ধি করা চাই আমাদের নিজেদের ও সকলের প্রকৃত আত্মাকে; আর প্রকৃত আত্মাকে উপলব্ধি করার অর্থ সচ্চিদানন্দকে উপলব্ধি করা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মনোময় পুরুষের অসুবিধা

জ্ঞানমার্গের আলোচনায় যে পর্যায়ে আমরা এসে পৌঁছেছি তা এই: আমরা শুরু করেছিলাম এই বলে যে মন, প্রাণ ও দেহ, — এই তিন সংজ্ঞার ঊর্ধ্বে আমাদের যে শুদ্ধ আত্মা, শুদ্ধ সন্মাত্র তা উপলব্ধি করাই এই যোগের প্রথম উদ্দেশ্য, কিন্তু এখন আমরা বলব যে এটি পর্যাপ্ত নয়, আমাদের আরো কর্তব্য আত্মাকে বা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা তাঁর বিভিন্ন মূল বিভাবে এবং প্রধানতঃ সচ্চিদানন্দ হিসেবে তাঁর ত্রয়াত্মক সত্যতায়। আত্মার সত্যতা ও ব্রহ্মের স্বরূপ যে শুধু শুদ্ধ সন্মাত্র তা নয়, এর সত্তার ও চেতনার শুদ্ধ চেতনা ও শুদ্ধ আনন্দও আত্মার সত্যতা ও ব্রহ্মের স্বরূপ।

তাছাড়া, আত্মা বা সচ্চিদানন্দের উপলব্ধি দুই প্রকারের। একটি হল এমন নীরব, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, আত্মমগ্ন, স্বয়ং-পূর্ণ সৎ, চিৎ ও আনন্দের উপলব্ধি যা এক, নৈর্ব্যক্তিক, বিভিন্ন গুণের ক্রিয়ারহিত, বিশ্বের অনন্ত দৃশ্যরূপ থেকে বিমুখ অথবা একে দেখে উপেক্ষার সঙ্গে, তাতে কোন অংশ না নিয়ে। আর একটি হল সেই একই সৎ, চিৎ ও আনন্দের উপলব্ধি যা নিরঙ্কুশ, মুক্ত, বিষয়সমূহের প্রভু, অবিচ্ছেদ্য শান্তির মধ্য থেকে সক্রিয়, যা নিজেকে বাইরে ঢেলে দিচ্ছে চিরন্তন আত্ম-একাগ্রতার মধ্য থেকে অনন্ত ক্রিয়ার ও গুণে, যিনি এক পরম ব্যক্তি হয়েও এক বিশাল সম নৈর্ব্যক্তিকত্বের ভিতর ব্যক্তিসত্ত্বের এই সকল খেলা নিজের মধ্যে ধারণ করেন, বিশ্বের এই অনন্ত দৃশ্যরূপ অধিগত করেন নিরাসক্ত হয়ে তবে অবিচ্ছেদ্যভাবে আলাদা না হয়ে, দিব্য ঈশনার সঙ্গে এবং তাঁর শাশ্বত জ্যোতির্ময় আত্ম-আনন্দের অগণিত বিকিরণের সঙ্গে — এক অভিব্যক্তি হিসেবে যা তিনি ধারণ করেন কিন্তু যার দ্বারা তিনি ধৃত হন না, যা তিনি শাসন করেন স্বাধীনভাবে এবং সেজন্য যার দ্বারা তিনি বদ্ধ হন না। ইনি ধর্মের পুরুষবিধ ভগবান নন অথবা দার্শনিকদের সগুণ ব্রহ্ম নন, তবে এমন কিছু যার মধ্যে পুরুষবিধ ও নৈর্ব্যক্তিকত্বের, গুণ ও নির্গুণের সমন্বয় সাধিত হয়। ইনিই বিশ্বাতীত যিনি তাদের উভয়কেই অধিগত করেন তাঁর সত্তার মধ্যে আবার তাদের উভয়কেই প্রয়োগ করেন তাঁর অভিব্যক্তির বিভিন্ন বিভাব হিসেবে। অতএব এই হল পূর্ণযোগের সাধকের উপলব্ধির বিষয়।

এখনই বোঝা যায় যে এই দৃষ্টিকোণ থেকে, আমরা মন, প্রাণ ও দেহ থেকে সরে এসে যে শুদ্ধ শান্ত আত্মার উপলব্ধি লাভ করি তা শুধু আমাদের পক্ষে এই মহত্তর উপলব্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তি অর্জন। সুতরাং ঐ সাধনপন্থাই আমাদের যোগের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়; আরো কিছু প্রয়োজন যা আরো ব্যাপকভাবে সদর্থক। এই যা সব আমাদের আপতিক আত্মা এবং এর অধিষ্ঠান বিশ্বের সকল দৃশ্যরূপ সে সব থেকে যেমন

আমরা সরে এসে প্রবেশ করেছিলাম স্বপ্রতিষ্ঠ আত্মচেতন ব্রহ্মের মধ্যে, তেমন এখন আমাদের দরকার মন, প্রাণ ও দেহকে ফিরে পাওয়া ব্রহ্মের সর্বগ্রাহী আত্মসত্তা, আত্মচেতনা ও আত্ম-আনন্দের সঙ্গে। জগৎ-লীলার অনধীন হয়ে শুধু শুদ্ধ আত্মসত্তা লাভ করাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়, সকল সত্তাকেই আমাদের লাভ করা চাই আমাদের আপন সত্তা বলে; আমরা যে দেশকালগত সকল পরিবর্তনের অতীত এক অনন্ত অহং-শূন্য চেতনা — শুধু এই জানলে চলবে না, দেশ ও কালের মধ্যে চেতনার ও এর সৃজনশীল শক্তির সকল বহির্বর্ষণের সঙ্গেও আমাদের এক হওয়া চাই; শুধু অতলস্পর্শী প্রশান্তি ও অক্ষুব্ধতার সামর্থ্য পাওয়াই যথেষ্ট নয়, বিশ্বজনীন বিষয়সমূহেও স্বচ্ছন্দ ও অনন্ত আনন্দেরও সামর্থ্য লাভ প্রয়োজন। কারণ, তাই সচ্চিদানন্দ, তাই ব্রহ্ম হলেন তা, কেবল শুদ্ধ শান্তি নয়।

যদি আমরা সহজেই অতিমানসিক লোকে নিজেদের উন্নীত করতে এবং সেখানে দৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত হয়ে জগৎ ও সত্তাকে, চেতনা ও ক্রিয়াকে, সচেতন অনুভূতির বহির্গমন ও অন্তঃপ্রবেশকে দিব্য করণসমূহের সামর্থ্যের দ্বারা তদনুযায়ী উপলব্ধি করতে সমর্থ হতাম, তাহলে এই উপলব্ধিতে কোন মূলগত বাধা আসত না। কিন্তু মানব মনোময় পুরুষ, এখনো অতিমানসিক পুরুষ নয়। সুতরাং জ্ঞানের সাধনা ও নিজের সত্তার উপলব্ধি — এই কাজ তার করা চাই মনের দ্বারা আর অতিমানসিক সব লোক থেকে তার যা সাহায্য পাওয়া সম্ভব তাই দিয়ে। বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা যে সত্তা উপলব্ধি করি তার এই যে বৈশিষ্ট্য, সুতরাং আমাদের যোগের এই যে বৈশিষ্ট্য তা আমাদের উপর এমন কতকগুলি সীমাবদ্ধতা ও প্রাথমিক বাধা চাপিয়ে দেয় যা অতিক্রম করা যায় একমাত্র দিব্য সাহায্যের দ্বারা অথবা কঠোর সাধনার দ্বারা এবং বস্তুতঃ একমাত্র এই দুইটি সহায়ের মিলিত শক্তিতে। পূর্ণজ্ঞানের, পূর্ণ উপলব্ধির, পূর্ণ হওয়ার পথে এই সব বাধাগুলি আমাদের প্রথম সংক্ষেপে বলা দরকার, তবে যদি আমরা আরো অগ্রসর হতে সমর্থ হই।

বস্তুতঃ আমাদের অস্তিত্বের বিন্যাসে উপলব্ধ মানসিক সত্তা ও উপলব্ধ আধ্যাত্মিক সত্তা, — দুই ভিন্ন লোক; একটি উৎকৃষ্ট ও দিব্য, অন্যটি অপকৃষ্ট ও মানবীয়। প্রথমটিতে আছে অনন্ত সত্তা, অনন্ত চেতনা ও সঙ্কল্প, অনন্ত আনন্দ এবং অতিমানসের অনন্ত ব্যাপক ও স্বয়ং-ফলপ্রসূ জ্ঞান অর্থাৎ চারটি দিব্যতত্ত্ব; অন্যটিতে আছে মানসিক সত্তা, প্রাণিক সত্তা ও শারীরিক সত্তা — তিনটি মানবীয় তত্ত্ব। এদের আপাতপ্রতীয়মান প্রকৃতিতে এই দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ; প্রত্যেকটি অপরটির বিপরীত। দিব্য তত্ত্ব অনন্ত ও অমর সত্তা; মানবীয় তত্ত্ব হল কাল, ক্ষেত্র ও রূপে সীমাবদ্ধ জীবন, এমন জীবন যা মৃত্যু তবে এই মৃত্যু চেষ্টারত সেই জীবন হবার জন্য যা অমরত্ব। দিব্য তত্ত্ব অনন্ত চেতনা যা এর অন্তর্গত নিজের সব অভিব্যক্তি অতিক্রম ক'রে এবং তাদের আলিঙ্গন ক'রে অবস্থিত; মানবীয় তত্ত্ব এমন চেতনা যাকে অচিতির সুপ্তি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, যা তার ব্যবহার করা করণগুলির অধীন, দেহ ও অহং দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং অন্যান্য সব চেতনা, দেহ এবং অহং-এর সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ অন্বেষণে যত্নবান আর এটি সে করে

সদর্থকভাবে মিলনসাধক সংযোগ ও সমবেদনার বিবিধ উপায়ে এবং নঞর্থকভাবে বৈরীভাবাপন্ন সংযোগ ও বিদ্বেষের বিবিধ উপায়ে। দিব্য তত্ত্ব, — অবিচ্ছেদ্য আত্ম-আনন্দ ও অভঞ্জনীয় সর্ব-আনন্দ; মানবীয় তত্ত্ব, — মন ও দেহের ইন্দ্রিয়সংবিৎ যা আনন্দের অন্বেষণ করে কিন্তু পায় শুধু সুখ, উপেক্ষা ও যন্ত্রণা। দিব্যতত্ত্ব সর্বব্যাপক অতিমানসিক জ্ঞান ও সর্বসাধক অতিমানসিক সঙ্কল্প; মানবীয় তত্ত্ব এমন এক অজ্ঞানতা যা জ্ঞানের চেষ্টা করে বিষয়সমূহের বিভিন্ন খণ্ড ও অংশের ধারণা থেকে, তবে এসবকে তার একত্র যোগ করতে হয় আনাড়ির মতো; এ হল এক অসামর্থ্য তবে ক্রমে ক্রমে জ্ঞান বিস্তারের মতো ক্রমে ক্রমে সামর্থ্য বিস্তারের মাধ্যমে শক্তি ও সঙ্কল্প অর্জন করতে চেষ্টা করে; আর এই বিস্তারসাধন করার একমাত্র উপায় হল এর জ্ঞানের আংশিক ও বিভক্ত পদ্ধতির অনুরূপভাবে সঙ্কল্পের আংশিক ও বিভক্ত প্রয়োগ। দিব্যতত্ত্ব নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ঐক্যের উপর এবং বিষয়সমূহের বিভিন্ন অতিস্থিতির ও সমগ্রতার ঈশ্বর হিসেবে; মানবীয় তত্ত্ব নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে বিভক্ত বহুত্বের উপর এবং এমনকি যখন তা তাদের বিভাজন ও বিভিন্ন অংশের এবং তাদের জোড়া লাগানোর ও এক করার সব দুরূহ ক্রিয়ার প্রভু, তখনো তা সেসবের অধীন। মানবের কাছে এই দুটির মধ্যে এক আবরণ ও ঢাকনি থাকে যার দরুন মানব যে শুধু দিব্যতত্ত্ব লাভে অসমর্থ হয় তা নয়, এমনকি তা জানতেও অসমর্থ হয়।

সুতরাং যখন মনোময় পুরুষ সাধনা করে দিব্যতত্ত্ব জানতে, তা উপলব্ধি করতে ও তা হতে, তার প্রথম কাজ হল এই ঢাকনি তোলা, এই আবরণ সরিয়ে দেওয়া। কিন্তু ঐ দুরূহ ব্রতে যখন সে সফল হয় সে দেখে যে দিব্যতত্ত্ব এমন কিছু যা তার চেয়ে মহত্তর, দূরবর্তী উচ্চ এবং মানসিক, প্রাণিক, এমনকি শারীরিকভাবেও তার ঊর্ধ্বে; এর দিকে সে ঊর্ধ্বে তাকায় নিজের দীন অবস্থা থেকে, আর যদি আদৌ সম্ভব হয় এতে তার আরোহণ করা চাই অথবা যদি সম্ভব না হয় একে নিম্নে আবাহন করা তার দরকার আর দরকার এর অধীন হয়ে আরাধনা করা। সে দিব্যতত্ত্বকে দেখে সত্তার এক মহত্তর লোক রূপে, এবং পরে তার নিজের প্রত্যয় বা উপলব্ধির প্রকৃতি অনুযায়ী সে দেখে এটি অস্তিত্বের এক পরম অবস্থা, এক স্বর্গ অথবা এক সৎ বা নির্বাণ। অথবা সে দেখে যে সে নিজে যা তা থেকে, অন্ততঃ বর্তমানে সে নিজে যা তা থেকে এটি ভিন্ন এক পরম সত্তা, আর তারপর আবার সেই সত্তার কোন দিক বা বিভাব সম্বন্ধে তার নিজের প্রত্যয় বা উপলব্ধি তার দর্শন বা অবধারণ অনুযায়ী সে তাকে কোন না কোন নামে ভগবান ব'লে ডাকে এবং মনে করে ভগবান হয় পুরুষবিধ বা নৈর্ব্যক্তিক, সগুণ অথবা নির্গুণ, নীরব ও উদাসীন সামর্থ্য অথবা সক্রিয় প্রভু ও সাহায্যদাতা। আর না হয় একে সে দেখে এক পরম সদ্বস্তুরূপে যার এক প্রতিফলন তার নিজের অপূর্ণ সত্তা অথবা যা থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং তারপর সর্বদাই তার নিজের প্রত্যয় বা উপলব্ধি অনুযায়ী এর নাম দেয় আত্মা বা ব্রহ্ম এবং এর সম্বন্ধে নানাবিধ বিশেষণ প্রয়োগ করে — সৎ, অসৎ, তাও, শূন্য, শক্তি, অজ্ঞেয়।

সুতরাং আমরা যদি মনের দ্বারা চেষ্টা করি সচ্চিদানন্দকে উপলব্ধি করতে, তাহলে

প্রথম এই বাধা আসা সম্ভব যে আমরা একে দেখব এমন কিছু ব'লে যা উর্ধ্বে, অতীতে এমনকি এক অর্থে চারিদিকে অবস্থিত কিন্তু সেই সত্তা ও আমাদের সত্তার মধ্যে এক ব্যবধান বিদ্যমান, — এমন এক গহ্বর যার উপর কোন সেতু রচিত হয়নি, এমনকি কোন সেতু রচনা সম্ভবও নয়। সেখানে আছে এই অনন্ত অস্তিত্ব; কিন্তু যে মনোময় পুরুষ একে জানতে পারে তা থেকে এ হল সম্পূর্ণ ভিন্ন, আর আমাদের সত্তা ও জগৎ-সত্তা সম্বন্ধে আমাদের আপন অনুভূতি যাতে তার আনন্দময় আনন্ত্যের অনুভূতি হতে পারে তার জন্য আমরা যে তার কাছে নিজেদের তুলে তা হব অথবা তাকে আমাদের কাছে নামিয়ে আনব তা সম্ভব হয় না। সেখানে আছে এই মহৎ সীমাহীন নিরুপাধি চেতনা ও শক্তি; কিন্তু আমাদের চেতনা ও শক্তি তা থেকে পৃথকভাবে বিদ্যমান, এমনকি তার মধ্যে থাকলেও এ হল পৃথক, সঙ্কীর্ণ, ক্ষুদ্র, অবসন্ন, নিজের প্রতি ও জগতের প্রতি বিতৃষ্ণ, কিন্তু এ যে পরতর বিষয় দেখেছে তার অংশগ্রহণে অসমর্থ। সেখানে আছে এই অমেয় অনাবিল আনন্দ; কিন্তু আমাদের আপন সত্তা থেকে যায় এর দিব্য আনন্দগ্রহণে অসমর্থ — সুখ, দুঃখ ও নিস্তেজ নিষ্ক্রিয় ইন্দ্রিয়সংবিৎ-এর অবর প্রকৃতির ক্রীড়া হিসেবে। সেখানে আছে এই পূর্ণ জ্ঞান ও সঙ্কল্প; কিন্তু আমাদের আপন জ্ঞান ও সঙ্কল্প সর্বদাই থেকে যায় সেই মানসিক বিকৃত জ্ঞান ও পঙ্গু সঙ্কল্প যা ভগবানের ঐ প্রকৃতির অংশগ্রহণে তার সঙ্গে একতান হতে অসমর্থ। আর না হয় যতক্ষণ আমরা কেবল সেই দর্শনের আনন্দবিভোর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকি, ততক্ষণ আমরা নিজেদের থেকে মুক্তি পাই; কিন্তু যে মুহূর্তে আমরা আবার আমাদের আপন সত্তার উপর আমাদের চেতনা ফেরাই, আমরা তা থেকে বিচ্যুত হই আর এটি হয় অন্তর্ধান করে, নয় দূরে সরে গিয়ে অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। ভগবান আমাদের ছেড়ে চলে যান; দর্শন তিরোহিত হয়; আবার আমরা ফিরে আসি আমাদের মর্ত্য জীবনের তুচ্ছতার মধ্যে।

যে কোন প্রকারে, এই বিভাজনী গহ্বরের উপর সেতুবন্ধন আবশ্যক। আর এই বিষয়ে মনোময় পুরুষের পক্ষে দুইটি সম্ভাবনা থাকে। একটি সম্ভাবনা হ'ল, — এক মহান্ দীর্ঘস্থায়ী, একাগ্র, সকলভোলা প্রয়াসের দ্বারা নিজের মধ্য থেকে পরমের মধ্যে তার উত্তরণ; কিন্তু এই প্রয়াসে মন বাধ্য হয় তার নিজের চেতনা ছেড়ে অন্য একটি চেতনার মধ্যে অন্তর্হিত হতে এবং সাময়িকভাবে অথবা চিরদিনের মতো নিজেকে সম্পূর্ণ ধ্বংস না করলেও হারিয়ে ফেলতে। একে যেতে হয় সমাধির তন্ময় অবস্থায়। সেজন্য রাজযোগে ও অন্যান্য যোগপ্রণালীতে এই সমাধি বা যৌগিক তন্ময়-অবস্থার উপর এক অতীব গুরুত্ব দেওয়া হয়, কারণ এর মধ্যে মন শুধু যে তার সাধারণ আগ্রহের বিষয় ও কাজকর্ম থেকে নিবৃত্ত হয় তা নয়, এ প্রথম নিবৃত্ত হয় বাহ্য ক্রিয়া ও বোধ ও সত্তার সকল চেতনা থেকে এবং পরে নিবৃত্ত হয় বিভিন্ন আন্তর মানসিক ক্রিয়ার সকল চেতনা থেকে। তার এই অন্তর-সমাহিত অবস্থায় মনোময় পুরুষের পক্ষে পরমতত্ত্বের স্বরূপের বা নানাবিধ বিভাবের বা নানাবিধ স্তরের বিভিন্ন প্রকারের উপলব্ধি পাওয়া সম্ভব, কিন্তু আদর্শ হল সম্পূর্ণরূপে মনকে ত্যাগ করা এবং মানসিক উপলব্ধির অতীতে গিয়ে একান্ত

সমাধির মধ্যে প্রবেশ করা যার মধ্যে মনের বা অবর জীবনের সকল চিহ্নের অবসান হয়। কিন্তু এ হ'ল চেতনার এমন এক অবস্থা যা খুব কম সাধকই পেতে সমর্থ এবং যা থেকে প্রত্যাবর্তন করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না।

যেহেতু মানসচেতনাই মনোময় পুরুষের অধিকারভুক্ত একমাত্র জাগ্রত অবস্থা সেহেতু, স্পষ্টতঃই, তার পক্ষে আমাদের সমগ্র জাগ্রত জীবন ও আমাদের সকল আভ্যন্তরীণ মন — এই উভয়কেই সম্পূর্ণভাবে পিছনে না ফেলে অন্য কোন চেতনায় সম্পূর্ণ প্রবেশ করা সাধারণতঃ সম্ভব হয় না। এইজন্যই যৌগিক সমাধির প্রয়োজন। কিন্তু কেউই অনবরত এই সমাধিতে থাকতে পারে না; অথবা যদিই বা কেউ অনির্দিষ্ট দীর্ঘকালের জন্য এর মধ্যে অবস্থান করতে পারত, তাহলেও দৈহিক জীবনের উপর কোন প্রবল বা নিরন্তর আহ্বানের দ্বারা ঐ সমাধি ভগ্ন হওয়া সর্বদাই সম্ভব। আর যখন কেউ মানসিক চেতনায় ফিরে আসে, সে আবার উপস্থিত হয় অবর সত্তার মধ্যে। সেজন্যই বলা হয়েছে যে যতক্ষণ না দেহ ও দৈহিক জীবন চূড়ান্তভাবে ত্যাগ করা হয়, ততক্ষণ মানবজন্ম থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি, মনোময় পুরুষের জীবন থেকে সম্পূর্ণ উৎক্রান্তি অসম্ভব। যে যোগী এই পদ্ধতি অনুসরণ করে তার সম্মুখে এই আদর্শ ধরা হয় — মানবজীবনের, মানসিক সত্তার সকল কামনা, প্রতি ক্ষুদ্রতম ইচ্ছাও বর্জন কর, জগৎ থেকে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে বিচ্ছিন্ন কর, আর ক্রমশঃ বেশী ঘন ঘন এবং উত্তরোত্তর গভীরভাবে সমাধির সর্বাপেক্ষা একাগ্র অবস্থায় প্রবেশ ক'রে শেষে সত্তার সেই পূর্ণ অন্তঃসমাহিত অবস্থায় দেহ ত্যাগ কর, তবেই সম্ভব হবে পরম সন্মাত্রের মধ্যে মহাপ্রয়াণ। মন ও চিৎপুরুষের মধ্যে এই আপাতপ্রতীয়মান অসঙ্গতিও একটি কারণ যে জন্য অতগুলি ধর্ম ও দর্শন বাধ্য হয়ে জগৎকে দোষ দেয় আর প্রতীক্ষা ক'রে থাকে এক পরপারের স্বর্গের জন্য অথবা এক শূন্য নির্বাণ বা পরম ব্রহ্মের মধ্যে এক সর্বোত্তম অলক্ষণ আত্মসত্তার জন্য।

কিন্তু এই যখন অবস্থা, তখন যে মানবমন ভগবানকে চায় তার কি করণীয় — তার জাগ্রত মুহূর্তগুলি সম্বন্ধে? কারণ এই সব যদি মর্ত্য মানসিকতার সকল অক্ষমতার অধীন হয়, যদি এরা শোক, ভয়, ক্রোধ, প্রচণ্ড ভাবাবেগ, ক্ষুধা, লোভ, কামনা, প্রভৃতির আক্রমণের হাত থেকে নিস্তার না পায় তাহলে একথা মনে করা অযৌক্তিক হবে যে দেহত্যাগের মুহূর্তে যৌগিক সমাধির মধ্যে শুধু মনোময় পুরুষের একাগ্রতার দ্বারাই অন্তঃপুরুষ সক্ষম হবে পরম সৎ-এর মধ্যে প্রয়াণ করতে, আর না ফিরে এসে। কারণ মানবের সাধারণ চেতনা তখনো বৌদ্ধকথিত কর্মশৃঙ্খলা বা কর্মপ্রবাহের অধীন; তা তখনো এমন সব ক্রিয়াশক্তির সৃষ্টি করতে থাকে যেগুলি তাদের উৎপাদক মনোময় পুরুষের পরবর্তী জীবনে সক্রিয় ও ফলপ্রসূ হতে বাধ্য। অথবা অন্য এক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায়, চেতনাই যখন নির্ধারক বস্তু, দৈহিক জীবন তা নয় কারণ এ তো শুধু এক ফল, মানুষ সাধারণতঃ তখনো মানবীয় বা অন্ততঃ মানসিক ক্রিয়ার স্তরের অন্তর্গত, আর শুধু স্থূল শরীর থেকে প্রস্থান করলেই এই ক্রিয়া লোপ করা যায় না; মর্ত্যদেহ ত্যাগ করলেই

যে মর্ত্যমন ত্যাগ করা হবে তা নয়। তাছাড়া, জগতের প্রতি প্রবল বিরক্তি বা জড়জীবনের প্রতি প্রাণবিরুদ্ধ উপেক্ষা বা বিতৃষ্ণা থাকাও যথেষ্ট নয়; কারণ এও অবর মানসিক অবস্থা ও ক্রিয়ার অন্তর্গত। শ্রেষ্ঠ শিক্ষা এই যে এমনকি মুক্তিরও জন্য কামনা ও তার আনুষঙ্গিক সকল মানসিক ক্রিয়ারই উর্ধ্বে প্রথম যেতে হবে, তবে যদি অন্তঃপুরুষ সক্ষম হয় সম্পূর্ণ মুক্ত হতে। সুতরাং মনের পক্ষে শুধু অসাধারণ অবস্থাতেই নিজের মধ্য থেকে পরতর চেতনায় উত্তরণে সক্ষম হওয়াই যথেষ্ট নয়, এর জাগ্রত মানসিকতাকেও সম্পূর্ণভাবে আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন করা প্রয়োজন।

মনোময় পুরুষের পক্ষে যে দ্বিতীয় সম্ভাবনা উন্মুক্ত থাকে, এখন আমরা তার ক্ষেত্রে এইভাবেই আসি; কারণ যদি তার নিজের মধ্য থেকে সত্তার এক দিব্য অতিমানসিক লোকে উত্তরণই তার প্রথম সম্ভাবনা হয়, তাহলে অন্যটি হল দিব্যতত্ত্বকে নিজের মধ্যে নিম্নে আবাহন করা যাতে তার মানসিকতা অবশ্যই পরিবর্তিত হয় দিব্যের প্রতিমূর্তিতে, আর দিব্যভাবাপন্ন বা আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন হয়। এ করা সম্ভব এবং প্রাথমিকভাবে করা চাই-ই মনের সেই সামর্থ্যের দ্বারা যার জন্য মন যে বিষয়কে জানে, নিজের চেতনার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করে ও চিন্তা করে সেই বিষয়ের প্রতিফলন হয়। কারণ, মন বস্তুতঃ এক প্রতিক্ষেপক, এক মাধ্যম, আর তার কোন ক্রিয়ারই উদ্ভব নিজে থেকে হয় না, কোনটিই আত্মনির্ভর নয়। সাধারণতঃ মন প্রতিফলিত করে মর্ত্য প্রকৃতির অবস্থা এবং যে শক্তি জড়বিশ্বের অবস্থার মধ্যে কাজ করে তার বিভিন্ন ক্রিয়া। কিন্তু যদি এ এইসব ক্রিয়া এবং মানসিক প্রকৃতির বিশিষ্ট সব ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ ক'রে নির্মল, নিষ্ক্রিয় ও শুদ্ধ হয়, তাহলে এর মধ্যে দিব্য তত্ত্ব প্রতিফলিত হয়, — যেন এক স্বচ্ছ দর্পণের মধ্যে অথবা বাতাসে অক্ষুব্ধ নিস্তরঙ্গ নির্মল জলের মধ্যে আকাশের মতো। মন তখনো সম্পূর্ণভাবে দিব্য তত্ত্বের অধিকার পায় না বা দিব্য হয় না, তবে যতক্ষণ এটি এই শুদ্ধ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে ততক্ষণ তা দিব্যতত্ত্বের বা তার এক জ্যোতির্ময় প্রতিবিম্বের অধিকারভুক্ত হয়ে থাকে। এ যদি সক্রিয় হয়, এ আবার এসে পড়ে মর্ত্য প্রকৃতির বিক্ষোভের মধ্যে আর তাকেই প্রতিফলিত করে, তখন আর এটি দিব্যতত্ত্বকে প্রতিফলিত করে না। এইজন্য যে আদর্শ সাধারণতঃ বলা হয় তা হল — একান্ত শান্তভাব এবং প্রথমে সকল বাহ্য ক্রিয়ার এবং পরে সকল আন্তর গতিবৃত্তির অবসান; এখানেও জ্ঞানমার্গের সাধকের থাকা চাই একপ্রকার জাগ্রত সমাধি। যে সব ক্রিয়া অপরিহার্য সেসবের হওয়া চাই বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের একান্ত বাহ্য ক্রিয়া, আর শান্ত মন শেষ পর্যন্ত তাতে কোন অংশও নেয় না, তা থেকে কোন ফল বা লাভও চায় না।

কিন্তু পূর্ণ যোগের পক্ষে এটি পর্যাপ্ত নয়। জাগ্রত মানসিকতার শুধু নঞর্থক অক্ষুব্ধতা নয়, তার সদর্থক রূপান্তর একান্ত প্রয়োজনীয়। এই রূপান্তর সম্ভব কারণ যদিও দিব্যলোকসমূহ মানসিক চেতনার উর্ধ্বে আর তাদের মধ্যে বাস্তবভাবে প্রবেশ করতে হলে সাধারণতঃ সমাধির মধ্যে আমাদের মানসিক চেতনাশূন্য হতে হয়, তথাপি মানসিক সত্তার মধ্যেই দিব্যলোকসমূহ বর্তমান যেগুলি আমাদের সাধারণ মানসিকতা অপেক্ষা

মহত্তর; এই মানসিকতা সঠিক দিব্য লোকেরই বিভিন্ন অবস্থা ফুটিয়ে তোলে তবে এখানে মানসিকতার অবস্থাগুলি প্রবল হওয়ায় তারা এদের দ্বারা কিছু পরিবর্তিত হয়। দিব্য লোকের অন্তর্গত সকল অনুভূতিকেই সেখানে ধরা যায়, তবে মানসিক পন্থায় ও মানসিক রূপে। উন্নত মানুষের পক্ষে দিব্য মানসিকতার এই সব লোকে জাগ্রত অবস্থায় উত্তরণ করা সম্ভব; অথবা তার পক্ষে এও সম্ভব হয় যে সে ঐসব থেকে এমন সব অনুভাব ও অনুভূতির প্রবাহ পাবে যেগুলি শেষ পর্যন্ত তার সমগ্র জাগ্রত জীবনকে তাদের কাছে উন্মুক্ত করবে এবং একে রূপান্তরিত করবে তাদের প্রকৃতিতে। এইসব উচ্চতর মানসিক অবস্থাগুলি তার সিদ্ধির বিভিন্ন অব্যবহিত উৎস, বৃহৎ বাস্তব করণ, আন্তর ধাম।[১]

কিন্তু এই সব লোকে যাত্রাপথে বা তাদের থেকে শক্তি লাভ করাতে আমাদের মানসিকতার সব সঙ্কীর্ণতা আমাদের সঙ্গে থাকে। প্রথমতঃ মন অবিভক্ত বস্তুর সুদৃঢ় বিভাজক, আর তার সমগ্র প্রকৃতিই হল একসময়ে শুধু একটি বিষয়েই নিবদ্ধ থাকা অন্যসব বাদ দিয়ে অথবা সেইটিতে জোর দেওয়া অন্যগুলিকে ছোট ক'রে। এই জন্য, তা সচ্চিদানন্দ লাভে, তাঁর শুদ্ধ অস্তিত্ব, সৎ বিভাবেই নিবদ্ধ থাকে, আর তখন চিৎ ও আনন্দ হয় নিজেদের লীন করে শুদ্ধ, অনন্ত সত্তার অনুভূতির মধ্যে অথবা সেখানে শান্ত হয়ে থাকে; আর এইভাবেই আসে শান্ত অদ্বৈতবাদীর উপলব্ধি। অথবা তা চেতনা, চিৎ বিভাবের উপর নিবদ্ধ থাকবে আর তখন সৎ ও আনন্দ হবে এক অনন্ত বিশ্বাতীত সামর্থ্য ও চিৎশক্তির অনুভূতির উপর নির্ভরশীল; আর এইভাবেই আসে তান্ত্রিক শক্তি সাধকের উপলব্ধি। অথবা তা আনন্দ বিভাবের উপর নিবদ্ধ হবে আর তখন মনে হবে যে সৎ ও চেতনা যেন অন্তর্হিত হয়েছে এমন এক আনন্দের মধ্যে যার আত্ম-অধিকারী সংবিৎ-এর অথবা উপাদানস্বরূপ সত্তার ভিত্তি নেই; আর এতে আসে নির্বাণপ্রয়াসী বৌদ্ধের উপলব্ধি। অথবা তা নিবদ্ধ হবে সচ্চিদানন্দের এমন কোন বিভাবে যা মনে আসে অতিমানসিক জ্ঞান, সঙ্কল্প ও প্রেম থেকে, আর তখন সচ্চিদানন্দের অনন্ত নৈর্ব্যক্তিক বিভাব হয় প্রায় সম্পূর্ণভাবে, নয় একেবারে সম্পূর্ণভাবে লীন হয় পরম দেবতার অনুভূতিতে, আর এতে আসে নানা ধর্মের বিভিন্ন অনুভূতি এবং ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধে মানবীয় অন্তঃপুরুষের কোন স্বর্গধাম বা দিব্য অবস্থালাভ। আর যাদের উদ্দেশ্য হল বিশ্বজীবন থেকে যে কোন স্থানে প্রস্থান, তাদের পক্ষে এটি পর্যাপ্ত, কারণ এইসব তত্ত্ব বা বিভাবের যে কোন একটির মধ্যে মনকে নিমজ্জিত করে অথবা অধিকার করে তারা তাদের মানসিকতার দিব্য লোকের মধ্যে অবস্থানের মাধ্যমে অথবা সেসবের দ্বারা তাদের জাগ্রত অবস্থা অধিগত হওয়ায় এই কাম্য প্রয়াণ সাধনে সমর্থ হয়।

কিন্তু পূর্ণযোগের সাধকের কর্তব্য হল সবকিছুকে সুসমঞ্জস করা যাতে এইসব হতে

[১] বেদে এদের নানা নামে অভিহিত করা হয় — সদঃ, গৃহ বা ক্ষয়, ধাম, পদং, ভূমি, ক্ষিতি (অর্থাৎ আসন, ঘর, স্থিতি বা অবস্থা, পাদপীঠ, ভূমি, আবাস)।

পারে সচ্চিদানন্দের পূর্ণ উপলব্ধির সমগ্র ও সম ঐক্য। এইখানে তার কাছে উপস্থিত হয় মনের শেষ বাধা — একই সাথে ঐক্য ও বহুত্ব ধারণে তার অক্ষমতা। এক শুদ্ধ অনন্তে উপনীত হয়ে সেখানে বাস করা এবং এমনকি সেই সময়েই সৎ-এর — যে সৎ চেতনা ও যে চেতনা আনন্দ — তার পূর্ণ মণ্ডলাকার অনুভূতি পাওয়া একেবারে দুরূহ না হতে পারে। এমনকি মন এই ঐক্য সম্বন্ধে তার অনুভূতিকে বহুত্বে প্রসারিত করতে পারে যাতে সে বোধ করে যে এটি যেমন বিশ্বের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, তেমন বিশ্বের মধ্যে প্রতি বিষয়ে, শক্তিতে ও ক্রিয়াতেও অনুপ্রবিষ্ট অথবা একই সময়ে সে বোধ করে যে এই সৎ-চিৎ-আনন্দ বিশ্বকে ধরে আছে, এর সকল বিষয়কে আবৃত করে আছে এবং এর সকল গতিবৃত্তি উৎপন্ন করছে। অবশ্য এইসব অনুভূতিকে ঠিক মতো একত্র ও সুসমঞ্জস করা তার পক্ষে দুরূহ; কিন্তু তথাপি এটি সচ্চিদানন্দকে অধিগত করতে সক্ষম একই সাথে নিজের মধ্যে, সকলের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট তত্ত্ব হিসেবে এবং সকলের আধার রূপে। কিন্তু এর সঙ্গে এই চূড়ান্ত অনুভূতি যুক্ত করা যে এই সকলই সচ্চিদানন্দ এবং তিনি বৈ আর কিছু নয়, এইভাবে বিভিন্ন বিষয়, গতিবৃত্তি, রূপ অধিগত করা — এটাই মনের পক্ষে এক প্রকাণ্ড বাধা। পৃথক পৃথক ভাবে এদের যে কোন একটি সম্পন্ন করা সম্ভব; মন একটি থেকে অন্যটিতে যেতে পারে, একটিতে পৌঁছে অন্যটি বর্জন করতে পারে আর একে বলতে পারে অবর জীবন অথবা অন্যটিকে পরতর জীবন। কিন্তু কোন কিছু বিসর্জন না দিয়ে সব এক করা, কোন কিছু বর্জন না করে অখণ্ডতা সাধন — এই হল তার চরম বাধা।

চতুর্দশ অধ্যায়

নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় ব্রহ্ম

নিজের প্রকৃত সত্তা ও জগৎ সত্তা সম্বন্ধে পূর্ণ উপলব্ধিলাভের পথে মনোময় পুরুষ যে বাধার সম্মুখীন হয় তা দূর করা যায় তার আত্মবিকাশের দুই বিভিন্ন পথের একটি বা অন্যটি অনুসরণ করে। একটি পথ হল — তার আপন সত্তার লোক থেকে লোকান্তরে নিজেকে বিকশিত করা এবং প্রতি লোকেই ক্রমান্বয়ে জগতের সঙ্গে ও সচ্চিদানন্দের সঙ্গে তার একত্ব আস্বাদন করা; প্রতি লোকেই তার এই উপলব্ধি হয় যে সচ্চিদানন্দ সেই লোকের পুরুষ ও প্রকৃতি, চিন্ময়পুরুষ ও প্রকৃতি-পুরুষ, আর তার উত্তরণ পথে সে সত্তার নিম্ন পর্যায়ের ক্রিয়া নিজের মধ্যে গ্রহণ করে। অর্থাৎ সে আত্মবিস্তার ও রূপান্তরের এক প্রকার পরিগ্রাহী প্রণালীর দ্বারা সক্ষম হয় জড়াসক্ত মানবের বিকাশসাধনে দিব্য বা আধ্যাত্মিক মানবে। মনে হয় অতি প্রাচীন ঋষিরা এই পদ্ধতিই অবলম্বন করতেন, আর তার আভাস পাই আমরা ঋগ্বেদে ও কোন কোন উপনিষদে[1]। অপর পথে তার প্রয়াস হল প্রথমেই মানসিক সত্তার উচ্চতম লোকে শুধু আত্ম-অস্তিত্বের উপলব্ধি লাভ করা এবং সেই সুদৃঢ় ভিত্তি থেকে তার মানসিকতার অবস্থার মধ্যে আধ্যাত্মিকভাবে সেই প্রণালী উপলব্ধি করা যে প্রণালীতে স্বয়ম্ভূ সর্বভূত হয়েছেন, তবে এই উপলব্ধি করা হয় আত্মবিভক্ত অহমাত্মক চেতনার মধ্যে অবতরণ না ক'রে, কারণ এই চেতনা অবিদ্যার মধ্যে বিবর্তনের এক অবস্থা। এইভাবে অধ্যাত্মীকৃত মনোময় পুরুষরূপে বিশ্বাত্মক আত্ম-অস্তিত্বের মধ্যে সচ্চিদানন্দের সঙ্গে এক হয়ে সে তখন তা ছাড়িয়ে উত্তরণ করতে পারে শুদ্ধ আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের অতিমানসিক লোকে। এই শেষোক্ত পদ্ধতিরই বিভিন্ন পর্যায় আমরা এখন দেখাতে চেষ্টা করব জ্ঞানমার্গের সাধকের জন্য।

অহং, মন, প্রাণ, দেহ — এসবের সঙ্গে তার আত্মার অভিন্নতা বোধ থেকে নিবৃত্ত হবার সাধন পন্থা অনুসরণ করার পর সাধক জ্ঞানের দ্বারা যে উপলব্ধি লাভ করে তা হল এক শুদ্ধ আত্মবিৎ অস্তিত্ব যা এক, অবিভক্ত, শান্তিময়, নিষ্ক্রিয়, জগতের ক্রিয়ায় অবিচলিত। জগতের সঙ্গে এই আত্মার যে একমাত্র সম্পর্ক থাকে বলে মনে হয় তা হল এমন এক নিস্পৃহ সাক্ষীর সম্পর্ক যে সাক্ষী জগতের কোন ক্রিয়াতেই জড়িত নয়, যার উপর তাদের কোন প্রভাবই আসে না বা যাকে তারা এমনকি স্পর্শও করে না। চেতনার এই অবস্থাকে যদি আরো এগিয়ে নেওয়া যায় তাহলে সাধক এমন এক আত্মার কথা জানতে পারে যা প্রপঞ্চ (জগৎসত্তা) থেকে এমনকি আরো দূরে; জগতের সবকিছুই এক অর্থে সেই আত্মার মধ্যে অবস্থিত, কিন্তু তবু একই সময় তারা এর চেতনার বাইরে, এর

[1] এর মধ্যে তৈত্তিরীয় উপনিষদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সত্তার মধ্যে অসৎ, তারা আছে শুধু এক প্রকার অসৎ মনে — সুতরাং এক স্বপ্ন, মায়া। এই উদাসীন ও বিশ্বাতীত সৎ অস্তিত্বকে নিজের আপন সত্তার শুদ্ধ আত্মা বলে উপলব্ধি করা সম্ভব; অথবা আত্মা বা নিজের আপন সত্তার ভাবনাও এর মধ্যে বিলীন হবার সম্ভাবনা থাকে যাতে মনের কাছে এ হল শুধু এক অজ্ঞেয় "তৎ", যা মানসচেতনার কাছে অজ্ঞেয় এবং প্রপঞ্চের সঙ্গে যার কোন প্রকার বাস্তব সংযোগ বা ব্যবহার সম্ভব নয়। এমনকি মনোময় পুরুষের পক্ষে এর এই উপলব্ধিও সম্ভব যে এ হল এক নাস্তি, অসৎ বা শূন্য, তবে এমন শূন্য যা জগতের সবকিছু রহিত, এমন অসৎ যাতে জগতের সব কিছুই অবর্তমান, অথচ এই হল একমাত্র সদ্‌বস্তু। নিজের সত্তার একাগ্রতার দ্বারা ঐ অতিস্থিতির দিকে আরো অগ্রসর হওয়ার অর্থ মানসিক সত্তা ও প্রপঞ্চ সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে নিজেকে নিক্ষেপ করা অজ্ঞেয়ের মধ্যে।

কিন্তু পূর্ণ জ্ঞানযোগের দাবী হল প্রপঞ্চের উপর দিব্য প্রত্যাবর্তন, আর তার প্রথম কর্তব্য হল এই উপলব্ধি করা যে আত্মাই সর্ব, সর্বম্ ব্রহ্ম। প্রথম, স্বয়ম্ভূর উপর একাগ্র হয়ে আমাদের এই উপলব্ধি করা দরকার যে মন ও বিভিন্ন ইন্দ্রিয় যেসবকে জানে সেসব হল আমাদের আপন চেতনার কাছে এই যে শুদ্ধ আত্মা আমরা যা এখন হয়েছি তার মধ্যে অবস্থিত বিষয়সমূহের সঙ্কেত। শুদ্ধ আত্মার এই দর্শন মানসবোধ ও মানস-দৃষ্টির কাছে প্রতিভাত হয় এমন এক অনন্ত সদ্‌বস্তুরূপে যার মধ্যে সকল কিছু থাকে শুধু নাম ও রূপ হিসেবে, যথার্থতঃ অসৎ নয়, মতিভ্রম বা স্বপ্ন নয়, কিন্তু চেতনার এক সৃষ্টি মাত্র যা বাস্তব হওয়া অপেক্ষা বরং অনুভবগম্য ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। চেতনার এই স্থিতিতে সকল কিছুকেই স্বপ্ন না মনে হলেও তবু মনে হয় সেসব প্রশান্ত, অচঞ্চল, শান্তিময়, উদাসীন আত্মার মধ্যে যেন অনেকটা ছবি বা পুতুল নাচ। আমাদের নিজের প্রাতিভাসিক জীবন এই প্রত্যয়গত ক্রিয়ার অংশ, অন্য বিভিন্ন রূপের মধ্যে মন ও দেহের এক যান্ত্রিক রূপ, আমরা নিজেরা অন্য বিভিন্ন নামের মধ্যে সত্তার এক নাম, এই সর্বগ্রাহী প্রশান্ত আত্মসংবিৎসম্পন্ন আত্মার মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চঞ্চল। জগতের যে সক্রিয় চেতনা তা এই অবস্থায় আমাদের উপলব্ধিতে উপস্থিত নয়, কারণ আমাদের মধ্যে মনন নিস্তব্ধ হয়েছে আর সেইজন্য আমাদের আপন চেতনা সম্পূর্ণ শান্ত ও নিষ্ক্রিয় — যা কিছু আমরা করি, মনে হয় সেসব শুধু যান্ত্রিক, আমাদের সক্রিয় ও সঙ্কল্প ও জ্ঞানের দ্বারা তাদের যে সচেতনভাবে উৎপত্তি হয়েছে তা মনে হয় না। অথবা যদি মনন দেখা দেয়, তা-ও ঘটে বাকী সবের মতো যান্ত্রিকভাবে আমাদের দেহসঞ্চালনের মতো, প্রকৃতির অদেখা শক্তির চালনায় যেমন হয় উদ্ভিদ ও মৌলিক পদার্থে, তা যে আমাদের আত্মসত্তার কোন সক্রিয় সঙ্কল্পের দ্বারা চালিত হয় তা নয়। কারণ এই আত্মা নিশ্চল, এ যে ক্রিয়ার অনুমতি দেয়, এ তা প্রবর্তন করে না অথবা তাতে অংশ নেয় না। এই আত্মা সর্ব শুধু এই অর্থে যে এ হল অনন্ত এক যা নির্বিকার রূপে সকল নাম ও রূপ এবং তাদের আশ্রয়স্থল।

চেতনার এই অবস্থার ভিত্তি হল শুদ্ধ আত্মসত্তা সম্বন্ধে মনের আত্যন্তিক উপলব্ধি

যাতে চেতনা শান্ত, নিষ্ক্রিয়, সত্তার শুদ্ধ আত্মসংবিৎ-এ বিস্তৃতভাবে সমাহিত, সক্রিয় নয়, কোন প্রকার সম্ভূতির উৎপাদক নয়। এর জ্ঞানের বিভাব নির্বিশেষ তাদাত্ম্যের সংবিতের মধ্যে শান্ত; এর শক্তি ও সঙ্কল্পের বিভাব অপরিবর্তনীয় নির্বিকারতার সংবিতের মধ্যে শান্ত। আবার তবু এ নাম রূপের কথা জানে, জানে গতিবৃত্তির কথা; কিন্তু মনে হয় এই গতিবৃত্তির উৎপত্তি আত্মা থেকে হয় না, তা যেন চলে নিজেরই স্বগত সামর্থ্যের বলে, আর আত্মার মধ্যে শুধু প্রতিফলিত হবার জন্য। এর অর্থ এই যে মনোময় পুরুষ আত্যন্তিক একাগ্রতার দ্বারা নিজের থেকে চেতনার স্ফুরন্ত বিভাব সরিয়ে ফেলেছে, আর আশ্রয় নিয়েছে স্থিতিক চেতনার মধ্যে আর দু'য়ের মধ্যে এক প্রাচীর নির্মাণ করেছে যাতে সংযোগ না হয়; নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় ব্রহ্মের মাঝে ব্যবধানের এক প্রণালী তৈরী হয়েছে, তাদের একজন দাঁড়িয়ে থাকে এক পারে, অন্যজন অন্য পারে, একে অপরকে দেখে কিন্তু তাদের মধ্যে কোন সংযোগ নেই, নেই কোন সমবেদনার স্পর্শ, কোন ঐক্যবোধ। সুতরাং নিষ্ক্রিয় আত্মার কাছে সকল সচেতন সত্তা মনে হয় স্বভাবতঃই নিষ্ক্রিয়, সকল ক্রিয়াই মনে হয় নিজে অচেতন ও গতিবিধিতে যন্ত্রবৎ জড়। এই অবস্থার উপলব্ধিই প্রাচীন সাংখ্যদর্শনের ভিত্তি; এর শিক্ষা এই যে পুরুষ অর্থাৎ চিন্ময় পুরুষ শান্ত, নিষ্ক্রিয়, অক্ষর সত্তা আর প্রকৃতি অর্থাৎ প্রকৃতিস্বরূপ পুরুষ এমনকি তার অন্তর্গত মন ও বুদ্ধিও সক্রিয়, ক্ষর, যন্ত্রবৎ জড়, তবে এটি পুরুষে প্রতিফলিত হয় আর পুরুষ তার মধ্যে যা প্রতিফলিত হয় তার সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করে তাকে দেয় তার নিজের চেতনার আলো। যখন পুরুষ প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন না করতে শেখে, তখন প্রকৃতি তার ক্রিয়ার সংবেগ থেকে সরে সাম্যাবস্থায় ও নিষ্ক্রিয়তায় ফিরে যায়। এই অবস্থাকে বেদান্ত যে দৃষ্টিতে দেখল তাতে এই দর্শনের উৎপত্তি হল যে নিষ্ক্রিয় আত্মা বা ব্রহ্মই একমাত্র সদ্‌বস্তু এবং অন্য সব এই আত্মার উপর মানসিক ভ্রমের মিথ্যা ক্রিয়ার দ্বারা আরোপিত নাম ও রূপ; আর এই ভ্রম দূর করা দরকার অক্ষর আত্মা সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা এবং এই আরোপকে[১] অস্বীকার করে। বস্তুতঃ এই দুই মতের পার্থক্য শুধু প্রকাশভঙ্গিতে ও দৃষ্টিকোণে; সারতঃ তারা একই আধ্যাত্মিক অনুভূতি থেকে একই বুদ্ধিগত সামান্য ভাবনা।

যদি আমরা এখানেই নিরস্ত হই তাহলে জগতের প্রতি শুধু দুইটি মনোভাব সম্ভব। হয় আমাদের থাকতে হবে জগৎলীলার শুধু নিষ্ক্রিয় সাক্ষীরূপে, নয় তার মধ্যে আমাদের কাজ করতে হবে যন্ত্রের মতো শুধু বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও কর্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার দ্বারা,[২] কিন্তু সচেতন আত্মা তাতে কোন অংশ গ্রহণ করবে না। প্রথমটি নির্বাচন করা হলে আমাদের কাজ হল যথাসম্ভব সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় ও নীরব ব্রহ্মের অনুরূপ নিষ্ক্রিয়তা লাভ করা। আমরা আমাদের মনকে শান্ত করেছি, মননের ক্রিয়া ও হৃদয়ের চাঞ্চল্যকে

[১] অধ্যারোপ

[২] কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈঃ —

নিস্তব্ধ করেছি, আর লাভ করেছি সম্পূর্ণ আন্তর প্রশান্তি ও উদাসীনতা; এখন আমাদের প্রয়াস হল প্রাণ ও দেহের যান্ত্রিক ক্রিয়াকে শান্ত করা, একে যথাসম্ভব ন্যূনতম পরিমাণে হ্রাস করা যাতে শেষ পর্যন্ত চিরদিনের মতো পুরোপুরি এর অবসান আসে। যে বৈরাগ্যযোগ জীবন অস্বীকার করে তার অন্তিম লক্ষ্য এই কিন্তু স্পষ্টতঃ এ আমাদের লক্ষ্য নয়। বিকল্প পথটি নির্বাচন ক'রে আমরা সক্ষম হই বাহ্যতঃ বেশ পুরোপুরি কর্মে প্রবৃত্ত থাকতে অথচ তখন থাকে সম্পূর্ণ আন্তর নিষ্ক্রিয়তা, প্রশান্তি, মানসিক নীরবতা, উদাসীনতা, এবং বিভিন্ন ভাবাবেগের নিবৃত্তি, স্বেচ্ছাবৃত্তির উপশম।

সাধারণ মনের কাছে এটি সম্ভবপর মনে হয় না। যেমন ভাবাবেগের দিক থেকে, এ ভাবতে পারে না যে কামনা ও ভাবাবেগের পছন্দ না থাকলে কোন ক্রিয়া সম্ভবপর, তেমন বুদ্ধির দিক থেকেও এ ভাবতে অক্ষম যে মনন-প্রত্যয় এবং সঙ্কল্পের সচেতন প্রবর্তনা ও সক্রিয়তা বিহনে কোন ক্রিয়া সম্ভবপর। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আমরা দেখি যে জড় ও নিতান্তই সজীব প্রাণজগতের সমগ্র ক্রিয়ার মতো আমাদের নিজেদেরও ক্রিয়ার অধিকাংশ করা হয় যান্ত্রিক সংবেগ ও চালনার দ্বারা যার মধ্যে এইসব বিষয় অন্ততঃ প্রকাশ্যে সক্রিয় নয়। বলা যেতে পারে যে কেবলমাত্র শারীরিক ও প্রাণিক ক্রিয়া সম্বন্ধেই এটি সম্ভবপর, কিন্তু যেসব ক্রিয়া সাধারণতঃ ভাবনাপর ও সঙ্কল্পপর মনের ব্যাপ্রিয়ার উপর নির্ভরশীল, যেমন মানবজীবনের কথা বলা, লেখা, এবং সকল বুদ্ধির কাজ — তাদের বেলায় এটি সম্ভবপর নয়। কিন্তু একথা যে সত্য নয় তা আমরা দেখি যখন আমরা সক্ষম হই আমাদের মানসিক প্রকৃতির অভ্যাসগত ও সাধারণ ধারার পশ্চাতে যেতে। আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষণে দেখা যায় যে আপতিক কর্তার মনন ও সঙ্কল্পে কোনরকম সচেতন প্রবর্তনা না থাকলেও এই সকল ক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব; তার বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়, তার কথা বলার ইন্দ্রিয় পর্যন্ত, হয়ে ওঠে সে ভিন্ন অন্যের মনন ও সঙ্কল্পের নিষ্ক্রিয় যন্ত্র।

একথা নিশ্চিত যে সকল বুদ্ধির কাজের পশ্চাতে এক বুদ্ধিমান সঙ্কল্প থাকতে বাধ্য, কিন্তু তা যে কর্তার সচেতন মনের বুদ্ধি বা সঙ্কল্প হতে হবে তা নয়। যেসব মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপারের কথা আমি বলেছি, তাদের মধ্যে কতকগুলিতে স্পষ্টতঃই অপর মানুষের সঙ্কল্প ও বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গুলি ব্যবহার করে, অন্যগুলিতে নিশ্চয় করে বলা যায় না কিসের দরুন তা ঘটছে — এ কি অন্য সত্তার প্রভাব বা প্রেরণা, না অবচেতন, অধিচেতন মনের উদ্বর্তন, না এই দুয়েরই মিশ্রিত ও যুক্ত ক্রিয়া। কিন্তু শুধু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা "কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈঃ" ক্রিয়ার এই যে যৌগিক অবস্থা তাতে কাজ করে স্বয়ং প্রকৃতির সর্বগত বুদ্ধি ও সঙ্কল্প বিভিন্ন অতিচেতন ও অবচেতন কেন্দ্র থেকে, যেমন এ কাজ করে উদ্ভিদ জগতের বা নিষ্প্রাণ জড়ীয় রূপের যন্ত্রের মতো উদ্দেশ্যপূর্ণ সব শক্তির মধ্যে, তবে এখানে যৌগিক অবস্থায় কাজ হয় এমন এক জীবন্ত যন্ত্রের মাধ্যমে যে ক্রিয়ার ও যন্ত্র ব্যবহারের সচেতন সাক্ষী। এটি বিশেষ লক্ষণীয় যে এরকম অবস্থার কথা বলায়, লেখায়, বুদ্ধির কাজে ভাবনায় এমন এক পূর্ণ শক্তি ফুটে ওঠে যা ভাস্বর, ত্রুটিশূন্য, যুক্তিসম্মত ও চিদাবিষ্ট এবং

যাতে সাধনের উপায়গুলি সম্পূর্ণভাবে সাধ্যের উপযোগী হয়; মানুষ নিজে তার মন, সঙ্কল্প ও সামর্থ্যের পুরনো সাধারণ অবস্থায় যা করতে পারত তার চেয়ে এইসব কাজ অনেক উচ্চস্তরের, অথচ সব সময়ই সে বোঝে যে ভাবনা তার কাছে আসে, সে নিজে তা ভাবে না, যে সঙ্কল্প তার মাধ্যমে কাজ করে সে তাকে কাজের মধ্যে নিরীক্ষণ করে কিন্তু তাকে নিজের বলে নেয় না বা ব্যবহার করে না, যেসব সামর্থ্য তার মধ্য দিয়ে জগতের উপর সক্রিয় সেসব সে নিজের বলে দাবী করে না, সে শুধু তাদের নিষ্ক্রিয় প্রবাহপ্রণালী। কিন্তু বস্তুতঃ এরকম ব্যাপার অসাধারণ নয়, অথবা বিষয়সমূহের সাধারণ বিধানের বিরুদ্ধ নয়। কারণ আমরা কি জড়প্রকৃতির আপাতপ্রতীয়মান জড়ক্রিয়ার মধ্যে নিগূঢ় সর্বগত সঙ্কল্প ও বুদ্ধির সম্পূর্ণ সুষ্ঠু ক্রিয়াপদ্ধতি দেখি না? আর বস্তুতঃ এই সর্বগত সঙ্কল্প ও বুদ্ধিই প্রশান্ত, উদাসীন ও আন্তর নীরব যোগীর মধ্য দিয়ে ঐভাবে কাজ করে, আর যোগী এর ক্রিয়া সম্পাদনে সীমিত ও অজ্ঞ ব্যক্তিগত সঙ্কল্প ও বুদ্ধির কোন বাধা আনে না। সে বাস করে নীরব আত্মার মধ্যে; সে সক্রিয় ব্রহ্মকে কাজ করতে দেয় তার প্রাকৃত যন্ত্রগুলির মধ্য দিয়ে, আর এর সর্বগত শক্তি ও জ্ঞানের বিভিন্ন রূপায়ণ স্বীকার করে, তবে নিরপেক্ষভাবে কোন অংশ গ্রহণ না করে।

এই যে স্থিতি যাতে আন্তর নিষ্ক্রিয়তা ও বাহ্যকর্ম পরস্পরের অনধীন, তা হল সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক মুক্তির অবস্থা। যেমন গীতায় বলা হয় যোগী কর্মরত থেকেও নিষ্কর্মা থাকে, কারণ সে তো কর্ম করে না, কর্ম করে বিশ্বপ্রকৃতি, প্রকৃতির অধীশ্বরের নির্দেশে। যোগী তার কোন কর্মের দ্বারা বদ্ধ হয় না, সেসব কর্ম তার মনের উপর কোন শেষ জের বা ফল রাখে না বা তার অন্তঃপুরুষে লেগে থাকে না বা কোন দাগ ফেলে না[১]; তারা অন্তর্ধান করে, সম্পাদনের দ্বারাই বিলীন[২] হয়, অক্ষর আত্মার উপর তাদের কোন প্রভাব পড়ে না, অন্তঃপুরুষেও কোন পরিবর্তন আসে না। সুতরাং উন্নীত পুরুষকে যদি প্রপঞ্চের মধ্যে মানবীয় কর্মের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে হয় তাহলে তার যে স্থিতি নেওয়া কর্তব্য, মনে হয় তা এই, — অন্তরে অপরিবর্তনীয় নীরবতা, অক্ষুব্ধতা, নিষ্ক্রিয়তা এবং বাইরে সেই সর্বগত সঙ্কল্প ও প্রজ্ঞার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কর্ম যা গীতার কথামতো কাজ করে তার কোন কাজে জড়িত বা বদ্ধ বা অজ্ঞভাবে আসক্ত না হয়ে। আর এটা নিশ্চিত যে যেমন আমরা কর্মযোগে দেখেছি যোগীর যে স্থিতি লাভ করা কর্তব্য তা হল সম্পূর্ণ আন্তর নিষ্ক্রিয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত পূর্ণকর্ম। কিন্তু এখানে এই যে আত্মজ্ঞানের অবস্থায় আমরা উপনীত হয়েছি তাতে স্পষ্টতঃই অখণ্ডতার অভাব; কারণ এখনো নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় ব্রহ্মের মধ্যে এক ব্যবধান, এক অনুপলব্ধ ঐক্য অথবা চেতনার এক চিড় রয়ে যায়। আমাদের এখনো দরকার নীরব আত্মার অধিকার না হারিয়ে সক্রিয় ব্রহ্মকে সচেতনভাবে অধিগত করা। ভিত্তি হিসেবে আমাদের রাখা চাই আন্তর নীরবতা,

[১] ন কর্ম লিপ্যতে নরে — ঈশ উপনিষদ
[২] প্রবিলীয়ন্তে কর্মাণি — গীতা

অক্ষুব্ধতা, নিষ্ক্রিয়তা, কিন্তু সক্রিয় ব্রহ্মের বিভিন্ন কর্মে দূরস্থ উদাসীনতার স্থলে আমাদের পাওয়া চাই তাদের মধ্যে সম ও নিরপেক্ষ আনন্দ; পাছে আমাদের মুক্তি ও প্রশান্তি নষ্ট হয় এই ভয়ে কর্মে অংশগ্রহণে অস্বীকার করার পরিবর্তে আমাদের প্রয়োজন সক্রিয় ব্রহ্মকে সচেতনভাবে অধিগত করা যাঁর অস্তিত্বের আনন্দ তাঁর প্রশান্তিকে নষ্ট করে না অথবা সকল কর্মপ্রণালীর উপর তাঁর প্রভুত্বের দ্বারা বিভিন্ন কর্মের মধ্যে তাঁর শান্ত স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হয় না।

এই বাধা সৃষ্টির কারণ এই যে মনোময় পুরুষ আত্যন্তিকভাবে একাগ্র হয় শুদ্ধ অস্তিত্বের মনোলোকের উপর যেখানে চেতনা বিশ্রামরত থাকে নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে এবং অস্তিত্বের আনন্দ বিশ্রামরত থাকে অস্তিত্বের শান্তির মধ্যে। অস্তিত্বের চিৎ-শক্তির যে লোকে চেতনা সক্রিয় সামর্থ্য ও সঙ্কল্প হিসেবে এবং আনন্দ সক্রিয় অস্তিত্বের হর্ষ হিসেবে — তাও তার আলিঙ্গন করা চাই। এখানে অসুবিধা এই যে মন খুব সম্ভব শক্তির চেতনাকে অধিগত না ক'রে নিজেকে নিক্ষেপ করবে তার মধ্যে। প্রকৃতির মধ্যে এই অধঃনিক্ষেপের চরম মানসিক অবস্থা হল সেই অবস্থা যাতে সাধারণ মানুষ মনে করে যে তার দৈহিক ও প্রাণিক ক্রিয়া এবং তার উপর নির্ভরশীল তার মনোবৃত্তিই তার সমগ্র আসল জীবন এবং তার অন্তঃপুরুষের নিষ্ক্রিয়তা হল জীবন থেকে প্রস্থান এবং শূন্যতার দিকে অগ্রসর হওয়া। সে বাস করে সক্রিয় ব্রহ্মের উপরিভাগে আর যে সময় নিষ্ক্রিয় আত্মার আত্যন্তিকভাবে একাগ্র নীরব অন্তঃপুরুষ মনে করে যে সকল ক্রিয়া শুধু নাম ও রূপ, সে মনে করে যে এরাই একমাত্র সদ্‌বস্তু এবং আত্মাই নাম মাত্র। একটিতে নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম দূরে থাকেন সক্রিয় ব্রহ্ম থেকে এবং তাঁর চেতনায় কোন অংশগ্রহণ করেন না, আর অপরটিতে সক্রিয় ব্রহ্ম দূরে থাকেন নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম থেকে এবং তাঁর চেতনায় কোন অংশ নেন না, আবার নিজের চেতনাকেও সম্পূর্ণভাবে অধিগত করেন না। এই আত্যন্তিকতার মধ্যে প্রত্যেকটি অপরের কাছে সম্পূর্ণ অসৎ না হলেও, এ হল স্থিতির এক স্থিতিধর্মিতা অথবা আত্মাকে না পাওয়ার এমন অবস্থা যার স্থিতিধর্মিতা হ'ল যন্ত্রের মতো সক্রিয় থাকা। কিন্তু যে সাধক একবার বিষয়সমূহের স্বরূপ নিশ্চিতভাবে দেখেছে এবং নীরব আত্মার শান্তি সম্যক্‌ভাবে আস্বাদন করেছে তার পক্ষে এমন কোন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা সম্ভব নয় যাতে আত্মজ্ঞানের হানি হয়, অথবা অন্তঃপুরুষের প্রশান্তি বিসর্জন দিতে হয়। যে মন ও প্রাণ ও দেহের শুধু ব্যষ্টিগত ক্রিয়ার এত অজ্ঞান ও পরিশ্রম ও বিক্ষোভ তার মধ্যে সে আর নিজেকে ফিরে নিক্ষেপ করবে না। যা কিছু নতুন অবস্থা তার পক্ষে অর্জন করা সম্ভব হবে তা তার কাছে সন্তোষজনক হবে যদি কেবল এই হয় যে সে ইতিপূর্বেই যে বিষয়কে দেখেছে প্রকৃত আত্মজ্ঞান, আত্ম-আনন্দ ও আত্ম-অধিকারের পক্ষে অপরিহার্য ব'লে তার উপর এটি প্রতিষ্ঠিত এবং তা এর অন্তর্গত।

তবু যখন সে আবার জগতের ক্রিয়ার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে চেষ্টা করে তখন আবার পুরনো মানসিক বৃত্তির মধ্যে আংশিক, উপরভাসা ও অস্থায়ী পতনের সম্ভাবনা থাকে। এই পতন রোধ করতে হলে অথবা তা এলে তার প্রতিকারের জন্য তার কর্তব্য

হল সচ্চিদানন্দের সত্যকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকা এবং অনন্ত একম্ সম্বন্ধে তার উপলব্ধিকে প্রসারিত করা অনন্ত বহুত্বের বিলাসে। সকল বিষয়ের মধ্যে একম্ ব্রহ্ম যেমন চিন্ময় সত্তার শুদ্ধ সংবিৎ তেমন সত্তার চিৎ-শক্তি — এতেই তাকে একাগ্র হতে হবে এবং এটিই তার উপলব্ধি করা চাই। অস্তিত্বকে যথার্থভাবে অধিগত করতে হলে তার পরবর্তী কাজ হল এই উপলব্ধি করা যে আত্মাই সর্ব, — শুধু যে বিষয়সমূহের অনন্য স্বরূপ হিসেবে তা নয়, তাদের বহুধা রূপের মধ্যেও, শুধু যে বিশ্বাতীত চেতনার মধ্যে সকলকে ধরে আছেন ব'লে তা নয়, উপাদানস্বরূপ চেতনার দ্বারা সব কিছু হয়েছেন বলেও। যে অনুপাতে এই উপলব্ধি সিদ্ধ হয়, সেই অনুপাতে চেতনার পাদ এবং তার উপযোগী মানসিক দৃষ্টিরও পরিবর্তন হয়। এমন এক অক্ষর আত্মা যা নাম ও রূপ ধারণ করে, প্রকৃতির সব পরিণাম ধারণ করে অথচ সেসবে অংশ নেয় না, তার পরিবর্তে আসবে সেই আত্মার চেতনা· যা স্বরূপে অক্ষর, তার মৌলিক স্থিতিতে অপরিবর্তনীয় অথচ এই যে সর্বভূতকে মন নাম ও রূপ হিসেবে পার্থক্য করে সে সবকে নিজের অনুভূতিতে গঠন করে এবং নিজেই সে সব হয়। মন ও দেহের সব রূপায়ণ শুধু যে পুরুষের মধ্যে প্রতিফলিত বিভিন্ন সঙ্কেত হবে তা নয়, সেগুলি হবে সব বাস্তব রূপ আর ব্রহ্ম, আত্মা, চিন্ময়পুরুষ এদের ধাতু এবং যেন এদের রূপায়ণের উপাদান। রূপের সঙ্গে যুক্ত নাম শুধু যে মনের এমন এক ভাবনা যার অনুরূপ ঐ নামধারী কোন বাস্তব সত্তা নেই তা নয়, তার পশ্চাতে থাকবে চিন্ময় সত্তার এক সত্যকার সামর্থ্য, ব্রহ্মের এক সত্যকার আত্ম-অনুভূতি যা তার নীরবতার মধ্যে সম্ভাব্য এমন কিছু হিসেবে রয়েছে যা এখনও প্রকাশিত হয়নি। আবার তথাপি এর সকল পরিবর্তনের মধ্যে উপলব্ধি করা হবে যে এ হল এক, মুক্ত এবং সে সকলের ঊর্ধ্বে। নাম ও রূপের অধ্যারোপের অধীন এক অদ্বিতীয় সদ্‌বস্তুর উপলব্ধির পরিবর্তে এই উপলব্ধি হবে যে এক সনাতন পুরুষই নিজেকে বাইরে প্রক্ষেপ করছেন অনন্ত সম্ভূতির মধ্যে। যোগীর চেতনায় সর্বভূত হবে আত্মার, তার নিজের অন্তঃপুরুষরূপ, শুধু যে ভাবনারূপ তা নয়, আর সেসব তার সঙ্গে এক, আর তার বিশ্বসত্তার অন্তর্গত। যা কিছু আছে সে সকলেরই সমগ্র অন্তঃপুরুষ জীবন, মানসিক, প্রাণিক ও দৈহিক জীবন তার কাছে হবে সেই পুরুষের এক অবিভক্ত গতিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি যিনি চিরদিন একই থাকেন। যে আত্মাকে উপলব্ধি করা হবে তাঁর যে দুই বিভাব — অক্ষর স্থিতি ও ক্ষর প্রবৃত্তি তাতে আত্মাই সব এবং দেখা যাবে যে এই হল আমাদের সত্তার ব্যাপক সত্য।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বিশ্বচেতনা

সক্রিয় ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা ও তাঁর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার অর্থ ব্যষ্টিচেতনার পরিবর্তে বিশ্বচেতনা লাভ করা, তবে মিলন আংশিক কি সম্পূর্ণ যেমন হবে, সেই অনুসারে ঐ পরিবর্তনও হবে অপূর্ণ বা পূর্ণ। মানবের সাধারণ জীবন শুধু যে এক ব্যষ্টিচেতনা তা নয়, এ হল অহমাত্মক চেতনাও; অর্থাৎ এই সেই চেতনা যাতে ব্যষ্টিপুরুষ বা জীবাত্মা নিজেকে এক করে বিশ্বপ্রকৃতির গতিবৃত্তির মধ্যে তার মানসিক, প্রাণিক, শারীরিক অনুভূতির গ্রন্থির সঙ্গে, তার মনোসৃষ্ট অহং-এর সঙ্গে, এবং অপেক্ষাকৃত কম ঘনিষ্ঠভাবে মন, প্রাণ ও দেহের সঙ্গে যারা বিভিন্ন অনুভূতি গ্রহণ করে; কারণ এদের সম্বন্ধে সে বলতে পারে "আমার মন, প্রাণ ও দেহ", আর এইজন্য এদের সে নিজ ব'লে মনে করে অথচ সে মনে করে যে সে অংশতঃ এই সব নয়, এই সব এমন কিছু যা সে অধিকার করে ও ব্যবহার করে; কিন্তু অহং সম্বন্ধে সে বলে, "এ আমি।" মন, প্রাণ ও দেহের সঙ্গে অভিন্নতা বোধ থেকে সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে সে তার অহং থেকে ফিরে যেতে পারে সেই আসল জীবের, জীবাত্মার চেতনায় যে জীবাত্মা মন, প্রাণ ও দেহের প্রকৃত অধিকারী। এই জীবের দিক থেকে পিছনে তার দিকে তাকিয়ে যার প্রতিভূ ও সচেতন সঙ্কেত সে, সে ফিরে যেতে পারে শুদ্ধ আত্মার, অনপেক্ষ সন্মাত্রের, অথবা অনপেক্ষ অসতের বিশ্বাতীত চেতনায় — যে তিনটি একই সনাতন সদ্‌বস্তুর বিভিন্ন স্থিতি। কিন্তু একদিকে বিশ্বপ্রকৃতি আর অন্যদিকে এর এক ও বিশ্বব্যাপী আত্মার অধিকারী বিশ্বাতীত সন্মাত্র — এদের মধ্যে অবস্থিত বিশ্বচেতনা, বিরাট পুরুষ যার প্রকৃতি অর্থাৎ সক্রিয় সচেতন শক্তি হল সমগ্র নিসর্গ শক্তি (Nature)। আমরা তাতে উপনীত হতে পারি, তা হতে পারি হয় অহং-এর প্রাচীরগুলি যেন পাশাপাশিভাবে ভেঙে একম্-এর অন্তর্গত সর্বভূতের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে অথবা উর্ধ্ব থেকে শুদ্ধ আত্মা বা অনপেক্ষ সন্মাত্রকে এর বহির্গামী, বিশ্বগত, সর্বগ্রাহী, সকলের উপাদানস্বরূপ আত্মজ্ঞান ও আত্ম-সৃজনশীল সামর্থ্যে উপলব্ধি করে।

সকলের মধ্যে বিশ্বগত নীরব আত্মারূপেই এই বিশ্বচেতনার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা মনোময় পুরুষের পক্ষে সবচেয়ে সহজ; ইনি হলেন শুদ্ধ ও সর্বব্যাপী সাক্ষী যিনি বিশ্বের চিন্ময়পুরুষরূপে বিশ্বের সকল প্রবৃত্তি নিরীক্ষণ করেন, ইনিই সচ্চিদানন্দ — যাঁর আনন্দের জন্য বিশ্বপ্রকৃতি তার বিভিন্ন কর্মের চিরন্তন শোভাযাত্রা প্রদর্শন করে। আমরা এমন এক তত্ত্বকে জানতে পারি যা আমাদের ও সকল বিষয়ের মধ্যে অবস্থিত এক অক্ষত আনন্দ, এক শুদ্ধ ও সিদ্ধ সান্নিধ্য, এক অনন্ত ও স্বয়ং-পূর্ণ সামর্থ্য; সকল বিষয় বিভক্ত হলেও এ বিভক্ত হয় না, বিশ্ব অভিব্যক্তির চাপ ও সংঘর্ষের প্রভাবাধীন নয়,

এই অভিব্যক্তির সকল কিছুর ঊর্ধ্বে থেকেও এ সেসবের অন্তঃস্থ। এটি আছে ব'লেই এই সকল কিছু থাকে, কিন্তু এর অস্তিত্ব এই সকলের উপর নির্ভর করে না; এ হল এত মহান্ যে তার দ্বারা অধ্যুষিত ও ধৃত কাল ও দেশের মধ্যে গতিধারার দ্বারা এ সীমিত হয় না। এই ভিত্তিবলেই আমরা সমর্থ হই আমাদের স্বীয় সত্তার মধ্যে সমগ্র বিশ্বকে দিব্যসত্তার নিরাপত্তায় অধিগত করতে। যার মধ্যে আমরা বাস করি তার দ্বারা আমরা আর সীমিত ও আবদ্ধ হই না, বরং যে সবের মধ্যে আমরা বাস করতে সম্মত হই সেসবকে আমরা ভগবানের মতো নিজেদের মধ্যে ধারণ করি প্রকৃতির ক্রিয়ার উদ্দেশ্যে। আমরা মন বা প্রাণ বা দেহ নই, বরং এদের অধিকারী নীরব, শান্তিময়, সনাতন অন্তঃপুরুষ যা তাদের অন্তঃপ্রেরণাদাতা এবং পরিপোষক; আর এই অন্তঃপুরুষকেই আমরা সর্বত্র দেখি যে এটি সকল প্রাণ ও মন ও দেহকে পোষণ করে, তাদের মধ্যে প্রেরণা দিয়ে ও তাদের অধিগত করে অবস্থিত, একে আর আমরা নিজেদের মধ্যে এক পৃথক ও ব্যষ্টিপুরুষ ব'লে দেখি না। এতেই এই সকল কিছু চলন্ত ও সক্রিয়; এই সকল কিছুর মধ্যে এ হল স্থির ও অক্ষর। একে লাভ করলে, আমরা লাভ করি আমাদের শাশ্বত আত্মসত্তাকে যা তার সনাতন চেতনা ও আনন্দের মধ্যে স্থির।

এর পর আমাদের উপলব্ধি করা চাই যে এই নীরব আত্মাই বিশ্বপ্রকৃতির সকল ক্রিয়ার প্রভু, সেই একই স্বয়ম্ভূ যিনি তাঁর সনাতন চেতনার সৃজনশীল শক্তিতে বিলসিত হয়েছেন। এই সকল ক্রিয়া শুধু তাঁরই সামর্থ্য ও জ্ঞান ও আত্ম-আনন্দ যা তাঁর অনন্ত সত্তায় সর্বত্র বিস্তৃত হয়েছে ("পর্যগাৎ") তাঁর শাশ্বত প্রজ্ঞা ও সঙ্কল্পের সব কাজ করার জন্য। আমরা ভগবানকে, সকলের সনাতন আত্মাকে যে প্রথম উপলব্ধি করি তাতে তিনিই উৎস এই সব কিছুর — ক্রিয়া ও নিষ্ক্রিয়তা, সকল জ্ঞান ও অজ্ঞানতা, সকল আনন্দ ও কষ্টভোগ, সকল শুভ ও অশুভ, পূর্ণতা ও অপূর্ণতা, সকল শক্তি ও রূপ, শাশ্বত দিব্যতত্ত্ব থেকে প্রকৃতির সকল বহির্গমন ও ভগবানের দিকে প্রকৃতির সকল প্রত্যাবর্তন। পরে আমরা উপলব্ধি করি যে তিনি স্বয়ং সর্বত্র বিস্তৃত হয়েছেন তাঁর সামর্থ্য ও জ্ঞানে — কারণ সামর্থ্য ও জ্ঞান তাঁরই স্বরূপ — আর তিনি যে শুধু তাদের সব কর্মের উৎস তা নয়, তিনি তাদের কর্মের স্রষ্টা ও কর্তা, সর্বভূতের মধ্যে এক; কারণ বিশ্ব অভিব্যক্তির বহু পুরুষ এক ভগবানেরই বিভিন্ন আনন মাত্র, এই যে বহু মন, প্রাণ ও দেহ — এসব শুধু তাঁরই বিভিন্ন মুখোশ ও ছদ্মবেশ। আমরা বোধ করি যে প্রতি সত্তাই বিশ্বব্যাপী নারায়ণ যিনি আমাদের সম্মুখে বহুরূপে উপস্থিত; আমরা তার মধ্যে নিজেদের হারিয়ে ফেলি আর অনুভব করি যে আমাদের নিজেদের মন, প্রাণ ও দেহ আত্মারই এক রূপ মাত্র আর যাদের আমরা আগে অপর ব'লে ভাবতাম এখন তারা সব আমাদের চেতনায় অন্য মন, প্রাণ ও দেহে আমাদেরই আত্মা। বিশ্বস্থ সকল শক্তি ও ভাবনা ও ঘটনা ও বিষয়সমূহের আকার এই আত্মার শুধু বিভিন্ন প্রকাশমাত্রা, ভগবানের শাশ্বত আত্মরূপায়ণে তাঁর বিভিন্ন ইষ্টার্থ। বিভিন্ন বিষয় ও সত্তাকে এইভাবে দেখলে, আমাদের পক্ষে তাদের এইভাবে দেখা সম্ভব যে তারা যেন তাঁর বিভক্ত সত্তার বিভিন্ন অবিচ্ছেদ্য

অংশ কিন্তু এই উপলব্ধি ও জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না যদি না আমরা গুণ ও দেশ ও বিভাজনের এই ভাবনা অতিক্রম করি ও অনন্তকে দেখি সর্বত্র, দেখি বিশ্ব ও বিশ্বস্থ প্রতি বিষয়কে তার অস্তিত্বে ও গূঢ় চেতনায় ও সামর্থ্যে ও আনন্দে, অবিভাজ্য ভগবানরূপে তাঁর সমগ্রতায় — আমাদের মনে তাঁর যে রূপ তৈরী হয় তা শুধু আংশিক অভিব্যক্তি হিসেবে যতই আমাদের প্রতীতি হ'ক না কেন। যখন আমরা এইভাবে ভগবানকে অধিগত করি নীরব ও সর্বোত্তম সাক্ষীরূপে, এবং সক্রিয় প্রভুরূপে এবং সকলের উপাদানস্বরূপ সত্তারূপে, আর এইসব বিভাবের মধ্যে কোন বিভাজন না করি তাহলে আমরা অধিগত করি সমগ্র বিশ্ব ভগবানকে, আলিঙ্গন করি সমগ্র বিশ্বাত্মক আত্মা ও সদ্‌বস্তুকে, প্রবুদ্ধ হই বিশ্বচেতনায়।

এই যে বিশ্বচেতনা আমরা লাভ করি, তার সঙ্গে আমাদের ব্যষ্টি জীবনের সম্পর্ক কি হবে? কেননা, যেহেতু তখনো আমাদের মন, দেহ ও মানবজীবন থাকে, সেহেতু, আমাদের পৃথক ব্যষ্টি চেতনাকে অতিক্রম করা হলেও আমাদের ব্যষ্টি জীবন চলতে থাকে। এটা সম্পূর্ণ সম্ভব যে আমরা বিশ্বচেতনা উপলব্ধি করব কিন্তু তা হব না, একে দেখব, অর্থাৎ অন্তঃপুরুষ দিয়ে, একে অনুভব করব এবং এর মধ্যে বাস করব, এর সঙ্গে যুক্ত হব, কিন্তু তার সঙ্গে পুরোপুরি এক না হয়ে এক কথায়, বিশ্বাত্মার বিশ্বচেতনার মধ্যে জীবাত্মার ব্যষ্টিচেতনা রক্ষা করা সম্পূর্ণ সম্ভব। দু'য়ের মধ্যে একপ্রকার পার্থক্য রক্ষা ক'রে তাদের মধ্যের সম্পর্কগুলি উপভোগ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব; বিশ্বাত্মার আনন্দ ও আনন্ত্যে অংশগ্রহণ করার সাথে আমরা ব্যষ্টি আত্মা থাকতে পারি; অথবা এদের উভয়কেই আমরা অধিগত করতে পারি মহত্তর ও ক্ষুদ্রতর আত্মা হিসেবে, একটি নিজেকে বাইরে ঢেলে দিচ্ছে দিব্যচেতনা ও শক্তির বিশ্বক্রীড়ার মধ্যে, আর অন্যটি ঢেলে দিচ্ছে সেই একই বিরাটপুরুষের ক্রিয়া আমাদের ব্যষ্টি পুরুষকেন্দ্র বা পুরুষরূপের মধ্য দিয়ে এবং মন, প্রাণ ও দেহের ব্যষ্টি ক্রীড়ার জন্য। কিন্তু সর্বদাই জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধির পরাকাষ্ঠা হল এমন সামর্থ্য লাভ যাতে ব্যক্তিভাবনাকে বিশ্বসত্তার মধ্যে বিলীন করা, ব্যষ্টি চেতনাকে বিশ্বচেতনায় নিমজ্জন করা, এমনকি অন্তঃপুরুষরূপকেও চিৎপুরুষের ঐক্য ও বিশ্বভাবের মধ্যে মুক্ত করা সম্ভব হয়। এই সেই লয় বা মোক্ষ যা জ্ঞানযোগের সাধ্য। চিরাচরিত যোগের মতো এটি প্রসারিত হতে পারে মন প্রাণ ও দেহেরও লয়ে নীরব আত্মার বা অনপেক্ষ সম্মাত্রের মধ্যে কিন্তু মোক্ষের সার হল অনন্তের মধ্যে ব্যষ্টি জীবের নিমজ্জন। যখন যোগী আর অনুভব করে না যে সে দেহের মধ্যে অবস্থিত বা মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ চেতনা, আবার অনন্ত চেতনার নিঃসীমতার মধ্যে বিভাজনের বোধও হারিয়ে ফেলে তখন সে যে ব্রত সাধনের জন্য অগ্রসর হয়েছিল তা সিদ্ধ হয়। এর পর মানবজীবন আর রাখা বা না রাখা কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়, কারণ সর্বদা নীরূপ 'একম্'-ই মন ও প্রাণ ও দেহের নানা রূপের মধ্যে কাজ করে আর প্রতি অন্তঃপুরুষ শুধু এক একটি আসন যেখান থেকে সে তার নিজের খেলা পর্যবেক্ষণ, গ্রহণ ও প্রবর্তন করতে মনস্থ করে।

বিশ্বচেতনায় অবস্থান ক'রে আমরা যার মধ্যে নিজেদের নিমজ্জন করি তা সচ্চিদানন্দ। এক সনাতন সন্মাত্রই আমরা তখন হই, এক সনাতন চেতনাই তার নিজের সব কাজ দেখে আমাদের মধ্যে ও অপরের মধ্যে, সেই চেতনার এক সনাতন সঙ্কল্প বা শক্তিই নিজেকে বিলসিত করে অনন্ত কর্মধারায়, এক অনন্ত আনন্দই তার নিজের ও তার সকল কর্মধারার হর্ষ লাভ করে — এ হল নিজে স্থির, অক্ষর, কালাতীত, দেশাতীত, পরম এবং তার বিভিন্ন কর্মধারার আনন্ত্যের মধ্যে নিজে নিস্তব্ধ, তাদের পরিবর্তনের দ্বারা এ পরিবর্তিত হয় না, তাদের বহুত্বের দ্বারা এ খণ্ডিত হয় না, কাল ও দেশের সমুদ্রের মধ্যে তাদের প্রবাহের জোয়ার ভাঁটায় এর হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, তাদের আপাতপ্রতীয়মান বিপরীত রূপের দ্বারা এ বিভ্রান্ত অথবা তাদের দিব্য ইচ্ছাকৃত সীমার দ্বারা সীমিত হয় না। সচ্চিদানন্দই ব্যক্ত বিষয়সমূহের বহুত্বের ঐক্য, তিনিই তাদের সকল বৈচিত্র্য ও বিরোধের শাশ্বত সামঞ্জস্য, তিনিই সেই অনন্ত পূর্ণতা যা তাদের সব সসীমতা সার্থক করে ও তাদের সকল অপূর্ণতার গন্তব্যস্থল।

একথা স্পষ্ট যে এই বিশ্বচেতনায় বাস করলে বিশ্বের মধ্যে সকল কিছু সম্বন্ধে আমাদের অনুভূতি ও মূল্যায়নের আমূল পরিবর্তন হবে। আমরা অবিদ্যার মধ্যে বাস করি ব্যষ্টি অহংরূপে, আর সব কিছু বিচার করি জ্ঞানের এক খণ্ডিত, আংশিক ও ব্যক্তিগত মান দিয়ে; আমরা সব কিছু জানি সীমিত চেতনা ও শক্তির গ্রহণসামর্থ্য অনুযায়ী, এবং সেজন্য বিশ্ব অভিজ্ঞতার কোন অংশেই দিব্য সাড়া দিতে অথবা প্রকৃত মূল্য স্থাপনে আমরা অক্ষম। আমরা যে সসীমতা, দুর্বলতা, অসামর্থ্য, শোক, যন্ত্রণা, সংগ্রাম এবং এর সব বিরুদ্ধভাবাবেগ অথবা এইসব বিষয়ের বিপরীতগুলি অনুভব করি, তা করি এক চিরন্তন দ্বন্দ্বের মধ্যে বিপরীত হিসেবে, অনপেক্ষ শুভ ও সুখের নিত্যতার মধ্যে নয়। আমরা বাস করি অনুভূতির খণ্ড খণ্ড অংশ দিয়ে আর প্রতি বিষয় ও সমগ্রকে বিচার করি আমাদের আংশিক মূল্য দিয়ে। যখন আমরা অনপেক্ষ মূল্য পাবার চেষ্টা করি তখন আমরা শুধু বিষয়সমূহের কোন আংশিক দৃষ্টিকে বড় করে ধরি যাতে তাই কাজ করে দিব্য কর্মপ্রণালীসমূহের সমগ্রতার বদলে। আমরা ভান করি যে আমাদের অংশগুলিই পূর্ণ আর আমাদের একদেশীয় দৃষ্টিকোণগুলি স্থাপন করি ভগবানের সমগ্রদর্শনের সার্বভৌমত্বের মধ্যে।

বিশ্বচেতনায় প্রবেশ করলে আমরা সেই সমগ্রদর্শনের অংশীদার হই, আর সব কিছুকে দেখি অনন্ত ও একম্-এর মূল্যে। আমাদের কাছে সসীমতার ও অজ্ঞানতারও অর্থের পরিবর্তন হয়। অজ্ঞানতা পরিবর্তিত হয় দিব্য জ্ঞানের এক বিশেষ ক্রিয়ায়; বল ও দুর্বলতা ও অসামর্থ্য পরিবর্তিত হয় দিব্যশক্তির নানাবিধ মাত্রার স্বচ্ছন্দ প্রয়োগে ও সম্বরণে সুখ ও দুঃখ পরিবর্তিত হয় দিব্য আনন্দের প্রভুত্বে ও বশ্যতায়; সংগ্রাম পরিবর্তিত হয় দিব্য সুষমার মধ্যে বিভিন্ন শক্তি ও মূল্যের সাম্যে। মন, প্রাণ ও দেহের সসীমতা আর আমাদের কষ্ট দেয় না; কারণ আর আমরা এদের মধ্যে বাস করি না, আমরা বাস করি চিৎপুরুষের আনন্ত্যের মধ্যে, আর এই সবকে আমরা দেখি অভিব্যক্তির

মধ্যে তাদের যথার্থ মূল্যে ও স্থানে ও উদ্দেশ্যে — যেন এরা সেই সচ্চিদানন্দের পরম সত্তা, চিৎ-শক্তি ও আনন্দের বিভিন্ন মাত্রা যিনি বিশ্বের মধ্যে নিজেকে আবৃত ও প্রকাশ করছেন। মানুষ ও বিষয়সমূহকে আর আমরা তাদের বাহ্যরূপ দিয়ে বিচার করি না এবং আমরা মুক্ত হই সকল প্রকার বিদ্বেষপূর্ণ ও পরস্পরবিরোধী ভাবনা ও ভাবাবেগ থেকে; কারণ প্রতি বিষয় ও প্রাণীর মধ্যে আমরা অন্তঃপুরুষকেই দেখি, ভগবানকেই খুঁজি ও পাই এবং বাকী সবের মূল্য আমাদের কাছে শুধু গৌণ সেই সংস্থানের মধ্যে যা আমাদের জন্য থাকে শুধু ভগবানের আত্মপ্রকাশরূপে, তাদের নিজেদের কোন একান্ত মূল্য নেই। সেইরকম কোন ঘটনাই আমাদের বিক্ষুব্ধ করতে সক্ষম হয় না, কারণ সুখকর ও দুঃখকর, মঙ্গলজনক ও অমঙ্গলজনক ঘটনাসমূহের পার্থক্য নষ্ট হয়, আর সব কিছুই দেখা হয় তাদের দিব্যমূল্য ও দিব্য উদ্দেশ্যে। এইভাবে আমরা লাভ করি সম্পূর্ণ মুক্তি ও অনন্ত সমত্ব। এই পূর্ণতার কথাই উপনিষদ বলে এই কথায় — "যার মধ্যে আত্মা সর্বভূত হয়েছে, তার মোহ কেমন করে হবে, যে সম্যক্ জানে[১] এবং সকল কিছুতে একত্ব দেখে তার শোক কোথা থেকে আসবে?"

কিন্তু এটি হয় কেবল তখনই যখন বিশ্বচেতনায় পূর্ণতা আসে যা মনোময় পুরুষের পক্ষে দুষ্কর। যখন মানসিকতা চিৎপুরুষের ভগবানের ভাবনা বা উপলব্ধি লাভ করে, তখন তার ঝোঁক হয় অস্তিত্বকে দুই বিপরীত ভাগে ভাগ করতে — অপর ও পর অস্তিত্ব। একদিকে সে দেখে অনন্ত, অরূপ, এক প্রশান্তি ও আনন্দ, স্থৈর্য ও নীরবতা, পরমার্থসৎ, বৃহৎ, শুদ্ধ; অন্যদিকে সে দেখে সান্ত, রূপময় জগৎ, বিষম বহুত্ব, সংঘর্ষ ও কষ্টভোগ এবং অপূর্ণ, অবাস্তব শুভ, ক্লেশকর ক্রিয়া, নিরর্থক সফলতা, সাপেক্ষ, সীমিত ও তুচ্ছ ও জঘন্য। যারা এই বিভাজন, এই বিরোধ সৃষ্টি করে তাদের কাছে সম্পূর্ণ মুক্তি পাওয়া যায় শুধু একম্-এর প্রশান্তিতে, অনন্তের অলক্ষণত্বে, পরমার্থসৎ-এর অসম্ভূতিতে, তাদের কাছে এই পরমার্থসৎ-ই একমাত্র বাস্তব সত্তা; মুক্ত হতে হলে সকল মূল্য ধ্বংস করা চাই, সকল সসীমতাকে শুধু অতিক্রম করা নয়, তাদের বিলোপ সাধন করা চাই। তারা দিব্য বিরামের মুক্তি পায়, কিন্তু দিব্য কর্মের স্বাধীনতা পায় না; তারা বিশ্বাতীতের শান্তি উপভোগ করে, কিন্তু বিশ্বাতীতের বিশ্বব্যাপী আনন্দ উপভোগ করে না। তাদের স্বাধীনতা নির্ভর করে বিশ্বক্রিয়া থেকে বিরত থাকার উপর, বিশ্ব অস্তিত্বকে আয়ত্ত ও অধিগত করতে অক্ষম তা। তবে তাদের পক্ষে বিশ্বাতীত শান্তির মতো বিশ্বগত শান্তি উপলব্ধি করা ও তাতে অংশ গ্রহণ করাও সম্ভব। তবু বিভাজন দূর হয় না। যে স্বাধীনতা তারা উপভোগ করে তা হল নীরব নিষ্ক্রিয় সাক্ষীর স্বাধীনতা, তা সেই দিব্য অধীশ্বরচেতনার স্বাধীনতা নয় যা সকল বিষয় অধিগত করে, সকল কিছুতেই আনন্দ পায়, সৃষ্টির সকল রূপের মধ্যেই নিজেকে ঢেলে দেয়, — পতন বা ক্ষয় বা বন্ধন বা

[১] বিজানতঃ। এক ও বহুর জ্ঞানই বিজ্ঞান, এতে বহুকে দেখা হয় একের সংজ্ঞায়, দিব্য সত্তার অনন্ত ঐক্যসাধক "সত্যম্, ঋতম্ ও বৃহৎ"-এর মধ্যে।

কলুষের ভয় না করেই। চিৎপুরুষের সকল অধিকার তখনো অধিগত করা হয় না, তখনো থাকে এক অস্বীকৃতি, এক সসীমতা, সকল অস্তিত্বের সমগ্র একত্ব থেকে এক সংবরণ। মন, প্রাণ, দেহের কর্মপ্রণালী দেখা হয় মনোময় পুরুষের আধ্যাত্মিক লোকের স্থৈর্য ও প্রশান্তি থেকে এবং পূর্ণ করা হয় সেই স্থৈর্য ও প্রশান্তি দিয়ে; তারা সর্বকর্তৃত্বময় চিৎপুরুষের বিধানের দ্বারা অধিকৃত ও নিয়ন্ত্রিত হয় না।

এটি হয় যখন মনোময় পুরুষ অবস্থান করে তার নিজের সব আধ্যাত্মিক লোকে, সৎ, চিৎ, আনন্দের সব মনোময় লোকে এবং তাদের আলো ও আনন্দ ঢালে নিম্নে অপর অস্তিত্বের উপর। কিন্তু একপ্রকার বিশ্বচেতনায় উপনীত হবার প্রয়াস করা সম্ভব হয় অপর লোকগুলির মধ্যেই বাস করে, আমরা যেমন বলেছি পাশাপাশিভাবে তাদের সব সসীমতা দূর করে এবং নিম্নে তাদের মধ্যে পর অস্তিত্বের আলোক ও বৃহত্ত্ব আবাহন করে। শুধু যে চিৎপুরুষ এক তা নয়, মন, প্রাণ, জড়ও এক। এক বিশ্বমন আছে, এক বিশ্বপ্রাণ আছে, এক বিশ্বদেহ আছে। বিশ্বজনীন সমবেদনা, বিশ্বজনীন প্রেম এবং অপর সব সত্তার ভিতরের অন্তঃপুরুষের বোধ ও জ্ঞান লাভ করার জন্য মানবের সকল চেষ্টাই হল প্রসারশীল মন ও হৃদয়ের সামর্থ্যের দ্বারা অহং-এর প্রাচীরগুলিকে আঘাতে আঘাতে ক্ষীণ ও দীর্ণ এবং শেষে তাদের ভূমিসাৎ করে এক বিশ্বচেতনার নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা। আর যদি আমরা সক্ষম হই মন ও হৃদয়ের দ্বারা চিৎপুরুষের স্পর্শ লাভ করতে, এই অবর মানবসত্তার মধ্যে ভগবানের শক্তিশালী অন্তঃপ্রবাহ গ্রহণ করতে এবং প্রেমের দ্বারা, বিশ্বজনীন আনন্দের দ্বারা, সকল প্রকৃতি ও সকল সত্তার সঙ্গে মনের একত্বের দ্বারা আমাদের প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করতে দিব্য প্রকৃতির প্রতিবিম্বে, তাহলে প্রাচীরগুলি ভাঙতেও আমরা সক্ষম হব। এমনকি আমাদের দেহগুলিও প্রকৃতপক্ষে পৃথক সত্তা নয় এবং সেজন্য আমাদের শারীর চেতনাও সমর্থ হয় অপরের ও বিশ্বের শারীর চেতনার সঙ্গে একত্বলাভে। যোগী এই অনুভব করতে সক্ষম যে তার দেহ অন্য সকল দেহের সঙ্গে এক, সে তাদের সব বিকারের কথাও জানতে পারে, এমনকি সেসবে সে অংশও গ্রহণ করতে পারে; সকল জড়ের ঐক্য সে সর্বদাই অনুভব করতে সক্ষম, আর তার শরীর যে জড়ের গতির[১] মধ্যে একগতি তা-ও সে অবগত হয়। তার পক্ষে আরো সম্ভব সর্বদাই এবং স্বাভাবিকভাবেই এটি অনুভব করা যে অনন্ত প্রাণের সমগ্র সাগরই তার সত্যকার প্রাণিক জীবন আর তার নিজের জীবন সেই সীমাহীন কল্লোলের এক তরঙ্গমাত্র। আবার এর চেয়ে আরো সহজে সে সক্ষম হয় মনে ও হৃদয়ে নিজেকে সকল ভূতের সঙ্গে যুক্ত করতে, তাদের বিভিন্ন কামনা, সংগ্রাম, সুখ, দুঃখ, ভাবনা, সংবেগের কথা জানতে এমনভাবে যেন এইসব তার নিজেরই, অন্ততঃ যেন সেসব ঘটছে তার বৃহত্তর আত্মার মধ্যে তার নিজের হৃদয় ও মনের বিভিন্ন বৃত্তির মতো প্রায় সমান অথবা সম্পূর্ণ অন্তরঙ্গভাবে। এও বিশ্বচেতনার এক উপলব্ধি।

[১] জগত্যাম্ জগৎ — ঈশ উপনিষদ।

এমনকি মনে হতে পারে যে এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ একত্ব কারণ এই মনোসৃষ্ট জগতে যা কিছু আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয় সে সবকেই এতে আমাদের আপন বলে স্বীকার করা হয়। কখন কখন দেখা যায় যে একেই বলা হয়েছে সিদ্ধির পরাকাষ্ঠা। একথা ঠিক যে এ হল এক মহতী উপলব্ধি এবং মহত্তরা এক উপলব্ধিলাভের পথ। গীতায় যে বলা হয়েছে হর্ষে বা শোকে সর্বভূতকে আত্মবৎ গ্রহণ করতে তা এর কথাই। এই সমবেদনাপূর্ণ একত্ব এবং অনন্ত করুণার পথ দিয়ে বৌদ্ধ উপনীত হয় তার নির্বাণে। তবু এর মধ্যে বিভিন্ন পর্যায় ও মাত্রা আছে। প্রথম অবস্থায় অন্তঃপুরুষ তখনো দ্বন্দ্বের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার অধীন এবং সেহেতু তখনো অপরা প্রকৃতির অধীন থাকে; বিশ্ব-কষ্টে সে বিষণ্ণ ও ব্যথিত হয়, বিশ্ব-আনন্দে সে প্রফুল্ল হয়। অপরের সুখে আমরা সুখের বশীভূত হই, তাদের দুঃখেও আমরা কষ্টভোগ করি আর এই একত্ব এমনকি দেহেও বিস্তৃত করা যায় যেমন সেই ভারতীয় সাধুর বেলায় হয়েছিল যিনি মাঠে এক বলদকে তার নির্দয় মালিক প্রহার করছে দেখে ঐ প্রাণীর যন্ত্রণা অনুভব করে আর্তনাদ করে উঠেছিলেন এবং দেখা গেল তাঁর নিজের গায়েও চাবুকের দাগ ফুটে উঠেছে। কিন্তু প্রকৃতির বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার কাছে অবর সত্তার বশ্যতার সঙ্গে সচ্চিদানন্দের স্বাধীনতার মধ্যে একত্ব থাকাও একান্ত আবশ্যক। কিন্তু এই সিদ্ধিলাভ সম্ভব যখন অন্তঃপুরুষ মুক্ত হয়ে বিশ্ব প্রতিক্রিয়াসমূহের ঊর্ধ্বে ওঠে, তখন এই সবকে অনুভব করা হয় প্রাণ, মন ও দেহের মধ্যে অবর গতি হিসেবে। অন্তঃপুরুষ এসবকে বোঝে, স্বীকার করে, তাদের প্রতি তার সমবেদনা থাকে কিন্তু তাদের দ্বারা সে অভিভূত বা প্রভাবিত হয় না, ফলে এমনকি মন ও দেহও শিক্ষা করে সে সবকে উপরিস্থল ছাড়া অন্যত্র অভিভূত বা এমনকি প্রভাবিত না হয়ে স্বীকার করতে। আর এই সাধনার সিদ্ধি আসে যখন অস্তিত্বের দুই অর্ধ আর বিভক্ত থাকে না এবং মন, প্রাণ ও দেহ বিভিন্ন বিশ্বসংস্পর্শের প্রতি অবর বা অজ্ঞানময় সাড়া থেকে উপচিত হয় চিৎপুরুষের স্বাধীনতায় এবং অবসান হয় দ্বন্দ্বের বশ্যতার। এর এই অর্থ নয় যে অপরের সংগ্রাম ও কষ্টভোগের বোধ থাকে না, বরং এর অর্থ এমন এক আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা ও স্বাধীনতা যা সাধককে সামর্থ্য দেয় সুষ্ঠুভাবে বুঝতে, বিষয়সমূহের উপর যথার্থ মূল্য স্থাপন করতে এবং নিম্ন থেকে সংগ্রাম করার পরিবর্তে ঊর্ধ্ব থেকে নিরাময় করতে। এটি দিব্য করুণা ও পরোপকারেচ্ছা রুদ্ধ করে না, কিন্তু এ যে মানবীয় ও পাশবিক দুঃখ ও কষ্টভোগ রুদ্ধ করে তা ঠিক।

মনোময় পুরুষের আধ্যাত্মিক ও অবর লোকগুলির মধ্যকার যে যোগসূত্রটি তাকেই প্রাচীন বৈদান্তিক পরিভাষায় বলা হয় বিজ্ঞান, আর আমরা একে বলতে পারি সত্যলোক বা আদর্শ মন বা অতিমানস যেখানে এক ও বহু মিলিত হয় এবং আমাদের সত্তা স্বচ্ছন্দভাবে উন্মুক্ত হয় দিব্যসত্যের উদ্ভাসক আলোর দিকে এবং দিব্যসঙ্কল্প ও জ্ঞানের চিদাবেশের নিকট। আমাদের ও ভগবানের মধ্যে যে বুদ্ধিগত, ভাবগত ও ইন্দ্রিয়গত মনের আবরণ আমাদের সাধারণ জীবন নির্মাণ করেছে তাকে যদি আমরা ছিন্ন করতে সক্ষম হই, তাহলে আমরা আমাদের সকল মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক অনুভূতিকে

ঊর্ধ্বে নিতে পারি সত্য-মানসের মধ্য দিয়ে — আর এই ছিল প্রাচীন বৈদিক "যজ্ঞের" নিগূঢ় বা রহস্যময় অর্থ — যাতে সেসব রূপান্তরিত হয় সচ্চিদানন্দের অনন্ত সত্যের বিভিন্ন সংজ্ঞায়, আর আমরা সমর্থ হই অনন্ত সন্মাত্রের বিভিন্ন সামর্থ্য ও দীপ্তিকে গ্রহণ করতে দিব্য জ্ঞান, সঙ্কল্প ও আনন্দের বিভিন্ন রূপে যাতে তাদের আরোপ করা হয় আমাদের মানসিকতা, প্রাণিকতা ও শারীরিক সত্তার উপর যতক্ষণ না অবরসত্তা রূপান্তরিত হয় পরতর সত্তার সিদ্ধ আধারে। এই হল বৈদিক সাধনার দুই ধারা — একটি হল মানবের মাঝে দেবগণের অবতরণ ও জন্ম, আর অন্যটি হল দিব্য জ্ঞান, সামর্থ্য ও আনন্দের দিকে সংগ্রামরত বিভিন্ন মানবসামর্থ্যের আরোহণ এবং তাদের উত্তরণ দেবগণের মধ্যে, আর এদের পরিণাম আসে একের, অনন্তের, আনন্দময় জীবনের ভগবানের সঙ্গে মিলনের অমরত্বের অধিকার লাভ। এই আদর্শ লোক অধিকার করার বলে আমরা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করি অপর ও পর অস্তিত্বের বিরোধ এবং সেই মিথ্যা ব্যবধান যা অবিদ্যা সৃষ্টি করেছিল সান্ত ও অনন্তের মাঝে, ভগবান ও প্রকৃতির মাঝে, এক ও বহুর মাঝে, আর আমরা উন্মুক্ত করি ভগবানের দ্বার, জীবকে সার্থক করি বিশ্বচেতনার সম্পূর্ণ সুষমার মধ্যে এবং বিশ্বসত্তার মধ্যে উপলব্ধি করি বিশ্বাতীত সচ্চিদানন্দের আবির্ভাব।

ষোড়শ অধ্যায়

একত্ব

অতএব যখন সাধক মন, প্রাণ ও দেহের সঙ্গে তার অভিন্নতা বোধ থেকে তার চেতনার কেন্দ্র প্রত্যাহার করে তার প্রকৃত আত্মা আবিষ্কার করে, আর আবিষ্কার করে সেই আত্মার একত্ব শুদ্ধ নীরব অক্ষর ব্রহ্মের সঙ্গে এবং সেই অক্ষর ব্রহ্মের মধ্যে সেই তত্ত্বও আবিষ্কার করে যার দ্বারা জীব তার আপন ব্যক্তিরূপ থেকে পলায়ন করে নৈর্ব্যক্তিকের মধ্যে, তখন জ্ঞানমার্গের সাধনার প্রথম পর্যায় সমাপ্ত হয়। একমাত্র এটিই একান্তভাবে প্রয়োজনীয় জ্ঞানযোগের চিরাচরিত লক্ষ্যের জন্য, নিমজ্জনের জন্য, বিশ্ব জীবন থেকে পলায়নের জন্য, সকল বিশ্বসত্তার অতীত যে অনপেক্ষ ও অনুপাখ্য পরব্রহ্ম তার মধ্যে মোক্ষের জন্য। এইরকম মোক্ষকামী তার পথে অন্য উপলব্ধিও পেতে পারে; বিশ্বের যিনি প্রভু, যে পুরুষ নিজেকে সকল সৃষ্ট বিষয়ের মধ্যে অভিব্যক্ত করেন তাঁকে সে উপলব্ধি করতে পারে, বিশ্বচেতনা লাভ করতে পারে, আর পারে সকল সত্তার সঙ্গে তার ঐক্য জানতে ও অনুভব করতে। কিন্তু এইসব শুধু তার যাত্রার বিভিন্ন পর্যায় বা অবস্থা, অনুপাখ্য লক্ষ্যের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হবার কালে তার অন্তঃপুরুষের বিকাশের পরিণাম। এইসব ছাড়িয়ে যাওয়াই তার পরম লক্ষ্য। অপরপক্ষে স্বাধীনতা ও নীরবতা ও প্রশান্তি পাবার পর যখন আমরা বিশ্বচেতনার দ্বারা নীরব ব্রহ্মের মতো আবার সক্রিয় ব্রহ্মকেও অধিগত করি এবং দিব্য স্বাধীনতার মধ্যে দৃঢ়ভাবে বিশ্রাম ও বাস করতে সক্ষম হই, তখন আমরা এই পথের সাধনার দ্বিতীয় পর্যায় সমাপ্ত করি এবং এর দ্বারা আত্মজ্ঞানের অখণ্ডতা হয়ে ওঠে মুক্ত পুরুষের অবস্থান ভূমি।

অন্তঃপুরুষ এইভাবে নিজেকে অধিকার করে সচ্চিদানন্দের ঐক্যের মধ্যে এবং তার নিজের সত্তার সকল অভিব্যক্ত লোকের উপর। অখণ্ড জ্ঞানের বিশেষত্ব এই যে তা সবকিছুর মিলন সাধন করে সচ্চিদানন্দের মধ্যে, কারণ সত্তা যে শুধু স্বরূপে এক তা নয়, এ হল এক সর্বত্র, তার সকল স্থিতিতে এবং প্রতি বিভাবে, যেমন একত্বের চরম রূপে, তেমন বহুত্বেরও চরম রূপে। চিরাচরিত জ্ঞান এই সত্যকে মুখে স্বীকার করলেও কাজের বেলায় তর্ক করে যেন একত্ব সর্বত্র সমান নয় অথবা সকলের মধ্যে তাকে সমানভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এ জ্ঞান একত্বকে পায় অব্যক্ত পরমার্থসৎ-এর মধ্যে, কিন্তু ততখানি পায় না অভিব্যক্তির মধ্যে, তাকে পুরুষবিধ অপেক্ষা নৈর্ব্যক্তিকে আরো শুদ্ধভাবে পায়, সম্পূর্ণভাবে পায় নির্গুণে, কিন্তু সগুণে তত সম্পূর্ণভাবে নয়, তাকে সন্তোষজনকভাবে উপস্থিত দেখে নীরব ও নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের মধ্যে, কিন্তু সক্রিয় ব্রহ্মের মধ্যে তত সন্তোষজনকভাবে নয়। সেজন্য এ জ্ঞান পরমার্থসৎ-এর এইসব অপর সংজ্ঞাগুলিকে উত্তরণের পরম্পরায় তাদের বিপরীতগুলির নিম্নে স্থাপন করে এবং দাবী

করে যে শেষ পর্যন্ত এদের বর্জন আবশ্যক, যেন চরম উপলব্ধির পক্ষে এই বর্জন অপরিহার্য। কিন্তু পূর্ণজ্ঞান এরকম কোন বিভাজন করে না; একত্ব সম্বন্ধে তার যে দৃষ্টি তাতে তা অন্য একপ্রকার একান্ততায় উপনীত হয়। অব্যক্ত ও ব্যক্ত, নৈর্ব্যক্তিক ও পুরুষবিধ, নির্গুণ ও সগুণ, বিশ্বজনীন নীরবতার অনন্ত গভীরতা এবং বিশ্বজনীন ক্রিয়ার অনন্ত বৃহত্ত্ব — এসবেরই মধ্যে তা পায় একই একত্ব। এটি একই একান্ত একত্ব পায় পুরুষে ও প্রকৃতিতে, দিব্য সান্নিধ্যে ও দিব্য সামর্থ্য ও জ্ঞানের বিভিন্ন কর্মে, একপুরুষের নিত্য ব্যক্ততাতে এবং বহুপুরুষের নিরন্তর অভিব্যক্তিতে, সচ্চিদানন্দের অবিচ্ছেদ্য ঐক্যের মধ্যে যিনি নিজের বহুবিধ একত্ব নিজের কাছে সর্বদাই বাস্তব রাখেন এবং মন, প্রাণ ও দেহের আপাতপ্রতীয়মান সব বিভাজনের মধ্যে যেসবে একত্ব নিগূঢ় হলেও সর্বদাই বাস্তব এবং বাস্তব হবার জন্য অবিরাম প্রয়াসী। এর কাছে সকল ঐক্য এক প্রগাঢ়, শুদ্ধ ও অনন্ত বাস্তব উপলব্ধি, সকল ভেদ একই ভাবগত ও সনাতন সত্তার প্রচুর, সমৃদ্ধ ও অসীম বাস্তব উপলব্ধি।

সুতরাং সম্পূর্ণ ঐক্যোপলব্ধি পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণযোগের সার। সচ্চিদানন্দ যে স্বরূপে এক এবং তাঁর সকল অভিব্যক্তিতেও এক, — এই জানা জ্ঞানের ভিত্তি; একত্বের এই দর্শনকে চেতনার কাছে তার স্থিতিতে ও তার ক্রিয়াতে বাস্তব করা এবং পরম সত্তা ও সকল সত্তার সঙ্গে ঐক্য বোধের মধ্যে বিভক্ত ব্যষ্টিত্বের বোধ নিমজ্জন করে তা-ই হওয়া — জ্ঞানযোগে এই হল তার সফল সাধনা; ঐক্যের ঐ বোধে বাস করা, চিন্তা, অনুভব, সঙ্কল্প ও কর্ম করা — এই হল ব্যষ্টি সত্তা ও ব্যষ্টিজীবনে তার সফল সাধনা। ভেদের মধ্যে একত্বের এই যে উপলব্ধি এবং একত্বের এই যে অনুশীলন — এই হল যোগের সব কিছু।

অস্তিত্বের যে কোন স্থিতিতে বা যে কোন লোকে সচ্চিদানন্দ স্বরূপে এক। সুতরাং একেই আমাদের সকল সফল ক্রিয়ার ভিত্তি করা কর্তব্য — তা সে ক্রিয়া চেতনার বা শক্তির বা সত্তার হ'ক, জ্ঞান বা সঙ্কল্প বা আনন্দের হ'ক। আমরা যেমন দেখেছি, আমাদের বাস করতে হবে বিশ্বাতীত পরমার্থসৎ-এর চেতনায় এবং সেই পরমার্থসৎ-এর চেতনাতেও যিনি সকল সম্পর্কের মধ্যে অভিব্যক্ত, নৈর্ব্যক্তিক এবং সকল ব্যক্তিরূপ হিসেবে ব্যক্ত, সকল গুণের অতীত এবং অনন্ত গুণসমৃদ্ধ, এক নীরবতা যার মধ্য থেকে নিত্য বাক্ সৃজন করে, এক দিব্য স্থৈর্য ও শান্তি যা অনন্ত আনন্দ ও ক্রিয়ার মধ্যে নিজেকে অধিকার করে। আমাদের তাঁকে পাওয়া চাই এইভাবে যে তিনিই পুরুষরূপ সকল কিছু জানেন, সকল কিছু অনুমোদন করেন, নিয়ন্ত্রণ করেন, সকল কিছুর আধার, ভর্তা এবং আন্তরশক্তি আর তিনিই একসাথে প্রকৃতি রূপে সকল জ্ঞান, সঙ্কল্প ও রূপায়ণ সম্পাদন করেন। তাঁকে দেখা চাই যে তিনিই এক সন্মাত্র, নিজের মধ্যে আত্মসমাহিত সত্তা এবং সর্বভূতের মধ্যে বিলসিত সত্তা; তিনিই এক চেতনারূপে তাঁর অস্তিত্বের ঐক্যের মধ্যে একাগ্র, বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রসারিত এবং অগণিত সত্তার মধ্যে বহু কেন্দ্রগত; তিনিই এক শক্তিরূপে আত্মসমাহিত চেতনার বিশ্রামের মধ্যে স্থিতিক এবং প্রসারিত চেতনার

ক্রিয়ার মধ্যে স্ফুরন্ত; তিনিই এক আনন্দরূপে তাঁর অলক্ষণ আনন্ত্যের কথা সানন্দে অবগত এবং সকল লক্ষণ ও শক্তি ও বিভিন্ন রূপকে নিজ ব'লে সানন্দে অবগত; তিনিই এক সৃজনশীল জ্ঞান ও নিয়ন্তা সঙ্কল্প যা অতিমানসিক, এবং সকল মন, প্রাণ ও দেহের প্রভব ও নির্ধারক; তিনিই এক মন যা সকল মনোময় পুরুষের আশ্রয় ও তাদের সকল মানসিক বৃত্তির উপাদানস্বরূপ; তিনিই এক প্রাণ যা সকল সজীব সত্তার মধ্যে সক্রিয় ও তাদের প্রাণিক ক্রিয়ার উৎপাদক; তিনিই এক ধাতু যা বিভিন্ন রূপ ও বিষয়ের উপাদানস্বরূপ সেই দৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গোচর ছাঁচ যার মধ্যে মন ও প্রাণ ব্যক্ত ও সক্রিয় হয়, ঠিক যেমন এক শুদ্ধ অস্তিত্ব সেই আকাশতত্ত্ব যার মধ্যে সকল চিৎ-শক্তি ও আনন্দ মিলিত হয়ে অবস্থান করে এবং নানাভাবে নিজেদের পায়। কারণ এইগুলিই সচ্চিদানন্দের ব্যক্ত সত্তার সপ্ত তত্ত্ব।

পূর্ণজ্ঞান যোগের কর্তব্য হল এই অভিব্যক্তির দুই প্রকৃতি স্বীকার করা — কারণ সচ্চিদানন্দের পরা প্রকৃতি আছে যার মধ্যে তাঁকে পাওয়া যায় এবং মন, প্রাণ ও দেহের অপরা প্রকৃতি আছে যার মধ্যে তিনি প্রচ্ছন্ন থাকেন; এর আরো উচিত এই দুইকে প্রদীপ্ত উপলব্ধির একত্বের মধ্যে সমন্বিত ও যুক্ত করা। এই দুইকে পৃথক রাখা আমাদের চলে না, কারণ তাহলে আমাদের একপ্রকার দ্বিবিধ জীবন যাপন করতে হয় — ভিতরে বা ঊর্ধ্বে আধ্যাত্মিক, এবং আমাদের সক্রিয় ও পার্থিব জীবনযাত্রায় মানসিক ও জড়াসক্ত; আমাদের কর্তব্য, — পরতর সদ্‌বস্তুর আলোক, শক্তি ও হর্ষে অবর জীবনযাত্রাকে নতুনভাবে দেখা ও পুনর্গঠন করা। আমাদের উপলব্ধি করা চাই যে জড় হল চিৎপুরুষের ইন্দ্রিয়সৃষ্ট ছাঁচ, অর্থাৎ পার্থিব সত্তা ও ক্রিয়ার শ্রেষ্ঠ পরিস্থিতির মধ্যে সচ্চিদানন্দের আলোক, শক্তি ও হর্ষের সকল অভিব্যক্তির এক মাধ্যম। আমাদের দেখা চাই যে প্রাণ অনন্ত দিব্য শক্তির এক প্রবাহ প্রণালী এবং ইন্দ্রিয় ও মন এ থেকে যে দূরত্ব ও বিভাজনের প্রাকার সৃষ্টি করেছে তা ভেঙে ফেলা চাই, তবেই দিব্য সামর্থ্যের পক্ষে সম্ভব হবে আমাদের সকল প্রাণপ্রবৃত্তিকে অধিগত করে চালনা ও পরিবর্তন করা যতক্ষণ না প্রাণশক্তি রূপান্তরিত হয়ে শেষে আর সেই সীমিত প্রাণশক্তি থাকে না যা এখন আমাদের মন ও দেহ ধারণ করে এবং যতক্ষণ না এটি হয়ে ওঠে সচ্চিদানন্দের সর্ব-আনন্দময় চিৎ-শক্তির প্রতিমূর্তি। অনুরূপভাবে আমাদের উচিত আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানগত ও ভাবগত মানসিকতাকে পরিবর্তন করা দিব্য প্রেম ও বিশ্বজনীন আনন্দের লীলায়; আমাদের আরো উচিত আমাদের অন্তঃস্থ জ্ঞান ও সঙ্কল্প প্রয়াসী ধীশক্তিকে পরিপূর্ণ করা দিব্য জ্ঞানসঙ্কল্পের আলোকে যতক্ষণ না এটি রূপান্তরিত হয় সেই পরতর ও মহিমময় কর্মের প্রতিমূর্তিতে।

এই যে রূপান্তর তা সত্যমানসের জাগরণ বিনা সম্পূর্ণ হতে পারে না অথবা প্রকৃতপক্ষে নিষ্পন্ন করা যায় না; মনোময় পুরুষের মধ্যে এই সত্যমানস অতিমানসের প্রতিরূপ এবং এর দীপ্তিরাশিকে মানসিকভাবে গ্রহণ করতে সমর্থ। এই মধ্যবর্তী সামর্থ্যের মুক্ত দুয়ার না থাকায় চিৎপুরুষ ও মনের বিরুদ্ধতার দরুন, পরা ও অপরা —

এই দুই প্রকৃতি পৃথক হয়ে থাকে এবং যদিও যোগাযোগ ও প্রভাব থাকা সম্ভব অথবা অপরাপ্রকৃতির পক্ষে পরাপ্রকৃতিকে একপ্রকার জ্যোতির্ময় অথবা আনন্দময় সমাধির মধ্যে লাভ করা সম্ভব হয়, তাহলেও অপরাপ্রকৃতির পূর্ণ ও সুষ্ঠু রূপান্তর সম্ভব হয় না। জড় ও তার সকল রূপের মধ্যে অবস্থিত চিৎপুরুষকে, সকল ভাবাবেগ ও ইন্দ্রিয়সংবিতের মধ্যে অবস্থিত দিব্য আনন্দকে, সকল প্রাণপ্রবৃত্তির পশ্চাতে দিব্যশক্তিকে আমরা ভাবমানস দিয়ে অপূর্ণভাবে অনুভব করতে পারি, ইন্দ্রিয়মানস দিয়ে বোধ করতে পারি অথবা বুদ্ধিমানস দিয়ে এসবের প্রতীতি ও ধারণা পেতে সক্ষম হই; কিন্তু তবু অপরাপ্রকৃতি তার নিজের স্বভাব বজায় রাখে এবং ঊর্ধ্ব থেকে আসা প্রভাবকে তার ক্রিয়ায় সীমাবদ্ধ ও বিভক্ত করবে এবং তার লক্ষণে পরিবর্তিত করবে। এমনকি যখন এই প্রভাব তার সর্বোচ্চ, সর্বাপেক্ষা ব্যাপ্ত ও তীব্র সামর্থ্য গ্রহণ করে, তখনো এটি তার ক্রিয়ায় অনিয়মিত ও বিশৃঙ্খল হবে, একে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যাবে শুধু শান্তি ও নিস্তব্ধতার মধ্যে; একে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হলে আমরা আবার মাঝে মাঝে তামসিকতার প্রতিক্রিয়ার অধীন হব; সাধারণ জীবন ও এর বিভিন্ন বাহ্য স্পর্শের চাপে এবং দ্বন্দ্বসমূহের আক্রমণে একে ভুলে যাওয়ারই প্রবণতা বেশী হবে, একে সম্পূর্ণভাবে পাবার সম্ভাবনা থাকে শুধু যখন আমরা নিজেদের ও ভগবানের সঙ্গে একাকী থাকি, আর না হয় তাকে পেতে পারি শুধু প্রগাঢ় আনন্দ ও উল্লাসের অবস্থায়, তা সে মুহূর্তব্যাপী হ'ক বা আরো কিছু দীর্ঘসময়ব্যাপী হ'ক। কারণ আমাদের মানসিকতা একটি সীমিত যন্ত্র, এটি বিচরণ করে সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে এবং বিষয়সমূহকে গ্রহণ করে খণ্ড খণ্ড ক'রে আংশিকভাবে, সুতরাং এটি চঞ্চল, অস্থির ও পরিবর্তনশীল হতে বাধ্য; এ স্থিরতা পেতে পারে শুধু তার ক্রিয়ার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ক'রে আর নিষ্ঠা পায় নিবৃত্তি ও বিশ্রামের দ্বারা।

অপরপক্ষে আমাদের প্রত্যক্ষ সত্যদর্শনগুলি আসে সেই অতিমানস থেকে যা আনন্ত্য থেকে সৃষ্টি করে বিশ্বশৃঙ্খলা; এই অতিমানস এমন এক সঙ্কল্প যা জানে ও এমন এক জ্ঞান যা কার্যসাধক। বেদ বলে, এর কর্মপ্রবৃত্তি নিম্নে নিয়ে আসে দ্যুলোকের অবাধ বর্ষণ — আলোক ও সামর্থ্য ও আনন্দের মহো অর্ণঃ থেকে সপ্ত নদীর পূর্ণ প্রবাহ। এ হল সচ্চিদানন্দের প্রকাশক। আমাদের মানসিকতার বিক্ষিপ্ত ও অসম্বদ্ধ আভাসনগুলির পশ্চাতে অবস্থিত সত্যেরও প্রকাশক এ, আর তাদের প্রতিটিকে এ বাধ্য করে পিছনের সত্যের ঐক্যের মধ্যে তাদের আপন আপন স্থানে আসতে; এইভাবে এটি সক্ষম হয় আমাদের মনের অর্ধ-আলোককে রূপান্তরিত করতে আলোকের নিশ্চিত সমগ্রতায়। আমাদের মানসিক সঙ্কল্প ও ভাবগত সব ইচ্ছা ও প্রাণিক চেষ্টার সকল কুটিল ও অপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত সংঘর্ষের পশ্চাতে অবস্থিত সঙ্কল্পকে এটি প্রকাশ করে এবং প্রতিটিকে বাধ্য করে পিছনের জ্যোতির্ময় সঙ্কল্পের ঐক্যের মধ্যে তার আপন স্থানে আসতে; এইভাবে এ সক্ষম হয় আমাদের প্রাণের ও মনের অর্ধ-অন্ধকারময় সংগ্রামকে রূপান্তরিত করতে সুশৃঙ্খল শক্তির এক নিশ্চিত সমগ্রতায়। এটি সেই আনন্দ প্রকাশ করে

যার জন্য আমাদের প্রতি ইন্দ্রিয়সংবিৎ ও ভাবাবেগ হাতড়ায় এবং যা থেকে তারা পিছনে পড়ে হয়ে দাঁড়ায় আংশিক পাওয়া তুষ্টি অথবা অসন্তোষ, যন্ত্রণা, শোক বা উদাসীনতা এবং প্রতিটিকে এ বাধ্য করে পশ্চাতে অবস্থিত বিশ্বজনীন আনন্দের ঐক্যের মধ্যে নিজের স্থানে আসতে; এইভাবে এ সক্ষম হয় আমাদের দ্বন্দ্বভাবাপন্ন সব ভাবাবেগ ও ইন্দ্রিয়-সংবিতের বিরোধকে রূপান্তরিত করতে শান্ত অথচ গভীর ও শক্তিশালী প্রেম ও আনন্দের নিশ্চিত সমগ্রতায়। উপরন্তু এ বিশ্বক্রিয়া প্রকাশ ক'রে সত্তার সেই সত্যকে দেখায় যা থেকে তার প্রতি ক্রিয়া উৎপন্ন হয় ও যার দিকে তারা অগ্রসর হয়; প্রতি গতিতে যে কার্যসাধিকা শক্তি থাকে তা-ও এ দেখায়, আর দেখায় সত্তার আনন্দকে যার জন্য এবং যা থেকে প্রতিটির জন্ম; আর এই সবকে এ সম্পৃক্ত করে সচ্চিদানন্দের বিশ্বসত্তা, চেতনা, শক্তি ও আনন্দের সঙ্গে। এইভাবে এ আমাদের জন্য সুসমঞ্জস করে সৃষ্টির সকল বিরোধ, বিভাজন ও বিপরীতভাবগুলি এবং আমাদের দেখায় তাদের মধ্যে বর্তমান একম্ ও অনন্তকে। এই অতিমানসিক আলোকের মধ্যে উন্নীত হলে, দুঃখ, সুখ ও উদাসীনতা পরিবর্তিত হতে শুরু করে এক স্বপ্রতিষ্ঠ আনন্দের হর্ষে; বল ও দুর্বলতা, সফলতা ও বিফলতা এক স্বয়ং কার্যসাধক শক্তি ও সঙ্কল্পের বিভিন্ন সামর্থ্যে; সত্য ও প্রমাদ, জ্ঞান ও অজ্ঞানতা এক অনন্ত আত্মসংবিৎ ও বিশ্বজ্ঞানের আলোকে; সত্তার বৃদ্ধি ও সত্তার হ্রাস, সসীমতা ও সসীমতার অতিক্রমণ এক আত্মচরিতার্থ করা চিন্ময় অস্তিত্বের বিভিন্ন তরঙ্গে। আমাদের সকল জীবন ও আমাদের সকল মূল সত্তা রূপান্তরিত হয় সচ্চিদানন্দের অধিকারভুক্ত বস্তুতে।

জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির তিনটি পথ যে বিভিন্ন লক্ষ্য নিজেদের সম্মুখে স্থাপন করে তাদের ঐক্যে আমরা উপনীত হই এই পূর্ণজ্ঞানের পথে। জ্ঞানের লক্ষ্য প্রকৃত আত্মসত্তার উপলব্ধি, কর্মের লক্ষ্য সেই দিব্য চেতনার উপলব্ধি যা নিগূঢ়ভাবে সকল কর্ম নিয়ন্ত্রণ করে, ভক্তির লক্ষ্য সেই আনন্দের উপলব্ধি যা প্রেমিকরূপে উপভোগ করে সকল পুরুষকে ও সকল ভূতকে — সৎ, চিৎ-তপস্ ও আনন্দ। অতএব প্রত্যেকেরই লক্ষ্য সচ্চিদানন্দকে পাওয়া তাঁর ত্রয়াত্মক দিব্যপ্রকৃতির একটি বা অপর বিভাবের মধ্য দিয়ে। জ্ঞানের দ্বারা আমরা সর্বদাই উপনীত হই আমাদের প্রকৃত সনাতন অক্ষর সত্তাতে এই সেই স্বয়ম্ভূ যার তামস প্রতিরূপ হল বিশ্বের প্রতি "আমি", আর আমরা ভেদ বিলোপ করি "সোঽহম্" — "আমি তিনি" এই মহতী উপলব্ধির মধ্যে, এবং তার সাথে আমরা আবার উপনীত হই অপর সকল সত্তার সঙ্গে আমাদের তাদাত্ম্যে।

কিন্তু একই সাথে সেই অনন্ত সত্তা সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞানে আমরা জানি যে এ হল এক চিৎ-শক্তি যা বিভিন্ন জগৎ সৃষ্টি ও শাসন করে এবং এদের কর্মের মধ্যে নিজেকে অভিব্যক্ত করে; এটি ঈশ্বররূপে স্বয়ম্ভূকে প্রকট করে তাঁর বিশ্বব্যাপী চিৎসঙ্কল্পের মধ্যে। এর দ্বারাই আমরা সমর্থ হই আমাদের সঙ্কল্পকে তাঁর সঙ্কল্পের সঙ্গে যুক্ত করতে, সকল ভূতের ক্রিয়াশক্তির মধ্যে তাঁর সঙ্কল্পকে উপলব্ধি করতে আর এই বুঝতে যে অপর সকলের এই সব শক্তির চরিতার্থতা আমাদের নিজেদেরই বিশ্বজনীন আত্মচরিতার্থতার

অংশ। এইভাবে দূর হয় সংঘর্ষ ও বিভাজন ও বিরোধের বাস্তবতা, থাকে শুধু তাদের বাহ্য রূপ। অতএব ঐ জ্ঞানের দ্বারা আমাদের দিব্যকর্মসাধন সম্ভবপর হয়, এই কর্মপ্রণালী আমাদের প্রকৃতির কাছে ব্যক্তিগত কিন্তু সত্তার কাছে এ হল নৈর্ব্যক্তিক কারণ এর উদ্ভব "তৎস্বরূপ" থেকে যা আমাদের অহং-এর অতীত এবং কাজ করে শুধু তার বিশ্বগত অনুমতির দ্বারা। আমাদের সব কর্মে আমরা প্রবৃত্ত হই সমত্বের সঙ্গে, কর্ম ও কর্মফলে বদ্ধ না হয়ে, পরতমের সঙ্গে একতানে, বিশ্বাত্মকের সঙ্গে একতানে, আমাদের কাজের জন্য পৃথক দায়িত্ব থাকে না, এবং সেজন্য তাদের সব প্রতিক্রিয়ার কোন প্রভাবও আমাদের স্পর্শ করে না। এই যা আমরা দেখেছি কর্মমার্গের সার্থকতা তা-ই এইভাবে হয়ে ওঠে জ্ঞানমার্গের অনুষঙ্গ ও ফল।

পূর্ণজ্ঞান আমাদের আরো দেখায় যে স্বয়ম্ভূ আবার সর্ব-আনন্দময় যিনি জগৎ প্রকাশক, সকল সত্তা-প্রকাশক সচ্চিদানন্দরূপে তাদের আরাধনা গ্রহণ করেন, — যেমন তিনি গ্রহণ করেন তাদের সব আস্পৃহার কাজ ও জ্ঞানের এষণা এবং তাদের দিকে আনত হয়ে তাদের নিজের কাছে আকর্ষণ ক'রে সকলকে গ্রহণ করেন তাঁর ভাগবতসত্তার হর্ষের মধ্যে। তিনি যে আমাদের দিব্য আত্মা তা জেনে আমরা তাঁর সঙ্গে এক হই, যেমন প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ এক হয় ঐ আলিঙ্গনের উল্লাসে। সকল সত্তারও মধ্যে তাঁকে জেনে, সর্বত্র প্রেমাস্পদের মহিমা ও সৌন্দর্য ও হর্ষ অনুভব ক'রে আমরা আমাদের অন্তঃপুরুষকে রূপান্তরিত করি বিশ্বজনীন আনন্দের তীব্র ভাবাবেগ ও বিশ্বজনীন প্রেমের ব্যাপ্তিতে ও হর্ষে। এই যেসব আমরা দেখব ভক্তিমার্গের পরাকাষ্ঠা তা-ও হয়ে ওঠে জ্ঞানমার্গের অনুষঙ্গ ও ফল।

এইভাবে পূর্ণজ্ঞানের দ্বারা আমরা সবকিছুকে এক করি 'একম্'-এর মধ্যে। আমরা বিশ্বসঙ্গীতের সকল তানই গ্রহণ করি, সকল সুর গ্রহণ করি তা সে সব সুর মধুর বা কর্কশ হ'ক, আভাসনে ভাস্বর বা তমসাচ্ছন্ন হ'ক, শক্তিশালী বা অস্পষ্ট হ'ক, শোনা যাক অথবা শোনা না যাক, আর আমরা দেখি যে সব পরিবর্তিত হয়ে সমন্বিত হয়েছে সচ্চিদানন্দের অবিভাজ্য একতানের মধ্যে। জ্ঞান সামর্থ্য ও আনন্দও আনে। "তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ" (যে সর্বত্র একত্ব দেখে তার মোহই বা হবে কেমন করে শোকই বা আসবে কোথা থেকে?)।

সপ্তদশ অধ্যায়

পুরুষ ও প্রকৃতি

পূর্ণজ্ঞানকে সমগ্রভাবে নিলে, এই তার ফল; এর কাজ হ'ল আমাদের সত্তার বিভিন্ন তন্ত্রীগুলি নিয়ে বিশ্বসত্তার মধ্যে একত্র করা। ভগবান যেমন জগৎকে অধিগত করেন, আমরাও যদি চাই জগৎকে তেমন সুষ্ঠুভাবে অধিগত করতে আমাদের দিব্যভাবাপন্ন চেতনার মধ্যে, আমাদেরও জানতে হবে প্রতি বিষয়কে তার একান্ত সত্তাতে, — প্রথমে এ একাকী যেমন, তেমনভাবে এবং দ্বিতীয়তঃ যে সকল তাকে সম্পূর্ণ করে সেই সকলের সঙ্গে তার যোগে; কারণ ভগবান এইভাবেই তাঁর সত্তাকে জগতের মধ্যে প্রতিফলিত করেছেন ও দেখেছেন। বিষয়সমূহকে অংশ হিসেবে, অপূর্ণ পদার্থ হিসেবে দেখা নিম্ন বিশ্লেষণমূলক জ্ঞান। পরমার্থসৎ সর্বত্র বিরাজিত, সর্বত্রই তাঁকে দেখা ও পাওয়া চাই। প্রতি সান্তই অনন্ত এবং তাকে জানা ও বোধ করা চাই যেমন তার উপরভাসা সান্ত বাহ্যরূপে তেমন তার স্বকীয় অনন্ততাতে। কিন্তু জগৎকে ঐভাবে জানতে হলে, একে ঐভাবে দেখতে ও অনুভব করতে হলে, এ যে ঐরকম সে সম্বন্ধে শুধু এক বুদ্ধিগত ভাবনা বা কল্পনা পাওয়াই যথেষ্ট নয়। দরকার একপ্রকার দিব্য দর্শন, দিব্য বোধ, দিব্য উল্লাস, আমাদের চেতনার বিষয়সমূহের সঙ্গে আমাদের নিজেদের মিলনের অনুভূতি। ঐ অনুভূতিতে শুধু যে পরপার তা নয়, এপারেরও সবকিছু, শুধু যে সমগ্রতা অর্থাৎ সমষ্টিরূপী সর্ব তা নয়, সর্বের মধ্যে প্রতি জিনিসটি আমাদের কাছে হয়ে ওঠে আমাদের আত্মা, ভগবান, পরমার্থসৎ ও অনন্ত, সচ্চিদানন্দ। ভগবানের জগতে সম্পূর্ণ আনন্দের, মন ও হৃদয় ও সঙ্কল্পের সম্পূর্ণ তৃপ্তির, চেতনার সম্পূর্ণ মুক্তির রহস্য হল এই। এই সেই পরমা অনুভূতি যা পাবার জন্য কলা ও কাব্য, এবং প্রত্যক্‌বৃত্ত ও পরাক্‌বৃত্ত জ্ঞানের এইসকল নানাবিধ প্রযত্ন, বিষয়সমূহকে অধিকার ও উপভোগ করার সকল কামনা ও চেষ্টা অল্পবিস্তর অজ্ঞানভাবে প্রবৃত্ত; বস্তুগুলির বিভিন্ন রূপ ও ধর্ম ও গুণ আয়ত্ত করার জন্য তাদের যে চেষ্টা তা শুধু এক প্রাথমিক কাজ কিন্তু এতে গভীরতম তৃপ্তি আসে না যদি না এইসব বস্তুকে সুষ্ঠু ও একান্তভাবে আয়ত্তে এনে তারা সেই অনন্ত সদ্‌বস্তুর বোধ লাভ করে যার বাহ্য প্রতীক এইসব বস্তু। যুক্তিবাদী মনে ও সাধারণ ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে একথা মনে হতে পারে শুধু কবির কল্পনা বা রহস্যপূর্ণ ভ্রম; কিন্তু যে একান্ত তৃপ্তি ও প্রকাশবোধ এ দেয়, — আর একমাত্র এই তা দিতে সক্ষম, — তা-ই বস্তুতঃ এক প্রমাণ যে এ হল এক মহত্তর সত্য; ওর দ্বারা আমরা সেই পরতর চেতনা ও দিব্যতর বোধ থেকে এক রশ্মি পাই যাতে শেষ পর্যন্ত রূপান্তরিত হবার জন্যই আমাদের আন্তর সত্তা অভিপ্রেত, — শুধু যদি আমরা তাতে সম্মত হই।

আমরা দেখেছি যে ভাগবত সত্তার শ্রেষ্ঠ তত্ত্বরাজি সম্বন্ধে এটি প্রযোজ্য।

সাধারণতঃ বিচারশীল মন আমাদের বলে যে যা সকল অভিব্যক্তির অতীত শুধু তা-ই অনপেক্ষ, শুধু নীরূপ চিৎপুরুষই অনন্ত, শুধু কালাতীত, দেশাতীত, অক্ষর, নিশ্চল আত্মাই তার বিশ্রাম অবস্থায় একান্তভাবে সত্য; আর যদি আমরা আমাদের সাধনায় এই ভাবনা অনুসরণ করি ও এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হই তাহলে ঐ প্রত্যক্‌বৃত্ত অনুভূতিতেই আমরা উপনীত হব, অন্যসব আমাদের কাছে মনে হবে মিথ্যা বা শুধু আপেক্ষিকভাবে সত্য। কিন্তু যদি আমরা শুরু করি বৃহত্তর ভাবনা থেকে, তাহলে এক পূর্ণতর সত্য ও বিশালতর অনুভূতি আমাদের নিকট উন্মুক্ত হয়। আমরা অনুভব করি যে কালাতীত, দেশাতীত অস্তিত্বের অক্ষর অবস্থা এক অনপেক্ষ ও অনন্ততত্ত্ব; কিন্তু ভাবগত সত্তার যে বিভাবে এটি তার বিভিন্ন সামর্থ্য, গুণ ও আত্ম-সৃজনের বহির্বর্ষণকে সর্ব-আনন্দময়ভাবে অধিগত করে তার চিৎ-শক্তি ও সক্রিয় আনন্দও এক অনপেক্ষ ও অনন্ত তত্ত্ব — আর বস্তুতঃ এ হল সেই একই অনপেক্ষ ও অনন্ত তত্ত্ব, আর এতই এক যে আমরা একই সাথে সমভাবে উপভোগ করতে সক্ষম হই দিব্য কালাতীত স্থৈর্য ও প্রশান্তি এবং সক্রিয়তার দিব্য কালাধিকারী আনন্দ আর তা হয় স্বচ্ছন্দভাবে, অনন্তভাবে, তাতে বন্ধন থাকে না, অথবা অস্থিরতা ও কষ্টভোগের মধ্যেও পড়তে হয় না। এই যে সক্রিয়তা যা অক্ষরের মধ্যে আত্ম-নিহিত ও এক অর্থে অন্তরে প্রত্যাহৃত ও গুপ্ত আর বিশ্বে প্রকাশিত তার সকল তত্ত্ব সম্বন্ধেই আমরা ঐ একই অনুভূতি পেতে এবং তাদের অনন্তগুণ ও সামর্থ্য উপলব্ধি করতে সমর্থ হই।

এই তত্ত্বগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হল পুরুষ ও প্রকৃতির দ্বৈতভাব যা ঐক্যে পর্যবসিত হয়; এই দ্বৈতভাব সম্বন্ধে আমরা কর্মযোগে আগে বলেছি। কিন্তু জ্ঞানযোগের পক্ষেও এটি সমানই গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনসমূহে এই ভাগটি সুস্পষ্টভাবে করা হয়েছিল; কিন্তু এর ভিত্তি হল ঐক্যের মধ্যে ব্যবহারিক দ্বৈতভাবের চিরন্তন তথ্য যার উপর জগৎ-অভিব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত। বিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের যেমন দৃষ্টি সেই অনুযায়ী এর বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়। বেদান্তবাদীরা নাম দিয়েছিল — আত্মা ও মায়া; তাদের পূর্বানুরাগ অনুযায়ী কারও কাছে আত্মার অর্থ অক্ষর তত্ত্ব আর মায়া আত্মার সেই সামর্থ্য যার বলে আত্মা নিজের উপর বিশ্বভ্রান্তি আরোপ করে; অথবা অন্য কারও কাছে আত্মার অর্থ ভাগবত সত্তা, আর মায়ার অর্থ চিৎ-সত্তা ও চিৎ-শক্তির প্রকৃতি যার দ্বারা ভগবান নিজেকে মূর্ত করেন পুরুষ রূপে ও বিষয়সমূহের রূপে: অন্য কেউ নাম দিল — ঈশ্বর ও শক্তি, প্রভু ও তাঁর শক্তি, তাঁর বিশ্বসামর্থ্য। সাংখ্যের বিশ্লেষণমূলক দর্শন বলত যে তাদের দ্বৈতভাব চিরন্তন, একত্বের কোন সম্ভাবনা নেই, এতে স্বীকার করা হ'ত শুধু মিলন ও বিচ্ছেদের সম্পর্ক যার দ্বারা প্রকৃতির বিশ্বক্রিয়া পুরুষের জন্য আরম্ভ হয়, চলতে থাকে অথবা নিবৃত্ত হয়; কারণ পুরুষ নিষ্ক্রিয় চিন্ময় সত্তা — তা স্বরূপে একই এবং চিরকাল অক্ষর, — প্রকৃতি হল নিসর্গের সক্রিয়া শক্তি যা তার গতির দ্বারা বিশ্বপ্রপঞ্চ সৃজন ও পালন করে এবং স্থিতির মধ্যে মগ্ন হয়ে এর লয় সাধন করে। এই সব দার্শনিক পার্থক্য ছেড়ে দিলে, আমরা সেই আদি মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতিতে আসি

যেখান থেকে বাস্তবিকই সকলের আরম্ভ অর্থাৎ এই অনুভূতি যে সকল বিশ্বের না হলেও সকল প্রাণীর, সকল মনুষ্যের সত্তাতে দুইটি তত্ত্ব বিদ্যমান — এক দ্বৈতসত্তা, প্রকৃতি ও পুরুষ।

এই দ্বৈতভাব স্বতঃসিদ্ধ। আদৌ কোন দার্শনিক বিচার না করেই, শুধু অভিজ্ঞতাবলেই আমরা সকলে এটি দেখতে পাই, যদিও এর কোন আঁটসাঁট বর্ণনা দেবার চেষ্টা আমরা করি না। যে আত্যন্তিক জড়বাদে পুরুষকে অস্বীকার করা হয়, অথবা বলা হয় যে এ শুধু এক প্রাকৃতিক ঘটনার অল্পবিস্তর ভ্রান্তিপূর্ণ ফল যখন তা সক্রিয় হয় স্থূল মস্তিষ্কের সেই দুর্বোধ্য বিষয়ের উপর যাকে আমরা চেতনা বা মন বলি, কিন্তু যা বাস্তবিকই একপ্রকার জটিল স্নায়বিক আক্ষেপের বেশী আর কিছু নয়, এমনকি সেই জড়বাদও এই দ্বৈতভাবের ব্যবহারিক তথ্যকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। কিভাবে এর উৎপত্তি হল সে কথায় আদৌ কিছু যায় আসে না; একথা অনস্বীকার্য যে এ আছে, এ হল আমাদের সমগ্র জীবনের নির্ধারক, আর আমরা যে মানুষ, আমাদের সঙ্কল্প বুদ্ধি আছে, এক আন্তর জীবন আছে যার জন্যই আমাদের সকল সুখ ও দুঃখভোগ, আমাদের কাছে এই একটি জিনিস বাস্তবিকই গুরুত্বপূর্ণ। জীবনের সমগ্র সমস্যাই এই একটিমাত্র প্রশ্নে পর্যবসিত হয়, — "এই যে অন্তঃপুরুষ ও প্রকৃতি যারা পরস্পরের মুখোমুখি বিদ্যমান — একদিকে এই প্রকৃতি, এই ব্যক্তিগত ও বিশ্বক্রিয়া যা চেষ্টা করে অন্তঃপুরুষের উপর তার প্রভাব ফেলতে, তাকে অধিগত, নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ করতে, আর অন্যদিকে এই অন্তঃপুরুষ যা এক রহস্যময়ভাবে অনুভব করে যে তার স্বাধীনতা আছে, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আছে, সে যা হয় ও করে তার জন্য তার দায়িত্ব আছে আর সেজন্য সে চেষ্টা করে নিজের ও জগতের প্রকৃতির সঙ্গে মোকাবিলা করতে, একে নিয়ন্ত্রণ, অধিগত ও উপভোগ করতে অথবা হয়ত তা বর্জন ক'রে তা থেকে নিষ্কৃতি পেতে, — এদের নিয়ে আমরা কি করব?" এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাদের জানতে হবে, — জানতে হবে অন্তঃপুরুষ কি করতে সক্ষম, জানতে হবে নিজেকে নিয়ে সে কি করতে সক্ষম, আরো জানতে হবে প্রকৃতি ও জগতকে নিয়ে সে কি করতে সক্ষম। মানবের সমগ্র দর্শন, ধর্ম, প্রাকৃতবিজ্ঞান বাস্তবিকই আর কিছু নয়, সেসব শুধু এক প্রয়াস যাতে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পক্ষে প্রয়োজনীয় সব সঠিক তথ্য পাওয়া যায় এবং আমাদের জ্ঞানের ক্ষমতামতো সন্তোষজনকভাবে আমাদের জীবনের সমস্যার সমাধান হয়।

এই যে আমাদের অপরা ও বিক্ষুব্ধ প্রকৃতি ও সত্তার সঙ্গে আমাদের বর্তমান সংঘর্ষ ও তাদের অধীনতা তা থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাবার আশা জাগে যখন আমরা অনুভব করি যে আমাদের পুরুষ-সত্তার দুইটি স্থিতি আছে — একটি নিম্ন, বিক্ষুব্ধ ও অধীনস্থ অপরটি উচ্চ, পরম, অক্ষুব্ধ ও প্রভুত্বপূর্ণ; একটি মনের মধ্যে দোলায়মান, অন্যটি চিৎপুরুষের মধ্যে প্রশান্ত; এদের কথা ধর্ম ও দর্শন স্বীকার করে কিন্তু আধুনিক ভাবনা চেষ্টা করেছে তা অস্বীকার করতে। শুধু নিষ্কৃতি লাভের নয়, এক সম্পূর্ণ সন্তোষজনক ও বিজয়ী সমাধানের আশার উদয় হয় যখন আমরা অনুভব করি — যেমন কোন কোন

ধর্ম ও দর্শন স্বীকার করে কিন্তু অন্যেরা মনে হয় অস্বীকার করে — যে অন্তঃপুরুষ ও প্রকৃতির দ্বৈতভাবাপন্ন ঐক্যের মধ্যেও এক নিম্ন, সাধারণ মানবীয় পাদ ও এক উচ্চতর দিব্য পাদ বিদ্যমান; এই দিব্য পাদের মধ্যে দ্বৈতভাবের অবস্থাগুলি পরাবর্তিত হয় এবং অন্তঃপুরুষ তা-ই হয় যা হবার জন্য সে এখন শুধু সংগ্রাম ও আস্পৃহা করে অর্থাৎ নিজের প্রকৃতির প্রভু হয়, স্বাধীন হয় এবং ভগবানের সঙ্গে মিলনে জগৎ-প্রকৃতিরও অধিকারী হয়। এই সম্ভাবনাগুলি সম্বন্ধে আমাদের যেমন ভাবনা হবে, সেই অনুযায়ী সমাধান সাধনেও আমাদের চেষ্টা হবে।

যখন অন্তঃপুরুষ মনের মধ্যে সংবৃত্ত থাকে, মানসিক ভাবনা, ইন্দ্রিয়সংবিৎ, ভাবাবেগ, জগতের প্রাণিক ও ভৌতিক সব আঘাত গ্রহণ ও সেসবে যান্ত্রিক প্রত্যাঘাত প্রভৃতির সাধারণ ঘটনার দ্বারা অধিগত থাকে তখন অন্তঃপুরুষ প্রকৃতির অধীন। এমনকি তার সঙ্কল্প ও বুদ্ধিও তার মানসিক প্রকৃতির দ্বারা নির্ধারিত হয় আর এইসব এমনকি আরো বেশী নির্ধারিত হয় তার পরিবেশের মানসিক প্রকৃতির দ্বারা যা ব্যষ্টি মানসিকতার উপর সূক্ষ্ম ও নিগূঢ়ভাবে কাজ ক'রে তাকে অভিভূত করে; সুতরাং নিজের অভিজ্ঞতা ও ক্রিয়াকে নিয়মাধীন, নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ করার জন্য তার যে চেষ্টা তার মধ্যে এক ভ্রান্তি রয়ে যায়, কারণ সে যখন ভাবে যে সে কাজ করছে, তখন প্রকৃতপক্ষে কাজ করছে প্রকৃতি, যা সব সে চিন্তা করে, সঙ্কল্প করে ও সম্পাদন করে, আসলে সেসব নির্ধারণ করে প্রকৃতি। তার মধ্যে যদি সততই এই জ্ঞান না থাকত যে সে আছে, যে সে নিজে নিজেই বিদ্যমান, সে দেহ বা প্রাণ নয়, বরং অন্য কিছু যা বিশ্ব-অভিজ্ঞতাকে নির্ধারণ না করলেও অন্ততঃ তা গ্রহণ ও স্বীকার করে তাহলে শেষ পর্যন্ত সে বাধ্য হ'ত এই মনে করতে যে প্রকৃতিই সব এবং অন্তঃপুরুষ এক ভ্রান্তি। এই সিদ্ধান্তই আধুনিক জড়বাদ স্বীকার করে, শূন্যবাদী বৌদ্ধমতও এই সিদ্ধান্তে এসেছিল; এই উভয়সঙ্কট দেখে সাংখ্য তার সমাধান করল এই বলে যে বাস্তবিকপক্ষে পুরুষ প্রকৃতির নির্ধারণগুলি শুধু প্রতিফলিত করে, সে নিজে কিছু নির্ধারণ করে না, সে প্রভু নয়, তবে সেইসবকে প্রতিফলিত করতে অস্বীকার করে সে নিজে ফিরে যেতে পারে শাশ্বত নিশ্চলতা ও প্রশান্তির মধ্যে। অন্য এমন সব সমাধানও আছে যেসব ঐ একই ব্যবহারিক সিদ্ধান্তে আসে বটে, কিন্তু অন্য প্রান্ত থেকে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক প্রান্ত থেকে তারা বলে যে প্রকৃতি ভ্রম বা মায়া অথবা পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই অনিত্য এবং তারা আমাদের কাছে এমন এক অতীত অবস্থার নির্দেশ দেয় যেখানে তাদের দ্বৈতভাব থাকে না, হয় তারা উভয়ই চিরন্তন ও অনির্বচনীয় কিছুর মধ্যে বিলীন হয়, নয় সক্রিয় তত্ত্বটিকে পুরোপুরি বাদ দেওয়া হয়। যদিও এই সব সমাধানে মানবজাতির বৃহত্তর আশার এবং গভীর সংবেগ ও আস্পৃহার তৃপ্তি হয় না, তবু তাদের সীমার মধ্যে তারা যুক্তিসিদ্ধ; কারণ তারা পায় পরমার্থসৎকে তার স্বরূপে, অথবা অন্তঃপুরুষের পৃথক একান্ততায়, যদিও তারা পরমার্থসৎ-এর সেই সব বহু আনন্দময় আনন্ত্য বর্জন করে যা মানবের মাঝে চিরন্তন অন্বেষুর কাছে আনা হয় যখন পুরুষ তার দিব্য সত্তায় প্রকৃতির সত্যকার অধিকার পায়।

চিৎপুরুষের মধ্যে উন্নীত হলে পুরুষ আর প্রকৃতির অধীন থাকে না, সে এই

মানসিক ক্রিয়ার উর্ধ্বে থাকে। সে উর্ধ্বে থাকতে পারে বিচ্ছিন্ন ও বিবিক্ত হয়ে, উদাসীন অর্থাৎ নিস্পৃহভাবে উর্ধ্বে আসীন হতে পারে, অথবা নিজের সম্বন্ধে তার নির্বিশেষ, তার একাগ্র আধ্যাত্মিক অনুভূতির তন্ময়-করা প্রশান্তি বা আনন্দের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তাতে লীন হয়ে থাকতে পারে; তখন আমাদের কাজ হবে প্রকৃতি ও বিশ্বসত্তা সম্পূর্ণ ত্যাগ করে অতিস্থিত হওয়া, দিব্য ও নিরঙ্কুশ প্রাপ্তির দ্বারা জয় করা নয়। কিন্তু চিৎপুরুষ, ভগবান যে শুধু প্রকৃতির উর্ধ্বে তা নয়, তিনি প্রকৃতি ও বিশ্বের ঈশ্বরও বটে; পুরুষের কর্তব্য তার আধ্যাত্মিক স্থিতিতে উঠে ভগবানের সঙ্গে তার ঐক্যের দ্বারা অন্ততঃ সেই একই ঈশনা লাভে সমর্থ হওয়া। নিজের প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণে সমর্থ হওয়া তার অবশ্য কর্তব্য কিন্তু তা শুধু শান্তির মধ্যে নয়, বা এই প্রকৃতিকে জোর করে নিবৃত্ত করে নয়, তা করা চাই তার ক্রীড়া ও সক্রিয়তাকে অপ্রতিহতভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। নিম্ন স্থিতিতে এ সম্ভব নয়, কারণ পুরুষ কাজ করে মনের মাধ্যমে, আর মন কাজ করতে পারে শুধু এক একটি জীবের মধ্য দিয়ে ও আংশিকভাবে সেই বিশ্বপ্রকৃতিকে তুষ্টির সঙ্গে মান্য করে অথবা ক্ষোভের সঙ্গে তার অধীন হয়ে, যে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্য দিয়ে দিব্যজ্ঞান ও দিব্যসঙ্কল্প বিশ্বের মধ্যে সাধিত হয়। কিন্তু চিৎপুরুষ জ্ঞান ও সঙ্কল্পের অধিকারী, সে তাদের উৎস ও কারণ, তাদের অধীন নয়; সুতরাং যে অনুপাতে পুরুষ তার দিব্য অথবা আধ্যাত্মিক সত্তা গ্রহণ করে, সেই অনুপাতে সে তার প্রকৃতির গতিরও উপর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। প্রাচীন ভাষায়, সে হয়ে ওঠে স্বরাট, অর্থাৎ মুক্ত এবং নিজের জীবন ও সত্তার রাজত্বের আত্ম-শাসক। কিন্তু তার পরিবেশের, তার জগতের উপরও তার নিয়ন্ত্রণ বর্ধিত হয়। কিন্তু সে এটি করতে পারে শুধু নিজেকে বিশ্বভাবাপন্ন ক'রে; কারণ দিব্য ও বিশ্বগত সঙ্কল্পকেই তার প্রকাশ করা চাই জগতের উপর তার ক্রিয়ার মধ্যে। প্রথমে তার কর্তব্য হ'ল মনের মতো ক্ষুদ্র বিভক্ত ব্যক্তিসত্বের শারীরিক, প্রাণিক, ইন্দ্রিয়গত, ভাবগত, বুদ্ধিগত দৃষ্টির দ্বারা সীমাবদ্ধ না হয়ে তার চেতনা প্রসারিত করা এবং বিশ্বকে দেখা নিজের মধ্যে; তার নিজের বুদ্ধিগত সব ভাবনা, কামনা ও চেষ্টা, অভিরুচি, উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়, সংবেগ আঁকড়ে না থেকে তার গ্রহণ করা উচিত সব জগৎ-সত্য, জগৎ-ক্রিয়াশক্তি, জগৎ-প্রবণতা, জগৎ-উদ্দেশ্য; তার নিজের যেসব বুদ্ধিগত ভাবনা, কামনা ইত্যাদি থাকে সেসবকে বিশ্বভাবের সঙ্গে সুসঙ্গত করা আবশ্যক। তারপর তার কর্তব্য হল, তার জ্ঞান ও সঙ্কল্পকে তাদের উৎসেই নিবেদন করা দিব্য জ্ঞান ও দিব্য সঙ্কল্পের নিকট এবং এইভাবে নিবেদনের মধ্য দিয়ে লয়ে উপনীত হওয়া যাতে তার ব্যক্তিগত আলো মিলিয়ে যায় দিব্য আলোকের মধ্যে, তার ব্যক্তিগত প্রবর্তনার বিনাশ হয় দিব্য প্রবর্তনার মধ্যে। প্রথম দরকার অনন্তের সঙ্গে একতান হওয়া, ভগবানের সঙ্গে সুসমঞ্জস হওয়া এবং পরে দরকার অনন্তের সঙ্গে মিলিত হওয়া, ভগবানের মধ্যে গৃহীত হওয়া — তবেই সম্ভব হবে পূর্ণ ক্ষমতা ও ঈশনা, আর ঠিক এই হল আধ্যাত্মিক জীবন ও সত্তার আসল প্রকৃতি।

পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ও প্রভুত্বের দিকে পুরুষের যে গতি তাতে প্রকৃতির দিকে পুরুষ যেসব

বিভিন্ন ভাব নিতে পারে তার সন্ধান পাওয়া যাবে গীতায় পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যে পার্থক্য করা হয়েছে তা থেকে। গীতা বলে, পুরুষ সাক্ষী, ভর্তা, অনুমন্তা, জ্ঞাতা, ঈশ্বর, ভোক্তা; প্রকৃতি কার্য সাধন করে, এ হল এক সক্রিয় তত্ত্ব এবং পুরুষের ভাব অনুযায়ী এর কোন না কোন ক্রিয়া থাকবেই। ইচ্ছা করলে পুরুষ শুদ্ধ সাক্ষীর স্থিতি নিতে পারে; প্রকৃতির ক্রিয়াকে সে দেখতে পারে এমন এক বিষয় হিসেবে যা থেকে সে পৃথক হয়ে অবস্থিত এ শুধু লক্ষ্য করে, কিন্তু নিজে কোন অংশ নেয় না। এই যে শান্ত থাকার সামর্থ্য তার গুরুত্ব আমরা দেখেছি, এ হল সেই প্রত্যাহার ক্রিয়ার ভিত্তি যার দ্বারা আমরা দেহ, প্রাণ, মানসিক ক্রিয়া, ভাবনা, ইন্দ্রিয়সংবিৎ, ভাবাবেগ প্রভৃতি সব কিছু সম্বন্ধে বলতে পারি, "প্রাণ, মন ও দেহের মধ্যে যা সক্রিয় তা প্রকৃতি, এ আমি নয়, এ এমনকি আমরাও নয়," আর এইভাবে আমরা পাই এই সব বিষয় থেকে পুরুষের বিচ্ছিন্নতা এবং তাদের উপশম। অতএব এইভাবে যে ত্যাগ বা অন্ততঃ অংশ না নেওয়ার মনোভাব আসে তা তামসিক হতে পারে যখন প্রাকৃত ক্রিয়া থাকাকালীন তা মাথা পেতে নিশ্চেষ্টভাবে সহ্য করা হয়, এটি রাজসিক হতে পারে যদি তাতে বিরক্তি, ঘৃণা বা জুগুপ্সার ভাব থাকে, সাত্ত্বিক হতে পারে যদি পুরুষের বিচ্ছিন্নতা সম্বন্ধে ভাস্বর বুদ্ধি এবং বিবিক্ততা ও বিশ্রামের শান্তি ও হর্ষ থাকে, তবে তার সঙ্গে এক সম ও নৈর্ব্যক্তিক আনন্দও থাকতে পারে, এ আনন্দ যেন অভিনয়-দর্শকের আনন্দ, দর্শক আনন্দ পায় কিন্তু আসক্ত হয় না, সে যেকোন সময়ই উঠে পড়ে সমানই আনন্দের সঙ্গে অভিনয় ছেড়ে চলে যেতে পারে! সাক্ষীর শ্রেষ্ঠ মনোভাব হল বিশ্বসৃষ্টির ঘটনাসমূহের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ আসক্তিশূন্যতা ও মুক্তি।

শুদ্ধ সাক্ষী হিসেবে, পুরুষ অস্বীকার করে প্রকৃতির ভর্তা বা পোষক হয়ে কাজ করতে। "ভর্তা" অন্য কিছু, ভগবান বা শক্তি বা মায়া, কিন্তু পুরুষ নয়, পুরুষ শুধু তার সাক্ষী — চেতনার উপর প্রাকৃত ক্রিয়ার প্রতিবিম্ব পড়তে দেয়, কিন্তু তা পালন করার বা বজায় রাখার কোন দায়িত্ব নেয় না। সে এই কথা বলে না, "এই সব আমার মধ্যে আছে, আমি এদের পালন করি, এরা আমার সত্তার ক্রিয়া"; বড় জোর সে বলে, "এই সব আমার উপর আরোপিত হয়েছে, কিন্তু বাস্তবিকই তারা আমার বাইরের জিনিস।" অস্তিত্বের মধ্যে স্পষ্ট ও সত্যকার দ্বৈত না থাকলে, বিষয়টির সমগ্র সত্য এ হতে পারে না; পুরুষ ভর্তাও বটে, যে ক্রিয়াশক্তি বিশ্বের দৃশ্যাবলী উদঘাটিত করে আর তার বিভিন্ন ক্রিয়াশক্তি চালনা করে তাকে পুরুষ তার সত্তার মধ্যে ধারণ করে। যখন পুরুষ ভর্তার এই কাজ স্বীকার করে, তখন সে তা করতে পারে নিষ্ক্রিয়ভাবে ও আসক্তিশূন্য হয়ে আর এই অনুভব করে যে সে শক্তি দেয় কিন্তু তা নিয়ন্ত্রণ বা নির্ধারণ করে না। নিয়ন্ত্রণ করে অন্য কেউ, — ভগবান অথবা শক্তি অথবা মায়ার স্বরূপ; পুরুষ শুধু নিস্পৃহভাবে ভরণ করে তবে যতক্ষণ না করলে নয়, হয়ত ততক্ষণ ভরণ করে যতক্ষণ তার অতীত অনুমতির ও ক্রিয়াশক্তিতে তার আগ্রহের শক্তি বজায় থাকে ও শেষ হতে চায় না। কিন্তু ভর্তার মনোভাব সম্পূর্ণ স্বীকার করা হলে, বুঝতে হবে যে সক্রিয় ব্রহ্মের ও তার

বিশ্বসত্তার আনন্দের সঙ্গে তাদাত্ম্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করা হয়েছে। কারণ পুরুষ হয়ে উঠেছে সক্রিয় অনুমতিদাতা।

সাক্ষীর ভাবেও একপ্রকার অনুমতি আছে, তবে তা নিষ্ক্রিয়, নিশ্চেষ্ট এবং তাতে কোন একান্ততা নেই; কিন্তু যদি সে ভরণ করতে সম্পূর্ণ রাজী হয়, তাহলে অনুমতি সক্রিয় হয়ে উঠেছে যদিও পুরুষ রাজী হয় প্রকৃতির সকল ক্রিয়াশক্তিকে শুধু প্রতিফলিত, ভরণ ও সেইভাবে পালন করতে এবং তার বেশী সে কিছু করে না, নির্ধারণ করে না, নির্বাচন করে না, এই বিশ্বাস করে যে যা নির্বাচন ও নির্ধারণ করে তা ভগবান বা শক্তি স্বয়ং বা কোন জ্ঞানসঙ্কল্প, আর পুরুষ শুধু সাক্ষী ও ভর্তা এবং এইভাবে অনুমতিদাতা, "অনুমন্তা" কিন্তু জ্ঞান ও সঙ্কল্পের অধিকারী ও পরিচালক, "জ্ঞাতা ঈশ্বরঃ" সে নয়। কিন্তু যদি তার অভ্যাসই হয় তার কাছে যা দেওয়া হয় তার মধ্যে থেকে নির্বাচন ও বর্জন করা, তাহলে সে নির্ধারক; আপেক্ষিক নিষ্ক্রিয় অনুমতি হয়ে উঠেছে সম্পূর্ণ সক্রিয় অনুমতি এবং হতে চলেছে সক্রিয় নিয়ন্ত্রণ।

সক্রিয় নিয়ন্তা সে হয়ে ওঠে যখন প্রকৃতির জ্ঞাতা, ঈশ্বর ও ভোক্তা হিসেবে তার যে সম্পূর্ণ কাজ তা সে স্বীকার করে। জ্ঞাতা হিসেবে পুরুষ সেই শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞানের অধিকারী যা কাজ করে ও নির্ধারণ করে, সে সত্তার সেইসব বিভিন্ন মূল্যগুলি দেখে যেগুলি বিশ্বের মধ্যে নিজেদের চরিতার্থ করছে, সে নিয়তির রহস্যের মধ্যে অবস্থিত। কিন্তু শক্তি নিজেই জ্ঞানের দ্বারা নির্ধারিত হয়, জ্ঞানই তার আদি ও উৎস, তার বিভিন্ন মূল্যায়নের মাননির্দেশক ও সব মূল্যের ফলদায়ক। অতএব যে অনুপাতে পুরুষ আবার জ্ঞাতা হয় সেই অনুপাতে সে আবার ক্রিয়ার নিয়ন্তাও হয়। আবার এও সে করতে পারে না সক্রিয় "ভোক্তা" না হয়ে। অবর সত্তায় ভোগ দুই প্রকারের — সদর্থক ও নঞর্থক, যা ইন্দ্রিয়সংবিতের তড়িৎপ্রবাহের মধ্যে রূপান্তরিত হয় সুখে ও দুঃখে, কিন্তু পরসত্তায় এটি আত্ম-অভিব্যক্তিতে দিব্য আনন্দের এক সক্রিয় সম উপভোগ। এতে মুক্তির কোন হানি নেই, অজ্ঞানময় আসক্তির মধ্যেও কোন অবতরণ নেই। যে জীব তার অন্তঃপুরুষে মুক্ত সে জানে যে ভগবান প্রকৃতির ক্রিয়ার ঈশ্বর, মায়া তাঁর জ্ঞানসঙ্কল্প যা সব কিছু নির্ধারণ ও সম্পাদন করে, আর শক্তি এই দ্বিবিধ দিব্যসামর্থ্যের সঙ্কল্পের দিক যার মধ্যে জ্ঞান সর্বদাই বর্তমান ও কর্মরত; নিজের সম্বন্ধে সে জানে, এমনকি ব্যষ্টিজীব হিসেবে সে জানে যে সে দিব্য সত্তার এক কেন্দ্র, গীতার কথায় ঈশ্বরের অংশ, আর এইভাবে প্রকৃতির সেই ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে যা সে অবলোকন, ভরণ, অনুমোদন ও ভোগ করে, জানে এবং জ্ঞানের নির্ধারক সামর্থ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে; আর যখন সে নিজেকে বিশ্বভাবাপন্ন করে, তখন তার জ্ঞান প্রতিফলিত করে শুধু দিব্যজ্ঞান, তার সঙ্কল্প সাধন করে শুধু দিব্যসঙ্কল্প, সে ভোগ করে শুধু দিব্য আনন্দ, অজ্ঞানময় ব্যক্তিগত তৃপ্তি নয়। এমনকি প্রতিনিধিরূপে বিশ্বসত্তার উপভোগ ও আনন্দের মধ্যেও সীমিত ব্যক্তিসত্ত্ব অধিকার ক'রে, ত্যাগ করে পুরুষ এইভাবে তার স্বাধীনতা বজায় রাখে। এই পরতর স্থিতিতে সে সম্পূর্ণভাবে নিয়েছে পুরুষ ও প্রকৃতির বিভিন্ন সত্যকার সব সম্পর্ক।

সচ্চিদানন্দের সত্তা থেকেই পুরুষ ও প্রকৃতির উদ্ভব — তাদের মিলনে ও দ্বৈতভাবে। আত্মসচেতন অস্তিত্ব হল সত্তার মূল স্বরূপ; এই হল সৎ বা পুরুষ; আত্মসচেতন অস্তিত্বের সামর্থ্য — তা এটি নিজের মধ্যে নিবৃত্ত থাকুক বা তার চেতনা ও শক্তির, তার জ্ঞান ও তার সঙ্কল্পের, চিৎ ও তপসের, চিৎ ও তার শক্তির বিভিন্ন কার্যে সক্রিয় হ'ক — এই হল প্রকৃতি। সত্তার আনন্দ হল এই চিন্ময় সত্তা ও চিন্ময়ী শক্তির মিলনের শাশ্বত সত্য, তা নিজের মধ্যে তন্ময় থাকুক আর না হয় তার এই দুই বিভাবের অচ্ছেদ্য দ্বৈতভাবে বিলসিত হ'ক — লোকসমূহের উদ্ঘাটন ও তাদের অবলোকন করা, তাদের মধ্যে ক্রিয়াসাধন ও ঐ ক্রিয়া ধারণ করা বিভিন্ন কর্ম নিষ্পাদন করা এবং অনুমতি দেওয়া যার অভাবে প্রকৃতির শক্তি কাজ করতে অক্ষম, জ্ঞান ও সঙ্কল্প নিষ্পাদন ও নিয়ন্ত্রণ করা এবং জ্ঞান — শক্তি ও সঙ্কল্প শক্তির নির্ধারণসমূহ জানা ও নিয়ন্ত্রণ করা, উপভোগের সম্পদ সরবরাহ করা ও উপভোগ করা — পুরুষ যে প্রকৃতির অধিকারী, দ্রষ্টা জ্ঞাতা ঈশ্বর, আর প্রকৃতি যে সত্তা প্রকাশে, সঙ্কল্প সাধনে, আত্মজ্ঞানের তৃপ্তিসাধনে, পুরুষের সত্তার আনন্দ উৎপাদনে সক্রিয়। এই যা আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি সত্তার স্বরূপের উপর তাই পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির পরম ও সার্বিক সম্পর্ক। স্বরূপে পুরুষের একান্ত আনন্দ এবং এই ভিত্তির উপর প্রকৃতিতে পুরুষের একান্ত আনন্দ — এরাই এই সম্পর্কের দিব্য সার্থকতা।

অষ্টাদশ অধ্যায়

পুরুষ ও তার মুক্তি

এখন আমাদের থেমে বিবেচনা করতে হবে, এই যে আমরা পুরুষ ও প্রকৃতির বিভিন্ন সম্পর্ক স্বীকার করলাম তাতে আমরা কি কি বিষয়ে আবদ্ধ হলাম; কারণ এর অর্থ এই যে মানবজাতির যেসব সাধারণ লক্ষ্য তার কোনটিই আমাদের সাধনার যোগের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। আমাদের পার্থিব জীবন বর্তমানে যা তা আমাদের যোগ স্বীকার করে না, অথবা কোনরূপ নৈতিক উৎকর্ষে বা ধর্মের উল্লাসে বা পরপারের কোন স্বর্গে এ তৃপ্ত থাকতে পারে না অথবা সত্তার তেমন কোন লয়সাধনেও এ তৃপ্ত হতে পারে না যার দ্বারা জীবনের অশান্তি সন্তোষজনকভাবে দূর করতে পারা যায়। আমাদের লক্ষ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন হয়ে ওঠে; আমাদের লক্ষ্য শুধু কোন অহং-ভাবে ও পার্থিবসত্তাতে বাস করা নয়, আমাদের লক্ষ্য অনন্ত ভাগবতসত্তার মধ্যে, ভগবানের মধ্যে বাস করা, তবে সেই সাথে প্রকৃতি থেকে, আমাদের মানবভাইদের কাছ থেকে, পৃথিবী ও পার্থিবজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে — ঠিক যেমন ভগবান আমাদের কাছ থেকে ও পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেন না। জগৎ ও প্রকৃতি ও এই সকল সত্তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়েও তিনি অবস্থান করেন, তবে এমন সামর্থ্য, স্বাতন্ত্র্য ও আত্মজ্ঞানের সঙ্গে যা একান্ত ও অবিচ্ছেদ্য। আমাদের মুক্তি ও সিদ্ধির অর্থ অবিদ্যা, বন্ধন ও দুর্বলতা অতিক্রম করা এবং দিব্যসামর্থ্য, স্বাতন্ত্র্য ও আত্মজ্ঞানসহ জগৎ ও প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কে তাঁর মধ্যে বাস করা। কারণ সৃষ্টির সঙ্গে পুরুষের সম্পর্কের পরাকাষ্ঠা হল পুরুষের দ্বারা প্রকৃতিকে অধিগত করা যখন পুরুষ আর অবিদ্যাচ্ছন্ন নয় ও প্রকৃতির অধীন নয় বরং যখন সে তার ব্যক্ত সত্তাকে জানে, অতিক্রম করে, উপভোগ ও নিয়ন্ত্রণ করে এবং তার আত্মপ্রকাশ কি হবে তা সে নির্ধারণ করে বিপুল ও স্বচ্ছন্দভাবে।

পুরুষের বিশ্বজন্ম ও সম্ভূতির মধ্যে প্রকৃতির সঙ্গে তার খেলার সব কিছুরই অর্থ এই যে এক একত্ব তার নিজের দ্বৈতভাবের বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজেকে খুঁজে বার করছে। সর্বত্রই এক সচ্চিদানন্দ, যিনি স্বয়ম্ভু, অসীম, এমন ঐক্য যা তার নিজের বৈচিত্র্যের চরম আনন্ত্যের দ্বারা বিনষ্ট হয় না — এই হল সত্তার মূল সত্য, এর জন্যই আমাদের জ্ঞানের এষণা এবং এতেই আমাদের প্রত্যক্‌বৃত্ত জীবনের পরিণতি। এ থেকেই অপর সকল সত্যের উৎপত্তি, এরই উপর তারা প্রতিষ্ঠিত, এর দ্বারাই প্রতিমুহূর্তে তাদের অস্তিত্ব সম্ভবপর এবং শেষ অবধি এতেই তারা নিজেদের ও পরস্পরকে জানতে সক্ষম, আর সমন্বিত, সুসমঞ্জস ও সার্থক হয়। জগতের সকল সম্পর্কই — এমনকি সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে পীড়াদায়ক আপতিক বৈষম্যগুলিও এমন কিছুর সম্পর্ক যা তার নিজের বিশ্বসত্তার মধ্যে নিজের কাছে শাশ্বত; বিভিন্ন অসম্বন্ধ সত্তা আকস্মিকভাবে অথবা বিশ্ব-

অস্তিত্বের কোন যান্ত্রিক রীতির দরুন মিলেছে এবং তাদের সংঘর্ষই এই সব সম্পর্ক, — তা কোথাও বা কোন সময়ই ঠিক নয়। সুতরাং একত্বের এই শাশ্বত তথ্যের পুনঃপ্রাপ্তিই আমাদের আত্মজ্ঞানের মূল কাজ; এর মধ্যে বাস করাই যে আমাদের সত্তাকে আন্তরভাবে অধিগত করার এবং জগতের সঙ্গে আমাদের সঠিক ও আদর্শ সম্পর্কগুলির ফলপ্রসূ তত্ত্ব তা নিশ্চিত। এই জন্যই একত্বের উপর আমাদের সবচেয়ে বেশী করে জোর দিতে হয়েছে এই বলে যে এই হল আমাদের জ্ঞানযোগের লক্ষ্য এবং এক হিসেবে সমগ্র লক্ষ্য।

কিন্তু সর্বত্রই এবং সকল লোকেই এই ঐক্য নিজেকে বিলসিত করে দ্বৈতভাবের এক কার্যসাধক বা ব্যবহারিক সত্যের দ্বারা। সনাতন হল এক অনন্ত চিন্ময় সন্মাত্র, পুরুষ, এ নিশ্চেতন ও যান্ত্রিক কিছু নয়; ঐক্যের সাম্যাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত স্বীয় চিন্ময় সত্তার শক্তির আনন্দের মধ্যে এ নিত্য অবস্থিত; কিন্তু বিশ্বের মধ্যে বিচিত্র সৃজনশীল আত্মানুভূতির সঙ্গে ক্রীড়ারত তার চিন্ময়সত্তার শক্তির সমানই শাশ্বত আনন্দের মধ্যেও তা অবস্থিত। ঠিক যেমন আমরা নিজেরা জানি বা জানতে পারি যে আমরা সর্বদাই কালাতীত, নামাতীত, চিরন্তন কিছু যাকে আমরা আত্মা বলি এবং যা আমরা যেসব সেসবের ঐক্যস্বরূপ, আবার তবু সাথে সাথে আমরা যেসব কাজ করি, চিন্তা করি, সঙ্কল্প ও সৃজন করি, হই, — সেসবের বিচিত্র অভিজ্ঞতা পাই ঠিক সেই রকমই হল জগতের মধ্যে পুরুষের আত্মবোধ। পার্থক্য এই যে আমরা বর্তমানে সীমিত ও অহং-বদ্ধ মানসিক জীব হওয়ায়, সাধারণতঃ আমাদের এই অভিজ্ঞতা হয় অবিদ্যার মধ্যে আর আমরা আত্মার মধ্যে বাস করি না, তবে শুধু সময়ে সময়ে এর দিকে পিছনে তাকাই বা এতে সরে যাই, অথচ সনাতন এর অধিকারী তাঁর অনন্ত আত্মজ্ঞানের মধ্যে, তিনি নিত্যই এই আত্মা এবং এইসব আত্ম-অভিজ্ঞতার দিকে তাকান সত্তার পরিপূর্ণতা থেকে। মনের কারাগারে আবদ্ধ আমাদের মতো তিনি ভাবেন না যে তাঁর সত্তা আত্ম-অভিজ্ঞতার এক অনির্দিষ্ট পরিণাম ও যোগফল, অথবা এক বিরাট বিরুদ্ধতত্ত্ব। সত্তা ও সম্ভূতির মধ্যে যে প্রাচীন দার্শনিক বিবাদ তা শাশ্বত আত্মজ্ঞানের নিকট সম্ভবপর নয়।

চিন্ময়সত্তার যে সক্রিয়শক্তি নিজেকে চরিতার্থ করে তার আত্ম-অনুভূতির বিভিন্ন সামর্থ্যের মধ্যে, তার জ্ঞান, সঙ্কল্প, আত্ম-আনন্দ, আত্ম-বিভাবনার বিভিন্ন সামর্থ্যের মধ্যে এবং এদের ক্রিয়াশক্তির সকল চমকপ্রদ বৈচিত্র্য, বিপর্যয়, সংরক্ষণ ও পরিবর্তনের মধ্যে, এমনকি বিকারের মধ্যেও — একেই আমরা বলি প্রকৃতি — যেমন বিশ্বের মধ্যে, তেমন আমাদের মধ্যে। কিন্তু বৈচিত্র্যের এই শক্তির পিছনে, সমান এক একত্বের মধ্যে আছে ওই একই শক্তির নিত্য সাম্যাবস্থা এবং এই শক্তি যেমন বৈচিত্র্যগুলি উৎপাদন করেছে তেমন তাদের ধারণ করে নিরপেক্ষভাবে এবং শাসন করে এবং সত্তা বা পুরুষ আত্ম-আনন্দের যা কিছু লক্ষ্য নিজের চেতনায় ভাবনা করেছে এবং নিজের সঙ্কল্পের দ্বারা বা চেতনার সামর্থ্যের দ্বারা নির্ধারিত করেছে, সেইদিকে ঐ শক্তি চালনা করে। এই হল দিব্য প্রকৃতি যার সঙ্গে ঐক্যের মধ্যে আমাদের ফিরে যেতে হবে আমাদের আত্মজ্ঞানের

যোগের দ্বারা। আমাদের হ'তে হবে পুরুষ, সচ্চিদানন্দ যে তার প্রকৃতির দিব্য ব্যষ্টিগত অধিকার পেয়ে আনন্দ ভোগ করে, আর আমাদের অহমাত্মক প্রকৃতির অধীন মনোময় পুরুষ হলে চলবে না। কারণ তাই আসল মানুষ, জীবের পরম ও অখণ্ড আত্মা, আর অহং হল আমাদেরই শুধু এক অবর ও আংশিক অভিব্যক্তি যার মাধ্যমে কোন প্রকারের সীমিত ও প্রস্তুতিকর অভিজ্ঞতা সম্ভবপর হয় এবং কিছু সময়ের জন্য তা উপভোগ করতে দেওয়া হয়। কিন্তু অবর সত্তার এই উপভোগ আমাদের সমগ্র ভব্যার্থ নয়; এমনকি এই জড় জগতে মানুষ হিসেবে আমরা যে বেঁচে থাকি তারও একমাত্র বা শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা নয়।

আমাদের এই যে ব্যষ্টিসত্তা, তা সেই সত্তা যার দ্বারা আত্মসচেতন মনে অজ্ঞান সম্ভবপর হয় কিন্তু এ হল আবার সেই সত্তাও যার দ্বারা আধ্যাত্মিক সত্তার মধ্যে মুক্তি সম্ভবপর হয় আর সম্ভব হয় দিব্য অমরত্বভোগ। যে অমরত্বে উপনীত হয়, সে সনাতন নয়, কি তাঁর অতিস্থিতিতে, কি বিশ্বসত্তায়; জীবই আত্মজ্ঞানে উত্তরণ করে, তাতেই এ অধিগত থাকে, এবং তার দ্বারাই এ কার্যকরী হয়। আধ্যাত্মিক, মানসিক বা জড়গত — সকল জীবনই হল পুরুষের লীলা তার প্রকৃতির বিভিন্ন সম্ভাবনার সঙ্গে; কারণ এই লীলা না থাকলে কোন আত্মপ্রকাশ ও কোন আপেক্ষিক আত্ম-অনুভূতি সম্ভব নয়। এমনকি, সকল কিছুই আমাদের বৃহত্তর আত্মা — আমাদের এই উপলব্ধিতেও এবং ভগবান ও অপর সকল সত্তার সঙ্গে আমাদের একত্বেও এই লীলা স্থায়ী হতে পারে এবং স্থায়ী হওয়া দরকার — অবশ্য যদি না আমরা চাই যে আমরা সকল আত্মপ্রকাশ এবং সমাধিমগ্ন ও তন্ময় আত্ম-অনুভূতি ছাড়া অন্যসব আত্ম-অনুভূতি থেকে নিবৃত্ত হব। কিন্তু তখনও এই যে সমাধির বা মুক্ত লীলার উপলব্ধি হয় তা হয় ব্যষ্টিসত্তার মধ্যেই; সমাধি হল এই মনোময় পুরুষের নিমজ্জন ঐক্যের একমাত্র অনুভূতির মধ্যে, আর মুক্ত লীলা হল আধ্যাত্মিক সত্তার মধ্যে তার মনকে তুলে নেওয়া একত্বের স্বচ্ছন্দ উপলব্ধি ও আনন্দের জন্য। কারণ দিব্য সত্তার প্রকৃতি হ'ল সর্বদাই তার ঐক্য অধিগত করা কিন্তু এই ঐক্যকে অধিগত করতে হবে অনন্ত অনুভূতির মধ্যেও অনেক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, অনেক লোকের উপর এবং নিজের অনেক সচেতন সামর্থ্য বা আত্মার মাধ্যমে — অর্থাৎ আমাদের সীমিত বুদ্ধিগত ভাষায়, এক চিন্ময় পুরুষের অনেক ব্যষ্টিত্বের মাধ্যমে। আমাদের প্রত্যেকেই এই সব ব্যষ্টিত্বের এক একটি। ভগবান থেকে দূরে সীমিত অহং-এর মধ্যে, সীমিত মনের মধ্যে থাকার অর্থ আমাদের নিজেদের থেকে দূরে থাকা, আমাদের সত্যকার ব্যষ্টিত্ব থেকে বঞ্চিত থাকা, আসল ব্যষ্টি না হয়ে আপতিক ব্যষ্টি হওয়া; এ হল আমাদের অবিদ্যার সামর্থ্য। ভাগবতসত্তার মধ্যে গৃহীত হয়ে এখন যাতে আমরা বাস করি তাকে আমাদের আধ্যাত্মিক, অনন্ত ও বিশ্বব্যাপী চেতনা বলে জানার অর্থ আমাদের পরম ও অখণ্ড আত্মাকে, আমাদের সত্যকার ব্যষ্টিত্বকে অধিগত করা; এ হল আমাদের আত্মজ্ঞানের সামর্থ্য।

চিরন্তন অভিব্যক্তির এই যে তিন সামর্থ্য — ভগবান, প্রকৃতি ও জীব তাদের

শাশ্বত ঐক্য ও প্রত্যেকের জন্য অপরের অন্তরঙ্গ প্রয়োজনীয়তা জেনে আমরা বুঝতে পারি স্বয়ং অস্তিত্বকে এবং জগতের বাহ্যরূপের মধ্যে সেই সবকিছুকে যা এখন আমাদের অজ্ঞানতার কাছে বিভ্রান্তিকর। আমাদের আত্মজ্ঞান এদের কোনটিকেই ধ্বংস করে না, এ ধ্বংস করে শুধু আমাদের অজ্ঞানতাকে ও এর বিশিষ্ট অবস্থাগুলিকে যার জন্য আমরা আমাদের প্রকৃতির অহমাত্মক সব নির্ধারণে আবদ্ধ হয়ে তাদের অধীন হই। যখন আমরা আমাদের সত্যকার সত্তা ফিরে পাই তখন অহং আমাদের কাছ থেকে খসে যায়; এর স্থান নেয় আমাদের পরম ও অখণ্ড আত্মা, আমাদের সত্যকার ব্যষ্টিত্ব। এই পরম আত্মা হিসেবে এ নিজেকে সকল সত্তার সঙ্গে এক করে এবং সকল জগৎ ও প্রকৃতিকে দেখে স্বীয় আনন্ত্যের মধ্যে। আমাদের এই কথার অর্থ শুধু এই যে আমাদের পৃথক অস্তিত্বের বোধ মিলিয়ে যায় অসীম, অবিভক্ত ও অনন্ত সত্তার চেতনার মধ্যে, আর এতে আমরা আর আমাদের বর্তমান জন্ম ও সম্ভূতির নাম ও রূপে এবং বিভিন্ন বিশেষ মানসিক ও শারীরিক নির্ধারণে আবদ্ধ অনুভব করি না, বিশ্বের কোন কিছুর বা কারও থেকে আমরা আর পৃথক থাকি না। একেই প্রাচীন মনীষীরা বলতেন অসম্ভূতি বা জন্মনাশ বা নির্বাণ। সেই সাথে, আমাদের জীবজন্ম ও সম্ভূতির মধ্য দিয়ে আমাদের জীবন ও কর্ম চলতে থাকে তবে ভিন্ন জ্ঞান ও সম্পূর্ণ অন্য এক প্রকার অনুভূতি নিয়ে; জগৎও থাকে তবে একে আমরা দেখি আমাদের সত্তার মধ্যে, এ যে আমাদের সত্তার বাইরে আমরা ভিন্ন অন্য কিছু সেভাবে নয়। আমাদের প্রকৃত সত্তার, আমাদের অখণ্ড সত্তার এই নতুন চেতনায় শাশ্বতভাবে বাস করতে সমর্থ হওয়াই মুক্তিপ্রাপ্তি ও অমরত্বভোগ।

এইখানে আসে সেই ভাবনার জটিলতা যে অমরত্ব সম্ভব হয় শুধু মৃত্যুর পর অন্যসব জগতে, অস্তিত্বের বিভিন্ন উচ্চতর লোকে, অথবা মুক্তিতে মানসিক বা দৈহিক জীবনধারণের সকল সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়, এবং জীব জীবন চিরকালের জন্য বিলীন হয় এক নৈর্ব্যক্তিক আনন্ত্যের মধ্যে। এইসব ভাবনা যে জোরালো হয় তার কারণ অনুভূতিতে তাদের কিছু সমর্থন মেলে আর অন্তঃপুরুষও একপ্রকার এর প্রয়োজন অথবা ঊর্ধ্বাভিমুখী আকর্ষণ অনুভব করে যখন সে মন ও জড়ের প্রবল বন্ধনগুলি ত্যাগ করে। মনে হয় যে এই সব বন্ধন সকল পার্থিব জীবন বা সকল মানসিক অস্তিত্ব থেকে অবিচ্ছেদ্য। মৃত্যু জড় জগতের রাজা কারণ মনে হয় প্রাণ এখানে থাকে শুধু মৃত্যুর অধীন হয়ে, নিরন্তর মরণের দ্বারা; অমরত্বকে এখানে জয় করতে হবে কষ্টের সঙ্গে এবং তার যা প্রকৃতি তাতে মনে হয় অমরত্ব হল সকল মৃত্যুবর্জন এবং সেহেতু জড় জগতের মধ্যে সকল জন্ম বর্জন। অমরত্বের ক্ষেত্র নিশ্চয়ই হবে কোন সূক্ষ্মলোকে, কোন স্বর্গে যেখানে হয় দেহ থাকে না, আর না হয় তা অন্যবিধ এবং অন্তঃপুরুষেরই এক রূপ মাত্র অথবা এক গৌণ অবস্থা। অপরপক্ষে যারা অমরত্বের অতীতে যেতে চায় তারা বোধ করে যে সকল লোক ও স্বর্গ সান্ত অস্তিত্বেরই বিভিন্ন অবস্থা এবং অনন্ত আত্মা এসব থেকে মুক্ত। তারা অভিভূত হয় নৈর্ব্যক্তিক ও অনন্তের মধ্যে বিলীন হওয়ার প্রয়োজনীয়তার দ্বারা এবং অন্তঃপুরুষের সম্ভূতিতে তার আনন্দের সঙ্গে নৈর্ব্যক্তিক সত্তার

আনন্দের কোনরকম সমীকরণে তাদের অক্ষমতার দ্বারা। বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্র উদ্ভাবন করা হয় যাতে নিমজ্জন ও লয়ের প্রয়োজনীয়তা বুদ্ধির কাছে গ্রাহ্য করা হয়; কিন্তু যা বাস্তবিকই গুরুত্বপূর্ণ ও সিদ্ধান্তে আসার শেষ কথা তা হল ওপারের হাতছানি, অন্তঃপুরুষের প্রয়োজনীয়তা, আর এই ক্ষেত্রে একপ্রকার নৈর্ব্যক্তিক সন্মাত্রে বা অসতে তার আনন্দ। কারণ সিদ্ধান্তের ভিত্তি হল পুরুষের নির্ধারক আনন্দ, তার প্রকৃতির সঙ্গে সে যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে সঙ্কল্প করে সেই সম্পর্ক, তার প্রকৃতির নানাবিধ সব সম্ভাবনার মধ্যে তার ব্যক্তিগত আত্ম-অনুভূতির বিকাশে সে যে ধারা অনুসরণ করেছে তার ফলস্বরূপ সে যে অনুভূতি লাভ করে। এর সমর্থনে আমাদের বুদ্ধিগত যুক্তিগুলি শুধু ঐ অনুভূতি সম্বন্ধে যুক্তিবুদ্ধিকে দেওয়া আমাদের বিবরণ, আর এরা কতকগুলি কৌশল যা দিয়ে আমরা মনকে সাহায্য করি যেন অন্তঃপুরুষ যে পথে যাচ্ছে সেই পথ সে মেনে নেয়।

আমাদের বর্তমান অনুভূতি আমাদের বিশ্বাস করাতে চাইলেও, আমাদের জগৎসত্তার কারণ অহং নয়; কারণ অহং হল জগৎসত্তার যে প্রকার আমাদের তার শুধু এক ফল ও অবস্থা; এ হল এক সম্পর্ক যা বহু-অন্তঃপুরুষময় পুরুষ ব্যষ্টিভাবাপন্ন বিভিন্ন মন ও দেহের মধ্যে স্থাপন করেছে, এ হল আত্মরক্ষার ও পরস্পরকে বাদ দেওয়ার ও আক্রমণ করার এক সম্পর্ক যাতে জগতের মধ্যে বিষয়সমূহের পরস্পরের উপর নির্ভরশীলতার মধ্যে অনন্যনির্ভর মানসিক ও ভৌতিক অনুভূতির এক সম্ভাবনা আসে। কিন্তু এই সব লোকে কোন অনপেক্ষ অনন্যনির্ভরতা সম্ভব হয় না; সুতরাং এই আত্যন্তিক সাধনার একমাত্র সম্ভবপর পরিণতি হল নৈর্ব্যক্তিকতা যা সকল মানসিক ও ভৌতিক অনুভূতি বর্জন করে: শুধু এইভাবেই এক একান্ত অনন্যনির্ভর আত্ম-অনুভূতি লাভ সম্ভব হয়। তখন মনে হয় অন্তঃপুরুষ অবস্থান করে নিজের মধ্যেই অনপেক্ষভাবে, অনন্যনির্ভর হয়ে; ভারতীয় কথায় সে তখন স্বাধীন, শুধু নিজের উপর নির্ভরশীল, ভগবান বা অন্য সব সত্তার উপর নির্ভরশীল নয়। সুতরাং এই অনুভূতিতে ভগবান, ব্যক্তিগত আত্মা ও অন্যান্য সত্তাকে অবিদ্যার পার্থক্য বলে অস্বীকার ও বর্জন করা হয়। অহং-ই তার নিজের অপূর্ণতা স্বীকার করে ও নিজ ও তার বিপরীত সবকিছু — উভয়কেই বিসর্জন দেয় যাতে অনন্যনির্ভর আত্ম-অনুভূতি সম্বন্ধে তার নিজের মৌলিক সহজাত প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়; কেননা এ দেখে যে ভগবান ও অপর সকলের সঙ্গে সম্পর্কের দ্বারা তা সাধন করার জন্য এর চেষ্টা আগাগোড়াই ভ্রম, অসারত্ব ও শূন্যতার অভিশাপগ্রস্ত। এ তাদের আর স্বীকার করে না কারণ তাদের স্বীকার করলেই এ তাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে; এ নিজের স্থায়িত্ব স্বীকার করতেও ক্ষান্ত হয় কারণ অহং-এর স্থায়িত্বের অর্থ তা-ই স্বীকার করা যাকে এ আত্মা নয় বলে বাদ দিতে চেষ্টা করে এবং বিশ্ব ও অন্যান্য সত্তাও স্বীকার করা। বৌদ্ধদের আত্মনাশের স্বরূপই হল মনোময় পুরুষ যা সব অনুভব করে সে সবের একান্ত বর্জন; অদ্বৈতবাদীর যে আত্ম-নিমজ্জন তার অনপেক্ষসত্তার মধ্যে, তা-ও সেই একই লক্ষ্য, তবে তার ভাবনা এসেছে ভিন্নভাবে:

উভয়ই হল অন্তঃপুরুষের এক চূড়ান্ত ঘোষণা যে সে আত্যন্তিকভাবে প্রকৃতির অনধীন।

মোক্ষের জন্য যে এক প্রকার সংক্ষিপ্ত সাধনপথকে আমরা প্রত্যাহারের সাধনা বলে বর্ণনা করেছি সেই পথে যে অনুভূতি লাভ হয় তা এই প্রবণতার পক্ষে সহায়কর। কারণ এর অর্থ অহং চূর্ণ করা এবং মানসিকতার যেসব অভ্যাস এখন আমাদের আছে সেসব বর্জন করা: কারণ ঐ মানসিকতা জড় ও বিভিন্ন স্থূল ইন্দ্রিয়ের অধীন আর সে বিভিন্ন সব জিনিসকে জানে শুধু বিভিন্ন রূপ, বিষয়, বাহ্যঘটনা এবং ঐসব রূপের যে নাম আমরা দিই সেই বিভিন্ন নাম হিসেবে। অপর প্রাণীদের প্রত্যক্‌বৃত্ত জীবন সম্বন্ধে আমরা জানি শুধু আমাদের নিজেদের এই জীবনের সঙ্গে সাদৃশ্যের দ্বারা অথবা তাদের কথাবার্তা, কর্ম ইত্যাদি যেসব বাহ্য নিদর্শনগুলিকে আমাদের মন আমাদের নিজেদের প্রত্যক্‌বৃত্ততার সংজ্ঞায় রূপান্তরিত করে সেসবের উপর ভিত্তি করে অনুমান বা পরোক্ষ অনুভবের দ্বারা; এছাড়া আমরা সরাসরি অপরের প্রত্যক্‌বৃত্ত জীবনের কথা জানি না। যখন আমরা অহং এবং স্থূল মন ভেঙে বেরিয়ে আসি চিৎপুরুষের আনন্ত্যের মধ্যে তখনো আমরা জগৎ ও অপর সবকে দেখি যেমন মন তাদের দেখতে আমাদের অভ্যস্ত করেছে অর্থাৎ নাম ও রূপ হিসেবে; শুধু চিৎপুরুষের প্রত্যক্ষ ও মহত্তর সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের নতুন অনুভূতিতে, মনের কাছে সেসবের নিজেদের যে প্রত্যক্ষ পরাক্‌বৃত্ত বাস্তবতা এবং পরোক্ষ প্রত্যক্‌বৃত্ত বাস্তবতা ছিল তা নষ্ট হয়। যে সত্যতর সদ্‌বস্তুর অনুভূতি আমরা এখন পাই তার সম্পূর্ণ বিপরীত মনে হয় ঐসব (অর্থাৎ জগৎ ও অন্য সব কিছু); আমাদের মানসিকতা শান্ত ও উদাসীন হয়ে পড়ায়, এ আর সেই সব মধ্যবর্তী সংজ্ঞাগুলি জানতে ও নিজের কাছে বাস্তব করতে চেষ্টা করে না যেগুলি যেমন আমাদের মধ্যে তেমন সেইসবেও অবস্থিত আর যাদের সম্বন্ধে জ্ঞানের উপযোগ হল আধ্যাত্মিক আত্মা ও জগতের পরাক্‌বৃত্ত সব ঘটনার মধ্যকার ব্যবধানের উপর সেতু রচনা করা। এক শুদ্ধ আধ্যাত্মিক সন্মাত্রের আনন্দময় অনন্ত নৈর্ব্যক্তিকতাতেই আমরা তৃপ্ত থাকি; তখন আর অন্যকিছু বা অন্য কেউ আমাদের কাছে অর্থহীন। স্থূল ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের যা দেখায় এবং সেসব সম্বন্ধে মন যা অনুভব ও ভাবনা করে এবং যাতে অত অপূর্ণ ও ক্ষণস্থায়ীভাবে আনন্দ পায় তা এখন মনে হয় অবাস্তব ও তুচ্ছ; সত্তার যেসব মধ্যবর্তী সত্যের মধ্য দিয়ে এইসব জিনিসকে একম্ উপভোগ করেন এবং যাতে তাঁর জন্য তাঁর সত্তার ও আনন্দের সেই মূল্য থাকে যা আমরা যেমন বলতে পারি, তাঁর কাছে বিশ্ব-অস্তিত্বকে সুন্দর ও অভিব্যক্তির যোগ্য করে, সেসবকে আমরা পাই না আর পেতেও চাই না। ভগবান জগতে যে আনন্দ পান সে আনন্দের ভাগ আর আমরা পাই না; বরং আমাদের কাছে মনে হয় যে সনাতন তাঁর সত্তার শুদ্ধতার মধ্যে জড়ের অশুদ্ধ প্রকৃতি আসতে দিয়ে নিজেকে হীন করেছেন অথবা অসার সব নাম ও অবাস্তব সব রূপ কল্পনা ক'রে নিজ সত্তার সত্যকে মিথ্যা করেছেন। আর না হয় যদি আমরা আদৌ ঐ আনন্দ অনুভব করি আমরা তা করি দূর থেকে বিচ্ছিন্নভাবে যার জন্যে আমরা অন্তরঙ্গ প্রাপ্তির বোধ নিয়ে তা ভোগ করতে পারি না, অথবা আনন্দ অনুভব করি এক তন্ময় ও

আত্যন্তিক আত্ম-অনুভূতির মহত্তর আনন্দের প্রতি আকর্ষণ নিয়ে যার জন্য আমরা এই অবর সংজ্ঞার মধ্যে থাকতে পারি শুধু ততক্ষণ যতক্ষণ আমাদের এখানে বাধ্য হয়ে থাকতে হয় আমাদের স্থূল প্রাণ ও শরীর টিকে থাকে বলে, তবে তার বেশী নয়।

কিন্তু যদি আমাদের যোগসাধনার পথে অথবা জগতের উপর আমাদের উপলব্ধ আত্মার স্বচ্ছন্দ প্রত্যাবর্তনের ও আমাদের মধ্যে পুরুষের দ্বারা তার প্রকৃতিকে স্বচ্ছন্দভাবে ফিরে পাওয়ার ফলে আমরা সচেতন হয়ে উঠি শুধু যে অপরের সব দেহ ও বাহ্য আত্মপ্রকাশ সম্বন্ধে তা নয়, অন্তরঙ্গভাবে তাদের আন্তর সত্তা, তাদের মন, তাদের অন্তঃপুরুষ সম্বন্ধে এবং এসবের মধ্যে তারও সম্বন্ধে যার কথা তাদের নিজেদের উপরভাসা মন জানে না তাহলে তাদের মধ্যেও আমরা দেখি প্রকৃত সত্তা আর আমরা তাদের দেখি যে তারা আমাদের আত্মারই বিভিন্ন আত্মা, শুধু বিভিন্ন নাম ও রূপ নয়। তারা আমাদের কাছে হয়ে ওঠে সনাতনের বিভিন্ন সদ্‌বস্তু। আমাদের মন আর তখন সে সবকে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ভেবে মোহগ্রস্ত বা অসৎ মনে করে ভ্রান্তির অধীন থাকে না। অবশ্য আমাদের কাছে জড়াসক্ত জীবনের পুরনো অভিভূত করা মূল্য থাকে না কিন্তু ভাগবত পুরুষের কাছে তার যে মহত্তর মূল্য তা পাওয়া যায়; এটি যে আমাদের সম্ভূতির একমাত্র সংজ্ঞা এই বলে একে আর গণ্য করা হয় না, তবে মনে করা হয় যে মন ও চিৎপুরুষের পরতর সংজ্ঞার সম্পর্কে এর শুধু এক গৌণ মূল্য আছে আর এই গৌণতার জন্য তার মূল্য হানি না হয়ে বরং বৃদ্ধি পায়। আমরা দেখি যে আমাদের জড়গত সত্তা, জীবন, প্রকৃতি — এসব শুধু পুরুষের এক স্থিতি ভঙ্গি তার প্রকৃতির সম্পর্কে আর তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব কেবল তখনই হৃদয়ঙ্গম করা যায় যখন তাদের নিজের মধ্যে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে না দেখে বরং দেখা হয় সেই সব পরতর স্থিতি ভঙ্গির উপর নির্ভরশীল হিসেবে যারা তাদের অবলম্বন স্বরূপ; এইসব মহত্তর সম্পর্ক থেকেই তারা তাদের অর্থ পায়, সুতরাং এদের সঙ্গে সচেতনভাবে যুক্ত হয়েই তারা চরিতার্থ করতে পারে তাদের যথার্থ সব প্রবণতা ও লক্ষ্য। মুক্ত আত্মজ্ঞান প্রাপ্তিতে জীবন তখন আমাদের কাছে সার্থক হয়ে ওঠে, এ আর তখন ব্যর্থ হয় না।

পরিশেষে এই বৃহত্তর অখণ্ড জ্ঞান ও মুক্তি আমাদের সমগ্র অস্তিত্বকে বন্ধনহীন ও চরিতার্থ করে। যখন আমরা এই জ্ঞান আয়ত্ত করি তখন আমরা বুঝি কেন আমাদের অস্তিত্ব ভগবান, আমরা নিজেরা ও জগৎ, — এই তিন সংজ্ঞার মধ্যে বিচরণ করে, আর আমরা তাদের সকলকে বা কোন একটিকে পরস্পরের বিরুদ্ধ, অসঙ্গত, বিসংবাদী বলে দেখি না; আবার বিপরীত দিকে, তারা যে আমাদের অবিদ্যার এমন সংজ্ঞা যা পরিশেষে শুদ্ধ নৈর্ব্যক্তিক ঐক্যের মধ্যে বিলীন হবে — এই বলেও তাদের গণ্য করি না। আমরা বরং তাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি আমাদের আত্মসার্থকতার এমন সংজ্ঞা হিসেবে যেগুলি মুক্তির পরও তাদের মূল্য রক্ষা করে বা কেবল তখনই পায় তাদের প্রকৃত মূল্য। আর আমরা অনুভব করি না যে আমাদের অস্তিত্ব অন্য সব অস্তিত্ব হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র যাদের সঙ্গে আমাদের বিভিন্ন সম্পর্কের দ্বারাই আমাদের জগৎ-অভিজ্ঞতা গঠিত হয়;

এই নব চেতনায় তারা সকলেই থাকে আমাদের মধ্যে আর আমরাও থাকি তাদের মধ্যে। তারা ও আমরা আর তখন অতগুলি পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অহং নই যে প্রত্যেকে নিজের নিজের স্বতন্ত্র চরিতার্থতার বা স্বোত্তরণের প্রয়াসী হয় এবং শেষ পর্যন্ত আর অন্য কিছুর দিকে লক্ষ্য করে না; তারা সকলেই সেই সনাতন এবং প্রত্যেকের অন্তঃস্থ আত্মা তার মধ্যে নিগূঢ়ভাবে সকলকে আলিঙ্গন করে এবং নানাভাবে প্রয়াস করে তার ঐক্যের এই পরতর সত্যকে তার পার্থিব সত্তায় ফুটিয়ে তুলতে ও সফল করতে। পরস্পরকে বাদ দেওয়া নয়, পরস্পরকে অন্তর্ভুক্ত করাই আমাদের ব্যষ্টিত্বের দিব্য সত্য, প্রেমই পরতর বিধান, অনন্যনির্ভর আত্মচরিতার্থতা নয়।

আমাদের আসল সত্তা যে পুরুষ সে সর্বদাই প্রকৃতির অনধীন ও অধীশ্বর, আর আমরা যে এই অনধীনতা লাভের প্রয়াসী তা সঙ্গত; অহমাত্মক ক্রিয়ার ও এর স্বোত্তরণের উপকারিতা হল এই, কিন্তু অনধীন অস্তিত্ব সম্বন্ধে অহং-এর যে নীতি তাকেই একান্তভাবে পূর্ণ করায় অনধীনতা সঠিকভাবে সার্থক করা হয় না, এটি সার্থক করা হয় নিজের প্রকৃতির সম্বন্ধে পুরুষের এই পরতম স্থিতিতে উপনীত হলে। সেখানে প্রকৃতির অতীতে স্থিতি হয়, আবার প্রকৃতিকে অধিগত করাও হয়, আমাদের ব্যষ্টিত্বের সুষ্ঠু সার্থকতাসাধন হয়, আবার জগৎ ও অপর সকলের সঙ্গে আমাদের সব সম্পর্কেরও সুষ্ঠু সার্থকতাসাধন হয়। সুতরাং ওপারের স্বর্গে পৃথিবী সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে ব্যক্তিগত মোক্ষলাভ আমাদের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য নয়; আমাদের নিজেদের মুক্তির মতোই অপর সকলের মুক্তি ও আত্মসার্থকতাও আমাদের নিজেদের কাজ — এমনকি বলা চলে আমাদের দিব্য স্বার্থ। তা নাহলে অপর সকলের সঙ্গে আমাদের ঐক্যের কোন কার্যকরী অর্থ থাকে না। এই জগতে অহমাত্মক জীবনের সব প্রলোভন জয় করা হল আমাদের নিজেদের উপর আমাদের প্রথম বিজয়; ওপারের স্বর্গে ব্যক্তিগত সুখের প্রলোভন জয় করা আমাদের দ্বিতীয় বিজয়; আর জীবন থেকে পলায়নের ও নৈর্ব্যক্তিক আনন্ত্যের মধ্যে আত্মবিভোর আনন্দের যে শ্রেষ্ঠ প্রলোভন তা জয় করা হল অন্তিম ও মহত্তম বিজয়। তখন আমরা মুক্ত হই সকল ব্যষ্টি আত্যন্তিকতা থেকে এবং অধিগত করি আমাদের সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা।

মোক্ষপ্রাপ্ত পুরুষের অবস্থা হল নিত্যমুক্ত পুরুষের অবস্থা। এর চেতনা এক অতিস্থিতি এবং এক সর্বগ্রাহী ঐক্য। এর যে আত্মজ্ঞান তাতে আত্মজ্ঞানের সকল সংজ্ঞাগুলি রহিত হয় না, বরং সকল বিষয়কে এক ও সুসঙ্গত করে ভগবান ও দিব্য প্রকৃতির মধ্যে। ধর্মের যে তীব্র উল্লাস যা শুধু ভগবান ও আমাদের জানে আর বাকী সবকে বাইরে রাখে, এর কাছে তা শুধু এক অন্তরঙ্গ অনুভব যা তাকে প্রস্তুত করে সকল জীবের চারিদিকে দিব্য প্রেম ও আনন্দের আলিঙ্গনের অংশভাক্ হতে। সিদ্ধ পুরুষের পক্ষে সেরকম স্বর্গীয় আনন্দ ভোগ করা সম্ভব হয় না যাতে ভগবান ও আমরা ও কৃতার্থজনেরা যুক্ত হয়ে অকৃতার্থজন ও তাদের কষ্টভোগের দিকে আমরা দূর থেকে উদাসীনভাবে চেয়ে থাকতে পারি; কারণ তারাও তার আত্মা; ব্যক্তিগতভাবে দুঃখকষ্ট শু

অবিদ্যা থেকে মুক্ত হওয়ায় সে স্বভাবতঃই তাদের দিকে ফিরবে তাদেরও তার মুক্তির দিকে নিয়ে আসার জন্য। অপরপক্ষে ভগবান ও ওপারকে বাদ দিয়ে আত্মা ও অপর সকল ও জগতের মধ্যে বিভিন্ন সম্পর্কের ভিতর বিভোর থাকার অবস্থা আরো অসম্ভব, সুতরাং সিদ্ধ পুরুষ পৃথিবীর দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় না, এমনকি মানুষের সঙ্গে মানুষের শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে পরহিতার্থক সম্বন্ধের দ্বারাও সীমাবদ্ধ হয় না। এর কাজ বা এর চরম সিদ্ধি যে পরের জন্য নিজেকে নিশ্চিহ্ন ক'রে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা তা নয়, বরং নিজেকে সার্থক করা ভগবৎ-প্রাপ্তি, স্বাধীনতা ও আনন্দের মধ্যে যাতে তার সার্থকতার মধ্যে, তার সার্থকতার দ্বারা অপর সকলেও সার্থক হতে পারে। কারণ একমাত্র ভগবানের মধ্যেই, শুধু ভগবৎ-প্রাপ্তির দ্বারাই জীবনের সকল বৈষম্য দূর করা যায়, সুতরাং শেষ পর্যন্ত মানুষকে ভগবানের দিকে উত্তোলন করাই মানবজাতিকে সাহায্য করার একমাত্র কার্যকরী পন্থা। অপর সকল কাজকর্মের ও আমাদের আত্ম-অনুভূতির বিভিন্ন উপলব্ধির উপকার ও সামর্থ্য আছে কিন্তু পরিশেষে এইসব জনাকীর্ণ পার্শ্ব-পথরেখাকে বা এইসব নির্জন পন্থাকে চারিদিক ঘুরে মিলতে হবে অখণ্ড মার্গের ব্যাপ্তির মধ্যে যা দিয়ে মোক্ষপ্রাপ্ত পুরুষ সকলকে অতিক্রম করে, সকলকে আলিঙ্গন করে এবং হয়ে ওঠে সকলের সার্থকতার নিশ্চিত আশ্বাস ও সামর্থ্য আর এই সার্থকতা হয় ভগবানের যে অভিব্যক্ত সত্তা তাদের মধ্যে।

উনবিংশ অধ্যায়

আমাদের আন্তরের বিভিন্ন লোক

যদি আমাদের অন্তঃস্থ পুরুষকে এইভাবে তার পরতম আত্মা, দিব্য পুরুষের সঙ্গে মিলনের দ্বারা তার প্রকৃতির জ্ঞাতা, প্রভু ও স্বাধীন ভোক্তা হতে হয়, তাহলে স্পষ্টতঃই, আমাদের সত্তার বর্তমান লোকে আবিষ্ট থেকে সে কাজ করা সম্ভব হয় না; কারণ এ হল সেই জড়লোক যার মধ্যে প্রকৃতির শাসন সম্পূর্ণ; সেখানে প্রকৃতির কর্মপ্রবৃত্তির বিভ্রান্তিকর আলোড়নের মধ্যে, তার ক্রিয়াধারার স্থূল আড়ম্বরের মধ্যে দিব্যপুরুষ সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন থাকেন, আর জড়ের মধ্যে প্রকৃতির দ্বারা চিৎপুরুষের সংবৃত্তি থেকে ব্যষ্টি পুরুষের উদ্‌বর্তনকালে এই ব্যষ্টিপুরুষ তার সকল কাজকর্মে জড়ীয় ও প্রাণিক করণ সমূহের মধ্যে তখনো বিশেষ জড়িত থাকায় দিব্য স্বাধীনতা ভোগ করতে অসমর্থ। যাকে এ তার স্বাধীনতা ও প্রভূত্ব বলে তা শুধু প্রকৃতির কাছে মনের সূক্ষ্ম অধীনতা; অবশ্য পশু, উদ্ভিদ ও ধাতুর মতো প্রাণিক ও জড়ীয় বিষয়ের স্থূল অধীনতা অপেক্ষা মনের ঐ অধীনতা লঘুতর, এবং যে অবস্থায় মুক্তি ও শাসন সম্ভব হয় তার আরো নিকটবর্তী, কিন্তু তবু এটি প্রকৃত স্বাধীনতা ও প্রভুত্ব নয়। সুতরাং আমাদের চেতনার বিভিন্ন লোক এবং মনোময় সত্তার বিভিন্ন আধ্যাত্মিক লোক সম্বন্ধে আমাদের বলতে হয়েছে; কারণ এই সব না থাকলে, এখানে, এই পৃথিবীতে দেহধারী জীবের মোক্ষ অসম্ভব হ'ত। তাকে অপেক্ষা ক'রে থাকতে হ'ত, আর বড় জোর নিজেকে প্রস্তুত করতে হ'ত, যাতে সে তা খুঁজে পায় অন্য বিভিন্ন লোকে এবং অন্য একপ্রকার ভৌতিক বা আধ্যাত্মিক দেহে যা জড়গত অনুভূতির কঠিন আবরণে তত দৃঢ়ভাবে আবৃত নয়।

সাধারণ জ্ঞানযোগে চেতনার শুধু দুই লোক স্বীকার করলেই চলে — আধ্যাত্মিক লোক ও জড়ভাবাপন্ন মানসিক লোক; শুদ্ধ যুক্তিবুদ্ধি এই দুয়ের মাঝে অবস্থিত হয়ে দুটিকেই দেখে, — প্রাতিভাসিক জগতের সব ভ্রান্তি ছিন্ন ক'রে, জড়ভাবাপন্ন মানসিক লোক অতিক্রম করে দেখে আধ্যাত্মিক লোকের সদ্‌বস্তু; আর তারপর ব্যষ্টিপুরুষের সঙ্কল্প জ্ঞানের এই স্থিতির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে অপরা স্থিতি বর্জন করে এবং পরম লোকের মধ্যে সরে গিয়ে সেখানেই আবিষ্ট হয়, মন ও দেহ হারিয়ে তা থেকে প্রাণ বিসর্জন দেয় এবং পরমপুরুষের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করে ব্যষ্টিজীবন থেকে উদ্ধার পায়। এ জানে যে এটা আমাদের অস্তিত্বের সমগ্র সত্য নয়, এই অস্তিত্ব আরো অনেক বেশী জটিল; এ জানে যে অনেক লোক বর্তমান কিন্তু এইসব এই মোক্ষের জন্য অত্যাবশ্যক নয় বলে এ তাদের অবহেলা করে আর না হয় তাদের দিকে মন দেয় না। এইসব লোক বরং বাস্তবিকই তার বিঘ্নস্বরূপ কারণ সেখানে বাস করলে লাভ হয় চিত্তাকর্ষক নব নব সূক্ষ্ম অনুভূতি, সূক্ষ্ম উপভোগ, সূক্ষ্ম শক্তি, প্রাতিভাসিক জ্ঞানের এক

নতুন জগৎ আর এসবের অন্বেষণে সৃষ্টি হয় তার একমাত্র যে লক্ষ্য ব্রহ্মের মধ্যে নিমজ্জন তার পথের বিভিন্ন অন্তরায় আর ভগবানের দিকে যাবার পথের ধারে পর পর অসংখ্য ফাঁদ। কিন্তু আমরা যখন প্রপঞ্চ স্বীকার করি, আর আমাদের কাছে সকল প্রপঞ্চ ব্রহ্ম ও ভগবৎ-উপস্থিতিতে পূর্ণ, তখন আমাদের কাছে এই সব কোন ভীতির জিনিস নয়; পথভ্রষ্ট হবার বিপদ যতই থাকুক না কেন, সেসবের সম্মুখীন হয়ে আমাদের তা জয় করতে হবে। যদি জগৎ ও আমাদের নিজেদের জীবন এতই জটিল হয়, তাহলে আমাদের কর্তব্য এইসব জটিলতা জানা ও স্বীকার করা যাতে আমাদের আত্মজ্ঞান ও তার প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের বিভিন্ন ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হতে পারে। যদি অনেক লোক থাকে, সেসব আমাদের অধিগত করা চাই ভগবানের জন্য, যেমন আমরা চাই আমাদের মন, প্রাণ ও দেহের সাধারণ স্থিতিকে আধ্যাত্মিকভাবে অধিগত করে রূপান্তরিত করতে।

সকল দেশেই প্রাচীন বিদ্যা আমাদের সত্তার প্রচ্ছন্ন সত্যগুলি সম্বন্ধে অনুসন্ধানে পূর্ণ ছিল, যার ফলে অনুশীলন ও সন্ধানের এক বিশাল ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়েছিল; ইওরোপে এদের নাম দেওয়া হয় গুহ্যবিদ্যা (occultism) কিন্তু আমরা প্রাচীতে অনুরূপ কোন পদ ব্যবহার করি না কেননা এইসব বিষয় পাশ্চাত্ত্য মানসিকতার কাছে যত দূরবর্তী, রহস্যময় ও অসামান্য মনে হয় আমাদের কাছে তত মনে হয় না; এই সব আমাদের আরো নিকটবর্তী আর আমাদের সাধারণ জড়গত জীবন ও এই বৃহত্তর জীবনের মাঝের আবরণটি অনেক পাতলা। ভারতবর্ষে,[১] মিশরে, ক্যাল্ডিয়ায়, চীনে, গ্রীসে, কেল্টিক দেশগুলিতে এরা এমন অনেক যৌগিক প্রণালী ও সাধনার অঙ্গ হয়েছে যেগুলির একসময় সর্বত্র বেশ প্রভাব ছিল, কিন্তু আধুনিক মনের কাছে সে সব প্রতিভাত হয়েছে শুধু কুসংস্কার ও রহস্যবাদ যদিও যেসব তথ্য ও অনুভূতির উপর এরা প্রতিষ্ঠিত সেগুলি জড় জগতের তথ্য ও অনুভূতির মতোই তাদের নিজেদের ক্ষেত্রে সমানই বাস্তব এবং তাদের নিজেদের বুদ্ধিগম্য নিয়মের দ্বারা সমানই নিয়ন্ত্রিত। সূক্ষ্মজ্ঞানের এই বিশাল ও দুর্গম ক্ষেত্রের মধ্যে নামা আমাদের এখন অভিপ্রায় নয়।[২] তবে যেসব প্রশস্ত তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে এর কাঠামো নির্মিত সেসব সম্বন্ধে এখন আলোচনা করা আবশ্যক কারণ এই সবের অভাবে আমাদের জ্ঞানযোগ সম্পূর্ণ হতে পারে না। আমরা দেখি যে বিভিন্ন প্রণালীতে আলোচিত তথ্যগুলি সর্বদা একই তবে মত ও অনুশীলনের বিন্যাস সম্বন্ধে প্রচুর পার্থক্য আছে, কারণ অত বৃহৎ ও দুরূহ বিষয়ের আলোচনায় এরকম পার্থক্য স্বাভাবিক ও অনিবার্য। এক প্রণালীতে যেসব বিষয় বাদ দেওয়া আছে, অন্যতে সেসবকেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া আছে, কোন কোন প্রণালীতে যা অপ্রধান অন্যতে

[১] উদাহরণস্বরূপ ভারতবর্ষে তান্ত্রিক প্রণালী।

[২] এ সম্বন্ধে আমরা এখানে পরে আলোচনা করব বলে আশা করি; তবে 'আর্য'তে আমাদের প্রথম কাজ হল আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক সব সত্যের আলোচনা করা; এইসব আয়ত্ত করার পরই সূক্ষ্ম বিদ্যার দিকে অগ্রসর হওয়া নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন।

তা-ই আবার অত্যধিক প্রধান স্থানীয়; যেসব অনুভূতি এক প্রণালীতে শুধু গৌণ ক্ষেত্র বলে বিবেচিত হয়েছে, সেইগুলি অন্যতে পৃথক রাজ্য বলে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু আমি এখানে বরাবর বৈদিক ও বৈদান্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করব যার বড় রেখাগুলি আমরা উপনিষদে পাই; এর প্রথম কারণ এই যে আমার কাছে এই পদ্ধতিই সর্বাপেক্ষা সরল ও দার্শনিক বলে মনে হয়; আর বিশেষতঃ এই কারণে যে আমাদের যে পরম উদ্দেশ্য মোক্ষ, তার পক্ষে বিভিন্ন লোকের উপযোগিতার দিক থেকে এই পদ্ধতি শুরু থেকেই গণ্য হয়েছে। এই পদ্ধতিতে তার ভিত্তিস্বরূপ নেওয়া হয়েছে আমাদের সাধারণ সত্তার তিন তত্ত্ব — মন, প্রাণ ও জড়, সচ্চিদানন্দের ত্রয়াত্মক আধ্যাত্মিক তত্ত্ব এবং সংযোজক তত্ত্ব বিজ্ঞান, অতিমানস, মুক্ত বা আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা, আর এইভাবে আমাদের সত্তার সম্ভবপর সকল বৃহৎ স্থিতিগুলিকেই সাজানো হয়েছে সপ্ত লোকের এক শ্রেণীতে — (কখন কখন এদের পঞ্চ লোক বলে গণ্য করা হয় কারণ নিম্নের পঞ্চলোকই আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অধিগম্য) — যার মধ্য দিয়ে বিকাশমান সত্তা উত্তরণ করতে পারে তার সিদ্ধিতে।

কিন্তু প্রথমে আমাদের প্রণিধান করা চাই, — চেতনার বিভিন্ন লোক, অস্তিত্বের বিভিন্ন লোক বলতে আমরা কি বুঝি। আমরা বুঝি পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে বিভিন্ন সম্পর্কের এক সাধারণ সুস্থির স্থিতি বা জগৎ। কারণ যা কিছুকে আমরা জগৎ বলতে পারি তা হল — আর এ ছাড়া অন্য কিছু হওয়া সম্ভব নয় — এমন এক সাধারণ সম্পর্কের ধারা যে সম্পর্ককে সৃষ্টি অথবা স্থাপিত করেছে এক বিশ্বঅস্তিত্ব নিজের, অথবা বলা যাক তার শাশ্বত তথ্য বা যোগ্যতার এবং তার সম্ভূতির বিভিন্ন সামর্থ্যের মধ্যে। সম্ভূতির সঙ্গে ঐ অস্তিত্বের বিভিন্ন সম্পর্কের অবস্থায় এবং সম্ভূতি সম্বন্ধে তার অনুভূতির অবস্থায় আমরা ঐ অস্তিত্বকে পুরুষ বলি, জীবের মধ্যে ব্যষ্টি পুরুষ, বিশ্বের মধ্যে বিশ্বপুরুষ; সম্ভূতির তত্ত্ব ও বিভিন্ন সামর্থ্যকে আমরা বলি প্রকৃতি। কিন্তু যেহেতু সত্তা, সত্তার চিৎশক্তি ও আনন্দ সর্বদাই অস্তিত্বের তিনটি উপাদানভূত সংজ্ঞা, সেহেতু যেভাবে প্রকৃতিকে এই তিনটি আদি বিষয় ব্যবহার করতে প্রবৃত্ত করা হয় এবং তাদের যে রূপ দিতে তাকে অনুমতি দেওয়া হয়, — বস্তুতঃ সেইভাবে ও সেইসব রূপের দ্বারা জগতের প্রকার নির্ধারিত হবে। কারণ অস্তিত্ব নিজেই তার সম্ভূতির উপাদান এবং সর্বদা তা হতে বাধ্য; একে গঠন করা চাই সেই ধাতুতে যা নিয়ে শক্তিকে কাজ করতে হয়; আবার শক্তির হওয়া চাই সেই সামর্থ্য যা ঐ ধাতুকে কর্মে প্রয়োগ করে, আর তা নিয়ে যে কোন লক্ষ্য সাধনের জন্য কর্ম করে। শক্তিই সেই বিষয় যাকে আমরা সাধারণতঃ প্রকৃতি বলি। আবার যে লক্ষ্য, যে উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন জগৎ সৃষ্টি হয় তা সাধন করা চাই সেই চেতনার দ্বারা যা সকল অস্তিত্ব ও সকল শক্তি ও তাদের সকল কর্মপ্রণালীতে স্বগত, আর উদ্দেশ্য হওয়া চাই জগতের মধ্যে নিজেকে ও অস্তিত্বের আনন্দকে পাওয়া। যে কোন জগৎ-অস্তিত্বের অবস্থা ও লক্ষ্যগুলিকে পর্যবসিত হতে হবে ঐ উদ্দেশ্য- সাধনেই; অস্তিত্বই বিকশিত করছে তার নিজের সত্তার সংজ্ঞাগুলি, তার সত্তার সামর্থ্য, তার সত্তার

চিন্ময় আনন্দ; যদি এই সব নিবর্তিত অবস্থায় থাকে, তাদের বিবর্তন আবশ্যক; তারা যদি আবৃত থাকে, তাদের আত্মপ্রকাশ আবশ্যক।

এখানে পুরুষ বাস করে এক জড় বিশ্বের মধ্যে; একমাত্র এর সম্বন্ধেই সে অব্যবহিতভাবে সচেতন; ঐ বিশ্বের মধ্যে নিজের সব যোগ্যতার বাস্তবতা সাধনের দুরূহ বিষয়টিই তার আসল কাজ। কিন্তু জড়ের অর্থই হল আত্মভোলা শক্তির মধ্যে ও ধাতুর স্ববিভাজক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রভাবে খণ্ডিত রূপের মধ্যে অস্তিত্বের চিন্ময় আনন্দের নিবর্তন। সুতরাং জড় জগতের সমগ্র তত্ত্ব ও প্রচেষ্টা হবে, — যা নিবর্তিত অবস্থায় আছে তার বিবর্তন এবং যা অবিকশিত রয়েছে তার বিকাশসাধন। এখানে সবকিছু প্রথম থেকেই আচ্ছন্ন রয়েছে জড়শক্তির প্রচণ্ডভাবে সক্রিয় নিশ্চেতন সুপ্তির মধ্যে; সুতরাং যে কোন জড়ীয় সম্ভূতির সমগ্র লক্ষ্য হবে নিশ্চেতনের মধ্য থেকে চেতনার জাগরণ; জড়ীয় সম্ভূতির সমগ্র পরিণতি হওয়া চাই জড়ের আবরণের অপসারণ ও সম্ভূতির মধ্যে নিজের আবদ্ধ অন্তঃপুরুষের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসচেতন পুরুষের জ্যোতির্ময় প্রকাশ। যেহেতু মানুষ এরকম এক আবদ্ধ পুরুষ, সেহেতু এই জ্যোতির্ময় মোক্ষ ও আত্মজ্ঞান লাভই হবে তার সর্বোত্তম উদ্দেশ্য ও তার সিদ্ধির সর্ত।

কিন্তু এই যে উদ্দেশ্য যা ভৌতিক শরীরে জাত মনোময় পুরুষের এখনো অনিবার্যভাবে সর্বোত্তম লক্ষ্য তার যথার্থ সাধনের পক্ষে জড় জগতের বিভিন্ন সঙ্কীর্ণতা প্রতিকূল বলে মনে হয়। প্রথমে অস্তিত্ব এখানে নিজেকে রূপায়িত করেছে মূলতঃ জড়রূপে; নিজের আত্ম-অনুভবকারী চিৎ-শক্তির কাছে একে স্ববিভাজক জড়ধাতুর রূপে পরাক্‌বৃত্তভাবাপন্ন, ও ইন্দ্রিয়গোচর ও মূর্ত করা হয়েছে, এবং এই জড়ের সমাহারের দ্বারা মানুষের জন্য এমন এক ভৌতিক শরীর নির্মাণ করা হয়েছে যা অন্য সব থেকে পৃথক ও বিভক্ত এবং ক্রিয়াধারার সব দৃঢ় রীতির অধীন, অর্থাৎ আমরা যেমন বলি নিশ্চেতন জড়প্রকৃতির বিভিন্ন নিয়মের অধীন। তার সত্তার শক্তিও জড়ের মধ্যে সক্রিয় প্রকৃতি বা শক্তি যা ধীরে ধীরে নিশ্চেতনা থেকে প্রাণে জাগ্রত হয়েছে, আর সর্বদাই রূপের দ্বারা সীমাবদ্ধ, সর্বদাই দেহের উপর নির্ভরশীল, এর কারণে সর্বদাই (বিশ্ব) প্রাণের অন্য অংশ থেকে ও অন্যান্য প্রাণধারী জীব থেকে পৃথক, নিশ্চেতনার বিভিন্ন বিধান ও শারীরিক জীবনধারণের বিভিন্ন সীমার দ্বারা সর্বদাই তার বিকাশে, স্থায়িত্বে, আত্মসিদ্ধিতে বিঘ্নিত। ঠিক সেই রকম, তার চেতনা এমন এক মানসিকতা যা দেহের মধ্যে ও এক তীক্ষ্ণভাবে ব্যষ্টিভাবাপন্ন প্রাণের মধ্যে স্ফুটিত হচ্ছে; সুতরাং এটি তার বিভিন্ন কর্মধারায় ও সামর্থ্যে সীমিত এবং পর্যাপ্ত যোগ্যতাবিহীন বিভিন্ন দৈহিক ইন্দ্রিয়ের উপর ও অতীব সীমাবদ্ধ প্রাণশক্তির উপর নির্ভরশীল; এটি বিশ্বমনের অন্য অংশ থেকে পৃথক; আর অন্যান্য মনোময় জীবের চিন্তার মধ্যে তার প্রবেশপথও রুদ্ধ, তাদের আন্তর ক্রিয়া সম্বন্ধে সে তার নিজের মানসিকতার সদৃশের সাহায্যে এবং তাদের বিভিন্ন অপ্রচুর দৈহিক সঙ্কেত ও আত্মপ্রকাশ থেকে যতটুকু বুঝতে পারে, তাছাড়া বাকী সব তার স্থূল মনের কাছে অজ্ঞাত থাকে। তার চেতনা সর্বদাই নিশ্চেতনার দিকে পিছিয়ে পড়ছে, আর এই নিশ্চেতনার

মধ্যে তার চেতনার এক বড় অংশ সর্বদাই নিবর্তিত থাকে, তার প্রাণ পিছিয়ে পড়ে মৃত্যুর দিকে, তার দৈহিক সত্তা বিকিরণের দিকে। স্থূল ইন্দ্রিয়সংবিৎ ও ইন্দ্রিয়মানসের উপর প্রতিষ্ঠিত এই অপূর্ণ চেতনা তার পরিবেশের সঙ্গে যেসব সম্পর্ক রাখে তাদের উপর নির্ভর করে তার সত্তার আনন্দ, অর্থাৎ তার সত্তার আনন্দ নির্ভর করে এক সীমিত মনের উপর যা সীমিত দেহ, সীমিত প্রাণশক্তি, সীমিত ইন্দ্রিয়সকলের সাহায্যে চেষ্টা করে বাইরের বিজাতীয় জগৎকে আয়ত্তে আনতে। সুতরাং এর অধিকারের সামর্থ্য সীমিত, এর আনন্দের শক্তি সীমিত এবং জগতের যেসব স্পর্শ এর শক্তির অতিরিক্ত যেসব ঐ শক্তি সহ্য করতে অসমর্থ, আয়ত্তে আনতে, আত্মসাৎ ও অধিগত করতে অসমর্থ সে সবকে বাধ্য হয়ে পরিবর্তিত হতে হবে এমন কিছুতে যা আনন্দ নয়, যন্ত্রণাতে, অস্বস্তিতে বা বিষাদে। আর না হয় এর মোকাবিলা করা চাই একে গ্রহণ না ক'রে বা এর সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে, অথবা, যদি গ্রহণ করা হয়, একে সরিয়ে রাখতে হবে উদাসীনতার দ্বারা। তাছাড়া, সত্তার যেরকম আনন্দ সে অধিগত করে তা সচ্চিদানন্দের আত্ম-আনন্দের মতো স্বাভাবিকভাবে ও শাশ্বতভাবে অধিগত করা হয় না, তা অধিগত করা হয় কালের মধ্যে অনুভব ও অর্জনের দ্বারা, এবং সেহেতু তাকে বজায় রাখার ও দীর্ঘস্থায়ী করার একমাত্র উপায় হল অনুভূতির পুনরাবৃত্তি আর স্বভাবতঃই এই আনন্দ অতীব অনিশ্চিত ও ক্ষণিক।

এই সবের অর্থ এই যে জড় বিশ্বের মধ্যে প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের স্বাভাবিক সব সম্পর্ক হল এর সব ক্রিয়াধারার শক্তির মধ্যে চিন্ময়সত্তার সম্পূর্ণ সমাপত্তি, অতএব পুরুষের সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি, ও আত্মজ্ঞানহীনতা, প্রকৃতির সম্পূর্ণ আধিপত্য এবং প্রকৃতির কাছে পুরুষের অধীনতা। পুরুষ নিজেকে জানে না, যদি সে কিছু জানে, সে জানে শুধু প্রকৃতির কর্মধারা। মানবের মধ্যে ব্যষ্টি আত্মসচেতন পুরুষের উদ্‌বর্তনের ফলেই যে অজ্ঞানতা ও অধীনতার এই সব প্রাথমিক সম্পর্কগুলি দূর হবে তা নয়। কারণ এই পুরুষ বাস করছে অস্তিত্বের এক জড়লোকে অর্থাৎ প্রকৃতির এমন এক স্থিতির মধ্যে যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সম্পর্কে জড় এখনো প্রধান নির্ধারক ও তার চেতনা জড়ের দ্বারা সীমিত হওয়ায় এই চেতনা সম্পূর্ণ আত্ম-অধিকারী চেতনা হতে অসমর্থ। এমনকি বিশ্বপুরুষও যদি জড়সূত্রের সীমাবদ্ধ হ'ত সে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে অধিগত করতে অসমর্থ হ'ত; আর ব্যষ্টিপুরুষের সামর্থ্য তো আরো অনেক কম হওয়ায় সে নিজেকে অধিগত করতে সম্পূর্ণ অসমর্থ; দৈহিক, প্রাণিক ও মানসিক সীমাবদ্ধতা ও বিচ্ছিন্নতার দরুন অস্তিত্বের বাকী সব তার কাছে হয়ে ওঠে বাইরের কিছু অথচ এরই উপর সে তার প্রাণ ও তার আনন্দ ও তার জ্ঞানের জন্য নির্ভরশীল। নিজের উপর, ও বিশ্বের উপর মানুষের যে অসন্তোষ তার সমগ্র কারণ হল তার সামর্থ্য, জ্ঞান, প্রাণ, অস্তিত্বের আনন্দের এই সব সীমাগুলি। আর যদি জড় বিশ্বই সব কিছু হ'ত এবং জড়লোকই তার সত্তার একমাত্র লোক হ'ত, তাহলে মানুষ, ব্যষ্টিপুরুষ কখনই সিদ্ধি ও আত্মসার্থকতা লাভে সমর্থ হ'ত না, আর বাস্তবিকই পশুর জীবন ছাড়া অন্য কোন

জীবনই লাভ করতে পারত না। এমন সব জগৎ থাকতে বাধ্য যেখানে পুরুষ ও প্রকৃতির এই সব অসম্পূর্ণ ও অসন্তোষজনক সম্পর্ক থেকে সে মুক্ত অথবা তার সত্তার এমন সব লোক থাকতে বাধ্য যেখানে উত্তরণ ক'রে সে ঐসব সম্পর্কের অতীতে যেতে পারে অথবা অন্ততঃ এমন সব লোক, জগৎ ও উচ্চতর সত্তা থাকতে বাধ্য যাদের থেকে সে নিতে পারে জ্ঞান, বিভিন্ন সামর্থ্য, হর্ষ তার সত্তার বৃদ্ধি অথবা এই সব পেতে তাকে সাহায্য করা হয়, আর তা না হলে এই সব পাওয়া অসম্ভব হ'ত। প্রাচীন বিদ্যা বলে যে এই সব বিষয় বর্তমান — অন্যান্য বিভিন্ন জগৎ, উচ্চতর সব লোক; আর সেসবের সঙ্গে যোগাযোগ ও সেসবে উত্তরণ সম্ভব, আর তার উপলব্ধ সত্তার বর্তমান পর্যায়ে যা তার উপরে অবস্থিত তার সঙ্গে সংস্পর্শের দ্বারা ও তার প্রভাবের দ্বারা তার বৃদ্ধিও সম্ভব।

যেমন, পুরুষ ও প্রকৃতির সব সম্পর্কের এমন এক স্থিতি আছে যেখানে জড় প্রথম নির্ধারক, অর্থাৎ জড়ীয় অস্তিত্বের জগৎ বর্তমান, তেমন ঠিক তার উপরে এমন এক স্থিতি আছে যার মধ্যে জড় শ্রেষ্ঠ নয়, বরং যেখানে জড়ের বদলে প্রাণশক্তি প্রথম নির্ধারক। এই জগতে বিভিন্ন রূপ প্রাণের অবস্থা নির্ধারণ করে না, বরং প্রাণই রূপ নির্ধারণ করে, সুতরাং এখানে রূপগুলি জড়জগতের সব রূপের চেয়ে আরো বেশী স্বতন্ত্র, তরল, এবং অধিকতর এবং আমাদের ধারণায় আশ্চর্য রকমের পরিবর্তনশীল। এই প্রাণশক্তি নিশ্চেতন জড়শক্তি নয়, এমনকি তার নিম্নতম সব ক্রিয়ায় ছাড়া অন্য ক্রিয়াতে অবচেতন শক্তিও নয়, কিন্তু এ হল সত্তার চিৎ-শক্তি যা অগ্রসর হয় গঠনের দিকে, তবে আরো মৌলিকভাবে উপভোগের দিকে, প্রাপ্তির দিকে, নিজের স্ফুরন্ত সংবেগের তৃপ্তির দিকে। সুতরাং এই যে নিছক প্রাণিক অস্তিত্বের জগৎ, পুরুষ ও প্রকৃতির সব সম্পর্কের এই যে স্থিতি যেখানে প্রাণসামর্থ্য আমাদের স্থূল জীবনযাত্রায় যা ঘটে তার চেয়ে অত অধিকতর স্বাধীনতা ও সামর্থ্যের সঙ্গে সক্রিয় — এখানে কামনা ও সংবেগের তৃপ্তিই প্রথম বিধান; একে বলা যায় কামনার জগৎ, কারণ তাই তার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া, স্থূল জীবন যেমন মনে হয় একটি পরিবর্তনশীল সূত্রে নিবদ্ধ এটি তেমন কোন একটি পরিবর্তনশীল সূত্রে নিবদ্ধ নয়, বরং এ তার স্থিতির অনেক পরিবর্তন সাধনে সমর্থ। আর তার মধ্যে অনেক উপলোক আছে — যেসব উপলোক জড়ীয় অস্তিত্ব স্পর্শ ক'রে মনে হয় তার মধ্যে মিলিয়ে যায় সেসব থেকে আরম্ভ ক'রে প্রাণসামর্থ্যের তুঙ্গে আছে সেই সব উপলোক যেগুলি শুদ্ধ মানসিক ও চৈত্য অস্তিত্বের সব লোক স্পর্শ ক'রে তাদের মধ্যে মিলিয়ে যায়। কারণ, প্রকৃতির মধ্যে সত্তার অনন্ত পর্যায়ে এমন কোন প্রশস্ত ব্যবধান নেই, কোন আকস্মিক খাদ নেই যা লাফ দিয়ে পার হতে হবে, এর বদলে একটি অন্যটির মধ্যে মিলিয়ে যায়, এক সূক্ষ্ম অনবচ্ছেদ আছে; এর মধ্য থেকে তার পৃথক ও সুস্পষ্ট অনুভূতির সামর্থ্য যেসব ক্রম, নির্দিষ্ট স্তর, সুস্পষ্ট পর্যায় তৈরী করে তা দিয়ে অন্তঃপুরুষ জগৎ-অস্তিত্ব সম্বন্ধে তার বিভিন্ন সম্ভাবনাগুলিকে নানাভাবে জানে ও অধিগত করে। আবার, কোন না কোন প্রকারের উপভোগ কামনার

সমগ্র উদ্দেশ্য হওয়ায় তা-ই কামনা-জগতের ঝোঁক হতে বাধ্য; কিন্তু যেহেতু যেখানেই পুরুষ মুক্ত নয় — আর কামনার অধীন থাকলে তার মুক্ত হওয়া সম্ভবও নয় — তার সকল অনুভূতির সদর্থক ও নঞর্থক ভাব থাকবেই, এই জগতে শুধু যে এমন সব বিশাল বা তীব্র বা বিরামহীন উপভোগের সম্ভাবনা আছে যা সীমিত স্থূল মনের কল্পনারও প্রায় অতীত তা নয়, তাতে তেমনই সমান বিশাল কষ্টভোগেরও সম্ভাবনা আছে। এইজন্য এইখানে সেইসব বিভিন্ন নিম্নতম স্বর্গ ও সকল প্রকার নরক অবস্থিত যেসব সম্বন্ধে লোককথায় ও কল্পনায় মানবমন নিজেকে আদিমতম যুগ থেকে প্রলুব্ধ ও সন্ত্রস্ত রেখেছে। বাস্তবিকই, সকল মানবকল্পনাই কোন সদ্‌বস্তু বা বাস্তব সম্ভাবনার সঙ্গে সম্বন্ধিত, যদিও সেগুলি নিজেরা পৃথকভাবে সম্পূর্ণ বেঠিক চিত্র হতে পারে অথবা অতীব স্থূলরূপে প্রকাশিত হতে পারে এবং সেজন্য সেগুলি বিভিন্ন অতিভৌতিক সদ্‌বস্তুর সত্য প্রকাশের অনুপযুক্ত হয়ে ওঠে।

যেহেতু প্রকৃতি এক জটিল ঐক্য, কতকগুলি অসম্বন্ধ ঘটনার সমবায় নয়, সেহেতু জড় অস্তিত্ব ও এই প্রাণিক বা কামনার জগতের মধ্যে এমন কোন ব্যবধান থাকা অসম্ভব যার উপর সেতু রচনা করা যায় না। প্রত্যুত, এক অর্থে বলা যায় যে তারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের মধ্যে অবস্থিত এবং কিছু পরিমাণে অন্ততঃ অন্যোন্যনির্ভর। বস্তুতঃ, জড়জগৎ সত্যই প্রাণজগৎ থেকে একপ্রকার প্রক্ষেপ, এমন এক বিষয় যা এটি বাইরে নিক্ষেপ করেছে ও নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে যাতে এর কতকগুলি কামনা মূর্ত ও চরিতার্থ হতে পারে এমন সব অবস্থার মধ্যে যা এর নিজের অবস্থা থেকে ভিন্ন অথচ যেগুলি এর নিজেরই অত্যন্ত জড়ীয় আকাঙ্ক্ষার যুক্তিসম্মত পরিণাম। বলা যেতে পারে যে ভৌতিক বিশ্বের জড়ীয় নিশ্চেতন অস্তিত্বের উপর এই প্রাণজগতের চাপের ফলেই পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব হয়েছে। আমাদের নিজেদের ব্যক্ত প্রাণসত্তাও এমন এক বৃহত্তর ও গভীরতর প্রাণসত্তার শুধু এক উপরভাসা পরিণাম যার সঙ্গত স্থান হল প্রাণলোকে আর যার মধ্য দিয়ে আমরা প্রাণজগতের সঙ্গে যুক্ত। উপরন্তু আমাদের উপর অবিরাম প্রাণজগতের ক্রিয়া হচ্ছে আর জড়অস্তিত্বের প্রতি বিষয়ের পিছনে আছে প্রাণজগতের উপযুক্ত বিভিন্ন সামর্থ্য; এমনকি সর্বাপেক্ষা স্থূল ও আদিম পদার্থেরও পিছনে আছে তাদের অবলম্বনস্বরূপ বিভিন্ন আদিম প্রাণসামর্থ্য, আদিমসত্তা। প্রাণজগতের বিভিন্ন প্রভাবগুলি সর্বদাই জড়অস্তিত্বের উপর জলধারার মতো নেমে এসে সেখানে তাদের সব সামর্থ্য ও ফল উৎপন্ন করছে, এই সব আবার প্রাণজগতে ফিরে যায় তার পরিবর্তনসাধনের জন্য। আমাদের প্রাণ-অংশ, কামনা-অংশ সর্বদাই সেখানকার স্পর্শ ও প্রভাব পায়; সেখানে শুভ কামনা ও অশুভ কামনার বিভিন্ন হিতকর ও অহিতকর সামর্থ্য আছে আর আমরা তাদের কথা না জানলেও, তাদের সম্বন্ধে উদাসীন থাকলেও তারা আমাদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এই সব সামর্থ্য যে শুধু প্রবণতা, নিশ্চেতনশক্তি তা নয়, একমাত্র জড়ের সীমারম্ভের গুলি ছাড়া, এরা অবচেতনও নয়, এরা সচেতন সামর্থ্য, জীবন্ত প্রভাব। যখন আমরা আমাদের অস্তিত্বের উচ্চতর লোক সম্বন্ধে প্রবুদ্ধ হই তখন

আমরা এদের শত্রু বা মিত্র ব'লে জানতে পারি, জানতে পারি যে এরা এমন সব সামর্থ্য যা আমাদের অধিগত করার প্রয়াসী বা যে সবকে আমরা আয়ত্ত ক'রে, অভিভূত ক'রে তাদের পিছনে ফেলে ছাড়িয়ে যেতে পারি। প্রাণজগতের সামর্থ্যগুলির সঙ্গে মানুষের সম্ভবপর এই সম্পর্ক ইওরোপীয় গুহ্যবিদ্যার, বিশেষতঃ মধ্যযুগের এই বিদ্যার এক বড় অংশের বিষয় হয়েছিল এবং প্রাচীরও কোন কোন রূপের যাদুবিদ্যা ও অধ্যাত্মবাদের বড় অংশের বিষয় হয়েছিল। অতীতের এই যেসব "কুসংস্কার" — সত্যই অনেক কুসংস্কার ছিল অর্থাৎ অনেক অজ্ঞানময় ও বিকৃত বিশ্বাস, মিথ্যা ব্যাখ্যা এবং ওপারের নিয়মগুলির সঙ্গে অজ্ঞ ও বিশ্রী ব্যবহার ছিল — তবু তাদের পিছনে এমন সব সত্য ছিল যা কোন ভাবী প্রাকৃতবিজ্ঞান জড়জগতের সঙ্গে তার একমাত্র কাজ থেকে নিষ্কৃতি পেলে পুনরাবিষ্কার করতে সমর্থ। কারণ জড়বিশ্বে মনোময় পুরুষের অস্তিত্বের মতোই অতিজড়ীয়ও এক সদ্‌বস্তু।

তবে এই যে এত সব আমাদের পিছনে আছে ও সর্বদাই আমাদের উপর চাপ দিচ্ছে তাদের সম্বন্ধে আমরা যে সাধারণতঃ অজ্ঞ তার কারণ কি? সেই একই কারণ যার জন্য আমরা আমাদের প্রতিবেশীর আন্তরজীবনের কথা জানি না, যদিও আমাদের মতো তাদেরও আন্তরজীবন বর্তমান এবং সর্বদাই আমাদের উপর তার গুহ্য প্রভাব প্রয়োগ করে — কেননা আমাদের ভাবনার ও বেদনার অনেক অংশই আমাদের মধ্যে আসে বাইরে থেকে, আমাদের [illegible] থেকে, মানবজাতির ব্যষ্টি জীব ও সমষ্টিগত মন উভয় থেকেই; আর সেই একই কারণে আমরা আমাদের নিজেদেরই সত্তার সেই বৃহত্তর অংশের কথা জানি না যা আমাদের জাগ্রত মনের কাছে অবচেতন বা অধিচেতন এবং সর্বদাই আমাদের উপরিস্থ জীবনকে প্রভাবিত এবং গুহ্যভাবে নির্ধারণ করছে। এসবের কারণ এই যে আমরা সাধারণতঃ ব্যবহার করি শুধু আমাদের দৈহিক ইন্দ্রিয়গুলি এবং প্রায় পুরোপুরি বাস করি দেহের মধ্যে, ও স্থূল প্রাণ ও স্থূল মনের মধ্যে আর প্রাণজগতে আমাদের সম্পর্ক সরাসরি এসবের মধ্য দিয়ে স্থাপিত হয় না। এই সম্পর্ক স্থাপনের কাজ হয় আমাদের সত্তার অন্যসব অংশের মাধ্যমে, যাদের উপনিষদে বলা হয় 'কোষ' ও পরবর্তী পরিভাষায় বলা হয় 'শরীর'; অর্থাৎ তা হয় আমাদের সত্যকার মনোময় পুরুষের বাস যে মনোকোষ বা সূক্ষ্মশরীর তার মাধ্যমে এবং প্রাণকোষ বা প্রাণিক শরীরের মাধ্যমে; এই প্রাণকোষ বা প্রাণিক শরীর ভৌতিক বা অন্নকোষের সঙ্গে আরো নিবিড়ভাবে সংযুক্ত আর এই দুয়ে মিলে গঠিত হয় আমাদের জটিল অস্তিত্বের স্থূলশরীর। এই সবের এমন সব সামর্থ্য, ইন্দ্রিয়বোধ ও গ্রহণক্ষমতা আছে যেগুলি সর্বদাই আমাদের মধ্যে সক্রিয় এবং আমাদের বিভিন্ন স্থূল ইন্দ্রিয় ও আমাদের স্থূল প্রাণ ও মানসিকতার গ্রন্থির সঙ্গে সংযুক্ত ও তাদের উপর আঘাত দেয়। আত্মবিকাশের দ্বারা আমরা সক্ষম হই এদের কথা জানতে, তাদের মধ্যে আমাদের প্রাণকে অধিগত করতে, তাদের মধ্য দিয়ে প্রাণজগৎ ও অপরাপর জগতের সঙ্গে সচেতন সম্পর্কে আসতে এবং আরো সক্ষম হই এমনকি জড় জগতেরই বিভিন্ন সত্য, তথ্য ও ঘটনা সম্বন্ধে অধিকতর

সূক্ষ্ম অনুভূতি ও অধিকতর অন্তরঙ্গ জ্ঞানের জন্য তাদের ব্যবহার করতে। এই যে জড়লোক যা এখন আমাদের কাছে সর্বেসর্বা তা ছাড়া আমাদের অস্তিত্বের অন্য সব লোকেও আমরা এই আত্মবিকাশের দ্বারা অল্পবিস্তর পূর্ণভাবে বাস করতে সক্ষম হই।

প্রাণজগতের সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা বিশ্ব-অস্তিত্বের আরো উচ্চতর বিভিন্ন লোক সম্বন্ধেও প্রযোজ্য, তবে প্রয়োজনীয় কিছু পার্থক্য থাকবে। কারণ এর উজানে আছে মনোলোক, মানসিক অস্তিত্বের জগৎ যার মধ্যে প্রাণ বা জড় নয়, মনই প্রথম নির্ধারক। সেখানে মন জড়ীয় অবস্থা বা প্রাণশক্তির দ্বারা নির্ধারিত হয় না, বরং মনই এদের নির্ধারণ ও ব্যবহার করে নিজের তৃপ্তির জন্য। সেখানে মন অর্থাৎ চৈত্য ও বুদ্ধিসত্তা এক অর্থে স্বাধীন, অন্ততঃ এত স্বাধীন যে সে নিজেকে এমনভাবে তৃপ্ত ও চরিতার্থ করতে সক্ষম যে আমাদের দেহবদ্ধ ও প্রাণবদ্ধ মানসিকতার তা কল্পনারও একরকম অতীত; কারণ সেখানে পুরুষ শুদ্ধ মনোময় সত্তা আর প্রকৃতির সঙ্গে তার সব সম্পর্ক নির্ধারিত হয় ঐ শুদ্ধতর মানসিকতার দ্বারা, সেখানে প্রকৃতি প্রাণিক ও ভৌতিক না হয়ে বরং মানসিক। প্রাণজগৎ ও পরোক্ষভাবে জড়লোকও — উভয়ই ঐ মনোলোক থেকে প্রক্ষেপবিশেষ, মনোময় পুরুষের এমন কতকগুলি প্রবণতার ফল যারা চেয়েছে নিজেদের উপযোগী ক্ষেত্র, অবস্থা ও সামঞ্জস্যের বিন্যাস লাভ করতে; আর বলা যায় যে এই জগতে মনের উৎপত্তির কারণ হল মনোলোকের চাপ প্রথম প্রাণজগতের উপর এবং এর পর জড় অস্তিত্বের মধ্যে প্রাণের উপর। প্রাণজগতে নিজের পরিবর্তনের দ্বারা এ আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করে কাম-মানস; নিজের অধিকার বলে এ আমাদের মধ্যে প্রবুদ্ধ করে আমাদের চৈত্য ও বুদ্ধিগত অস্তিত্বের শুদ্ধতর সব সামর্থ্য। কিন্তু আমাদের উপরিস্থ মানসিকতা হল এক বৃহত্তর অধিচেতন মানসিকতার গৌণ ফল মাত্র আর এই অধিচেতন মানসিকতার স্বধাম হল মনোলোক। মানসিক অস্তিত্বের এই জগৎও আমাদের উপর ও আমাদের জগতের উপর সততই সক্রিয়, এরও বিভিন্ন সামর্থ্য ও সত্তা আছে এবং আমাদের মনোময় শরীরের মাধ্যমে এ আমাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সেখানে আমরা চৈত্য ও মানসিক স্বর্গগুলিও পাই, আর পুরুষ যখন এই স্থূল শরীর ত্যাগ করে সে ঐসব স্বর্গে উঠে সেখানে সাময়িকভাবে বাস করতে পারে যতক্ষণ না পার্থিব অস্তিত্বের টান তাকে আবার নীচের দিকে নামিয়ে আনে। এখানেও অনেক লোক আছে, তাদের মধ্যে নিম্নতমটি নীচের সব জগতের উপর এসে পড়ে তাদের মধ্যে মিলিয়ে যায় আর মন-সামর্থ্যের তুঙ্গে অবস্থিত উচ্চতম লোকটি মিলিয়ে যায় অধিকতর আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের বিভিন্ন জগতের মধ্যে।

সুতরাং এইসব উচ্চতম জগৎ অতিমানসিক; তারা অতিমানসের তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ মুক্ত, আধ্যাত্মিক বা দিব্য বুদ্ধি[১] বা বিজ্ঞানের তত্ত্বের এবং সচ্চিদানন্দের ত্রিবিধ

[১] একে (Divine intelligence) বলা হয় "বিজ্ঞান" বা "বুদ্ধি" কিন্তু পদটিতে অর্থভ্রম হবার সম্ভাবনা কারণ মানসিক বুদ্ধির বেলাতেও এই পদ প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু মানসিক বুদ্ধি দিব্য বুদ্ধি থেকে উৎপন্ন এক নিম্ন বুদ্ধিমাত্র।

আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। এইসব থেকেই নিম্নের জগৎগুলি উৎপন্ন হয় নিজের প্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপুরুষের ক্রিয়ার কতকগুলি বিশিষ্ট বা সঙ্কীর্ণ অবস্থার মধ্যে পুরুষের এক প্রকার পতনের দ্বারা। কিন্তু এইসবও সংযোগের অযোগ্য এমন কোন ব্যবধানের দ্বারা আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; আমাদের উপর তাদের প্রভাব আসে বিজ্ঞানকোষ ও আনন্দকোষ নামে অভিহিত অংশের মাধ্যমে, কারণ শরীর বা আধ্যাত্মিক শরীরের মাধ্যমে এবং কম সরাসরি মানসিক শরীরের মাধ্যমে, আর তাদের গূঢ় সামর্থ্য সব যে প্রাণিক ও জড়ীয় অস্তিত্বের বিভিন্ন ক্রিয়াধারায় থাকে না তা-ও নয়। প্রাণ ও শরীরের মধ্যে বর্তমান মনোময় সত্তার উপর এই সব পরতম জগতের চাপের ফলেই আমাদের মধ্যে জেগে ওঠে আমাদের চিন্ময় আধ্যাত্মিক সত্তা ও আমাদের বোধিমূলক মন। কিন্তু আমাদের কথায়, অধিকাংশ মানবেরই এই কারণ শরীর একরকম অবিকশিত, আর সেখানে বাস করা অথবা বিভিন্ন অতিমানসিক লোকে আরোহণ করা — অবশ্য এইগুলি মানসিক সত্তায় অবস্থিত অনুরূপ উপলোক থেকে পৃথক — মানবের পক্ষে সর্বাপেক্ষা দুষ্কর বিষয় এবং আরো দুষ্কর সেসবে সচেতনভাবে আবিষ্ট হওয়া। সমাধির তন্ময় অবস্থায় এর সাধন সম্ভব, কিন্তু অন্যপ্রকারে এর সাধনের একমাত্র উপায় হল ব্যষ্টিপুরুষের সামর্থ্যসমূহের এক নব বিবর্তন, কিন্তু এর কথা এমনকি কল্পনা করার ইচ্ছাও একরকম কারুরই নেই। অথচ এরই উপর নির্ভর করে সেই সিদ্ধ আত্মচেতনা একমাত্র যার দ্বারা পুরুষ সমর্থ হয় প্রকৃতির উপর পূর্ণ সচেতন নিয়ন্ত্রণ অধিকার লাভে; কারণ সেখানে এমনকি মনও নিম্নতর প্রভেদকারী তত্ত্বগুলিকে নির্ধারণ করে না, এদের স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করেন পরম চিৎপুরুষ তাঁর অস্তিত্বের এমন সব গৌণ সংজ্ঞা হিসেবে যা উচ্চতর তত্ত্বগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আর এদের সাহায্যে লাভ করে তাদের নিজেদের সুষ্ঠু সামর্থ্য। একমাত্র তাই হবে নিবর্তিত বিষয়ের সম্পূর্ণ বিবর্তন এবং অবিকশিত বিষয়ের বিকাশ আর এর জন্য পুরুষ, যেন নিজের কাছে পণ রেখে এই জড়বিশ্বের মাঝে বেছে নিয়েছেন সর্বাপেক্ষা দুরূহকার্যের অবস্থাগুলি।

বিংশ অধ্যায়

অপরার্ধের ত্রি-পুরুষ

এই হল বিশ্ব অস্তিত্বের নানাবিধ জগতের এবং আমাদের সত্তার নানাবিধ লোকের গঠনতত্ত্ব; এরা যেন এক সোপানশ্রেণী যা নিম্নে জড়ের মধ্যে নেমে গিয়েছে এবং হয়ত তারও নিম্নে গিয়েছে, আর উঠেছে পরম চিৎপুরুষের শিখরসমূহে, এমনকি হয়ত সেই বিন্দুতে যেখানে অস্তিত্ব বিশ্বসত্তা থেকে বাইরে প্রস্থান করে বিশ্বোর্ধ্ব পরমার্থসৎ-এর বিভিন্ন স্তরে — অন্ততঃ এই কথাই বলা হয় বৌদ্ধ জগৎ-সংস্থানের বর্ণনায়। কিন্তু আমাদের সাধারণ জড়ভাবাপন্ন চেতনার কাছে এসবের অস্তিত্ব নেই, কারণ আমরা ব্যস্ত থাকি জড়জগতের এক ক্ষুদ্রকোণের মধ্যে আমাদের অস্তিত্ব নিয়ে এবং পৃথিবীর উপর একটিমাত্র দেহের মধ্যে নিবদ্ধ আমাদের জীবনরূপী কালের এক ক্ষুদ্র মুহূর্তের তুচ্ছ সব অভিজ্ঞতা নিয়ে আর সেজন্য ঐসব জগৎ ও লোক আমাদের কাছে প্রচ্ছন্ন থাকে। ঐ চেতনার কাছে জগৎ হল বিভিন্ন জড়বস্তু ও শক্তির এক স্তূপ যাতে কোন রকমের এক আকার গড়ে উঠেছে এবং কতকগুলি স্থির স্বপ্রতিষ্ঠ বিধানের দ্বারা বিভিন্ন নিয়মিত গতিবৃত্তির মধ্যে সামঞ্জস্যের শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়েছে; এইসব বিধানকে আমাদের মানতে হয়, এরা আমাদের নিয়ন্ত্রণ ও চারিদিকে সীমাবদ্ধ করে আর এদের সম্বন্ধে আমাদের যথাশক্তি উৎকৃষ্ট জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক যাতে আমরা এই যে একটিমাত্র স্বল্পস্থায়ী জীবন যা জন্মে আরম্ভ হয়, মৃত্যুতে শেষ হয় এবং দ্বিতীয়বার আর ফিরে আসে না তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম হই। আমাদের আপনসত্তা জড়ের এই বিশ্বপ্রাণের মাঝে অথবা জড়শক্তির কর্মধারার চিরন্তন প্রবাহের মাঝে এক প্রকার আকস্মিক ঘটনা বা অন্ততঃ এক অতি ক্ষুদ্র ও গৌণ ব্যাপার। কোন রকমে এক অন্তঃপুরুষ বা মন দেহের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে এবং ভাল করে বোঝে না এমন সব বিষয় ও শক্তির মধ্যে স্খলিত পদে বিচরণ করে; প্রথমে সে এক বিপজ্জনক ও প্রধানতঃ বৈরীভাবাপন্ন জগতের মধ্যে কোন রকমে দুরূহ জীবনযাপনে ব্যস্ত থাকে এবং পরে ব্যস্ত থাকে এর বিভিন্ন বিধান প্রণিধান ও ব্যবহার করার চেষ্টায় যাতে যতদিন জীবন থাকে ততদিন তাকে যথাসম্ভব সহনীয় বা সুখী করা যায়। যদি বাস্তবিকই আমরা জড়ের মধ্যে ব্যষ্টিভাবাপন্ন মনের এইরকম এক গৌণ ক্রিয়ার বেশী কিছু না হতাম তাহলে আমাদের কাছে দেবার মত অস্তিত্বের আর কিছু থাকত না; এর শ্রেষ্ঠ অংশ বড় জোর হ'ত চিরন্তন জড় ও প্রাণের বিভিন্ন বাধার সঙ্গে ক্ষণস্থায়ী বুদ্ধিশক্তি ও সঙ্কল্পের এই সংঘর্ষ, যার সঙ্গে যুক্ত হ'ত কল্পনার বিলাস এবং আমাদের কাছে ধর্ম ও কলার দেওয়া বিভিন্ন সান্ত্বনাদায়ক আজব যত কথা এবং মানুষের চিন্তাশ্রয়ী মন ও অস্থির কল্পনাশক্তির দেখা সব চমৎকার স্বপ্ন — সংগ্রামের তীব্রতা কমাত এরা।

কিন্তু যেহেতু মানুষ অন্তঃপুরুষ, সে শুধু এক জীবন্ত দেহ নয়, সেহেতু সে কখনই দীর্ঘকাল সন্তুষ্ট থাকতে পারে না যে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এই যে প্রাথমিক প্রতীতি, — একমাত্র যে প্রতীতিকে জীবনের বাহ্য ও পরাক্‌বৃত্ত তথ্য সমর্থন করে — তা-ই প্রকৃত সত্য বা সমগ্র জ্ঞান: তার প্রত্যক্‌বৃত্ত সত্তা ওপারের বিভিন্ন সদ্‌বস্তুর ইঙ্গিত ও সঙ্কেতে পূর্ণ, এ আনন্ত্য ও অমরত্বের বোধের দিকে উন্মুক্ত, অন্যান্য জগৎ, সত্তার উচ্চতর সম্ভাবনা, অন্তঃপুরুষের জন্য অনুভূতির বৃহত্তর সব ক্ষেত্র — এসব সম্বন্ধেও তার সহজেই দৃঢ় বিশ্বাস আসে। (প্রাকৃতিক) বিজ্ঞান আমাদের দেয় অস্তিত্বের পরাক্‌বৃত্ত সত্য এবং আমাদের অন্নময় ও প্রাণময় সত্তা সম্বন্ধে বাহ্য জ্ঞান; কিন্তু আমরা অনুভব করি যে এদের উজানে এমন সব বিভিন্ন সত্য আছে যেগুলি সম্ভবতঃ আমাদের প্রত্যক্‌বৃত্ত সত্তার উৎকর্ষ ও এর বিভিন্ন সামর্থ্যের বিস্তারের দ্বারা আমাদের কাছে উত্তরোত্তর উন্মুক্ত হতে পারে। এই জগতের জ্ঞান পাবার পর, এর উজানে অস্তিত্বের অন্যান্য অবস্থার জ্ঞানান্বেষণের জন্য আমাদের অদম্য প্রেরণা আসে, আর এইজন্যই উগ্র জড়বাদ ও সন্দেহবাদের যুগের পর সর্বদাই আসে গুহ্যবাদ, নানাবিধ রহস্যময় বিশ্বাস, বিভিন্ন নতুন ধর্ম এবং অনন্ত ও ভগবানের জন্য গভীরতর এষণার যুগ। আমাদের বাহ্য মানসিকতা ও আমাদের দৈহিক প্রাণের সব বিধানের জ্ঞান যথেষ্ট নয়; এ সর্বদাই আমাদের নিয়ে যায় নিম্নে ও পশ্চাতে অবস্থিত প্রত্যক্‌বৃত্ত জীবনের সেই রহস্যময় ও প্রচ্ছন্ন গহনে যার শুধু এক প্রান্ত বা বহিঃপ্রাঙ্গণ হল আমাদের উপরভাসা চেতনা। আমরা দেখতে পাই যে আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়সমূহের কাছে যা উপস্থিত তা বিশ্ব অস্তিত্বের শুধু জড়ীয় খোলস এবং যা আমাদের বাহ্য মানসিকতায় জানা যায় তা পশ্চাতে অবস্থিত অনির্ণীত বিশাল সব মহাদেশের প্রান্তভাগ মাত্র। এইসবকে অনুসন্ধান করে নির্ণয় করা এমন এক কাজ যা নিশ্চয়ই জড় বিজ্ঞান বা বাহ্য মনোবিদ্যার জ্ঞান ছাড়া অন্য জ্ঞানের অন্তর্গত।

নিজেকে ছাড়িয়ে এবং নিজের জীবনের সব প্রত্যক্ষ ও জড় তথ্য ছাড়িয়ে যাবার জন্য ধর্মই মানবের প্রথম প্রয়াস। তার অন্নময় ও মনোময় সত্তার অবলম্বনস্বরূপ এক অনন্ত সম্বন্ধে তার যে আন্তর বোধ এবং এর সান্নিধ্যে এসে এর সংসর্গে বাস করার জন্য তার অন্তঃপুরুষের যে আস্পৃহা — এদের তার কাছে দৃঢ় ও বাস্তব করাই ধর্মের মুখ্য কাজ। মানব চিরদিন স্বপ্ন দেখেছে যে নিজেকে অতিক্রম ক'রে দৈহিক ও মর্ত্য জীবন পার হয়ে অমর জীবন ও আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের আনন্দের মধ্যে তার উপচয় সম্ভব; কিন্তু এই সম্ভাবনা সম্বন্ধে তার সাধারণ জীবন কোন নিশ্চিত আশ্বাস দেয় না; ধর্মের কাজ হল তাকে ঐ সম্ভাবনা সম্বন্ধে নিশ্চিত করা। এ তার এই বোধকেও দৃঢ় করে যে তার ভাগ্য এখন যে জগৎ বা লোকের মধ্যে নির্ধারিত হচ্ছে তাছাড়া অস্তিত্বের অন্যান্য লোক বা জগৎও আছে আর এইসব জগতে এই মরণশীলতা এবং অশুভ ও কষ্টভোগের কাছে এই অধীনতা স্বাভাবিক অবস্থা নয়, বরং অমরত্বের আনন্দই চিরন্তন অবস্থা। আনুষঙ্গিকভাবে, ধর্ম তাকে মর্ত্য জীবনের এমন এক নিয়ম দেয় যার সাহায্যে তার কর্তব্য হল অমরত্বের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা। সে পুরুষ, দেহ নয়, আর তার পার্থিব

জীবন হল এমন এক উপায় যার দ্বারা সে তার আধ্যাত্মিক সত্তার ভবিষ্যৎ অবস্থাগুলি নির্ধারণ করে। এইসব তো সকল ধর্মেরই সাধারণ কথা, কিন্তু এর বেশী তাদের কাছ থেকে আমরা আর কোন দৃঢ় নিশ্চয়তা পাই না। তারা ভিন্ন ভিন্ন কথা বলে; কোন কোন ধর্ম বলে, পৃথিবীতে আমরা এই একটি জীবনই পাই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য, তারা অন্তঃপুরুষের অতীত অমরত্ব অস্বীকার করে, স্বীকার করে শুধু তার ভবিষ্যৎ অমরত্ব, এমনকি এই অবিশ্বাস্য মত জাহির করে ভয় দেখায় যে যারা সঠিক পথে চলে না তাদের ভবিষ্যতে আছে অনন্তকালের কষ্টভোগ; আবার অন্য যেসব ধর্ম আরো উদার ও যুক্তিসম্মত তারা জন্মান্তর স্বীকার করে, তারা বলে যে এই পর পর জীবনের দ্বারাই অন্তঃপুরুষ উপচিত হয় অনন্তের জ্ঞানের মধ্যে; এরা এই সম্পূর্ণ নিশ্চিত আশ্বাসও দেয় যে সকলেরই অন্তিম নিয়তি হল লক্ষ্যপ্রাপ্তি ও সিদ্ধিলাভ। কোন কোন ধর্ম আমাদের বলে যে অনন্ত হল আমাদের থেকে ভিন্ন এমন এক পুরুষ যার সঙ্গে আমরা ব্যক্তিগত সকল সম্পর্ক স্থাপনে সমর্থ, অপর কিছু ধর্ম বলে যে এ হল এক নৈর্ব্যক্তিক অস্তিত্ব যার মধ্যে আমাদের পৃথক সত্তার লয় সাধন কর্তব্য; সেজন্য কেউ কেউ বলে যে আমাদের নিশানা হল ওপারের এমন সব জগৎ যার মধ্যে আমরা ভগবানের সান্নিধ্যে বাস করি, অন্যেরা বলে আমাদের লক্ষ্য অনন্তের মধ্যে নিমজ্জনের দ্বারা প্রপঞ্চের উপশম। বেশীরভাগ ধর্মই আমাদের উপদেশ দেয় যে পার্থিব জীবনকে এক পরীক্ষা বা সাময়িক পীড়া বা অসার কিছু ভেবে সহ্য করা বা ত্যাগ করা চাই এবং ওপারের দিকেই আমাদের সব আশা নিবদ্ধ করা কর্তব্য; কোন কোন ধর্মে আমরা এই পৃথিবীর উপর দেহের মধ্যে মানবের সমষ্টিগত জীবনের মধ্যে পরম চিৎপুরুষের, ভগবানের ভবিষ্য বিজয়ের অস্পষ্ট ইঙ্গিত পাই এবং এইভাবে তারা যে শুধু জীবের পৃথক আশা ও আস্পৃহা সমর্থন করে তা নয়, জাতির সম্মিলিত ও সমবেদনাপূর্ণ আশা ও আস্পৃহাকেও সমর্থন করে। বস্তুতঃ ধর্ম কোন জ্ঞান নয়, এ হল এক বিশ্বাস ও আস্পৃহা; অবশ্য এর সমর্থনে দুইটি বিষয় আছে — বিশাল আধ্যাত্মিক সত্যসমূহের অনির্দিষ্টভাবে প্রকাশিত বোধিমূলক জ্ঞান এবং যেসব পুরুষ সাধারণ জীবন পার হয়ে উর্ধ্বে উঠেছেন তাঁদের প্রত্যক্বৃত্ত অনুভূতি; কিন্তু এ নিজে নিজে আমাদের দেয় শুধু আশা ও বিশ্বাস যাতে আমরা এদের সাহায্যে পরম চিৎপুরুষের বিভিন্ন গুপ্ত প্রদেশ ও বৃহত্তর সত্যকে অন্তরঙ্গভাবে পাবার জন্য আস্পৃহা করতে উৎসাহিত হই। আমরা যে সর্বদাই কোন ধর্মের কিছু সুস্পষ্ট সত্যকে ও প্রতীককে বা কোন বিশেষ সাধনপন্থাকে কতকগুলি অলঙ্ঘ্য গোঁড়া মতে পরিণত করি তা থেকে বোঝা যায় যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিষয়ে আমরা এখনো শিশুমাত্র, আর এখনো আমরা অনন্তের বিদ্যা থেকে দূরবর্তী।

অথচ প্রতি বড় ধর্মেরই পিছনে, অর্থাৎ এর বিশ্বাস, আশা, বিভিন্ন সব প্রতীক, বিক্ষিপ্ত সত্য ও সীমাকারী গোঁড়া মতের বাহ্য দিকের পিছনে আছে আন্তর আধ্যাত্মিক সাধনা ও দীপ্তির গূঢ় দিক যার সাহায্যে প্রচ্ছন্ন সব সত্য জানা যায়, সাধন ও অধিগত করা যায়। প্রতি বাহ্য ধর্মেরই পিছনে এক গূঢ় যোগশাস্ত্র থাকে, অর্থাৎ এক বোধিমূলক

জ্ঞান থাকে যার দিকে প্রথম সোপান হল বিশ্বাস, অবর্ণনীয় বিভিন্ন সদ্‌বস্তু থাকে যার সব রূপময় প্রকাশ হল তার বিভিন্ন প্রতীক, এর বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত সত্যের গভীরতর তাৎপর্য থাকে, আর থাকে অস্তিত্বের বিভিন্ন উচ্চতর লোকের সব রহস্য যাদের স্থূল ইঙ্গিত ও আভাসন হল তার সব গোঁড়া মত ও কুসংস্কার। জড়জগৎ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের বিষয়ে প্রাথমিক সব বাহ্য রূপ ও ব্যবহারের বদলে তার বিশাল প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের বিভিন্ন প্রচ্ছন্ন সত্য ও এখনো গূঢ় রয়েছে এমন সব সামর্থ্য এনে এবং আমাদের নিজেদের মনে বিভিন্ন বিশ্বাস ও মতের বদলে পরীক্ষিত অনুভূতি ও গভীরতর বুদ্ধি এনে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Science) যে কাজ করে, যোগও সেই কাজ করে আমাদের সত্তার বিভিন্ন উচ্চতর লোক ও জগৎ ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে যেগুলি ধর্মের লক্ষ্য। সুতরাং বদ্ধ দুয়ারের পিছনে এই যে সব ক্রম-বিন্যস্ত অনুভূতির ভাণ্ডার অবস্থিত যেখানে যাবার চাবিকাঠি মানবের চেতনা ইচ্ছা করলেই পেতে পারে, সে সব ভাণ্ডার এক ব্যাপক জ্ঞানযোগের অন্তর্ভুক্ত; এই যোগকে শুধু পরমার্থসৎ-এর অন্বেষণে বা ভগবানের স্বরূপ জ্ঞানের বিষয়ে, অথবা ব্যষ্টি মানবপুরুষের সঙ্গে বিভিন্ন বিবিক্ত সম্পর্কের মধ্যে ভগবানকে জানার বিষয়ে আবদ্ধ রাখার প্রয়োজন নেই। একথা সত্য যে পরমার্থসৎ-এর চেতনাই জ্ঞানযোগের পরতম লক্ষ্য এবং ভগবৎপ্রাপ্তিই তার প্রথম ও মহত্তম ও সর্বাপেক্ষা আগ্রহের বিষয়, আর কোন অবর জ্ঞানের জন্য একে অবহেলা করার অর্থ আমাদের যোগকে হীন অথবা এমনকি তুচ্ছ ব'লে কলঙ্কিত করা এবং এর বিশিষ্ট লক্ষ্য হারান বা তা থেকে ভ্রষ্ট হওয়া; কিন্তু ভগবানকে জানা হলে, আমাদের অস্তিত্বের বিভিন্ন লোকে আমাদের ও জগতের সঙ্গে ভগবানের নানাবিধ সম্পর্কের মধ্যে ভগবৎ-জ্ঞানও জ্ঞানযোগের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। শুদ্ধ আত্মসত্তাতে উত্তরণ করাকেই আমাদের প্রত্যক্‌বৃত্ত আত্ম-উন্নয়নের পরাকাষ্ঠা বলে দৃঢ়ভাবে ধরে রেখে আমরা সেই শিখর থেকে বিভিন্ন অবর আত্মাকেও অধিগত করতে পারি, এমনকি তাদের অন্তর্গত যে অন্নময় আত্মা এবং প্রকৃতির সব কর্মপ্রণালী সেসবও অধিগত করতে পারি।

এই জ্ঞানের জন্য আমাদের সাধনা পৃথক পৃথক দুই দিকে সম্ভব — পুরুষের দিকে, প্রকৃতির দিকে; আর ভগবানের আলোকে পুরুষ ও প্রকৃতির নানাবিধ সম্পর্ককে সুষ্ঠুভাবে অধিগত করার জন্য আমরা এই দুই দিককে একত্র করতে পারি। উপনিষদে বলা হয় যে মানুষ ও জগতের মধ্যে, অর্থাৎ পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এক পঞ্চপর্বা পুরুষ বিদ্যমান। প্রথম যার কথা আমরা সকলে জানি তা হল অন্নময় পুরুষ, আত্মা বা সত্তা; এ হল এমন এক আত্মা যার সম্বন্ধে মনে হয় শরীর থেকে আলাদাভাবে তাঁর প্রায় কোন অস্তিত্বই নেই আর শরীরের উপর নির্ভর করে না এমন কোন প্রাণিক বা এমনকি মানসিক ক্রিয়াও নেই। জড়জগতের সর্বত্রই এই অন্নময় পুরুষ বিদ্যমান; এ শরীর ব্যেপে অবস্থিত, অস্ফুটভাবে তার বিভিন্ন গতিবৃত্তি প্রবর্তন করে এবং তার সব অনুভূতির সমগ্র ভিত্তি; এ সব কিছুকেই দেয় প্রণোদনা, এমনকি যারা মানসিকভাবে সচেতন নয়, তাদেরও।

কিন্তু মানবের মধ্যে এই অন্নময় সত্তা প্রাণিকভাবাপন্ন ও মানসিকভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে; প্রাণিক ও মানসিক সত্তার কিছুটা এবং তাদের প্রকৃতি ও সামর্থ্যের কিছুটা সে অর্জন করেছে। কিন্তু এইসব তার যে পাওয়া তা গৌণ, যেন তার আদি প্রকৃতির উপর আরোপ করা হয়েছে এবং তাদের প্রয়োগ করা হয় ভৌতিক অস্তিত্ব ও তার বিভিন্ন করণের বিধান ও ক্রিয়ার অধীনভাবে। আমাদের মানসিক ও প্রাণিক অংশের উপর দেহের ও ভৌতিক প্রকৃতির এই আধিপত্যের জন্যই মনে হয় প্রথম দৃষ্টিতে জড়বাদীদের এই মতের সমর্থন করা হয় যে মন ও প্রাণ শুধু ভৌতিক শক্তির অবস্থা ও পরিণাম এবং এদের সকল বৃত্তিকেই প্রাণী-শরীরস্থ ঐ শক্তির বিভিন্ন ক্রিয়ার দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। বস্তুতঃ, দেহের নিকট মন ও প্রাণের এই সম্পূর্ণ অধীনতাই অবিকশিত মানবজাতির বিশিষ্ট লক্ষণ, মনুষ্যেতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে এটি আরও বেশী মাত্রায় প্রযোজ্য। পুনর্জন্মবাদের কথা এই যে যারা পার্থিব জীবনে এই অবস্থা পার হয় না তারা মৃত্যুর পর মানসিক বা উচ্চতর প্রাণের জগতে উঠতে অক্ষম; বরং বিভিন্ন ভৌতিক লোকের শ্রেণীর প্রান্তভাগ থেকে তাদের ফিরে আসতে হয় পরবর্তী পার্থিব জীবনে আরো বিকাশসাধনের উদ্দেশ্যে। কারণ অবিকশিত অন্নময় পুরুষ জড় প্রকৃতির ও নিজের সংস্কারের সম্পূর্ণ প্রভাবাধীন এবং তার কর্তব্য হল আগে এই সবকে আরো শ্রেয়স্করভাবে ব্যবহার করা তবে যদি সে সক্ষম হয় সত্তার ক্রমবিন্যাসে আরো ঊর্ধ্বে আরোহণ করতে।

অধিকতর বিকশিত মানবজাতি আমাদের সুবিধা দেয় যাতে আমরা সক্ষম হই সত্তার প্রাণময় ও মনোময় লোক থেকে প্রাপ্ত সকল সামর্থ্য ও অনুভূতির আরো শ্রেয়স্কর ও স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে, যাতে এই সব প্রচ্ছন্ন লোক থেকে আরো সাহায্যের জন্য আমরা আরো বেশী প্রবণ হই, স্থূল লোকের মধ্যে আমরা আরো কম নিবিষ্ট থাকি এবং যাতে আমরা কামলোক থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন মহত্তর প্রাণিক শক্তি ও সামর্থ্যের দ্বারা, মহত্তর ও সূক্ষ্মতর মানসিক শক্তির দ্বারা এবং চৈত্যিক ও বুদ্ধিময় লোক থেকে প্রাপ্ত সামর্থ্যের দ্বারা সক্ষম হই অন্নময় সত্তার আদি প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ ও কিছু পরিবর্তন সাধনে। এই বিকাশের দ্বারা আমরা মৃত্যু ও পুনর্জন্মের মাঝে মধ্যবর্তী অস্তিত্বের আরো উচ্চ শিখরে উঠতে সক্ষম হই, আর সক্ষম হই পুনর্জন্মেরই আরো শ্রেয়স্কর ও দ্রুত ব্যবহারে আরো উচ্চতর মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু তাহলেও, আমাদের যে অন্নময় সত্তা তখনো আমাদের জাগ্রত আত্মার অধিকাংশকে নির্ধারণ করে তার মধ্যে আমরা কাজ করি আমাদের ক্রিয়ার উৎস যেসব জগৎ বা লোক তাদের সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট চেতনা না নিয়েই। অবশ্য অন্নময় সত্তার প্রাণলোক ও মনোলোক সম্বন্ধে আমরা অবগত থাকি কিন্তু যথার্থ প্রাণলোক ও মনোলোক সম্বন্ধে অথবা আমাদের সাধারণ চেতনার পশ্চাতে যে মহত্তর ও বৃহত্তর প্রাণময় ও মনোময় পুরুষ আমরা হই, তার সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না। বিকাশের শুধু এক উচ্চ অবস্থাতেই আমরা তাদের কথা জানতে পারি কিন্তু তখনো তা জানি সাধারণতঃ শুধু আমাদের মানসিকভাবাপন্ন স্থূল প্রকৃতির ক্রিয়ার পশ্চাতে; আমরা ঐসব লোকে প্রকৃতই বাস করি না, কারণ তা যদি

করতাম তাহলে আমরা প্রাণসামর্থ্যের দ্বারা অতিশীঘ্রই দেহকে সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম এবং এই দুইকেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম "নেতা" মনের দ্বারা; তখন আমরা আমাদের সঙ্কল্প ও জ্ঞানকে আমাদের সত্তার প্রভু ক'রে তাদের দ্বারা আমাদের শারীরিক ও মানসিক জীবনকে অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হ'তাম। অন্নময় আত্মাকে অতিক্রম করার এবং উচ্চতর সব আত্মাকে অধিগত করার এই সামর্থ্য যোগের দ্বারা অর্জন করা যায় আরো উন্নীত ও প্রসারিত আত্ম-চেতনা ও আত্ম-ঈশনার মাধ্যমে।

পুরুষের দিক থেকে এটি করা সম্ভব অন্নময় আত্মা থেকে এবং ভৌতিক প্রকৃতির সঙ্গে তার নিবিষ্টতা থেকে সরে এসে এবং মনন ও সঙ্কল্পের একাগ্রতার মাধ্যমে নিজেকে প্রথম প্রাণময় আত্মার ও পরে মনোময় আত্মার মধ্যে উন্নীত ক'রে। ঐ উপায়ের দ্বারা আমরা প্রাণময় পুরুষ হয়ে অন্নময় আত্মাকে ঐ নব চেতনার মধ্যে ঊর্ধ্বে নিয়ে আসতে সক্ষম হই যাতে আমরা দেহ, এর প্রকৃতি ও এর সব ক্রিয়াকে শুধু জানি আমরা বর্তমানে যে প্রাণ-পুরুষ তার এমন সব গৌণ অবস্থা ব'লে যেগুলি প্রাণ-পুরুষ ব্যবহার করে জড়জগতের সঙ্গে তার বিভিন্ন সম্পর্কের জন্য। অন্নময় সত্তা থেকে এক প্রকার দূরে থাকার ভাব এবং তাছাড়া এর উপর শ্রেষ্ঠত্ব; দেহ শুধু এক যন্ত্র বা খোল এবং একে সহজেই বিচ্ছিন্ন করা যায়, — এইরকম এক সুস্পষ্ট বোধ; আমাদের অন্নময় সত্তা ও প্রাণ-পরিবেশের উপর আমাদের বিভিন্ন কামনার অসাধারণ কার্যকারিতা; যে প্রাণ-শক্তি সম্বন্ধে আমরা এখন সুস্পষ্টভাবে সচেতন হয়ে উঠি তাকে ব্যবহার ও চালনা করার বিষয়ে সামর্থ্য ও আয়াসের এক প্রখর বোধ; কারণ আমরা বাস্তবভাবে অনুভব করি যে দেহের সম্পর্কে এর ক্রিয়া সূক্ষ্মভাবে ভৌতিক এবং এ এক প্রকার সূক্ষ্ম ঘনত্বে মনের দ্বারা ব্যবহৃত ক্রিয়াশক্তিরূপে আমাদের বোধগম্য; অন্নময় লোকের ঊর্ধ্বে আমাদের মধ্যে প্রাণলোক সম্বন্ধে আমাদের সংবিৎ এবং কামনা-জগতের বিভিন্ন সত্তার সম্বন্ধে জ্ঞান ও তাদের সঙ্গে সংযোগ; বিভিন্ন নতুন সামর্থ্যের বিকাশ ও সক্রিয়তা — যেগুলিকে সাধারণতঃ গুহ্য সামর্থ্য বা সিদ্ধি বলা হয়; জগতের মধ্যে প্রাণ-পুরুষ সম্বন্ধে এক নিবিড় বোধ ও তার সঙ্গে সমবেদনা এবং অপর ব্যক্তিদের বিভিন্ন ভাবাবেগ, কামনা, প্রাণিক সংবেগ সম্বন্ধে জ্ঞান বা ইন্দ্রিয়সংবিৎ; — এইসব হল যোগলব্ধ এই নব চেতনার কতকগুলি নিদর্শন।

কিন্তু এই সকল সামর্থ্য আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিভিন্ন অবর পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত এবং বাস্তবিকই স্থূল অস্তিত্বের চেয়ে এমন বেশী আধ্যাত্মিক কিছু নয়। এইভাবে আমাদের আরো উচ্চে যেতে হবে এবং নিজেদের তুলতে হবে মনোময় আত্মার মধ্যে। তা-ই ক'রে আমরা মনোময় আত্মা হয়ে অন্নময় ও প্রাণময় সত্তাকে এর মধ্যে ঊর্ধ্বে নিয়ে আসতে সক্ষম হই যাতে প্রাণ ও দেহ ও তাদের বিভিন্ন ক্রিয়া আমাদের কাছে হয়ে ওঠে আমাদের সত্তার এমন সব গৌণ অবস্থা যেগুলি আমরা বর্তমানে যে মন-পুরুষ তার দ্বারা ব্যবহৃত হয় জড় অস্তিত্বের অন্তর্গত বিভিন্ন অবর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। এখানেও আমরা প্রথমে লাভ করি প্রাণ ও দেহ থেকে এক প্রকার দূরে থাকার ভাব আর মনে হয় যে আমাদের প্রকৃত জীবন জড়াসক্ত মানবের লোক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অন্য এক লোকে

অবস্থিত এবং এটি পার্থিব অস্তিত্ব অপেক্ষা আরো সূক্ষ্ম অস্তিত্বের সঙ্গে, পার্থিব জ্ঞানালোক অপেক্ষা আরো বিশাল জ্ঞানালোকের সঙ্গে এবং এক অতীব বিরল অথচ আরো মহতী ক্রিয়াশক্তির সঙ্গে সংযুক্ত; বস্তুতঃ আমরা মনোময় লোকের সংস্পর্শে আসি, মনোময় সব জগতের কথা জানতে পারি, এর বিভিন্ন সত্তা ও সামর্থ্যের সঙ্গে যোগাযোগেও সমর্থ হই। ঐ লোক থেকে আমরা কামনা-জগৎ ও জড় অস্তিত্বকে দেখি যেন এরা আমাদের নিম্নে অবস্থিত, এমন বিষয় এই সব যে ইচ্ছা করলেই আমরা এদের দূরে নিক্ষেপ করতে পারি আমাদের থেকে এবং বস্তুতঃ যখন আমরা দেহত্যাগ করি তখন এদের সহজেই বর্জন করি যাতে আমরা বিভিন্ন মানসিক বা চৈত্যিক স্বর্গে অধিষ্ঠিত হই। কিন্তু এইরকম দূরবর্তী ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার বদলে আমরা বরং প্রাণ ও দেহ ও প্রাণলোক ও মনোলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠও হতে পারি এবং প্রভুত্বের সঙ্গে সে সবের উপর সক্রিয় হতে পারি আমাদের সত্তার নব উচ্চলোক থেকে। ভৌতিক বা প্রাণিক ক্রিয়া-শক্তি ছাড়া অন্য এক প্রকার কলনা — এমন কিছু যাকে আমরা বলতে পারি শুদ্ধ মন-সামর্থ্য ও আত্ম-শক্তি, যা অবশ্য বিকশিত মানুষ ব্যবহার করে তবে পরোক্ষ ও অপূর্ণভাবে কিন্তু যা আমরা এখন ব্যবহার করতে পারি স্বচ্ছন্দে ও সজ্ঞানে — তা-ই হয়ে ওঠে আমাদের ক্রিয়ার সাধারণ ধারা, আর সেসময় কামনাশক্তি ও শারীরিক ক্রিয়া গৌণ হয়ে পড়ে, তাদের শুধু ব্যবহার করা হয় তাদের পিছনে অবস্থিত এই নবশক্তির যোগে এবং এর সাময়িক প্রণালীরূপে। বিশ্বস্থিত মনের সঙ্গেও আমাদের সংযোগ ও সমবেদনা থাকে, এর সম্বন্ধে আমরা সচেতন থাকি, সকল ঘটনার পিছনে অবস্থিত সেইসব বিভিন্ন অভিপ্রায়, নির্দেশ, বিভিন্ন মনন-শক্তি এবং সূক্ষ্ম সামর্থ্যসমূহের সংগ্রাম সম্বন্ধেও অবগত থাকি যে সব সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ অজ্ঞ অথবা স্থূল ঘটনা থেকে শুধু অস্পষ্টভাবে অনুমানে সক্ষম অথচ যেসব আমরা এখন প্রত্যক্ষভাবে দেখতে ও অনুভব করতে পারি তাদের ক্রিয়ার কোন স্থূল নিদর্শন বা এমনকি প্রাণিক সংবাদ আসার আগেই। আবার অপর বিভিন্ন সত্তার মনোক্রিয়ার জ্ঞান ও বোধও আমরা অর্জন করি, তা এই সব সত্তা অন্নলোকের হ'ক বা এর উপরের সব লোকের হ'ক; এবং মনোময় পুরুষের মহত্তর বিভিন্ন সামর্থ্য অর্থাৎ গুহ্য সামর্থ্য বা সিদ্ধি যেগুলি প্রাণলোকের বিশিষ্ট সব সামর্থ্য বা সিদ্ধি অপেক্ষা আরো বেশী বিরল বা সূক্ষ্মতর প্রকারের স্বাভাবিকভাবেই আমাদের চেতনায় জেগে ওঠে।

এই সব কিন্তু আমাদের সত্তার অপরার্ধের ত্রিজগতের, প্রাচীন ঋষিদের "ত্রৈলোক্যের" অবস্থা। এইসব লোকে আমরা যতদিন বাস করি, ততদিন আমাদের সব সামর্থ্য ও আমাদের চেতনার প্রসার যতই হ'ক না কেন, আমরা তখনো বাস করতে থাকি বিশ্বদেবগণের এলাকার মধ্যে এবং পুরুষের উপর প্রকৃতির শাসনের অধীন থাকি, যদিও এই অধীনতা অনেক পরিমাণে সূক্ষ্মতর, সহজতর ও লঘুতর। প্রকৃত স্বাধীনতা ও ঈশনা লাভ করতে হলে প্রয়োজন হল আমাদের সত্তার বহু-অধিত্যকাযুক্ত পর্বতের আরো উচ্চতর স্তরে আরোহণ করা।

একবিংশ অধ্যায়

স্বোত্তরণের সোপান

এই যে অপর ত্রি-সত্তা ও অপর ত্রি-লোক যার মধ্যে সাধারণতঃ আমাদের চেতনা এবং তার বিভিন্ন সামর্থ্য ও পরিণাম সীমাবদ্ধ তা থেকে উত্তরণকে বৈদিক ঋষিরা বর্ণনা করেছেন যেন এ হল অন্তরীক্ষ ও পৃথ্বী — এই দুই "রোদসী" ছাড়িয়ে বা ভেদ ক'রে উজানযাত্রা; এই উত্তরণের ফলে অনন্ততার এমন ক্রমপরম্পরা উন্মুক্ত হয় যার সঙ্গে মানবের সাধারণ সত্তার এমনকি তার সর্বাপেক্ষা উচ্চ ও ব্যাপ্ত অবস্থাতেও এখনো কোন পরিচয় নেই। এই উচ্চতার মধ্যে, এমনকি এই ক্রম-পরম্পরায় নিম্নতম ধাপেও আরোহণ করা তার পক্ষে দুরূহ। এক বিচ্ছেদ, যা স্বরূপতঃ অসত্য হলেও কার্যতঃ প্রখর, মানবের সমগ্র সত্তাকে, পিণ্ডকে বিভক্ত করে, আবার তেমন এটি বিভক্ত করে জগৎ-সত্তাকেও, ব্রহ্মাণ্ডকেও। উভয়েরই এক উচ্চ ও নিম্ন গোলার্ধ আছে, এরাই প্রাচীন জ্ঞানের পরার্ধ ও অপরার্ধ। পরার্ধ হল পরম চিৎপুরুষের পূর্ণ ও শাশ্বত রাজ্য; কারণ সেখানে সে অবিরাম ও অক্ষুণ্ণভাবে ব্যক্ত করে তার আনন্ত্যরাজি, বিলসিত করে তার অসীম অস্তিত্বের, তার অসীম চেতনা ও জ্ঞানের, তার অসীম শক্তি ও সামর্থ্যের, তার অসীম আনন্দের অনাবৃত মহিমাপুঞ্জ। ঠিক তেমনই অপরার্ধও চিৎপুরুষের অধিকারভুক্ত, কিন্তু এখানে এ হল তার যে সীমাকারী মন, আবদ্ধ প্রাণ ও বিভাগকরা দেহের অবর আত্মপ্রকাশ তার দ্বারা নিবিড়ভাবে, ঘন আচ্ছাদনে আবৃত। অপরার্ধের মধ্যে আত্মা নামরূপের মধ্যে আচ্ছাদিত থাকে; আন্তর ও বাহ্যের, ব্যষ্টি ও সামান্যের মধ্যে বিভাজনের দ্বারা এর চেতনা খণ্ডিত; এর দৃষ্টি ও বোধ বহির্মুখী (পরাক্‌বৃত্ত); এর শক্তি এর চেতনার বিভাজনের দ্বারা সীমিত হওয়ায় কাজ করে শৃঙ্খলবদ্ধ হয়ে; এর জ্ঞান, সঙ্কল্প, সামর্থ্য, আনন্দ এই বিভাজনের দ্বারা বিভক্ত হওয়ায়, এই সীমার দ্বারা সীমিত হওয়ায় উন্মুক্ত থাকে সেসবের বিপরীত বা বিকৃত রূপের দিকে, অজ্ঞানতা, দুর্বলতা ও কষ্টভোগের দিকে। অবশ্য আমরা আমাদের বোধ ও দর্শনকে প্রত্যক্‌বৃত্ত (অন্তর্মুখী) ক'রে নিজেদের মধ্যে প্রকৃত আত্মা বা চিৎপুরুষের কথা অবগত হতে সক্ষম; সেই আত্মা বা চিৎপুরুষকে আমরা আবার বাহ্য জগৎ ও এর ঘটনাবলীর মধ্যেও আবিষ্কার করতে সক্ষম, আর তার উপায় হল সেখানেও বোধ ও দৃষ্টিকে নাম ও রূপের আবরণের মধ্য দিয়ে আন্তর মগ্ন ক'রে তাদের মধ্যে যা আবিষ্ট নয়তো তাদের পশ্চাতে যা দণ্ডায়মান তাতে পৌঁছান। এই অন্তর্মুখী দৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের সাধারণ চেতনা প্রতিবোধের দ্বারা জানতে পারে আত্মার অনন্ত সত্তা, চেতনা ও আনন্দের কথা এবং এই সব বিষয়ের নিষ্ক্রিয় বা স্থিতিক আনন্ত্যের অংশভাক্‌ হতেও পারে। কিন্তু আমরা এর জ্ঞান, সামর্থ্য ও হর্ষের সক্রিয় বা স্ফুরন্ত অভিব্যক্তির অংশ পেতে পারি শুধু অতীব সীমিত পরিমাণে। এমনকি প্রতিবোধের দ্বারা এই যে স্থিতিক

তাদাত্ম্য লাভ তা-ও সাধারণতঃ দীর্ঘ ও দুরূহ সাধনা ব্যতীত সম্ভব হয় না এবং তা-ও হয় বহু জন্মের মধ্য দিয়ে উত্তরোত্তর আত্মবিকাশের ফলে; কারণ আমাদের সাধারণ চেতনা তার সত্তার অপরার্ধের বিধানে অতি দৃঢ়ভাবে বদ্ধ থাকে। একে আদৌ উত্তরণ করা সম্ভব কি না তা বুঝতে হলে আমাদের কর্তব্য যেসব জগৎ নিয়ে এই দুই গোলার্ধ গঠিত তাদের সম্পর্কগুলি ব্যবহারিক সূত্রাকারে পুনর্বার বলা।

সকল কিছুই পরম চিৎপুরুষের দ্বারা নির্ধারিত হয়, কারণ সূক্ষ্মতম অস্তিত্ব থেকে স্থূলতম জড় পর্যন্ত সকল কিছুই পরম চিৎপুরুষের অভিব্যক্তি। কিন্তু এই চিৎপুরুষ, আত্মা বা সত্তা, যে জগতের মধ্যে বাস করে সেই জগৎকে এবং ঐ জগতের মধ্যে এর চেতনা, শক্তি ও আনন্দের সব অনুভূতিকে নির্ধারণ করে পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্কের অনেক সম্ভবপর স্থিতির মধ্যে কোন এক স্থিতির দ্বারা — যেটি তার নিজেরই বিভিন্ন বিশ্বতত্ত্বের কোন না কোনটির মূলস্থিতি। জড়তত্ত্বের মধ্যে স্থিত হয়ে এটি হয়ে ওঠে জড় প্রকৃতির শাসনের মধ্যে এক ভৌতিক বিশ্বের অন্নময় আত্মা; তখন চিৎপুরুষ বিভোর থাকে জড় সম্বন্ধে তার অনুভূতির মধ্যে; জড় অস্তিত্বের বিশিষ্ট তামসিক সামর্থ্যের অজ্ঞানতা ও নিশ্চেষ্টতার দ্বারা সে অভিভূত হয়। জীবের মধ্যে সে হয়ে ওঠে জড়ভাবাপন্ন পুরুষ, “অন্নময় পুরুষ” যার প্রাণ ও মন বিকশিত হয়েছে জড়তত্ত্বের অজ্ঞানতা ও নিশ্চেষ্টতার মধ্য থেকে এবং যা এই সবের মৌলিক সীমাগুলির অধীন। কারণ জড়ের মধ্যকার প্রাণ কাজ করে দেহের অধীন হয়ে; জড়ের মধ্যকার মন কাজ করে দেহের এবং প্রাণিক বা স্নায়বিক সত্তার অধীন হয়ে; জড়ের মধ্যে চিৎপুরুষ নিজেই তার আত্ম-সম্পর্ক ও তার বিভিন্ন সামর্থ্য বিষয়ে এই জড়শাসিত ও প্রাণ-তাড়িত মনের বিভিন্ন সীমা ও বিভাজনের দ্বারা সীমিত ও বিভক্ত। এই অন্নময় পুরুষ স্থূল শরীরে এবং এর সঙ্কীর্ণ উপরভাসা বাহ্য চেতনায় বদ্ধ হয়ে বাস করে এবং এটি সাধারণতঃ এর বিভিন্ন স্থূল ইন্দ্রিয়ের, এর বিভিন্ন ইন্দ্রিয় বোধের, এর জড়বদ্ধ প্রাণ ও মনের সব অনুভূতিকে এবং তাদের সঙ্গে বড় জোর কিছু সীমিত আধ্যাত্মিক অস্পষ্ট আভাসকে গ্রহণ করে অস্তিত্বের সমগ্র সত্য বলে।

মানব এক চিৎপুরুষ, কিন্তু এমন চিৎপুরুষ যে জড় প্রকৃতির মধ্যে বাস করে মনোময় পুরুষ হয়ে; তার নিজের আত্মচেতনার কাছে সে স্থূল দেহের মধ্যে এক মন। কিন্তু প্রথমে সে যে মনোময় পুরুষ তা জড়ভাবাপন্ন এবং সে জড়ভাবাপন্ন পুরুষকে, অন্নময় পুরুষকে তার প্রকৃত আত্মা বলে গ্রহণ করে। উপনিষদের কথায়, সে জড়কে (অন্নকে) ব্রহ্ম বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয় কারণ এখানে তার দৃষ্টি দেখে যে অন্নই সেই বিষয় যা থেকে সকল কিছুর জন্ম, যার দ্বারা সকল কিছু জীবনধারণ করে এবং যার মধ্যে সকল কিছু তাদের প্রয়াণে প্রত্যাবর্তন করে। চিৎপুরুষ সম্বন্ধে তার স্বাভাবিক সর্বোচ্চ প্রত্যয় হল এ এক অনন্ত, বরং এক নিশ্চেতন অনন্ত যা জড় বিশ্বে (আর বাস্তবিক একমাত্র একেই সে জানে) বাস করে বা তা ব্যেপে থাকে এবং এর উপস্থিতির সামর্থ্যের দ্বারা তার চারিদিকে এই সকল রূপ অভিব্যক্ত করে। নিজের সম্বন্ধে তার স্বাভাবিক

সর্বোচ্চ ভাবনা এই যে সে অন্তঃপুরুষ বা চিৎপুরুষ, তবে এর সম্বন্ধে তার ভাবনা অস্পষ্ট, আর সে এমন এক অন্তঃপুরুষ যা শুধু ভৌতিক জীবনের অনুভূতির দ্বারা অভিব্যক্ত ভৌতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে জড়িত এবং এর বিনাশে স্বয়ংক্রিয় রীতির বশে বাধ্য হয়ে ফিরে যায় অনন্তের বিশাল নির্বিশেষতার মধ্যে। কিন্তু তার [illegible] সামর্থ্য থাকায়, সে অন্নময় পুরুষের এই সব স্বাভাবিক ভাবনা ছাড়িয়ে উর্ধ্বে উঠতে সক্ষম; আর সক্ষম এই সবের পরিপূরক হিসেবে বিভিন্ন অতিভৌতিক লোক ও জগৎ থেকে লওয়া কিছু অনুভূতি যোগ করতে। সে মনে একাগ্র হয়ে তার সত্তার মানসিক অংশ পুষ্ট করতে সক্ষম, তবে সাধারণতঃ এতে তার প্রাণিক ও শারীরিক জীবনের পূর্ণতা ক্ষুণ্ণ হয়; পরিশেষে মন প্রাধান্য লাভ করে ওপারের দিকে উন্মুক্ত হতে সক্ষম হয়। এই আত্ম-মুক্ত-করা মনকে সে একাগ্র করতে পারে পরম চিৎপুরুষে। এখানেও এই প্রক্রিয়ায় সে সাধারণতঃ তার পূর্ণ মানসিক ও শারীরিক জীবন থেকে উত্তরোত্তর বিমুখ হয়; প্রকৃতির মধ্যে তার জড়গত ভিত্তির সামর্থ্য অনুযায়ী সে যথাসম্ভব তাদের সব সম্ভাবনাকে সীমিত বা নিরুৎসাহ করে। পরিশেষে তার আধ্যাত্মিক জীবন প্রাধান্য লাভ ক'রে ধ্বংস করে তার পৃথ্বীমুখী প্রবণতা এবং ছিন্ন করে এর সব বন্ধন ও সীমা। আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন হয়ে সে তার প্রকৃত অস্তিত্ব স্থাপিত করে ওপারে অন্য সব জগতে, প্রাণময় বা মনোময় লোকের স্বর্গে; পৃথিবীর উপর এই জীবনকে সে দেখতে শুরু করে যেন এ এক যন্ত্রণাপূর্ণ বা কষ্টকর ঘটনা বা যাত্রা যাতে সে তার আন্তর আদর্শ আত্মার, তার আধ্যাত্মিক স্বরূপের পূর্ণ উপভোগে কখনই সমর্থ হবে না। উপরন্তু আত্মা বা চিৎপুরুষ সম্বন্ধে তার সর্বোচ্চ ভাবনায় একে সে অন্নবিস্তর শান্ত ধারণা করতেই প্রবণ; কারণ আমরা যেমন দেখেছি, সে যা সম্পূর্ণ অনুভব করতে সক্ষম তা শুধু তার স্থিতিক আনন্ত্য, প্রকৃতির দ্বারা সীমিত নয় এমন পুরুষের নিশ্চল স্বাধীনতা, প্রকৃতি থেকে সরে দাঁড়িয়েছে এমন পুরুষ। অবশ্য তার মধ্যে কিছু দিব্য স্ফুরন্ত অভিব্যক্তি আসা সম্ভব, কিন্তু এ জড় প্রকৃতির গুরুভার সীমারাজির সম্পূর্ণ উর্ধ্বে উঠতে অক্ষম। নীরব ও নিষ্ক্রিয় আত্মার শান্তিই আরো সহজলভ্য এবং একেই সে আরো সহজে ও পূর্ণভাবে ধারণ করতে সক্ষম; অনন্ত কর্মপ্রবৃত্তির আনন্দ, অপরিমেয় সামর্থ্যের কলনা (dynamis) লাভ করা তার পক্ষে দুঃসাধ্য।

কিন্তু চিৎপুরুষ জড়তত্ত্বে স্থিত না হয়ে স্থিত হতে পারে প্রাণতত্ত্বে। এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে চিৎপুরুষ হয়ে ওঠে সচেতনভাবে স্ফুরন্ত প্রকৃতির রাজত্বে এক প্রাণময় জগতের প্রাণময় আত্মা, এক প্রাণ-ক্রিয়াশক্তির প্রাণময় পুরুষ। সচেতন প্রাণের সামর্থ্য ও বিলাসের বিভিন্ন অনুভূতিতে বিভোর হয়ে এটি বশীভূত হয় কামনা, প্রবৃত্তি ও প্রচণ্ড ভাবাবেগের যেগুলি প্রাণিক অস্তিত্বের বিশিষ্ট রাজসিক তত্ত্বের অন্তর্গত। জীবের মধ্যে এই চিৎপুরুষ হয়ে ওঠে প্রাণময় পুরুষ যার প্রকৃতিতে প্রাণশক্তিগুলি উৎপীড়ন করে মানসিক ও ভৌতিক তত্ত্বসমূহকে। প্রাণজগতের মধ্যে ভৌতিক পদার্থ তার সব ক্রিয়া ও রচনা সহজেই গঠন করে কামনা ও এর সব কল্পনা অনুযায়ী এবং প্রাণের বেগ ও সামর্থ্যের ও তাদের বিভিন্ন রচনার দাস হয়ে তাদের আদেশ পালন করে, আর তাদের এ

প্রতিহত বা সীমিত করে না যেমন এ করে এইখানে পৃথিবীতে যেখানে নিষ্প্রাণ জড়ের মধ্যে প্রাণ এক অনিশ্চিত ঘটনা। প্রাণসামর্থ্যের দ্বারা মানসিক পদার্থও গঠিত ও সীমিত হয়, এ তার আদেশ পালন করে এবং সহায় হয় শুধু তার বিভিন্ন কামনার প্রেরণাকে ও তার বিভিন্ন সংবেগের শক্তিকে সমৃদ্ধ ও চরিতার্থ করার কাজে। এই প্রাণময় পুরুষ বাস করে এক প্রাণিক দেহে যা ভৌতিক জড়ের চেয়ে অনেক সূক্ষ্মতর এক দ্রব্যে গঠিত; এ হল এমন এক দ্রব্য যা চিন্ময় ক্রিয়াশক্তির দ্বারা পূর্ণ এবং এমন সব অনুভব, সামর্থ্য, ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি লাভে সমর্থ যেসব পৃথ্বীজড়ের স্থূল আণবিক পদার্থ দিতে পারে এরকম যে কোন বিষয় অপেক্ষা অনেক বেশী বলশালী। মানবেরও নিজের মধ্যে তার অন্নময় সত্তার পশ্চাতে আছে এই প্রাণময় পুরুষ, এই প্রাণিক প্রকৃতি ও এই প্রাণিক শরীর যা অন্নময় সত্তার অধিচেতনস্তরে অবস্থিত, অদেখা ও অজানা ভাবে তবে অতি সন্নিকটে এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গঠন করে তার অস্তিত্বের সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক ভাবে সক্রিয় অংশ; প্রাণ-জগৎ বা কামনা-জগতের সঙ্গে সংযুক্ত এক সমগ্র প্রাণলোক আমাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে, এ হল এমন এক গূঢ় চেতনা যার মধ্যে প্রাণ ও কামনার লীলা চলে বন্ধনহীন ভাবে, তাদের আত্মপ্রকাশ হয় স্বচ্ছন্দভাবে এবং সেখানে থেকে তারা তাদের সব প্রভাব ও রচনা নিক্ষেপ করে আমাদের বহিঃপ্রাণের উপর।

এই প্রাণলোকের সামর্থ্য যে অনুপাতে তার মধ্যে নিজেকে প্রকট করে এবং তার অন্নময় সত্তাকে অধিকার করে, সেই অনুপাতে এই 'পৃথিবীপুত্র' হয়ে ওঠে প্রাণশক্তির এমন এক বাহন যার সব কামনা প্রবল, সব রাগ-বিকার ও ভাবাবেগ প্রচণ্ড, ক্রিয়া তীব্রভাবে স্ফুরন্ত অর্থাৎ সে উত্তরোত্তর হয়ে ওঠে রাজসিক মানব। এখন তার পক্ষে তার চেতনায় প্রাণলোকের দিকে উদ্বুদ্ধ হওয়া, এবং প্রাণময় পুরুষ হয়ে ওঠা, প্রাণিক প্রকৃতি ধারণ করা এবং প্রত্যক্ষ ভৌতিক শরীরের মতোই গূঢ় প্রাণশরীরেও বাস করা সম্ভবপর হয়। যদি সে কিছু পূর্ণতা বা একনিষ্ঠতাসহ এই পরিবর্তন সাধন করে — সাধারণতঃ তা হয় বৃহৎ ও হিতকর সীমার মধ্যে অথবা তার সঙ্গে থাকে নিষ্কৃতিদায়ক বহু জটিলতা — আর যদি সে এইসব বিষয় ছাড়িয়ে না ওঠে, এবং প্রাণের উজানে যে শিখরে এইসবকে ব্যবহার, শুদ্ধ ও উন্নত করা যায় সেখানে সে না আরোহণ করে, তাহলে সে হয়ে ওঠে নিম্ন চরিত্রের অসুর বা দানব, রাক্ষসপ্রকৃতির, নিছক সামর্থ্য ও প্রাণশক্তির পুরুষ; সে স্ফীত বা প্রপীড়িত হয় অসীম কামনা ও রাগ-বিকারের শক্তির দ্বারা এবং চালিত হয় সক্রিয় সামর্থ্য ও বিশাল রাজসিক অহং দ্বারা, তবে এমন সব সামর্থ্যের অধিকারী সে হয় যেগুলি সাধারণ অপেক্ষাকৃত নিশ্চেষ্ট পৃথ্বী-প্রকৃতির দেহবদ্ধ মানবের সামর্থ্য অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণের ও অনেক বেশী প্রকারের। এমনকি যদি সে প্রাণলোকে মনের বিকাশ সাধন করে প্রচুরভাবে এবং এর স্ফুরন্ত শক্তিকে ব্যবহার করে আত্মতৃপ্তির জন্য, আবার আত্মসংযমের জন্যও, তবু তা হবে আসুরিক তপস্যার সঙ্গে, যদিও এ হল এক আরো উন্নত চরিত্রের এবং এর উদ্দেশ্য হবে আরো নিয়ন্ত্রিতভাবে রাজসিক অহং-এর তৃপ্তি সাধন।

কিন্তু যেমন অন্নময় লোকে সম্ভব, তেমন প্রাণময় লোকেরও পক্ষে নিজের

প্রকারের কোন বিশেষ আধ্যাত্মিক মহত্ত্বে আরোহণ করা সম্ভবপর। প্রাণাসক্ত মানুষ ইচ্ছা করলেই কাম-পুরুষ ও কাম-লোকের পক্ষে স্বাভাবিক সব ভাবনা ও ক্রিয়াশক্তি ছাড়িয়ে নিজেকে তুলতে পারে। সে এক উচ্চতর মানসিকতা বিকাশসাধনে সক্ষম, আর সক্ষম প্রাণময় পুরুষের অবস্থার মধ্যে চিৎপুরুষকে অথবা আত্মাকে এর বিভিন্ন রূপ ও সামর্থ্যের পশ্চাতে বা উজানে কিছু উপলব্ধি করার জন্য একাগ্র হতে। এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে নিষ্ক্রিয় শান্তভাবের আবশ্যকতা অপেক্ষাকৃত কম হবে; কারণ সনাতনের আনন্দ ও সামর্থ্যের সক্রিয় চরিতার্থতাসাধন, স্ফুরন্ত অনন্তের আরো বলশালী ও আত্মতৃপ্ত সব সামর্থ্যের, আরো সমৃদ্ধ বিকাশসাধনের সম্ভাবনা আরো অনেক বেশী হবে। কিন্তু তথাপি ঐ চরিতার্থতাসাধন কখনই প্রকৃত ও অখণ্ড সিদ্ধির কাছাকাছিও আসতে সক্ষম হবে না; কারণ কামনা-জগতের সব অবস্থা অন্নময় জগতের অবস্থার মতোই সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে অনুপযোগী। প্রাণপুরুষেরও কর্তব্য আমাদের অস্তিত্বের অপরার্ধে তার প্রাণের পূর্ণতা, সক্রিয়তা ও শক্তি ক্ষুণ্ণ করেও চিৎপুরুষের বিকাশসাধন করা এবং পরিশেষে প্রাণিক সূত্র থেকে, প্রাণ থেকে সরে এসে তার উজানে অবস্থিত নীরবতা বা অনির্বচনীয় সামর্থ্যে যাওয়া। যদি সে প্রাণ থেকে না সরে আসে, তাহলে তাকে প্রাণের শৃঙ্খলেই বদ্ধ থাকতে হবে, এবং কামনা-জগতের শুধু নিজের অধিকার বলে এবং এর প্রবল রাজসিকতত্ত্বের দরুন এর অধোমুখী আকর্ষণের দ্বারা তার আত্ম-চরিতার্থতাও সীমিত হবে। প্রাণময় লোকেও সম্পূর্ণ সিদ্ধি অসম্ভব; যে পুরুষ শুধু অতদূর পৌঁছয় তাকে মহত্তর অনুভূতি, উচ্চতর আত্মবিকাশ, চিৎপুরুষের আরো সোজাভাবে উত্তরণের জন্য ফিরে আসতে হবে স্থূল জীবনের মধ্যে।

জড় ও প্রাণের উপরে আছে মনের তত্ত্ব, যা বিষয়সমূহের গূঢ় প্রভবের আরো নিকটবর্তী। মনে স্থিত পরম চিৎপুরুষ হয়ে ওঠে মনোময় জগতের মনোময় আত্মা এবং সেখানে আবিষ্ট থাকে নিজেরই শুদ্ধ ও জ্যোতির্ময় মানসিক প্রকৃতির রাজত্বে। সেখানে এ কাজ করে বিশ্ব বুদ্ধির অতীব স্বাধীনতার মধ্যে; আর এর সহায়ে থাকে চৈত্য মানসিক ও উচ্চতর ভাবপ্রধান মনঃশক্তির সম্মিলিত সব ক্রিয়া যেগুলি মনোময় অস্তিত্বের বিশিষ্ট সাত্ত্বিক তত্ত্বের স্বচ্ছতা ও প্রসন্নতার দ্বারা সূক্ষ্মভাবাপন্ন ও আলোকিত হয়। জীবের মধ্যে ঐরকম স্থিত চিৎপুরুষ হয়ে ওঠে মনোময় পুরুষ যার প্রকৃতিতে মনের স্বচ্ছতা ও জ্যোতির্ময় সামর্থ্য কাজ করে নিজের অধিকারেই, প্রাণিক বা দৈহিক সব করণের কোন সীমার বা উৎপীড়নের অনধীন হয়ে; বরং এই সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ করে এর দেহের বিভিন্ন রূপ এবং এর প্রাণের বিভিন্ন সামর্থ্য। কারণ মন তার নিজের লোকে প্রাণের দ্বারা সীমিত বা জড়ের দ্বারা ব্যাহত হয় না, যেমন এ হয় এখানে পৃথ্বী-ক্রিয়াধারায়। এই মনোময় পুরুষ বাস করে এক মনোময় বা সূক্ষ্মদেহে যা জ্ঞান, অনুভব, ও অপর সব সত্তার সঙ্গে সমবেদনা ও পারস্পরিক আন্তরবোধের এমন সব সামর্থ্য ভোগ করে যা একরকম আমাদের কল্পনার অতীত; এদের সঙ্গে তার থাকে এমন এক স্বচ্ছন্দ, সূক্ষ্ম ও ব্যাপক মানসিকভাবাপন্ন ইন্দ্রিয়-শক্তি যা প্রাণ-প্রকৃতির বা জড়-প্রকৃতির স্থূলতর সব অবস্থার দ্বারা সীমিত হয় না।

মানবেরও নিজের মধ্যে অধিচেতন স্তরে, অজানা ও অদেখাভাবে, তার জাগ্রত চেতনা ও স্থূল শরীরের পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় এই মনোময় পুরুষ, মানসিক প্রকৃতি ও মনোময় শরীর আছে আর আছে এক মনোময় লোক যা জড়ভাবাপন্ন নয় এবং যার মধ্যে মনের তত্ত্ব স্বচ্ছন্দে কাজ করে; এই যে জগৎ যা এর বিজাতীয়, এর স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক এবং এর শুদ্ধতা ও স্বচ্ছতানাশক, তার সঙ্গে এ যেমন সংঘর্ষে রত, এ এখানে মনোলোকে তেমন সংঘর্ষে রত নয়। যে অনুপাতে এই মনোলোক মানবের উপর চাপ দেয়, সেই অনুপাতে তার বিভিন্ন উচ্চতর শক্তি, তার বুদ্ধিপ্রধান ও চৈত্য সত্তা ও সামর্থ্যগুলি, তার উচ্চতর ভাবপ্রধান প্রাণ জাগ্রত ও উপচিত হয়। কারণ এ যতই প্রকট হয়, স্থূল অংশগুলি ততই এর প্রভাবাধীন হয় এবং দেহবদ্ধ প্রকৃতির অনুরূপ মনোলোক এর দ্বারা ততই সমৃদ্ধ ও উন্নত হয়। এর ক্রমবর্ধমান আধিপত্যের কোন এক বিশেষ মাত্রায়, এ মানবকে করতে পারে সত্যকারের মানব, শুধু এক যুক্তিবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী নয়; কারণ এ তখন আমাদের অন্তঃস্থ মনোময় পুরুষকে এর বিশিষ্ট শক্তি দেয়; এই মনোময় পুরুষই আমাদের মানবজাতির মনস্তাত্ত্বিক গঠনের সারতত্ত্ব যা আন্তরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, যদিও এখনো এ হল নিরতিশয় বাধাগ্রস্ত।

এই উচ্চতর মানসিক চেতনায় প্রবুদ্ধ হওয়া, এই মনোময় পুরুষ হওয়া,[১] এই মানসিক প্রকৃতি ধারণ করা এবং শুধু প্রাণময় ও অন্নময় কোষে বাস না করে এই মনোময় শরীরেও বাস করা মানবের পক্ষে সম্ভব। যদি এই রূপান্তরে পর্যাপ্ত সম্পূর্ণতা থাকত তাহলে সে এমন এক জীবন ও সত্তা লাভে সক্ষম হ'ত যা অন্ততঃ অর্ধদিব্য। কারণ সে এমন দৃষ্টি ও বিভিন্ন সামর্থ্য ও অনুভব উপভোগ করত যা এই সাধারণ জীবন ও শরীরের ক্ষেত্রের অতীত; সে সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করত শুদ্ধজ্ঞানের স্বচ্ছতার দ্বারা, অন্যসব সত্তার সঙ্গে সে যুক্ত হ'ত প্রেম ও সুখের সমবেদনার দ্বারা, তার ভাবাবেগগুলি উন্নীত হ'ত চৈত্য-মানসিক লোকের পূর্ণতায়; তার ইন্দ্রিয়সংবিৎগুলি উদ্ধার পেত স্থূলতা থেকে, তার সূক্ষ্ম, শুদ্ধ ও নমনীয় ধীশক্তি মুক্তি পেত অশুদ্ধ প্রাণিক ক্রিয়াশক্তি ও জড়ের সব বাধা থেকে। আর, যে কোন মানসিক হর্ষ ও জ্ঞান অপেক্ষা পরতর প্রজ্ঞা ও আনন্দের প্রতিবোধও সে বিকশিত করত, কারণ সে আরো পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারত অতিমানসিক আলোকের শরস্বরূপ বিভিন্ন চিদাবেশ ও বোধি যাতে অক্ষম মনের বিকৃতকারী ও মিথ্যাজনক মিশ্রণ থাকত না এবং সে গঠন করতে পারত তার উৎকৃষ্ট মানসিক অস্তিত্ব ঐ বৃহত্তর জ্যোতির ছাঁচে ও সামর্থ্যে। তখন সে আত্মা বা পরম

[১] এখানে আমি 'মন' বলতে শুধু যে মানুষের সাধারণত জানা মনের উচ্চতম স্তর ধরেছি তা নয়, সেই সব আরো উচ্চতর স্তরও এর অন্তর্গত যেগুলিতে প্রবেশ করার হয় তার বর্তমানে কোন শক্তি নেই, নয় তাদের বিভিন্ন সামর্থ্যের এক ক্ষীণ অংশকে শুধু আংশিক ও মিশ্রিতভাবে গ্রহণ করা হয় — অর্থাৎ প্রভাস মন, বোধি এবং সর্বশেষ সৃজনক্ষম অধিমানস বা মায়া যা অনেক উর্ধ্বে অবস্থিত এবং আমাদের বর্তমান অস্তিত্বের উৎস। যদি মন বলতে শুধু যুক্তিবুদ্ধি বা মানুষীবুদ্ধি বোঝায় তাহলে স্বাধীন মনোময় পুরুষ ও এর অবস্থা এমন কিছু হ'ত যা তাদের সম্বন্ধে এখানে যে বর্ণনা দেওয়া হল তার চেয়ে অনেক বেশী সীমিত ও অতীব নিম্ন শ্রেণীর।

চিৎপুরুষকেও উপলব্ধি করতে পারত এখন যা সম্ভব তার চেয়ে অনেক বিশালতর এবং আরো জ্যোতির্ময় ও আরো প্রগাঢ় তীব্রতায় এবং তার অস্তিত্বের পরিতৃপ্ত সুষমার মধ্যে এর সক্রিয় সামর্থ্য ও আনন্দের বৃহত্তর লীলার সঙ্গে।

আর আমাদের সাধারণ ধারণায় এটাই মনে হবে এক পূর্ণ সিদ্ধি, এমন কিছু যার জন্য মানব আদর্শবাদের চরমে উঠেও আস্পৃহা করতে পারে। একথা নিঃসন্দেহ যে শুদ্ধ মনোময় পুরুষের যা নিজস্ব স্বভাব তাতে এ হল এক পর্যাপ্ত সিদ্ধি, কিন্তু তখনো এর স্থান আধ্যাত্মিক প্রকৃতির মহত্তর বিভিন্ন সম্ভাবনার অনেক নিম্নে। কেননা এখানেও আমাদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি মনের বিভিন্ন সীমার অধীন থাকবে, আর মন হল যেন এক প্রতিফলিত, মিশ্রিত ও বিকীর্ণ অথবা সঙ্কীর্ণভাবে তীব্র আলোক, এটি চিৎপুরুষের বৃহৎ ও ব্যাপক স্বপ্রতিষ্ঠ দীপ্তি ও হর্ষ নয়। ঐ বৃহত্তর আলোক, ঐ গভীরতর আনন্দ মনের নাগালের অতীত। বাস্তবিকই মন কখনই চিৎপুরুষের সুষ্ঠু যন্ত্র হতে পারে না; এর ক্রিয়ার কোন পরম আত্মপ্রকাশ সম্ভব নয়, কারণ তার স্বভাবই হল পৃথক করা, বিভক্ত করা, সীমা টানা। এমনকি যদি মন সকল সদর্থক অনৃত ও প্রমাদ থেকে মুক্ত হতে পারত, এমনকি যদি এটি পুরোপুরি বোধিসম্পন্ন ও অভ্রান্তভাবে বোধিসম্পন্ন হতে পারত, তাহলেও এর ক্ষমতা হ'ত শুধু বিভিন্ন অর্ধ-সত্য বা পৃথক সত্যকে আনা ও সংগঠন করা, আর, এসবকে যে আনত তা-ও তাদের স্বরূপে নয়, পরন্তু বিভিন্ন জ্যোতির্ময় প্রতিমূর্তিতে, যেগুলিকে একত্রিত করা হয়েছে যাতে একটি রাশিকৃত সমগ্র বা স্তূপময় গঠন নির্মিত হয়। সুতরাং এখানে আত্ম-সিদ্ধি প্রয়াসী মনোময় পুরুষের কর্তব্য হল হয় নিজের অবর অস্তিত্ব বর্জন করে শুদ্ধ চিৎপুরুষের মধ্যে প্রস্থান করা, আর না হয় স্থূল জীবনে ফিরে আসা তার মধ্যে এমন এক সামর্থ্য বিকাশ করার জন্য যা এখনো পর্যন্ত আমাদের মানসিক ও চৈত্য প্রকৃতিতে পাওয়া যায়নি। এই হল উপনিষদের সেই কথার মর্ম যাতে বলা হয় যে মনোময় পুরুষের দ্বারা লব্ধ স্বর্গ হল তা-ই যাতে মানবকে নিয়ে যায় সূর্যের রশ্মিসমূহে অর্থাৎ অতিমানসিক ঋতচেতনার বিকীর্ণ, বিভক্ত যদিও প্রখর সব কিরণে আর সেখান থেকে ফিরে আসতে হয় পার্থিব অস্তিত্বে। কিন্তু যেসব জ্ঞানদীপ্ত সাধক পার্থিব জীবন ত্যাগ ক'রে "সূর্যদ্বারের" মধ্য দিয়ে উজানে চলে যায় তারা সেখান থেকে ফেরে না। যে মনোময় পুরুষ তার নিজ লোক ছাড়িয়ে যায় সে প্রত্যাবর্তন করে না কেননা ঐ সংক্রমণের দ্বারা সে অস্তিত্বের এমন এক উচ্চ লোকে যায় যা পরার্ধের বিশিষ্ট লোক। সে এর মহত্তর আধ্যাত্মিক প্রকৃতিকে এই অপরার্ধের ত্রিতত্ত্বের মধ্যে নামিয়ে আনতে অক্ষম, কারণ এখানে মনোময় পুরুষই আত্মার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। এখানে এই ত্রিবিধ মনোময়, প্রাণময় ও অন্নময় শরীর প্রায় আমাদের সামর্থ্যের সম্পূর্ণ ক্ষেত্র, তারা ঐ মহত্তর চেতনার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়; এই আধার এমনভাবে তৈরী হয়নি যে এর মধ্যে কোন মহত্তর দেবতাকে ধারণ করা যায় বা এই অতিমানসিক শক্তি ও জ্ঞানের জ্যোতির স্থান হয়।

এই যে সসীমতা তা বর্তমান থাকে শুধু ততদিন যতদিন মানব আবদ্ধ থাকে

মানসিক মায়ার পরিসীমার মধ্যে। যদি সে সর্বোচ্চ মানসিক আয়তন ছাড়িয়ে ওঠে জ্ঞান-আত্মার মধ্যে, যদি সে হয়ে ওঠে জ্ঞান-পুরুষ, বিজ্ঞানে স্থিত চিৎপুরুষ, "বিজ্ঞানময় পুরুষ" এবং ধারণ করে এর অনন্ত সত্য ও সামর্থ্যের প্রকৃতি, যদি সে বাস করে জ্ঞানকোষে, কারণ শরীরে, এবং আবার এইসব সূক্ষ্ম মানসিক কোষে ও তার সঙ্গে সংযুক্ত প্রাণময় ও স্থূলতর অন্নময় কোষে, তাহলে তখন এবং কেবল তখনই সে সমর্থ হবে তার পার্থিব অস্তিত্বের মধ্যে পুরোপুরি নামিয়ে আনতে অনন্ত আধ্যাত্মিক চেতনার পূর্ণতা; কেবল তখনই সে উপযুক্ত হবে তার সমগ্র সত্তাকে, এমনকি তার সমগ্র ব্যক্ত দেহবদ্ধ প্রকাশমান প্রকৃতিকে তুলতে আধ্যাত্মিক রাজ্যে। কিন্তু এ হল অত্যধিক দুষ্কর; যেহেতু, কারণ শরীর নিজেকে সহজেই উন্মুক্ত করে বিভিন্ন আধ্যাত্মিক লোকের চেতনা ও সামর্থ্যরাজির নিকট এবং এর যে প্রকৃতি তাতে এ অস্তিত্বের পরার্ধের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু মানবের মাঝে এ হয় আদৌ বিকশিত হয়নি, নয় এ পর্যন্ত শুধু অপরিণতভাবে বিকশিত ও সংহত হয়েছে এবং আমাদের অন্তঃস্থ অধিচেতন লোকের বহু মধ্যবর্তী দ্বারের পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন আছে। এ তার উপাদান আনে সত্য-জ্ঞানের লোক থেকে, এবং অনন্ত আনন্দের লোক থেকে এবং এইসব পুরোপুরি আরো এক অগম্য পরার্ধের অন্তর্গত। এরা তাদের সত্য ও আলোক ও হর্ষ বর্ষণ করে এই অপর অস্তিত্বের উপর এবং যেসবকে আমরা আধ্যাত্মিকতা বলি, যেসবকে সিদ্ধি বলি সেসবের উৎস তারাই। কিন্তু তাদের এই অন্তর্বর্ষণ আসে পুরু সব আবরণের পিছন থেকে এবং এদের মধ্য দিয়ে এসে যখন তারা পৌঁছয় তখন তারা এত মিশ্রিত ও ক্ষীণ যে তারা সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আমাদের বিভিন্ন স্থূল অনুভবের জড়ীয়তার মধ্যে, অতিমাত্রায় বিকৃত ও দূষিত হয় আমাদের সব প্রাণিক সংবেগের মধ্যে, তারা আমাদের ভাবনাপর এষণার মধ্যেও দূষিত হয়, যদিও কিছু কম পরিমাণে, এমনকি আমাদের মানসিক প্রকৃতির সর্বোচ্চ বোধিসম্পন্ন বিভিন্ন স্তরের অপেক্ষাকৃত শুদ্ধতা ও প্রখরতার মধ্যেও তারা দূষিত হয় তবে আরো কম পরিমাণে। সকল অস্তিত্বের মধ্যেই অতিমানসিক তত্ত্ব নিগূঢ়ভাবে নিহিত। এমনকি স্থূলতম জড়ীয়তার মধ্যেও এ বর্তমান, বিভিন্ন অবর জগৎকে এ রক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ করে তার গুপ্ত সামর্থ্য ও বিধানের বলে; কিন্তু ঐ সামর্থ্য নিজেকে অবগুণ্ঠিত রাখে এবং ঐ বিধান কাজ করে অলক্ষিতভাবে আমাদের শারীরিক, প্রাণিক ও মানসিক প্রকৃতির হীনতর নিয়মের শৃঙ্খলিত সব সীমা ও পঙ্গু বিকৃতির মধ্য দিয়ে। তবু হীনতম রূপগুলিরও মধ্যে এই যে তার উপস্থিতি ও নিয়ন্ত্রণ তা থেকে আমরা আশ্বাস পাই — আর এই আশ্বাসের কারণ হল সকল অস্তিত্বের ঐক্য — যে সকল আবরণ সত্ত্বেও, আমাদের রাশিরাশি আপতিক অক্ষমতা সত্ত্বেও, আমাদের মন ও প্রাণ ও দেহের অসামর্থ্য বা অনিচ্ছুকতা সত্ত্বেও তাদের জাগরণ সম্ভবপর, এমনকি এখানে তাদের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তিও সম্ভবপর। আর যা সম্ভবপর তা একদিন হবেই, কারণ তাই সর্বশক্তিমান চিৎপুরুষের বিধান।

পুরুষের এইসব পরতর অবস্থার স্বরূপ এবং তাদের যে সব আধ্যাত্মিক প্রকৃতির

বিভিন্ন জগৎ তাদের স্বরূপ অবধারণ করা স্বভাবতঃই দুরূহ। এমনকি উপনিষদ এবং বেদও শুধু তাদের আভাস দেয় বিভিন্ন সঙ্কেতে, ইঙ্গিতে ও প্রতীকে। তবু দুই গোলার্ধের সীমানায় অবস্থিত মনের দ্বারা যতদূর আয়ত্ত করা সম্ভব ততদূর তাদের সব নীতি ও ব্যবহারিক ফল সম্বন্ধে কিছু বিবরণ দেওয়ার প্রয়াস করা প্রয়োজনীয়। ঐ সীমানার অতীতে যাওয়াই আত্মজ্ঞানের দ্বারা স্বোত্তরণ-যোগের পরাকাষ্ঠা, সম্পূর্ণতা। উপনিষদ বলে সিদ্ধির অভীপ্সু পিছনে সরে এসে উপরে যায়, অন্নময় পুরুষ থেকে প্রাণময় পুরুষে, আবার প্রাণময় পুরুষ থেকে মনোময় পুরুষে — মনোময় পুরুষ থেকে বিজ্ঞানময় পুরুষে এবং ঐ বিজ্ঞানময় আত্মা থেকে আনন্দময় পুরুষে। এই আনন্দময় আত্মা পূর্ণ সচ্চিদানন্দের চিন্ময় প্রতিষ্ঠা এবং তার মধ্যে প্রয়াণেই সমাপ্ত হয় পুরুষের উৎক্রান্তি। সুতরাং দেহবদ্ধ চেতনার এই যে সুনিশ্চিত রূপান্তর, আমাদের সদা অভীপ্সু প্রকৃতির এই যে জ্যোতির্ময় রূপান্তর ও স্বোত্তরণ — তার কিছু বর্ণনা নিজের কাছে দেবার চেষ্টা করা মনের অবশ্য কর্তব্য। মন যে বর্ণনা পেতে সক্ষম তা কখনই বিষয়ের স্বরূপের পক্ষে পর্যাপ্ত হতে পারে না, তবে অন্ততঃ তার কিছু আভাস-দেওয়া ছায়ার অথবা হয়ত কোন অর্ধ-ভাস্বর প্রতিমূর্তির ইঙ্গিত দেওয়া এর পক্ষে সম্ভব।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

বিজ্ঞান

আমাদের সুষ্ঠু স্বোত্তরণে আমরা আমাদের মনশ্চেতন সত্তার অজ্ঞানতা বা অর্ধ-আলোকিত অবস্থা থেকে বাইরে ও উপরে প্রয়াণ করি তার উর্ধ্বে এক মহত্তর প্রজ্ঞা-আত্মা ও সত্য-সামর্থ্যের মধ্যে যাতে আমরা সেখানে বাস করতে পারি দিব্য জ্ঞানের নির্বাধ আলোকের মধ্যে। আমরা যে মনোময় মানব তা পরিবর্তিত হয় ঋত-চিৎ দেবে, 'বিজ্ঞানময় পুরুষে'। আমাদের উৎক্রান্তি শৈলের এই সানুর উপর আসীন হয়ে আমরা থাকি বিরাট পুরুষের এই জড়ীয়, এই প্রাণিক, এই মানসিক স্থিতি থেকে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন লোকে এবং এই পরিবর্তনের সাথে আমাদের পুরুষ-জীবন ও আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ জগৎ সম্বন্ধে আমাদের সকল দৃষ্টি ও অনুভূতিরও পরিবর্তন হয়। আমরা জন্ম নিই এক নব পুরুষ-অবস্থার মধ্যে এবং ধারণ করি এক নব প্রকৃতি; কারণ পুরুষের অবস্থানুসারে প্রকৃতির অবস্থা গড়ে ওঠে। জগৎ-উৎক্রান্তির প্রতি সংক্রমণে, জড় থেকে প্রাণে, প্রাণ থেকে মনে, বদ্ধ মন থেকে মুক্ত বুদ্ধিতে, যেমন যেমন প্রচ্ছন্ন, অর্ধ-ব্যক্ত বা ইতিপূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে এমন অন্তঃপুরুষ সত্তার উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে ওঠে, প্রকৃতিও তেমন তেমন উন্নীত হয় অস্তিত্বের এক মহত্তর কর্মধারায়, আরো বিস্তৃত চেতনায়, আরো বিপুল শক্তিতে এবং আরো প্রগাঢ় বৃহৎ ক্ষেত্রে ও হর্ষে। কিন্তু মন-আত্মা থেকে বিজ্ঞান-আত্মায় সংক্রমণ যোগের মহৎ ও চূড়ান্ত সংক্রমণ। এর অর্থ আমাদের উপর বিশ্ব অবিদ্যার শেষ বন্ধনেরও অপসারণ এবং আমাদের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা বিষয়সমূহের পরম সত্যে, এমন এক অনন্ত ও শাশ্বত চেতনায় যাকে তমসাচ্ছন্নতা, মিথ্যা, কষ্টভোগ বা প্রমাদ দ্বারা কলুষিত করা যায় না।

এই হল প্রথম শিখর যা দিব্য পূর্ণতার, "সাধর্ম্য"র, "সাদৃশ্য"র মধ্যে প্রবেশ করে; কারণ বাকীসব শুধু তার দিকে উর্ধ্বে তাকায় অথবা তার তাৎপর্যের কিছু কিরণ আহরণ করে। মনের বা অধিমানসের উচ্চতম শিখরগুলিও এক হ্রাস-পাওয়া অবিদ্যার পরিধির অন্তর্গত; তারা কিছু দিব্য আলোক বক্রভাবে নিতে সক্ষম কিন্তু এর সামর্থ্য হ্রাস না ক'রে আমাদের অবর অঙ্গসমূহে একে চালনা করতে অক্ষম। কারণ যতদিন আমরা মন, প্রাণ ও দেহ — এই ত্রিস্তরের মধ্যে থাকি, ততদিন আমাদের সক্রিয়া প্রকৃতি কাজ করতে থাকে অজ্ঞানতার শক্তিতে, এমনকি তখনো যখন মনের মধ্যকার অন্তঃপুরুষ জ্ঞানের কিছুটা অধিগত করে। এমনকি যদি অন্তঃপুরুষ তার মানসিক চেতনায় জ্ঞানের সকল বিশালতাকেই প্রতিফলিত বা বিবৃত করত, তাহলেও সে একে ক্রিয়ার শক্তিতে সঠিকভাবে প্রস্তুত করতে সক্ষম হ'ত না। তার ক্রিয়ায় শক্তি হয়ত প্রচুর বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু তবু সত্যের পশ্চাতে এমন এক সঙ্কীর্ণতা থাকবে, তখনো সত্য বিভক্ত হবার এত বেশী

সম্ভাবনা থাকবে যে অনন্তের সামর্থ্যে অখণ্ডভাবে তার কাজ করা সম্ভব হবে না। সাধারণ সামর্থ্যগুলির তুলনায় দিব্যভাবাপন্ন প্রভাস মনের সামর্থ্য বিপুল হতে পারে, কিন্তু তখনো এ অক্ষমতার অধীন থাকবে এবং কার্যসাধক সঙ্কল্পের শক্তি এবং এর প্রেরণাদায়ক ভাবনার আলো — এ দুয়ের মধ্যে কোন সঙ্গতি থাকা সম্ভব হবে না। অনন্ত সান্নিধ্য সেখানে থাকতে পারে স্থিতিশীল পাদে কিন্তু প্রকৃতির ক্রিয়াগুলির প্রবৃত্তি তখনো অপরা প্রকৃতির অন্তর্গত, এর কর্মপ্রণালীর ত্রিগুণ অনুসারেই এ চলতে বাধ্য এবং এর অন্তঃস্থ মহত্ত্বের কোন পর্যাপ্ত রূপ দিতে এ অক্ষম। অকৃতকার্যতা, আদর্শ সঙ্কল্প ও কার্যসাধক সঙ্কল্পের মধ্যে ব্যবধান আমাদের আন্তর চেতনায় আমরা যে সত্যকে অনুভব করি তাকে জীবন্ত রূপ ও ক্রিয়ায় ফুটিয়ে তুলতে এই যে আমাদের নিরন্তর অক্ষমতা — এই সবের যে দুঃখময় পরিস্থিতি তা পদে পদে ব্যাহত করে মন ও প্রাণের সকল আস্পৃহাকে তাদের পশ্চাতে অবস্থিত দিব্যত্ব লাভের পথে। কিন্তু বিজ্ঞান শুধু সত্য নয়, এ হল সত্য-সামর্থ্যও, এ হল অনন্ত ও দিব্য প্রকৃতির নিজস্ব কর্মধারা; এ হল সেই দিব্য জ্ঞান যা স্বতঃস্ফূর্ত ও জ্যোতির্ময় ও অবশ্যম্ভাবী আত্ম-চরিতার্থতা সাধনের শক্তি ও আনন্দের মধ্যে দিব্য সঙ্কল্পের সঙ্গে এক। সুতরাং বিজ্ঞানের দ্বারা আমরা মানব প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করি দিব্য প্রকৃতিতে।

তাহলে এই বিজ্ঞান কি, কিভাবেই বা তার বর্ণনা সম্ভব? দুইটি বিপরীত প্রমাদ পরিহার করা চাই, এরা এমন দুই ভ্রান্ত ধারণা যা বিজ্ঞানের সত্যের বিপরীত দুই দিক বিকৃত করে। একটি প্রমাদ হল সেই সব দার্শনিকদের যারা ধীশক্তির মধ্যে নিবদ্ধ থাকে; এতে "বিজ্ঞান"কে সমার্থক করা হয় অন্য ভারতীয় সংজ্ঞা "বুদ্ধি"র সঙ্গে এবং "বুদ্ধি"কে সমার্থক করা হয় যুক্তিবুদ্ধির, বিচারবুদ্ধির, তর্কবুদ্ধির সঙ্গে। যেসব দর্শন এই অর্থ গ্রহণ করে তারা শুদ্ধ ধী-র লোক থেকে একেবারে চলে যায় শুদ্ধ চিৎপুরুষের লোকে। কোন মধ্যবর্তী সামর্থ্য স্বীকার করা হয় না, শুদ্ধ যুক্তিবুদ্ধি ব্যতীত জ্ঞানের কোন দিব্যতর ক্রিয়া স্বীকার করা হয় না; সত্যের সম্মুখীন হবার জন্য সীমিত মানুষী সাধনকেই নেওয়া হয় চেতনার সম্ভবপর উৎকৃষ্ট চালক ব'লে, এর সর্বোচ্চ শক্তি ও আদি গতিবৃত্তি ব'লে। এক বিপরীত প্রমাদ হল রহস্যবাদীদের ভ্রান্ত ধারণা যাতে বিজ্ঞানকে এক করা হয় অনন্তের সেই চেতনার সঙ্গে যা সকল ভাবময় জ্ঞান থেকে মুক্ত অথবা এমন ভাবময় জ্ঞান যা পুঞ্জীভূত হয়েছে চিন্তার একমাত্র সারে এবং যা 'একম্'-এর একমাত্র ও অপরিবর্তনীয় ভাবনায় অন্য স্ফুরন্ত ক্রিয়ারহিত। এই হল উপনিষদের "চৈতন্যঘন" এবং বিজ্ঞানের অন্যতম গতি, বরং এর বহুমুখী গতিবৃত্তির মধ্যে একটি সূত্র। বিজ্ঞান যে শুধু অনন্ত স্বরূপের ঘনীভূত চেতনা তা নয়, এ আবার একই সময়ে অনন্তের অসংখ্যবিধ লীলার অনন্ত জ্ঞান। সকল ভাবময় জ্ঞান (মানসিক নয়, অতিমানসিক) এর মধ্যে নিহিত, কিন্তু এটি ভাবময় জ্ঞানের দ্বারা সীমিত নয়, কারণ এ হল সকল ভাবময় গতিবৃত্তির অনেক উজানে। আবার, বিজ্ঞানের ভাবময় জ্ঞানের স্বরূপ যে বুদ্ধিগত চিন্তা তা-ও এ নয়; আমরা যাকে যুক্তিবুদ্ধি বলি এ তা নয়, নয়কো ঘনীভূত বুদ্ধি। কারণ যুক্তিবুদ্ধির সব

প্রণালী মানসিক, তার আহরণ মানসিক, তার ভিত্তি মানসিক; কিন্তু বিজ্ঞানের ভাবময় প্রণালী স্বয়ং-প্রকাশ, অতিমানসিক, এর মনন-আলোক থেকে যা উৎপন্ন হয় তা স্বতঃস্ফূর্ত, আহরণ দ্বারা উৎপন্ন হয় না; এর মনন-ভিত্তি হল সচেতন তাদাত্ম্যের অভিব্যক্তি, পরোক্ষ সন্নিকর্ষজাত সংস্কারের রূপান্তর নয়। মননের এই দুই রূপের মধ্যে এক সম্পর্ক আছে, এমনকি একপ্রকার ছিন্ন অভিন্নতা আছে; কারণ একটি অন্যটি থেকে গূঢ়ভাবে উৎপন্ন হয়। মনের অতীতে যা তা থেকেই মনের উৎপত্তি। কিন্তু তারা কাজ করে ভিন্ন লোকে এবং পরস্পরের ধারার বিপরীত ভাবে।

এমনকি শুদ্ধতম যুক্তিবুদ্ধিও, সর্বাপেক্ষা ভাস্বর বিচারবুদ্ধিযুক্ত ধীমত্তাও বিজ্ঞান নয়। যুক্তিবুদ্ধি বা ধীশক্তি অপরাবুদ্ধি মাত্র; এ তার ক্রিয়ার জন্য ইন্দ্রিয়মানসের দেওয়া সব বিষয়ের ও মানসিক বুদ্ধির দেওয়া সব প্রত্যয়ের উপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞানের মতো এ স্বয়ং-প্রকাশ, প্রামাণিক নয়, কারণ বিষয়কে বিষয়ীর সঙ্গে এক করে না। বস্তুতঃ বুদ্ধির এক পররূপ আছে যাকে বলা হয় বোধিসম্পন্ন মানস বা বোধিসম্পন্ন যুক্তিবুদ্ধি এবং তা তার বিভিন্ন বোধি, চিদাবেশ, দ্রুত প্রকাশক দর্শন, ভাস্বর অন্তর্দৃষ্টি ও বিচারের দ্বারা মহত্তর সামর্থ্য, ক্ষিপ্রতর ক্রিয়া ও অধিকতর ও স্বতঃস্ফূর্ত নিশ্চয়তার সঙ্গে যুক্তিবুদ্ধির কাজ করতে সক্ষম। এ কাজ করে সত্যের আত্ম-আলোকে যা ইন্দ্রিয়মানসের চঞ্চল মশালশিখা ও তার সীমিত অনিশ্চিত বিষয়ের উপর নির্ভর করে না; এ বুদ্ধিজ প্রত্যয় দিয়ে অগ্রসর হয় না, এ অগ্রসর হয় অন্তর্দর্শনের সব প্রত্যয় দিয়ে: এ হল এক প্রকার সত্য-দর্শন, সত্য-শ্রবণ, সত্য-স্মৃতি, সাক্ষাৎ সত্য-বিবেক। এই সত্যময় ও প্রামাণিক বোধি এবং সাধারণ মানসিক যুক্তিবুদ্ধির যে সামর্থ্যকে এর সঙ্গে সহজেই ভুল করা হয় সেই সামর্থ্য — এই দুই যে পৃথক তা প্রণিধান করা চাই। এই শেষেরটি নিগূহিত যুক্তিবুদ্ধির এমন এক সামর্থ্য যা তার সিদ্ধান্তে পৌঁছয় লাফ দিয়ে, তার্কিক মনের সাধারণ ধাপগুলিতে তার প্রয়োজন থাকে না। যেমন কোন ব্যক্তি বিপজ্জনক জমিতে হাঁটবার সময় চোখে সে যে পরিমাণ মাটি দেখতে পায় তাকে পায়ের স্পর্শ দিয়ে ভয়ে ভয়ে পরীক্ষা ক'রে অগ্রসর হয়, তেমন তর্কবুদ্ধিও অগ্রসর হয় একটির পর একটি পা ফেলে; আর প্রতি পদক্ষেপের নিশ্চয়তা পরীক্ষা ক'রে। কিন্তু তর্কবুদ্ধির অতীত অপর এক পদ্ধতি হল দ্রুত অন্তর্দৃষ্টির বা ক্ষিপ্র বিচারের গতি; এ অগ্রসর হয় দীর্ঘ পদক্ষেপে বা লম্ফ দিয়ে যেমন কোন ব্যক্তি লাফিয়ে চলে একটি নিশ্চিত জায়গা থেকে অন্য একটি নিশ্চিত স্থানে, অন্ততঃ যাকে সে নিশ্চিত ব'লে জানে তাতে। এই যে জায়গাটি সে পার হয় তাকে সে দেখে নেয় এক সংহত দৃষ্টির ঝলকে কিন্তু সে চোখ দিয়ে বা স্পর্শের দ্বারা এর বিভিন্ন পরম্পরা, লক্ষণ বা অবস্থা পৃথক পৃথক দেখে না বা মাপ করে না। এই গতিবৃত্তিতে বোধির সামর্থ্যের কিছু বোধ থাকে, এর কিছু বেগ থাকে আর থাকে এর আলোক ও নিশ্চয়তার কিছু অবভাস, আর একে বোধি মনে করতে আমরা সর্বদাই উন্মুখ। কিন্তু আমাদের ধারণা ভুল আর একে বিশ্বাস করার পরিণতি হতে পারে নিদারুণ বিষম প্রমাদ।

বুদ্ধিবাদীরা এমনকি এও মনে করে যে বোধি স্বয়ং এই পদ্ধতির চেয়ে বেশী কিছু নয়, যাতে তর্কমনের সমগ্র কাজটি করা হয় ক্ষিপ্রতার সঙ্গে, অথবা বোধ হয় অর্ধ-চেতনভাবে বা অবচেতনভাবে, এটি যুক্তিসম্মত পদ্ধতির দ্বারা বিবেচনার সঙ্গে সম্পাদিত হয় না। কিন্তু স্বরূপতঃ এই ক্রিয়া বোধি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আর এটি যে সত্যক্রিয়া হবেই তা-ও নয়। এর উল্লম্ফনের পরিণতি হতে পারে পদস্খলন, এর ক্ষিপ্রতা প্রবঞ্চনা করতে পারে, এর নিশ্চয়তা প্রায়ই হয় এক অতিবিশ্বাসী প্রমাদ। এর সিদ্ধান্তের বৈধতাকে সর্বদা নির্ভর করতে হবে ভবিষ্যতে ইন্দ্রিয়বোধের সাক্ষ্য দ্বারা তার যাথার্থ্য নির্ণয়ের বা সমর্থনের উপর, আর না হয় নিজের কাছে নিজের নিশ্চয়তা ব্যাখ্যা করার জন্য প্রয়োজন হবে বুদ্ধিমূলক সব প্রত্যয়ের এক যুক্তিসম্মত মিলনসাধন। বস্তুতঃ এই অবর আলোক অতি সহজেই নিজের মধ্যে নিতে পারে প্রকৃত বোধির মিশ্রণ, আর তখন এক মিথ্যা-বোধিসম্পন্ন বা অর্ধ-বোধিসম্পন্ন মনের সৃষ্টি হয়, যা তার পুনঃপুনঃ উজ্জ্বল সফলতার দরুন অতীব ভ্রান্তিজনক কারণ এইসব সফলতা বিভিন্ন অত্যধিক আত্ম-নিশ্চিত মিথ্যা নিশ্চয়তার আবর্তকে কথঞ্চিৎ উপশম করে মাত্র। প্রত্যুত, প্রকৃত বোধির নিজের মধ্যেই থাকে তার সত্যতার প্রামাণ্যতা; তার সীমার মধ্যে এ হল ধ্রুব ও অভ্রান্ত। এবং যতক্ষণ এ থাকে শুদ্ধ বোধি এবং নিজের মধ্যে কোন ইন্দ্রিয়-প্রমাদ বা বুদ্ধিগত ভাবময় জ্ঞানের মিশ্রণ আসতে না দেয় ততক্ষণ এ কোন অনুভূতির দ্বারাই খণ্ডিত হয় না। যুক্তিবুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়বোধের দ্বারা বোধিকে পরে পরীক্ষা করা যেতে পারে কিন্তু এর সত্য এই পরীক্ষণের উপর নির্ভরশীল নয়, এ স্বতঃপ্রণোদিত আত্ম-প্রমাণের দ্বারা সুনিশ্চিত। যদি কখনও এই মহত্তর আলোকের সঙ্গে অনুমানের উপর নির্ভরশীল যুক্তিবুদ্ধির বিরোধ হয় তাহলে পরিশেষে আরো প্রচুর জ্ঞানের পর দেখা যাবে যে বোধিমূলক সিদ্ধান্তই সঠিক এবং যে যুক্তিসম্মত ও অনুমানগত সিদ্ধান্ত আরো গ্রহণীয় মনে হয়েছিল তা ভ্রমপূর্ণ। কারণ প্রকৃত বোধির উৎপত্তি বিষয়সমূহের স্বপ্রতিষ্ঠ সত্য থেকে এবং ঐ স্বপ্রতিষ্ঠ সত্যই একে দৃঢ় করে, জ্ঞানলাভের কোন পরোক্ষ, গৌণ বা অন্যাশ্রিত পদ্ধতির দ্বারা একে দৃঢ় করা হয় না।

কিন্তু এই বোধিসম্পন্ন যুক্তিবুদ্ধিও বিজ্ঞান নয়, এ হল অতিমানস-আলোকের এক রশ্মিমাত্র যা দীপ্তির ঝলকের দ্বারা চলে আসে মানসিকতার মধ্যে, যেমন বিদ্যুৎ আসে অনুজ্জ্বল মেঘাচ্ছন্ন অঞ্চলে। এর বিভিন্ন চিদাবেশ, সত্য-দর্শন, বোধি, স্বয়ং-প্রকাশক নির্ণয় হল এক পরতর বিজ্ঞানলোক থেকে আসা এমন সব বার্তা যা সুবিধামত আমাদের চেতনার অবর স্তরে এসে পড়ে। বোধি সম্পন্ন মনের স্বরূপই এমন যে এর ক্রিয়ার ও স্বয়ংপূর্ণ বিজ্ঞানের ক্রিয়ার মধ্যে গুরুতর প্রভেদের ব্যবধান রয়ে যায়। প্রথমতঃ এ কাজ করে পৃথক পৃথক ও সীমিত সব দীপ্তি দ্বারা; একটি বিদ্যুৎ-ঝলকের দ্বারাই তার কাজ শুরু ও শেষ হয় এবং এই এক ঝলকের দ্বারা জ্ঞানের যে নিতান্তই সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র বা একটিমাত্র স্বল্প অংশ আলোকিত হয় তার মধ্যেই এর সত্য সীমাবদ্ধ থাকে। আমরা প্রাণীর মধ্যে সহজাত সংস্কারের ক্রিয়া দেখি; এই সংস্কার সেই প্রাণ-মানস বা ইন্দ্রিয়-

মানসের এক স্বয়ংক্রিয় বোধি যা প্রাণীর শ্রেষ্ঠ ও নিশ্চিততম করণ আর এরই উপর প্রাণীকে নির্ভর করতে হয় কারণ মানুষের মতো যুক্তিবুদ্ধির আলো তার নেই, তার যা আছে তা আরো অপরিণত ও এখনো মন্দগঠিত বুদ্ধি। আর আমরা প্রথমেই দেখতে পাই যে এই যে সহজাত সংস্কার যা যুক্তিবুদ্ধি অপেক্ষা অত বেশী নিশ্চিত বলে মনে হয় তার আশ্চর্যজনক সত্য পাখী, পশু বা পতঙ্গের মধ্যে সীমিত থাকে সেই কোন বিশেষ ও পরিমিত প্রয়োজনের মধ্যে যা সাধনের জন্য তাকে প্রয়োগ করা হয়। যখন প্রাণীর প্রাণ-মানস ঐ পরিমিত সীমা ছাড়িয়ে কাজ করতে চেষ্টা করে তখন এ মানুষের যুক্তিবুদ্ধি অপেক্ষা আরো অন্ধভাবে বিষম ভুল করে আর একে কষ্ট করে শিখতে হয় পর পর অনেক ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার দ্বারা। মানুষের উচ্চতর মানসিক বোধি হল আন্তর-দর্শনমূলক বোধি, এটি ইন্দ্রিয়-বোধি নয়; কারণ এ দীপ্ত করে বুদ্ধিকে, ইন্দ্রিয়মানসকে নয়, এ হল আত্ম-সচেতন ও জ্যোতির্ময়, অর্ধ অবচেতন অন্ধ আলোক নয়; এ স্বাধীনভাবে ক্রিয়াশীল, যন্ত্রের মতো স্বয়ংক্রিয় নয়। কিন্তু তথাপি, এমনকি যখন এ অনুকরণশীল মিথ্যা-বোধির দ্বারা দূষিত হয় না তখনো এ মানুষের মধ্যে, প্রাণীর সহজ-সংস্কারের মতোই সীমিত থাকে, — সীমিত থাকে সঙ্কল্প বা জ্ঞানের কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের মধ্যে — যেমন সহজ-সংস্কার সীমিত থাকে জীবনধারণের কোন বিশেষ উপকারিতার বা প্রকৃতির উদ্দেশ্যের মধ্যে। আর যখন বুদ্ধি তার প্রায় অপরিবর্তনীয় অভ্যাসের মতো চেষ্টা করে একে কাজে লাগাতে, প্রয়োগ করতে, এর সঙ্গে কিছু যোগ দিতে, তখন এ বোধিসম্পন্ন কেন্দ্রের চারিদিকে নিজেরই বিশিষ্ট ধারা অনুসারে গড়ে তোলে সত্য ও প্রমাদের মিশ্রণের এক স্তূপ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, বুদ্ধি এই বোধির সারপদার্থের মধ্যে ইন্দ্রিয়-প্রমাদ ও ভাবনাগত প্রমাদের কিছু উপাদান আরোপ করে অথবা বিভিন্ন মানসিক যোগ ও বিচ্যুতির দ্বারা একে আচ্ছাদন করে বোধির সত্যকে যে শুধু পথভ্রষ্ট করে তা নয়, এ এই সত্যকে বিকৃত এবং মিথ্যায় পরিণত করে। বোধির উৎকৃষ্ট অবস্থায় এ আমাদের দেয় শুধু সীমিত আলো, যদিও এই আলো প্রখর; আমাদের অপব্যবহারের দরুন অথবা এর মিথ্যা অনুকরণের দরুন এর নিকৃষ্ট অবস্থায় এ এমন সব সংশয় ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে আমাদের ফেলতে পারে যেগুলি কম উচ্চাভিলাষী যুক্তিবুদ্ধি এড়িয়ে যায় আর তার নিজের নিরাপদ ও আয়াসকর মন্থর পদ্ধতিতে সন্তুষ্ট থাকে, তবে এই পদ্ধতি যুক্তিবুদ্ধির অবর সব উদ্দেশ্যের পক্ষে নিরাপদ হলেও, কখনই বিষয়সমূহের আন্তর সত্যের সন্তোষজনক দিশারী নয়।

যুক্তিবুদ্ধির উপর আমাদের নির্ভরতার আধিক্য যতই কম হয় ততই আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় বোধিসম্পন্ন মনের ব্যবহার অনুশীলন ও সম্প্রসারণ করা। আমরা আমাদের মানসিকতাকে শিক্ষা দিতে পারি যেন তা এখনকার মতো বোধিসম্পন্ন দীপ্তির প্রতি পৃথক ঝলককেই তার নিজের বিভিন্ন অবর উদ্দেশ্যের জন্য না অধিকার করে, যেন তা এই ঝলকের চারিদিকে প্রথমেই আমাদের ভাবনাকে নিক্ষেপ ক'রে এক কঠিন বুদ্ধিগত ক্রিয়ায় না পরিণত করে; আমরা একে এই শিক্ষা দিতে সক্ষম যে এ যেন চিন্তা করে

ক্রমান্বয়ী ও সম্বদ্ধ বোধিসমূহের প্রবাহে, যেন এ আলোর পর আলো বর্ষণ করে প্রোজ্জ্বল ও বিজয়ী পরম্পরায়। এই দুরূহ পরিবর্তন সাধনে আমরা সেই অনুপাতে সক্ষম হব যে অনুপাতে আমরা শুদ্ধ করতে পারি এই হস্তক্ষেপকারী বুদ্ধিকে — অর্থাৎ যদি আমরা এর মধ্যে কমাতে পারি বিষয়সমূহের বাহ্যরূপের দাসত্বে আবদ্ধ জড়গত মননের উপাদান, অবর প্রকৃতির বিভিন্ন ইচ্ছায়, কামনায়, সংবেগে আবদ্ধ প্রাণিক মননের উপাদান, বুদ্ধির বেশী পছন্দসই, অনুকূল বা পূর্বেই স্থির করা হয়েছে এমন সব ভাবনায়, প্রত্যয়ে, মতামতে, নির্দিষ্ট ক্রিয়াসমূহে আবদ্ধ বুদ্ধিগত মননের উপাদান আর যদি আমরা ঐসব উপাদানকে ন্যূনতম মাত্রায় হ্রাস ক'রে তাদের স্থলে আনতে পারি বিষয়সমূহের এক বোধিসম্পন্ন দর্শন ও বোধ, বাহ্যরূপগুলির মধ্যে বোধিসম্পন্ন অন্তর্দৃষ্টি, বোধিসম্পন্ন সঙ্কল্প ও বোধিসম্পন্ন ভাবময় জ্ঞান। এই কাজ আমাদের চেতনার পক্ষে যথেষ্ট দুষ্কর কারণ আমাদের চেতনা স্বভাবতঃই মানসিকতা, প্রাণিকতা ও দৈহিকতার ত্রিবিধ বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ থাকে নিজেরই অপূর্ণতায় ও অজ্ঞানতায় — এরাই অন্তঃপুরুষের বন্ধন বিষয়ে বৈদিক রহস্যার্থক উপকথার উত্তম, মধ্যম ও অধম পাশ, অর্থাৎ বাহ্যরূপের মিশ্রিত সত্য ও মিথ্যার সেই পাশগুলি যা দিয়ে শুনঃশেপকে বদ্ধ করা হয়েছিল যূপকাষ্ঠে।

কিন্তু এই দুরূহ কাজটি সুষ্ঠুভাবে সমাধা করা হলেও বোধি বিজ্ঞান হবে না; এ হবে মনের মধ্যে তার ক্ষীণ বিস্তার অথবা প্রথম প্রবেশের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ। এই যে পার্থক্য যার সঠিক বর্ণনা প্রতীকের সাহায্য বিনা সহজ নয় তাকে বোঝান যায় যদি আমরা বৈদিক উপমাটি গ্রহণ করি যাতে সূর্য হ'ল বিজ্ঞানের[1] প্রতীক, আর আকাশ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী হল মানবের ও বিশ্বের মানসিকতা, প্রাণিকতা ও দৈহিকতার প্রতীক। পৃথিবীতে বাস করলে, অন্তরীক্ষে আরোহণ করলে, এমনকি আকাশে পাখা মেললেও মনোময় পুরুষ তখনো থাকে সূর্যের রশ্মিজালের মধ্যে, তার দৈহিক আলোর মধ্যে নয়। আর ঐ রশ্মিজালের মধ্যে সে বিষয়সমূহকে যেভাবে দেখে তা তাদের স্বরূপে নয়, বরং তার দর্শন-ইন্দ্রিয়ে তারা যেভাবে ইন্দ্রিয়ের দোষের জন্য বিকৃত হয়ে অথবা তার সীমাবদ্ধতার জন্য তাদের সঙ্কুচিত সত্যে প্রতিফলিত হয় সেইভাবে দেখে। কিন্তু বিজ্ঞানময় পুরুষ বাস করে স্বয়ং সূর্যের মধ্যে, প্রকৃত আলোকের নিজের দেহ ও দীপ্তির মধ্যে; এই জ্যোতিকে সে জানে নিজেরই আত্ম-জ্যোতির্ময় সত্তা ব'লে আর সে দেখে অপরার্ধের ত্রিতত্ত্বের ও এর অন্তর্গত প্রতি বিষয়টির সমগ্র সত্য। সে একে যে দেখে তা মানসিক দর্শনেন্দ্রিয়ে প্রতিফলনের দ্বারা নয়, সে দেখে সাক্ষাৎ বিজ্ঞানসূর্যরূপী চক্ষু দিয়ে — কারণ বেদের কথায় সূর্য হল দেবগণের চক্ষু। মনোময় পুরুষ, এমনকি বোধিসম্পন্ন মানসেও সত্যকে অনুভব করে শুধু প্রোজ্জ্বল প্রতিফলনের দ্বারা অথবা সীমিত বার্তার দ্বারা এবং এর সঙ্গে আবার থাকে মানসিক দর্শনের বিভিন্ন সীমা ও ন্যূন সামর্থ্য; কিন্তু অতিমানসিক পুরুষ

[1] এইজন্য বেদে সূর্যকে বলা হয় "ঋতম্ জ্যোতিঃ"।

তাকে দেখে স্বয়ং বিজ্ঞানের দ্বারা এবং সত্যের সঠিক কেন্দ্র ও উচ্ছল উৎস থেকে, তার স্বরূপে এবং নিজেরই স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বয়ংপ্রকাশক পদ্ধতির দ্বারা। কারণ বিজ্ঞান হল পরোক্ষ ও মানবীয় জ্ঞানের বিপরীত প্রত্যক্ষ ও দিব্য জ্ঞান।

ধীশক্তির কাছে বিজ্ঞানের স্বরূপ বর্ণনা করার একমাত্র উপায় হল ধীশক্তির বিপরীত স্বরূপের সঙ্গে তুলনা করা এবং তখনো যে সমস্ত পদ আমাদের ব্যবহার করতে হয় তারা তা প্রকাশ করতে পারে না যদি না তাদের সঙ্গে সহায়স্বরূপ থাকে কিছু বাস্তব অনুভূতি। কারণ যুক্তিবুদ্ধির তৈরী এমনকি ভাষা আছে যা যুক্তিবুদ্ধির অতীত বিষয়কে প্রকাশ করতে সক্ষম? মূলতঃ, এই দুই সামর্থ্যের মধ্যে প্রভেদ এই যে মানসিক যুক্তিবুদ্ধি কষ্ট করে চলে অজ্ঞানতা থেকে সত্যে, কিন্তু বিজ্ঞানের নিজের মধ্যেই আছে সত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ, তার অব্যবহিত দর্শন এবং সহজ ও সতত অধিকার; সত্যের জন্য অন্বেষণের বা কোন প্রকার পদ্ধতির প্রয়োজন বিজ্ঞানের থাকে না। যুক্তিবুদ্ধি শুরু করে সব বাহ্যরূপ নিয়ে এবং কষ্ট করে পরিশ্রম করে তাদের পশ্চাতে সত্যে পৌঁছবার জন্য আর এই কাজে তাকে সর্বদাই অথবা প্রায়শঃই বাহ্যরূপের উপর অন্ততঃ আংশিকভাবেও নির্ভর করতে হয়। বিজ্ঞান শুরু করে সত্য থেকে, এবং বাহ্য রূপগুলি দেখায় সত্যের আলোকে; এ হল স্বয়ং সত্যের শরীর ও তার মর্ম। যুক্তিবুদ্ধি অগ্রসর হয় অনুমানের দ্বারা, তা সিদ্ধান্তে পৌঁছয়; কিন্তু বিজ্ঞান অগ্রসর হয় তাদাত্ম্য বা দর্শনের দ্বারা — এ হয়, দেখে ও জানে। স্থূল দর্শন যেমন বিষয়সমূহের বাহ্য রূপ দেখে ও আয়ত্ত করে প্রত্যক্ষভাবে, তেমন ও আরো বেশী প্রত্যক্ষভাবে বিজ্ঞান বিষয়সমূহের সত্য দেখে ও আয়ত্ত করে। কিন্তু যেখানে বিষয়সমূহের সঙ্গে স্থূল ইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হয় প্রচ্ছন্ন সংযোগের দ্বারা, বিজ্ঞান তাদের সঙ্গে তাদাত্ম্যে আসে অনবগুণ্ঠিত একত্বের দ্বারা। এইভাবে এ সব বিষয়কে জানতে পারে যেমন কোন ব্যক্তি তার নিজের অস্তিত্ব জানে, — সহজভাবে, সুনিশ্চিতভাবে ও অবিলম্বে। যুক্তিবুদ্ধির কাছে ইন্দ্রিয়গুলি যা দেয় শুধু তা-ই প্রত্যক্ষ জ্ঞান, সত্যের বাকী অংশ জানা যায় পরোক্ষভাবে; বিজ্ঞানের কাছে তার সকল সত্যই প্রত্যক্ষজ্ঞান। সুতরাং ধীশক্তির দ্বারা যে সত্য লাভ হয় তা এক অর্জন যার উপর সর্বদাই থাকে সন্দেহের কিছু ছায়া, অসম্পূর্ণতা, রাত্রি ও অজ্ঞানতা বা অর্ধ-জ্ঞানের এক ঘিরে থাকা উপচ্ছায়া, আরো অধিক জ্ঞানের দ্বারা পরিবর্তন বা খণ্ডনের এক সম্ভাবনা। বিজ্ঞানের সত্য সংশয়মুক্ত, স্বতঃসিদ্ধ, স্বপ্রতিষ্ঠ, অখণ্ডনীয়, অনপেক্ষ।

যুক্তিবুদ্ধির প্রথম করণ হল অবেক্ষা — সাধারণ, বিশ্লেষণমূলক ও সংশ্লেষণমূলক; এ নিজেকে সাহায্য করে সাদৃশ্য-তুলনা, পার্থক্য-তুলনা ও উপমানের দ্বারা — অভিজ্ঞতা থেকে পরোক্ষজ্ঞানে অগ্রসর হয় অবরোহ অনুমান ও আরোহ অনুমানের তর্কসম্মত প্রণালীতে ও সকল প্রকার অনুমানের সাহায্যে — নির্ভর করে স্মৃতির উপর, নিজেকে ছাড়িয়ে যায় কল্পনার দ্বারা ও দৃঢ় করে সিদ্ধান্তের দ্বারা; সবই হল অন্ধকারে অন্বেষণের এক ধারা। বিজ্ঞান অন্বেষণ করে না, সত্য তার অধিকারভুক্ত। অথবা যদি এ আলোকিত করে, এমনকি তখনো এ অন্বেষণ করে না; এ প্রকাশ করে, দীপ্ত করে। বুদ্ধি

থেকে বিজ্ঞানে রূপান্তরিত চেতনায় কল্পনার স্থলে আসবে সত্য-অন্তঃপ্রেরণা, মানসিক সিদ্ধান্তের স্থলে আসবে স্ব-প্রকাশক নির্ণয়। যুক্তি থেকে সিদ্ধান্তে যাবার মন্থর ও স্খলনশীল তর্ক পদ্ধতিকে বাইরে নিক্ষেপ করে তার স্থলে আসবে দ্রুত বোধিসম্পন্ন ক্রিয়া; সিদ্ধান্ত বা তথ্য অবিলম্বেই জানা যাবে তার নিজেরই অধিকারে তার নিজেরই স্বয়ং-পূর্ণ সাক্ষীর দ্বারা আর যেসব সাক্ষ্যর দ্বারা আমরা তাতে উপনীত হই সেসব সাক্ষ্যও দেখা যাবে অবিলম্বে, তথ্যের সঙ্গেই, একই ব্যাপক চিত্রে, তার সাক্ষ্য হিসেবে নয় বরং তার অন্তরঙ্গ বিভিন্ন অবস্থা, সংযোগ ও সম্পর্ক হিসেবে, তার গঠনের অংশ অথবা পরিস্থিতির পার্শ্ব হিসেবে। মানসিক ও ইন্দ্রিয়গত অবেক্ষা পরিবর্তিত হবে এক আন্তর দর্শনে যাতে করণগুলি ব্যবহৃত হবে প্রণালী হিসেবে, তবে মন যেমন স্থূল ইন্দ্রিয়ের অভাবে অন্ধ ও বধির, এই আন্তরদর্শন তাদের উপর তেমন নির্ভর করে না; আর এই দর্শন শুধু যে বিষয়টিকে দেখবে তা নয়, এ আরো দেখবে তার সকল সত্য, তার বিভিন্নশক্তি, সামর্থ্য, তার অন্তর্গত নিত্য তত্ত্বসমূহ। আমাদের অনিশ্চিত স্মৃতি নষ্ট হবে, আর এর স্থলে আসবে জ্ঞানের জ্যোতির্ময় অধিকার, এক দিব্য স্মৃতি যা অর্জিত জ্ঞানের ভাণ্ডার নয়, বরং চেতনায় সর্বদা অবস্থিত সকল বিষয়ের আধার, একই সঙ্গে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের স্মৃতি।

কারণ যুক্তিবুদ্ধি অগ্রসর হয় কালের এক ক্ষণ থেকে অন্যক্ষণে আর হারায় ও অর্জন করে, আবার হারায় ও আবার অর্জন করে; কিন্তু বিজ্ঞান কালকে আয়ত্ত করে এক দৃষ্টিতে ও চিরন্তন সামর্থ্যে এবং অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে যুক্ত করে তাদের বিভিন্ন অবিভাজ্য সংযোগসূত্রে, জ্ঞানের একটিমাত্র অবিচ্ছিন্ন চিত্রে, তাদের পাশাপাশি রেখে। বিজ্ঞান শুরু করে সমগ্রতা থেকে যা বিজ্ঞানের অধিকারে থাকে অব্যবহিতভাবে; এটি বিভিন্ন অংশ, বর্গ ও খুঁটিনাটিকে দেখে শুধু সমগ্রতার সম্পর্কে এবং এর সঙ্গে এক দর্শনে: মানসিক যুক্তিবুদ্ধি বস্তুতঃ সমগ্রতাকে আদৌ দেখতে পায় না এবং কোন সমগ্রকেই সম্পূর্ণভাবে জানে না, সমগ্রকে এ যা জানে তা শুধু এর বিভিন্ন অংশ, স্তূপ ও খুঁটিনাটির বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ থেকে আরম্ভ ক'রে; অন্যথায়, এর সমগ্র-দর্শন সর্বদাই অস্পষ্ট লক্ষণসমূহের এক অনিশ্চিত প্রাথমিক বোধ অথবা এক অপূর্ণ অবধারণ বা বিভ্রান্তিপূর্ণ সংক্ষেপ। যুক্তিবুদ্ধির কাজ হল বিভিন্ন উপাদান, প্রক্রিয়া ও গুণ নিয়ে; এই সবের দ্বারা বিষয়ের স্বরূপ, এর বাস্তবতা, এর সার সম্বন্ধে কোন ভাবনা গঠন করার জন্য তার চেষ্টা নিরর্থক। কিন্তু বিজ্ঞান বিষয়কে প্রথম দেখে তার স্বরূপে, তার আদি ও শাশ্বত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করে এবং এর সঙ্গে তার বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও গুণ যুক্ত করে শুধু তার প্রকৃতির আত্মপ্রকাশ হিসেবে। যুক্তিবুদ্ধি বাস করে বৈচিত্র্যের মধ্যে, এ হল তার বন্দী; যেমন এ কালের বিভিন্ন খণ্ডের সঙ্গে ও দেশের বিভিন্ন বিভাজনের সঙ্গে ব্যবহার করে, তেমন এ বিষয়গুলিকে ব্যবহার করে পৃথক পৃথক ভাবে এবং প্রতি বিষয়কে ব্যবহার করে পৃথক অস্তিত্ব হিসেবে; এ ঐক্য দেখে শুধু যোগফলের মধ্যে অথবা বৈচিত্র্য বাদ দিয়ে অথবা সামান্য ভাবনা ও শূন্য মূর্তি হিসেবে। কিন্তু বিজ্ঞান ঐক্যের

মধ্যে আবিষ্ট থাকে, এবং এর দ্বারাই বৈচিত্র্যসমূহের সকল প্রকৃতি জানে; এ আরম্ভ করে ঐক্য থেকে এবং বৈচিত্র্যগুলিকে দেখে শুধু ঐক্যের অন্তর্গত হিসেবে, বৈচিত্র্য মিলে যে ঐক্য গঠিত হয়েছে তা নয়, ঐক্যই নিজের বহুত্ব গঠন করেছে। বিজ্ঞানময় জ্ঞান, বিজ্ঞানময় অনুভব কোন প্রকৃত বিভাজন স্বীকার করে না; বিষয়গুলি যেন তাদের প্রকৃত ও আদি একত্বের অনধীন এইভাবে এ তাদের পৃথকভাবে ব্যবহার করে না। যুক্তিবুদ্ধির কাজ সান্তের সঙ্গে, এ অনন্তের কাছে অসহায়: অনন্ত সম্বন্ধে এর যে ভাবনা সম্ভব তা হল এই যে এ হল এক অনির্দিষ্ট বিস্তার যার মধ্যে সান্ত কাজ করে কিন্তু অনন্ত স্বরূপে যা সে সম্বন্ধে এর ভাবনা করা দুরূহ, তাকে সে আদৌ আয়ত্ত করতে ও তার মধ্যে আদৌ প্রবেশ করতে অক্ষম। কিন্তু বিজ্ঞান অনন্তের মধ্যেই বর্তমান, দেখে ও বাস করে: এ সর্বদাই শুরু করে অনন্ত থেকে এবং সান্ত বিষয়সমূহকে জানে শুধু অনন্তের সঙ্গে তাদের সম্পর্কে ও অনন্তের অর্থে।

আমাদের নিজেদের যুক্তিবুদ্ধির সঙ্গে বিপরীতভাবে তুলনায় আমরা বিজ্ঞানকে যা জানি তেমনভাবে তার এইরকম অপূর্ণ বর্ণনা না করে যদি আমরা বিজ্ঞানকে বর্ণনা করতে চাই এ নিজেকে যেভাবে জানে সেইভাবে তাহলে সঙ্কেত ও প্রতীক ছাড়া অন্যভাবে এর সম্বন্ধে কিছু বলা একরকম অসম্ভব। আর প্রথমে আমাদের স্মরণ রাখা চাই যে বিজ্ঞানময় স্তর, মহৎ, বিজ্ঞান আমাদের চেতনার পরমলোক নয়, এ হল একটি মধ্যবর্তী বা সংযোজক লোক। একদিকে কেবল পরম চিৎপুরুষের ত্রয়াত্মক মহিমা, সনাতনের অনন্ত সৎ, চিৎ ও আনন্দ ও অন্যদিকে আমাদের অবর ত্রিবিধ সত্তা ও প্রকৃতি — এই দুয়ের মধ্যে অবস্থিত হয়ে এ যেন দণ্ডায়মান রয়েছে সনাতনের মধ্যস্বরূপী, ব্যাকৃত, সংগঠনকারী ও সৃজনশীল প্রজ্ঞা, সামর্থ্য ও হর্ষরূপে। সচ্চিদানন্দ তাঁর অগ্রাহ্য সত্তার আলোক বিজ্ঞানের মধ্যে একত্র ক'রে তা বাইরে অন্তঃপুরুষের উপর বর্ষণ করেন সত্তার দিব্য জ্ঞান, দিব্য সঙ্কল্প ও দিব্য আনন্দের আকারে ও সামর্থ্যে। এ যেন অনন্ত আলো যা সূর্যের সংহত মণ্ডলের মধ্যে একত্র করার পর তাকে চিরস্থায়ী রশ্মিধারায় বর্ষণ করা হয় সূর্যের উপর নির্ভরশীল সকল কিছুর উপর। কিন্তু বিজ্ঞান শুধু আলোক নয়, এ আবার শক্তি; এ হল সৃজনশীল জ্ঞান, এ হল দিব্য প্রধান ভাবনার আত্ম-কার্যসাধক সত্য। এই ভাবনা সৃজনশীল কল্পনা নয়, এ এমন কিছু নয় যা শূন্যে নির্মাণ করে, এ হল শাশ্বত ধাতুর আলোক ও সামর্থ্য, সত্য-শক্তিতে পূর্ণ সত্য-আলোক; আর সত্তায় যা সুপ্ত থাকে তা-ই এ বাইরে প্রকাশ করে, সত্তায় কখনও ছিল না এমন কিছু অবাস্তব এ সৃষ্টি করে না। বিজ্ঞানের ভাবময় জ্ঞান হল সনাতন সন্মাত্রের চেতনার বিকিরণশীল আলোক-সত্ব; প্রতি রশ্মিই এক সত্য। বিজ্ঞানের অন্তঃস্থ সঙ্কল্প শাশ্বত জ্ঞানের এক চিন্ময় শক্তি; এ সত্তার চেতনা ও ধাতুকে প্রক্ষেপ করে সত্য-সামর্থ্যের বিভিন্ন অভ্রান্ত রূপে, — এমন সব রূপ যেগুলি ভাবনাকে মূর্ত করে এবং একে নিখুঁতভাবে কার্যকরী করে এবং প্রতি সত্য-সামর্থ্যকে ও প্রতি সত্য-রূপকে এ ফুটিয়ে তোলে তার প্রকৃতি অনুসারে স্বতঃস্ফূর্ত ও সঠিকভাবে। বিজ্ঞানের মধ্যে দিব্য ভাবনার এই সৃজনশীল শক্তি থাকে ব'লে বেদে

সূর্যকে অর্থাৎ বিজ্ঞানের প্রভু ও প্রতীককে বর্ণনা করা হয়েছে যে এ সকল বিষয়ের জনক আলোক, "সূর্য সবিতৃ" জ্যোতির্ময়-প্রজ্ঞা যা অভিব্যক্ত অস্তিত্বের মধ্যে বহিঃপ্রকাশক। দিব্য আনন্দের, শাশ্বত আনন্দের অন্তঃপ্রেরণাবলেই এই সৃষ্টি; এ হল নিজেরই সত্য ও সামর্থ্যের আনন্দে পরিপূর্ণ, এ সৃষ্টি করে আনন্দের ভিতর, সৃষ্টি করে আনন্দের মধ্য থেকে এবং যা সৃষ্টি করে তা-ও আনন্দময়। সুতরাং বিজ্ঞানের জগৎ, অতিমানসিক জগৎ হল সত্যময় ও সুখময় সৃজন, "ঋতম্, ভদ্রম্" কারণ এর মধ্যকার সকল কিছুই এর নির্মাতা যে পূর্ণ আনন্দ তার অংশভাক্। অব্যভিচারী জ্ঞানের এক দিব্য দ্যুতি, অবিচলিত সঙ্কল্পের এক দিব্য সামর্থ্য এবং স্খলনহীন আনন্দের এক দিব্য আরাম — এই সব হল অতিমানসের মধ্যস্থ, বিজ্ঞানের মধ্যস্থ পুরুষের প্রকৃতি। এখানে যা সব অপূর্ণ ও সাপেক্ষ সে সবের পূর্ণ অনপেক্ষতত্ত্ব নিয়েই বিজ্ঞানময় বা অতিমানসিক লোক গঠিত, এবং এখানে যা সব বিপরীত তাদের সমন্বিত পরস্পর-সংযোজন ও সুখময় সম্মিশনই তার গতিবৃত্তি। কারণ এই সব বিপরীতের বাহ্য রূপের পশ্চাতে তাদের বিভিন্ন সত্য অবস্থিত আর সনাতনের এই সব সত্যের মধ্যে পরস্পরের কোন বিরোধ নেই; আমাদের মনের ও প্রাণের বিপরীত বিষয়গুলি অতিমানসের মধ্যে তাদের নিজেদের প্রকৃত মর্মে রূপান্তরিত হলে তারা সংযুক্ত হয়, আর তাদের দেখা যায় যেন তারা সনাতন সদ্‌বস্তুর ও চিরস্থায়ী আনন্দের বিভিন্ন সুর ও রঙের খেলা। অতিমানস বা বিজ্ঞান হল পরম সত্য, পরম দিব্যমনন, পরমা বাক্, পরম আলোক, পরম সঙ্কল্প-ভাবনা; এ হল দেশাতীত অনন্তের আন্তর ও বাহ্য বিস্তার, কালাতীত সনাতনের শৃঙ্খলমুক্ত কাল, পরমার্থসৎ-এর সকল অনপেক্ষতত্ত্বের দিব্য সামঞ্জস্য।

দ্রষ্টা মনের কাছে, বিজ্ঞানের তিনটি সামর্থ্য বর্তমান। এর পরম সামর্থ্য ঈশ্বরের অনন্ত সত্তা, চেতনা ও আনন্দ সম্বন্ধে অবগত এবং সে সবকে এ নিজের মধ্যে গ্রহণ করে ঊর্ধ্ব থেকে; এর সর্বোচ্চ শিখরে এ হল সনাতন সচ্চিদানন্দের অনপেক্ষ জ্ঞান ও শক্তি। এর দ্বিতীয় সামর্থ্য অনন্তকে একাগ্র করে এক ঘন জ্যোতির্ময় চেতনায়, এ হল "চৈতন্যঘন" বা "চিদ্‌ঘন", দিব্য চেতনার বীজাবস্থা যার মধ্যে দিব্য সত্তার সকল অপরিবর্তনীয় তত্ত্ব এবং দিব্য চিন্ময়-ভাবনা ও প্রকৃতির সকল অলঙ্ঘনীয় সত্য জীবন্ত ও মূর্ত রূপে নিহিত। এর তৃতীয় সামর্থ্য এই সব বিষয়কে বাইরে প্রকাশ করে বা বিকিরণ করে দিব্যজ্ঞানের কার্যক্ষম ভাবনা, দর্শন, যথার্থ তাদাত্ম্যের দ্বারা, দিব্য সঙ্কল্প-শক্তির সঞ্চালনের দ্বারা, দিব্য আনন্দ-তীব্রতার স্পন্দনের দ্বারা আর তাতে গড়ে ওঠে তাদের বিভিন্ন সামর্থ্য, রূপ ও জীবন্ত পরিণামের এক বিশ্ব সামঞ্জস্য, এক অসীম বৈচিত্র্য, এক বহুবিধ ছন্দ। যখন মনোময় পুরুষ উন্নত হয়ে বিজ্ঞানময় পুরুষ হয় তখন তাকে এই তিন সামর্থ্যের মধ্যে আরোহণ করতে হয়। তার কর্তব্য হল রূপান্তরের দ্বারা নিজের সব গতিবৃত্তিকে পরিণত করা বিজ্ঞানের বিভিন্ন গতিবৃত্তিতে, নিজের মানসিক অনুভব, ভাবময় জ্ঞান সুখকে পরিণত করা দিব্যজ্ঞানের দ্যুতিতে, দিব্য সঙ্কল্প-শক্তির স্পন্দনে, দিব্য আনন্দ-সাগরের তরঙ্গে ও বন্যায়। তার নিজের মানসিক প্রকৃতির চেতন-সত্ত্বকে

রূপান্তরিত করা চাই "চিদ্‌ঘন" অর্থাৎ ঘন স্বয়ং-প্রকাশক চেতনায়। আরো দরকার নিজের চিন্ময় ধাতুকে রূপান্তরিত করা অনন্ত সচ্চিদানন্দের বিজ্ঞানময় আত্মায় বা সত্য-আত্মায়। এই তিন ক্রিয়াকে ঈশোপনিষদে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে — প্রথমটিকে বলা হয়েছে "ব্যূহ" অর্থাৎ বিজ্ঞান-সূর্যের রশ্মিরাজিকে সত্যচেতনার ক্রমে বিন্যাস করা; দ্বিতীয়টিকে বলা হয়েছে "সমূহ" অর্থাৎ রশ্মিগুলিকে বিজ্ঞানসূর্যের শরীরে একত্রিত করা; তৃতীয়টি হল সূর্যের সেই কল্যাণতম রূপদর্শন যার মধ্যে অন্তঃপুরুষ অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভাবে অধিগত করে অনন্ত পুরুষের[১] সঙ্গে নিজের একত্ব। ঊর্ধ্বে, তার মধ্যে, চারিদিকে, সর্বত্র পরতম আর অন্তঃপুরুষ পরতমে আবিষ্ট ও তাঁর সঙ্গে এক, — নিজেরই ঘনীভূত জ্যোতির্ময় পুরুষ প্রকৃতিতে একাগ্র ভগবানের অনন্ত সামর্থ্য ও সত্য, — দিব্য জ্ঞান, সঙ্কল্প ও আনন্দের এমন ভাস্বর কর্মধারা যা প্রকৃতির স্বাভাবিক ক্রিয়ার মধ্যে সম্পূর্ণ সুষ্ঠু — এই হল সেই মনোময় পুরুষের মৌলিক অনুভূতি যা বিজ্ঞানের সিদ্ধিতে রূপান্তরিত ও চরিতার্থ ও ঊর্ধ্বায়িত হয়েছে।

[১] "সূর্য, ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ, তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি, যোঽসাবসৌপুরুষঃ সোঽহমস্মি;" বেদে বিজ্ঞান-লোককে বলা হয় "ঋতম্, সত্যম্, বৃহৎ" — এরা একই ত্রিবিধ ভাবনা তবে বিভিন্নভাবে বর্ণিত। ঋতম্ হল সত্যের ধারা অনুযায়ী দিব্যজ্ঞান, সঙ্কল্প ও আনন্দের ক্রিয়া অর্থাৎ সত্য-চেতনার লীলা। সত্যম্ হল যে সত্তা ঐভাবে কাজ করে তার সত্য, সত্য-চেতনার স্ফুরন্ত স্বরূপ। বৃহৎ হল সচ্চিদানন্দের আনন্ত্য যা থেকে অন্য দুটির উৎপত্তি এবং যার মধ্যে এরা প্রতিষ্ঠিত।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

বিজ্ঞানপ্রাপ্তির বিভিন্ন সর্ত

বিজ্ঞানের প্রথম তত্ত্ব হল জ্ঞান, কিন্তু জ্ঞান এর একমাত্র সামর্থ্য নয়। অপর সকল লোকেরই মতো সত্যচেতনা নিজেকে সেই বিশেষ তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত করে যা স্বভাবতঃই এর সকল গতির চাবিকাঠি; কিন্তু এ তার দ্বারা সীমিত নয়, অস্তিত্বের অপর সকল সামর্থ্যই এ ধারণ করে। পার্থক্য এই যে এই সব অন্য সামর্থ্যের স্বভাব ও কর্মধারা পরিবর্তিত হয়ে নিজেরই মূল ও প্রধান বিধান অনুযায়ী আকার ধারণ করে; বুদ্ধি, প্রাণ, দেহ, সঙ্কল্প, চেতনা, আনন্দ — এই সকলই দিব্য জ্ঞানে জ্যোর্তিময়, প্রবুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত। বস্তুতঃ এই হল সর্বত্র পুরুষ-প্রকৃতির ধারা; অভিব্যক্ত অস্তিত্বের সকল স্তর-পরম্পরা এবং ক্রমবিন্যস্ত সামঞ্জস্যসমূহের এই হল প্রধান গতিবৃত্তি।

মনোময় পুরুষে মানস-বোধ বা বুদ্ধিই মূল ও প্রধান তত্ত্ব। মনোজগতের অধিবাসী মনোময় পুরুষ তার কেন্দ্রীয় ও নির্ধারক স্বভাবে বুদ্ধিস্বরূপ; সে বুদ্ধির এক কেন্দ্র, বুদ্ধির এক পুঞ্জীভূত গতিবৃত্তি, বুদ্ধির এক গ্রহিষ্ণু ও বিকিরণশীল ক্রিয়া। তার নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তার বুদ্ধিগত বোধ আছে, নিজের অস্তিত্ব ছাড়া অপর অস্তিত্ব সম্বন্ধেও তার বুদ্ধিগত বোধ আছে, নিজের স্বভাব ও কর্মধারা ও অপর সকলের কর্মধারা সম্বন্ধেও তার বুদ্ধিগত বোধ আছে, বিষয় ও ব্যক্তিসমূহের স্বভাব এবং নিজের সঙ্গে তাদের বিভিন্ন সম্পর্ক ও পরস্পরের সঙ্গে তাদের বিভিন্ন সম্পর্ক সম্বন্ধেও তার বুদ্ধিগত বোধ আছে। এই সব নিয়েই অস্তিত্ব সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা গঠিত। অস্তিত্ব সম্বন্ধে তার অন্য কোন জ্ঞান নেই, প্রাণ ও জড় যেভাবে তার কাছে ইন্দ্রিয়গোচর হয় এবং যেভাবে তারা তার মানসিক বুদ্ধির দ্বারা গ্রাহ্য হতে সমর্থ — সে ছাড়া অন্যভাবে এদের সম্বন্ধে তার কোন জ্ঞান নেই; যেসব সম্বন্ধে তার ইন্দ্রিয়বোধ ও মানসিক প্রতীতি নেই, সেসব তার কাছে কার্যতঃ অস্তিত্ব-শূন্য, অথবা অন্ততঃ তার জগৎ ও প্রকৃতির অজানা ভিন্ন প্রকারের।

মানব তার মূল তত্ত্বে মনোময় পুরুষ কিন্তু সে মনোময় জগতে বাস করে না, সে যে অস্তিত্বে বাস করে তা প্রধানতঃ ভৌতিক; তার মন জড়-আধারে আবদ্ধ ও জড়ের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং তাকে শুরু করতে হয় বিভিন্ন স্থূল ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নিয়ে; জড়গত সংস্পর্শের সকল প্রণালীই এই সব স্থূল ইন্দ্রিয়; মানস-বোধ নিয়ে সে শুরু করে না। কিন্তু তবু, এই সব স্থূল ইন্দ্রিয় যা সব নিয়ে আসে সে সব মানস-বোধের দ্বারা আয়ত্ত ও বুদ্ধিগত সত্তার সত্ত্বে ও মূল্যে রূপান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত ও তা না হলে সে এদের স্বাধীনভাবে ব্যবহার করে না, আর করতে পারেও না। অবর অবমানুষী অব-মানসিক জগতে যা প্রাণিক, স্নায়ুগত, স্ফুরন্ত, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া তা মানস-সংজ্ঞায় পরিবর্তিত বা মানস-শাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়েও বেশ ভালভাবেই কার্যকারী থাকে, কিন্তু সে সবকে

তার মধ্যে উন্নত ক'রে দেওয়া চাই কোনপ্রকার বুদ্ধির কাছে। মানবীয় বৈশিষ্ট্য পেয়ে মানবীয় হতে হলে একে প্রথম হতে হবে শক্তির বোধ, কামনার বোধ, সঙ্কল্পের বোধ, বুদ্ধিগত সঙ্কল্প-ক্রিয়ার বোধ অথবা শক্তি-ক্রিয়ার মানসিকভাবে সচেতন বোধ। তার সত্তার যে অবর আনন্দ তা পরিণত হয় মানসিক অথবা মানসিকভাবাপন্ন প্রাণিক বা ভৌতিক সুখের এবং এর বিকৃতি দুঃখের বোধে, অথবা পছন্দ ও অপছন্দর মানসিক ও মানসিকভাবাপন্ন বেদনাত্মক ইন্দ্রিয়সংবিতে অথবা আনন্দ ও নিরানন্দের বুদ্ধিতে — এই সবই হল বুদ্ধিগত মানসবোধের ব্যাপার। সেইরকম আবার, যা তার উর্ধ্বে, যা তার চারিদিকে এবং যার মধ্যে সে বাস করে সেইসব — ভগবান, বিরাট পুরুষ, বিভিন্ন বিশ্বশক্তি — তার কাছে অস্তিত্ব-শূন্য ও অসৎ, যতক্ষণ না তার মন তাদের সম্বন্ধে সজাগ হয়ে ওঠে এবং পায়, — যদিও তখনো তাদের আসল সত্যে নয় — অতীন্দ্রিয় বিষয়সমূহের কিছু ভাবনা, নিরীক্ষণ, অনুমান, কল্পনা, অনন্তের কিছু মানসিক বোধ আর তার নিজের উর্ধ্বে ও চারিদিকে অতি-আত্মার বিভিন্ন শক্তির সম্বন্ধে কিছু বুদ্ধিগত ব্যাখ্যাকারী চেতনা।

যখন আমরা মন থেকে বিজ্ঞানে যাই, তখন সকল কিছুই পরিবর্তিত হয়; কারণ সেখানে প্রত্যক্ষ সহজাত জ্ঞানই কেন্দ্রীয় তত্ত্ব। বিজ্ঞানময় সত্তার যা স্বভাব তাতে এ হল এক সত্য-চেতনা, বিষয়সমূহের সত্যদর্শনের এক কেন্দ্র ও পরিধি, বিজ্ঞানের এক পুঞ্জীভূত গতিবৃত্তি অথবা সূক্ষ্মদেহ। এর ক্রিয়া হল বিষয়সমূহের গভীরতম সত্যতম আত্মা ও প্রকৃতির আন্তর বিধান অনুযায়ী সেসবের সত্য-সামর্থ্যের আত্ম-চরিতার্থতাকারী ও বিকিরণশীল কর্ম। বিজ্ঞানে প্রবেশ করার পূর্বে বিষয়সমূহের এই সত্য আমাদের লাভ করা অবশ্য প্রয়োজনীয় — কারণ বিজ্ঞানময় লোকে এরই মধ্যে সকল কিছু অবস্থিত এবং এর থেকেই সকল কিছুর উৎপত্তি — তা সর্বপ্রথম হল ঐক্যের, একত্বের এক সত্য, তবে বৈচিত্র্য উৎপাদন করে এমন ঐক্য, বহুত্বের মধ্যে ঐক্য আর তথাপি সর্বদাই ঐক্য, এক অপরাজেয় একত্ব। সর্বঅস্তিত্ব ও সর্বভূতের সঙ্গে আমাদের নিজেদের বিপুল ও নিবিড় আত্ম-অভিন্নতা, বিশ্বব্যাপিতা, বিশ্ব অবধারণ বা ধারণ, এক প্রকার সর্বময়ত্ব — এই সব ব্যতীত বিজ্ঞানের অবস্থা, বিজ্ঞানময় পুরুষের অবস্থা লাভ করা অসম্ভব। বিজ্ঞানময় পুরুষের নিজের সম্বন্ধে সাধারণতঃ এই চেতনা থাকে যে সে অনন্ত, সাধারণতঃ এই চেতনাও থাকে যে সে নিজের মধ্যে জগৎ ধারণ করে আছে এবং এর অতিরিক্ত সে; এ সেই বিভক্ত মনোময় পুরুষের মতো নয় যে সাধারণতঃ এমন এক চেতনায় বদ্ধ থাকে যে নিজেকে অনুভব করে যে সে জগতের মধ্যে ধরা রয়েছে ও এর এক অংশ। সুতরাং সীমাজনক ও আবদ্ধকারী অহং থেকে উদ্ধার পাওয়াই বিজ্ঞানময় সত্তা লাভের দিকে প্রথম প্রাথমিক পদক্ষেপ; কারণ যতদিন আমরা এই অহং-এর মধ্যে বাস করি ততদিন এই পরতর সদ্‌বস্তু, এই বৃহৎ আত্মসচেতনতা, এই প্রকৃত আত্মজ্ঞান আশা করা বৃথা। অহং-মনন, অহং-ক্রিয়া, অহং-সঙ্কল্পের দিকে অতি সামান্য প্রত্যাবর্তনেরও ফল হল, চেতনা যে বিজ্ঞানময় সত্য লাভ করেছে তা থেকে বিভক্ত

মানসপ্রকৃতির বিভিন্ন অনৃতের মধ্যে এর স্খলন। এই জ্যোর্তিময় পরতর চেতনার মূল ভিত্তিই হল সত্তার দৃঢ় বিশ্বজনীনতা। সকল কঠোর পৃথক্‌ভাব পরিহার ক'রে (তবে তার পরিবর্তে এক প্রকার অতিস্থিত উর্ধ্বদৃষ্টি বা অনধীনতা লাভ ক'রে) আমাদের পক্ষে প্রয়োজন হল, — আমরা সকল বিষয় ও সত্তার সঙ্গে যে এক তা অনুভব করা, তাদের সঙ্গে নিজেদের অভিন্ন করা, তারা যে আমরা নিজেরাই এইভাবে তাদের জানা, তাদের সত্তাকে আমাদের আপন সত্তা ব'লে অনুভব করা, তাদের চেতনাকে আমাদের চেতনার অংশ ব'লে স্বীকার করা, আমাদেরই ক্রিয়াশক্তির মতো অন্তরঙ্গভাবে তাদের ক্রিয়াশক্তির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা, সকলের সঙ্গে এক আত্মা হতে শেখা। অবশ্য ঐ একত্ব যে প্রয়োজনীয় সবকিছু তা নয়, তবে এ হল এক প্রথম সর্ত এবং এ ব্যতীত বিজ্ঞানপ্রাপ্তি হয় না।

যতদিন বর্তমানের মতো আমাদের এই অনুভব থাকবে যে আমরা এক ব্যষ্টিগত মন, প্রাণ ও দেহের মধ্যে অধিষ্ঠিত এক চেতনা, ততদিন এই বিশ্বজনীনতা পুরোপুরি অর্জন করা অসম্ভব। অন্নময় শরীর থেকে, এমনকি মনোময় শরীর থেকে বিজ্ঞানময় শরীরে পুরুষের একপ্রকার উত্তরণ প্রয়োজন। মস্তিষ্ক বা এর প্রতিরূপ মানসিক "পদ্ম" আর আমাদের চিন্তার কেন্দ্র থাকতে পারে না, হৃদয় বা এর প্রতিরূপ "পদ্ম"ও আর আমাদের ভাবগত ও ইন্দ্রিয়সংবেদনগত সত্তার উৎসকেন্দ্র থাকতে পারে না। আমাদের সত্তার, আমাদের মননের, আমাদের সঙ্কল্প ও ক্রিয়ার চিন্ময় কেন্দ্র, এমনকি আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়সংবিৎ ও ভাবাবেগের আদি শক্তিও দেহ ও মনের বাইরে উঠে তাদের উর্ধ্বে এক স্বতন্ত্র স্থান গ্রহণ করে। আর আমাদের এ ইন্দ্রিয়বোধ হয় না যে আমরা দেহের মধ্যে বাস করছি, আমাদের বোধ হয় যে আমরা এর উর্ধ্বে অবস্থিত যেন এর প্রভু, অধিকারী বা ঈশ্বর এবং সেই সাথে একে ঘিরে রাখি আবদ্ধ স্থূল ইন্দ্রিয়ের চেতনা অপেক্ষা এক আরো ব্যাপ্ত চেতনার দ্বারা। এখন আমরা বাস্তবতার সজীব শক্তিতে সাধারণ ও অবিরতভাবে উপলব্ধি করি জ্ঞানীদের সেই কথার তাৎপর্য যে পুরুষ দেহকে বহন করে অথবা পুরুষ দেহের মধ্যে থাকে না, বরং দেহই পুরুষের মধ্যে থাকে। মস্তিষ্ক থেকে নয়, দেহের উর্ধ্ব থেকেই আমরা ভাবনা ও সঙ্কল্প করব; মস্তিষ্কের ক্রিয়া হবে উপর থেকে মননশক্তি ও সঙ্কল্পশক্তির আঘাতে দেহযন্ত্রের প্রত্যুত্তর ও সঞ্চালন মাত্র। সকল কিছুই উৎপন্ন হবে উপর থেকে; আমাদের বর্তমান মানসিক ক্রিয়ার প্রতিরূপ যা কিছু বিজ্ঞানে আছে সে সবই ঘটে উপর থেকে। বিজ্ঞানময় রূপান্তরের এই যে বিভিন্ন অবস্থা তার সকলগুলি না হলেও অনেকগুলিই লাভ করা যায় এবং বস্তুতঃ লাভ করা প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানপ্রাপ্তির বহুপূর্বেই — তবে প্রথমে অপূর্ণভাবে, যেন প্রতিফলনের দ্বারা — স্বয়ং উত্তরমানসে এবং আরো সম্পূর্ণভাবে সেই চেতনায় যাকে আমরা বলতে পারি মানসিকতা ও বিজ্ঞানের মধ্যে অবস্থিত অধিমানস চেতনা।

কিন্তু এই (বিজ্ঞান) কেন্দ্র এবং এই (বিজ্ঞানময়) ক্রিয়া স্বাধীন, বদ্ধ নয়, দেহযন্ত্রের উপর নির্ভরশীল নয়, সঙ্কীর্ণ অহং-বোধে আবদ্ধ নয়। এ দেহে জড়িত নয়; এ যে কোন

বিভক্ত ব্যষ্টিত্বের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আনাড়ির মতো চেষ্টা করছে অথবা নিজেরই গভীরতর চিৎপুরুষের জন্য অন্তর্মুখী হয়ে অন্ধের মতো খুঁজছে তা-ও নয়। কারণ এই মহান্ রূপান্তরে আমরা এমন এক চেতনা পেতে শুরু করি যা কোন উৎপাদক আধারের (generating box) মধ্যে আবদ্ধ নয়, বরং যা সর্বত্র স্বচ্ছন্দভাবে ব্যাপ্ত এবং স্বপ্রতিষ্ঠভাবে প্রসারশীল; এক কেন্দ্র আছে বা থাকতে পারে, কিন্তু তা ব্যষ্টিক্রিয়ার সুবিধার জন্য, এটি কোন অনমনীয় বা সংগঠনসূচক বা পার্থক্যসূচক কেন্দ্র নয়। এর পর থেকে আমাদের সচেতন ক্রিয়াবলীর স্বভাবই হয় বিশ্বজনীন; এ হল বিশ্বসত্তার সঙ্গে এক এবং বিশ্বভাব থেকে উৎপন্ন হয়ে অগ্রসর হয় নমনীয় ও পরিবর্তনীয় ব্যষ্টিভাবাপন্নতার দিকে। এ এমন এক অনন্ত পুরুষের সংবিৎ হয়ে উঠেছে যে সর্বদাই কাজ করে বিশ্বজনীনভাবে, যদিও জোর দেওয়া হয় তার বিভিন্ন শক্তির ব্যষ্টিগত রূপায়ণের উপর। কিন্তু এই জোর পার্থক্যসূচক অপেক্ষা বরং বৈশিষ্ট্যসূচক, এবং এই রূপায়ণ আর তা নয় যা আমরা ব্যষ্টিত্ব বলে বুঝি; এখন আর নিজেরই যন্ত্রক্রিয়ার সূত্রে আবদ্ধ ক্ষুদ্র সীমিত নির্মিত কোন ব্যক্তি নেই। চেতনার এই অবস্থা আমাদের সত্তার বর্তমান ধরনের পক্ষে এত অস্বাভাবিক যে একে পায়নি এমন যুক্তিবাদী ব্যক্তির কাছে মনে হবে এ হল অসম্ভব অথবা এক বিজাতীয় অবস্থা; কিন্তু অধিগত হলে এ তার মহত্তর শান্তি, স্বাধীনতা, আলোক, সামর্থ্য, সঙ্কল্পের কার্যকারিতা, ভাবনা ও বেদনার প্রামাণ্য সত্যের দ্বারা এমনকি মানসিকবুদ্ধিরও কাছে নিজের যথার্থতা প্রতিপন্ন করে। কেননা এই অবস্থা ইতিপূর্বেই শুরু হয় মুক্ত মনের উচ্চতর স্তরসমূহে এবং সেজন্য মানসবুদ্ধি একে কিছু কিছু অনুভব ও বুঝতে সক্ষম হয়, তবে এ সুষ্ঠু আত্ম-অধিকারে উন্নত হয় একমাত্র তখনই যখন সে পিছনে ফেলে আসে মানসিক স্তরসমূহ, অর্থাৎ একমাত্র অতিমানসিক বিজ্ঞানে।

চেতনার এই অবস্থায় অনন্ত আমাদের কাছে হয়ে ওঠে মূল, বাস্তব সদ্‌বস্তু, একমাত্র বিষয় যা অব্যবহিত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভাবে সত্য। অনন্ত সম্বন্ধে আমাদের মৌলিক বোধ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে সান্ত সম্বন্ধে চিন্তা করা অথবা তা উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে, কারণ একমাত্র এই অনন্তের মধ্যেই সান্ত জীবনধারণে সক্ষম, নিজেকে গঠন করতে সক্ষম, কোন বাস্তবতা বা স্থায়িত্ব পেতে সক্ষম। যতদিন এই সান্ত মন ও দেহ থাকে আমাদের চেতনার কাছে আমাদের অস্তিত্বের প্রথম তথ্য এবং আমাদের সকল চিন্তা, বেদনা ও সঙ্কল্পের ভিত্তি এবং যতদিন সান্ত বিষয়সমূহই থাকে স্বাভাবিক সদ্‌বস্তু যা থেকে আমরা মাঝে মাঝে, এমনকি প্রায়শঃই অনন্তের কোন ভাবনা ও বোধে উত্তরণ করি ততদিন আমরা বিজ্ঞান থেকে বহুদূরবর্তী। বিজ্ঞানময় লোকে অনন্তই যুগপৎ আমাদের সত্তার স্বাভাবিক চেতনা, এর প্রথম তথ্য, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ধাতু। এ হল আমাদের কাছে অতীব মূর্ত রূপে সেই ভিত্তি যা থেকে প্রতি সান্ত বিষয়ই নিজেকে গঠন করে, এবং এর সীমাহীন অপরিমেয় বিভিন্ন শক্তিই আমাদের সকল মনন, সঙ্কল্প ও আনন্দের উৎপত্তির কারণ। কিন্তু এই অনন্ত যে শুধু ব্যাপ্তির বা প্রসারতার এক

অনন্ত যার মধ্যে সকল কিছু রূপগ্রহণ করে ও ঘটে তা নয়। ঐ অপরিমেয় প্রসারতার পশ্চাতে যে এক দেশাতীত আন্তর অনন্ত আছে তা বিজ্ঞানময় চেতনা সর্বদাই জানে। এই দ্বিবিধ অনন্তের মধ্য দিয়েই আমরা পৌঁছব সচ্চিদানন্দের স্বরূপগত সত্তায়, আমাদের আপন সত্তার পরম আত্মায় এবং আমাদের বিশ্ব অস্তিত্বের সমগ্রতায়। আমাদের কাছে উন্মুক্ত হয় এমন এক অসীম অস্তিত্ব যার সম্বন্ধে আমরা অনুভব করি যে এ যেন আমাদের ঊর্ধ্বে এক আনন্ত্য যার মধ্যে উঠতে আমরা চেষ্টা করি এবং এ যেন আমাদের চারিদিকে এক আনন্ত্য যার মধ্যে আমাদের পৃথক অস্তিত্ব বিলীন করার জন্য আমরা প্রয়াস করি। পরে, এর মধ্যে আমরা প্রসারিত হই এবং এর মধ্যে উত্তরণ করি; অহং ভেঙে আমরা ব্যর হই এর বৃহত্ত্বের মধ্যে এবং তা-ই হই চিরদিনের জন্য। যদি এই মুক্তি অর্জন করা যায়, তাহলে আমাদের তেমন সঙ্কল্প থাকলে এই মুক্তির সামর্থ্য আমাদের অবর সত্তাকেও উত্তরোত্তর অধিগত করতে পারে যতদিন না, এমনকি আমাদের অবম ও বিকৃততম ক্রিয়াবলীও রূপান্তরিত হয় বিজ্ঞানের সত্যে।

অনন্ত সম্বন্ধে এই বোধ এবং অনন্তের দ্বারা এই অধিকার — এই হল ভিত্তি, এবং একমাত্র এটি অর্জন করা হলেই আমরা অগ্রসর হতে পারি অতিমানসিক ভাবনা, অনুভব, বোধ, তাদাত্ম্য ও সংবিতের কোনপ্রকার সাধারণ অবস্থার দিকে। কারণ, এমনকি অনন্তের বোধও শুধু এক প্রথম প্রতিষ্ঠা, আরো অনেক কিছু করা কর্তব্য তবে যদি পরে চেতনা স্ফুরন্তভাবে বিজ্ঞানময় হয়ে উঠতে পারে। কারণ অতিমানসিক জ্ঞান হল পরম আলোকের খেলা; এমনকি বিজ্ঞানে আরোহণ করার পূর্বেই অন্য অনেক আলোক, মানবমন ছাড়া জ্ঞানের বিভিন্ন স্তর আমাদের মধ্যে উন্মুক্ত হতে পারে এবং ঐ মহাজ্যোতির কিছু গ্রহণ বা প্রতিফলিত করতে পারে। কিন্তু একে আয়ত্ত বা সম্পূর্ণভাবে অধিগত করতে হলে আমাদের কর্তব্য হল প্রথম ঐ পরম আলোকের সত্তার মধ্যে প্রবেশ করা ও তা-ই হওয়া, আমাদের চেতনাকে রূপান্তরিত করা চাই ঐ চেতনায়, তাদাত্ম্যের দ্বারা আত্ম-সংবিতের ও সর্ব-সংবিতের এর যে তত্ত্ব ও সামর্থ্য তা-ই হওয়া চাই আমাদের অস্তিত্বের পূর্ণ সত্ত্ব। কারণ আমাদের চেতনা যে ধরনের হবে, আমাদের জ্ঞান ও ক্রিয়ার সাধন ও পথগুলিও সেরকম হতে বাধ্য, আর যদি জ্ঞানের ঐ পরতর সামর্থ্য আমাদের আয়ত্ত করতে হয়, — শুধু তা মাঝে মাঝে পাওয়া নয় — তাহলে চেতনারই আমূল রূপান্তর অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু এ কোন পরতর মননের বা একপ্রকার দিব্য যুক্তিবুদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যেখানে এখন আমাদের বর্তমান জ্ঞানের সব সাধনগুলির প্রবেশ নিষিদ্ধ, আর তারা অন্ধ ও অকার্যকরী সেখানে এটি সেসব সাধনকে অতিমাত্রায় প্রসারিত, সক্রিয় ও কার্যকরী ভাবে উত্তোলন করে এবং তাদের পরিণত করে বিজ্ঞানের উচ্চ এবং প্রখর বোধাত্মক ক্রিয়াধারায়। এইভাবে এ আমাদের ইন্দ্রিয়ক্রিয়াকে উপরে নিয়ে তাকে, এমনকি তার সাধারণ ক্ষেত্রেও ভাস্বর করে যাতে আমরা লাভ করি বিষয়সমূহের প্রকৃত অর্থ। কিন্তু আবার এ মানসবোধকেও এমন সমর্থ করে যে সে বাহ্য ঘটনার মতো আন্তর ঘটনারও প্রত্যক্ষ বোধ পায়, আর উদাহরণস্বরূপ

যে বিষয়ের উপর সে নিবদ্ধ হয় তার বিভিন্ন ভাবনা, বেদনা, ইন্দ্রিয়সংবিৎ, স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া অনুভব ও গ্রহণ বা উপলব্ধি করে।[১] এটি বিভিন্ন স্থূল ইন্দ্রিয়ের সাথে বিভিন্ন সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলিও ব্যবহার করে এবং তাদের রক্ষা করে তাদের সব প্রমাদ থেকে। এই জড়লোক, যেখানে আমাদের সাধারণ মানসিকতা অজ্ঞানতায় যুক্ত অতিরিক্ত অস্তিত্বের অন্য বিভিন্ন লোকেরও জ্ঞান, অনুভূতি এটি আমাদের দেয় এবং আমাদের জন্য জগৎ প্রসারিত করে। সেইরকম এ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়সংবিৎকে রূপান্তরিত করে এবং সেসবকে যেমন তাদের পূর্ণ ধারণশক্তি দেয় তেমন দেয় তাদের পূর্ণ প্রখরতা; কারণ আমাদের সাধারণ মানসিকতায় পূর্ণ প্রখরতা অসম্ভব, এইজন্য যে এক নির্দিষ্ট সীমার বাইরের স্পন্দনগুলি ধারণ ও সহ্য করার সামর্থ্য তার নেই, মন ও দেহ — দুইই ভেঙে যাবে আঘাতের চাপে বা সুদীর্ঘ টানে। আমাদের বিভিন্ন বেদনা ও ভাবাবেগের অন্তর্গত জ্ঞানের উপাদানকেও এ তুলে নেয় — কারণ আমাদের বিভিন্ন বেদনার মধ্যেও জ্ঞানের এমন সামর্থ্য ও কার্যসাধনের এমন স্যামর্থ্য আছে যা আমরা জানি না ও সঠিকভাবে বিকশিত করি না — এবং এ একই সময়ে তাদের মুক্ত করে তাদের বিভিন্ন সঙ্কীর্ণতা থেকে, তাদের বিভিন্ন প্রমাদ ও কলুষ থেকে। কারণ সকল বিষয়ে বিজ্ঞানই সত্য, ঋত, পরম বিধান, "দেবানাম্ অদব্ধানি ব্রতানি"।

জ্ঞান এবং শক্তি বা সঙ্কল্প — কারণ সকল চিন্ময় শক্তিই সঙ্কল্প — হল চেতনার ক্রিয়ার যুগ্ম দিক। আমাদের মানসিকতায় এরা বিভক্ত। ভাবনা প্রথম আসে, সঙ্কল্প আসে এর পর স্খলিতপদে, অথবা এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে অথবা ভাবনার অপূর্ণ যন্ত্র হিসেবে তাকে ব্যবহার করা হয় আর ফলও হয় অপূর্ণ; আর না হয় সঙ্কল্প প্রথম শুরু করে তার মধ্যে এক অন্ধ বা অর্ধদর্শী ভাবনা নিয়ে এবং বিশৃঙ্খলার মধ্যে এমন কিছু সম্পাদন করে যার সম্বন্ধে আমরা সঠিক ধারণা পাই পরে। আমাদের অন্তর্গত এই দুই সামর্থ্যের মধ্যে কোন একত্ব নেই, নেই কোন পূর্ণ সামঞ্জস্যবোধ; আর না হয় কার্যসাধনের সঙ্গে কার্যারম্ভের কোন সুষ্ঠু মিল থাকে না। তাছাড়া জীবের সঙ্কল্পও বিশ্বসঙ্কল্পের সঙ্গে সুসমঞ্জস নয়; এ তাকে ছাড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে, অথবা তার নীচে পড়ে থাকে আর না হয় তা থেকে বিচ্যুত হয়ে তার বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এ সত্যের বিভিন্ন কাল বা ঋতু জানে না, জানে না তার বিভিন্ন মাত্রা বা পরিমাণ। বিজ্ঞান সঙ্কল্পকে তুলে নিয়ে একে প্রথম অতিমানসিক জ্ঞানের সত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যে আনে এবং পরে আনে এর সঙ্গে একত্বে। এই জ্ঞানে জীবের ভাবনা বিশ্বভাবের ভাবনার সঙ্গে এক, কারণ উভয়কেই ফিরিয়ে নেওয়া হয় পরম জ্ঞানের ও বিশ্বাতীত সঙ্কল্পের সত্যে। বিজ্ঞান শুধু যে আমাদের বুদ্ধিগত সঙ্কল্প তুলে নেয় তা নয়, এ আমাদের বিভিন্ন কামনা, এমনকি যেগুলিকে আমরা হীন কামনা বলি সেগুলিও তুলে নেয়, তুলে নেয় বিভিন্ন সহজ সংস্কার, সংবেগ,

[১] পতঞ্জলি বলেন, এই সামর্থ্য আসে বিষয়ের উপর "সংযমের" দ্বারা। কিন্তু সংযমের প্রয়োজন মানসিকতার জন্য, বিজ্ঞানে "সংযমের" কোন প্রয়োজন নেই। কারণ এই প্রকারের বোধ বিজ্ঞানের স্বাভাবিক ক্রিয়া।

ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়সংবিতের বিভিন্ন বাহ্য প্রাপ্তি এবং এই সবকে এ রূপান্তরিত করে। এরা আর ইচ্ছা ও কামনা থাকে না, কারণ প্রথমে এদের যে ব্যক্তিগত ভাব তার অবসান হয় এবং পরে অবসান হয় তাদের সেই অনায়ত্তের জন্য সংগ্রামের ভাব যাকে আমরা বলি লালসা ও কামনা। এরা আর সহজ সংস্কারমূলক বা বুদ্ধিপ্রধান মানসিকতার অন্ধ বা অর্ধ-অন্ধ চেষ্টা থাকে না, এরা রূপান্তরিত হয় সত্যসঙ্কল্পের বিচিত্র ক্রিয়ায়; আর ঐ সঙ্কল্প কাজ করে এর পূর্বনির্ধারিত ক্রিয়ার সঠিক পরিমাণের স্বগত জ্ঞান নিয়ে এবং সেজন্য এর এমন এক কার্যকারিতা থাকে যা আমাদের মানসিক সঙ্কল্প-ক্রিয়ার অজ্ঞাত। সেইজন্য আবার বিজ্ঞানময় সঙ্কল্পের ক্রিয়াতে পাপের কোন স্থান নেই; কারণ সকল পাপই সঙ্কল্পের প্রমাদ, অবিদ্যার কামনা ও ক্রিয়া।

যখন কামনা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয়, তখন শোক ও সকল আন্তর কষ্টভোগেরও অবসান হয়। বিজ্ঞান শুধু যে আমাদের জ্ঞান ও সঙ্কল্পের অংশগুলি তুলে নেয় তা নয়, এ আমাদের স্নেহ ও আনন্দের অংশগুলিও তুলে নিয়ে তাদের রূপান্তরিত করে দিব্য আনন্দের ক্রিয়ায়। কারণ যদি জ্ঞান ও শক্তি চেতনার ক্রিয়ার যুগ্ম দিক বা সামর্থ্য হয়, তাহলে আনন্দ — যা আমরা যাকে সুখ বলি তার চেয়ে পরতর কিছু — চেতনার নিজস্ব সত্ত্ব এবং জ্ঞান ও সঙ্কল্পের, শক্তি ও আত্মসংবিতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক পরিণাম। সুখ ও দুঃখ, হর্ষ ও বিষাদ — উভয়ই আনন্দের বিকৃতরূপ আর এদের উৎপত্তির কারণ হল আমাদের চেতনা ও এর প্রযুক্ত শক্তির মধ্যে, আমাদের জ্ঞান ও সঙ্কল্পের মধ্যে সামঞ্জস্যের হানি, এবং এমন এক অবর লোকে অবতরণের দরুন তাদের একত্ব-ছেদ যার মধ্যে তারা সীমিত, নিজেদের মধ্যে বিভক্ত, তাদের পূর্ণ ও সঙ্গত ক্রিয়া থেকে নিবারিত, অন্য শক্তি, অন্য চেতনা, অন্য জ্ঞান, অন্য সঙ্কল্পের সঙ্গে তারা সংঘর্ষে লিপ্ত। এই বিচ্যুতিকে বিজ্ঞান সংশোধন করে তার সত্যের সামর্থ্যের দ্বারা এবং একত্ব ও সামঞ্জস্যে, ঋত ও পরম বিধানে সমগ্রভাবে পুনঃস্থাপনের দ্বারা। আমাদের সকল ভাবাবেগ তুলে নিয়ে এ সেসবকে রূপান্তরিত করে প্রেম ও আনন্দের বিবিধ রূপে, এমনকি আমাদের বিভিন্ন রকমের ঘৃণা, বিতৃষ্ণা, কষ্টভোগের কারণগুলিকেও এ এইভাবে রূপান্তরিত করে। যে অর্থ তারা হারিয়েছিল এবং এই হারানর দরুন তারা যেসব বিকৃতিতে পরিণত হয়েছে সে অর্থ এ বার করে বা প্রকট করে; এ আমাদের সমগ্র প্রকৃতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে শাশ্বত শিবে। অনুরূপভাবে এ আমাদের বিভিন্ন অনুভব ও ইন্দ্রিয়বোধের সঙ্গে ব্যবহার করে তারা যে আনন্দ খোঁজে তা সমস্তই প্রকাশ করে, তবে তা প্রকাশ করে তার সত্যে, কোন বিকৃতিতে ও অসঙ্গত অন্বেষণে ও অসঙ্গত গ্রহণে নয়; এমনকি আমাদের অবর সব সংবেগগুলিকেও এ শিক্ষা দেয় যেন তারা যেসব বাহ্য রূপের পশ্চাতে ছোটে সেসবের মধ্যে স্পর্শ করে ভগবান ও অনন্তকে। এই যে সব করা হয় তা অবর সত্তার মূল্যবোধে করা হয় না, তা করা হয় মানসিক, প্রাণিক, জড়ীয় সত্তাকে দিব্য আনন্দের অবিচ্ছেদ্য শুদ্ধতায়, স্বাভাবিক প্রখরতায়, এক অথচ বহুবিধ অবিরত উল্লাসে উত্তোলন করে।

এইভাবে বিজ্ঞানের সত্তা তার সকল ক্রিয়ার মাঝে এক পরিপূর্ণায়িত জ্ঞান-সামর্থ্য, সঙ্কল্প-সামর্থ্য ও আনন্দ-সামর্থ্যের এক লীলা যেসবকে উন্নত করা হয়েছে মানসিক, প্রাণিক ও দৈহিক স্তর অপেক্ষা উচ্চতর স্তরে। এই সত্তা সর্বব্যাপী, বিশ্বভাবাপন্ন এবং অহমাত্মক ব্যক্তিসত্ত্ব ও ব্যষ্টিত্ব থেকে মুক্ত এবং এ এক পরতর আত্মার, সত্তার এক পরতর চেতনার এবং সেহেতু এক পরতরা শক্তির ও পরতর আনন্দের লীলা। ঐসব বিজ্ঞানের মধ্যে কাজ করে মহত্তরা বা দিব্য প্রকৃতির শুদ্ধতায়, ঋতে, সত্যে। এর সামর্থ্যগুলি প্রায়ই এমন সব মনে হতে পারে যেসবকে যোগের সাধারণ ভাষায় বলা হয় সিদ্ধি, ইওরোপীয়রা বলে গুহ্যশক্তি, ভক্তেরা ও অনেক যোগীরা যাদের পরিহার ও ভয় করে এই ব'লে যে এরা ভগবানের জন্য সত্যকার অন্বেষণের পথে বিভিন্ন ফাঁদ, অন্তরায় ও বিভ্রমকারী বিষয়। কিন্তু তাদের স্বভাবই ঐরকম, তারা যে এখানে বিপজ্জনক তার কারণ তাদের অস্বাভাবিকভাবে চাওয়া হয় অহং-এর দ্বারা অবর সত্তায় অহমাত্মক তৃপ্তির জন্য। বিজ্ঞানের মধ্যে এরা গুহ্যশক্তিও নয়, সিদ্ধিও নয়, এরা বিজ্ঞানের প্রকৃতির উন্মুক্ত আয়াসহীন ও স্বাভাবিক ক্রীড়া। বিজ্ঞান হল ভাগবত সত্তার দিব্য সব তাদাত্ম্যের মধ্যে এর সত্য-সামর্থ্য ও সত্য-ক্রিয়া এবং যখন এ বিজ্ঞানলোকে উন্নীত জীবের মধ্য দিয়ে কাজ করে, এ নিজেকে চরিতার্থ করে অবিকৃতভাবে, ত্রুটিশূন্য বা অহমাত্মক প্রতিক্রিয়ারহিত হয়ে, ভগবৎ-অধিকার থেকে বিচ্যুত না হয়ে। সেখানে জীব আর তখন অহং নয়, সে পরতরা দিব্যপ্রকৃতিতে স্থায়ীভাবে অধিষ্ঠিত মুক্ত জীব, আর এই দিব্য প্রকৃতির এক অংশ সে, "পরাপ্রকৃতির্জীবভূতা"; এ হল পরম ও বিশ্বাত্মক আত্মারই প্রকৃতি। অবশ্য আত্মাকে তখন দেখা হয় বহুময় ব্যষ্টিত্বের লীলায় তবে অবিদ্যার আবরণশূন্য হয়ে, আত্মজ্ঞানের সঙ্গে, দেখা হয় এর বহুময় একত্বে, এর দিব্যশক্তির সত্যে।

বিজ্ঞানের মধ্যেই পাওয়া যায় পুরুষ ও প্রকৃতির সঠিক সম্পর্ক ও ক্রিয়া, কারণ সেখানে তারা মিলিত হয়ে এক হয়েছে, আর ভগবান তখন আর মায়াবৃত নন। সকলই তাঁর ক্রিয়া। জীব তখন আর বলে না, "আমি চিন্তা করি, আমি কাজ করি, আমি কামনা করি, আমি অনুভব করি"। ঐক্যের জন্য সাধনায় রত যে সাধক ঐক্য পাবার আগেই বলেছিল "হৃদিস্থিত তুমি যেমন আমায় নিযুক্ত করবে তেমন আমি কাজ করব", সে সেই সাধকেরও মতো তা বলে না। কারণ হৃদয়, মানসিক চেতনার কেন্দ্র আর তখন উৎপত্তির কেন্দ্র নয়, এ হল শুধু এক আনন্দময় প্রণালী। সে বরং জানে যে ভগবান ঊর্ধ্বে আসীন, সকলের প্রভু, "অধিষ্ঠিত", আবার তার অভ্যন্তরেও সক্রিয়। আর নিজে সেই পরতর সত্তায় আসীন হয়ে "পরার্ধে, পরমস্যাম্ পরাবতি", সে সত্য অর্থে নির্ভীকভাবে বলতে পারে "ভগবান নিজেই তাঁর প্রকৃতির দ্বারা আমার ব্যষ্টিত্ব ও এর বিভিন্ন রূপের মধ্য দিয়ে জানেন, কাজ করেন, ভালবাসেন, আনন্দ পান এবং সেখানে এর পরতর ও দিব্যমাত্রায় সেই বহুবিধ 'লীলা' চরিতার্থ করেন, আর অনন্ত নিজেই নিত্য যে বিশ্বজনীনতা তার মধ্যে তিনি এই লীলা করেন নিত্যকাল ধরে"।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

বিজ্ঞান ও আনন্দ

বিজ্ঞানে উত্তরণের ও বিজ্ঞানময় চেতনার কিছু পাওয়ার ফলে মানবের অন্তঃপুরুষ উন্নত এবং তার জগৎ-জীবন উর্ধ্বায়িত হয়ে এমন আলোক ও সামর্থ্য ও আনন্দ ও আনন্ত্যের গরিমা পেতে বাধ্য যা আমাদের বর্তমান মানসিক ও স্থূল অস্তিত্বের পঙ্গু ক্রিয়া ও বিভিন্ন সীমিত উপলব্ধির তুলনায় মনে হবে এক চূড়ান্ত ও অনপেক্ষ সিদ্ধির পূর্ণ স্থিতি ও প্রবৃত্তি। আর এ হল এক সত্যকার সিদ্ধি, এমন কিছু যা চিৎপুরুষের উৎক্রান্তিতে আর পূর্বে হয়নি। কারণ মানসিকতার লোকে শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক উপলব্ধিরও মধ্যে এমন কিছু থাকে যা মাথাভারী, একমুখী ও আত্যন্তিক; এমনকি সর্বাপেক্ষা ব্যাপ্ত মানসিক আধ্যাত্মিকতাও যথেষ্ট ব্যাপ্ত নয়, এবং উপরন্তু জীবনের মধ্যে আত্মপ্রকাশের অপূর্ণ সামর্থ্যের দ্বারা এ হল কলুষিত। আবার তথাপি এর উজানে যা আছে তার তুলনায় এও, — এই প্রাথমিক বিজ্ঞানময় জ্যোতিও এক পূর্ণতর সিদ্ধির দিকে শুধু এক উজ্জ্বল পথ। এই হল সেই সুদৃঢ় ও প্রোজ্জ্বল ধাপ যেখান থেকে আমরা সানন্দে আরোহণ করতে পারি আরো উর্ধ্বে অনপেক্ষ আনন্ত্যসমূহের মধ্যে যেগুলি জন্মপরিগ্রহকারী চিৎপুরুষের প্রভব ও গন্তব্যস্থল। এই যে অধিকতর উৎক্রান্তি তাতে বিজ্ঞান তিরোহিত হয় না বরং উপনীত হয় নিজেরই সেই পরম আলোকে যেখান থেকে এ অবতরণ করেছে মন ও পরম অনন্তের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে।

উপনিষদ আমাদের বলে যে মনোময় আত্মার উর্ধ্বে বিজ্ঞানময় আত্মা অধিগত করার পর এবং এর মধ্যে সকল অবর আত্মাই উর্ধ্বে আকৃষ্ট হবার পর তখনো আমাদের জন্য থাকে আরো একটি ধাপ আর সর্বশেষ ধাপ — যদিও প্রশ্ন হতে পারে এ কি চিরন্তনভাবেই সর্বশেষ ধাপ, না শুধু এমন সর্বশেষ ধাপ যা কার্যতঃ ভাবনায় আসে অথবা শুধু বর্তমানে আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় — আর এই ধাপ হল আমাদের বিজ্ঞানময় অস্তিত্বকে তুলে নেবার জন্য আনন্দ-আত্মার মধ্যে এবং সেখানে সম্পূর্ণ করা দিব্য অনন্তের আধ্যাত্মিক আত্ম-আবিষ্কার। আনন্দ, অর্থাৎ পরম শাশ্বত আনন্দ সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষী হর্ষ বা সুখ অপেক্ষা অতীব ভিন্ন ও উচ্চতর প্রকৃতির, এবং এই হল চিৎপুরুষের স্বরূপগত ও আদি প্রকৃতি। আনন্দের মধ্যেই চিৎপুরুষ পাবে তার প্রকৃত আত্মা, আনন্দের মধ্যেই সে পাবে তার স্বরূপগত চেতনা, আনন্দের মধ্যেই সে পাবে তার অস্তিত্বের অনপেক্ষ সামর্থ্য। চিৎপুরুষের এই সর্বশ্রেষ্ঠ, অনপেক্ষ, অসীম, নিরুপাধি আনন্দের মধ্যে দেহধারী পুরুষের প্রবেশই অনন্ত মোক্ষ ও অনন্ত সিদ্ধি। একথা সত্য যে এমনকি যে অবর লোকগুলিতে পুরুষ তার খর্ব ও পরিচ্ছিন্ন প্রকৃতির সঙ্গে ক্রীড়ারত সেখানেও এই আনন্দের কিছু উপভোগ সম্ভব প্রতিফলনের দ্বারা, সীমিত অবতরণের দ্বারা। জ্ঞানের

বিজ্ঞানময় সত্য লোক ও এর উর্ধ্বস্থিত লোকের মতোই, অন্নময় লোকে, প্রাণময় লোকে, মনোময় লোকেও এক আধ্যাত্মিক ও নিঃসীম আনন্দের অনুভূতি সম্ভব। আর যে যোগী এই সব লঘুতর উপলব্ধির মধ্যে প্রবেশ করে সে এইসবকে এত সম্পূর্ণ ও প্রবল দেখবে যে সে মনে করবে এর চেয়ে মহত্তর, এর অতীতে আর কিছু নেই। কারণ প্রতি দিব্য তত্ত্বের মধ্যেই নিহিত থাকে আমাদের সত্তার অপর ছয় সুরের সকলগুলিরই সমগ্র যোগ্যতা; প্রকৃতির প্রতি লোকই এই সব সুরের বিষয় নিজস্ব পূর্ণতা পেতে পারে তার নিজের সব পরিস্থিতি অনুযায়ী। কিন্তু অখণ্ড পূর্ণসিদ্ধি লাভের একমাত্র উপায় হল পরতম লোকের মধ্যে অবম লোকের উপচীয়মান উত্তরণ এবং অবম লোকের মধ্যে পরতম লোকের অবিরত অবতরণ যতক্ষণ না এই সব হয়ে ওঠে একসাথে একই অনন্ত ও সনাতন সত্যের দৃঢ় পিণ্ড এবং নমনীয় সাগর-সত্ত্ব।

মানবের অন্তঃস্থ স্থূল চেতনাও, অর্থাৎ অন্নময় পুরুষও এই পরম উত্তরণ ও অখণ্ড অবতরণ ব্যতীতই সচ্চিদানন্দের আত্মাকে প্রতিফলিত ও তার মধ্যে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়। এটি সে করতে পারে দুই উপায়ে — হয় স্থূলপ্রকৃতির অন্তঃস্থ পুরুষের, সেখানে নিগূঢ় কিন্তু তথাপি বিদ্যমান তার আনন্দ, সামর্থ্য ও আনন্ত্যের প্রতিফলনের দ্বারা, আর না হয়, তার ভিতরের বা বাইরের আত্মার মধ্যে নিজের ধাতু ও অস্তিত্বের পৃথক বোধ হারিয়ে ফেলে। এর পরিণাম হল স্থূল মনের এমন এক প্রশংসিত নিদ্রা যার মধ্যে অন্নময় পুরুষ একপ্রকার সচেতন নির্বাণে নিজেকে ভুলে যায়, আর না হয় প্রকৃতির হাতে জড় বস্তুর মতো, "জড়বৎ", বাতাসের মধ্যে পাতার মতো ঘুরে বেড়ায়; অথবা অন্য এক পরিণাম হল ক্রিয়ার শুদ্ধ সুখময় ও স্বচ্ছন্দ দায়িত্বহীনতার অবস্থা, "বালবৎ", দিব্য শৈশব। কিন্তু এই যে অবস্থা আসে তাতে আরো উন্নত স্তরের ঐ একই পাদের অন্তর্গত জ্ঞানের ও আনন্দের উচ্চতর ঐশ্বর্যরাজি থাকে না। এ হল সচ্চিদানন্দের এক নিশ্চেষ্ট উপলব্ধি যার মধ্যে প্রকৃতির উপর পুরুষের কোন প্রভুত্ব থাকে না অথবা প্রকৃতিরও কোন উর্ধ্বায়ন হয় না তার নিজেরই পরম সামর্থ্যের মধ্যে, পরাশক্তির অনন্ত ঐশ্বর্যের মধ্যে। অথচ এই দুটি — এই প্রভুত্ব ও এই উর্ধ্বায়ন — সিদ্ধির দুই তোরণ, পরম সনাতনের মধ্যে প্রবেশ করার দুই চমৎকার দুয়ার।

ঐ একইভাবে মানবের অন্তঃস্থ প্রাণ-অন্তঃপুরুষ ও প্রাণ-চেতনা অর্থাৎ প্রাণময়পুরুষ সচ্চিদানন্দের আত্মাকে সরাসরি প্রতিফলিত করতে ও তার মধ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় আর সে এটি করে, হয় বিশ্ব প্রাণের মধ্যকার পুরুষের বিশাল ও উজ্জ্বল ও আনন্দময় প্রতিফলনের দ্বারা, নয় তার ভিতরে বা বাইরে বিশাল আত্মার মধ্যে প্রাণ ও অস্তিত্বের পৃথক বোধ হারিয়ে ফেলে। এর ফল — হয় নিছক আত্মবিস্মৃতির এক গভীর অবস্থা, না হয়, প্রাণ-প্রকৃতির দ্বারা দায়িত্বহীনভাবে চালিত এক ক্রিয়া, মহতী বিশ্বশক্তির প্রাণিক নৃত্যের কাছে আত্মবিসর্জনের উৎকৃষ্ট উৎসাহ। বহিঃসত্তা বাস করে ভগবৎ-অধিকৃত উন্মত্ততার মধ্যে "উন্মত্তবৎ" আর নিজের ও জগৎ সম্বন্ধে উদাসীন থাকে না হয়, সম্পূর্ণ অবহেলা করে যথাযোগ্য মানুষী ক্রিয়ার বিভিন্ন প্রচলিত রীতি ও

ঔচিত্য অথবা এক মহত্তর সত্যের সামঞ্জস্য ও ছন্দ। এ কাজ করে বন্ধনরহিত প্রাণময় পুরুষের মতো, "পিশাচবৎ", যেন এক দিব্য পাগল অথবা দিব্য পিশাচ। এখানেও প্রকৃতির উপর কোন প্রভুত্ব বা পরম উর্ধ্বায়ন নেই। আছে শুধু আমাদের ভিতরে আত্মার দ্বারা এক আনন্দপূর্ণ স্থিতিক অধিকার এবং আমাদের বাইরে স্থূল ও প্রাণিক প্রকৃতির দ্বারা এক অনিয়ন্ত্রিত স্ফুরন্ত অধিকার।

মানবের অন্তঃস্থ মানস-অন্তঃপুরুষ ও মানস-চেতনা অর্থাৎ মনোময় পুরুষ ঐ একই সরাসরিভাবে সচ্চিদানন্দকে প্রতিফলিত করতে ও তাঁর মধ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় আর এ সে করে হয় পুরুষের প্রতিফলনের দ্বারা যেমন সে নিজেকে প্রতিফলিত করে শুদ্ধ বিশ্বমনের প্রকৃতিতে যা জ্যোতির্ময়, নির্বাধ, সুখময়, নমনীয়, অসীম, না হয়, তার ভিতরে ও তার বাইরে বৃহৎ, মুক্ত, অপরিচ্ছিন্ন কেন্দ্রাতীত আত্মার মধ্যে সমাপত্তির দ্বারা। এর ফল, — হয় সকল মন ও ক্রিয়ার এক নিশ্চল অবসান, আর না হয় এমন এক কামনাশূন্য বন্ধনরহিত ক্রিয়া যা নির্লিপ্ত আন্তর সাক্ষী নিরীক্ষণ করে। মনোময় পুরুষ হয়ে ওঠে এমন এক সন্ন্যাসী যে জগতে একলা থাকে ও সকল মানুষী সম্পর্ক সম্বন্ধে উদাসীন অথবা এমন এক নিগূঢ় পুরুষ যে উল্লাসভরা ভগবৎসান্নিধ্যে বা আনন্দপূর্ণ তাদাত্ম্যে বাস করে এবং সকল জীবের প্রতি শুদ্ধ প্রেম ও রভসের বিভিন্ন আনন্দময় সম্পর্ক রাখে। এমনকি মনোময় পুরুষের পক্ষে একসাথে তিন লোকেই আত্মাকে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। তখন সে এসবের সঙ্গে অভিন্ন হয় পালাক্রমে, পরপর অথবা একসাথে। অথবা সে অবর রূপগুলি রূপান্তরিত করতে পারে পরতর অবস্থার বিভিন্ন অভিব্যক্তিতে; সে উপরে নিয়ে যেতে পারে মুক্ত স্থূল মনের 'বালবৎ' ভাবকে বা নিশ্চেষ্ট দায়িত্বহীনতাকে, অথবা মুক্ত প্রাণিক মনের দিব্য উন্মত্ততাকে এবং সকল বিধি, ঔচিত্য ও সামঞ্জস্যের প্রতি অমনোযোগিতাকে এবং এইসব দিয়ে রঙীন বা আবৃত করতে পারে সাধুর রভসকে বা পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর একক স্বাধীনতাকে। এখানেও জগতের মধ্যে প্রকৃতির উপর পুরুষের কোন প্রভুত্ব থাকে না, কোন উর্ধ্বায়ন থাকে না, থাকে একরূপ দ্বিবিধ অধিকার — ভিতরে মানসিক আধ্যাত্মিক অনন্তের স্বাতন্ত্র্য ও আনন্দের দ্বারা, এবং বাইরে মানস-প্রকৃতির সুখময়, স্বাভাবিক ও অনিয়ন্ত্রিত লীলার দ্বারা। কিন্তু যেহেতু বিজ্ঞানকে এমন এক প্রকারে গ্রহণ করার ক্ষমতা মনোময় পুরুষের থাকে যে প্রকারে প্রাণময় পুরুষ বা অন্নময় পুরুষ তা গ্রহণ করতে অক্ষম এবং যেহেতু সে তা গ্রহণ করতে সক্ষম জ্ঞানের সঙ্গে, যদিও এই জ্ঞান মানসিক প্রত্যুত্তরের সীমিত জ্ঞান, সেহেতু এর আলো দিয়ে তার বাহ্য ক্রিয়াকে কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করা, অথবা যদি তা না হয়, এর মধ্যে তার সঙ্কল্প ও তার চিন্তাধারাকে অন্ততঃ অভিষিক্ত ও বিশুদ্ধ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়। কিন্তু মন পারে শুধু অন্তঃস্থ অনন্ত ও বাইরের সান্ত প্রকৃতির মধ্যে একটা আপোষে পৌঁছতে; পূর্ণতার কোন বোধ নিয়ে তার বাহ্য ক্রিয়ার মধ্যে আন্তর সত্তার জ্ঞান ও সামর্থ্য ও আনন্দের আনন্ত্য বর্ষণ করতে এ অক্ষম; এই বাহ্য ক্রিয়া সর্বদাই অপ্রচুর রয়ে যায়। তবু এ সন্তুষ্ট ও স্বতন্ত্র থাকে কারণ ক্রিয়া প্রচুর বা অপ্রচুর হ'ক, অন্তঃস্থ প্রভুই তার ভার নেন,

তা চালনার দায়িত্ব নেন ও তার পরিণাম নির্ধারণ করেন।

কিন্তু বিজ্ঞানময় পুরুষই প্রথম অংশ নেন শুধু যে সনাতনের স্বাধীনতায় তা নয়, তাঁর সামর্থ্য ও আধিপত্যেও। কারণ সে তার ক্রিয়ার মধ্যে পরম দেবতার ঐশ্বর্যের পূর্ণতা গ্রহণ করে, তাঁর ঐশ্বর্যের বোধ পায়। এ হল অনন্তের স্বচ্ছন্দ, মনোহর ও রাজকীয় যাত্রার অংশভাক্, আদি জ্ঞান, নিষ্কলুষ সামর্থ্য, অখণ্ডনীয় আনন্দের আধার, আর সকল জীবনকে রূপান্তরিত করে শাশ্বত আলোকে, ও শাশ্বত বহ্নিতে এবং শাশ্বত অমৃত-মদিরায়। এ আত্মার অনন্ত অধিগত করে, আবার এ অধিগত করে প্রকৃতির অনন্ত। অনন্তের আত্মার মধ্যে প্রকৃতিগত আত্মাকে এ ততটা হারায় না, যতটা সে পায়। অন্য যেসব লোকে মনোময় পুরুষের প্রবেশ আরো সহজ, সেসবে মানব ভগবানকে পায় নিজের মধ্যে, এবং নিজেকে পায় ভগবানের মধ্যে; ব্যক্তি বা প্রকৃতি অপেক্ষা বরং স্বরূপে সে দিব্য হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানে, এমনকি মানসিকভাবাপন্ন বিজ্ঞানে, দিব্যসনাতন মানবরূপী প্রতীক অধিগত, পরিবর্তিত ও চিহ্নিত করেন, ব্যক্তি ও প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে আবৃত করেন এবং আংশিকভাবে খুঁজে পান। মনোময় পুরুষ বড় জোর তাই গ্রহণ বা প্রতিফলিত করে যা সত্য, দিব্য ও শাশ্বত; বিজ্ঞানময় পুরুষ প্রকৃত তাদাত্ম্যে উপনীত হয় এবং অধিগত করে সত্য-প্রকৃতির চিৎপুরুষ ও সামর্থ্য। পুরুষ ও প্রকৃতি যে দুটি পৃথক সামর্থ্য-পরস্পরের অনুপূরক, — সাংখ্যদর্শনের যে মহান্ সত্য আমাদের বর্তমান প্রাকৃত অস্তিত্বের ব্যবহারিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, — বিজ্ঞানে তাদের দ্বৈতভাব তিরোহিত হয় তাদের দ্বয়াত্মক সত্তায়, গুহ্য পরমের স্ফুরন্ত রহস্যে। সত্যসত্তা হল ভারতীয় প্রতিমাবিদ্যার প্রতীক হর-গৌরী[১]; এই হল পুরুষ-স্ত্রীরূপী দ্বিবিধ সামর্থ্য যা পরমের পরমাশক্তি থেকে জাত এবং এর দ্বারা বিধৃত।

সুতরাং সত্য-পুরুষ অনন্তের মধ্যে আত্ম-বিস্মৃতির অবস্থায় আসে না; অনন্তের মধ্যে এ আসে শাশ্বত আত্ম-অধিকারে। এর ক্রিয়া অনিয়মিত নয়; অনন্ত স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে এ হল সম্পূর্ণ সংযম। অবর লোকসমূহে পুরুষ স্বভাবতঃই প্রকৃতির অধীন আর নিয়ামক তত্ত্ব পাওয়া যায় অপরা প্রকৃতিতে; সেখানে সকল নিয়মপালন নির্ভর করে সান্তের বিধানের কঠোর অধীনতা স্বীকার করার উপর। এই সব লোকের উপর অবস্থিত পুরুষ যদি সেই বিধান থেকে সরে চলে যায় অনন্তের স্বাধীনতার মধ্যে, এ তার স্বাভাবিক কেন্দ্র হারিয়ে ফেলে এবং বিশ্ব আনন্ত্যের মধ্যে কেন্দ্রশূন্য হয়ে পড়ে, আর যে জীবন্ত সামঞ্জস্যকারী তত্ত্বের দ্বারা তার বহিঃসত্তা তখনো পর্যন্ত নিয়মিত হ'ত তা থেকে সে বঞ্চিত হয় আর অন্য কোন তত্ত্ব সে পায় না। ব্যক্তিগত প্রকৃতি অথবা এর যা অবশিষ্ট থাকে তা শুধু কিছুদিনের জন্য এর অতীত গতিবৃত্তিগুলি যন্ত্রের মতো চালিয়ে যায় অথবা এ ব্যক্তির শরীরসংস্থান অপেক্ষা বরং ঐ শরীরের উপর কার্যরত বিশ্বশক্তি তরঙ্গের উচ্ছ্বাস ও পতনের মধ্যে নৃত্য করে, আর না হয় এ এক দায়িত্বশূন্য রভসের

[১] এই হল ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর, ঈশ্বর ও শক্তির দ্বয়াত্মক শরীর — দক্ষিণার্ধ নর ও বামার্ধ নারী।

উন্মত্ত পদক্ষেপের মধ্যে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায় অথবা এ নিশ্চেষ্ট থাকে এবং এর অন্তরে যে চিৎপুরুষ ছিল তার শ্বাস একে পরিত্যাগ করে। অপরপক্ষে যদি পুরুষ নিজের স্বাতন্ত্র্যের সংবেগে নিয়ন্ত্রণের এমন অপর এক ও দিব্য কেন্দ্র আবিষ্কারের অভিমুখে অগ্রসর হয় যার মধ্য দিয়ে অনন্ত জীবের মধ্যে তার নিজের ক্রিয়া সচেতনভাবে শাসন করতে সক্ষম, তাহলে সে অগ্রসর হচ্ছে বিজ্ঞানের দিকে যেখানে ঐ কেন্দ্র অর্থাৎ এক শাশ্বত সামঞ্জস্য ও সুশৃঙ্খলার কেন্দ্র পূর্ব থেকেই বিদ্যমান। মন ও প্রাণের ঊর্ধ্বে বিজ্ঞানে আরোহণ করলেই পুরুষ তার নিজের প্রকৃতির ঈশ্বর হতে পারে কারণ সে তখন শুধু পরাপ্রকৃতির অধীন। কারণ সেখানে শক্তি বা সঙ্কল্প দিব্যজ্ঞানের অবিকল প্রতিরূপ, সুষ্ঠু কলনা। এবং ঐ জ্ঞান শুধু যে পরম সাক্ষীর চক্ষু তা নয়, এ হল ঈশ্বরের অন্তর্নিহিত ও বিজয়ী অবলোকন। এর জ্যোতির্ময় নিয়ামক সামর্থ্য — এমন এক সামর্থ্য যাকে রুদ্ধ বা অস্বীকার করা যায় না, — তার আত্ম-প্রকাশশীল শক্তিকে আরোপ করে সকল ক্রিয়ার উপর এবং প্রতি গতিবৃত্তি ও সংবেগকে করে তোলে সত্য ও উজ্জ্বল ও যথার্থ ও অনিবার্য।

অবর লোকসমূহের বিভিন্ন সব উপলব্ধিকে বিজ্ঞান বর্জন করে না; কারণ এ আমাদের ব্যক্ত প্রকৃতির ধ্বংস বা লয় নয়, নির্বাণ নয়, বরং এ তার মহিমময় চরিতার্থতা। এ প্রাথমিক উপলব্ধিসমূহকে রূপান্তরিত ও দিব্য সুষমার উপাদান করার পর সেসবকে অধিগত করে তার নিজের পরিবেশের মধ্যে। বিজ্ঞানময় পুরুষ শিশু কিন্তু রাজ-শিশু[1]; বিজ্ঞানলোকই রাজকীয় ও শাশ্বত শৈশব যার খেলার সামগ্রী হল বিভিন্ন জগৎ এবং সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি হল ক্লান্তিহীন ক্রীড়ার আশ্চর্যময় উদ্যান। বিজ্ঞান দিব্য নিশ্চেষ্টতার অবস্থা গ্রহণ করে, কিন্তু এ সেই অধীন পুরুষের নিশ্চেষ্টতা নয় যে ঝরা পাতার মতো ঈশ্বরের শ্বাসের মধ্যে প্রকৃতির দ্বারা চালিত হয়। এ হল সেই সুখময়ী নিষ্ক্রিয়তা যার মধ্যে আছে প্রকৃতি-পুরুষের ক্রিয়া ও আনন্দের এক কল্পনাতীত তীব্রতা; আর এই প্রকৃতি-পুরুষ যেমন চালিত হয় কর্তৃত্বময় পুরুষের আনন্দের দ্বারা তেমন সেই সাথে সে জানে যে সে নিজেই পুরুষের ঊর্ধ্বে ও তার চারিদিকে পরাশক্তি এবং নিজের বক্ষের উপর তাকে নিত্যকাল পরমানন্দে আয়ত্তে রেখে বহন করে। পুরুষ প্রকৃতির এই দ্বয়াত্মক সত্তা যেন এক প্রদীপ্ত সূর্য ও দিব্য আলোকের পুঞ্জ যা নিজেই নিজেকে বহন করে তার কক্ষপথে তার নিজেরই আন্তর চেতনা ও সামর্থ্যের দ্বারা যা বিশ্বচেতনা ও সামর্থ্যের সঙ্গে এক, পরম অতিস্থিতির সঙ্গে এক। এর উন্মত্ততা আনন্দের প্রাজ্ঞ উন্মত্ততা, এ এক পরম চেতনা ও সামর্থ্যের এমন অমেয় রভস যা নিজের দিব্য গতিবৃত্তিসমূহের মধ্যে স্পন্দিত হয় স্বাতন্ত্র্য ও তীব্রতার অনন্ত বোধ সমেত। এর ক্রিয়া বুদ্ধির অতীত এবং সেজন্য যে যুক্তিবুদ্ধিপ্রধান মনের কাছে এর সন্ধানসূত্র নেই, তার কাছে এটি মনে হয় এক প্রকাণ্ড উন্মত্ততা। কিন্তু তবু যাকে উন্মত্ততা বলে মনে হয় তা এমন এক ক্রিয়ারত প্রজ্ঞা যা মনকে পরাভূত করে তার অন্তর্নিহিত বিষয়সমূহের স্বাতন্ত্র্য ও সমৃদ্ধির দ্বারা

[1] হেরাক্লিটাস (Heraclitus) ঐরকম বলেন, "রাজ্য হচ্ছে শিশুর"।

এবং তার বিভিন্ন গতির মৌলিক সরলতার মধ্যে অনন্ত জটিলতার দ্বারা, এই হল জগন্নাথের আপন পদ্ধতি আর এমন এক জিনিস বুদ্ধিতে যার কোন ব্যাখ্যা মেলে না, — এও এক নৃত্য, বিভিন্ন শক্তির আবর্তন কিন্তু নটরাজ তাঁর শক্তিরাজি নিয়ন্ত্রিত করে চালনা করেন ছন্দের তালে তালে, — রাসলীলার আপন-তৈরী সুষম চক্রে। দিব্য পিশাচের মতোই বিজ্ঞানময় পুরুষও সাধারণ মানবজীবনের বিভিন্ন ক্ষুদ্র আচারপ্রথা ও ঔচিত্যের দ্বারা বদ্ধ হয় না, অথবা সেই সব সঙ্কীর্ণ বিধির দ্বারাও বদ্ধ হয় না যেসবের মাধ্যমে সাধারণ জীবন অপরা প্রকৃতির বিভ্রমকারী দ্বন্দ্বসমূহের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ার জন্য সাময়িক সুবিধা রচনা করে অথবা চেষ্টা করে একে জগতের আপতিক বিরোধসমূহের মধ্যে চালনা করতে, এর অগণিত বাধাবিঘ্ন পরিহার করে তার বিভিন্ন বিপদ ও গর্ত-গহ্বরের চার পাশ দিয়ে অতীব সতর্কতার সঙ্গে পা ফেলতে। বিজ্ঞানময় অতিমানসিক জীবন আমাদের কাছে অস্বাভাবিক কারণ যে পুরুষ প্রকৃতির সঙ্গে নির্ভীকভাবে, ও এমনকি উগ্রভাবে ব্যবহার করে তার সকল দুঃসাহসিক কার্য ও নির্ভীক আনন্দকে এই জীবন নেয় স্বচ্ছন্দভাবে, অথচ এই জীবনই অনন্তের আপন স্বাভাবিক অবস্থা এবং তার সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত হয় সত্যের বিধানের দ্বারা তার যথার্থ অভ্রান্ত ধারায়। এ পালন করে সেই বিধান যা এক অসংখ্য একত্বের মধ্যে আত্ম-অধিকৃত জ্ঞান, প্রেম ও আনন্দের বিধান। একে অস্বাভাবিক মনে হয় কারণ এর ছন্দকে মনের ভুল-করা তালের দ্বারা মাপা যায় না, অথচ এ পা ফেলে এক আশ্চর্যজনক ও বিশ্বাতীত ছন্দের তালে।

আর তাহলে আরো এক উচ্চতর ধাপের কি প্রয়োজন আর বিজ্ঞানময় পুরুষ ও আনন্দময় পুরুষের মধ্যে কি-ই বা প্রভেদ? কোন স্বরূপগত প্রভেদ নেই, কিন্তু তবু এক প্রভেদ আছে কারণ এক চেতনা থেকে অন্য চেতনায় যাওয়া হয় এবং অবস্থানের কিছু পরাবর্তন হয় — কেননা জড় থেকে সর্বোত্তম সন্মাত্রে উত্তরণের প্রতি ধাপেই চেতনার পরাবর্তন হয়। পুরুষ তখন আর এর উজানের কিছুর দিকে তাকায় না, বরং সে এতেই থাকে এবং এখান থেকে সে আগে যা সব ছিল সেসবের দিকে নীচে তাকায়। বস্তুতঃ, সকল লোকেই আনন্দ খুঁজে পাওয়া সম্ভব, কারণ এ সর্বত্র বিদ্যমান ও সর্বত্রই এক। এমনকি চেতনার প্রতি অবর জগতেই আনন্দলোকের পুনরাবৃত্তি হয়। কিন্তু অবর লোকসমূহে একে যে শুধু পাওয়া যায় এর মধ্যে শুদ্ধ মন বা প্রাণবোধ বা শারীর সংবিতের একপ্রকার বিলীনতার দ্বারা তা নয়, এ যেন নিজেই মিশ্রিত হয়ে তরল হয়ে পড়ে সেই মিশ্রণের মধ্যে অবস্থিত মন, প্রাণ ও জড়ের বিলীন রূপের দ্বারা এবং এত তুচ্ছ ও ক্ষীণ হয়ে পড়ে যে অবর চেতনার কাছে এ বিস্ময়ের বিষয় হলেও এর প্রকৃত তীব্রতার সঙ্গে তুলনার অযোগ্য। অপরপক্ষে বিজ্ঞানের থাকে স্বরূপগত চেতনার ঘন আলো[1] যার মধ্যে আনন্দের প্রগাঢ় পূর্ণতা থাকা সম্ভব। আর যখন বিজ্ঞানের রূপ মিলিয়ে যায় আনন্দের মধ্যে তখন এ একেবারে ধ্বংস হয় না, তবে এর এক স্বাভাবিক পরিবর্তন

[1] চিদ্‌ঘন

আসে পুরুষকে যা নিয়ে যায় ঊর্ধ্বে তার অন্তিম ও পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যে; কারণ এ নিজেকে রূপায়িত করে চিৎপুরুষের অনপেক্ষ অস্তিত্বের ছাঁচে এবং প্রসারিত হয় নিজেরই সম্পূর্ণ স্বপ্রতিষ্ঠ আনন্দময় আনন্ত্যের বিভিন্ন রূপে। অনন্ত ও পরমার্থসৎই বিজ্ঞানের সকল ক্রিয়াবলীর চিন্ময় উৎস, সহচারী তত্ত্ব, অবস্থা, মান, ক্ষেত্র ও আবহাওয়া, আর বিজ্ঞান এই অনন্ত ও পরমার্থসৎকে অধিগত করে তার ভিত্তি, প্রভব, উপাদান দ্রব্য, অন্তর্বাসী ও প্রেরণাদায়ক সান্নিধ্য হিসেবে; কিন্তু এর ক্রিয়ায় একে মনে হয় যেন এ তার কর্মরূপে তার কার্যধারার ছন্দোময় প্রণালীরূপে, সনাতনের দিব্যমায়ারূপে[১] অথবা প্রজ্ঞা-রূপায়ণ রূপে পৃথকভাবে অবস্থিত। বিজ্ঞান হল দিব্য চিৎ-শক্তির দিব্য জ্ঞান-সঙ্কল্প; এ হল প্রকৃতি-পুরুষের সুসমঞ্জস চেতনা ও ক্রিয়া — দিব্য অস্তিত্বের আনন্দে পূর্ণ। আনন্দের মধ্যে জ্ঞান এই সব সঙ্কল্পমূলক সামঞ্জস্য থেকে ফিরে যায় শুদ্ধ আত্ম-চৈতন্যের মধ্যে, সঙ্কল্প মিলিয়ে যায় শুদ্ধ বিশ্বাতীত শক্তির মধ্যে আর উভয়কেই তুলে নেওয়া হয় অনন্তের শুদ্ধ আনন্দের মধ্যে। বিজ্ঞানময় অস্তিত্বের ভিত্তি হল আনন্দের আত্ম-সত্ত্ব ও আত্ম-রূপ।

উৎক্রান্তিতে এটি হয় তার কারণ এইখানে একান্ত ঐক্যে সংক্রমণ সম্পূর্ণ শেষ হয়; বিজ্ঞান এর চূড়ান্ত ধাপ কিন্তু অন্তিম বিশ্রামস্থল নয়। বিজ্ঞানের মধ্যে পুরুষ তার আনন্ত্যের কথা জানে ও এর মধ্যে বাস করে, অথচ সে-ই আবার অনন্তের জীবক্রীড়ার জন্য বাস করে এক কার্যোপযোগী কেন্দ্রে। সর্বভূতের সঙ্গে নিজের তাদাত্ম্য সে উপলব্ধি করে, তবে এক প্রভেদহীন বৈশিষ্ট্য সে রাখে যার দ্বারা সে সর্বভূতের সঙ্গে একপ্রকার বিচিত্রতার মধ্যে সংযোগ রাখতেও সক্ষম হয়। সংযোগের হর্ষের জন্য এই যে বৈশিষ্ট্য তা মনের মধ্যে শুধু যে প্রভেদ হয়ে দাঁড়ায় তা নয়, এ তার আত্ম-অনুভূতিতে হয়ে ওঠে আমাদের অন্য বিভিন্ন আত্মা থেকে বিভাজন, তার আধ্যাত্মিক সত্তায় এ হয়ে ওঠে আমাদের সঙ্গে যে আত্মা এক তাকে অপরের মধ্যে হারিয়ে ফেলার এক বোধ, যে আনন্দ থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে তা পাবার জন্য প্রয়াস, জীবনের মধ্যে অহমাত্মক আত্ম-সমাপত্তি ও হারানো একত্বের জন্য অন্ধ অন্বেষণের মধ্যে এক আপোষ। নিজের অনন্ত চেতনায় বিজ্ঞানপুরুষ স্বেচ্ছায় সৃষ্টি করে একপ্রকার সীমা নিজেরই বিভিন্ন প্রজ্ঞামূলক উদ্দেশ্যের জন্য; এমনকি তার সত্তার এক বিশেষ জ্যোতির্ময় প্রভামণ্ডলও থাকে যার মধ্যে সে বিচরণ করে, যদিও ঐ মণ্ডলের বাইরে সে সকল বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করে এবং সর্বসত্তা ও সর্বভূতের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন করে। আনন্দের মধ্যে সকলই পরাবর্তিত হয়, কেন্দ্র লোপ পায়। আনন্দ-প্রকৃতিতে কোন কেন্দ্র নেই, নেই কোন স্বেচ্ছাকৃত বা আরোপিত পরিধি — কিন্তু সমগ্রটা এবং সকল কিছু এক সম সত্তা, এক অভিন্ন চিৎপুরুষ। আনন্দময় পুরুষ নিজেকে পায় ও অনুভব করে সর্বত্র; তার কোন

[১] এই মায়া ভ্রমের অর্থে নয়, এ 'মায়া'বাদের আদি বৈদিক অর্থে। বিজ্ঞানময় অস্তিত্বে সবকিছুই বাস্তব, আধ্যাত্মিকভাবে মূর্ত, তাদের সত্যতা চিরন্তন প্রমাণযোগ্য।

বাসস্থান নেই, সে "অনিকেত", অথবা সর্বই তার বাসস্থান, আর না হয় যদি সে পছন্দ করে সকল কিছুই তার বিভিন্ন বহু বাসস্থান যেগুলি পরস্পরের জন্য উন্মুক্ত থাকে চিরদিন। অন্য সকল আত্মা পুরোপুরি তার নিজেরই আত্মা — যেমন স্বরূপে, তেমন ক্রিয়ায়। বৈচিত্র্যপূর্ণ একত্বের মধ্যে সংযোগের হর্ষ পুরোপুরি হয়ে ওঠে অগণিত একত্বের মধ্যে একান্ত তাদাত্ম্যের হর্ষ। সন্মাত্র আর তখন জ্ঞানের সংজ্ঞায় ব্যাকৃত হয় না, কারণ এখানে জ্ঞেয়, জ্ঞান এবং জ্ঞাতা সম্পূর্ণভাবে এক আত্মা, এবং যেহেতু সকল কিছু সকল কিছুকে অধিগত করে নিবিড়তম নিবিড়তার উজানে 'এক অন্তরঙ্গ তাদাত্ম্যে, সেহেতু আমরা যাকে জ্ঞান বলি তার কোন প্রয়োজন নেই। সকল চেতনাই অনন্তের আনন্দের, সকল সামর্থ্য অনন্তের আনন্দের সামর্থ্য, সকল রূপ ও ক্রিয়াবলী অনন্তের আনন্দের বিভিন্ন রূপ ও ক্রিয়াবলী। নিজের সত্তার এই যে একান্ত সত্য তার মধ্যেই আনন্দের সনাতন পুরুষের বাস — এখানে সে বিপরীত সব ঘটনার মধ্যে বিকৃত থাকে, সেখানে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে তাকে রূপান্তরিত করা হয় তাদের বাস্তব সত্যতায়।

পুরুষের অস্তিত্ব বজায় থাকে, তার নাশ হয় না, কোন অলক্ষণ অনির্দেশের মধ্যে সে বিলীন হয় না। কেননা আমাদের অস্তিত্বের প্রতি লোকে একই নীতি প্রযোজ্য; পুরুষ আত্ম-সমাপত্তির তন্ময়তাতে নিদ্রিত হয়ে পড়তে পারে, ভগবৎপ্রাপ্তির অনির্বচনীয় তীব্রতার মধ্যে আবিষ্ট থাকতে পারে, আবার বাস করতে পারে নিজেরই লোকের সর্বোত্তম গরিমার মধ্যে — বিভিন্ন ভারতীয় শাস্ত্রের আনন্দলোকে, ব্রহ্মলোকে, বৈকুণ্ঠে, গোলোকে — এমনকি অবর জগৎসমূহেরও দিকে ফিরতে পারে সে সবকে নিজের আলোক, সামর্থ্য, পরমানন্দে পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে। শাশ্বত জগৎসমূহে এবং ক্রমশঃ বেশী করে মনের ঊর্ধ্বে সকল জগতেই এই সব অবস্থা পরস্পরের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। কারণ তারা পৃথক নয়; তারা পরমার্থসৎ-এর চেতনার বিভিন্ন সহবর্তী, এমনকি একীভূত সামর্থ্য। আনন্দলোকে অবস্থিত ভগবান কোন জগৎ-লীলায় অক্ষম নন, অথবা তিনি তাঁর গরিমা প্রকাশে নিজেকে নিবারণ করেন না। বরং, যেমন উপনিষদ বলে, আনন্দই প্রকৃত সৃজনক্ষম তত্ত্ব। কারণ এই দিব্য আনন্দ[1] থেকেই সকল কিছুর জন্ম; এর মধ্যে সকল কিছুই অস্তিত্বের একান্ত সত্য হিসেবে পূর্ব থেকেই অবস্থিত; বিজ্ঞান এই সত্য বাইরে এনে ভাবনা ও ভাবনার বিধানের দ্বারা এক স্বেচ্ছাকৃত সীমার অধীন করে। আনন্দের মধ্যে সকল বিধানের অবসান হয়, আর থাকে সকল সর্ত বা সীমার বন্ধনরহিত একান্ত স্বাধীনতা। এ হল সকল তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ, আবার একই গতিতে সকল তত্ত্বের ভোক্তা; এ হল সর্বগুণমুক্ত আবার নিজেরই অনন্ত গুণের ভোক্তা; এ হল সকল রূপের ঊর্ধ্বে আবার সকল আত্মরূপ ও আকারের রচয়িতা ও ভোক্তা। এই অচিন্তনীয় সম্পূর্ণতাই চিৎপুরুষের স্বরূপ, — যে চিৎপুরুষ বিশ্বাতীত ও বিশ্বাত্মক, আর বিশ্বাতীত ও

[1] এইজন্য আনন্দের জগৎকে বলা হয় জনলোক -- 'জন' পদের যে দুই অর্থ — জন্ম ও আনন্দ — সেই দুই অর্থে।

বিশ্বাত্মক চিৎপুরুষের সঙ্গে আনন্দের মধ্যে এক হওয়ার অর্থ পুরুষেরও তা-ই হওয়া, তার কিছু কম নয়। যেহেতু এই লোকের উপর অনপেক্ষ তত্ত্ব এবং অনপেক্ষ তত্ত্বসমূহের লীলা থাকে, সেহেতু স্বভাবতঃই আমাদের মনের কোন প্রত্যয়ের দ্বারা এর বর্ণনা সম্ভব নয়, অথবা আমাদের বিভিন্ন মানস প্রত্যয় যেসব প্রাতিভাসিক বা আদর্শ সদ্‌বস্তুর বুদ্ধিগত সঙ্কেত সেসবের নিদর্শন দ্বারাও এর বর্ণনা সম্ভব নয়। বস্তুতঃ এই সদ্‌বস্তুগুলি নিজেরাই ঐসব অবর্ণনীয় অনপেক্ষ তত্ত্বের আপেক্ষিক প্রতীকমাত্র। প্রতীক, প্রকাশশীল সদ্‌বস্তু যা আমাদের দিতে পারে তা এমনকি তত্ত্বের স্বরূপ সম্বন্ধেও এক ভাবনা, অনুভব, ইন্দ্রিয়বোধ, দর্শন, সংযোগ, কিন্তু অবশেষে আমরা তার উজানে সেই তত্ত্বে যাই যার প্রতীক এই সব, এবং ভাবনা, দর্শন, সংযোগ অতিক্রম ক'রে, আদর্শ সদ্‌বস্তুসমূহ ভেদ ক'রে উপনীত হই প্রকৃত সদ্‌বস্তুসমূহে, "একম্"-এ, পরমে, কালাতীতে ও সনাতনে, অনন্তভাবে অনন্তে।

আমরা বর্তমানে যা আছি ও যা জানি তার সম্পূর্ণ অতীত এমন কিছু বিষয় সম্বন্ধে যখন আমরা অন্তর্মুখীভাবে অবগত হই এবং সেই বিষয়টির দিকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হই তখন প্রথম আমাদের যে সর্বগ্রাসী সংবেগ আসে তা হল বর্তমান বাস্তবতা থেকে প্রস্থান ক'রে সেই পরতর সদ্‌বস্তুতে পুরোপুরি আবিষ্ট থাকা। যখন আমরা পরম সন্মাত্র ও অনন্ত আনন্দের প্রতি আকৃষ্ট হই তখন সেই আকর্ষণের যে চরম রূপ হয় তা হল এই অবর ও সান্ত অস্তিত্বকে ভ্রান্তিরূপে হেয় জ্ঞান এবং ওপারে নির্বাণের জন্য আস্পৃহা — চিৎপুরুষের মধ্যে লয় পাওয়ার, নিমজ্জিত থাকার, বিনষ্ট হবার এক প্রচণ্ড আবেগ। কিন্তু প্রকৃত লয়, সত্যকার নির্বাণের অর্থ অবর অস্তিত্বের যা সব বন্ধনসূচক বৈশিষ্ট্য সেসবের বিমুক্তি পরতর অস্তিত্বের বৃহত্তর সত্তার মধ্যে, জীবন্ত সৎ-এর দ্বারা জীবন্ত প্রতীকের চিন্ময় অধিকার। পরিশেষে আমরা জানতে পারি যে ঐ পরতর সদ্‌বস্তু শুধু যে বাকী সবের কারণ তা নয়, শুধু যে এ বাকী সবকে আলিঙ্গন করে ও তাদের মধ্যে অবস্থান করে তা নয়, বরং যতই আমরা একে ক্রমশঃ আরো বেশী অধিগত করি ততই বাকী সব আমাদের পুরুষ-অনুভূতিতে রূপান্তরিত হয় এক মহত্তর ইষ্টার্থে এবং হয়ে ওঠে সৎ-এর আরো সমৃদ্ধ প্রকাশের, অনন্তের সঙ্গে এক অধিকতর বহুমুখী যোগাযোগের, পরতমে এক বৃহৎ উত্তরণের সাধন। সর্বশেষে আমরা অনপেক্ষ তত্ত্বের নিকটে পৌঁছই এবং এর পরম ইষ্টার্থগুলিতেও পৌঁছই যেগুলি সকল বিষয়ের অনপেক্ষ তত্ত্ব। মোক্ষের জন্য যে প্রচণ্ড আগ্রহ, "মুমুক্ষুত্ব" এতদিন পর্যন্ত আমাদের প্রেরণার উৎস ছিল তা নষ্ট হয়, কারণ এখন আমরা তার অন্তরঙ্গ সামীপ্যে থাকি যা সদা মুক্ত, যা আমাদের বর্তমান বন্ধনের প্রতি আকৃষ্ট ও আসক্ত হয় না অথবা যা আমাদের কাছে মনে হয় বন্ধন তাকে ভয় করে না। নিজের মুক্তির জন্য বদ্ধ পুরুষের আত্যন্তিক আগ্রহ নাশই একমাত্র উপায় যার দ্বারা আমাদের প্রকৃতির একান্ত মুক্তি আসা সম্ভব। মানুষের অন্তঃপুরুষকে ভগবান নিজের দিকে আকৃষ্ট করেন নানা প্রলোভনের সাহায্যে; আনন্দ সম্বন্ধে অন্তঃপুরুষের নিজের আপেক্ষিক ও অপূর্ণ ধারণা থেকেই এই সব প্রলোভনের উৎপত্তি; এই সব প্রলোভন

আনন্দ অন্বেষণের বিভিন্ন পন্থা, তবে যদি আমরা শেষ পর্যন্ত সেসবেই জড়িয়ে থাকি, তাহলে আমরা ঐসব অত্যুত্তম আনন্দের অনির্বচনীয় সত্য হারাই। এই সব প্রলোভনের মধ্যে প্রথম হল ঐহিক পুরস্কারের প্রলোভন, অর্থাৎ পার্থিব মন ও দেহে জড়বিষয়ক, বুদ্ধিগত, নৈতিক বা অন্য প্রকারের সুখের পারিতোষিক। এই একই ফলপ্রসূ প্রমাদের আরো দূরবর্তী ও মহত্তর রূপান্তর হল দ্বিতীয় প্রলোভন যাতে এই সব ঐহিক পুরস্কারের চেয়ে অনেক বেশী এক স্বর্গীয় আনন্দের আশা করা হয়; স্বর্গের ধারণা ক্রমশঃ উচ্চ ও শুদ্ধ হতে থাকে যতক্ষণ না এটি লাভ করে ভগবানের নিত্য সান্নিধ্যের অথবা সনাতনের সঙ্গে নিরবধি মিলনের শুদ্ধ ভাবনা। সবশেষে আমরা পাই সকল প্রলোভনের মধ্যে সূক্ষ্মতম প্রলোভন — এই সব জাগতিক বা স্বর্গীয় সুখ থেকে, এবং সকল দুঃখ, কষ্ট, পরিশ্রম ও উদ্বেগ থেকে, এবং সকল প্রাতিভাসিক বিষয় থেকে নিষ্কৃতিলাভ, এক নির্বাণ, পরমার্থসৎ-এর মধ্যে আত্ম-লয়, নিবৃত্তি ও অনুপাখ্য প্রশান্তির আনন্দ। পরিশেষে মনের এই সব খেলনাকে অতিক্রম ক'রে যেতে হবে। জন্মের ভীতি ও জন্ম থেকে নিষ্কৃতি পাবার কামনা — আমাদের মধ্য থেকে এই দুয়েরই সম্পূর্ণ অপসরণ একান্ত আবশ্যক। কারণ, প্রাচীন কথার পুনরাবৃত্তি করে বলা যায়, — যে পুরুষ একত্ব উপলব্ধি করেছে তার মোহ নেই, জুগুপ্সা নেই: যে পুরুষ আনন্দ-ব্রহ্মে প্রবেশ করেছে, কারুর কাছ থেকে বা কোন বিষয় থেকে তার ভয় পাবার কিছু নেই। ভয, কামনা ও শোক — এসব মনের ব্যাধি; এর বিভাজন ও সীমাবন্ধনের বোধ থেকেই তাদের উৎপত্তি, যে মিথ্যা তাদের জনয়িতা তার অবসান হলে ওদেরও অবসান হয়। আনন্দ এই সব ব্যাধিমুক্ত; এ সন্ন্যাসীর একচেটিয়া সম্পত্তি নয়, জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা থেকে এর উৎপত্তি হয় না।

আনন্দময় পুরুষ সম্ভূতি (জন্ম) কি অসম্ভূতিতে (জন্মহীনতায়) বদ্ধ নয়; সে বিদ্যার কামনার দ্বারা চালিত হয় না অথবা অবিদ্যার ভয়ে ক্লিষ্ট হয় না। পরম আনন্দময় পুরুষ আগেই বিদ্যার অধিকারী হয়েছে, জ্ঞানের সকল প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে সে উঠেছে। রূপ বা কর্ম দ্বারা চেতনায় সীমিত না হওয়ায় সে অবিদ্যায় আকুলিত না হয়েও অভিব্যক্তির সঙ্গে লীলায় সক্ষম। ইতিপূর্বেই সে ঊর্ধ্বে শাশ্বত অভিব্যক্তির রহস্যের মধ্যে তার নিজের কাজ করে, আবার, যখন সময় হয়, সে এখানে নেমে আসবে জন্মের মধ্যে আর তাতে সে যে প্রকৃতির চক্র-আর্বতনের শৃঙ্খলে বদ্ধ অবিদ্যার দাস হবে তা নয়। কারণ সে জানে যে বারবার জন্ম পরিগ্রহের উদ্দেশ্য ও বিধান হল দেহবদ্ধ পুরুষ যেন লোক থেকে লোকান্তরে ঊর্ধ্বে ওঠে এবং সর্বদাই অবর লীলার বিধির পরিবর্তে আনে পরতর লীলার বিধি, এমনকি যেন সে তা আনে নিম্নে জড়ক্ষেত্রেও। ঐ উত্তরণকে ঊর্ধ্ব থেকে সাহায্য করায় আনন্দময় পুরুষের ঘৃণা নেই, তার ভয়ও নেই ভগবৎ-সোপান বেয়ে নিম্নে জড়জন্মের মধ্যে নেমে এসে সেখানে নিজের আনন্দময় প্রকৃতির সামর্থ্য দিতে দিব্যশক্তিসমূহের ঊর্ধ্বাভিমুখী আকর্ষণে। বিকাশমান কালপুরুষের সেই অপরূপ মুহূর্তের সময় এখনো আসেনি। সাধারণতঃ মানব এখনো আনন্দময় প্রকৃতিতে উত্তরণ করতে সক্ষম নয়; প্রথম তার যা কর্তব্য তা হল নিজেকে বিভিন্ন উচ্চতর শিখরে দৃঢ়ভাবে

প্রতিষ্ঠিত করা এবং সেসব থেকে বিজ্ঞানে উত্তরণ করা; সম্পূর্ণ আনন্দসামর্থ্যকে নিম্নে এই পার্থিব প্রকৃতিতে নামিয়ে আনার ক্ষমতা তার আরো কম; তার পক্ষে প্রথম প্রয়োজন হল আর মনোময় মানব না থাকা ও অতিমানবীয় হওয়া। এখন তার পক্ষে যা করা সম্ভব তা হল নিজের অন্তঃপুরুষের মধ্যে এর সামর্থ্যের কিছু বেশী বা কম পরিমাণে গ্রহণ করা, তবে অবর চেতনার মধ্য দিয়ে আসার দরুন ঐ সামর্থ্যের পরিমাণ হ্রাস পায়, কিন্তু তাহলেও তা থেকে সে পায় এক রভসের ও এক অপার দিব্য আনন্দের বোধ।

আর, যখন আনন্দময় প্রকৃতি এক নব অতিমানসিক জাতির মধ্যে প্রকট হবে তখন তার স্বরূপ কি হবে? পূর্ণ বিকশিত পুরুষ এক প্রগাঢ় ও অসীম আনন্দ-চেতনার অনুভূতির স্থিতিতে ও স্ফুরন্ত পরিণতিতে সকল সত্তার সঙ্গে এক হবে। আর যেহেতু প্রেম আনন্দ-একত্বের ফলোৎপাদক সামর্থ্য ও পুরুষ-প্রতীক সে এই একত্বের দিকে অগ্রসর হবে এবং তাতে প্রবেশ করবে বিশ্বপ্রেমের তোরণ দিয়ে; — এই বিশ্বপ্রেম প্রথম হবে মানবপ্রেমের উর্ধ্বায়িত রূপ এবং পরে হবে দিব্য প্রেম, আর এর পরাকাষ্ঠায় এ এমন এক সৌন্দর্যময়, মাধুর্যময় ও জ্যোতির্ময় বিষয় হবে যা এখন আমাদের ধারণার অতীত। আনন্দ-চেতনার মধ্যে সে সকল জগৎ-লীলা ও এর বিভিন্ন সামর্থ্য ও ঘটনার সঙ্গে এক হবে এবং তখন চিরতরে নির্বাসিত হবে আমাদের দীন ও কলঙ্কিত মানসিক ও প্রাণিক ও শারীরিক জীবনের শোক ও ভয়, ক্ষুধা ও যন্ত্রণা। সে আনন্দমুক্তির সেই সামর্থ্য পাবে যার মধ্যে আমাদের সত্তার সকল পরস্পরবিরোধী তত্ত্বগুলি মিলিত হবে তাদের অনপেক্ষ মূল্যে। সকল অশুভ বাধ্য হয়ে পরিবর্তিত হবে শুভে; সর্ব-সুন্দরের বিশ্ব সৌন্দর্য অধিকার করবে তার অধঃপতিত রাজ্যগুলি; প্রতি অন্ধকার রূপান্তরিত হবে এক অন্তর্গূঢ় আলোর মহিমায়, আর মন যে সব বৈষম্য সৃষ্টি করে সত্য ও শিব ও সুন্দরের মধ্যে, সামর্থ্য ও প্রেম ও বিদ্যার মধ্যে সে সব তিরোহিত হবে শাশ্বত শিখরের উপর, অনন্ত বিস্তৃতির মধ্যে যেখানে তারা সর্বদাই এক।

মন, প্রাণ ও দেহের মধ্যে অবস্থিত পুরুষ প্রকৃতি থেকে বিভক্ত এবং এর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত। প্রকৃতির যা সবকে সে মূর্তরূপ দিতে সক্ষম সে সবকে সে তার প্রবল সামর্থ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ ও অধীন করার প্রয়াস করে, আর তথাপি সে তার পীড়াদায়ক দ্বন্দ্বগুলির অধীন থাকে এবং বস্তুতঃ সে পুরোপুরি, আগাগোড়া তার ক্রীড়নক। বিজ্ঞানের মধ্যে পুরুষ প্রকৃতির সঙ্গে দ্বয়াত্মক, পুরুষ তার নিজের প্রকৃতির প্রভু হিসেবে প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপগত একত্বের দ্বারা তাদের মিল ও সামঞ্জস্য পায় আর এমনকি সে তা পায় যে সময় সে পরতমের রাজকীয় দিব্য প্রকৃতিতে পরতমের কাছে এক অনন্ত আনন্দপূর্ণ অধীনতা স্বীকার করে — যে অধীনতার উপর নির্ভর করে তার প্রভুত্ব ও তার সর্ববিধ স্বাধীনতা। বিজ্ঞানের উচ্চশিখরসমূহে এবং আনন্দের মধ্যে সে প্রকৃতির সঙ্গে এক, আর তখন সে তার সঙ্গে শুধু দ্বয়াত্মক নয়। তখন আর অবিদ্যার মধ্যে পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির বিভ্রান্তিকর লীলা থাকে না; সব কিছুই পুরুষের সচেতন লীলা, নিজের সঙ্গে ও নিজের সকল আত্মার সঙ্গে ও পরতমের সঙ্গে ও দিব্য শক্তির সঙ্গে এবং তা হয় নিজের এবং

অনন্ত আনন্দময় প্রকৃতির মধ্যে। এই হল পরম রহস্য, সর্বোত্তম গুহ্য তত্ত্ব, আর আমাদের মানসিক সব ধারণার কাছে এবং আমাদের সীমিত বুদ্ধির উজানে যা আছে তা প্রণিধান করার জন্য এই বুদ্ধির প্রয়াসের কাছে ঐ রহস্য যতই দুরূহ ও জটিল হ'ক না কেন, এটি আমাদের অনুভূতির কাছে সরল। সচ্চিদানন্দের আত্মরতির মুক্ত আনন্ত্যের মধ্যে আছে এক ভাগবত শিশুর লীলা, অনন্ত প্রেমিকের এক "রাসলীলা" এবং তাঁর রহস্যপূর্ণ আত্মিক প্রতীকগুলি এক কালাতীত নিত্যকালের মধ্যে নিজেদের পুনঃপুনঃ প্রকট করে সৌন্দর্যের রূপে এবং আনন্দের ছন্দে ও সুষমায়।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

পরা ও অপরা বিদ্যা

জ্ঞানমার্গ সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা এখন শেষ হল, আর আমরা দেখলাম কোথায় এ নিয়ে যায়। প্রথমতঃ, জ্ঞানযোগের সাধ্য হল ভগবৎপ্রাপ্তি অর্থাৎ চেতনার মাধ্যমে, অভিন্নতার মাধ্যমে, দিব্য সদ্‌বস্তুর প্রতিবোধের মাধ্যমে ভগবানকে অধিগত করা এবং ভগবানের দ্বারা অধিগত হওয়া। কিন্তু তা যে শুধু আমাদের বর্তমান জীবন থেকে দূরে কোন আচ্ছিন্ন প্রত্যয়ের মধ্যে হবে তা নয়, তা হতে হবে এখানেও; সুতরাং সাধ্য হল ভগবানকে স্বরূপে পাওয়া, ভগবানকে জগতের মধ্যে পাওয়া, ভগবানকে অন্তরে পাওয়া, ভগবানকে পাওয়া সর্ব বিষয়ে ও সর্ব সত্তায়। এর অর্থ ভগবানের সঙ্গে একত্ব লাভ করা এবং এর মাধ্যমে বিশ্বাত্মা, বিশ্ব ও সর্বভূতেরও সঙ্গে একত্ব লাভ করা; সুতরাং এর অর্থ একত্বের মধ্যে অনন্ত বৈচিত্র্যও লাভ করা, তবে তা হবে একত্বের ভিত্তিতে, বিভাজনের ভিত্তিতে নয়। এর অর্থ ভগবানকে পাওয়া তাঁর ব্যক্তিরূপে ও তাঁর নৈর্ব্যক্তিকত্বে; তাঁর নির্গুণ শুদ্ধতায় ও তাঁর অনন্তগুণে; কালের মধ্যে ও কালাতীত বিভাবে; তাঁর ক্রিয়ায় ও তাঁর নীরবতায়; সান্তের মধ্যে এবং অনন্তের মধ্যে। এর অর্থ তাঁকে পাওয়া শুধু শুদ্ধ আত্মায় নয়, সকল আত্মাতেই; শুধু আত্মায় নয়, প্রকৃতির মধ্যেও; শুধু চিৎপুরুষে নয়, অতিমানস, মন, প্রাণ ও দেহেও পাওয়া; এর অর্থ চিৎপুরুষ দিয়ে, মন দিয়ে, প্রাণিক ও শারীরিক চেতনা দিয়ে তাঁকে পাওয়া; আবার এর অর্থ এই যে এই সবও যেন তাঁর দ্বারা অধিগত হয় যাতে আমাদের সমগ্র সত্তা তাঁর সঙ্গে এক হয়, তাঁতেই পূর্ণ হয়, তাঁর দ্বারাই শাসিত ও চালিত হয়। যেহেতু ভগবান একত্ব, সেহেতু এর অর্থ আমাদের শারীরিক চেতনারও এক হওয়া জড়বিশ্বের পুরুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে; আমাদের প্রাণের এক হওয়া সর্বপ্রাণের সঙ্গে, আমাদের মনের এক হওয়া বিশ্বমনের সঙ্গে; আমাদের চিৎপুরুষের এক হওয়া বিরাট পুরুষের সঙ্গে। এর অর্থ তাঁর মধ্যে তাঁর অনপেক্ষ বিভাবে নিমজ্জিত হওয়া এবং তাঁকে সকল সম্বন্ধের মধ্যে পাওয়া।

দ্বিতীয়তঃ, সাধ্য হল দিব্য সত্তা ও দিব্য প্রকৃতি ধারণ করা। এবং যেহেতু ভগবান সচ্চিদানন্দ, সেহেতু সাধ্য হল আমাদের সত্তাকে উন্নীত করা দিব্যসত্তার মধ্যে, আমাদের চেতনাকে দিব্য চেতনার মধ্যে, আমাদের ক্রিয়াশক্তিকে দিব্য ক্রিয়াশক্তিতে; আমাদের অস্তিত্বের আনন্দকে, সত্তার দিব্য আনন্দের মধ্যে। আর এই সাধ্য শুধু যে এই পরতর চেতনার মধ্যে আমাদের নিজেদের উত্তোলন করা তা নয়, এর মধ্যে আমাদের সর্বসত্তায় বিস্তৃত হওয়া, কারণ একে পাওয়া চাই আমাদের অস্তিত্বের সকল লোকে ও আমাদের সকল অঙ্গে যাতে আমাদের মানসিক, প্রাণিক, শারীরিক অস্তিত্ব পূর্ণ হয়ে ওঠে দিব্য প্রকৃতিতে, আমাদের বুদ্ধিপ্রধান মানসিকতাকে হতে হবে দিব্য জ্ঞানসঙ্কল্পের ক্রীড়া,

আমাদের মানসিক পুরুষজীবনের হওয়া চাই দিব্য প্রেম ও আনন্দের ক্রীড়া, আমাদের প্রাণশক্তি দিব্য প্রাণের ক্রীড়া, আমাদের শারীরিক সত্তা দিব্য ধাতুর এক ছাঁচ। আমাদের মধ্যে ভগবৎক্রিয়াকে উপলব্ধি করতে হবে দিব্য বিজ্ঞান ও দিব্য আনন্দের নিকট আমাদেব নিজেদের উন্মীলনের দ্বারা এবং এর পূর্ণতায়, বিজ্ঞান ও আনন্দের মধ্যে উত্তরণের দ্বারা এবং সেখানে স্থায়ীভাবে অধিষ্ঠানের দ্বারা। কারণ যদিও আমাদের স্থূল জীবন এই জড়লোকের উপর প্রতিষ্ঠিত আর স্বাভাবিক বাহ্যমুখী জীবনে মন ও অন্তঃপুরুষ জড় অস্তিত্বেই ব্যস্ত, তবু আমাদের সত্তার এই বাহ্যভাব কোন অনিবার্য সঙ্কীর্ণতা নয়। প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের বিভিন্ন সম্পর্কের যে সব বিভিন্ন লোক আছে তাদের একটি থেকে অন্যটিতে আমরা আমাদের আভ্যন্তরীণ চেতনাকে উন্নীত করতে সক্ষম, আর এমনকি অন্নময় পুরুষ ও প্রকৃতির প্রভাবাধীন মনোময় পুরুষের বদলে আমরা হয়ে উঠতে পারি বিজ্ঞানময় পুরুষ বা বিজ্ঞান-আত্মা এবং ধারণ করতে পারি বিজ্ঞানময় প্রকৃতি বা আনন্দময় প্রকৃতি। আর আন্তর জীবনের এই উন্নয়নের দ্বারা আমরা সক্ষম হই আমাদের সমগ্র বহির্মুখী জীবনকে রূপান্তরিত করতে; জড়প্রভাবাধীন জীবনের পরিবর্তে আমরা তখন পাব এমন জীবন যা চিৎপুরুষের প্রভাবাধীন এবং সেই সাথে এই জীবনের সকল পরিস্থিতিও গঠিত ও নির্ধারিত হবে সত্তার শুদ্ধতার দ্বারা, সান্তেরও মধ্যে অনন্ত চেতনার দ্বারা, চিৎপুরুষের দিব্য ক্রিয়াশক্তি, দিব্য হর্ষ ও আনন্দের দ্বারা।

এই হল লক্ষ্য; তাছাড়া আমরা দেখেছি পদ্ধতির মূল অঙ্গ কি কি। তবে পদ্ধতিবিষয়ক প্রশ্নের যে একটি দিকে আমরা এ পর্যন্ত হাত দিইনি সেইটি এখন আমাদের প্রথমে সংক্ষেপে বিবেচনা করা দরকার। পূর্ণযোগের শাস্ত্রে এই নীতি অবশ্য পালনীয় যে সমগ্র জীবনই যোগের অংশ; কিন্তু যে বিদ্যার কথা আমরা বলেছি তা মনে হয় জীবন বলতে সাধারণতঃ যা বোঝায় তার বিদ্যা নয়, বরং জীবনের পশ্চাতে কোন বিষয়ের বিদ্যা। দুই প্রকারের বিদ্যা আছে; — একটি চেষ্টা করে অস্তিত্বের আপতিক ঘটনাগুলি বুঝতে বাহ্যভাবে, বাইরে থেকে অগ্রসর হয়ে, ধীশক্তির মাধ্যমে — এটি হল অপরা বিদ্যা, আপতিক জগতের বিদ্যা; দ্বিতীয়টি সেই বিদ্যা যার চেষ্টা হল অস্তিত্বের সত্য জানা ভিতর থেকে, তার উৎসে ও সদ্‌বস্তুতে, আধ্যাত্মিক উপলব্ধির দ্বারা। সাধারণতঃ, দুটির মধ্যে এক প্রখর প্রভেদ করা হয়, আর মনে করা হয় যে যখন আমরা পরা বিদ্যা, ভগবৎ-জ্ঞান লাভ করি, তখন অন্যটি, জগৎ-জ্ঞান আমাদের কাছে নিষ্প্রয়োজন: কিন্তু বস্তুতঃ এরা একই এষণার দুই দিক। সকল বিদ্যাই শেষ পর্যন্ত ভগবৎ-বিদ্যা, — নিজের মাধ্যমে, প্রকৃতির মাধ্যমে, প্রকৃতির বিভিন্ন কর্মের মাধ্যমে। মানবজাতিকে এই বিদ্যালাভের চেষ্টা প্রথম করতে হবে বাহ্য জীবনের মাধ্যমে; কারণ, যতদিন না তার মানসিকতা যথেষ্ট বিকশিত হয় ততদিন আধ্যাত্মিক বিদ্যা বাস্তবিকই সম্ভব হয় না, আর যে অনুপাতে এ বিকশিত হয়, সেই অনুপাতে আধ্যাত্মিক বিদ্যার সম্ভাবনা আরো সমৃদ্ধ ও পূর্ণ হয়।

প্রাকৃত বিজ্ঞান, কলা, দর্শন, নীতিশাস্ত্র, মনোবিদ্যা, মানব ও তার অতীতের জ্ঞান, কর্ম স্বয়ং — এই সব উপায়েই আমরা লাভ করি প্রকৃতির মাধ্যমে ও জীবনের মাধ্যমে ভগবানের বিভিন্ন ক্রিয়াপ্রণালীর জ্ঞান। প্রথমে জীবনের বিভিন্ন কর্মধারাতে ও প্রকৃতির বিভিন্ন রূপেই আমরা ব্যস্ত থাকি, কিন্তু যতই আমরা ক্রমশঃ আরো গভীরে যাই এবং অধিকতর ব্যাপক দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতা লাভ করি ততই এদের প্রতি ধারাই আমাদের নিয়ে যায় মুখোমুখি ভগবানের কাছে। প্রাকৃত বিজ্ঞান তার শেষ সীমায়, এমনকি জড়বিজ্ঞানও শেষে বাধ্য হয় জড়জগতের মধ্যে অনন্তকে, বিশ্বাত্মককে, চিৎপুরুষকে, দিব্য বুদ্ধি ও সঙ্কল্পকে অনুভব করতে। যে সব সূক্ষ্ম বিজ্ঞান আমাদের সত্তার উচ্চতর ও সূক্ষ্মতর বিভিন্ন লোক ও সামর্থ্যের কর্ম নিয়ে আলোচনা করে এবং পশ্চাতে অবস্থিত সেই সব জগতের বিভিন্ন সত্তা ও ঘটনার সংস্পর্শে আসে যেগুলি অদেখা, আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বোধগম্য নয়, তবে যেগুলি সূক্ষ্ম মন ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় সেই সব সূক্ষ্ম বিজ্ঞানেরও আরো সহজে ঐ একই ধ্রুব পরিণতি। কলারও সেই পরিণতি; যে সৌন্দর্যানুরাগী ব্যক্তি কান্ত ভাবাবেগের মাধ্যমে প্রকৃতি নিয়েই ব্যস্ত থাকে সে-ও নিশ্চয় শেষে আধ্যাত্মিক ভাবাবেগ লাভ ক'রে প্রকৃতির মধ্যে শুধু যে অনন্ত জীবন অনুভব করবে তা নয়, অনন্ত সান্নিধ্যও অনুভব করবে; যে মানবজীবনের মধ্যে সৌন্দর্য নিয়ে মত্ত থাকে সে-ও শেষে মানবজাতির মধ্যে নিশ্চয় দেখবে ভগবানকে, বিশ্বাত্মককে, আধ্যাত্মিক সত্তাকে। বিষয়সমূহের বিভিন্ন তত্ত্ব আলোচনায় রত দর্শনও শেষে নিশ্চয়ই অনুভব করবে এই সকল তত্ত্বের মূল তত্ত্বকে, এবং এর প্রকৃতি, বিভিন্ন গুণ ও মৌলিক কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবে। সেইরূপ, নীতিশাস্ত্রও শেষ পর্যন্ত দেখবে, মঙ্গলের যে বিধান এ খোঁজে সে বিধান ভগবানেরই বিধান এবং তা নির্ভর করে বিধানস্বামীর সত্তা ও প্রকৃতির উপর। জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে মন ও অন্তঃপুরুষের অনুশীলন থেকে মনোবিদ্যাও নিয়ে যায় সকল বিষয় ও সত্তার মধ্যে একই পুরুষ ও একই মনের অনুভবে। প্রকৃতির ইতিহাস ও চর্চার মতো মানবের ইতিহাস ও চর্চা নিয়ে যায় সেই সনাতন ও বিশ্বাত্মক সামর্থ্য ও পুরুষের অনুভবে যাঁর মনন ও সঙ্কল্প কাজ করে বিশ্ব ও মানব বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। কর্ম নিজেই আমাদের জোর ক'রে সেই দিব্য সামর্থ্যের সংস্পর্শে নিয়ে আসে যা আমাদের সব ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কাজ করে, এইসব ক্রিয়াকে ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ করে। ধীশক্তি ভগবানকে জানতে ও বুঝতে শুরু করে, ভাবাবেগগুলি শুরু করে তাঁকে অনুভব ও আকাঙ্ক্ষা ও ভক্তি করতে, সঙ্কল্প শুরু করে তাঁর সেবায় নিজেকে নিয়োগ করতে — এই ভগবান ব্যতীত প্রকৃতি ও মানবের অস্তিত্ব বা সঞ্চরণ সম্ভব নয়, আর একমাত্র তাঁর সম্বন্ধে সচেতন জ্ঞানের দ্বারাই আমরা উপনীত হতে পারি আমাদের সর্বোত্তম সম্ভাবনাগুলিতে।

এইখানেই যোগের প্রবেশ। জ্ঞান, ভাবাবেগ ও ক্রিয়ার ব্যবহারের দ্বারাই ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য এর কাজ শুরু হয়। ভগবানের সঙ্গে মিলনের জন্য সচেতন ও সুষ্ঠু অন্বেষণই যোগ, এই মিলনের দিকেই ছিল বাকী সবের যাত্রা ও অন্বেষণ, তবে অজ্ঞান ও

অপূর্ণভাবে। সুতরাং যোগ প্রথমে অপরা বিদ্যার ক্রিয়া থেকে ও পদ্ধতি থেকে পৃথক থাকে। কারণ যখন এই অপরা বিদ্যা ভগবানের দিকে যায় বাইরে থেকে পরোক্ষভাবে, আর কখনো তাঁর গোপন নিবাসে প্রবেশ করে না, যোগ আমাদের ডাকে ভিতরে এবং ভগবানের দিকে যায় সরাসরিভাবে; যে সময় অপরা বিদ্যা তাঁকে খোঁজে ধীশক্তির মাধ্যমে এবং আবরণের পশ্চাত থেকে তাঁর সম্বন্ধে সচেতন হয়, যোগ তাঁকে খোঁজে উপলব্ধির মাধ্যমে, এ আবরণ তুলে তাঁর পূর্ণ দর্শন পায়; যখন ওটি শুধু সান্নিধ্য ও প্রভাব অনুভব করে, যোগ সেই সান্নিধ্যের মধ্যে প্রবেশ ক'রে নিজেকে প্রভাবের দ্বারা পূর্ণ করে; যখন ওটি শুধু কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে অবগত হয় এবং সেসবের মাধ্যমে সদ্‌বস্তুর কিছু আভাস পায়, যোগ সদ্‌বস্তুর সঙ্গে আমাদের আন্তর সত্তাকে অভিন্ন করে এবং সেখান থেকে কর্মপ্রণালী দেখে। সুতরাং অপরা বিদ্যার সব পদ্ধতি থেকে যোগের সব পদ্ধতি ভিন্ন।

বিদ্যার মধ্যে যোগের পদ্ধতি হল সর্বদা প্রত্যক্‌বৃত্ত হওয়া আর যখন এ বাহ্য বিষয়সমূহের উপর তাকায় তার উদ্দেশ্য হল বাহ্যরূপ ভেদ ক'রে তাদের মধ্যে এক নিত্য সদ্‌বস্তুতে উপনীত হওয়া। অপরা বিদ্যা বাহ্যরূপ ও কর্মপ্রণালীতে ব্যস্ত থাকে; পরা বিদ্যার প্রথম প্রয়োজন হল এই সব থেকে সরে এসে সেই সদ্‌বস্তুতে যাওয়া যার বাহ্যরূপ তারা এবং চিন্ময় অস্তিত্বের সেই সত্তা ও সামর্থ্যে যাওয়া যাদের কর্মপ্রণালী তারা। এটি এই কাজ করে এই তিনটি উপায়ে — শুদ্ধি, একাগ্রতা, অভিন্নতা; এদের প্রত্যেকটি পরস্পরের পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং প্রতিটির দ্বারা অপরগুলি সম্পূর্ণ হয়। শুদ্ধির উদ্দেশ্য হল সমগ্র মনোময় সত্তাকে এমন এক স্বচ্ছ দর্পণ করা যাতে দিব্য সদ্‌বস্তুর প্রতিফলন সম্ভব হয়, একে এমন এক নির্মল পাত্র ও নির্বাধ প্রণালী করা যার ভিতর দিব্য সান্নিধ্যের ও যার মধ্য দিয়ে দিব্য প্রভাবের বর্ষণ সম্ভব হয়, একে এমন এক সূক্ষ্মভাবাপন্ন উপাদান করা যাকে দিব্যপ্রকৃতি অধিগত ক'রে নতুনভাবে গঠন ও ব্যবহার করতে সক্ষম হয় দিব্য পরিণামের জন্য। কারণ বর্তমানে মনোময় সত্তা প্রতিফলন করে শুধু সেই সব বিশৃঙ্খলা যেগুলির উৎপত্তি জগৎ সম্বন্ধে মানসিক ও স্থূল দৃষ্টির থেকে, এ হল শুধু অজ্ঞানময় অপরা প্রকৃতির বৈষম্যের প্রণালী এবং এমন সব বাধা ও কলুষে পূর্ণ যেগুলির জন্য পরা প্রকৃতির ক্রিয়া সম্ভব হয় না, সেজন্য আমাদের সত্তার সমগ্র আকার বিরূপ ও অপূর্ণ, সর্বোত্তম প্রভাবসমূহের অবাধ্য এবং অজ্ঞানময় ও অবর প্রয়োজন সাধনেই প্রবৃত্ত। এমনকি জগৎকেও এ প্রতিফলিত করে মিথ্যারূপে; এ হল ভগবানের প্রতিফলনে অসমর্থ।

একাগ্রতার প্রয়োজন প্রথমতঃ এই কারণে — আমাদের ভাবনাগুলি ছোটে বহুবিস্তৃত সব কামনার পিছনে, ইন্দ্রিয়গুলি ও বিভিন্ন ঘটনায় বাহ্য মানসিক প্রতিক্রিয়া তাদের টেনে নেয় তাদের পথেই; এইভাবে তাদের বিক্ষিপ্ত সঞ্চরণের ফলে সমগ্র সঙ্কল্প ও মনের যে স্বাভাবিক চঞ্চল ইতস্ততঃ ভ্রমণ তা থেকে তাদের সরিয়ে আনার জন্যই এই প্রয়োজন। আমাদের কর্তব্য, — সঙ্কল্প ও মননকে নিবদ্ধ করা এবং এর জন্য আবশ্যক

বিপুল প্রয়াস, একনিষ্ঠ একাগ্রতা। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের নিজেদের ও সত্যের মধ্যে আমাদের সাধারণ মানসিকতা যে আবরণ খাড়া করে তা ছিন্ন করার জন্য একাগ্রতা প্রয়োজন, কারণ বাহ্য জ্ঞান আহরণ করা যায় প্রসঙ্গক্রমে, স্বাভাবিক মনোযোগিতা ও গ্রহণের দ্বারা, কিন্তু আন্তর, প্রচ্ছন্ন ও পরতর সত্য আয়ত্ত করার একমাত্র উপায় হল — মনের একান্ত একাগ্রতা তার বিষয়টির উপর এবং সঙ্কল্পের একান্ত একাগ্রতা এটি পাবার জন্য, এবং একবার পাওয়া হলে একে অভ্যাসগতভাবে ধারণ ও এর সঙ্গে নিজেকে দৃঢ়ভাবে যুক্ত করার জন্য। কারণ অভিন্নতাই সম্পূর্ণ জ্ঞান ও প্রাপ্তির সর্ত; এই প্রগাঢ় অভিন্নতা বোধ লাভের উপায় হল, — সদ্‌বস্তুকে অভ্যাসগত ও শুদ্ধভাবে প্রতিফলিত করা এবং এর উপর অখণ্ড একাগ্রতা দেওয়া; আর এটি প্রয়োজনীয়ও বটে, — ভাগবত সত্তা ও নিত্য সদ্‌বস্তুর সঙ্গে আমাদের যে বিভাজন ও পার্থক্য আমাদের অসংস্কৃত, অজ্ঞ, মানসিকতার স্বাভাবিক অবস্থা তা সম্পূর্ণভাবে চূর্ণ করার জন্য এই অভিন্নতার প্রয়োজন।

অপরা বিদ্যার পদ্ধতি দিয়ে এদের কোনটিরই সাধন সম্ভব নয়। একথা সত্য যে এই সব ক্রিয়ায় আমরা এই বিষয়ে কিছু প্রস্তুত হই, কিন্তু তা কিছু দূর পর্যন্ত এবং তীব্রতার এক বিশেষ মাত্রা অবধি, আর যেখানে তাদের ক্রিয়া বন্ধ হয় সেখানে যোগের ক্রিয়া এসে ভগবানের মধ্যে আমাদের উপচয়ের ভার নেয় এবং তা সম্পূর্ণ করার উপায় বার করে। সকল জ্ঞানানুশীলনের ফলেই — অবশ্য যদি না এ অতিরিক্ত পৃথ্বীমুখী আকর্ষণের দ্বারা কলুষিত হয় আমাদের সত্তার নির্মলতা, সূক্ষ্মতা ও শুদ্ধতাসাধন সুকর হয়। যে অনুপাতে আমরা আরো মনোময় হয়ে উঠি, সেই অনুপাতে আমরা আমাদের সমগ্র প্রকৃতির সূক্ষ্মতর ক্রিয়া পাই কারণ এই প্রকৃতি পরতর সব ভাবনা, শুদ্ধতর সঙ্কল্প, আরো কম স্থূল সত্য, আরো বেশী অন্তর্মুখী প্রভাব প্রতিফলিত ও গ্রহণ করার উপযোগী হয়। শুদ্ধ করার কাজে নৈতিক জ্ঞানের এবং ভাবনা ও সঙ্কল্পের নৈতিক অভ্যাসের সামর্থ্য যে কত বেশী তা সকলেরই জানা। দর্শনশাস্ত্র শুধু যে যুক্তিবুদ্ধিকে শুদ্ধ এবং একে বিশ্বাত্মক ও অনন্তের সংস্পর্শ লাভে প্রবণ করে তা নয়, এর দ্বারা প্রকৃতির স্থিরতা সাধন ও জ্ঞানীর প্রশান্তিলাভও সুকর হয়; আর প্রশান্তি লাভেই বোঝা যায় যে আত্ম-কর্তৃত্ব ও শুদ্ধতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বগত সৌন্দর্যে, এমনকি তার বিভিন্ন কান্তরূপে নিবিষ্টতার এক তীব্র সামর্থ্য আছে প্রকৃতিকে নির্মল ও সূক্ষ্ম করার কাজে এবং এর পরাকাষ্ঠায় এ হল শুদ্ধির পক্ষে এক মহাশক্তি। এমনকি মনের বৈজ্ঞানিক অভ্যাস এবং বিশ্ববিধান ও সত্যে নিস্পৃহ নিবিষ্টতাও শুধু যে যুক্তিবুদ্ধি ও পর্যবেক্ষণশক্তিকে নির্মল করে তা নয় এ অন্য-প্রেরণার দ্বারা প্রতিহত না হলে মন ও নৈতিক প্রকৃতিকে অবিচলিত, উন্নত ও শুদ্ধ করার কাজে সহায় হয়, তবে এর এই প্রভাবের দিকে তেমন মনোযোগ দেওয়া হয়নি।

এইসব অনুশীলনের এক সুস্পষ্ট ফল এবং এদের জন্য এক সতত প্রয়োজনীয় বিষয় হল — সত্য গ্রহণ ও সত্যের মধ্যে বাস করার উদ্দেশ্যে মনের একাগ্রতা ও সঙ্কল্পের শিক্ষা; এবং পরিশেষে অথবা যখন তারা সর্বাপেক্ষা তীব্র হয় তখন, যা পাওয়া সম্ভব ও পাওয়া যায়ও — তা হল দিব্য সদ্‌বস্তু সম্বন্ধে প্রথম এক বুদ্ধিগত এবং পরে

এক প্রতিবোধাত্মক অনুভব যার পরিণতি হতে পারে ঐ সদ্‌বস্তুর সঙ্গে একপ্রকার প্রাথমিক অভিন্নতাবোধ। তবে এই সব এক বিশেষ সীমা ছাড়িয়ে যেতে অক্ষম। দিব্য সদ্‌বস্তুর অখণ্ড প্রতিবোধ ও অন্তরে গ্রহণের জন্য সমগ্র সত্তার রীতিসঙ্গত শুদ্ধি সাধনের একমাত্র উপায় হল, — যোগের বিশেষ পদ্ধতিসমূহ। অপরা বিদ্যার সব বিক্ষিপ্ত একাগ্রতার বদলে আসা চাই যোগের একান্ত একাগ্রতা; অপরা বিদ্যা আনতে পারে বড়জোর এক অস্পষ্ট ও নিষ্ফল অভিন্নতা; একে সরিয়ে তার স্থলে আনা চাই সম্পূর্ণ, অন্তরঙ্গ, অমোঘ ও জীবন্ত মিলন; যোগ এটাই আনে।

তবু যোগ তার সাধনার পথে অথবা তার সাধ্যলাভে অপরা বিদ্যার রূপগুলি বাদ দিয়ে ফেলে দেয় না, তবে এর ব্যতিক্রম হয় যখন এ পরিণত হয় এক চরম বৈরাগ্যবাদে বা রহস্যবাদে যাদের কাছে প্রপঞ্চের এই অন্য দিব্য রহস্য সম্পূর্ণ অসহনীয়। অপরা বিদ্যার এই সব রূপ থেকে যোগের পার্থক্য হল যে যোগের লক্ষ্য প্রগাঢ়, বিশাল ও উচ্চ এবং এর লক্ষ্যের উপযোগী সব পদ্ধতির বিশিষ্ট ধরনের; কিন্তু এ যে শুধু সেসব থেকে শুরু করে তা নয়, এ পথের কিছু দূর পর্যন্ত তাদের সঙ্গে নিয়ে যায় এবং সহকারী হিসেবে ব্যবহার করে। এখন বোঝা যায়, যোগের প্রস্তুতিজনক পদ্ধতির পক্ষে, যে শুদ্ধতা এর লক্ষ্য সেই লক্ষ্যের পক্ষে নৈতিক ভাবনা ও আচরণের গুরুত্ব কত বেশী, — অবশ্য আন্তর আচরণের মতো বাহ্য আচরণের গুরুত্ব তত বেশী নয়। তাছাড়া, যোগের সমগ্র পদ্ধতিই মনস্তাত্ত্বিক; একরকম বলা যেতে পারে যে এ হল সুষ্ঠু মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের চরম অনুশীলন। দর্শন শাস্ত্রের তথ্যগুলিকেই অবলম্বন ক'রে যোগ সেসব থেকে শুরু করে তার সত্তার বিভিন্ন তত্ত্বের মাধ্যমে ভগবৎ-উপলব্ধির বিষয়ে তার কাজ; তবে দর্শনশাস্ত্র দেয় শুধু এক বুদ্ধিগত ধারণা আর যোগ একে নিয়ে যায় ভাবনার উজানে দর্শনে, এবং ধারণার উজানে উপলব্ধিতে ও প্রাপ্তিতে; দর্শনশাস্ত্র যাকে দূরবর্তী আচ্ছিন্ন প্রত্যয় বলে ক্ষান্ত হয়, যোগ তাকে নিয়ে আসে জীবন্ত সামীপ্যে ও আধ্যাত্মিক মূর্ততায়। সৌন্দর্যগ্রাহী ও ভাবপ্রধান মনকে এবং বিভিন্ন কান্ত রূপগুলিকে যোগ ব্যবহার করে — এমনকি জ্ঞানযোগও — একাগ্রতার অবলম্বনরূপে এবং এরা উর্ধ্বায়িত হয়ে প্রেম ও আনন্দ যোগের সমগ্র সাধন হয়, যেমন জীবন ও ক্রিয়া উর্ধ্বায়িত হয়ে কর্মযোগের সমগ্র সাধন হয়। প্রকৃতির মধ্যে ভগবানের ধ্যান, মানবের মধ্যে এবং মানবের ও জগতের যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎব্যাপী জীবন তার মধ্যে ভগবানের ধ্যান ও সেবা — এই সবকেই জ্ঞানযোগ উপাদানরূপে সমানভাবে ব্যবহার করতে পারে সর্ববিষয়ের মধ্যে ভগবৎ-উপলব্ধি সম্পূর্ণ করার জন্য। কেবল পার্থক্য এই যে সব কিছুই চালিত হয় সেই এক লক্ষ্যের দিকে, ভগবানের দিকে, সে সব পূর্ণ করা হয় দিব্য, অনন্ত, সার্বিক অস্তিত্বের ভাবনায় যাতে বিভিন্ন ঘটনা ও রূপের মধ্যে অপরা বিদ্যার বহির্মুখী, ইন্দ্রিয়গত, স্বার্থক্রিয়াকারী নিবিষ্টতার পরিবর্তে স্থাপিত হয় একমাত্র দিব্য নিবিষ্টতা। সাধ্যলাভের পরও যোগীর এই একই দিব্য নিবিষ্টতা থাকে। আগের মতোই যোগী সান্তের মধ্যে ভগবানকে জানে ও দেখে এবং জগতের মধ্যে ভগবৎ-চেতনা ও ভগবৎক্রিয়ার

প্রবাহপ্রণালী হয়ে থাকে। সুতরাং জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান এবং জীবন বিষয়ক সকল কিছুকেই বিস্তৃত ও উন্নত করার কাজ তার যোগের অন্তর্ভুক্ত। কেবল পার্থক্য এই যে সে সকলের মধ্যেই দেখে ভগবানকে, দেখে পরম সদ্‌বস্তুকে, আর তার কর্মের প্রেরণা হল ভগবৎ-জ্ঞানের দিকে, পরম সদ্‌বস্তু লাভের দিকে মানবজাতিকে সাহায্যদান। প্রাকৃত বিজ্ঞানের সব তথ্যের মাধ্যমে সে দেখে ভগবান, দর্শনশাস্ত্রের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে দেখে ভগবান, সৌন্দর্যের বিভিন্ন রূপের মাধ্যমে ও মঙ্গলের বিভিন্ন রূপের মাধ্যমে দেখে ভগবান, জীবনের সকল কাজকর্মের মধ্যে দেখে ভগবান, ভগবানকে দেখে জগতের অতীত ও এর বিভিন্ন পরিণতির মধ্যে বর্তমান ও এর সব প্রবণতার মধ্যে, ভবিষ্যৎ ও এর মহতী অগ্রসরতার মধ্যে। এদের যে কোনটির বা সকলগুলির মধ্যে সে আনতে সক্ষম চিৎপুরুষ থেকে পাওয়া তার ভাস্বর দর্শন ও মুক্ত সামর্থ্য। তার কাছে অপরা বিদ্যা এমন এক ধাপ হয়েছে যেখান থেকে সে আরোহণ করেছে পরা বিদ্যায়; তার জন্য পরা বিদ্যা অপরা বিদ্যাকে দীপ্ত ক'রে নিজের অঙ্গ ক'রে নেয় যদিও এ হয় শুধু তার নিম্ন প্রান্ত এবং সর্বাপেক্ষা বাহ্য বিকিরণ।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

সমাধি

জ্ঞানযোগের লক্ষ্য সর্বদাই হওয়া চাই — বর্তমানে আমাদের কাছে স্বাভাবিক নয় এমন এক পরতর চেতনায় উপচয় বা উত্তরণ বা প্রয়াণ; আর এই লক্ষ্যের সঙ্গে যৌগিক তন্ময়তার বিষয়ে অর্থাৎ সমাধিতে যে গুরুত্ব দেওয়া হয় তার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। মনে করা হয় যে সত্তার এমন সব অবস্থা আছে যা শুধু সমাধিতেই লাভ কবা সম্ভব; সেই অবস্থাই বিশেষভাবে কাম্য যার মধ্যে সংবিতের সকল ক্রিয়া বিলুপ্ত হয় আর নিশ্চল, কালাতীত ও অনন্ত সত্তায় শুদ্ধ অতিমানসিক নিমজ্জন ব্যতীত কোন চেতনা আদৌ থাকে না। এই তন্ময়তার মধ্যে প্রবেশ ক'রে অন্তঃপুরুষ প্রস্থান করে সর্বোত্তম নির্বাণের নীরবতার মধ্যে তখন অস্তিত্বের কোন ভ্রান্তিপূর্ণ বা অবর অবস্থার মধ্যে প্রত্যাবর্তনের কোন সম্ভাবনা থাকে না। ভক্তিযোগে সমাধির গুরুত্ব ঐরকম সব চেয়ে বেশী না হলেও সেখানেও এর স্থান আছে; সেখানে এ হল সত্তার এক মূর্ছিত অবস্থা যার মধ্যে দিব্য প্রেমের রভস অন্তঃপুরুষকে নিক্ষেপ করে। এর মধ্যে প্রবেশ করা রাজযোগ ও হঠযোগের যোগসাধনের সোপানের সর্বোচ্চ ধাপ। তাহলে পূর্ণযোগে সমাধির কি স্বরূপ অথবা এর তন্ময়তার কি উপকারিতা? এটা স্পষ্ট যে যেখানে জীবনের মধ্যে ভগবানকে পাওয়া আমাদের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত, সেখানে জীবনের নিবৃত্তির অবস্থা সর্বশেষ পূর্ণতাসূচক ধাপ বা সর্বোচ্চ কাম্য অবস্থা হতে পারে না: অন্য অনেক যৌগিক প্রণালীতে যৌগিক তন্ময়তা যেমন লক্ষ্য, পূর্ণযোগে তা হতে পারে না, এ হল শুধু এক সাধন, আর এ সাধনের উদ্দেশ্য জাগ্রত জীবন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া নয়, এর উদ্দেশ্য যে চেতনা দেখে, বেঁচে থাকে ও সক্রিয় সেই সমগ্র চেতনার প্রসার ও উন্নতি সাধন।

যে সত্যের উপর সমাধির গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত তাকে আধুনিক বিদ্যা পুনরাবিষ্কার করছে কিন্তু এটি ভারতীয় মনোবিদ্যায় কখনো নষ্ট হয়নি; এই সত্য এই যে, কি জগৎসত্তা অথবা কি আমাদের নিজেদের সত্তা — এদের এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় অথবা আমাদের কার্যে প্রয়োগ করা হয়। অবশিষ্ট সব পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন আছে সত্তার বিভিন্ন অধিচেতন স্তরে, যেগুলি নেমে গিয়েছে অবচেতনের গভীরতম গহনে এবং ঊর্ধ্বে উঠেছে অতিচেতনার সর্বোচ্চ সব শিখরে অথবা যেগুলি আমাদের জাগ্রত আত্মার সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রকে ঘিরে রেখেছে এক বিশাল পরিচেতন অস্তিত্বের দ্বারা, যার কিছু ইঙ্গিত মাত্র পায় আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়। এই তথ্যটি প্রাচীন ভারতীয় মনোবিদ্যায় প্রকাশ করা হয়েছে চেতনাকে তিন পাদে ভাগ করে — জাগ্রত অবস্থা, স্বপ্নাবস্থা, সুষুপ্তির অবস্থা, "জাগ্রৎ", "স্বপ্ন", "সুষুপ্তি"; এর ধারণায় মানবসত্তার মধ্যে জাগ্রত-আত্মা, স্বপ্ন-আত্মা, সুষুপ্তি-আত্মা আছে; আর আছে সত্তার পরম বা কেবল আত্মা, —

এক চতুর্থ বা তুরীয় আত্মা যা এই সবের অতীত এবং যা থেকে এই সব উৎপন্ন হয়েছে জগতের মধ্যে সাপেক্ষ অভিজ্ঞতার উপভোগের জন্য।

প্রাচীন গ্রন্থসমূহের পরিভাষা পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে স্থূলমনের আয়ত্তাধীন এই দেহবদ্ধ জীবনে জড়বিশ্বের যে চেতনা আমরা স্বভাবতঃ পেয়েছি তা-ই জাগ্রত অবস্থা। পশ্চাতে অবস্থিত যে সূক্ষ্মতর প্রাণলোক ও মনোলোক আমাদের কাছে ভৌতিক অস্তিত্বের বিষয়সমূহের মতো ঐরকম মূর্ত বাস্তব নয় — এমনকি যখন আমরা তাদের ইঙ্গিত পাই তখনো নয় — সেই প্রাণলোক ও মনোলোকের অনুরূপ চেতনা হল স্বপ্নাবস্থা। সুষুপ্তি-অবস্থা হল সেই চেতনা যা বিজ্ঞানের বিশিষ্ট অতিমানসিক লোকের অনুরূপ; এই অতিমানসিক লোক আমাদের অনুভূতির অতীত, কারণ আমাদের কারণ শরীর বা বিজ্ঞানকোষ আমাদের মধ্যে বিকশিত হয়নি, এর শক্তিগুলি সক্রিয় নয় আর সেজন্য আমরা ঐ লোকের সম্পর্কে স্বপ্নশূন্য নিদ্রার অবস্থায় থাকি। এদের অতীত তুরীয় হল আমাদের শুদ্ধ আত্ম-অস্তিত্বের অথবা আমাদের কেবল সত্তার চেতনা; এদের সঙ্গে আমাদের আদৌ কোন সরাসরি সম্পর্ক নেই, তা যা কিছু মানসিক প্রতিফলনই আমরা পাই না কেন আমাদের স্বপ্নে বা আমাদের জাগ্রত অবস্থায় অথবা এমনকি আমাদের সুষুপ্তি চেতনায় যেখান হতে তাদের পুনরুদ্ধার অসম্ভব। এই চতুর্বিধ ক্রমবিন্যাস হল সত্তার সোপানের সেই সব বিভিন্ন ক্রম যা দিয়ে আমরা প্রত্যারোহণ করি অনপেক্ষ ভগবানের দিকে। সুতরাং সাধারণতঃ আমরা জাগ্রত অবস্থা থেকে সরে না এসে, তার ভিতরে ও তা থেকে দূরে প্রবেশ না ক'রে এবং জড়জগতের সংস্পর্শ না হারিয়ে স্থূল মন থেকে চেতনার পরতর বিভিন্ন লোকে বা মাত্রায় প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হই না। সেজন্য, যারা এই সব পরতর মাত্রার অনুভূতি পাবার কামনা করে, তাদের কাছে সমাধি এক কাম্য বিষয়, স্থূল মন ও প্রকৃতির সব বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি পাবার এক উপায়।

যেমন যেমন সমাধি বা যৌগিক তন্ময়তা সাধারণ বা জাগ্রত অবস্থা থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে গিয়ে চেতনার এমন সব স্তরে প্রবেশ করে যেগুলিতে জাগ্রত মনের সঙ্গে যোগাযোগ ক্রমেই কমে যায়, যেগুলি জাগ্রত জগতের বার্তা নিতে ক্রমেই অপটু হয় তেমন তেমন এ ক্রমশঃ আরো গভীরে অপসরণ করে। একটি বিশেষ সীমা ছাড়িয়ে গেলে, সমাধি সম্পূর্ণ হয়, আর যে অন্তঃপুরুষ তার মধ্যে অপসরণ করেছে তাকে তখন জাগ্রত করা বা আহ্বান করে ফিরিয়ে আনা একরকম বা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সে আসতে পারে তার নিজের ইচ্ছায় অথবা শারীরিক অনুরোধের প্রচণ্ড আঘাতের দ্বারা তবে প্রত্যাবর্তনের এক আকস্মিক আলোড়নের দরুন এরকম আঘাত শরীরের পক্ষে বিপজ্জনক। বলা হয় যে সমাধির এমন সব পরম অবস্থা আছে যেখানে অন্তঃপুরুষ খুব বেশী দিন থাকলে আর ফিরতে পারে না; কারণ যে সূত্রটি তাকে জীবনের চেতনার সঙ্গে বেঁধে রাখে তা থেকে তার সংযোগ ছিন্ন হয়, দেহ পড়ে থাকে, অবশ্য যে অবস্থায় তাকে রাখা হয়েছিল সেই অবস্থাতেই থাকে, লয়ের দ্বারা মৃত হয় না তবে যে অন্তঃপুরুষ-অধিকৃত প্রাণ সেখানে বাস করত তাকে আর এ ফিরে পেতে সক্ষম হয় না। পরিশেষে

যোগী তার উন্নতির এক বিশেষ পর্যায়ে মৃত্যুর সাধারণ ঘটনা বিনা-ই নিশ্চিতভাবে দেহত্যাগের সামর্থ্য অর্জন করে; এইভাবে সে দেহত্যাগ করে সঙ্কল্পের[১] প্রয়োগের দ্বারা অথবা এমন এক প্রণালীতে যাতে ঊর্ধ্বমুখী প্রাণ-ধারার ("উদান") দুয়ার দিয়ে প্রাণিক জীবনীশক্তিকে প্রত্যাহার করা হয় এবং তার জন্য একটি পথ খোলা হয় মস্তকস্থিত গুহ্য ব্রহ্মরন্ধ্রের মধ্য দিয়ে। সমাধির অবস্থায় জীবন থেকে প্রস্থান ক'রে সে সরাসরি লাভ করে তার অভীষ্ট বিষয় — সত্তার পরতর পাদ।

এক স্বপ্নাবস্থাতেই অসংখ্য শ্রেণীর গভীরতা আছে, অপেক্ষাকৃত কম গভীর শ্রেণী থেকে প্রত্যাবর্তন সহজ, স্থূল ইন্দ্রিয়ের জগৎ নিকটেই অবস্থিত, যদিও কিছু সময়ের জন্য তাকে বাইরে রাখা হয়; মন আরো গভীরে গেলে, এই জগৎ আরো দূরবর্তী হয়, ভিতরে এসে আন্তর সমাপত্তি ক্ষুণ্ন করার ক্ষমতা তার কমে যায়, মন প্রবেশ করে সমাধির নিরাপদ গভীরতায়। সমাধি ও সাধারণ নিদ্রার মধ্যে, অর্থাৎ যোগের স্বপ্নাবস্থা ও ভৌতিক স্বপ্নাবস্থার মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। শেষেরটি স্থূলমনের অন্তর্গত; আগেরটিতে আসল সূক্ষ্ম মন স্থূল মানসিকতার মিশ্রণ থেকে মুক্ত হয়ে ক্রিয়ারত। স্থূল মনের সব স্বপ্ন অসংলগ্ন বিশৃঙ্খল স্তূপ যার মধ্যে কিছু আছে স্থূল জগৎ থেকে আসা অস্পষ্ট স্পর্শের এমন সব প্রতিক্রিয়া যার চারিদিকে অবর মানসশক্তিগুলি সঙ্কল্প ও বুদ্ধি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এলোমেলো অর্থহীন চিন্তার জাল বোনে, কিছু আছে মস্তিষ্ক-স্মৃতি থেকে আসা বিশৃঙ্খল ভাবানুষঙ্গ, কিছু আছে মনোময় লোকে বিচরণরত অন্তঃপুরুষ থেকে এমন সব প্রতিফলন যেগুলি সাধারণতঃ গ্রহণ করা হয় না বুঝে অথবা অন্যাদের সঙ্গে না মিল ক'রে আর গ্রহণের সময় যেগুলি অভাবনীয়ভাবে বিকৃত হয় এবং বিশৃঙ্খলভাবে মিশে যায় অপর সব স্বপ্ন-বস্তুর সঙ্গে, মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্মৃতির বিষয়ের সঙ্গে, স্থূলজগৎ থেকে আসা ইন্দ্রিয়সংস্পর্শের সব উদ্ভট প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে। অপর পক্ষে যৌগিক স্বপ্নাবস্থায় মন স্থূল জগৎকে আয়ত্ত না করলেও, নিজেকে আয়ত্ত করে স্পষ্টভাবে, কাজ করে সুসঙ্গতভাবে এবং সমর্থ হয় তার সাধারণ সঙ্কল্প ও বুদ্ধিকে একাগ্র সামর্থ্য দিয়ে ব্যবহার করতে অথবা মনের আরো উন্নত লোকের পরতর সঙ্কল্প ও বুদ্ধিকে ব্যবহার করতে। বাহ্য জগতের অভিজ্ঞতা থেকে এ সরে আসে, স্থূল ইন্দ্রিয়গুলিকে এবং জড়বিষয়ের সঙ্গে তাদের যোগাযোগের দ্বারগুলিকে এ সম্পূর্ণ বন্ধ করে; কিন্তু যা কিছু তার আসল ক্রিয়া অর্থাৎ ভাবনা, যুক্তিবুদ্ধি, গভীর চিন্তা, দর্শন — এসব সে পূর্বের মতোই সম্পন্ন করতে পারে আরো বিশুদ্ধতার সঙ্গে এবং জাগ্রত মনের বিক্ষেপ ও অস্থিরতামুক্ত নিরঙ্কুশ একাগ্রতার শক্তি দিয়ে। এ তার সঙ্কল্পের প্রয়োগে নিজের উপর অথবা নিজের পরিবেশের উপর এমন সব মানসিক, নৈতিক ও এমনকি ভৌতিক ফল উৎপাদনে সক্ষম হয় যেগুলি সমাধিভঙ্গের পরও বজায় থাকতে পারে এবং যাদের পরের ফলও আসতে পারে জাগ্রত অবস্থার উপর।

[১] ইচ্ছামৃত্যু

স্বপ্নাবস্থার সামর্থ্যগুলির পূর্ণ অধিকার পেতে হলে প্রথম দরকার হল স্থূল ইন্দ্রিয়গুলির উপর বাহ্য জগতের রূপ, শব্দাদির আক্রমণ রোধ করা। অবশ্য, স্বপ্ন-সমাধিতে সূক্ষ্মদেহের অন্তর্গত সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়সমূহের মাধ্যমে বাহ্য স্থূল জগৎকে জানা সম্ভব; নিজের ইচ্ছামতো বাহ্য জগতের ঐসবকে জানা যায় আর তা জানা যায় জাগ্রত অবস্থার চেয়ে আরো অনেক ব্যাপক পরিমাণে: কারণ স্থূল শারীরিক ইন্দ্রিয় অপেক্ষা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলি এত শক্তিমান যে তাদের ক্রিয়াক্ষেত্রের প্রসার আরো অনেক বেশী আর এই প্রসারকে কার্যতঃ অসীম করা যায়। কিন্তু স্থূল ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে স্থূল জগৎ সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ জ্ঞান থেকে সূক্ষ্ম সব ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তার জ্ঞান সম্পূর্ণ বিভিন্ন; সমাধির স্থির অবস্থার সঙ্গে আমাদের সাধারণ জ্ঞানের সঙ্গতি নেই, কারণ স্থূল ইন্দ্রিয়গুলির চাপ সমাধি ভেঙে দেয় এবং মনকে ডেকে ফিরিয়ে আনে তাদের স্বাভাবিক ক্ষেত্রে একমাত্র যেখানে তাদের সামর্থ্য নিবদ্ধ। কিন্তু সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলি তাদের নিজেদের সব লোক ও স্থূল জগৎ — উভয়েরই উপর কার্য করতে সমর্থ যদিও এই স্থূল জগৎ তাদের নিজেদের সত্তার জগৎ থেকে আরো দূরবর্তী। স্থূল ইন্দ্রিয়গুলির সব দ্বার সম্পূর্ণ বন্ধ করার জন্য যোগে নানা কৌশল অবলম্বন করা হয়, তার মধ্যে কতকগুলি ভৌতিক কৌশল; কিন্তু যে একটি সাধন সবচেয়ে পর্যাপ্ত তা হ'ল একাগ্রতার শক্তি; এর দ্বারা মনকে অন্তর্মুখী করে এমন গভীরতার মধ্যে আনা যায় যেখানে ভৌতিক বিষয়ের আহ্বান আর সহজে পৌঁছতে পারে না। দ্বিতীয় প্রয়োজন হল শারীরিক নিদ্রার ব্যাঘাত দূর করা। যখন মন স্থূল বিষয়ের সংস্পর্শ থেকে সরে এসে ভিতরে যায় তখন তার সাধারণ অভ্যাস হল নিদ্রার জড়তা বা তার স্বপ্নের কবলিত হওয়া এবং সেজন্য যখন তাকে সমাধি লাভের জন্য ডাকা হয় তখন এ নিছক অভ্যাস বশে প্রথমেই যে প্রত্যুত্তর দেয় বা দিতে প্রবণ হয় তা প্রার্থিত প্রত্যুত্তর নয়, বরং তার শারীরিক নিদ্রার স্বাভাবিক প্রত্যুত্তর। মনের এই অভ্যাস দূর করা চাই; মনের শেখা চাই যেন এ স্বপ্নাবস্থার মধ্যে জাগ্রত থাকে, যেন আত্ম-অধিকারী হয়, তবে বহির্মুখী সজাগতা নিয়ে নয়, অন্তঃসমাহিত সজাগতা নিয়ে যাতে মন নিজের মধ্যে মগ্ন থাকলেও তার সকল সামর্থ্যই এ প্রয়োগ করে।

স্বপ্নাবস্থার অনুভূতিগুলি অনন্ত প্রকারের। কারণ এ যে শুধু স্বাভাবিক মানসিক সামর্থ্যগুলিকে অর্থাৎ যুক্তি, বিচার, সঙ্কল্প, কল্পনাকে নিরঙ্কুশভাবে অধিগত করে সেগুলিকে ইচ্ছামতো যে কোন ভাবে, যে কোন প্রসঙ্গে, যে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে সক্ষম তা নয়, বরং স্থূল জগৎ থেকে আরম্ভ ক'রে উচ্চতর বিভিন্ন মানসিক জগৎ পর্যন্ত যে সকল জগতের মধ্যে তার স্বাভাবিক প্রবেশ আছে অথবা যে সবের মধ্যে এ ইচ্ছা করলেই প্রবেশ লাভ করে — সেই সকল জগতের সঙ্গে এ সংযোগ স্থাপনে সমর্থ। এই কাজ এ করে সেই সব নানা উপায়ে যেগুলি স্থূল বহির্মুখী ইন্দ্রিয়সমূহের সঙ্কীর্ণ সীমা থেকে মুক্ত প্রত্যক্‌বৃত্ত মনের সূক্ষ্মতা, নমনীয়তা ও ব্যাপক গতি-প্রবৃত্তির নিকট সুলভ। প্রথমে এ সকল বিষয়কে — তা এরা জড়জগতের অন্তর্গত হ'ক অথবা অন্যান্য

লোকের হ'ক — জানতে পারে অনুভবযোগ্য প্রতিমূর্তির সহায়ে, তবে এই সব প্রতিমূর্তি যে শুধু দৃশ্য বিষয়ের তা নয়, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, স্বাদ, গতি, ক্রিয়া প্রভৃতি যে সকল বিষয় মন ও এর সব করণের বোধগম্য হয় সে সবেরও প্রতিমূর্তি এরা। কারণ সমাধির মধ্যে মন যেতে পারে আন্তর দেশে যাকে কখন কখন বলা হয় চিদাকাশ অর্থাৎ উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম আকাশের সব গভীর প্রদেশের মধ্যে যেগুলি জড়বিশ্বের স্থূলতর আকাশের ঘন আবরণের দ্বারা স্থূল ইন্দ্রিয় থেকে আড়াল করা থাকে, আর জড়জগতেই হ'ক অথবা অন্য কোন জগতেই হ'ক — সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ই নিজেদের এমন সব পুনর্গঠনকারী স্পন্দন, অনুভবযোগ্য প্রতিধ্বনি, প্রত্যুৎপত্তি ও পুনরাবর্তী প্রতিমূর্তি সৃজন করে যেগুলি ঐ সূক্ষ্মতর আকাশ গ্রহণ ক'রে ধারণ করে রাখে।

এতেই দূরদর্শন, দূরশ্রবণ প্রভৃতি ঘটনাগুলির অধিকাংশের ব্যাখ্যা মেলে; কারণ এই সব ঘটনার অর্থ এই যে, সচরাচর না হলেও, জাগ্রত.মানসিকতা কখনো এমন বিষয়ের সীমিত সূক্ষ্মচৈতন্য লাভ করে যাকে বলা যায় সূক্ষ্ম আকাশের প্রতিমূর্তি-স্মৃতি এবং যার দ্বারা শুধু যে অতীত ও বর্তমান বিষয়সকলের সঙ্কেত বোঝা যায় তা নয়, এমনকি ভবিষ্যতের বিষয়ের সঙ্কেতও বোঝা যায়; কারণ ভবিষ্যৎ বিষয়গুলি মনের উচ্চতর লোকের উপর জ্ঞান ও দর্শনের নিকট ইতিপূর্বেই সংসিদ্ধ হয়ে থাকে এবং তাদের প্রতিমূর্তি প্রতিফলিত হতে পারে বর্তমানকালে মনের উপর। কিন্তু এই যে সব বিষয়গুলি জাগ্রত মানসিকতার কাছে অসাধারণ, দুষ্কর এবং হয় কোন বিশেষ সামর্থ্য অর্জনের দ্বারা অথবা শ্রমসাধ্য অভ্যাসের পরই অনুভব করা যায় সেগুলি সমাধি চেতনার স্বপ্নাবস্থার পক্ষে স্বাভাবিক, আর এর মধ্যে অধিচেতন মন মুক্ত থাকে। আর ঐ মন নানাবিধ লোকস্থিত বিষয়সমূহকেও জানতে পারে এবং তা যে শুধু এই সব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রতিমূর্তির দ্বারা জানে তা নয়, তা জানে একপ্রকার ভাবনাদৃষ্টি বা ভাবনাগ্রহণ ও সংস্কারের দ্বারা যা চেতনার সেই ঘটনার অনুরূপ যাকে আধুনিক "অতীন্দ্রিয়" বিজ্ঞানে বলা হয় ভাবনা-সংক্রমণ (Telepathy)। কিন্তু এখানেই স্বপ্নাবস্থার সামর্থ্যের শেষ হয় না। এ এক প্রকার মনোময় বা প্রাণময় সূক্ষ্ম শরীরে আমাদের নিজেদেরই এক প্রকার প্রক্ষেপ দ্বারা অন্যান্য লোক ও জগতের মধ্যে অথবা এই জগতেরই দূরবর্তী স্থানের ও দৃশ্যের মধ্যে বাস্তবিকই প্রবেশ ক'রে এক প্রকার কায়িক উপস্থিতির দ্বারা তাদের মধ্যে বিচরণ ক'রে নিয়ে আসতে পারে তাদের বিভিন্ন দৃশ্য ও সত্য ঘটনার প্রত্যক্ষ অনুভূতি। এমনকি এ ঐ একই উদ্দেশ্যে মনোময় বা প্রাণময় শরীরকে সত্যসত্যই প্রক্ষেপ ক'রে তাতে পর্যটন করতে পারে; তখন স্থূল দেহ পড়ে থাকে গভীরতম সমাধির মধ্যে, সে যতক্ষণ না ফিরে আসে ততক্ষণ এই দেহে প্রাণের কোন চিহ্ন থাকে না।

কিন্তু সমাধির স্বপ্নাবস্থার শ্রেষ্ঠ মূল্য এইসব বিপুল পরিমাণের বাহ্য বিষয়ে নয়, এর শ্রেষ্ঠ মূল্য তার সেই সামর্থ্যে যার দ্বারা ভাবনা, ভাবাবেগ, সঙ্কল্পের পরতর ক্ষেত্র ও সামর্থ্যগুলি সহজেই মুক্ত করা যায় আর এই সব পরতর বিষয় দ্বারাই অন্তঃপুরুষের

উচ্চতা, ক্রিয়াক্ষেত্র ও আত্ম-প্রভুত্ব বৃদ্ধি পায়। বিশেষতঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের বিভ্রান্তিকারী আকর্ষণ থেকে সরে এসে এ একাগ্রতাপূর্ণ আত্ম-একান্ততার সুষ্ঠু সামর্থ্যে স্বাধীন যুক্তি, ভাবনা, বিবেকের দ্বারা অথবা এক উত্তরোত্তর গভীর দর্শন ও অভিন্নতার দ্বারা আরো অন্তরঙ্গভাবে, আরো চূড়ান্তভাবে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে যাতে সে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় ভগবানের মধ্যে, পরমাত্মার মধ্যে, বিশ্বাতীত সত্যের মধ্যে যেমন তাঁর সব তত্ত্ব ও সামর্থ্য ও অভিব্যক্তির বিভাবে, আবার তেমন তাঁর পরতম মূল সৎ-স্বরূপে। অথবা এ নিবিষ্ট আন্তর হর্ষ ও ভাবাবেগের দ্বারা, যেন অন্তঃপুরুষের রুদ্ধ ও নিভৃত প্রকোষ্ঠে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে দিব্য প্রেমাস্পদের সঙ্গে, সকল দিব্যসুখ, উল্লাস ও আনন্দের অধিপতির সঙ্গে মিলনের রসাস্বাদনের জন্য।

পূর্ণযোগের পক্ষে সমাধির এই পদ্ধতির যে অসুবিধা আছে বলে মনে হয় তা এই যে যখন সমাধির অবসান হয় তখন সূত্র ছিন্ন হয় আর অন্তঃপুরুষ ফিরে আসে বাহ্য জীবনের বিক্ষেপ ও অপূর্ণতার মধ্যে, তবে এই সব গভীরতর অনুভূতির সাধারণ স্মৃতির দ্বারা বাহ্যজীবনের উপর যে উন্নতিবিধায়ক ফল আসা সম্ভব শুধু তা-ই থাকে। কিন্তু এই ব্যবধান, এই ছেদ অনিবার্য নয়। প্রথমতঃ জাগ্রত মনের কাছে সমাধি অবস্থার অনুভূতিগুলি যে শূন্য মনে হয় তার কারণ শুধু এই যে চৈত্যপুরুষ তখনো এসবে অনভ্যস্ত; যতই এ সমাধির অধীশ্বর হয় ততই এ বিস্মৃতির কোন ব্যবধান বিনা-ই আন্তর জাগরণ থেকে যেতে সক্ষম হয় বাহ্য জাগরণে। দ্বিতীয়তঃ একবার এটি করা হলে আন্তর অবস্থার মধ্যে যা পাওয়া যায় তাকে জাগ্রত চেতনার দ্বারা অর্জন ক'রে জাগ্রত জীবনের স্বাভাবিক অনুভূতি, সামর্থ্য, মানসিক স্থিতিতে পরিণত করা আরো সহজ হয়। যে সূক্ষ্ম মন সাধারণতঃ অন্নময় পুরুষের জিদের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে তা এমনকি জাগ্রত অবস্থাতেও শক্তিশালী হয়ে ওঠে যতক্ষণ না প্রসারশীল মানব ঐ জাগ্রত অবস্থাতেও তার স্থূল শরীরের মতো তার সব বিভিন্ন সূক্ষ্ম শরীরেও বাস করতে সক্ষম হয়, আর সক্ষম হয় তাদের কথা জানতে, তাদের মধ্যে থাকতে, তাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, শক্তি ও সামর্থ্য ব্যবহার করতে, অতি-ভৌতিক সত্য, চেতনা ও অনুভূতির অধিকারী হয়ে বাস করতে।

সুষুপ্তি-অবস্থা উত্তরণ করে সত্তার পরতর সামর্থ্যে ভাবনা ছাড়িয়ে শুদ্ধ চেতনার মধ্যে, ভাবাবেগ ছাড়িয়ে শুদ্ধ আনন্দের মধ্যে, সঙ্কল্প ছাড়িয়ে শুদ্ধ প্রভুত্বের মধ্যে; সচ্চিদানন্দের যে পরম অবস্থা থেকে জগতের সকল কার্যকলাপের উৎপত্তি তার সঙ্গে এই হল মিলনের দ্বার। কিন্তু এখানে আমাদের সাবধান হতে হবে যেন আমরা প্রতীক্ ভাষার প্রচ্ছন্ন গর্তে না পড়ি। এই সব পরতর অবস্থা বোঝাতে "স্বপ্ন" ও "সুষুপ্তি" পদের ব্যবহার শুধু রূপক মাত্র আর তার কারণ এই যে সাধারণ স্থূলমনের কাছে তার অপরিচিত সব লোক ঐরকম বোধ হয়। যে তৃতীয় পাদকে "সুষুপ্তি" বলা হয় তাতে যে আত্মা গভীর নিদ্রামগ্ন থাকেন তা নয়। বরং সুষুপ্তি-আত্মাকে বলা হয়েছে "প্রাজ্ঞ" অর্থাৎ প্রজ্ঞা ও বিদ্যার অধীশ্বর, বিজ্ঞানাত্মা, এবং "ঈশ্বর" অর্থাৎ সত্তার অধিপতি। স্থূল মনের কাছে এ হল নিদ্রা, আমাদের বিশালতর ও সূক্ষ্মতর চেতনার এ হল অধিকতর জাগরণ।

সাধারণ মনের কাছে যা কিছু তার সাধারণ অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত অথচ তার এলাকাভুক্ত সেসব মনে হয় স্বপ্ন; কিন্তু যে সীমারেখায় এটি এমন সব বিষয়ের কাছে পৌঁছয় যেগুলি তার এলাকার বাইরে সেখানে আর তখন সত্যকে এমনকি স্বপ্নের মধ্যেও দেখতে পায় না, সে আসে গভীর নিদ্রার অবস্থায় যেখানে সব কিছুই শূন্য ও অবোধ্য, কিছুই গ্রহণ করা হয় না। ব্যক্তিবিশেষের চেতনার সামর্থ্য অনুযায়ী, এর প্রবুদ্ধতা ও জাগরণের মাত্রা ও উচ্চতা অনুযায়ী এই সীমারেখার পরিবর্তন হয়। এই রেখাকে উত্তরোত্তর ঊর্ধ্বে নেওয়া যায় এবং শেষ পর্যন্ত এ এমনকি মন ছাড়িয়েও যেতে পারে। অবশ্য, সাধারণতঃ অতিমানসিক সব স্তরের উপর মানব মন এমন কি সমাধির আন্তর জাগরণ নিয়েও জাগ্রত থাকতে অক্ষম; তবে এই অক্ষমতা জয় করা সম্ভব। এই সব স্তরের উপর জাগ্রত থেকে পুরুষ বিজ্ঞানময় ভাবনার, বিজ্ঞানময় সঙ্কল্পের, বিজ্ঞানময় আনন্দের সব ক্ষেত্রের অধীশ্বর হয় আর যদি সে সমাধির মধ্যে তা করতে সমর্থ হয় তাহলে তার এই অনুভূতির স্মৃতি, ও অনুভূতির সামর্থ্যকে জাগ্রত অবস্থাতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। আমাদের কাছে আরো পরতর যে স্তর উন্মুক্ত থাকে অর্থাৎ আনন্দের স্তর, এমনকি সেখানেও প্রবুদ্ধ পুরুষ অনুরূপভাবে আনন্দ-আত্মাকে অধিগত করতে পারে তাঁর সমাহিত অবস্থা এবং তাঁর বিশ্বব্যাপ্তিত্ব, — এই উভয় বিভাবেই। কিন্তু তবু ঊর্ধ্বে আরো ক্ষেত্র থাকতে পারে যা থেকে কোন স্মৃতি আনা সম্ভব নয় — এক এই স্মৃতি ছাড়া যা বলে, "যে কোন ভাবেই হ'ক, বর্ণনা করা যায় না এমন ভাবে, আমি আনন্দে ছিলাম" — এ হল সেই অপরিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের আনন্দ যা ভাবনার দ্বারা প্রকাশের সকল যোগ্যতার অতীত অথবা রূপক বা লক্ষণের দ্বারা বর্ণনার অতীত। এমনকি সত্তার বোধও বিলুপ্ত হতে পারে এমন এক অনুভূতির মধ্যে যাতে প্রপঞ্চের কোন অর্থ থাকে না, আর মনে হয় যে বৌদ্ধদের প্রতীক যে নির্বাণ তা-ই একমাত্র অবিসংবাদী সত্য। জাগরণের সামর্থ্য যত ঊর্ধ্বেই যাক্ না কেন, মনে হয় তারও উজানে কোন স্তর আছে যাতে নিদ্রার, "সুষুপ্তির" রূপকটি তখনো প্রয়োজ্য হবে।

এই হল যৌগিক তন্ময়তার, সমাধির তত্ত্ব; এর জটিল ব্যাপারের মধ্যে আমাদের এখন প্রবেশ করার প্রয়োজন নেই। পূর্ণযোগে এর দুইটি উপকারিতার কথা বলাই যথেষ্ট হবে। একথা সত্য যে একটা সীমা পর্যন্ত যা নির্দিষ্ট করা বা চিহ্নিত করা দুরূহ সমাধি থেকে যা পাওয়া যায়, তার প্রায় সবটাই অর্জন করা যায় সমাধি অবলম্বন না করেও। কিন্তু তবু আধ্যাত্মিক ও চৈত্যিক অনুভূতির এমন কতকগুলি উচ্চ শিখর আছে যেগুলি সম্বন্ধে প্রতিবোধাত্মক অনুভূতির পরিবর্তে প্রত্যক্ষ অনুভূতি গভীর ও সমগ্রভাবে লাভ করার একমাত্র উপায় হল যৌগিক সমাধি। আর এমনকি যা সব অন্যভাবে অর্জন করা সম্ভব, সেসবেরও জন্য সমাধি এক সুলভ উপায় ও এক সুবিধাকর বিষয়, আর যেসব লোকে আমরা উন্নত আধ্যাত্মিক অনুভূতি অন্বেষণ করি সেগুলি যত বেশী উচ্চ ও দুষ্প্রাপ্য হয়, এটি অনিবার্য না হলেও তত বেশী আমাদের উপকারে আসে। একবার

সেখানে এটি পাওয়া গেলে, একে যতবেশী সম্ভব আনা দরকার জাগ্রত চেতনার মধ্যে। কারণ যে যোগের মধ্যে সকল জীবন সম্পূর্ণ ও অকুণ্ঠভাবে অন্তর্ভুক্ত তাতে সমাধির পূর্ণ উপকারিতা পাওয়া যায় কেবল তখনই যখন মানুষের মধ্যে দেহধারী পুরুষের অখণ্ড জাগরণের জন্য সমাধিলব্ধ বিষয়গুলিকে করা যায় স্বাভাবিক সম্পদ ও অনুভূতি।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

হঠযোগ

যোগের যেমন ভিন্ন ভিন্ন অনেক পথ আছে, সমাধিলাভের পথও প্রায় তেমন সংখ্যকই ভিন্ন ভিন্ন। বস্তুতঃ, এতে এত বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয় — শুধু যে পরতম চেতনালাভের এক উৎকৃষ্ট সাধন হিসেবে তা নয়, আবার এই হিসেবেও যে এ হল সেই পরতম চেতনারই স্বকীয় অবস্থা ও পাদ একমাত্র যার মধ্যে আমাদের দেহ থাকাকালীন এই পরতম চেতনাকে সম্পূর্ণ অধিগত ও উপভোগ করা সম্ভব — যে কতকগুলি যোগসাধন পন্থাকে দেখায় যেন এরা শুধু সমাধিলাভের উপায় মাত্র। সকল যোগের স্বরূপই হল পরমের সঙ্গে ঐক্যের জন্য প্রয়াস ও তার প্রাপ্তি — পরমের সত্তার সঙ্গে ঐক্য, পরমের চেতনার সঙ্গে ঐক্য, পরমের আনন্দের সঙ্গে ঐক্য, — অথবা যদি আমরা একান্ত ঐক্যের ভাবনা প্রত্যাখ্যান করি, তাহলে যোগের স্বরূপের হল অন্ততঃ একপ্রকার মিলনের প্রয়াস ও তার প্রাপ্তি — যদিও এই মিলনের অর্থ শুধু এই যে পুরুষ বাস করে ভগবানের সঙ্গে সত্তার একই পাদে ও পরিধির মধ্যে, "সালোক্য" অথবা একপ্রকার অবিচ্ছেদ্য সান্নিধ্যে "সামীপ্য"। এটি লাভ করার একমাত্র উপায় হল আমাদের সাধারণ মানসিকতার আয়ত্তাধীন চেতনার যে স্তর ও তীব্রতা তা অপেক্ষা চেতনার আরো উচ্চ স্তরে ও তীব্রতায় উত্তরণ করা। আমরা দেখেছি যে সমাধিই এইরকম এক উচ্চতর স্তর ও মহত্তর তীব্রতার স্বাভাবিক স্থিতি। স্বভাবতঃই জ্ঞানযোগে এর গুরুত্ব অনেক বেশী কারণ এই যোগের পদ্ধতি ও উদ্দেশ্যের তত্ত্বই হল মানসিক চেতনাকে এমন এক স্বচ্ছতায় ও সমাহিত সামর্থ্যে উন্নীত করা যার দ্বারা এ প্রকৃত সত্তাকে জানতে, তার মধ্যে বিলীন হতে এবং তার সঙ্গে অভিন্ন হতে সক্ষম হয়। কিন্তু দুটি বড় যোগপন্থায় এদের গুরুত্ব এমনকি বেশী। এই যে দুটি পন্থা, — রাজযোগ ও হঠযোগ — এদের কথাই আমরা এখন আলোচনা করব; কারণ জ্ঞানমার্গের পদ্ধতি ও এদের পদ্ধতির মধ্যে বিরাট প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও, এরা যে জ্ঞানযোগের অনুরূপ তার চূড়ান্ত প্রমাণ এই যে তাদের মূল তত্ত্ব এই একই সমাধি। তবে তাদের বিভিন্ন ক্রমের পশ্চাতের মূল ভাব সম্বন্ধে প্রসঙ্গতঃ আলোচনা ছাড়া আর বেশী কিছু করা আমাদের প্রয়োজন নেই; কারণ সমন্বয়ী ও পূর্ণযোগে তাদের গুরুত্ব গৌণ, অবশ্য তাদের সব লক্ষ্য পূর্ণযোগের অন্তর্গত করা চাই, কিন্তু তাদের সব পদ্ধতি হয় পুরোপুরি বাদ দেওয়া যায়, নয় তাদের প্রয়োগ করা যায় শুধু প্রাথমিক বা প্রাসঙ্গিক সহায়তার জন্য।

হঠযোগ এক শক্তিশালী কিন্তু দুরূহ ও কষ্টকর প্রণালী। এর ক্রিয়ার তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে এই তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যে দেহ ও অন্তঃপুরুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান। বন্ধন ও মোক্ষ, পশুসুলভ দুর্বলতা ও দিব্য সামর্থ্য, মন ও অন্তঃপুরুষের তমসাচ্ছন্নতা আর

তাদের ভাস্বরতা, দুঃখ ও সীমার বশ্যতা আর আত্ম-প্রভুত্ব, মৃত্যু ও অমরত্ব — এই সব দ্বন্দ্বের চাবিকাঠি হল দেহ, তাদের রহস্য হল দেহ। হঠযোগীর কাছে দেহ শুধু এক জীবন্ত জড়ের স্তূপ নয়, এ হল আধ্যাত্মিক সত্তা ও অন্নময় সত্তার মধ্যে এক রহস্যপূর্ণ সেতু; এমনকি হঠযোগসাধনার এক কৌশলী ব্যাখ্যাতাকে বলতে দেখা গেছে যে বেদান্তের প্রতীক "ওম্" হল রহস্যময় মানবশরীরের এক সঙ্কেত। অবশ্য যদিও হঠযোগী সর্বদাই স্থূল শরীরের কথাই বলে এবং একেই তার সব বিভিন্ন অভ্যাসের ভিত্তি করে, তবু সে একে শারীরসংস্থানবিৎ বা শারীর-ক্রিয়াবিদ্বানের দৃষ্টিতে দেখে না, বরং তাকে এমন ভাষায় বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে যাতে স্থূল শরীরের পশ্চাতে সূক্ষ্ম শরীরের দিকেই লক্ষ্য করা হয়। বস্তুতঃ, আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে হঠযোগীর সমগ্র লক্ষ্যকে এইভাবে সংক্ষেপে বলা যায় — যদিও হঠযোগী নিজে তা ঐভাবে বলতে চাইবে না — যে এ হল নির্দিষ্ট সব বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার দ্বারা স্থূল শরীর মধ্যস্থ অন্তঃপুরুষকে এমন সামর্থ্য, আলোক, শুদ্ধতা, স্বাধীনতা, আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিভিন্ন উত্তরোত্তর উচ্চ পর্যায় দেবার এক প্রয়াস যেগুলি অন্তঃপুরুষের কাছে স্বাভাবিক ভাবে উন্মুক্ত হ'ত যদি অন্তঃপুরুষ এখানে বাস করত সূক্ষ্ম শরীরের মধ্যে ও উন্নত কারণ শরীরের মধ্যে।

যারা মনে করে যে (প্রাকৃত) বিজ্ঞানের বিষয় শুধু জড় বিশ্বের বাহ্য ঘটনাবলী, তাদের পশ্চাতে যা সব রয়েছে সেসব নয়, তাদের কাছে হঠযোগের প্রক্রিয়াগুলিকে বৈজ্ঞানিক বলা অদ্ভুত মনে হবে; কিন্তু বিজ্ঞানের মতো হঠযোগের প্রক্রিয়াগুলিও বিভিন্ন বিধান ও তাদের কর্মধারার সুনিশ্চিত অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং সেসবকে সঠিকভাবে অনুশীলন করা হলে তা থেকে সুপরীক্ষিত সব ফলও পাওয়া যায়। বস্তুতঃ হঠযোগ, তার নিজের ধারায় এক জ্ঞান শাস্ত্র; তবে আসল জ্ঞানযোগ হল আধ্যাত্মিক অনুশীলনে প্রয়োগ করা হয়েছে এমন সত্তাবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান, এক মনোবিজ্ঞানমূলক শাস্ত্র, হঠযোগ হল সত্তার বিজ্ঞান, এক মনোভৌতিক শাস্ত্র। দুটিতেই স্থূল, চৈত্য ও আধ্যাত্মিক ফল পাওয়া যায়; কিন্তু তারা একই সত্যের দুই বিভিন্ন মেরুতে অবস্থিত হওয়ায়, একটির কাছে মনোভৌতিক ফলগুলির মূল্য নগণ্য, তার কাছে একমাত্র বিশুদ্ধ চৈত্য ও আধ্যাত্মিক ফলই আসল বিষয়, আর এমনকি বিশুদ্ধ চৈত্য ফলও আধ্যাত্মিক ফলের সহায়ক মাত্র, সমগ্র মনোযোগ সমাবিষ্ট থাকে এই আধ্যাত্মিক ফলে; অপরটিতে শারীরিক ফলের গুরুত্ব অতি বৃহৎ, সূক্ষ্ম মানসিক ফলের মূল্য প্রচুর, আর আধ্যাত্মিক ফলই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সার্থক পরিণতি, তবে দেহের দিকেই এত বেশী ও নিবিষ্ট মনোযোগ দিতে হয় যে আধ্যাত্মিক পরিণতি দীর্ঘদিন ধরে স্থগিত রাখা এক দূরবর্তী বিষয় বলে গণ্য হয়। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে দুটিরই এক লক্ষ্যে উপনীত হওয়া নিশ্চিত। পরতমে যাবার জন্য হঠযোগও এক পথ, যদিও যেতে হবে এক দীর্ঘ, দুরূহ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ সাধনার দ্বারা, "দুঃখম্ আপ্তুম্"।

সকল যোগসাধনারই পদ্ধতিতে অনুশীলনের তিনটি নীতি বর্তমান; প্রথম শুদ্ধীকরণ অর্থাৎ আমাদের শারীরিক, নৈতিক ও মানসিক সংস্থানের মধ্যে সত্তার শক্তির

মিশ্রিত ও অনিয়মিত ক্রিয়ার দ্বারা উৎপন্ন সকল বিচ্যুতি, বিশৃঙ্খলা, বাধার অপসারণ; দ্বিতীয়তঃ একাগ্রতা অর্থাৎ এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যসাধনের উদ্দেশ্যে আমাদের অন্তঃস্থ সত্তার ঐ শক্তিকে পূর্ণমাত্রায় প্রখর করা এবং একে নিজের আয়ত্তে এনে স্বনির্দিষ্ট পথে নিয়োগ করা; তৃতীয়তঃ মুক্তি অর্থাৎ এক মিথ্যা ও সীমিত লীলার মধ্যে ব্যষ্টিভাবাপন্ন ক্রিয়াশক্তির সঙ্কীর্ণ ও দুঃখময় যে সব গ্রন্থি আমাদের প্রকৃতির বর্তমান বিধান তা থেকে বিমুক্তি। আমাদের মুক্ত সত্তার যে উপভোগ পরতমের সঙ্গে আমাদের ঐক্য বা মিলন সাধন করে তা-ই চরম পরিণতি; যোগসাধনার উদ্দেশ্য হল এই। এই তিন অপরিহার্য সোপান এবং এরা যে সব উচ্চ, উন্মুক্ত এবং অনন্ত স্তরে আরোহণ করে সেই সব স্তর — এই সবকেই হঠযোগ তার সকল অনুশীলনের মধ্যে নজরে রাখে।

এর শারীরিক শিক্ষার দুটি প্রধান অঙ্গ হল আসন ও প্রাণায়াম, অন্যগুলি এদের সহায়ক মাত্র; আসনের অর্থ দেহকে নিশ্চলতার কতকগুলি বিশেষ ভঙ্গীতে অভ্যস্ত করা, আর প্রাণায়ামের অর্থ শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়ামের দ্বারা দেহমধ্যস্থ শক্তির প্রাণিক ধারার চালনা ও নিরোধ। স্থূল আধারই যন্ত্র; কিন্তু স্থূল আধারের দুই উপাদান — দেহ ও প্রাণ; দেহ হল আপতিক যন্ত্র ও ভিত্তি, আর প্রাণ অর্থাৎ প্রাণশক্তি হল সামর্থ্য ও আসল যন্ত্র। বর্তমানে এই দুই যন্ত্রই আমাদের প্রভু। আমরা দেহের অধীন, আমরা প্রাণশক্তির অধীন, যদিও আমরা অন্তঃপুরুষ, যদিও আমরা মনোময় পুরুষ, তবু আমরা অতীব সীমিত মাত্রায় তাদের প্রভু হিসেবে আদৌ দাঁড়াতে সক্ষম। এক নগণ্য ও সীমিত দৈহিক প্রকৃতির দ্বারা আমরা বদ্ধ, এবং ফলতঃ যে নগণ্য ও সীমিত প্রাণশক্তিকে দেহ সহ্য করতে সক্ষম অথবা যা এ কার্যে প্রয়োগ করতে সক্ষম শুধু তার দ্বারা আমরা বদ্ধ। উপরন্তু আমাদের মধ্যে এদের প্রত্যেকের ও উভয়ের ক্রিয়া শুধু যে সঙ্কীর্ণতম সব সীমার অধীন তা নয়, এ হল সততই অশুদ্ধতা দুষ্ট, আর যতবারই এই অশুদ্ধতা সংশোধন করা হয়, ততবারই এটি আবার ফিরে আসে; সেই সঙ্গে ঐ ক্রিয়া সকল প্রকার বিশৃঙ্খলার অধীন, যেগুলির মধ্যে কতকগুলি স্বাভাবিক, এক উগ্র অবস্থা, আমাদের সাধারণ স্থূল জীবনের অংশ, অন্যগুলি অস্বাভাবিক, এর বিভিন্ন ব্যাধি ও বিকলতা। এই সব নিয়েই হঠযোগকে কাজ করতে হবে; এই সবকেই তার জয় করা চাই; আর এটি সে করে প্রধানতঃ দুইটি পদ্ধতির সাহায্যে যেগুলি জটিল ও কষ্টকর, তবে তত্ত্বতঃ সরল ও কার্যকরী।

হঠযোগের আসন প্রণালীর মূলে দুটি গভীর ভাবনা আছে যাদের সঙ্গে বহু কার্যকরী আনুষঙ্গিক অর্থ জড়িত। প্রথমটি হল শারীরিক নিশ্চলতাজনিত নিয়ন্ত্রণ, দ্বিতীয়টি নিশ্চলতাজনিত সামর্থ্য। জ্ঞানযোগে মানসিক নিশ্চলতার সামর্থ্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ, হঠযোগে শারীরিক নিশ্চলতার সামর্থ্য অনুরূপ কারণে তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সত্তা ও প্রকৃতির গভীরতর সব সত্যে অনভ্যস্ত মনের কাছে এই দুটিই মনে হবে নিশ্চেষ্টতার নিস্তেজ নিষ্ক্রিয়তার জন্য অন্বেষণ। এর সম্পূর্ণ বিপরীতই সত্য; কারণ মনের বা দেহের যে যৌগিক নিষ্ক্রিয়তা তা এমন এক অবস্থা যাতে থাকে শক্তির বিপুলতম বৃদ্ধি, অধিকার ও ধারণ। আমাদের মনের স্বাভাবিক সক্রিয়তার অধিকাংশই এক

বিশৃঙ্খলাপূর্ণ অস্থিরতা, এ হল শক্তির অপচয় ও দ্রুত পরীক্ষামূলক ব্যয়ে পূর্ণ; এর মধ্যে সামান্য অংশমাত্র নেওয়া হয় আত্মনিয়ন্ত্রণকারী সঙ্কল্পের ক্রিয়াপ্রণালীর জন্য — তবে মনে রাখতে হবে, যাকে অপচয় বলা হয় তা এই দিক থেকে অপচয় হলেও বিশ্বপ্রকৃতির দিক থেকে অপচয় নয়; আমাদের কাছে যা অপচয় তাতে প্রকৃতির বিধানের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। আমাদের দেহের সক্রিয়তাও ঐরকম এক অস্থিরতা।

এই অস্থিরতা থেকে বোঝা যায় যে আমাদের দেহের মধ্যে যে সীমিত প্রাণশক্তি প্রবেশ করে বা উৎপন্ন হয় এমনকি সেটুকু পর্যন্ত ধারণ করতে আমাদের দেহ সততই অসমর্থ এবং তার ফলে এই প্রাণিক শক্তির এক সাধারণ ক্ষয় হয় আর পাওয়া যায় সুব্যবস্থিত ও সুপরিমিত সক্রিয়তার এক সম্পূর্ণ গৌণ অংশ। উপরন্তু এই সবের পরিণাম স্বরূপ, দেহের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে ক্রিয়ারত প্রাণশক্তিসমূহের গতিবৃত্তি ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আদানপ্রদান ও ভারসাম্যের ব্যাপারে এবং দেহের বাইরে থেকে যেসব শক্তি — তা অপরের হ'ক অথবা পরিবেশের মধ্যে নানাভাবে সক্রিয় সাধারণ প্রাণিক শক্তির হ'ক — দেহের উপর কাজ করে তাদের সঙ্গে দেহমধ্যস্থ শক্তিসমূহের আদানপ্রদানের ব্যাপারে সর্বদাই এমন এক অনিশ্চিত ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য থাকে যা যে কোন মুহূর্তে নষ্ট হওয়া সম্ভব। প্রতি বাধা, প্রতি ত্রুটি, প্রতি বাহুল্য, প্রতি আঘাত থেকেই উৎপন্ন হয় বিভিন্ন অশুদ্ধতা ও বিশৃঙ্খলা। প্রকৃতিকে নিজে নিজে কাজ করতে ছেড়ে দেওয়া হলে, সে নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই সবের ব্যবস্থা ভালই করে; তবে যে মুহূর্তে মানুষের প্রমাদী মন ও সঙ্কল্প প্রকৃতির বিভিন্ন রীতি ও তার বিভিন্ন প্রাণিক সহজসংস্কার ও বোধিতে হস্তক্ষেপ করে — বিশেষতঃ যখন তারা মিথ্যা বা কৃত্রিম রীতি সৃষ্টি করে তখন আরো বেশী অনিশ্চিত এক শৃঙ্খলা ও প্রায় নিত্য অব্যবস্থাই সত্তার সাধারণ অবস্থা হয়ে পড়ে। তথাপি এই হস্তক্ষেপ অনিবার্য, কারণ মানুষের জীবন শুধু তার অন্তঃস্থ প্রাণিক প্রকৃতির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নয়, তার জীবন আরো মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য যেগুলি প্রকৃতি তার প্রথম ভারসাম্যের ব্যাপারে চিন্তা করেনি আর যেগুলির সঙ্গে তার বিভিন্ন কর্মপ্রণালীকে মিল করতে হয় কষ্ট করে। সুতরাং এক মহত্তর স্থিতি বা ক্রিয়ার জন্য প্রথম আবশ্যক হল এই বিশৃঙ্খল অস্থিরতা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া, সক্রিয়তাকে শান্ত ক'রে নিয়ন্ত্রিত করা। হঠযোগীর কাজ হল দেহ ও প্রাণশক্তির স্থিতি ও ক্রিয়ার এক অস্বাভাবিক ভঙ্গী আনা, তবে এই অস্বাভাবিকতার লক্ষ্য আরো বেশী বিশৃঙ্খলা নয়, এর লক্ষ্য উৎকর্ষ ও আত্ম-কর্তৃত্ব।

আসনের নিশ্চলতার প্রথম উদ্দেশ্য হল দেহের উপর আরোপিত অস্থিরতা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া এবং তাকে বাধ্য করা যাতে দেহ প্রাণিক-শক্তিকে ক্ষয় ও অপচয় না ক'রে তা ধারণ ক'রে রাখে। আসন-অভ্যাসের যে অনুভূতি তা নিশ্চেষ্টতাজনিত শক্তির সমাপ্তি ও হ্রাস নয় বরং বেশী পরিমাণে শক্তির বৃদ্ধি, অন্তর্বর্ষণ ও চলাচল। অতিরিক্ত শক্তিকে কাজের দ্বারা বাইরে ব্যয় করাতে অভ্যস্ত দেহের পক্ষে এই বৃদ্ধি ও এই রক্ষিত আন্তর ক্রিয়া সহ্য করা প্রথমে কষ্টকর হয়, আর তার কষ্ট বোঝা যায় তার প্রচণ্ড কম্পন

থেকে; পরে দেহ নিজেকে অভ্যস্ত করে নেয় এবং যখন আসনটি আয়ত্ত হয় তখন এ দেখে যে আসনের ভঙ্গীটি গোড়াতে যতই তার কাছে দুরূহ বা অস্বাভাবিক হ'ক না কেন, শেষে এটি বসার বা শোয়ার সবচেয়ে আরামপ্রদ ভঙ্গীর মতোই আরামপ্রদ। পরে যত পরিমাণেরই প্রাণিক শক্তি তার উপর প্রয়োগ করা হ'ক না কেন, এ উত্তরোত্তর তা ধারণ করতে সমর্থ হয়; তখন আর তার এই শক্তিকে কাজের মধ্যে বাইরে নিক্ষেপ করার দরকার হয় না, আর এই বৃদ্ধির পরিমাণ এত বিশাল যে মনে হয় যেন এর সীমা নেই; ফলে সিদ্ধ হঠযোগীর দেহ সহিষ্ণুতা, বল, শক্তির অক্লান্ত প্রয়োগের এমন সব অদ্ভুত ক্রিয়ায় সমর্থ হয় যেগুলি মানুষের স্বাভাবিক উৎকৃষ্ট দৈহিক শক্তিও করতে অক্ষম। কারণ তার দেহ এই শক্তিকে শুধু যে ধারণ ও রক্ষা করতে সক্ষম হয় তা নয়, এ দেহ-সংস্থানের উপর তার সম্পূর্ণ অধিকার ও এর মধ্য দিয়ে তার আরো সম্পূর্ণ ক্রিয়া সহ্য করতেও সক্ষম হয়। যে দেহ শান্ত, নিষ্ক্রিয় এবং ধারকসামর্থ্য ও ধৃতসামর্থ্যের অস্থির ভারসাম্যমুক্ত তাকে প্রাণশক্তি এইভাবে অধিকার ক'রে, তার মধ্যে এক শক্তিশালী একীভূত গতিবৃত্তিতে কাজ ক'রে আরো ক্ষমতাশালী ও কার্যকরী হয়ে ওঠে। বস্তুতঃ মনে হয় যেন দেহ প্রাণশক্তিকে ধারণ, অধিকার বা ব্যবহার করে না, বরং যেন প্রাণশক্তিই দেহকে ধারণ, অধিকার ও ব্যবহার করে — ঠিক যেমন মনে হয় যে অস্থির সক্রিয় মনের ভিতর যা কিছু আধ্যাত্মিক শক্তি আসে মন তাকে আয়ত্ত ক'রে অনিয়মিত ও অপূর্ণভাবে ব্যবহার করে অথচ মন শান্ত হলে, আধ্যাত্মিক শক্তিই তাকে ধরে, আয়ত্ত ও ব্যবহার করে।

দেহ এইভাবে নিজ থেকে মুক্ত হয়ে, নিজেরই অনেক বিশৃঙ্খলা ও অনাচার থেকে শুদ্ধ হয়ে অংশতঃ আসনের দ্বারা এবং সম্পূর্ণভাবে আসন ও প্রাণায়ামের যুক্ত ক্রিয়ার দ্বারা এক সিদ্ধ যন্ত্র হয়ে ওঠে। তার শীঘ্রই ক্লান্ত হবার প্রবণতা দূর হয়; স্বাস্থ্য-সামর্থ্য বৃদ্ধি পায় প্রভূত পরিমাণে এবং ক্ষয়, জরা ও মৃত্যুর প্রবণতাও স্তব্ধ হয়। এমনকি সাধারণ আয়ুসীমার ঊর্ধ্বে পরিণত বয়সেও হঠযোগী দেহের মধ্যে প্রাণের অক্ষুণ্ণ বীর্য, স্বাস্থ্য ও যৌবন রক্ষা করে; এমনকি শারীরিক যৌবনের বাহ্য রূপও এ আরো বেশী দিন রক্ষা করে। দীর্ঘজীবন লাভের সামর্থ্য তার বৃদ্ধি পায়, আর তার দৃষ্টিকোণ থেকে, দেহ যখন এক যন্ত্র তখন একে দীর্ঘ দিন অক্ষুণ্ণ ও ততদিন পর্যন্ত হানিকর দোষ থেকে মুক্ত রাখার গুরুত্ব কম নয়। এটাও উল্লেখযোগ্য যে হঠযোগে নানা প্রকারের আসন আছে, তাদের সংখ্যাও প্রচুর, মোট সংখ্যা আশীর ঊর্ধ্বে হবে আর তাদের মধ্যে কতকগুলি অত্যন্ত জটিল ও দুঃসাধ্য। আসনগুলি নানাবিধ হওয়ার সুবিধা হল পূর্বে যেসব ফলের কথা বলা হয়েছে সেগুলির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় আর দেহের ব্যবহারে আরো বেশী স্বাধীনতা ও নমনীয়তা পাওয়া যায়; তাছাড়া আরো যা সুবিধা হয় তা এই যে এতে দেহমধ্যস্থ শারীরিক শক্তি ও এর সঙ্গে সম্পৃক্ত পৃথ্বীশক্তি — এ দু'য়ের সম্পর্কের পরিবর্তন হয়। তার একটি ফল এই যে পৃথ্বীশক্তির গুরুভার লঘু হয়; তার প্রথম নিদর্শন, ক্লান্তি জয়, আর শেষ নিদর্শন — "উত্থাপনের" ঘটনা, অর্থাৎ আংশিক উত্থান।

স্থূল শরীর সূক্ষ্ম শরীরের কিছু স্বভাব পেতে এবং প্রাণশক্তির সঙ্গে এর বিভিন্ন সম্পর্কেরও কিছু অধিগত করতে শুরু করে। তাই এমন এক মহত্তর শক্তিতে পরিণত হয় যা আরো প্রবলভাবে অনুভব করা যায় অথচ যা আরো লঘু, স্বচ্ছন্দ ও সূক্ষ্ম ভৌতিক ক্রিয়া সম্পাদনে সমর্থ হয়; এইসব শক্তিরই চরম পরিণতি হল হঠযোগের বিভিন্ন "সিদ্ধি" অর্থাৎ "গরিমা", "মহিমা", "অণিমা" ও "লঘিমা"র অসামান্য সামর্থ্য। তাছাড়া, হৃৎ-স্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি স্থূল ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন ক্রিয়া ও প্রবৃত্তির উপর প্রাণ আর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে না। শেষ পর্যন্ত এই সবকে সাময়িকভাবে রুদ্ধ করা সম্ভব, আর তাতে প্রাণের সমাপ্তি বা ক্ষতি হয় না।

কিন্তু আসন ও প্রাণায়ামের সুষ্ঠু সম্পাদনের এই যে সব ফল তা শুধু এক মূলগত শারীরিক সামর্থ্য ও স্বাধীনতা। হঠযোগের মহত্তর ব্যবহার আরো ঘনিষ্ঠভাবে নির্ভর করে প্রাণায়ামের উপর। আসনের বেশী কাজ হল সরাসরিভাবে শারীরিক সমগ্রতার অধিকতর জড়ীয় অংশের সঙ্গে, যদিও এই কাজেও তার অপরটির সাহায্যের প্রয়োজন হয়; প্রাণায়াম শুরু করে আসন-লব্ধ শারীরিক নিশ্চলতা ও আত্ম-ধারণ থেকে আর তার বেশী কাজ হল সরাসরিভাবে সূক্ষ্মতর প্রাণিক অংশ, নাড়ীতন্ত্রের (স্নায়ুমণ্ডলীর) সঙ্গে। এই কাজ করা হয় শ্বাস-প্রশ্বাসের নানাবিধ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা; নিঃশ্বাসের (রেচক) ও প্রশ্বাসের (পূরক) সমতা থেকে আরম্ভ ক'রে উভয়েরই অতীব ভিন্ন ভিন্ন ছন্দোময় নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত এ বিস্তৃত আর এসবের মাঝে থাকে শ্বাসের অন্তর্ধারণ (কুম্ভক)। এই যে শ্বাসের অন্তর্ধারণ যা প্রথমে করা হয় কিছু কষ্ট ক'রে তা শেষ পর্যন্ত তার সতত স্বাভাবিক ক্রিয়া শ্বাস নেওয়া ও ফেলার মতোই সহজ হয় ও স্বাভাবিক মনে হয়। কিন্তু প্রাণায়ামের প্রাথমিক উদ্দেশ্যগুলি হল নাড়ীতন্ত্রকে শুদ্ধ করা, সকল নাড়ীর (স্নায়ুর) মধ্য দিয়ে প্রাণশক্তিকে সঞ্চালন করা যেন কোন বাধা, বিশৃঙ্খলা বা অনাচার না ঘটে এবং এর ব্যাপ্রিয়ার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখা, যাতে দেহবাসী পুরুষের মন ও সঙ্কল্প আর পূর্বের মতো দেহ বা প্রাণ বা তাদের সম্মিলিত সব সঙ্কীর্ণতার অধীন না হয়। নাড়ীতন্ত্রের এক শুদ্ধীকৃত ও নির্বাধ অবস্থা আনায় শ্বাস-প্রশ্বাসের এইসব ব্যায়ামের সামর্থ্য আমাদের শারীর বিদ্যার এক পরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত তথ্য। দেহ-সংস্থানকে নির্মল করার বিষয়েও এ হল এক সহায় তবে প্রথমে এ তার সকল প্রণালী ও দ্বারের উপর সম্পূর্ণ কার্যকরী হয় না; সেজন্য হঠযোগী তাদের সব সঞ্চিত মলিনতাকে নিয়মিতভাবে অপসারণ করার জন্য অতিরিক্ত স্থূল প্রক্রিয়া অবলম্বন করে। এইসব ব্যায়াম আসনের সঙ্গে — এমনকি বিশেষ বিশেষ আসন বিশেষ বিশেষ ব্যাধি নাশের পক্ষে কার্যকরী হয় — ও প্রাণায়ামের সঙ্গে যুক্ত হলে, দেহের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু প্রধান লাভ এই যে এই শুদ্ধি করা হলে, প্রাণশক্তিকে যে কোন স্থানে, দেহের যে কোন অংশে, এবং যে কোন প্রকারেই অথবা তার গতির যে কোন ছন্দেই চালনা করা সম্ভব হবে।

ফুসফুসের ভিতরে ও বাইরে শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজটিই আমাদের শরীর সংস্থানের মধ্যে প্রাণের, জীবনবায়ুর একমাত্র সর্বাপেক্ষা ইন্দ্রিয়গোচর, বাহ্য ও ধারণযোগ্য

গতিবৃত্তি। যোগবিদ্যানুযায়ী প্রাণের গতিবৃত্তি পাঁচ প্রকারের; এ সমগ্র নাড়ীতন্ত্রকে ও সমগ্র জড়দেহকে ব্যেপে থাকে এবং তার সকল প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করে। হঠযোগী শ্বাসপ্রশ্বাসের বাহ্য ক্রিয়াটি আয়ত্ত করে, যেন এটি একপ্রকার চাবিকাঠি যার সাহায্যে প্রাণের এইসব পাঁচটি সামর্থ্যের নিয়ন্ত্রণ তার কাছে সুলভ হয়। সে তাদের সব আন্তর ক্রিয়ার কথা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ভাবে জানতে পারে, এবং মানসিকভাবে সচেতন হয় তার সমগ্র শারীরিক জীবন ও ক্রিয়া সম্বন্ধে। সে তার দেহসংস্থানের সকল নাড়ীর অর্থাৎ স্নায়ুপ্রণালীর মধ্য দিয়ে প্রাণ চালনা করতে সক্ষম হয়। নাড়ীতন্ত্রের ষট্‌চক্রের মধ্যে অর্থাৎ স্নায়ুগ্রন্থিময় কেন্দ্রের মধ্যে প্রাণের যে ক্রিয়া তা-ও সে জানতে পারে এবং প্রত্যেকটির মধ্যে ক্রিয়াকে সে তার বর্তমান সীমিত, অভ্যাসগত ও যান্ত্রিক কর্মপ্রণালী ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বে উন্মুক্ত করতে সক্ষম হয়। সংক্ষেপে বলা যায় সে দেহমধ্যস্থ প্রাণের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করে — যেমন এর স্থূলতম ভৌতিক বিষয়গুলিতে, তেমন এর সূক্ষ্মতম নাড়ীবিষয়ে এমনকি তাতেও যা বর্তমানে ইচ্ছাপ্রণোদিত নয় এবং আমাদের সাক্ষীস্বরূপ চেতনা ও সঙ্কল্পের নাগালের বাইরে। এইভাবে দেহ ও প্রাণের শুদ্ধীকরণের উপর অবলম্বন করে তাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং স্বচ্ছন্দ ও কার্যকরী ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত হয়, আর এই হল হঠযোগের উচ্চতর লক্ষ্যসমূহের ভিত্তি স্বরূপ।

কিন্তু তবু এই সবই এক ভিত্তি মাত্র — অর্থাৎ হঠযোগের দ্বারা ব্যবহৃত দুই সাধনের বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী ভৌতিক অবস্থা। বিভিন্ন সূক্ষ্ম মানসিক ও আধ্যাত্মিক ফলের যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির উদ্দেশে এইসব প্রয়োগ করা সম্ভব তা এখনো বাকী আছে। দেহ ও মন ও চিৎপুরুষের মধ্যে এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের মধ্যে যে সংযোগ হঠযোগপ্রণালীর ভিত্তি তারই উপর এ নির্ভর করে। এইস্থানে এ রাজযোগের সঙ্গে একই পথে আসে, আর এক বিশেষ বিন্দুতে উপনীত হলে একটি থেকে অপরটিতে সংক্রমণ সম্ভব হয়।

অষ্টবিংশ অধ্যায়

রাজযোগ

হঠযোগীর জন্য যোগের সকল বদ্ধ দুয়ারের চাবিকাঠি যেমন দেহ ও প্রাণ, তেমন রাজযোগে চাবিকাঠি হল মন। কিন্তু যেহেতু দু'য়েতেই স্বীকার করা হয় যে দেহ ও প্রাণের উপর মন নির্ভরশীল — হঠযোগে বলা হয় যে মনের এই নির্ভরতা সম্পূর্ণ, আর প্রচলিত রাজযোগে বলা হয় যে এ হল আংশিক — সেহেতু এই উভয়শাস্ত্রেই আসন ও প্রাণায়ামের অনুশীলন অন্তর্গত; তবে একটিতে এই দুই প্রক্রিয়াই সমগ্র ক্ষেত্র অধিকার করে, আর অপরটিতে প্রতিটি একটি সরল প্রণালীতে নিবদ্ধ থাকে, এবং তাদের যুক্তভাবে ব্যবহার করা হয় মাত্র এক সীমিত ও মধ্যবর্তী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। আমরা সহজেই দেখতে পারি যে যদিও মানব তার সত্তায় এক দেহধারী পুরুষ, তবু সে তার পার্থিব প্রকৃতিতে কত বেশী পরিমাণে অন্নময় ও প্রাণময় সত্তা এবং কেমন করে, অন্ততঃ প্রথম দৃষ্টিতে, তার সব মানসিক বৃত্তি প্রায় সম্পূর্ণভাবে তার দেহ ও নাড়ীতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল। এমনকি কিছু সময় আধুনিক প্রাকৃত বিজ্ঞান ও মনোবিদ্যার মত ছিল যে এই নির্ভরতা বাস্তবিকই এক তাদাত্ম্য; তারা এই কথা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছে যে মন বা পুরুষ বলে পৃথক সত্তা কিছু নেই এবং সকল মানসিক বৃত্তিই বস্তুতঃ বিভিন্ন শারীরিক প্রবৃত্তি। এই অযৌক্তিক প্রকল্পের কথা বাদ দিলেও, এমনকি অন্যদিকেও এই নির্ভরতাকে এত বেশী বড় করা হয়েছে যে মনে করা হয় যে এ পুরোপুরি এক অপরিহার্য সর্ত আর মনের দ্বারা প্রাণিক ও দৈহিক প্রবৃত্তিসমূহের নিয়ন্ত্রণের বা এইসব থেকে মনের নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার সামর্থ্যের কথাকে বহুদিন এক প্রমাদ বা মনের এক রুগ্ন অবস্থা বা মতিভ্রম বলে গণ্য করা হয়েছে। সুতরাং মনের ঐ নির্ভরতাকে অখণ্ডনীয় বলেই স্বীকার করা হয়, আর প্রাকৃত বিজ্ঞান এই নির্ভরতার আসল চাবিকাঠি পায়ও না, পাবার চেষ্টাও করে না; এবং সেজন্য আমাদের জন্য বিমুক্তি ও কর্তৃত্বের কোন রহস্য আবিষ্কারেও অক্ষম।

যোগের মনোভৌতিক বিজ্ঞান এই ভুল করে না। এ চাবিকাঠিটি পাবার চেষ্টা করে, তাকে খুঁজে পায় এবং বিমুক্তি সাধনে সক্ষম হয়; কারণ এ পশ্চাতে সেই সূক্ষ্ম মানসিক বা মানসিক দেহের কথা বিবেচনা করে যার একপ্রকার স্থূল আকারের প্রতিকৃতি হল ভৌতিক শরীর এবং তার দ্বারা ভৌতিক শরীরের এমন সব বিভিন্ন রহস্যের জ্ঞানলাভে সমর্থ হয় যেগুলি কেবলমাত্র ভৌতিক অনুসন্ধানে জানা যায় না। এই যে মানসিক বা সূক্ষ্ম মানসিক দেহকে অন্তঃপুরুষ এমন কি মৃত্যুর পরেও রাখে তার মধ্যে তার নিজের সূক্ষ্ম প্রকৃতি ও ধাতুর অনুরূপ এক সূক্ষ্ম প্রাণিক শক্তিও আছে — কারণ যেখানেই কোন প্রকারের প্রাণ আছে সেখানেই তার কার্যোপযোগী প্রাণিক ক্রিয়া-শক্তি ও ধাতু থাকতে বাধ্য — আর এই সূক্ষ্ম প্রাণিক শক্তিকে চালনা করা হয় 'নাড়ী' নামক বহুসংখ্যক

প্রণালীর এক সংস্থানের মধ্য দিয়ে — এই হল চৈত্য শরীরের সূক্ষ্ম স্নায়বিক গঠন; এই নাড়ীগুলিকে ছয়টি (অথবা প্রকৃতই সাতটি) কেন্দ্রে একত্র করা হয়; এদের পারিভাষিক সংজ্ঞা পদ্ম বা চক্র; এর এক আরোহী ক্রমপর্যায়ে ঊর্ধ্বে শিখরদেশে ওঠে যেখানে আছে সহস্রদল পদ্ম যা থেকে এই সব মানসিক ও প্রাণিক ক্রিয়াশক্তি প্রবাহিত হয়। এই সব পদ্মের প্রতিটিই তার নিজের বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক সামর্থ্য, ক্রিয়াশক্তি ও কার্যাবলীর পর্যায়ের কেন্দ্র ও কোষাগার — এক একটি পর্য্যায় আমাদের মনস্তাত্ত্বিক অস্তিত্বের এক একটি লোকের অনুরূপ — আর বাইরে নিঃসৃত হয়ে তারা বিভিন্ন নাড়ীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় প্রাণিক শক্তিসমূহের স্রোতের সঙ্গে মিলিত হয়ে ফিরে আসে।

চৈত্যশরীরের এই ব্যবস্থার অনুরূপ ব্যবস্থা ভৌতিক শরীরে আছে — এর মেরুস্তম্ভটি যেন একটি দণ্ড এবং নাড়ীগ্রন্থির কেন্দ্রগুলি যেন বিভিন্ন চক্র; এই চক্রগুলির নিম্নতমটি স্তম্ভের তলদেশে সংযুক্ত এবং সেখান থেকে চক্রগুলি উঠেছে মস্তিষ্ক পর্যন্ত আর শেষ হয় তাদের শিখর "ব্রহ্মরন্ধ্রে" যা করোটির শীর্ষে অবস্থিত। কিন্তু দেহপ্রধান মানবের মাঝে এই চক্র বা পদ্মগুলি বন্ধ থাকে অথবা শুধু আংশিকভাবে খোলা থাকে; তার ফল এই যে শুধু সেইটুকু সামর্থ্য এবং শুধু সেইটুকু পরিমাণে তার মধ্যে সক্রিয় যা তার সাধারণ স্থূল জীবনের পক্ষে পর্যাপ্ত, আর মন ও অন্তঃপুরুষ শুধু সেই পরিমাণে কাজ করে যা ঐ জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে সমতাপন্ন হবে। যান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, দেহধারী পুরুষ যে কেন দৈহিক ও স্নায়বিক জীবনের উপর এত নির্ভরশীল মনে হয় তার আসল কারণ হল এই — যদিও এই নির্ভরতা যতখানি মনে হয় তত সম্পূর্ণ বা তত প্রকৃত নয়। অন্তঃপুরুষের সমগ্র ক্রিয়াশক্তি স্থূল দেহ ও প্রাণের মধ্যে বিলসিত হয় না, মনের গূঢ় সব সামর্থ্যও এর মধ্যে জাগ্রত নয়, দৈহিক ও স্নায়বিক ক্রিয়াশক্তিগুলিরই আধিপত্য বেশী। কিন্তু সকল সময়ই পরমা ক্রিয়াশক্তি সেখানে অবস্থিত, তবে সুপ্ত অবস্থায় বলা হয়, এ যেন সাপের মতো কুণ্ডলীকৃত অবস্থায় নিদ্রিত রয়েছে, — সেজন্য একে "কুণ্ডলিনী শক্তি" বলা হয় — আর ঐভাবে এ থাকে নিম্নতম চক্রে, "মূলাধারে"। যখন প্রাণায়ামের দ্বারা উচ্চ ও নিম্ন প্রাণের ধারার বিভাজন বিলীন হয়, তখন এই কুণ্ডলিনী আঘাত পেয়ে জেগে ওঠে, এ নিজের কুণ্ডলী খুলে এক অগ্নিময় সর্পের মতো উপরে উঠতে শুরু করে আর উঠবার পথে প্রত্যেক পদ্মটি বিদীর্ণ ক'রে উঠতে থাকে যতক্ষণ না শক্তি ব্রহ্মরন্ধ্রের মধ্যে মিলনের গভীর সমাধিতে পুরুষের সাক্ষাৎ পায়।

প্রতীকের ভাষা কম করে, আরো দার্শনিক ভাষায় — যদিও এই ভাষা হয়ত কম গভীর — এর অর্থ এই যে আমাদের সত্তার আসল ক্রিয়াশক্তি সুপ্ত ও নিশ্চেতন থাকে আমাদের প্রাণিক সংস্থানের গভীর প্রদেশসমূহে আর তা জেগে ওঠে প্রাণায়ামের অনুশীলন দ্বারা। এর প্রসরণে, এ আমাদের মনস্তাত্ত্বিক সত্তার সকল কেন্দ্রগুলি উন্মুক্ত করে; এই সব কেন্দ্রেই অবস্থান করে সেই তত্ত্বের সব সামর্থ্য ও চেতনা যাকে হয়ত এখন বলা যাবে আমাদের অধিচেতন আত্মা; সুতরাং যেমন যেমন সামর্থ্য ও চেতনার এক একটি কেন্দ্র উন্মুক্ত হয়, তেমন তেমন আমরা ক্রমিক মনস্তাত্ত্বিক লোকের মধ্যে

প্রবেশ লাভ করি এবং তাদের অনুরূপ সত্তার বিভিন্ন জগৎ অথবা বিশ্ব অবস্থার সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত করতে সমর্থ হই; তখন আমাদের মধ্যে বিকশিত হয় সকল চৈত্য সামর্থ্য যেগুলি স্থূল মানবের পক্ষে অস্বাভাবিক, কিন্তু অন্তঃপুরুষের পক্ষে স্বাভাবিক। পরিশেষে উৎক্রান্তির চরম সীমায় এই উর্ধ্বগামী ও প্রসার্যমাণ ক্রিয়াশক্তি সেই অতিচেতন আত্মার সাক্ষাৎ পায় যা আমাদের ভৌতিক ও মানসিক অস্তিত্বের পশ্চাতে ও উর্ধ্বে গূঢ়ভাবে আসীন থাকে; এই সাক্ষাতের ফলে মিলনের এক গভীর সমাধি আসে যাতে আমাদের জাগ্রত চেতনা লীন হয়ে যায় অতিচেতনের মধ্যে। এইভাবে ক্রটিহীন ও অক্লান্ত প্রাণায়াম-অভ্যাসের দ্বারা হঠযোগী তার আপন পথে সেই সব চৈত্য ও আধ্যাত্মিক ফল পায় যেগুলির জন্য অন্য যোগ সাধনা করে আরো সরাসরি সব সূক্ষ্ম-মানসিক ও আধ্যাত্মিক পদ্ধতির মাধ্যমে। এই প্রাণায়ামের সঙ্গে যে একটি মাত্র মানসিক সাহায্য সে যোগ করে তা হ'ল কোন মন্ত্র, পবিত্র অক্ষর, নাম বা গুহ্য সূত্রের ব্যবহার; এটি সকল ভারতীয় যোগসাধনাতেই ব্যবহার করা হয় ও সেসবে এর গুরুত্বও সমধিক। মন্ত্র, ষট্চক্র ও কুণ্ডলিনী শক্তির সামর্থ্যের এই যে রহস্য তা সেই সকল জটিল মনোভৌতিক বিদ্যা ও অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান সত্য যাদের সম্বন্ধে তান্ত্রিক দর্শন এক যুক্তিপূর্ণ বিবরণ ও পদ্ধতিসমূহের সর্বাপেক্ষা সম্পূর্ণ সার সংগ্রহ আমাদের দিয়েছে বলে দাবী করে। ভারতবর্ষে যে সকল ধর্ম ও সাধনা এই মনোভৌতিক পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে তারা তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য অল্পবিস্তর এরই উপর নির্ভর করে।

হঠযোগের মতো রাজযোগও প্রাণায়াম ব্যবহার করে এবং তা করে ঐসব একই প্রধান প্রধান চৈত্য উদ্দেশ্যের জন্য, তবে এর সমগ্র তত্ত্ব বিষয়ে এটি সূক্ষ্ম মানসিক সাধনা হওয়ায়, এ প্রাণায়ামকে ব্যবহার করে তার অনুষ্ঠানশ্রেণীর শুধু এক পর্যায় হিসেবে, এবং তা-ও করে অতীব সীমিত মাত্রায়, তিনটি বা চারটি বড় উপকারিতার জন্য। আসন ও প্রাণায়াম নিয়ে এ শুরু করে না, বরং এ প্রথমে জোর দেয় মানসিকতার নৈতিক শুদ্ধির জন্য। এই প্রাথমিক সাধনার গুরুত্ব অসীম, এ না হলে রাজযোগের অবশিষ্ট সাধনপথ কষ্টকর, দূষিত এবং অপ্রত্যাশিত মানসিক, নৈতিক ও শারীরিক বিপদে পূর্ণ হওয়া সম্ভব।[১] প্রচলিত সাধনপন্থায়, এই নৈতিক শুদ্ধিসাধনকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয় — পাঁচটি "যম" ও পাঁচটি "নিয়ম"। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে আছে আচরণে নৈতিক আত্মসংযমের বিধিসমূহ যেমন, সত্যকথন, ক্ষতি বা হত্যা ও চুরির কাজ থেকে নিবৃত্তি, প্রভৃতি [সত্য, অহিংসা, অস্তেয়]; কিন্তু বস্তুতঃ এই সবকে মনে করা চাই নৈতিক আত্মসংযম ও শুদ্ধতার সাধারণ প্রয়োজনের কতকগুলি প্রধান লক্ষণমাত্র। আরো ব্যাপক অর্থে যমের অর্থ যে কোন আত্মসংযম যার দ্বারা মানবের অন্তঃস্থ রাজসিক অহং-ভাব ও এর বিভিন্ন প্রচণ্ড আবেগ ও কামনা জয় ক'রে শান্ত ও সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করা হয়।

[১] আধুনিক ভারতে লোকেরা যোগে আকৃষ্ট হয়ে কোন পুস্তক বা অল্পজ্ঞ ব্যক্তি থেকে, এর বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু জেনে প্রায়ই সোজা রাজযোগের প্রাণায়াম অবলম্বন করে, কিন্তু প্রায়শঃই এর ফল দুঃখময়। এই পথে ভুল করার ঝুঁকি নিতে পারে শুধু অতীব দৃঢ়চিত্ত পুরুষ।

এর উদ্দেশ্য হল নৈতিক শান্তভাব, প্রচণ্ড আবেগশূন্যতা সৃষ্টি করা, এবং এইভাবে রাজসিক মানবের মাঝে অহং-ভাবের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করা। ঠিক সেইরকম নিয়মের অর্থ বিভিন্ন নিয়মিত অনুষ্ঠানের দ্বারা মনের শিক্ষা; এইসব অনুষ্ঠানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল ভাগবত সত্তার ধ্যান, আর তাদের উদ্দেশ্য হল সাত্ত্বিক শান্তভাব, শুদ্ধতা ও একাগ্রতার জন্য যোগ্যতা সৃষ্টি করা; আর এদেরই উপর যোগের বাকী সবের দৃঢ় সাধনা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব।

তবেই অর্থাৎ এই ভিত্তি দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হওয়ার পর আসন ও প্রাণায়ামের দরকার হয় এবং তখনই এদের কাছ থেকে সুষ্ঠু ফল পাওয়া সম্ভব। মনের ও নৈতিক সত্তার সংযম নিজে শুধু আমাদের সাধারণ চেতনাকে সঠিক প্রাথমিক অবস্থায় নিয়ে আসে: যোগের সব মহত্তর লক্ষ্যের জন্য পরতর চৈত্যপুরুষের যে বিকাশ বা আবির্ভাব প্রয়োজনীয় তা এর দ্বারা সাধিত হয় না। এই আবির্ভাবের জন্য প্রয়োজন হল মানসিক সত্তার সঙ্গে প্রাণিক ও ভৌতিক দেহের যে বর্তমান গ্রন্থি তা শিথিল করা এবং মহত্তর চৈত্য পুরুষের মধ্য দিয়ে অতিচেতন পুরুষের সঙ্গে মিলনে উত্তরণ করার পথ নির্বিঘ্ন করা। এর উপায় হল প্রাণায়াম। রাজযোগে যে আসন ব্যবহার করা হয় তা শুধু তার সবচেয়ে সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গীতে অর্থাৎ সেই ভঙ্গীতে যা দেহ স্বভাবতঃ গ্রহণ করে যখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুটিয়ে নিয়ে বসে থাকা হয়, তবে এতে পিঠ ও মাথা নিখুঁৎভাবে খাড়া ও সরলরেখায় রাখা চাই যাতে মেরুদণ্ড না বাঁকে। স্পষ্টতঃই এই শেষের বিধিটি ষট্‌চক্র এবং "মূলাধার" ও "ব্রহ্মরন্ধ্রের" মধ্যে প্রাণিক শক্তি চলাচলের তথ্যের সঙ্গে সংযুক্ত। রাজযোগের প্রাণায়াম নাড়ীতন্ত্রকে শুদ্ধ ও নির্মল করে; এর দ্বারা আমরা প্রাণিক শক্তিকে দেহের মধ্য দিয়ে সমভাবে সঞ্চালন করতে ও প্রয়োজন অনুসারে আমাদের ইচ্ছামতো তাকে বিশেষ স্থানেও চালনা করতে সমর্থ হই আর এইভাবে আমরা সমর্থ হই দেহের ও প্রাণসত্তার অটুট স্বাস্থ্য ও নীরোগ অবস্থা রক্ষা করতে; দেহের মধ্যে প্রাণিকশক্তির পঞ্চ অভ্যস্ত ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণও এ আমাদের দেয়, আবার যেসব অভ্যস্ত বিভাজনের দ্বারা শুধু প্রাণশক্তির সাধারণ যান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলি সাধারণ জীবনে সম্ভব হয় তাদেরও এ সেই সাথে ভেঙে দেয়। মনোভৌতিক সংস্থানের ছয়টি কেন্দ্র এ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে এবং প্রত্যেক আরোহী লোকের উপর জাগ্রত চেতনার মধ্যে নিয়ে আসে প্রবুদ্ধ শক্তির সামর্থ্য এবং অনাবৃত পুরুষের আলোক। এর সঙ্গে মন্ত্রের ব্যবহার যুক্ত হওয়ায় এ দিব্য ক্রিয়াশক্তিকে দেহের মধ্যে নিয়ে আসে এবং রাজযোগ পদ্ধতির মুকুট স্বরূপ সমাধির মধ্যে একাগ্রতার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে এবং তার সাধন সুগম করে।

রাজযোগের একাগ্রতাকে চারিটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়; এর শুরু — বাহ্য বিষয়সমূহ থেকে মন ও সব ইন্দ্রিয় — উভয়েরই প্রত্যাহারে, তার পরে আসে অপর সকল ভাবনা ও মানসিক বৃত্তি বাদ দিয়ে একাগ্রতার বিষয়কে ধারণ করা, তারও পরে, এই একটি বিষয়ে মনের সুদীর্ঘ তন্ময়তা (বা ধ্যান) এবং সর্বশেষে আসে চেতনার সম্পূর্ণ অন্তর্গমন যার দ্বারা এ সমাধির একত্বের মধ্যে সকল বহির্মুখী মানসিক বৃত্তি থেকে নিবৃত্ত

হয়। এই মানসিক শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হল মনকে বাহ্য ও মানসিক জগৎ থেকে সরিয়ে এনে ভাগবতসত্তার সহিত মিলনের মধ্যে নিয়ে যাওয়া। সুতরাং প্রথম তিনটি পর্যায়ে কোন মানসিক সাধন বা অবলম্বনের ব্যবহার প্রয়োজন হয় যার দ্বারা বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ঘুরে বেড়াতে অভ্যস্ত মন একটিমাত্র বিষয়ে নিবদ্ধ হয় আর সেই একটি বিষয় এমন কিছু হওয়া চাই যা ভগবানের ভাবনার প্রতিরূপ। সাধারণতঃ এ কোন নাম বা রূপ বা মন্ত্র যার দ্বারা মননকে ঈশ্বরের অনন্য জ্ঞান বা আরাধনায় নিবদ্ধ করা যায়। ভাবনার উপর এই একাগ্রতার দ্বারা মন ভাবনা থেকে প্রবেশ করে সদ্‌বস্তুর মধ্যে আর তার মধ্যে এ ডুবে যায় নীরব, তন্ময় ও এক হয়ে। এই হল চিরাচরিত পন্থা। কিন্তু অন্য কিছু পন্থাও আছে যেগুলি ঐ একই রকম রাজযৌগিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, কারণ এরাও মনোময় ও চৈত্য সত্তাকে চাবিকাঠি হিসেবে ব্যবহার করে। তাদের কতকগুলির লক্ষ্য মনের অব্যবহিত তন্ময়তা অপেক্ষা বরং তার উপশম সাধনের দিকেই বেশী; এই সাধনায় মনকে শুধু নিরীক্ষণ করা হয় এবং তার যে ভ্রাম্যমাণ মননের উদ্দেশ্যহীন ছোটাছুটির অভ্যাস তা নিঃশেষ করতে দেওয়া হয় কারণ এ অনুভব করে যে তা থেকে সকল অনুমতি, উদ্দেশ্য ও আগ্রহ প্রত্যাহার করা হয়েছে; এবং অপর একটি অপেক্ষাকৃত বেশী শ্রমসাধ্য ও দ্রুত ফলপ্রসূ পদ্ধতিও নেওয়া হয় যার দ্বারা সকল বহির্মুখী মননকে বাদ দেওয়া হয় এবং মনকে বাধ্য করা হয় নিজের মধ্যে ডুবে যেতে যেখানে এর একান্ত নিস্তব্ধতার মধ্যে এ শুধু প্রতিফলিত করতে পারে শুদ্ধ সত্তাকে, আর না হয় প্রয়াণ করতে পারে তার অতিচেতন অস্তিত্বের মধ্যে। পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য আছে কিন্তু উদ্দেশ্য ও ফল একই।

মনে হতে পারে যে এই হলেই রাজযোগের সমগ্র ক্রিয়ার ও লক্ষ্যের সমাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। কারণ এর ক্রিয়া হল চেতনার তরঙ্গসমূহের, তার বহুবিধ বৃত্তির, "চিত্তবৃত্তির" স্তব্ধতা; এর জন্য প্রথমে, পঙ্কিল রাজসিক বৃত্তিগুলিকে নিরন্তর সরিয়ে তাদের পরিবর্তে শান্ত ও দীপ্ত সব সাত্ত্বিক বৃত্তি আনা হয় এবং তার পরে সকল বৃত্তিই স্তব্ধ করা হয়; আর এর উদ্দেশ্য হল ভগবানের সঙ্গে অন্তঃপুরুষের নীরব মিলন ও ঐক্য লাভ। বস্তুতঃ আমরা দেখি যে রাজযোগ সাধনপন্থায় গুহ্য সামর্থ্যের অনুশীলন ও ব্যবহারের মতো অপর কিছু উদ্দেশ্যও আছে যাদের মধ্যে কতকগুলি মনে হয় প্রধান উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন ও এমনকি অসঙ্গত। এইসব সামর্থ্য বা সিদ্ধিকে পুনঃপুনঃ নিন্দা করা হয় এই বলে যে এরা বিপজ্জনক ও বিভ্রান্তিকারী, যোগীর যে একমাত্র ন্যায্য লক্ষ্য, ভগবৎ-মিলন তা থেকে তারা যোগীকে সরিয়ে আনে। সুতরাং স্বভাবতঃই মনে হবে যে লক্ষ্যের দিকে যাবার পথে এই সব পরিহার করা উচিত; এবং একবার লক্ষ্যে উপনীত হলে তখন মনে হবে এরা তুচ্ছ ও অনাবশ্যক। কিন্তু রাজযোগ একটি চৈত্য বিদ্যা, যার মধ্যে চেতনার সকল পরতর অবস্থা এবং তাদের বিভিন্ন সামর্থ্য অন্তর্ভুক্ত; এইসবের দ্বারাই মনোময় পুরুষ উত্তরণ করে অতিচেতনের দিকে, আবার পরমতমের সঙ্গে তার মিলনের চরম ও শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনার দিকে। তাছাড়া, যোগী যতক্ষণ শরীরের

মধ্যে থাকে ততক্ষণ সে যে সর্বদাই মানসিক নিষ্ক্রিয় ও সমাধিমগ্ন থাকে তা নয়, আর তার সত্তার পরতর লোকসমূহে যেসব বিভিন্ন সামর্থ্য ও অবস্থা তার লাভ করা সম্ভব সে সবের বিবরণ বিদ্যার সম্পূর্ণতার জন্য প্রয়োজনীয়।

প্রথমতঃ এই সব সামর্থ্য ও অনুভূতি প্রাণময় ও মনোময় লোকের অন্তর্ভুক্ত যেগুলি আমাদের নিবাস, এই ভৌতিক লোকের উর্ধ্বে আর এরা সূক্ষ্মশরীরস্থ অন্তঃপুরুষের পক্ষে স্বাভাবিক; স্থূলদেহের উপর নির্ভরতা যতই কমতে থাকে ততই এই সব অস্বাভাবিক ক্রিয়া সম্ভব হয় এবং এমনকি না চাইলেও সেগুলি আবির্ভূত হয়। রাজযোগ-বিদ্যার দেওয়া বিভিন্ন প্রক্রিয়ার দ্বারা এই সবকে অর্জন ও দৃঢ় করা যায় এবং তখন তাদের প্রয়োগ করা না করা আমাদের ইচ্ছাধীন হয়; অথবা তাদের নিজেদেরই বিকশিত হতে দেওয়া যেতে পারে এবং তাদের ব্যবহার করা যেতে পারে কেবল তখনই যখন তারা আসে অথবা যখন অন্তঃস্থ ভগবান আমাদের সে সব ব্যবহার করার প্রেরণা দেন; আর না হয়, এই সব স্বাভাবিকভাবে বিকশিত ও সক্রিয় হলেও, যোগের যে একমাত্র পরম লক্ষ্য তার প্রতি একমনা ভক্তিবশে, সে সবকে ত্যাগ করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, অতিমানসিক লোকসমূহের অন্তর্গত বিভিন্ন পূর্ণতর, মহত্তর সামর্থ্যও আছে যেগুলি ভগবানেরই আপন সামর্থ্য — তাঁর আধ্যাত্মিক ও অতিমানসিক ভাবময় সত্তায়। এদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা দৃঢ়ভাবে বা অখণ্ডভাবে আদৌ অর্জন করা যায় না, তারা শুধু আসতে পারে উর্ধ্ব থেকে, আর না হয়, তারা মানবের পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারে যদি এবং যখন মানব মনের উজানে উত্তরণ ক'রে বাস করে আধ্যাত্মিক সত্তায়, সামর্থ্যে, চেতনায় ও ভাবনায়। তখন এইসব অস্বাভাবিক ও কষ্টলব্ধ সিদ্ধি না হয়ে, হয়ে ওঠে শুধু তার ক্রিয়ার নিজস্ব স্বভাব ও পদ্ধতি — অবশ্য যদি সে তখনো পূর্বের মতো প্রপঞ্চে সক্রিয় থাকে।

মোটের উপর, পূর্ণযোগের পক্ষে রাজযোগ ও হঠযোগের বিশিষ্ট পদ্ধতিগুলি কখনো কখনো উন্নতির কোন কোন পর্যায়ে উপকারে আসতে পারে, তবে অপরিহার্য নয়। একথা ঠিক যে তাদের প্রধান লক্ষ্যগুলি যোগের পূর্ণতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা চাই; তবে সে সবের সাধন অন্য উপায়ে সম্ভব। কারণ পূর্ণযোগের পদ্ধতিগুলি প্রধানতঃ আধ্যাত্মিক হওয়া চাই, আর ভৌতিক পদ্ধতির উপর অথবা নির্দিষ্ট চৈত্য বা মনোভৌতিক প্রক্রিয়ার উপর বেশী পরিমাণে নির্ভর করার অর্থ উচ্চতর ক্রিয়ার পরিবর্তে নিম্নতর ক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা। এই প্রশ্নটি সম্বন্ধে আমাদের পরে অল্প কিছু বলার সুযোগ হবে যখন আমরা পদ্ধতিতে সমন্বয়ের সর্বশেষ তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করব; এই আলোচনা করাই আমাদের বিভিন্ন যোগের বিবেচনার উদ্দেশ্য।

তৃতীয় খণ্ড

ভাগবত প্রেমের যোগ

প্রথম অধ্যায়

প্রেম ও ত্রিমার্গ

সঙ্কল্প, জ্ঞান ও প্রেম — এরাই মানবপ্রকৃতিতে ও মানবের জীবনে তিনটি দিব্য সামর্থ্য, এবং এরাই তিনটি পথ দেখায় যা দিয়ে মানবের অন্তঃপুরুষ ওঠে ভগবানের দিকে। সুতরাং, আমরা যেমন পূর্বে দেখেছি, পূর্ণযোগের ভিত্তি হওয়া চাই এদের অখণ্ডতা, এই সকল তিনটিতেই ভগবানের সঙ্গে মিলন।

ক্রিয়াই জীবনের প্রথম সামর্থ্য। প্রকৃতি শুরু করে শক্তি ও এর বিভিন্ন কর্ম দিয়ে যেগুলি মানবের মাঝে একবার সচেতন হলে হয়ে ওঠে সঙ্কল্প ও এর বিভিন্ন সিদ্ধি; সুতরাং তার ক্রিয়াকে ভগবৎ-অভিমুখী করলেই মানবের জীবন দিব্য হতে শুরু করে সর্বোত্তম ও সুনিশ্চিতভাবে। এই হল প্রথম প্রবেশের দুয়ার, দীক্ষার সূত্রপাত। যখন তার অন্তঃস্থ সঙ্কল্পকে এক করা হয় ভাগবত সঙ্কল্পের সঙ্গে এবং সত্তার সমগ্র ক্রিয়া ভগবান থেকে উৎসারিত হয়ে চালিত হয় ভগবানের দিকে, তখন কর্মের মধ্যে মিলন সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়। কিন্তু কর্মের চরিতার্থতা সাধিত হয় জ্ঞানে, গীতায় বলা হয়েছে, — কর্মের সকল সমগ্রতার পূর্ণ পরিণতি হয় জ্ঞানে, "সর্বম্ কর্মাখিলম্ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে"। যে সর্বব্যাপী চিন্ময় পুরুষ থেকে আমাদের সঙ্কল্প ও কর্মের উদ্ভব, যাঁর কাছ থেকে এরা তাদের সামর্থ্য পায় এবং যাঁর মধ্যে এদের ক্রিয়া-শক্তির লীলা সার্থক হয় তাঁর সঙ্গে আমরা এক হই সঙ্কল্প ও কর্মের মধ্যে মিলনের দ্বারা। আর এই মিলনের মুকুট হল প্রেম; কারণ প্রেম হল সেই পুরুষের সঙ্গে সচেতন মিলনের আনন্দ যাঁর মধ্যে আমরা জীবন ধারণ করি, কর্ম করি ও বিচরণ করি, যাঁর দ্বারা আমাদের অস্তিত্ব বজায় থাকে এবং একমাত্র যাঁর জন্যেই আমরা শেষে শিক্ষা করি কর্ম করতে ও হতে। তাই আমাদের সামর্থ্যগুলির ত্রিত্ব, ভগবানের মধ্যে সকল তিনটিরই মিলন আর এতেই আমরা উপনীত হই যখন আমরা শুরু করি কর্ম থেকে আমাদের প্রবেশের পথ ও সংযোগের ধারা হিসেবে।

ভগবানের মধ্যে সতত বাস করার ভিত্তি হল জ্ঞান। কারণ চেতনাই সকল জীবনধারণ ও সত্তার ভিত্তি ও জ্ঞান হল চেতনার ক্রিয়া অর্থাৎ সেই আলো যার দ্বারা এ নিজেকে ও নিজের বিভিন্ন সদ্‌বস্তুকে জানে, আবার এ হল সেই সামর্থ্য যার দ্বারা আমরা ক্রিয়া থেকে শুরু ক'রে মননের বিভিন্ন আন্তর ফলগুলি ধারণ ক'রে আমাদের চিন্ময় সত্তার দৃঢ় উপচয়ের মধ্যে কর্ম করতে সমর্থ হই যতক্ষণ না এ মিলনের দ্বারা নিজেকে সিদ্ধ করে ভাগবত সত্তার আনন্ত্যের মধ্যে। ভগবান আমাদের দেখা দেন বহু বিভাবে আর এর প্রতিটির জন্য জ্ঞানই চাবিকাঠি যাতে আমরা জ্ঞানের দ্বারা অনন্ত ও ভগবানের মধ্যে প্রবেশ করি ও তাঁকে অধিগত করি তাঁর সত্তার প্রতি ভাবে,

"সর্বভাবেন"[১] এবং আমরা তাঁকে গ্রহণ করি আমাদের মধ্যে এবং তিনি আমাদের অধিগত করেন আমাদের প্রতি ভাবে।

জ্ঞানের অভাবে আমরা তাঁর মধ্যে বাস করি অন্ধের মতো সেই প্রকৃতির সামর্থ্যের অন্ধতা নিয়ে যে নিজের কর্মে আগ্রহী কিন্তু নিজের উৎস ও অধিকর্তা সম্বন্ধে বিস্মৃত এবং সেজন্য আমরা আমাদের সত্তার প্রকৃত ও পূর্ণ আনন্দ থেকে অদিব্যভাবে বঞ্চিত। আমরা যা জানি তার সঙ্গে সচেতন একত্বে যে জ্ঞান উপনীত হয় — কারণ একমাত্র তাদাত্ম্যের দ্বারাই সম্পূর্ণ ও প্রকৃত জ্ঞানের অস্তিত্ব সম্ভব — তার দ্বারা বিভাজনের নিরাময় হয় এবং আমাদের সকল সঙ্কীর্ণতা ও বৈষম্য ও দুর্বলতা ও অসন্তোষের কারণ বিলুপ্ত হয়। কিন্তু কর্ম বিনা জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না; কারণ সত্তার মধ্যস্থ সঙ্কল্পও ভগবান — শুধু যে সত্তা বা তার আত্মবিৎ নীরব অস্তিত্বই ভগবান তা নয় — আর যদি কর্মের পরিণতি হয় জ্ঞানে, তাহলে জ্ঞানেরও চরিতার্থতা সাধিত হয় কর্মে। আবার এখানেও প্রেমই জ্ঞানের মুকুট; কারণ প্রেম মিলনের আনন্দ, আর ঐক্যকে মিলনের হর্ষ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া চাই, যাতে তার নিজের আনন্দের সকল ঐশ্বর্য লাভ হয়। বস্তুতঃ পূর্ণ জ্ঞানের ফল হল পূর্ণ প্রেম, সম্যক্ জ্ঞান থেকে আসে প্রেমের পরিপূর্ণ ও বহুল ঐশ্বর্য। গীতা বলে, "যে আমাকে পুরুষোত্তম ব'লে জানে" — শুধু অক্ষর একত্বের বিভাবে নয়, ভগবানের বহুপুরুষময় ক্ষর বিভাবেও, আবার এই দুই বিভাবেরই উর্ধ্বে উত্তম পুরুষ-রূপেও, যার মধ্যে এই দুই বিভাবই দিব্যভাবে বিধৃত — "সে-ই প্রেমের দ্বারা আমাকে সর্বভাবে চায় কারণ তার আছে সম্যক্ জ্ঞান"। এই হল আমাদের সামর্থ্যগুলির ত্রিত্ব, ভগবানের মধ্যে সকল তিনটিরই মিলন আর এতেই আমরা উপনীত হই যখন আমরা শুরু করি জ্ঞান থেকে।

প্রেম সমগ্র সত্তার কিরীট এবং এর সার্থকতাসাধনের উপায়, এর দ্বারা সত্তা উত্তরণ করে সকল তীব্রতায় ও সকল পরিপূর্ণতায় এবং চরম আত্মপ্রাপ্তির রভসে। কারণ যদিও পরম সত্তার স্বরূপই চেতনা এবং সেজন্য চেতনার দ্বারা অর্থাৎ এর সম্বন্ধে যে সম্যক্ জ্ঞান তাদাত্ম্যের মধ্যে পূর্ণ হয় তার দ্বারা আমরা এর সঙ্গে এক হই, তবু চেতনার স্বরূপ হল আনন্দ, আর আনন্দের শিখরের চাবিকাঠি ও রহস্য হল প্রেম। এবং যদিও সঙ্কল্প চিন্ময় সত্তার সেই সামর্থ্য যার দ্বারা এ নিজেকে সার্থক করে এবং সঙ্কল্পের মধ্যে মিলনের দ্বারা আমরা পরম সত্তার সঙ্গে এক হই এর বিশিষ্ট অনন্ত সামর্থ্যে, তবু সেই সামর্থ্যের সকল কর্মই শুরু হয় আনন্দ থেকে, আনন্দের মধ্যেই তাদের বাস এবং আনন্দই তাদের লক্ষ্য ও পরিণতি; আনন্দের সম্যক্ ব্যাপ্তি লাভের উপায় হল সত্তার স্বরূপ এবং এর চেতনার সামর্থ্য যা সব ব্যক্ত করে সেই সব কিছুতে সত্তার প্রেম। প্রেমই দিব্য আত্মানন্দের সামর্থ্য ও প্রচণ্ড আবেগ, আর প্রেম না থাকলে আমরা পেতে পারি এর আনন্ত্যের নিবিষ্ট শান্তি, আনন্দের তন্ময় নীরবতা কিন্তু পাই না এর ঐশ্বর্য ও পূর্ণতার

[১] গীতা

একান্ত গভীরতা। বিভাজনের দুঃখ থেকে প্রেম আমাদের নিয়ে যায় পূর্ণ মিলনের আনন্দে কিন্তু মিলনসাধনের যে হর্ষ অন্তঃপুরুষের মহত্তম আবিষ্কার এবং যার জন্য বিশ্বজীবন এক দীর্ঘ প্রস্তুতি সেই হর্ষ আমরা হারাই না। সুতরাং প্রেমের দ্বারা ভগবানের দিকে অগ্রসর হওয়ার অর্থ নিজেকে প্রস্তুত করা সম্ভবপর মহত্তম আধ্যাত্মিক সিদ্ধির জন্য।

সার্থক প্রেম জ্ঞানকে বাদ দেয় না, বরং এ নিজেই জ্ঞান আনে; জ্ঞান যতই সম্পূর্ণ হয়, প্রেমের ভব্যার্থ ততই সমৃদ্ধ হয়। গীতাতে ভগবান বলেছেন, "ভক্তির দ্বারাই মানব আমাকে জানতে পারে আমার ব্যাপ্তিতে ও মহত্ত্বে এবং সত্তার তত্ত্বসমূহের মধ্যে আমি যেমন সেইভাবে, 'তত্ত্বতঃ' এবং এইভাবে 'তত্ত্বতঃ' আমাকে জেনে সে আমার মধ্যে প্রবেশ করে।" জ্ঞানবিহীন প্রেম অত্যুগ্র ও তীব্র, কিন্তু অন্ধ, অমার্জিত ও প্রায়শঃই এক বিপজ্জনক বিষয়, এক বিশাল সামর্থ্য, কিন্তু আবার এক অন্তরায়; যে প্রেমের জ্ঞান সীমিত সে তার ব্যগ্রতায় এবং প্রায়ই তার ব্যগ্রতার বশেই সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ে; কিন্তু যে প্রেমে পূর্ণ জ্ঞান আসে তার ফল অনন্ত এবং একান্ত মিলন। দিব্যকর্মের সঙ্গে এই প্রেমের অসঙ্গতি নেই, বরং এ নিজেই দিব্যকর্মে প্রবৃত্ত হয় হর্ষের সঙ্গে; কারণ এ ভগবানকে ভালবাসে তাঁর সমগ্র সত্তায় এবং সেহেতু সকল সত্তাসমূহের মধ্যে তাঁর সঙ্গে এক, এবং সেজন্য জগতের জন্য কর্ম করার অর্থ ভগবানের প্রতি নিজের প্রেমকে অনুভব ও সার্থক করা বহু বিচিত্রভাবে। এই হল আমাদের সামর্থ্যগুলির ত্রিত্ব, ভগবানের মধ্যে সকল তিনটিরই মিলন, আর এতেই আমরা উপনীত হই যখন আমরা যাত্রা শুরু করি ভক্তির পথ দিয়ে, প্রেমকে পথের দেবদূত ক'রে, আর এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে আমরা যেন সর্বপ্রেমাস্পদের সত্তার দিব্য আনন্দের রভসের মধ্যে পাই আমাদের সার্থকতা, এর নিশ্চিন্ত আবাস, ও আনন্দময় ধাম ও এর বিশ্ববিকিরণের কেন্দ্র।

সুতরাং যখন এই তিন সামর্থ্যের মিলনের মধ্যেই আমাদের সিদ্ধির ভিত্তি নিহিত, তখন ভগবানের মধ্যে অখণ্ড আত্মসার্থকতার সাধকের কর্তব্য হল — এই তিনটি পথের পথিকদের মধ্যে আমরা প্রায়শঃই যে ভ্রান্ত ধারণা ও পারস্পরিক অপবাদ প্রচার দেখি তা থেকে দূরে থাকা অথবা তার নিজের যদি আদৌ ঐসব মনোভাব থাকে তা পরিহার করা। প্রায়ই দেখা যায় যে জ্ঞান সম্প্রদায়ের সাধকরা তাদের অত্যুচ্চ শিখর থেকে ভক্তিমার্গকে ঘৃণা না করলেও হীন চক্ষে দেখে যেন এ হল এক নিকৃষ্ট, অজ্ঞানময় বিষয়, আর উচ্চসত্যের জন্য যারা এখনো যোগ্য নয় শুধু তাদেরই উপযোগী এটি। একথা সত্য যে জ্ঞানবিহীন ভক্তি প্রায়ই এক অপক্ব, অমার্জিত, অন্ধ ও বিপজ্জনক বিষয়, আর একরকম সততই তার প্রমাণ পাওয়া যায় ধার্মিকদের প্রমাদ, অপরাধ ও নির্বুদ্ধিতা থেকে। কিন্তু এর কারণ এই যে তাদের ভক্তি তার নিজস্ব পথে, নিজের আসল তত্ত্ব পায়নি এবং সেজন্য এ বাস্তবিকই সঠিক পথের উপর আসেনি, বরং এই পথের জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছে, যে সব উপপথ দিয়ে সঠিক পথে আসা যায় এ তারই কোন একটি পথে রয়েছে; আর এই পর্যায়ে ভক্তির মতো জ্ঞানও অপূর্ণ — দাম্ভিক, ভেদপন্থী, অসহিষ্ণু,

কোন একটি মাত্র আত্যন্তিক তত্ত্বের সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ আর সাধারণতঃ এই তত্ত্বটিও গৃহীত হয়েছে অতি অপূর্ণভাবে। যখন ভক্ত সেই সামর্থ্য আয়ত্ত করে যা তাকে উন্নত করবে, অর্থাৎ যখন সে বাস্তবিকই প্রেমের সন্ধান পায়, তখন শেষ পর্যন্ত প্রেম জ্ঞানের মতোই সকলভাবে তার শুদ্ধি ও প্রসারতা সাধনে সক্ষম হবে; এই দুই সামর্থ্য সমকক্ষ, তাদের লক্ষ্যও এক যদিও এই লক্ষ্য প্রাপ্তি সম্বন্ধে তাদের পদ্ধতি বিভিন্ন। দার্শনিক যে দম্ভের বশে ভক্তের তীব্র আবেগকে হীন চক্ষে দেখে সে দম্ভের কারণ সকল দম্ভের কারণেরই মতো — তার প্রকৃতির কোন বিশেষ এক উনতা; কারণ ধীশক্তি অতিমাত্রায় আত্যন্তিকভাবে উন্নত হলে হৃদয় যা দিতে পারে তা সে পায় না। ধীশক্তি যে সকল প্রকারেই হৃদয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তা নয়; যদিও এ এমন কতকগুলি দুয়ার খুব শীঘ্র খোলে যেগুলির কাছে হৃদয় স্বভাবতঃই অপটু ও অক্ষম, তবু ধীশক্তির নিজেরও এমন সব সত্য না পাবার সম্ভাবনা থাকে যেগুলি হৃদয়ের কাছে অতি নিকটবর্তী ও সুলভ। আর ভাবনার পথ গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে উপনীত হলে হয়ত এ সহজেই লাভ করে ব্যোমচুম্বী উচ্চতা, অত্যুচ্চ শিখর, আকাশতুল্য বিশালতা, কিন্তু এ হৃদয়ের সাহায্য বিনা দিব্য সত্তা ও দিব্য আনন্দের অতীব গম্ভীর ও সমৃদ্ধ গহ্বরগুলির ও তাদের মহাসামুদ্রিক গভীর প্রদেশের সন্ধান পেতে অক্ষম।

সাধারণতঃ যে মনে করা হয় ভক্তির পথ নিকৃষ্ট হতে বাধ্য তা প্রথমতঃ এই কারণে যে এর পাথেয় হল পূজা যা আধ্যাত্মিক অনুভূতির সেই পর্যায়ের অন্তর্গত যেখানে মানবের অন্তঃপুরুষ ও ভগবানের মধ্যে ভেদ থাকে ও ঐক্য পর্যাপ্ত নয়; দ্বিতীয়তঃ এর মূল তত্ত্বই হল প্রেম, আর প্রেমের অর্থ সর্বদাই দুই — প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ, এবং সেজন্য দ্বৈতভাব থাকে, যদিও একত্বই আধ্যাত্মিক অনুভূতির পরাকাষ্ঠা; আর তৃতীয় কারণ এই যে এর সাধ্য এক পুরুষবিধ ভগবান অথচ নৈর্ব্যক্তিক একমাত্র সদ্‌বস্তু না হলেও এ হল সর্বশ্রেষ্ঠ ও নিত্য সত্য। কিন্তু ভক্তির পথে পূজা শুধু প্রথম পদক্ষেপ। যেখানে বাহ্য পূজা রূপান্তরিত হয় আন্তর আরাধনায়, সেখানে শুরু হয় প্রকৃত ভক্তি; এটিই গভীর হয়ে পরিণত হয় ভাগবত প্রেমে; ঐ প্রেমের ফলে আসে ভগবানের সঙ্গে আমাদের বিভিন্ন সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার হর্ষ; ঘনিষ্ঠতার হর্ষ পরিণত হয় মিলনের আনন্দে। জ্ঞানের মতো প্রেমও আমাদের নিয়ে যায় সর্বশ্রেষ্ঠ একত্বে এবং ঐ একত্বকে করে সম্ভবমতো সর্বাপেক্ষা গভীর ও প্রগাঢ়। একথা সত্য যে প্রেম একত্বের মধ্যে ভেদের উপরই সহর্ষে ফিরে আসে আর এই ভেদের দ্বারাই একত্বও আরো সমৃদ্ধ ও মধুর হয়। কিন্তু আমরা এখানে বলতে পারি যে মনন অপেক্ষা হৃদয় অধিকতর বিজ্ঞ, অন্ততঃ সেই মনন অপেক্ষা বিজ্ঞ যা ভগবান সম্বন্ধে সব পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবনা দেখে একটিতে একাগ্র হয় আর অন্য যেটি এর বিপরীত মনে হয় সেটি বাদ দেয় কিন্তু এই বিপরীতটি আসলে অন্যটির অনুপূরক ও এর শ্রেষ্ঠ সার্থকতাসাধনের উপায়। মনের দুর্বলতাই এই যে এ ভগবানের যে বিভাবগুলি দেখে সেগুলিকে এ নিজেই মননের দ্বারা, এর সদর্থক ও নঞর্থক ভাবনার দ্বারা সীমিত করে এবং একটিকে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে অত্যধিক আগ্রহী হয়।

মনন, বিচার অর্থাৎ যে দার্শনিকসুলভ বৃত্তির দ্বারা মানসিক জ্ঞান ভগবানের দিকে যায় তার ঝোঁক হল মূর্ত অপেক্ষা বিমূর্তকে, অন্তরঙ্গ ও সমীপস্থ বিষয় অপেক্ষা উচ্চ ও দূরবর্তী বিষয়কে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া। এর কাছে শুধু 'একম্'-এর স্বরূপের আনন্দে সত্য মহত্তর আর বহুর মধ্যে একম্-এর ও একম্-এর মধ্যে বহুর আনন্দে হয় সত্য হীনতর অথবা শুধু মিথ্যা, নৈর্ব্যক্তিক ও নির্গুণে সত্য মহত্তর, আর পুরুষবিধ ও সগুণে হয় সত্য হীনতর অথবা শুধু মিথ্যা বর্তমান। কিন্তু ভগবান আমাদের ভাবনার বিরুদ্ধতার অতীত, তাঁর বিভাবের মধ্যে আমরা যে সব ন্যায়ের বিরোধ করি তিনি সে সবের অতীত। আমরা দেখেছি যে তিনি আত্যন্তিক ঐক্যের দ্বারা বদ্ধ ও সীমিত নন; তাঁর একত্ব নিজেকে ফুটিয়ে তোলে অনন্ত বৈচিত্র্যে আর ঐ বৈচিত্র্যের হর্ষের সর্বাপেক্ষা সম্পূর্ণ চাবিকাঠি হল প্রেম, আর সেজন্য তাতে ঐক্যের হর্ষ নষ্ট হয় না। সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানে ও জ্ঞানের দ্বারা সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক অনুভূতি একত্বকে যেমন পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যায় তাঁর আত্মবিভোর আনন্দের মধ্যে, একে তেমনই পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যায় তাঁর নানাবিধ সম্বন্ধের মধ্যে। যদি মননের কাছে মনে হয় নৈর্ব্যক্তিক বিশালতর ও পরতর সত্য আর পুরুষবিধ সঙ্কীর্ণতর অনুভূতি, তবু চিৎপুরুষ দেখে যে উভয়ই এক সদ্‌বস্তুর বিভিন্ন বিভাব আর এই সদ্‌বস্তুই নিজেকে রূপায়িত করেছেন উভয়ের মধ্যে, আর যদি সদ্‌বস্তু সম্বন্ধে এমন জ্ঞান থাকে যা মনন লাভ করে অনন্ত নৈর্ব্যক্তিকত্বের প্রতি আগ্রহী হয়ে, তাহলে সদ্‌বস্তু সম্বন্ধে আবার এমন জ্ঞানও আছে যা প্রেম লাভ করে অনন্ত ব্যক্তিসত্ত্বের প্রতি আগ্রহী হয়ে। প্রতিটি আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করা হলে, তাদের পথে একই চরম সত্য লাভ হয়। যেমন গীতা আমাদের বলে, — যেমন জ্ঞানের দ্বারা তেমন ভক্তির দ্বারাও আমরা পুরুষোত্তমের সঙ্গে, পরতমের সঙ্গে ঐক্য লাভ করি; পুরুষোত্তম নিজের মধ্যে ধারণ করেন নৈর্ব্যক্তিক ও অসংখ্য ব্যক্তিসত্ত্ব, নির্গুণ ও অনন্ত গুণ, শুদ্ধ সৎ, চেতনা, ও আনন্দ এবং এদের বিভিন্ন সম্বন্ধের অসীম লীলা।

অপরপক্ষে, ভক্তের ঝোঁক হল শুধু জ্ঞানের নীরস শুষ্কতাকে ঘৃণা করা। আর একথা সত্য যে আধ্যাত্মিক অনুভূতির উল্লাসবিহীন দর্শন এমন কিছু যা যেমন স্বচ্ছ তেমন রুক্ষ এবং আমাদের সব তৃপ্তি দিতে অসমর্থ, আর এর যে আধ্যাত্মিক অনুভূতি তখনো মননের অবলম্বন ত্যাগ করে মনের উজানে ওঠেনি, এমনকি তা-ও অত্যধিক মাত্রায় বাস করে আচ্ছিন্ন আনন্দের মধ্যে আর এ যা পায় তা ভক্তের তীব্র আবেগের কাছে শূন্য মনে হলেও এ অবশ্য সে শূন্য নয় কিন্তু তাতে থাকে উচ্চ শিখরের সব ত্রুটি। অপরপক্ষে, জ্ঞানের অভাবে প্রেম নিজেই সম্পূর্ণ নয়। গীতায় তিন প্রকার প্রাথমিক ভক্তির পার্থক্যের কথা বলা হয়েছে — একরকম যা সংসারের দুঃখকষ্ট থেকে উদ্ধারের জন্য ভগবানের শরণাপন্ন হয়, অর্থাৎ আর্তের ভক্তি, আর একরকম যা কামনা পূরণের জন্য ভগবানের কাছে যায় তার ইষ্টদাতা হিসেবে, অর্থাৎ অর্থার্থীর ভক্তি, আর একরকম ভক্তি যা ভগবানকে না জেনেও তাঁকে ভালবেসেছে আর এই অজানা ভগবানকে জানবার জন্য ব্যাকুল হয় অর্থাৎ জিজ্ঞাসুর ভক্তি; কিন্তু এ সেই ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলে যা জানে। স্পষ্টতঃই, যে তীব্র ভালবাসার আবেগ বলে "আমি বুঝি না, শুধু ভালবাসি", আর

ভালবেসে জানতে চায় না, সে আবেগ প্রেমের প্রথম আত্মপ্রকাশ মাত্র, তার অন্তিম আত্মপ্রকাশ নয়, তার সর্বাপেক্ষা তীব্রতাও নয়। বরং ভগবান সম্বন্ধে জ্ঞান যেমন বাড়তে থাকে, তেমন ভগবানে আনন্দ ও তাঁর প্রতি প্রেমও বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। জ্ঞানের ভিত্তি না থাকলে শুধু উল্লাস দৃঢ় হতে পারে না; যা আমরা ভালবাসি তার মধ্যে বাস করলেই এই দৃঢ়তা আসে, কিন্তু তার মধ্যে বাস করার অর্থ তার সঙ্গে চেতনায় এক হওয়া, আর চেতনার একত্বই জ্ঞানের সর্বোত্তম অবস্থা। ভগবৎ-জ্ঞান ভগবৎপ্রেমকে দেয় তার সর্বাপেক্ষা অটল দৃঢ়তা, তার কাছে উন্মুক্ত করে তার অনুভূতির বিশালতম হর্ষ, তাকে উত্তোলন করে তার দৃষ্টির সর্বোচ্চ শিখরসমূহে।

এই দুই সামর্থ্যের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি যদি একপ্রকার অজ্ঞানতা হয়, তাহলে এরা উভয়ে যে কর্মমার্গকে ঘৃণার চোখে দেখতে চায় এই ব'লে যে এ তাদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির আরো উন্নত শিখরের নিম্নে সে প্রবৃত্তিও কম অজ্ঞানতা নয়। জ্ঞানের একপ্রকার তীব্রতার মতো, প্রেমেরও এক প্রকার তীব্রতা আছে যার কাছে মনে হয় কর্ম এমন কিছু যা বহির্মুখী ও বিভ্রান্তিকর। কিন্তু কর্ম যে এরকম বহির্মুখী ও বিভ্রান্তিকর হয় তা কেবল ততদিন যতদিন আমরা পরতমের সঙ্গে সঙ্কল্প ও চেতনার একত্ব পাই না। একবার তা পাওয়া গেলে কর্ম হয়ে ওঠে জ্ঞানের আপন সামর্থ্য ও প্রেমের আপন প্রস্রবণ। যদি জ্ঞান হয় একত্বের আপন অবস্থা, আর প্রেম এর আনন্দ, তাহলে দিব্য কর্মসমূহও এর আলোক ও মাধুর্যের সজীব সামর্থ্য। মানবপ্রেমের অভীপ্সায় যেমন টান থাকে, তেমন প্রেমের টান হল প্রেমিক ও প্রেমাস্পদকে জগৎ ও অন্য সকল থেকে দূরে বিচ্ছিন্ন করা যখন তারা হৃদয়ের রুদ্ধ বিবাহকুঞ্জে তাদের আত্যন্তিক একত্ব উপভোগ করে। হয়ত এ হল এই পথের এক অনিবার্য টান। কিন্তু তবু যে বিশালতম প্রেম জ্ঞানে সার্থক হয়, তার কাছে জগৎ এই হর্ষ থেকে ভিন্ন ও এর প্রতিকূল কিছু নয়, বরং সে একে দেখে পরম প্রেমাস্পদের সত্তা ব'লে, সৃষ্টির সকল বিষয়কে দেখে তারই সত্তা ব'লে, আর এই দর্শনে দিব্যকর্মসমূহ লাভ করে তাদের হর্ষ ও তাদের সার্থকতা।

এই হল সেই জ্ঞান যার মধ্যে পূর্ণযোগের বাস করা চাই। ভগবানের দিকে আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে মনের বিভিন্ন শক্তি থেকে অর্থাৎ ধীশক্তি, সঙ্কল্প, হৃদয় থেকে, আর মনের মধ্যে সকল কিছুই সীমিত। যাত্রার প্রারম্ভে ও যাত্রাপথে দীর্ঘ দিন ধরে সঙ্কীর্ণতা ও আত্যন্তিকতা না থেকে পারে না। কিন্তু আরো বেশী আত্যন্তিক সাধনপন্থার চেয়ে পূর্ণযোগ এই সবকে ব্যবহার করবে আরো শিথিলভাবে; আর অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়িই এ বার হয়ে আসবে মানসিক রীতির বন্ধন থেকে। জ্ঞানমার্গ বা কর্মমার্গ থেকে যেমন পূর্ণযোগ শুরু হতে পারে, তেমন এর শুরু হতে পারে ভক্তিমার্গ থেকেও। কিন্তু যেখানে তারা মিলিত হয় সেখানেই এর সার্থকতার আনন্দের শুরু। প্রেম থেকে এ শুরু না করলেও, এর প্রেমলাভ অবশ্যম্ভাবী; কারণ প্রেমই কর্মের কিরীট ও জ্ঞানের প্রস্ফুটন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভক্তির বিভিন্ন প্রেরণা

সকল ধর্মই আরম্ভ হয় এমন এক শক্তি বা অস্তিত্বের প্রতীতি নিয়ে যা আমাদের বিভিন্ন সীমিত ও মর্ত্য আত্মা অপেক্ষা মহত্তর ও পরতর, আর থাকে ঐ শক্তির উদ্দেশে পূজার ভাবনা ও ক্রিয়া আর এর সঙ্কল্প, এর বিভিন্ন বিধান বা দাবীর প্রতি আনুগত্য স্বীকার। কিন্তু এই যে শক্তিকে ধারণা, পূজা ও মান্য করা হয় তার ও পূজকের মধ্যে ধর্ম তার প্রাথমিক অবস্থায় এক অমেয় ব্যবধান স্থাপন করে। যোগের পরাকাষ্ঠায় এই ব্যবধান লুপ্ত হয়; কারণ যোগ হল মিলন। আমরা এই মিলনে আসি জ্ঞানের মাধ্যমে; কারণ ঐ শক্তি সম্বন্ধে আমাদের সব প্রাথমিক অস্পষ্ট ধারণা যেমন স্বচ্ছ, বৃহৎ ও গভীর হয়ে ওঠে, তেমন আমরা ক্রমে বুঝতে পারি যে এ হল আমাদের নিজেদেরই পরতম আত্মা, আমাদের সত্তার প্রভব ও পোষক এবং এর দিকেই আমাদের প্রবণতা। কর্মের মাধ্যমেও আমরা মিলনে উপনীত হই কারণ প্রথমে শুধু আনুগত্য থাকলেও আমরা ক্রমে এর সঙ্কল্পের সঙ্গে আমাদের সঙ্কল্পকে অভিন্ন করি, কারণ যে অনুপাতে আমাদের সঙ্কল্প এর উৎস ও আদর্শ এই শক্তির সঙ্গে এক হয়, সেই অনুপাতে আমাদের শক্তির সুষ্ঠু ও দিব্য হওয়া সম্ভব। আবার পূজার দ্বারাও আমরা এর সঙ্গে মিলনে আসি; কারণ এক দূরবর্তী পূজার ভাবনা ও ক্রিয়া ক্রমে উন্নত হয়ে পরিণত হয় নিবিড় আরাধনার প্রয়োজনীয়তায় এবং এটি আবার পরিণত হয় প্রেমের ঘনিষ্ঠতায়, আর প্রেমের পূর্ণতা হল প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলন। পূজার এই বিকাশ থেকেই ভক্তিযোগের আরম্ভ, আর প্রেমাস্পদের সঙ্গে এই মিলনের দ্বারাই এ পায় তার সর্বোচ্চ শিখর ও পূর্ণতা।

আমাদের অবর মানবপ্রকৃতির সাধারণ প্রেরণাগুলিকে অবলম্বন ক'রেই আমাদের সত্তার সকল সহজ সংস্কার ও ক্রিয়া শুরু হয় — প্রথমে থাকে মিশ্রিত ও অহমাত্মক বিভিন্ন প্রেরণা, কিন্তু পরে এরা শুদ্ধ ও উন্নত হয়, আমাদের বিভিন্ন ক্রিয়া তাদের সাথে যে সব ফল আনে সে সব ছাড়াই প্রেরণাগুলি হয়ে ওঠে আমাদের পরা প্রকৃতির এক প্রখর ও বিশেষ প্রয়োজন; সর্বশেষে তারা উন্নত হয়ে পরিণত হয় আমাদের সত্তার এক প্রকার সুস্পষ্ট অবশ্য কর্তব্যে আর এই কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই আমরা উপনীত হই আমাদের অন্তঃস্থ সেই পরম স্বপ্রতিষ্ঠ বিষয়ে যা সকল সময়ই এর দিকে আমাদের আকর্ষণ করছিল; প্রথমে এ আকর্ষণ করে আমাদের অহমাত্মক প্রকৃতির বিভিন্ন প্রলোভন দিয়ে, তারপর এমন কিছুর দ্বারা যা আরো বেশী উচ্চ, বিশাল ও বিশ্বজনীন যতক্ষণ না আমরা সমর্থ হই এর আপন সাক্ষাৎ আকর্ষণ অনুভব করতে আর এই আকর্ষণই সর্বাপেক্ষা প্রবল ও অলঙ্ঘনীয়। সাধারণ ধর্মীয় পূজার যে রূপান্তর হয় শুদ্ধা ভক্তির যোগে তাতে আমরা এই দেখি যে সাধারণ প্রচলিত ধর্মের সহেতুক ও স্বার্থদুষ্ট

পূজা পরিণত হয় অহৈতুক ও স্বপ্রতিষ্ঠ প্রেমের তত্ত্বে। বস্তুতঃ এই শেষটিই প্রকৃত ভক্তির নিকষ আর এর থেকেই বোঝা যায় যে আমরা বাস্তবিকই প্রধান পথে আছি, না এই পথে নিয়ে যায় শুধু এমন এক উপপথের উপর আছি। আমাদের কর্তব্য হল আমাদের দুর্বলতার বিভিন্ন আশ্রয়, অহং-এর বিভিন্ন প্রেরণা, আমাদের অবর প্রকৃতির বিভিন্ন প্রলোভন পরিহার করা, তবেই যদি আমরা পরে যোগ্য হতে পারি দিব্য মিলনের জন্য।

মানব প্রথমে অনুভব করে যে এক বা হয়ত অনেকগুলি শক্তি আছে যা তার চেয়ে মহত্তর বা উচ্চতর এবং যার দ্বারা প্রকৃতির মধ্যে তার জীবন আচ্ছন্ন, প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়; আর সেজন্য সে স্বভাবতঃই এর বা এদের প্রতি প্রয়োগ করে ঐ জীবনের নানাবিধ বাধাবিঘ্ন, কামনা ও বিপদের মাঝে প্রাকৃত সত্তার প্রাথমিক অমার্জিত ভাবগুলি — অর্থাৎ ভয় ও স্বার্থ। ধর্মীয় সংস্কারের বিকাশে এই সব প্রবর্তক ভাবগুলির যে বিশাল অবদান আছে তা অনস্বীকার্য, আর বস্তুতঃ মানবের বর্তমান প্রকৃতিতে, এ অপেক্ষা কম কিছু হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না; আর এমনকি যখন ধর্ম তার পথে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে তখনও আমরা দেখি যে এইসব প্রবর্তক ভাব বর্তমান ও সক্রিয়, তাদের অবদান যথেষ্ট বৃহৎ, আর ধর্ম নিজেই মানুষের উপর তার দাবীর সমর্থনে এদের ন্যায্য বলে মেনে নেয় উচিত মনে করে। বলা হয় যে ভগবানের ভয় — অথবা ঐতিহাসিক সত্যের খাতিরে বলা যেতে পারে যে বহু ভগবানের ভয় —- ধর্মের গোড়ার কথা, কিন্তু এ হল অর্ধসত্য, যদিও বৈজ্ঞানিক গবেষণা ধর্মের বিকাশের মূল অনুসন্ধানের চেষ্টায় এরই উপর অযথা জোর দিয়েছে, কারণ এই অনুসন্ধান সহানুভূতিসূচক ভাবের বদলে বরং সাধারণতঃ করা হয় ছিদ্রান্বেষী এবং প্রায়শঃই প্রতিকূলভাবে। কিন্তু শুধু ভগবানের ভয়ই গোড়ার কথা নয়, কারণ মানুষ এমনকি অত্যন্ত অসভ্য অবস্থাতেও শুধু ভয়ে কাজ করে না, তার কাজের প্রেরণা দুটি — ভয় ও কামনা, অপ্রিয় ও অহিতকারী বিষয়ের ভয় এবং প্রিয় ও হিতকর বিষয়ের কামনা; সুতরাং তার কাজের প্রেরণা — ভয় ও স্বার্থ। যতদিন না সে তার অন্তঃপুরুষের মধ্যে বেশী ক'রে এবং বাহ্য বিষয়সমূহের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে শুধু গৌণভাবে বাস করতে শেখে — ততদিন তার কাছে জীবন মুখ্যতঃ — আর এতেই সে মগ্ন থাকে — বিভিন্ন ক্রিয়া ও ফলের পরম্পরা, এমন সব বিষয় যেগুলি কাম্য, অন্বেষণের এবং ক্রিয়ার দ্বারা লাভ করার যোগ্য, এবং এমন সব বিষয় যেগুলি ভয়প্রদ ও পরিহার করা কর্তব্য, অথচ যেগুলি ক্রিয়ার ফলে তার উপর এসে পড়তে পারে। আর শুধু যে তারই ক্রিয়ার দ্বারা এই সব বিষয় তার কাছে আসে তা নয়, অপর সকলের ক্রিয়া এবং তার চারিদিকে অবস্থিত প্রকৃতির ক্রিয়ার দ্বারাও এই সব তার কাছে আসে। অতএব যখনই তার এই বোধ জাগে যে এই সবের পশ্চাতে এমন এক শক্তি আছে যা ক্রিয়া ও ফলের উপর প্রভাব বিস্তারে ও সে সব নির্ধারণে সক্ষম, তখনই তার ধারণা হয় যে এ হল প্রসাদ ও সন্তাপদাতা এবং তার উপকার বা ক্ষতি, উদ্ধার ও ধ্বংস-সাধনে সক্ষম এবং কোন কোন অবস্থাতে তা করতেও এ ইচ্ছুক।

তার সত্তার অতীব অমার্জিত অংশগুলিতে, এর সম্বন্ধে তার যে ধারণা হয় তা এই যে ভগবান তার নিজেরই মতো বিভিন্ন প্রাকৃত অহমাত্মক সংবেগের বিষয়, সন্তুষ্ট হলে উপকার করে, আর রুষ্ট হলে অপকার করে; তখন উপহারের দ্বারা তার প্রীতিসাধন ও প্রার্থনার দ্বারা তাকে অনুনয় বিনয় করার উপায় হল পূজা। সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা ক'রে ও তাঁকে তোষামোদ ক'রে তাঁকে তার পক্ষে পায়। মানসিকতা আরো উন্নত হলে তার ধারণা হয় যে জীবনের ক্রিয়ার মূলে আছে দিব্য ন্যায়পরায়ণতার এক ধ্রুব নীতি আর এর ব্যাখ্যা সে সর্বদাই দেয় নিজের ভাবনা ও চরিত্র অনুযায়ী, এ যেন তার মানুষী ন্যায়পরায়ণতার এক প্রকার বৃহত্তর প্রতিরূপ; সে নৈতিক শুভ ও অশুভের ভাবনা কল্পনা ক'রে মনে করে যে কষ্টভোগ ও বিপত্তি ও সকল অপ্রিয় বিষয় তার সব পাপের শাস্তি, আর সুখ ও সৌভাগ্য ও সকল প্রিয় বিষয় তার পুণ্যের পারিতোষিক। তার কাছে ভগবান যেন এক রাজা, বিচারক, আইনপ্রণেতা, ন্যায়কর্তা। কিন্তু তবু সে তাকে একপ্রকার বড় দরের মানুষ মনে ক'রে ভাবে যে যেমন তার নিজের ন্যায়বিচারকে প্রার্থনা ও অনুনয়ের দ্বারা অন্যরূপ করা সম্ভব, তেমন ভগবানের ন্যায়বিচারকেও ঐ একই উপায়ে ভিন্নরূপ করা সম্ভব। তার কাছে ন্যায়বিচারের অর্থ পুরস্কার ও শাস্তি আর প্রার্থীর প্রতি দয়াবশে শাস্তির বিচারকে লঘু, আবার বিশেষ অনুগ্রহ ও করুণার দ্বারা পুরস্কারের মাত্রা বৃদ্ধি করা সম্ভব; আর দিব্যসামর্থ্য তুষ্ট হলে তার ভক্ত ও অনুরাগীদের উপর সর্বদাই ঐরকম বিশেষ অনুগ্রহ ও করুণা বর্ষণ করতে পারে। তাছাড়া, আমাদের মতো ভগবানও ক্রোধ ও প্রতিহিংসায় সমর্থ, আর ক্রোধ ও প্রতিহিংসাকে নিবৃত্ত করা যায় উপহার ও প্রার্থনা ও প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা; ভগবান পক্ষপাতিত্বেও সমর্থ আর তাঁর পক্ষপাতিত্ব পাওয়া যায় উপহার ও প্রার্থনা ও স্তুতির দ্বারা। সুতরাং একমাত্র নৈতিক বিধানের উপর নির্ভর না ক'রে প্রার্থনা ও তুষ্টিসাধন হিসেবে পূজার ব্যবহার এখনো বর্তমান।

এইসব প্রেরণার সাথে, ব্যক্তিগত অনুভবের এক বিকাশ হয়; প্রথম অনুভব আসে সম্ভ্রমমিশ্রিত ভয়ের যা স্বভাবতঃই বোধ করা হয় এমন কোন বিশাল, শক্তিশালী ও অপরিমেয় বিষয়ের প্রতি যা আমাদের প্রকৃতির অতীত, কারণ এর ক্রিয়ার উৎস ও বিস্তার একপ্রকার অজ্ঞেয়; আর একটি হল, যে বিষয় প্রকৃতিতে বা পূর্ণতায় আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ তার প্রতি শ্রদ্ধা ও আরাধনার অনুভব। কেননা, মানবপ্রকৃতির গুণসম্পন্ন এক ভগবানের ভাবনা প্রধানতঃ বজায় রেখেও, তবু তার সাথে সাথে, এর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে অথবা এর বৃদ্ধি হিসেবে বিকশিত হয় আমাদের প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সর্বদর্শিতার, সর্বশক্তিমত্তার ও রহস্যময় পরিপূর্ণতার ধারণা। প্রচলিত ধর্মের দশভাগের নয়ভাগই এই সব প্রেরণার এক বিশৃঙ্খল মিশ্রণ যাতে প্রেরণাগুলি নানাভাবে বিকশিত হয়েছে এবং প্রায়শঃই লঘু, সূক্ষ্ম বা রঙীন করা হয়েছে; আর অপর দশমাংশ হল মহত্তর আধ্যাত্মিক পুরুষগণ মানবজাতির অপেক্ষাকৃত আদিম ধর্মীয় ভাবনার মধ্যে ভগবান সম্বন্ধে যে সব আরো উৎকৃষ্ট, সুন্দর ও গভীর ভাবনা আনতে সক্ষম হয়েছেন বাকী

ভালবেসে জানতে চায় না, সে আবেগ প্রেমের প্রথম আত্মপ্রকাশ মাত্র, তার অন্তিম আত্মপ্রকাশ নয়, তার সর্বাপেক্ষা তীব্রতাও নয়। বরং ভগবান সম্বন্ধে জ্ঞান যেমন বাড়তে থাকে, তেমন ভগবানে আনন্দ ও তাঁর প্রতি প্রেমও বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। জ্ঞানের ভিত্তি না থাকলে শুধু উল্লাস দৃঢ় হতে পারে না; যা আমরা ভালবাসি তার মধ্যে বাস করলেই এই দৃঢ়তা আসে, কিন্তু তার মধ্যে বাস করার অর্থ তার সঙ্গে চেতনায় এক হওয়া, আর চেতনার একত্বই জ্ঞানের সর্বোত্তম অবস্থা। ভগবৎ-জ্ঞান ভগবৎপ্রেমকে দেয় তার সর্বাপেক্ষা অটল দৃঢ়তা, তার কাছে উন্মুক্ত করে তার অনুভূতির বিশালতম হর্ষ, তাকে উত্তোলন করে তার দৃষ্টির সর্বোচ্চ শিখরসমূহে।

এই দুই সামর্থ্যের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি যদি একপ্রকার অজ্ঞানতা হয়, তাহলে এরা উভয়ে যে কর্মমার্গকে ঘৃণার চোখে দেখতে চায় এই ব'লে যে এ তাদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির আরো উন্নত শিখরের নিম্নে সে প্রবৃত্তিও কম অজ্ঞানতা নয়। জ্ঞানের একপ্রকার তীব্রতার মতো, প্রেমেরও এক প্রকার তীব্রতা আছে যার কাছে মনে হয় কর্ম এমন কিছু যা বহির্মুখী ও বিভ্রান্তিকর। কিন্তু কর্ম যে এরকম বহির্মুখী ও বিভ্রান্তিকর হয় তা কেবল ততদিন যতদিন আমরা পরতমের সঙ্গে সঙ্কল্প ও চেতনার একত্ব পাই না। একবার তা পাওয়া গেলে কর্ম হয়ে ওঠে জ্ঞানের আপন সামর্থ্য ও প্রেমের আপন প্রস্রবণ। যদি জ্ঞান হয় একত্বের আপন অবস্থা, আর প্রেম এর আনন্দ, তাহলে দিব্য কর্মসমূহও এর আলোক ও মাধুর্যের সজীব সামর্থ্য। মানবপ্রেমের অভীপ্সায় যেমন টান থাকে, তেমন প্রেমের টান হল প্রেমিক ও প্রেমাস্পদকে জগৎ ও অন্য সকল থেকে দূরে বিচ্ছিন্ন করা যখন তারা হৃদয়ের রুদ্ধ বিবাহকুঞ্জে তাদের আত্যন্তিক একত্ব উপভোগ করে। হয়ত এ হল এই পথের এক অনিবার্য টান। কিন্তু তবু যে বিশালতম প্রেম জ্ঞানে সার্থক হয়, তার কাছে জগৎ এই হর্ষ থেকে ভিন্ন ও এর প্রতিকূল কিছু নয়, বরং সে একে দেখে পরম প্রেমাস্পদের সত্তা ব'লে, সৃষ্টির সকল বিষয়কে দেখে তারই সত্তা ব'লে, আর এই দর্শনে দিব্যকর্মসমূহ লাভ করে তাদের হর্ষ ও তাদের সার্থকতা।

এই হল সেই জ্ঞান যার মধ্যে পূর্ণযোগের বাস করা চাই। ভগবানের দিকে আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে মনের বিভিন্ন শক্তি থেকে অর্থাৎ ধীশক্তি, সঙ্কল্প, হৃদয় থেকে, আর মনের মধ্যে সকল কিছুই সীমিত। যাত্রার প্রারম্ভে ও যাত্রাপথে দীর্ঘ দিন ধরে সঙ্কীর্ণতা ও আত্যন্তিকতা না থেকে পারে না। কিন্তু আরো বেশী আত্যন্তিক সাধনপন্থার চেয়ে পূর্ণযোগ এই সবকে ব্যবহার করবে আরো শিথিলভাবে; আর অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়িই এ বার হয়ে আসবে মানসিক রীতির বন্ধন থেকে। জ্ঞানমার্গ বা কর্মমার্গ থেকে যেমন পূর্ণযোগ শুরু হতে পারে, তেমন এর শুরু হতে পারে ভক্তিমার্গ থেকেও। কিন্তু যেখানে তারা মিলিত হয় সেখানেই এর সার্থকতার আনন্দের শুরু। প্রেম থেকে এ শুরু না করলেও, এর প্রেমলাভ অবশ্যম্ভাবী; কারণ প্রেমই কর্মের কিরীট ও জ্ঞানের প্রস্ফুটন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভক্তির বিভিন্ন প্রেরণা

সকল ধর্মই আরম্ভ হয় এমন এক শক্তি বা অস্তিত্বের প্রতীতি নিয়ে যা আমাদের বিভিন্ন সীমিত ও মর্ত্য আত্মা অপেক্ষা মহত্তর ও পরতর, আর থাকে ঐ শক্তির উদ্দেশে পূজার ভাবনা ও ক্রিয়া আর এর সঙ্কল্প, এর বিভিন্ন বিধান বা দাবীর প্রতি আনুগত্য স্বীকার। কিন্তু এই যে শক্তিকে ধারণা, পূজা ও মান্য করা হয় তার ও পূজকের মধ্যে ধর্ম তার প্রাথমিক অবস্থায় এক অমেয় ব্যবধান স্থাপন করে। যোগের পরাকাষ্ঠায় এই ব্যবধান লুপ্ত হয়; কারণ যোগ হল মিলন। আমরা এই মিলনে আসি জ্ঞানের মাধ্যমে; কারণ ঐ শক্তি সম্বন্ধে আমাদের সব প্রাথমিক অস্পষ্ট ধারণা যেমন স্বচ্ছ, বৃহৎ ও গভীর হয়ে ওঠে, তেমন আমরা ক্রমে বুঝতে পারি যে এ হল আমাদের নিজেদেরই পরতম আত্মা, আমাদের সত্তার প্রভব ও পোষক এবং এর দিকেই আমাদের প্রবণতা। কর্মের মাধ্যমেও আমরা মিলনে উপনীত হই কারণ প্রথমে শুধু আনুগত্য থাকলেও আমরা ক্রমে এর সঙ্কল্পের সঙ্গে আমাদের সঙ্কল্পকে অভিন্ন করি, কারণ যে অনুপাতে আমাদের সঙ্কল্প এর উৎস ও আদর্শ এই শক্তির সঙ্গে এক হয়, সেই অনুপাতে আমাদের শক্তির সুষ্ঠু ও দিব্য হওয়া সম্ভব। আবার পূজার দ্বারাও আমরা এর সঙ্গে মিলনে আসি; কারণ এক দূরবর্তী পূজার ভাবনা ও ক্রিয়া ক্রমে উন্নত হয়ে পরিণত হয় নিবিড় আরাধনার প্রয়োজনীয়তায় এবং এটি আবার পরিণত হয় প্রেমের ঘনিষ্ঠতায়, আর প্রেমের পূর্ণতা হল প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলন। পূজার এই বিকাশ থেকেই ভক্তিযোগের আরম্ভ, আর প্রেমাস্পদের সঙ্গে এই মিলনের দ্বারাই এ পায় তার সর্বোচ্চ শিখর ও পূর্ণতা।

আমাদের অবর মানবপ্রকৃতির সাধারণ প্রেরণাগুলিকে অবলম্বন ক'রেই আমাদের সত্তার সকল সহজ সংস্কার ও ক্রিয়া শুরু হয় — প্রথমে থাকে মিশ্রিত ও অহমাত্মক বিভিন্ন প্রেরণা, কিন্তু পরে এরা শুদ্ধ ও উন্নত হয়, আমাদের বিভিন্ন ক্রিয়া তাদের সাথে যে সব ফল আনে সে সব ছাড়াই প্রেরণাগুলি হয়ে ওঠে আমাদের পরা প্রকৃতির এক প্রখর ও বিশেষ প্রয়োজন; সর্বশেষে তারা উন্নত হয়ে পরিণত হয় আমাদের সত্তার এক প্রকার সুস্পষ্ট অবশ্য কর্তব্যে আর এই কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই আমরা উপনীত হই আমাদের অন্তঃস্থ সেই পরম স্বপ্রতিষ্ঠ বিষয়ে যা সকল সময়ই এর দিকে আমাদের আকর্ষণ করছিল; প্রথমে এ আকর্ষণ করে আমাদের অহমাত্মক প্রকৃতির বিভিন্ন প্রলোভন দিয়ে, তারপর এমন কিছুর দ্বারা যা আরো বেশী উচ্চ, বিশাল ও বিশ্বজনীন যতক্ষণ না আমরা সমর্থ হই এর আপন সাক্ষাৎ আকর্ষণ অনুভব করতে আর এই আকর্ষণই সর্বাপেক্ষা প্রবল ও অলঙ্ঘনীয়। সাধারণ ধর্মীয় পূজার যে রূপান্তর হয় শুদ্ধা ভক্তির যোগে তাতে আমরা এই দেখি যে সাধারণ প্রচলিত ধর্মের সহেতুক ও স্বার্থদুষ্ট

পূজা পরিণত হয় অহৈতুক ও স্বপ্রতিষ্ঠ প্রেমের তত্ত্বে। বস্তুতঃ এই শেষটিই প্রকৃত ভক্তির নিকষ আর এর থেকেই বোঝা যায় যে আমরা বাস্তবিকই প্রধান পথে আছি, না এই পথে নিয়ে যায় শুধু এমন এক উপপথের উপর আছি। আমাদের কর্তব্য হল আমাদের দুর্বলতার বিভিন্ন আশ্রয়, অহং-এর বিভিন্ন প্রেরণা, আমাদের অবর প্রকৃতির বিভিন্ন প্রলোভন পরিহার করা, তবেই যদি আমরা পরে যোগ্য হতে পারি দিব্য মিলনের জন্য।

মানব প্রথমে অনুভব করে যে এক বা হয়ত অনেকগুলি শক্তি আছে যা তার চেয়ে মহত্তর বা উচ্চতর এবং যার দ্বারা প্রকৃতির মধ্যে তার জীবন আচ্ছন্ন, প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়; আর সেজন্য সে স্বভাবতঃই এর বা এদের প্রতি প্রয়োগ করে ঐ জীবনের নানাবিধ বাধাবিঘ্ন, কামনা ও বিপদের মাঝে প্রাকৃত সত্তার প্রাথমিক অমার্জিত ভাবগুলি — অর্থাৎ ভয় ও স্বার্থ। ধর্মীয় সংস্কারের বিকাশে এই সব প্রবর্তক ভাবগুলির যে বিশাল অবদান আছে তা অনস্বীকার্য, আর বস্তুতঃ মানবের বর্তমান প্রকৃতিতে, এ অপেক্ষা কম কিছু হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না; আর এমনকি যখন ধর্ম তার পথে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে তখনও আমরা দেখি যে এইসব প্রবর্তক ভাব বর্তমান ও সক্রিয়, তাদের অবদান যথেষ্ট বৃহৎ, আর ধর্ম নিজেই মানুষের উপর তার দাবীর সমর্থনে এদের ন্যায্য বলে মেনে নেয় উচিত মনে করে। বলা হয় যে ভগবানের ভয় — অথবা ঐতিহাসিক সত্যের খাতিরে বলা যেতে পারে যে বহু ভগবানের ভয় — ধর্মের গোড়ার কথা, কিন্তু এ হল অর্ধসত্য, যদিও বৈজ্ঞানিক গবেষণা ধর্মের বিকাশের মূল অনুসন্ধানের চেষ্টায় এরই উপর অযথা জোর দিয়েছে, কারণ এই অনুসন্ধান সহানুভূতিসূচক ভাবের বদলে বরং সাধারণতঃ করা হয় ছিদ্রান্বেষী এবং প্রায়শঃই প্রতিকূলভাবে। কিন্তু শুধু ভগবানের ভয়ই গোড়ার কথা নয়, কারণ মানুষ এমনকি অত্যন্ত অসভ্য অবস্থাতেও শুধু ভয়ে কাজ করে না, তার কাজের প্রেরণা দুটি — ভয় ও কামনা, অপ্রিয় ও অহিতকারী বিষয়ের ভয় এবং প্রিয় ও হিতকর বিষয়ের কামনা; সুতরাং তার কাজের প্রেরণা — ভয় ও স্বার্থ। যতদিন না সে তার অন্তঃপুরুষের মধ্যে বেশী ক'রে এবং বাহ্য বিষয়সমূহের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে শুধু গৌণভাবে বাস করতে শেখে — ততদিন তার কাছে জীবন মুখ্যতঃ — আর এতেই সে মগ্ন থাকে — বিভিন্ন ক্রিয়া ও ফলের পরম্পরা, এমন সব বিষয় যেগুলি কাম্য, অন্বেষণের এবং ক্রিয়ার দ্বারা লাভ করার যোগ্য, এবং এমন সব বিষয় যেগুলি ভয়প্রদ ও পরিহার করা কর্তব্য, অথচ যেগুলি ক্রিয়ার ফলে তার উপর এসে পড়তে পারে। আর শুধু যে তারই ক্রিয়ার দ্বারা এই সব বিষয় তার কাছে আসে তা নয়, অপর সকলের ক্রিয়া এবং তার চারিদিকে অবস্থিত প্রকৃতির ক্রিয়ার দ্বারাও এই সব তার কাছে আসে। অতএব যখনই তার এই বোধ জাগে যে এই সবের পশ্চাতে এমন এক শক্তি আছে যা ক্রিয়া ও ফলের উপর প্রভাব বিস্তারে ও সে সব নির্ধারণে সক্ষম, তখনই তার ধারণা হয় যে এ হল প্রসাদ ও সন্তাপদাতা এবং তার উপকার বা ক্ষতি, উদ্ধার ও ধ্বংস-সাধনে সক্ষম এবং কোন কোন অবস্থাতে তা করতেও এ ইচ্ছুক।

তার সত্তার অতীব অমার্জিত অংশগুলিতে, এর সম্বন্ধে তার যে ধারণা হয় তা এই যে ভগবান তার নিজেরই মতো বিভিন্ন প্রাকৃত অহমাত্মক সংবেগের বিষয়, সন্তুষ্ট হলে উপকার করে, আর রুষ্ট হলে অপকার করে; তখন উপহারের দ্বারা তার প্রীতিসাধন ও প্রার্থনার দ্বারা তাকে অনুনয় বিনয় করার উপায় হল পূজা। সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা ক'রে ও তাঁকে তোষামোদ ক'রে তাঁকে তার পক্ষে পায়। মানসিকতা আরো উন্নত হলে তার ধারণা হয় যে জীবনের ক্রিয়ার মূলে আছে দিব্য ন্যায়পরায়ণতার এক ধ্রুব নীতি আর এর ব্যাখ্যা সে সর্বদাই দেয় নিজের ভাবনা ও চরিত্র অনুযায়ী, এ যেন তার মানুষী ন্যায়পরায়ণতার এক প্রকার বৃহত্তর প্রতিরূপ; সে নৈতিক শুভ ও অশুভের ভাবনা কল্পনা ক'রে মনে করে যে কষ্টভোগ ও বিপত্তি ও সকল অপ্রিয় বিষয় তার সব পাপের শাস্তি, আর সুখ ও সৌভাগ্য ও সকল প্রিয় বিষয় তার পুণ্যের পারিতোষিক। তার কাছে ভগবান যেন এক রাজা, বিচারক, আইনপ্রণেতা, ন্যায়কর্তা। কিন্তু তবু সে তাকে একপ্রকার বড় দরের মানুষ মনে ক'রে ভাবে যে যেমন তার নিজের ন্যায়বিচারকে প্রার্থনা ও অনুনয়ের দ্বারা অন্যরূপ করা সম্ভব, তেমন ভগবানের ন্যায়বিচারকেও ঐ একই উপায়ে ভিন্নরূপ করা সম্ভব। তার কাছে ন্যায়বিচারের অর্থ পুরস্কার ও শাস্তি আর প্রার্থীর প্রতি দয়াবশে শাস্তির বিচারকে লঘু, আবার বিশেষ অনুগ্রহ ও করুণার দ্বারা পুরস্কারের মাত্রা বৃদ্ধি করা সম্ভব; আর দিব্যসামর্থ্য তুষ্ট হলে তার ভক্ত ও অনুরাগীদের উপর সর্বদাই ঐরকম বিশেষ অনুগ্রহ ও করুণা বর্ষণ করতে পারে। তাছাড়া, আমাদের মতো ভগবানও ক্রোধ ও প্রতিহিংসায় সমর্থ, আর ক্রোধ ও প্রতিহিংসাকে নিবৃত্ত করা যায় উপহার ও প্রার্থনা ও প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা; ভগবান পক্ষপাতিত্বেও সমর্থ আর তাঁর পক্ষপাতিত্ব পাওয়া যায় উপহার ও প্রার্থনা ও স্তুতির দ্বারা। সুতরাং একমাত্র নৈতিক বিধানের উপর নির্ভর না ক'রে প্রার্থনা ও তুষ্টিসাধন হিসেবে পূজার ব্যবহার এখনো বর্তমান।

এইসব প্রেরণার সাথে, ব্যক্তিগত অনুভবের এক বিকাশ হয়; প্রথম অনুভব আসে সম্ভ্রমমিশ্রিত ভয়ের যা স্বভাবতঃই বোধ করা হয় এমন কোন বিশাল, শক্তিশালী ও অপরিমেয় বিষয়ের প্রতি যা আমাদের প্রকৃতির অতীত, কারণ এর ক্রিয়ার উৎস ও বিস্তার একপ্রকার অজ্ঞেয়; আর একটি হল, যে বিষয় প্রকৃতিতে বা পূর্ণতায় আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ তার প্রতি শ্রদ্ধা ও আরাধনার অনুভব। কেননা, মানবপ্রকৃতির গুণসম্পন্ন এক ভগবানের ভাবনা প্রধানতঃ বজায় রেখেও, তবু তার সাথে সাথে, এর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে অথবা এর বৃদ্ধি হিসেবে বিকশিত হয় আমাদের প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সর্বদর্শিতার, সর্বশক্তিমত্তার ও রহস্যময় পরিপূর্ণতার ধারণা। প্রচলিত ধর্মের দশভাগের নয়ভাগই এই সব প্রেরণার এক বিশৃঙ্খল মিশ্রণ যাতে প্রেরণাগুলি নানাভাবে বিকশিত হয়েছে এবং প্রায়শঃই লঘু, সূক্ষ্ম বা রঙীন করা হয়েছে; আর অপর দশমাংশ হল মহত্তর আধ্যাত্মিক পুরুষগণ মানবজাতির অপেক্ষাকৃত আদিম ধর্মীয় ভাবনার মধ্যে ভগবান সম্বন্ধে যে সব আরো উৎকৃষ্ট, সুন্দর ও গভীর ভাবনা আনতে সক্ষম হয়েছেন বাকী

অংশের মধ্যে সে সবের অনুপ্রবেশের দ্বারা এর পরিপ্লাবন। এর ফল সাধারণতঃ বেশ অমার্জিত এবং সন্দেহবাদ ও অবিশ্বাসের শরাঘাতের সহজ লক্ষ্য — তবে মানবমনের এই সব শক্তি বিশ্বাস ও ধর্মেরও উপকারে আসে কারণ তারা ধর্মকে বাধ্য করে তার বিভিন্ন ভাবনায় যা অমার্জিত বা মিথ্যা আছে তাকে ক্রমশঃ শুদ্ধ করতে। কিন্তু আমাদের যা দেখা দরকার তা হল পূজার ধর্মীয় সহজ সংস্কারকে শুদ্ধ ও উন্নত করার কাজে এই সব পূর্বতন প্রেরণাগুলির মধ্যে কোন্ কোন্‌টির বজায় থাকার এবং যে ভক্তিযোগ নিজেই পূজা থেকে আরম্ভ করে তার অন্তর্গত হওয়ার প্রয়োজন কি পরিমাণ। ভাগবত সত্তার ও মানব অন্তঃপুরুষের সঙ্গে এর বিভিন্ন সম্পর্কের কোন সত্যের কতদূর অনুরূপ এরা — তারই উপর ওটি নির্ভর করে; কারণ ভক্তির দ্বারা আমরা পেতে চাই ভগবানের সঙ্গে মিলন, চাই তাঁর সঙ্গে, তাঁর সত্যের সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক, — আমাদের অবর প্রকৃতির এবং এর বিভিন্ন অহমাত্মক সংবেগ ও অজ্ঞানময় ধারণার কোন মরীচিকার সঙ্গে নয়।

যে যুক্তিতে সন্দেহাকুল অবিশ্বাস ধর্মকে আক্রমণ করে তা এই যে বস্তুতঃ এই বিশ্বে এমন কোন চিন্ময় সামর্থ্য বা পুরুষ নেই যা আমাদের অপেক্ষা মহত্তর ও পরতর অথবা আমাদের অস্তিত্বের উপর যার কোনপ্রকার প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ আছে, কিন্তু যোগ এই যুক্তি স্বীকার করতে অক্ষম, কারণ এটি সকল আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিরোধী এবং যোগকেই অসম্ভব করে তুলবে। দর্শন বা প্রচলিত ধর্মের মতো যোগ কোন তথ্য বা গোঁড়ামতের বিষয় নয়, এ হল অনুভূতির বিষয়। এর অনুভূতি এই যে এক চিন্ময় বিশ্বাত্মক ও বিশ্বাতীত পুরুষ আছেন যাঁর সঙ্গে আমাদের মিলন সাধন হয় যোগের দ্বারা আর অলখের সঙ্গে মিলনের এই সচেতন অনুভূতি সর্বদাই পুনঃপুনঃ পাওয়া যায় এবং এর বাস্তবতা সর্বদাই প্রমাণ করা যায়; আবার ভৌতিক জগৎ সম্বন্ধে এবং যে সব দৃশ্যমান দেহের অদৃশ্য মনের সঙ্গে আমাদের দৈনিক কারবার তাদের সম্বন্ধে আমাদের সচেতন অনুভূতি যেমন যথার্থ, তেমনই যথার্থ ঐ চিন্ময় পুরুষ সম্বন্ধে আমাদের সচেতন অনুভূতি। সচেতন মিলনের দ্বারাই যোগ অগ্রসর হয়, সচেতন সত্তা এর যন্ত্র, আর নিশ্চেতনের সঙ্গে কোন সচেতন মিলন সম্ভব নয়। একথা সত্য যে এ মানবচেতনা ছাড়িয়ে যায়, এবং সমাধির মধ্যে অতিচেতন হয়, কিন্তু তা আমাদের সচেতন সত্তার বিলোপ নয়, এ হল শুধু তার স্বোত্তরণ, এর বর্তমান স্তর ও সাধারণ সীমা ছাড়িয়ে উজানে যাওয়া।

এ পর্যন্ত সকল যৌগিক অনুভূতি একমত। কিন্তু ধর্ম ও ভক্তিযোগ আরো অগ্রসর হয়; তারা বলে এই পুরুষের এক ব্যক্তিসত্ত্ব ও মানুষের সাথে তার মানুষী সম্বন্ধ আছে। দুয়েতেই মানুষ ভগবানের দিকে যায় যেমন সে অন্য মানুষের দিকে যায়, তার মানবসুলভ ভাব নিয়ে, মানুষী সব ভাবাবেগ নিয়ে, তবে আরো তীব্র ও উন্নত অনুভবের সঙ্গে; আর শুধু তাই নয়, ভগবানও অনুরূপভাবে এই সব ভাবাবেগে সাড়া দেন। আসল প্রশ্ন হল — এইরকম সাড়া সম্ভবপর কিনা; কারণ যদি ভগবান নৈর্ব্যক্তিক, অলক্ষণ ও

সম্বন্ধরহিত হন, তাহলে এরকম কোন সাড়া সম্ভবপর নয় আর এর কাছে মানুষের ভাবে যাওয়া অর্থহীন; বরং আমাদের কর্তব্য হবে যে সব বিষয়ে আমরা মানুষ বা যে কোন রকমের প্রাণী সে সব বিষয়ে নিজেদের মনুষ্যত্বরহিত, ব্যক্তিত্বরহিত, লুপ্ত করা; এর কাছে যাবার আর কোন সর্ত নেই, আর কোন উপায় নেই। আমাদের সঙ্গে বা বিশ্বের মধ্যে কোন কিছুর সঙ্গে যে নৈর্ব্যক্তিকত্বের কোন সম্বন্ধ নেই এবং আমাদের মনের গ্রাহ্য কোন লক্ষণ যার নেই তার জন্য প্রেম, ভয়, প্রার্থনা, স্তুতি, পূজা স্পষ্টতঃই এক অযৌক্তিক মূর্খামি। এই বিবেচনায় ধর্ম ও ভক্তির কথা ওঠেই না। অদ্বৈতবাদীর এই যে রিক্ত ও নিষ্ফল দর্শন তার জন্য সে ধর্মের এক ভিত্তি পাবার জন্য ভগবান ও বিভিন্ন দেবতার ব্যবহারিক অস্তিত্ব স্বীকার ক'রে তার মনকে মায়ার ভাষায় মোহাচ্ছন্ন রাখতে বাধ্য হয়। জনসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রচলন ও সমাদর হল কেবল তখনই যখন বুদ্ধ অধিষ্ঠিত হলেন পূজার যোগ্য পরম দেবতার স্থানে।

যদি পরতম আমাদের সঙ্গে শুধু নৈর্ব্যক্তিক সম্বন্ধ স্থাপনে সমর্থ হয় তাহলে ধর্মের যে মানবীয় সজীবতা তা আর থাকে না, আর ভক্তিমার্গের কোন কার্যকারিতা থাকে না অথবা এমনকি এ আদৌ সম্ভবপর হয় না। অবশ্য আমরা এর প্রতি আমাদের মানবীয় সব ভাবাবেগ প্রয়োগ করতে পারি, কিন্তু তা হবে অস্পষ্ট ও অনিশ্চিতভাবে, মানবীয় সাড়া পাবার আশা না ক'রে; একমাত্র যে ভাবে এ আমাদের কোন উত্তর দিতে সক্ষম তা হল আমাদের ভাবাবেগগুলি স্তব্ধ ক'রে ও আমাদের উপর এর নিজের নৈর্ব্যক্তিক শান্তি ও অপরিবর্তনীয় সমত্ব নিক্ষেপ ক'রে; আর বস্তুতঃ যখন আমরা পরম দেবতার শুদ্ধ নৈর্ব্যক্তিকত্বের দিকে অগ্রসর হই তখন এটাই ঘটে। আমরা একে এক পরম বিধান হিসেবে মান্য করতে পারি, এর শান্ত সত্তার প্রতি আস্পৃহায় আমাদের অন্তঃপুরুষকে এতে তুলতে পারি, এর মধ্যে উপচিত হতে পারি আমাদের ভাবপ্রধান প্রকৃতিকে পরিহার ক'রে; আমাদের মধ্যকার মানুষী সত্তার তাতে তৃপ্তি আসে না, কিন্তু এ অক্ষুব্ধ, স্থির ও স্তব্ধ হয়। কিন্তু ভক্তিযোগ চায়, আর এই বিষয় এ ধর্মের সঙ্গে এক মত, যে এই নৈর্ব্যক্তিক আস্পৃহা অপেক্ষা আরো নিবিড় ও প্রীতিপূর্ণ পূজার প্রয়োজন। এর লক্ষ্য আমাদের সত্তার নৈর্ব্যক্তিক অংশের সঙ্গে মানবীয় অংশেরও দিব্য সার্থকতা; এর লক্ষ্য মানবের ভাবপ্রধান সত্তার দিব্য পরিতৃপ্তি। পরতমের কাছে এর দাবী হল — আমাদের প্রেম গ্রহণ কর ও তুমি সাড়া দাও তোমার প্রেম দিয়ে; যেমন আমরা তাঁতে আনন্দ পাই ও তাঁকে খুঁজি, এই বিশ্বাস ক'রে যে তিনিও তেমন আমাদের বিষয়ে আনন্দ পান ও আমাদের খোঁজেন। আর এই দাবীকে যুক্তিহীন ব'লে নিন্দা করা যায় না, কারণ যদি পরম ও বিশ্বাত্মক পুরুষ আমাদের বিষয়ে কোন আনন্দ না পেতেন তাহলে এই যে আমরা জন্মেছি ও বেঁচে আছি তা কিভাবে সম্ভব তা বোঝা দুষ্কর হয়, আর যদি তিনি তাঁর দিকে আমাদের না টানতেন — আর এটাই আমাদের জন্য ভগবানের অন্বেষণ — তা হলে কেন যে আমরা তাঁকে পাবার জন্য আমাদের সাধারণ জীবনের গণ্ডির বাইরে আসি তার কোন কারণ প্রকৃতির মধ্যে দেখা যায় না।

সুতরাং ভক্তিযোগ আদৌ সম্ভব হতে হলে আমাদের প্রথমে স্বীকার করতে হবে যে পরম সন্মাত্র এক আচ্ছিন্ন প্রত্যয় নয় বা অস্তিত্বের এক অবস্থা নয়, ইনি এক চিন্ময় পুরুষ; দ্বিতীয়তঃ, তিনি বিশ্বের মধ্যে আমাদের দেখা দেন এবং কোন এক প্রকারে তিনি এর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, আবার এর উৎসও তা না হলে তাঁর দেখা পাবার জন্য আমাদের যেতে হ'ত বিশ্বজীবনের বাইরে; তৃতীয়তঃ, আমাদের সঙ্গে তিনি ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনে সমর্থ এবং সেজন্য তাঁর ব্যক্তিরূপ ধারণে অসমর্থ হওয়া কোনমতেই চলে না; আর সর্বশেষ, যখন আমরা তাঁর দিকে যাই আমাদের সব মানুষী ভাবাবেগ নিয়ে, আমরা সেইভাবেই সাড়া পাই। এর এই অর্থ নয় যে ভগবানের স্বভাব ঠিক মানবের স্বভাবেরই মতো, যদিও আরো বেশী মাত্রায় অথবা এও নয় যে তাঁর স্বভাব কতকগুলি দোষমুক্ত মানবের স্বভাব আর ভগবান এক বড়দরের মানব আর না হয় আদর্শ মানব। আমাদের সাধারণ চেতনায় আমরা যেমন এক সীমিত অহং, ভগবান যে তেমন গুণের দ্বারা সীমিত কোন অহং তা নয় আর তিনি তা হতে পারেন না। কিন্তু অপর পক্ষে, এটি নিশ্চিত যে ভগবান থেকেই আমাদের মানব চেতনার উৎপত্তি ও প্রকাশ হয়েছে, যদিও আমাদের মধ্যে এ যেসব রূপ নিয়েছে সেগুলি দিব্য চেতনা থেকে অন্যবিধ হতে পারে, আর হতে বাধ্য কারণ আমরা অহং-এর দ্বারা সীমিত, এবং তাঁর মতো বিশ্বজনীন নই, আমাদের প্রকৃতির উপরিস্থ নই, আমাদের গুণ ও তাদের ক্রিয়ার চেয়ে মহত্তর নই, তবু আমাদের সব মানুষী ভাবাবেগ ও সংবেগের পিছনে তাঁর এক সত্য থাকতে বাধ্য আর আমাদের সব ভাবাবেগ ও সংবেগ এর সীমিত এবং সেজন্য প্রায়ই বিকৃত অথবা এমনকি নিকৃষ্ট রূপ। আমাদের ভাবময় সত্তার মাধ্যমে তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ে আমরা ঐ সত্যের দিকেই অগ্রসর হই আর তা আমাদের কাছে নেমে আসে আমাদের সব ভাবাবেগের সঙ্গে মিলিত হয়ে সে সবকে নিজের দিকে তোলবার জন্য; এরই মাধ্যমে আমাদের ভাবময় সত্তা যুক্ত হয় তাঁর সঙ্গে।

দ্বিতীয়তঃ, এই পরতম পুরুষ আবার বিরাট পুরুষও, আর বিশ্বের সঙ্গে আমাদের বিভিন্ন সম্বন্ধগুলি বিভিন্ন উপায় যার সাহায্যে আমরা তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনে যোগ্য হই। যেসব ভাবাবেগ দিয়ে আমরা আমাদের উপর বিশ্ব অস্তিত্বের ক্রিয়ার সম্মুখীন হই, বস্তুতঃ সে সবই চলে তাঁর দিকে, তবে প্রথমে তা হয় অজ্ঞানতার মধ্যে, কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধির সাথে সাথে সে সবকে তাঁর দিকে সজ্ঞানে চালনা ক'রেই আমরা তাঁর সঙ্গে আরো অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপন করি এবং যেমন আমরা ঐক্যের আরো নিকটবর্তী হই, সে সবের মধ্যে যা কিছু মিথ্যা ও অজ্ঞানময় তা খসে পড়ে। উন্নতির যে অবস্থায় আমরা আছি সেই অবস্থানুযায়ী তিনি সে সবেই সাড়া দেন; আমাদের অপূর্ণ অগ্রসরে যদি আমরা কোন সাড়া বা সাহায্য না পেতাম, তাহলে আরো সুষ্ঠু সম্বন্ধগুলি কখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারত না। মানুষরা তাঁর দিকে যে ভাবে এগিয়ে যায়, তিনি তেমন ভাবেই তাদের গ্রহণ করেন এবং দিব্য প্রেম দিয়ে তাদের ভক্তিতে সাড়াও দেন, "তাঁথেব ভজতে"। সত্তার যে রূপ, যে সব গুণ তারা তাঁর উপর আরোপ করে, সেই রূপ ও সেইসব গুণেরই মাধ্যমে তিনি

তাদের বিকাশ সাধনে সাহায্য করেন, তাদের অগ্রগতিতে উৎসাহ দেন অথবা তা নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তাদের পথ দিয়েই, তা সে পথ সরল বা কুটিল হ'ক, তিনি তাদের টেনে নেন তাঁর দিকে। তাঁর সম্বন্ধে তারা যা দেখে তা-ও এক সত্য কিন্তু এমন সত্য যা তাদের কাছে প্রতিভাত হয় তাদের আপন সত্তা ও চেতনার সংজ্ঞায়, আংশিকভাবে, বিকৃত হয়ে, তাদের নিজস্ব পরতর সদ্‌বস্তুর সংজ্ঞায় নয়, যখন আমরা সম্পূর্ণ দেবত্বকে জানতে পারি তখন তিনি যে বিভাব গ্রহণ করেন সে বিভাবে নয়। ধর্মের অপেক্ষাকৃত অমার্জিত বা আদিম উপাদানের সমর্থনে যুক্তি এটাই আবার এটাই তাদের স্বল্পস্থায়িত্বের ও লুপ্ত হওয়ার দণ্ডাজ্ঞারও সঙ্গত কারণ। এদের সমর্থন করা যায় এই কারণে যে তাদের পশ্চাতে ভগবানের এক সত্য আছে আর বিকাশমান মামবচেতনার ঐ অবস্থায় ঐ সত্যের দিকে শুধু ঐ ভাবেই যাওয়া এবং আরো অগ্রসর হওয়া সম্ভব; তারা দণ্ডাদিষ্ট এই কারণে যে ভগবানের সঙ্গে এই সব অমার্জিত ধারণায় ও সম্বন্ধে সর্বদাই বজায় থাকার অর্থ হল সেই নিবিড়তর মিলন থেকে বঞ্চিত থাকা যার দিকে এই সব অমার্জিত উপক্রম কতকগুলি প্রাথমিক পদক্ষেপ, তা তারা যতই কম দৃঢ় হ'ক।

আমরা বলেছি যে সমগ্র জীবনই প্রকৃতির যোগ; এখানে এই জড় জগতে জীবনের অর্থ হল প্রকৃতির প্রাথমিক নিশ্চেতনা থেকে বহির্যাত্রা আর তার নিশানা হল যে চিন্ময় ভগবান থেকে তার উৎপত্তি তাঁর সঙ্গে পুনর্মিলিত হওয়া। ধর্মে মানবমন যা প্রকৃতির সংসিদ্ধ যন্ত্র, মানবের মাঝে তার এই নিশানার কথা অবগত হয়, তার আস্পৃহায় সাড়া দেয়। এমনকি সাধারণ প্রচলিত ধর্মও একপ্রকার অজ্ঞানময় ভক্তিযোগ। কিন্তু আমরা যাকে বিশেষ ক'রে যোগ বলি এ তা হয় না যতক্ষণ না প্রেরণা কিছু মাত্রায় অতীন্দ্রিয়ভাবে স্বচ্ছ হয়, যতক্ষণ না এ দেখে যে মিলনই এর উদ্দেশ্য এবং প্রেম মিলনের তত্ত্ব এবং সেজন্য যতক্ষণ না এ সচেষ্ট হয় প্রেম উপলব্ধি করতে এবং এর পার্থক্যসূচক লক্ষণ বিসর্জন দিতে প্রেমের মধ্যে। যখন ঐ কাজ নিষ্পন্ন হয়, তখন বুঝতে হবে যে যোগ লক্ষ্যের দিকে এগিয়েছে নিঃসংশয়ে এবং তার ফলপ্রাপ্তি সম্বন্ধে নিশ্চিত। এইভাবে ভক্তির সব প্রেরণাকে প্রথম যেতে হবে ভগবানের দিকে নিবিষ্ট ও প্রবলভাবে এবং তারপর যাতে এদের অতীব স্থূল উপাদানগুলি দূর হয় সেজন্য এদের কর্তব্য নিজেদের রূপান্তরিত করা এবং সর্বশেষে প্রতিষ্ঠিত হওয়া শুদ্ধ ও ষোড়শকল প্রেমে। প্রেমের পূর্ণ মিলনের সঙ্গে যা সবের অবস্থান সম্ভব নয়, শেষ পর্যন্ত তাদের সকলেরই বিদায় নিশ্চিত, থাকতে পারে শুধু সেইগুলি যেগুলি নিজেদের রূপায়িত করতে পারে দিব্য প্রেমের প্রকাশে ও দিব্য প্রেমাস্বাদনের উপায়ে। কারণ প্রেমই আমাদের মধ্যে একমাত্র ভাবাবেগ যা সম্পূর্ণ অহৈতুক ও স্বপ্রতিষ্ঠ হতে পারে; প্রেম ব্যতিরেকে প্রেমের অন্য কোন হেতুর প্রয়োজন নেই। কেননা, আমাদের সকল ভাবাবেগেরই উৎস হল আনন্দের অন্বেষণ ও তার প্রাপ্তি, অথবা এই অন্বেষণের বিফলতা অথবা যে আনন্দ আমরা পেয়েছি বা আয়ত্ত করব বলে ভেবেছিলাম, তার নিষ্ফলতা; কিন্তু যার দ্বারা আমরা সরাসরি ভাগবত পুরুষের স্বপ্রতিষ্ঠ আনন্দের প্রাপ্তিতে প্রবেশ লাভে সমর্থ হই

তা-ই প্রেম। বস্তুতঃ ভাগবত প্রেম নিজেই ঐ প্রাপ্তি, আর এ যেন আনন্দের দেহ।

এই সব সত্যের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় আমরা কিভাবে এই যোগের দিকে অগ্রসর হব এবং এই পথে আমাদের যাত্রা কেমন হবে। অনেক গৌণ প্রশ্ন আসে যেগুলির সম্বন্ধে মানুষের বুদ্ধি ব্যস্ত হয়, কিন্তু যদিও সেগুলি সম্বন্ধে আমাদের পরে আলোচনা করতে হতে পারে, তবু তারা মূলগত প্রশ্ন নয়। ভক্তিযোগ হৃদয়ের ব্যাপার, এ বুদ্ধির ব্যাপার নয়। কারণ এই পথে যে জ্ঞান আসে এমনকি তার জন্যও আমরা যাত্রা করি হৃদয় থেকে, বুদ্ধি থেকে নয়। সুতরাং হৃদয়ের ভক্তির বিভিন্ন প্রেরণা ও তাদের অন্তিম প্রাপ্তি এবং প্রেমের পরম ও অনুপম স্বপ্রতিষ্ঠ প্রেরণার মধ্যে কোনরূপে তাদের তিরোধান — এই সবই আমাদের প্রথমে জানা দরকার এবং এরাই আসল বিষয়। অনেক দুরূহ প্রশ্ন আছে, — যেমন ভগবানের কি কোন অতিভৌতিক রূপ বা রূপ-সামর্থ্য আছে যা থেকে বিভিন্ন সকল রূপের উৎপত্তি হয়, না তিনি নিত্য নীরূপ; বর্তমানে আমাদের যেটুকু বলা প্রয়োজন তা এই যে ভক্ত তাঁকে যে নানাবিধ রূপ দেয় তিনি অন্ততঃ সেসব গ্রহণ করেন এবং এইসবের মাধ্যমে তাকে প্রেমের মধ্যে দেখা দেন, তবে তাঁর চিৎপুরুষের সঙ্গে আমাদের চিৎপুরুষের মিশ্রণই ভক্তির ফলাস্বাদনের পক্ষে অত্যাবশ্যক। সেইরকম কোন কোন ধর্ম ও ধর্মীয় দর্শন ভক্তিকে বাঁধতে চায় এই ধারণায় যে মানবের অন্তঃপুরুষ ও ভগবানের মধ্যে এক নিত্য ভেদ বর্তমান, আর তারা বলে যে এই ভেদ না থাকলে প্রেম ও ভক্তিরও থাকা সম্ভব নয়; অথচ যে দর্শনের বিবেচনায় একমাত্র "একম্"ই আছে, সেই দর্শনের কাছে প্রেম ও ভক্তি শুধু অজ্ঞানময় অবস্থার অন্তর্গত, যতদিন অজ্ঞানতা থাকে ততদিন হয়ত এরা প্রয়োজনীয় অথবা অন্ততঃ প্রাথমিক চেষ্টা হিসেবে উপকারী, কিন্তু যখন সব ভেদ লুপ্ত হয় তখন তাদের অস্তিত্ব অসম্ভব এবং তখন দরকার তাদের ঊর্ধ্বে উঠে তাদের পরিত্যাগ করা। কিন্তু আমরা অদ্বয় সন্মাত্রের সত্য স্বীকার করতে পারি এই অর্থে যে প্রকৃতির মধ্যে সকল কিছুই ভগবান, যদিও ভগবান প্রকৃতিস্থ সকল কিছুর অতিরিক্ত, আর তখন প্রেম সেই বৃত্তি হয় যার দ্বারা প্রকৃতি ও মানবের মধ্যকার ভগবান অধিগত ও উপভোগ করেন বিশ্বাত্মক ও পরতম ভগবানের আনন্দ। যাই হ'ক না কেন, প্রেমের স্বরূপই এমন যে এর দ্বিবিধ চরিতার্থতা থাকতে বাধ্য — একটির দ্বারা প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ উপভোগ করে ভেদের মধ্যে তাদের মিলন এবং সেই সবও উপভোগ করে যাতে নানাবিধ মিলনের হর্ষ বৃদ্ধি পায়; আর অন্যটির দ্বারা তারা পরস্পরের মধ্যে নিজেদের ফেলে দিয়ে হয়ে ওঠে এক আত্মা। আদি পর্বে ঐ সত্যই যথেষ্ট, কারণ এই হল প্রেমের স্বরূপ; আর যেহেতু প্রেমই এই যোগের মূল প্রেরণা, সেহেতু প্রেমের সমগ্র স্বরূপ যেমন হবে, যোগসাধনার পরিণতি ও সার্থকতাও তেমন হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

ভগবন্মুখী ভাবাবেগ

যোগের নীতি হল মানবচেতনার সকল বা কোন একটি সামর্থ্যকে ভগবানের দিকে ফেরানো যাতে সত্তার ঐ ক্রিয়ার দ্বারা আসতে পারে সংযোগ, সম্বন্ধ, মিলন। ভক্তিযোগে ভাবময় প্রকৃতিকেই সাধন করা হয়। এর প্রধান অঙ্গ হল মানব ও ভাগবত পুরুষের মধ্যে কোন মানবীয় সম্পর্ক অবলম্বন করা আর এর সাহায্যে হৃদয়ের ভাবাবেগগুলিকে তাঁর দিকে সর্বদাই তীব্রতরভাবে প্রবাহিত করা যাতে মানবের অন্তঃপুরুষ তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক হয়ে উঠতে পারে ভাগবত প্রেমের প্রচণ্ড অনুরাগে। ভক্ত তার যোগের দ্বারা যা চায় তা শেষ পর্যন্ত একত্বের শুদ্ধ শান্তি অথবা একত্বের সামর্থ্য ও নিষ্কাম সঙ্কল্প নয়, সে চায় মিলনের নিবিড় আনন্দ। যে কোন ভাব হৃদয়কে এই নিবিড় আনন্দের জন্য প্রস্তুত করতে পারে তাকে-ই যোগ গ্রহণ করে; আর যা কিছু তা থেকে সরিয়ে আনে তা উত্তরোত্তর লোপ পেতে বাধ্য যতই প্রেমের দৃঢ় মিলন আরো ঘনিষ্ঠ ও পূর্ণ হতে থাকে।

যে সকল ভাব নিয়ে ধর্ম অগ্রসর হয় ভগবানের পূজা, সেবা ও প্রেমের দিকে, সে সবকেই যোগ স্বীকার করে, তবে শেষ পর্যন্ত সে সবকে তার সঙ্গে না রাখলেও, প্রথমের দিকে ভাবময় প্রকৃতির চেষ্টা হিসেবে সে সব থাকে। কিন্তু একটি ভাব আছে যার সাথে যোগ — অন্ততঃ যেভাবে ভারতে এর অনুশীলন হয় — কোন সংস্রব রাখে না। কতকগুলি ধর্মে, হয়ত বেশীরভাগ ধর্মেই ভগবানের প্রতি ভয়ের ভাবনার স্থান অতি বৃহৎ, কখনো কখনো এরই স্থান বৃহত্তম, আর ভগবৎ-ভীরু লোকই এই সব ধর্মের আদর্শ পূজারী। অবশ্য একপ্রকার ভক্তির সঙ্গে এবং কিছুদূর পর্যন্ত ভয়ের ভাব সম্পূর্ণ সঙ্গত; এর পরাকাষ্ঠায় এ উন্নত হয় দিব্য সামর্থ্যের, দিব্য ন্যায়পরায়ণতার, দিব্য বিধানের, দিব্য পবিত্রতার পূজায়, সর্বশক্তিমান স্রষ্টা ও বিচারকের প্রতি নৈতিক বাধ্যতায়, ও ভয়মিশ্রিত ভক্তিতে। সুতরাং এর প্রেরণা কিছু নীতিমূলক ও কিছু ধর্মমূলক, এ ঠিক ভক্তের প্রেরণা নয়, বরং এ কর্মীর প্রেরণা যখন সে তার কর্মে প্রবৃত্ত হয় তার কর্মের দিব্য বিধাতা ও বিচারকের প্রতি ভক্তিবশে। এই ভাব মনে করে যে ভগবান রাজা, এ তাঁর সিংহাসনের মহিমার অতি নিকটে যায় না, তবে যেতে পারে যদি এ পবিত্রতার দ্বারা যোগ্য হয় অথবা যদি এমন কোন মধ্যস্থ তাকে সেখানে নিয়ে যায় যে নিবৃত্ত করবে পাপের প্রতি ভগবানের ক্রোধকে। তবে ভগবানের অতি নিকটে এসেও তার গরীয়ান পূজাস্পদ থেকে এ নিজেকে সম্ভ্রমসূচক দূরত্বে রাখে। মায়ের প্রতি শিশুর অথবা প্রেমাস্পদের প্রতি প্রেমিকের ভয়শূন্য বিশ্বাস নিয়ে, অথবা পূর্ণ প্রেমের সঙ্গে একত্বের যে অন্তরঙ্গ বোধ থাকে সে বোধ নিয়ে এ ভগবানকে আলিঙ্গন করতে অক্ষম।

কতকগুলি আদিম সাধারণে প্রচলিত ধর্মে ভগবানকে যে কারণে ভয় করা হ'ত সে

কারণ ছিল অত্যন্ত অমার্জিত। অনুভব করা হ'ত যে জগতের মধ্যে মানুষের চেয়ে এমন সব মহত্তর শক্তি আছে যাদের স্বভাব ও আচরণ অবোধ্য এবং যারা মনে হ'ত সর্বদাই উদ্যত তার উন্নতির সময় তাকে ধরাশায়ী করতে এবং তাদের অপ্রীতিকর কার্যের জন্য তাকে আঘাত করতে। দেবতাদের সম্বন্ধে ভয়ের উৎপত্তির কারণ ছিল ভগবান সম্বন্ধে মানবের অজ্ঞানতা এবং যে সব বিধানে জগৎ শাসিত হয় সে সব বিধান সম্বন্ধেও তার অজ্ঞানতা। এর ধারণায় এই মহত্তর শক্তিগুলি স্বেচ্ছাচারী ও মানুষের মতো রাগদ্বেষসম্পন্ন; কল্পনা করা হ'ত যে এরা পৃথিবীর বড় বড় লোকেরই প্রতিমূর্তি, এরা খামখেয়ালী, অত্যাচারী, ব্যক্তিগত শত্রুভাবাপন্ন হতে পারে, আর ঈর্ষাপরায়ণও হতে পারে যদি মানুষের এমন কোন মহত্ত্ব থাকে যার জন্য সে পার্থিব প্রকৃতির তুচ্ছতা ছাড়িয়ে দিব্য প্রকৃতির অতি সমীপে আসার যোগ্য হয়। এই সব ধারণার মধ্যে কোন খাঁটি ভক্তির উৎপত্তির সম্ভাবনা ছিল না, শুধু আসতে পারত সেই অনিশ্চিত রকমের ভক্তি (যা আদৌ ভক্তি কিনা সন্দেহ) যা দুর্বলের থাকা সম্ভব সবলের জন্য যাতে সে তার আশ্রয় কিনতে পারে পূজা ও উপহার ও স্তুতির দ্বারা এবং সবল তার অধীনস্থের উপর যে সব বিধান চাপিয়ে পুরস্কার ও শাস্তির দ্বারা তা মানতে বাধ্য করতে পারে সেগুলির অনুবর্তী হয়ে, আর না হয় থাকতে পারত সেই দীন ও অতীব নম্র সম্মান ও আরাধনার ভাব যা অনুভব করা হয় এমন মহত্ত্ব, গরিমা, প্রজ্ঞা ও রাজকীয় সামর্থ্যের প্রতি যা জগতের ঊর্ধ্বে এবং এর সব বিধান ও ঘটনার উৎস অথবা অন্ততঃপক্ষে নিয়ামক।

ভক্তিমার্গের প্রাথমিক পর্যায়ের আরো নিকটে আসা সম্ভব হয় যখন দিব্য সামর্থ্যের এই উপাদানটি এই সব অমার্জিত ভাবনা থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করে এমন এক দিব্য শাসক, জগৎস্রষ্টা ও বিধাতার ভাবনা যিনি স্বর্গ ও মর্ত্যের ঈশ্বর, এবং তার সৃষ্টির সকল বিষয়ের দিশারী ও সাহায্যদাতা ও পরিত্রাতা। ভাগবত সত্তা সম্বন্ধে এই বৃহত্তর ও উচ্চতর ভাবনায় পুরনো অসংস্কৃত ভাবনার অনেক উপাদান বহুদিন বর্তমান ছিল এবং এখনো ঐরকম কিছু উপাদান আছে। এই ভাবনাটিকে সবচেয়ে বড় ক'রে সামনে এনেছিল ইহুদীরা এবং তাদের কাছ থেকেই এটি ছড়িয়ে পড়েছিল জগতের অধিকাংশ স্থানে। তারা এমন এক সাধু ভগবানে বিশ্বাস করতে পারত যিনি অনুদার, স্বেচ্ছাচারী, ক্রোধপরায়ণ, ঈর্ষান্বিত, প্রায়শঃই নিষ্ঠুর এবং এমনকি অযথা রক্তপিপাসু। এমনকি এখনো কেউ কেউ এমন এক স্রষ্টায় বিশ্বাস করে যিনি স্বর্গ ও নরক সৃষ্টি করেছেন — এক চিরন্তন স্বর্গ ও এক চিরন্তন নরক, তাঁর সৃষ্টির দুই মেরু; আর এমনকি কোন কোন ধর্মমতে তিনি তাঁর সৃষ্ট সব জীবের জন্য পূর্ব থেকেই শুধু যে পাপ ও দণ্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করার বিধান করেছেন তা নয়, চিরন্তন নরকবাসেরও ব্যবস্থা করেছেন। তবে শিশুসুলভ ধর্মবিশ্বাসের এই সব আতিশয্য বাদ দিলেও, ভগবান সম্বন্ধে এই যে ভাবনা যে তিনি সর্বশক্তিমান বিচারক, আইনপ্রণেতা, রাজা, তা শুধু এককভাবে নিলে এ এক অমার্জিত ও অপূর্ণ ভাবনা, কারণ এতে থাকে প্রধান সত্যের বদলে এক অবর ও

বাহ্য সত্য এবং এর দ্বারা অধিকতর অন্তরঙ্গ সদ্‌বস্তুর জন্য আরো উচ্চভাবে অগ্রসর হওয়া নিবারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এতে পাপের বোধের গুরুত্ব সম্বন্ধে বড় বেশী বলা হয় এবং সেজন্য জীবের ভয় ও আত্ম-অবিশ্বাস ও দুর্বলতা দীর্ঘস্থায়ী হয় ও বৃদ্ধি পায়। এ পুণ্য আচরণ ও পাপ-নিবৃত্তিকে যুক্ত করে পুরস্কার ও দণ্ডের ভাবনার সঙ্গে যদিও এই সব দেওয়া হয় পরবর্তী জীবনে, আর যে উচ্চতর ভাব দ্বারা নৈতিক সত্তা চালিত হওয়া উচিত তার স্থানে এ ভয় ও স্বার্থের হীন প্রেরণাগুলিকেই তাদের কারণ করে। এ স্বয়ং ভগবানকে ধর্মজীবনে মানবাত্মার লক্ষ্য না ক'রে লক্ষ্য করে স্বর্গ ও নরককে। মানবমনের মন্থর শিক্ষাব্যাপারে এই সব অমার্জিত বিষয়গুলি তাদের প্রয়োজনীয় কাজ করেছে, কিন্তু যোগীর পক্ষে তারা আদৌ উপযোগী নয়, কারণ যোগী জানে যা কিছু সত্য তাদের আছে তা বরং বিশ্বের বাহ্য বিধানের সঙ্গে বিকাশমান মানবাত্মার বিভিন্ন বাহ্য সম্বন্ধের অন্তর্গত, ভগবানের সঙ্গে মানবাত্মার বিভিন্ন আন্তর সম্বন্ধের অন্তরঙ্গ সত্য তা নয়; অথচ এই সম্বন্ধগুলিই যোগের যথার্থ ক্ষেত্র।

তবু, এই ধারণা থেকে এমন কতকগুলি নতুন ভাবনার উদয় হয় যার সাহায্যে আমরা উপনীত হই ভক্তিযোগের দ্বারপ্রান্তের আরো নিকটে। প্রথমে উদয় হতে পারে ভগবান সম্বন্ধে এই ভাবনা যে তিনিই আমাদের নৈতিক সত্তার উৎস ও বিধান ও লক্ষ্য, আর এই ভাবনা থেকে এই জ্ঞান আসা সম্ভব যে তিনিই আমাদের পরমাত্মা আর এর জন্যই আমাদের সক্রিয় প্রকৃতির আস্পৃহা, তিনিই পরম সঙ্কল্প যার সঙ্গে আমাদের সঙ্কল্প এক করা চাই, তিনিই শাশ্বত ঋত ও শুদ্ধতা ও সত্য ও প্রজ্ঞা যার সঙ্গে সামঞ্জস্যে আমাদের প্রকৃতির উপচয় আবশ্যক এবং যাঁর সত্তার দিকে আমাদের সত্তা আকৃষ্ট হয়। এইভাবে আমরা আসি কর্মযোগে আর এই যোগে ভগবানের প্রতি ব্যক্তিগত ভক্তির স্থান আছে কারণ দিব্য সঙ্কল্পই দেখা দেয় আমাদের কর্মের অধীশ্বররূপে যাঁর কথা শোনা, যাঁর দিব্য প্রচোদনা পালন করা আমাদের কর্তব্য এবং যাঁর কাজ করাই আমাদের সক্রিয় জীবন ও সঙ্কল্পের একমাত্র ব্রত। দ্বিতীয়তঃ উদয় হয় দিব্য চিৎপুরুষের ভাবনা, এই ভাবনা যে তিনি সকলের পিতা ও তাঁর সকল জীবের উপর প্রসারিত করেন তাঁর করুণামাখা আশ্রয় ও প্রেমের পক্ষ, আর ঐ থেকেই গড়ে ওঠে অন্তঃপুরুষ ও ভগবানের মধ্যে পিতা ও সন্তানের সম্পর্ক, প্রেমের সম্পর্ক, আর তার পরিণামস্বরূপ সকল মানুষের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক। যে ভগবানের প্রকৃতির শান্ত শুদ্ধ আলোয় আমাদের বিকশিত হতে হবে, যে অধীশ্বরের দিকে আমরা অগ্রসর হই কর্ম ও সেবার মাধ্যমে, যে পিতা সাড়া দেন সন্তানবৎ শরণার্থী অন্তঃপুরুষের প্রেমে — তাঁর সঙ্গে এই সব বিভিন্ন সম্পর্কগুলি ভক্তিযোগের স্বীকৃত অঙ্গ।

যে মুহূর্তে আমরা এই সব নতুন ভাবনা ও এদের গভীরতর আধ্যাত্মিক অর্থের মধ্যে ভালোভাবে প্রবেশ করি, সে মুহূর্তে ভগবৎ-ভয়ের প্রেরণা অকেজো, অনাবশ্যক ও এমনকি অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রধানতঃ নৈতিক ক্ষেত্রেই এর গুরুত্ব যখন জীব শ্রেয়ের জন্যই শ্রেয়ের অনুবর্তী হওয়ার জন্য যথেষ্ট বিকশিত হয়নি, আর তার প্রয়োজন তার

উপরিস্থ এমন এক কর্তৃত্বময় পুরুষ যার ক্রোধ অথবা কঠোর নিরুত্তাপ বিচারকে সে ভয় করতে পারে এবং ঐ ভয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারে পুণ্যের প্রতি তার নিষ্ঠা। যখন আমরা আধ্যাত্মিকতার মধ্যে বিকশিত হই তখন এই প্রেরণার আর বেশীদিন থাকা সম্ভব নয়, এ শুধু থাকতে পারে তখনো মনের মধ্যে কোন বিভ্রান্তি বা পুরনো মানসিকতার রেশ বজায় থাকার দরুন। তাছাড়া, যোগে যা নৈতিক লক্ষ্য তা পুণ্যের বাহ্য ভাবনার নৈতিক লক্ষ্য হতে ভিন্ন। সাধারণতঃ মনে করা হয় যে নীতিশাস্ত্র উচিত ক্রিয়ার একপ্রকার ব্যবস্থা, কর্মই সবকিছু, আর কিভাবে উচিত কর্ম করা যায় তা-ই সমগ্র প্রশ্ন ও চিন্তার সমগ্র বিষয়। কিন্তু যোগীর কাছে প্রধানতঃ ক্রিয়ার গুরুত্ব ক্রিয়ার জন্য নয়, বরং এর গুরুত্ব এই কারণে যে ভগবানের দিকে অন্তঃপুরুষের উপচয়ের এ হল এক উপায়। এইজন্য ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র ক্রিয়ার গুণের উপর তত জোর দেয় না, যত জোর দেয় যে অন্তঃপুরুষ থেকে ক্রিয়া প্রবাহিত হয় তার গুণের উপর, তার সত্য, নির্ভীকতা, শুদ্ধতা, প্রেম, করুণা, হিতৈষণা, অহিংসার উপর, এদের বহিঃপ্রবাহ হিসেবে বিভিন্ন ক্রিয়ার উপর। প্রাচীন পাশ্চাত্য ভাবনা এই যে মানবপ্রকৃতি স্বভাবতঃই মন্দ আর পুণ্য এমন এক বিষয় যা আমাদের অধঃপতিত প্রকৃতির বিরুদ্ধ হলেও তা পালন করা কর্তব্য; প্রাচীন কাল থেকে যোগীদের ভাবনায় অভ্যস্ত ভারতীয় মানসিকতার কাছে এই পাশ্চাত্য ভাবনা অপরিচিত। আমাদের প্রকৃতিতে যেমন উগ্র রাজসিক গুণ ও নিম্নমুখী তামসিক গুণ আছে, তেমন আছে শুদ্ধতর সাত্ত্বিক উপাদান, এই সাত্ত্বিক গুণই এর শ্রেষ্ঠ অংশ এবং একে উদ্দীপিত করাই নীতিশাস্ত্রের কাজ। এর দ্বারা আমরা আমাদের অন্তঃস্থ "দৈবী প্রকৃতি" বৃদ্ধি করি এবং বিভিন্ন আসুরিক ও পৈশাচিক উপাদান থেকে নিষ্কৃতি পাই। এই ধারণা অনুযায়ী ভগবৎ-ভীরুর ইহুদীসুলভ সদাচার নৈতিক বিকাশের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হল সাধু ও ভগবৎপ্রেমিকের শুদ্ধতা, প্রেম, পরোপকারিতা, সত্য, নির্ভীকতা, অহিংসা। এবং আরো ব্যাপকভাবে বলা যায় যে দিব্য প্রকৃতিতে উপচিত হওয়াই নৈতিক সত্তার পরিপূর্ণতা। এই ব্রতসাধনের শ্রেষ্ঠ উপায় হল এই উপলব্ধি করা যে ভগবান পরতর আত্মা, দিশারী ও উত্তোলনকারী সঙ্কল্প অথবা অধীশ্বর যাঁকে আমরা পূজা ও সেবা করি। তাঁর ভয় নয়, পরন্তু তাঁর প্রতি প্রেম এবং তাঁর সত্তার স্বাধীনতা ও নিত্য শুদ্ধতার প্রতি আস্পৃহাই আমাদের প্রেরণা হওয়া চাই।

অবশ্য, একথা ঠিক যে প্রভু ও ভৃত্যের, এবং এমনকি পিতা ও সন্তানের সম্বন্ধের মধ্যেও ভয় থাকে কিন্তু তা থাকে শুধু মানুষী স্তরে, যখন ঐ সম্বন্ধের ভিতর শাসন ও বশ্যতা ও শাস্তি প্রবল হয়ে দেখা দেয়, আর ভালোবাসা নিজেকে অল্পবিস্তর মুছে ফেলে কর্তৃত্বের মুখোশের আড়ালে। প্রভুরূপেও ভগবান কাউকেই শাস্তি দেন না, ভয় দেখান না, জোর ক'রে মানতে বাধ্য করেন না। মানবের অন্তঃপুরুষকেই আসতে হবে স্বচ্ছন্দভাবে ভগবানের কাছে এবং নিজেকে নিবেদন করতে হবে তাঁর বিজয়ী শক্তির নিকট যাতে তিনি তাকে ধ'রে তুলতে পারেন তাঁর নিজের দিব্য স্তরসমূহে এবং তাকে দিতে পারেন অনন্তের দ্বারা সান্ত প্রকৃতির উপর কর্তৃত্বের এবং সর্বোত্তমের প্রতি সেবার

হর্ষ, আর এই সবেই আসে অহং ও অপরা প্রকৃতি থেকে মুক্তি। প্রেম এই সম্বন্ধের চাবিকাঠি, আর ভারতীয় যোগের এই সেবার, "দাস্যম্"-এর অর্থ দিব্য ভগবানের সুখময় সেবা অথবা দিব্য প্রেমাস্পদের প্রতি তীব্র অনুরাগপূর্ণ সেবা। গীতার কথায়, জগৎস্বামী তাঁর সেবক, ভক্তের নিকট দাবী করেন যেন সে জীবনে তাঁর যন্ত্র বৈ আর কিছু না হয়; এই দাবী তিনি করেন সখা, দিশারী ও পরতর আত্মা হিসেবে, নিজের সম্বন্ধে তিনি বলেন যে তিনি সকল জগতের প্রভু, তাঁর সৃষ্ট সকল কিছুর বন্ধু, "সর্বলোকমহেশ্বরম্ সুহৃদম্ সর্বভূতানাম্"; বস্তুতঃ এই দুইটি একসাথে থাকতে বাধ্য, আর একটির অভাবে অন্যটির পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। সেইরকম, ভগবান আমাদের সত্তার স্রষ্টা এই যুক্তিতে যে ভগবান স্রষ্টা হিসেবে পিতৃত্বের দাবীতে আমাদের আনুগত্য চান তা নয়, তিনি তা চান সেই প্রেমের পিতৃত্বের দাবীতে যা আমাদের নিয়ে যায় যোগের ঘনিষ্ঠতর আত্মমিলনের দিকে। এই দু'য়েতেই প্রেম আসল চাবিকাঠি আর যেখানে ভয়ের প্রেরণা থাকে সেখানে পরিপূর্ণ প্রেমের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। উদ্দেশ্য হল, — ভগবানের সঙ্গে মানবের অন্তঃপুরুষের ঘনিষ্ঠতা, আর ভয় সর্বদাই স্থাপন করে এক অন্তরায় ও এক দূরত্ব; এমনকি দিব্য সামর্থ্যের প্রতি ভয়মিশ্রিত সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা দূরত্ব ও বিভাজনের নিদর্শন, আর এরা অন্তর্হিত হয় প্রেমের মিলনের অন্তরঙ্গতার মধ্যে। তাছাড়া, ভয় অপরা প্রকৃতির, অবর আত্মার অন্তর্গত, আর পরতর আত্মার দিকে যেতে হলে একে ত্যাগ করা চাই, তবে যদি আমরা পরে যেতে পারি তাঁর সান্নিধ্যে।

দিব্য পিতৃত্বের এই যে সম্বন্ধ এবং বিশ্বজননী-আত্মা রূপে ভগবানের সঙ্গে আরো যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ — এদের উৎস অন্য এক প্রাথমিক ধর্মীয় প্রেরণা। গীতা বলে — একপ্রকার ভক্ত আছে যে ভগবানের কাছে যায় যেন ভগবান তার অভাব পূরণ করেন, তার মঙ্গল সাধন করেন, তার আন্তর ও বাহ্য সত্তার প্রয়োজন মেটান। শ্রীভগবান বলেন, "আমি ভক্তের কাছে নিয়ে আসি তার মঙ্গলপ্রাপ্তি ও মঙ্গল অধিকার, যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"। মানবের জীবন বিভিন্ন অভাব ও প্রয়োজনের জীবন এবং সুতরাং এ হল বিভিন্ন কামনার জীবন, আর এই সব কামনা যে শুধু তার শারীর ও প্রাণিক সত্তায় আসে তা নয়, এরা মানসিক ও আধ্যাত্মিক সত্তাতেও আসে। যখন তার জ্ঞান হয় যে জগৎ-শাসক এক মহত্তর সামর্থ্যে বিদ্যমান, তখন সে প্রার্থনার মাধ্যমে তাঁর কাছে যায় যেন তিনি তার প্রয়োজন মেটান, তার দুর্গম যাত্রায় সহায় হন, তার সংগ্রামে রক্ষা ও সাহায্য করেন। সাধারণ ধর্মে প্রার্থনার দ্বারা ভগবানের দিকে যে অগ্রসর হওয়া তার মধ্যে যা কিছু অমার্জিত বিষয়ই থাকুক না কেন, — আর অনেক এরকম বিষয় আছে, বিশেষতঃ সেই মনোভাবে যাতে কল্পনা করা হয় যে ভগবানকে যেন প্রশংসা, অনুরোধ ও উপহারের দ্বারা তুষ্ট, উৎকোচে বশীভূত ও চাটুবচনে বিভ্রান্ত ক'রে তাঁর সম্মতি বা প্রশ্রয় পাওয়া সম্ভব এবং যে আন্তর ভাব নিয়ে তাঁর দিকে যাওয়া হয় তা প্রায়শঃই তুচ্ছ মনে করা হয় — তবু ভগবানের দিকে এইভাবে ফেরাও আমাদের ধর্মীয় সত্তার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা এবং এক সঠিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রার্থনার দ্বারা যে কোন ফলপ্রাপ্তি সম্ভব তা প্রায়ই সন্দেহ করা হয় আর মনে করা হয় যে প্রার্থনা এক অযৌক্তিক বিষয় ও অনাবশ্যক ও নিষ্ফল হতে বাধ্য। একথা সত্য যে বিশ্বজনীন সঙ্কল্প সর্বদাই তার লক্ষ্য সাধন করে এবং অহমাত্মক স্তুতি ও অনুনয়ের দ্বারা একে তার লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট করা সম্ভব নয়, যে বিশ্বাতীত নিজেকে বিশ্বশৃঙ্খলার মধ্যে প্রকাশিত করছেন তার সম্বন্ধেও এটি সত্য কারণ তিনি সর্বদর্শী হওয়ায় কি করা হবে তা তাঁর বৃহত্তর জ্ঞানে পূর্ব থেকেই জানা থাকতে বাধ্য এবং কোন মানুষী ভাবনার দ্বারা ঐ জ্ঞানের কোন নির্দেশ বা উদ্দীপনা লাভের প্রয়োজন থাকে না, আর কোন জগৎ-শৃঙ্খলার মধ্যে ব্যষ্টির বিভিন্ন কামনার কোন প্রকৃত নির্ধারণী ক্ষমতা নেই, থাকতে পারেও না। কিন্তু এও ঠিক যে ঐ শৃঙ্খলা বা বিশ্বজনীন সঙ্কল্পসাধন পুরোপুরি যান্ত্রিক বিধানের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না, এ নিষ্পন্ন হয় এমন সব সামর্থ্য ও শক্তির দ্বারা যার মধ্যে, অন্ততঃ মানবজীবনের পক্ষে, মানবের সঙ্কল্প, আস্পৃহা ও বিশ্বাসের গুরুত্ব কম নয়। প্রার্থনা ঐ সঙ্কল্প, আস্পৃহা ও শ্রদ্ধার এক বিশেষ রূপ মাত্র। এর রূপগুলি প্রায়ই অমার্জিত এবং শুধু শিশুসুলভই নয়, তাহলে এত দোষের কিছু হ'ত না, সেসব ছেলেমানুষি; কিন্তু তবু এর এক প্রকৃত সামর্থ্য ও তাৎপর্য আছে। এর সামর্থ্য ও অর্থ হল মানবের সঙ্কল্প, আস্পৃহা ও বিশ্বাসকে দিব্য সঙ্কল্পের সংস্পর্শে আনা যেন এই সঙ্কল্প এমন এক চিন্ময় পুরুষের সঙ্কল্প যাঁর সঙ্গে আমরা বিভিন্ন সচেতন ও সজীব সম্পর্ক স্থাপনে সমর্থ হই। কারণ আমাদের সঙ্কল্প ও আস্পৃহা দুইভাবে কাজ করতে সক্ষম — হয় আমাদের আপন ক্ষমতা ও প্রয়াসের দ্বারা কাজ করতে সক্ষম — আর কি হীন, কি মহৎ সকল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একে যে এক বিশিষ্ট ও কার্যকরী বিষয় করা যায় তাতে সন্দেহ নেই — আর অনেক সাধনপন্থা আছে যারা বলে যে প্রয়োগ করার যোগ্য শক্তি, একমাত্র এটাই; — আর না হয় এ কাজ করতে সক্ষম দিব্য অথবা বিশ্বজনীন সঙ্কল্পের উপর নির্ভর ক'রে ও তার অধীন হয়ে। আর এই শেষের পন্থাটিতে আবার ঐ পরম সঙ্কল্প সম্বন্ধে মনে করা যেতে পারে যে তিনি আমাদের আস্পৃহায় অবশ্যই সাড়া দেন তবে প্রায় যন্ত্রের মতো ক্রিয়াশক্তির এক প্রকার বিধানের দ্বারা, অথবা অন্ততঃ সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিকভাবে, আর না হয়, মনে করা যেতে পারে যে তিনি মানবের অন্তঃপুরুষের দিব্য আস্পৃহা ও শ্রদ্ধায় সজ্ঞানে সাড়া দেন এবং সজ্ঞানে তার কাছে আনেন প্রার্থিত সাহায্য, দেশনা, আশ্রয় ও সফলতা, "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"।

আমাদের জন্য এই সম্পর্ক রচনায় প্রার্থনা প্রথম সাহায্য করে নিম্ন স্তরে, আর এমনকি তখনো যখন এ অনেক কিছু যারা নিছক অহং-ভাব ও আত্মপ্রতারণামাত্র তাদের সঙ্গে মিলে থাকে; কিন্তু পরে আমরা যেতে পারি এর পিছনের আধ্যাত্মিক সত্যের দিকে। তখন যা গুরুত্বপূর্ণ তা প্রার্থিত বস্তুটির দান নয়, তা হল শুধু ঐ সম্পর্ক, ভগবানের সঙ্গে মানুষের জীবনের সংযোগ, সচেতন আদানপ্রদান। আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহে এবং আধ্যাত্মিক ফলের অন্বেষণে এই সচেতন সম্পর্ক এক মহৎ সামর্থ্য; আমাদের নিজেদের সম্পূর্ণ স্বয়ং-নির্ভর সংগ্রাম অপেক্ষা এই সামর্থ্য বহু পরিমাণে মহত্তর এবং এ আনয়ন

করে পূর্ণতর আধ্যাত্মিক উপচয় ও অনুভূতি। সেজন্য পরিশেষে প্রার্থনার সমাপ্তি হয় সেই মহত্তর বিষয়ের মধ্যে যার জন্য এ আমাদের প্রস্তুত করেছিল — বস্তুতঃ যে রূপটিকে আমরা প্রার্থনা বলি তা নিজে সার বিষয় নয় যতক্ষণ বিশ্বাস, সঙ্কল্প, আস্পৃহা থাকে — আর না হয়, প্রার্থনা থাকে শুধু সম্পর্কের হর্ষের নিমিত্ত। তাছাড়া, এর কাম্য বিষয়গুলি, "অর্থ" অর্থাৎ যা সব এ পেতে চায়, ক্রমশঃ শ্রেয়তর হয় যতক্ষণ না আমরা পাই শ্রেষ্ঠ অহৈতুকী ভক্তি, আর এই ভক্তি হল শুদ্ধ ও নিছক দিব্য প্রেমের ভক্তি যার সঙ্গে অন্য কোন দাবী বা আকাঙ্ক্ষা থাকে না।

ভগবানের প্রতি এই মনোভাব থেকে যে সব সম্বন্ধের উদয় হয় তা হল সন্তানের সঙ্গে দিব্য পিতা ও মাতার সম্বন্ধ ও দিব্য সখার সম্বন্ধ। ভগবানকে এইরকম ভেবে তাঁর কাছে মানবাত্মা আসে সাহায্যের জন্য, আশ্রয়ের জন্য, দেশনার জন্য, সফলতার জন্য — অথবা যদি জ্ঞান লক্ষ্য হয় সে আসে দিশারীর কাছে, গুরুর কাছে, আলোকদাতার কাছে কারণ ভগবানই জ্ঞানসূর্য — অথবা সে আসে যন্ত্রণা ও কষ্টভোগের মধ্যে যন্ত্রণার উপশমের জন্য, সান্ত্বনা ও উদ্ধারের জন্য আর এই উদ্ধার হতে পারে শুধু কষ্টভোগ থেকে অথবা কষ্টের আলয় এই প্রপঞ্চ থেকে অথবা এর সব আন্তর ও আসল কারণ থেকে।[১] আমরা দেখি যে এই বিষয়গুলিতে এক বিশেষ পর্যায় আছে। কারণ পিতার সম্পর্ক সর্বদাই অপেক্ষাকৃত কম ঘনিষ্ঠ, প্রগাঢ়, তীব্র, অন্তরঙ্গ এবং সেজন্য যোগে এর ব্যবহার কম কারণ যোগ চায় নিবিড়তম মিলন। দিব্য সখার সম্বন্ধ আরো মধুর ও আরো অন্তরঙ্গ, এতে এমনকি অসমত্বের মধ্যেও সমত্ব ও অন্তরঙ্গতা থাকে আর থাকে পারস্পরিক আত্মদানের উপক্রম; এর নিবিড়তম পর্যায়ে যখন অন্যপ্রকার দেওয়া ও নেওয়ার সকল ভাবনা দূর হয়, যখন এই সম্বন্ধ অহৈতুকী হয়ে ওঠে, থাকে শুধু একমাত্র প্রেমের সর্ব-তৃপ্তিকর প্রেরণা, তখন এ পরিণত হয় বিশ্বলীলার মাঝে খেলার সাথীর স্বচ্ছন্দ ও সুখময় সম্পর্কে। কিন্তু এ অপেক্ষা আরো ঘনিষ্ঠ ও আরো অন্তরঙ্গ সম্পর্ক হল মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক এবং সেজন্য যেখানেই ধর্মের টান অত্যন্ত প্রগাঢ় ও ব্যাকুল এবং মানুষের হৃদয় থেকে উৎসারিত হয় অতীব তীব্রভাবে সেখানেই এই সম্পর্কের অবদান অত্যন্ত বেশী, জীব মাতৃ-আত্মার কাছে যায় তার সকল কামনা ও দুঃখের মধ্যে আর ভগবতী জননীরও ইচ্ছা যে তা-ই হ'ক, তবেই তো তিনি ঢেলে দেবেন তাঁর হৃদয়ের প্রেমের ধারা। সে যে তাঁর দিকে যায় তার এও কারণ যে এই প্রেম স্বপ্রতিষ্ঠ আর এই দেখায় আমাদের স্বধাম যার দিকে আমরা ফিরি জগতের মধ্যে আমাদের ঘোরাঘুরি থেকে, এই দেখায় আমাদের বিশ্রামস্থল মাতৃবক্ষঃ।

কিন্তু পরম ও শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধ হল সেই সম্বন্ধ যা ধর্মের সাধারণ প্রেরণাগুলির মধ্যে কোনটি থেকেই উদিত হয় না, বরং যা যোগের সার বিষয়, উদিত হয় প্রেমেরই স্বরূপ

[১] গীতায় যে চার শ্রেণীর ভক্তের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে এরা তিনটি শ্রেণী — "আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু" অর্থাৎ দুঃখী, স্বার্থান্বেষী ও ভগবৎ-জ্ঞানান্বেষী।

থেকে; এ হল প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের তীব্র অনুরাগ। যেখানেই জীবের কামনা থাকে ভগবানের সঙ্গে তার একান্ত মিলনলাভের সেখানেই দিব্য আকুতির এই রূপটি প্রবেশ করে, এমনকি এ সেই সব ধর্মেও আসে যেগুলিতে মনে হয় এর প্রয়োজন নেই এবং তাদের সাধারণ বিধানে কোন স্থান দেওয়া হয় না। এখানে প্রার্থনার একমাত্র বিষয় হল প্রেম, ভয়ের একমাত্র বিষয় প্রেমের হানি, একমাত্র দুঃখ প্রেমের বিয়োগের দুঃখ; কারণ প্রেমিকের পক্ষে অন্য সকল বিষয়ই হয় অস্তিত্বশূন্য, নয় তারা আসে শুধু প্রেমের প্রসঙ্গ হিসেবে অথবা ফল হিসেবে, এর উদ্দেশ্য বা সর্ত হিসেবে নয়। বস্তুতঃ সকল প্রেমই স্বরূপতঃ স্বপ্রতিষ্ঠ কারণ এ উৎসারিত হয় সত্তার মধ্যস্থ এক গূঢ় একত্ব থেকে এবং দুই জীবের মধ্যে ঐ একত্বের বোধ থেকে অথবা হৃদয়ে একত্বের কামনা থেকে যারা তখনো ভাবতে সক্ষম যে তারা পরস্পর থেকে ভিন্ন ও বিভক্ত। সুতরাং এইসব অন্য সম্বন্ধগুলিও একমাত্র প্রেমের জন্য আসতে সক্ষম হয় তাদের সত্তার স্বপ্রতিষ্ঠ অহৈতুক আনন্দে। কিন্তু তবু এরা শুরু করে অন্য সব প্রেরণা থেকে এবং শেষের দিকে এরা কিছু পরিমাণে তাদের ক্রীড়ার তৃপ্তিও পায় সে সবে। কিন্তু এখানে আদি প্রেম, অন্ত প্রেম এবং সমগ্র লক্ষ্যই প্রেম। অবশ্য পাবার কামনা থাকে, কিন্তু এমনকি এও জয় করা হয় স্বপ্রতিষ্ঠ প্রেমের পরিপূর্ণতায়, আর ভক্তের শেষ দাবী মাত্র এইটুকু থাকে যে তার ভক্তি যেন শেষ না হয়, তার ভক্তি যেন হ্রাস না পায়। সে স্বর্গ চায় না বা জন্ম থেকে মুক্তি চায় না অথবা অন্য কোন বস্তু চায় না, সে শুধু চায় তার প্রেম যেন নিত্য ও একান্ত হয়।

প্রেম এক তীব্র অনুরাগ, এর আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী দুটি — নিত্যতা ও তীব্রতা, আর প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের সম্বন্ধ ব্যাপারে নিত্যতা ও তীব্রতার জন্য আকাঙ্ক্ষা সহজাত ও আত্ম-সম্ভূত। প্রেমের অর্থ পরস্পরকে পাবার আকাঙ্ক্ষা এবং এখানেই একান্ত হয় পরস্পরকে পাবার দাবী। পাবার কামনাতে থাকে ভেদবোধ, এই কামনা অতিক্রম ক'রে প্রেম চায় একত্ব এবং এইখানেই একত্বের ভাবনা, পরস্পরের মধ্যে দুই অন্তরাত্মার নিমজ্জিত ও এক হওয়ার ভাবনা পায় তার কামনার পরাকাষ্ঠা, এবং তার তৃপ্তির পূর্ণতা। আবার প্রেম হল সৌন্দর্যস্পৃহা, আর এইখানেই এই স্পৃহা চিরতৃপ্ত হয় সর্বসুন্দরের দর্শনে ও স্পর্শে ও হর্ষে। প্রেম আনন্দের শিশু ও অন্বেষু আর এইখানেই এ পায় হৃদয়-চেতনা ও সত্তার প্রতি তন্ত্রী — উভয়েরই সম্ভবপর সর্বোত্তম রভস। তাছাড়া, এই সম্বন্ধ এমন যা সবচেয়ে বেশী দাবী করে — যেমন মানুষের মধ্যে — এবং সর্বাপেক্ষা তীব্র হয়েও সবচেয়ে কম তৃপ্ত, কারণ একমাত্র ভগবানেই এ পেতে পারে তার আসল ও পূর্ণ তৃপ্তি। সুতরাং এইখানেই ভগবানের দিকে মানুষী ভাবাবেগের মোড় ফেরা সব চেয়ে বেশী করে পায় তার পূর্ণ অর্থ এবং আবিষ্কার করে সকল সত্য যার মানুষী প্রতীক হল প্রেম; তখন এর সকল মূল সহজাত প্রবৃত্তিগুলি দিব্যভাবাপন্ন, উন্নীত, তৃপ্ত হয় সেই আনন্দের মাঝে যা থেকে আমাদের জীবনের উৎপত্তি হয়েছিল এবং যার দিকে এ ফিরে আসে একত্বের দ্বারা, আর তা হয় ভাগবত অস্তিত্বের পরমানন্দের মধ্যে যেখানে প্রেম অনপেক্ষ, নিত্য ও অবিমিশ্র।

চতুর্থ অধ্যায়

ভক্তিমার্গ

ভগবানের জন্য জীবের হৃদয়ের আকৃতি যেমন ব্যাপ্ত — ভক্তি নিজের মধ্যে তেমনই ব্যাপ্ত এবং প্রেম ও কামনা যেমন সোজা গমন করে তাদের লক্ষ্যের দিকে, ভক্তিও তেমন সরল ও ঋজুমুখী। এইজন্য একে কোন বিধিসম্মত পদ্ধতির মধ্যে নিবদ্ধ করা চলে না, রাজযোগের মত কোন মনস্তাত্ত্বিক বিদ্যার উপর অথবা হঠযোগের মত কোন মনোভৌতিক বিদ্যার উপর এর প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, অথবা জ্ঞানযোগের সাধারণ পদ্ধতির মতো কোন নির্দিষ্ট বুদ্ধিগত প্রণালী থেকেও এর শুরু সম্ভব নয়। এ প্রয়োগ করতে পারে নানাবিধ উপায় বা অবলম্বন, আর মানবের মাঝে শৃঙ্খলা, প্রণালী ও বিধানের প্রবণতা থাকায় মানব এই সব সহায়কের আশ্রয় গ্রহণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার প্রয়াস করতে পারে; কিন্তু তাদের বিভিন্ন পার্থক্যের বিবরণ দিতে হলে আবশ্যক হবে মানবের অগণিত ধর্মসমূহের প্রায় সকলগুলিই কি আন্তর ভাব নিয়ে ভগবানের দিকে যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অপেক্ষাকৃত অধিকতর অন্তরঙ্গ ভক্তিযোগের মধ্যে কেবল এই চারিটি ভাব বিদ্যমান — ভগবন্মুখী অন্তঃপুরুষের কামনা ও তার ভাবাবেগের টান ভগবানের দিকে, প্রেমের ব্যথা ও প্রেমের দিব্য প্রতিদান, অধিগত প্রেমের আনন্দ ও ঐ আনন্দের খেলা, এবং দিব্য প্রেমিকের চিরন্তন উপভোগ যা স্বর্গীয় আনন্দের মর্ম। এই বিষয়গুলি একই সাথে এত সরল আবার এত গভীর যে এদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা বা বিশ্লেষণ করা অসম্ভব। বড় জোর শুধু এই বলা যায় যে এরা সিদ্ধির চারিটি ক্রমিক উপাদান, ধাপ — যদি তাদের ঐরকম বলা সম্ভব — আর এখানেই ব্যাপকভাবে পাওয়া যাবে তার অবলম্বিত কতকগুলি উপায়, আবার এখানেই আছে ভক্তিসাধনার কতকগুলি দিক ও অনুভূতি। এরা যে সাধারণ ধারা অনুসরণ করে মোটামুটি শুধু তা-ই জানা এখন আমাদের প্রয়োজন; তবেই আমরা এর পর বিবেচনা করতে যাব কিভাবে ভক্তিমার্গ প্রবেশ করে সমন্বয়ী ও পূর্ণ যোগের মধ্যে, এর কি স্থান সেখানে, এবং এর তত্ত্বের কিরকম প্রভাব দিব্য জীবনধারণের অন্যান্য তত্ত্বের উপর।

সকল যোগের অর্থ হল, যে-মানবমন ও মানব অন্তঃপুরুষ এখনো উপলব্ধিতে দিব্য নয়, তবে তার মধ্যে দিব্য সংবেগ ও আকর্ষণ অনুভব করে তার মোড় ঘোরা সেই বিষয়ের দিকে যার দ্বারা সে পায় তার মহত্তর সত্তা। ভাবাবেগের দিক থেকে নিশ্চয় ক'রে বলা যায় যে এই গতি প্রথম যে রূপ নেয় তা আরাধনার রূপ। সাধারণ ধর্মে এই আরাধনা বাহ্য পূজার রূপ নেয় আর তা থেকে গড়ে ওঠে বিধিসম্মত আনুষ্ঠানিক পূজার এক অতীব বাহ্য আকার। এই উপাদান সাধারণতঃ প্রয়োজনীয় এইজন্য যে বেশীরভাগ লোকই বাস করে তাদের স্থূল মনে, স্থূল প্রতীকের সাহায্য বিনা কিছু উপলব্ধি করতে

অক্ষম, এবং স্থূল ক্রিয়ার শক্তির সাহায্য ছাড়া তারা যে কিছু অনুভব করছে তা বুঝতে অক্ষম। সাধনার পর্যায় সম্বন্ধে যে তান্ত্রিক ভাবনায় 'পশু'র যূথের পাশবিক বা অন্নময় সত্তার পথই তার সাধন পন্থার সর্বনিম্ন পর্যায় সেই অনুযায়ী আমরা বলতে পারি যে নিছক অথবা প্রধানতঃ আনুষ্ঠানিক আরাধনাই এই মার্গের নিম্নতম অংশের প্রথম ধাপ। এটা স্পষ্ট যে এমনকি আসল ধর্মও — আর যোগ তো ধর্মের অতিরিক্ত কিছু — আন্তর হয় কেবল তখনই যখন এই সম্পূর্ণ বাহ্য পূজার পিছনে এমন কিছু থাকে যা মনের মধ্যে বাস্তবিকই অনুভব করা হয় — কিছু অকৃত্রিম প্রপত্তি, ভয় মিশ্রিত সম্ভ্রম অথবা আধ্যাত্মিক আস্পৃহা, আর বাহ্য পূজা তখন এর এক সহায়, এক বহিঃপ্রকাশ, যেন এমন কিছু যা মাঝে মাঝে অথবা সততই এর কথা স্মরণ করিয়ে সাধারণ জীবনের নিবিষ্টতা থেকে মনকে এর দিকে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। কিন্তু যতদিন এ থাকে আমাদের শ্রদ্ধা বা পূজার পাত্র, পরম দেবতার ভাবনা মাত্র, ততদিন আমরা যোগের গোড়াতেও পৌঁছইনি। যেহেতু যোগের লক্ষ্য মিলন, সেহেতু এর আরম্ভও সর্বদা হওয়া চাই ভগবানের জন্য এষণা, কোনপ্রকার স্পর্শের, সামীপ্যের বা লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা। আমাদের মধ্যে এরকম ভাব এলে, আরাধনা সর্বদাই হয়ে ওঠে প্রধানতঃ আন্তর পূজা; আমরা শুরু করি নিজেদের তৈরী করতে ভগবানের মন্দির রূপে, আমাদের সব ভাবনা ও বেদনাকে আস্পৃহা ও এষণার সতত প্রার্থনায়, আমাদের সমস্ত জীবনকে এক বাহ্য সেবা ও পূজায়। এই পরিবর্তন, এই নতুন আত্মিক প্রবণতা যেমন বৃদ্ধি পায়, ভক্তের ধর্মও তেমন হয়ে ওঠে এক যোগ, এক বর্ধিষ্ণু সংযোগ ও মিলন। অবশ্য এই জন্য যে বাহ্য পূজাকে বাদ দিতেই হবে তা নয়, তবে এ উত্তরোত্তর হয়ে উঠবে আন্তর ভক্তি ও আরাধনার স্থূল প্রকাশ অথবা বহিঃপ্রবাহ, অন্তঃপুরুষের তরঙ্গ নিজেকে বাইরে প্রকট করবে কথায় ও সাঙ্কেতিক ক্রিয়ায়।

আরাধনা যে গভীরতর ভক্তিযোগের এক অঙ্গে পরিণত হবে, প্রেমপুষ্পের পাপড়িরূপে যে তার অর্ঘ ও আত্ম-উন্নয়ন নিবেদন করবে সূর্যের দিকে — তার পূর্বে যা দরকার তা হল এ গভীর হলে তার সঙ্গে আনা চাই আরাধনার পাত্র ভগবানের নিকট উত্তরোত্তর উৎসর্গ। আর এই উৎসর্গের এক অঙ্গ হওয়া চাই আত্মশুদ্ধি, যাতে যোগ্য হওয়া চাই দিব্য সংযোগের জন্য, অথবা আমাদের আন্তর সত্তার মন্দিরে ভগবানের প্রবেশের জন্য, অথবা হৃদয়তীর্থে তার আত্মপ্রকাশের জন্য। এই শুদ্ধি নৈতিক প্রকারের হতে পারে, কিন্তু উচিত ও নির্দোষ কাজের জন্য নীতিনিষ্ঠের যে প্রয়াস এ শুধু তা হবে না, অথবা এমনকি যখন আমরা যোগের অবস্থায় পৌঁছই তখনো এ নিয়মনিষ্ঠ ধর্মে প্রকাশিত ভগবৎ-বিধানের প্রতি আনুগত্যও হবে না; পরন্তু এ এমন কিছু হবে যার অর্থ যা সব ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে অথবা আমাদের অন্তঃস্থ ভগবান সম্বন্ধে ভাবনার বিরোধী সেই সব কিছুরই অপনয়ন (katharsis)। প্রথমটির বেলায় এ অনুভব ও বহিঃকর্মের অভ্যাসে হয়ে ওঠে ভগবানের এক অনুকরণ, আর শেষেরটির বেলায় এ হয় আমাদের প্রকৃতিতে তাঁর সাদৃশ্যে উপচয়। আনুষ্ঠানিক পূজার সঙ্গে আন্তর আরাধনার যে

সম্বন্ধ, বাহ্য নৈতিক জীবনের সঙ্গে ভগবৎ-সাদৃশ্যে উপচয়েরও সেই সম্বন্ধ। এর পরিণতি হল ভগবানের সঙ্গে সাদৃশ্যলাভের দ্বারা এক প্রকার মুক্তি,[১] আমাদের অপরা প্রকৃতি থেকে মুক্তি এবং দিব্য প্রকৃতিতে রূপান্তর।

উৎসর্গ পূর্ণ হলে তা হয়ে ওঠে ভগবানের প্রতি আমাদের সকল সত্তার এবং সেজন্য আমাদের সকল ভাবনা ও কর্মেরও নিয়োগ। এখানে যোগ তার মধ্যে নেয় কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের সার উপাদানগুলি, তবে তা নেয় তার আপন ধারায় ও তার আপন বিশেষ ভাবে। এ হল ভগবানের নিকট জীবন ও কর্মের যজ্ঞ, তবে দিব্য সঙ্কল্পের দিকে নিজের সঙ্কল্পকে ফেরানোর চেয়ে বরং এ আরো বেশী হয় প্রেমের যজ্ঞ। ভগবানের কাছে ভক্ত নিবেদন করে তার জীবন ও সে যা কিছু সে সব এবং তার যা কিছু আছে সে সব এবং সে যা সব করে সে সবও। এই সমর্পণ বৈরাগ্যের আকার নিতে পারে; এ এইরকম হয় যখন ভক্ত মানুষের সাধারণ জীবন ত্যাগ ক'রে সমস্ত দিন ব্যাপৃত থাকে শুধু প্রার্থনা ও স্তুতি ও পূজায়, অথবা আনন্দ-বিভোর ধ্যানে, ব্যক্তিগত সকল সম্পত্তি পরিত্যাগ ক'রে সাধু বা ভিক্ষু হয় যার একমাত্র সম্পত্তি হল ভগবান, জীবনের সকল কর্মই পরিহার করে, করে শুধু সেই সব কাজ যেগুলি ভগবানের সঙ্গে মিলনের এবং অন্যান্য ভক্তের সঙ্গে সম্মিলনের সহায় অথবা অন্তর্গত, আর না হয় বৈরাগ্যজীবনের সুরক্ষিত দুর্গ থেকে বড়জোর জনসেবার সেই কার্যগুলি ক'রে যায় যেগুলি মনে হয় প্রেম, করুণা ও মঙ্গলের দিব্য প্রকৃতির বিশিষ্ট বহিঃপ্রবাহ। কিন্তু আরো ব্যাপ্ত আত্মোৎসর্গও আছে যা সকল সর্বাঙ্গীন যোগের সঠিক বিষয়; এতে জীবনের পূর্ণতা ও সমগ্র জগৎকে স্বীকার করা হয় ভগবানের লীলারূপে এবং সেজন্য সমগ্র সত্তা নিবেদিত হয় তাঁর অধিকারে; নিজে যা সে সব এবং নিজের যা আছে সে সব এতে ধারণ করা হয় শুধু ভগবানের সম্পত্তি ব'লে, আমাদের নিজেদের সম্পত্তি ব'লে নয়, এবং সকল কর্ম করা হয় তাঁর কাছে অর্ঘ্যরূপে। এর দ্বারা আসে আন্তর ও বাহ্য — এই দুই জীবনেরই সম্পূর্ণ ও সক্রিয় আত্মোৎসর্গ, অখণ্ড আত্মদান।

তাছাড়া আছে ভগবানের প্রতি সব ভাবনারও উৎসর্গ। এর প্রারম্ভে এ হল আরাধনার বস্তুর উপর মন নিবদ্ধ করার প্রয়াস — কারণ স্বভাবতঃই মানুষের চঞ্চল মন অন্য সব বস্তু নিয়েই ব্যস্ত থাকে, আর এমনকি উপরের দিকে পাঠানোর সময়ও সর্বদাই বিক্ষিপ্ত হয় সংসারের টানে — যাতে পরিশেষে তার অভ্যাসই হয় তাঁকে ভাবা, আর অন্য সব কিছু তখন শুধু গৌণ এবং ভাবা হয় কেবল তাঁর সঙ্গে সম্পর্কে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটি করা হয় স্থূল মূর্তির সাহায্যে, অথবা আরো অন্তরঙ্গ ও লক্ষণীয় ভাবে কোন মন্ত্র বা ভগবানের নামের সাহায্যে যার মাধ্যমে ভাগবত সত্তার উপলব্ধি আসে। ব্যবস্থাপকরা মনে করে যে মনের ভক্তির দ্বারা ভগবৎ-অন্বেষণের তিনটি পর্যায়: প্রথম হল ভগবানের নাম, বিভিন্ন গুণ ও এদের সঙ্গে যুক্ত সব কিছুরই নিরন্তর শ্রবণ, দ্বিতীয়

[১] সাদৃশ্য মুক্তি

হল এদের বা ভাগবত সত্তা বা ভগবানের ব্যক্তিসত্ত্ব সম্বন্ধে সতত মনন, তৃতীয় হল বিষয়ের উপর মনঃস্থির ও মনোনিবেশ করা; এর দ্বারা পাওয়া যায় পূর্ণ উপলব্ধি। আবার এর সঙ্গের অনুভব বা একাগ্রতা যখন অতীব প্রগাঢ় হয় তখন এদের দ্বারা লাভ হয় সমাধি অর্থাৎ আনন্দবিভোর তন্ময়তা যাতে চেতনা চলে যায় সব বাহ্য বিষয় থেকে। কিন্তু বস্তুতঃ এই সব প্রাসঙ্গিক; একমাত্র সার বিষয় হল আরাধনার পাত্রের উপর মনের ভাবনার প্রগাঢ় অভিনিবেশ। যদিও মনে হয় যে এটি জ্ঞানযোগের ধ্যানের অনুরূপ তবু আন্তরভাবে এ হল ভিন্নরকম। এর প্রকৃত স্বরূপে এ কোন শান্ত ধ্যান নয়, এ হল আনন্দবিভোর ধ্যান; এ ভগবানের সত্তার মধ্যে লীন হতে চায় না, এ চায় ভগবানকে নিয়ে আসতে আমাদের নিজেদের মধ্যে, এবং নিজেদের হারিয়ে ফেলতে তাঁর সান্নিধ্যের অথবা অধিকারের গভীর রভসের মধ্যে; আর এর আনন্দ ঐক্যের শান্তি নয়, এর আনন্দ মিলনের রভস। এক্ষেত্রেও থাকতে পারে সেই বিভক্ত আত্মোৎসর্গ যার পরিণাম হল জীবনের অন্য সকল ভাবনার বিসর্জন এই রভস লাভের জন্য যে রভস পরে নিত্য হয় ওপারের সব লোকে, আর না হয় থাকতে পারে সেই ব্যাপক আত্মোৎসর্গ যাতে সকল ভাবনাই ভগবৎপূর্ণ হয়, আর এমনকি জীবনের সব কাজকর্মের মধ্যেও প্রতি ভাবনা তাঁকেই স্মরণ করে। অন্য যোগের মতো, এই যোগেও সাধক ভগবানকে দেখতে পায় সর্বত্র এবং সকল কিছুতে এবং সে ভগবৎ-উপলব্ধি বর্ষণ করে তার সকল আন্তর ও বাহ্য ক্রিয়ার মধ্যে। কিন্তু এই যোগে সকল কিছুরই অবলম্বন হল ভাবগত মিলনের প্রধান শক্তি; কারণ প্রেমের দ্বারাই নিষ্পন্ন হয় সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ ও সম্পূর্ণ প্রাপ্তি, এবং ভাবনা ও ক্রিয়া হয়ে ওঠে চিৎপুরুষ ও এর বিভিন্ন অঙ্গের অধিকারী ভাগবত প্রেমের বিভিন্ন আকার ও সঙ্কেত।

সাধারণতঃ এই ভাবেই যা প্রথমে হয়ত ভগবান সম্বন্ধে কোন ভাবনার অস্পষ্ট অনুরাগ থাকে তা ভাগবত প্রেমের রঙ ও লক্ষণ নেয় এবং পরে যোগের পথে নেওয়া হলে এ রূপান্তরিত হয় ঐ প্রেমের আন্তর সত্যতা ও প্রগাঢ় অনুভূতিতে। কিন্তু আরো অন্তরঙ্গ যোগ আছে যাতে প্রথম থেকেই এই প্রেম থাকে আর যা সিদ্ধিলাভ করে শুধু তার আকাঙ্ক্ষার তীব্রতার দ্বারা, অন্য কোন প্রণালী বা পদ্ধতির সাহায্য বিনাই। বাকী সব আসে, কিন্তু তা আসে এর মধ্য থেকে, যেমন পাতা ও ফুল আসে বীজ থেকে; অন্য বিষয়গুলি প্রেমের বিকাশ ও সার্থকতা সাধনের উপায় নয়, বরং যে প্রেম ইতিপূর্বেই অন্তঃপুরুষের মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে এ হল তারই সব বিকিরণ। এই পথই অন্তঃপুরুষ অনুসরণ করে যখন সে — হয়ত মানুষের সাধারণ জীবনে ব্যস্ত থাকার সময়ই — পরম দেবতার বাঁশী শুনেছে গোপন বনদেশের সমীপবর্তী যবনিকার অন্তরালে, সে আর তখন আত্মস্থ থাকে না, কোন তৃপ্তি বা বিশ্রাম পায় না যতক্ষণ না সে দিব্য মুরলী বাদকের পিছনে ছুটে তাকে ধ'রে নিজের করে নেয়। পার্থিব বিষয় ফেলে যে হৃদয় ও অন্তঃপুরুষ ঘুরে দাঁড়ায় সকল সৌন্দর্য ও আনন্দের উৎসের দিকে তাদের মধ্যে স্বয়ং প্রেমের সামর্থ্য সারতঃ হল এই। এই অন্বেষণের মধ্যে থাকে প্রেমের সকল রস ও প্রচণ্ড অনুরাগ, সকল ভাব ও অনুভূতি, আর এই প্রেম একাগ্র থাকে কামনার এক পরম বিষয়ে এবং

মানুষীপ্রেমের পক্ষে সম্ভবপর তীব্রতার পরাকাষ্ঠা ছাড়িয়ে এ হল শতগুণ তীব্র। সমগ্র জীবনে আলোড়ন আসে, আসে অধরা দর্শনের দীপ্তি, হৃদয়ের কামনার একমাত্র বস্তুর প্রতি অতৃপ্ত আকৃতি, এই একমাত্র নিবিষ্টতা থেকে যা কিছু অন্য দিকে টানে সে সবের প্রতি অধৈর্য, তাকে পাবার পথে সব বাধার জন্য তীব্র ব্যথা, একটিমাত্র রূপের মধ্যে সকল সৌন্দর্য ও আনন্দের পূর্ণ দর্শন। আর থাকে প্রেমের বিভিন্ন সকল ভাব, গভীর চিন্তা ও সমাপত্তির হর্ষ, সাক্ষাৎ লাভ ও কৃতার্থতা ও আলিঙ্গনের আনন্দ, বিরহের ব্যথা, প্রেমের কোপ, আকাঙক্ষার অশ্রু, পুনর্মিলনের আরো বেশী আনন্দ। আন্তর চেতনার এই পরম কাব্যের দৃশ্যপট হল হৃদয় কিন্তু এমন হৃদয় যা উত্তরোত্তর এক প্রগাঢ় আধ্যাত্মিক পরিবর্তন লাভ করে আর হয়ে ওঠে চিৎপুরুষের জ্যোতির্ময় বিকাশমান শতদল। আর এর চাওয়ার তীব্রতা যেমন মানুষের সাধারণ সব ভাবাবেগের সর্বোচ্চ সামর্থ্যের অতীত, তেমন আনন্দ ও অন্তিম রভস কল্পনাতীত ও বর্ণনাতীত। কারণ এ হল পরম দেবতার সেই আনন্দ যা মানববুদ্ধির অগম্য।

ভারতীয় ভক্তি এই ভাগবত প্রেমকে এমন সব শক্তিশালী রূপ, কবিত্বময় প্রতীক দিয়েছে যেগুলি ততটা প্রতীক নয়, যতটা সত্যের অন্তরঙ্গ প্রকাশ, কেননা এই সত্যকে অন্য রকমে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এ যে মানুষী সম্বন্ধ ব্যবহার করে ও দিব্য ব্যক্তিকে দেখে তা শুধু সঙ্কেত হিসেবে নয়, এর কারণ এই যে মানবের অন্তঃপুরুষের সঙ্গে পরম আনন্দ ও সৌন্দর্যের এমন সব দিব্য সম্বন্ধ আছে যে সবের অপূর্ণ কিন্তু তবু প্রকৃত জাতিরূপ হল বিভিন্ন মানুষী সম্বন্ধ; এবং আরো কারণ এই যে ঐ আনন্দ ও সৌন্দর্য কোন অগোচর দার্শনিক সত্তার আচ্ছিন্ন প্রত্যয় বা গুণ নয়, বরং পরমপুরুষের স্বকীয় দেহ ও রূপ। এ হল এক জীবন্ত পুরুষ যার জন্য ভক্তের অন্তঃপুরুষ সতৃষ্ণ; কারণ সকল জীবনের উৎস যে কোন ভাবনা বা প্রতীতি বা অস্তিত্বের অবস্থা তা নয়, এ হল এক বাস্তব পুরুষ। সুতরাং দিব্য প্রেমাস্পদ লাভেই জীবের সকল জীবন পরিতৃপ্ত হয় এবং যে সব সম্বন্ধের দ্বারা সে তাঁকে পায় এবং যাদের মধ্যে সে নিজেকে প্রকাশ করে সে সব সম্পূর্ণ চরিতার্থ হয়; সেজন্যই আবার পরম প্রেমাস্পদকে খোঁজা যায় ঐ সব সম্বন্ধের যে কোন একটির বা সকলগুলির দ্বারা, যদিও যেগুলি সর্বাপেক্ষা প্রগাঢ় হওয়া সম্ভব সেগুলির দ্বারাই সর্বদা তাঁকে সর্বাপেক্ষা আকুলভাবে সন্ধান করা হয় এবং অধিগত করা হয় গভীরতম রভসের সঙ্গে। তাঁকে চাওয়া হয় অন্তরে হৃদয়ের মধ্যে পেতে এবং সেজন্য সকল কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে, অন্তঃপুরুষেরই মধ্যে সত্তার আন্তর-সমাহিত একাগ্রতার দ্বারা; কিন্তু তাঁকে আবার দেখা যায় ও ভালোবাসা যায় সর্বত্র, কারণ তিনি তাঁর সত্তা ব্যক্ত করেন সর্বত্রই। অস্তিত্বের সকল সৌন্দর্য ও হর্ষকেই দেখা হয় তাঁরই হর্ষ ও আনন্দ ব'লে; চিৎপুরুষ তাঁকে আলিঙ্গন করে সকল সত্তার মধ্যে; আস্বাদিত প্রেমের রভস নিজেকে বাইরে ঢেলে দেয় বিশ্বজনীন প্রেমে; সকল অস্তিত্ব হয়ে ওঠে এর আনন্দের বিকিরণ, আর এমনকি আকারেও এ রূপান্তরিত হয় এমন কিছুতে যা তার বাহ্য আকার থেকে ভিন্ন। স্বয়ং জগৎকেই অনুভব করা হয় দিব্য আনন্দের খেলা ব'লে, লীলা ব'লে আর যার মধ্যে জগৎ নিজেকে লীন করে তা হল শাশ্বত মিলনানন্দের স্বর্গধাম।

পঞ্চম অধ্যায়

দিব্য ব্যক্তিসত্ত্ব

যে সমন্বয়ী যোগে জ্ঞান ও ভক্তিকে শুধু অন্তর্ভুক্ত করা নয়, তাদের মিলিয়ে এক করা হয় তাতে এখনই একটি প্রশ্নের উদয় হয় — এটি হল দিব্য ব্যক্তিসত্ত্বের দুরূহ ও ক্লান্তিকর প্রশ্ন। আধুনিক ভাবনার প্রবণতা হয়েছে ব্যক্তিসত্ত্বকে ছোট করার দিকে; অস্তিত্বের জটিল তথ্যরাজির পশ্চাতে এ দেখেছে শুধু এক মহতী নৈর্ব্যক্তিক শক্তি, এক দুর্জ্ঞেয় সম্ভূতি, আর তারও কাজ চলে বিভিন্ন নৈর্ব্যক্তিক শক্তি ও নৈর্ব্যক্তিক বিধানের মাধ্যমে, আর ব্যক্তিসত্ত্ব উপস্থিত হয় এই নৈর্ব্যক্তিক গতির শুধু এক পরবর্তী, গৌণ, আংশিক ও স্বল্পস্থায়ী ঘটনা হিসেবে। যদি স্বীকারও করা যায় যে এই শক্তির চেতনা আছে তাহলেও ঐ চেতনা মনে হয় নৈর্ব্যক্তিক, অব্যাকৃত এবং আচ্ছিন্ন গুণ বা ক্রিয়াশক্তি ছাড়া স্বরূপতঃ সর্ববিষয়শূন্য। প্রাচীন ভারতীয় ভাবনার অধিকাংশ ধারাই সোপান শ্রেণীর সম্পূর্ণ অন্য প্রান্ত থেকে শুরু ক'রে উপনীত হয়েছে ঐ একই সামান্য সিদ্ধান্তে। এদের ধারণায় এক নৈর্ব্যক্তিক সন্মাত্রই মূল ও সনাতন সত্য; ব্যক্তিসত্ত্ব শুধু এক ভ্রমাত্মক মায়া, অথবা বড় জোর এক মনের ব্যাপার।

অপর পক্ষে ভক্তিমার্গ অসম্ভব হয় যদি এ কথা স্বীকার না করা যায় যে ভগবানের ব্যক্তিসত্ত্ব এক সদ্‌বস্তু, এক বাস্তব সত্য, এ ভ্রমের আশ্রয়স্থল নয়। প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ না থাকলে প্রেম সম্ভব হয় না। যদি আমাদের ব্যক্তিসত্ত্ব ভ্রম হয় আর যদি আমাদের আরাধ্য পরম ব্যক্তিসত্ত্বও হয় শুধু ভ্রমের এক প্রধান দিক, আর যদি আমরা তা বিশ্বাস করি, তাহলে এখনই প্রেম ও আরাধনার বিনাশ আবশ্যক, অথবা তা শুধু থাকতে পারে হৃদয়ের অযৌক্তিক তীব্র অনুরাগের মধ্যে যা তার প্রবল জীবনস্পন্দনের দ্বারা অস্বীকার করে যুক্তিবুদ্ধির স্পষ্ট ও শুষ্ক সত্যসমূহ। যা আমাদের মনের ছায়া অথবা এক উজ্জ্বল বিশ্বঘটনা এবং সত্যের দৃষ্টি থেকে অন্তর্হিত হয় তাকে ভালোবাসা ও পূজা করা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু স্বেচ্ছাকৃত আত্মপ্রতারণার ভিত্তির উপর মুক্তির পথ রচনা সম্ভব নয়। অবশ্য ভক্ত বুদ্ধির এই সব সংশয়কে তার পথে আসতে দেয় না; সে পায় তার হৃদয়ের দৈব বাণী, আর এইগুলিই তার পক্ষে পর্যাপ্ত। কিন্তু পূর্ণযোগের সাধকের কর্তব্য সনাতন ও চরম সত্য জানা, শেষ অবধি ছায়ার আনন্দের মধ্যে পড়ে না থাকা। যদি নৈর্ব্যক্তিক একমাত্র স্থায়ী সত্য হয়, তাহলে কোন দৃঢ় সমন্বয় সম্ভবপর হয় না। বড় জোর সে দিব্য ব্যক্তিসত্ত্বকে নিতে পারে প্রতীক হিসেবে, এক শক্তিশালী ও কার্যকরী কল্পনা হিসেবে, কিন্তু পরিশেষে তার করণীয় হবে একে অতিক্রম ক'রে ভক্তি ত্যাগ করা একমাত্র চরম জ্ঞানান্বেষণের উদ্দেশ্যে। অলক্ষণ সদ্‌বস্তুতে উপনীত হতে হলে তার করণীয় হবে সত্তাকে রিক্ত করা তার সকল প্রতীক, ইষ্টার্থ, আধেয় ফেলে দিয়ে।

কিন্তু আমরা বলেছি যে আমাদের মন যেমন বোঝে, ব্যক্তিসত্ত্ব ও নৈর্ব্যক্তিকত্ব শুধু ভগবানের বিভিন্ন বিভাব এবং উভয়ই বিদ্যমান তাঁর সত্তার মধ্যে; এরা একই বিষয়, কিন্তু আমরা একে দেখি দুই বিপরীত দিক থেকে এবং তার মধ্যে প্রবেশ করি দুই বিভিন্ন দুয়ার দিয়ে। যখন আমরা চলি ভক্তির টান ও প্রেমের বোধি অনুযায়ী, তখন ধীশক্তি যে সব সংশয়ের দ্বারা আমাদের কষ্ট দিতে চায় অথবা আমাদের অনুসরণ করতে চায় দিব্য মিলনের হর্ষের মধ্যে, সেই সব সংশয় থেকে মুক্ত হতে হলে আমাদের কর্তব্য হবে এই বিষয়টি আরো সুস্পষ্টভাবে দেখা। অবশ্য ঐ হর্ষ থেকে তারা খসে পড়ে, কিন্তু যদি আমরা আক্রান্ত থাকি দার্শনিক মনের অতীব গুরুভারে, তাহলে এরা আমাদের সঙ্গে যেতে পারে ওর দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত। সুতরাং যতশীঘ্র সম্ভব এই সব থেকে নিজেদের মুক্ত করাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ, আর তার উপায় হল, বুদ্ধি, যুক্তিনিষ্ঠ দার্শনিক মন সত্যের দিকে যে বিশিষ্ট ধারায় অগ্রসর হয় সে বিষয়ে তাদের সব সীমা উপলব্ধি করা, এবং সেই আধ্যাত্মিক অনুভূতিরও — যেসব অনুভূতি সম্ভব হয়েছে বুদ্ধির রাস্তায় এগিয়ে এসে — সব সীমা উপলব্ধি করা এবং এ-ও দেখতে পাওয়া যে এই সব অনুভূতি সেই সর্বোচ্চ ও সর্বপ্রসারী অখণ্ড আধ্যাত্মিক অনুভূতি হতেই হবে এমন কোন কথা নয়। আধ্যাত্মিক বোধি সর্বদাই বিবেকী যুক্তিবুদ্ধি অপেক্ষা অধিকতর জ্যোতির্ময় দিশারী, আর আধ্যাত্মিক বোধির নির্দেশ আমরা যে শুধু যুক্তিবুদ্ধির মাধ্যমে পাই তা নয়, আমরা তা পাই আমাদের সত্তার অন্যান্য অংশেরও মাধ্যমে, হৃদয় ও প্রাণেরও মাধ্যমে। সুতরাং সম্যক্ জ্ঞান এমন কিছু হবে যা এইসব বিবেচনা ক'রে তাদের বিবিধ সত্যগুলি মিলিয়ে এক করে। ধীশক্তি নিজেই আরো গভীরভাবে তৃপ্ত হবে যদি এ শুধু নিজের তথ্যসমূহেই নিবদ্ধ না থেকে হৃদয় ও প্রাণেরও সত্য গ্রহণ করে এবং তাদের দেয় তাদের একান্ত আধ্যাত্মিক মূল্য।

দার্শনিক বুদ্ধির স্বভাব হল ভাবনার মধ্যে বিচরণ করা এবং এই সবকে তাদের নিজস্ব এমন এক প্রকার আচ্ছিন্ন বাস্তবতা দেওয়া যা আমাদের জীবন ও ব্যক্তিগত চেতনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এদের সকল মূর্ত প্রতিরূপ থেকে বিচ্ছিন্ন। এর প্রবৃত্তি হল এই সব প্রতিরূপকে তাদের রিক্ততম ও সর্বাপেক্ষা সাধারণ সংজ্ঞায় পরিণত করা এবং সম্ভব হলে এমনকি এই গুলিকেও পরিণত করা কোন অন্তিম আচ্ছিন্ন প্রত্যয়ে। শুদ্ধ বুদ্ধির গতি জীবন থেকে দূরে ভিন্নমুখী। বিষয়সমূহের বিচারের কাজে এর প্রয়াস হল আমাদের ব্যক্তিভাবনার উপর তাদের প্রভাব থেকে সরে গিয়ে তাদের পশ্চাতে যা কিছু সাধারণ ও নৈর্ব্যক্তিক সত্য আছে তাতে উপনীত হওয়া; এই সত্যকেই সত্তার একমাত্র আসল সত্য ব'লে, অন্ততঃ সদ্‌বস্তুর একমাত্র শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী সামর্থ্য ব'লে গণ্য করতেই এ প্রবণ। সেজন্য এ স্বভাববশতঃই চরম সীমায় একান্ত নৈর্ব্যক্তিকত্বে ও একান্ত আচ্ছিন্ন প্রত্যয়ে পরিণত হতে বাধ্য। এইখানেই প্রাচীন দর্শনসমূহের সমাপ্তি। এরা সব কিছুকেই পরিণত করেছিল তিনটি আচ্ছিন্ন প্রত্যয়ে — সত্তার সৎ, চিৎ ও আনন্দে, আর তাদের প্রবণতা হল এই তিনটির মধ্যে যে দুটিকে প্রথম ও সর্বাপেক্ষা আচ্ছিন্ন প্রত্যয়ের উপর নির্ভরশীল মনে হ'ত সে দুটিকে বর্জন করা এবং সকল কিছুকেই নিক্ষেপ করা এক শুদ্ধ অলক্ষণ

সন্মাত্রের মধ্যে যা থেকে সত্তার একমাত্র অনন্ত ও কালাতীত তথ্য ছাড়া অন্য সব কিছুই — সকল রূপ, সকল ইষ্টার্থ পরিত্যক্ত হয়েছে। কিন্তু বুদ্ধির পক্ষে আরো একটি পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব ছিল, আর তা নেওয়া হয়েছিল বৌদ্ধদর্শনে। এ দেখল যে এমনকি সন্মাত্রের এই সর্বশেষ তথ্যটিও শুধু এক প্রতিরূপ; ওকেও বিয়োগ ক'রে এ পৌঁছল এক অনন্ত শূন্যে যা হয়ত এক রিক্ততা অথবা এক শাশ্বত অনির্বচনীয়।

আমরা যেমন জানি, হৃদয় ও প্রাণের বিধান সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা আচ্ছিন্ন প্রত্যয় নিয়ে থাকতে পারে না; তারা তাদের তৃপ্তি পেতে পারে শুধু সেই সব বিষয়ে যেগুলি মূর্ত অথবা গ্রাহ্য করা যায়; কি ভৌতিক, কি মানসিক, কি আধ্যাত্মিক ভাবে, তাদের লক্ষ্য এমন কিছু নয় যা তারা বুদ্ধিগত বিয়োজনের দ্বারা বিচার ক'রে পেতে চায়; তারা চায় এর এক জীবন্ত সম্ভূতি অথবা তাদের লক্ষ্যের এক সচেতন প্রাপ্তি ও হর্ষ। আচ্ছিন্ন মনের অথবা নৈর্ব্যক্তিক অস্তিত্বের তৃপ্তিতে যে তারা সাড়া দেয় তা-ও নয়, তারা সাড়া দেয় আমাদের অন্তঃস্থ এক পুরুষের এক চিন্ময় ব্যক্তির হর্ষে ও সক্রিয়তায়; এই পুরুষ সান্ত বা অনন্ত যাই হন না কেন, তাঁর কাছে তাঁর অস্তিত্বের বিভিন্ন আনন্দ ও সামর্থ্য এক সদ্‌বস্তু। সুতরাং যখন হৃদয় ও প্রাণ ফেরে সর্বোত্তম ও অনন্তের অভিমুখে, তখন তারা কোন আচ্ছিন্ন অস্তিত্বে বা অনস্তিত্বে, সৎ, কিংবা নির্বাণে উপনীত হয় না, তারা উপনীত হয় এক সৎপুরুষে, শুধু এক চেতনায় নয় বরং এক চিন্ময় পুরুষে, চৈতন্য পুরুষে, শুধু যে 'অস্তি'র কেবল এক নৈর্ব্যক্তিক আনন্দে তা নয়, বরং আনন্দের এক অনন্ত "অহমস্মি"তে, এক আনন্দময় পুরুষে; আবার তারা যে তার চেতনা ও আনন্দকে এক অলক্ষণ সন্মাত্রের মধ্যে নিমজ্জিত ও বিলীন করবে তা-ও নয়, বরং তারা দাবী করবে একের মধ্যে সকল তিনটিই পেতে, কারণ অস্তিত্বের আনন্দই তাদের শ্রেষ্ঠ সামর্থ্য, আর চেতনা না থাকলে, আনন্দলাভও সম্ভব নয়। ভারতের প্রগাঢ়তম প্রেমধর্মের পরম বিগ্রহের, সর্বানন্দ, সর্বসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের তাৎপর্য হল এই।

বুদ্ধিও এই ধারা অনুযায়ী যেতে পারে, কিন্তু তখন আর এ শুদ্ধ ধীশক্তি থাকে না; এ তার সাহায্যে তার কল্পনাশক্তিকে ডাকে, আর হয়ে ওঠে মূর্তি নির্মাতা, প্রতীক ও মূল্যের স্রষ্টা, আধ্যাত্মিক শিল্পী ও কবি। সেজন্য কঠোরতম বুদ্ধিপর দর্শন সগুণ, দিব্য ব্যক্তিকে স্বীকার করে — শুধু পরম বিশ্বপ্রতীক হিসেবে; এ বলে, ওকে ছাড়িয়ে সদ্‌বস্তুতে যাও, তুমি শেষে উপনীত হবে নির্গুণে, শুদ্ধ নৈর্ব্যক্তিকে। এর প্রতিদ্বন্দ্বী দর্শন বলে, সগুণই শ্রেষ্ঠ; হয়ত তা বলবে, যা নৈর্ব্যক্তিক তা তাঁর আধ্যাত্মিক প্রকৃতির উপাদান, পদার্থ যা থেকে সে ব্যক্ত করে তার সত্তা, চেতনা ও আনন্দের বিভিন্ন সামর্থ্য, সেই সব যা তাঁকে প্রকাশ করে; নৈর্ব্যক্তিক হল শুধু সেই আপতিক অসদর্থক যার মধ্যে থেকে তিনি বিকীর্ণ করেন তাঁর ব্যক্তিসত্ত্বের নিত্য সদর্থকের সব কালগত বিকার। স্পষ্টতঃই এখানে দুইটি সহজাত বৃত্তি আছে, অথবা যদি আমরা ধীশক্তির বেলায় এই পদটি প্রয়োগ করতে ইতস্ততঃ করি, তাহলে বলা যায় আমাদের সত্তার দুইটি অন্তর্জাত সামর্থ্য আছে যারা একই সদ্‌বস্তুর সঙ্গে ব্যবহার করে তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব ধারায়।

এই যে ধীশক্তির সব ভাবনা, এর বিচার বিবেচনা, এবং হৃদয় ও জীবনের বিভিন্ন আস্পৃহা ও তাদের আসন্ন ভাবগুলি এই উভয়েরই পশ্চাতে বিভিন্ন সদ্‌বস্তু আছে আর ওরা এই সদ্‌বস্তুতে উপনীত হবার উপায়। উভয়েরই যাথার্থ্য আধ্যাত্মিক অনুভূতির দ্বারা সমর্থিত; যে বিষয়ের জন্য তাদের অন্বেষণ তাদের দিব্য অনপেক্ষ তত্ত্বে উভয়ই উপনীত হয়। কিন্তু তবু প্রত্যেকেরই প্রবণতা হল — যদি একে অতিমাত্রায় আত্যন্তিকভাবে প্রশ্রয় দেওয়া হয় — তার নিজের অন্তর্জাত গুণ ও বিশিষ্ট উপায়ের সব সঙ্কীর্ণতার দ্বারা ব্যাহত হওয়া। আমাদের পার্থিব জীবনধারায় আমরা এটাই দেখি; এখানে হৃদয় ও প্রাণকে আত্যন্তিকভাবে অনুসরণ করা হলে কোন জ্যোতির্ময় ফল লাভ হয় না, আবার আত্যন্তিক বুদ্ধিপরায়ণতাও হয়ে ওঠে দূরবর্তী, আচ্ছিন্ন ও অশক্ত, অথবা এক নিষ্ফল সমালোচক বা শুষ্ক যন্ত্রকার। তাদের পর্যাপ্ত সামঞ্জস্য ও সমুচিত সমন্বয়সাধন আমাদের মনোবিদ্যা ও আমাদের ক্রিয়ার অন্যতম দুরূহ সমস্যা।

সমন্বয় আনার সামর্থ্য আছে তাদের উর্ধ্বে, বোধিতে। কিন্তু এক বোধি আছে যা ধীশক্তির অনুবর্তী, এবং এক বোধি আছে যা হৃদয় ও প্রাণের অনুবর্তী, আর যদি আমরা এদের কোন একটিকে আত্যন্তিকভাবে অনুসরণ করি, আমরা পূর্বাপেক্ষা বেশী অগ্রসর হব না; অন্যান্য অল্পদৃষ্টি সামর্থ্য যা করতে চায়, আমরা শুধু তা-ই করি অর্থাৎ বিষয়গুলিকে আমাদের কাছে আরো অন্তরঙ্গভাবে বাস্তব করি, কিন্তু তবু তা করি পৃথকভাবে। কিন্তু এই যে সত্য যে বোধি নিরপেক্ষভাবে আমাদের সত্তার সকল অংশেরই সহায় হয় — কারণ এমনকি দেহেরও নিজস্ব সব বোধি আছে — তা থেকে বোঝা যায় যে বোধি আত্যন্তিক নয়, বরং এ হল এক অখণ্ড সত্য আবিষ্কর্তা। আমাদের কর্তব্য আমাদের সমগ্র সত্তার বোধিকে পরীক্ষা করা — শুধু যে পৃথকভাবে তার প্রতি অংশে অথবা তাদের বিভিন্ন প্রাপ্তির যোগফলে তা নয়, বরং এই সব অবর করণের উজানে, এমনকি এদের প্রাথমিক আধ্যাত্মিক প্রতিরূপেরও উজানে, বোধির স্বধামে উঠে যা অনন্ত ও অসীম সত্যের স্বধাম, "ঋতস্য স্বে দমে" যেখানে সকল অস্তিত্ব এর ঐক্য আবিষ্কার করে। এই হল প্রাচীন বেদের সেই বাণীর তাৎপর্য — "ঋতেন ঋতম্ অপিহিতং ধ্রুবং...দশ শতা সহ তস্থুঃ তদ্ একম্" (ঋগ্বেদ — ৫।৬২।১) — "সত্যের দ্বারা আবৃত একটি ধ্রুব সত্য আছে (অর্থাৎ নিত্যসত্যকে আবৃত করে আছে এই অন্য সত্য যার এই সব অবর বোধি আমরা পাই); সেখানে আলোকের দশ শত রশ্মি একত্র অবস্থিত; ওই হল একম্।"

আধ্যাত্মিক বোধি সর্বদাই সত্যের সন্ধান পায়; এ আধ্যাত্মিক উপলব্ধির জ্যোতির্ময় অগ্রদূত, আর না হয় এর উদ্ভাসক আলোক; এ তা-ই দেখে যার সন্ধানের জন্য আমাদের সত্তার অন্যান্য সামর্থ্যগুলি প্রয়াসী; বুদ্ধির বিভিন্ন আচ্ছিন্ন প্রতিরূপ এবং হৃদয় ও প্রাণের বিভিন্ন প্রাতিভাসিক প্রতিরূপের যে ধ্রুব সত্য তা-ই এ পায়, এই সত্য নিজে দূরবর্তীভাবেও আচ্ছিন্ন নয়, অথবা বাহ্যভাবে মূর্ত নয়, বরং অন্য এমন কিছু যার সম্বন্ধে বলা যায় যে আমাদের কাছে এর যে মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যক্তি তার শুধু দুই পক্ষ এরা।

যখন আমাদের অখণ্ড সত্তার বিভিন্ন অঙ্গ আর নিজেদের মধ্যে বিবাদ করে না, বরং ঊর্ধ্ব থেকে আলোকিত হয়, তখন এর বোধি যা উপলব্ধি করে তা এই যে আমাদের সত্তার সমগ্র পেতে চায় সেই এক সদ্‌বস্তু। নৈর্ব্যক্তিক এক সত্য, পুরুষবিধও এক সত্য; এরা একই সত্য, তবে দেখা হয়েছে আমাদের মনস্তাত্ত্বিক সক্রিয়তার দুই দিক থেকে; এদের কোনটিই একলা পরম সদ্‌বস্তুর পূর্ণ বিবরণ দেয় না অথচ এদের প্রত্যেকটিরই সাহায্যে আমরা অগ্রসর হতে পারি এর দিকে।

এক দিক থেকে দেখলে মনে হবে, যেন এক নৈর্ব্যক্তিক মনন কর্মরত যে তার ক্রিয়ার সুবিধার জন্য সৃষ্টি করেছে এক মিথ্যা চিন্তক, এক নৈর্ব্যক্তিক সামর্থ্য কর্মরত যে সৃষ্টি করে এক মিথ্যা কর্তা, এক নৈর্ব্যক্তিক অস্তিত্ব কর্মরত যা এমন এক পুরুষবিধ সত্তার মিথ্যা ব্যবহার করে যার সচেতন ব্যক্তিসত্ত্ব ও ব্যক্তিগত আনন্দ আছে। অন্য দিক থেকে দেখলে, এক চিন্তকই নিজেকে প্রকাশ করে। বিভিন্ন চিন্তায় যেগুলি সে না থাকলে থাকতে পারত না, আর আমাদের চিন্তার সামান্য প্রতীতি চিন্তকের প্রকৃতির সামর্থ্যের প্রতীকমাত্র; ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেন সঙ্কল্প ও সামর্থ্য ও শক্তির দ্বারা; সৎপুরুষই নিজেকে প্রসারিত করেন তাঁর অস্তিত্ব, চেতনা ও আনন্দের সকল রূপে — অখণ্ড ও আংশিক, সরল, বিপরীত ও বিকৃত, আর এই সব বিষয় সম্বন্ধে আমাদের আচ্ছিন্ন সামান্য প্রতীতি হল তাঁর সত্তার প্রকৃতির ত্রিবিধ সামর্থ্যের শুধু এক বুদ্ধিগত প্রতিরূপ। তখন বিপরীতভাবে মনে হবে যে সকল নৈর্ব্যক্তিকত্ব এক মিথ্যা, আর অস্তিত্ব তার প্রতি গতিতে ও প্রতি কণাতে সেই এক অথচ অগণিত ব্যক্তিসত্ত্বের, অনন্ত পরম দেবতার, আত্মবিৎ ও আত্মবিকাশমান পুরুষের প্রাণ, চেতনা, সামর্থ্য ও আনন্দ বৈ আর কিছু নয়। দুইটি দৃষ্টিই সত্য, শুধু এই ছাড়া যে মিথ্যার ভাবনা আমাদের বুদ্ধিগত প্রণালী থেকে ধার নেওয়া হয়েছে তাকে নির্বাসন দিতে হবে, আর প্রত্যেক দৃষ্টিকেই দিতে হবে তার উপযুক্ত যথার্থতা। পূর্ণ যোগের সাধককে এই আলোকে দেখতে হবে যে এই উভয় প্রণালীতেই সে পৌঁছতে পারে সেই একই অভিন্ন সদ্‌বস্তুতে, হয় পরপর, নয় একসাথে — যেন এমন দুইটি সংযুক্ত চাকার উপর যে দুটি চলে সমান্তরাল রেখায় তবে এমন সমান্তরাল রেখা যা বুদ্ধিপর তর্কশাস্ত্র অগ্রাহ্য ক'রে মেশে অনন্তের মধ্যে ঐক্য সম্বন্ধে তাদের আপন আন্তর সত্য অনুযায়ী।

এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমাদের দেখতে হবে ভাগবত ব্যক্তিসত্ত্বের দিকে। যখন আমরা ব্যক্তিসত্ত্বের কথা বলি, তখন আমরা প্রথমে এর দ্বারা এমন কিছু বুঝি যা সীমিত, বাহ্য ও বিভক্ত, আর পুরুষবিধ ভগবান সম্বন্ধে আমাদের ভাবনা হয়ে ওঠে এই একই অসম্পূর্ণ প্রকৃতির। আমাদের কাছে আমাদের ব্যক্তিসত্ত্বের অর্থ প্রথমে এই যে এ হল এক পৃথক প্রাণী, এক সীমাবদ্ধ মন, দেহ, চরিত্র, আর আমরা যে ব্যক্তি তা একেই মনে করি, এক স্থির পরিমাণ; কারণ যদিও বস্তুতঃ এ সর্বদাই পরিবর্তিত হচ্ছে, তবু স্থায়িত্বের এমন যথেষ্ট উপাদান থাকে যাতে এই স্থিরতার ধারণা সম্বন্ধে এক প্রকার ব্যবহারিক সঙ্গত সমর্থন পাওয়া যায়। আমরা মনে করি ভগবান এইরকম এক ব্যক্তি, শুধু তাঁর দেহ

নেই, তিনিও অন্যদের থেকে ভিন্ন এক পৃথক ব্যক্তি, তাঁর মন ও চরিত্র আছে আর এরা কতকগুলি গুণের দ্বারা সীমাবদ্ধ। প্রথমে আমাদের অলংকৃত ধারণায় এই দেবতা অতীব অস্থির, চপল ও খেয়ালী, আমাদের মানুষী চরিত্রের এক বড় সংস্করণ; কিন্তু পরে আমরা মনে করি যে ভগবানের ব্যক্তিসত্ত্বের প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্থির পরিমাণের এবং আমরা তাঁতে শুধু সেই সব গুণ আরোপ করি যেগুলিকে আমরা মনে করি দিব্য ও আদর্শ, আর অন্য সব গুণ বাদ দেওয়া হয়। এই সঙ্কীর্ণতার দরুন আমরা বাকী সবের জন্য বাধ্য হয়ে এক শয়তানকে দায়ী করি, আর না হয় যা সবকে আমরা অশুভ মনে করি সে সবের জন্য বলি যে মানুষেরই আদি সামর্থ্য আছে তাদের সৃষ্টি করার ও সেই তাদের কারণ, আর না হয়, যখন দেখি যে এই যুক্তিও ঠিক চলে না তখন আমরা প্রকৃতি নাম দিয়ে এক শক্তি খাড়া করি এবং যে সব হীন গুণ ও রাশি রাশি কর্মের জন্য ভগবানকে দায়ী করতে চাই না সে সব আরোপ করি এই শক্তিতে আরো উচ্চস্তরে, ভগবানে মন ও চরিত্রের আরোপ আরো কম মানুষী ধরনের হয়ে ওঠে, আমরা মনে করি তিনি এক অনন্ত চিৎপুরুষ, তবু এক পৃথক ব্যক্তি, এক চিৎপুরুষ আর তিনি কতকগুলি নির্দিষ্ট গুণ বিশিষ্ট। ভাগবত ব্যক্তিসত্ত্ব, পুরুষবিধ ভগবান সম্বন্ধে এই সব ভাবনা ভাবা হয়, আর বিভিন্ন ধর্মে এই সব ভাবনা সম্পূর্ণ ভিন্নভিন্ন ধরনের।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে এই সব এক আদি নরত্বারোপবাদ যার পরিণতি হল ভগবান সম্বন্ধে এক বুদ্ধিপর ধারণা আর জগৎকে আমরা যেমন দেখি তাতে তার বাস্তবতার সঙ্গে এর বৈষম্য অত্যন্ত বেশী। দার্শনিক ও সন্দিগ্ধ মন যে এই সবকে বুদ্ধির যুক্তিতে সহজেই ধ্বংস করবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই — এর যুক্তিধারায় পুরুষবিধ ভগবান অস্বীকার করা হয়, স্বীকার করা হয় এক নৈর্ব্যক্তিক শক্তি বা সম্ভূতি, অথবা স্বীকার করা হয় এক নৈর্ব্যক্তিক সত্তা বা অনির্বচনীয় অসৎ, আর বলা হয় যে বাকী সব শুধু মায়ার প্রতীক অথবা কালচেতনার প্রাতিভাসিক সত্য। কিন্তু এই সব শুধু একেশ্বরবাদের ভিন্ন রূপ। বহুদেববাদী ধর্মগুলি যারা হয়ত কম উন্নত কিন্তু আরো ব্যাপক এবং বিশ্বজীবনের প্রতি প্রত্যুত্তরে আরো সংবেদনশীল অনুভব করেছে যে বিশ্বের মধ্যে সকল কিছুরই উৎপত্তির কারণ এক দেবতা; সেজন্য তারা ভেবেছিল যে দিব্য ব্যক্তিসত্ত্ব অর্থাৎ দেবতা বর্তমান, আর এর সঙ্গে এক অস্পষ্ট বোধ ছিল যে তাদের পশ্চাতে এক অনির্দেশ্য ভগবান বর্তমান, তবে বিভিন্ন পুরুষবিধ দেবতার সঙ্গে তাঁর সব সম্পর্ক সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। আর এদের অপেক্ষাকৃত জনসাধারণে প্রচলিত বাহ্যরূপগুলিতে এই দেবতারা ছিল অমার্জিত মানুষী ধরনের; কিন্তু যেখানে আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহের আন্তর অর্থ আরো স্বচ্ছ হয়ে উঠল, সেখানে বিভিন্ন দেবতাদের মনে করা হল একই ভগবানের বিভিন্ন ব্যক্তিসত্ত্বের রূপ — এই হল প্রাচীন বেদের ঘোষিত বাণী। এই ভগবান হতে পারেন এক পরম পুরুষ যিনি নিজেকে প্রকট করেন নানাবিধ দিব্য ব্যক্তিসত্ত্বে, অথবা তিনি এক নৈর্ব্যক্তিক সন্মাত্র যা মানবমনকে দেখা দেয় এই সব বিভিন্ন রূপে; অথবা, বুদ্ধির দ্বারা এদের মধ্যে কোন সমন্বয়সাধনের চেষ্টা না ক'রে দুইটি

মতকেই এক সাথে স্বীকার করা যায়, কারণ দুইটিই আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে সত্য ব'লে উপলব্ধ হয়েছিল।

ভাগবত ব্যক্তিসত্ত্ব সম্বন্ধে এই সব ধারণাকে আমরা যদি বুদ্ধির দ্বারা বিচার করি, তাহলে আমাদের প্রবণতা অনুযায়ী আমরা বলতে চাইব যে এরা কল্পনার সৃষ্টি, অথবা মনস্তাত্ত্বিক প্রতীক, অন্ততঃপক্ষে যে বিষয়টি আদৌ এই সব নয় বরং সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক তার প্রতি আমাদের সংবেদনশীল ব্যক্তিসত্ত্বের প্রতিক্রিয়া। আমরা বলতে পারি যে বস্তুতঃ ওটি (তৎ) আমাদের মানবত্ব ও আমাদের ব্যক্তিসত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং সেজন্য ওর সঙ্গে সম্পর্কে আসার জন্য আমরা ভিতরের টানে বাধ্য হই এই সব মানবীয় কল্পিতকথা ও এই সব পুরুষবিধ প্রতীক স্থাপন করতে, তবে যদি আমরা একে আরো নিকটে পাই। কিন্তু আমাদের বিচার করা চাই আধ্যাত্মিক অনুভূতির দ্বারা এবং এক সমগ্র আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে আমরা দেখতে পাব যে এই সব বিষয় কল্পনাপ্রসূত মিথ্যা বা প্রতীক নয়, বরং ভাগবত সত্তার স্বরূপেরই বিভিন্ন সত্য, যেগুলি সম্বন্ধে আমাদের চিত্র যতই অপূর্ণ হ'ক না কেন। এমনকি আমাদের নিজেদের ব্যক্তিসত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের প্রাথমিক ভাবনা একান্তই প্রমাদ নয়, এ শুধু এক অসম্পূর্ণ ও অগভীর দৃষ্টি যা বহু মানসিক প্রমাদে সমাকীর্ণ। মহত্তর আত্মজ্ঞানে আমরা জানি যে প্রথমে আমাদের সম্বন্ধে যা মনে হয় যে আমরা রূপ, বিভিন্ন সামর্থ্য, ধর্ম, গুণের এক বিশেষ গঠন যার সঙ্গে এক সচেতন "আমি" নিজেকে অভিন্ন বোধ করে তা আমরা মূলতঃ নই। ঐ বিশেষ গঠন হল আমাদের সক্রিয় চেতনার উপরিভাগে আমাদের আংশিক সত্তার শুধু এক সাময়িক ঘটনা, কিন্তু তবু এ হল এক ঘটনা। আমরা দেখি যে অন্তরে এক অনন্ত সত্তা বিদ্যমান যা সকল গুণের, অনন্ত গুণের যোগ্যতাসম্পন্ন, আর এই সব গুণকে মেশানো যায় সম্ভবপর যে কোন সংখ্যক প্রকারে, আর প্রতি মিশ্রণই আমাদের সত্তার এক প্রকাশ। কারণ এই সব ব্যক্তিসত্ত্ব হল এক ব্যক্তির অর্থাৎ নিজের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে সচেতন এক পুরুষের আত্ম-অভিব্যক্তি।

কিন্তু আমরা এও দেখি যে এই পুরুষ যেন অনন্তগুণসম্পন্নই নয়, বরং তার জটিল বাস্তবতার এমন এক পাদ তার আছে যাতে সে যেন গুণ থেকে সরে দাঁড়িয়ে হয়ে ওঠে এক অনির্দেশ্য চিন্ময় সন্মাত্র, "অনির্দেশ্যম্"। এমনকি মনে হয় চেতনাও প্রত্যাহৃত হয়, আর বাকী থাকে শুধু এক কালাতীত শুদ্ধ সন্মাত্র। আবার এমনকি আমাদের সত্তার এই শুদ্ধ আত্মাকে এক বিশেষ স্তরে মনে হয় যে এ নিজের আপন বাস্তবতা অস্বীকার করে অথবা এ হল এক অনাত্ম,[১] অপ্রতিষ্ঠ অজ্ঞেয় থেকে পুরঃক্ষেপ যার সম্বন্ধে আমাদের এই ধারণা সম্ভব যে এ হয় এক নামহীন কিছু অথবা শূন্য। আর যখন এইটির উপর আত্যন্তিকভাবে নিবিষ্ট হই এবং এ নিজের মধ্যে যা সব প্রত্যাহার করেছে তা ভুলে যাই, কেবল তখনই আমরা বলি যে শুদ্ধ নৈর্ব্যক্তিকত্ব বা রিক্ত শূন্যই শ্রেষ্ঠ সত্য। কিন্তু আরো

[১] অনাত্ম্যম্ অনিলয়নম্ — তৈত্তিরীয় উপনিষদ।

এক সম্যক্ দর্শনে আমরা দেখি যে ব্যক্তি ও ব্যক্তিসত্ত্ব এবং যা সব এ ব্যক্ত করেছে — এই নিজেকে এই ভাবে পরিণত করেছে নিজের অব্যক্ত অনপেক্ষ তত্ত্বে। আর যদি আমরা আমাদের যুক্তিমানসের সঙ্গে আমাদের হৃদয়কেও উর্ধ্বে নিয়ে যাই সর্বোত্তমে, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে আমরা এতে উপনীত হতে পারি যেমন অনপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিকত্বের মাধ্যমে তেমন অনপেক্ষ ব্যক্তিরও মাধ্যমে। কিন্তু এই সব আত্মজ্ঞান হল — ভগবান তাঁর বিশ্বভাবে যে অনুরূপ সত্য ধারণ করেন শুধু তারই প্রকারভেদ আমাদের মধ্যে। এখানেও আমরা তাঁর দেখা পাই ভাগবত ব্যক্তিসত্ত্বের বিবিধ রূপে, — গুণের বিভিন্ন ব্যাকৃতিতে যেগুলি আমাদের কাছে নানাভাবে তাঁকে ব্যক্ত করে তাঁর প্রকৃতিতে; অনন্ত গুণে; ভাগবত ব্যক্তিতে যিনি নিজেকে প্রকাশ করেন অনন্তগুণে; অনপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিকত্বে, অনপেক্ষ সন্মাত্রে অথবা অনপেক্ষ অসৎ-এ, অথচ — এই যে ভাগবত ব্যক্তি, এই যে চিন্ময়পুরুষ আমাদের মধ্য দিয়ে, বিশ্বের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকট করেন সকল সময়ই এ হল তাঁরই অব্যক্ত অনপেক্ষ তত্ত্ব।

এমনকি বিশ্বলোকের উপরেও আমরা সর্বদাই ভগবানের দিকে অগ্রসর হচ্ছি এই দুই ভাবেই। আমরা চিন্তা, অনুভব করতে পারি ও বলতেও পারি যে ভগবান সত্য, ন্যায়বিচার, নীতিনিষ্ঠা, সামর্থ্য, প্রেম, আনন্দ, সৌন্দর্য; আমরা তাঁকে দেখতে পারি বিশ্বশক্তিরূপে অথবা বিশ্বচেতনারূপে। কিন্তু এ শুধু অনুভূতির আচ্ছিন্ন প্রণালী। যেমন আমরা নিজেরা শুধু কতকগুলি বিভিন্ন গুণ বা সামর্থ্য নই, অথবা এক মনস্তাত্ত্বিক পরিমাণ নই, বরং এক পুরুষ, এক ব্যক্তি যে ঐভাবে তার প্রকৃতি প্রকাশ করে, তেমন ভগবানও এক ব্যক্তি, এক চিন্ময় পুরুষ যিনি ঐভাবে তাঁর প্রকৃতি প্রকাশ করেন আমাদের কাছে। আর আমরা তাঁর আরাধনা করতে পারি এই প্রকৃতির বিভিন্ন রূপে — নীতিনিষ্ঠার ভগবান রূপে, প্রেম ও দয়ার ভগবান রূপে, শান্তি ও শুদ্ধতার ভগবান রূপে; কিন্তু এটি স্পষ্ট যে দিব্য প্রকৃতিতে অন্যান্য বিষয়ও আছে, আর ব্যক্তিসত্ত্বের যে রূপে আমরা এইভাবে তাঁর পূজা করছি তার বাইরে ঐসবকে রেখেছি। অবিচল আধ্যাত্মিক দর্শন ও অনুভূতির সাহস তাঁর দেখা পায় আরো অনেক কঠোর বা করাল রূপে। এই সবের কোনটিই সমগ্র দেবত্ব নয়; অথচ তাঁর ব্যক্তিসত্ত্বের এই সব বিভিন্ন রূপ তাঁর নিজের আসল সত্য, আর এই সবেই তিনি আমাদের দেখা দেন এবং আমাদের সঙ্গে ব্যবহারও করেন ব'লে মনে হয়, যেন বাকী সব তাঁর পশ্চাতে সরিয়ে রাখা হয়েছে। পৃথক পৃথক ভাবে এদের প্রত্যেকটি তিনি, আবার সব একত্র করেও তিনি। তিনি বিষ্ণু, কৃষ্ণ, কালী; তিনি আমাদের কাছে নিজেকে প্রকট করেন মানবপ্রকৃতিতে — খৃষ্টের ব্যক্তিসত্ত্বরূপে অথবা বুদ্ধের ব্যক্তিসত্ত্বরূপে। যখন আমরা আমাদের প্রাথমিক আত্যন্তিকভাবে একাগ্র-করা দর্শনের উজানে তাকাই, আমরা বিষ্ণুর পশ্চাতে দেখি শিবের সমগ্র ব্যক্তিসত্ত্ব এবং শিবের পশ্চাতে দেখি বিষ্ণুর সমগ্র ব্যক্তিসত্ত্ব। তিনি অনন্তগুণ, আবার অনন্ত ভাগবত ব্যক্তিসত্ত্ব যা এর মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে। আবার মনে হয় তিনি সরে যান এক শুদ্ধ আধ্যাত্মিক নৈর্ব্যক্তিকত্বের মধ্যে অথবা এমনকি

নৈর্ব্যক্তিক আত্মারও সকল ভাবনার উজানে যে জন্য আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন নিরীশ্বরবাদ অথবা অজ্ঞেয়বাদ সমর্থনযোগ্য হয়; তিনি মানবমনে হয়ে ওঠেন "অনির্দেশ্যম"। কিন্তু এই অজ্ঞেয়ের মধ্য থেকেই চিন্ময়পুরুষ, ভাগবতব্যক্তি যিনি নিজেকে এখানে ব্যক্ত করেছেন তখনো বলেন, "এও আমি; এমনকি এখানেও মনের দৃষ্টির উজানে আমি সে-ই, পুরুষোত্তম।"

কারণ বুদ্ধির সব বিভাগ ও বিরোধের উজানে অন্য একটি আলোক আছে, আর সেখানে এক সত্যের দর্শন নিজেকে প্রকট করে যাকে আমরা এইভাবে বুদ্ধির প্রণালীতে নিজেদের কাছে প্রকাশ করতে চেষ্টা করতে পারি। সেখানে সব কিছুই এই সব সত্যের একমাত্র সত্য; কারণ সেখানে প্রত্যেকটি বাকী সবের মধ্যে বর্তমান ও ন্যায়সঙ্গত। ঐ আলোকের মধ্যে, আমাদের আধ্যাত্মিক অনুভূতি মিলিত হয়ে এক ও অখণ্ডভাবাপন্ন হয়ে ওঠে; নৈর্ব্যক্তিকের জন্য এষণা ও ভাগবত ব্যক্তিসত্বের আরাধনার মধ্যে, জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের মধ্যে কোন প্রকৃত বিভাজনের লেশমাত্র থাকে না, শ্রেষ্ঠতা ও হীনতার ছায়ামাত্র থাকে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভগবৎ-আনন্দ

তাহলে এই হল ভক্তিমার্গ এবং সর্বাপেক্ষা উচ্চ ও ব্যাপ্ত অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা সম্যক্ জ্ঞানের কাছে তার সমর্থনে যুক্তি হল এই আর আমরা এখন বুঝতে পারি পূর্ণযোগে এর রূপ ও স্থান কি হবে। যোগের সার হল মানবপ্রকৃতির মাধ্যমে ভগবানের অমর সত্তা ও চেতনা ও আনন্দের সঙ্গে অন্তঃপুরুষের মিলনসাধন, আর এর ফল হল আমাদের পক্ষে মনে যা ধারণা করা ও আধ্যাত্মিক সাধনায় উপলব্ধি করা সম্ভব ততদূর পর্যন্ত সত্তার দিব্য প্রকৃতিতে বিকাশ, তা সে যাই হ'ক না কেন। এই ভগবানের যা কিছু আমরা দেখি এবং তাতে একাগ্র শক্তি নিবদ্ধ করি আমরা তা-ই হতে পারি অথবা তার সঙ্গে এক প্রকার ঐক্যে অথবা সবচেয়ে কমপক্ষে তার সঙ্গে এক সুর ও তানে বিকশিত হতে পারি। এই কথাই প্রাচীন উপনিষদ নিঃসংশয়ভাবে সংক্ষেপে বলেছিল তার মহত্তম সংজ্ঞায় — "যে একে সৎ ব'লে জানে, সে ঐ সৎ হয়, আর যে জানে যে এ হল অসৎ, সে ঐ অসৎ হয়"; — আমরা ভগবানের অন্য যা কিছু দেখি সে সবেরই পক্ষে এটি প্রযোজ্য, আর বলা যায় যে এই হল পরম দেবতার যুগপৎ স্বরূপগত ও ব্যবহারিক সত্য। এ হল আমাদের অতীত এমন কিছু যা বস্তুতঃ আমাদের ভিতরে ইতিপূর্বেই বিদ্যমান, কিন্তু যা এখনো আমরা আমাদের মানবজীবনে হইনি অথবা শুধু প্রাথমিকভাবে হয়েছি; কিন্তু এর যা কিছু আমরা দেখি তা আমরা সৃষ্টি বা প্রকাশ করতে সক্ষম আমাদের সচেতন প্রকৃতি ও সত্তায় এবং তাতে বিকশিত হতেও সমর্থ; সুতরাং এইভাবে আমাদের মধ্যে পৃথকভাবে পরমদেবতাকে সৃষ্টি বা প্রকাশ করা এবং এর বিশ্বভাব ও অতিস্থিতিতে বিকশিত হওয়া আমাদের আধ্যাত্মিক নিয়তি। অথবা যদি মনে হয় যে এটি এত উচ্চ যে আমাদের দুর্বল প্রকৃতির পক্ষে তা সাধন করা অসম্ভব, তাহলে অন্ততঃ এর সমীপস্থ হওয়া ও এর চিন্তা করা এবং এর সঙ্গে দৃঢ় সম্বন্ধে আসা এক নিকট ও সম্ভবপর সিদ্ধি।

যে সমন্বয়ী বা পূর্ণযোগের কথা আমরা বিবেচনা করছি তার লক্ষ্য হল আমাদের মানব প্রকৃতির প্রতি অংশের মাধ্যমে, পৃথকভাবে অথবা একসাথে, ভগবানের সত্তা, চেতনা ও আনন্দের সঙ্গে মিলন কিন্তু পরিশেষে এই সবকে সুসমঞ্জস ও একীভূত করা চাই যাতে সমগ্রই রূপান্তরিত হতে পারে সত্তার দিব্য প্রকৃতিতে। এর চেয়ে কম কিছুতে পূর্ণ দ্রষ্টা তৃপ্তি পায় না, কারণ যা সে দেখে তাকে-ই সে আধ্যাত্মিক ভাবে অধিগত করার জন্য এবং যতদূর সম্ভব তা-ই হওয়ার জন্য সে সচেষ্ট। শুধু তার মধ্যস্থ জ্ঞাতাকে নিয়ে নয়, অথবা শুধু সঙ্কল্প নিয়ে নয়, অথবা শুধু হৃদয় নিয়ে নয়, এই সবকেই সমভাবে নিয়ে এবং তার অন্তঃস্থ সমগ্র মনোময় ও প্রাণময় সত্তা নিয়ে সে পরম দেবতার পানে আস্পৃহা করে এবং সাধনা করে তাদের প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করতে তাদের দিব্য প্রতিরূপে।

আর যেহেতু ভগবান আমাদের দেখা দেন তাঁর সত্তার বহু ভাবে এবং সবেতেই তিনি আমাদের আকৃষ্ট করেন তাঁর দিকে, এমন কি যখন মনে হয় তিনি আমাদের কাছ থেকে সরে যাচ্ছেন তখনো — আর এই দিব্য সম্ভাবনা দেখা এবং বিভিন্ন বাধার খেলা জয় করাই মানব জীবনের সমগ্র রহস্য ও মহত্ত্ব — সেহেতু এই সব ভাবের প্রতিটিরই পরাকাষ্ঠাতে অথবা তাদের একত্বের চাবিকাঠি পেলে তাদের সকলের মিলনে আমরা আস্পৃহা করব তাঁকে খুঁজে বার করতে এবং পেয়ে তাঁকে অধিগত করতে। যেহেতু তিনি নৈর্ব্যক্তিকত্বের মধ্যে সরে যান, সেহেতু আমরা তাঁর নৈর্ব্যক্তিক সত্তা ও আনন্দের সন্ধানে যাব, কিন্তু যেহেতু তিনি আবার আমাদের ব্যক্তিসত্ত্বের মধ্যে এবং মানবের সঙ্গে ভগবানের বিভিন্ন ব্যক্তিগত সম্বন্ধের মাধ্যমে আমাদের দেখা দেন, সেহেতু এর থেকেও আমরা নিজেদের বঞ্চিত করব না; প্রেম ও আনন্দের লীলা এবং এর অনির্বচনীয় মিলন — উভয়কেই আমরা গ্রহণ করব।

জ্ঞানের দ্বারা আমরা ভগবানের সঙ্গে ঐক্য খুঁজি তাঁর চিন্ময় সত্তায়; কর্মের দ্বারাও আমরা ভগবানের সঙ্গে ঐক্য খুঁজি তাঁর চিন্ময় সত্তায়, তবে নিস্পন্দভাবে নয়, স্ফুরন্তভাবে, দিব্য সঙ্কল্পের সঙ্গে সচেতন মিলনের মাধ্যমে; কিন্তু প্রেমের দ্বারা আমরা তাঁর সঙ্গে ঐক্য খুঁজি তাঁর সত্তার সকল আনন্দে। সেইজন্য প্রেমমার্গ এর কতকগুলি প্রাথমিক প্রক্রিয়ায় যতই সঙ্কীর্ণ মনে হ'ক না কেন, এ শেষে যোগের অপর যে কোন প্রেরণা অপেক্ষা আরো অবশ্যম্ভাবীরূপে সর্বব্যাপক হয়। জ্ঞানমার্গ সহজেই ঝুঁকে পড়ে নৈর্ব্যক্তিক ও পরমার্থসৎ-এর দিকে, অতিশীঘ্রই আত্যন্তিক হয়ে উঠতে পারে। একথা সত্য যে তা করার প্রয়োজন এর নেই; কারণ ভগবানের চিন্ময় সত্তা যেমন বিশ্বজনীন ও ব্যষ্টিগত তেমন বিশ্বাতীত ও অনপেক্ষ, এখানেও ঐক্যের অখণ্ড উপলব্ধি থাকতে পারে এবং থাকা উচিতও, আর এর দ্বারা আমরা মানবের মধ্যে ভগবানের সঙ্গে ও বিশ্বের মধ্যে ভগবানের সঙ্গে এমন এক আধ্যাত্মিক একত্বে উপনীত হতে পারি যা কোন বিশ্বাতীত মিলনের সঙ্গে কম সম্পূর্ণ নয়। কিন্তু তবু এ যে সম্পূর্ণ অবশ্যম্ভাবী তা নয়। কারণ আমরা বলতে পারি যে জ্ঞানের উচ্চ নীচ ভেদ আছে, উচ্চ আত্মসংবিৎ আছে আবার নিম্ন আত্মসংবিৎ আছে, আর জ্ঞানের স্তূপ বাদ দিয়ে জ্ঞানের শিখরের জন্যই সাধনা করা, সর্বাঙ্গীণ পথ অপেক্ষা বর্জনের পথ নির্বাচন করাই শ্রেয়ঃ। অথবা আমরা এক মায়াবাদ আবিষ্কার ক'রে আমাদের মানবভাইদের সঙ্গে ও বিশ্বক্রিয়ার সঙ্গে সকল সম্পর্ক বর্জন করার সমর্থনে যুক্তি দিতে পারি। কর্মমার্গ আমাদের নিয়ে যায় বিশ্বাতীতে যাঁর সত্তার সামর্থ্য নিজেকে জগতের মধ্যে ব্যক্ত করে এমন এক সঙ্কল্প রূপে যা আমাদের মধ্যে ও সকলের মধ্যে এক এবং যার সঙ্গে তাদাত্ম্যের দ্বারা আমরা ঐ তাদাত্ম্যের বিভিন্ন অবস্থার হেতু তিনি যে সকলের মধ্যে এক আত্মা এবং বিশ্বের মধ্যে বিশ্বাত্মক আত্মা ও প্রভু এইভাবে তাঁর সঙ্গে মিলনে আসি। আর মনে হতে পারে যে এ আমাদের ঐক্য-উপলব্ধির মধ্যে এক প্রকার ব্যাপকতা আনে। কিন্তু তবু এও যে সম্পূর্ণ অবশ্যম্ভাবী তা নয়। কারণ এই প্রেরণাও সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিকত্বের দিকে ঝুঁকতে পারে, আর

এমনকি যদি এর ফলে বিশ্বদেবতার ক্রিয়াসমূহে পূর্বের মতোই অংশ নেওয়া হয়, তাহলেও এই প্রেরণা তার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও নিষ্ক্রিয় হতে পারে। একমাত্র যখন আনন্দ এই সবের মধ্যে আসে, কেবল তখনই অখণ্ড মিলনের প্রেরণা সম্পূর্ণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

এই যে এত সম্পূর্ণ অবশ্যম্ভাবী আনন্দ তা হল ভগবানে আনন্দ তাঁর নিজের জন্য, আর অন্য কিছুর জন্য নয়, তিনি নিজে ছাড়া কোন কারণ বা লাভের জন্য নয়। ভগবান আমাদের দিতে পারেন এমন কিছুর জন্য অথবা তাঁর মধ্যে কোন বিশেষ গুণের জন্য যে এ ভগবানকে পেতে চায় তা নয়, এ তাঁকে পেতে চায় একমাত্র এই কারণে যে তিনি আমাদের আত্মা এবং আমাদের সমগ্র সত্তা এবং আমাদের সব কিছু। এ যে অতিস্থিতির আনন্দ আলিঙ্গন করে, তা অতিস্থিতির জন্য নয়, এই কারণে যে তিনি অতিস্থিত (বিশ্বাতীত); বিশ্বময়ের আনন্দ আলিঙ্গন করে বিশ্বভাবের জন্য নয়, তিনি বিশ্বময়, এই কারণে; জীবের আনন্দ আলিঙ্গন করে জীবের তৃপ্তির জন্য নয়, তিনিই জীব, এই কারণে। এই সকল পার্থক্য ও বাহ্যরূপের পশ্চাতে যায় এবং তাঁর সত্তায় কম বেশীর হিসেব করে না, বরং এ তাঁকে আলিঙ্গন করে যেখানেই তিনি আছেন সেখানেই এবং সেজন্য সর্বত্রই; এ তাঁকে সম্পূর্ণ আলিঙ্গন করে যেমন বেশী প্রাতিভাসিকে, তেমন কম প্রাতিভাসিকে, যেমন অসীমের প্রকাশে, তেমন আপতিক সীমায়; সর্বত্রই তাঁর একত্ব ও সম্পূর্ণতার বোধি ও অনুভূতি এর থাকে। শুধু তার পারমার্থিক সত্তার জন্য তাঁকে অন্বেষণ করার প্রকৃত অর্থ হল আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত লাভের জন্য, একান্ত শান্তি লাভের জন্য প্রয়াস করা। অবশ্য তাঁকে একান্তভাবে অধিগত করাই তাঁর সত্তায় এই আনন্দের অনিবার্য লক্ষ্য, কিন্তু তা আসে যখন আমরা তাঁকে নিজের মধ্যে পাই সম্পূর্ণভাবে এবং তিনিও আমাদের নেন তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে, আর একে কোন বিশেষ পাদে বা অবস্থায় সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়োজন নেই। তাঁকে কোন আনন্দময় স্বর্গে অন্বেষণ করার অর্থ তাঁকে তাঁর নিজের জন্য অন্বেষণ করা নয়, এর অর্থ স্বর্গের আনন্দের জন্য অন্বেষণ করা; যখন আমরা তাঁর সত্তার সকল প্রকৃত আনন্দ পাই তখন স্বর্গও আসে আমাদের মধ্যে, আর যেখানেই তিনি থাকেন ও আমরা থাকি, সেখানেই আমরা পাই তাঁর রাজ্যের হর্ষ। সুতরাং তাঁকে শুধু আমাদের মধ্যে ও আমাদের জন্য অন্বেষণ করারও অর্থ আমাদের নিজদিগকে এবং তাঁতে আমাদের হর্ষকে, উভয়কেই সীমিত করা। অখণ্ড আনন্দ তাঁকে যে শুধু আমাদের আপন ব্যষ্টি সত্তার মধ্যে আলিঙ্গন করে তা নয়, এ তাঁকে আলিঙ্গন করে সমভাবে সকল মানুষের মাঝে ও সকল প্রাণীর মধ্যে। আর যেহেতু তাঁর মধ্যেই আমরা সকলের সঙ্গে এক, সেহেতু এ তাঁকে যে পেতে চায় তা শুধু আমাদের নিজেদের জন্য নয়, এ পেতে চায় আমাদের সব মানবভাইদের জন্য। পূর্ণযোগের সাধকের পক্ষে ভক্তিমার্গের অর্থ হল ভগবানে অখণ্ড ও সম্পূর্ণ আনন্দ, — অখণ্ড কেননা এ হল শুদ্ধ ও স্বপ্রতিষ্ঠিত, এবং সম্পূর্ণ কেননা এ হল সর্বগ্রাহী ও সর্বগ্রাসী।

একবার এ আমাদের মধ্যে সক্রিয় হলে যোগের অন্যান্য মার্গগুলি যেন নিজেদের

পরিবর্তিত করে এরই বিধানে, এবং এর দ্বারাই পায় তাদের নিজেদের সবচেয়ে সমৃদ্ধ তাৎপর্য। ভগবানের প্রতি আমাদের সত্তার অখণ্ড ভক্তি জ্ঞানের বিমুখ নয়; এই পথের ভক্ত এমন ভগবৎপ্রেমী যে আবার ভগবৎ-জ্ঞানীও, কারণ তাঁর সত্তার জ্ঞানের দ্বারাই আসে তাঁর সত্তার সমগ্র আনন্দ; কিন্তু আনন্দেই জ্ঞান নিজেকে সার্থক করে, বিশ্বাতীতের জ্ঞান সার্থক হয় বিশ্বাতীতের আনন্দে, বিশ্বাত্মকের জ্ঞান বিশ্বাত্মক পরম দেবতার আনন্দে, ব্যষ্টি অভিব্যক্তির জ্ঞান ব্যষ্টির মধ্যে ভগবানের আনন্দে, নৈর্ব্যক্তিকের জ্ঞান তাঁর নৈর্ব্যক্তিক সত্তার শুদ্ধ আনন্দে, পুরুষবিধের জ্ঞান তাঁর ব্যক্তিসত্ত্বের পূর্ণ আনন্দে, তাঁর বিভিন্ন গুণ ও এদের লীলা সার্থক হয় অভিব্যক্তির আনন্দে, নির্গুণের জ্ঞান সার্থক হয় তাঁর অবর্ণ অস্তিত্ব ও অব্যক্ততার আনন্দে।

সেইরকম আবার এই ভগবৎপ্রেমী হবে ভগবৎকর্মী, কিন্তু তা শুধু কর্মের জন্য নয়, অথবা ক্রিয়ায় স্বার্থপর সুখের জন্য নয়, সে ভগবৎকর্মী হবে এইজন্য যে এই পথে ভগবান তাঁর সত্তার সামর্থ্য ব্যয় করেন আর আমরা তাঁকে দেখতে পাই তার বিভিন্ন সামর্থ্যের মধ্যে ও এদের নিদর্শনের মধ্যে; আরো এই কারণে যে কর্মের মধ্যে দিব্য সঙ্কল্প হল দেবত্বের সামর্থ্যের আনন্দে তার বহিঃপ্রবাহ, দিব্যশক্তির আনন্দে ভাগবত সত্তার নিঃসরণ। প্রেমাস্পদের সর্ব কর্মে ও ক্রিয়ায় সে অনুভব করবে পরিপূর্ণ হর্ষ, কারণ সে প্রেমাস্পদকে পায় এই সবেরও মধ্যে; সে নিজে সকল কর্মই করবে, কারণ ঐ সব কর্মেরও মাধ্যমে তার সত্তাধীশ তার মধ্যে প্রকাশ করেন তাঁর দিব্য হর্ষ; যখন সে কাজ করে তখন সে অনুভব করে যে তার প্রিয় ও আরাধ্যের সঙ্গে তার একত্ব সে প্রকাশ করছে তার ক্রিয়ায় ও কর্মে; যে সঙ্কল্প অনুযায়ী সে কর্ম করে ও যার সঙ্গে তার সত্তার সকল শক্তি আনন্দময়ভাবে এক হয় তার উল্লাসও সে অনুভব করে। সেইরকম আবার, ভগবৎপ্রেমী পূর্ণতার জন্য সচেষ্ট হবে কারণ পূর্ণতাই ভগবানের স্বভাব, আর যতই সে পূর্ণতায় উপচিত হয় ততই সে তার প্রেমাস্পদকে অনুভব করে তার প্রাকৃত সত্তায় ব্যক্ত হতে। অথবা ফুল যেমন ফুটে ওঠে সহজভাবে, সে-ও তেমন সহজভাবে বিকশিত হবে পূর্ণতায়, কারণ ভগবান তার মধ্যে আছেন ও ভগবৎ-হর্ষের মধ্যেও আছেন, আর যেমন ঐ হর্ষ প্রসারিত হয় তার মধ্যে, তেমন অন্তঃপুরুষ, মন এবং প্রাণও স্বাভাবিকভাবেই প্রসারিত হয় তাদের দেবত্বে। সেই সঙ্গে, তার অপূর্ণতার দুঃখ আর থাকবে না কারণ সে ভগবানকে অনুভব করে সকল কিছুর মধ্যে, প্রতি সসীম বাহ্যরূপের মধ্যে পূর্ণভাবে।

তাছাড়া, জীবনের মাধ্যমে ভগবৎ-অন্বেষণ ও তার সত্তা ও বিশ্ব সত্তার সকল কাজকর্মের মধ্যে তাঁর সাক্ষাৎলাভ যে তার পূজার অন্তর্গত হবে না তা-ও নয়। তার কাছে সকল প্রকৃতি ও সকল জীবন হবে একই সাথে এক প্রকাশ ও এক রমণীয় নির্দিষ্ট মিলনস্থান। তার কাছে বুদ্ধিমূলক ও সৌন্দর্যমূলক ও স্ফুরন্ত ক্রিয়াবলী, (প্রাকৃত) বিজ্ঞান ও দর্শন ও জীবন, মনন ও কলা ও ক্রিয়া গ্রহণ করবে এক দিব্যতর অনুমোদন ও মহত্তর অর্থ। এই সবের জন্য সে সচেষ্ট হবে এই কারণে যে এই সবের মধ্য দিয়ে সে পাবে ভগবানের স্পষ্ট দর্শন এবং তাদের মধ্যে ভগবৎ-আনন্দ। অবশ্য সে তাদের সব বাহ্যরূপে

আসক্ত হবে না, কারণ আসক্তি আনন্দের প্রতিবন্ধক; কিন্তু যেহেতু সে পায় ঐ শুদ্ধ, শক্তিশালী এবং অখণ্ড আনন্দ যা সকল কিছু লাভ করে কিন্তু কিছুর উপর নির্ভরশীল নয় এবং যেহেতু সে ঐ সব বাহ্যরূপে দেখতে পায় প্রেমাস্পদের বিভিন্ন কর্মপ্রণালী ও ক্রিয়া ও সঙ্কেত, সম্ভূতি ও প্রতীক ও মূর্তি, সেহেতু সেসব থেকে সে এমন এক উল্লাস পায় যা সেই সবেরই জন্য সেই সবের প্রয়াসী সাধারণ মনের পক্ষে লাভ করা বা এমনকি স্বপ্নে ভাবাও সম্ভব নয়। এই সব এবং আরো কিছু হয়ে ওঠে পূর্ণযোগের পথ ও এর সিদ্ধির অংশ।

আনন্দের সাধারণ সামর্থ্য হল প্রেম, আর প্রেমের হর্ষ যে বিশেষ ছাঁচ নেয় তা হল সৌন্দর্যের দর্শন। ভগবৎপ্রেমী বিশ্বপ্রেমী এবং সে আলিঙ্গন করে সর্বানন্দময়কে ও সর্বসুন্দরকে। বিশ্বপ্রেম তার হৃদয়কে দখল করলে নিশ্চিত বোঝা যায় যে ভগবান তাকে নিয়েছেন তাঁর মধ্যে; আর যখন সে সর্বসুন্দরের দর্শন পায় সর্বত্র আর সকল সময়ই অনুভব করতে পারে তাঁর আলিঙ্গনের আনন্দ, তখন নিশ্চিত বোঝা যায় যে সে-ও ভগবানকে পেয়েছে তার মধ্যে। মিলনই প্রেমের সিদ্ধি, কিন্তু এই দুজনে দুজনকে পাওয়াতেই পাওয়া যায় এর তীব্রতার উচ্চতম শিখর ও বৃহত্তম ব্যাপ্তি। এই হল রভসের মধ্যে একত্বের ভিত্তি।

সপ্তম অধ্যায়

আনন্দ ব্রহ্ম

পূর্ণ সমন্বয়ী যোগে ভক্তিমার্গের রূপ হবে প্রেম ও আনন্দের মাধ্যমে ভগবৎ-অন্বেষণ এবং তার সত্তার সকল ভাবেরই উপর সানন্দ অধিকার। এর পরাকাষ্ঠা পাওয়া যাবে প্রেমের অখণ্ড মিলনে ও ভগবানের সঙ্গে অন্তঃপুরুষের ঘনিষ্ঠতার সকল ভাবেরই সম্পূর্ণ উপভোগ। এ জ্ঞান থেকে শুরু করতে পারে অথবা শুরু করতে পারে কর্ম থেকে, কিন্তু তাহলে এ জ্ঞানকে পরিণত করবে প্রেমাস্পদের সত্তার সঙ্গে জ্যোতির্ময় মিলনের হর্ষে, আর কর্মকে পরিণত করবে প্রেমাস্পদের সত্তার সঙ্কল্প ও সামর্থ্যের সঙ্গে আমাদের সত্তার সক্রিয় মিলনের হর্ষে। আর না হয়, এ আরম্ভ করতে পারে প্রথমেই প্রেম ও আনন্দ থেকে; তখন এ এই অপর দুটি বিষয়কে নিজের মধ্যে নিয়ে তাদের উভয়কেই বিকশিত করবে একত্বের সম্পূর্ণ হর্ষের অঙ্গরূপে।

ভগবানের প্রতি হৃদয়ের যে আকর্ষণ তার আরম্ভ হতে পারে নৈর্ব্যক্তিক, অর্থাৎ আমাদের ভাবময় বা আমাদের সৌন্দর্যগ্রাহী সত্তার নিকট অথবা আধ্যাত্মিক সুখ গ্রহণে আমাদের ক্ষমতার কাছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজেকে প্রকট করেছে এমন বিশ্বময় বা বিশ্বাতীত কিছুতে এক নৈর্ব্যক্তিক হর্ষের স্পর্শ। যার সম্বন্ধে আমরা এইভাবে সচেতন হই তা-ই আনন্দ ব্রহ্ম, আনন্দময় অস্তিত্ব। আমরা আরাধনা করি এক নৈর্ব্যক্তিক আনন্দ ও সৌন্দর্যকে, এমন এক শুদ্ধ ও অনন্ত পূর্ণতাকে যাকে আমরা কোন নাম বা রূপ দিতে অক্ষম, আর অন্তঃপুরুষ গভীরভাবে আকৃষ্ট হয় এমন এক আদর্শ ও অনন্ত উপস্থিতি, সামর্থ্য ও অস্তিত্বের প্রতি যা জগতের মধ্যে অথবা তা ছাড়িয়ে অবস্থিত এবং যা কোন প্রকারে আমাদের কাছে মনস্তাত্ত্বিকভাবে অথবা আধ্যাত্মিকভাবে বোধগম্য হয় এবং তারপর উত্তরোত্তর অন্তরঙ্গ ও বাস্তব হয়। ওটিই আমাদের কাছে আনন্দময় অস্তিত্বের আহ্বান, স্পর্শ। তখন সর্বদাই এর উপস্থিতির হর্ষ ও সান্নিধ্য লাভ করা, এর অচঞ্চল বাস্তবতা সম্বন্ধে বুদ্ধি ও বোধিমূলক মনের তৃপ্তির জন্য এ কি তা জানা, আমাদের নিষ্ক্রিয় সত্তাকে এবং যথাসাধ্য আমাদের সক্রিয় সত্তাকেও, আমাদের আন্তর অমর সত্তাকে এবং এমনকি আমাদের বাহ্য মরসত্তাকেও এর সঙ্গে নিটোল সামঞ্জস্যে স্থাপন করা — এই সব হয়ে ওঠে আমাদের জীবনধারণের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। আর অনুভব হয় যে এর কাছে আমাদের নিজেদের উন্মীলিত করাই একমাত্র সত্যকার সুখ, এর মধ্যে বাস করাই একমাত্র প্রকৃত সিদ্ধি।

অনুপাখ্যের স্বরূপ হল এমন এক বিশ্বাতীত আনন্দ যা মনের কল্পনার ও ভাষায় প্রকাশের অতীত। সমগ্র বিশ্বের মধ্যে ও বিশ্বের অন্তর্গত সকল কিছুর মধ্যে ইনি নিগূঢ়ভাবে সমাবিষ্ট হয়ে আবৃত করে আছেন। এঁর উপস্থিতিকে বলা হয় সত্তার আনন্দের

গুহ্য আকাশ, আর এঁর সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলে যে এ না থাকলে কেউ এক মুহূর্তের জন্যও শ্বাস নিতে বা জীবনধারণ করতে পারত না। আর এই আধ্যাত্মিক আনন্দ এখানে আমাদের হৃদয়ের মধ্যেও বিদ্যমান। এ উপরভাসা মনের বিক্ষোভের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে; এই মন অস্তিত্বের হর্ষের যেসব নানাবিধ মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক রূপ পায় তা শুধু ঐ আনন্দের ক্ষীণ ও দূষিত রূপান্তর। কিন্তু যদি মন একবার এর গ্রহণে যথেষ্ট সূক্ষ্ম ও শুদ্ধ হয়ে ওঠে, আর অস্তিত্বের প্রতি আমাদের বাহ্য প্রতিক্রিয়ার স্থূলতর প্রকৃতির দ্বারা সীমাবদ্ধ না থাকে তাহলে আমরা এর এমন এক প্রতিবিম্ব নিতে সক্ষম হই যা বোধ হয় আমাদের প্রকৃতির অন্তর্গত প্রবলতম অংশেরই রঙ নেবে — হয় পুরোপুরি, না হয় অত্যন্ত বেশী পরিমাণে। এ প্রথম দেখা দিতে পারে এমন কোন বিশ্ব সৌন্দর্যের আকৃতিরূপে যা আমরা অনুভব করি প্রকৃতি ও মানব ও আমাদের চারিদিকের সকল কিছুর মধ্যে; অথবা আমরা পেতে পারি এমন কোন বিশ্বাতীত সৌন্দর্যের বোধি যার শুধু প্রতীক হল এখানকার সব আপতিক সৌন্দর্য। এইভাবে এ আসে তাদের কাছে যাদের মধ্যে সৌন্দর্যগ্রাহী সত্তা বিকশিত ও প্রবল, আর যে সব সহজাত প্রবৃত্তি প্রকাশের রূপ পেলে কবি ও শিল্পী নির্মাণ করে সেগুলি যাদের মধ্যে প্রবল। অথবা এ হতে পারে এক ভাগবত প্রেমময় পুরুষের বোধ, আর না হয় বিশ্বের মধ্যে বা পশ্চাতে বা তার অতীতে এমন এক উপকারী ও করুণাময় অনন্ত সান্নিধ্যের বোধ যা আমাদের সাড়া দেয় যখন আমরা তার দিকে ফিরি আমাদের চিৎপুরুষের প্রয়োজন নিয়ে। এইভাবে এ প্রথম আবির্ভূত হয় যখন ভাবময় সত্তা প্রখরভাবে বিকশিত থাকে। অন্যান্য প্রকারেও আমাদের কাছে এর আসা সম্ভব, তবে সর্বদাই এ আসে আনন্দ, সৌন্দর্য, প্রেম বা শান্তির এমন এক সামর্থ্য বা সান্নিধ্য রূপে যা মন স্পর্শ করে অথচ মনের মধ্যে এই সব বিষয় সাধারণতঃ যে সব রূপ নেয় তাদের অতীতে অবস্থিত।

কারণ সকল হর্ষ, সৌন্দর্য, প্রেম, শান্তি, আনন্দই আনন্দব্রহ্মের নিঃসরণ, অর্থাৎ চিৎপুরুষ, বুদ্ধি, কল্পনা, সৌন্দর্যবোধ, নৈতিক আস্পৃহা ও তৃপ্তি, ক্রিয়া, মন, শরীর, এই সকলেরই আনন্দ হল আনন্দব্রহ্মের নিঃসরণ। আর আমাদের সত্তার সকল ভাবের মধ্য দিয়েই ভগবান আমাদের স্পর্শ ক'রে সে সবকে কাজে লাগাতে পারেন চিৎপুরুষকে উদ্বুদ্ধ ও মুক্ত করার জন্য। কিন্তু আনন্দব্রহ্মের স্বরূপে উপনীত হতে হলে এর মানসিক গ্রহণ হওয়া চাই সূক্ষ্মভাবাপন্ন, আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন, বিশ্বভাবাপন্ন, এবং যা কিছু মলিন ও গণ্ডি টানে সে সব থেকে নির্মুক্ত। কারণ যখন আমরা এর অতীব সমীপস্থ হই অথবা এর মধ্যে প্রবেশ করি, তা হয় এমন এক বিশ্বাতীত ও বিশ্বব্যাপী আনন্দের প্রবুদ্ধ আধ্যাত্মিক বোধের দ্বারা যা জগতের সকল বিরোধের মধ্যে অথচ সে সবের পশ্চাতে ও উজানে অবস্থিত এবং যার সঙ্গে আমরা নিজেদের যুক্ত করতে পারি এক বর্ধিষ্ণু বিশ্বব্যাপী ও আধ্যাত্মিক অথবা এক বিশ্বাতীত রভসের মাধ্যমে।

এই যে আনন্ত্য আমরা বুঝতে পারি, তাকে প্রতিফলিত ক'রেই সাধারণতঃ মন তৃপ্ত হয়, আর না হয় তৃপ্ত হয় আমাদের ভিতরে ও বাইরে এর সম্বন্ধে এই বোধ পেয়ে যে

এ হল এমন এক অনুভূতি যা পুনঃপুনঃ এলেও তবু অসামান্য রয়ে যায়। যখন এ আসে তখন এ নিজে নিজেই এত তৃপ্তিকর ও আশ্চর্যজনক মনে হয়, আর আমাদের সাধারণ মন ও যে সক্রিয় জীবন আমাদের যাপন করতে হবে তা-ও এর সঙ্গে এত অসঙ্গতিপূর্ণ বোধ হয় যে আমরা মনে করতে পারি যে আরো কিছু আশা করার অর্থ সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া। কিন্তু যোগের আন্তর ভাবই হল অসামান্যকে সাধারণ করা এবং যা আমাদের ঊর্ধ্বে এবং আমাদের সাধারণ আত্মা অপেক্ষা মহত্তর তাকে পরিণত করা আমাদের নিজস্ব সতত চেতনায়। সুতরাং অনন্তের যে অনুভূতিই আমরা পাই তার নিকট আরো ধীর স্থির ভাবে নিজেদের উন্মীলিত করতে, একে শুদ্ধ ও তীব্র করতে, একে আরো সতত মনন ও ধ্যানের বিষয় করতে আমাদের ইতস্ততঃ করা উচিত নয়, আর ঐসব ক'রে যেতে হবে যতক্ষণ না এ হয়ে ওঠে সেই মূল সামর্থ্য যা আমাদের মধ্যে সক্রিয়, হয়ে ওঠে সেই পরমদেবতা যাকে আমরা আরাধনা ও আলিঙ্গন করি, আমাদের সমগ্র সত্তা এর সঙ্গে একসুরে বাঁধা হয় এবং একে করা হয় আমাদের সত্তার নিজস্ব আত্মা।

এর সম্বন্ধে আমাদের অনুভূতিকে শুদ্ধ করা চাই যেন এর ভিতর মানসিক মিশ্রণ কিছু না থাকে; তা না হলে এ চলে যায়, আমরা ধরে রাখতে পারি না। আর এই শুদ্ধ করার কাজের এক অংশ হল যে কোন কারণের বা মনের কোন উত্তেজক অবস্থার উপর এর নির্ভরতার যেন অবসান হয়; এর হওয়া চাই নিজেই নিজের কারণ ও স্বপ্রতিষ্ঠিত, অপর সকল আনন্দের উৎস, যা কেবল নিজের জোরেই থাকবে, আর এমন কোন জাগতিক বা অন্যপ্রকারের প্রতিমূর্তি বা প্রতীকে আসক্ত হবে না যার মধ্য দিয়ে এর সঙ্গে আমাদের প্রথম সংযোগ হয়েছিল। এর সম্বন্ধে আমাদের অনুভূতিকে সর্বদাই তীব্র ও আরো প্রগাঢ় করা কর্তব্য, নতুবা আমরা শুধু একে প্রতিফলিত করব অপূর্ণ মনের দর্পণে, আর উন্নয়ন ও রূপান্তরের সেই শিখরে উপনীত হব না যা আমাদের নিয়ে যায় মন ছাড়িয়ে অনুপাখ্য আনন্দের মধ্যে। আমাদের সতত মনন ও ধ্যানের বিষয় হয়ে এ যা সব আছে সে সবকে পরিণত করবে নিজেতে, নিজেকে প্রকট করবে বিশ্বাত্মক আনন্দ ব্রহ্মরূপে এবং সকল অস্তিত্বকে করবে এর বহির্বর্ষণ। যদি আমরা এর শরণ নিই আমাদের সকল আন্তর ক্রিয়া ও বাহ্য ক্রিয়ার অন্তঃপ্রেরণার জন্য, তাহলে এ হয়ে উঠবে ভগবানের সেই হর্ষ যা নিজেকে আমাদের মধ্য দিয়ে ঢেলে দেয় জীবন ও সজীব সকল কিছুর উপর আলোক ও প্রেম ও সামর্থ্যের ধারায়। যখন আমরা একে চাই অন্তঃপুরুষের আরাধনা ও প্রেমের দ্বারা এ নিজেকে প্রকট করে পরম দেবতা রূপে, তার মধ্যে আমরা দেখি ভগবানের মুখমণ্ডল এবং উপলব্ধি করি আমাদের প্রেমিকের আনন্দ। এর সঙ্গে আমাদের সমগ্র সত্তাকে এক সুরে বেঁধে আমরা বিকশিত হই এর সাদৃশ্যের সুখময় পূর্ণতায়, দিব্য প্রকৃতির এক মানবীয় প্রতিরূপে। আর যখন এ সকল প্রকারে হয়ে ওঠে আমাদের আত্মার আত্মা, আমরা সত্তায় সার্থকতা পেয়ে সমৃদ্ধিসম্পন্ন হই।

ব্রহ্ম সর্বদাই নিজেকে প্রকট করেন তিন প্রকারে — আমাদের নিজেদের ভিতরে, আমাদের লোকের ঊর্ধ্বে, আমাদের চারিদিকে বিশ্বের মধ্যে। আমাদের মধ্যে পুরুষের, আন্তর অন্তঃপুরুষের দুইটি কেন্দ্র আছে যার মধ্য দিয়ে স্পর্শ ক'রে তিনি আমাদের

জাগিয়ে তোলেন; এক পুরুষ আছে আমাদের হৃৎকমলে যা আমাদের সকল সামর্থ্য উন্মীলিত করে ঊর্ধ্বপানে, অন্য পুরুষ আছে সহস্রদল কমলে যেখান থেকে দর্শনের বিদ্যুৎরশ্মি ও দিব্যশক্তির বহ্নি নেমে আসে মনন ও সংস্কারের মধ্য দিয়ে আর আমাদের মধ্যে খুলে দেয় তৃতীয় নেত্র। আনন্দ অস্তিত্ব আমাদের কাছে আসতে পারে এই দুটি কেন্দ্রের যে কোনটির মধ্য দিয়ে। যখন হৃদয়-কমল প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে তখন আমরা অনুভব করি যে আলোর ফুলের মতো এক দিব্য হর্ষ, প্রেম ও শান্তি আমাদের মধ্যে প্রসারিত হয়ে দীপ্ত করে সমগ্র সত্তাকে। তখন তারা নিজেদের যুক্ত করতে পারে তাদের গূঢ় উৎস, আমাদের হৃদিস্থিত ভগবানের সঙ্গে, এবং তাঁর আরাধনা করতে পারে যেন মন্দিরের ভিতরে; মনন ও সঙ্কল্পকে অধিগত করার জন্য তারা ঊর্ধ্বপানে প্রবাহিত হতে পারে এবং বার হয়ে উপরে যেতে পারে বিশ্বাতীতের দিকে; মনন, অনুভব ও ক্রিয়ার মধ্যে তারা স্রোতের মতো বাইরে আসতে পারে আমাদের চারিদিককার সকল কিছুর মধ্যে। কিন্তু যতদিন আমাদের সাধারণ সত্তা কোন বাধা দেয় অথবা এই দিব্য প্রভাবের প্রত্যুত্তরে বা এই দিব্য অধিকারের যন্ত্রে পুরোপুরি না পরিবর্তিত হয় ততদিন এই অনুভূতি অবিশ্রান্তভাবে না এসে মাঝে মাঝে আসবে এবং আমরা সর্বদাই ফিরে আসতে পারি আমাদের পুরনো মর্ত্য হৃদয়ের মধ্যে; কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা অথবা ভগবানের প্রতি আমাদের তৃষ্ণা ও অনুরাগের বলে, এ উত্তরোত্তর পরিবর্তিত হবে যতদিন না এই অসামান্য অনুভূতি হয়ে ওঠে আমাদের স্বাভাবিক চেতনা।

যখন উপরের পদ্ম ফুটে ওঠে, তখন সকল মন ভরে যায় দিব্য আলোক, হর্ষ ও সামর্থ্যে, যার পিছনে থাকেন ভগবান, আমাদের সত্তার অধীশ্বর তাঁর রাজাসনের উপরে, আর আমাদের অন্তঃপুরুষ থাকে তাঁর পাশে অথবা ভিতর দিকে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর রশ্মিজালের মধ্যে; তখন সকল মনন ও সঙ্কল্প হয়ে ওঠে এক উজ্জ্বলতা, সামর্থ্য ও রভস; বিশ্বাতীতের সঙ্গে যোগ রেখে, এ নেমে আসতে পারে শ্রাবণের ধারার মতো আমাদের সব মর্ত্য অঙ্গের দিকে এবং তাদের দ্বারা প্রবাহিত হতে পারে বাইরে জগতের উপরে। যেমন বৈদিক রহস্যবাদীরা জানতেন, এই ঊষাতেও আমাদের জন্য আছে এর দিবারাত্রির পালাবদল, আলো থেকে আমাদের নির্বাসন; কিন্তু এই নতুন অস্তিত্ব ধারণের সামর্থ্য আমাদের যত বৃদ্ধি পায়, ততই আমরা সমর্থ হই এই জ্যোতির আকর সূর্যের দিকে দীর্ঘসময় তাকাতে আর আমাদের আন্তর সত্তায় আমরা হয়ে উঠতে পারি এর সঙ্গে এক দেহ। এই পরিবর্তন কত দ্রুত আসবে তা কখন কখন নির্ভর করে এইভাবে প্রকাশিত ভগবানের জন্য আমাদের ব্যাকুলতার বেগের উপর এবং আমাদের সাধনশক্তির তীব্রতার উপর; কিন্তু অন্য সময় এ বরং অগ্রসর হয় তাঁর সর্বজ্ঞ কর্মধারার ছন্দের নিকট নিষ্ক্রিয় আত্মসমর্পণের দ্বারা, আর এই কর্ম সর্বদাই চলে তার নিজের পদ্ধতিতে যা প্রথমে অজ্ঞেয় থাকে। তবে এই শেষোক্তটি ভিত্তি হয় যখন আমাদের প্রেম ও বিশ্বাস সম্পূর্ণ হয় আর আমাদের সমগ্র সত্তা এমন এক সামর্থ্যের আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে থাকে যা প্রেম ও জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা।

আমাদের চারিদিকে জগতের মধ্যে ভগবান নিজেকে প্রকট করেন যখন আমরা এর

দিকে তাকাই আনন্দের এমন এক আধ্যাত্মিক কামনা নিয়ে যা তাঁকে পেতে চায় সকল বিষয়ের মধ্যে। প্রায়শঃই রূপের আবরণ হঠাৎ একটু খুলে যায় আর এইভাবে আবরণটি নিজেই পরিণত হয় স্বরূপ প্রকাশে। এক বিশ্বব্যাপী আধ্যাত্মিক উপস্থিতি, এক বিশ্বব্যাপী শান্তি, এক বিশ্বব্যাপী অনন্ত আনন্দ ব্যক্ত হয়েছে, এ হল সর্বগত, সর্বগ্রাহী, সর্বভেদী। এই উপস্থিতির প্রতি আমাদের প্রেম, এতে আমাদের আনন্দ, এর সম্বন্ধে আমাদের সতত মনন — এসবের দ্বারা এ ফিরে আসে ও আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে; এ সেই বিষয়টি হয়ে ওঠে যা আমরা দেখি আর বাকী সব শুধু এর আবাস, রূপ ও প্রতীক। এমনকি যা সব অত্যন্ত বাহ্য, দেহ, রূপ, শব্দ, যা কিছু আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর সে সবকেই আমরা দেখি এই উপস্থিতি হিসেবে; এরা আর ভৌতিক থাকে না, এরা পরিণত হয় চিৎপুরুষের ধাতুতে। এই রূপান্তরের অর্থ আমাদের নিজেদেরই আন্তর চেতনার রূপান্তর। চারিদিক-ঘিরে-থাকা এই উপস্থিতি আমাদের নেয় নিজের মধ্যে আর আমরা হয়ে উঠি এর অংশ। আমাদের আপন মন, প্রাণ, দেহ আমাদের কাছে হয়ে ওঠে শুধু এর আবাস ও মন্দির, এর কর্মধারার এক রূপ, ও এর আত্মপ্রকাশের এক যন্ত্র। সব কিছুই এই আনন্দের শুধু অন্তরাত্মা ও দেহ।

এই সেই ভগবান যাকে দেখা যায় আমাদের চারিদিকে ও আমাদের নিজস্ব ভৌতিক লোকের উপর। কিন্তু উর্ধ্বেও তিনি নিজেকে প্রকট করতে সক্ষম। আমরা দেখি বা অনুভব করি যে তিনি যেন এক সমুন্নীত সান্নিধ্য, আনন্দের এক মহান্ অনন্ত অথবা এর মধ্যে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা — আর আমরা তাঁকে আমাদের মধ্যে বা চারিদিকে দেখি না। যতদিন এই দর্শন আমাদের থাকে, ততদিন আমাদের মর্ত্যতা সংযত থাকে ঐ অমরতার দ্বারা; এ আলোক, সামর্থ্য ও হর্ষ অনুভব করে ও এতে সাড়া দেয় তার গ্রহণসামর্থ্য অনুযায়ী; অথবা এ চিৎপুরুষের অবতরণ অনুভব করে এবং তারপর কিছু সময়ের জন্য রূপান্তরিত হয়, আর নয় উন্নীত হয় আলোক ও সামর্থ্যের প্রতিফলনের কিছু প্রভার মধ্যে; এ হয়ে ওঠে আনন্দের আধার। কিন্তু অন্য সময় এ ফিরে পড়ে পুরনো মর্ত্যতার মধ্যে আর নিস্তেজ বা তুচ্ছভাবে অবস্থান বা কাজ করে তার সব পার্থিব অভ্যাসের মধ্যে আটক থেকে। সম্পূর্ণ মোক্ষ আসে মানুষী মন ও দেহের মধ্যে দিব্য সামর্থ্যের অবতরণের দ্বারা এবং দিব্য প্রতিমূর্তিতে তাদের আন্তর জীবনের পুনর্গঠনের দ্বারা — একেই বৈদিক ঋষিরা বলতেন যজ্ঞের দ্বারা পুত্রের জন্ম। বস্তুতঃ নিরন্তর যজ্ঞ বা নিবেদনের দ্বারাই — এই যজ্ঞ আরাধনা ও আস্পৃহার যজ্ঞ, কর্মের যজ্ঞ, মনন ও জ্ঞানের যজ্ঞ, ভগবৎ-অভিমুখী সঙ্কল্পের উর্ধ্বগামী অগ্নির যজ্ঞ — এই যজ্ঞের দ্বারাই আমরা নিজেদের গঠন করি এই অনন্তের সত্তায়।

যখন আমরা আনন্দব্রহ্মের এই চেতনাকে দৃঢ়ভাবে অধিগত করি এর সকল তিন অভিব্যক্তির মধ্যে — উর্ধ্বে, অন্তরে ও চারিদিকে, তখন আমরা পাই এর পূর্ণ একত্ব এবং আলিঙ্গন করি সর্বভূতকে এর আনন্দ, শান্তি, হর্ষ ও প্রেমের মধ্যে; তখন সকল বিভিন্ন জগৎ হয়ে ওঠে এই আত্মার দেহ। কিন্তু এই আনন্দের সমৃদ্ধতম জ্ঞান আমরা পাই

না যদি এ শুধু হয় আমাদের অনুভব-করা এক নৈর্ব্যক্তিক উপস্থিতি, বিশালতা বা অন্তর্নির্বিষ্টতা, যদি আমাদের আরাধনা তত বেশী অন্তরঙ্গ না হয় যত অন্তরঙ্গ হলে এই সত্তা এর সুবিস্তৃত হর্ষের মধ্য থেকে আমাদের কাছে প্রকট করে এর মুখমণ্ডল ও দেহ এবং আমাদের অনুভব করায় বন্ধু ও সখার করস্পর্শ। এর নৈর্ব্যক্তিকত্ব হল ব্রহ্মের আনন্দময় মহত্ত্ব কিন্তু তা থেকে আমাদের উপর দৃষ্টিপাত করতে পারে ভাগবত ব্যক্তিসত্ত্বের মাধুর্য ও ঘনিষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ। কারণ আনন্দ হল আমাদের সত্তার আত্মা ও অধীশ্বরের সান্নিধ্য, আর এর বহিঃপ্রবাহের স্রোত হতে পারে তাঁর লীলার বিশুদ্ধ হর্ষ।

অষ্টম অধ্যায়

প্রেমের রহস্য

প্রচলিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী, নৈর্ব্যক্তিকত্বের আরাধনা ঠিক ভক্তিযোগ হবে না; কারণ যোগের সব প্রচলিত রূপে মনে করা হয় যে নৈর্ব্যক্তিককে চাওয়া যায় শুধু এক সম্পূর্ণ ঐক্যের জন্য যার মধ্যে ভগবান ও আমাদের নিজেদের ব্যক্তি অন্তর্ধান করে, আর আরাধনা করতে বা আরাধনা পেতে কেউ থাকে না; থাকে শুধু একত্ব ও আনন্ত্যের অনুভূতির আনন্দ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক চেতনার অলৌকিক ব্যাপারকে অত কঠোর তর্কশাস্ত্রের বাঁধনে বাঁধা যায় না। যখন আমরা প্রথম অনন্তের সান্নিধ্য অনুভব করি, আমাদের অন্তঃস্থ সান্ত ব্যক্তিসত্ত্বই এর স্পর্শ পায় এবং সেজন্য এই ঐ স্পর্শ ও আহ্বানে সাড়া দিতে পারে একপ্রকার আরাধনার ভাবের সঙ্গে। দ্বিতীয়তঃ আমরা অনন্তকে মনে করতে পারি যে এ ততটা একত্ব ও আনন্দের এক আধ্যাত্মিক পাদ নয়, অথবা তা-ও যে শুধু সত্তা বিষয়ক এর ছাঁচ ও মাধ্যম তা নয়, বরং এ আমাদের চেতনার কাছে অনুপাখ্য পরমদেবতার সান্নিধ্য; এবং তখনও প্রেম ও আরাধনার স্থান থাকে। আর এমনকি যখন আমাদের ব্যক্তিসত্ত্ব এর সঙ্গে ঐক্যে লোপ পায় ব'লে মনে হয় তখনো এ হতে পারে — আর বস্তুতঃ এটাই সত্য, যে ব্যষ্টি ভগবানই বিশ্বাত্মক ও পরতমের মধ্যে বিগলিত হয়ে মিশছে এমন এক মিলনের দ্বারা যার মধ্যে প্রেম ও প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ বিস্মৃত হয় রভসের মিশিয়ে-দেওয়া অনুভূতির মধ্যে, কিন্তু তবু একত্বের মধ্যে সুপ্ত থাকে এবং তার মধ্যে অবচেতনভাবে টিকে থাকে। প্রেমের দ্বারা আত্মার সকল মিলন এই প্রকারেরই হতে বাধ্য। এমনকি আমরা এক অর্থে বলতে পারি যে ব্যষ্টিপুরুষ ও ভগবানের মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের সকল বিচিত্র অনুভূতির অন্তিম শিখররূপ মিলনের এই হর্ষ পাবার জন্যই এক বহু হয়েছেন এই বিশ্বের মধ্যে।

তবু শুধু নৈর্ব্যক্তিক অনন্তের জন্য সাধনার দ্বারাই ভাগবত প্রেমের আরো বিচিত্র ও অতীব অন্তরঙ্গ অনুভূতি লাভ হয় না; এর জন্য আমাদের আরাধ্য পরমদেবতা হওয়া চাই সমীপস্থ ও পুরুষবিধ। যখন আমরা নৈর্ব্যক্তিকের হৃদয়ে প্রবেশ করি তখন এর পক্ষে ব্যক্তিসত্ত্বের সকল সমৃদ্ধি নিজের ভিতরে প্রকাশ করা সম্ভব, আর যে শুধু চেয়েছে একমাত্র অনন্ত উপস্থিতির মধ্যে প্রবেশ করতে অথবা তাকে আলিঙ্গন করতে সে এর মধ্যে এমন সব বিষয় আবিষ্কার করতে পারে যার কথা সে স্বপ্নেও ভাবেনি; ভগবানের সত্তার মধ্যে এমন সব বিষয় আছে যা আমাদের পক্ষে অভাবনীয়, গণ্ডি-দেওয়া বুদ্ধির সব ভাবনা বিপর্যস্ত করে। কিন্তু সাধারণতঃ ভক্তিমার্গ শুরু করে অন্য প্রান্ত থেকে; দিব্য ব্যক্তিসত্ত্বের আরাধনা থেকে আরম্ভ ক'রে এ ঊর্ধ্বে ওঠে ও তার ফলে প্রসারিত হয় ঐ আরাধনার দ্বারা। ভগবান পুরুষ, তিনি কোন আচ্ছিন্ন অস্তিত্ব নন অথবা শুদ্ধ কালাতীত আনন্ত্যের কোন পাদ নন; আদি ও বিশ্ব অস্তিত্ব তিনি, এই অস্তিত্ব সত্তার চেতনা ও

আনন্দ থেকে অচ্ছেদ্য, আর যে অস্তিত্ব তার আপন সত্তা ও আপন আনন্দ সম্বন্ধে সচেতন তাকেই আমরা বলতে পারি দিব্য অনন্ত ব্যক্তি — পুরুষ। তাছাড়া, সকল চেতনার অর্থ সামর্থ্য, শক্তি; যেখানে সত্তার অনন্ত চেতনা আছে, সেখানে সত্তার অনন্ত শক্তিও আছে, আর ঐ শক্তিবলেই বিশ্বে সকল কিছুর অস্তিত্ব। এই পুরুষের দ্বারাই সকল সত্তা থাকে; সকল বিষয় ভগবানেরই বিভিন্ন মুখমণ্ডল; সকল মনন ও ক্রিয়া ও বেদনা ও প্রেম উৎপন্ন হয় তাঁর থেকেই এবং ফিরেও যায় তাঁর কাছে, তিনিই আমাদের সকল ফলের উৎস ও আশ্রয় ও গূঢ় লক্ষ্য। পূর্ণ যোগের ভক্তি উজাড় ক'রে ঢালা হবে, উন্নীত হবে এই পরম দেবতাতেই, এই পুরুষেই। বিশ্বাতীতভাবে এ তাঁকে পেতে চাইবে একান্ত মিলনের রভসের মধ্যে; বিশ্বময়ভাবে এ তাঁকে পেতে চাইবে বিশ্বজনীন আনন্দ ও প্রেমের সঙ্গে অনন্ত গুণে ও প্রতি বিভাবে ও সকল সত্তার মধ্যে; ব্যষ্টিভাবে এ তাঁর সঙ্গে সেই সকল মানুষী সম্বন্ধ স্থাপিত করবে যা মানুষে মানুষে সৃষ্ট হয় প্রেমের দ্বারা।

হৃদয় যাকে পেতে চাইছে, তার পূর্ণ অখণ্ডতাকে গোড়া থেকেই সম্পূর্ণভাবে ধরা সম্ভব না হতে পারে; বস্তুতঃ এ সম্ভব হয় একমাত্র যদি আমাদের পূর্বতন জীবনধারণের প্রণালীর দ্বারা বুদ্ধি, মানসিক প্রকৃতি, ভাবময় মন পূর্বেই বিকশিত হয়েছে বৃহত্ত্বে ও সূক্ষ্মতায়। ধীশক্তির, সৌন্দর্যগ্রাহী ও ভাবময় মনের এবং আমাদের সঙ্কল্প ও সক্রিয় অভিজ্ঞতার অংশগুলিরও প্রসারশীল উৎকর্ষের দ্বারা এর দিকে যাওয়াই সাধারণ জীবনের অভিজ্ঞতার অর্থ। এ সাধারণ সত্তাকে প্রসারিত ও মার্জিত করে যাতে এ সহজেই উন্মীলিত হতে পারে সেই পরম "তৎ"-এর সকল সত্যের দিকে যা এদের প্রস্তুত করছিল তার আত্ম-অভিব্যক্তির দেবালয়ের জন্য। সাধারণতঃ মানব তার সত্তার এই সকল অংশেই সীমিত, আর প্রথমে সে দিব্য সত্যের শুধু ততখানিই ধরতে পারে যা তার নিজের প্রকৃতির ও এর অতীত বিকাশ ও অনুষঙ্গের অনেকটা অনুরূপ। সেজন্য ভগবান প্রথমে আমাদের দেখা দেন তার দিব্যগুণাবলী ও প্রকৃতির বিভিন্ন সীমিত সদর্থক বিভাবে; সাধকের কাছে তিনি উপস্থিত হন সে যেসব বিষয় বুঝতে এবং যাতে তার সঙ্কল্প ও হৃদয় সাড়া দিতে অক্ষম সে সবের অনপেক্ষ তত্ত্ব হিসেবে; তিনি প্রকাশ করেন তাঁর দেবত্বের কোন নাম ও দিক। একেই যোগে বলা হয় ইষ্টদেবতা, অর্থাৎ সেই নাম ও রূপ যা আমাদের প্রকৃতি নির্বাচন করে একে পূজা করার জন্য। যাতে মানুষ এই দেবত্বকে আলিঙ্গন করতে পারে তার প্রতি অংশ দিয়ে, একে এমন এক রূপে প্রকাশিত করা হয় যা এর বিভিন্ন দিক ও গুণের অনুরূপ এবং উপাসকের কাছে হয়ে ওঠে ভগবানের জীবন্ত বিগ্রহ। এই সব হল বিষ্ণু, শিব, কৃষ্ণ, কালী, দুর্গা, খৃষ্ট, বুদ্ধের রূপ যা মানবমন ধরে আরাধনার জন্য। এমনকি যে একেশ্বরবাদী নিরাকার পরমদেবতার উপাসনা করে সে-ও তাঁকে দেয় গুণের এমন কোন রূপ, কোন মানসিক রূপ অথবা প্রকৃতির রূপ যা দিয়ে সে তাঁর ধারণা করে ও তাঁর দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু ভগবানের কোন জীবন্ত রূপ, যেন কোন মানসিক দেহ দেখতে পেলে তাঁর দিকে অগ্রসর হওয়া আরো বেশী ঘনিষ্ঠ ও মধুর হয়।

পূর্ণ ভক্তিযোগের পথ হবে ভগবান সম্বন্ধে এই ভাবনাকে বিশ্বভাবাপন্ন করা, তাঁকে

অন্তরঙ্গভাবে ব্যক্তিভাবাপন্ন করা এক বহুল ও সর্বগ্রাহী সম্বন্ধের দ্বারা, সমগ্র সত্তার কাছে তাঁকে নিরন্তর উপস্থিত করা, তাঁর কাছে সম্পূর্ণ সত্তাকে উৎসর্গ করা, নিঃশেষ করা, সমর্পণ করা যাতে তিনি অধিষ্ঠিত হন আমাদের নিকটে ও ভিতরে, আর আমরা বাস করি তাঁর সঙ্গে ও তাঁর ভিতরে। মনন ও দর্শন অর্থাৎ সর্ব বিষয়ে নিরন্তর তাঁকে চিন্তা করা ও সর্বদা ও সর্বত্র তাঁকে দেখা — ভক্তিমার্গের পক্ষে অত্যাবশ্যক। যখন আমরা স্থূল প্রকৃতির বিষয় সমূহের উপর দৃষ্টিপাত করি, তখন তাদের মধ্যে আমাদের দেখা চাই আমাদের দিব্য প্রেমাস্পদকে; যখন আমরা তাকাই মানুষ ও প্রাণীর দিকে, তখন তাঁকেই আমাদের দেখা চাই সে সবের মধ্যে, আর এদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধে আমাদের দেখা চাই যে আমরা তাঁরই বিভিন্ন রূপের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করছি; যখন আমরা আমাদের এই জড় জগতের সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে অন্য সব লোকের সত্তাদের জানি অথবা তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করি, তখনো সেই একই মনন ও দর্শনকে বাস্তব করতে হবে আমাদের মনের কাছে। আমাদের মনের যে সাধারণ অভ্যাস হল শুধু জড়ীয় ও আপতিক রূপের দিকে ও সাধারণ খণ্ডিত সম্বন্ধের দিকে উন্মুক্ত থাকা এবং অন্তঃস্থ গূঢ় পরম দেবতাকে উপেক্ষা করা তাকে দূর করতে হবে এই গভীরতর ও বিপুলতর অবধারণার ও এই মহত্তর সম্বন্ধের প্রতি সর্বগ্রাহী প্রেম ও আনন্দের অবিরাম অভ্যাসের দ্বারা। সকল দেবতার মধ্যে আমাদের দেখা চাই এই একমাত্র ভগবানকে যাঁকে আমরা পূজা করি আমাদের হৃদয় ও আমাদের সকল সত্তা দিয়ে; তাঁরই দিব্যত্বের বিভিন্ন রূপ তারা। এইভাবে আমাদের আধ্যাত্মিক আলিঙ্গন বিস্তারিত ক'রে আমরা এমন এক স্থানে আসি যেখানে সবই তিনি এবং এই চেতনার আনন্দ আমাদের কাছে হয়ে ওঠে আমাদের জগৎ দেখার স্বাভাবিক অবিচ্ছিন্ন ধারা। এতেই আমরা পাই তাঁর সঙ্গে আমাদের মিলনের বাহ্য বা পরাক্‌বৃত্ত বিশ্বভাব।

আন্তরভাবে, প্রেমাস্পদের মূর্তিকে দৃষ্টিগোচর হতে হবে আন্তর নেত্রের কাছে, তিনি আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত আছেন যেন নিজের নিকেতনে, তাঁর উপস্থিতির মাধুর্য দিয়ে ভরিয়ে দিচ্ছেন আমাদের হৃদয়, আমাদের সত্তার শিখর থেকে সখা, প্রভু ও প্রেমিকরূপে নিয়ন্ত্রণ করছেন আমাদের মন ও প্রাণের সকল ক্রিয়াবলী, উপর থেকে তাঁর সঙ্গে আমাদের মিলিত করছেন বিশ্বের মধ্যে। যে হর্ষকে নিবিড় ও স্থায়ী ও অব্যর্থ করতে হবে তা হল নিরন্তর অন্তর্মিলন। আমাদের সাধারণ নিবিষ্টতা থেকে সরে এসে সম্পূর্ণভাবে নিজের মধ্যে অবস্থান করে এক অসামান্য সামীপ্য ও আরাধনার মধ্যে এই মিলনকে যে সীমাবদ্ধ করব, তা নয়, অথবা আমাদের সব মানুষী কাজকর্ম ত্যাগ করে যে একে পেতে চাইব, তা-ও নয়। আমাদের সকল মনন, সংবেগ, বেদনা, ক্রিয়া উপস্থাপিত করতে হবে তাঁরই কাছে তাঁর সম্মতি বা অসম্মতির জন্য, অথবা যদি আমরা তখনো অতদূর না যেতে পারি, সে সব নিবেদন করতে হবে আমাদের আস্পৃহার যজ্ঞে যাতে তিনি ক্রমশঃ বেশী করে আমাদের মধ্যে অবতরণ ক'রে সে সকলের মধ্যে উপস্থিত হতে পারেন আর তাদের পরিব্যাপ্ত করতে পারেন তাঁর সকল সামর্থ্য ও সঙ্কল্প দিয়ে, তাঁর আলো ও জ্ঞান,

প্রেম ও আনন্দ দিয়ে। পরিশেষে আমাদের সকল মনন, বেদনা, সংবেগ, ক্রিয়া শুরু করবে তাঁর কাছ থেকেই উদ্ভূত হয়ে পরিবর্তিত হতে নিজেদের কোন দিব্য বীজ ও রূপে; আমাদের সমগ্র আন্তর জীবনযাত্রায় আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে আমরা এই চেতনায় বিকশিত হব যে আমরা তাঁর সত্তার এক অংশ, যতক্ষণ না আমাদের আরাধ্য ভগবানের অস্তিত্বের ও আমাদের নিজেদের জীবনের মধ্যে আর কোন বিভাজন না থাকে। সেইরূপ সকল ঘটনার মধ্যেও আমাদের ক্রমশঃ দেখতে হবে যে আমাদের সঙ্গে দিব্য প্রেমিকের আচরণ এইসব এবং সে সবে এমন সুখ পেতে হবে যে শোক ও কষ্টভোগ ও শারীরিক যন্ত্রণাও হয়ে ওঠে তাঁর দান এবং আনন্দে পরিবর্তিত হয়, আর ভাগবত সংস্পর্শের বোধের দ্বারা বিনষ্ট হয়ে অবশেষে অন্তর্হিত হয় আনন্দের মধ্যে কারণ তাঁর করস্পর্শ হচ্ছে এক অলৌকিক রূপান্তরের রসায়নবিদ্। কেউ কেউ জীবন বর্জন করে এই কারণে যে এ হল শোক দুঃখের দ্বারা কলুষিত, কিন্তু ভগবৎপ্রেমীর কাছে শোক দুঃখ হয়ে ওঠে তাঁর দেখা পাবার সাধন, তাঁর পেষণ-ক্রিয়ার চিহ্ন হিসেবে এবং যখনই তাঁর প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের মিলন এত সম্পূর্ণ হয় যে বিশ্বময় আনন্দের এই সব মুখোশ আর একে গোপন রাখতে পারে না, তখনই সে সবের অবসান হয় চিরদিনের জন্য। তারা পরিবর্তিত হয় আনন্দে।

যে সকল সম্পর্কের দ্বারা এই মিলন আসে সে সব এই পথে হয়ে ওঠে তীব্রভাবে ও আনন্দময়ভাবে ব্যক্তিগত। যে সম্পর্ক পরিশেষে সকল সম্পর্ককে ধারণ করে, গ্রহণ করে অথবা এক করে তা হল প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের সম্পর্ক, কারণ সকল সম্পর্কের মধ্যে এই হল সর্বাপেক্ষা প্রগাঢ় ও আনন্দময়, এই বাকী সবকে নিয়ে যায় তার সব শিখরে অথচ এসবকে ছাড়িয়েও যায়। তিনি গুরু ও দিশারী এবং আমাদের নিয়ে যান জ্ঞানের মাঝে; বিকাশমান আন্তর আলোক ও দর্শনের প্রতি পদক্ষেপে আমরা অনুভব করি তাঁর স্পর্শ যা আমাদের মনের মাটির রূপদাতা শিল্পীর স্পর্শের মতো, অনুভব করি তাঁরই স্বর যা প্রকাশ করে সত্য ও এর পদ, অনুভব করি সেই মনন যা তিনি আমাদের দেন ও যাতে আমরা সাড়া দিই, অনুভব করি তাঁর বিজলী-বর্শার ঝলক যা দূর করে আমাদের অবিদ্যার অন্ধকার। বিশেষতঃ যে পরিমাণে মনের আংশিক আলোগুলি রূপান্তরিত হয়ে ওঠে বিজ্ঞানের আলোতে — কম বা বেশী যে পরিমাণেই তা হ'ক না কেন — আমরা অনুভব করি এ যেন আমাদের মানসিকতার রূপান্তর তাঁর মানসিকতায়, আর উত্তরোত্তর তিনিই আমাদের মধ্যে হয়ে ওঠেন চিন্তক ও দ্রষ্টা। আমরা আর নিজেদের জন্য চিন্তা করি না বা দেখি না, বরং শুধু তা-ই চিন্তা করি যা তিনি চিন্তা করতে সঙ্কল্প করেন আমাদের জন্য, আমরা শুধু তা-ই দেখি যা তিনি দেখেন আমাদের জন্য। আর তখন গুরু সার্থক হন প্রেমিকের মধ্যে; আমাদের সকল মনোময় সত্তাকে তিনি করায়ত্ত করেন একে আলিঙ্গন ও অধিগত করার জন্য, একে উপভোগ ও ব্যবহার করার জন্য।

তিনি অধীশ্বর; কিন্তু যাবার এই পথে সকল দূরত্ব ও পার্থক্য, সকল সম্ভ্রমমিশ্রিত ভয় ও ত্রাস ও নিছক আজ্ঞানুবর্তিতা তিরোহিত হয়, কারণ আমরা তাঁর সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ

ও মিলিত হই যে এই সব বিষয় আর থাকতে পারে না, আর আমাদের সত্তার প্রেমিকই একে তুলে নিয়ে দখল করে ও ইচ্ছামতো ব্যবহার ও কাজ করে। আজ্ঞানুবর্তিতা সেবকের লক্ষণ, কিন্তু এই সম্বন্ধের নিম্নতম পর্যায় ওটি, "দাস্য"। পরে আমরা আজ্ঞা পালন করি না, আমরা তাঁর সঙ্কল্পমতো চলি যেমন বাজনার তার সাড়া দেয় বাদকের অঙ্গুলি চালনায়। যন্ত্র হওয়ার অর্থ এই আত্মসমর্পণ ও প্রপত্তির উচ্চতর পর্যায়। কিন্তু এ হল জীবন্ত ও প্রেমপূর্ণ যন্ত্র এবং এর শেষ অবস্থায় আমাদের সত্তার সমগ্র প্রকৃতি হয়ে ওঠে ভগবানের দাস, ভগবান যে একে অধিকার করেছেন এবং এ যে সানন্দে ভগবানের আয়ত্ত ও কর্তৃত্বের অধীন হয়েছে, তাতেই এ উৎফুল্ল। তিনি একে যা করতে বলেন এ সে সবই করে বিনা দ্বিরুক্তিতে ও প্রগাঢ় আনন্দের সঙ্গে, তিনি একে যা বহন করতে বলেন এ সে সবই বহন করে সাগ্রহে ও সানন্দে, কারণ যা সে বহন করে তা প্রেমাস্পদেরই ভার।

তিনি সখা, দুঃখে ও বিপদে তিনি মন্ত্রণাদাতা, সাহায্যদাতা, পরিত্রাতা, শত্রু থেকে আমাদের রক্ষা করেন, যোদ্ধারূপে আমাদের জন্য সংগ্রাম করেন অথবা তাঁরই আড়ালে আমরা যুদ্ধ করি, তিনি সারথি, আমাদের পথের দিশারী। আর এই সম্বন্ধের মধ্যে আমরা অবিলম্বে পাই এক আরো নিবিড় অন্তরঙ্গতা; তিনি সহচর ও নিত্য সঙ্গী, জীবন-খেলার সাথী। কিন্তু তবু একটা ভেদ থাকে, তা সে যতই মধুর হ'ক, বন্ধুত্ব বড় বেশী ব্যাহত হয় উপকারিতার আগমনে। প্রেমিক আঘাত দিতে পারে, ত্যাগ করতে পারে, ক্রুদ্ধ হতে পারে, মনে হয় প্রবঞ্চনা করে, তবু প্রেম থেকেই যায়, আর এমনকি এই সব বিরুদ্ধতার জন্য বৃদ্ধি পায়; এই সবের জন্য পুনর্মিলনের হর্ষ এবং পাবার হর্ষ বৃদ্ধি পায়; প্রেমিক এই সবের মধ্যেও বন্ধুই থাকেন, আর শেষে আমরা দেখি যে যা সব তিনি করেন সে সব করা হয়েছে আমাদের সত্তার প্রেমিক ও সাহায্যদাতার দ্বারা আমাদের অন্তঃপুরুষের পূর্ণতার জন্য, আমাদের মধ্যে তাঁর হর্ষেরও জন্য। এইসব বিপরীত ভাবের জন্য অন্তরঙ্গতা আরো ঘনিষ্ঠ হয়। আবার তিনি আমাদের সত্তার পিতা ও মাতা, এর উৎস ও রক্ষক, একে সস্নেহে পালন করেন ও আমাদের কামনা পূরণ করেন। তিনি আমাদের কামনাজাত সন্তান যাকে আমরা লালন পালন করি। এই সব বিষয়ই প্রেমিক গ্রহণ করেন। ঘনিষ্ঠতা ও একত্বের অবস্থায় তাঁর প্রেম তার মধ্যে রাখে মাতার ও পিতার স্নেহ এবং আমাদের চাহিদা অনুযায়ী আমরা এই প্রেম লাভ করি। সব কিছু এক হয়ে যায় ঐ গভীরতম বহুমুখী সম্বন্ধের মধ্যে।

এমনকি গোড়া থেকেই প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের এই ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধে আসা সম্ভব, তবে ভক্তির যে কতকগুলি পথে কেবলমাত্র রভসই সাধ্য সে সবে এই সম্বন্ধ যেমন আত্যন্তিক হয়, পূর্ণযোগীর কাছে এটি তত আত্যন্তিক হবে না। গোড়া থেকেই এটি নিজের মধ্যে নেবে অপর সব সম্বন্ধেরও কিছু কিছু রঙ, কারণ যোগী জ্ঞান ও কর্মও অনুসরণ করে এবং গুরু, সখা ও প্রভুরূপে ভগবানকে পাবার প্রয়োজন তার থাকে। ভগবৎপ্রেম যেমন বৃদ্ধি পেতে থাকে, তেমন তার মধ্যে ভগবৎ-জ্ঞানও প্রসারিত হয়,

আর প্রসারিত হয় তার প্রকৃতি ও জীবনযাত্রায় ভগবৎ-সঙ্কল্পের ক্রিয়া। দিব্য প্রেমিক নিজেকে প্রকট করেন; তিনি জীবনকে অধিগত করেন। কিন্তু তবু মূল সম্বন্ধ হবে প্রেমের সম্বন্ধ যা থেকে সকল কিছু প্রবাহিত হয়, এই প্রেম অত্যুগ্র, পূর্ণ আর খোঁজে চরিতার্থতার শত শত পথ, পরস্পরকে পাবার সকল উপায়, মিলনানন্দের লক্ষ রূপ। মনের সকল পার্থক্য, এর সকল অন্তরায় এবং "হতে পারে না"র নিষেধ, যুক্তিবুদ্ধির সকল নিষ্প্রাণ বিশ্লেষণ — এই সবকে উপহাস করে এই প্রেম, অথবা এদের ব্যবহার করে শুধু মিলনের বিভিন্ন পরীক্ষা ও ক্ষেত্র ও দুয়ার হিসেবে। আমাদের কাছে প্রেম আসতে পারে নানা ভাবে; এ আসতে পারে প্রেমিকের সৌন্দর্যের প্রতি জাগরণ রূপে যখন আমরা তাঁর আদর্শ মুখমণ্ডল ও মূর্তি দেখি, জগতের মধ্যে বিষয়সমূহের সহস্র মুখের পশ্চাতে পাই আমাদের কাছে তাঁর নিজের বিভিন্ন রহস্যময় ইঙ্গিত, অনুভব করি হৃদয়ের মন্থর বা আকস্মিক প্রয়োজন, অন্তঃপুরুষের মধ্যে এক অস্পষ্ট তৃষ্ণা অথবা এই বোধ জাগে যে সমীপস্থ কোন একজন আমাদের আকর্ষণ করছেন অথবা আমাদের পিছনে আসছেন সপ্রেমে অথবা আনন্দময়, সৌন্দর্যময় একজন আছেন যাঁকে আমাদের খুঁজে বার করা কর্তব্য।

তাঁকে পাবার জন্য আমাদের আকাঙ্ক্ষা হতে পারে তীব্র এবং আমরা অ-দেখা প্রেমাস্পদের অনুসরণ করতে পারি; তবে এও সম্ভব যে আমরা প্রথমে চাই বা না চাই প্রেমিক নিজেই, তাঁর কথা আমরা না ভাবলেও আমাদের পিছনে পিছনে এসে জগতের মধ্যে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে আমাদের অধিগত করেন। এমনকি প্রথমে তিনি প্রেমের ক্রোধ নিয়ে শত্রুরূপেও আসতে পারেন, এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের সবচেয়ে প্রাথমিক সম্বন্ধগুলি হতে পারে যুদ্ধ ও সংগ্রামের। যেখানে প্রথমেই প্রেম ও আকর্ষণ থাকে, সেখানেও ভগবান ও জীবের মধ্যে সম্বন্ধগুলির মধ্যে দীর্ঘদিন থাকতে পারে ভুল বোঝা ও দোষারোপ, ঈর্ষা ও ক্রোধ, প্রেমের বিবাদ ও কলহ, আশা ও নিরাশা এবং বিরহ ও বিচ্ছেদের ব্যথা। তাঁর বিরুদ্ধে আমরা নিক্ষেপ করি হৃদয়ের সকল তীব্র ভাবাবেগ যতক্ষণ না এরা শুদ্ধ হয়ে পরিণত হয় আনন্দ ও একত্বের অনন্য রভসে। কিন্তু এও এক ভাবমাত্র; ভাগবতপ্রেমের আনন্দের একান্ত ঐক্য ও শাশ্বত বৈচিত্র্যের সকল কথা বর্ণনা করা মানুষের ভাষার পক্ষে সম্ভবপর নয়। আমাদের পরতর ও অবর অঙ্গগুলি উভয়ই পরিপ্লুত হয় এর দ্বারা, যেমন অন্তঃপুরুষ হয়, মন ও প্রাণও তেমন হয়, তার চেয়ে কম নয়: এমনকি স্থূল দেহও হর্ষের অংশ পায়, স্পর্শ অনুভব করে আর তার সকল প্রত্যঙ্গ, শিরা, স্নায়ু ভরে যায় রভস মদিরার, "অমৃতের" প্রবাহে। প্রেম ও আনন্দই সত্তার শেষ কথা, গুহ্যের গুহ্য, রহস্যের রহস্য।

যদি প্রেম ও আনন্দের পথ এইভাবে বিশ্বভাবাপন্ন, ব্যক্তিভাবাপন্ন হয়, তাকে ঊর্ধ্বে নিয়ে তার বিভিন্ন তীব্র রূপ দেওয়া হয় আর তাকে করা হয় সর্বব্যাপী, সর্বগ্রাহী, সর্বার্থ-সাধক, তাহলে তা থেকে লাভ হয় পরম মুক্তি। এর সর্বোচ্চ শিখর হল বিশ্বাতীত মিলন। কিন্তু প্রেমের পক্ষে সম্পূর্ণ মিলনই মুক্তি; এর কাছে মুক্তির অপর কোন অর্থ নেই; আর

সকল প্রকার মুক্তিই একসাথে এ অন্তর্ভুক্ত করে, একসাথে — শেষকালে নয় যে মুক্তিগুলো পরপর আসবে এবং তাই জন্যে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কহীন, যদিও কারো কারো ক্ষেত্রে তা-ও হয়ে থাকে। আমরা পাই মানবীয় চিৎপুরুষের সঙ্গে দিব্য চিৎপুরুষের একান্ত মিলন, "সাযুজ্য"; যা সব ভেদের উপর নির্ভরশীল সে সবের আধার এর মধ্যে নিজেকে প্রকট করে — কিন্তু এখানে ভেদ একত্বেরই এক রূপ, — অর্থাৎ আমরা পাই সামীপ্য, সংযোগ ও পরস্পর সান্নিধ্যের আনন্দ, "সামীপ্য সালোক্য" — এর আনন্দ, আর পাই পরস্পরের প্রতিফলনের আনন্দ অর্থাৎ যাহাকে আমরা বলি সাদৃশ্য তার আনন্দ, আর অন্য সব অপরূপ জিনিসও পাই যেগুলির কোন নাম এখনো ভাষায় নেই। এমন কিছু নেই যা ভগবৎপ্রেমীর নাগালের বাইরে বা তাকে দেওয়া হয় না; কারণ সে হল দিব্য প্রেমিকের প্রিয় এবং পরম প্রেমাস্পদের আত্মা।

চতুর্থ খণ্ড

আত্মসিদ্ধি যোগ

প্রথম অধ্যায়

পূর্ণযোগের মূলতত্ত্ব

যোগের মূলতত্ত্ব হল আমাদের মানবসত্তার একটি বা সকল সামর্থ্যগুলিকে ভাগবতসত্তা লাভের উপায়ে পরিণত করা। সাধারণ যোগে সত্তার একটি প্রধান শক্তিকে অথবা এর বিভিন্ন শক্তির কোন সমষ্টিকে উপায়, বাহন, পথ করা হয়। সমন্বয়ী যোগে সকল শক্তিগুলিকেই একত্র মিলিয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হবে রূপান্তরকারী সাধনতন্ত্রের।

হঠযোগে সাধন হল দেহ ও প্রাণ। আসন ও অন্যান্য শারীরিক প্রক্রিয়ার দ্বারা দেহের সকল শক্তিকে নিস্তব্ধ, একত্র, শুদ্ধ, উন্নত ও একাগ্র করা হয় তাদের চরম সীমা পর্যন্ত অথবা সকল সীমা অতিক্রম ক'রে; সেইরকম প্রাণের শক্তিকেও শুদ্ধ, উন্নত, একাগ্র করা হয় আসন ও প্রাণায়ামের দ্বারা। তারপর শক্তিগুলির এই একাগ্র সমষ্টিকে চালনা করা হয় সেই ভৌতিক কেন্দ্রের দিকে যার মধ্যে দিব্য চেতনা প্রচ্ছন্নভাবে আসীন থাকে মানবদেহের অভ্যন্তরে। প্রাণের শক্তি, প্রকৃতি-শক্তি যা তার সকল গুহ্য শক্তি নিয়ে কুণ্ডলিত হয়ে পৃথ্বীসত্তার সর্বনিম্ন স্নায়ুচক্রে (মূলাধারে) সুপ্ত থাকে — কারণ আমাদের সাধারণ কাজকর্মে শুধু সেই পরিমাণ শক্তি জাগ্রত ক্রিয়ায় বার হয় যা মানবজীবনের সীমিত ব্যবহারের পক্ষে পর্যাপ্ত — তা জাগ্রত হয়ে চক্রের পর চক্রের মধ্য দিয়ে ঊর্ধ্বে ওঠে এবং ওঠবার সময় ও যাবার পথে আমাদের সত্তার পরপর প্রতি গ্রন্থির সব শক্তিকেও জাগ্রত করে অর্থাৎ স্নায়বিক প্রাণ, ভাবাবেগের হৃদয়, এবং সাধারণ মানসিকতা, বাক্, দৃষ্টি, সঙ্কল্প, উচ্চতর জ্ঞান প্রবুদ্ধ করে যতক্ষণ না এ মস্তিষ্কের মধ্য দিয়ে ও এর ঊর্ধ্বে দিব্য চেতনার সঙ্গে মিলিত হয়ে তার সঙ্গে এক হয়ে যায়।

রাজযোগে যে করণটি নির্বাচিত করা হয় তা মন। আমাদের সাধারণ মানসিকতাকে প্রথম সংযত ও শুদ্ধ ক'রে চালনা করা হয় ভাগবত সত্তার দিকে এবং তারপর আসন ও প্রাণায়ামের সংক্ষিপ্ত প্রণালীর দ্বারা আমাদের সত্তার শারীরিক শক্তিকে স্তব্ধ ও একাগ্র করা হয়, প্রাণশক্তিকে মুক্ত করা হয় এমন এক ছন্দোময় গতিতে যা নিবৃত্ত হতেও সমর্থ এবং একে একাগ্র করা হয় এর ঊর্ধ্বাভিমুখী ক্রিয়ার উচ্চতর শক্তিতে, আর মন তার আশ্রয়স্বরূপ দেহ ও প্রাণের এই মহত্তর ক্রিয়া ও একাগ্রতার দ্বারা পুষ্ট ও সবল হয়ে নিজেই শুদ্ধ হয় তার সকল চঞ্চলতা ও ভাবাবেগ ও অভ্যাসগত চিন্তাতরঙ্গ থেকে, এবং বিভ্রম ও বিক্ষেপ থেকে মুক্ত হয়ে ও একাগ্রতার সর্বোচ্চ শক্তি পেয়ে সমাহিত হয় সমাপত্তির সমাধিতে। এই শিক্ষার দ্বারা দুইটি বিষয় লাভ হয় — একটি ঐহিক, অন্যটি শাশ্বত। মনঃশক্তির অপর এক একাগ্র ক্রিয়ায় বিকশিত হয় জ্ঞানের অসামান্য সব সামর্থ্য, অমোঘ সঙ্কল্প, গ্রহণের গভীর আলোক, ভাবনা-বিকিরণের শক্তিশালী আলোক, যেগুলি আমাদের সাধারণ মানসিকতার সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের সম্পূর্ণ উজানে; এ লাভ করে

সেই সব যৌগিক বা গুহ্য শক্তি যাদের চারিদিকে অত রহস্যের জাল বোনা হয়েছে অথচ এই সব রহস্য সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, তবে হয়ত হিতকর। কিন্তু একমাত্র চরম লক্ষ্য এবং একমাত্র সর্বপ্রধান লাভ হল মন নিস্তব্ধ হয়ে একাগ্র সমাধির মধ্যে মগ্ন হলে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারে দিব্য চেতনার মধ্যে আর অন্তঃপুরুষ মুক্ত হয় ভাগবত সত্তার সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য।

ত্রিমার্গ তার যে করণগুলি নির্বাচন ক'রে নেয় তা হল মানুষের মানসিক অন্তরাত্মা-জীবনের তিনটি প্রধান শক্তি। জ্ঞানমার্গ নির্বাচন করে যুক্তিবুদ্ধি ও মানসিক দর্শন এবং এ শুদ্ধি, একাগ্রতা ও ভগবন্মুখী এষণার এক প্রকার সাধনার দ্বারা তাদের পরিণত করে সর্বাপেক্ষা মহত্তম জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠ দর্শনের অর্থাৎ ভগবৎ-জ্ঞান ও ভগবৎ-দর্শনের উপায়ে। এর লক্ষ্য হল ভগবানকে দেখা ও জানা ও ভগবান হওয়া। কর্মমার্গ, ক্রিয়া তার করণ হিসেবে নির্বাচন করে কর্মকর্তার সঙ্কল্প; এ জীবনকে করে পরমদেবতার নিকট এক যজ্ঞের নিবেদন এবং শুদ্ধি, একাগ্রতা ও দিব্যসঙ্কল্পের নিকট বশ্যতার একপ্রকার সাধনার দ্বারা জীবনকে পরিণত করে বিশ্বের দিব্য অধীশ্বরের সঙ্গে মানবের অন্তঃপুরুষের সংযোগের ও বর্ধিষ্ণু ঐক্যের উপায়ে। ভক্তিমার্গ নির্বাচন করে অন্তঃপুরুষের ভাবময় ও কান্ত শক্তিগুলি এবং সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতা, তীব্র এষণার অনন্ত প্রচণ্ড অনুরাগের মধ্যে সে সবকে ভগবন্মুখী ক'রে তাদের পরিণত করে এক উপায়ে যাতে ভগবানকে পাওয়া যায় ভাগবত সত্তার সঙ্গে ঐক্যের এক বা বহু সম্বন্ধের ভিতর। সকলেরই লক্ষ্য হল তাদের নিজস্ব পথে পরম চিৎপুরুষের সঙ্গে মানবীয় অন্তঃপুরুষের মিলন বা ঐক্য।

প্রতিটি যোগের প্রণালীই ব্যবহৃত করণের চরিত্রানুগ হয়, সেজন্য হঠযোগের প্রণালী মনোভৌতিক, রাজযোগের প্রণালী মানসিক ও চৈত্য, জ্ঞানমার্গ আধ্যাত্মিক ও জ্ঞানীয়, ভক্তিমার্গ আধ্যাত্মিক, ভাবময় ও সৌন্দর্যবোধাত্মক, কর্মমার্গ আধ্যাত্মিক ও কর্মের দ্বারা স্ফুরন্ত। প্রতিটির সাধনা করা হয় তার নিজস্ব বিশিষ্ট শক্তির ধারা অনুযায়ী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকল শক্তিই এক, সকল শক্তিই বস্তুতঃ অন্তঃপুরুষের শক্তি। প্রাণ, দেহ ও মনের সাধারণ কর্মধারায় এই সত্যটি সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন থাকে প্রকৃতির বিক্ষিপ্ত, বিভাজক ও বিকিরণশীল কর্মের দ্বারা যা আমাদের সকল ব্যাপ্রিয়ার সাধারণ অবস্থা, কিন্তু এখানেও শেষ পর্যন্ত ঐ সত্য সুস্পষ্ট; কারণ সকল জড়শক্তির মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে প্রাণিক, মানসিক, চৈত্য, আধ্যাত্মিক শক্তি এবং পরিশেষে এ বাধ্য হয় একই পরমাশক্তির এই সব বিভিন্ন রূপগুলি মুক্ত করতে; প্রাণিক শক্তি প্রচ্ছন্ন রাখে এবং ক্রিয়ায় মুক্ত করে অন্য সকল রূপগুলি, মানসিক শক্তি নিজেকে প্রাণ ও দেহ ও তাদের বিভিন্ন সামর্থ্য ও ব্যাপ্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত ক'রে ধারণ করে সত্তার অবিকশিত বা শুধু আংশিক বিকশিত চৈত্য ও আধ্যাত্মিক শক্তি। কিন্তু যখন যোগের দ্বারা এই সব শক্তির যে কোনটিকে বিক্ষিপ্ত ও বিকিরণশীল ক্রিয়া থেকে নিয়ে তার সর্বোচ্চ মাত্রায় উন্নত ও একাগ্র করা হয় তখন এ হয়ে ওঠে ব্যক্ত অন্তঃপুরুষ — শক্তি ও প্রকট করে তাদের স্বরূপগত ঐক্য। সেজন্য হঠযোগের প্রণালীতেও শুদ্ধ চৈত্য ও আধ্যাত্মিক ফল পাওয়া যায়, রাজযোগের

প্রণালী চৈত্য উপায়ে লাভ করে আধ্যাত্মিক সিদ্ধি। ত্রিমার্গ সম্বন্ধে মনে হতে পারে যে এর যে সাধনধারা ও উদ্দেশ্য তাতে এ সম্পূর্ণ মানসিক ও আধ্যাত্মিক কিন্তু এতেও এমন সব ফল পাওয়া যায় যেগুলি বরং অন্য সব মার্গের বিশিষ্ট ফল, ইচ্ছা না থাকলেও সে সব আসে স্বাভাবিক বিকাশ হিসেবে আর ঐ একই কারণে যে অন্তঃপুরুষ-শক্তি হল সর্ব-শক্তি এবং যেখানে একটি দিকে এটি পরাকাষ্ঠা লাভ করে, সেখানে এর অন্যান্য সম্ভাবনাগুলিও দেখা দিতে শুরু করে বাস্তবভাবে অথবা প্রাথমিক যোগ্যতা হিসেবে। এই ঐক্য থেকে তখনই বোঝা যায় যে এক সমন্বয়ী যোগ সম্ভবপর।

তান্ত্রিক সাধনা স্বরূপতঃ এক সমন্বয়। এ এই বিশাল বিশ্বজনীন সত্য আয়ত্ত করেছে যে সত্তার দুটি মেরু আছে যাদের স্বরূপগত ঐক্যই অস্তিত্বের রহস্য — ব্রহ্ম ও শক্তি, চিৎপুরুষ ও প্রকৃতি, আর প্রকৃতি হ'ল চিৎপুরুষেরই শক্তি, বরং এ শক্তিরূপী চিৎপুরুষ। মানবের মধ্যকার প্রকৃতিকে তুলে চিৎপুরুষের ব্যক্ত শক্তিতে আনাই এর পদ্ধতি, আর সমগ্র প্রকৃতিকেই এ একত্র তুলে নেয় আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের জন্য। এর সাধনতন্ত্রে আছে শক্তিশালী হঠযোগের প্রণালী এবং বিশেষ ক'রে আছে স্নায়বিক কেন্দ্রগুলির (চক্র) উন্মীলন, এবং এর মধ্য দিয়ে জাগ্রত শক্তির যাত্রা ব্রহ্মের সঙ্গে তার মিলনের পথে, আর আছে রাজযোগের শুদ্ধি, ধ্যান ও একাগ্রতার সূক্ষ্মতর প্রভাব, সঙ্কল্পশক্তির উত্তোলন ক্ষমতা, ভক্তির প্রবর্তক শক্তি, জ্ঞানের চাবিকাঠি। কিন্তু এই সব বিশিষ্ট যোগের বিভিন্ন শক্তিগুলিকে কার্যকরীভাবে একত্র করেই এ ক্ষান্ত হয় না। তার সমন্বয়ী প্রবণতার দরুন এ যৌগিক পদ্ধতির ক্ষেত্রকে আরো বিস্তৃত করে দুই দিকে। প্রথমতঃ এ মানবীয় গুণের প্রধান উৎসগুলির মধ্যে অনেকগুলিকে — কামনাকে, ক্রিয়াকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ ক'রে সে সবকে সংযমে আনে কঠোরভাবে, আর তা করার প্রথম লক্ষ্য হল এর বিভিন্ন প্রেরণাগুলির উপর অন্তঃপুরুষের কর্তৃত্ব স্থাপন এবং অন্তিম উপকারিতা হল এক দিব্যতর আধ্যাত্মিক স্তরে তাদের উন্নয়ন। তাছাড়া বিশিষ্ট সাধন পন্থাগুলির যেমন একমাত্র ব্রত হল মুক্তি সাধন, এই যোগে তেমন নয়; এ যে শুধু মুক্তিকেই যোগের উদ্দেশ্য করে তা নয়, এর অন্য উদ্দেশ্য হল পরম চিৎপুরুষের শক্তিকে বিশ্বজনীনভাবে উপভোগ করা (ভুক্তি), অথচ অন্যান্য যোগ হয়ত একে সাধনপথে নেয় প্রসঙ্গক্রমে, আংশিকভাবে ও আকস্মিক বিষয় হিসেবে, কিন্তু একে সাধনার প্রেরণা বা উদ্দেশ্য করে না। তান্ত্রিক সাধনা আরো সাহসী ও ব্যাপক।

সমন্বয়ের যে পদ্ধতি আমরা অবলম্বন করছি তাতে তন্ত্রের অন্য এক সূত্র অনুসরণ করা হয়, আর তা নেওয়া হয়েছে যোগের বিভিন্ন সম্ভাবনাগুলির সম্বন্ধে অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে। তন্ত্রের লক্ষ্যসাধনের জন্য এই সমন্বয় শুরু করে বেদান্তের পদ্ধতি থেকে। তন্ত্রের পদ্ধতিতে শক্তিই সর্বপ্রধান, এই হয়ে ওঠে চিৎপুরুষকে পাবার চাবিকাঠি; এই সমন্বয়ে চিৎপুরুষ, অন্তঃপুরুষ সর্বপ্রধান, এই হল শক্তিকে তুলে নেবার রহস্য। তন্ত্র পদ্ধতি শুরু করে সর্বনিম্ন থেকে এবং উত্তরণের সোপানকে উপর পানে সাজায় ক্রমান্বয়ে শিখর পর্যন্ত; সেজন্য এ প্রথম জোর দেয় দেহ ও এর বিভিন্ন কেন্দ্রগুলির স্নায়ুমণ্ডলীর

(নাড়ীতন্ত্রের) মধ্যে জাগ্রত শক্তির ক্রিয়ার উপর; ছয়টি পদ্মের (ষট্‌চক্র) উন্মীলনের অর্থ চিৎপুরুষের শক্তির স্তরের উদ্‌ঘাটন। আমাদের সমন্বয়ের কাছে মানব দেহগত চিৎপুরুষ অপেক্ষা বরং আরো বেশী পরিমাণে মনোগত চিৎপুরুষ; এ ধরে নেয় যে মানবের এই সামর্থ্য আছে যে সে ঐ স্তরেই সাধনা শুরু ক'রে নিজেকে এক উচ্চতর আধ্যাত্মিক শক্তি ও সত্তার নিকট উন্মুক্ত ক'রে তার সত্তাকে আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন করতে সক্ষম; আবার ঐ উচ্চতর শক্তিকে ঐভাবে অধিগত ও সক্রিয় ক'রে সে তার সাহায্যে তার সমগ্র প্রকৃতিকেও সিদ্ধ করতে সক্ষম। এই কারণে আমরা প্রথমে জোর দিয়েছি মনোগত অন্তঃপুরুষের বিভিন্ন শক্তিগুলির সমুচিত ব্যবহারের উপর এবং চিৎপুরুষের রুদ্ধ শক্তি উন্মুক্ত করতে জ্ঞান, কর্ম ও প্রেমের ত্রিবিধ চাবিকাঠির প্রয়োগের উপর; হঠযোগের পদ্ধতিগুলি না অবলম্বন করলেও চলে, তবে তাদের আংশিকভাবে ব্যবহার করায় আপত্তি নেই, আর রাজযোগের পদ্ধতি আসবে শুধু এক অনিয়মিত অঙ্গ হিসেবে। সরলতম পন্থায় আধ্যাত্মিক শক্তি ও সত্তার বৃহত্তম বিকাশ সাধন করা এবং এর দ্বারা মানবজীবনযাত্রার সমগ্র ক্ষেত্রে মুক্ত প্রকৃতিকে দিব্যভাবাপন্ন করা — এই হল আমাদের যোগের প্রেরণা, এর দ্বারাই আমরা অনুপ্রাণিত।

যে মূলতত্ত্বের কথা আমরা বলতে চাই তা হল আত্মসমর্পণ, অর্থাৎ ভগবানের সত্তা, চেতনা, শক্তি, আনন্দের নিকট মানবীয় সত্তার উৎসর্গ, মানবের, মনোময় পুরুষের অন্তঃপুরুষের মধ্যে সাক্ষাৎলাভের সকল বিন্দুতেই মিলন বা সঙ্গ যার দ্বারা ভগবান স্বয়ং সরাসরি ও অনাবৃতভাবে যন্ত্রের অধীশ্বর ও অধিকর্তা হয়ে তাঁর সান্নিধ্য ও দেশনার আলোকের দ্বারা প্রকৃতির সকল শক্তির মধ্যে মানবীয় সত্তাকে পূর্ণতা দেবেন দিব্যজীবনযাত্রার জন্য। এখানে আমরা পাই যোগের উদ্দেশ্যসমূহের এক অধিকতর প্রসার। সকল যোগেরই সাধারণ প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল মানবের বর্তমান প্রাকৃত অজ্ঞানতা ও সঙ্কীর্ণতা থেকে তার অন্তঃপুরুষের মুক্তি, এর বিমুক্তি আধ্যাত্মিক সত্তার মধ্যে, এর মিলন পরমাত্মা ও পরমদেবের সঙ্গে। কিন্তু সাধারণতঃ একে যে শুধু প্রাথমিক উদ্দেশ্য করা হয় তা নয়, একে করা হয় সমগ্র ও অন্তিম উদ্দেশ্য: আধ্যাত্মিক সত্তার উপভোগ থাকে, কিন্তু তা থাকে — হয় আত্মসত্তার নীরবতার মধ্যে মানবীয় ও ব্যষ্টি সত্তার লয়ে, না হয় আর এক অস্তিত্বের মধ্যে এক পরতর লোকের উপর। তান্ত্রিক সাধনা মুক্তিকে অন্তিম লক্ষ্য করে, কিন্তু একে একমাত্র লক্ষ্য করে না; এ তার সাধনপথে নেয় পূর্ণ সিদ্ধি ও মানবীয় অস্তিত্বের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি, আলোক ও হর্ষের উপভোগ, আর এমনকি এ এমন এক পরম অনুভূতিরও আভাস পায় যার মধ্যে মুক্তি ও বিশ্বজনীন ক্রিয়া ও উপভোগ মিলিত হয়ে এক হয়, এবং সকল বিরোধ ও বৈষম্য চূড়ান্তভাবে দূর হয়। আমাদের আধ্যাত্মিক যোগ্যতার এই ব্যাপকতর দৃষ্টিকোণ থেকেই আমরা শুরু করি কিন্তু আমরা আর একটি বিষয়ে গুরুত্ব দিই যার ফলে যোগের তাৎপর্য আরো সম্পূর্ণ হয়। আমরা মনে করি যে মানবের চিৎপুরুষ কেবলমাত্র এক ব্যষ্টিসত্তা নয়, আর তার যাত্রা যে শুধু ভগবানের সঙ্গে বিশ্বাতীত ঐক্য লাভের জন্য তা নয়, বরং আমরা মনে

করি যে এ হ'ল এমন এক বিশ্বময় সত্তা যে সকল অন্তঃপুরুষ ও সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে ভগবানের সঙ্গে একত্ব লাভে সমর্থ, আর আমরা এই প্রসারিত দৃষ্টিকে দিই তার কার্যতঃ সম্পূর্ণ সফল রূপ। মানবীয় অন্তঃপুরুষের ব্যক্তিগত মুক্তি এবং আধ্যাত্মিক সত্তায়, চেতনায় ও আনন্দে ভগবানের সঙ্গে ব্যক্তিগত মিলনাস্বাদন — এ সর্বদা'ই যোগের প্রথম উদ্দেশ্য হতে বাধ্য; ভগবানের সঙ্গে বিশ্বজনীন ঐক্যের স্বচ্ছন্দ উপভোগ হয়ে ওঠে দ্বিতীয় উদ্দেশ্য; কিন্তু এর থেকে যে এক তৃতীয় উদ্দেশ্যর উদয় হয়, — তা হ'ল মানবজাতির মধ্যে ভগবানের যে আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য তাতে সমবেদনা ও অংশগ্রহণের দ্বারা সর্বভূতের সঙ্গে ভগবৎ-ঐক্যের অর্থকে কার্যে পরিণত করা। ব্যক্তিগত যোগ তখন তার পৃথক্‌ভাব ত্যাগ ক'রে হয়ে ওঠে মানবজাতির মধ্যে দিব্য প্রকৃতির সমষ্টি যোগের এক অংশ। আত্মায় ও চিৎপুরুষে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মোক্ষপ্রাপ্ত ব্যষ্টিপুরুষ তার প্রাকৃত সত্তায় হয়ে ওঠে এক আত্মসিদ্ধিপ্রদ যন্ত্র মানবজাতির মধ্যে ভগবানের সুষ্ঠু বহিঃপ্রস্ফুটনের জন্য।

এই বহিঃপ্রস্ফুটনের দুইটি পর্যায় — প্রথম আসে বিভক্ত মানবীয় অহং থেকে চিৎপুরুষের ঐক্যের মধ্যে উপচয়, আর তারপর আসে দিব্য প্রকৃতির অধিকার তার যথার্থ ও উচ্চতর রূপগুলিতে, এ অধিকার তখন আর মনোময় সত্তার সব অবর রূপে হয় না, কারণ এগুলি বিশ্বজনীন ব্যষ্টির মধ্যে দিব্য প্রকৃতির মূল লিপির সঠিক উক্তি নয়, এরা হল তার বিকৃত রূপান্তর। অর্থাৎ এমন এক সিদ্ধি আমাদের লক্ষ্য হওয়া চাই যার অর্থ মানসিক প্রকৃতির উন্নয়ন পূর্ণ আধ্যাত্মিক ও অতি-মানসিক প্রকৃতিতে। অতএব জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের এই পূর্ণ যোগকে প্রসারিত করা চাই আধ্যাত্মিক ও বিজ্ঞানময় আত্মসিদ্ধির যোগে। যেহেতু বিজ্ঞানময় জ্ঞান, সঙ্কল্প ও আনন্দ চিৎপুরুষের প্রত্যক্ষ করণ এবং তাদের লাভ করা যায় শুধু চিৎপুরুষের মধ্যে, ভাগবত সত্তার মধ্যে উপচয়ের দ্বারা, সেহেতু এই উপচয়ই হওয়া চাই আমাদের যোগের প্রথম লক্ষ্য। জীবের অন্তঃপুরুষের মধ্যে ভগবান যে তাঁর বিজ্ঞানময় বহিঃপ্রস্ফুটন পূর্ণ করবেন তার আগে দরকার মনোময় পুরুষের নিজেকে বিস্তৃত করা ভগবানের একত্বের মধ্যে। জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের ত্রিমার্গ যে অখণ্ড যোগের প্রধান সুর হয়ে ওঠে তার কারণ হল এই, কারণ ওটাই প্রত্যক্ষ উপায় যার দ্বারা মনোগত অন্তঃপুরুষ উঠতে পারে তার সব উচ্চতম উৎকৃষ্ট স্তরে যেখান থেকে সে ঊর্ধ্বে চলে যায় দিব্য একত্বের মধ্যে। যোগ যে পূর্ণ, অখণ্ড হওয়া চাই — ওটাও তার এক কারণ। কারণ যদি অনন্তের মধ্যে নিমজ্জন অথবা ভগবানের সঙ্গে কোন ঘনিষ্ঠ মিলনই আমাদের সমগ্র লক্ষ্য হ'ত তাহলে পূর্ণ যোগ অনাবশ্যক হয়ে পড়ত, — আবশ্যক হ'ত শুধু মানবের সত্তার এমন অধিকতর তৃপ্তির জন্য যা আমরা পেতে পারি সমগ্র সত্তাকে তার পরম উৎসের দিকে আত্ম-উত্তোলনের দ্বারা, এ ছাড়া অন্য কিছুর জন্য নয়। কিন্তু মূল লক্ষ্যের জন্য এর প্রয়োজন হ'ত না, কারণ অন্তঃপুরুষ-প্রকৃতির যে কোন শক্তির দ্বারাই আমরা ভগবানের সঙ্গে মিলতে পারি; প্রতি শক্তিই তার পরাকাষ্ঠায় উত্তরণ করে অনন্ত ও অনপেক্ষ তত্ত্বের মধ্যে, সুতরাং এদের প্রত্যেকেই সেখানে

পৌঁছবার পক্ষে পর্যাপ্ত পথস্বরূপ, কারণ শত শত সকল পথই মিলিত হয় সনাতনে। কিন্তু বিজ্ঞানময় সত্তা হল সমগ্র দিব্য ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির সম্পূর্ণ ভোগ ও অধিকার; আর এ হল মানবের সমগ্র প্রকৃতির সম্পূর্ণ উন্নয়ন এক দিব্য ও আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের যে শক্তি তার মধ্যে। তখন এই যোগের জন্য অখণ্ডতা হয়ে ওঠে এক অত্যাবশ্যক সর্ত।

একই সঙ্গে আমরা দেখেছি যে কিছু ব্যাপকতার সঙ্গে সাধনা করা হলে ত্রিমার্গের প্রত্যেকেই তার পরাকাষ্ঠায় তার মধ্যে নিতে পারে অপরগুলিরও বিভিন্ন শক্তি এবং হতে পারে তাদের চরিতার্থতা সাধনেও সক্ষম। সুতরাং এই যথেষ্ট হবে যদি আমরা যে কোন একটি পথে সাধনা শুরু করে সেই বিন্দুটি খুঁজে পাই যেখানে এই পথ অন্যের সঙ্গে মিলিত হয় অগ্রগতির প্রাথমিক সমান্তরাল রেখাগুলিতে এবং তাদের মধ্যে মিশে যায় নিজের প্রসারণের দ্বারা। তবু আরো দুরূহ, জটিল এবং পূর্ণমাত্রায় শক্তিশালী প্রণালী হবে যেন একসঙ্গে তিনটি রেখারই উপর, পুরুষ-প্রকৃতির ত্রি-চক্রের উপর সাধনা শুরু করা। কিন্তু আত্মসিদ্ধি যোগের সর্ত ও উপায় কি কি তা না দেখা পর্যন্ত এই সম্ভাবনার বিবেচনা স্থগিত রাখাই কর্তব্য। কারণ আমরা দেখব যে একেও সম্পূর্ণভাবে স্থগিত রাখার প্রয়োজন নেই, তবে এর কিছু প্রস্তুতি দিব্য কর্ম, প্রেম ও জ্ঞানের বিকাশের অঙ্গ এবং ঐ বিকাশের দ্বারা এ পথের একধরনের দীক্ষা মেলে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পূর্ণ সিদ্ধি

মানবীয় সত্তার দিব্য সিদ্ধিই আমাদের লক্ষ্য। সুতরাং আমাদের প্রথম জানা দরকার মানবের সমগ্র সিদ্ধির অন্তর্ভুক্ত উপাদান কি কি; দ্বিতীয়তঃ আমাদের জানা দরকার আমাদের সত্তার মানবীয় সিদ্ধি থেকে ভিন্ন এই যে দিব্য সিদ্ধি — আমাদের কাছে তার অর্থ কি। মানব সত্তারূপে যে আত্মবিকাশে সমর্থ এবং অন্ততঃ তার মন ধারণা করতে সক্ষম এমন সিদ্ধির কোন আদর্শ মানের দিকে সে যে কিছু অগ্রসর হতে ও তাকে সম্মুখে রেখে তার অনুবর্তী হতে সমর্থ — এটি সকল চিন্তাশীল মানুষই স্বীকার করে, যদিও মাত্র অল্পসংখ্যক লোকই এই সম্ভাবনাকে জীবনের একমাত্র সর্বপ্রধান লক্ষ্য গণ্য ক'রে ঐ কার্যে ব্রতী হয়। কিন্তু কেউ কেউ মনে করে এই আদর্শ এক ঐহিক পরিবর্তন স্বরূপ, আবার অন্য কেউ মনে করে এ হল এক ধর্মীয় রূপান্তর।

কখনও কখনও মনে করা হয় যে ঐহিক সিদ্ধি এমন কিছু যা বাহ্য, সামাজিক, এক ক্রিয়ার বিষয়, আমাদের মানবভাইদের এবং পারিপার্শ্বিকের সাথে আরো যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার, আরো সুষ্ঠু ও দক্ষ নাগরিকজীবন ও কর্তব্যপালন, আরো উৎকৃষ্ট, সমৃদ্ধ, সদয় ও সুখময় জীবনযাত্রা প্রণালী, আরো ন্যায়সঙ্গত ও সুসমঞ্জসভাবে অন্যদের সহযোগে জীবনের সব সুবিধাভোগ। আবার অন্যেরা মনে করে এ হল এক আরো আন্তর ও প্রত্যক্‌বৃত্ত আদর্শ, বুদ্ধি, সঙ্কল্প ও যুক্তির স্বচ্ছতা ও উন্নয়ন সাধন, প্রকৃতিস্থ শক্তি ও সামর্থ্যের উৎকর্ষ ও নিয়ন্ত্রণ, আরো মহত্তর নৈতিক, আরো সমৃদ্ধ সৌন্দর্যবোধাত্মক, সূক্ষ্মতর ভাবময়, আরো অধিক সুস্থ ও সুশাসিত প্রাণিক ও শারীরিক সত্তা। কখনও কখনও একটি উপাদানের উপরই জোর দেওয়া হয় আর অন্যগুলি প্রায় বাদ পড়ে; কখনও কখনও আরো উদার ও ধীরস্থির মনে অখণ্ড সামঞ্জস্যকেই গণ্য করা হয় সমগ্র সিদ্ধি ব'লে। এর জন্য যে বাহ্য উপায় অবলম্বন করা হয় তা হল শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবর্তন, অথবা সঠিক করণ হিসাবে আন্তর আত্মশিক্ষা ও বিকাশকেই বেশী শ্রেয়ঃ মনে করা হয়। অথবা এই দুটি লক্ষ্যকেই — আন্তর ব্যক্তির সিদ্ধিকে এবং বাহ্য জীবনযাত্রার সিদ্ধিকে স্পষ্টভাবে যুক্ত করা হয়।

কিন্তু ঐহিক লক্ষ্যের ক্ষেত্র হল বর্তমান জীবন ও তার সুবিধাগুলি; অপরদিকে ধর্ম তার সম্মুখে যে লক্ষ্য রাখে তা হল মৃত্যুর পর অন্য এক জীবনের জন্য আত্মগঠন, এর সাধারণতম আদর্শ হল এক প্রকার পবিত্র সাধুজীবন, আর এর উপায় হল ভগবৎপ্রসাদের দ্বারা অথবা শাস্ত্রবিহিত বিধানের আর না হয় ধর্মপ্রতিষ্ঠাতার আদিষ্ট বিধানের অনুবর্তী হয়ে অপূর্ণ বা পাপময় মানবসত্তার রূপান্তর। ধর্মের লক্ষ্যের মধ্যে সামাজিক পরিবর্তন থাকতে পারে কিন্তু তখন এই পরিবর্তন আসার উপায় হবে ধর্মের

এক সাধারণ আদর্শ ও উৎসর্গীকৃত জীবনযাত্রা প্রণালী স্বীকার, সাধুসন্তের ভ্রাতৃত্ব, দেবতন্ত্র অথবা ভগবানের রাজ্য যা পৃথিবীতে প্রতিফলিত করে স্বর্গের রাজ্য।

যেমন অন্যান্য অংশে তেমন এই বিষয়েও আমাদের সমন্বয়ী যোগের উদ্দেশ্য হওয়া চাই আরো অখণ্ড ও ব্যাপক, এই সকল উপাদানকে অথবা আত্মসিদ্ধির এক আরো বিশাল সংবেগের এই সব প্রবণতাকে গ্রহণ ক'রে সে সবকে সুসমঞ্জস অথবা বরং মিলিয়ে এক করা চাই, আর যাতে ঐ কাজ সফলভাবে করা যায় সেজন্য একে এমন এক সত্য আয়ত্ত করতে হবে যা সাধারণ ধর্মীয় তত্ত্ব অপেক্ষা ব্যাপকতর এবং ঐহিক তত্ত্ব অপেক্ষা উচ্চতর। সমগ্র জীবন এক গূঢ় যোগ, অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যে যে দিব্য তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন আছে তা আবিষ্কার ও সার্থক করার দিকে প্রকৃতির অস্পষ্ট বিকাশ, তবে মানুষ যখন তার মধ্যকার ও জগতের মধ্যকার পরম চিৎপুরুষের নিকট তার জ্ঞান, সঙ্কল্প, ক্রিয়া, প্রাণের সকল করণ উন্মীলিত করে তখন তার মধ্যে এই দিব্যতত্ত্ব উত্তরোত্তর কম অস্পষ্ট ও অধিকতর আত্মসচেতন ও দীপ্ত ও আত্ম-অধিকৃত হয়ে ওঠে। মন, প্রাণ, দেহ, আমাদের প্রকৃতির সকল রূপই এই বিকাশের উপায় তবে তারা তাদের অন্তিম সিদ্ধি পায় শুধু তাদের উজানে "কিছুর" নিকট উন্মীলিত হয়ে; এর কারণ প্রথমতঃ এই যে, মানুষ যা তার সবখানি তারা নয়; আর দ্বিতীয়তঃ সেই যে অন্য কিছু যা সে, তা-ই তার সম্পূর্ণতার চাবিকাঠি, এ এমন এক আলোক আনে যা তার নিকট প্রকাশ করে তার সত্তার সমগ্র উচ্চ ও বৃহৎ বাস্তবতা।

মন তার পূর্ণতা পায় এক মহত্তর জ্ঞানের দ্বারা যার শুধু অর্ধ-আলোক এই মন; প্রাণ তার তাৎপর্য আবিষ্কার করে এক মহত্তর শক্তি ও সঙ্কল্পের মধ্যে যাদের বাহ্য ও এখনো অস্পষ্ট ব্যাপ্রিয়া হল প্রাণ; শরীর তার সর্বশেষ ব্যবহার খুঁজে পায় সত্তার এক শক্তির যন্ত্র হিসেবে, এ হল সত্তার এক ভৌতিক আশ্রয় ও জড়ীয় যাত্রাবিন্দু। প্রথমে এই সবকে নিজেরা বিকশিত হয়ে তাদের সাধারণ সম্ভাবনাগুলি পেতে হবে; আমাদের সমগ্র সাধারণ জীবনের অর্থ এই সব সম্ভাবনাগুলিকে পরীক্ষা করা; এই প্রস্তুতিজনক ও পরীক্ষামূলক আত্মশিক্ষার জন্য এ হল এক সুযোগ। কিন্তু জীবন তার সুষ্ঠু আত্মপূর্ণতা পায় না যতক্ষণ না এ উন্মুক্ত হয় সত্তার মহত্তর বাস্তবতার নিকট যার সুরচিত কর্মক্ষেত্র এ হয়ে ওঠে আরো সমৃদ্ধ শক্তি এবং আরো সংবেদনশীল ব্যবহার ও গ্রহণসামর্থ্যের বিকাশসাধনের দ্বারা।

বুদ্ধি, সঙ্কল্পশক্তি, নীতিবোধ, ভাবাবেগ, সৌন্দর্যবৃত্তি, শরীর, এসবের শিক্ষা ও উন্নতিসাধন যে হিতকর তাতে সন্দেহ নেই, তবে শেষ পর্যন্ত তাদের অর্থ শুধু গণ্ডির মধ্যে অবিরাম ভ্রমণ যার কোন অন্তিম উদ্ধারকারী ও উদ্ভাসক লক্ষ্য থাকে না যদি না তারা এমন এক বিন্দুতে উপনীত হয় যেখানে তারা নিজেদের উন্মুক্ত করতে পারে পরম চিৎপুরুষের সামর্থ্য ও সান্নিধ্যের নিকট এবং সমর্থ হয় এর সব প্রত্যক্ষ কর্মধারা গ্রহণ করতে। এই প্রত্যক্ষ কর্মধারা সমগ্র সত্তার এমন এক রূপান্তর সাধন করে যা আমাদের প্রকৃত সিদ্ধির অপরিহার্য সর্ত। অতএব, পরম চিৎপুরুষের সত্যে ও শক্তিতে বিকশিত

হওয়া এবং ঐ শক্তির প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার দ্বারা এর আত্মপ্রকাশের যোগ্য প্রণালীতে রূপান্তরিত হওয়া — ভগবানের মধ্যে মানবের জীবনধারা এবং মানবজাতির মধ্যে পরম চিৎপুরুষের দিব্য জীবনধারা — এই হবে পূর্ণ আত্মসিদ্ধি যোগের মূলতত্ত্ব ও সমগ্র উদ্দেশ্য।

এই পরিবর্তনের ধারায় সাধনার রীতি অনুযায়ী তার কর্মপ্রণালীর দুইটি পর্যায় থাকতে বাধ্য। প্রথমতঃ, যখনই মানব তার অন্তঃপুরুষ, মন, হৃদয়ের দ্বারা এই দিব্য সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে এবং একেই জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য গণ্য ক'রে এর দিকে ফেরে, তখনই তার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা শুরু হয় এর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে এবং যা সব নিম্ন কর্মধারার অন্তর্গত এবং আধ্যাত্মিক সত্য ও এর শক্তির নিকট তার উন্মুক্ত হওয়ার পথে যা সব অন্তরায় সে সব থেকে নিষ্কৃতি পেতে যাতে সে এই মুক্তির দ্বারা তার আধ্যাত্মিক সত্তা অধিগত করতে পারে, আর পারে তার সকল প্রাকৃত প্রবৃত্তিকে রূপান্তরিত করতে এই সত্তার আত্মপ্রকাশের স্বচ্ছন্দ উপায়ে। এই রূপান্তরের ফলেই শুরু হয় আত্মসচেতন যোগ যা তার নিজের লক্ষ্য: তখন আসে এক নতুন জাগরণ, ও জীবনপ্রেরণার এক ঊর্ধ্বমুখী পরিবর্তন। যতদিন জীবনের বর্তমান সাধারণ সব উদ্দেশ্যের জন্য শুধু এক বুদ্ধিগত, নৈতিক ও অন্য আত্মশিক্ষা থাকে যা মন, প্রাণ ও দেহের কর্মধারার সাধারণ গণ্ডির বাইরে যায় না, ততদিন আমরা থাকি প্রকৃতির অস্পষ্ট ও তখনো অনালোকিত প্রস্তুতিকর যোগের মধ্যে, তখনো আমরা শুধু এক মানবীয় সিদ্ধির প্রয়াসী। ভগবান ও ভগবৎসিদ্ধির জন্য, আমাদের সমগ্র সত্তায় তাঁর সঙ্গে ঐক্য ও আমাদের সমগ্র প্রকৃতিতে আধ্যাত্মিক সিদ্ধির জন্য এক আধ্যাত্মিক কামনাই এই পরিবর্তনের নিশ্চিত নিদর্শন, আমাদের সত্তা ও জীবনযাত্রার এক মহান্ অখণ্ড রূপান্তরের অগ্রগামী শক্তি।

ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা এক প্রারম্ভিক পরিবর্তন, এক প্রাথমিক রূপান্তর সাধন করা সম্ভব; এর অর্থ আমাদের বিভিন্ন মানসিক প্রেরণার, আমাদের চরিত্র ও স্বভাবের এক কম বা বেশী আধ্যাত্মীকরণ এবং প্রাণিক ও শারীরিক জীবনের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, এর উপশম অথবা পরিবর্তিত ক্রিয়া। এই রূপান্তরিত প্রত্যকবৃত্ততাকে করা যেতে পারে ভগবানের সঙ্গে মনোগত অন্তঃপুরুষের কিছু সংযোগের বা ঐক্যের ভিত্তি এবং মানুষের মানসিকতার মধ্যে দিব্য প্রকৃতির কিছু আংশিক প্রতিফলনেরও ভিত্তি। শুধু এতদূর পর্যন্তই মানুষ যেতে পারে নিজের প্রচেষ্টায়, অন্য সহায় না নিয়ে, বা শুধু কিছু পরোক্ষ সহায় নিয়ে, কারণ এ হল মনের প্রচেষ্টা এবং মন নিজেকে ছাড়িয়ে স্থায়ীভাবে উঠতে অক্ষম: বড় জোর এ ওঠে এক আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন ও আদর্শভাবাপন্ন মানসিকতায়। ঐ সীমা ছাড়িয়ে যদি এ ঊর্ধ্বে ছুটে যায় তাহলে নিজের উপর, জীবনের উপর তার আর কোন হাত থাকে না, এ উপনীত হয় সমাপত্তির সমাধিতে, অথবা নিষ্ক্রিয়তায়। এক মহত্তর সিদ্ধি পাওয়া সম্ভব একমাত্র যদি এক পরাশক্তি ভিতরে প্রবেশ ক'রে সত্তার সমগ্র ক্রিয়ার ভার নেয়। সুতরাং এই যোগের দ্বিতীয় পর্যায় হবে প্রকৃতির সকল ক্রিয়াকে

অশ্রান্তভাবে এই মহত্তরা শক্তির হস্তে ছেড়ে দেওয়া, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার স্থানে এর প্রভাব, অধিকার ও কর্মধারা আনা যতক্ষণ না ভগবান যাঁকে আমরা আস্পৃহা করি এই যোগের প্রত্যক্ষ অধীশ্বর হন এবং সাধন করেন সত্তার সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ও আদর্শ রূপান্তর।

আমাদের যোগের এই দ্বিবিধ বৈশিষ্ট্যের জন্য এই যোগ সিদ্ধির ঐহিক আদর্শের ওই সীমা ছাড়িয়ে যায়, আবার এ ধর্মের যে আরো উন্নত, প্রগাঢ় কিন্তু আরো অনেক সঙ্কীর্ণ সূত্র তাকে-ও ছাড়িয়ে যায়। ঐহিক আদর্শ মনে করে মানব সর্বদাই এক মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক সত্তা আর এর লক্ষ্য — এই সকল সীমার মধ্যেই এক মানবীয় সিদ্ধি অর্থাৎ মন, প্রাণ ও দেহের সিদ্ধি, ধীশক্তি ও জ্ঞানের, সঙ্কল্প ও সামর্থ্যের, নৈতিক চরিত্র, লক্ষ্য ও আচরণের, সৌন্দর্যবিষয়ক বোধ ও সৃজনশীলতার, ভাবময় সমত্বপূর্ণ স্থিতি ও ভোগের, প্রাণ ও শরীরের সুস্থতার, নিয়ন্ত্রিত ক্রিয়া ও সমুচিত দক্ষতার প্রসার ও সূক্ষ্মতা। এই লক্ষ্য পূর্ণ ও বিশাল, কিন্তু তবু যথেষ্ট পরিমাণে বিশাল ও পূর্ণ নয় কারণ এতে আমাদের সত্তার সেই অন্য মহত্তর উপাদান উপেক্ষা করা হয়; যার সম্বন্ধে মনের অস্পষ্ট ধারণা এই যে এ হল এক আধ্যাত্মিক উপাদান; এই উপাদানকে হয় বিকশিত করা হয় না, না হয় তৃপ্ত করা হয় অপ্রচুরভাবে যেন এ শুধু কোন সাময়িক বা অতিরিক্ত গৌণ অনুভূতি, মনের অসামান্য দিকের ক্রিয়ার ফল অথবা তার আবির্ভাব ও স্থায়িত্বের জন্য মনের উপর নির্ভরশীল। যখন এই লক্ষ্য আমাদের মানসিকতার আরো উন্নত ও ব্যাপক অংশগুলির বিকাশ সাধনের অভিলাষী হয় তখন এ উচ্চ হতে পারে, কিন্তু তখনো এ যথেষ্ট পরিমাণে উচ্চ নয়, কারণ এ মনের উজানে সেই বিষয়ের জন্য আস্পৃহা করে না যার শুধু নিষ্প্রভ বিকিরণ হল আমাদের শুদ্ধতম যুক্তিবুদ্ধি, আমাদের উজ্জ্বলতম মানসিক বোধি, আমাদের গভীরতম মানসিক বোধ ও বেদনা, প্রবলতম মানসিক সঙ্কল্প ও শক্তি, অথবা আদর্শ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তাছাড়া এর লক্ষ্য সাধারণ মানবজীবনের পার্থিব সিদ্ধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

পূর্ণসিদ্ধির যোগ মনে করে যে মানব মন, প্রাণ ও দেহের মধ্যে সংবৃত্ত এক দিব্য আধ্যাত্মিক সত্তা; সুতরাং এর লক্ষ্য, — মুক্তি এবং তার দিব্য প্রকৃতির সিদ্ধি। এর প্রয়াস হল পূর্ণবিকশিত আধ্যাত্মিক সত্তার মধ্যে আন্তর জীবনযাত্রাকে তার সতত স্বকীয় জীবনযাত্রা করা এবং মন, প্রাণ ও দেহের আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন ক্রিয়াকে শুধু এর বাহ্য মানবীয় অভিব্যক্তি করা। যাতে এই আধ্যাত্মিক সত্তা অস্পষ্ট ও অনির্দেশ্য কিছু না হয় অথবা এমন কিছু না হয় যা শুধু অপূর্ণভাবে উপলব্ধ এবং মানসিক অবলম্বন ও মানসিক সব সীমার উপর নির্ভরশীল, সেজন্য এই যোগ চেষ্টা করে মন ছাড়িয়ে যেতে অতিমানসিক জ্ঞান, সঙ্কল্প, ইন্দ্রিয় বোধ, বেদনা ও বোধিতে, প্রাণিক ও শারীরিক ক্রিয়ার স্ফুরন্ত উপক্রমে, সেই সবে যা আধ্যাত্মিক সত্তার আপন কর্মধারা রচনা করে। এ মানবজীবন স্বীকার করে কিন্তু পার্থিব জড়গত জীবনযাত্রার পিছনে বৃহৎ অতি-পার্থিব ক্রিয়ার সম্বন্ধেও অবহিত থাকে এবং নিজেকে যুক্ত করে ভাগবত সত্তার সঙ্গে যা থেকে

এই সব আংশিক ও অবর অবস্থার পরম উদ্ভব হয়, আর তা করে এইজন্য যে সমগ্র জীবন যেন তার দিব্য উৎস সম্বন্ধে সচেতন হতে পারে এবং জ্ঞানের, সঙ্কল্পের, বেদনা, ইন্দ্রিয়বোধ ও দেহের প্রতি ক্রিয়ায় অনুভব করতে পারে দিব্য প্রবর্তক সংবেগ। ঐহিক লক্ষ্যের মধ্যে যা সব গুরুত্বপূর্ণ সে সব এ বর্জন করে না তবে তাকে প্রসারিত করে, তার যে মহত্তর ও সত্যতর অর্থ এখন এর কাছে প্রচ্ছন্ন তা আবিষ্কার ক'রে তার মধ্যে বাস করে এবং তাকে রূপান্তরিত করে এক সীমিত, পার্থিব ও মর্ত্য বিষয় থেকে অনন্ত, দিব্য ও অমর ইষ্টার্থের আকারে।

ধর্মীয় আদর্শের সঙ্গে পূর্ণযোগের অনেক বিষয়েই মিল আছে, কিন্তু এ ধর্মীয় আদর্শকে ছাড়িয়ে যায় এই অর্থে যে এ হল আরো ব্যাপ্ত। ধর্মীয় আদর্শ শুধু যে পৃথিবীর উজানে তাকায় তা নয়, বরং এ পৃথিবীর দিকে না তাকিয়ে তাকায় স্বর্গের দিকে, অথবা এমনকি সকল স্বর্গ ছাড়িয়ে তাকায় এক প্রকার নির্বাণের দিকে। যে কোন রকমেরই আন্তর বা বাহ্য পরিবর্তন শেষ পর্যন্ত অন্তঃপুরুষকে মানবজীবন থেকে সরিয়ে তার উজানে যাবার সহায় হবে তারই মধ্যে এর সিদ্ধির আদর্শ সীমিত। সিদ্ধি সম্বন্ধে এর সাধারণ ভাবনা এই যে তা হল এক ধর্মীয়-নৈতিক পরিবর্তন, সক্রিয় ও ভাবময় সত্তার প্রচণ্ড রকমের শুদ্ধীকরণ, যার সঙ্গে তার উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা হিসেবে প্রায়ই থাকে প্রাণিক সংবেগগুলির সন্ন্যাসীসুলভ নাশ ও বর্জন; তাছাড়া এক অতিপার্থিব প্রেরণা এবং ধর্মপরায়ণতা ও সদাচারমূলক জীবনের পুরস্কার বা ফল এই ভাবনার অন্তর্গত হবেই। আর জ্ঞান, সঙ্কল্প, সৌন্দর্যস্পৃহার যে পরিবর্তন এই ভাবনার অন্তর্গত তা এই অর্থে যে এই সবকে মানবজীবনের বিভিন্ন লক্ষ্যের বদলে অন্য বিষয়াভিমুখী করা চাই, এবং শেষ পর্যন্ত এই ভাবনায় সৌন্দর্যস্পৃহা, সঙ্কল্প ও জ্ঞানের সকল পার্থিব বিষয়কে বর্জন করা হয়। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা অথবা দিব্য প্রভাব, কর্ম ও জ্ঞান অথবা ভগবৎপ্রসাদ, এদের মধ্যে যারই উপর এই পদ্ধতি জোর দিক না কেন, এ ঐহিক পদ্ধতির মতো বিকাশসাধন নয়, বরং এক রূপান্তরসাধন; তবে শেষ পর্যন্ত এর লক্ষ্য আমাদের মানসিক ও শারীরিক প্রকৃতির রূপান্তর সাধন নয়, বরং এক শুদ্ধ আধ্যাত্মিক প্রকৃতি ও সত্তা পরিগ্রহ, এবং যেহেতু তা এখানে পৃথিবীতে সম্ভবপর নয়, সেহেতু এ আশা করে যে তার লক্ষ্য সাধন হবে অন্য কোন জগতে প্রস্থান করে অথবা সকল জাগতিক অস্তিত্ব পরিহার করে।

কিন্তু যে ধারণার উপর পূর্ণযোগ প্রতিষ্ঠিত তাতে আধ্যাত্মিক সত্তা এক সর্বব্যাপী অস্তিত্ব, আর এর পূর্ণতাপ্রাপ্তির জন্য অন্য জগতে প্রস্থান অথবা জাগতিক আত্মবিনাশ অত্যাবশ্যক নয়, বরং তা পাবার উপায় হল আমরা বর্তমানে দৃশ্যতঃ যা তা থেকে আমরা আমাদের সত্তার স্বরূপে সর্বদাই যে সর্বব্যাপী সদ্‌বস্তু তার চেতনার মধ্যে উপচয়। ধর্মনিষ্ঠার রূপের পরিবর্তে এ আনে দিব্য মিলনের আরো সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক এষণা। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা থেকে শুরু ক'রে এ দিব্য প্রভাব ও অধিকারের মাধ্যমে অগ্রসর হয় রূপান্তরের দিকে; কিন্তু এই ভগবৎপ্রসাদ, — যদি এই নামই একে দেওয়া চলে — শুধু উপর-থেকে-আসা কোন রহস্যময় প্রবাহ বা স্পর্শমাত্র নয়, বরং এ হল এমন এক

দিব্য সান্নিধ্যের সর্বব্যাপী ক্রিয়া যাকে আমরা অন্তরে জানতে পারি আমাদের সত্তার পরমাত্মা ও অধীশ্বরের শক্তি ব'লে; এই শক্তি আমাদের অন্তঃপুরুষে প্রবেশ ক'রে একে এমনভাবে অধিগত করে যে আমরা যে শুধু অনুভব করি যে এ আমাদের সন্নিকটে এবং আমাদের মর্ত্য প্রকৃতির উপর চাপ দিচ্ছে তা নয়, বরং আমরা এর বিধানের মধ্যে বাস করি, ঐ বিধান জানি এবং তাকে অধিগত করি আমাদের আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন প্রকৃতির সমগ্র শক্তি ব'লে। এর ক্রিয়ায় যে পরিবর্তন সাধিত হবে তা এক অখণ্ড পরিবর্তন — আমাদের নৈতিক সত্তার অখণ্ড পরিবর্তন দিব্য প্রকৃতির সত্যে ও ঋতে, আমাদের বুদ্ধিগত সত্তার অখণ্ড পরিবর্তন দিব্য জ্ঞানের দীপ্তিতে, আমাদের ভাবময় সত্তার অখণ্ড পরিবর্তন ভাগবত প্রেম ও ঐক্যে, আমাদের স্ফুরন্ত ও সঙ্কল্পগত সত্তার অখণ্ড পরিবর্তন দিব্য শক্তির কর্মপ্রণালীতে, আমাদের সৌন্দর্যগ্রাহী সত্তার অখণ্ড পরিবর্তন দিব্য সৌন্দর্যের পূর্ণ গ্রহণে ও সৃজনশীল উপভোগে, এমনকি পরিশেষে প্রাণময় ও অন্নময় সত্তারও দিব্য পরিবর্তন বাদ যাবে না। এর কাছে সকল পূর্বজীবন হল এই পরিবর্তনের দিকে এমন এক প্রস্তুতিমূলক উপচয় যা অনিচ্ছাকৃত এবং অচেতন অথবা অর্ধচেতন আর যোগ হল এই পরিবর্তনের জন্য এক স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও সচেতন চেষ্টা এবং এই পরিবর্তন সাধন, আর এই পরিবর্তনের দ্বারা সকল অংশসমেত মানবজীবন যেমন পরিবর্তিত হয়, তেমন সেই সঙ্গে এর সমগ্র লক্ষ্যও চরিতার্থ হয়। বিশ্বাতীত সত্য ও পরপারের বিভিন্ন জগতে যে জীবন আছে তা এ স্বীকার করে, কিন্তু এ পার্থিব জগতকেও স্বীকার করে অবিভক্ত অস্তিত্বের এক অবিচ্ছিন্ন পর্যায় হিসেবে, আর স্বীকার করে যে পৃথিবীর উপর ব্যষ্টিগত ও সামাজিক জীবনের পরিবর্তন হল ঐ পার্থিব অস্তিত্বের দিব্য তাৎপর্যের অন্যতম সুর।

এই পূর্ণসিদ্ধির এক অত্যাবশ্যকীয় সর্ত হল বিশ্বাতীত ভগবানের নিকট নিজেকে উন্মুক্ত করা; আর অপর এক অত্যাবশ্যকীয় সর্ত হল বিশ্বাত্মক ভগবানের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করা। এই বিষয়ে জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগের সঙ্গে আত্মসিদ্ধি যোগের সম্পূর্ণ মিল আছে; কারণ যদি পরম সত্তা, চেতনা ও আনন্দের সঙ্গে মিলন না হয় এবং সর্ব বিষয়ে ও সত্তায় বিশ্বাত্মক আত্মার সঙ্গে ঐক্য না আসে তাহলে মানবীয় প্রকৃতিকে দিব্য প্রকৃতিতে পরিবর্তন করা অথবা একে অস্তিত্বের দিব্য জ্ঞান, সঙ্কল্প ও আনন্দের যন্ত্রে পরিণত করা অসম্ভব। ব্যষ্টিমানবের দ্বারা দিব্য প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ বিভক্তভাবে অধিগত করা সম্ভব নয়, অবশ্য এর মধ্যে আত্মনিবৃত্ত সমাপত্তির কথা আলাদা। কিন্তু যতদিন মানবজীবন থাকে ততদিন এই ঐক্য এমন কোন অন্তরতম আধ্যাত্মিক একত্ব হবে না যার সঙ্গে মন, প্রাণ এবং দেহে বিভক্ত অস্তিত্বও সম্ভব হবে; পূর্ণ সিদ্ধির অর্থ এই আধ্যাত্মিক ঐক্যের মাধ্যমে বিশ্ব সত্তার অপর যে নিত্য সংজ্ঞা বিশ্বমন, বিশ্বপ্রাণ, বিশ্বরূপ তাদেরও সঙ্গে ঐক্য লাভ। উপরন্তু, যেহেতু মানবজীবন সম্বন্ধে এখনো স্বীকার করা হয় যে এ হল মানবের মাঝে উপলব্ধ ভগবানের আত্মপ্রকাশ, সেহেতু আমাদের জীবনে সম্পূর্ণ দিব্য প্রকৃতির ক্রিয়া থাকতে বাধ্য; আর এই জন্য অতিমানসিক পরিবর্তনের

প্রয়োজন দেখা দেয় কারণ এই পরিবর্তন বাহ্য প্রকৃতির অপূর্ণ ক্রিয়ার পরিবর্তে আনে আধ্যাত্মিক সত্তার স্বকীয় ক্রিয়া, এবং এর মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক অংশগুলিকে আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন ও পরিবর্তিত করে আধ্যাত্মিক পরমতার দ্বারা। এই যে তিনটি উপাদান, অর্থাৎ পরতম ভগবানের সঙ্গে মিলন, বিশ্বাত্মার সঙ্গে ঐক্য এবং এক অতিমানসিক জীবনক্রিয়া যা এই বিশ্বাতীত উৎস থেকে এবং এই বিশ্বভাবের মধ্য দিয়ে আসে কিন্তু তখনো জীবকেই ব্যবহার করে আত্মপ্রণালী ও প্রাকৃত যন্ত্র হিসেবে — এরাই মানবের পূর্ণ দিব্য সিদ্ধির সার।

তৃতীয় অধ্যায়

আত্মসিদ্ধির মনোবিদ্যা

তাহলে মূলতঃ এই দিব্য আত্মসিদ্ধির অর্থ, — দিব্য প্রকৃতির সাদৃশ্যে এবং দিব্য প্রকৃতির সঙ্গে এক মৌলিক একত্বে মানবপ্রকৃতির পরিবর্তন মানবের মধ্যে দ্রুত ভগবানের প্রতিমূর্তি নির্মাণ এবং এর আদর্শ রূপরেখার পূরণ। এ তা-ই যাকে সাধারণতঃ বলা হয় সাদৃশ্যমুক্তি, অর্থাৎ দৃশ্যমান মানবীয় সত্তার বন্ধন থেকে দিব্য সাদৃশ্যে মুক্তি, অথবা গীতার কথায়, এ হল সাধর্ম্য মুক্তি, অর্থাৎ পরতম, বিশ্বাত্মক ও অন্তরধিষ্ঠাতা ভগবানের সঙ্গে সত্তার বিধানে, ধর্মে এক হওয়া। এইরকম পরিবর্তনের দিকে আমরা কিভাবে অগ্রসর হব তা জানতে হলে ও সে সম্বন্ধে সঠিক দৃষ্টি পেতে হলে আমাদের কর্তব্য হবে বর্তমান মানব প্রকৃতি তার বিবিধ তত্ত্বের বিশৃঙ্খল মিশ্রণে যে জটিল বিষয় হয়েছে তার সম্বন্ধে এক পর্যাপ্ত কাজ-চলা ধারণা গঠন করা, তবেই যদি আমরা দেখতে পাই এর প্রতি অংশকে যে পরিবর্তন গ্রহণ করতে হবে তার সঠিক স্বরূপ কি এবং ঐ পরিবর্তন সাধনের সর্বাপেক্ষা কার্যকরী উপায় কি। চিন্তাশীল মর্ত্য জড়ের এই গ্রন্থি থেকে কিভাবে এর অন্তঃস্থ অমর তত্ত্বকে মুক্ত করা যায়, এই মানসিকভাবাপন্ন প্রাণিক পশুরূপী মানবের মধ্য থেকে কিভাবে তার দেবত্বের নিমজ্জিত সঙ্কেতগুলির সুখময় পরিপূর্ণতা বার করা যায় — এই হল মানবের ও তার জীবনধারণের আসল সমস্যা। দেবত্বের অনেক প্রাথমিক সঙ্কেত জীবন বিকশিত করে তবে সেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত না ক'রে; যোগের অর্থ হল জীবনের পক্ষে দুরূহ যে গ্রন্থি তার বন্ধনমোচন।

যে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা থেকে এই সমস্যা এবং এর সকল বাধার উৎপত্তি তার কেন্দ্রীয় রহস্য জানাই আমাদের সর্বপ্রথম কাজ। কিন্তু সাধারণ মনোবিজ্ঞান আমাদের কোন উপকারে আসবে না কারণ এতে শুধু মন ও এর সব ব্যাপারকে নেওয়া হয় তাদের উপরভাসা মূল্যে; আত্মনিরূপণ ও আত্মপরিবর্তনের এই পথে এই বিজ্ঞান থেকে আমরা কোন নির্দেশ পাব না। আর জড়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক মনোবিজ্ঞান থেকে কোন সন্ধানসূত্র পাওয়ার সম্ভাবনা আরো কম কারণ এ ধরে নেয় যে দেহ এবং আমাদের প্রকৃতির জৈবিক ও শারীরক্রিয়া বিষয়ক ব্যাপারগুলি শুধু যে গোড়ার কথা তা নয়, বরং এরাই সমগ্র আসল ভিত্তি আর এ মনে করে যে মানবমন শুধু প্রাণ ও দেহ থেকে এক সূক্ষ্ম বিকাশ। মানবপ্রকৃতির পশু দিকটির সম্বন্ধে এবং মানবমনের যতখানি আমাদের সত্তার শারীরিক অংশের দ্বারা সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত ততখানি সম্বন্ধে হয়ত ওটাই প্রকৃত সত্য। কিন্তু মানব ও পশুর মধ্যে যা মূল পার্থক্য তা এই যে পশুর মন — যেমন আমরা একে জানি — তার আদিম সূত্র থেকে এক মুহূর্তও সরে আসতে পারে না, দেহগত প্রাণ অন্তঃপুরুষের চারিদিকে যে আবরণ, যে ঘন জালের ঘর বুনেছে তা ভেঙে বার হয়ে তার

বর্তমান আত্মার চেয়ে মহত্তর কিছু, আরো মুক্ত, গৌরবময় ও উন্নত সত্তা হতে অক্ষম; কিন্তু মানবের মাঝে মন নিজেকে এমন এক মহত্তর সক্রিয়শক্তি হিসেবে প্রকট করে যা সত্তার প্রাণিক ও শারীরিক সূত্রের বন্ধন থেকে মুক্ত হচ্ছে। কিন্তু তবু মানব যা অথবা যা হতে পারে সে সব এর মধ্যে সীমিত নয়: আরো মহত্তর এক আদর্শ সক্রিয় শক্তি বিকাশ ও নির্মুক্ত করার শক্তি তার মধ্যে বর্তমান আর এই আদর্শ শক্তি আবার মানবের প্রকৃতির মানসিক সূত্রের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে প্রকট করে এক আধ্যাত্মিক সত্তার অতিমানসিক রূপ, এক আদর্শ শক্তি। যোগে আমাদের কাজ হল ভৌতিক প্রকৃতি ও বাহ্য মানবের সীমা অতিক্রম ক'রে আসল মানবের সমগ্র প্রকৃতির কর্মধারা আবিষ্কার করা। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এক মনোভৌতিক জ্ঞান অর্জন ও প্রয়োগ করা আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

মানবের যা প্রকৃত স্বরূপ তাতে সে এক চিৎপুরুষ আর তা মন, প্রাণ ও দেহ ব্যবহার করে বিশ্বের মধ্যে ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত অভিজ্ঞতা ও আত্মপ্রকাশের জন্য; এই সত্য আমাদের বর্তমান বুদ্ধি ও চেতনার কাছে যতই অস্পষ্ট হ'ক না, যোগের প্রয়োজনের জন্য আমাদের এটা বিশ্বাস করা চাই, আর আমরা পরে দেখব যে বর্ধিষ্ণু অনুভূতি ও মহত্তর আত্মজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে এই বিশ্বাস যথার্থ। এই চিৎপুরুষ এক অনন্ত অস্তিত্ব যে ব্যষ্টিগত অভিজ্ঞতার জন্য নিজেকে আপতিক সত্তার মধ্যে সীমিত করে। এ হল এক অনন্ত চেতনা যা সত্তার বিবিধ জ্ঞানের ও বিবিধ শক্তির আনন্দের জন্য নিজেকে সীমিত করে চেতনার বিভিন্ন সান্ত রূপে। এ হল সত্তার এক অনন্ত আনন্দ যা নিজেকে এবং এর বিভিন্ন শক্তিকে প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করে, নিজের অস্তিত্বের হর্ষে বহু পর্যায়কে প্রচ্ছন্ন ও আবিষ্কার করে আবার গঠনও করে, এমনকি তাতে তার আপন স্বরূপ আপাতপ্রতীয়মানভাবে আচ্ছন্ন ও অস্বীকৃতও হয়। এ হল স্বরূপে সনাতন সচ্চিদানন্দ কিন্তু এ বিশ্ব ও ব্যষ্টি প্রকৃতির মাঝে এই যে জটিলতার, সান্তের মধ্যে অনন্তের এই যে গ্রন্থিবাঁধা ও গ্রন্থিখোলার বিভাব গ্রহণ করে সেই বিভাবটিই আমরা দেখি। এই সনাতন সচ্চিদানন্দকে, আমাদের অন্তরে আমাদের সত্তার এই মূল আত্মাকে আবিষ্কার করা এবং তার মধ্যে বাস করা — এই হল দৃঢ় ভিত্তি, এর আসল প্রকৃতিকে সুস্পষ্ট করা যেন এ আমাদের বিভিন্ন করণে অর্থাৎ অতিমানসে, মনে, প্রাণে ও দেহে দিব্য জীবনযাত্রাপ্রণালী সৃজন করে — এই হল আধ্যাত্মিক সিদ্ধির সক্রিয় তত্ত্ব।

চিৎপুরুষ প্রকৃতির সব ক্রিয়াধারার মধ্যে নিজের অভিব্যক্তির জন্য যে চারটি করণ ব্যবহার করে তা হল — অতিমানস, মন, প্রাণ ও দেহ। অতিমানস এমন আধ্যাত্মিক চেতনা যা কাজ করে স্বয়ং-প্রকাশ জ্ঞান, সঙ্কল্প, ইন্দ্রিয়বোধ, সৌন্দর্যস্পৃহা এবং সক্রিয় শক্তি রূপে, যা নিজেই নিজের আনন্দ ও সত্তার সৃষ্টি এবং তা প্রকট করার শক্তি। মন ঐ একই সব শক্তির ক্রিয়া কিন্তু এ হল সীমিত এবং শুধু অতীব পরোক্ষ ও আংশিকভাবে আলোকিত। অতিমানসের বাস ঐক্যের ভিতর যদিও বৈচিত্র্য নিয়েই এর লীলা; মনের বাস বৈচিত্র্যের এক বিভক্ত ক্রিয়ায়, যদিও ঐক্যের দিকে তার উন্মুক্ত হওয়া সম্ভব। মন

যে শুধু অজ্ঞানতায় সমর্থ তা নয়, বরং এ সর্বদাই আংশিকভাবে ও গণ্ডি টেনে কাজ করে ব'লে এ স্বভাবতঃই কাজ করে অজ্ঞানতার শক্তি হিসেবে: এমনকি এ সম্পূর্ণ নিশ্চেতনার বা নির্জ্ঞানের মধ্যে নিজেকে ভুলে যেতে পারে, এবং তা যায়ও এবং তা থেকে জাগে আংশিক জ্ঞানের অজ্ঞানতার মধ্যে এবং অজ্ঞানতা থেকে চলে সম্পূর্ণ জ্ঞানের দিকে — মানুষের মাঝে এই তার স্বাভাবিক ক্রিয়া — কিন্তু কখনই এ নিজের দ্বারা সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভে সক্ষম হয় না। অতিমানস প্রকৃত অজ্ঞানতায় অসমর্থ; এমনকি যদি এ কোন বিশেষ কর্মধারায় সীমিত হয়ে পূর্ণ জ্ঞানকে তার পিছনে রাখে, তবু যা পিছনে রাখা হয়েছে তার কাছ থেকেই তার সকল কর্মধারা নির্দেশ নেয় এবং সবই ভরপুর থাকে আত্মজ্যোতিতে; এমনকি যদি এ নিজে জড়ীয় নির্জ্ঞানের মধ্যে সংবৃত্ত থাকে তাহলেও এ সেখানে এক পূর্ণ সঙ্কল্প ও জ্ঞানের কাজ করে সঠিকভাবে। অবর করণগুলির ক্রিয়াতেও অতিমানস তার সাহায্য দেয়; বস্তুতঃ এ সর্বদাই সেখানে থাকে মর্মস্থলে তাদের বিভিন্ন ক্রিয়ার গূঢ় অবলম্বনরূপে। জড়ের মধ্যে এ হল বিষয়সমূহের ভিতরে প্রচ্ছন্ন ভাবনার স্বয়ং-ক্রিয় কর্ম ও কার্যসাধন; প্রাণের ভিতর এর সর্বাপেক্ষা গ্রাহ্য রূপ হল সহজাত সংস্কার, এক সহজবৃত্তিমূলক অবচেতন বা আংশিক অবচেতন জ্ঞান এবং ক্রিয়া; মনের মধ্যে এ নিজেকে প্রকাশ করে বোধি রূপে অর্থাৎ বুদ্ধি, সঙ্কল্প, ইন্দ্রিয়বোধ ও সৌন্দর্যস্পৃহার দ্রুত, সরাসরি ও স্বয়ং-সাধক জ্যোতিরূপে। কিন্তু এরা অতিমানসের বিভিন্ন জ্যোতিপ্রভামাত্র যেগুলি অপেক্ষাকৃত অজ্ঞানাচ্ছন্ন সব করণের সীমিত ব্যাপ্রিয়ার মধ্যে আসে নিজেদের তার উপযোগী ক'রে: এর নিজস্ব বিশিষ্ট প্রকৃতি হল বিজ্ঞান যা মন, প্রাণ ও দেহের কাছে অতিচেতন। অতিমানস বা বিজ্ঞান হল চিৎপুরুষের নিজের স্বকীয় বাস্তবতার মধ্যে তার বিশিষ্ট, ভাস্বর, অর্থপূর্ণ ক্রিয়া।

প্রাণ চিৎপুরুষের ক্রিয়াশক্তি যাকে মনের ও দেহের ক্রিয়ার অধীন করা হয়; এ নিজেকে চরিতার্থ করে মানসিকতা ও শারীরিকতার মাধ্যমে আর কাজ করে তাদের মধ্যে সংযোজক রূপে। এর নিজের বিশিষ্ট ক্রিয়া আছে, কিন্তু কোথাও এ মন ও দেহের অনধীন হয়ে কাজ করে না। কর্মরত চিৎপুরুষের সকল ক্রিয়াশক্তি কাজ করে সৎ ও চিৎ এই দুই তত্ত্বের মধ্যে; — 'সৎ'-এর আত্মরূপায়ণের এবং 'চিৎ'-এর লীলা ও আত্মোপলব্ধির জন্য, 'সৎ'-এর আনন্দ ও 'চিৎ'-এর আনন্দের জন্য। সত্তার এই যে অবর বিভাবনের মধ্যে আমাদের বর্তমান বাস তাতে চিৎপুরুষের প্রাণের ক্রিয়াশক্তি কাজ করে মন ও জড় এই দুই তত্ত্বের মধ্যে; তখন এ জড়ের ধাতুর বিভাবনগুলি ধারণ ও সাধন করে, এবং কাজ করে জড়শক্তিরূপে, আবার এ মনের চেতনার বিভিন্ন বিভাবনা ও মানসিক শক্তির সব কর্মধারাও ধারণ করে, এবং মন ও দেহের পারস্পরিক ক্রিয়াও ধারণ করে এবং কাজ করে ইন্দ্রিয়গত ও স্নায়বিক শক্তি হিসেবে। আমাদের সাধারণ মানবজীবনের প্রয়োজনের জন্য আমরা যাকে জীবনীশক্তি বলি তা হল সচেতন সত্তার সামর্থ্য যা জড়ে আবির্ভূত হয়ে তা থেকে এবং তার মধ্যে মুক্ত করে মন ও উচ্চতর সব শক্তি এবং স্থূল জীবনের মধ্যে তাদের সীমিত ক্রিয়া ধারণ করে — ঠিক যেমন আমরা

যাকে মানসিকতা বলি তা হল সচেতন সত্তার শক্তি যা দেহের মধ্যে জেগে ওঠে তার নিজের চেতনার আলোকের নিকট এবং তার অব্যবহিত চারিদিককার বাকী সব সত্তার চেতনার নিকট এবং প্রথমে কাজ করে এর জন্য প্রাণ ও দেহের দ্বারা নির্ধারিত সীমিত ক্রিয়ার মধ্যে, কিন্তু কতকগুলি বিশেষ বিন্দুতে এবং কোন বিশেষ উচ্চতায় এ তা থেকে বার হয়ে চলে যায় এই গণ্ডির উজানে কোন আংশিক ক্রিয়ায়। কিন্তু এটাই প্রাণের বা মানসিকতার সমগ্র শক্তি নয়; এই জড়ীয় স্তর ছাড়া, তাদের নিজেদের প্রকারের সচেতন অস্তিত্বের অন্যান্য লোকও আছে যেখানে তারা তাদের বিশিষ্ট কার্যে আরো বেশী স্বচ্ছন্দ। জড় বা দেহ নিজেই চিৎপুরুষের ধাতুর এমন এক সীমিত-করা রূপ যার মধ্যে প্রাণ ও মন ও চিৎপুরুষ সংবৃত্ত, আত্মপ্রচ্ছন্ন থাকে ও তাদের নিজেদের বহির্মুখী ক্রিয়ার মধ্যে তন্ময় হয়ে নিজেদের ভুলে যায়, কিন্তু তা থেকে তারা বার হয়ে প্রকট হতে বাধ্য হয় এক স্বতঃ-উৎসারিত বিবর্তনের দ্বারা। কিন্তু জড় ও ধাতুর বিভিন্ন সূক্ষ্মতর রূপে সূক্ষ্ম হতে সমর্থ আর এদের মধ্যে এ হয়ে ওঠে প্রাণের, মনের, চিৎপুরুষের আরো দৃশ্যতঃ বিশিষ্ট ঘনত্ব। এই স্থূল জড় দেহ ছাড়া মানুষের নিজের আছে তার আধারস্বরূপ এক প্রাণময় কোষ, এক মানসিক দেহ, ও আনন্দ ও বিজ্ঞানের এক দেহ। কিন্তু সকল জড়ের, সকল দেহের মধ্যে এই সব পরতর তত্ত্বের গূঢ় শক্তি বিদ্যমান; জড় প্রাণের এক গঠন আর যে বিরাট পুরুষ একে তার শক্তি ও ধাতু দেয় ও এর মধ্যে অনুস্যূত থাকে তা থেকে বিচ্ছিন্ন কোন বাস্তব অস্তিত্ব এর নেই।

এই হল চিৎপুরুষ ও তার বিভিন্ন করণের স্বরূপ। তবে এর বিভিন্ন কার্য বুঝতে হলে এবং যে প্রচলিত গর্তপথের মধ্যে আমাদের জীবন ঘুরতে থাকে তা থেকে তাদের উপরে ওঠাবার কাজে যে জ্ঞান আমাদের উত্তোলনের সামর্থ্য দেয় তা পেতে হলে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে পরম চিৎপুরুষ তাঁর সকল কর্মধারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তার সত্তার দুই বিভাবের উপর — পুরুষ ও প্রকৃতির উপর। শক্তিতে এরা পৃথক ও বিভিন্ন, এইভাবে তাদের গণ্য করা দরকার — কারণ চেতনার ব্যবহারে এই পার্থক্য সঠিক — যদিও তারা একই সদ্‌বস্তুর দুই দিক মাত্র, একই চিন্ময় সত্তার দুই ভিন্ন মেরু। পুরুষ অর্থাৎ অন্তঃপুরুষ হল চিৎপুরুষ যে তার নিজের প্রকৃতির সব কর্মধারা সম্বন্ধে অবগত, সে এদের ধারণ করে তার সত্তার দ্বারা এবং সে সবকে ভোগ করে অথবা তাদের উপভোগ বর্জন করে তার সত্তার আনন্দে। প্রকৃতি চিৎপুরুষের শক্তি, এবং সে আবার চিৎপুরুষের সেই শক্তির ক্রিয়া ও কর্মধারা যে সত্তার নাম ও রূপ রচনা করে, চেতনা ও জ্ঞানের ক্রিয়া বিকাশ করে, নিজেকে নিক্ষেপ করে সঙ্কল্প ও প্রেরণার, শক্তি ও ক্রিয়াশক্তির মধ্যে এবং নিজেকে চরিতার্থ করে উপভোগের মধ্যে। এই প্রকৃতি মায়া, শক্তি। যদি আমরা তাকে দেখি তার সবচেয়ে বাহ্য দিকে যেখানে সে পুরুষের বিপরীত ব'লে মনে হয়, সে প্রকৃতি, এক জড়ধর্মী ও যান্ত্রিক স্বয়ংচালিত ক্রিয়া, নিশ্চেতন বা সচেতন — তখনই সচেতন হয় যখন পুরুষ এর ক্রিয়াবলীকে আত্মিক দীপ্তি দ্বারা আলোকিত করে এবং এই সচেতনতা বিভিন্ন মাত্রার হয়ে থাকে — প্রাণিক, মানসিক ও

অতিমানসিক। যদি আমরা তাকে দেখি তার অপর অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ দিকে যেখানে সে পুরুষের সঙ্গে ঐক্যের আরো নিকটে আসে সে মায়া, সত্তা ও সম্ভূতির অথবা সত্তা ও সম্ভূতি থেকে নিবৃত্তির সঙ্কল্প আর সেই সঙ্গে চেতনার কাছে প্রতিভাত হয়ে নিবর্তন ও বিবর্তনের, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের, চিৎপুরুষের আত্মগোপনের ও চিৎপুরুষের আত্ম-আবিষ্কারের সকল পরিণতিও থাকে। এই দুই একই বিষয়ের অর্থাৎ শক্তির, চিৎপুরুষের সত্তার শক্তির বিভিন্ন দিক, আর এক আপাতপ্রতীয়মান নিশ্চেতনার মধ্যে এই শক্তির কাজ চলে চিৎপুরুষের জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি হিসেবে, হয় অতিচেতনভাবে নয় সচেতনভাবে বা অবচেতনভাবে — বস্তুতঃ এই তিনভাবেই একত্র কাজ চলে একই সময়ে এবং একই অন্তঃপুরুষের মধ্যে। এই শক্তিবলে চিৎপুরুষ সকল কিছু সৃষ্টি করে নিজের মধ্যে, লুক্কায়িত করে এবং আবিষ্কার করে নিজেকে, রূপে এবং সৃষ্টিমায়ার অন্তরালে।

নিজের স্বরূপের এই শক্তিবলে পুরুষ তার ইচ্ছামতো যে কোন স্থিতি নিতে, যে কোন আত্মবিভাবনার উপযোগী সত্তার বিধান ও রূপ অনুযায়ী চলতে সমর্থ। নিজের আত্ম-অস্তিত্বের শক্তিতে এ হল সনাতন অন্তঃপুরুষ ও চিৎপুরুষ এবং নিজের অভিব্যক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও তার নিয়ন্তা; এ হল বিশ্বপুরুষ ও চিৎপুরুষ আর তার অস্তিত্বের সম্ভূতির শক্তিতে বিকশিত, সান্তের মধ্যে অনন্ত; এ হল ব্যষ্টি অন্তঃপুরুষ ও চিৎপুরুষ তার সম্ভূতির কোন বিশেষ ধারার বিকাশের মধ্যে তন্ময়, দৃশ্যতঃ অনন্তের মধ্যে পরিবর্তনশীল সান্ত। এই সবই এ হতে পারে এক সাথে — সনাতন চিৎপুরুষ, বিশ্বের মধ্যে বিশ্বভাবাপন্ন, তার বিভিন্ন সত্তার মধ্যে ব্যষ্টিভাবাপন্ন; আবার পুরুষ চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করতেও পারে এই তিন বিভাবের যে কোন একটির মধ্যে প্রকৃতির ক্রিয়াকে বর্জন ক'রে, নিয়ন্ত্রিত ক'রে অথবা তাতে সাড়া দিয়ে, অন্যগুলিকে রাখতে পারে তার পশ্চাতে বা তা থেকে দূরে এবং নিজেকে জানতে পারে শুদ্ধ নিত্যতা বলে অথবা আত্মধারক বিশ্বভাব কিংবা আত্যন্তিক ব্যষ্টিত্ব বলে। তার প্রকৃতির বিভাবনা যাই হ'ক না কেন, পুরুষ তা-ই হয়েছে বলে নিজেকে দেখাতে পারে এবং শুধু তা-ই বলে নিজেকে দেখতেও পারে তার চেতনার সম্মুখস্থ সক্রিয় অংশে; কিন্তু সে কখনই শুধু তা নয় যা সে প্রতিভাত হয়; অন্য যা সব সে হতে পারে তা-ও সে; যা সব তার এখনো প্রচ্ছন্ন আছে সে সব সে গূঢ়ভাবে। কালের মধ্যে কোন বিশেষ আত্মবিভাবনার মধ্যে সে এমন সীমাবদ্ধ নয় যে তার অন্যথা হয় না, বরং তা ভেদ করে তা ছাড়িয়ে যাবার, তা চূর্ণ বা বিকশিত করার ক্ষমতা তার আছে, সে নির্বাচন, বর্জন, নতুন করে সৃষ্টি করতেও পারে অথবা নিজের মধ্য থেকে মহত্তর কোন আত্মবিভাবনা প্রকট করতে সক্ষম। তার বিভিন্ন করণে তার চেতনার সমগ্র সক্রিয় সঙ্কল্পের দ্বারা সে নিজেকে যা ব'লে বিশ্বাস করে তা-ই সে হয় অথবা হতে প্রবণ হয় "যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ": যা সে হতে পারে বলে সে বিশ্বাস করে এবং যা হওয়ায় তার পূর্ণ শ্রদ্ধা আছে, তাতে-ই সে প্রকৃতিতে পরিবর্তিত হয়, তা-ই সে বিকশিত বা আবিষ্কার করে।

নিজের প্রকৃতির উপর পুরুষের এই যে শক্তি — আত্মসিদ্ধি যোগে এর গুরুত্ব

অত্যন্ত বেশী; যদি এ না থাকত তাহলে আমরা সচেতন চেষ্টা ও আস্পৃহার দ্বারা কখনই আমাদের বর্তমান অপূর্ণ মানবীয় সত্তার বাঁধা গর্তপথ থেকে বাইরে আসতে পারতাম না; যদি কোন মহত্তর সিদ্ধিলাভ অভিপ্রেত হ'ত, তাহলে আমাদের অপেক্ষা ক'রে থাকতে হ'ত কবে প্রকৃতি তা সাধন করে তার বিবর্তনের নিজস্ব মন্থর বা দ্রুত ধারায়। সত্তার নিম্নতর রূপগুলিতে পুরুষ প্রকৃতির নিকট এই সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করে নেয়, কিন্তু যেমন সে এই পর্যায়ের উচ্চতর স্তরে উঠতে থাকে, ততই তার এই বোধ জাগে যে তার মধ্যে এমন কিছু আছে যা প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে; কিন্তু এই স্বাধীন সঙ্কল্প ও নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ বাস্তব হয় কেবল তখনই যখন সে আত্মজ্ঞান লাভ করে। এই পরিবর্তন সাধিত হয় প্রকৃতির ধারার মধ্য দিয়ে, সুতরাং কোন খেয়ালী যাদুর দ্বারা নয়, বরং তা হয় সুশৃঙ্খল বিকাশ ও বোধগম্য কর্মপ্রণালীর দ্বারা। যখন সম্পূর্ণ কর্তৃত্বলাভ হয় তখন বুদ্ধির কাছে এই কর্মপ্রণালী তার স্বয়ং-সাধক দ্রুততার দরুন অলৌকিক মনে হতে পারে কিন্তু তবু এ চলে পরম চিৎপুরুষের সত্যের বিধান অনুযায়ী — যখন আমাদের অন্তঃস্থ ভগবান তাঁর সঙ্গে আমাদের সঙ্কল্প ও সত্তার নিবিড় মিলনের দ্বারা যোগের ভার নেন এবং কাজ করেন প্রকৃতির সর্বশক্তিমান অধীশ্বর হিসেবে। কারণ ভগবান আমাদের পরতম আত্মা এবং প্রকৃতির আত্মা, সনাতন ও বিশ্বাত্মক পুরুষ।

সত্তার যে কোন লোকে পুরুষ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, সে তার শক্তির অব্যবহিত প্রধান রূপে সত্তার যে কোন তত্ত্ব নিতে পারে এবং বাস করতে পারে তার সচেতন ক্রিয়ার উপযুক্ত প্রকারের কর্মপ্রণালীতে। আত্ম-অস্তিত্বের অনন্ত ঐক্যের তত্ত্বের মধ্যে পুরুষ অধিষ্ঠিত হয়ে সকল চেতনা, ক্রিয়াশক্তি, আনন্দ, জ্ঞান, সঙ্কল্প, সক্রিয়তাকে জানতে পারে এই মূল সত্যের, 'সৎ'-এর, সত্যের চিন্ময় রূপ হিসেবে। সে অধিষ্ঠিত হতে পারে অনন্ত সচেতন ক্রিয়াশক্তির তত্ত্বে, তপসে এবং জানতে পারে যে সত্তার অনন্ত আনন্দের উপভোগের জন্য এ আত্ম-অস্তিত্বের মধ্য থেকে বাইরে বিবৃত করছে জ্ঞানের, সঙ্কল্পের এবং স্ফুরন্ত আত্মক্রিয়ার বিভিন্ন কর্ম। সে অনন্ত স্ব-প্রতিষ্ঠ আনন্দের তত্ত্বেও অধিষ্ঠিত হয়ে জানতে পারে যে দিব্য আনন্দ তার আত্ম-অস্তিত্বের মধ্য থেকে তার ক্রিয়াশক্তির দ্বারা সৃষ্টি করছে সত্তার যে কোন সামঞ্জস্য। এই তিন স্থিতির মধ্যে ঐক্যের চেতনাই প্রধান; তার নিত্যতার, বিশ্বভাবের, ঐক্যের সংবিতের মধ্যেই পুরুষ বাস করে আর যা কিছু বৈচিত্র্য আছে তা বিয়োজক বৈচিত্র্য নয়, বরং একত্বেরই শুধু বহুময় বিভাব। আবার এ অধিষ্ঠিত হতে পারে অতিমানসের তত্ত্বেও, এক জ্যোতির্ময় আত্মনিয়ন্ত্রণকারী জ্ঞান, সঙ্কল্প ও ক্রিয়ায় যা বিকশিত করে চিন্ময় সত্তার সুষ্ঠু আনন্দের কিছু সুসমন্বিত অবস্থা। পরতর বিজ্ঞানে ঐক্যই ভিত্তি, কিন্তু এ বৈচিত্র্যে আনন্দ পায়; অতিমানসের অবর তথ্যে বৈচিত্র্যই ভিত্তি কিন্তু এ সর্বদাই উন্মুখ থাকে সচেতন ঐক্যের দিকে এবং ঐক্যেই আনন্দ পায়। চেতনার এই সব পর্যায়গুলি আমাদের বর্তমান স্তরের উজানে অবস্থিত; এরা আমাদের সাধারণ মানসিকতার কাছে অতিচেতন। এই মানসিকতা সত্তার নিম্ন গোলার্ধের অন্তর্গত।

এই অবর সত্তা আরম্ভ হয় যেখানে পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে, অতিমানসস্থ চিৎপুরুষ

এবং মন, প্রাণ ও দেহের ভিতর চিৎপুরুষের মধ্যে এক আবরণ পড়ে। যেখানে এই আবরণ পড়ে না, সেখানে এই সব করণগত শক্তি আমাদের মধ্যে তারা যা তা নয়, বরং তারা অতিমানস ও চিৎপুরুষের একীভূত ক্রিয়ার আলোকিত অংশ। মন ভাবতে শুরু করে যে তার ক্রিয়া অনধীন যখন সে ভুলে যায় সেই আলোর কাছে নির্দেশ নিতে যা থেকে তার উৎপত্তি এবং যখন সে নিজের বিভক্ত প্রক্রিয়া ও উপভোগের সম্ভাবনায় তন্ময় হয়ে যায়। যখন পুরুষ মনের তত্ত্বে অধিষ্ঠিত থাকে আর প্রাণ ও দেহের অধীন তখনো হয়নি, বরং তাদের প্রয়োগকর্তা থাকে, তখন নিজের সম্বন্ধে তার এই জ্ঞান হয় যে সে এক মনোময় পুরুষ যে তার মানসিক জীবন ও বিভিন্ন শক্তি ও মূর্তি, সূক্ষ্ম মানসিক ধাতুর সব দেহ পরিচালিত করছে তার ব্যক্তিগত জ্ঞান, সঙ্কল্প ও স্ফুরত্তা অনুসারে, তবে বিশ্বমনের মধ্যে অবস্থিত অন্য সব সত্তা ও সামর্থ্যের সঙ্গে সম্বন্ধের দ্বারা সামান্য পরিবর্তিত হয়ে। যখন সে প্রাণের তত্ত্বে অধিষ্ঠিত থাকে তখন সে নিজেকে জানে বিশ্বপ্রাণের এক সত্তা রূপে যে তার বিভিন্ন কামনার দ্বারা তার ক্রিয়া ও চেতনা পরিচালনা করছে, তবে তা করা হয় অনুরূপভাবে পরিবর্তনকারী বিশ্ব-প্রাণপুরুষের বিশিষ্ট অবস্থার মধ্যে যাঁর কাজ চলে বহু ব্যষ্টি প্রাণ সত্তার মাধ্যমে। যখন এ জড়ের তত্ত্বের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকে তখন এ নিজেকে জানে জড়ের চেতনা রূপে যে কাজ করছে জড়ীয় সত্তার ক্রিয়াশক্তির অনুরূপ বিধানের অধীনে। যে অনুপাতে সে জ্ঞানের দিকে প্রবণ হয় সেই অনুপাতে সে কম বেশী স্পষ্টভাবে নিজেকে জানে মনোময় পুরুষ, প্রাণময় পুরুষ, অন্নময় পুরুষ ব'লে আর সেইভাবে তার প্রকৃতিকে দেখে ও তার মধ্যে কাজ করে অথবা তার প্রকৃতিই তার উপর কাজ করে; কিন্তু যেখানে সে অজ্ঞানতার দিকে প্রবণ হয় সেখানে সে নিজেকে অহং ব'লে জানে এবং প্রকৃতির সৃষ্টি, মন, প্রাণ বা দেহের প্রকৃতির এই অহং-এর সঙ্গে নিজেকে এক মনে করে। কিন্তু জড়গত পুরুষের স্বকীয় প্রবণতা হল গঠন-ক্রিয়া ও জড়ীয় সঞ্চালনের মধ্যে পুরুষের ক্রিয়াশক্তির সমাপত্তির দিকে যার ফল হল সচেতন সত্তার আত্মবিস্মৃতি। জড় বিশ্ব আরম্ভ হয় এক আপাতপ্রতীয়মান নিশ্চেতনা থেকে।

এই সকল লোকেই বিরাট পুরুষ অধিষ্ঠিত থাকে এক প্রকার সাথে সাথে আর এই তত্ত্বের প্রত্যেকটির উপর এক একটি অথবা এক এক সারি জগৎ নির্মাণ করে এর এমন সব সত্তাসহ যাদের বাস ঐ তত্ত্বের প্রকৃতির মধ্যে। পিণ্ডরূপী যে মানব, তার নিজের সত্তার মধ্যে এই সকল লোকই — তার অবচেতন অস্তিত্ব থেকে তার অতিচেতন অস্তিত্ব পর্যন্ত — পর্যায়ক্রমে বর্তমান। তার যে স্থূল, জড়ভাবাপন্ন মন ও বিভিন্ন ইন্দ্রিয় শুধু জড় জগৎকেই জানে তাদের থেকে এই যে প্রচ্ছন্ন জগৎ গোপন থাকে তাদের কথা সে জানতে পারে যোগের বিকাশমান শক্তির দ্বারা, আর তখন সে জানতে পারে যে তার জড়ীয় অস্তিত্ব বিচ্ছিন্ন ও স্ব-প্রতিষ্ঠ কিছু নয়, যেমন তার আবাস এই জড় বিশ্ব কোন বিচ্ছিন্ন ও স্ব-প্রতিষ্ঠ বিষয় নয়, বরং তার জড় অস্তিত্ব সর্বদাই উচ্চতর লোকের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং এসবের বিভিন্ন শক্তি ও সত্তা তার উপর সক্রিয়। এই সব উচ্চতর লোকের

ক্রিয়া সে নিজের মধ্যে উন্মুক্ত ও বৃদ্ধি করতে এবং অন্যান্য জগতের জীবনের সঙ্গে এক প্রকার অংশগ্রহণের আনন্দ উপভোগ করতে সক্ষম এবং অন্য সময়ে মৃত্যুর পর অথবা মৃত্যুর এবং জড়দেহে পুনর্জন্মের মধ্যে এই সব লোক তার অধিষ্ঠানভূমি অর্থাৎ তার চেতনার ধাম হয় বা হতে পারে। কিন্তু তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামর্থ্য হল নিজের মধ্যে এই সব উচ্চতর তত্ত্বের শক্তিগুলি বিকাশ করা অর্থাৎ প্রাণের এক মহত্তর শক্তি, মনের আরো শুদ্ধ আলো; অতিমানসের জ্যোতি, চিৎপুরুষের অনন্ত সত্তা, চেতনা ও আনন্দ। এক উর্ধ্বগামী সাধনধারার সাহায্যে সে তার মানবীয় অপূর্ণতাকে বিকশিত করতে পারে ঐ মহত্তর পূর্ণতার দিকে।

কিন্তু যা-ই তার লক্ষ্য হ'ক না কেন, যত উন্নতই তার আস্পৃহা হ'ক না কেন, তাকে আরম্ভ করতে হবে তার বর্তমান অপূর্ণতার বিধান থেকে আর এর সব কথা জেনে তার দেখা চাই কিভাবে এক সম্ভবপর পূর্ণতার বিধানে এর পরিবর্তনসাধন সম্ভব। তার সত্তার এই বর্তমান বিধান শুরু হয়েছে জড় বিশ্বের নিশ্চেতনা থেকে অর্থাৎ রূপের মধ্যে অন্তঃপুরুষের যে নিবর্তন এবং জড় জগতের কাছে তার যে অধীনতা তা থেকে, এবং যদিও এই জড়ে প্রাণ ও মন তাদের আপন আপন ক্রিয়াশক্তি বিকশিত করেছে, তবু তারা নিম্নতর জড়শক্তির ক্রিয়ার মধ্যে সীমিত ও আবদ্ধ, — যে জড়শক্তি তার ব্যবহারিক উপরভাসা চেতনার অজ্ঞানতার কাছে তার আদি তত্ত্ব। যদিও সে এক দেহধারী মনোময় পুরুষ তবু তার মধ্যকার মনকে দেহ ও দেহগত প্রাণের নিয়ন্ত্রণ সহ্য করতে হয় এবং সে প্রাণ ও দেহকে সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে শুধু অল্পবিস্তর প্রভূত পরিমাণ শক্তি ও একাগ্রতা বলে। পূর্ণ সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হবার একমাত্র উপায় হল ঐ নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করা আর এই লক্ষ্যে সে পৌঁছতে পারে শুধু অন্তঃপুরুষের শক্তি বিকশিত ক'রে। তার মধ্যে প্রকৃতি-শক্তিকে উত্তরোত্তর হতে হবে অন্তঃপুরুষের এক সম্পূর্ণ সচেতন ক্রিয়া, চিৎপুরুষের সমগ্র সঙ্কল্প ও জ্ঞানের এক সচেতন বহিঃপ্রকাশ। প্রকৃতিকে প্রকট হতে হবে পুরুষেরই শক্তিরূপে।

চতুর্থ অধ্যায়

মনোময় পুরুষের সিদ্ধি

এইরকম অবস্থায় আত্মসিদ্ধির যোগের মূল ভাবনা হতে হবে মানবের অন্তঃপুরুষের সঙ্গে তার মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক প্রকৃতির বর্তমান সব সম্বন্ধের পরাবর্তন। বর্তমানে মানব এক আংশিক আত্মসচেতন পুরুষ, এবং মন, প্রাণ ও দেহের অধীন ও তাদের দ্বারা সীমাবদ্ধ, কিন্তু তাকে হতে হবে তার মন, প্রাণ ও দেহের অধীশ্বর এক সম্পূর্ণ আত্মসচেতন পুরুষ। এক সম্পূর্ণ আত্মসচেতন পুরুষ তার সব বিভিন্ন করণের চাহিদা ও দাবীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। সে হবে তাদের অধ্যক্ষ ও স্বাধীন অধিকর্তা। তার নিজের সত্তার অধীশ্বর হবার জন্য মানবের এই যে প্রয়াস — এই হল তার অধিকাংশ অতীত আধ্যাত্মিক, বুদ্ধিবিষয়ক ও নৈতিক প্রচেষ্টার তাৎপর্য।

সম্পূর্ণ বাস্তব স্বাধীনতা ও কর্তৃত্বসহ নিজের সত্তার অধিকর্তা হতে হলে মানবের কর্তব্য হবে তার মধ্যে তার সর্বোচ্চ আত্মা, আসল মানব অথবা শ্রেষ্ঠ পুরুষ আবিষ্কার করা; সে-ই স্বাধীন ও তার নিজের অবিচ্ছেদ্য শক্তির অধীশ্বর। সে বর্তমানে যে এক মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক অহং, তার অবসান একান্ত আবশ্যক, কারণ এই অহং সর্বদাই মানসিক, প্রাণিক, শারীরিক প্রকৃতির সৃষ্টি, করণ ও অধীনস্থ। এই অহং তার আসল আত্মা নয়, এ হল শুধু প্রকৃতির এক যন্ত্রবিশেষ যার দ্বারা প্রকৃতি মন, প্রাণ ও দেহের মধ্যে এক সীমিত ও পৃথক ব্যক্তিগত সত্তার বোধ বিকশিত করেছে। এই যন্ত্রের দ্বারা সে কাজ করে যেন সে এই জড় জগতে এক পৃথক অস্তিত্ব। প্রকৃতি এমন কতকগুলি অভ্যস্ত সঙ্কীর্ণতাজনক অবস্থা বিকশিত করেছে যার মধ্যে ঐ ক্রিয়া চলে; আর যে উপায়ে প্রকৃতি অন্তঃপুরুষকে এই ক্রিয়ায় সম্মত হতে এবং এই সব অভ্যস্ত সঙ্কীর্ণতাজনক অবস্থা স্বীকার করতে রাজী করায় তা হল অহং-এর সঙ্গে অন্তঃপুরুষের নিজেকে এক মনে করা। যতদিন এই অভিন্নতা বোধ থাকে ততদিন সে এই অভ্যস্ত সঙ্কীর্ণ ক্রিয়ার পাকে নিজেকে আটক রাখে, এবং যতদিন না সে এর ঊর্ধ্বে ওঠে ততদিন অন্তঃপুরুষের দ্বারা তার ব্যষ্টিগত জীবনযাত্রাকে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করাই সম্ভব হয় না, প্রকৃত স্বোত্তরণ সাধন তো অনেক দূরের কথা। এই কারণেই যোগসাধনার এক অত্যাবশ্যক কাজ হল, — যে বহির্মুখী অহংবোধের দ্বারা আমরা মন, প্রাণ ও দেহের ক্রিয়ার সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন করি তা থেকে সরে এসে অন্তরাবৃত্ত হয়ে অন্তঃপুরুষের মধ্যে বাস করা। এই বহির্ভাবাপন্ন অহংবোধ থেকে মুক্তি সাধনই অন্তঃপুরুষের স্বাধীনতা ও কর্তৃত্বের দিকে প্রথম পদক্ষেপ।

যখন আমরা এইভাবে অন্তঃপুরুষের মধ্যে নিবৃত্ত হই, তখন আমরা দেখি যে আমরা মন নই, বরং দেহবদ্ধ মনের ক্রিয়ার পশ্চাতে দণ্ডায়মান এক মনোময় পুরুষ,

কোন মানসিক বা প্রাণিক ব্যক্তিসত্ত্ব নই — ব্যক্তিসত্ত্ব হল প্রকৃতির রচনা — বরং এক মানসিক ব্যক্তি, মনোময় পুরুষ। আমরা অন্তরস্থ এমন এক পুরুষ সম্বন্ধে সচেতন হই যে আত্মজ্ঞান ও জগৎ-জ্ঞানের জন্য মনের উপর অবস্থান করে এবং নিজেকে ভাবে যে সে আত্ম-অনুভূতি ও জগৎ-অনুভূতির জন্য, অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী ক্রিয়ার জন্য এক জীব, কিন্তু তবু মন, প্রাণ ও দেহ থেকে ভিন্ন। প্রাণিক ক্রিয়া ও অন্নময় সত্তা থেকে এই ভিন্নতাবোধ অতীব স্পষ্ট; কারণ যদিও পুরুষ অনুভব করে যে প্রাণ ও দেহের মধ্যে তার মন জড়িত, তবু সে জানে যে এই স্থূল প্রাণ ও দেহের অবসান বা লয় হলেও, তখনো মনোময় সত্তাতে তার অস্তিত্ব বজায় থাকবে। কিন্তু সে যে মন থেকে ভিন্ন এই বোধ পাওয়া আরো দুরূহ, আর এই বোধ অত সুস্পষ্টও হয় না। কিন্তু তবু এই বোধ থাকে; মনোময় পুরুষ যে তিনটি বোধির মধ্যে বাস করে এবং তাদের দ্বারা তার নিজের মহত্তর অস্তিত্বের কথা জানতে পারে তাদের যে কোন একটি বা সকলগুলিই এই বোধের বৈশিষ্ট্য।

প্রথম, নিজের সম্বন্ধে তার এই বোধি থাকে যে সে এমন একজন যে মনের ক্রিয়ার দ্রষ্টা; এই ক্রিয়া এমন কিছু যা তার মধ্যে চলছে, অথচ তার সামনে থাকে তার জ্ঞান-দৃষ্টির বিষয়রূপে। এই আত্মসংবিৎ সাক্ষী পুরুষের বোধিত অনুভব। সাক্ষী পুরুষ হল শুদ্ধ চেতনা যা প্রকৃতিকে নিরীক্ষণ করে এবং একে দেখে যেন এ চেতনার উপর প্রতিফলিত এক ক্রিয়া যা ঐ চেতনার দ্বারা আলোকিত হয়, কিন্তু স্বরূপে চেতনা থেকে ভিন্ন। মনোময় পুরুষের কাছে প্রকৃতি শুধু এক ক্রিয়া, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণমূলক ভাবনার, সঙ্কল্পের, ইন্দ্রিয়বোধের, ভাবাবেগের, স্বভাব ও চরিত্রের, অহং-অনুভবের এক জটিল ক্রিয়া, আর এই ক্রিয়া চলে প্রাণিক সব সংবেগ, প্রয়োজন এবং লালসার ভিত্তির উপর এবং স্থূল দেহের দ্বারা আরোপিত অবস্থার মধ্যে। কিন্তু মনোময় পুরুষ এদের দ্বারা সীমিত নয়, কারণ এ যে শুধু তাদের নতুন নির্দেশ দিতে এবং অনেক পরিবর্তন, সূক্ষ্মতা ও প্রসার আনতে সক্ষম তা নয়, এ আবার ভাবনা ও কল্পনায় এবং আরো সূক্ষ্ম ও নমনীয় সৃষ্টির মানসিক জগতে কার্য করতেও সমর্থ। কিন্তু আবার, সে যে বর্তমান ক্রিয়ার মধ্যে বাস করে তার চেয়ে বৃহত্তর ও মহত্তর কিছুরও বোধি মনোময় পুরুষের মধ্যে আছে অর্থাৎ অনুভূতির এমন এক ভূমি আছে যার শুধু সম্মুখস্থ অবস্থা অথবা সঙ্কীর্ণ বাহ্য নির্বাচন এই বর্তমান ক্রিয়া। এই বোধির দ্বারা সে এক অধিচেতন আত্মার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়ায়, আর এই বাহ্য মানসিকতা তার আত্মজ্ঞানের নিকট যে সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে তা অপেক্ষা এই অধিচেতন আত্মার সম্ভাবনা আরো বেশী প্রসারিত। সর্বশেষ ও মহত্তম বোধি হল এমন কিছুর আন্তর সংবিৎ যা সে নিজে স্বরূপতঃ আরো বেশী, এমন কিছু যা মনের ঊর্ধ্বে, যেমন মন স্থূল প্রাণ ও দেহের ঊর্ধ্বে। এই আন্তর সংবিৎ হল তার অতিমানসিক ও আধ্যাত্মিক সত্তার বোধি।

যে বাহ্য ক্রিয়া থেকে মনোময় পুরুষ সরে গিয়েছে তার মধ্যে সে আবার যে কোন সময় নিজেকে নিবর্তিত করতে পারে, কিছু সময়ের জন্য সেখানে বাস করতে পারে মন,

প্রাণ ও দেহের যন্ত্রশৃঙ্খলার সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন হয়ে এবং আবার তার পৌনঃপুনিক সাধারণ ক্রিয়া করতে পারে তন্ময়ভাবে। কিন্তু একবার ঐরকম বিচ্ছিন্ন হয়ে সে অবস্থায় কিছু সময় থাকলে সে আগে যা ছিল তা সম্পূর্ণভাবে আর কখনই নিজের কাছে হতে পারে না। বাহ্যক্রিয়ার মধ্যে এই নিবর্তন এখন শুধু হয়ে ওঠে এক পৌনঃপুনিক আত্মবিস্মৃতি, তবে আবার নিজের মধ্যে ও শুদ্ধ আত্ম-অনুভূতির মধ্যে সরে যাবার প্রবণতা তার মধ্যে থাকে। এটাও লক্ষণীয় যে এই যে বহির্মুখী চেতনা তার জন্য তার আত্ম-অনুভূতির বর্তমান প্রাকৃত রূপ সৃষ্টি করেছে তার সাধারণ ক্রিয়া থেকে সরে এসে পুরুষ অপর দুটি স্থিতি নিতে সক্ষম। তার নিজের সম্বন্ধে সে এই বোধি পেতে পারে যে সে দেহের মধ্যে এক পুরুষ যা প্রাণকে প্রকট করে তার ক্রিয়ারূপে এবং মনকে প্রকট করে ঐ ক্রিয়ার আলো রূপে। দেহমধ্যস্থ এই পুরুষ হল অন্নময় পুরুষ যা প্রাণ ও মনকে বিশিষ্টভাবে ব্যবহার করে ভৌতিক অনুভূতির জন্য — অন্য সকল কিছুকে মনে করা হয় ভৌতিক অনুভূতির পরিণাম স্বরূপ — যা দেহের প্রাণের উজানে তাকায় না, আর তার দৈহিক ব্যষ্টিত্বের বাইরে সে যা কিছু অনুভব করে তাতে সে শুধু এই ভৌতিক বিশ্বের কথাই জানে এবং বড় জোর বোধ করে জড় প্রকৃতির পুরুষের সঙ্গে তার একত্ব। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে সে এই বোধিও পেতে পারে যে সে প্রাণের এক পুরুষ যে কালের মধ্যে সম্ভূতির মহতী ধারার সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন ক'রে দেহকে প্রকট করে এক রূপ বা ভিত্তিস্থানীয় ইন্দ্রিয় ছবি হিসেবে এবং মনকে প্রকট করে প্রাণ-অনুভূতির এক সচেতন ক্রিয়ারূপে। প্রাণের মধ্যে এই পুরুষ হল প্রাণময় পুরুষ যে স্থূল দেহের স্থিতিকাল ও সব গণ্ডি ছাড়িয়ে দেখতে সমর্থ, আর অনুভব করতে সমর্থ পশ্চাতে ও সম্মুখে প্রাণের এক নিত্যতা, এক বিশ্ব প্রাণসত্তার সঙ্গে তাদাত্ম্য, তবে কালের মধ্যে এক অবিরত প্রাণিক সম্ভূতির উজানে সে তাকায় না। এই তিন পুরুষ হল পরম চিৎপুরুষের বিভিন্ন অন্তরাত্মা-রূপ যার দ্বারা এই পরম চিৎপুরুষ তাঁর সচেতন অস্তিত্বকে অভিন্ন করেন তাঁর বিশ্বসত্তার তিনটি লোক বা তত্ত্বের যে কোন একটির সঙ্গে এবং তাঁর ক্রিয়াও প্রতিষ্ঠিত করেন এর উপর।

কিন্তু মানবের বৈশিষ্ট্য এই যে সে এক মনোময় পুরুষ। উপরন্তু, বর্তমানে মানসিকতাই তার সর্বোচ্চ অবস্থা যাতে সে তার প্রকৃত আত্মার সর্বাপেক্ষা নিকটস্থ এবং সব চেয়ে সহজে ও বেশী পরিমাণে চিৎপুরুষ সম্বন্ধে সচেতন। তার সিদ্ধিলাভের উপায় হল বহির্মুখী বা বাহ্য অস্তিত্বের মধ্যে নিজেকে নিবর্তিত না করা, অথবা প্রাণের পুরুষ বা দেহের পুরুষের মধ্যে নিজেকে স্থাপন না করা; বরং এই উপায় হল সেই তিনটি মানসিক বোধির উপর জোর দেওয়া যার সাহায্যে সে শেষ পর্যন্ত নিজেকে শারীরিক, প্রাণিক ও মানসিক স্তরের ঊর্ধ্বে উত্তোলন করতে সক্ষম হয়। সে এই জোর দিতে পারে দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন রূপে, যাদের প্রত্যেকটির উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি বিভিন্ন। প্রকৃতিস্থ অস্তিত্ব থেকে দূরে এক দিকে, মন, প্রাণ ও দেহ থেকে বিচ্ছিন্নতা, প্রত্যাহারের দিকে বিশেষ জোর দেওয়া তার পক্ষে সম্পূর্ণ সম্ভব। সে চেষ্টা করতে পারে উত্তরোত্তর বাস করতে সাক্ষী পুরুষ

হিসেবে, যাতে সে প্রকৃতির ক্রিয়া শুধু দেখবে, তাতে তার কোন আগ্রহ থাকবে না, অনুমোদন দেবে না, বিচ্ছিন্ন হয়ে সমগ্র ক্রিয়াকে বর্জন করবে এবং শুদ্ধ সচেতন অস্তিত্বের মধ্যে নিবৃত্ত হবে। এই হল সাংখ্য মুক্তি। যে বৃহত্তর অস্তিত্বের বোধি তার আছে তার মধ্যে নিবৃত্ত হয়ে সে বাহ্য মানসিকতা থেকে সরে যেতে পারে স্বপ্নাবস্থা বা সুষুপ্তাবস্থার মধ্যে যাতে সে প্রবেশ করে চেতনার আরো ব্যাপ্ত ও উচ্চ ভূমির মধ্যে। এই সব ভূমিতে চলে গিয়ে সে তার কাছ থেকে পার্থিব সত্তা সরিয়ে দিতে পারে। প্রাচীন কালে মনে করা হ'ত যে মানসোত্তর সব জগতে এমন সংক্রমণও আছে যা থেকে পার্থিব চেতনায় প্রত্যাবর্তন হয় সম্ভবপর ছিল না অথবা অবশ্যকর্তব্য ছিল না। কিন্তু এই প্রকার মুক্তির নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত সমাপ্তি নির্ভর করে সেই আধ্যাত্মিক আত্মার মধ্যে মনোময় পুরুষের উন্নয়নের উপর যার সম্বন্ধে সে সচেতন হয় যখন সে তাকায় সকল মানসিকতা থেকে দূরে ও ঊর্ধ্বপানে। একেই দেওয়া হয় পার্থিব অস্তিত্ব থেকে সম্পূর্ণ নিবৃত্তির চাবিকাঠি হিসেবে — তা এই নিবৃত্তি শুদ্ধ সত্তার মধ্যে নিমজ্জনের দ্বারা আসুক অথবা বিশ্বাতীত সত্তার মধ্যে অংশ গ্রহণের দ্বারা আসুক, — যেভাবেই আসুক না কেন।

কিন্তু যদি শুধু প্রকৃতি থেকে আত্মবিচ্ছিন্নতার দ্বারা মুক্ত হওয়াই আমাদের লক্ষ্য না হয়, বরং লক্ষ্য হয় এর সঙ্গে পূর্ণ কর্তৃত্বও লাভ করা তাহলে শুধু এই প্রকার আগ্রহ আর পর্যাপ্ত হয় না। আবশ্যক হল আমাদের মধ্যে প্রকৃতির মানসিক, প্রাণিক ও ভৌতিক ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা, এর বন্ধনের বিভিন্ন গ্রন্থি ও মুক্তির সব শিথিল বিন্দুর সন্ধান করা, আর এর অপূর্ণতার বিভিন্ন সন্ধান-সূত্র আবিষ্কার করে পূর্ণতার সন্ধান-সূত্র আয়ত্ত করা। যখন দ্রষ্টা অন্তঃপুরুষ, সাক্ষী পুরুষ তার প্রকৃতির ক্রিয়া থেকে সরে দাঁড়িয়ে তা নিরীক্ষণ করে, সে দেখে যে এই ক্রিয়া চলে তার নিজের প্রেরণাতেই তার যন্ত্রের শক্তিবলে, সঞ্চালনের অনুবৃত্তির, মানসিকতার অনুবৃত্তির, প্রাণ-সংবেগের অনুবৃত্তির, অনিচ্ছাকৃত শারীরিক যন্ত্র রচনার অনুবৃত্তির শক্তিতে। প্রথমে মনে হয় যেন সমগ্র বিষয়টি এক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের পৌনঃপুনিক ক্রিয়া যদিও ঐ ক্রিয়ার সমষ্টির ফলে অনবরতই দেখা দেয় সৃষ্টি, বিকাশ ও বিবর্তন। পুরুষ যেন এতদিন এই চক্রের মধ্যে ধরা পড়ে অহং-বোধের দ্বারা এতে আসক্ত হয়ে যন্ত্রের পাকের মধ্যে চারিদিকে এবং সামনের দিকে ঘুরছিল। তার মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক ব্যক্তিসত্ত্বকে যদি আর এমন এক পুরুষ দ্বারা দেখা না হয় যে ঐ গতির মধ্যে আবদ্ধ এবং নিজেকে ক্রিয়ার এক অংশ ব'লে মনে করে বরং দেখা হয় এক স্থির নিরাসক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে তাহলে একে স্বভাবতঃই মনে হবে প্রকৃতির এক সম্পূর্ণ যান্ত্রিক নির্দিষ্টতা অথবা প্রকৃতির সবিশেষ তত্ত্বরাজির প্রবাহ যাতে সে তার চেতনার আলোকপাত করেছে।

কিন্তু আরো গভীর দৃষ্টিতে দেখা যায় যে এই নির্দিষ্টতা যত সম্পূর্ণ মনে হয় তত সম্পূর্ণ নয়; প্রকৃতির ক্রিয়া চলতে থাকে এবং পুরুষের অনুমোদনের জন্যই এ ঐরকম। দ্রষ্টাপুরুষ দেখে যে সে এই ক্রিয়াকে ধারণ করে এবং কোন এক প্রকারে একে পূর্ণ করে ও ব্যেপে থাকে তার চিন্ময় সত্তা দিয়ে। সে আবিষ্কার করে যে সে না থাকলে প্রকৃতির

ক্রিয়া চলতে পারে না, এবং যেখানে সে অশ্রান্তভাবে এই অনুমোদন প্রত্যাহার করে, সেখানে অভ্যস্ত ক্রিয়া ক্রমশঃ দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে থেমে যায়। তার সমগ্র সক্রিয় মানসিকতাকে এইভাবে নিস্তব্ধ করা যায়। কিন্তু তবু এক নিষ্ক্রিয় মানসিকতা থাকে যা যন্ত্রের মতো চলতে থাকে, কিন্তু একেও নিস্তব্ধ করা যায় যদি সে ক্রিয়ার বাইরে নিজের মধ্যে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয়। এমনকি তখনো জীবনক্রিয়া চলতে থাকে তার সব চেয়ে যান্ত্রিক অংশগুলিতে; কিন্তু একেও স্তব্ধ ক'রে থামিয়ে দেওয়া যায়। তখন দেখা যাবে যে সে শুধু ভর্তা পুরুষ নয়, সে কোন এক প্রকারে তার প্রকৃতির অধীশ্বর, ঈশ্বর। এই অনুমোদনকারী নিয়ন্ত্রণের দরুন, তার সম্মতির প্রয়োজনীয়তার দরুন সে তার অহংবোধের মধ্যে নিজের সম্বন্ধে ভাবে যে সে এক অন্তঃপুরুষ বা মনোময় পুরুষ যার নিজের বিভিন্ন সম্ভূতি নির্ধারণ করার স্বাধীন ইচ্ছা আছে। কিন্তু তবু এই স্বাধীন ইচ্ছাও মনে হয় অপূর্ণ, প্রায় ভ্রমাত্মক, কারণ বাস্তব সঙ্কল্প নিজেই প্রকৃতির এক যন্ত্র এবং প্রতি ইচ্ছাই অতীত ক্রিয়ার প্রবাহ এবং এর তৈরী অবস্থাসমূহের সমষ্টির দ্বারা নির্ধারিত — যদিও, প্রবাহের ফল, সমষ্টি প্রতি মুহূর্তে এক নতুন বিকাশ, এক নতুন সবিশেষ তত্ত্ব হওয়ায় একে মনে হয় এক স্বয়ং-জাত ইচ্ছা যা প্রতি মুহূর্তে নতুনভাবে সৃজনক্ষম। কিন্তু এই সকল সময় তার যা দান তা হল প্রকৃতি যা করছিল তাতে পশ্চাতের এক সম্মতি, এক অনুমোদন। মনে হয় না যে সে প্রকৃতিকে পুরোপুরি শাসন করতে সক্ষম, তবে সে সক্ষম শুধু কতকগুলি সুনির্দিষ্ট সম্ভাবনার মধ্যে নির্বাচন করতে: প্রকৃতির মধ্যে তার অতীত সংবেগ থেকে উৎপন্ন এক বাধার শক্তি আছে এবং বাধার আরো বড় এক শক্তি আছে, এই শক্তি তার তৈরী নির্দিষ্ট অবস্থাসমূহের সমষ্টি থেকে উৎপন্ন যে অবস্থাগুলিকে প্রকৃতি তার কাছে উপস্থিত করে অবশ্য পালনীয় কতকগুলি চিরস্থায়ী বিধান হিসেবে। সে তার কর্মপ্রণালীতে আমূল পরিবর্তন করতে অক্ষম, তার বর্তমান গতিধারার মধ্যে থেকে স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছানুযায়ী কার্য করতেও অক্ষম, আবার মানসিকতার মধ্যে অবস্থান ক'রে এক প্রকৃতই স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ আনতে পারে এমনভাবে যে প্রকৃতির বাইরে বা ঊর্ধ্বে যাবে সে ক্ষমতাও নেই। এইভাবে দুই রকমের নির্ভরতা বর্তমান, — প্রকৃতির নির্ভরতা পুরুষের সম্মতির উপর, আর পুরুষের নির্ভরতা প্রকৃতির ক্রিয়ার বিধান, ধারা ও সীমার উপর, নির্দিষ্টতাকে অস্বীকার করা হয় স্বাধীন ইচ্ছার বোধের দ্বারা আর স্বাধীন ইচ্ছা খণ্ডিত হয় প্রাকৃতিক নির্দিষ্টতার বাস্তবতার দ্বারা। পুরুষ নিশ্চিত যে প্রকৃতি তার শক্তি, কিন্তু মনে হয় সে প্রকৃতির অধীন। সে অনুমন্তা পুরুষ, কিন্তু মনে হয় না যে সে একান্ত প্রভু, ঈশ্বর।

কিন্তু তবু কোন এক স্থানে একান্ত নিয়ন্ত্রণ আছে, প্রকৃত ঈশ্বর বর্তমান। পুরুষ এই তত্ত্ব সম্বন্ধে সচেতন এবং জানে যে যদি সে এই তত্ত্ব আবিষ্কারে সমর্থ হয় তাহলে সে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অধিকারী হবে, শুধু যে প্রকৃতির সঙ্কল্পের নিষ্ক্রিয় অনুমোদনকারী সাক্ষী এবং ভর্তা পুরুষ হবে তা নয়, সে হবে প্রকৃতির সকল গতিবৃত্তির স্বাধীন শক্তিশালী প্রয়োগকর্তা ও নির্ধারক। কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণ, মনে হয়, মানসিকতা ছাড়া অন্য এক স্থিতির

অন্তর্গত। কখন কখন সে দেখে যে সে নিজেই এই নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করছে, তবে এক প্রবাহপ্রণালী বা যন্ত্র হিসেবে; এ তার কাছে আসে ঊর্ধ্ব থেকে। একথা স্পষ্ট যে এ অতিমানসিক, এ মনোময় পুরুষ অপেক্ষা মহত্তর পরম চিৎপুরুষের শক্তি আর আগেই সে নিজে জানে যে এই পরম চিৎপুরুষ তার সচেতন সত্তার শীর্ষে ও গূঢ় মর্মলোকে অবস্থিত। সুতরাং নিয়ন্ত্রণ ও প্রভুত্ব লাভের উপায় হল ঐ পরম চিৎপুরুষের সঙ্গে তাদাত্ম্যলাভ। সে তা নিষ্ক্রিয়ভাবে পেতে পারে তার মানসিক চেতনায় এক প্রকার প্রতিফলন ও গ্রহণের দ্বারা, কিন্তু তাহলে সে তখন হয় শুধু শক্তির এক ছাঁচ, প্রবাহপ্রণালী বা যন্ত্র, তার অধিকারী হয় না বা অংশভাক্‌ও হয় না। সে তাদাত্ম্য পেতে পারে আন্তর আধ্যাত্মিক সত্তার মধ্যে তার মানসিকতার সমাপত্তির দ্বারা, কিন্তু তখন সচেতন ক্রিয়ার অবসান হয় তাদাত্ম্যের তন্ময়তার মধ্যে। প্রকৃতির সক্রিয় ঈশ্বর হতে হলে, স্পষ্টতঃই তার কর্তব্য হবে পরতর অতিমানসিক স্থিতিতে উত্তরণ করা যেখানে নিয়ন্তা চিৎপুরুষের সঙ্গে শুধু যে নিষ্ক্রিয় তাদাত্ম্য সম্ভবপর তা নয়, সক্রিয় তাদাত্ম্যও সম্ভব। এই মহত্তর স্থিতিতে উত্তরণ করার পথ বার করা এবং আত্মশাসক, স্বরাট্‌ হওয়া — এই হল তার সিদ্ধিলাভের অন্যতম প্রয়োজনীয় শর্ত।

এই উত্তরণ যে দুরূহ তার কারণ হল এক প্রাকৃত অবিদ্যা। সে পুরুষ, মানসিক ও ভৌতিক প্রকৃতির সাক্ষী, কিন্তু আত্মা ও প্রকৃতির সম্পূর্ণ জ্ঞাতা নয়। মানসিকতায় যে জ্ঞান তা আলোকিত হয় তার চেতনার দ্বারা; সে মানসিক জ্ঞাতা; কিন্তু সে দেখে যে এ প্রকৃত জ্ঞান নয়, এ শুধু এক আংশিক অন্বেষণ ও আংশিক প্রাপ্তি, ওপারের এক মহত্তর আলোক থেকে পাওয়া এক অনিশ্চিত প্রতিফলন এবং ক্রিয়ার জন্য তার সঙ্কীর্ণ প্রয়োগ, আর এই মহত্তর আলোকই প্রকৃত জ্ঞান। এই আলোক হল পরম চিৎপুরুষের আত্মসংবিৎ ও সর্বসংবিৎ। এই যে মূল আত্মসংবিৎ, তা সে পেতে পারে এমনকি সত্তার মনোময় লোকে মনোময় পুরুষের মধ্যে প্রতিফলনের দ্বারা অথবা চিৎপুরুষের মধ্যে তার সমাপত্তির দ্বারা, যেমন বস্তুতঃ সে তা পেতে পারে প্রাণময় পুরুষের ও অন্নময় পুরুষের মধ্যে অন্য এক প্রকার প্রতিফলন বা সমাপত্তির দ্বারা। কিন্তু এই মূল আত্মসংবিৎকে এর ক্রিয়ার পুরুষ হিসেবে নিয়ে এক কার্যকরী সর্বসংবিতে অংশ গ্রহণের জন্য তার কর্তব্য হবে অতিমানসে আরোহণ। সত্তার প্রভু হতে হলে তাকে হতে হবে আত্মা ও প্রকৃতির জ্ঞাতা, "জ্ঞাতা ঈশ্বর"। মনের এক উচ্চতর স্তরে যেখানে মন সরাসরি অতিমানসে সাড়া দেয় সেখানে এর আংশিক সাধন সম্ভব হয়, কিন্তু প্রকৃতভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে এই সিদ্ধি মনোময় পুরুষের আয়ত্তাধীন নয়, এ হল আদর্শ বা বিজ্ঞানময় পুরুষের আয়ত্তাধীন। আর এই সিদ্ধিলাভের পরতম পন্থা হল মনোময় পুরুষকে এই মহত্তর বিজ্ঞানময় পুরুষে উন্নীত করা এবং তাকে উন্নীত করা চিৎপুরুষের আনন্দ-আত্মার মধ্যে, আনন্দময় পুরুষের মধ্যে।

কিন্তু বর্তমান প্রকৃতির আমূল সংশোধন বিনা এবং মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক সত্তার জটিল গ্রন্থির যা দৃঢ় বিধান ব'লে মনে হয় তার অনেক কিছু উৎপাটন না করা

হলে এই সিদ্ধি তো দূরের কথা, কোন সিদ্ধিই সম্ভব নয়। এই গ্রন্থির বিধান সৃষ্টি হয়েছে এক নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্যের জন্য, অর্থাৎ জীবন্ত দেহের মধ্যে কিছু কালের জন্য মানসিক অহং-এর ধারণ, রক্ষণ, অধিকার, বৃদ্ধি, ভোগ, অভিজ্ঞতা, প্রয়োজন, কার্যের জন্য। এর পরিণামস্বরূপ অন্য উদ্দেশ্যও পূরণ হয়, কিন্তু এই হল অব্যবহিত ও মূলতঃ নির্ধারক উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন। আরো মহৎ উপযোগিতা ও স্বচ্ছন্দ করণ ব্যবস্থা পেতে হলে এই গ্রন্থিকে কিছু ছিন্ন করা চাই, এবং তাকে ছাপিয়ে রূপান্তরিত করা চাই ক্রিয়ার বৃহত্তর সৌষম্যে। পুরুষ দেখে যে সৃষ্ট বিধান যেন আত্মার ও অনাত্মার, অর্থাৎ প্রত্যক্‌বৃত্ত সত্তার ও বহির্বিশ্বের প্রাথমিক বিশৃঙ্খল চেতনার মধ্য থেকে অভ্যস্ত অথচ বিকাশমান সব অভিজ্ঞতার এক আংশিক স্থির ও আংশিক অস্থির নির্বাচনমূলক নির্ধারণের বিধান হয়। মন, প্রাণ ও দেহ পরস্পরের উপর সক্রিয় হয়ে এই নির্ধারণ স্থির করে, তবে তাদের কাজ যেমন সামঞ্জস্য ও মিলের মধ্যে হয়, তেমন আবার বৈষম্য ও অমিল, পরস্পরের মধ্যে হস্তক্ষেপ ও সঙ্কীর্ণতার মধ্যেও হয়। আবার মনের নিজের বিবিধ ক্রিয়ার মধ্যেও ঐরূপ মিশ্রিত সামঞ্জস্য ও বৈষম্য থাকে, এবং প্রাণেরও নিজের ও অন্নময় সত্তারও বিবিধ ক্রিয়ার মধ্যে ঐ একই অবস্থা। সব কিছুই এক প্রকার বিশৃঙ্খলাপূর্ণ শৃঙ্খলা, এক সতত ঘিরে থাকা ও আগ্রাসী অব্যবস্থা থেকে বিকশিত ও উদ্ভাবিত এক ব্যবস্থা।

এই সেই দুরূহ কাজ যা পুরুষকে প্রথম মোকাবিলা করতে হয় — প্রকৃতির এক মিশ্রিত ও বিশৃঙ্খল ক্রিয়া, এমন ক্রিয়া যাতে স্বচ্ছ আত্মজ্ঞান, স্পষ্ট প্রেরণা ও সুদৃঢ় করণব্যবস্থা নেই, আছে শুধু এই সবের জন্য এক চেষ্টা এবং কার্যসাধনের এক সাধারণ আপেক্ষিক সাফল্য, — কোন কোন দিকে অভিযোজনের এক আশ্চর্যজনক ফল পাওয়া যায় কিন্তু আবার অপ্রচুরতার অনেক কষ্টও আসে। ঐ ব্যামিশ্র ও বিশৃঙ্খল ক্রিয়ার সংশোধন আবশ্যক; শুদ্ধি আত্মসিদ্ধিলাভের এক অত্যাবশ্যক উপায়। এই সকল অশুদ্ধতা ও অপ্রচুরতার পরিণাম হল অনেক প্রকার সঙ্কীর্ণতা ও বন্ধন: কিন্তু বন্ধনের প্রধান গ্রন্থি দুটি কি তিনটি — আর এদের মধ্যে অহং সর্বপ্রধান গ্রন্থি; অন্য সব গ্রন্থি এদের থেকেই উৎপন্ন। এই সব বন্ধন দূর করা চাই; যতক্ষণ না শুদ্ধির ফলে মুক্তি আসে ততক্ষণ শুদ্ধি পূর্ণ হয় না। তাছাড়া কিছু শুদ্ধি ও মুক্তি সাধিত হবার পর, তখনো যা করণীয় থাকে তা হল শুদ্ধ-করা করণগুলির এক মহত্তর উদ্দেশ্য ও উপযোগিতার বিধানে পরিবর্তন, ক্রিয়ার এক বিশাল, বাস্তব ও সুষ্ঠু শৃঙ্খলা। পরিবর্তনের দ্বারা মানুষ পেতে পারে সত্তার পূর্ণতার, শান্তি, শক্তি ও জ্ঞানের, এমনকি আরো বিশাল প্রাণিক ক্রিয়ার এবং আরো সুষ্ঠু দেহগত জীবনের এক প্রকার সিদ্ধি। এই সিদ্ধির এক ফল হল সত্তার এক বিশাল ও সৌষ্ঠবময় আনন্দ। সুতরাং যোগের চারিটি অঙ্গ হল — সত্তার "শুদ্ধি, মুক্তি, সিদ্ধি" ও আনন্দ অর্থাৎ "ভুক্তি"।

কিন্তু এই সিদ্ধি পাওয়া যায় না, অথবা দৃঢ় ও বিশালতায় সম্পূর্ণ হতে পারে না যদি পুরুষ জোর দেয় ব্যষ্টিত্বের উপর। শারীরিক, প্রাণিক ও মানসিক অহং-এর সঙ্গে একাত্মতাবোধ ত্যাগ করাই যথেষ্ট নয়; অন্তঃপুরুষের মধ্যে তার পাওয়া চাই এক

সত্যকার বিশ্বভাবাপন্ন ব্যষ্টিত্ব, বিভক্ত ব্যষ্টিত্ব নয়। অবর প্রকৃতিতে মানব এক অহং যার ধারণা হল যে সে অপর সকল ভূত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন; তার কাছে এই অহংই আত্মা, অন্য সব অনাত্মা, তার সত্তার বাইরে। নিজের সম্বন্ধে ও জগৎ সম্বন্ধে তার এই ধারণা থেকেই তার সকল ক্রিয়া শুরু হয়, এরই উপর তার সকল ক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বস্তুতঃ এই ধারণা ভুল। মানসিক ভাবনায় এবং মানসিক ও অন্যান্য প্রকারের ক্রিয়ায় সে যতই তীব্রভাবে নিজেকে ব্যষ্টিভাবাপন্ন করুক না কেন, সে বিশ্বসত্তা থেকে অবিচ্ছেদ্য, তার দেহ বিশ্বশক্তি ও জড় থেকে অবিচ্ছেদ্য, তার প্রাণ বিশ্বপ্রাণ থেকে, তার মন বিশ্বমন থেকে, তার অন্তঃপুরুষ ও চিৎপুরুষ বিশ্ব অন্তঃপুরুষ ও চিৎপুরুষ থেকে অবিচ্ছেদ্য। প্রতি মুহূর্তে বিশ্ব সত্তা তার উপর সক্রিয়, তাকে আক্রমণ করে, অভিভূত করে এবং তার মধ্যে নিজেকে ফুটিয়ে তোলে; সে-ও উল্টে বিশ্বসত্তার উপর সক্রিয়, তাকে আক্রমণ ক'রে চেষ্টা করে তার উপর নিজেকে আরোপ করতে, একে নিয়ন্ত্রণ করতে, এর আক্রমণ বিফল করতে এবং এর করণব্যবস্থাকে শাসন ও ব্যবহার করতে।

এই সংঘর্ষ এক অন্তর্লীন ঐক্যেরই পরিণাম, পূর্ব বিচ্ছিন্নতার দরুন ঐক্য এই সংঘর্ষের রূপ নেয়; মন একত্বকে যে দুটি ভাগে ভাগ করেছে তারা একত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য পরস্পরের দিকে ছুটে যায় এবং প্রত্যেকে চেষ্টা করে বিভক্ত অংশটিকে ধ'রে তার নিজের সামিল করতে। মনে হয় বিশ্ব সর্বদাই সচেষ্ট ব্যক্তিকে গ্রাস করতে, অনন্ত সচেষ্ট সান্তকে ফিরিয়ে নিতে, যদিও সান্ত চায় নিজেকে রক্ষা করতে এবং এমনকি উল্টে বিশ্বকে আক্রমণ করে। কিন্তু বস্তুতঃ এই আপতিক সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে বিশ্বসত্তা মানবের মধ্যে তার উদ্দেশ্য পূরণে কর্মরত যদিও এই উদ্দেশ্য ও প্রণালীর সত্য ও সন্ধানসূত্র বাহ্য সচেতন মনে ধরা পড়ে না, তা শুধু অস্পষ্টভাবে থাকে অন্তর্লীন অবচেতন ঐক্যে এবং শুধু দীপ্তভাবে জানা থাকে এক অধিনিয়ন্তা অতিচেতন ঐক্যে। মানবকেও ঐক্যের দিকে যেতে হয় তার অহং-এর বিস্তারের এক সতত সংবেগের প্রভাবে; অন্য যে সব অহংকে ও বিশ্বের অন্যান্য অংশকে সে তার ব্যবহারে ও অধিকারে পায় তাদের সঙ্গে এই অহং যতদূর সম্ভব নিজেকে এক মনে করে। মানুষ যেমন তার নিজের সত্তার জ্ঞান ও কর্তৃত্ব পেতে চায়, তেমন সে চায় প্রকৃতির পারিপার্শ্বিক জগতের, তার বিভিন্ন বিষয়ের, তার করণব্যবস্থার, তার প্রাণীসমূহের জ্ঞান ও কর্তৃত্ব পেতে। এই যে তার লক্ষ্য একে সে সাধন করতে চেষ্টা করে অহমাত্মক অধিকারের দ্বারা, কিন্তু যতই সে বিকশিত হয়, ততই তার মধ্যে বৃদ্ধি পায় গূঢ় একত্বজাত সমবেদনার কিছুটা, এবং তার মধ্যে জাগে অন্য সব সত্তার সঙ্গে ক্রমশঃ আরো বিশাল সহযোগিতা ও একত্বের ভাবনা, বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বসত্তার সঙ্গে এক সামঞ্জস্যের ভাবনা।

মনের মধ্যস্থ সাক্ষী পুরুষ দেখে যে তার চেষ্টার অপ্রচুরতার কারণ, — বস্তুতঃ মানবের জীবন ও প্রকৃতির সকল অপ্রচুরতার কারণ — হল বিচ্ছিন্নতা ও তার পরিণামস্বরূপ সংঘর্ষ, জ্ঞানের অভাব, সামঞ্জস্যের অভাব ও একত্বের অভাব। তার পক্ষে অত্যাবশ্যক হল বিভক্ত ব্যষ্টিত্ব ছাপিয়ে বিকশিত হওয়া, নিজেকে বিশ্বভাবাপন্ন করা,

নিজেকে বিশ্বের সঙ্গে এক করা। এই একীকরণ করার একমাত্র উপায় হল অন্তঃপুরুষের মাধ্যমে আমাদের মনের পুরুষকে এক করা বিশ্বমনের সঙ্গে, আমাদের প্রাণের পুরুষকে এক করা বিশ্ব প্রাণপুরুষের সঙ্গে, আমাদের অন্নময় পুরুষকে এক করা ভৌতিক প্রকৃতির বিশ্ব পুরুষের সঙ্গে। যখন এই কাজ সম্ভব হয়, তখন যে পরিমাণ শক্তি, তীব্রতা, গভীরতা, সম্পূর্ণতা ও স্থায়িত্বের সঙ্গে এটি করা যায় সেই পরিমাণে প্রাকৃত ক্রিয়ার উপর মহৎ ফল উৎপন্ন হয়। বিশেষতঃ, মনের সঙ্গে মনের, প্রাণের সঙ্গে প্রাণের এক অব্যবহিত ও গভীর সমবেদনা ও মিশ্রণ বিকশিত হয়, বিচ্ছিন্নতার জন্য দেহের আগ্রহ হ্রাস পায় এবং পরস্পরের মধ্যে সরাসরি মানসিক ও অন্যান্য যোগাযোগ ও সকল ক্রিয়া বৃদ্ধি পায় যার ফলে যে অপ্রচুর পরোক্ষ যোগাযোগ ও ক্রিয়া এখনো পর্যন্ত দেহবদ্ধ মন দ্বারা ব্যবহৃত সচেতন উপায়ের বৃহত্তর অংশ ছিল তার বাধা দূর হয়। কিন্তু তবু পুরুষ দেখে যে মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক প্রকৃতিকে পৃথকভাবে নিলে তাতে সর্বদাই এক ত্রুটি, অপ্রচুরতা ও বিশৃঙ্খল ক্রিয়া থাকে যার কারণ হল বিশ্বপ্রকৃতির যান্ত্রিকভাবে অসমান পারস্পরিক ক্রিয়া। একে অতিক্রম করতে হলে তার কর্তব্য হবে বিশ্বভাবের মধ্যেও অতিমানসিক ও আধ্যাত্মিক লোকে উত্তরণ করা, বিশ্বের অতিমানসিক পুরুষের সঙ্গে, বিরাট পুরুষের সঙ্গে এক হওয়া। নিজের ও বিশ্বের মধ্যে এক পরতর তত্ত্বের বৃহত্তর আলোক ও শৃঙ্খলায় সে উপনীত হয় আর এই তত্ত্বটি দিব্য সচ্চিদানন্দের বিশিষ্ট ক্রিয়া। এমনকি সে ঐ আলোক ও শৃঙ্খলার প্রভাব আরোপ করতে সমর্থ হয় শুধু যে নিজের প্রাকৃত সত্তার উপর তা নয়, সে যে জগতের মধ্যে বাস করে তার উপর, যা তার চারিদিকে আছে তার উপরও এই প্রভাব আসে তবে তা হয় তার মধ্যে পরম চিৎপুরুষের ক্রিয়ার ক্ষেত্র এবং বিস্তারের মধ্যে। সে "স্বরাট্", আত্মজ্ঞাতা, আত্মশাসক কিন্তু এই আধ্যাত্মিক একত্ব ও অতিস্থিতির মাধ্যমে সে আরো হতে শুরু করে "সম্রাট্", তার সত্তার ঘিরে-থাকা জগতের জ্ঞাতা ও অধীশ্বর।

এই আত্মবিকাশের মধ্যে পুরুষ দেখে যে সে এই পদ্ধতিতে অখণ্ড পূর্ণযোগের উদ্দেশ্য সাধন করেছে — নিজের আত্মায় এবং বিশ্বভাবাপন্ন ব্যষ্টিত্বে পরতমের সঙ্গে মিলন। যতদিন সে প্রপঞ্চের মধ্যে থাকে ততদিন এই সিদ্ধি তার থেকে বাইরে বিকিরিত হতে বাধ্য — কারণ বিশ্ব এবং এর সব সত্তার সঙ্গে তার একত্বের রীতি হল এই; এই বিকিরণের ফলে তার চারিদিকে এমন এক প্রভাব ও ক্রিয়া আসবে যা থেকে যারা ঐ একই সিদ্ধিতে উঠতে বা তার দিকে অগ্রসর হতে সমর্থ তারা সাহায্য পায়, আর বাকী সবের জন্য ঐ প্রভাব ও ক্রিয়ার যা সাহায্য তা হবে — আর স্বরাট্ ও সম্রাট্ই শুধু ঐরকম সাহায্যদানে সক্ষম — মানবজাতিকে এই সিদ্ধির দিকে এবং তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে এক মহত্তর দিব্য সত্যের কোন প্রতিমূর্তির দিকে আধ্যাত্মিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। যে সত্যে সে কষ্ট করে আরোহণ করেছে তার এক আলোক ও শক্তি সে হয়ে ওঠে, আর হয়ে ওঠে অপরের উত্তরণের এক সাধন।

পঞ্চম অধ্যায়

চিৎপুরুষের বিভিন্ন করণ

আমাদের সত্তার সক্রিয় সিদ্ধি পেতে হলে প্রথম আবশ্যক হল এ এখন যেসব করণগুলিকে বেসুর সঙ্গীতের জন্য ব্যবহার করে সেগুলির কর্মপ্রণালীকে শুদ্ধ করা। সত্তার নিজের, মানবের মধ্যে চিৎপুরুষের, দিব্য সদ্‌বস্তুর কোন শুদ্ধির প্রয়োজন নেই; এ হল চিরশুদ্ধ, এর করণব্যবস্থার বিভিন্ন দোষ অথবা কর্মে মন, হৃদয় ও দেহের স্খলন একে স্পর্শ করে না, যেমন, উপনিষদের কথায়, চোখের দোষ সূর্যকে স্পর্শ বা কলুষিত করে না। মন, হৃদয়, প্রাণিক কামনার পুরুষ, দেহমধ্যস্থ প্রাণ — এরাই অশুদ্ধির আশ্রয়স্থল; যদি চিৎপুরুষের ক্রিয়াধারাকে সুষ্ঠু ক্রিয়াধারা হতে হয় তাহলে এই সবকেই শুদ্ধ করা প্রয়োজন, এখন যেমন এরা অপরা প্রকৃতির ভ্রান্ত সুখকে অল্পবিস্তর সুবিধা দিতে ব্যস্ত, তেমন হওয়া চলবে না। সাধারণতঃ যাকে সত্তার শুদ্ধতা বলা হয় তা, — হয় এক নেতিবাচক শুভ্রতা, যেসব ক্রিয়া, বেদনা, ভাবনা বা সঙ্কল্পকে আমরা অনুচিত মনে করি সেগুলিকে সতত দমন ক'রে পাপ থেকে অব্যাহতি পাওয়া, না হয় এ এক শ্রেষ্ঠ নেতিবাচক বা নিষ্ক্রিয় শুদ্ধতা, সম্পূর্ণ ভগবৎ-ভাব, নৈষ্কর্ম্য, অস্থির মনের ও কামনার পুরুষের সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা যার ফলে নিবৃত্তিমার্গে পাওয়া যায় এক পরমাশান্তি; কারণ তখন চিৎপুরুষ আবির্ভূত হয় তার অপাপবিদ্ধ স্বরূপের সকল শাশ্বত শুদ্ধতায়। তা পাওয়া গেলে, তখন আর অন্য কিছু ভোগ বা সাধন করার থাকে না। কিন্তু এই যোগে আমাদের কাজ আরো দুরূহ; এ হল সত্তার পরিপূর্ণ আনন্দের উপর, অন্তঃপুরুষের করণগত এবং চিৎপুরুষের স্বরূপগত প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত এক সামগ্রিক, অক্ষীয়মাণ, এমনকি আরো বেশী ও আরো শক্তিশালী ক্রিয়া। মন, হৃদয়, প্রাণ, দেহ — এদের ভগবানের কাজ করা চাই, যে সব কাজ এখন তারা করে সে সবই এবং আরো বেশী, তবে তা করা চাই দিব্যভাবে, এখন যা তারা করে না। যে ব্রত সাধনে সিদ্ধি প্রয়াসীকে নিযুক্ত হতে হবে তার প্রথম কথা এই যে তার উদ্দেশ্য কোন নেতিবাচক, নিষেধার্থক নিষ্ক্রিয় বা নিবৃত্তিমূলক শুদ্ধতা নয়, এ হল এক ইতিবাচক, সদর্থক সক্রিয় শুদ্ধতা। এক দিব্য উপশমে পাওয়া যায় পরম চিৎপুরুষের অপাপবিদ্ধ নিত্যতা, এক দিব্য সক্রিয়তায় এর সঙ্গে আরো বেশী পাওয়া যায় — অন্তঃপুরুষের, মনের ও দেহের সঠিক শুদ্ধ অবিচলিত ক্রিয়া।

তাছাড়া, পূর্ণসিদ্ধি চায় আমরা যেন প্রতি করণের সকল অংশের সমস্ত জটিল করণ ব্যাপারকে সমগ্রভাবে শুদ্ধ করি। শেষ পর্যন্ত এটি যে নীতিসম্মত আরো সঙ্কীর্ণ নৈতিক শুদ্ধতা হবে তা নয়। নীতির কারবার আমাদের সত্তার কামপুরুষ ও সক্রিয় বাহ্যস্ফুরন্ত অংশ নিয়ে; এর ক্ষেত্রের পরিসর চরিত্র ও ক্রিয়ার মধ্যেই সীমিত। এ হল কতকগুলি

বিশেষ ক্রিয়া, বিশেষ কামনা, সংবেগ, কুপ্রবৃত্তি নিষেধ ও দমন করে, আর কর্মের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ গুণ নিবিষ্ট করে যেমন সত্যবাদিতা, প্রেম, দাক্ষিণ্য, করুণা, ব্রহ্মচর্য। তা করা হলে এবং সদাচারের এক ভিত্তি এবং এক শুদ্ধ সঙ্কল্প ও ক্রিয়ার নির্দোষ অভ্যাস সুনিশ্চিত হলে, তার কাজ শেষ হয়। কিন্তু পূর্ণ সিদ্ধির সিদ্ধ ব্রতীকে বাস করতে হয় ভালো ও মন্দের অতীত পরম চিৎপুরুষের শাশ্বত শুদ্ধতার বৃহত্তর লোকে। এই কথার এই অর্থ নয় যে সে কোন কিছু গ্রাহ্য না ক'রে ভালো মন্দ ক'রে যাবে আর বলবে যে চিৎপুরুষের কাছে এই সবের কোন পার্থক্য নেই; অবশ্য দ্রুতসিদ্ধান্তকারী অবিবেচক বুদ্ধি সেরকমই ভাবতে চাইবে, কিন্তু ব্যষ্টি ক্রিয়ার ক্ষেত্রে এ স্পষ্টতঃই অসত্য হবে এবং তাতে অপূর্ণ মানব প্রকৃতির উদ্দাম আত্মপরায়ণতা ঢাকা দেবার এক যুক্তি পাওয়া যেতে পারে। এই কথার এই অর্থও নয় যে যেহেতু সুখদুঃখের মতো ভালো ও মন্দও এই জগতে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত — অবশ্য বর্তমানে এই উক্তিটি যতই সত্য হ'ক না কেন এবং সর্বজনপ্রযোজ্য নীতি হিসেবে যতই যুক্তিযুক্ত মনে হ'ক না কেন মানবীয় সত্তার আধ্যাত্মিক বিকাশ সম্বন্ধে এটি যে সত্য হবে তা নয়, — মোক্ষপ্রাপ্ত পুরুষ চিৎপুরুষের মধ্যে বাস ক'রে এক অপরিহার্য অপূর্ণ প্রকৃতির যান্ত্রিক সতত কর্মপ্রণালী থেকে সরে দাঁড়াবে। সকল সক্রিয়তার অন্তিম নিবৃত্তির পথে এক পর্যায় হিসেবে এ যতই সম্ভব হ'ক না কেন, সক্রিয় সিদ্ধির পক্ষে এই উপদেশ আদর্শ নয়। বরং এর অর্থ এই যে সক্রিয় পূর্ণ সিদ্ধির সিদ্ধ ব্রতী স্ফুরন্তভাবে বাস করবে দিব্য চিৎপুরুষের বিশ্বাতীত শক্তির কর্মধারার মধ্যে আর তা করবে ক্রিয়ার জন্য তার মধ্যে ব্যষ্টিভাবাপন্ন অতিমানসের মাধ্যমে এক বিশ্বজনীন সঙ্কল্প হিসেবে। সুতরাং তার সব কর্ম হবে শাশ্বত জ্ঞানের, শাশ্বত সত্যের, শাশ্বত শক্তির, শাশ্বত প্রেমের, শাশ্বত আনন্দের কর্ম; কিন্তু সে যে কর্মই করুক না কেন তার সমগ্র মূল আন্তর ভাব হবে ঐ সত্য, জ্ঞান, শক্তি, প্রেম, আনন্দ, এইসব যে কর্মের রূপের উপর নির্ভর করবে তা নয়; বরং এরাই তার কর্ম নির্ধারণ করবে ভিতরের আন্তর ভাব থেকে, তার কর্ম আন্তর ভাবকে নির্ধারণ করবে না অথবা একে কর্মধারার কোন নির্দিষ্ট মানের বা কঠিন ছাঁচের অনুগত করবে না। তার যে চরিত্রের এক প্রবল অভ্যাসমাত্র থাকবে তা নয়, বরং তার থাকবে শুধু এক আধ্যাত্মিক সত্তা ও সঙ্কল্প, আর তার সঙ্গে বড় জোর ক্রিয়ার জন্য স্বভাবের এক স্বচ্ছন্দ ও নমনীয় ছাঁচ। তার জীবন হবে সনাতন উৎস-প্রস্রবণ থেকে এক সরাসরি প্রবাহ, কোন সাময়িক মানবীয় প্রতিমূর্তিতে গড়া কোন রূপ নয়। তার সিদ্ধি সাত্ত্বিক শুদ্ধতা হবে না, এ হবে প্রকৃতির গুণত্রয়ের ঊর্ধ্বে উন্নীত এক বিষয়, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের, আধ্যাত্মিক শক্তির, আধ্যাত্মিক আনন্দের, ঐক্যের ও ঐক্যের সুষমার সিদ্ধি; তার সব কাজের বাহ্য সিদ্ধি স্বচ্ছন্দভাবে গড়া হবে এই আন্তর আধ্যাত্মিক অতিস্থিতি ও বিশ্বভাবের আত্মপ্রকাশ হিসেবে। এই পরিবর্তনের জন্য তার কর্তব্য হবে, চিৎপুরুষ ও অতিমানসের যে শক্তি এখন আমাদের মানসিকতার কাছে অতিচেতন তাকে নিজের মধ্যে সচেতন করা। কিন্তু ওটি তার নিকট কাজ করতে অক্ষম যতক্ষণ না তার বর্তমান মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক সত্তা তার বাস্তব অবর

কর্মধারা থেকে মুক্ত হয়। এই শুদ্ধিই প্রথম আবশ্যক।

অর্থাৎ, শুদ্ধি বলতে যে কতকগুলি বিশেষ বাহ্য প্রবৃত্তিমূলক ক্রিয়াকলাপ, তাদের নিয়ন্ত্রণ, অন্য ক্রিয়ার দমন অথবা চরিত্রের কতকগুলি বিশেষ রূপের বা কতকগুলি বিশেষ মানসিক ও নৈতিক সামর্থ্যের বিকাশ বোঝাবে — তা নয়, এই সীমিত অর্থে তাকে নেওয়া চলবে না। এই সব হল আমাদের ব্যুৎপন্ন সত্তার গৌণ চিহ্ন, এরা স্বরূপগত সামর্থ্য ও প্রাথমিক শক্তি নয়। আমাদের প্রকৃতির বিভিন্ন প্রাথমিক শক্তি সম্বন্ধে আরো ব্যাপক মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টি আমাদের পাওয়া চাই। আমাদের কর্তব্য হবে আমাদের সত্তার বিভিন্ন গঠিত অংশ কোন্‌গুলি তা স্পষ্টভাবে জানা, তাদের অশুদ্ধতা ও অনুচিত ক্রিয়ার মূল দোষ কোন্‌টি তার সন্ধান পেয়ে তা সংশোধন করা; তখন বাকী সব যে স্বভাবতঃই শুদ্ধ হবে তা নিশ্চিত। অশুদ্ধতার বাহ্য লক্ষণগুলির চিকিৎসা করলে চলবে না অথবা তা করা চলে শুধু গৌণভাবে, সামান্য সহায়ক সাধন হিসেবে, দরকার হলে, আরো গভীরে গিয়ে রোগনির্ণয় করার পর, মূলে ঘা দিতে হবে। তখন আমরা দেখি যে সব নষ্টের মূল হল দুই প্রকারের অশুদ্ধতা। একটি হল আমাদের অতীত বিবর্তনের প্রকৃতিজাত দোষ, যার স্বরূপ হল ভেদকারী অজ্ঞান; এই দোষ হল, — আমাদের করণগত সত্তার প্রতি অংশের উচিত ক্রিয়াকে যে মৌলিক অনুচিত ও অজ্ঞানতাময় রূপ দেওয়া হয় তা-ই। অপর অশুদ্ধতার সৃষ্টি হয় বিবর্তনের ক্রমিক ধারা থেকে; এই বিবর্তনে প্রাণ দেহের মধ্যে উদ্ভূত হয়েছে ও তার উপর নির্ভরশীল, মন উদ্ভূত হয় দেহমধ্যস্থ প্রাণে এবং এর উপর নির্ভরশীল, অতিমানস উদ্ভূত হয় মনে এবং তাকে শাসন না ক'রে নিজেই তার কাজ করে, স্বয়ং অন্তঃপুরুষকে মনে হয় যেন এ হল মনোময় সত্তার দেহগত জীবনের শুধু এক অবস্থা এবং এই অন্তঃপুরুষ চিৎপুরুষকে আচ্ছাদিত করে রাখে তার সব অবর অপূর্ণতার মধ্যে। আমাদের প্রকৃতির এই দ্বিতীয় দোষের কারণ হল নিম্নতর সব অংশের উপর উচ্চতর সব অংশের নির্ভরতা; এ হল ক্রিয়াব্যাপারের এক মিশ্রণ যার দ্বারা নিম্ন করণের অশুদ্ধ ক্রিয়াধারা উচ্চতর ক্রিয়াব্যাপারের বিশিষ্ট কর্মের মধ্যে প্রবেশ ক'রে বিমূঢ়তা, ভ্রান্ত নির্দেশ ও বিভ্রম এনে তার অপূর্ণতা বাড়িয়ে তোলে।

অতএব, প্রাণের, প্রাণিক শক্তির যথার্থ কাজ হল ভোগ ও অধিকার। এ দুটিই সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত, কারণ পরম চিৎপুরুষ জগৎ সৃষ্টি করেছেন আনন্দের জন্য, পরম একের দ্বারা বহুর ভোগ ও অধিকার, বহুর দ্বারা পরম একের ভোগ ও অধিকার, আবার বহুর দ্বারা বহুরও ভোগ ও অধিকার; কিন্তু দোষ এই যে, — আর এ প্রথম প্রকার দোষের এক উদাহরণ — ভেদকারী অজ্ঞান একে বিকৃত করে কামনা ও আকাঙ্ক্ষার অনুচিত রূপে যার ফলে সমগ্র ভোগ ও অধিকার কলুষিত হয় এবং তার উপর আরোপিত হয় এর বিপরীত, — অভাব ও কষ্টভোগ। আবার যেহেতু মন প্রাণ থেকে বিকশিত হয়ে তাতে জড়িত থাকে, সেহেতু এই কামনা ও আকাঙ্ক্ষা মানসিক সঙ্কল্প ও জ্ঞানের ক্রিয়ার মধ্যে প্রবেশ করে; তার ফলে সঙ্কল্প হয়ে ওঠে আকাঙ্ক্ষার সঙ্কল্প ও কামনার এক শক্তি, এ যে যুক্তিসম্মত সঙ্কল্প ও বুদ্ধিসম্মত কার্যকারিতার বিবেচক শক্তি

হবে তা নয়, এ বিচার ও যুক্তিবুদ্ধিকে বিকৃত করে যার ফলে আমরা বিচার করি ও যুক্তি দিই আমাদের সব কামনা ও পূর্ব ধারণা অনুসারে, শুদ্ধ বিচারশক্তির নিঃস্বার্থ নিরপেক্ষতা অথবা যে যুক্তিবুদ্ধি শুধু সত্যকে স্পষ্ট করে জানতে চায় এবং এর ক্রিয়ার সর্ব বিষয়কে সঠিক ভাবে বুঝতে চায় তার ন্যায়পরতা আমাদের বিচার ও যুক্তিতে থাকে না। এ হল মিশ্রণের এক উদাহরণ। এই দুই রকমের দোষ — ক্রিয়ার অনুচিত রূপ ও ক্রিয়ার অসঙ্গত মিশ্রণ — এরা এই দুই বিশিষ্ট উদাহরণের ক্ষেত্রেই সীমিত নয়, এ দোষ প্রত্যেক করণেরই এবং তাদের বিভিন্ন ব্যাপ্রিয়ার প্রতি সমবায়েরই। এরা আমাদের প্রকৃতির সমগ্র গঠন ব্যেপে আছে। এরা আমাদের অপরা করণগত প্রকৃতির মৌলিক দোষ, আর যদি আমরা এদের শুদ্ধ করতে পারি, আমরা আমাদের করণগত সত্তাকে নিয়ে যাব শুদ্ধতার অবস্থায়, আর ভোগ করব শুদ্ধ সঙ্কল্পের স্বচ্ছতা, ভাবাবেগের শুদ্ধ হৃদয়, আমাদের জীবনীশক্তির শুদ্ধ আস্বাদন, শুদ্ধ দেহ। তা হবে এক প্রাথমিক মানবিক সিদ্ধি কিন্তু একে ভিত্তি করা যায় আর এর আত্মপ্রাপ্তির সাধনায় এ বিকশিত হতে পারে মহত্তর দিব্য সিদ্ধিতে।

আমাদের অপরা প্রকৃতির তিন শক্তি হল মন, প্রাণ ও দেহ। কিন্তু এদের সম্পূর্ণ পৃথকভাবে নেওয়া সম্ভব নয়, কারণ প্রাণ কাজ করে সংযোজক হিসেবে এবং নিজের স্বভাব দেয় প্রাণকে এবং অনেক পরিমাণে আমাদের মানসিকতাকেও। আমাদের দেহ এক প্রাণবন্ত দেহ; প্রাণশক্তি এর সকল ব্যাপ্রিয়ায় মিশে সেসব নির্ধারণ করে। আমাদের মনও প্রধানতঃ প্রাণের মন, শারীরিক ইন্দ্রিয়সংবিতের মন; কেবলমাত্র এর উচ্চতর ক্রিয়াধারায় এ স্বাভাবিকভাবে প্রাণের অধীন শারীর মানসিকতার ঊর্ধ্বে কিছু করতে সক্ষম হয়। আমরা এই বিষয়টি স্থাপন করতে পারি এই ক্রমোচ্চ পর্যায়ে। প্রথম, আমাদের থাকে এক দেহ যাকে ধরে আছে স্থূল (শরীরগত) প্রাণশক্তি, স্থূল (শরীরগত) প্রাণ যা সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আমাদের দৈহিক ক্রিয়ায় এর ছাপ দেয় যাতে সবই হয় এক প্রাণবন্ত দেহের বিশিষ্ট ক্রিয়া, কোন জড়ময় যান্ত্রিক দেহের ক্রিয়া হয় না। প্রাণ ও শরীর-জড়ত্ব দুই মিলে গঠিত হয় স্থূল শরীর। এ হল শুধু বাহ্য করণ; প্রাণের স্নায়বিক শক্তি কাজ করে দেহের রূপের মধ্যে ও তার বিভিন্ন স্থূল শারীরিক ইন্দ্রিয়ের মধ্যে। তারপর আছে অন্তঃকরণ অর্থাৎ সচেতন মানসিকতা। প্রাচীন দর্শনে এই অন্তঃকরণকে ভাগ করা হ'ত চারি শক্তিতে; — "চিত্ত" অর্থাৎ ভিত্তিমূলক মানসিক চেতনা; "মনস্" অর্থাৎ ইন্দ্রিয় মানস; "বুদ্ধি"; "অহঙ্কার" অর্থাৎ অহং-ভাবনা। এই শ্রেণীবিভাগ নিয়েই শুরু করা যেতে পারে, তবে আরো ব্যবহারিক সুবিধার জন্য আরো কিছু ভাগ করা দরকার। এই মানসিকতাকে ব্যেপে আছে প্রাণশক্তি যা এখানে হয়ে ওঠে প্রাণের সূক্ষ্ম চেতনার জন্য এবং প্রাণের উপর সূক্ষ্ম ক্রিয়ার জন্য এক যন্ত্র। ইন্দ্রিয়মানসের ও ভিত্তিমূলক চেতনার প্রতি তন্ত্রী এই সূক্ষ্ম প্রাণের ক্রিয়ায় পরিব্যাপ্ত। এমনকি বুদ্ধি ও অহংও এর বশীভূত যদিও তাদের সামর্থ্য আছে মনকে এই প্রাণিক, স্নায়বিক ও শারীরিক মনোবিদ্যার অধীনতা ছাড়িয়ে উপরে তুলতে। এদের সমবায়ে আমাদের মধ্যে

সৃষ্টি হয় ইন্দ্রিয়-সংবিৎসম্পন্ন কামপুরুষ যা উচ্চতর মানবীয় সিদ্ধির এবং আরো মহত্তর দিব্য সিদ্ধির প্রধান অন্তরায়। সর্বশেষ, আমাদের বর্তমান সচেতন মানসিকতার উর্ধ্বে আছে এক গূঢ় অতিমানস আর এই হল ঐ সিদ্ধির উপযুক্ত সাধন ও স্বধাম।

চিত্তের অর্থাৎ ভিত্তিমূলক চেতনার অধিকাংশই অবচেতন; এর প্রকট ও প্রচ্ছন্ন সব ক্রিয়া দুই প্রকারের, একটি হল নিষ্ক্রিয় বা গ্রহিষ্ণু, অপরটি সক্রিয় অথবা প্রতি-সক্রিয় ও গঠনমূলক। নিষ্ক্রিয় শক্তি হিসেবে এ সকল স্পর্শ গ্রহণ করে এমনকি সে সবগুলিও গ্রহণ করে যার কথা মন জানে না বা যেসবে সে অমনোযোগী থাকে আর সে সবকে এ জমা রাখে নিষ্ক্রিয় অবচেতন স্মৃতির বিশাল ভাণ্ডারে যা থেকে মন সক্রিয় স্মৃতি হিসেবে কিছু কিছু বাইরে আনতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ মন শুধু সেই সব বার করে যা সে সেই সময় দেখেছে ও বুঝেছে, — যেগুলি সে ভালভাবে দেখেছে ও সযত্নে বুঝেছে সেইগুলি সে আরো সহজে বার করে, আর যেগুলি সে হেলা করে দেখেছে অথবা ভালো বোঝেনি সেগুলি সে বার করে কষ্ট ক'রে; সেই সঙ্গে চেতনায় এমন এক সামর্থ্য আছে যার দ্বারা মন যা আদৌ পর্যবেক্ষণ করেনি অথবা যাতে আদৌ মনোযোগ দেয়নি, অথবা এমনকি সচেতনভাবে যা অনুভব করেনি সেসবও পাঠান যায় সক্রিয় মনে। এই সামর্থ্যের কাজ দেখা যায় শুধু অস্বাভাবিক অবস্থায় যখন অবচেতন চিত্তের কিছু অংশ যেন উপরতলায় আসে অথবা যখন আমাদের মধ্যস্থ অধিচেতন সত্তা আবির্ভূত হয় দ্বারপ্রান্তে ও কিছু সময়ের জন্য কিছু কাজ করে মানসিকতার বহিঃপ্রকোষ্ঠে যেখানে বহির্জগতের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক ও লেনদেন চলে এবং উপরতলায় ফুটে ওঠে আমাদের নিজেদের সঙ্গে আমাদের আন্তর কারবার। স্মৃতির এই কাজ সমগ্র মানসিক ক্রিয়ার কাছে এতই মৌলিক যে কখনও কখনও বলা হয়, স্মৃতিই মানুষ। দেহ ও প্রাণের যে অবমানসিক ক্রিয়া এই অবচেতন চিত্তের দ্বারা পূর্ণ, এমনকি তাতেও এক প্রাণিক ও শারীরিক স্মৃতি থাকে যদিও ঐ ক্রিয়া সচেতন মনের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। প্রাণের ও শরীরের অভ্যাসসমূহের অধিকাংশই গঠিত হয় এই অবমানসিক স্মৃতির দ্বারা। এই জন্যই এদের সচেতন মন ও সঙ্কল্পের আরো শক্তিশালী ক্রিয়ার দ্বারা অনির্দিষ্ট পরিমাণে পরিবর্তন করা সম্ভব হয়, তবে তা করা যায় যখন ঐ শক্তিকে বিকশিত করা যায় এবং এ প্রাণিক ও শারীরিক ক্রিয়ার নতুন বিধানের জন্য চিৎপুরুষের সঙ্কল্পকে অবচেতন চিত্তের কাছে জানাবার উপায় খুঁজে পায়। এমনকি আমাদের প্রাণ ও দেহের সমগ্র গঠনকেই বর্ণনা করা যায় এমন কতকগুলি অভ্যাসের সমষ্টি হিসেবে যেগুলি অতীত বিবর্তনের দ্বারা গঠিত হয়েছে এবং একত্র ধরা আছে এই গূঢ় চেতনার দৃঢ় স্মৃতির দ্বারা। কেননা, প্রাণ ও দেহের মতো চেতনার মৌলিক উপাদান এই চিত্তও প্রকৃতির মধ্যে বিশ্বময় তবে জড়প্রকৃতিতে অবচেতন ও যান্ত্রিক।

কিন্তু বস্তুতঃ মনের বা অন্তঃকরণের সকল ক্রিয়ার উদয় হয় এই চিত্তের অর্থাৎ ভিত্তিমূলক চেতনার মধ্য থেকে যা আমাদের সক্রিয় মানসিকতার কাছে আংশিকভাবে সচেতন এবং আংশিকভাবে অবচেতন অথবা অধিচেতন। বহির্জগতের অভিঘাতে অথবা

প্রত্যক্‌বৃত্ত আন্তর সত্তার প্রতিবর্তী ক্রিয়ার প্রেরণায় এর থেকে নির্গত হয় কতকগুলি অভ্যাসগত ক্রিয়া যাদের গড়ন নির্ধারিত হয়েছে আমাদের বিবর্তনের দ্বারা। এই ক্রিয়ার একটি রূপ হল ভাবমানস, তবে সুবিধার জন্য আমরা একে সংক্ষেপে বলতে পারি হৃদয়। আমাদের সব ভাবাবেগ হল প্রতিক্রিয়া ও প্রত্যুত্তরের বিভিন্ন তরঙ্গ, "চিত্তবৃত্তি", যা সব উদিত হয় ভিত্তিমূলক চেতনা থেকে। তাদের ক্রিয়াও অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত হয় অভ্যাসের এবং ভাবমূলক স্মৃতির দ্বারা। কিন্তু এই সব চিত্তবৃত্তি যে আসতে বাধ্য তা নয়, এরা কোন অপরিবর্তনীয় বিধানের অন্তর্গত নয়; আমাদের ভাবময় সত্তার এমন কোন প্রকৃতই অবশ্যপালনীয় বিধান নেই যার নিকট আমরা মাথা পাততে বাধ্য ও যার কোন প্রতিকার নেই; মনের উপর বিশেষ কতকগুলি অভিঘাতে দুঃখের সাড়া, অন্য কতকগুলিতে ক্রোধের সাড়া, অন্য কিছুতে ঘৃণা বা অপছন্দের সাড়া, অপর কিছুতে পছন্দ বা ভালোবাসার সাড়া — এইভাবে যে আমাদের সাড়া দিতেই হবে তা নয়। এই সবই হল আমাদের ভাবময় মানসিকতার অভ্যাস মাত্র, চিৎপুরুষের সচেতন সঙ্কল্পের দ্বারা এই সবের পরিবর্তন সম্ভব; এইগুলিকে নিরোধ করা যায়; এমনকি আমরা শোক, ক্রোধ, ঘৃণা, পছন্দ অপছন্দর দ্বন্দ্বের সব বশ্যতা থেকে সম্পূর্ণ উর্ধ্বে উঠতে সক্ষম। যতদিন আমরা ভাবমূলক মানসিকতার মধ্যে চিত্তের যান্ত্রিক ক্রিয়ার অধীন থাকতে চাই, শুধু ততদিনই আমরা এই সবের অধীন থাকি, কিন্তু অতীত অভ্যাসের শক্তির দরুন, এবং বিশেষতঃ মানসিকতার প্রাণিক অংশের, স্নায়বিক প্রাণ-মানসের, অথবা সূক্ষ্ম প্রাণের দুরাগ্রহের জন্য সেসব থেকে অব্যাহতি পাওয়া দুষ্কর। চিত্তের প্রতিক্রিয়া রূপে ভাবমূলক মনের এই যে প্রকৃতি তা স্নায়বিক প্রাণসংবিৎ এবং চৈত্যগত প্রাণের সাড়ার উপর একধরনের ঘনিষ্ঠভাবে নির্ভরশীল — তা এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে কোন কোন ভাষায় একে বলা হয় চিত্ত ও প্রাণ, হৃদয়, প্রাণময় পুরুষ; বস্তুতঃ এ কামপুরুষের সেই সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষভাবে বিক্ষোভজনক ও জোরালো দুরাগ্রহী ক্রিয়া যা প্রাণিক কামনা ও প্রত্যুত্তরশীল চেতনার মিশ্রণ সৃষ্টি করেছে আমাদের মধ্যে। কিন্তু তবু আমাদের মধ্যস্থ সত্যকার ভাবমূলক অন্তঃপুরুষ যে প্রকৃত চৈত্যসত্তা, তা কামপুরুষ নয়, এ হল শুদ্ধ প্রেম ও আনন্দের অন্তঃপুরুষ; কিন্তু আমাদের প্রকৃত সত্তার বাকী অংশের মতো এই চৈত্যসত্তার আবির্ভাব সম্ভব হয় কেবল তখনই যখন কামনার প্রাণের দ্বারা সৃষ্ট বিকৃতিকে উপর থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং এ আর আমাদের সত্তার বিশিষ্ট ক্রিয়া থাকে না। এই কার্যসাধন আমাদের শুদ্ধি, মুক্তি ও সিদ্ধির এক অত্যাবশ্যক অঙ্গ।

সূক্ষ্ম প্রাণের স্নায়বিক ক্রিয়া সবচেয়ে স্পষ্টভাবে জানা যায় আমাদের সেই মানসিকতায় যা কেবল ইন্দ্রিয়সংবিতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বস্তুতঃ, এই স্নায়বিক মানসিকতা আমাদের অন্তঃকরণের সকল ক্রিয়ার অনুবর্তী এবং প্রায়শঃই মনে হয় যেন ইন্দ্রিয়সংবিৎ ছাড়া, এই হল বিষয়সমূহের অধিকাংশ। বিশেষ করে, বিভিন্ন ভাবাবেগ তার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে প্রাণিক ছাপ ধারণ করে; এমনকি ভয় ভাবাবেগ অপেক্ষা স্নায়বিক ইন্দ্রিয়সংবিৎই বেশী, ক্রোধ প্রায়শঃই অথবা অনেকাংশেই এক ইন্দ্রিয়সংবিৎমূলক

প্রত্যুত্তর যা পরিণত হয়েছে ভাবাবেগের রূপে। অন্যান্য বেদনা হৃদয়েরই বেশী অন্তর্গত, আরো অন্তর্মুখী, কিন্তু এরাও সূক্ষ্ম প্রাণের সব স্নায়বিক ও শারীরিক আকাঙ্ক্ষার অথবা সব বহির্মুখী সংবেগের সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে যুক্ত হয়ে পড়ে। প্রেম হল হৃদয়ের ভাবাবেগ, শুদ্ধ বেদনা (feeling) হওয়া এর পক্ষে সম্ভব — আমরা দেহবদ্ধ মন হওয়ায় সকল মানসিকতা আমাদের প্রাণের উপর কোন একপ্রকার প্রভাব এবং আমাদের দেহের উপাদানের উপর কিছু প্রতিক্রিয়া আনতে বাধ্য, এমনকি ভাবনাও তা আনে, কিন্তু সেজন্য যে তাদের শারীরিক প্রকৃতির হতেই হবে তার অর্থ নেই — কিন্তু হৃদয়ের প্রেম সহজেই যুক্ত হয় দেহমধ্যস্থ প্রাণিক কামনার সঙ্গে। এই যে শারীরিক কামনা যাকে কাম বলা হয় তার বশ্যতা থেকে এই শারীরিক অংশটিকে শুদ্ধ করা সম্ভব, এ এমন প্রেম হতে পারে যা দেহকে ব্যবহার করে যেমন শারীরিক সামীপ্যের জন্য, তেমন আবার মানসিক ও আধ্যাত্মিক সামীপ্যের জন্যও; কিন্তু প্রেম আবার এই সব থেকে নিজেকে পৃথক করতে সক্ষম, এমনকি সবচেয়ে নির্দোষ শারীরিক অংশ থেকেও অথবা এর ছায়া ছাড়া অন্য সব থেকে পৃথক করতে সক্ষম এবং এইভাবে হতে সক্ষম অন্তঃপুরুষের সঙ্গে অন্তঃপুরুষের, চৈত্যসত্তার সঙ্গে চৈত্যসত্তার মিলনের উদ্দেশে এক শুদ্ধ বেগ। তথাপি, ইন্দ্রিয়সংবিৎমূলক মনের ন্যায়সঙ্গত ক্রিয়া ভাবাবেগ নয়, এ হল সচেতন স্নায়বিক প্রত্যুত্তর ও স্নায়বিক বেদনা ও বিক্রিয়া, কোন কর্মের জন্য শারীরিক ইন্দ্রিয় ও দেহের ব্যবহারের সংবেগ, সচেতন প্রাণিক লালসা ও কামনা। একটা দিক হল গ্রহিষ্ণু প্রত্যুত্তরের, অন্য দিক হল স্ফুরন্ত প্রতিক্রিয়ার। এইসব বিষয়ের যে ন্যায়সঙ্গত স্বাভাবিক ক্রিয়া তা আসে যখন উত্তর মানস যন্ত্রের মতো তাদের অধীন না হয়ে বরং তাদের ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠুভাবে চালনা করে। কিন্তু এ অপেক্ষা আরো উচ্চতর অবস্থা হল যখন তারা চিৎপুরুষের সঙ্কল্পের দ্বারা এক প্রকার রূপান্তর লাভ করে, কারণ এই চিৎপুরুষ চৈত্যপ্রাণকে দেয় তার বিশিষ্ট ক্রিয়ার উচিত রূপ, এর অনুচিত বা কামনাময় রূপ আর দেয় না।

আমাদের সাধারণ চেতনায় মনঃ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়মানস জ্ঞানের জন্য নির্ভর করে বিভিন্ন স্থূল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপর এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়াভিমুখী কর্মের জন্য নির্ভর করে দেহের বিভিন্ন কর্মেন্দ্রিয়ের উপর। ইন্দ্রিয়সমূহের বাহ্য ও বহির্মুখী ক্রিয়ার প্রকৃতি হল শারীরিক ও স্নায়বিক, আর সহজেই মনে হতে পারে যে তারা শুধু স্নায়ু-ক্রিয়ার ফল; প্রাচীন গ্রন্থে তাদের কখনও কখনও বলা হয় "প্রাণঃ", স্নায়বিক বা প্রাণের ক্রিয়া। কিন্তু তবু তাদের মধ্যে যা মূল বিষয় তা স্নায়বিক উত্তেজনা নয়, বরং এ হল চেতনা, চিত্তের ক্রিয়া যা ইন্দ্রিয়কে এবং এই ইন্দ্রিয় যার প্রণালী সেই স্নায়বিক অভিঘাতকে ব্যবহার করে। মনঃ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়মানস হল সেই কার্যব্যাপার যা ভিত্তিমূলক চেতনা থেকে উদ্ভূত হয়ে আমরা যাকে ইন্দ্রিয় (বোধ) বলি তার সমগ্র সারতত্ত্ব গঠন করে। দৃষ্টি, শ্রবণ, আস্বাদন, ঘ্রাণ, স্পর্শ — এই সব বাস্তবিকই মনের ধর্মবিশেষ, দেহের নয়; কিন্তু আমরা যে স্থূল মনের ব্যবহার করি তার শুধু কাজ হ'ল স্নায়ুমণ্ডলীর ও বিভিন্ন শারীরিক

ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এ বাহ্য অভিঘাতের যে পরিমাণ গ্রহণ করে সেইটুকুকে ইন্দ্রিয়বোধে রূপান্তরিত করা, তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু আন্তর মানসেরও নিজের সূক্ষ্ম দৃষ্টি, শ্রবণ, সংযোগের সামর্থ্য আছে যা স্থূল ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে না। আর উপরন্তু তার এমন সামর্থ্য আছে যাতে মন বিষয়ের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে যার ফলে এমনকি এ ক্রিয়ার উচ্চ পর্যায়ে ভৌতিক সীমার মধ্যে বা বাইরে বিষয়ের অন্তর্নিহিত সব কিছুরও বোধ পায়; কিন্তু শুধু এই সামর্থ্যই নয়, তার আরো যা সামর্থ্য আছে তা হল মনের সঙ্গে মনের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের। তাছাড়া মন বিভিন্ন ইন্দ্রিয় অভিঘাতের আপতন, মূল্য, তীব্রতা পরিবর্তিত, নিয়ন্ত্রিত ও নিরুদ্ধ করতেও সমর্থ। মনের এই সব সামর্থ্যগুলি আমরা সাধারণতঃ ব্যবহার করি না বা বিকশিত করি না; এরা অধিচেতন রয়ে যায় এবং কখন কখন প্রকাশ পায় অনিয়মিত ও চপলভাবে আর তা কতক মনে সহজেই হয়, অন্যত্র তত সহজে হয় না অথবা এরা উপরে আসে সত্তার সব অস্বাভাবিক অবস্থায়। এরাই অতীন্দ্রিয় দর্শন, অতীন্দ্রিয় শ্রবণ, ভাবনা ও সংবেগের স্থানান্তরীকরণ, অপরের মনের মধ্যে নিজের মনোভাব সংক্রমণ — প্রভৃতি অধিকাংশ অতি সাধারণ গুহ্য শক্তির ভিত্তি; এদের গুহ্য শক্তি বলা হয় যদিও তাদের আরো ভালো ও কম রহস্যময় পরিচয় হল যে তারা মনের বর্তমান অধিচেতন ক্রিয়ার শক্তি। এই অধিচেতন ইন্দ্রিয় মানসের ক্রিয়ারই উপর নির্ভর করে সম্মোহন এবং অন্যান্য অনেক এরকম বিষয়; তবে এই সব বিষয়ের সবখানিই যে শুধু এই অধিচেতন ইন্দ্রিয়মানসের ক্রিয়া তা নয়, তবে এই হল পারস্পরিক সম্বন্ধ, যোগাযোগ, ও প্রত্যুত্তরের ভিত্তিস্বরূপ প্রথম উপায়, যদিও বাস্তব ক্রিয়ার অনেকখানিই আন্তর বুদ্ধির অন্তর্গত। ভৌতিক মন, অতিভৌতিক মন — এই দুই ইন্দ্রিয়পর মানসিকতাই আমাদের আছে এবং আমরা তা ব্যবহার করতেও সক্ষম।

বুদ্ধি হল সচেতন সত্তার এমন রচনা যা ভিত্তিমূলক চেতনায় তার আদিরূপকে অনেক ছাড়িয়ে যায়; এ হল জ্ঞান ও সঙ্কল্পের শক্তিযুক্ত বুদ্ধি। মন ও প্রাণ ও দেহের বাকী সব ক্রিয়াকেই বুদ্ধি নেয় ও ব্যবহার করে। স্বরূপতঃ এ পরম চিৎপুরুষের ভাবনাশক্তি ও সঙ্কল্পশক্তি যা এক প্রকার নিম্ন মানসিক সক্রিয়তায় পরিণত হয়েছে। এই বুদ্ধির ক্রিয়াকে আমরা তিনটি পর পর পর্যায়ে ভাগ করতে পারি। প্রথম হল এক অবর বোধাত্মক বুদ্ধি যার কাজ হল ইন্দ্রিয়মানস, স্মৃতি, হৃদয় ও ইন্দ্রিয়সংবিৎমূলক মানসিকতার বার্তাগুলিকে শুধু নেওয়া, লিপিবদ্ধ করা, বোঝা ও সে সবে উত্তর দেওয়া। এই সবের সাহায্যে এ এক প্রাথমিক চিন্তাশীল মন সৃষ্টি করে; এই মন তাদের তথ্যগুলির বাইরে যায় না, বরং নিজেকেই তাদের ছাঁচে ফেলে তাদের পুনরাবৃত্তি বন্ধ করে, তাদের দ্বারা সূচিত মনন ও সঙ্কল্পের অভ্যস্ত গণ্ডির মধ্যে অনবরত ঘুরতে থাকে অথবা প্রাণের মন্ত্রণাতে যুক্তিবুদ্ধির অনুগত বশ্যতা স্বীকার ক'রে তার বোধ ও ধারণাতে যা সব নতুন নির্ধারণ আসে সে সবের অনুবর্তী হয়। এই যে প্রাথমিক বুদ্ধি যা আমরা সকলেই প্রভূত পরিমাণে ব্যবহার করি, এর উজানে আছে বুদ্ধির অন্তর্গত সঙ্কল্পশক্তির ও সেই

যুক্তিবুদ্ধির সামর্থ্য যা বিন্যাস বা নির্বাচন করে; এর ক্রিয়া ও লক্ষ্য হল জীবনের বুদ্ধিগত ধারণার ব্যবহারের জন্য জ্ঞান ও সঙ্কল্পের এক আপাত যুক্তিযুক্ত, পর্যাপ্ত ও স্থির ব্যবস্থালাভের চেষ্টা।

চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যে এ আরো শুদ্ধ মননশীলতা হলেও এই গৌণ বা মধ্যবর্তী যুক্তিবুদ্ধি উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে আসলে প্রয়োগকুশল। এ এক প্রকার বুদ্ধিগত গঠন, ছাঁচ, বিধি সৃষ্টি করে যার মধ্যে এ আন্তর ও বাহ্য জীবনকে ফেলতে চেষ্টা করে যাতে এ কোন প্রকার যুক্তিসম্মত সঙ্কল্পের উদ্দেশ্যের জন্য তাকে ব্যবহার করতে পারে কিছু কর্তৃত্ব ও শাসনের সঙ্গে। এই যুক্তিবুদ্ধিই আমাদের স্বাভাবিক বুদ্ধিগত সত্তাকে দেয় আমাদের নির্দিষ্ট সৌন্দর্যবিষয়ক ও নীতিবিষয়ক বিভিন্ন মান, আমাদের মতামতের গঠন ও ভাবনা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত সব আদর্শ। আদৌ যাদের বুদ্ধি বিকশিত হয়েছে এমন সব ব্যক্তিরই মধ্যে এ অত্যধিক বিকশিত এবং এর স্থান সর্বাগ্রে। কিন্তু একেও ছাড়িয়ে এক যুক্তিবুদ্ধি আছে যা বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ ক্রিয়া; এর কাজ হল নিঃস্বার্থভাবে শুদ্ধ সত্য ও সঠিক জ্ঞান অন্বেষণ করা; এর প্রয়াস হল — জীবন ও বিষয়সমূহ ও আমাদের আপতিক সব আত্মার পিছনে অবস্থিত আসল সত্য আবিষ্কার করা, এবং নিজের সঙ্কল্পকে সত্যের বিধানের অধীন করা। শুদ্ধতা সহকারে এই শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি ব্যবহার করতে পারে এরকম ব্যক্তি আমাদের মধ্যে অতীব বিরল; কিন্তু এর সাধনের জন্য প্রয়াস করা অন্তঃকরণের শ্রেষ্ঠ সামর্থ্য।

বস্তুতঃ বুদ্ধি এক মধ্যবর্তী শক্তি; তার একদিকে আছে এক আরো পরতর সত্য-মানস যা এখনো আমাদের সক্রিয় অধিকারে আসেনি এবং যা পরম চিৎপুরুষের সরাসরি করণ, এবং অন্যদিকে আছে দেহের মধ্যে বিকশিত মানবমনের স্থূল জীবন। এর যে বুদ্ধি ও সঙ্কল্পের বিভিন্ন শক্তি আছে সে সব নেওয়া হয় এই মহত্তর প্রত্যক্ষ সত্যমানস বা অতিমানস থেকে। বুদ্ধি তার মানসিক ক্রিয়া একত্র করে অহং-ভাবনার চারিদিকে অর্থাৎ এই ভাবনার চারিদিকে যে আমি এই মন, প্রাণ ও দেহ অথবা আমি তাদের ক্রিয়ার দ্বারা নির্ধারিত এক মনোময় সত্তা। এই অহং-ভাবনার পরিচর্যা করাই এর কাজ, — তা এই অহং-ভাবনা আমরা যাকে অহন্তা বলি তার মধ্যে সীমিত থাকুক, অথবা আমাদের চারিদিককার জীবনের সঙ্গে সমবেদনার দ্বারা প্রসারিত হ'ক। এক অহং-বোধের সৃষ্টি হয় যার আশ্রয়স্থল হল দেহের, ব্যষ্টিভাবাপন্ন প্রাণের, মনের প্রত্যুত্তরের পার্থক্যমূলক ক্রিয়া, আর বুদ্ধির মধ্যস্থ অহং-ভাবনা এই অহং-এর মননের, চরিত্রের, ব্যক্তি-ভাবনার সমগ্র ক্রিয়া কেন্দ্রীভূত করে। অবর বুদ্ধি ও মধ্যবর্তী যুক্তিবুদ্ধি হল এর অভিজ্ঞতা ও আত্মপ্রসারের জন্য কামনার যন্ত্র। কিন্তু যখন পরতম যুক্তিবুদ্ধি ও সঙ্কল্প বিকশিত হয়, তখন আমরা তার দিকে ফিরতে পারি যার অর্থ এই সব বাহ্য বিষয় বহন করে পরতর আধ্যাত্মিক চেতনার কাছে। তখন "আমি"কে দেখা যায় যে এ পরমাত্মার, পরম চিৎপুরুষের, ভগবানের, বহুত্ব বিভাবে বিশ্বাতীত, বিশ্বাত্মক ও ব্যষ্টিগত এক সন্মাত্রের মানসিক প্রতিফলন; যে চেতনার মধ্যে *এই সকল বিষয় মিলিত হয়, এক সত্তার বিভিন্ন*

বিভাব হয় এবং তাদের যথার্থ সম্বন্ধ গ্রহণ করে সেই চেতনাকে তখন অনাবৃত করা যায় এই সকল ভৌতিক ও মানসিক আচ্ছাদন থেকে। অতিমানসে সংক্রমণ হলে বুদ্ধির শক্তিগুলি নষ্ট হয় না, বরং সে সবকে রূপান্তরিত করা চাই তাদের অতিমানসিক মূল্যে। কিন্তু অতিমানস ও বুদ্ধির রূপান্তরের আলোচনা পরতরা সিদ্ধি বা দিব্য সিদ্ধির অন্তর্গত। এখন আমাদের বিবেচনা করা চাই মানবের সাধারণ সত্তার শুদ্ধীকরণ, যা হবে এরকম যেকোন রূপান্তরের উদ্যোগ পর্ব এবং মুক্তি দেবে অপরা প্রকৃতির সব বন্ধন থেকে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শুদ্ধি — অবর মানসিকতা

এই সব করণের জটিল ক্রিয়া নিয়েই আমাদের কাজ এবং এদের শুদ্ধিই আমাদের ব্রত। আর সহজতম উপায় হল এদের প্রতিটির মধ্যে যে দুই প্রকারের মৌলিক দোষ বর্তমান তাতে একাগ্র হয়ে তাদের গঠন স্পষ্টভাবে বুঝে সে সব সংশোধন করা। কিন্তু কোথায় আমরা শুরু করব — এই প্রশ্নটিরও বিবেচনা দরকার। কারণ করণগুলি পরস্পরের সঙ্গে এত বেশী জড়িত যে কোন একটি করণের সম্পূর্ণ শুদ্ধি নির্ভর করে অন্য সকল করণেরও সম্পূর্ণ শুদ্ধির উপর; আর এ হল কষ্ট, নৈরাশ্য ও বিভ্রান্তির এক বড় আকর — যেমন, আমরা ভাবছি যে বুদ্ধি শুদ্ধ হয়েছে, অথচ তখনই দেখি যে এ তখনো আক্রান্ত ও আচ্ছন্ন হচ্ছে কারণ হৃদয়ের সব ভাবাবেগ, ও সঙ্কল্প ও ইন্দ্রিয়বোধাশ্রিত মন তখনো অপরা প্রকৃতির অনেক অশুদ্ধির দ্বারা দূষিত এবং তারা আলোকিত বুদ্ধির মধ্যে আবার প্রবেশ করে আমাদের সাধ্য শুদ্ধ সত্যের প্রতিফলনে একে নিরস্ত করে। কিন্তু অপর দিকে, এই সুবিধাও আছে যে একটি গুরুত্বপূর্ণ করণ যথেষ্ট শুদ্ধ করা হলে তাকে ব্যবহার করা যায় অন্যগুলির শুদ্ধির উপায় হিসেবে, একটি পদক্ষেপ দৃঢ়ভাবে করা হলে অন্যগুলি আরো সহজ হয় ও অনেক বাধা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। তাহলে এমন কোন্ করণ আছে যা শুদ্ধ ও সিদ্ধ করা হলে তা বাকী সকলের সিদ্ধি আনে খুব সহজে ও কার্যকরীভাবে অথবা অতীব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাদের শুদ্ধিসাধনে সহায় হয়?

যেহেতু আমরা মনের মধ্যে আবৃত চিৎপুরুষ, এমন এক পুরুষ যে এখানে বিকশিত হয়েছে প্রাণবন্ত স্থূল শরীরের মধ্যে মনোময় পুরুষ রূপে, সেহেতু স্বভাবতঃই এই পরম কাম্য বিষয়টিকে খোঁজ করা চাই আমাদের মনের ভিতর, অন্তঃকরণে। আর স্পষ্টতঃই এটাই অভিপ্রেত যে মানুষ বুদ্ধির দ্বারা ও বুদ্ধির সঙ্কল্পের দ্বারা সেই সব কাজ করবে যা তার জন্য শারীরিক ও স্নায়বিক প্রকৃতির দ্বারা করা হয় না, যদিও এরকম করা হয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্ষেত্রে। যতদিন না কোন অতিমানসিক শক্তির বিকাশ হয়, ততদিন বুদ্ধিগত সঙ্কল্পই হবে আমাদের কার্যসাধনের প্রধান শক্তি এবং একে শুদ্ধ করাই আমাদের প্রথম অবশ্য কর্তব্য। একবার যদি আমাদের বুদ্ধি ও সঙ্কল্পকে সেই সব থেকে শুদ্ধ করা হয় যা তাদের সঙ্কীর্ণ করে এবং অনুচিত ক্রিয়ায় বা অনুচিত পথে চালিত করে, তাহলে তাদের সহজেই সিদ্ধ করা যায়, সত্যের সব প্রস্তাবে উত্তর দিতে সক্ষম করা যায়, আর সক্ষম করা যায় নিজেদের ও সত্তার বাকী অংশকে বুঝতে, নিজেরা কি করছে তা স্পষ্টভাবে এবং সূক্ষ্ম ও সতর্ক নির্ভুলতার সঙ্গে দেখতে এবং তা করার সঠিক পন্থা অবলম্বন করতে যেন দ্বিধা বা অধীরতাবশে কোন প্রমাদ বা স্খলনজনিত বিচ্যুতি না হয়। পরিশেষে

তাদের উত্তরকে উন্মীলিত করা যায় অতিমানসের সুষ্ঠু বিবেক, বোধি, স্মৃতি ও শ্রুতির নিকট এবং এ অগ্রসর হতে পারে এক উত্তরোত্তর দীপ্ত ও এমনকি অভ্রান্ত ক্রিয়ার দ্বারা। কিন্তু এই শুদ্ধিসাধন সম্ভব হয় না যদি না পূর্বেই অন্তঃকরণের অন্যান্য নিম্ন অংশগুলির মধ্যে তার প্রাকৃত সব বাধা অপসারিত হয়, আর যে প্রধান প্রাকৃত বাধা অন্তঃকরণের সমগ্র ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, ইন্দ্রিয়ের, মনোগত ইন্দ্রিয়সংবিতের ভাবাবেগের, স্ফুরন্ত সংবেগের, বুদ্ধির মধ্য দিয়ে সক্রিয় তা হল সূক্ষ্ম প্রাণের মিশ্রণ ও জোরালো দাবী। তাহলে এরই সঙ্গে মোকাবিলা করা দরকার, অর্থাৎ দরকার হল এর প্রবল মিশ্রণ বাদ দেওয়া, এর দাবী অস্বীকার করা এবং একেই শান্ত ও প্রস্তুত করা শুদ্ধির জন্য।

বলা হয়েছে যে প্রতি করণেরই উচিত ও সঙ্গত ক্রিয়া আছে, আবার তার উচিত ক্রিয়ার বিকৃতি অথবা ভ্রান্ত তত্ত্বও আছে। সূক্ষ্মপ্রাণের উচিত ক্রিয়া হল শুদ্ধ অধিকার ও ভোগ। মনন, সঙ্কল্প, ক্রিয়া, স্ফুরন্ত সংবেগ, ক্রিয়ার ফল, ভাবাবেগ, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়সংবিৎ ভোগ করা, আবার তাদের সাহায্যে বিষয়সমূহ, ব্যক্তি, জীবন, জগৎও ভোগ করা — এই কাজের জন্যই সূক্ষ্ম প্রাণ আমাদের এক মনোভৌতিক ভিত্তি দেয়। অস্তিত্বের এক বাস্তবিকই সুষ্ঠু ভোগ আসা সম্ভব হয় কেবল তখনই যখন আমরা যা ভোগ করি তা জগৎকে জগৎ হিসেবে বা তার জন্যই ভোগ করা নয়, বরং তা ভগবানকে ভোগ করা জগতের মধ্যে, যখন আমাদের উপভোগের আসল ও মূল পাত্র বিভিন্ন বিষয় নয়, বরং তা হয় বিষয়সমূহের মধ্যস্থ চিৎপুরুষের আনন্দ, আর বিষয়সমূহ হয় শুধু চিৎপুরুষের রূপ ও প্রতীক, আনন্দ সাগরের লহরী। কিন্তু এই আনন্দ আসতে পারে কেবল তখনই যখন আমরা আমাদের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে পাই এবং প্রতিফলিত করি নিগূঢ় আধ্যাত্মিক সত্তা, আর এর পূর্ণতা পাওয়া যায় তখনই যখন আমরা আরোহণ করি বিভিন্ন অতিমানসিক স্তরে। ইতিমধ্যে এই সব বিষয়ের এক উচিত মানবীয় ভোগ অনুমোদন করা হয় যা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত; ভারতীয় মনোবিদ্যার ভাষায় এই ভোগ হল প্রধানতঃ সাত্ত্বিক প্রকৃতির। এ হল এক প্রবুদ্ধ ভোগ আর তা করা হয় মুখ্যতঃ বোধাত্মক, সৌন্দর্যগ্রাহী ও ভাবমূলক মনের দ্বারা এবং গৌণতঃ শুধু ইন্দ্রিয়বোধাত্মক স্নায়বিক ও শারীরিক সত্তার দ্বারা; কিন্তু এই সব হবে বুদ্ধির স্পষ্ট শাসনের অধীন, সঠিক যুক্তিবুদ্ধির, সঠিক সঙ্কল্পের, প্রাণিক অভিঘাতের সঠিক গ্রহণের, সঠিক ব্যবস্থার, বিষয়সমূহের সত্য, বিধান, আদর্শ, অর্থ, সৌন্দর্য, ব্যবহারের সঠিক অনুভবের অধীন। মন এই সবের ভোগের শুদ্ধ আস্বাদন, "রস" পায় আর যা কিছু বিচলিত, বিক্ষুব্ধ ও বিকৃত তা বর্জন করে। এই স্বচ্ছ ও নির্মল রস গ্রহণের মধ্যে সূক্ষ্ম প্রাণের আনা চাই জীবনের পূর্ণ অর্থ এবং সমগ্র সত্তার দ্বারা নিবিষ্ট "ভোগ" যার অভাবে মনের দ্বারা গ্রহণ ও অধিকার, "রসগ্রহণ" যথেষ্ট পরিমাণে জমাট হবে না, এ এত ক্ষীণ হবে যে তাতে দেহধারী পুরুষের সম্পূর্ণ তৃপ্তি আসবে না। এই অবদানই সূক্ষ্ম প্রাণের বিশিষ্ট কাজ।

যে বিকৃতি ভিতরে প্রবেশ ক'রে শুদ্ধতার অন্তরায় হয় তা হল প্রাণিক লালসার এক রূপ; সূক্ষ্মপ্রাণ যে বিরাট বিকৃতি আমাদের সত্তায় আনে তা হল কামনা। আমাদের নেই

ব'লে আমরা যা অনুভব করি তা পাবার জন্য যে প্রাণিক লালসা তা-ই কামনার মূল, এই হল প্রাপ্তি ও তৃপ্তির জন্য সীমিত প্রাণের সহজ সংস্কার। এ অভাববোধ সৃষ্টি করে — প্রথম সৃষ্টি করে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কামের অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট প্রাণিক লালসা এবং পরে সৃষ্টি করে মনের সেই সব সূক্ষ্ম ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কামবৃত্তি যেগুলি আমাদের সত্তার আরো বৃহৎ ও আরো ক্ষিপ্র ও আরো ব্যাপক ক্লেশ, এই ক্ষুধা অনন্ত কারণ এ হল এক অনন্ত সত্তার ক্ষুধা, এই তৃষ্ণা শুধু সাময়িকভাবে তুষ্টির দ্বারা শান্ত হয় কিন্তু এর যা প্রকৃতি তাতে এর তৃপ্তিসাধন অসম্ভব। সূক্ষ্মপ্রাণ ইন্দ্রিয়গত মনকে আক্রমণ ক'রে তার মধ্যে নিয়ে আসে ইন্দ্রিয়সংবিতের অশান্ত তৃষ্ণা, স্ফুরন্ত মনকে আক্রমণ করে সঙ্গে নিয়ে প্রভুত্ব, প্রাপ্তি, আধিপত্য, সফলতা, প্রতি সংবেগের চরিতার্থতার কামনা, ভাবময় মনকে ভরিয়ে দেয় রুচি ও অরুচির তৃপ্তির জন্য, প্রেম ও দ্বেষের তুষ্টির জন্য কামনার দ্বারা, আনে ভয়ের জুগুপ্সা ও সন্ত্রাস, আশার প্রয়াস ও নৈরাশ্য, আরোপ করে শোকের যাতনা এবং হর্ষের ক্ষণিক উষ্ণতা ও উত্তেজনা, বুদ্ধি ও বুদ্ধিগত সঙ্কল্পকে করে এই সব দুষ্কর্মের সহায়ক এবং তাদের নিজ নিজ রকমে পরিণত করে বিকৃত ও পঙ্গু করণে, সঙ্কল্পকে পরিণত করে লালসার সঙ্কল্পে, বুদ্ধিকে পরিণত করে সীমিত, অসহিষ্ণু, উগ্র পূর্বসিদ্ধান্ত ও মতের এক আংশিক, স্খলনশীল ও উৎসুক অনুবর্তীরূপে। সকল দুঃখ, নিরাশা, ক্লেশের মূল হল কামনা, কারণ যদিও এতে অন্বেষণ ও তৃপ্তির এক উত্তেজনাময় হর্ষ থাকে, তবু এ সর্বদাই সত্তার এক প্রয়াস হওয়ায়, এর অন্বেষণ ও প্রাপ্তির মধ্যে থাকে পরিশ্রম, সংঘর্ষ, দ্রুত ক্লান্তি, সঙ্কীর্ণতার বোধ, সকল লাভ সত্ত্বেও অতৃপ্তি ও নিরাশা, বিরামহীন অস্বাভাবিক উত্তেজনা, ক্লেশ, অশান্তি। কামনা থেকে মুক্ত হওয়াই সূক্ষ্ম প্রাণের একমাত্র দৃঢ় ও অপরিহার্য শুদ্ধি — কারণ এই ভাবেই আমরা কামনার পুরুষকে ও আমাদের সকল করণের মধ্যে তার ব্যাপক মিশ্রণকে সরিয়ে তার স্থানে আনতে পারি শান্ত আনন্দের মনোময় পুরুষ এবং আমাদের নিজেদের ও জগতের ও প্রকৃতির উপর এর স্বচ্ছ ও বিমল অধিকার আর এই হল মানসিক জীবন ও তার সিদ্ধির স্ফটিকতুল্য শুদ্ধ ভিত্তি।

সকল উচ্চতর ক্রিয়াতেই সূক্ষ্ম প্রাণ অযথা প্রবেশ করে তাদের বিকৃত করার উদ্দেশ্যে, কিন্তু এর ত্রুটির কারণ এই যে জড় থেকে প্রাণের উদ্‌বর্তনের সময় প্রাণ দেহের মধ্যে যে ভৌতিক ক্রিয়া বিকশিত করেছে তার প্রকৃতি ঐ সূক্ষ্মপ্রাণে অযথা প্রবেশ ক'রে তাকেই বিকৃত করে। এটিই দেহস্থ ব্যষ্টিপ্রাণকে পৃথক করেছে বিশ্বস্থ প্রাণ থেকে এবং একে অভাব, সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যা তার নেই তার জন্য আকাঙ্ক্ষা, ভোগের পিছনে দীর্ঘ ও অন্ধ অন্বেষণ, এবং প্রাপ্তির বিঘ্নিত ও বিফল প্রয়োজনীয়তা, এইসব দোষে দূষিত করেছে। বিষয়সমূহের যে স্তর শুধু ভৌতিক, তাতে এ সহজেই নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত থাকে, কিন্তু সূক্ষ্ম প্রাণের মধ্যে এ নিজেকে বিস্তৃত করে বিপুলভাবে এবং যেমন মন বৃদ্ধি পায় তেমন এ হয়ে ওঠে এক দুর্দমনীয়, অতপণীয়, অনিয়মিত এবং পীড়া ও ব্যাধি সৃষ্টিতে তৎপর। তাছাড়া, সূক্ষ্মপ্রাণ নির্ভর করে স্থূল প্রাণের উপর, অন্নময় সত্তার স্নায়বিক শক্তির দ্বারা নিজেকে সীমিত করে এবং তার দ্বারা মনের ক্রিয়াকেও

সীমিত করে এবং মন যে দেহের উপর নির্ভরশীল এবং ক্লান্তি, অসামর্থ্য, ব্যাধি, পীড়া, উন্মত্ততা, ক্ষুদ্রতা, অনিশ্চয়তার অধীন এবং এমনকি স্থূল মানসিকতার ক্রিয়ার সম্ভবপর লয়েরও অধীন — সেই নির্ভরতা ও অধীনতার যোগসূত্র হয় ঐ সূক্ষ্মপ্রাণ। আমাদের মন এমন বিষয় নয় যা নিজের ক্ষমতায় শক্তিশালী, চিন্ময় চিৎপুরুষের স্বচ্ছ যন্ত্র, স্বাধীন এবং প্রাণ ও দেহের নিয়ন্ত্রণ, ব্যবহার ও পূর্ণতাসাধনে সমর্থ, এর পরিবর্তে এ পরিণামে দেখা দেয় এক মিশ্রিত গঠনরূপে; এ প্রধানতঃ এক স্থূল মানসিকতা যা তার সব স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সীমিত এবং দেহের মধ্যে প্রাণের বিভিন্ন দাবী ও প্রতিবন্ধের অধীন। এই অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাবার একমাত্র উপায় হল বিশ্লেষণের এক প্রকার ব্যবহারিক অন্তর্মুখী মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া যার দ্বারা আমরা মানসিকতাকে জানতে পারি এক পৃথক শক্তি ব'লে, একে আলাদা করি স্বচ্ছন্দ কার্যের জন্য, সূক্ষ্ম ও স্থূল প্রাণকেও স্পষ্টভাবে জানি এবং তাদের আর অধীনতার জন্য যোগসূত্র করি না, বরং তাদের করি বুদ্ধিস্থ পরম ভাবনা ও সঙ্কল্পের এক সঞ্চালন-প্রণালী যা বুদ্ধির মন্ত্রণা ও আদেশের অনুগত; তখন প্রাণ হয়ে ওঠে এমন এক নিষ্ক্রিয় উপায় যার সাহায্যে স্থূল জীবনের উপর মনের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ সাধিত হয়। আমাদের ক্রিয়ার অভ্যস্ত স্থিতির পক্ষে এই নিয়ন্ত্রণ যতই অস্বাভাবিক হ'ক না কেন, এ যে শুধু সম্ভব তা নয় — আর একে কিছু পরিমাণে দেখা যায় সম্মোহনের ব্যাপারে যদিও এই সব বিষয় অস্বাস্থ্যকর ও অস্বাভাবিক কারণ এই সবে মন্ত্রণা ও আদেশ দেয় বাইরের এক সঙ্কল্প — তবে এটি স্বাভাবিক ক্রিয়া হতে বাধ্য যখন অন্তঃস্থ পরতর আত্মা সমগ্র সত্তাকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করার ভার নেয়। কিন্তু তবু এই নিয়ন্ত্রণসাধন সম্পূর্ণ সুষ্ঠু হতে পারে একমাত্র অতিমানসিক স্তর থেকে, কারণ এখানেই সত্যকার কার্যকরী পরম ভাবনা ও সঙ্কল্পের বাস অথচ মানসিক ভাবনা-মানস — এমনকি তা আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন হলেও — শুধু এক সীমিত প্রতিনিধি, যদিও একে অতীব শক্তিশালী করা সম্ভব।

মনে করা হয় যে কামনা মানবীয় জীবনযাত্রার আসল প্রবর্তক শক্তি এবং একে বর্জন করার অর্থ জীবনের সব প্রস্রবণ রুদ্ধ করা, কামনার তৃপ্তিসাধনই মানুষের একমাত্র ভোগ এবং একে বাদ দেওয়ার ফল হবে নিবৃত্তিমূলক বৈরাগ্যের দ্বারা জীবনের সংবেগ নির্বাপিত করা। কিন্তু অন্তঃপুরুষের জীবনের আসল প্রবর্তক শক্তি হল সঙ্কল্প; কামনা হল প্রবল দেহগত প্রাণে ও স্থূল মনে সঙ্কল্পের এক বিকৃতিমাত্র। জগৎকে অধিকার ও ভোগ করার দিকে অন্তঃপুরুষের যে আকর্ষণ তা স্বরূপতঃ আনন্দলাভের জন্য সঙ্কল্প; আর আকাঙ্ক্ষাতৃপ্তির ভোগ হল আনন্দলাভের জন্য সঙ্কল্পের শুধু এক প্রাণিক ও শারীরিক হীন রূপ। বিশুদ্ধ সঙ্কল্প ও কামনার মধ্যে, আনন্দলাভের জন্য আন্তর সঙ্কল্প এবং মন ও দেহের বাহ্য কাম ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে প্রভেদ জানা আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক। যদি আমরা আমাদের সত্তার অভিজ্ঞতার মধ্যে ব্যবহারিকভাবে এই পার্থক্য করতে সমর্থ না হই, তাহলে আমাদের শুধু বেছে নিতে হবে — হয় জীবননাশা বৈরাগ্য, নয় জীবনযাপনের স্থূল সঙ্কল্প; আর না হয় চেষ্টা করতে পারি এই দুয়ের মধ্যে এক উদ্ভট

অনিশ্চিত ও অস্থির আপোস। বস্তুতঃ বেশীরভাগ লোকই তা-ই করে; অতি অল্পসংখ্যকই জীবন-প্রবৃত্তি পদদলিত ক'রে প্রয়াসী হয় বৈরাগ্যের পথে সিদ্ধি লাভের জন্য; বেশীরভাগই জীবনযাপনের স্থূল সঙ্কল্পের অনুবর্তী হয় তবে সেইসব নিয়ন্ত্রণ ও সংযম পালন করে যা সমাজ আরোপ করে অথবা সাধারণ সামাজিক মানব নিজের মন ও ক্রিয়ার উপর আরোপ করতে শিক্ষা পায়; অন্যেরা নৈতিক কৃচ্ছ্রতা এবং কামনাময় মানসিক ও প্রাণিক আত্মার পরিমিত তৃপ্তির মধ্যে ভারসাম্য আনে এবং এই ভারসাম্যের মধ্যেই তারা দেখে বিবেচক মন ও সুস্থ মানবজীবন যাপনের এক স্বর্ণমণ্ডিত মধ্যম পথ। কিন্তু এই সব পথের কোনটিতেই আমাদের প্রার্থিত সিদ্ধি অর্থাৎ জীবনে ভগবৎ-শাসন লাভ করা যায় না। প্রাণকে, প্রাণময় সত্তাকে পুরোপুরি পদদলিত করার অর্থ জীবনের সেই শক্তি বিনষ্ট করা যার দ্বারা মানবীয় সত্তার মাঝে দেহবদ্ধ অন্তঃপুরুষের বিশাল কাজ ধারণ করা চাই; জীবনযাপনের জন্য স্থূল সঙ্কল্পে প্রশ্রয় দেওয়ার অর্থ অপূর্ণতাতে তুষ্ট থাকা; এদের মধ্যে আপোস করার অর্থ, মাঝপথে থেমে থাকা যাতে না পৃথিবী, না স্বর্গ — কোনটাই পাওয়া যায় না। কিন্তু যদি আমরা কামনার দ্বারা বিকৃত নয় এমন বিশুদ্ধ সঙ্কল্প পাই — আমরা দেখব যে এই সঙ্কল্প কামনার লম্ফমান, ধূমক্লিষ্ট, দ্রুত-ক্লান্ত ও পর্যুদস্ত শিখা অপেক্ষা অনেক বেশী স্বচ্ছন্দ, শান্ত, স্থির ও কার্যকরী শক্তি — এবং যদি আমরা পাই আকাঙ্ক্ষার কোন উদ্বেগের দ্বারা ক্লিষ্ট বা সীমিত নয় এমন আনন্দের প্রশান্ত আন্তর সঙ্কল্প, তাহলে আমরা তখন প্রাণকে রূপান্তরিত করতে পারি যেন এ মনের এক উৎপীড়ক, শত্রু ও আক্রমণকারী না থেকে হয়ে ওঠে এক অনুগত যন্ত্র। যদি আমরা চাই তাহলে এই সব মহত্তর বিষয়কেও আমরা কামনা নামে অভিহিত করতে পারি, কিন্তু তাহলে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে প্রাণিক আকাঙ্ক্ষা ছাড়া এক দিব্য কামনা, এক ভগবৎ কামনা আছে, আর ঐ অন্য যে অবর কামনা তা হল এই ভগবৎ কামনার অস্পষ্ট ছায়া কিন্তু এই ভগবৎ কামনাতেই ঐ অবর কামনাকে রূপান্তরিত হতে হবে। তার চেয়ে বরং এই যে দুটি জিনিস স্বভাবে ও আন্তর ক্রিয়ায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন তাদের জন্য দুটি পৃথক নাম রাখাই শ্রেয়ঃ।

তাহলে শুদ্ধির কাজে প্রথম পদক্ষেপ হল প্রাণকে কামনা মুক্ত করা এবং প্রসঙ্গক্রমে আমাদের প্রকৃতির সাধারণ স্থিতিকে উল্টে দেওয়া এবং যে প্রাণময় সত্তা এক কষ্টকর প্রবল শক্তি তাকে পরিবর্তিত করা স্বাধীন ও অনাসক্ত মনের অনুগত যন্ত্রে। সূক্ষ্ম প্রাণের এই বিকৃতি যেমন সংশোধিত হতে থাকে, অন্তঃকরণের সব মধ্যবর্তী অংশের বাকিগুলিরও শুদ্ধি সুগম হয় এবং ঐ সংশোধন সম্পূর্ণ হলে তাদের শুদ্ধিকেও সহজেই একান্ত করা যায়। এই সব মধ্যবর্তী অংশ হল ভাবময় মন, গ্রহিষ্ণু ইন্দ্রিয়বোধাশ্রিত মন এবং সক্রিয় ইন্দ্রিয়বোধাশ্রিত মন অর্থাৎ স্ফুরন্ত সংবেগের মন। অত্যন্ত জটিল পারস্পরিক ক্রিয়ার মধ্যে তারা সব একত্র আবদ্ধ থাকে। ভাবময় মনের বিকৃতি নির্ভর করে পছন্দ ও অপছন্দের, "রাগ-দ্বেষের", ভাবময় আকর্ষণ ও বিকর্ষণের উপর। এই সব আকর্ষণ ও বিকর্ষণে বিভিন্ন ভাবাবেগের ও ইন্দ্রিয়সংবিতের মধ্যকার কামপুরুষ যেসব

অভ্যস্ত সাড়া দেয় তা থেকেই উৎপন্ন হয় আমাদের বিভিন্ন ভাবাবেগের সকল জটিলতা এবং অন্তঃপুরুষের উপর তাদের উৎপীড়ন। প্রেম ও ঘৃণা, আশা ও ভয়, শোক ও হর্ষ — এসবেরই স্রোতধারা থাকে এই এক উৎসে। আমাদের সত্তার প্রথম অভ্যাস, আর না হয় গঠিত (ও প্রায়শঃই বিকৃত) অভ্যাস, অর্থাৎ আমাদের সত্তার দ্বিতীয় অভ্যাস যা কিছুকে মনের কাছে প্রিয় (প্রিয়ম্) ব'লে উপস্থিত করে আমরা তাকেই পছন্দ করি, ভালবাসি, বরণ করি, তা পেতেই আমাদের আশা, তাতেই আমাদের আনন্দ; আর যেগুলি এ আমাদের কাছে অপ্রিয় (অপ্রিয়ম্) ব'লে উপস্থিত করে তা-ই আমরা ঘৃণা বা অপছন্দ করি, তাতেই আমাদের ভয় বা বিতৃষ্ণা বা দুঃখ হয়। ভাবময় প্রকৃতির এই অভ্যাস বুদ্ধিগত সঙ্কল্পের পথে প্রবেশ ক'রে প্রায়ই একে ক'রে তোলে ভাবময় সত্তার এক অসহায় দাস, আর না হয় অন্ততঃ প্রকৃতির উপর স্বাধীন বিচার ও শাসন আনতে নিবারণ করে। এই বিকৃতির সংশোধন আবশ্যক। সূক্ষ্ম প্রাণের মধ্যে কামনাকে ও ভাবময় মনে এর প্রবেশকে বিদায় দিলে, এই সংশোধন সুগম হয়। কারণ তখন হৃদয়ের দৃঢ় বন্ধন যে আসক্তি তা হৃদয়তন্ত্রী থেকে খসে পড়ে; রাগদ্বেষের অনৈচ্ছিক অভ্যাস তখনো রয়ে যায়, কিন্তু আসক্তির দ্বারা তা দৃঢ় না থাকার দরুন, সঙ্কল্প ও বুদ্ধির দ্বারা এর মোকাবিলা করা আরো সহজ হয়। চঞ্চল হৃদয়কে জয় করা সম্ভব হয় আর এ আকর্ষণ ও বিকর্ষণের অভ্যাস মুক্ত হতে পারে।

কিন্তু কামনার মতো এক্ষেত্রেও ভাবা যেতে পারে যে এটি করা হলে এর অর্থ হবে ভাবময় সত্তার মৃত্যু। এ নিশ্চয়ই তা-ই হবে যদি বিকৃতি বাদ দেওয়া হয়, আর তার স্থানে ভাবময় মনের সঠিক ক্রিয়া আনা না হয়; তখন মন চলে যাবে শূন্য উদাসীনতার শমিত অবস্থায়, অথবা শান্তিময় নিরপেক্ষতার জ্যোতির্ময় অবস্থায় যাতে ভাবাবেগের কোন কম্পন বা তরঙ্গ নেই। প্রথম অবস্থাটি কোন প্রকারেই কাম্য নয়; পরেরটি নিবৃত্তিমূলক সাধনপন্থার সিদ্ধি হতে পারে, কিন্তু যে পূর্ণ সিদ্ধিতে প্রেম বর্জন করা হয় না অথবা আনন্দের নানাবিধ ক্রীড়া পরিহার করা হয় না তাতে এই অবস্থা হতে পারে শুধু এমন এক পর্যায় যাকে অতিক্রম করা চাই, কিন্তু তার বেশী নয় অর্থাৎ এমন এক প্রাথমিক নিষ্ক্রিয়তা যা স্বীকার করা হয় সঠিক সক্রিয়তার প্রথম ভিত্তি হিসেবে। আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, পছন্দ ও অপছন্দ — এই সব সাধারণ মানুষের জন্য এক প্রয়োজনীয় কৌশল, তার চারিদিকে জগতের সহস্র প্রীতিকর ও ভয়ঙ্কর, উপকারী ও বিপজ্জনক অভিঘাতের মধ্য থেকে স্বাভাবিক ও সহজবৃত্তিমূলক নির্বাচন করার এক প্রথম তত্ত্ব এই সব। কার্যের এই উপাদান নিয়েই বুদ্ধি শুরু করে এবং স্বাভাবিক ও সহজবৃত্তিমূলক নির্বাচনকে সংশোধন করতে চেষ্টা করে আরো বিবেচনাপূর্ণ, যুক্তিগত ও স্বেচ্ছাকৃত নির্বাচন দ্বারা; কারণ স্পষ্টতঃই যা প্রিয় তা-ই যে সর্বদাই উচিত বস্তু, বাঞ্ছনীয় ও বরণীয় বিষয় তা নয়, আবার যা অপ্রিয় তা-ই যে সর্বদাই অনুচিত বস্তু, ত্যাজ্য ও বর্জনীয় বিষয় তা-ও নয়; "প্রেয়ঃ" ও "শ্রেয়ঃ" — এই দুয়ের প্রভেদ বোঝা চাই, আর নির্বাচন করা চাই যথার্থ যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা, ভাবাবেগের খেয়াল দ্বারা নয়। কিন্তু যুক্তিবুদ্ধির কাজ আরো অনেক

বেশী ভাল হতে পারে যদি ভাবাবেগের মন্ত্রণা সরিয়ে নেওয়া হয় আর হৃদয় বিশ্রাম নেয় জ্যোতির্ময় নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে। তখন আবার হৃদয়ের যথার্থ সক্রিয়তাকে উপরতলায় আনা সম্ভব হয়; কারণ তখন আমরা দেখতে পাই যে এই ভাবাবেগ-তাড়িত কামনাময় পুরুষের পশ্চাতে সকল সময়ই প্রতীক্ষা করছিল প্রেম ও বিমল হর্ষ ও আনন্দের অন্তঃপুরুষ, এক শুদ্ধ চৈত্যসত্তা যা আচ্ছাদিত ছিল ক্রোধ, ভয়, ঘৃণা, বিকর্ষণের সব মলিন বিকৃতির দ্বারা এবং নিরপেক্ষ প্রেম ও হর্ষ দিয়ে জগৎ-আলিঙ্গনে অক্ষম ছিল। কিন্তু শুদ্ধ হৃদয় ক্রোধমুক্ত, ভয়মুক্ত, ঘৃণামুক্ত, সকল জুগুপ্সা ও বিকর্ষণমুক্ত: এ বিশ্বজনীন প্রেমময়, ভগবান জগতের মধ্যে একে যে বিবিধ আনন্দ দেন তা এ গ্রহণ করতে পারে অক্ষুব্ধ মাধুর্য ও স্বচ্ছতা সমেত। কিন্তু এ প্রেম ও আনন্দের শ্লথ দাস নয়; এ কামনা করে না, বিভিন্ন ক্রিয়ার অধীশ্বররূপে নিজেকে আরোপ করার চেষ্টা করে না। ক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যে নির্বাচন পদ্ধতি তা প্রধানতঃ ছেড়ে দেওয়া হয় বুদ্ধির কাছে এবং যখন বুদ্ধি অতিক্রম করা হয় তখন একে ছেড়ে দেওয়া হয় অতিমানসিক সঙ্কল্প, জ্ঞান ও আনন্দের মধ্যস্থিত চিৎপুরুষের নিকট।

গ্রহিষ্ণু ইন্দ্রিয়বোধাশ্রিত মন হল বিভিন্ন আঘাতের স্নায়বিক মানসিক ভিত্তি; এ বিষয়সমূহের সব অভিঘাত গ্রহণ করে মানসিকভাবে এবং তাদের দেয় মানসিক সুখ ও দুঃখের বিভিন্ন সাড়া আর এ থেকেই ভাবগত পছন্দ ও অপছন্দর দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। হৃদয়ের সকল ভাবাবেগেরই অনুরূপ স্নায়বিক-মানসিক সহচারী থাকে, আর আমরা প্রায়ই দেখি যে যখন হৃদয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বাভিমুখী সঙ্কল্পের লেশমাত্রও থাকে না, তখনো সেখানে রয়ে যায় স্নায়বিক মনের ক্ষোভের কিছু মূল অথবা স্থূল মনে এমন এক স্মৃতি যা উত্তরোত্তর সম্পূর্ণ ভৌতিক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে যতই বুদ্ধিস্থ সঙ্কল্প একে দূরে ফেলে। সর্বশেষে এ হয়ে ওঠে বাইরে থেকে আসা এক ইঙ্গিতমাত্র যাতে মনের স্নায়বিক তন্ত্রীগুলি তখনো মাঝে মাঝে সাড়া দেয় যতক্ষণ না এক সম্পূর্ণ শুদ্ধতা তাদের মুক্ত করে আনন্দের সেই একই জ্যোতির্ময় বিশ্বভাবের মধ্যে যা শুদ্ধ হৃদয় আগেই পেয়েছে। সক্রিয় স্ফুরন্ত সংবেগাত্মক মন হল প্রতিক্রিয়ার অবর যন্ত্র বা প্রণালী; এর বিকৃতি হল অশুদ্ধ ভাবময় ও ইন্দ্রিয়বোধাশ্রিত মানসিকতার ইঙ্গিত ও প্রাণের কামনার এবং শোক, ভয়, ঘৃণা, কামনা, কাম, লালসা প্রভৃতি অশান্ত ভাবের দ্বারা প্রণোদিত ক্রিয়া সংবেগের অধীনতা স্বীকার। এর ক্রিয়ার যথার্থ রূপ হল বল, সাহস, স্বভাবগত সামর্থ্যের এমন এক শুদ্ধ স্ফুরন্ত শক্তি যা নিজের জন্য বা অবর অঙ্গসমূহের নির্দেশ অনুসারে কাজ করে না, বরং কাজ করে শুদ্ধ বুদ্ধি ও সঙ্কল্পের অথবা অতিমানসিক পুরুষের আদেশের নিরপেক্ষ প্রণালীরূপে। যখন আমরা এই সব বিকৃতি থেকে মুক্ত হয়ে মানসিকতাকে নির্মল করি ক্রিয়ার এই সব সত্যতর রূপের জন্য, তখন অবর মানসিকতা শুদ্ধ হয় এবং প্রস্তুত হয় সিদ্ধির জন্য। কিন্তু ঐ সিদ্ধি নির্ভর করে শুদ্ধ ও প্রবুদ্ধ বুদ্ধি-প্রাপ্তির উপর; কারণ বুদ্ধিই মনোময় সত্তার মধ্যস্থ প্রধান শক্তি এবং পুরুষের প্রধান মানসিক করণ।

সপ্তম অধ্যায়

শুদ্ধি — বুদ্ধি ও সঙ্কল্প

বুদ্ধিকে শুদ্ধ করতে হলে, এর যে বিশেষ জটিল গঠন তা আমাদের প্রথম বোঝা দরকার। আর প্রথমেই যে পার্থক্যটি আমাদের স্পষ্টভাবে জানা দরকার, অথচ সাধারণ কথায় যা উপেক্ষা করা হয় তা হল "মনস্" ও "বুদ্ধির" মধ্যে পার্থক্য। মনস্ হল ইন্দ্রিয়মানস। মানুষের প্রাথমিক মানসিকতাতে যুক্তিবুদ্ধি ও সঙ্কল্প আদৌ থাকে না; এ এক পশুসুলভ ভৌতিক বা ইন্দ্রিয়গত মানসিকতা, আর এর সমগ্র অভিজ্ঞতা গঠিত হয় এর উপর বাহ্য জগৎ যে সব ছাপ ফেলে তা থেকে এবং তাছাড়া এইরকম অভিজ্ঞতার বহির্মুখী উদ্দীপনায় এর যে দেহবদ্ধ চেতনা সাড়া দেয় তা-ও এর উপর যে ছাপ দেয় তা থেকে। বুদ্ধি আসে শুধু এক গৌণ শক্তি হিসেবে যা বিবর্তনে প্রথম স্থান নিলেও এখনো নির্ভরশীল তার ব্যবহৃত নিম্ন করণের উপর; নিজের সব কর্মধারার জন্য এ নির্ভর করে ইন্দ্রিয়মানসের উপর, এবং নিজের উচ্চতর স্তরে এ যা করতে পারে এ তা করে শারীরিক বা ইন্দ্রিয়পর ভিত্তি থেকে জ্ঞান ও ক্রিয়ার এক দুরূহ, শ্রমসাধ্য ও কিছু স্খলনশীল প্রসারের দ্বারা। এক অর্ধ-আলোকিত শারীরিক বা ইন্দ্রিয়গত মানসিকতাই মানবমনের সাধারণ চরিত্র।

বস্তুতঃ মনস্ হল বাহ্য চিত্ত থেকে এক বিকাশ; বাহ্যস্পর্শের দ্বারা উত্তেজিত ও উদ্বুদ্ধ চেতনার স্থূল উপাদানের এ হল এক প্রাথমিক সংগঠন। ভৌতিকভাবে আমরা যা তা হল জড়ের মধ্যে সুপ্ত এমন এক অন্তঃপুরুষ যা বহিশ্চেতনার স্থূল উপাদানের দ্বারা ব্যাপ্ত এক জীবন্ত দেহের মধ্যে আংশিক জাগ্রত অবস্থায় বিকশিত হয়েছে; আর যে বাহ্য জগতের মধ্যে আমরা আমাদের চিন্ময় সত্তাকে বিকশিত করছি তার বিভিন্ন বহির্মুখী অভিঘাতের প্রতি ঐ বহিশ্চেতনা অল্পবিস্তর সচেতন ও সমনস্ক। পশুর মধ্যে বাহ্যভাবাপন্ন চেতনার এই উপাদান নিজেকে সংহত করে বোদ্ধা ও সক্রিয় মনের এক সুনিয়ন্ত্রিত মানসিক ইন্দ্রিয়ে বা করণে। বস্তুতঃ ইন্দ্রিয় হল নিজের চারিদিককার বিষয়সমূহের সঙ্গে দেহবদ্ধ চেতনার মানসিক সংস্পর্শ। এই সংস্পর্শ সর্বদাই স্বরূপতঃ এক মানসিক ঘটনা; কিন্তু বস্তুতঃ এ প্রধানতঃ নির্ভর করে এমন সব বস্তুর ও তাদের ধর্মের সঙ্গে সংস্পর্শের কতকগুলি শারীরিক করণের বিকাশের উপর যাদের সব প্রতিরূপকে এ অভ্যাসবশে তাদের মানসিক মূল্য দিতে সমর্থ হয়। আমরা যাদের শারীরিক (স্থূল) ইন্দ্রিয় বলি তাদের দুইটি অঙ্গ — বস্তুটির ভৌতিক-স্নায়বিক ছাপ এবং একে আমরা যে মানসিক-স্নায়বিক মূল্য দিই তা এবং এই দুটি নিয়ে রচিত হয় দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শ এবং এরা বিশেষতঃ স্পর্শ যে সকল বিচিত্র রকমের ইন্দ্রিয়সংবিতের আরম্ভস্থল বা প্রথম সঞ্চালক বাহন সে সকলও রচিত হয়। কিন্তু স্থূল ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভরশীল নয় এমন সরাসরি সঞ্চালনার দ্বারাই মনস্ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-ছাপ

নিতে এবং সেসব থেকে ফল পেতে সমর্থ হয়। সৃষ্টির নিম্নস্তরে এ আরো স্পষ্ট। যদিও এই সরাসরি ইন্দ্রিয়ের জন্য মনে এই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের জন্য মহত্তর সামর্থ্য মানুষের বাস্তবিকই আছে, তবু সে স্থূল ইন্দ্রিয় ও তার সঙ্গে বুদ্ধির ক্রিয়ার উপর আত্যন্তিকভাবে নির্ভরশীল হওয়ায় ঐ সামর্থ্য নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে।

অতএব মনসের প্রথম কাজ হল ইন্দ্রিয় অনুভূতিকে সংহত করা; তাছাড়া এ দেহবদ্ধ চেতনার মাঝে সঙ্কল্পের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াগুলিকেও সংহত করে এবং দেহকে ব্যবহার করে করণরূপে অর্থাৎ সাধারণতঃ যেমন বলা হয়, কর্মেন্দ্রিয় ব্যবহার করে। এই স্বাভাবিক ক্রিয়ারও দুই অঙ্গ — ভৌতিক-স্নায়বিক সংবেগ এবং এর পশ্চাতে সহজপ্রবৃত্তিমূলক সঙ্কল্প-সংবেগের মনো-স্নায়বিক শক্তি-মূল্য। এই সব নিয়েই রচিত হয় সকল বিকাশমান প্রাণিজীবনের প্রাথমিক সব অনুভূতি ও ক্রিয়ার গ্রন্থি। কিন্তু এ ছাড়াও মনসে বা ইন্দ্রিয়মানসে থাকে ঐ সবের পরিণামস্বরূপ এক প্রাথমিক ভাবনা-উপাদান যা প্রাণিজীবনের সকল ক্রিয়ারই সাথে সাথে থাকে। ঠিক যেমন জীবন্ত দেহে চেতনার, "চিত্তের" এক প্রকার ব্যাপক ও প্রবল ক্রিয়া থাকে যা ইন্দ্রিয়মানসে পরিণত হয়, সেইরকম ইন্দ্রিয়মানসেরও মধ্যে থাকে এক প্রকার ব্যাপক ও প্রবল শক্তি যা ইন্দ্রিয়তথ্যগুলি ব্যবহার করে মানসিকভাবে, সেগুলিকে পরিণত করে প্রত্যক্ষ বোধে এবং প্রাথমিক ভাবনায়, এক অভিজ্ঞতাকে সহচরিত করে অন্য সব অভিজ্ঞতার সঙ্গে এবং কোন না কোন প্রকারে চিন্তা ও অনুভব ও সঙ্কল্প করে ইন্দ্রিয়গত ভিত্তির উপর।

এই যে ইন্দ্রিয়বোধাশ্রিত ভাবনামানস যার ভিত্তি হল ইন্দ্রিয়, স্মৃতি, সহচার, প্রাথমিক ভাবনা ও পরিণামস্বরূপ সামান্য বা গৌণ ভাবনা, তা সকল বিকশিত প্রাণিজীবনে ও মানসিকতাতেই দেখা যায়। অবশ্য মানব এত বিশালভাবে এর বিকাশ, ও প্রসার ও জটিলতা সাধন করেছে যে তা পশুর পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু তবু সে যদি এখানেই নিরস্ত হ'ত, সে শুধু আরো উঁচুদরের শক্তিশালী পশুই থেকে যেত। সে যে পশুর ক্ষেত্র ও উচ্চতা ছাড়িয়ে যায় তার কারণ এই যে সে অল্প বা বিস্তর পরিমাণে সমর্থ হয় তার ভাবনা ক্রিয়াকে বিযুক্ত ও পৃথক করতে ইন্দ্রিয় মানসিকতা থেকে, শেষোক্তটি থেকে পিছনে সরে আসতে এবং এর তথ্য দেখতে এবং উপর থেকে তার উপর কাজ করতে এক বিচ্ছিন্ন ও অংশতঃ মুক্তিপ্রাপ্ত বুদ্ধির দ্বারা। প্রাণীর বুদ্ধি ও সঙ্কল্প ইন্দ্রিয়মানসের মধ্যে সংবৃত্ত থাকে এবং সেজন্য এর দ্বারাই সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত হয় এবং তাদের নিয়ে যাওয়া হয় এর সব ইন্দ্রিয়সংবিৎ, ইন্দ্রিয়ানুভব, ও সংবেগের ধারার উপর। মানব ব্যবহার করতে পারে যুক্তিবুদ্ধি ও সঙ্কল্প, অর্থাৎ এমন এক মন যা নিজেকে দেখে, চিন্তা করে, সকল কিছু দেখে ও বুদ্ধিমানের মতো সঙ্কল্প করে এবং যা আর ইন্দ্রিয়মানসের মধ্যে সংবৃত্ত নয় বরং কাজ করে এর উপর থেকে ও পিছন থেকে এবং তা করে নিজের অধিকারেই, এক প্রকার বিচ্ছিন্নতা ও স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে। সে চিন্তনশীল এবং বুদ্ধিগত সঙ্কল্পের কিছু আপেক্ষিক স্বাধীনতা তার আছে। সে তার নিজের মধ্যে মুক্ত এবং গঠন করেছে এক পৃথক শক্তি, অর্থাৎ বুদ্ধি।

কিন্তু এই বুদ্ধি কি? যৌগিক জ্ঞানের দিক থেকে আমরা বলতে পারি যে এ

অন্তঃপুরুষের, প্রকৃতির মধ্যে আন্তর চিন্ময়সত্তার, পুরুষের সেই করণ যার দ্বারা সে তার নিজের ও তার পারিপার্শ্বিকের, উভয়েরই উপর এক প্রকার সচেতন ও সুশৃঙ্খল অধিকার লাভ করে। চিত্ত ও মনসের সকল ক্রিয়ার পশ্চাতেই এই অন্তঃপুরুষ, এই পুরুষ বিদ্যমান; কিন্তু প্রাণের নিম্ন রূপগুলিতে এ প্রায় পুরোপুরিই অবচেতন, সুপ্ত বা অর্ধজাগ্রত, প্রকৃতির যান্ত্রিক ক্রিয়ায় তন্ময়; কিন্তু যতই সে প্রাণের ক্রমপর্যায়ে উঠতে থাকে ততই সে উত্তরোত্তর জাগ্রত হয় ও আরো বেশী সম্মুখে আসে। বুদ্ধির সক্রিয়তার দ্বারা সে সম্পূর্ণ জাগরণের ধারা শুরু করে। মনের বিভিন্ন নিম্নক্রিয়ায় অন্তঃপুরুষ প্রকৃতিকে অধিকার না ক'রে বরং তারই অধীন থাকে; কারণ যে যন্ত্র তাকে সচেতন দেহবদ্ধ অভিজ্ঞতার মধ্যে এনেছে তার সম্পূর্ণ দাস সে এই সব ক্রিয়ায়। কিন্তু বুদ্ধির মধ্যে আমরা এমন কিছুর সন্ধান পাই যা তখনো প্রাকৃত করণব্যবস্থা হলেও তবু মনে হয় তার দ্বারা প্রকৃতি পুরুষকে সাহায্য ও অস্ত্রসজ্জিত করছে প্রকৃতিকে অবধারণ, অধিকার ও আয়ত্ত করতে।

কিন্তু কি অবধারণ, কি অধিকার, কি কর্তৃত্ব — কোনটিই সম্পূর্ণ নয়; এর কারণ, হয় আমাদের মধ্যে বুদ্ধি এখনো নিজেই অসম্পূর্ণ, এখনো শুধু অর্ধ-বিকশিত ও অর্ধ-গঠিত; আর না হয়, এ তার প্রকৃতিতে শুধু এক মধ্যবর্তী করণ, আর সম্পূর্ণ জ্ঞান ও কর্তৃত্ব পাবার আগে, বুদ্ধির চেয়ে মহত্তর কিছুতে আমাদের ওঠা একান্ত আবশ্যক। তবু এ হল এক গতিক্রিয়া যার দ্বারা আমরা এই জ্ঞান পাই যে আমাদের মধ্যে এমন এক শক্তি আছে যা প্রাণিজীবন থেকে মহত্তর, এমন এক সত্য আছে যা ইন্দ্রিয়মানস দ্বারা অনুভূত প্রাথমিক সব সত্য বা অবভাস অপেক্ষা মহত্তর; আর এর দ্বারা আমরা চেষ্টা করতে পারি সেই সত্যে পৌঁছবার জন্য এবং সাধনা করার জন্য যার লক্ষ্য হবে — ক্রিয়া ও নিয়ন্ত্রণের আরো অধিক ও সফল শক্তি; আমাদের নিজস্ব প্রকৃতির ও আমাদের চারিদিককার বিষয়সমূহের প্রকৃতির — এই উভয়েরই আরো কার্যকরী শাসন, এক পরতর জ্ঞান, এক পরতর সামর্থ্য, এক পরতর ও বৃহত্তর ভোগ এবং সত্তার আরো উন্নত এক স্তর। তাহলে এই প্রবৃত্তির অন্তিম উদ্দেশ্য কি? স্পষ্টতঃই, তা নিশ্চয়ই এই যে পুরুষকে পেতে হবে তার নিজের শ্রেষ্ঠ ও পূর্ণতম সত্য, অন্তঃপুরুষ বা আত্মার মহত্তম সত্য, এবং প্রকৃতির মহত্তম সত্য এবং আরো যা পেতে হবে তা হল — সত্তার এমন এক ক্রিয়া ও স্থিতি যা ঐ পরম সত্যের পরিণাম বা এর সঙ্গে অভিন্ন হবেই, এই মহত্তম জ্ঞানের শক্তি এবং যে মহত্তম সত্তা ও চেতনার দিকে এ উন্মীলিত হয় তার ভোগ। এই হল প্রকৃতির মধ্যে চিন্ময় সত্তার বিকাশের অন্তিম ধ্রুব পরিণাম।

সুতরাং আমাদের আত্মার ও পরম চিৎপুরুষের সমগ্র সত্য এবং আমাদের মুক্ত ও সম্পূর্ণ সত্তার জ্ঞান, মহত্ত্ব, আনন্দ লাভ করাই যে বুদ্ধির শুদ্ধি, মুক্তি ও সিদ্ধির উদ্দেশ্য হবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সাধারণতঃ এই মনে করা হয় যে এর অর্থ যে পুরুষের দ্বারা প্রকৃতির পূর্ণ অধিকার তা নয়, বরং এর অর্থ প্রকৃতির বর্জন। প্রকৃতির ক্রিয়াকে সরিয়েই আমাদের পেতে হবে আত্মাকে। যেমন বুদ্ধি জানতে পায় যে ইন্দ্রিয়মানস

আমাদের দেয় শুধু সব অবভাস যাদের মধ্যে অন্তঃপুরুষ প্রকৃতির অধীন থাকে এবং তা জেনে তাদের পশ্চাতে আরো প্রকৃত সত্য আবিষ্কার করে, তেমন অন্তঃপুরুষ নিশ্চয়ই জানতে পারবে যে বুদ্ধিও প্রকৃতির দিকে প্রযুক্ত হলে, এ আমাদের শুধু বিভিন্ন অবভাস দিতে ও অধীনতার প্রসার করতে সমর্থ এবং সেজন্য অন্তঃপুরুষের কর্তব্য হবে এই সবের পশ্চাতে আত্মার বিশুদ্ধ সত্য আবিষ্কার করা। আত্মা প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং বুদ্ধির পক্ষে প্রয়োজন হবে সব প্রাকৃত বিষয়ে আসক্তি ও নিবিষ্টতা থেকে নিজেকে শুদ্ধ করা; কেবল এই ভাবেই এ সমর্থ হবে শুদ্ধ আত্মা ও চিৎপুরুষকে জানতে ও সে সব থেকে পৃথক করতে: শুদ্ধ আত্মা ও চিৎপুরুষের জ্ঞানই একমাত্র প্রকৃত জ্ঞান, শুদ্ধ আত্মা ও চিৎপুরুষের আনন্দই একমাত্র আধ্যাত্মিক ভোগ, শুদ্ধ আত্মা ও চিৎপুরুষের চেতনা ও সত্তাই একমাত্র প্রকৃত চেতনা ও সত্তা। ক্রিয়া ও সঙ্কল্পের নিবৃত্তি আবশ্যক, কারণ সকল ক্রিয়াই প্রকৃতির; শুদ্ধ আত্মা ও চিৎপুরুষ হবার যে সঙ্কল্প তার অর্থ ক্রিয়ার সকল সঙ্কল্পের নিবৃত্তি।

কিন্তু আত্মার সত্তা, চেতনা, আনন্দ, শক্তি পাওয়া যে সিদ্ধির সর্ত তা স্বীকার করলেও — কারণ শুধু নিজের সত্য জেনে, অধিগত ক'রে ও তাতে বাস করেই অন্তঃপুরুষ মুক্ত ও সিদ্ধ হতে সক্ষম — আমরা বলি যে প্রকৃতি হল চিৎপুরুষের শাশ্বত ক্রিয়া ও অভিব্যক্তি; প্রকৃতি শয়তানের ফাঁদ নয়, অথবা কামনা, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মানসিক সঙ্কল্প ও বুদ্ধির দ্বারা সৃষ্ট কতকগুলি ভ্রান্তিজনক অবভাস নয়, বরং এই সব ঘটনা হল আভাস ও ইঙ্গিত এবং তাদের সকলের পশ্চাতে আছে চিৎপুরুষের এক সত্য, যে চিৎপুরুষ এদের ছাপিয়ে আছেন ও তাদের ব্যবহার করেন। আমরা বলি যে এক স্বগত আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান ও সঙ্কল্প আছে যার দ্বারা সকলের মধ্যে নিগূঢ় চিৎপুরুষ তাঁর নিজের সত্য জানেন, সঙ্কল্প করেন এবং প্রকৃতির মধ্যে তাঁর আপন সত্তা ব্যক্ত ও শাসন করেন; তাতে উপনীত হওয়া, তার সঙ্গে সম্মিলিত হওয়া অথবা তাতে অংশ গ্রহণ করা আমাদের সিদ্ধির এক অঙ্গ হওয়া চাই-ই। তাহলে বুদ্ধিকে শুদ্ধ করার উদ্দেশ্য হবে আমাদের আত্মসত্তার নিজস্ব সত্য লাভ করা এবং তার সাথে প্রকৃতির মধ্যে আমাদের সত্তার শ্রেষ্ঠ সত্যও লাভ করা। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আমাদের কর্তব্য হবে প্রথম আমাদের বুদ্ধিকে সে সব থেকে শুদ্ধ করা যা একে ইন্দ্রিয়মানসের বশীভূত করে এবং একবার তা করা হলে আমাদের কর্তব্য তাকে তার নিজের সব সঙ্কীর্ণতা থেকে শুদ্ধ করা এবং এর অবর মানসিক বুদ্ধি ও সঙ্কল্পকে রূপান্তরিত করা এক আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও সঙ্কল্পের মহত্তর ক্রিয়ায়।

ইন্দ্রিয়মানসের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য বুদ্ধির যে চেষ্টা তা মানববিকাশের মাঝে পূর্বেই অর্ধ-নিষ্পন্ন হয়েছে; এ হল মানবের মাঝে প্রকৃতির সাধারণ ক্রিয়ার এক অংশ। মানবের মাঝে ভাবনামানস, বুদ্ধি ও সঙ্কল্পের যে আদি ক্রিয়া তা এক অধীনস্থ ক্রিয়া। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ, প্রাণের সব আকাঙ্ক্ষা, সহজাতবৃত্তি, কামনা, ভাবাবেগের আদেশ, স্ফুরন্ত ইন্দ্রিয়মানসের বিভিন্ন সংবেগ — এ স্বীকার করে, এ শুধু চেষ্টা করে

সে সবকে আরো সুশৃঙ্খল নির্দেশ ও কার্যকরী সফলতা দিতে। কিন্তু যে মানুষের যুক্তিবুদ্ধি ও সঙ্কল্প অবর মনের তাঁবেদার এবং এর দ্বারা চালিত হয় সে এক হীন প্রকৃতির মানুষ, আর আমাদের চিন্ময় সত্তার যে অংশ এই অধীনতায় সম্মত হয় তা আমাদের মনুষ্যত্বের নিম্নতম অংশ। বুদ্ধির উচ্চতর ক্রিয়া হল অবর মনকে ছাড়িয়ে যাওয়া, তাকে নিয়ন্ত্রণ করা, অবশ্য তা বাদ দেওয়া নয়, তবে যে সকল ক্রিয়ার প্রাথমিক আভাস এ সে সকলকে উন্নীত করা সঙ্কল্প ও বুদ্ধির মহত্তর লোকে। ইন্দ্রিয়মানসের সংস্কারগুলিকে এমন এক মনন ব্যবহার করে যা সে সব ছাড়িয়ে গিয়ে এমন সব সত্যে উপনীত হয় যা তাদের কাছে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ মননের বিভিন্ন ভাবময় সত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন সত্য; চিন্তা করে, আবিষ্কার করে এমন দার্শনিক মন ইন্দ্রিয় সংস্কারের প্রাথমিক মনকে পরাস্ত ও সংশোধন ক'রে আয়ত্তে আনে। সংবেগমূলক, প্রতিক্রিয়াশীল, ইন্দ্রিয়বোধাশ্রিত মানসিকতা, প্রাণের সব আকাঙ্ক্ষা, এবং ভাবময় কামনার মন — এই সবকে বুদ্ধিগত সঙ্কল্প গ্রহণ করে এবং এক মহত্তর নৈতিক মন সে সবকে পরাস্ত ও সংশোধন ক'রে তাদের আয়ত্তে আনে এবং এই মন উচিত সংবেগ, উচিত কামনা, উচিত ভাবাবেগ ও উচিত ক্রিয়ার এক বিধান আবিষ্কার ক'রে তা আরোপ করে তাদের উপর। গ্রহিষ্ণু স্থূলভোগপরায়ণ ইন্দ্রিয়বোধাশ্রিত মানসিকতা, ভাবমানস ও প্রাণমানস — এই সবকে বুদ্ধি গ্রহণ করে এবং এক আরো গভীর, আরো সুখময় সৌন্দর্যগ্রাহী মন সে সবকে পরাস্ত ও সংশোধন করে, আয়ত্তে আনে এবং এই মন প্রকৃত আনন্দ ও সৌন্দর্যের যে বিধান আবিষ্কার করে তা তাদের উপর স্থাপন করে। এই যে সব নতুন গঠন সে সবকে বুদ্ধিপ্রধান চিন্তাশীল ও সঙ্কল্পযুক্ত মানুষের এক সাধারণ "শক্তি" ব্যবহার করে প্রবল ধীশক্তি, কল্পনা, বিচার, স্মৃতি, ইচ্ছাশক্তি, বিবেকী যুক্তিবুদ্ধি ও আদর্শ অনুভবের পুরুষের মাঝে আর এই পুরুষ তাদের ব্যবহার করে জ্ঞান, আত্মবিকাশ, অভিজ্ঞতা, আবিষ্কার, সৃষ্টি, কার্যসাধনের জন্য, আস্পৃহা করে, প্রয়াস করে, আন্তরভাবে লাভ করে এবং সচেষ্ট হয় প্রকৃতির মধ্যে পুরুষের জীবনকে পরতর বিষয়ে পরিণত করতে। আদিম কামপুরুষ আর সত্তাকে শাসন করে না। এ এখনো এক কামপুরুষ কিন্তু একে দমন ও শাসন করে এক পরতরা শক্তি, এমন কিছু যা নিজের মধ্যে ব্যক্ত করেছে সত্য, সঙ্কল্প, ক্ষেম, সৌন্দর্যের দেবগণকে এবং চেষ্টা করে জীবনকে তাদের বশে আনতে। অমার্জিত কামপুরুষ ও মন চেষ্টা করছে নিজেকে রূপান্তরিত করতে এক আদর্শ পুরুষে ও মনে এবং যে অনুপাতে এই মহত্তর চিন্ময় সত্তার কিছু ফল ও সৌষম্য পাওয়া যায় ও প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাতেই বোঝা যাবে আমাদের উপচীয়মান মানবত্বের পরিমাণ কত।

কিন্তু তবু এ এক অতি অসম্পূর্ণ উন্নতি। আমরা দেখি যে আমাদের উন্নতি আরো বেশী সম্পূর্ণ হতে থাকে যতই আমরা এই দুই প্রকার সিদ্ধি লাভ করি; প্রথমতঃ বিভিন্ন হীন সঙ্কেতের হাত থেকে উত্তরোত্তর অধিক বিমুক্তি, দ্বিতীয়তঃ, যে আত্মপ্রতিষ্ঠ সত্তা, আলোক, শক্তি ও আনন্দ সাধারণ মানবত্বকে অতিক্রম ও রূপান্তরিত করে তার

উত্তরোত্তর বেশী সন্ধান লাভ। নৈতিক মন সেই অনুপাতে সিদ্ধ হয় যে অনুপাতে এ নিজেকে মুক্ত করে কামনা, ইন্দ্রিয়ের সঙ্কেত, সংবেগ, প্রথাগত আদিষ্ট ক্রিয়া থেকে এবং আবিষ্কার করে ন্যায়, প্রেম, সামর্থ্য ও শুদ্ধতার আত্মা যার মধ্যে এ থাকতে পারে চরিতার্থ হয়ে এবং তাকে করতে পারে এর সকল ক্রিয়ার ভিত্তি। সৌন্দর্যগ্রাহী মন সেই পরিমাণে সিদ্ধ হয় যে পরিমাণে এ তার সকল অমার্জিত সুখ থেকে এবং সৌন্দর্যগ্রাহী যুক্তিবুদ্ধির বাহ্য প্রচলিত নিয়ম থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং আবিষ্কার করে শুদ্ধ ও অনন্ত সৌন্দর্য ও আনন্দের স্বপ্রতিষ্ঠ আত্মা ও চিৎপুরুষ যা সৌন্দর্যবোধের উপাদানকে দেয় তার নিজের আলো ও হর্ষ। জ্ঞানের মন সিদ্ধ হয় যখন এ সংস্কার ও মতবাদ ও মতামত থেকে সরে আসে এবং আবিষ্কার করে আত্মজ্ঞান ও বোধির আলোক যা দীপ্ত করে ইন্দ্রিয় ও যুক্তিবুদ্ধির সকল ক্রিয়া, সকল আত্ম-অনুভূতি ও জগৎ-অনুভূতি। সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় যখন এ নিজের বিভিন্ন সংবেগ ও কার্যসাধনের প্রথাগত পথ থেকে সরে আসে ও তাদের পশ্চাতে যায় এবং আবিষ্কার করে চিৎপুরুষের আন্তর শক্তি যা বোধিময় ও দীপ্ত ক্রিয়ার এবং আদি সামঞ্জস্যপূর্ণ সৃষ্টির উৎস। সিদ্ধির পথে যাওয়া অর্থ হল অপরা প্রকৃতির সকল প্রভুত্ব থেকে দূরে চলে আসা, এবং বুদ্ধির মধ্যে চিৎপুরুষের ও আত্মার সত্তা, শক্তি, জ্ঞান ও আনন্দের শুদ্ধ ও শক্তিশালী প্রতিফলনের দিকে অগ্রসর হওয়া।

আত্মসিদ্ধি যোগের কাজ হল এই দুইটি ক্রিয়াকে যতদূর সম্ভব একান্ত করা। বুদ্ধির মধ্যে কামনার সকল মিশ্রণই এক অশুদ্ধতা। কামনার রঙে রঙীন বুদ্ধি অশুদ্ধ বুদ্ধি এবং এ সত্যকে বিকৃত করে; কামনায় রঙীন সঙ্কল্প অশুদ্ধ সঙ্কল্প এবং এ অন্তঃপুরুষের সব ক্রিয়ার উপর বিকৃতি, দুঃখ ও অপূর্ণতার ছাপ দেয়। কামনাময় পুরুষের ভাবাবেগের সকল মিশ্রণই অশুদ্ধতা এবং এও অনুরূপভাবে জ্ঞান ও ক্রিয়াকে বিকৃত করে। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়সংবিৎ ও সংবেগের নিকট সকল বশ্যতাই এক অশুদ্ধতা। ভাবনা ও সঙ্কল্পকে কামনা, উদ্বেগজনক ভাবাবেগ, বিক্ষেপকারী বা প্রভাবশালী সংবেগ থেকে অনাসক্ত হয়ে পিছনে সরে দাঁড়াতে হবে এবং কাজ করতে হবে নিজের অধিকারে যতদিন না তারা আবিষ্কার করতে পারে এক মহত্তর দিশারী, এক পরম সঙ্কল্প, তপস্ অথবা দিব্য শক্তি যা কামনা, মানসিক সঙ্কল্প ও সংবেগের স্থান নেবে এবং আবিষ্কার করবে এক পরম আনন্দ অর্থাৎ চিৎপুরুষের শুদ্ধ আনন্দ এবং এক ভাস্বর আধ্যাত্মিক জ্ঞান যা নিজেদের প্রকট করবে ঐ শক্তির ক্রিয়ায়। এই সম্পূর্ণ অনাসক্তি যা পূর্ণ আত্মশাসন, সমত্ব ও শান্তি ব্যতীত অর্থাৎ "শম, সমতা, শান্তি" ব্যতীত লাভ করা অসম্ভব — এই হল বুদ্ধিকে শুদ্ধ করার ব্রতে নিশ্চিততম পদক্ষেপ। শুধু এক শান্ত, সম ও অনাসক্ত মনই মুক্ত পুরুষের শান্তি প্রতিফলিত করতে অথবা তার ক্রিয়ার ভিত্তি হতে সক্ষম।

বুদ্ধি নিজেই এক মিশ্রিত ও অশুদ্ধ ক্রিয়ার ভারে আকুল। একে তার নিজস্ব সঠিক রূপে আনা হলে দেখা যায় যে এর ব্যাপ্রিয়ার তিনটি পর্যায় বা স্তর বিদ্যমান। প্রথমটি অর্থাৎ এর নিম্নতম ভিত্তি হল অভ্যাসগত রীতিসম্মত ক্রিয়া যা উচ্চতর যুক্তিবুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়মানসের মাঝে যোগসূত্র, এক প্রকার চলন্ত-বুদ্ধি। এই বুদ্ধি একক অবস্থায় নির্ভর

করে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যের উপর এবং তাছাড়া, ইন্দ্রিয়মানস জীবনকে যা দেখে এবং এর সম্বন্ধে যা ভাবে তা থেকে যুক্তিবুদ্ধি ক্রিয়ার যে বিধি স্থির করে তার উপরও এ নির্ভর করে। এ নিজে নিজে শুদ্ধ ভাবনা ও সঙ্কল্প গঠনে সমর্থ নয়, তবে এ পরতরা যুক্তিবুদ্ধির কার্যগুলিকে নিয়ে তাদের পরিণত করে ব্যবহারোপযোগী মতামতে, এবং ভাবনার প্রচলিত মানে অথবা ক্রিয়ার নিয়মে। যখন আমরা চিন্তক মনের এক প্রকার ব্যবহারিক বিশ্লেষণ ক'রে এই অঙ্গটি বিচ্ছিন্ন করি এবং মুক্ত, দ্রষ্টা ও নীরব পরতরা বুদ্ধিকে পিছনে ধ'রে রাখি, তখন আমরা দেখি যে এই চলন্ত-বুদ্ধি ঘুরতে থাকে নিষ্ফল গণ্ডির মধ্যে, বার বার আনে তার সব পূর্বগঠিত মতামত এবং বিষয়সমূহের প্রেষণে তার সাড়া, কিন্তু কোনরকম জোরালো অভিযোজন বা উপক্রমসাধনে সে অক্ষম। আর এ যতই বেশী ক'রে অনুভব করে যে এতে পরতরা বুদ্ধির অনুমোদন দেওয়া হয়নি, ততই এ বিফল হতে, নিজের উপর এবং এর সব রূপ ও অভ্যাসের উপর প্রত্যয় হারাতে, বুদ্ধিগত ক্রিয়াকে অবিশ্বাস করতে এবং দুর্বল ও নীরব হয়ে পড়তে শুরু করে। এই যে ভাবনামানস সর্বদাই চলছে, দৌড়চ্ছে, ঘুরপাক খাচ্ছে, বারবার আসা-যাওয়া করছে তাকে নিস্তব্ধ করা এক বড় কাজ কারণ যোগের অন্যতম সর্বাপেক্ষা কার্যকরী সাধনপ্রণালী হল ভাবনাকে নীরব করা, আর এই চলন্ত ভাবনামানসকে নিস্তব্ধ করা এর এক প্রধান অংশ।

কিন্তু পরতরা যুক্তিবুদ্ধির নিজেরই এক স্ফুরন্ত, প্রয়োগকুশল ধীমত্তার প্রথম অবস্থা আছে যাতে সৃষ্টি, ক্রিয়া ও সঙ্কল্পই আসল প্রেরণা, আর ভাবনা ও জ্ঞানকে প্রয়োগ করা হয় প্রধানতঃ কার্যসাধনের ভিত্তিমূলক রচনাও প্রস্তাবনার জন্য। এই প্রয়োগকুশল যুক্তিবুদ্ধির কাছে সত্য হল ধীশক্তির এক গঠন মাত্র যা আন্তর ও বাহ্য জীবনের ক্রিয়ার জন্য উপকারী। আরো পরতরা এক যুক্তিবুদ্ধি আছে যা ব্যক্তিগতভাবে উপকারী সত্য সৃষ্টি করার চেয়ে বরং বেশী উৎসুক পরম সত্যকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে প্রতিফলিত করতে, আর যখন আমরা এই আরো পরতরা যুক্তিবুদ্ধি থেকে প্রয়োগকুশল যুক্তিবুদ্ধিকে বিচ্ছিন্ন করি, আমরা দেখতে পাই যে এই প্রয়োগকুশল যুক্তিবুদ্ধি অনুভূতি উৎপন্ন, উন্নত ও বিস্তৃত করতে সক্ষম স্ফুরন্ত জ্ঞানের দ্বারা, কিন্তু একে নির্ভর করতে হয় চলন্ত-বুদ্ধির উপর তার পাদপীঠ ও ভিত্তি হিসেবে এবং তার সমগ্র গুরুত্ব দিতে হয় জীবন ও সম্ভূতির উপর। সুতরাং এ নিজে নিজে জীবন ও ক্রিয়াভিমুখী সঙ্কল্পের মন, জ্ঞানের মন অপেক্ষা বরং আরো অনেক বেশী পরিমাণে সঙ্কল্পের মন: এ কোন নিশ্চিত, ধ্রুব ও নিত্য সত্যের মধ্যে বাস করে না, বরং বাস করে সত্যের উন্নতিশীল ও পরিবর্তনশীল বিভিন্ন বিভাবের মধ্যে যেগুলি আমাদের জীবন ও সম্ভূতির চঞ্চল রূপগুলির উপযোগী, অথবা বড় জোর জীবনকে সাহায্য করে বিকশিত ও উন্নত হতে। এই প্রয়োগকুশল মন এককভাবে আমাদের কোন দৃঢ় প্রতিষ্ঠা এবং কোন ধ্রুব নিশানা দিতে অক্ষম; এ বাস করে বর্তমানের সত্যের মধ্যে, নিত্যতার কোন সত্যের মধ্যে নয়। কিন্তু যখন একে রীতিসম্মত বুদ্ধির উপর নির্ভরতা থেকে শুদ্ধ করা হয়, তখন এ পরতমা মানসিক যুক্তিবুদ্ধির সাহচর্যে হয়ে

ওঠে জীবনের মাঝে পরম সত্য চরিতার্থ করার এক সক্ষম প্রণালী এবং সাহসী সেবক। এর কর্মের মূল্য নির্ভর করে পরতম সত্যান্বেষী যুক্তিবুদ্ধির মূল্য ও সামর্থ্যের উপর। কিন্তু এককভাবে এ কালের ক্রীড়নক ও প্রাণের ক্রীতদাস। নীরবতা-সাধকের কর্তব্য হল একে নিজের কাছ থেকে দূরে নিক্ষেপ করা; পূর্ণ দিব্যত্ব সাধকের কর্তব্য একে ছাড়িয়ে যাওয়া, প্রাণের উপর ব্যগ্র এই চিন্তক মন সরিয়ে তার স্থানে এক মহত্তর কার্যসাধক আধ্যাত্মিক সঙ্কল্প আনা, চিৎপুরুষের সত্যসঙ্কল্প এবং এই সত্যসঙ্কল্পের দ্বারা ঐ চিন্তক মনকে রূপান্তরিত করা।

বুদ্ধিগত সঙ্কল্প ও যুক্তিবুদ্ধির তৃতীয় ও মহত্তম অবস্থা হল এমন এক বুদ্ধি যা কোন বিশ্বজনীন সদ্‌বস্তুর অথবা আরো পরতর স্বপ্রতিষ্ঠ সত্যের প্রয়াসী তাদের নিজেদের জন্যই এবং চেষ্টা করে ঐ সত্যের মধ্যে বাস করতে। এ হল মুখ্যতঃ এক জ্ঞানের মন, আর শুধু গৌণতঃ এক সঙ্কল্পের মন। এর জ্ঞানলিপ্সার আধিক্যে এ প্রায়ই সঙ্কল্পে অসমর্থ হয়, থাকে শুধু এক জানার সঙ্কল্প; ক্রিয়ার জন্য এ প্রয়োগকুশল মনের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল এবং সেজন্য কর্মের মধ্যে মানব তার শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের দ্বারা ধৃত পরম সত্যের বিশুদ্ধতা থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পতিত হয় এক মিশ্রিত, হীন, অস্থির ও অশুদ্ধ কার্যসাধনের মধ্যে। জ্ঞান ও সঙ্কল্পের মাঝে এই যে অসঙ্গতি — এমনকি যখন তারা পরস্পর বিরুদ্ধ নয় তখনো এ মানবীয় বুদ্ধির অন্যতম প্রধান দোষ, কিন্তু সকল মানবীয় চিন্তায় অন্যান্য স্বগত সঙ্কীর্ণতাও আছে। এই পরতমা বুদ্ধি মানুষের মাঝে তার নিজস্ব শুদ্ধতায় কাজ করে না; অবর মানসিকতার দোষগুলি একে আক্রমণ করে, এই মানসিকতা সর্বদাই একে তমসাচ্ছন্ন করে, বিকৃত ও আবৃত করে এবং তার নিজের সঙ্গত ক্রিয়ায় তাকে বাধা দেয় বা পঙ্গু করে। মানসিক হীনতার অভ্যাস থেকে মানবীয় বুদ্ধিকে সম্ভবমতো যতই শুদ্ধ করা হ'ক না কেন, এ তবু এমন এক শক্তি যা সত্যের জন্য অন্বেষণ করে, কিন্তু কখনো তাকে সম্পূর্ণ বা সরাসরি অধিগত করে না; এ চিৎপুরুষের সত্যকে শুধু প্রতিফলিত করতে সমর্থ, আর সমর্থ তাকে এর নিজের করার চেষ্টা করতে — তাকে এক সীমিত মানসিক মূল্য এবং সুস্পষ্ট মানসিক আকার দিয়ে। তাছাড়া, এ অখণ্ডভাবেও প্রতিফলিত করে না; বরং ধারণ করে এক অনিশ্চিত সমগ্রতা, না হয় কতকগুলি সীমিত বিশেষের যোগফল। প্রথম এ যে কোন একটি আংশিক প্রতিফলন ধরে এবং তাকে রীতিসম্মত মনের অভ্যাসের বশে এনে পরিণত করে এক নির্দিষ্ট আবদ্ধ-করা মতে; এইভাবে এ যে দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করে তা দিয়ে এ সকল নতুন সত্যের বিচার করে এবং সেজন্য তার উপর এক সীমিত পূর্বনির্ণয়ের রঙ চড়ায়। এই সঙ্কীর্ণতাজনক মত থেকে একে যতই মুক্ত করা যাক না কেন, তবু এর আর একটি দোষ থেকে যায়; এ হল প্রয়োগকুশল মনের দাবী যে একে অবিলম্বে কার্যে পরিণত করা চাই, বৃহত্তর সত্যে যাবার জন্য একে এই দাবী সময় দেয় না, বরং যা এ পূর্বেই সিদ্ধান্ত করেছে, জেনেছে এবং উপলব্ধি করেছে তার মধ্যেই একে নিবিষ্ট করে কার্যকারী চরিতার্থতার শক্তি দিয়ে। এই সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হলে বুদ্ধি হতে পারে পরম সত্যের এক শুদ্ধ ও নমনীয়

দর্পণ, এ আলোর পর আলো আনে, উপলব্ধির পর উপলব্ধিতে অগ্রসর হয়। তখন শুধু সঙ্কীর্ণতা বলতে, তার নিজস্ব অন্তর্নিহিত সঙ্কীর্ণতা।

এই সব সঙ্কীর্ণতা প্রধানতঃ দুই প্রকারের। প্রথমতঃ এর সব উপলব্ধি শুধু মানসিক উপলব্ধি; সাক্ষাৎ সত্যে যেতে হলে আমাদের যাওয়া চাই মানসিক বুদ্ধির উজানে। তাছাড়া মনের যা স্বভাব তাতে এ তার ধরা সত্যগুলিকে সফলভাবে মিলিয়ে এক করতেও অক্ষম। এ শুধু তাদের পাশাপাশি রেখে তাদের বিরোধ দেখতে পারে, আর না হয় এক প্রকার আংশিক, কার্যসাধক ও ব্যবহারিক সমবায় সাধনে সক্ষম হয়। কিন্তু সর্বশেষে এ দেখতে পায় যে সত্যের বিভাবগুলি অনন্ত আর এর বুদ্ধিগত বিভিন্ন রূপের কোনটাই সম্পূর্ণ সঠিক নয়, কারণ চিৎপুরুষ অনন্ত এবং চিৎপুরুষের মধ্যে সকল কিছুই সত্য, কিন্তু মনের মধ্যে অবস্থিত কোন কিছুই চিৎপুরুষের সমগ্র সত্য দিতে অক্ষম। তাহলে বুদ্ধি হয়ে ওঠে অনেকগুলি প্রতিফলনের এক দর্পণ, যে সকল সত্য এর উপর পড়ে তা সে প্রতিফলিত করে, কিন্তু কার্যে অক্ষম, আর যখন ক্রিয়ায় প্রযুক্ত হয় তখন হয় এ সিদ্ধান্তে আসতে অসমর্থ হয়, না হয় বিশৃঙ্খল হয়, অথবা একে কোন একটি বেছে নিয়ে কাজ করতে হয় যেন ঐ আংশিক বিষয়টিই সমগ্র সত্য যদিও এ জানে যে তা ঠিক নয়। এর ক্রিয়ার চেয়ে অনেক মহত্তর এক সত্য ধরলেও, এ অসহায়ভাবে কাজ করে অবিদ্যার সঙ্কীর্ণতার মধ্যে। অপরপক্ষে এ জীবন ও মনন থেকে নিবৃত্ত হয়ে চেষ্টা করতে পারে নিজেকে ছাড়িয়ে তার উজানে সত্যের মধ্যে প্রবেশ করতে। তা সে করতে পারে সদ্‌বস্তুর কোন দিক, কোন তত্ত্ব, কোন প্রতীক বা আভাস ধ'রে ও সেটিকে তার অনপেক্ষ, সর্বগ্রাসী, সর্ববর্জক উপলব্ধিতে নিয়ে, অথবা এমন নির্বিশেষ 'সৎ' বা 'অসৎ'-এর কোন ভাবনা ধরে ও উপলব্ধি করে যা থেকে সকল মনন ও জীবন নিবৃত্ত ও সমাপ্ত হয়। বুদ্ধি নিজেকে নিক্ষেপ করে জ্যোতিভরা নিদ্রার মধ্যে, আর অন্তঃপুরুষ প্রস্থান করে আধ্যাত্মিকসত্তার কোন অনির্বচনীয় শিখরে।

সুতরাং, বুদ্ধি সম্বন্ধে আমাদের করণীয় হল, হয় এই সবের মধ্যে একটি পন্থা বেছে নেওয়া, আর না হয় সেই দুঃসাহসিক ব্রতের প্রয়াসী হওয়া যা সাধারণতঃ করা হয় না, অর্থাৎ অন্তঃপুরুষকে মনোময় সত্তা থেকে উত্তোলন করা আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের মধ্যে এই দেখতে যে ঐ দিব্য আলোক ও শক্তির নিজস্ব মর্মলোকে আমরা কি পেতে পারি। এই বিজ্ঞানের মধ্যে আছে পরম চিন্ময় পুরুষের দ্যুলোকে জ্বলন্ত দিব্য জ্ঞানসঙ্কল্পের সূর্য, আর মানসিক বুদ্ধি ও সঙ্কল্প হল শুধু এর বিকীর্ণ ও বিচলিত সব রশ্মি ও প্রতিফলনের কিরণকেন্দ্র। তাই দিব্য ঐক্যের অধিকারী এবং তবু, অথবা বরং সেজন্যই, বহুত্ব ও বৈচিত্র্য নিয়ন্ত্রণে সমর্থ: এ যা কিছু নির্বাচন, আত্মপরিসীমা, সমবায় করে তা তার উপর অবিদ্যার দ্বারা আরোপিত নয়, বরং এই সব নিজেই বিকশিত হয় আত্ম-অধিকারী দিব্য জ্ঞানের শক্তির দ্বারা। যখন বিজ্ঞানপ্রাপ্তি হয়, তখন একে ফেরানো যায় সমগ্র প্রকৃতির দিকে মানবসত্তাকে দিব্যভাবাপন্ন করার উদ্দেশ্যে। এখনই এতে ওঠা অসম্ভব; তা করা যদি সম্ভব হ'ত তাহলে তার অর্থ হ'ত সূর্যের দ্বারের মধ্য দিয়ে "সূর্যস্য দ্বারা" এক

আকস্মিক ও প্রচণ্ড সীমা-অতিক্রমন, এক বিদারণ অথবা অলক্ষিত যাত্রা যাতে প্রত্যাবর্তনের কোন আশু সম্ভাবনা নেই। আমাদের কর্তব্য হবে যোগসূত্র অথবা সেতু হিসেবে এক বোধিত বা প্রভাস মানস গঠন করা; এ স্বয়ং বিজ্ঞান নয়, তবে এর মধ্যে বিজ্ঞানের এক প্রাথমিক ব্যুৎপন্ন দেহনির্মাণ সম্ভব। এই প্রভাস মানস প্রথমে হবে এক মিশ্রিত শক্তি; এর সকল মানসিক নির্ভরতা ও মানসিক রূপ থেকে একে মুক্ত ও শুদ্ধ করা প্রয়োজন যাতে সঙ্কল্প ও চিন্তার সকল ক্রিয়াকে এক ভাস্বর বিবেক, বোধি, স্মৃতি ও শ্রুতির দ্বারা রূপান্তরিত করা যায় ভাবনা-দৃষ্টিতে ও সত্যদর্শী সঙ্কল্পে। তাই হবে বুদ্ধির অন্তিম শুদ্ধি এবং বিজ্ঞানের সিদ্ধির জন্য প্রস্তুতি।

অষ্টম অধ্যায়

চিৎপুরুষের মুক্তি

মনোময় সত্তা ও সূক্ষ্মপ্রাণের শুদ্ধি সাধনে আধ্যাত্মিক মুক্তির ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। আপাততঃ আমরা ভৌতিক শুদ্ধির প্রশ্নটি অর্থাৎ দেহ ও স্থূলপ্রাণের শুদ্ধির প্রশ্নটি বাদ রাখব, যদিও তা-ও অখণ্ড শুদ্ধির পক্ষে প্রয়োজনীয়। শুদ্ধি মুক্তির সর্ত। সকল শুদ্ধির অর্থ বিমুক্তি, পরিত্রাণ; কারণ এ হল সেই সব অপূর্ণতা ও বিভ্রান্তির অপসারণ যেগুলি সঙ্কীর্ণতা আনে, আবদ্ধ ও তমসাচ্ছন্ন করে: কামনা থেকে শুদ্ধ হলে, সূক্ষ্মপ্রাণের মুক্তি আসে, অনুচিত সব ভাবাবেগ ও উদ্বেগজনক প্রতিক্রিয়া থেকে শুদ্ধ হলে হৃদয়ের মুক্তি আসে, ইন্দ্রিয়মানসের আচ্ছন্ন-করা সীমিত মনন থেকে শুদ্ধ হলে বুদ্ধির মুক্তি আসে, নিছক ধীমত্তা থেকে শুদ্ধ হলে বিজ্ঞানের মুক্তি আসে। কিন্তু এই সব হল করণবিষয়ক মুক্তি। অন্তঃপুরুষের "মুক্তি" আরো ব্যাপক ও মৌলিক প্রকৃতির; এর অর্থ মর্ত্যসঙ্কীর্ণতা থেকে বাইরে উন্মীলিত হওয়া চিৎপুরুষের অসীম অমরত্বের মধ্যে।

কতকগুলি ভাবনায়, মুক্তির অর্থ সকল প্রকৃতির বর্জন, শুদ্ধ সত্তার এক নীরব অবস্থা, নির্বাণ বা বিলোপ, কোন অনির্বচনীয় অনপেক্ষতত্ত্বের মধ্যে প্রাকৃত অস্তিত্বের লয় অর্থাৎ মোক্ষ। কিন্তু তদ্‌গত ও মগ্ন আনন্দ, নিষ্ক্রিয় শান্তির ব্যাপ্তি, আত্মনাশের বিমুক্তি, অথবা পরমার্থসৎ-এর মধ্যে আত্মনিমজ্জন — এদের কোনটিই আমাদের লক্ষ্য নয়। মুক্তির ভাবনায় আমরা শুধু সেই আন্তর পরিবর্তনের অর্থ দেব যা এই প্রকার সকল অনুভূতিতেই বিদ্যমান, সিদ্ধির পক্ষে অত্যাবশ্যক এবং আধ্যাত্মিক মুক্তির পক্ষে অপরিহার্য। তাহলে আমরা দেখতে পাব এতে সর্বদাই দুটি বিষয় বোঝায় — বর্জন ও গ্রহণ, একটি নেতিবাচক দিক, অন্যটি ইতিবাচক; মুক্তির নেতিবাচক সাধনার অর্থ অপরা পুরুষ-প্রকৃতির বিভিন্ন প্রধান বন্ধন থেকে, মুখ্য গ্রন্থি থেকে বিমুক্তি; ইতিবাচক সাধনার অর্থ পরতর আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের মধ্যে উন্মীলন বা উপচয়। কিন্তু এই সব মুখ্য গ্রন্থিগুলি কি কি — এরা কি মন, হৃদয়, সূক্ষ্ম প্রাণশক্তির করণগত গ্রন্থি ছাড়া অপর কিছু আরো সব গভীর গ্রন্থি? আমরা দেখি যে গীতায় এদের কথা আমাদের লক্ষ্যে আনা হয়েছে এবং অতীব জোরের সঙ্গে এবং সর্বদাই এদের গুরুত্ব সম্বন্ধে বারবার বলা হয়েছে; এই সব গ্রন্থি সংখ্যায় চারটি — কামনা, অহং, দ্বন্দ্ব ও প্রকৃতির ত্রিগুণ; কারণ, গীতার ভাবনায় মুক্ত হওয়ার অর্থ কামনাশূন্য, অহং-শূন্য, মন ও অন্তঃপুরুষ ও চিৎপুরুষে সম এবং "নিস্ত্রৈগুণ্য" হওয়া। আমরা এই বিবরণটি গ্রহণ করতে পারি কারণ মূল সব কিছুই এই ব্যাপক বিবরণের অন্তর্গত। অপরপক্ষে মুক্তির ইতিবাচক অর্থ হল অন্তঃপুরুষে বিশ্বাত্মক হওয়া, বিশ্বাতীতভাবে ভগবানের সঙ্গে চিৎপুরুষে এক হওয়া, সর্বশ্রেষ্ঠ দিব্য প্রকৃতি ধারণ করা — যেমন বলা যায় ভগবানের সদৃশ হওয়া অথবা আমাদের সত্তার

ধর্মে, স্বধর্মে তাঁর সঙ্গে এক হওয়া। মুক্তির সমগ্র ও পূর্ণ অর্থ হল এই এবং এই হল চিৎপুরুষের অখণ্ড মুক্তি।

সূক্ষ্ম প্রাণের কামনা থেকে শুদ্ধ হওয়ার কথা আমাদের পূর্বেই বলতে হয়েছে; স্থূল প্রাণের লালসা হল এর বিবর্তনমূলক ভিত্তি, অথবা বলা যায় ব্যবহারিক ভিত্তি। কিন্তু এই সব থাকে মানসিক ও সূক্ষ্মপ্রাণিক প্রকৃতিতে; আধ্যাত্মিক কামনাশূন্যতার অর্থ আরো ব্যাপক ও মৌলিক: কারণ কামনার দুইটি গ্রন্থি — একটি হল প্রাণের মধ্যে নিম্ন গ্রন্থি যা করণসমূহের মধ্যকার লালসা, অন্যটি হল খোদ অন্তঃপুরুষেরই মধ্যে একটি অতি সূক্ষ্ম গ্রন্থি যার প্রথম অবলম্বন বা "প্রতিষ্ঠা" হল বুদ্ধি আর এই হল আমাদের বন্ধনপাশের অন্তরতম মূল। নীচ থেকে দেখলে কামনাকে দেখা যায় যে এ হল প্রাণশক্তির এক লালসা যা সূক্ষ্মভাবাপন্ন হয়ে বিভিন্ন ভাবাবেগের মধ্যে পরিণত হয় হৃদয়ের লালসায়, এবং বুদ্ধির মধ্যে আরো সূক্ষ্মভাবাপন্ন হয়ে পরিণত হয় বুদ্ধির সৌন্দর্যগ্রাহী, নৈতিক, স্ফুরন্ত অথবা যুক্তিপ্রধান প্রবৃত্তির লালসায়, অভিরুচিতে, তীব্র আবেগে। সাধারণ মানুষের পক্ষে এই কামনা অত্যাবশ্যক; সে তার সব ক্রিয়াকে নিম্নতর বা উচ্চতর প্রকারের লালসা, অভিরুচি বা তীব্র আবেগের সেবায় না বেঁধে পৃথক জীব হিসেবে বাঁচতে বা কাজ করতে অক্ষম। কিন্তু যখন আমরা কামনাকে উপর থেকে দেখতে সমর্থ হই, তখন আমরা দেখি যে এই করণগত কামনার আশ্রয় হল চিৎপুরুষের এক সঙ্কল্প। এক সঙ্কল্প, তপঃ, শক্তি আছে যার দ্বারা নিগূঢ় চিৎপুরুষ তার সব বহিরঙ্গের উপর তাদের সকল ক্রিয়া আরোপ ক'রে তা থেকে তার সত্তার এক সক্রিয় আনন্দ আহরণ করে, — এমন এক আনন্দ যাতে ঐসব অঙ্গ যদি আদৌ সচেতনভাবে ভাগ নেয় তাহলে তা নেয় অতি অস্পষ্ট ও অপূর্ণভাবে। এই তপস্ হল সেই বিশ্বাতীত চিৎপুরুষের সঙ্কল্প যিনি বিশ্বগতির স্রষ্টা, সেই বিশ্বাত্মক চিৎপুরুষের সঙ্কল্প যিনি এই বিশ্বগতিকে ধারণ ও অনুপ্রাণিত করেন, সেই মুক্ত জীব চিৎপুরুষের সঙ্কল্প যিনি তাঁর বহুত্বের অন্তঃপুরুষ কেন্দ্র। এ হল এক অবিভক্ত সঙ্কল্প, এই সকলের মধ্যেই যুগপৎ স্বাধীন, ব্যাপক, সামঞ্জস্যপূর্ণ, একীভূত। যখন আমরা চিৎপুরুষের মধ্যে বাস ও কর্ম করি, তখন আমরা দেখি যে এ হল সত্তার আধ্যাত্মিক আনন্দের এক আয়াসহীন ও কামনাশূন্য, এক স্বতঃস্ফূর্ত ও ভাস্বর, এক আত্মচরিতার্থতাকর ও আত্ম-অধিকারী, এক তৃপ্ত ও আনন্দময় সঙ্কল্প।

কিন্তু যে মুহূর্তে জীব অন্তঃপুরুষ তার সত্তার বিশ্বাত্মক ও বিশ্বাতীত সত্য থেকে সরে এসে অহং-এর দিকে ঝোঁকে এবং চেষ্টা করে এই সঙ্কল্পকে পরিণত করতে তার নিজের এক বিষয়ে, এক পৃথক ব্যক্তিগত ক্রিয়াশক্তিতে, সেই মুহূর্তেই ঐ সঙ্কল্পের প্রকৃতি বদলে যায়: এ হয়ে ওঠে এক চেষ্টা, এক আয়াস, শক্তির এক তাপ যার থাকতে পারে কার্যসাধন ও প্রাপ্তির বিভিন্ন অগ্নিময় হর্ষ, কিন্তু যার আরো থাকে তার সব কষ্টকর প্রতিক্রিয়া ও শ্রমের দুঃখ। এটাই প্রতি করণে পরিণত হয় কামনা, ইচ্ছা, লালসার এক বুদ্ধিগত, ভাবগত, স্ফুরন্ত, ইন্দ্রিয়বোধাত্মক অথবা প্রাণিক সঙ্কল্পে। এমনকি যখন

করণসমূহ করণ হিসেবেই তাদের নিজেদের আপতিক প্রবর্তনা ও বিশেষ প্রকারের কামনা থেকে শুদ্ধ হয়, তখনো এই অপূর্ণ তপস্ থাকতে পারে এবং যতক্ষণ এ আন্তর ক্রিয়ার উৎসকে প্রচ্ছন্ন রাখে অথবা তার চরিত্র বিকৃত করে ততক্ষণ অন্তঃপুরুষ স্বাধীনতার আনন্দ পায় না, অথবা তা শুধু পেতে পারে সকল ক্রিয়া থেকে বিরত থেকে; এমনকি যদি একে আরো থাকতে দেওয়া হয়, এ প্রাণিক বা অন্যান্য সব কামনাকে আবার প্রজ্বলিত করবে অথবা সত্তার উপর তাদের এমন এক ছায়া ফেলবে যাতে তাদের কথা স্মরণ হয়। কামনার এই যে আধ্যাত্মিক বীজ বা আরম্ভ — একেও বহিষ্কার করা, ত্যাগ করা, দূরে নিক্ষেপ করা অবশ্য কর্তব্য: সাধকের কর্তব্য হল, হয় এক সক্রিয় শান্তি ও সম্পূর্ণ আন্তর নীরবতা বরণ করা, না হয় বিশ্বজনীন সঙ্কল্পের সঙ্গে, দিব্য শক্তির তপসের সঙ্গে ঐক্যের মধ্যে ব্যক্তিগত কর্মপ্রবৃত্তি, "সঙ্কল্পারম্ভ" বিলীন করা। নিষ্ক্রিয় পন্থা হল আন্তরভাবে নিশ্চল হওয়া যেন কোন চেষ্টা, ইচ্ছা, আশা বা কর্মপ্রবৃত্তি না থাকে অর্থাৎ "নিশ্চেষ্ট, অনীহ, নিরপেক্ষ, নিবৃত্ত" হওয়া; সক্রিয় পন্থা হল মনে এরকম নিশ্চল ও নৈর্ব্যক্তিক হওয়া, কিন্তু শুদ্ধীকৃত করণসমূহের মধ্য দিয়ে পরম সঙ্কল্পকে কাজ করতে দেওয়া তার আধ্যাত্মিক শুদ্ধতায়। তখন যদি অন্তঃপুরুষ আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন মানসিকতার স্তরে বাস করে, সে হয়ে ওঠে শুধু এক যন্ত্র, কিন্তু তার নিজের কোন প্রবর্তনা বা ক্রিয়া থাকে না, অর্থাৎ সে হয় "নিষ্ক্রিয়, সর্বারম্ভপরিত্যাগী"। কিন্তু সে যদি বিজ্ঞানে ওঠে, সে যুগপৎ এক যন্ত্র হয় আর হয় দিব্য ক্রিয়ার আনন্দের এবং দিব্য পরমানন্দের অংশভাক্; সে নিজের মধ্যে প্রকৃতি ও পুরুষকে মিলিয়ে এক করে।

সত্তার অহং-প্রবৃত্তি, অর্থাৎ পার্থক্যজনক প্রবৃত্তিই অজ্ঞানতা ও বন্ধনের সমগ্র দুঃখক্লিষ্ট পরিশ্রমের আলম্ব। যতক্ষণ মানুষ অহং-বোধ থেকে মুক্ত না হয়, ততক্ষণ কোন প্রকৃত মুক্তি সম্ভব নয়। বলা হয় যে অহং-এর স্থান বুদ্ধির মধ্যে; এ থাকে বিবেকী মন ও যুক্তিবুদ্ধির অজ্ঞানতার মধ্যে; এই মন ও যুক্তিবুদ্ধি ভুল বিবেচনা ক'রে মন, প্রাণ ও দেহের ব্যষ্টিভাবকে বিভক্ত অস্তিত্বের সত্য ব'লে গ্রহণ করে আর সকল অস্তিত্বের একত্বের যে মহত্তর সমন্বয়ী সত্য তা থেকে নিবৃত্ত হয়। অন্ততঃ, মানবের মাঝে অহং-ভাবনাই বিভক্ত অস্তিত্বের মিথ্যার প্রধান সমর্থক; সুতরাং এর ফলপ্রসূ প্রতিকার হল এই অহং-ভাবনা থেকে মুক্ত হওয়া এবং এর বিপরীত ভাবনায় অর্থাৎ ঐক্যের ভাবনায়, প্রকৃতির এক অবিভক্ত আত্মার, এক অবিভক্ত চিৎপুরুষের ও এক অবিভক্ত সত্তার ভাবনায় অধিষ্ঠিত হওয়া; এও এককভাবে একান্ত ফলপ্রসূ নয়। কারণ যদিও অহং নিজেকে এই অহং-ভাবনার দ্বারা, "অহম্-বুদ্ধির" দ্বারা সমর্থন করে, তবু এ যে একরকম দৃঢ়তা ও তীব্র অনুরাগের সঙ্গে স্থায়ী হয় সে বিষয়ে অহং-এর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সহায় হল ইন্দ্রিয়মানস, প্রাণ ও দেহের সাধারণ ক্রিয়া। যতদিন না এই সব করণগুলিকে শুদ্ধ করা হয় ততদিন অহং-ভাবনার নিরসন সম্পূর্ণ সম্ভব হয় না অথবা সম্পূর্ণ সফল হয় না; কারণ তাদের ক্রিয়া অশ্রান্তভাবে অহমাত্মক ও পার্থক্যমূলক হওয়ায় তারা বুদ্ধিকে বিপথে নিয়ে যায় যেমন, গীতার কথায় সমুদ্রের উপর বাতাস নিয়ে যায় নৌকাকে —

(বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি), বুদ্ধির মধ্যে জ্ঞান সর্বদাই আচ্ছন্ন হয় অথবা সাময়িকভাব লোপ পায় এবং তাকে আবার ফিরে পেতে হয়, এ যেন গ্রীসীয় উপকথার সিসিফাসের চিরন্তন পরিশ্রম। কিন্তু যদি নিম্ন করণগুলিকে অহমাত্মক কামনা, ইচ্ছা, সঙ্কল্প, অহমাত্মক প্রচণ্ড অনুরাগ, অহমাত্মক ভাবাবেগ থেকে শুদ্ধ করা হয় এবং স্বয়ং বুদ্ধিকে শুদ্ধ করা হয় অহমাত্মক ভাবনা ও অভিরুচি থেকে তাহলে একত্বের আধ্যাত্মিক সত্যের জ্ঞান সক্ষম হয় এক দৃঢ় প্রতিষ্ঠা পেতে। তা না হওয়া পর্যন্ত অহং সকল রকম সূক্ষ্ম আকার গ্রহণ করে, আমরা মনে করি আমরা তা থেকে মুক্ত হয়েছি, অথচ আসলে আমরা তখনো তারই যন্ত্র হিসেবে কাজ করছি, আমরা যা পেয়েছি তা বড় জোর এক বুদ্ধিগত সমতা, কিন্তু এ প্রকৃত আধ্যাত্মিক মুক্তি নয়। তাছাড়া, অহং-এর সক্রিয় বোধ বিসর্জন দেওয়াই যথেষ্ট নয়; তা শুধু আনতে পারে মানসিকতার এক নিষ্ক্রিয় অবস্থা, রাজসিক অহং-ভাবের স্থানে আসতে পারে বিভক্ত সত্তার এক প্রকার নিষ্ক্রিয়, নিশ্চেষ্ট শান্তি, কিন্তু এও সত্যকার মুক্তি নয়। অহং-বোধ দূর ক'রে তার স্থলে আনা চাই বিশ্বাতীত ভগবানের সঙ্গে ও বিশ্বসত্তার সঙ্গে একত্ব।

এই একত্ব আবশ্যক কেন না বুদ্ধি হল নানাবিধ ক্রীড়ার মধ্যে অহং-বোধের, অহঙ্কারের শুধু এক প্রতিষ্ঠা বা প্রধান আশ্রয়; কিন্তু মূলতঃ এ আমাদের আধ্যাত্মিক সত্তার এক সত্যের হীন অবস্থা অথবা বিকৃতি। সত্তার সত্য এই — এক বিশ্বাতীত সন্মাত্র, পরম আত্মা বা চিৎপুরুষ, অস্তিত্বের এক কালাতীত পুরুষ, এক সনাতন, এক ভগবান বিদ্যমান, অথবা পরম দেবতা সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত মানসিক ভাবনার তুলনায় আমরা একে বলতেও পারি যে এ এক অতি-ভগবান যিনি এখানে সর্বগত, সর্বগ্রাহী, সর্বপ্রবর্তক, ও সর্বনিয়ন্তা, এক মহান্ বিশ্বাত্মক চিৎপুরুষ; আর জীব হল সনাতনের সত্তার চিন্ময় শক্তি যা নিত্যকাল ধরে তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন সম্বন্ধ স্থাপনে সমর্থ অথচ আবার তাঁর সঙ্গে এক, তার নিজের শাশ্বত অস্তিত্বের বাস্তবতার মর্মলোকে। এ হল এক সত্য যা অবধারণ করতে বুদ্ধি সক্ষম এবং একবার একে শুদ্ধ করা হলে এ গৌণভাবে তাকে প্রতিফলিত, সঞ্চালিত, ধারণ করতে সক্ষম, কিন্তু একে পুরোপুরি উপলব্ধি, সার্থক ও কার্যকরী করা সম্ভব হয় কেবল চিৎপুরুষের মধ্যে। যখন আমরা চিৎপুরুষের মধ্যে বাস করি, তখন আমরা যে আমাদের সত্তার এই সত্যকে শুধু জানি তা নয়, আমরা সেই সত্য হই। তখন জীব চিৎপুরুষের মধ্যে, চিৎপুরুষের আনন্দের মধ্যে উপভোগ করে বিশ্বময় অস্তিত্বের সঙ্গে তার একত্ব, কালাতীত ভগবানের সঙ্গে তার একত্ব এবং অন্য সকল সত্তার সঙ্গে তার একত্ব, আর এই হল অহং থেকে আধ্যাত্মিক মুক্তির মৌলিক অর্থ। কিন্তু যে মুহূর্তে পুরুষ মানসিক সীমার দিকে ঝোঁকে, তখন আধ্যাত্মিক পৃথকত্বের কিছু বোধ আসে, এই বোধের নিজের আনন্দ আছে বটে, কিন্তু এ যে কোন মুহূর্তে পর্যবসিত হতে পারে সম্পূর্ণ অহং-বোধে, অজ্ঞানতায়, একত্বের বিস্মৃতিতে। এই পৃথকত্ব থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য কেউ কেউ চেষ্টা করে নিজেকে ভগবানের ভাবনায় ও উপলব্ধিতে তন্ময় করে রাখতে, আর আধ্যাত্মিক তপস্যার

কতকগুলি পন্থায়, জীবসত্তাকে বিলোপ করার দিকে এবং নিমজ্জনের সমাধির মধ্যে ভগবানের সঙ্গে সকল ব্যক্তিগত অথবা বিশ্বজনীন সম্বন্ধ বিসর্জন দেবার দিকে প্রয়াসের প্রবণতা আসে, অন্য পন্থাগুলিতে এ হয়ে ওঠে তন্ময়ভাবে তাঁর মধ্যে নিবাস, আর তা এই জগতে নয়, অথবা তাঁর সামীপ্যে সতত তন্ময় বা একচিত্ত হয়ে জীবনধারণ, "সাযুজ্য, সালোক্য, সামীপ্য মুক্তি"। পূর্ণযোগের জন্য যে পন্থা বলা হয় তা হল — সমগ্র সত্তাকে ভগবানের নিকট উত্তোলন ও সমর্পণ করা যাতে আমরা যে শুধু আমাদের আধ্যাত্মিক অস্তিত্বে তাঁর সঙ্গে এক হই তা নয়, তাঁর মধ্যে আমরা বাসও করি ও তিনিও আমাদের মধ্যে বাস করেন, আর এইভাবে সমগ্র প্রকৃতি তাঁর উপস্থিতিতে পূর্ণ হয় এবং রূপান্তরিত হয় দিব্য প্রকৃতিতে; আমরা হয়ে উঠি ভগবানের সঙ্গে এক অবিভক্ত চিৎপুরুষ ও চেতনা ও প্রাণ ও ধাতু এবং একই সাথে আমরা ঐ একত্বের মধ্যে বাস ও বিচরণ করি এবং তার নানাবিধ আনন্দ লাভ করি। অহং থেকে দিব্য চিৎপুরুষের ও প্রকৃতির মধ্যে এই যে অখণ্ড মুক্তি তা আমাদের বর্তমান স্তরে শুধু আপেক্ষিকভাবে সম্পূর্ণ হতে পারে, তবে এ একান্ত হতে শুরু করে যখন আমরা উন্মীলিত হই বিজ্ঞানের দিকে ও উত্তরণ করি তার মধ্যে। এই হল মুক্ত সিদ্ধি।

অহং থেকে মুক্তি, কামনা থেকে মুক্তি — এই দুই মিলে রচনা করে কেন্দ্রীয় আধ্যাত্মিক মুক্তির ভিত্তি। বিশ্বের মধ্যে আমি এক পৃথকভাবে স্বয়ম্ভূ সত্তা — এই বোধ, এই ভাবনা, এই অনুভূতি, আর ঐ অনুভূতির ছাঁচে সত্তার চেতনা ও শক্তিকে গঠন করা — এরাই সকল কষ্টভোগ, অজ্ঞানতা ও অশুভের মূল। আর তা হওয়ার কারণ এই যে এ বিষয়সমূহের সমগ্র প্রকৃত সত্যকে ব্যবহারে ও জ্ঞানে মিথ্যারূপ দেয়; এ সত্তাকে সীমিত করে, চেতনাকে সীমিত করে, আমাদের সত্তার শক্তিকে সীমিত করে, আমাদের সত্তার আনন্দকে সীমিত করে; আবার এই সব সীমার দরুন উৎপন্ন হয় অস্তিত্বের এক ভুল পথ, চেতনার এক ভুল পথ, আমাদের চেতনা ও সত্তার শক্তি ব্যবহারের এক ভুল প্রণালী, অস্তিত্বের আনন্দের বিভিন্ন ভ্রমাত্মক, বিকৃত ও বিপরীত রূপ। সত্তায় সীমিত ও পারিপার্শ্বিকের মধ্যে নিজে একক হয়ে পুরুষ ও তার আত্মার সঙ্গে, ভগবানের সঙ্গে, বিশ্বের সঙ্গে, চারিদিককার সকলের সঙ্গে ঐক্য ও সামঞ্জস্যের অনুভব পায় না; বরং সে দেখে যে বিশ্বের সঙ্গে তার অসামঞ্জস্য, অন্য সকল সত্তার সঙ্গে তার বিরোধ ও বৈষম্য, এই সব সত্তা তারই অন্য আত্মা অথচ সে এদের সঙ্গে ব্যবহার করে অনাত্মা হিসেবে; আর যতদিন এই বৈষম্য ও অসামঞ্জস্য বজায় থাকে, ততদিন সে তার জগৎকে অধিকার করতে অক্ষম হয়, বিশ্ব প্রাণের উপভোগে অক্ষম হয়, বরং নিজেকে রক্ষা ও বৃদ্ধি করার জন্য ও পারিপার্শ্বিক সব কিছুকে আয়ত্তে আনার জন্য যাতনাময় সংঘর্ষের মধ্যে অশান্তি, ভয়, সকল প্রকার কষ্টে জরজর থাকে — কারণ আপন জগৎকে নিজের আয়ত্তে আনা হল অনন্ত চিৎপুরুষের স্বভাব এবং সর্বসত্তার মধ্যে স্বাভাবিক প্রেরণা। এই পরিশ্রম ও চেষ্টা থেকে সে যা সব তৃপ্তি পায় সে সব সঙ্কীর্ণ, বিকৃত ও অসন্তোষজনক রকমের: তার একমাত্র আসল তৃপ্তি হল বিকাশের তৃপ্তি, নিজের দিকে উত্তরোত্তর অধিক প্রত্যাবর্তনের

তৃপ্তি, সুষমা ও সামঞ্জস্যের কিছু উপলব্ধির তৃপ্তি, সকল আত্মসৃষ্টি ও আত্মচরিতার্থতার তৃপ্তি, কিন্তু অহং-চেতনার ভিত্তির উপর সে এই সব বিষয়ের যৎসামান্য যা সাধন করতে পারে তা সর্বদাই সীমিত, অনিশ্চিত, অপূর্ণ ও ক্ষণস্থায়ী। তাছাড়া সে নিজের আত্মারও সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত — প্রথমতঃ এই কারণে যে তখন তার নিজের সত্তার কেন্দ্রীয় সামঞ্জস্যবিধায়ক সত্য আর তার অধিকারে না থাকায় সে তার প্রাকৃত অঙ্গসমূহকে যথাযোগ্যভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে অথবা তাদের বিভিন্ন প্রবণতা, শক্তি ও দাবীর মধ্যে মিল আনতে অক্ষম; সামঞ্জস্যের রহস্য সে পায়নি, কারণ সে তার নিজের ঐক্য ও আত্ম-অধিকারের রহস্য পায়নি; আর, দ্বিতীয়তঃ তার শ্রেষ্ঠ আত্মা তার অধিকারে না থাকায় তা পাবার জন্য তাকে সংগ্রাম করতে হয় আর যতদিন না সে তার নিজের প্রকৃত শ্রেষ্ঠ সত্তা লাভ করে ততদিন তাকে শান্তিতে থাকতে দেওয়া হয় না। এই সবের অর্থ এই যে সে ভগবানের সঙ্গে এক নয়; কারণ ভগবানের সঙ্গে এক হওয়ার অর্থ নিজের সঙ্গে এক হওয়া, বিশ্বের সঙ্গে এক হওয়া এবং সকল সত্তার সঙ্গে এক হওয়া। এই একত্বই হল এক যথার্থ অস্তিত্বের ও এক দিব্য অস্তিত্বের রহস্য। কিন্তু অহং এই রহস্য পেতে অক্ষম, কারণ এর যা স্বরূপ তাতে এ হল পার্থক্যমূলক; আর এমনকি আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে এবং আমাদের নিজেদের মনস্তাত্ত্বিক অস্তিত্বের সম্বন্ধেও এ ঐক্যের এক মিথ্যা কেন্দ্র; কেন না, এর চেষ্টা হল পরিবর্তনশীল মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক ব্যক্তিসত্ত্বের সঙ্গে একাত্মতা বোধের মধ্যে আমাদের সত্তার ঐক্য পাওয়া, আমাদের সমগ্র অস্তিত্বের সনাতন আত্মার সঙ্গে একাত্মতাবোধের মধ্যে ঐক্য পাবার জন্য তার চেষ্টা নয়। একমাত্র আধ্যাত্মিক আত্মার মধ্যেই আমরা প্রকৃত ঐক্য লাভে সক্ষম; কারণ সেখানেই জীব তার নিজের সমগ্র সত্তায় প্রসারিত হয় এবং দেখে যে সে নিজে বিশ্ব অস্তিত্বের সঙ্গে এবং বিশ্বাতীত দিব্যত্বের সঙ্গে এক।

অস্তিত্ব সম্বন্ধে এই ভ্রান্ত অহমাত্মক ও পার্থক্যমূলক প্রণালীই পুরুষের সকল অশান্তি ও কষ্টভোগের মূল। পুরুষ তার চেতনায় সীমিত হওয়ায় নিজের মুক্ত আত্ম-অস্তিত্বের অধিকার পায় না, অর্থাৎ সে "অনাত্মবান্" এবং এইভাবে সে জ্ঞানে সীমিত; আর এই সীমিত জ্ঞান মিথ্যাজনক জ্ঞানের আকার নেয়। সত্য জ্ঞানে ফিরে যাবার জন্য সংগ্রাম করাই উপায় হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু বিভক্ত মনের মধ্যে অহং সন্তুষ্ট থাকে জ্ঞানের বিভিন্ন অবভাস ও খণ্ড নিয়ে; এইগুলিকে এ জোড়া দিয়ে তৈরী করে এক মিথ্যাময় বা এক অপূর্ণ সমগ্র অথবা নিয়ন্ত্রণকারী প্রত্যয়, কিন্তু এই জ্ঞান শেষ পর্যন্ত মিথ্যা হয়ে দাঁড়ায় এবং তাকে ত্যাগ করতে হয় জ্ঞাতব্য যে একটিমাত্র বিষয় তার জন্য নতুন ক'রে অনুসন্ধানের জন্য। ঐ একমাত্র বিষয় হল ভগবান, আত্মা, চিৎপুরুষ যাঁর মধ্যে বিশ্বময় ও জীবসত্তা অবশেষে লাভ করে তাদের যথার্থ প্রতিষ্ঠা এবং তাদের যথার্থ সব সৌষম্য। তাছাড়া, অহং-বদ্ধ পুরুষ শক্তিতে সীমিত হওয়ায় বহুবিধ অসামর্থ্যে ভরা থাকে; ভ্রান্ত জ্ঞানের সঙ্গে থাকে সত্তার ভ্রান্ত সঙ্কল্প, বিভিন্ন ভ্রান্ত প্রবৃত্তি ও সংবেগ; আর এই ভ্রান্তি সম্বন্ধে তীব্র বোধই পাপ সম্বন্ধে মানব চেতনার মূল কারণ। তার প্রকৃতির এই ত্রুটিকে

সে সংশোধন করতে চেষ্টা করে আচরণের এমন সব মান দিয়ে যার সাহায্যে পাপের অহমাত্মক চেতনা ও সব তুষ্টিকে দূর করা যায় পুণ্যের অহমাত্মক চেতনা ও আত্মতুষ্টির দ্বারা অর্থাৎ রাজসিক অহং-ভাবকে দূর করার চেষ্টা করা হয় সাত্ত্বিক অহং-ভাবের দ্বারা। কিন্তু আদি পাপের উপশম আবশ্যক; এই আদি পাপ হল ভাগবত সত্তা ও ভাগবত সঙ্কল্প থেকে নিজের সত্তা ও সঙ্কল্পের বিচ্ছিন্নতা; যখন সে ভাগবত সঙ্কল্প ও সত্তার সঙ্গে ঐক্যে ফিরে আসে তখন সে পাপ পুণ্য ছাড়িয়ে ওঠে তার নিজের দিব্যপ্রকৃতির অনন্ত স্বপ্রতিষ্ঠ শুদ্ধতায় ও দৃঢ়তায়। তার বিভিন্ন অসামর্থ্যগুলিকে এ সংশোধন করতে চেষ্টা করে তার অপূর্ণ জ্ঞান সংহত ক'রে, এবং তার অর্ধ-আলোকিত সঙ্কল্প ও শক্তিকে সংযত ক'রে এবং তাদের চালিত ক'রে যুক্তিবুদ্ধির কিছু সুশৃঙ্খল চেষ্টার দ্বারা; কিন্তু তার ফল সর্বদাই কর্মসামর্থ্যের সীমিত, অনিশ্চিত, পরিবর্তনশীল ও ত্রুটিপূর্ণ পথ ও মান হতে বাধ্য। যখন সে মুক্ত চিৎপুরুষের বিশাল ঐক্যের মধ্যে, ভূমার মধ্যে আবার ফিরে আসে, কেবল তখনই তার প্রকৃতির ক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে অনন্ত চিৎপুরুষের যন্ত্ররূপে এবং ঋত ও সত্য ও শক্তির পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে, যে ঋত, সত্য ও শক্তি হল অস্তিত্বের পরম কেন্দ্র থেকে ক্রিয়ারত মুক্ত পুরুষের অধিকারভুক্ত। আবার, সত্তার আনন্দে সীমিত হওয়ায়, সে চিৎপুরুষের দৃঢ়, স্বপ্রতিষ্ঠ পূর্ণ আনন্দ পেতে অথবা বিশ্বের যে আনন্দ, যে পরমানন্দ জগৎকে গতিশীল রাখে তা পেতে অক্ষম, সে শুধু সক্ষম সুখ ও দুঃখের, হর্ষ ও শোকের মিশ্রিত ও পরিবর্তনশীল পরম্পরার মধ্যে বিচরণ করতে, আর না হয় বাধ্য হয়ে আশ্রয় নেয় কোন চেতন নিশ্চেতনার অথবা নিরপেক্ষ উদাসীনতার মধ্যে। অহং-মানসের পক্ষে অন্য কিছু করা অসম্ভব, আর যে পুরুষ নিজেকে অহং-এর মধ্যে বহির্ভাবাপন্ন করেছে সে প্রায় শুধু অস্তিত্বের এই অসন্তোষজনক, গৌণ, অপূর্ণ, প্রায়শঃই বিকৃত, অশান্ত অথবা নিরাকৃত উপভোগ; অথচ আধ্যাত্মিক ও বিশ্বময় আনন্দ সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকে অন্তরে, আত্মার মধ্যে, চিৎপুরুষের মধ্যে, ভগবান ও অস্তিত্বের সঙ্গে গূঢ় ঐক্যের মধ্যে। অহং-এর শৃঙ্খল দূরে ফেলে দিয়ে মুক্ত আত্মায়, অমর আধ্যাত্মিক সত্তায় ফিরে যাওয়াই হল পুরুষের প্রত্যাবর্তন তার নিজের শাশ্বত দিব্যত্বের মধ্যে।

অপূর্ণ বিভক্ত সত্তার দিকে সঙ্কল্প হল সেই ভ্রান্ত তপস্ যার ফলে প্রকৃতির মধ্যে পুরুষ চেষ্টা করে নিজেকে ব্যষ্টিভাবাপন্ন করতে, তার সত্তাকে, চেতনাকে, সত্তার শক্তিকে, অস্তিত্বের আনন্দকে পৃথক অর্থে ব্যষ্টিভাবাপন্ন করতে, এই সব বিষয় পেতে তার নিজের ব'লে, তার নিজের অধিকারে, ভগবানের অধিকারে বা বিশ্বজনীন একত্বের অধিকারে নয় — এই সবের ফলেই এই ভ্রান্ত প্রবৃত্তি ও অহং-এর সৃষ্টি। সুতরাং এই আদি কামনা থেকে সরে সেই কামনারহিত সঙ্কল্পে ফিরে যাওয়া অত্যাবশ্যক যার সত্তার সমগ্র উপভোগ এবং সত্তায় সম্পূর্ণ সঙ্কল্প হল এক মুক্ত বিশ্বময় ও একীকারক আনন্দের উপভোগ ও সঙ্কল্প। এই যে দুটি বিষয় — কামনাময় সঙ্কল্প থেকে মুক্তি এবং অহং থেকে মুক্তি, — এরা একই, আর কামনাময় সঙ্কল্প ও অহং-এর সুখময় নাশের ফলে যে একত্ব আসে তা-ই মুক্তির সার।

নবম অধ্যায়

প্রকৃতির মুক্তি

আমাদের সত্তার এই যে দুটি দিক — চিন্ময় ভোক্তা পুরুষ ও কার্যনিষ্পাদিকা প্রকৃতি যে অনবরতই তার সব অভিজ্ঞতা পুরুষের কাছে নিবেদন করে বিবিধরূপে — এরাই মিলিত হয়ে নির্ধারণ করে আমাদের আন্তর অবস্থার সকল বৃত্তি ও এর বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া। প্রকৃতি দান করে ঘটনাসমূহের বৈশিষ্ট্য এবং অভিজ্ঞতার করণসমূহের বিভিন্নরূপ, আর পুরুষ তা দেখে এই সব ঘটনায় প্রতিক্রিয়ার প্রাকৃত সব নির্ধারণে সম্মতি দিয়ে, অথবা সঙ্কল্পের দ্বারা প্রকৃতির উপর অন্য নির্ধারণ আরোপ ক'রে। করণগত অহং-চেতনা ও কামনাত্মক সঙ্কল্প গ্রহণ করার অর্থ অনুভূতির যে বিভিন্ন নিম্নস্তরে আত্মা তার সত্তার দিব্যপ্রকৃতি ভুলে যায় তাদের মধ্যে তার পতনে তার প্রাথমিক সম্মতি দান। এই সব বিষয়ের বর্জন এবং মুক্ত আত্মায় ও সত্তার মধ্যে দিব্য আনন্দের সঙ্কল্পে প্রত্যাবর্তন — এই হল চিৎপুরুষের মুক্তি। কিন্তু অন্য দিকে আছে, এই জটিল মিশ্রণে প্রকৃতির নিজেরই সব অবদান, আর এইগুলি সে আরোপ করে তার সব ক্রিয়া ও রচনা সম্বন্ধে পুরুষের অভিজ্ঞতার উপর, — একবার যখন প্রাথমিক আদি সম্মতি দেওয়া হয়েছে, এবং সমগ্র বাহ্য কার্যাবলীর বিধান করা হয়েছে। প্রকৃতির মৌলিক অবদান দুইটি — বিভিন্ন গুণ ও দ্বন্দ্ব। এই যে প্রকৃতির নিম্ন ক্রিয়ার মধ্যে আমরা বাস করি তার কতকগুলি গুণাত্মক প্রকার আছে যা তার নিম্ন অবস্থার সমগ্র ভিত্তি। পুরুষের উপর তার মন, প্রাণ ও দেহের প্রাকৃত শক্তিতে এই সব গুণের যে ফল সতত ঘটে তা হল এক বৈষম্যপূর্ণ ও বিভক্ত অনুভূতি, বিভিন্ন বিপরীত বিষয়ের বিরোধ, "দ্বন্দ্ব", তার সকল অনুভূতিতে এক গতি, এবং সতত এক সাথে থাকে এমন বিপরীত যুগলের, মিলিত হচ্ছে এমন সদর্থক ও অসদর্থক বিষয়ের, বিভিন্ন দ্বন্দ্বের মধ্যে এক দোলায়মান অবস্থা অথবা তাদের মিশ্রণ। অহং এবং কামনার সঙ্কল্প থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি এলে তার সঙ্গে আসতে বাধ্য অপরা প্রকৃতির সব গুণাত্মক প্রকার ছাড়িয়ে এক উর্ধ্বের অবস্থা, "ত্রৈগুণ্যাতীত অবস্থা", এই মিশ্রিত ও বৈষম্যপূর্ণ অনুভূতি থেকে বিমুক্তি, প্রকৃতির দ্বন্দ্বময় ক্রিয়ার নিবৃত্তি বা সমাধান। কিন্তু এই দিকেও দুই রকমের মুক্তি পাওয়া যায়। প্রথম প্রকারের বিমুক্তি হল চিৎপুরুষের নিশ্চল আনন্দের মধ্যে প্রকৃতি থেকে মুক্তি। দিব্য গুণ ও জগৎ-অভিজ্ঞতার আধ্যাত্মিক শক্তির মধ্যে প্রকৃতির যে আরো অধিক মুক্তি লাভ হয়, তা পরা শান্তিকে ভরিয়ে দেয় জ্ঞান, শক্তি, হর্ষ ও কর্তৃত্বের পরম সক্রিয় আনন্দে। পরম চিৎপুরুষ ও তাঁর পরাপ্রকৃতির দিব্য ঐক্যই অখণ্ড মুক্তি।

প্রকৃতি চিৎপুরুষের শক্তি হওয়ায়, তার ক্রিয়া স্বরূপতঃ গুণাত্মক। একভাবে বলা যায় যে প্রকৃতি শুধু সত্তায় শক্তি এবং ক্রিয়ার মধ্যে চিৎপুরুষের "অনন্তগুণের" বিকাশ।

অন্য সব তার বাহ্য ও আরো যান্ত্রিক দিকের অন্তর্গত; কিন্তু গুণের এই খেলাই আসল জিনিস, বাকী সব এর পরিণাম ও যান্ত্রিক সংযোগ। একবার যদি আমরা মৌলিক শক্তি ও গুণের কর্মধারাকে সঠিক করি, তাহলে বাকীসব ভোক্তা পুরুষের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে। কিন্তু বিষয়সমূহের নিম্নপ্রকৃতিতে অনন্তগুণের খেলা সীমিত মাত্রার, এ হল এক বিভক্ত ও বিরোধপূর্ণ প্রণালীর অন্তর্গত, এমন সব বিপরীত ও বিষম বস্তুর বিন্যাস যাদের মধ্যে সামঞ্জস্যের কোন ব্যবহারিক গতিশীল বিন্যাস খুঁজে পেয়ে তা সক্রিয় রাখা দরকার; সামঞ্জস্যে-আনা বিভিন্ন বৈষম্য, সংঘর্ষে লিপ্ত বিভিন্ন গুণ, অভিজ্ঞতার এমন বিভিন্ন বিসদৃশ শক্তি ও পন্থা যাদের মধ্যে কোন এক কাজচলা গোছের আংশিক, অত্যন্ত অনিশ্চিত সম্মতি জোর করে আনা হয়েছে, এক অস্থির, পরিবর্তনশীল ভারসাম্য — এই সবের এই যে ক্রীড়া তা চালনা করা হয় এমন তিনটি গুণাত্মক প্রকারের মৌলিক কর্মধারার দ্বারা যেগুলি তার সকল সৃষ্টিতেই সংঘর্ষে আসে ও একত্র মিলিত হয়। সাংখ্য দর্শনে এই তিনটি প্রকারের এই তিনটি নাম দেওয়া হয়েছে — সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ[১]; ভারতে দর্শন ও যোগের সকল সম্প্রদায়ই সাধারণতঃ এই উদ্দেশ্যে সাংখ্য দর্শনের কথা গ্রহণ করেছে। তমঃ হল নিশ্চেষ্টতার তত্ত্ব ও শক্তি; রজঃ — গতিশীলতা, উগ্রভাব, প্রযত্ন, সংগ্রাম, প্রবর্তনার ("আরম্ভের") তত্ত্ব; সত্ত্ব — আত্তীকরণ, সাম্য ও সামঞ্জস্যের তত্ত্ব। এই শ্রেণীবিভাগের দার্শনিক দিক সম্বন্ধে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু এর যে মনস্তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক দিক তাতে এর ব্যবহারিক গুরুত্ব প্রভূত, কারণ এই তিনটি তত্ত্ব সকল বিষয়েই প্রবেশ করে, তাদের নিজ নিজ সক্রিয় প্রকৃতির প্রবণতা দেবার জন্য এবং ফল ও কার্যসাধন আনার জন্য তারা মিলিত হয়, এবং পুরুষ অনুভূতিতে তাদের অসম ক্রিয়াই আমাদের সক্রিয় ব্যক্তিভাবনার, আমাদের ধাতের, প্রকৃতির জাতিরূপের এবং অভিজ্ঞতায় মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যের গঠনমূলক শক্তি। আমাদের মধ্যে ক্রিয়া ও অনুভূতির স্বরূপ নির্ধারিত হয় প্রকৃতির এই তিন গুণের বা প্রকারের মধ্যে কোনটি প্রবল ও তাদের পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার অনুপাত কিরকম তার দ্বারা। পুরুষ তার ব্যক্তিভাবনার মধ্যে যেন তাদের ছাঁচেই চলতে বাধ্য হয়; তাছাড়া, প্রায়শঃই তাদের উপর তার কোন স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ থাকার চেয়ে বরং সে-ই নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের দ্বারা। পুরুষের স্বাধীন হবার একমাত্র উপায় হল তাদের অসম ক্রিয়ার যাতনাক্লিষ্ট সংঘর্ষ ও তাদের সব অপ্রচুর মিল, সমবায় ও অনিশ্চিত সামঞ্জস্যের ঊর্ধ্বে আরোহণ করা এবং এই সব বর্জন করা, তা এই কাজ তাদের ক্রিয়ার অর্ধ-নিয়ন্ত্রিত বিশৃঙ্খলা থেকে সম্পূর্ণ উপশমের অর্থেই হ'ক, অথবা প্রকৃতির এই নিম্ন প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে এক অতীত অবস্থার এবং তাদের কর্মধারার উচ্চতর নিয়ন্ত্রণ বা রূপান্তরের অর্থেই হ'ক। হয় সকল গুণের শূন্যতা, নয় তাদের অতীত অবস্থা — এদুটির একটি লাভ করা অবশ্য কর্তব্য।

[১] কর্মযোগে এই বিষয়টির আলোচনা হয়েছে। এখানে এর পুনরুল্লেখ করা হচ্ছে প্রকৃতির সাধারণ চরিত্র এবং সত্তার সম্পূর্ণ মুক্তির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

আমাদের প্রাকৃত সত্তার সকল অংশই এই ত্রিগুণের প্রভাবাধীন। অবশ্য, মন, প্রাণ ও দেহ — এই তিন বিভিন্ন অঙ্গে তাদের এক একটির প্রভাব অন্যগুলির অপেক্ষা বেশী। নিশ্চেষ্টতার তত্ত্ব, তমসের প্রভাব সবচেয়ে বেশী জড় প্রকৃতিতে ও আমাদের অন্নময় সত্তাতে। এই তত্ত্বের ক্রিয়া দুই প্রকারের — শক্তির নিশ্চেষ্টতা ও জ্ঞানের নিশ্চেষ্টতা। যা কিছুর উপর তমসের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল, তার শক্তি ঝোঁকে অলস নৈষ্কর্ম্য ও নিশ্চলতার দিকে, আর না হয় এমন এক যান্ত্রিক ক্রিয়ার দিকে যার উপর তার অধিকার নেই, বরং যা এমন সব দুর্বোধ্য শক্তির অধিকারভুক্ত যেগুলি তাকে চালায় ক্রিয়াশক্তির যান্ত্রিক পাকে; ঠিক সেইভাবে এর চেতনাকে তমঃ পরিবর্তিত করে এক নিশ্চেতনাতে অথবা এক আবৃত অবচেতনাতে, অথবা এক অনিচ্ছুক, মন্থর বা কোন প্রকারের, যান্ত্রিক সচেতন ক্রিয়ায় যাতে তার নিজের শক্তির ভাবনা থাকে না, বরং যা এমন এক ভাবনার দ্বারা চালিত হয় যে মনে হয় সে তার বাইরের বিষয় অথবা কমপক্ষে তার সক্রিয় বোধ থেকে প্রচ্ছন্ন। যেমন, আমাদের দেহের তত্ত্বের যা প্রকৃতি তাতে এ নিশ্চেষ্ট, অবচেতন এবং যান্ত্রিক ও অভ্যস্ত আত্মচালনা ও ক্রিয়া ছাড়া অন্য কিছু করতে অসমর্থ: যদিও অন্য সব কিছুর মতো এরও অবস্থায় ও ক্রিয়াতে এক গতিশীলতার তত্ত্ব ও সাম্যের তত্ত্ব থাকে আর থাকে প্রতিক্রিয়া ও গূঢ় চেতনার এক স্বগত তত্ত্ব; এর রাজসিক প্রবৃত্তির বেশীর ভাগই পাওয়া যায় প্রাণশক্তি থেকে এবং সকল গূঢ় চেতনা পাওয়া যায় মনোময় সত্তা থেকে। রজঃ তত্ত্বের সব চেয়ে বেশী প্রভাব হল প্রাণিক প্রকৃতির উপর। আমাদের মধ্যে প্রাণই সবচেয়ে প্রবল গতিকারক চালক শক্তি, কিন্তু পার্থিব জীবের মধ্যে প্রাণশক্তি কামনাশক্তির আয়ত্তাধীন থাকে ব'লে রজঃর প্রবৃত্তি সর্বদাই ক্রিয়া ও কামনার দিকে; মানুষ ও পশুর মাঝে অধিকাংশ গতিশীলতা ও ক্রিয়ার প্রবলতম প্রবর্তক হল কামনা, আর এটি এতই প্রবল যে অনেকে মনে করে যে এই হল সকল ক্রিয়ার উৎপাদক এবং এমনকি আমাদের সত্তার প্রভব। তাছাড়া রজঃ দেখে যে এ এমন এক জড় জগতের মধ্যে অবস্থিত যার আরম্ভ এক নিশ্চেতনার তত্ত্ব এবং যন্ত্রের মতো চালিত নিশ্চেষ্টতা থেকে এবং সেজন্য তাকে কাজ করতে হয় এক বিপুল বিপরীত শক্তির বিরুদ্ধে; সেজন্য এর সকল ক্রিয়াই হয়ে ওঠে পাবার জন্য এক চেষ্টা, সংগ্রাম, অবরুদ্ধ ও ব্যাহত সংঘর্ষ যা পদে পদে কষ্ট পায় সঙ্কীর্ণতাজনক অসামর্থ্য, নৈরাশ্য ও দুঃখভোগের দরুন: এমনকি এ যা লাভ করে তা-ও অনিশ্চিত ও সীমিত এবং চেষ্টার প্রতিক্রিয়া এবং পরে এর অপ্রচুরতা ও নশ্বরতার আস্বাদনের ফলে এর গুণ নষ্ট হয়। সত্ত্বতত্ত্বের সবচেয়ে বেশী প্রভাব হল মনে, কিন্তু মনের যে নিম্ন অংশগুলি রাজসিক প্রাণশক্তির আয়ত্তাধীন তাদের উপর এই প্রভাব তত বেশী নয়, বুদ্ধি এবং যুক্তিবুদ্ধির সঙ্কল্পের মধ্যেই এর প্রভাব বেশী। বুদ্ধি, যুক্তিবুদ্ধি, বুদ্ধিপ্রধান সঙ্কল্প তাদের প্রবল তত্ত্বের স্বভাবের প্রভাবে সর্বদাই চেষ্টা করে আত্তীকরণের জন্য — জ্ঞানের দ্বারা আত্তীকরণ ও বোধময় সঙ্কল্পের শক্তির দ্বারা আত্তীকরণ এবং সর্বদাই চেষ্টা করে সাম্য, কিছু স্থিরতা, নিয়ম, স্বাভাবিক ঘটনা ও অনুভূতির পরস্পরবিরোধী অংশগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য

স্থাপনের জন্য। এই তৃপ্তি এ পায় নানা ভাবে এবং নানা পরিমাণে। আত্তীকরণ, সাম্য ও সামঞ্জস্য প্রাপ্তির সাথে সর্বদাই থাকে আরাম, সুখ, কর্তৃত্ব, নিশ্চয়তার এক আপেক্ষিক কিন্তু অল্পবিস্তর তীব্র ও তৃপ্তিজনক বোধ; রাজসিক কামনা ও প্রচণ্ড ভাবাবেগের তৃপ্তিতে যে সব অশান্ত ও উগ্র আমোদ অনিশ্চিতভাবে পাওয়া যায় সে সব থেকে ঐ বোধ ভিন্ন। সত্ত্বগুণের বৈশিষ্ট্য হল আলো ও সুখ। দেহধারী প্রাণবন্ত মনোময় পুরুষের সমগ্র প্রকৃতিই নির্ধারিত হয় এই তিনগুণের দ্বারা।

কিন্তু এই গুণগুলি হল আমাদের জটিল গঠনের প্রতি অংশের বিভিন্ন প্রবল শক্তিমাত্র। আমাদের জটিল মনস্তাত্ত্বিক গঠনের প্রতি তন্ত্রীতে ও প্রতি অংশে এই তিনটি গুণ মিশ্রিত, সংযুক্ত এবং সংঘর্ষরত থাকে। এরা মানসিক চরিত্র রচনা করে, আর রচনা করে আমাদের যুক্তিবুদ্ধির চরিত্র, আমাদের সঙ্কল্পের চরিত্র এবং আমাদের নৈতিক, সৌন্দর্যগ্রাহী, ভাবময়, স্ফুরন্ত ও ইন্দ্রিয়বোধাশ্রিত সত্তার চরিত্র। তমঃ নিয়ে আসে সেই সকল অজ্ঞানতা, নিশ্চেষ্টতা, দুর্বলতা, অসামর্থ্য যা আমাদের প্রকৃতিকে ক্লিষ্ট করে, আর আনে এক তমসাচ্ছন্ন যুক্তিবুদ্ধি, নির্জ্ঞান, বুদ্ধিহীনতা, অভ্যস্ত ধারণা ও যান্ত্রিক ভাবনায় আসক্তি, চিন্তা করায় ও জানায় অস্বীকৃতি, ক্ষুদ্র মন, বদ্ধ পথ, মানসিক অভ্যাসের ঘুরে ঘুরে ভ্রমণ, অন্ধকার ও অর্ধ-অন্ধকারে ঢাকা স্থানগুলি। তমঃ আনে অশক্ত সঙ্কল্প, বিশ্বাসের অভাব, আত্ম-প্রত্যয়হীনতা, ও প্রবর্তনাশক্তির অভাব, কার্যে অনিচ্ছা, চেষ্টা ও আস্পৃহা থেকে বিরতি, দীন ও সঙ্কীর্ণ মনোভাব, এবং আমাদের নৈতিক ও স্ফুরন্ত সত্তায় আনে নিশ্চেষ্টতা, ভীরুতা, নীচতা, জড়তা, ক্ষুদ্র ও হীন প্রেরণায় শ্লথ বশ্যতা, আমাদের নিম্ন প্রকৃতির কাছে দুর্বল নতিস্বীকার। আমাদের ভাবময় প্রকৃতিতে তমঃ নিয়ে আসে সংবিৎহীনতা, উপেক্ষা, সমবেদনার ও উন্মুক্ততার অভাব, বদ্ধ অন্তরাত্মা, নির্দয় হৃদয়, শীঘ্র-ফুরিয়ে-যাওয়া স্নেহ, বেদনার অবসাদ, আর আমাদের সৌন্দর্যগ্রাহী ও ইন্দ্রিয়বোধাশ্রিত প্রকৃতিতে আনে নিস্তেজ সৌন্দর্যস্পৃহা, প্রতিক্রিয়ার সীমিত ক্ষেত্র, সৌন্দর্যে অসাড়তা, সেই সব কিছু যা মানুষকে স্থূল, জড় ও অশিষ্টভাবাপন্ন করে। আমাদের সাধারণ সক্রিয় প্রকৃতির যা সব শুভ ও অশুভ সে সব রজঃর দান; প্রচুর পরিমাণে সত্ত্ব গুণের দ্বারা বিশুদ্ধ না হলে, এর পরিণতি হল অহং-ভাব, স্বেচ্ছাচার ও হিংসাত্মক কার্য, যুক্তিবুদ্ধির বিকৃত, দুরাগ্রহী বা অতিরঞ্জক ক্রিয়া, পূর্বধারণা, স্বমতে আসক্তি, প্রমাদে অনুরাগ, সত্যের বদলে বিভিন্ন কামনা ও অভিরুচির নিকট বুদ্ধির দাসত্ব, ধর্মান্ধ বা সাম্প্রদায়িক মন, স্বৈরিতা, গর্ব, ঔদ্ধত্য, স্বার্থপরতা, দুরাকাঙ্ক্ষা, কাম, লোভ, নিষ্ঠুরতা, ঘৃণা, ঈর্ষ্যা, প্রেমের অহং-ভাব, সকল দুরাচার ও তীব্র ভাবাবেগ, সৌন্দর্যবোধের আতিশয্য, ইন্দ্রিয়বোধাশ্রিত ও প্রাণিক সত্তার বিভিন্ন ব্যাধি ও বিকৃতি। তমঃ তার নিজের অধিকারে উৎপাদন করে স্থূল, নিস্তেজ ও অজ্ঞানতাময় প্রকৃতির মানুষ, রজঃ তৈরী করে ক্রিয়া, প্রচণ্ডভাব ও কামনার দ্বারা চালিত তেজস্বী, অস্থির ও কর্মচঞ্চল মানুষ। সত্ত্ব তৈরী করে উচ্চতর প্রকৃতির মানুষ। সত্ত্বের দান হল যুক্তিবুদ্ধি ও সাম্যের মন, নিঃস্বার্থ সত্যান্বেষী উন্মুক্ত বুদ্ধির স্বচ্ছতা, যুক্তিবুদ্ধির অধীন বা নৈতিক ভাবের দ্বারা চালিত সঙ্কল্প, আত্মসংযম, সমত্ব, শান্তি, প্রেম, সমবেদনা, মার্জিতরুচি,

পরিমিততা, সৌন্দর্যগ্রাহী ও ভাবময় মনের সূক্ষ্মতা, ইন্দ্রিয়বোধাশ্রিত সত্তায় কোমলতা, সমুচিত গ্রহণশীলতা, মিতাচার ও স্থৈর্য্য, প্রভুত্বশালী বুদ্ধির বশীভূত ও নিয়ন্ত্রিত প্রাণশক্তি। সাত্ত্বিক মানবের উৎকৃষ্ট নিদর্শন হল দার্শনিক, সাধু ও জ্ঞানী, রাজসিক মানবের উৎকৃষ্ট নিদর্শন, রাজনীতিজ্ঞ, যোদ্ধা, কর্মবীর। কিন্তু সকল মানুষের মাঝেই অল্প কি বেশী পরিমাণে গুণের মিশ্রণ আছে, আর আছে এক বহুধা ব্যক্তিভাবনা এবং অধিকাংশেরই মধ্যে গুণের পরিমাণের পরিবর্তন আসে, কখন একটি গুণ প্রবল হয় পরে আবার অন্য একটি প্রবল হয়; এমনকি মানুষের প্রকৃতির যে রূপটি প্রবল, তাতেও বেশীর ভাগ মানুষই মিশ্র ধরনের। জীবনপটের সকল রঙ ও বৈচিত্র্যের কারণ এই বিভিন্ন গুণের বুননের জটিল বিন্যাস।

কিন্তু জীবনের সমৃদ্ধি, এমনকি মন ও প্রকৃতির সাত্ত্বিক সৌষম্যও আধ্যাত্মিক সিদ্ধি নয়। অবশ্য হয়ত এক আপেক্ষিক সিদ্ধি পাওয়া যায়, কিন্তু এই সিদ্ধি অসম্পূর্ণতার সিদ্ধি, কিছু আংশিক উচ্চতা, শক্তি, সৌন্দর্য, কিছু পরিমাণের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব, এমনকি কিছু সাম্য যা আরোপিত করা হয়েছে ও যার স্থায়িত্ব অনিশ্চিত। এক আপেক্ষিক কর্তৃত্ব আসে কিন্তু এ প্রাণের দ্বারা দেহের উপর কর্তৃত্ব অথবা মনের দ্বারা দেহের উপর কর্তৃত্ব, এ মোক্ষপ্রাপ্ত ও আত্ম-অধিকারী চিৎপুরুষের দ্বারা করণসমূহের উপর স্বচ্ছন্দ অধিকার নয়। আমরা যদি আধ্যাত্মিক সিদ্ধি পেতে চাই তাহলে গুণ তিনটিকে অতিক্রম করা দরকার। স্পষ্টতঃই তমঃকে জয় করা চাই, নিশ্চেষ্টতা ও অজ্ঞানতা ও অসামর্থ্য প্রকৃত সিদ্ধির অঙ্গ হতে পারে না; কিন্তু প্রকৃতির মাঝে তমঃকে জয় করা যায় একমাত্র রজঃর শক্তির দ্বারা আর তার সঙ্গে সত্ত্বের শক্তি উত্তরোত্তর বেশী পরিমাণে যোগ করে। রজঃকেও জয় করা চাই, অহং-ভাব, ব্যক্তিগত কামনা ও আত্মান্বেষী উগ্রভাব প্রকৃত সিদ্ধির অঙ্গ হতে পারে না; কিন্তু একে জয় করা যায় শুধু সত্ত্বর শক্তির দ্বারা যা সত্তাকে আলোকিত করবে আর আলোকিত করবে ক্রিয়ার শৃঙ্খল তমঃর শক্তিকে। সত্ত্ব নিজেও শ্রেষ্ঠ বা পূর্ণ সিদ্ধি দেয় না; সত্ত্ব সর্বদাই এক সীমিত প্রকৃতির গুণ; সাত্ত্বিক জ্ঞান হল এক সীমিত মানসিকতার আলো; সাত্ত্বিক সঙ্কল্প, — এক সীমিত বুদ্ধিসম্পন্ন শক্তির শাসন। তাছাড়া সত্ত্ব একলা প্রকৃতির মধ্যে কাজ করতে অক্ষম, সকল ক্রিয়ার জন্য একে নির্ভর করতে হয় রজঃর সাহায্যের উপর; সেজন্য এমনকি সাত্ত্বিক ক্রিয়াতেও সর্বদাই রজঃর সব অপূর্ণতা থাকতে বাধ্য। এমনকি সাধু, দার্শনিক ও জ্ঞানীর মনে ও ক্রিয়াতেও থাকে অহং-ভাব, বিমূঢ়তা, অসঙ্গতি, একদেশীয়তা, সীমিত ও স্ফীত সঙ্কল্প যা তার সব সঙ্কীর্ণতার তীব্রতায় নিজেকে বাড়িয়ে তোলে। যেমন রাজসিক ও তামসিক অহং-ভাব আছে, তেমন সাত্ত্বিক অহং-ভাবও আছে, সাত্ত্বিক অহং-ভাবের পরাকাষ্ঠা হল জ্ঞানের বা পুণ্যের অহং-ভাব; কিন্তু যে কোন প্রকারেরই হ'ক মনের অহং-ভাব থাকলে মুক্তি আসা অসম্ভব। সকল তিনটি গুণকেই অতিক্রম করা চাই। সত্ত্ব আমাদের নিয়ে যেতে পারে পরম আলোকের কাছে, কিন্তু যখন আমরা দিব্য প্রকৃতির জ্যোতির্মণ্ডিত দেহের মধ্যে প্রবেশ করি তখন সত্ত্বর সীমিত স্বচ্ছতা আমাদের কাছ থেকে চলে যায়।

এই ত্রিগুণাতীত অবস্থা সাধারণতঃ পেতে চেষ্টা করা হয় অপরা প্রকৃতির ক্রিয়া

থেকে সরে এসে। এই সরে আসার ফলে নৈষ্কর্ম্যের দিকে ঝোঁক বৃদ্ধি পায়। যখন সত্ত্ব নিজেকে প্রবল করতে চায় তখন সে চেষ্টা করে রজঃ থেকে নিষ্কৃতি পেতে এবং সেজন্য নৈষ্কর্ম্যের তামসিক তত্ত্বের সাহায্য নেয়; এইজন্য এক বিশেষ প্রকারের উৎকৃষ্ট সাত্ত্বিক মানুষ আন্তর সত্তার মধ্যেই গভীরভাবে বাস করে, তারা কর্মের বাহ্য জীবনে আদৌ থাকে না বললেই হয়, আর না হয়, থাকলেও থাকে অনুপযুক্ত ও অক্ষম হয়ে। মোক্ষসাধক এই দিকে আরো অগ্রসর হয়, তার প্রয়াস হল প্রাকৃত সত্তার উপর এক আলোকিত তমঃ আরোপ করা যাতে সত্ত্বগুণ নিজেকে বিলীন করতে পারে চিৎপুরুষের আলোকের মধ্যে, কারণ মুক্তিপ্রদ আলোকিত অবস্থার জন্য এই তমঃ অক্ষমতা অপেক্ষা বরং বেশী হল এক উপশম। দেহের উপর, কামনা ও অহং-গত সক্রিয় প্রাণপুরুষের উপর, বাহ্য মনের উপর এক অচঞ্চলতা ও নিস্তব্ধতা আরোপিত হয়, আর সাত্ত্বিক প্রকৃতি চেষ্টা করে ধ্যানের শক্তির দ্বারা, আরাধনার আত্যন্তিক একাগ্রতার দ্বারা, অন্তর্মুখী হয়ে পরমের দিকে নিবিষ্ট সঙ্কল্পের দ্বারা নিজেকে বিলীন করতে চিৎপুরুষের মধ্যে। নিবৃত্তিমূলক বিমুক্তির পক্ষে এটি পর্যাপ্ত হলেও, অখণ্ড সিদ্ধির মুক্তির পক্ষে এ কিন্তু পর্যাপ্ত নয়। এই মুক্তি নির্ভর করে নৈষ্কর্ম্যের উপর এবং সম্পূর্ণ স্বপ্রতিষ্ঠ ও একান্ত নয়; যে মুহূর্তে পুরুষ ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়, তখনই সে দেখে যে প্রকৃতির কাজ তখনো চলে পুরনো অপূর্ণ গতিতে। প্রকৃতি থেকে পুরুষের এক প্রকার মুক্তি আছে যা নৈষ্কর্ম্যের দ্বারা লাভ করা যায়, কিন্তু এটি প্রকৃতির মধ্যে পুরুষের সেই মুক্তি নয় যা কি কর্মে, কি নৈষ্কর্ম্যে সকল সময়েই পূর্ণ ও স্বপ্রতিষ্ঠ। এখন প্রশ্ন হল — এইরকম মুক্তি ও সিদ্ধি সম্ভবপর কিনা এবং এই পূর্ণ স্বাধীনতা পাবার সর্ত কি হতে পারে?

সাধারণ ধারণা এই যে এইরকম মুক্তি ও সিদ্ধি সম্ভবপর নয়, কারণ সকল ক্রিয়াই নিম্ন ত্রিগুণের অন্তর্গত, সুতরাং ত্রুটিপূর্ণ "সদোষম্" হতে বাধ্য, সব ক্রিয়ারই উৎপত্তির কারণ হল গুণত্রয়ের গতি বিষমতা, সাম্যের অভাব ও অস্থির সংঘর্ষ; কিন্তু যখন অসম গুণগুলি সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থায় আসে তখন প্রকৃতির সকল ক্রিয়ার সমাপ্তি হয়, আর পুরুষ বিশ্রাম করে নিশ্চলতার মধ্যে। আমরা বলতে পারি যে ভগবান হয় তাঁর নীরবতার মধ্যেই থাকতে পারেন, নয় প্রকৃতির মধ্যে কাজ করতে পারেন এর করণব্যবস্থার মধ্য দিয়ে, কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁকে নিতে হবে এর সংঘর্ষ ও অপূর্ণতার বেশ। দেহধারী অপূর্ণ মনোময় পুরুষের মধ্যে প্রকৃতির সঙ্গে বর্তমান সব সম্পর্ক সমেত মানবীয় চিৎপুরুষের মধ্যে ভগবানের সাধারণ ন্যস্ত ক্রিয়ার পক্ষে তা সত্য হতে পারে, কিন্তু সিদ্ধির দিব্য প্রকৃতির পক্ষে একথা সত্য নয়। ত্রিগুণের সংঘর্ষ হল অপরা প্রকৃতিতে অপূর্ণতার এক প্রতিরূপ মাত্র; এই তিনগুণ হল ভগবানের তিন স্বরূপগত শক্তির প্রতিরূপ, এই তিনশক্তি যে শুধু নিশ্চলতার এক সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থার মধ্যে অবস্থিত তা নয়, এরা দিব্য ক্রিয়ার এক সুষ্ঠু সামঞ্জস্যের মধ্যে মিলিত। আধ্যাত্মিক সত্তার মধ্যে তমঃ হয়ে ওঠে এক দিব্য শান্তি যা ক্রিয়ার নিশ্চেষ্টতা ও অসামর্থ্য নয়, বরং এক পূর্ণশক্তি যা তার মধ্যে তার সকল সামর্থ্য ধারণ করে এবং যা সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও বিপুল কর্মপ্রবৃত্তিকেও আনে

শান্তির বিধানের ছত্রতলে; রজঃ হয়ে ওঠে চিৎপুরুষের এক স্বয়ং-সাধক প্রবর্তক একান্ত সঙ্কল্প যা কামনা, প্রচেষ্টা, সংঘর্ষশীল উগ্রভাব নয়, বরং সত্তার সেই একই পূর্ণশক্তি যা অনন্ত, অক্ষুব্ধ ও আনন্দময় ক্রিয়ায় সমর্থ। সত্ত্ব এক পরিমিত মানসিক আলো, "প্রকাশ" হয় না, এ হয়ে ওঠে ভাবগত সত্তার স্বপ্রতিষ্ঠ আলো, "জ্যোতি" যা সত্তার পূর্ণ শক্তির মূলতত্ত্ব আর দিব্য নিশ্চলতা এবং দিব্য কর্ম-সঙ্কল্পকে আলোকিত করে তাদের ঐক্যের মধ্যে। সাধারণ মুক্তি দিব্য নিশ্চলতার মধ্যে স্থির দিব্য আলো পায়, কিন্তু অখণ্ড সিদ্ধির লক্ষ্য — এই মহত্তর ত্রয়াত্মক ঐক্য।

প্রকৃতির এই মুক্তি যখন আসে, তখন প্রকৃতির বিভিন্ন দ্বন্দ্বের সমগ্র আধ্যাত্মিক অর্থেরও মুক্তি আসে। অপরা প্রকৃতির মধ্যে বিভিন্ন দ্বন্দ্বগুলি হল সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অহং-এর রূপায়ণের দ্বারা ক্লিষ্ট পুরুষের উপর ত্রিগুণের খেলার অনিবার্য ফল। এই দ্বন্দ্বের গ্রন্থি হল এমন এক অবিদ্যা যা বিষয়সমূহের আধ্যাত্মিক সত্য গ্রহণে অসমর্থ আর একাগ্র হয় অপূর্ণ সব অবভাসের উপর, কিন্তু তাদের আন্তর সত্যকে আয়ত্ত ক'রে যে এ তাদের মোকাবিলা করে তা নয়, বরং তাদের সঙ্গে এর ব্যবহারে থাকে সংঘর্ষ এবং আকর্ষণ ও বিকর্ষণের, সামর্থ্য ও অসামর্থ্যের, পছন্দ ও অপছন্দের, সুখ ও দুঃখের, হর্ষ ও বিষাদের, স্বীকার ও বিদ্বেষের এক পরিবর্তনশীল ভারসাম্য; আমাদের কাছে সকল জীবন মনে হয় যেন এই সব বিষয়ের এক জটিল মিশ্রণ — প্রিয় ও অপ্রিয়ের, সুন্দর ও অসুন্দরের, সত্য ও মিথ্যার, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের, সফলতা ও বিফলতার, শুভ ও অশুভের জটিল মিশ্রণ, প্রকৃতির অচ্ছেদ্য দ্বয়াত্মক জাল। এর সব রুচি ও বিদ্বেষের প্রতি আসক্তি পুরুষকে আবদ্ধ রাখে শুভ ও অশুভের, হর্ষ ও বিষাদের এই জালে। মুক্তিসাধক আসক্তি থেকে মুক্ত হয়, তার অন্তঃপুরুষ থেকে সব দ্বন্দ্ব নিক্ষেপ করে, কিন্তু যেহেতু দ্বন্দ্বগুলিকে দেখা যায় জীবনের সমগ্র কার্য, উপাদান ও গঠন বলে, মনে হয় এই মুক্তি পাবার সর্বাপেক্ষা সহজ উপায় হবে জীবন থেকে নিবৃত্তি — তা সে নিবৃত্তি বাহ্য ও স্থূল নিবৃত্তি হ'ক, — অবশ্য দেহ থাকার সময় যতদূর তা সম্ভব হয় ততদূর নিবৃত্তি — আর না হয় তা হ'ক আন্তর প্রত্যাহার, প্রকৃতির সমগ্র ক্রিয়ার প্রতি অনুমোদনের অস্বীকৃতি, মুক্তিপ্রদ বিতৃষ্ণা, "বৈরাগ্য"। এইভাবে পুরুষ বিচ্ছিন্ন হয় প্রকৃতি থেকে। তখন পুরুষ ঊর্ধ্বে আসীন হয়ে "উদাসীন" হয়ে প্রাকৃত সত্তার মধ্যে গুণের সংঘর্ষকে নিরীক্ষণ করে অচঞ্চলভাবে এবং দেহ ও মনের সুখ দুঃখকে দেখে নির্বিকার সাক্ষী রূপে। আর না হয়, সে তার বাহ্য মনেরও উপর তার উদাসীনতা আরোপ করতে সমর্থ হয়ে অনাসক্ত দ্রষ্টার নিরপেক্ষ শান্তির অথবা নিরপেক্ষ হর্ষের সঙ্গে বিশ্ব ক্রিয়া নিরীক্ষণ করে, যার মধ্যে তার আর কোন সক্রিয় আন্তর যোগ থাকে না। এই সাধনার পরিণতি হল জন্ম পরিহার ও নীরব আত্মার মধ্যে প্রস্থান, "মোক্ষ"।

কিন্তু এই পরিহার মুক্তির সম্ভাব্য শেষ কথা নয়। অখণ্ড মুক্তি তখনই আসে যখন বিতৃষ্ণা বা "বৈরাগ্যের" উপর প্রতিষ্ঠিত এই "মুমুক্ষুত্ব"কে, মোক্ষের প্রতি তীব্র অনুরাগকে ছাড়িয়ে এর অতীত হওয়া যায়; তখন পুরুষ মুক্ত হয় যেমন প্রকৃতির নিম্ন

ক্রিয়ার আসক্তি থেকে, তেমন আবার, ভগবানের বিশ্বক্রিয়ার প্রতি সকল বিদ্বেষ থেকেও। এই মুক্তি সম্পূর্ণতা লাভ করে যখন আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান কাজ করতে পারে অতিমানসিক জ্ঞানের সঙ্গে, প্রকৃতির ক্রিয়াকে গ্রহণ ক'রে এবং প্রবর্তনায় অতিমানসিক জ্যোতির্ময় সঙ্কল্প নিয়ে। বিজ্ঞান প্রকৃতির মধ্যে নিহিত আধ্যাত্মিক অর্থ খুঁজে পায়, বিষয়সমূহের মধ্যে ভগবানকে দেখে এবং যে সকল বস্তুকে মঙ্গলের বিপরীত বলে মনে হয় সে সকলকেও দেখে মঙ্গলের অন্তঃপুরুষ; ঐ অন্তঃপুরুষ সে সবের মধ্যে ও তাদের বাইরে উন্মুক্ত হয়, অপূর্ণ বা বিপরীত রূপের সকল বিকৃতি হয় খসে পড়ে, না হয় রূপান্তরিত হয় তাদের পরতর দিব্যসত্যে — যেমন গুণগুলি ফিরে যায় তাদের দিব্য তত্ত্বে — আর চিৎপুরুষ বাস করে এক বিশ্বময়, অনন্ত ও অনপেক্ষ সত্য, শিব, সুন্দর, আনন্দের মাঝে, আর এই হল অতিমানসিক অথবা আদর্শ দিব্য প্রকৃতি। প্রকৃতির মুক্তি এক হয় চিৎপুরুষের মুক্তির সঙ্গে এবং সেখানেই অখণ্ড স্বাধীনতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় অখণ্ড সিদ্ধি।

দশম অধ্যায়

সিদ্ধির ষড়ঙ্গ

যখন করণগত প্রকৃতির ভ্রান্ত ও বিশৃঙ্খল ক্রিয়া থেকে আত্মা শুদ্ধ হয়ে মুক্ত হয় নিজের স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তা, চেতনা, শক্তি ও আনন্দের মধ্যে আর প্রকৃতি নিজেই মুক্ত হয় বিভিন্ন সংঘর্ষরত গুণ ও দ্বন্দ্বের এই নিম্ন ক্রিয়ার জটিলতা থেকে দিব্য শান্তি ও দিব্য ক্রিয়ার উচ্চ সত্যের মধ্যে, তখন আধ্যাত্মিক সিদ্ধি সম্ভবপর হয়। সিদ্ধিলাভের পূর্বে শুদ্ধি ও মুক্তি অপরিহার্য। আধ্যাত্মিক আত্মসিদ্ধির একমাত্র অর্থ হ'ল ভাগবত সত্তার প্রকৃতির সঙ্গে একত্বে উপচয়, সুতরাং ভাগবত সত্তা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যেমন হবে, এই সিদ্ধির জন্য আমাদের সাধনার লক্ষ্য, প্রয়াস ও পদ্ধতিও তেমন হবে। মায়াবাদীর কাছে সত্তার শ্রেষ্ঠ বা মূলতঃ একমাত্র আসল সত্য হল নির্বিকার, নৈর্ব্যক্তিক, আত্মসচেতন ব্রহ্ম; সুতরাং সিদ্ধি সম্বন্ধে তার ভাবনা হল চিৎপুরুষের নির্বিকার শান্তি, নৈর্ব্যক্তিকতা ও শুদ্ধ আত্মসংবিতে উপচিত হওয়া এবং তার পথ হল বিশ্বসত্তা ও ব্যক্তিসত্তা বর্জন এবং নীরব আত্মজ্ঞানের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ। বৌদ্ধদের কাছে শ্রেষ্ঠ সত্য হল সত্তার অভাব আর তাদের সুষ্ঠু পথ হল, সত্তার অনিত্যতা ও দুঃখ এবং কামনার বিপজ্জনক নিঃসারতা উপলব্ধি করা এবং অহং-ভাব এবং এর আশ্রয়স্বরূপ ভাবনার সহচার ও কর্মপরম্পরার লয়সাধন করা। পরতম সম্বন্ধে অন্যান্য ভাবনাগুলি অত অসদর্থক নয়; নিজের নিজের ভাবনা অনুযায়ী এই সবের লক্ষ্য হল ভগবানের সঙ্গে কিছু সাদৃশ্যলাভ, আর প্রতি সাধনাতেই সেই মতো পথ নেওয়া হয়, যেমন, ভক্তের পথ হল প্রেম ও পূজা এবং তার লক্ষ্য হল প্রেমের দ্বারা ভগবানের সাদৃশ্যে বিকশিত হওয়া। কিন্তু পূর্ণযোগের পক্ষে সিদ্ধির অর্থ হবে এমন দিব্য চিৎপুরুষ ও দিব্য প্রকৃতি যার মধ্যে জগতের ভিতর দিব্য সম্পর্ক ও ক্রিয়ার স্থান হবে; এর ব্যাপক অর্থে বোঝায় সমগ্র প্রকৃতিকে দিব্যভাবাপন্ন করা এবং তার সত্তা ও ক্রিয়ার সকল অনুচিত গ্রন্থি বর্জন করা তবে আমাদের সত্তার কোন অংশ অথবা আমাদের ক্রিয়ার কোন ক্ষেত্র পরিহার করা নয়। সুতরাং সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হওয়া এক বিশাল ও জটিল কাজ এবং এর সব ফল ও কর্মধারার পরিসরও অনন্ত ও বিচিত্র। একটি সূত্র ও পদ্ধতি পাবার জন্য আমাদের কর্তব্য হবে সিদ্ধির কতকগুলি অত্যাবশ্যাক ও মৌলিক অঙ্গ ও প্রয়োজনীয় বিষয় স্থির করা; কারণ এইগুলি সুনিশ্চিতভাবে পাওয়া গেলে, দেখা যাবে যে বাকী সব শুধু তাদের স্বাভাবিক বিকাশ অথবা বিশেষ কর্মপ্রণালী। এই অঙ্গগুলিকে আমরা ছয়টি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি; এদের প্রত্যেকটি অনেক পরিমাণে অপরগুলির উপর নির্ভরশীল, কিন্তু এক প্রকার পারম্পর্য হিসেবেই তাদের পাওয়া যায়। সাধনার শুরু হবে অন্তঃপুরুষের এক ভিত্তিমূলক সমত্ব থেকে এবং ব্রাহ্মী ঐক্যের বৃহত্ত্বের মধ্যে সিদ্ধসত্তার মধ্য দিয়ে তা ঊর্ধ্বে আরোহণ করবে ভগবানের আদর্শ ক্রিয়াতে।

প্রথম আবশ্যক হল, — প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয়, অভিঘাত ও ক্রিয়ার সঙ্গে অন্তঃপুরুষের ব্যবহার ও সংস্পর্শ বিষয়ে তার স্বরূপগত ও প্রাকৃত সত্তায় এক মৌলিক স্থিতিলাভ। এই স্থিতিতে আমরা উপনীত হব পরিপূর্ণ "সমতার" মধ্যে বিকশিত হয়ে। আত্মা, চিৎপুরুষ বা ব্রহ্ম সকলের মধ্যেই এক এবং সেজন্য সকলের কাছেই এক। সমত্বের এই ভাবনাকে গীতায় পূর্ণভাবে পরিস্ফুট করা হয়েছে এবং অন্ততঃ এর একটি দিক সম্বন্ধে এর অনুভূতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গীতায় বলা হয়েছে যে আত্মা "সমং ব্রহ্ম", সম ব্রহ্ম। এমনকি এক শ্লোকে গীতায় সমত্ব ও যোগকে এক করা হয়েছে, — "সমত্বং যোগ উচ্যতে" — "সমত্বকে যোগ বলা হয়"। অর্থাৎ ব্রহ্মের সঙ্গে ঐক্যের, ব্রহ্ম হওয়ার, অনন্তের মধ্যে সত্তার অক্ষুব্ধ আধ্যাত্মিক স্থিতিতে বিকশিত হওয়ার নিদর্শন হল সমত্ব। এর গুরুত্ব এত বেশী যে এর সম্বন্ধে যতই বলা হ'ক তা অতিশয়োক্তি হয় না; কারণ সমত্বের দ্বারাই বোঝা যায় যে আমরা আমাদের প্রকৃতির অহমাত্মক সব নির্ধারণ অতিক্রম করেছি, দ্বন্দ্বসমূহে আমাদের দাসসুলভ সাড়া দেওয়াকে জয় করেছি, ত্রিগুণের বিকারশীল বিক্ষোভের অতীত হয়েছি, আর প্রবেশ করেছি মুক্তির প্রসন্নতা ও প্রশান্তির মধ্যে। সমত্ব চেতনার এমন এক পর্যায় যা আমাদের সমগ্র সত্তায় ও প্রকৃতির মধ্যে নিয়ে আসে অনন্তের শাশ্বত শান্তি। উপরন্তু এ হল এক সুদৃঢ় ও সুষ্ঠু দিব্য ক্রিয়ার অবস্থা; অনন্তের বিশ্ব ক্রিয়ার সুদৃঢ়তা ও বিপুলতার প্রতিষ্ঠা হল তার শাশ্বত শান্তি যা ঐ ক্রিয়ার দ্বারা কখনো ভঙ্গ বা স্খলিত হয় না। এই হল নিঃসন্দেহে সুষ্ঠু আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য; চিৎপুরুষে, বুদ্ধিতে, মনে, হৃদয়ে, প্রাকৃত চেতনাতে — এমনকি স্থূলতম চেতনাতেও — সকল বিষয়ে সম ও এক হওয়া এবং করণীয় কর্ম সম্বন্ধে চিৎপুরুষ, বুদ্ধি ইত্যাদির ক্রিয়ার বাহ্য অভিযোজনা যাই হ'ক না কেন, তাদের সকল ক্রিয়াকেই অভেদ্য দিব্য সমত্ব ও শান্তিতে সর্বদাই পূর্ণ করা এই আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার অন্তরতম তত্ত্ব হতে বাধ্য। ওকে বলা যায় সমত্বের নিষ্ক্রিয় বা ভিত্তিমূলক, মৌলিক ও গ্রহিষ্ণু দিক; কিন্তু এক সক্রিয় ও প্রভুত্বপূর্ণ দিকও আছে অর্থাৎ সম আনন্দ আছে; যখন সমত্বের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় কেবল তখনই এর আসা সম্ভব হয় আর এটিই তার পরিপূর্ণতার আনন্দময় কুসুম।

এর পর সিদ্ধির জন্য আবশ্যক হল মানবীয় প্রকৃতির সকল সক্রিয় অংশকে তাদের শক্তি ও সামর্থ্যের সেই শ্রেষ্ঠ অবস্থাতে ও কাজের উচ্চতম পর্যায়ে উত্তোলন করা যাতে এরা দিব্যভাবাপন্ন হয়ে সমর্থ হয় মুক্ত, সুষ্ঠু, আধ্যাত্মিক ও দিব্য ক্রিয়ার সত্যকার করণে। কাজের সুবিধার উদ্দেশ্যে, আমরা আমাদের প্রকৃতির যে চারটি অঙ্গকে প্রস্তুত করার জন্য নিতে পারি তারা হল বুদ্ধি, হৃদয়, প্রাণ ও দেহ এবং আমাদের দেখতে হবে এদের পূর্ণতার উপাদান কি কি হবে। তাছাড়া, আমাদের মধ্যে আছে ধাতের, চরিত্রের ও স্বভাবের বীর্য যা আমাদের অঙ্গগুলির শক্তিকে ক্রিয়ায় ফলপ্রসূ করে এবং তাদের দেয় তাদের জাতিরূপ ও প্রবণতা; এই বীর্যের সঙ্কীর্ণতা দূর ক'রে তাকে প্রসারিত ও মার্জিত করা চাই যাতে আমাদের মধ্যস্থ সমগ্র মানবত্ব হতে পারে এক দিব্য মানবত্বের ভিত্তি, আর তখন পুরুষ, আমাদের অন্তঃস্থ প্রকৃত মানব, জীবাত্মা এই মানবীয় যন্ত্রে কাজ করবে

পরিপূর্ণভাবে এবং এই মানবীয় আধারে প্রোজ্জ্বল হয়ে শোভা পাবে ষোড়শকলায়। সিদ্ধ প্রকৃতিকে দিব্যভাবাপন্ন করতে হলে আমাদের কর্তব্য হবে আমাদের সীমিত মানবীয় ক্রিয়াশক্তিকে সরাবার জন্য দিব্য শক্তিকে আবাহন করা, যাতে এ পরিণত হতে পারে এক মহত্তর অনন্ত ক্রিয়াশক্তির, "দৈবী প্রকৃতির", "ভাগবতী শক্তির" প্রতিমূর্তিতে এবং পূর্ণ হতে পারে তার শক্তিতে। এই সিদ্ধি সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে যে পরিমাণে আমরা সমর্থ হই নিজেদের সমর্পণ করতে প্রথমে ঐ ভাগবতীশক্তির এবং আমাদের সত্তা ও কর্মের স্বামী ও অধীশ্বরের দেশনার নিকট এবং পরে তাঁদের প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার নিকট। আর এর জন্য শ্রদ্ধা অত্যাবশ্যক, সিদ্ধির জন্য আমাদের সব আস্পৃহায় শ্রদ্ধাই আমাদের সত্তার মহতী চালনাশক্তি — এখানে এ হল ভগবানে ও ভাগবতী শক্তিতে শ্রদ্ধা যা নিঃসন্দেহে আরম্ভ হবে হৃদয়ে ও বুদ্ধিতে কিন্তু অধিকার করবে আমাদের সমগ্র প্রকৃতি, এর সকল চেতনা, এর সকল স্ফুরন্ত প্রবর্তক শক্তি। সিদ্ধির এই দ্বিতীয় অঙ্গের মূল তত্ত্ব হল এই চারিটি বিষয় — করণগত প্রকৃতির বিভিন্ন অঙ্গের সব পূর্ণ শক্তি, স্বভাবের সিদ্ধ বীর্য, দিব্যশক্তির ক্রিয়ায় তাদের রূপান্তর আর ঐ রূপান্তর আবাহন ও সমর্থন করার জন্য আমাদের সকল অঙ্গে পূর্ণ শ্রদ্ধা — শক্তি, বীর্য, দৈবী প্রকৃতি, শ্রদ্ধা।

কিন্তু যতদিন এই বিকাশসাধন চলে শুধু আমাদের সাধারণ প্রকৃতির সর্বোচ্চ স্তরে, ততদিন আমরা যে সিদ্ধি পেতে পারি তা মন, প্রাণ ও দেহগত পুরুষের অবর সংজ্ঞায় রূপায়িত এক প্রতিফলিত ও সীমিত সিদ্ধি, কিন্তু দিব্য ভাবনা ও তার শক্তির যে দিব্য সিদ্ধির পরাকাষ্ঠা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর সেটি আমাদের অধিকারে আসে না। তা পাওয়া যাবে এই সব অবর তত্ত্বের উজানে, অতিমানসিক বিজ্ঞানে; সুতরাং সিদ্ধির পরবর্তী ধাপ হবে মনোময় পুরুষের বিবর্তন বিজ্ঞানময় পুরুষে। যে সবের দ্বারা এই বিবর্তন সাধিত হয় তা হল, মানসিক সঙ্কীর্ণতা বিদীর্ণ ক'রে ঊর্ধ্বে গমন, আমাদের সত্তার যে পরবর্তী উচ্চতর লোক বা ভূমি এখন আমাদের কাছ থেকে মানসিক প্রতিফলনের ভাস্বর ঢাকনা দিয়ে প্রচ্ছন্ন আছে তার মধ্যে উর্ধ্বগামী পদক্ষেপ, আর আমরা যাসব সেসবের নবরূপায়ণ এই মহত্তর চেতনার সংজ্ঞায়। স্বয়ং বিজ্ঞানের মধ্যেই অনেকগুলি পর্যায় আছে, আর তাদের উচ্চতম পর্যায় উন্মুক্ত হয় পূর্ণ ও অনন্ত আনন্দের মধ্যে। বিজ্ঞানকে একবার ফলপ্রসূভাবে ক্রিয়ার মধ্যে আবাহন করা হলে, এ বুদ্ধি, সঙ্কল্প, ইন্দ্রিয়মানস, হৃদয়, প্রাণিক ও ইন্দ্রিয়বোধাত্মক সত্তার সকল পর্যায়গুলি উত্তরোত্তর তুলে নিয়ে জ্যোতির্ময় ও সামঞ্জস্যকারী রূপান্তরের দ্বারা তাদের পরিণত করবে দিব্য অস্তিত্বের সত্য, শক্তি ও আনন্দের ঐক্যে। আমাদের সমগ্র বুদ্ধিগত, সঙ্কল্পগত, স্ফুরন্ত, নৈতিক, সৌন্দর্যগ্রাহী, ইন্দ্রিয়বোধাত্মক, প্রাণিক ও শারীরিক সত্তাকে এ ঐ আলোক ও শক্তির মধ্যে উত্তোলন ক'রে তাদের রূপান্তরিত করবে তাদের নিজ নিজ শ্রেষ্ঠ তাৎপর্যে। আবার সব শারীরিক সঙ্কীর্ণতা জয় ক'রে আরো সুষ্ঠু ও দিব্য করণগত দেহ বিকাশ করারও ক্ষমতা এর আছে। এর আলোক অতিচেতনের ক্ষেত্রগুলি উন্মুক্ত ক'রে অবচেতনের মধ্যে তার রশ্মি নিক্ষেপ ক'রে তার মধ্যে তার জ্যোতির্ময় বন্যা ঢেলে দেয় এবং এর সব

অস্পষ্ট সঙ্কেত ও অবরুদ্ধ রহস্য আলোকিত করে। এ আমাদের নিয়ে যায় অনন্তের এক মহত্তর আলোকের মধ্যে; এমনকি সর্বোত্তম মানসিকতারও ক্ষীণতর দীপ্তিতে অনন্তের যে প্রতিফলন হয় তার চেয়ে বিশালতর এই আলোক। যে সময় এ জীবপুরুষ ও প্রকৃতিকে দিব্যতর অস্তিত্বের অর্থে সিদ্ধ করে এবং আমাদের সত্তার বৈচিত্র্যগুলির মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য আনে, সে সময় এ তার সকল ক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত করে তার উৎস পরম ঐক্যের উপর এবং সব কিছুকে তুলে নেয় ঐ ঐক্যের মধ্যে। এর ক্রিয়ার দ্বারা, ব্যক্তিসত্ত্ব ও নৈর্ব্যক্তিকতা — অস্তিত্বের এই দুটি শাশ্বত দিককে এক করা হয় পুরুষোত্তমের আধ্যাত্মিক সত্তার ও প্রকৃতি-দেহের মধ্যে।

এই যে বিজ্ঞানময় সিদ্ধি যা প্রকৃতিতে আধ্যাত্মিক তাকে সম্পন্ন করতে হবে এখানে দেহের মধ্যে, এবং এতে স্থূল জগতের মধ্যে জীবনকে এর অন্যতম ক্ষেত্র হিসেবে গণ্য করা হয় যদিও বিজ্ঞান আমাদের কাছে উন্মুক্ত করে জড় বিশ্বের অতীত বিভিন্ন লোক ও জগতের অধিকার। সুতরাং স্থূল শরীর কর্মের এক ভিত্তি, "প্রতিষ্ঠা", একে অবজ্ঞা, অবহেলা করা যায় না অথবা আধ্যাত্মিক বিবর্তন থেকে বাদ দেওয়া যায় না: পৃথিবীতে সম্পূর্ণ দিব্য জীবনযাত্রার বাহ্য যন্ত্র হিসেবে দেহের সিদ্ধি বিজ্ঞানময় রূপান্তরের এক আবশ্যকীয় অঙ্গ। এই পরিবর্তন সাধনের উপায় হল শারীর চেতনা ও এর বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে বিজ্ঞানময় পুরুষের বিধান আনা এবং বিজ্ঞানময় পুরুষ যে আনন্দময় পুরুষের মধ্যে উন্মুক্ত হয় সেই আনন্দময় পুরুষেরও বিধান আনা। এই সাধনার সর্বোত্তম পরিণতিতে আসে সমগ্র শারীর চেতনার আধ্যাত্মীকরণ ও দীপ্তি এবং দেহের বিধানের দিব্যত্বসাধন। কারণ, এই জড়ীয়ভাবে দৃশ্যমান ও ইন্দ্রিয়গোচর আধারের স্থূল অন্নময় কোষের পশ্চাতে একে অধিচেতনভাবে ধরে আছে মনোময় পুরুষের এক সূক্ষ্মশরীর এবং বিজ্ঞানময় পুরুষের এক আধ্যাত্মিক বা কারণশরীর যা আরো বিশুদ্ধ সূক্ষ্ম চেতনার দ্বারা জানা যায় এবং যার মধ্যে পাওয়া যাবে আধ্যাত্মিক দেহধারণের সকল সিদ্ধি; এই হল দেহের এখনো অপ্রকট দিব্য বিধান। কোন কোন যোগী যে শারীর সিদ্ধি লাভ করে তার বেশীর ভাগই আসে সূক্ষ্মশরীরের বিধানকে কিছু উন্মুক্ত করার ফলে অথবা আধ্যাত্মিক শরীরের বিধানের কিছুকে নিম্নে আবাহন করার ফলে। সাধারণ পদ্ধতি হল হঠযোগের ভৌতিক প্রক্রিয়ার দ্বারা (যার কিছুটা রাজযোগেরও অন্তর্গত) অথবা তন্ত্র সাধনার পদ্ধতির দ্বারা চক্রগুলির উন্মীলন। অবশ্য ইচ্ছা করলে, পূর্ণযোগের জন্য কোন কোন পর্যায়ে এই সবকে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু এরা অপরিহার্য নয়; কারণ এখানে নির্ভর করা হয় পরতর সত্তার শক্তির উপর যাতে অবর অস্তিত্বের পরিবর্তন সাধন হয়, এমন এক কর্মধারা নির্বাচন করা হয় যা কাজ করে প্রধানতঃ উপর থেকে নিম্নের দিকে, বিপরীতভাবে নয়, সেজন্য বিজ্ঞানের মহত্তর শক্তির বিকাশের জন্য প্রতীক্ষা করা হয় যোগের এই অংশে করণমূলক পরিবর্তনরূপে।

বাকী থাকবে বিজ্ঞানময় ভিত্তির উপর সুষ্ঠু ক্রিয়া ও ভোগ — কেননা তখনই কেবল এইসব পূর্ণভাবে সম্ভব হবে। পুরুষ বিশ্ব অভিব্যক্তির মধ্যে আসে তার অনন্ত অস্তিত্বের বৈচিত্র্যের জন্য, জ্ঞান, ক্রিয়া, ভোগের জন্য; বিজ্ঞান আধ্যাত্মিক জ্ঞানের

পরিপূর্ণতা আনে এবং এর উপর প্রতিষ্ঠিত করবে দিব্য ক্রিয়া এবং জগৎ ও সত্তার ভোগকে গঠন করবে সত্যের বিধান অনুযায়ী, চিৎপুরুষের স্বাধীনতা ও সিদ্ধি অনুযায়ী। কিন্তু এই ক্রিয়া বা ভোগের কোনটিই গুণত্রয়ের নিম্ন ক্রিয়ার অধীন হবে না অথবা এর পরিণামস্বরূপ আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রার যা প্রধানতঃ রাজসিক কামনার তৃপ্তির অহমাত্মক ভোগ তা-ও হবে না। যা কিছু কামনা থাকবে — যদি এই নাম দেওয়া হয়, — তাহলে তা হবে দিব্য কামনা অর্থাৎ পুরুষের আনন্দলাভের সঙ্কল্প যে তার স্বাধীনতা ও সিদ্ধির মধ্যে উপভোগ করে সিদ্ধ প্রকৃতির ও তার সকল অঙ্গের ক্রিয়া। এই প্রকৃতি সমগ্র মানবপ্রকৃতিকে নেবে নিজের পরতর দিব্য সত্যের বিধানের মধ্যে এবং কাজ করবে ঐ বিধানের মধ্যে এবং তার ক্রিয়ার ও সত্তার বিশ্ব উপভোগকে নিবেদন করবে তার কর্মপ্রণালীর অধ্যক্ষ ও নিয়ন্তা যে আনন্দময় ঈশ্বর, অস্তিত্ব ও কর্মের প্রভু এবং আনন্দের পরম চিৎপুরুষ, তাঁর নিকট। জীবপুরুষ হবে এই ক্রিয়া ও নিবেদনের প্রবাহপ্রণালী এবং একই সাথে উপভোগ করবে ঈশ্বরের সঙ্গে তার একত্ব এবং প্রকৃতির সঙ্গে তার একত্ব; আবার সে অনন্ত ও সান্তের সঙ্গে, ভগবান ও বিশ্ব এবং বিশ্বের মধ্যে সকল সত্তার সঙ্গে সকল সম্পর্ক উপভোগ করবে বিশ্বপুরুষ ও বিশ্বপ্রকৃতির মিলনের শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞায়।

সকল বিজ্ঞানময় বিবর্তন ঊর্ধ্বে উন্মুক্ত হয় আনন্দের দিব্য তত্ত্বের মধ্যে; এই তত্ত্বটিই সচ্চিদানন্দের অথবা সনাতন ব্রহ্মের আধ্যাত্মিক সত্তা, চেতনা ও আনন্দের পরিপূর্ণতার প্রতিষ্ঠা। প্রথমে এটি মানসিক অনুভূতিতে পাওয়া যায় প্রতিফলনের দ্বারা, এর পর একে আরো পূর্ণ ও সরাসরিভাবে পাওয়া যাবে পুঞ্জীভূত ও দীপ্ত চেতনার মধ্যে, "চিদ্‌ঘনের" মধ্যে যা আসে বিজ্ঞানের মাধ্যমে। সিদ্ধ পুরুষ বাস করবে এই ব্রাহ্মী চেতনার মধ্যে পুরুষোত্তমের সঙ্গে মিলিত হয়ে, সে সচেতন থাকবে ব্রহ্মের মধ্যে — যে ব্রহ্ম সর্ব, "সর্বম্ ব্রহ্ম", যে ব্রহ্ম সত্তায় অনন্ত ও গুণে অনন্ত, "অনন্ত ব্রহ্ম", যে ব্রহ্ম স্বপ্রতিষ্ঠ চেতনা ও বিশ্ব-জ্ঞানস্বরূপ, "জ্ঞানম্ ব্রহ্ম", যে ব্রহ্ম স্বপ্রতিষ্ঠ আনন্দ ও এর সত্তার বিশ্বময় আনন্দ স্বরূপ, "আনন্দম্ ব্রহ্ম"। তার অনুভব হবে যে সকল বিশ্ব সেই পরম একের অভিব্যক্তি, সকল গুণ ও ক্রিয়া তাঁর বিশ্বময় ও অনন্ত শক্তির ক্রীড়া, সকল জ্ঞান ও সচেতন অনুভূতি ঐ চেতনার বহিঃপ্রবাহ, সবই ঐ এক আনন্দের সংজ্ঞা। তার অন্নময় সত্তা এক হবে সকল জড় প্রকৃতির সঙ্গে, তার প্রাণময় সত্তা এক হবে বিশ্বের প্রাণের সঙ্গে, তার মন এক হবে বিশ্বমনের সঙ্গে, তার আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও সঙ্কল্প এক হবে দিব্যজ্ঞান ও সঙ্কল্পের সঙ্গে যেমন স্বরূপে, তেমন আবার যখন এ নিজেকে ঢেলে দেয় এই সকল প্রবাহ প্রণালীর মধ্য দিয়ে, তার চিৎপুরুষ এক হবে সকল সত্তার চিৎপুরুষের সঙ্গে। তার কাছে বিশ্ব অস্তিত্বের সকল বৈচিত্র্য পরিবর্তিত হবে ঐ ঐক্যের মধ্যে এবং প্রকট হবে এর আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের রহস্যের মধ্যে। কারণ এই আধ্যাত্মিক আনন্দ ও সত্তার মধ্যে সে 'তৎ'এর সঙ্গে এক হবে যে 'তৎ' সকল অস্তিত্বের প্রভব ও আধেয় ও অন্তর্বাসী ও চিৎপুরুষ ও গঠনমূলক শক্তি। এই হবে আত্মসিদ্ধির পরাকাষ্ঠা।

একাদশ অধ্যায়

সমত্বের সিদ্ধি

আধ্যাত্মিক সিদ্ধির জন্য সর্বপ্রথম আবশ্যক হল সম্পূর্ণ সমত্ব। যে অর্থে আমরা সিদ্ধি কথাটি যোগে ব্যবহার করি তাতে এর অর্থ হল অপরা অদিব্য প্রকৃতি থেকে পরতর দিব্য প্রকৃতিতে উপচয়। জ্ঞানের ভাষায় এর অর্থ পরতর আত্মার সত্তা ধারণ করা এবং অপেক্ষাকৃত অন্ধকারময় খণ্ডিত অবর আত্মা বিসর্জন দেওয়া, অথবা আমাদের অপূর্ণ অবস্থাকে রূপান্তরিত করা আমাদের প্রকৃত ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিসত্ত্বের নিটোল জ্যোতির্ময় পরিপূর্ণতায়। ভক্তি ও আরাধনার ভাষায়, এর অর্থ ভগবানের প্রকৃতির সাদৃশ্যে অথবা ভগবানের সত্তার ধর্মে উপচয়, আমাদের অভীপ্সার পাত্রের সঙ্গে মিলিত হওয়া, — কারণ এই সাদৃশ্য, সত্তার ধর্মের এই একত্ব না থাকলে, ঐ বিশ্বাতীত ও বিশ্বাত্মক চিৎপুরুষ এবং এই ব্যষ্টি চিৎপুরুষের মধ্যে ঐক্য সম্ভবপর নয়। পরা দিব্যপ্রকৃতির প্রতিষ্ঠা সমত্বের উপর। আমরা পরম সত্তাকে শুদ্ধ নীরব পরমাত্মা ও চিৎপুরুষ ব'লে দেখি অথবা বিশ্ব অস্তিত্বের দিব্য অধীশ্বর ব'লে দেখি — উভয় ক্ষেত্রেই এই কথা সত্য। শুদ্ধ পরমাত্মা বিশ্ব অস্তিত্বের সকল ঘটনা ও সম্পর্কের নিরপেক্ষ শান্তির মধ্যে সম, অবিচল ও দ্রষ্টা। অবশ্য এই সবে তার বিতৃষ্ণা না থাকলেও — বিতৃষ্ণা সমত্ব নয়, তাছাড়া বিশ্ব অস্তিত্ব সম্বন্ধে পরমাত্মাব বিতৃষ্ণা থাকলে, বিশ্বের উৎপত্তি আদৌ সম্ভব হ'ত না, অথবা জগৎ-চক্রও চলতে পারত না — অনাসক্তি, সমদৃষ্টির প্রসন্নতা, যে সব প্রতিক্রিয়াগুলি বাহ্য প্রকৃতিতে জড়িত পুরুষের অশান্তির কারণ ও অক্ষমতাজনক দুর্বলতাস্বরূপ সেগুলির অতীত অবস্থা — এরা নীরব অনন্তের শুদ্ধতার সার পদার্থ এবং বিশ্বের বহুমুখী প্রবৃত্তিতে এর নিরপেক্ষ সম্মতি ও সমর্থনের অবস্থা। কিন্তু পরতমের যে শক্তিতে এই গতিগুলি নিয়ন্ত্রিত ও বিকশিত হয় সেই শক্তিতেও ঐ একই সমত্ব এক ভিত্তিমূলক অবস্থা।

বিষয়সমূহের অধীশ্বর বিষয়সমূহের প্রতিক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত বা বিক্ষুব্ধ হন না; তা যদি তিনি হতেন, তাহলে তিনি সে সবের অধীন হতেন, তাদের প্রভু হতেন না, অথবা নিজের অজেয় সঙ্কল্প ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী এবং তাদের বিভিন্ন সম্পর্কের পশ্চাতে অবস্থিত তত্ত্বের আন্তর সত্য ও রীতি অনুযায়ী স্বচ্ছন্দভাবে তাদের বিকশিত করতে পারতেন না, বরং বাধ্য হতেন সাময়িক আকস্মিক ব্যাপার ও ঘটনার দাবী অনুযায়ী কার্য করতে। সকল বিষয়ের সত্য থাকে তাদের গহনপুরে, উপরতলার চরিষ্ণু অস্থির তরঙ্গরূপের মধ্যে নয়। পরম চিন্ময় পুরুষ তাঁর দিব্যজ্ঞানে ও সঙ্কল্পে ও প্রেমে সে সবের ক্রমবিকাশ নিয়ন্ত্রণ করেন তাদের গভীর প্রদেশ থেকে — যদিও আমাদের অজ্ঞানতার কাছে এই বিকাশকে মনে হয় এক নিষ্ঠুর বিশৃঙ্খলা ও বিক্ষেপ; — তিনি উপরের

কোলাহলে বিক্ষুব্ধ হন না। আমাদের অন্ধ অন্বেষণ এবং প্রচণ্ড ভাবাবেগের সঙ্গে দিব্য প্রকৃতির কোন সম্পর্ক নেই; যখন আমরা ভগবানের ক্রোধ বা অনুগ্রহের কথা বলি অথবা বলি যে মানবের মাঝে ভগবান কষ্ট পাচ্ছেন, তখন আমরা মানুষী ভাষা প্রয়োগ করি, তাতে আমরা যে ক্রিয়ার কথা বলি তার আন্তর তাৎপর্য অশুদ্ধ হয়ে পড়ে। আমরা সে সবের আসল সত্যের কিছু দেখতে পাই যখন আমরা প্রাতিভাসিক মন ছাড়িয়ে উপরে উঠি আধ্যাত্মিক সত্তার শিখরসমূহে। কারণ তখন আমরা দেখি যে কি আত্মার নীরবতায়, বা কি বিশ্বের মধ্যে তার ক্রিয়ায়, ভগবান সর্বদাই সচ্চিদানন্দ, চিন্ময় পুরুষের এক অনন্ত অস্তিত্ব, এক অনন্ত চেতনা এবং স্বপ্রতিষ্ঠিত শক্তি, তাঁর সকল অস্তিত্বে এক অনন্ত আনন্দ। আমরা নিজেরাই শুরু করি এক সম আলোক, শক্তি, হর্ষের মধ্যে বাস করতে — যেগুলি আত্মা ও বিষয়সমূহে অবস্থিত দিব্য জ্ঞান, সঙ্কল্প ও আনন্দের মনস্তাত্ত্বিক রূপায়ণ, আর এই আত্মা ও বিষয়সমূহ হল ঐ সব অনন্ত উৎস থেকে আসা সক্রিয় বিশ্বময় বহির্বর্ষণ। ঐ আলোক, শক্তি ও হর্ষের বীর্যে আমাদের অন্তঃস্থ এক গূঢ় আত্মা ও চিৎপুরুষ জীবন সম্বন্ধে মনের প্রতিলিপির দ্বিবর্ণগুলিকে গ্রহণ ক'রে সে সবকে সর্বদাই রূপান্তরিত করে তার সুষ্ঠু অনুভূতির খাদ্যে, আর এখনো যদি আমাদের অন্তরে এই প্রচ্ছন্ন মহত্তর অনুভূতি না থাকত, আমরা বিশ্বশক্তির চাপ সহ্য করতে অথবা এই বিশাল ও বিপজ্জনক জগতে বাস করতে পারতাম না। আমাদের চিৎপুরুষ ও প্রকৃতির এক সম্পূর্ণ সমত্ব এমন এক উপায় যার সাহায্যে আমরা অশান্ত ও অজ্ঞানময় বাহ্য চেতনা থেকে পিছনে যেতে পারি এই আন্তর স্বর্গরাজ্যে এবং অধিকার করতে পারি চিৎপুরুষের মহত্ত্বপূর্ণ, আনন্দময়, শান্তিভরা সনাতন রাজ্যসমূহ, "রাজ্যম্ সমৃদ্ধম্"। যোগে আত্মসিদ্ধিকারী লক্ষ্য আমাদের কাছ থেকে যে সমত্বের সাধনা দাবী করে তার সম্পূর্ণ ফল এবং সমগ্র ব্যাপার হল দিব্য প্রকৃতিতে ঐ আত্ম-উন্নয়ন।

আমাদের সত্তার সমগ্র ধাতুকে তার বর্তমান অশান্ত মানসিকতার উপাদান থেকে বার করে আত্মার ধাতুতে রূপান্তরিত করার জন্য অন্তঃপুরুষের সম্পূর্ণ সমত্ব ও শান্তি অপরিহার্য। আবার যদি আমাদের আস্পৃহা থাকে আমাদের বর্তমান বিশৃঙ্খল ও অজ্ঞানময় ক্রিয়া সরিয়ে তার স্থানে এমন মুক্ত চিৎপুরুষের স্বাধিকৃত ও ভাস্বর সব কাজ আনা যে তার প্রকৃতির শাস্তা ও বিশ্ব সত্তার সঙ্গে এক সুরে বাঁধা, তাহলেও ঐ সমত্ব ও শান্তি সমভাবেই অপরিহার্য। যদি আমাদের চিৎপুরুষের সমত্ব এবং আমাদের প্রকৃতির বিভিন্ন প্রবর্তক শক্তির সমত্ব না থাকে তাহলে দিব্য ক্রিয়া তো বটেই, এমনকি সুষ্ঠু মানবীয় ক্রিয়াও অসম্ভব। ভগবান সকলের প্রতিই সম, তাঁর বিশ্বের নিরপেক্ষ ভর্তা, তিনি সব কিছু দেখেন সমদৃষ্টিতে, বিকাশমান সত্তার যে বিধান তিনি নিজের অস্তিত্বের গহন রাজ্য থেকে বাইরে এনেছেন তাতে তিনি সম্মতি দেন, যা সহ্য করা প্রয়োজন তা তিনি সহ্য করেন, যা অবনমন করা দরকার তা তিনি অবনমন করেন, যা উত্তোলন করা দরকার তা তিনি উত্তোলন করেন, আর তিনি সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন সকল ঘটনার সকল কারণ ও পরিণাম সম্বন্ধে এবং তাদের আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক তাৎপর্যের

পরিস্ফুটন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ও সম জ্ঞান নিয়ে। ভগবান যে কামনার কোন অশান্ত প্রচণ্ড ভাবাবেগবশে সৃষ্টি করেন তা নয়, অথবা পক্ষপাতদুষ্ট অভিরুচির আসক্তিবশে পালন ও রক্ষা করেন তা-ও নয় অথবা ক্রোধ, বিরক্তি অথবা বিতৃষ্ণার মত্ত আবেগে ধ্বংস করেন তা-ও নয়। ছোট ও বড়, উচিত ও অনুচিত, অজ্ঞ ও বিজ্ঞ — সকলেরই সঙ্গে তিনি ব্যবহার করেন সকলের আত্মা হিসেবে, আর সত্তার সঙ্গে গভীর অন্তরঙ্গ ও এক হয়ে তিনি সকলকে চালনা করেন তাদের প্রকৃতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী, আর তিনি তা করেন পরিমাণ সম্বন্ধে সুষ্ঠু ধারণা, শক্তি ও ঔচিত্য সমেত। কিন্তু সকলের মধ্য দিয়েই তিনি বিষয়সমূহকে সঞ্চালন করেন যুগচক্রের মধ্যে নিজের বৃহৎ লক্ষ্য অনুসারে এবং ক্রমোন্নতির ধারায় পুরুষকে ঊর্ধ্বে আকর্ষণ করেন তার আপতিক অগ্রগতি ও পশ্চাদ্‌গতির মধ্য দিয়ে উচ্চতর এবং আরও উচ্চতর সেই বিকাশের দিকে যা বিশ্বপ্রেতির অর্থ। যে আত্মসিদ্ধিকারী জীব ভগবানের সঙ্গে সঙ্কল্পে এক হওয়ার এবং নিজের প্রকৃতিকে ভগবদুদ্দেশ্যে যন্ত্র করার প্রয়াসী তার কর্তব্য হবে মানবীয় অজ্ঞানতার অহমাত্মক ও পক্ষপাতদুষ্ট মত ও প্রেরণা থেকে নিজেকে মুক্ত করে প্রসারিত করা এবং এই পরম সমত্বের প্রতিমূর্তিতে নিজেকে গঠন করা।

ক্রিয়ায় এই সম স্থিতি পূর্ণযোগ সাধকের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রথমতঃ তার কর্তব্য হবে সেই সম সম্মতি ও বোধ অর্জন করা যা দিব্য ক্রিয়ার বিধানে সাড়া দেবে, — তার উপর কোন পক্ষপাতদুষ্ট সঙ্কল্প এবং ব্যক্তিগত আস্পৃহার উগ্র দাবী চাপাবার চেষ্টা না ক'রে। যারা ভগবানের সুষ্ঠু যন্ত্র হিসেবে কাজ করতে চাইবে তাদের কাছ থেকে প্রথম যা দাবী করা হয় তা হল — এক জ্ঞানপূর্ণ নৈর্ব্যক্তিকতা, এক শান্ত সমত্ব, এক বিশ্বজনীনতা যা সকল বিষয়কে দেখবে ভগবানের, এক অবিভক্ত সন্মাত্রের বিভিন্ন অভিব্যক্তি হিসেবে, বিষয়সমূহের গতিবিধিতে ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ, অসহিষ্ণু হয় না, অথবা অপর পক্ষে উত্তেজিত, অত্যুৎসুক বা অবিমৃষ্যকারীও হয় না, বরং দেখে যে বিধান পালন করা চাই এবং কালের গতি মানা প্রয়োজন, বিষয় ও সত্তাসমূহের বাস্তবতা সমবেদনার সঙ্গে দেখে ও বোঝে, আবার যেমন বর্তমান অবভাসের পশ্চাতে তাদের আন্তর তাৎপর্যের দিকে তাকায় তেমন সম্মুখে তাকায় দিব্য সম্ভাবনাসমূহের উদ্‌ঘাটনের দিকে। কিন্তু এই নৈর্ব্যক্তিক সম্মতি এক ভিত্তি মাত্র। মানব এমন এক বিবর্তনের যন্ত্র যার প্রথমে থাকে এক সংঘর্ষের ছদ্মবেশ কিন্তু যা উত্তরোত্তর বিকশিত হয় এক সতত জ্ঞানপূর্ণ মীমাংসার সত্যতর ও গভীরতর অর্থে এবং যা উত্তরোত্তর বেশী পরিমাণে নিশ্চয়ই গ্রহণ করবে এই সংঘর্ষ ও মীমাংসার অধুনা বিশ্বসুষমার গভীরতম সত্য ও তাৎপর্য। এই বিবর্তনের গতিবিধি ত্বরান্বিত করার যন্ত্র হওয়াই সিদ্ধ মানবীয় অন্তঃপুরুষের সদা কর্তব্য। এর জন্য প্রকৃতির মধ্যে যে কোন মাত্রায় হ'ক এক দিব্যশক্তি উপস্থিত থাকা প্রয়োজন যা কাজ করবে অন্তঃস্থ দিব্য সঙ্কল্পের রাজোচিত শক্তিতে। কিন্তু সিদ্ধ ও চিরস্থায়ী, ক্রিয়ায় অবিচল, সত্য সত্যই দিব্য হতে হলে একে অগ্রসর হতে হবে এক আধ্যাত্মিক সমত্বের, সকল সত্তার সঙ্গে এক শান্ত, নৈর্ব্যক্তিক ও সম আত্ম-অভিন্নতার, সকল ক্রিয়াশক্তির

জ্ঞানের ভিত্তিতে। বিশ্বের অগণিত কর্মধারার মধ্যে ভগবান কাজ করেন এক প্রচণ্ড শক্তিতে কিন্তু তার ভিত্তি হল এক অভঙ্গনীয় একত্ব, স্বাধীনতা ও শান্তির আলোক ও শক্তি। সিদ্ধ পুরুষের দিব্য কর্ম ঐরকমই হওয়া চাই। আর সত্তার যে অবস্থা ক্রিয়ার মধ্যে এই পরিবর্তিত ভাবনা সম্ভব করে তা হল সমত্ব।

কিন্তু এমনকি মানবীয় সিদ্ধিতেও সমত্ব অপরিহার্য, এ তার অন্যতম প্রধান উপাদান এবং এমনকি এর অত্যাবশ্যক বাতাবরণ। মানবীয় সিদ্ধিকে সিদ্ধি নামের যোগ্য হতে হলে তার লক্ষ্যের মধ্যে দুইটি জিনিস থাকা দরকার — আত্মপ্রভুত্ব ও পারিপার্শ্বিকের উপর প্রভুত্ব; মানবপ্রকৃতির দ্বারা এই শক্তিগুলি যত বেশী পরিমাণ লাভ করা সম্ভব তত বেশী পরিমাণ লাভ করার জন্যই সাধনা করা দরকার। আত্মসিদ্ধির জন্য মানবের প্রবেগ হল আত্মনিয়ন্তা ও অধিপতি হওয়া, প্রাচীন ভাষায় "স্বরাট্" ও "সম্রাট্" হওয়া। কিন্তু যদি সে অপরা প্রকৃতির আক্রমণের অধীন হয়, যদি সে হর্ষ ও শোকের বিক্ষোভে, সুখ ও দুঃখের প্রবল স্পর্শে, তার বিভিন্ন ভাবাবেগ ও প্রচণ্ড আবেগের কোলাহলে, তার ব্যক্তিগত পছন্দ ও অপছন্দের বন্ধনে, কামনা ও আসক্তির দৃঢ় শৃঙ্খলে, ব্যক্তিগত ও ভাবাবেগচালিত পক্ষপাতমূলক বিচার ও মতের সঙ্কীর্ণতায় তার অহং-ভাবের শত শত স্পর্শে এবং তার ভাবনা, বেদনা ও ক্রিয়ার উপর এর পশ্চাদ্ধাবনকারী প্রভাবসমূহের বশীভূত হয়, তাহলে তার পক্ষে স্বরাট্ হওয়া সম্ভবপর নয়। এইসব বিষয় অবর আত্মার, ছোট "আমি"র দাসত্বস্বরূপ, আর সে যদি তার নিজের প্রকৃতির অধিপতি হতে চায় তাহলে তার অন্তঃস্থ বড় "আমি"র কর্তব্য হবে এই ছোট "আমি"কে পদদলিত করা। এই সবকে জয় করাই আত্মপ্রভুত্বের সর্ত; কিন্তু ঐ জয়লাভের জন্য সমত্ব প্রয়োজন, এবং এই হল সাধনার সার কথা। সম্ভব হলে, এই সব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া, অথবা অন্ততঃ তাদের প্রভু হয়ে তাদের উর্ধ্বে যাওয়াই সমত্ব। তাছাড়া, যে স্বরাট্ নয়, সে তার পারিপার্শ্বিকের প্রভু হতে সক্ষম হয় না। বাইরের প্রভু হওয়ার জন্য যে জ্ঞান, সঙ্কল্প, সামঞ্জস্য দরকার তা আসতে পারে শুধু আন্তর জয়ের বিজয় মুকুট হিসেবে। একমাত্র সত্য, ঋত ও বিশ্বময় বৃহত্ত্বের পক্ষেই এই প্রভুত্ব সম্ভবপর, তবে এরা আমাদের অপূর্ণতার সম্মুখে যে মহান্ আদর্শ উপস্থাপিত করে অথচ যা সব মনে হয় এদের বিরোধী এবং তাদের অভিব্যক্তির প্রতিবন্ধ সে সব বুঝে তাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হয় সেই আদর্শ যে আত্ম-অধিকারী অন্তঃপুরুষ ও মন সর্বদাই অনুসরণ করে ঐ সত্য, ঋত ও বিশ্বময় বৃহত্ত্বকেই নিঃস্বার্থ সমত্বের সঙ্গে অনুসরণ করে তারও সম্পদ এই প্রভুত্ব। এমনকি আমাদের যে বাস্তব মানবীয় মানসিকতার স্তরে শুধু এক সীমিত সিদ্ধি পাওয়া সম্ভব, সেখানেও এই নিয়ম সত্য। কিন্তু যোগের আদর্শের কাজ হল এই স্বারাজ্য ও সাম্রাজ্যের লক্ষ্য নিয়ে একে বৃহত্তর আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর স্থাপন করা। সেখানেই এ তার পূর্ণ শক্তি পায় এবং চিৎপুরুষের দিব্যতর মাত্রার নিকট উন্মুক্ত হয়; কারণ অনন্তের সঙ্গে একত্বের দ্বারাই, সান্ত বিষয়সমূহের উপর আধ্যাত্মিক শক্তি সক্রিয় হয়েই, আমাদের সত্তা ও প্রকৃতির এক প্রকার শ্রেষ্ঠ অখণ্ড সিদ্ধি তার নিজের স্বপ্রতিষ্ঠা লাভ করে।

শুধু আত্মার নয়, প্রকৃতিতেও সম্পূর্ণ সমত্ব আত্মসিদ্ধি যোগের এক অবস্থা। স্পষ্টতঃই এটি লাভের জন্য প্রথম কাজ হবে আমাদের ভাবময় ও প্রাণময় সত্তার বিজয়, কারণ এইখানেই আছে সব চেয়ে বড় অনর্থের সব মূল, অসমতা ও অধীনতার সবচেয়ে দুর্দান্ত সব শক্তি, আমাদের অপূর্ণতার সর্বাপেক্ষা দুরাগ্রহী দাবী। আমাদের প্রকৃতির এই সব অংশের সমত্ব আসে শুদ্ধি ও মুক্তির দ্বারা। আমরা বলতে পারি যে সমত্বই মুক্তির সঠিক নিদর্শন। প্রাণিক কামনার প্রবেগের আধিপত্য থেকে এবং উগ্র ভাবাবেগের দ্বারা অন্তঃপুরুষের উপর অশান্ত প্রভুত্ব থেকে মুক্ত হবার অর্থ এমন এক প্রসন্ন ও সম হৃদয় ও প্রাণতত্ত্ব পাওয়া যাকে নিয়ন্ত্রণ করে এক বিশ্বজনীন পুরুষের উদার ও সমদৃষ্টি। কামনাই প্রাণের, প্রাণতত্ত্বের অশুদ্ধতা ও এর বন্ধনের শৃঙ্খল। মুক্ত প্রাণের অর্থ এক সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত প্রাণপুরুষ যে বাহ্য বিষয়সমূহের সংস্পর্শের সম্মুখীন হয় কামনাশূন্য হয়ে, এবং সে সবকে গ্রহণ করে ও সাড়া দেয় সমভাবে; পছন্দ ও অপছন্দর দাসত্বপূর্ণ দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হয়ে এবং এদের উর্ধ্বে উন্নীত হয়ে, সুখ দুঃখের প্রবেগে উদাসীন থেকে, প্রিয় বিষয়ের দ্বারা উত্তেজিত না হয়ে, অপ্রিয়ের দ্বারা উদ্বিগ্ন ও অভিভূত না হয়ে, এর রুচিকর স্পর্শগুলিতে আসক্তির সঙ্গে আঁকড়ে না থেকে, বিতৃষ্ণা আসে এমন সব স্পর্শগুলিকে প্রচণ্ডভাবে প্রতিহত না করে, এ উন্মুক্ত থাকে অনুভূতির মহত্তর সব মূল্যের প্রতি। ভীতিপ্রদ বা অনুগ্রহ প্রার্থী হয়ে যা সব জগৎ থেকে আসে সে সব এ স্থাপন করে পরতর বিভিন্ন তত্ত্বের নিকট, এমন এক যুক্তিবুদ্ধি ও হৃদয়ের নিকট যা চিৎপুরুষের আলো ও শান্ত হর্ষের সঙ্গে সংযুক্ত অথবা এদের দ্বারা পরিবর্তিত। চিৎপুরুষের দ্বারা এইভাবে শান্ত ও বশীভূত হয়ে এবং আমাদের অন্তঃস্থ গভীরতর ও সূক্ষ্মতর অন্তঃপুরুষের উপর নিজের প্রভুত্ব আরোপ করার চেষ্টা আর না ক'রে এই প্রাণপুরুষ নিজেই আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন হবে এবং বিষয়সমূহের সঙ্গে চিৎপুরুষের দিব্যতর ব্যবহারের নির্মল ও মহৎ যন্ত্ররূপে কাজ করবে। প্রাণ সংবেগকে অথবা এর স্বকীয় উপযোগিতা ও বৃত্তিকে বৈরাগ্যবশে বিনাশ করার কোন প্রশ্ন এখানে নেই; এর বিনাশ চাওয়া হয় না, তবে চাওয়া হয় এর রূপান্তর। প্রাণের বৃত্তি হল উপভোগ কিন্তু অস্তিত্বের প্রকৃত উপভোগ হল অন্তর্মুখী আধ্যাত্মিক আনন্দ, আমাদের প্রাণিক, ভাবাবেগপ্রধান অথবা মানসিক সুখ এখন যেমন স্থূল মনের প্রভাবে নিকৃষ্ট এবং সেজন্য আংশিক ও বিক্ষুব্ধ তেমন নয়, বরং আত্মা ও সকল অস্তিত্বের প্রশান্ত রভসের মধ্যে অধিগত হয়েছে এমন আধ্যাত্মিক আনন্দের এ হল এক গভীর ও পুঞ্জীভূত ঘন অবস্থা। অধিকার করাই এর বৃত্তি, অধিকারের দ্বারাই পুরুষের বিষয়ভোগ আসে কিন্তু আসল অধিকার হল এই, এই অধিকার বিশাল ও অন্তর্মুখী বাইরের কিছু আয়ত্ত করার উপর এ নির্ভর করে না, কারণ এক্ষেত্রে আমরা যা আয়ত্ত করি তার বশীভূত হই। সকল বাহ্য প্রাপ্তি ও উপভোগের অর্থ হবে নিজের জগৎসত্তার বিভিন্ন রূপ ও ঘটনার সঙ্গে আধ্যাত্মিক আনন্দের তৃপ্ত ও সম লীলার এক সুযোগ মাত্র। যাতে এই মহত্তর বিষয়, এই বিশাল বিশ্বজনীন ও সুষ্ঠু জীবন আসা সম্ভব হয় তার জন্য দরকার সকল অহমাত্মক প্রাপ্তি ত্যাগ, ভগবান ও বিভিন্ন সত্তা ও জগতের উপর অহং-

এর দাবী নিয়ে বিষয়সমূহকে নিজেদের করে নেওয়া, অর্থাৎ 'পরিগ্রহ', বর্জন (অপরিগ্রহ)। "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ", কামনা ও প্রাপ্তির অহমাত্মক বোধ ত্যাগ করেই পুরুষ দিব্যভাবে ভোগ করে তার আত্মা ও এই বিশ্ব।

সেইরকম মুক্ত হৃদয় এমন এক হৃদয় যা বিভিন্ন আবেগ ও প্রচণ্ড ভাবাবেগের ঝড় ঝাপটা থেকে মুক্ত; শোক, ক্রোধ, ঘৃণা ও ভয়ের নিষ্ঠুর স্পর্শ, প্রেমের অসমতা, হর্ষের উদ্বেগ, দুঃখের ব্যথা — এই সব সম হৃদয় থেকে খসে পড়ে, এ হৃদয় থাকে বিশাল, প্রশান্ত, সম, জ্যোতির্ময়, দিব্য। এই সব বিষয় আমাদের সত্তার মূল প্রকৃতি নয়, এই সব আমাদের বাহ্য সক্রিয় মানসিক ও প্রাণিক প্রকৃতির বর্তমান গঠনের এবং তার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে ব্যবহারের সৃষ্টি। এই সব বিচ্যুতির জন্য দায়ী হল অহং-বোধ যার জন্য আমরা পৃথক সত্তা হিসেবে ব্যবহার করতে প্ররোচিত হই এবং আমাদের বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত দাবী ও অনুভূতি দিয়েই বিশ্বের সব মূল্য নির্ণয় করি। যখন আমরা নিজেদের মধ্যে এবং বিশ্বের চিৎপুরুষের মধ্যে ভগবানের সঙ্গে ঐক্যে বাস করি, তখন এই সব অপূর্ণতা আমাদের থেকে খসে পড়ে, তারা অন্তর্হিত হয় আন্তর আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের শান্ত ও সম বীর্য ও আনন্দের মধ্যে। ঐ ভগবান সর্বদাই আমাদের মধ্যে বিদ্যমান; আমাদের অন্তরে যে অধিচেতন চৈত্যপুরুষ তাঁর অস্তিত্বের আনন্দের গোপন যন্ত্র তার মধ্য দিয়ে আসার পথে বাহ্য স্পর্শগুলি তাঁর কাছে পৌঁছবার আগেই তিনি তাদের রূপান্তরিত করেন। হৃদয়ের সমত্বের দ্বারা আমরা উপরতলার অশান্ত কামপুরুষ থেকে সরে এসে এই গভীরতর সত্তার দ্বার খুলে দিই, আর এর প্রতিক্রিয়াগুলি বাইরে এনে যা সব আমাদের ভাবময় সত্তাকে প্রলুব্ধ করে সে সবের উপর ঐ সব প্রতিক্রিয়ার সঠিক দিব্য মূল্য আরোপ করি। এই সিদ্ধির পরিণতি হল আধ্যাত্মিক অনুভবের এক মুক্ত, সুখময়, সম ও সর্বগ্রাহী হৃদয়।

এই সিদ্ধিতেও বৈরাগীর কোন কঠোর সংবেদনশূন্যতার কোন তটস্থ আধ্যাত্মিক উদাসীনতার অথবা আত্মদমনের কোন কষ্টকর কর্কশ তপস্যার প্রশ্ন নেই। এ ভাবময় প্রকৃতির বিনাশ নয়, তবে এ হল এক রূপান্তর। এখানে আমাদের বাহ্য প্রকৃতিতে যা সব বিকৃত অথবা অপূর্ণরূপে উপস্থিত হয় সে সবেরও এক তাৎপর্য ও উপকারিতা আছে, আর তা ফুটে ওঠে যখন আমরা ফিরে যাই ভাগবতসত্তার মহত্তর সত্যে। প্রেম বিনষ্ট হবে না, তবে পূর্ণ করা হবে, একে প্রসারিত করা হবে এর প্রশস্ততম সামর্থ্যে, গভীর করা হবে এর আধ্যাত্মিক রভসে, ভগবৎপ্রেমে, মানবপ্রেমে, সকল বিষয়েরই প্রেমে যেন এই সব আমরা নিজেরা, যেন এরা ভগবানের বিভিন্ন সত্তা ও শক্তি; এখন আমরা যে সব বিষয়ে অনেক বেশী গুরুত্ব দিই যেমন ক্ষুদ্র হর্ষ ও বিষাদের জোরালো অহমাত্মক, স্বার্থপরায়ণ প্রেম, ও দুরাগ্রহী সব দাবী যাদের সঙ্গে জড়িত থাকে ক্রোধ ও ঈর্ষা ও সন্তুষ্টির, ঐক্যের জন্য প্রচেষ্টার এবং ক্লান্তি, বিচ্ছেদ ও বিরহের গতিবৃত্তির বিচিত্র বিন্যাস — সে সব সরিয়ে তাদের স্থানে আসবে এক বিশাল বিশ্বজনীন প্রেম যা নানাবিধ সম্বন্ধ স্থাপনে আদৌ অসমর্থ নয়। শোকের অবসান হবে, তার স্থলে আসবে এক বিশ্বজনীন

সমপ্রেম ও সমবেদনা, তবে এই সমবেদনার অর্থ দুঃখে দুঃখ অনুভব করা নয়, এ এমন এক শক্তি যা নিজেই দুঃখমুক্ত, এবং অপরকে উৎসাহ দিতে, সাহায্য করতে, মুক্ত করতে সক্ষম। মুক্তপুরুষের পক্ষে ক্রোধ ও ঘৃণা অসম্ভব, কিন্তু ভগবানের প্রবল রুদ্রশক্তি যে অসম্ভব তা নয়, এই শক্তি ঘৃণা না করেও যুদ্ধ করতে, ক্রোধ না করেও ধ্বংস করতে সক্ষম; কারণ সকল সময়ই এ জানে যে যা এ ধ্বংস করে সে সব তার নিজেরই অংশ, তার নিজেরই অভিব্যক্তি, সুতরাং যাদের মধ্যে এই সব অভিব্যক্তি মূর্তিমন্ত হয়েছে তাদের প্রতি তার সমবেদনার ও সহবোধের কোন পরিবর্তন হয় না। আমাদের সকল ভাবময় প্রকৃতিতে এই উচ্চ মুক্তিপ্রদ রূপান্তর আসবে; কিন্তু যাতে এই রূপান্তরসাধন সম্ভব হয় তার জন্য সম্পূর্ণ সমত্বই কার্যকারী সর্ত।

আমাদের সত্তার বাকী অংশেও ঐ একই সমত্ব আনা অবশ্য কর্তব্য। আমাদের সমগ্র স্ফুরন্ত প্রকৃতি এখন কাজ করে বিভিন্ন অসম সংবেগের, অবর অজ্ঞানময় প্রকৃতির অভিব্যক্তির প্রভাবে। এই প্রবেগগুলিকে আমরা হয় পালন করি, নয় আংশিক নিয়ন্ত্রণ করি, না হয় তাদের উপর আমাদের যুক্তিবুদ্ধির প্রভাব দিই যাতে তারা পরিবর্তিত ও সংযত হয়, আর দিই আমাদের মন ও সৌন্দর্যবোধের প্রভাব যাতে তারা বিশুদ্ধ হয় এবং সুনীতিবিষয়ক ধারণার প্রভাব যাতে তারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আমাদের প্রচেষ্টার ব্যামিশ্র ফল হল উচিত ও অনুচিত, উপকারী ও অনিষ্টকারী, সামঞ্জস্যপূর্ণ অথবা বিশৃঙ্খল ক্রিয়াসমূহের এক জটিল সুর, মানবীয় যুক্তি ও যুক্তিহীনতার, পাপ ও পুণ্যের, মান ও অপমানের, মহৎ ও নীচের, লোক-প্রশংসিত ও লোক-নিন্দিত সব বিষয়ের পরিবর্তনশীল মান, আত্মশ্লাঘা বা নিন্দার অথবা আত্ম-ন্যায়পরায়ণতার এবং বিরক্তির, অনুতাপ ও লজ্জা ও নৈতিক অবসাদের অত্যধিক ঝঞ্ঝাট। অবশ্য বর্তমানে আমাদের আধ্যাত্মিক বিবর্তনের জন্য এই সব নিঃসন্দেহে অতীব প্রয়োজনীয়। কিন্তু এক মহত্তর সিদ্ধির সাধক এই সব দ্বন্দ্ব থেকে সরে আসবে, এসবকে দেখবে সমদৃষ্টিতে এবং সমত্বের মাধ্যমে লাভ করবে স্ফুরন্ত তপসের, আধ্যাত্মিক শক্তির এক নিরপেক্ষ ও বিশ্বজনীন ক্রিয়া যার মধ্যে তার নিজের শক্তি ও সঙ্কল্প পরিবর্তিত হয় দিব্য কর্মধারার এক মহত্তর প্রশান্ত রহস্যের শুদ্ধ ও সঙ্গত যন্ত্রে। এই স্ফুরন্ত সমত্বের ভিত্তির উপর সাধারণ মানসিক মানগুলি অতিক্রম করা হবে। তার সঙ্কল্পের দৃষ্টি উজানে তাকিয়ে দেখবে ভাগবত সত্তার এক শুদ্ধতার দিকে, দিব্য জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত দিব্যসঙ্কল্প-শক্তির প্রেরণার দিকে আর তার সিদ্ধ প্রকৃতি হবে এই শক্তির যন্ত্র। কিন্তু যতদিন স্ফুরন্ত অহং ভাবময় ও প্রাণিক সব সংবেগের এবং ব্যক্তিগত বিচারের অভিরুচির দাস হয়ে তার ক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করে ততদিন তা হওয়া অসম্ভব। সঙ্কল্পের পূর্ণ সমত্ব এমন শক্তি যাতে কর্মের প্রতি অবর প্রেরণার এই গ্রন্থিগুলি ছিন্নভিন্ন করে। এই সঙ্কল্প অবর সব সংবেগে সাড়া দেবে না, বরং মনের উর্ধ্বে পরম আলোকের মহত্তর দৃষ্টিসম্পন্ন প্রেরণার জন্য সজাগ ও সতর্ক থাকবে, এ বুদ্ধিগত বিচার দিয়ে বিচার ও শাসন করবে না বরং দর্শনের এক উচ্চতর এলাকা থেকে আসা আলোক ও নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করবে। যেমন যেমন

এ উর্ধ্বপানে অতিমানসিক সত্তায় আরোহণ করে এবং অন্তর্মুখী হয়ে আধ্যাত্মিক বিশালতায় প্রসারিত হয়, তেমন তেমন স্ফুরন্ত প্রকৃতি ভাবময় ও প্রাণিক প্রকৃতির মতোই রূপান্তরিত, আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন হবে, এবং বিকশিত হবে দিব্য প্রকৃতির এক শক্তিতে। করণগুলিকে তাদের নতুন কর্মধারার সঙ্গে সঙ্গতিতে আনতে অনেক বিচ্যুতি ও প্রমাদ ও অপূর্ণতা দেখা দেবে, কিন্তু যে পুরুষ উত্তরোত্তর সম হচ্ছে সে এই সব বিষয়ে বড় বেশী উদ্বিগ্ন বা ব্যথিত হবে না, কারণ আত্মার মধ্যে ও মনের উর্ধ্বে অবস্থিত পরম আলোক ও শক্তির দেশনার নিকট ন্যস্ত হওয়ায় সে তার পথে চলবে দৃঢ় আশ্বাস নিয়ে এবং রূপান্তরের কাজে যতই পতন ও অভ্যুদয় হ'ক না কেন সে তার সমাপ্তি পর্ব পর্যন্ত অপেক্ষা করবে বর্ধিষ্ণু প্রশান্তির সঙ্গে। গীতায় শ্রীভগবান যে পরম আশ্বাসবাণী দিয়েছেন, "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" — এই হবে তার দৃঢ় প্রত্যয়ের মূলমন্ত্র।

প্রকৃতিস্থ করণগুলির সিদ্ধিসাধনের এক অংশ হল, — আর এ হল এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ — চিন্তক মনের সিদ্ধি। আমাদের মানসিকতার ভিত্তিস্বরূপ আমাদের সব বুদ্ধিগত অভিরুচিতে, বিচারে, মতামতে, কল্পনায়, স্মৃতির সঙ্কীর্ণতাজনক সহচারসমূহে আমাদের যে বর্তমান মনোহর আত্মসমর্থক আসক্তি, এবং আমাদের অভ্যাসগত মনের চলন্ত সব পুনরাবৃত্তিতে, আমাদের প্রয়োগকুশল মনের নির্বন্ধসমূহে, এমনকি আমাদের বুদ্ধিগত সত্য-মানসেরও সঙ্কীর্ণতায় আমাদের যে বর্তমান ঐরকম আসক্তি — সে আসক্তিকেও বর্জন করা চাই অন্যান্য আসক্তির মতোই এবং তার স্থলে আনা চাই সমদৃষ্টির নিরপেক্ষতা। আমাদের চেতনার সীমিত প্রকৃতির দরুন এবং আমাদের ধীশক্তিরও এর যুক্তিতর্ক ও বোধির ক্ষুদ্র ভাণ্ডারের পক্ষপাতিত্বের জন্য বিদ্যা ও অবিদ্যা, সত্য ও প্রমাদ প্রভৃতির যেসব দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় সে সবকে সম ভাবনামানস দেখবে, তাদের গ্রহণ করবে ঐ জটের কোন সূত্রেই আবদ্ধ না হয়ে এবং অপেক্ষা করবে জ্যোতির্ময় অতিক্রমণের জন্য। অবিদ্যার মধ্যে সে দেখবে এমন এক বিদ্যা যা আটক রয়েছে এবং চেষ্টা করছে বা প্রতীক্ষা করছে মুক্তির জন্য, প্রমাদের মধ্যে দেখবে এমন এক কর্মরত সত্য যা নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে অথবা হাতড়ানো মন যাকে নিক্ষেপ করেছে ভ্রান্তিজনক রূপের মধ্যে। অপরদিকে সে তার বিদ্যার দ্বারা নিজেকে আবদ্ধ বা সীমিত রাখবে না অথবা নতুন জ্যোতির দিকে অগ্রসর হবার কোন নিষেধে নিরস্ত হবে না, অথবা সত্যকে পুরোপুরি ব্যবহার করার সময়ও একে কঠোরভাবে আঁকড়ে থাকবে না অথবা এর বর্তমান গঠনে তাকে জোর করে শৃঙ্খলাবদ্ধ করবে না। চিন্তক মনের এই একান্ত সমত্ব অপরিহার্য, কারণ এই অগ্রগতির উদ্দেশ্য হল সেই মহত্তর আলো যা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পরতর লোকের অন্তর্গত। এই সমত্ব সব চেয়ে সূক্ষ্ম ও দুরূহ আর মানুষের মন এর অনুশীলন করে সব চেয়ে কম; উর্ধ্বে অবলোকনকারী মানসিকতার উপর অতিমানসিক আলোক যতদিন না পুরোপুরি এসে পড়ে, ততদিন এই সিদ্ধি অসম্ভব। তবে মানসিক ধাতুর উপর ঐ আলোকের স্বচ্ছন্দ ক্রিয়া সম্ভব হতে হলে আগেই প্রয়োজন হবে বুদ্ধির মধ্যে সমত্বের

জন্য এক বর্ধিষ্ণু সঙ্কল্প। এর অর্থ যে বুদ্ধির এষণার ও বিশ্ব উদ্দেশ্যের বর্জন অথবা কোন উদাসীনতা অথবা নিরপেক্ষ অবিশ্বাস নয়, আর অনুপাখ্যের নীরবতার মধ্যে সকল ভাবনাকে নিস্তব্ধ করা তা-ও নয়। যাতে মন এক পরতর আলোক ও জ্ঞানের সম প্রবাহপ্রণালী হতে পারে সেজন্য মনকে এর নিজস্ব আংশিক কর্মধারা থেকে মুক্ত করা যখন উদ্দেশ্য হয় তখন মানসিক ভাবনাকে নিস্তব্ধ করা সাধনার এক অঙ্গ; কিন্তু মানসিক ধাতুরও রূপান্তরসাধন অবশ্য কর্তব্য; তা না হলে পরতর আলোক পূর্ণ অধিকার পায় না আর মানুষের মাঝে দিব্য চেতনার সুব্যবস্থিত কর্মের জন্য শক্তিশালী রূপগ্রহণেও অসমর্থ। অনুপাখ্যের নীরবতা ভাগবত সত্তার এক সত্য কিন্তু যে বাক্ প্রসৃত হয় ঐ নীরবতা থেকে তা-ও এক সত্য এবং এই বাক্‌কেই দেহ দিতে হবে প্রকৃতির সচেতন রূপের মধ্যে।

কিন্তু প্রকৃতির এই সব সমত্বসাধন এক উদ্যোগপর্ব, এদের অন্তিম লক্ষ্য হল সেই পরতম আধ্যাত্মিক সমত্বসাধন যাতে এই সমত্ব সমগ্র সত্তাকে অধিকার ক'রে এমন এক ব্যাপক বাতাবরণ তৈরী করতে পারে যার মধ্যে ভগবানের আলোক, শক্তি ও হর্ষ নিজেকে প্রকট করতে পারে মানবের মধ্যে আর তা হয় বর্ধিষ্ণু পরিপূর্ণতার মাঝে। ঐ সমত্ব হল সচ্চিদানন্দের শাশ্বত সমত্ব। এ হল অনন্ত সত্তার এমন এক সমত্ব যা স্বপ্রতিষ্ঠ, এ হল সনাতন চিৎপুরুষের সমত্ব, কিন্তু এ মন, হৃদয়, সঙ্কল্প, প্রাণ, শারীর সত্তাকে গড়ে তুলবে নিজের ছাঁচে। এ হল অনন্ত আধ্যাত্মিক চেতনার এমন এক সমত্ব যা এক দিব্যজ্ঞানের আনন্দময় প্রবহন ও তৃপ্ত তরঙ্গগুলিকে ধারণ করবে ও তাদের ভিত্তি হবে। এ হল দিব্য তপসের এক সমত্ব যা সকল প্রকৃতির মধ্যে দিব্য সঙ্কল্পের জ্যোতির্ময় ক্রিয়া প্রবর্তন করবে। এ হল দিব্য আনন্দের এক সমত্ব যা প্রতিষ্ঠিত করবে দিব্য বিশ্বজনীন আনন্দের ক্রীড়া, বিশ্বজনীন প্রেম ও বিশ্বসৌন্দর্যের অসীম সৌন্দর্যবোধ। অনন্তের আদর্শ সম প্রশান্তি ও প্রসন্নতা আমাদের সিদ্ধ সত্তার বিশাল ব্যোম হবে, কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন সম্পর্কের উপর সক্রিয়া প্রকৃতির মাধ্যমে অনন্তের যে আদর্শ সম ও সুষ্ঠু ক্রিয়া তা হবে আমাদের সত্তার মধ্যে এর শক্তির এক অক্ষুব্ধ বহির্বর্ষণ। পূর্ণযোগের সংজ্ঞায় এই হল সমত্বের অর্থ।

দ্বাদশ অধ্যায়

সমত্বের পথ

সম্পূর্ণ ও সুষ্ঠু সমত্বের বর্ণনা থেকে দেখা যাবে যে এই সমত্বের দুটি দিক আছে। সুতরাং একে পাওয়ার জন্য পর পর দুই সাধনক্রিয়ার প্রয়োজন। একটি অপরা প্রকৃতির ক্রিয়া থেকে আমাদের মুক্ত করে নিয়ে যাবে ভাগবত সত্তার স্থির শান্তিতে; অপরটি আমাদের মুক্ত করবে পরতরা প্রকৃতির পূর্ণ সত্তায় ও শক্তিতে এবং নিয়ে যাবে সম স্থিতি ও বিশ্বজনীনতার মধ্যে — এক দিব্য ও অনন্ত জ্ঞানের, ক্রিয়ার সঙ্কল্পের, আনন্দের। প্রথমটিকে বলা যেতে পারে নিষ্ক্রিয় বা নেতিবাচক সমত্ব, গ্রহণের সমত্ব যা অস্তিত্বের বিভিন্ন অভিঘাত ও ঘটনার সম্মুখীন হয় নির্বিকারভাবে এবং এরা আমাদের উপর যে সব বাহ্যরূপ ও প্রতিক্রিয়া আরোপ করে সে সব খণ্ডন করে। দ্বিতীয়টি হল সক্রিয়, ইতিবাচক সমত্ব যা অস্তিত্বের ঘটনাসমূহকে গ্রহণ করে তবে এক অবিভক্ত ভাগবতসত্তার অভিব্যক্তি হিসেবে, আর আমাদের অন্তঃস্থ দিব্য প্রকৃতি থেকে সে সবে যে সাড়া আসে তা-ও সম হয় এবং এই সক্রিয় সমত্ব তাদের রূপান্তরিত করে তার বিভিন্ন প্রচ্ছন্ন মূলে। প্রথমটি বাস করে একম্ ব্রহ্মের শান্তির মধ্যে এবং নিজ থেকে সরিয়ে রাখে সক্রিয় অবিদ্যার প্রকৃতিকে। দ্বিতীয়টি ঐ শান্তিরও মধ্যে বাস করে আবার ভগবানের আনন্দেরও মধ্যে বাস করে এবং প্রকৃতিগত পুরুষের জীবনের উপর আরোপ করে সত্তার দিব্য জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দের সব চিহ্ন। এক সাধারণ তত্ত্বের দ্বারা যুক্ত এই দুইটি দিকের দ্বারাই নির্ধারিত হবে পূর্ণযোগের সমত্ব সাধনা।

নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ কেবলমাত্র গ্রহিষ্ণু সমত্ব প্রাপ্তির জন্য সাধনা শুরু হতে পারে তিনটি বিভিন্ন তত্ত্ব বা মনোভাব থেকে কিন্তু তাদের ফল ও শেষ পরিণাম একই — তিতিক্ষা, উপেক্ষা (বা উদাসীনতা) ও প্রপত্তি। তিতিক্ষার তত্ত্ব নির্ভর করে আমাদের অন্তঃস্থ চিৎপুরুষের সামর্থ্যের উপর যাতে প্রাতিভাসিক প্রকৃতির যে সকল স্পর্শ, অভিঘাত ও আভাস চারিদিকে আমাদের আক্রমণ করে সে সব সহ্য করা হয়, — তাদের দ্বারা পরাভূত না হয়ে এবং তাদের সব ভাবময়, ইন্দ্রিয়বোধাত্মক, স্ফুরন্ত, বুদ্ধিগত প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করতে বাধ্য না হয়ে। অপরা প্রকৃতির মধ্যে বাহ্য মনের এই সামর্থ্য নেই। এর সামর্থ্য হল চেতনার সীমিত শক্তি, একে সাধ্যমতো সামাল দিতে হয় সেই সবের সঙ্গে যা সব এর উপর এসে পড়ে অথবা তাকে আক্রমণ করে এর চারিদিককার অস্তিত্বের এই লোকের চেতনা ও শক্তির আরো বিশাল আবর্ত থেকে। বিশ্বের মধ্যে এ যে আদৌ নিজেকে বাঁচিয়ে তার ব্যষ্টিসত্তাকে জাহির করে, তার মূলে বস্তুতঃ আছে তার অন্তঃস্থ চিৎপুরুষের সামর্থ্য, কিন্তু জীবনের উপর আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য এ সেই সামর্থ্যের সবখানি অথবা ঐ শক্তির আনন্ত্য সম্মুখে আনতে সক্ষম হয় না; তা যদি

আনতে সক্ষম হত তাহলে এ তৎক্ষণাৎ এর জগতের সমান ও প্রভু হতে সক্ষম হত। বস্তুতঃ এ যেমন পারে তেমনভাবে কাজ চালাতে বাধ্য হয়। এ কতকগুলি অভিঘাত পেয়ে সে সবকে আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণভাবে, কিছু সময়ের জন্য অথবা সব সময়ের জন্য আত্মসাৎ, সমীকরণ বা আয়ত্ত করে, আর তখন এ সেই পরিমাণে হর্ষ, আমোদ, তৃপ্তি, অভিরুচি, প্রেম ইত্যাদির ভাবময় ও ইন্দ্রিয়বোধাত্মক প্রতিক্রিয়া পায় অথবা স্বীকৃতি, সমর্থন, বোঝাপড়া, জ্ঞান, বিশেষ অনুরাগের বুদ্ধিগত ও মানসিক প্রতিক্রিয়া পায় এবং সেই সবের উপর এর সঙ্কল্প সে সবকে ধরে সতৃষ্ণ ও লোলুপ হয়ে এবং চেষ্টা করে সেই সবকে দীর্ঘস্থায়ী করতে, পুনঃপুনঃ পেতে, সৃষ্টি ও অধিগত করতে এবং তাদের তার জীবনের সুখদায়ক অভ্যাসে পরিণত করার জন্য। অন্যান্য অভিঘাতও এ পায় কিন্তু দেখে যে সেগুলি এত জোরালো অথবা এত বিসদৃশ ও বেসুরো অথবা এত ক্ষীণ যে সে সব থেকে কোন তৃপ্তি আসে না; এই সবকেই এ সহ্য করতে অথবা নিজের সঙ্গে মেলাতে অথবা আত্মসাৎ করতে অক্ষম হয় এবং তাদের প্রতিক্রিয়ায় বাধ্য হয়ে দেখা দেয় দুঃখ, যন্ত্রণা, অস্বস্তি, অতৃপ্তি, অসন্তোষ, অপছন্দ, বর্জন অথবা বুঝবার বা জানবার অক্ষমতা, অথবা গ্রহণে আপত্তি। এ চেষ্টা করে সে সব থেকে নিজেকে রক্ষা করতে, সে সব থেকে পালিয়ে আসতে, তাদের পুনরাবৃত্তি বন্ধ বা কম করতে; এই সব সম্বন্ধেই তার আসে ভয়, ক্রোধ, জুগুপ্সা, ত্রাস, বিতৃষ্ণা, বিরক্তি, লজ্জা, সে সব থেকে উদ্ধার পেলে এ খুসী হত, কিন্তু সে সব থেকে নিষ্কৃতি পায় না, কেননা তাদের কারণগুলিতে এবং সেজন্য ফলগুলিতেও এ বাঁধা থাকে এবং এমনকি সেগুলিকে আমন্ত্রণ ক'রে আনে; কেননা এই অভিঘাতগুলি জীবনের অঙ্গ, যে সব জিনিস আমরা কামনা করি সে সবের সঙ্গে জড়িত, আর তাদের সঙ্গে আমাদের ব্যবহারে অক্ষমতা হল আমাদের প্রকৃতির অপূর্ণতার অংশ। আবার অন্য কতকগুলি অভিঘাত আছে যেগুলিকে সাধারণ মন দমন অথবা শমিত করতে সক্ষম হয় আর সে সবে এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হল উপেক্ষা, সংবেদনশূন্যতা অথবা সহনশীলতা যা ইতিবাচক স্বীকার ও ভোগ নয়, আবার বর্জন কি কষ্ট ভোগ নয়। সকল বিষয়েই, ব্যক্তিতে, ঘটনায়, ভাবনায়, কর্মে, — যা কিছু মনের কাছে উপস্থিত হয় সে সবে সর্বদাই এই তিন প্রকারের প্রতিক্রিয়া আসে। সাধারণতঃ প্রতিক্রিয়াগুলি সকলের কাছে একই রকমের হয়, কিন্তু তাহলেও তা যে হতেই হবে তা নয়; প্রতিক্রিয়া কেমন হবে তা নির্ভর করে অভ্যাসের উপর আর তা সকলের কাছে ঠিক একই রকম হবে না অথবা বিভিন্ন সময়ে বা বিভিন্ন অবস্থায় একই মনের কাছে তা বিভিন্ন হয়। একই অভিঘাত হয়ত এক সময়ে সুখের বা ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে, অন্য সময় হয়ত এ বিপরীত বা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে, আবার কখনও হয়ত আমরা উদাসীন থাকি, নয়, সুখ দুঃখ কিছুই বোধ করি না।

যে সাধক প্রভুত্ব চায় সে প্রথম এই সব প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয় এমন এক জোরালো ও সম তিতিক্ষার শক্তি নিয়ে যা ঐসব প্রতিক্রিয়ার বিপরীত ও তাদের প্রতিরোধে সমর্থ। অপ্রীতিকর অভিঘাতগুলি থেকে নিজেকে রক্ষা করার অথবা সে সব

এড়িয়ে তা থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা না ক'রে সে হয়ত তাদের সম্মুখীন হয় এবং নিজেকে শিক্ষা দেয় দুঃখ ভোগ করতে এবং সে সবকে সহ্য করতে ধৈর্যের সঙ্গে, সাহসের সঙ্গে, উত্তরোত্তর আরো স্থির চিত্তে অথবা সে সবকে গ্রহণ করতে তপস্যার ভাবে, নয় শান্তভাবে। এই মনোভাবের, এই সাধনার ফল তিনটি, বিষয়সমূহ সম্বন্ধে পুরুষের তিনটি শক্তি প্রকট হয়। প্রথমতঃ, দেখা যায় যে আগে যা অসহনীয় ছিল তা সহ্য করা সহজ হয়েছে; যে শক্তি নিয়ে অভিঘাতটির সম্মুখীন হওয়া যায়, তা বৃদ্ধি পায়; অশান্তি, দুঃখ, বিষাদ, বিতৃষ্ণা অথবা বিভিন্ন অপ্রীতিকর প্রতিক্রিয়ার অন্য কোন সুর আসার জন্য ঐ অভিঘাত তখন ক্রমশঃ আরো বেশী শক্তিশালী হওয়া অথবা আরো দীর্ঘস্থায়ী হওয়া দরকার হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ দেখা যায় যে সচেতন প্রকৃতি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে — একটি হল সাধারণ মানসিক ও ভাবময় প্রকৃতি যার মধ্যে অভ্যস্ত প্রতিক্রিয়াগুলি পূর্বের মত ঘটতে থাকে, অন্যটি হল পরতর সঙ্কল্প ও যুক্তিবুদ্ধি যা নিরীক্ষণ করে এবং এই অপরা প্রকৃতির উগ্রভাবের দ্বারা ক্ষুব্ধ বা প্রভাবিত হয় না, একে নিজের ব'লে স্বীকার করে না, একে অনুমোদন বা অনুমতি দেয় না, অথবা তাতে অংশগ্রহণও করে না। তখন অপরা প্রকৃতির প্রতিক্রিয়াগুলির শক্তি ও সামর্থ্য কমতে শুরু করে, অপরা প্রকৃতি শুরু করে পরতরা যুক্তিবুদ্ধি ও সঙ্কল্পের শান্তি ও ক্ষমতার প্রস্তাবে সম্মতি দিতে এবং ক্রমশঃ ঐ শান্তি ও ক্ষমতা মানসিক ও ভাবময় সত্তা, এমনকি ইন্দ্রিয়বোধাত্মক, প্রাণিক ও শারীরিক সত্তাকেও অধিগত করে। এই থেকে আসে তৃতীয় শক্তি ও ফল — এই তিতিক্ষা ও প্রভুত্বের দ্বারা শক্তি, অপরা প্রকৃতির এই বিচ্ছিন্নতা ও বর্জন — যাতে সাধারণ প্রতিক্রিয়াগুলি বর্জন করা হয়, এমনকি, ইচ্ছা করলে আমরা আমাদের সকল প্রকার অনুভূতি পুনর্গঠন করতে পারি চিৎপুরুষের ক্ষমতার দ্বারা। এই পদ্ধতি যে শুধু সব অপ্রীতিকর প্রতিক্রিয়ার বেলাতেই প্রযুক্ত করা হয় তা নয়, সব সুখকর প্রতিক্রিয়াতেও প্রযুক্ত হয়; পুরুষ নিজেকে তাদের কাছে সমর্পণ করতে অথবা তাদের দ্বারা চালিত হতে অস্বীকার করে; যে অভিঘাতগুলি হর্ষ ও সুখ আনে সেগুলি সে সহ্য করে শান্ত ভাবে, তাদের দ্বারা উত্তেজিত হতে চায় না, প্রিয় জিনিসের জন্য মনের উৎসুক অন্বেষণ ও হর্ষ সরিয়ে তাদের স্থলে আনে চিৎপুরুষের শান্তি। আবার এটি ভাবনামানসের বেলাতেও প্রয়োগ করা যেতে পারে, জ্ঞান ও জ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা গ্রহণ করা হয় শান্ত ভাবে, কোন মনোহর ভাবনা-প্রস্তাবের মোহে চলতে অথবা কোন অনভ্যস্ত ও অরুচিকর ভাবনা-প্রস্তাবে বিতৃষ্ণার দরুন তা থেকে বিমুখ হতে সে চায় না, বরং সে পরম সত্যের প্রতীক্ষায় থাকে অনাসক্ত দ্রষ্টার দৃষ্টি নিয়ে যার ফলে সত্য বৃদ্ধি পায় শক্তিশালী, নিঃস্বার্থ, প্রভুত্বময় সঙ্কল্প ও যুক্তিবুদ্ধির ভিত্তির উপর। এইভাবে পুরুষ ক্রমশঃ সকল বিষয়েই সম হয়, নিজের প্রভু হয় এবং সমর্থ হয় জগতের সম্মুখীন হতে মনে প্রবল প্রতিরোধ শক্তি এবং চিৎপুরুষের অবিচল প্রসন্নতা নিয়ে।

দ্বিতীয় পথ হল নিরপেক্ষ উদাসীনতার মনোভাব। এর পদ্ধতি হল প্রথমেই বিষয়সমূহের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বর্জন করা এবং তাদের প্রতি অনুশীলন করা এক

জ্যোতির্ময় নির্বিকারভাব, এক নিষেধকারী বর্জন, বিচ্ছেদ ও বিরতির অভ্যাস। এই মনোভাবগঠনে জ্ঞান অপেক্ষা সঙ্কল্পের প্রভাব কম, যদিও সঙ্কল্প সর্বদাই প্রয়োজনীয়। এ হল এমন এক মনোভাব যাতে মনের উগ্রভাবগুলিকে মনে করা হয় যে এরা বহির্মুখী মানসিকতার ভ্রান্তিজাত বিষয় অথবা এরা একমাত্র সম চিৎপুরুষের প্রসন্ন সত্যের অযোগ্য বিভিন্ন অবর গতিক্রিয়া অথবা এমন প্রাণিক ও ভাবময় বিক্ষোভ যা বর্জন করা কর্তব্য তত্ত্বজ্ঞানীর শান্ত দ্রষ্টা সঙ্কল্পের দ্বারা এবং অনুরাগবিহীন বুদ্ধির দ্বারা। এ মন থেকে কামনা সরিয়ে ফেলে, যে অহং বিষয়সমূহে দুটি ক'রে মূল্য দেয়, তাকে ত্যাগ করে এবং কামনার স্থলে আনে নিরপেক্ষ ও উদাসীন প্রশান্তি এবং অহং-এর স্থলে আনে শুদ্ধ আত্মা যা জগতের বিভিন্ন অভিঘাতে বিক্ষুব্ধ, উত্তেজিত বা বিচলিত হয় না। আর শুধু যে ভাবমানস শান্ত হয় তা নয়, বুদ্ধিগত সত্তাও অজ্ঞানতার ভাবনাগুলি বর্জন ক'রে অবর জ্ঞানের আগ্রহ ছাড়িয়ে উপরে ওঠে সেই একমাত্র সত্যে যা শাশ্বত ও অপরিবর্তনশীল। এই পথেও তিনটি ফল বা শক্তি বিকশিত হয় এবং এদের সাহায্যে এই পথ আরোহণ করে শান্তির মধ্যে।

প্রথমতঃ দেখা যায় যে মন নিজে ইচ্ছা করেই জীবনের তুচ্ছ সুখ দুঃখে বাঁধা পড়ে আর বাহ্য ও অল্পস্থায়ী বিষয়ের দ্বারা এই যে অসহায়ভাবে যন্ত্রের মতো চালিত হবার তার যে অভ্যাস আছে তা ত্যাগ করতে যদি অন্তঃপুরুষ শুধু ইচ্ছা করে, তাহলে দেখা যাবে যে বাস্তবিকই সেগুলির কোন আন্তর কর্তৃত্ব নেই তার উপর। দ্বিতীয়তঃ দেখা যায় যে এখানেও এক বিভাজন সম্ভব অর্থাৎ নিম্ন অথবা বাহ্যমন যা তখনো পুরনো বাহ্যস্পর্শগুলির অধীন এবং উচ্চতর বুদ্ধি ও সঙ্কল্প যা চিৎপুরুষের তটস্থ শান্তির মধ্যে বাস করার জন্য সরে দাঁড়ায় — এই দু'য়ের মধ্যে এক মনস্তাত্ত্বিক ব্যবধান। অন্যভাবে বলা যায় যে, আমাদের ভিতর এক আন্তর বিচ্ছিন্ন শান্তি গড়ে ওঠে যা নিম্ন অঙ্গগুলির চাঞ্চল্য নিরীক্ষণ করে তাতে কোন অংশ না নিয়ে অথবা কোন অনুমতি না দিয়ে। প্রথমে উচ্চতর বুদ্ধি ও সঙ্কল্প হয়ত আঁধারে ঢাকা থাকে, তার উপর আক্রমণ আসে, নিম্ন অঙ্গগুলির প্ররোচনায় মন ভেসে যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই শান্তি অবিনশ্বর, চিরস্থায়ী হয়, প্রচণ্ডতম স্পর্শেও বিচলিত হয় না, "ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে"। শান্তিময় এই আন্তর পুরুষ বাহ্যমনের অশান্তিকে দেখে এক বিচ্ছিন্ন শ্রেষ্ঠত্বের ভাব নিয়ে অথবা যেমন শিশুর সামান্য সুখদুঃখের প্রতি কিছু সময়ের জন্য নির্লিপ্ত প্রশ্রয় দেওয়া হয় তেমন নির্লিপ্তভাবে। আর সর্বশেষে এই বাহ্য মনও ক্রমশঃ এই শান্ত ও তটস্থ প্রসন্নতা গ্রহণ করে; যে সব বিষয় তাকে আগে আকর্ষণ করত, সে সব বিষয়ে সে আর আকৃষ্ট হয় না অথবা যে দুঃখকষ্টে মিথ্যা গুরুত্ব দেবার অভ্যাস তার ছিল সে সব তাকে আর পীড়া দেয় না। এইভাবে তৃতীয় শক্তি আসে — বিশাল স্থিরতা ও শান্তির সর্বব্যাপী শক্তি, আমাদের আরোপিত কাল্পনিক, আত্মনিপীড়ক প্রকৃতির অবরোধ থেকে মুক্তির আনন্দ, নিজের নিত্যতার দ্বারা অনিত্য বিষয়সমূহের সংঘর্ষ ও কোলাহল দূর করে এমন সনাতন ও অনন্তের স্পর্শের গভীর অবিচলিত অত্যধিক সুখ, "ব্রহ্মসংস্পর্শম্ অত্যন্তম্ সুখম্

অশ্রুতে”। অন্তঃপুরুষ নিবদ্ধ হয় আত্মার আনন্দের মধ্যে, “আত্ম-রতিঃ”, চিৎপুরুষের একমাত্র অনন্ত আনন্দে, সে বাহ্যস্পর্শসমূহের ও তাদের দুঃখসুখের পিছনে আর ছোটাছুটি করে না। সে জগৎকে দেখে এক ক্রীড়া বা অভিনয়ের দ্রষ্টার মতো যাতে অংশ নেবার কোন বাধ্যবাধকতা আর তার নেই।

তৃতীয় পথ হল প্রপত্তির পথ; এর অর্থ খৃষ্টীয় নতি যা ভগবৎসঙ্কল্পের নিকট প্রপত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, না হয় এর অর্থ সকল বিষয় ও ঘটনাকে কালের মধ্যে বিশ্বসঙ্কল্পের অভিব্যক্তি হিসেবে নিরহঙ্কারভাবে গ্রহণ অথবা ভগবানের নিকট, পরম পুরুষের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। যেমন প্রথমটি হল সঙ্কল্পের পথ, আর দ্বিতীয়টি জ্ঞান ও বোধশীল যুক্তিবুদ্ধির পথ, তেমন এই তৃতীয়টি হল ভাবময় প্রকৃতি ও হৃদয়ের পথ, আর ভক্তিতত্ত্বের সঙ্গে এর সম্বন্ধ অতীব নিবিড়। একে শেষ পর্যন্ত নেওয়া হলে এরও পরিণাম সেই একই — পূর্ণ সমত্ব। কারণ, অহং গ্রন্থি শিথিল হয় এবং ব্যক্তিগত দাবী চলে যেতে শুরু করে, আমরা দেখি যে আমরা আর প্রিয় বিষয়ে সুখ বা অপ্রিয় বিষয়ে দুঃখ পেতে বাধ্য নই; আমরা সে সব সহ্য করি, অধীরভাবে গ্রহণ করি না অথবা উদ্বিগ্ন হয়ে বর্জনও করি না, সে সবকে স্থাপন করি আমাদের সত্তার অধীশ্বরের নিকট, আমাদের কাছে তাদের ব্যক্তিগত ফলে আমরা ক্রমশঃই কম ব্যস্ত হই, তখন আমাদের কাছে শুধু একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, — তা হল ভগবানের কাছে যাওয়া, অথবা বিশ্বময় ও অনন্ত সৎ স্বরূপের সঙ্গে সম্পৃক্ত ও সমসুর হওয়া অথবা ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়া, তাঁর প্রবাহপ্রণালী, যন্ত্র, সেবক, প্রেমিক হওয়া, তাঁতেই এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কে আনন্দ পাওয়া এবং সুখ বা দুঃখের অন্য কোন বিষয় বা কারণ না রাখা। এখানেও কিছু সময়ের জন্য অভ্যস্ত ভাবাবেগের নিম্ন মন এবং প্রেম ও আত্মদানের উচ্চতর চৈত্যমনের মধ্যে এক বিভাজন আসতে পারে, কিন্তু পরিশেষে প্রথমটি হার মানে, পরিবর্তন স্বীকার করে; নিজেকে রূপান্তরিত করে এবং ভগবানের প্রেম, হর্ষ, আনন্দের মধ্যে মগ্ন হয়, তখন তার অন্য কোন আগ্রহের বা আকর্ষণের বিষয় থাকে না। তখন ভিতরের সব কিছুই ঐ মিলনের সম শান্তি ও আনন্দ, সেই একমাত্র নীরব আনন্দ যা বুদ্ধির অগম্য, এমন আনন্দ যাকে অবর বিষয়সমূহের আমন্ত্রণ স্পর্শ করে না, তা থাকে আমাদের আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের গভীর প্রদেশে।

এই তিনটি পথ আলাদা আলাদা শুরু হলেও এরা এক হয়ে যায় আর, তার প্রমাণ প্রথমতঃ এই যে, এই সবেতেই “বাহ্যস্পর্শে” মনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াগুলি বন্ধ করা হয়, আর দ্বিতীয়তঃ আত্মাকে বা চিৎপুরুষকে বিচ্ছিন্ন করা হয় প্রকৃতির বাহ্য ক্রিয়া থেকে। কিন্তু স্পষ্টতঃই আমাদের সিদ্ধি আরো মহৎ ও আরো ব্যাপকভাবে সম্পূর্ণ হবে যদি আমরা আরো সক্রিয় সমত্ব পাই যার বলে আমরা যে শুধু জগৎ থেকে সরে আসতে বা তার সম্মুখীন হতে পারি তটস্থ বা বিচ্ছিন্ন শান্তির মধ্যে তা নয়, তার উপর আবার ফিরে এসেও তাকে অধিগত করতে পারি শান্ত ও সম পরম চিৎপুরুষের শক্তিতে। এ সম্ভব হয় এই কারণে যে জগৎ, প্রকৃতি, ক্রিয়া বস্তুতঃ পৃথক কিছু নয়, এরা পরমাত্মা,

সর্বপুরুষ, ভগবানেরই অভিব্যক্তি। সাধারণ মনের প্রতিক্রিয়াগুলি দিব্য মূল্যের এক হীন রূপ, আর এই হীনরূপ না থাকলে, এই সত্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হ'ত অর্থাৎ এ হল এক মিথ্যা রূপ, এক অজ্ঞানতা যাতে তাদের ক্রিয়াগুলি পরিবর্তিত হয়, আর এই অজ্ঞানতা শুরু হয় অন্ধ জড়ীয় নির্জ্ঞানের মধ্যে পরমাত্মার নিবর্তন থেকে। একবার যদি আমরা পরমাত্মার, ভগবানের পূর্ণ চেতনার মধ্যে ফিরে যাই তাহলে আমরা সমর্থ হব বিষয়সমূহের উপর এক সত্যকার দিব্য মূল্য স্থাপনে এবং তাদের উপর ক্রিয়ায় পরম চিৎপুরুষের শান্তি, হর্ষ, জ্ঞান ও দ্রষ্টাসঙ্কল্প সমেত। যখন আমরা তা করতে আরম্ভ করি, তখন অন্তঃপুরুষ পেতে শুরু করে বিশ্বের মধ্যে এক সম হর্ষ, সকল ক্রিয়াশক্তির সঙ্গে ব্যবহার-রত এক সম সঙ্কল্প, এক সম জ্ঞান যা এই দিব্য অভিব্যক্তির সব ঘটনার পশ্চাতে আধ্যাত্মিক সত্য অধিগত করে। ভগবানেরই মতো সে জগৎকে অধিগত করে অনন্ত আলোক, শক্তি ও আনন্দের পরিপূর্ণতার মধ্যে।

সুতরাং নেতিবাচক ও নিষ্ক্রিয় সমত্বের যোগের পরিবর্তে এক ইতিবাচক ও সক্রিয় সমত্বের যোগের দ্বারা অগ্রসর হওয়া যায় এই সকল অস্তিত্বের দিকে। এর জন্য প্রথমতঃ দরকার এক নতুন জ্ঞান, অর্থাৎ ঐক্যের জ্ঞান — সর্বভূতকে নিজ ব'লে দেখা, এবং সর্বভূতকে দেখা ভগবানের মধ্যে এবং ভগবানকে দেখা সর্বভূতের মধ্যে। তখন এক সঙ্কল্প হয় যাতে সকল ঘটনা, সকল বিষয়, সকল ব্যাপারকে, সকল ব্যক্তি ও শক্তিকে সমভাবে গ্রহণ করা হয় যেন সে সব আত্মার মুখোশ, এক ক্রিয়াশক্তির গতিবৃত্তি, ক্রিয়ারত একমাত্র শক্তির বিভিন্ন পরিণাম, একমাত্র দিব্য প্রজ্ঞার দ্বারা শাসিত; আর মহত্তর জ্ঞানের এই সঙ্কল্পের ভিত্তির উপর এমন এক শক্তি বিকশিত হয় যাতে সকল কিছুকে দেখা যায় অনুদ্বিগ্ন অন্তঃপুরুষ ও মনের সঙ্গে। অবশ্য প্রয়োজনীয় হল বিশ্বের আত্মার সঙ্গে আমার নিজের একাত্মতা, সকল সৃষ্ট বিষয়ের সঙ্গে একত্বের দর্শন ও অনুভব, এই উপলব্ধি যে সকল শক্তি, ও ক্রিয়াশক্তি ও ফল হল আমার আত্মার এই শক্তির গতিবৃত্তি এবং সেজন্য অন্তরঙ্গভাবে আমার নিজের; তবে স্পষ্টতঃই সে সব আমার অহং-আত্মার নয়, এই অহং-আত্মাকে নীরব, বর্জন ও নিক্ষেপ করা চাই, কারণ তা না হলে এই সিদ্ধি পাওয়া অসম্ভব, — এই আত্মা হল এক মহত্তর নৈর্ব্যক্তিক বা বিশ্বময় আত্মা যার সঙ্গে আমি এখন এক। কারণ, আমার ব্যক্তিসত্ত্ব এখন ঐ বিশ্বময় আত্মার ক্রিয়ার শুধু এক কেন্দ্র, তবে এমন কেন্দ্র যা অন্য সকল ব্যক্তিসত্ত্বের সঙ্গে এবং অন্য যে সব বিষয় এখন আমাদের কাছে শুধু নৈর্ব্যক্তিক বস্তু ও শক্তি সে সবেরও সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ও সমসুর: কিন্তু বস্তুতঃ এরাও এক নৈর্ব্যক্তিক পুরুষের, ভগবানের, পরমাত্মার, ও চিৎপুরুষের শক্তি। আমার ব্যষ্টিত্ব তাঁরই ব্যষ্টিত্ব, এ আর বিশ্বময় সত্তার সঙ্গে অসঙ্গত বা তা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; এ নিজেই বিশ্বভাবাপন্ন, বিশ্বময় আনন্দের জ্ঞাতা এবং যা সব এ জানে, যা সবের উপর এ কাজ করে ও যা সব উপভোগ করে, এ সে সবের সঙ্গে এক, সে সবের প্রেমিক। কেননা বিশ্বের সম জ্ঞানের সঙ্গে এবং বিশ্বস্বীকারের সম সঙ্কল্পের সঙ্গে যুক্ত হবে ভগবানের সকল বিশ্ব অভিব্যক্তিতে এক সম আনন্দ।

এখানেও এই পদ্ধতির তিনটি ফল বা শক্তি বর্ণনা করা যায়। প্রথমতঃ আমরা সম গ্রহণের এই শক্তি বিকশিত করি চিৎপুরুষ ও উচ্চতর যুক্তিবুদ্ধি ও সঙ্কল্পের মধ্যে যা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে সাড়া দেয়। কিন্তু আমরা এও দেখি যে যদিও প্রকৃতিকে রাজী করান যায় এই সাধারণ মনোভাব গ্রহণে তবু ঐ উচ্চতর যুক্তিবুদ্ধি ও সঙ্কল্প এবং নিম্ন মনোময় সত্তার মধ্যে এক সংগ্রাম চলে, কারণ এই সত্তা আঁকড়ে থাকে জগৎকে দেখার ও তার সব অভিঘাতে সাড়া দেওয়ার পুরনো অহমাত্মক পথটি। তারপর আমরা দেখতে পাই যে যদিও এই দুটি প্রথমে বিশৃঙ্খল, পরস্পরের সঙ্গে মিশ্রিত, নিজেদের মধ্যে পালা বদল করে, পরস্পরের উপর সক্রিয় হয়, অধিকারের জন্য সচেষ্ট হয়, তবু তাদের বিভাজন সম্ভব, পরতর আধ্যাত্মিক প্রকৃতিকে মুক্ত করা যায় অবর মানসিক প্রকৃতি থেকে। কিন্তু এই অবস্থায় যখন মন তখনো দুঃখ, অশান্তি, হীন হর্ষ ও আমাদের প্রতিক্রিয়ার অধীন থাকে, তখন বাড়তি এক বাধা উপস্থিত হয় যার প্রভাব আরো তীব্রভাবে ব্যক্তিভাবাপন্ন যোগে এই যোগের চেয়ে কম। কেননা, এই যোগে মন যে শুধু তার নিজের উদ্বেগ ও বাধা অনুভব করে তা নয়, এ অন্যদেরও সুখদুঃখের অংশভাক্ হয়, তীব্র সমবেদনায় সে সবে স্পন্দিত হয়, সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতার সঙ্গে তাদের সব অভিঘাত অনুভব করে, সে সবকে তার নিজের করে; শুধু তাই নয়, অন্যদের বিঘ্নগুলি আমাদের নিজেদের সব বিঘ্নের সঙ্গে যুক্ত হয়, এবং সিদ্ধির বিরোধী শক্তিগুলি আরো দৃঢ়তার সঙ্গে সক্রিয় হয়, কারণ এরা অনুভব করে যে এই সাধনা তাদের বিশ্ব রাজ্যের উপর এক আক্রমণ এবং তা জয় করার চেষ্টা, এ শুধু তাদের সাম্রাজ্য থেকে একটি বিবিক্ত পুরুষের পলায়ন নয়। কিন্তু পরিশেষে আমরা এও দেখি যে এই সব বিঘ্ন অতিক্রম করার এক শক্তি আসে; উচ্চতর যুক্তিবুদ্ধি ও সঙ্কল্প নিজেদের আরোপ করে নিম্ন মনের উপর যা আমাদের জ্ঞাতসারেই পরিবর্তিত হয় আধ্যাত্মিক প্রকৃতির বিরাট জাতিরূপে; এমনকি যতদিন না এর রূপান্তরের দ্বারা সকল কষ্ট, বাধা ও বিঘ্ন দূর করা হয় ততদিন এ সে সবগুলিকে অনুভব করায়, তাদের সম্মুখীন হওয়ায়, জয় করায় আনন্দ পায়। তারপর সমগ্র সত্তা বাস করে পরম চিৎপুরুষের স্বরূপ অবস্থার ও তাঁর অভিব্যক্তির এক অন্তিম শক্তি, বিশ্বজনীন ধীরতা ও হর্ষ, দ্রষ্টা আনন্দ ও সঙ্কল্পের মধ্যে।

এই ইতিবাচক পদ্ধতি কিভাবে কাজ করে তা দেখবার জন্য, আমরা খুব সংক্ষেপে জ্ঞান, সঙ্কল্প ও বেদনা এই তিন মহাশক্তির মধ্যে এর তত্ত্বটি অনুধাবন করব। প্রকৃতির মধ্যে আত্মার বিভিন্ন অভিব্যক্তিকে অন্তঃপুরুষ যে ভাবে নেয় ও তাদের উপর কার্যকরী মূল্য স্থাপন করে — তা-ই সকল ভাবাবেগ, বেদনা, ইন্দ্রিয়সংবিৎ। কিন্তু আত্মা যা অনুভব করে তা বিশ্বজনীন আনন্দ, পরমানন্দ। অপর পক্ষে আমরা দেখেছি যে, অবর মনোগত আত্মা সুখ, দুঃখ ও শমিত উপেক্ষার তিনটি পরিবর্তনশীল মূল্য দেয় যেগুলির সুর কম বেশী পর্যায়ে পরস্পরের মধ্যে মেশে, আর এই পর্যায় নির্ভর কেমনভাবে ব্যষ্টিভাবাপন্ন চেতনা সেই সবকে সাক্ষাৎ করে, বোধ করে, আত্মসাৎ, সমীকরণ ও আয়ত্ত করে যা সব তার ওপর এসে পড়ে সেই বৃহত্তর আত্মার সর্ব থেকে অথচ যাকে এ নিজের

বাইরে রেখেছে বিচ্ছিন্ন ব্যষ্টিভাবাপন্নতার দ্বারা এবং নিজের অনুভূতির কাছে অনাত্মরূপে তৈরী করেছে। কিন্তু আমাদের মধ্যে মহত্তর পরম আত্মা উপস্থিত থাকায় সকল সময়ই আমাদের মধ্যে এক নিগূঢ় অন্তঃপুরুষ থাকে যে এই সব বিষয়েই আনন্দ পায় এবং যা সব তাকে স্পর্শ করে তা থেকে শক্তি আহরণ করে এবং তাদের দ্বারা বৃদ্ধি পায় এবং যেমন অনুকূল, তেমন প্রতিকূল অনুভূতি থেকেও লাভবান হয়। বাহ্য কামপুরুষের উপর এ তার প্রভাব খাটায় এবং বস্তুতঃ এই জন্যই আমরা বেঁচে থাকার মধ্যে আনন্দ পাই এবং এমনকি সংগ্রাম ও কষ্টভোগ ও জীবনের কঠোরতর রঙগুলিতে এক প্রকার সুখ পেতে সমর্থ হই। কিন্তু বিশ্বজনীন আনন্দ পেতে হলে আমাদের সকল করণের শেখা দরকার কেমন করে আংশিক বা বিকৃত হর্ষ না পেয়ে পেতে হয় সকল বিষয়ের মৌলিক হর্ষ। সকল বিষয়েই আনন্দের এক তত্ত্ব আছে যা বুদ্ধি ধরতে পারে ও সৌন্দর্যবোধ অনুভব করতে পারে তাদের মধ্যে আনন্দের আস্বাদ হিসেবে, তাদের "রস" হিসেবে; কিন্তু সাধারণতঃ তারা তা না ক'রে তাদের উপর খুসীমতো অসম ও বিপরীত মূল্য স্থাপন করে: তাদের এমনভাবে চালান দরকার যাতে তারা সব জিনিসকে দেখে চিৎপুরুষের আলোকে এবং এই সব সাময়িক মূল্যগুলিকে রূপান্তরিত করে প্রকৃত রসে অর্থাৎ সম ও মৌলিক রসে, আধ্যাত্মিক রসে। সেখানে প্রাণতত্ত্বের কাজ হল এই আনন্দের তত্ত্বগ্রহণকে, "রসগ্রহণকে" এক পাওয়ার ভোগের প্রবল রূপ দেওয়া যা সমস্ত প্রাণসত্তাকে তা দিয়ে স্পন্দিত করে এবং তা গ্রহণ করতে ও তাতে আনন্দ পেতে বাধ্য করে; কিন্তু সাধারণতঃ কামনার জন্য এ তার কাজ করতে অসমর্থ হয়, এ তাকে পরিবর্তিত করে তিনটি অবররূপে, — সুখভোগে, দুঃখভোগে এবং এই উভয়েরই বর্জনে অর্থাৎ যাকে আমরা বলি সংবেদনশূন্যতা বা উপেক্ষা তাতে। প্রাণকে অর্থাৎ প্রাণিক সত্তাকে মুক্ত করা চাই কামনা ও এর সব অসমতা থেকে, তার কর্তব্য বুদ্ধি ও সৌন্দর্যবোধ যে রস উপলব্ধি করে তা গ্রহণ করা ও তাকে পরিণত করা শুদ্ধ ভোগে। তখন আর করণগুলির মধ্যে সেই তৃতীয় পদক্ষেপ নেবার কোন বাধা থাকে না যার দ্বারা সকল কিছু পরিবর্তিত হয় আধ্যাত্মিক আনন্দের পরিপূর্ণ ও শুদ্ধ রভসে।

আবার জ্ঞানের বিষয়ে, বিষয়সমূহের প্রতি মনের তিনটি প্রতিক্রিয়া আছে — অজ্ঞানতা, প্রমাদ ও সত্য জ্ঞান। ইতিবাচক সমত্ব প্রথমে এই তিনটিকেই গ্রহণ করবে আত্ম-অভিব্যক্তির গতিবৃত্তি হিসেবে; এই আত্ম-অভিব্যক্তি অজ্ঞানতা থেকে নির্গত হয়ে প্রমাদের কারণ যে আংশিক বা বিকৃত জ্ঞান তার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে বিকশিত হয় সত্যজ্ঞানে। এ মনের অজ্ঞানতার সঙ্গে ব্যবহার করবে যেন এ মনস্তাত্ত্বিক হিসেবে যা তা-ই অর্থাৎ চিৎ-ধাতুর তমসাচ্ছন্ন, অবগুণ্ঠিত বা আবৃত অবস্থা যার মধ্যে সর্বজ্ঞ পরমাত্মার জ্ঞান প্রচ্ছন্ন আছে যেন এক অন্ধকারময় কোষের মধ্যে। এ (অর্থাৎ ইতিবাচক সমত্ব) অজ্ঞানতার উপর বাস করবে মনের দ্বারা এবং পূর্ব থেকে জানা সম্পৃক্ত সব সত্যের সাহায্যে, বুদ্ধির দ্বারা অথবা বোধিত একাগ্রতার দ্বারা জ্ঞানকে মুক্ত করবে অজ্ঞানতার অবগুণ্ঠন থেকে। এ শুধু জানা বিষয়টিতেই আসক্ত থাকবে না অথবা সকল কিছুকেই

এর ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে আঁটতে চেষ্টা করবে না, বরং জানা ও অজানাতে বাস করবে এমন এক সম মন নিয়ে যা সকল সম্ভাবনার নিকট উন্মুক্ত। প্রমাদ সম্বন্ধেও তার ঐ একই ব্যবহার; এ সত্য ও প্রমাদের জটিল পাককে গ্রহণ করবে, কিন্তু কোন মতামতেই নিজেকে আসক্ত করবে না, বরং পেতে চেষ্টা করবে সকল মতের পিছনে সত্যের অংশকে, প্রমাদের মধ্যে আচ্ছন্ন জ্ঞানকে — কারণ সকল প্রমাদ হল সত্যের কিছু ভুলবোঝা অংশের বিকৃতি এবং তার জীবনীশক্তি আসে সেখান থেকেই, সত্যকে ভুল বোঝা থেকে নয়; নির্ণীত সত্যগুলিকে এ স্বীকার করবে, কিন্তু তার মধ্যেই নিজেকে বেঁধে রাখবে না কিন্তু সর্বদাই নতুন জ্ঞানের জন্য প্রস্তুত থাকবে এবং পেতে চেষ্টা করবে উত্তরোত্তর অখণ্ড, উত্তরোত্তর প্রসারিত, সমন্বয়ী, ঐক্যসাধক প্রজ্ঞা। কিন্তু এ পরিপূর্ণভাবে আসা সম্ভব কেবল আদর্শ অতিমানসে আরোহণ করে এবং সেই কারণে সত্যের সম সাধক ধীশক্তি ও এর ক্রিয়ায় আসক্ত হবে না বা ভাববে না যে এইখানেই সকল কিছুর সমাপ্তি, বরং প্রস্তুত থাকবে এ ছাড়িয়ে আরো উচ্চে উঠতে, আরোহণের প্রতি পর্যায়কে এবং তার সত্তার প্রতি শক্তির অবদানকে স্বীকার করবে, কিন্তু তা করবে শুধু তাদের এক পরতর সত্যের মধ্যে তোলবার জন্য। তার অবশ্য কর্তব্য হল সব কিছু গ্রহণ করা, কিন্তু কোন কিছুতেই আঁকড়ে না থাকা, কোন কিছু থেকে বিমুখ হয়ে সরে না আসা তা এ যতই অপূর্ণ অথবা প্রচলিত ধারণার পরিপন্থী হ'ক, তবে আবার সত্য-চিৎপুরুষের স্বচ্ছন্দ ক্রিয়ায় ক্ষতি হবে এমন কিছুকে সে তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে দেবে না। পরতর অতিমানসিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে আরোহণের জন্য বুদ্ধির এই সমত্ব এক অত্যাবশ্যক সর্ত।

আমাদের মধ্যে সঙ্কল্প সাধারণতঃ আমাদের সত্তার সর্বাপেক্ষা প্রবল শক্তি — জ্ঞানের সঙ্কল্প আছে আর আছে প্রাণের সঙ্কল্প, ভাবাবেগের সঙ্কল্প, আমাদের প্রকৃতির প্রতি অংশে সক্রিয় এক সঙ্কল্প; এই সঙ্কল্প অনেক রূপ নেয় এবং বিষয়সমূহে এর প্রতিক্রিয়াও নানাবিধ, যেমন অসামর্থ্য, শক্তির, প্রভুত্বের সঙ্কীর্ণতা, অথবা উচিত সঙ্কল্প, অনুচিত বা বিকৃত সঙ্কল্প, উদাসীন প্রবৃত্তি, — নীতিগত মনে পাপ, পুণ্য ও অনৈতিক প্রবৃত্তি — এবং এই রকম অন্য সব প্রতিক্রিয়া। ইতিবাচক সমত্ব এগুলিকেও প্রথমে নেয় সাময়িক মূল্যের জট হিসেবে, এই সবই তার যাত্রার উপকরণ কিন্তু এই সবকে তার রূপান্তরিত করা চাই বিশ্বময় কর্তৃত্বে, সত্য এবং বিশ্বময় ঋতের সঙ্কল্পে, সক্রিয় দিব্য সঙ্কল্পের স্বাতন্ত্র্যে। নিজের বিচ্যুতির জন্য সম সঙ্কল্পের কোনরকম অনুতাপ, দুঃখ বা অবসাদ বোধ করার প্রয়োজন নেই; যদি এই সবগুলি অভ্যস্ত মানসিকতায় উদিত হয়, এ শুধু দেখবে যে এরা কতদূর কোন অপূর্ণতার পরিচায়ক এবং দেখায় কি সংশোধন আবশ্যক — কারণ সকল সময় এরা সঠিক পরিচায়ক নয় — আর এইভাবে এ সে সব ছাড়িয়ে যাবে এক সম ও শান্ত দেশনার নিকট। এ দেখবে যে এই সব বিচ্যুতিগুলি নিজেরাই অভিজ্ঞতার জন্য প্রয়োজনীয় এবং শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য সাধনের সহায়কর। আমাদের নিজেদের মধ্যে ও জগতের মধ্যে যা সব ঘটে সে সবের পশ্চাতে ও ভিতরে

এ খুঁজবে দিব্য অর্থ ও দিব্য দেশনা; আরোপিত সীমা ছাড়িয়ে এ দেখবে বিশ্বশক্তির স্বেচ্ছাকৃত আত্মসীমা যার দ্বারা এ তার পদক্ষেপ ও পর্যায় নিয়ন্ত্রিত করে — আমাদের অবিদ্যার উপর এই সীমা আরোপিত, আর দিব্য জ্ঞানে এ হল আত্ম-আরোপিত — এবং এরও উজানে এ যাবে ভগবানের অসীম শক্তি সমেত ঐক্যে। সকল শক্তি ও ক্রিয়াকে এ দেখবে একমাত্র সৎ-স্বরূপ থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন শক্তি হিসেবে, এবং তাদের বিকৃতিগুলি ঐ গতিবৃত্তির পক্ষে প্রয়োজনীয় এমন সব অপূর্ণতা হিসেবে যেগুলি বিকাশ ধারার পক্ষে অনিবার্য; সেজন্য এ সকল অপূর্ণতাকেই সদয়ভাবে দেখবে, তবে সব সময়ই এ দৃঢ়ভাবে চাপ দেবে এক বিশ্বসিদ্ধি কল্পে। এই সমস্ত প্রকৃতিকে উন্মুক্ত করবে দিব্য ও বিশ্বসঙ্কল্পের দেশনার নিকট এবং একে প্রস্তুত করবে সেই অতিমানসিক ক্রিয়ার জন্য যাতে আমাদের মধ্যকার অন্তঃপুরুষের শক্তি পরম চিৎপুরুষের শক্তিতে জ্যোতির্ময়ভাবে পরিপূর্ণ এবং তার সঙ্গে এক।

নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয়, এই দুটি পদ্ধতিকে পূর্ণ যোগ ব্যবহার করবে প্রকৃতির প্রয়োজন অনুযায়ী এবং আন্তর চিৎপুরুষের, অন্তর্যামীর দেশনা অনুসারে। নিষ্ক্রিয় পদ্ধতির দ্বারা এ নিজেকে গণ্ডিবদ্ধ করবে না, কারণ তার ফল হবে একপ্রকার ব্যক্তিগত নিবৃত্তিমূলক মোক্ষ অথবা সক্রিয় ও বিশ্বময় আধ্যাত্মিক সত্তার অভাব, কিন্তু এই সব পূর্ণযোগের লক্ষ্যের সমগ্রতার পরিপন্থী। এ তিতিক্ষার পদ্ধতি অবলম্বন করবে কিন্তু অনাসক্ত ক্ষমতা ও প্রসন্নতাতে এ ক্ষান্ত হবে না, বরং এ সদর্থক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের দিকে অগ্রসর হবে যাতে তিতিক্ষার আর প্রয়োজন হবে না, কারণ তখন আত্মা বিশ্বশক্তিকে অধিগত করবে শান্ত ও শক্তিশালী স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং সমর্থ হবে তার সকল প্রতিক্রিয়াগুলিকে সহজ ও সুখময়ভাবে নির্ধারণ করতে একত্ব ও আনন্দের মধ্যে। এ নিরপেক্ষ উদাসীনতার পদ্ধতি অবলম্বন করবে কিন্তু সকল বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন উদাসীনতায় ক্ষান্ত হবে না, বরং তার সাধনা হবে উচ্চে আসীন হয়ে এমন শক্তিশালীভাবে জীবনকে নিরপেক্ষভাবে গ্রহণ করা যাতে সকল অনুভূতিকে রূপান্তরিত করা যায় সম চিৎপুরুষের বিভিন্ন মহত্তর মূল্যে। সাময়িকভাবে এ নতি ও প্রপত্তিকেও ব্যবহার করবে, কিন্তু ভগবানের কাছে নিজের ব্যক্তিগত সত্তার পূর্ণ আত্মসমর্পণের দ্বারা এ লাভ করবে সেই সর্বাধিকারী আনন্দ যার মধ্যে নতির কোন প্রয়োজন নেই, লাভ করবে বিশ্বময়ের সঙ্গে সুষ্ঠু সামঞ্জস্য যা শুধু এক নিষ্ক্রিয় সম্মতি নয় বরং এক সর্বগ্রাহী একত্ব, আর লাভ করবে ভগবানের নিকট প্রাকৃত আত্মার সুষ্ঠু করণতা ও অধীনতা যার দ্বারা জীব পুরুষ ভগবানকেও অধিগত করে। এ ইতিবাচক পদ্ধতি পূর্ণভাবে অবলম্বন করবে, কিন্তু বিষয়সমূহের সেই ব্যষ্টি গ্রহণ ছাড়িয়ে যাবে যার ফলে অস্তিত্ব পরিবর্তিত হ'ত শুধু সিদ্ধ ব্যক্তিগত জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দের ক্ষেত্রে। এ তা পাবেই কিন্তু আরো যা সে পাবে তা হল একত্ব যার দ্বারা এ যে শুধু নিজের জন্যই অন্যের অস্তিত্বে বাস করতে পারবে তা নয়, বরং ঐ অস্তিত্বে বাস করতে পারবে তাদেরও জন্য এবং তাদের সহায়তার জন্য, একই সিদ্ধির দিকে সাধনার

পথে তাদের করণ হিসেবে, এক সহচরিত ও সাহায্যদাতা শক্তি হিসেবে। এ ভগবানের জন্য বাস করবে, কিন্তু প্রপঞ্চ বর্জন করে নয়, পৃথিবীতে বা স্বর্গে আসক্ত না হয়ে, আবার বিশ্বোত্তীর্ণ মুক্তিতেও আসক্ত না হয়ে, বরং ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে বাস করবে সমভাবে তাঁর সকল লোকের মধ্যে, আবার তাঁর মধ্যে সমভাবে আত্মা ও অভিব্যক্তির মধ্যেও বাস করতে সমর্থ হবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সমত্বের ক্রিয়া

যে পার্থক্যগুলি করা হয়েছে তাতে সমত্বের পাদের অর্থ কি তা যথেষ্ট পরিমাণে দেখান হয়েছে। এ শুধু প্রবৃত্তির প্রশম ও ঔদাসীন্য নয়, অনুভূতি থেকে প্রত্যাহার নয়, বরং মন ও প্রাণের বর্তমান সব প্রতিক্রিয়ার উপর শ্রেষ্ঠত্ব। জীবনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে, বরং একে আলিঙ্গন ক'রে একে আত্মা ও চিৎপুরুষের ক্রিয়ার এক সুষ্ঠু রূপ হওয়ার জন্য একে বাধ্য করার এ হল এক আধ্যাত্মিক পথ। এই হল অস্তিত্বের উপর অন্তঃপুরুষের কর্তৃত্বর প্রথম রহস্য। যখন আমরা একে সুষ্ঠুভাবে পাই, তখন আমরা দিব্য আধ্যাত্মিক প্রকৃতির নিজের ভূমিতে উত্তীর্ণ হই। দেহের মধ্যে মনোময় পুরুষ চেষ্টা করে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও জয় করতে কিন্তু সে পদে পদে জীবনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়, কারণ সে প্রাণিক আত্মার কামনাময় প্রতিক্রিয়াগুলির কাছে নতিস্বীকার করে। সম হওয়াই, কামনার কোন চাপে পরাভূত না হওয়াই প্রকৃত কর্তৃত্বের প্রথম সর্ত, এর ভিত্তি হল আত্মসাম্রাজ্য। কিন্তু যে সমত্ব শুধু মানসিক, তা সে যত মহানই হ'ক না কেন, তার দোষ এই যে এ নিবৃত্তিপ্রবণ। কামনা থেকে এ নিজেকে রক্ষা করে সঙ্কল্প ও ক্রিয়ায় নিজেকে সীমিত ক'রে। একমাত্র চিৎপুরুষই সক্ষম সঙ্কল্পের অত্যুৎকৃষ্ট অক্ষুব্ধ তীব্রতা এবং অসীম ধৈর্য ধারণে, সে মন্থর ও সুচিন্তিত কর্মে, আবার দ্রুত ও প্রচণ্ড কর্মে সমভাবেই ন্যায়পরায়ণ, নিরাপদভাবে গণ্ডিবদ্ধ ও সীমিত কর্মে, আবার বিশাল ও বিপুল কর্মে সে সমভাবেই সুনিশ্চিত। বিশ্বের সঙ্কীর্ণতম গণ্ডির মধ্যে ক্ষুদ্রতম ক্রিয়াও সে গ্রহণ করতে সক্ষম আবার সে নির্ঋতির আবর্তের উপরেও কাজ করতে সক্ষম বিবেচনাশীল ও সৃজনক্ষম শক্তি দিয়ে; আর এই সব জিনিস সে করতে সক্ষম কারণ অনাসক্ত অথচ ঘনিষ্ঠভাবে তাদের গ্রহণ করে সে উভয়ের মধ্যেই নিয়ে যায় অনন্ত শান্তি, জ্ঞান, সঙ্কল্প ও শক্তি। তার ঐ অনাসক্তি থাকে কারণ সে যে সব ঘটনা, রূপ, ভাবনা ও গতিবৃত্তি তার পরিধির মধ্যে গ্রহণ করে সে সবের উর্ধ্বে সে; আর তার ঐ ঘনিষ্ঠ গ্রহণ থাকে কারণ সে তখনো সকল বিষয়ের সঙ্গে এক। যদি আমাদের এই স্বচ্ছন্দ ঐক্য, "একত্বম্ অনুপশ্যতঃ", না থাকে তাহলে আমরা চিৎপুরুষের পূর্ণ সমত্ব পাই না।

সাধকের প্রথম কাজ হল এই দেখা যে তার পূর্ণ সমত্ব আছে কিনা, এ বিষয়ে সে কতদূর অগ্রসর হয়েছে, আর না হয় কোথায় তার ত্রুটি এবং দৃঢ়ভাবে তার প্রকৃতির উপর নিজের সঙ্কল্প প্রয়োগ করা অথবা পুরুষের সঙ্কল্প আমন্ত্রণ করা যাতে ঐ ত্রুটি ও এর কারণগুলি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। এই চারটি বিষয় তার পাওয়া চাই-ই, — প্রথম, সমতা অর্থাৎ এই পদটির সব চেয়ে ব্যবহারিক অর্থে অর্থাৎ সকল প্রকার মানসিক, প্রাণিক, শারীরিক অভিরুচি থেকে মুক্তি, এবং তার ভিতরে ও চারিদিকে

ভগবানের সকল ক্রিয়ার সমভাবে গ্রহণ; দ্বিতীয়তঃ শান্তি অর্থাৎ স্থির প্রশান্তি এবং সকল ক্ষোভ ও উদ্বেগের অভাব; তৃতীয়তঃ, সুখম্ অর্থাৎ এক সদর্থক আন্তর আধ্যাত্মিক সুখ এবং প্রাকৃত সত্তার আধ্যাত্মিক স্বস্তি যাকে কিছুই ক্ষুণ্ণ করতে পারে না; চতুর্থতঃ জীবন ও অস্তিত্বকে আলিঙ্গনকারী অন্তঃপুরুষের বিমল হর্ষ ও হাস্য। সম হওয়ার অর্থ অনন্ত ও বিশ্বময় হওয়া, নিজেকে সীমিত না করা, মন ও প্রাণের কোন একটি বা অন্যরূপে ও এর আংশিক সব অভিরুচি ও কামনার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ না করা। কিন্তু যেহেতু মানুষ তার বর্তমান সাধারণ প্রকৃতিতে তার মানসিক ও প্রাণিক গঠনের দ্বারাই বাস করে, তার চিৎপুরুষের স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে নয়, সেহেতু, এই সবে এবং তাদের সঙ্গে জড়িত কামনা ও অভিরুচিতে তার আসক্তিও তার স্বাভাবিক অবস্থা। প্রথম অবস্থায় এই সবকে স্বীকার করা অনিবার্য, এই সব ছাড়িয়ে যাওয়া অতীব দুরূহ এবং হয়ত সম্পূর্ণ সম্ভব নয় যতক্ষণ আমরা মনকেই আমাদের ক্রিয়ার প্রধান করণ হিসেবে ব্যবহার করি। অতএব প্রথম কর্তব্য হল অন্ততঃ তাদের বিষদাঁত ভেঙে দেওয়া, এবং তারা টিকে থাকলেও তাদের প্রবলতর দুরাগ্রহ, তাদের বর্তমান অহং-ভাব, আমাদের প্রকৃতির উপর তাদের আরো উগ্র দাবী দূর করা।

আমরা যে তা করেছি তা জানা যাবে যদি মনে ও চিৎপুরুষে অচলা শান্তি উপস্থিত থাকে। সাধকের কর্তব্য হল, সাক্ষী ও ইচ্ছুক পুরুষ রূপে মনের পশ্চাতে দাঁড়িয়ে অথবা আরো যা ভাল, সমর্থ হওয়া মাত্রই মনের উর্ধ্বে অবস্থান ক'রে সতর্ক থাকা এবং তার মনের মধ্যে উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, দুঃখ, বিদ্রোহ, চাঞ্চল্যের ক্ষুদ্রতম চিহ্ন বা প্রসঙ্গ দূরে সরিয়ে দেওয়া। যদি এই জিনিসগুলি আসে তার কর্তব্য হল তৎক্ষণাৎ তাদের উৎপত্তিস্থল, তাদের সূচিত ত্রুটি, যে অহমাত্মক দাবী, প্রাণিক কামনা, ভাবাবেগ বা ভাবনার দোষ থেকে তাদের শুরু তা সব খুঁজে বার করা এবং এই সবকে তার নিস্তেজ করা চাই তার সঙ্কল্পের দ্বারা, তার আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন বুদ্ধির দ্বারা এবং তার সত্তার অধীশ্বরের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ অন্তঃপুরুষের দ্বারা। তাদের জন্য কোনক্রমেই কোন ছুতোই স্বীকার করা তার উচিত নয় তা সে ছুতো যতই স্বাভাবিক বা দেখতে ন্যায়সঙ্গত বা যুক্তিপূর্ণ হ'ক না কেন অথবা কোন আন্তর বা বাহ্য সমর্থনও স্বীকার করা উচিত নয়। ক্ষুব্ধ ও অস্থির অংশ যদি প্রাণ হয় তাহলে তার কর্তব্য হবে ক্ষুব্ধ প্রাণ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা, নিজের পরতরা প্রকৃতিকে বুদ্ধির মধ্যে আসীন রাখা এবং বুদ্ধির দ্বারা তার মধ্যকার কামপুরুষের দাবী সংযত ও বর্জন করা; আর ভাবাবেগের হৃদয় যদি ঐরকম অস্থির ও চঞ্চল হয় তাহলেও ঐরকম করাই তার কর্তব্য। কিন্তু অপর দিকে যদি সঙ্কল্প ও বুদ্ধিই দোষযুক্ত হয়, তাহলে সে দোষ দূর করা আরো কষ্টকর হয়, কারণ তখন তার প্রধান সহায় ও যন্ত্রটিই দিব্য সঙ্কল্পের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সহকর্মী হয় এবং নিম্ন অঙ্গের পুরনো দোষগুলি এই অনুমতির সুযোগ নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায়। সুতরাং কর্তব্য হল সর্বদাই একটিমাত্র যে প্রধান ভাবনা তাতেই জোর দেওয়া আর সেই ভাবনা হল আমাদের সত্তার অধীশ্বরের নিকট, আমাদের মধ্যে ও জগতের মধ্যে অবস্থিত ভগবানের নিকট, পরমাত্মা, বিরাট

পুরুষের নিকট আত্মসমর্পণ। এই প্রধান ভাবনায় সর্বদাই নিবিষ্ট হয়ে বুদ্ধি তার নিজের অন্য সব কম প্রবল আসক্তি ও অভিরুচিকে ক্ষীণ ক'রে সমগ্র সত্তাকে শিক্ষা দেবে যে অহং — যুক্তিবুদ্ধি, ব্যক্তিগতসঙ্কল্প, প্রাণের মধ্যে হৃদয় বা কামপুরুষের মারফৎ, যেভাবেই তার দাবী উপস্থিত করুক না কেন, তার কোন দাবীই উচিত নয় আর সকল দুঃখ, বিদ্রোহ, অধৈর্য, অশান্তি আমাদের সত্তার অধীশ্বরের এক প্রকার বিরুদ্ধাচরণ।

এই পূর্ণ আত্মসমর্পণই সাধকের প্রধান অবলম্বন হওয়া উচিত কারণ এই হল একমাত্র উপায় যার দ্বারা একান্ত স্থিরতা ও প্রশান্তি পাওয়া সম্ভব হয়; অবশ্য সকল কর্ম থেকে সম্পূর্ণ নিবৃত্তি ও উদাসীনতাও এক উপায় কিন্তু সে উপায় ত্যাগ করাই বিধেয়। যদি অশান্তি চলতে থাকে, একে শুদ্ধ ও সিদ্ধ করতে যদি সময় বেশী লাগে, তাহলে তার জন্য নিরুৎসাহ ও অধীর হবার কোন কারণ নেই। অশান্তি আসে কারণ প্রকৃতির মধ্যে তখনো এমন কিছু আছে যা তাতে সাড়া দেয় এবং অশান্তি বারবার আসায় ত্রুটি কোথায় তা জানার সুবিধা হয়, সাধক সতর্ক হয়ে ত্রুটি থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য সঙ্কল্পের আরো আলোকিত ও সঙ্গত ক্রিয়া প্রয়োগ করে। যখন অশান্তি এত প্রবল হয় যে তাকে বাইরে রাখা যায় না তখন একে বয়ে যেতে দিতেই হবে আর আরো সতর্ক হয়ে এবং আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন বুদ্ধির আগ্রহের দ্বারা দেখা উচিত যাতে এ সহজে ফিরে না আসে। এইভাবে অধ্যবসায় সহকারে সাধনার ফলে দেখা যাবে যে ক্রমশঃই এই সবগুলির জোর কমে আসছে, এই সব উত্তরোত্তর বাহ্য হয় এবং ফিরে এলেও স্বল্পস্থায়ী হয় যতক্ষণ না পরিশেষে শান্তিই হয়ে ওঠে সত্তার বিধান। এই নিয়ম চলতে থাকে যতক্ষণ মানসিক বুদ্ধিই প্রধান করণ; কিন্তু যখন অতিমানসিক আলোক মন ও হৃদয় অধিগত করে, তখন কোন উদ্বেগ, দুঃখ বা চাঞ্চল্য থাকতে পারে না; কারণ সেই আলোকের সঙ্গে আসে প্রদীপ্ত বীর্যের এক আধ্যাত্মিক প্রকৃতি যার মধ্যে এইসব বিষয়ের কোন স্থান থাকা সম্ভব নয়। সেখানে একমাত্র যে সব স্পন্দন ও ভাবাবেগ থাকে তা দিব্য ঐক্যের "আনন্দময়" প্রকৃতির অন্তর্গত।

সত্তাতে যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় তা অবিচল থাকা চাই, তা যাই ঘটুক না কেন — সুস্থ অবস্থায় ও পীড়ায় সুখে দুঃখে, এমনকি সর্বাপেক্ষা প্রবল শারীরিক যন্ত্রণাতেও, আমাদের নিজেদের অথবা আমাদের প্রিয়জনের সৌভাগ্যে ও দুর্ভাগ্যে, সফলতায় ও বিফলতায়, মান ও অপমানে, স্তুতি ও নিন্দাতে, আমাদের প্রতি ন্যায় বা অন্যায় করা হলেও অর্থাৎ যে সব কিছুতে সাধারণতঃ মন প্রভাবিত হয়, সে সবেও শান্তি অবিচল থাকা চাই। যদি আমরা সর্বত্র ঐক্য দেখি, যদি উপলব্ধি করি যে ভগবৎ-সঙ্কল্পের দ্বারাই সব কিছু ঘটে, ভগবানকে দেখি সকলের মধ্যে যেমন আমাদের বন্ধুদের মধ্যে তেমন আমাদের শত্রুদের মধ্যে, বা আরও সঠিকভাবে জীবনক্রীড়ায় আমাদের বিরোধী খেলুড়েদের মধ্যে, যেমন আমাদের সব অনুকূল ও সহায়কর শক্তির মধ্যে, তেমন আমাদের সব বিরুদ্ধ ও বাধাদায়ী শক্তির মধ্যে, সকল ক্রিয়াশক্তি, শক্তি ও ঘটনার মধ্যে এবং তাছাড়া যদি আমরা অনুভব করি যে সব কিছু আমাদের আত্মা থেকে অবিভক্ত,

সমগ্র জগৎ আমাদের বিশ্বসত্তার মধ্যে আমাদের সঙ্গে এক, তখন হৃদয় ও মনের পক্ষে শান্তির এই অবিচল ভাব রাখা আরো অনেক সহজ হয়ে পড়ে। তবে এই বিশ্বদৃষ্টি পাবার বা এতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই আমাদের কর্তব্য হবে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে এই গ্রহিষ্ণু ও সক্রিয় সমত্ব ও শান্তি পাওয়া। এর অল্পও "স্বল্পম্ অপি অস্য ধর্মস্য" সিদ্ধির দিকে এক বড় পদক্ষেপ; এতে এক প্রারম্ভিক দৃঢ়তা মুক্তির সিদ্ধির গোড়ার কথা, আর এর সম্পূর্ণতার অর্থ সিদ্ধির অন্যান্য অঙ্গে দ্রুত উন্নতির এক পরম আশ্বাস। কারণ এ না থাকলে আমরা কোন দৃঢ় ভিত্তি পাই না; আর এর সুস্পষ্ট অভাবে আমরা সর্বদাই কামনা, অহং, দ্বন্দ্ব, অজ্ঞানতার নিম্ন পর্যায়ে পিছিয়ে পড়ব।

এই শান্তি একবার পাওয়া গেলে, প্রাণিক ও মানসিক অভিরুচির উপদ্রবশক্তি নষ্ট হয়; এ থাকে শুধু মনের এক বাহ্য অভ্যাস হিসেবে। প্রাণিক গ্রহণ বা বর্জন, কোন ঘটনা অপেক্ষা অন্য এক বিশেষ ঘটনাকে স্বাগত জানাবার জন্য অধিকতর উৎসাহ, মানসিক গ্রহণ বা বর্জন, কোন কম অনুকূল ভাবনা বা সত্য অপেক্ষা কোন বিশেষ বেশী অনুকূল ভাবনা বা সত্যের প্রতি অভিরুচি — এই সব এক বাহ্য যান্ত্রিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়; তখনো এই সবের প্রয়োজন থাকে কারণ তা থেকে বোঝা যায় যে শক্তির কোন্ দিকে ফেরার অভিপ্রায় অথবা আমাদের সত্তার অধীশ্বর সাময়িকভাবে এখন একে কোন্ দিকে ঘোরাচ্ছেন। কিন্তু এর যে প্রবল অহমাত্মক সঙ্কল্পের, অসহিষ্ণু কামনার, দৃঢ়বদ্ধ পছন্দের অশান্তিকর ভাবটি তা নষ্ট হয়। এই বাহ্য রূপগুলি কিছুদিনের জন্য ক্ষীণ আকারে থাকতে পারে, কিন্তু যেমন সমত্বের শান্তি বৃদ্ধি পায়, গভীর হয়, আরো স্বরূপগত ও "ঘন" হয়, তেমন রূপগুলি অন্তর্ধান করে, মানসিক ও প্রাণিক ধাতুর উপর তাদের কোন প্রভাব পড়ে না অথবা তারা দেখা দেয় সর্বাপেক্ষা বাহ্য স্থূল মনের উপর শুধু স্পর্শ হিসেবে, তারা ভেতরে প্রবেশ করতে অক্ষম হয় এবং পরিশেষে মনের বহিঃপ্রান্তে ঐ পুনরাবৃত্তিরও বাহ্য আবির্ভাবের অবসান হয়। তখন এই উপলব্ধির জীবন্ত বাস্তবতা আসতে পারে যে আমাদের মধ্যে সকল কিছুই করা হয় ও চালিত হয় আমাদের সত্তার অধীশ্বরের দ্বারা, "যথা প্রযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"; এর আগে এ ছিল শুধু এক প্রবল ভাবনা ও বিশ্বাস যার সঙ্গে থাকত আমাদের ব্যক্তিগত প্রকৃতির সম্ভূতির পিছনে ভগবৎক্রিয়ার সাময়িক ও গৌণ আভাস। এখন প্রতি ক্রিয়াকেই দেখা যায় যে এ পুরুষের ইঙ্গিতে শক্তির, আমাদের মধ্যে ভগবৎ-শক্তির দেওয়া এক আকার; অবশ্য এ এখনো ব্যক্তিভাবাপন্ন, এখনো অবর মানসিক রূপের মধ্যে ক্ষুদ্রভাবাপন্ন কিন্তু মুখ্যতঃ এ অহমাত্মক নয়, এ এক অপূর্ণ রূপ, কিন্তু কোন সদর্থক বিকৃতি নয়। অতঃপর এই অবস্থাও ছাড়িয়ে যাওয়া চাই। কারণ সুষ্ঠু ক্রিয়া ও অনুভূতি কোন প্রকার মানসিক বা প্রাণিক অভিরুচির দ্বারা নির্ধারিত হবে না, তা নির্ধারিত হবে সত্যোদ্ভাসক ও অন্তঃপ্রেরক আধ্যাত্মিক সঙ্কল্প দ্বারা; এই সঙ্কল্পই শক্তি তাঁর প্রত্যক্ষ ও প্রকৃত প্রবর্তনায়। যখন আমি বলি যে আমি যেমন নিযুক্ত হই তেমন কাজ করি, তখনো আমি এক সঙ্কীর্ণতাজনক ব্যক্তিগত পদার্থ ও মানসিক প্রতিক্রিয়া আনি। কিন্তু প্রভুই তাঁর নিজের কাজ করেন

আমার মাধ্যমে, আমাকে তাঁর যন্ত্র ক'রে; আর আমার মধ্যে এমন কোন মানসিক বা অন্যরূপ অভিরুচি থাকা চলবে না যাতে গণ্ডি টানা যায়, হস্তক্ষেপ করা যায়, অপূর্ণ ক্রিয়ার উদ্ভব হয়। মনের হওয়া চাই এক নীরব জ্যোতির্ময় প্রবাহপ্রণালী যা দিয়ে উদ্ভাসিত হবে অতিমানসিক সত্য ও এর দেখার মধ্যে নিগূহিত সঙ্কল্প। তখনই ক্রিয়া হবে ঐ সর্বোত্তম পুরুষ ও সত্যের ক্রিয়া, মনের মধ্যে কোন সীমিত রূপান্তর বা ভ্রমাত্মক রূপান্তর নয়। যা কিছু সীমা, নির্বাচন, সম্পর্ক আরোপিত হয় তা ভগবান জীবের মধ্যে নিজেরই উপর নিজে আরোপ করবেন সেই সময়ে তাঁর নিজের উদ্দেশ্যের জন্য, সে সব অনিবার্য নয়, চরম নয় অথবা মনের কোন অজ্ঞানময় নির্ধারণ নয়। তখন মনন ও সঙ্কল্প হয়ে ওঠে এক জ্যোতির্ময় অনন্ত থেকে এক ক্রিয়া বিশেষ, এমন এক বিকাশ যা অন্য সব বিকাশকে বাদ দেয় না, বরং সে সবকে নিজের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের উপযুক্ত স্থানে রাখে, এমনকি তাদের ঘিরে রাখে বা রূপান্তরিত করে এবং দিব্য জ্ঞান ও ক্রিয়ার বৃহত্তর গঠনের দিকে অগ্রসর হয়।

প্রথম যে স্থিরতা আসে তা হল এক প্রশান্তি অর্থাৎ সকল উদ্বেগ, শোক ও চাঞ্চল্যের অভাব। সমত্ব যত প্রগাঢ় হয়ে ওঠে, ততই এই শান্তিতে সদর্থক সুখ ও আধ্যাত্মিক স্বস্তির পদার্থ বেশী হয়। এই হল চিৎপুরুষের স্বরূপে হর্ষ যা তার একান্ত অস্তিত্বের জন্য বাহ্য কিছুর উপর নির্ভরশীল নয়, অর্থাৎ গীতার ভাষায় "নিরাশ্রয়", "অন্তঃসুখোঽন্তরারামঃ", এক অতীব আন্তর সুখ, "ব্রহ্মসংস্পর্শম্ অত্যন্তম্ সুখম্ অশ্নুতে"। কোন কিছুই একে ক্ষুণ্ণ করতে অক্ষম, আর অন্তঃপুরুষ যে বাহ্য বিষয়সমূহ দেখে সে সবেও ঐ শান্তি ছড়িয়ে পড়ে, তাদেরও উপর এই শান্ত আধ্যাত্মিক হর্ষের বিধান আরোপ করে। কারণ এর ভিত্তি হল স্থির শান্তি, এ এক সম ও প্রশান্ত ও শমিত হর্ষ, "অহৈতুক", এবং অতিমানসিক আলোক যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে, ততই এক মহত্তর আনন্দ আসে, সকল কিছুর মধ্যে যে চিৎপুরুষ এই সকল কিছু হয়েছে, হয়ে উঠছে, দেখে, অনুভব করে তার অপর্যাপ্ত রভসের ভিত্তি এই আনন্দ; আর যে শক্তি জ্যোতির্ময়ভাবে ভগবানের কর্ম করেন ও সকল জগতের মধ্যে তাঁর আনন্দ নিয়ে যান তাঁর হাস্যেরও ভিত্তি এই আনন্দ।

সমত্বের সিদ্ধ ক্রিয়া বিষয়সমূহের মূল্য পরিবর্তন করে দিব্য আনন্দময় শক্তির ভিত্তিতে। বাহ্য কর্ম যেমন ছিল তেমন থাকতে পারে, অথবা বদলাতেও পারে, তা হবে চিৎপুরুষের নির্দেশ অনুসারে এবং জগতের জন্য যে কাজ করা হবে তার প্রয়োজন অনুযায়ী — কিন্তু সমগ্র আন্তর কর্ম অন্য প্রকারের। জ্ঞান, কর্ম, ভোগ, সৃষ্টি, রূপায়ণ — এই সবের বিভিন্ন সামর্থ্যে শক্তি অস্তিত্বের বিভিন্ন লক্ষ্য সাধনে নিজেকে নিযুক্ত করবেন, তবে অন্য মনোভাবে, তাদের এই যে সব লক্ষ্য, ফল, ক্রিয়াধারা সে সব ভগবান নির্দিষ্ট করবেন তাঁর উর্ধ্বের আলো থেকে, সে সব এমন কিছু হবে না যা অহং দাবী করবে পৃথকভাবে তার নিজের জন্য। সত্তার অধীশ্বরের বিধান থেকে মন, হৃদয়, প্রাণিক সত্তা, এমনকি দেহের কাছে যা আসবে তাতেই তারা সন্তুষ্ট হবে এবং তাতেই পাবে সূক্ষ্মতম ও

পূর্ণতম আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন তৃপ্তি ও আনন্দ; কিন্তু ঊর্ধ্বের দিব্য জ্ঞান ও সঙ্কল্প কাজ করে যাবে তার অন্যান্য উদ্দেশ্যকল্পে। এক্ষেত্রে সফলতা ও বিফলতার বর্তমান অর্থ থাকবে না। কোন বিফলতা সম্ভব নয়, কারণ যা কিছু ঘটে তা-ই জগদীশ্বরের অভিপ্রায়, অন্তিম নয় — তার যাত্রার এক পদক্ষেপমাত্র আর যদি মনে হয় এ করণগত সত্তার সম্মুখে স্থাপিত লক্ষ্যের বিরুদ্ধ, পরাভব, অস্বীকৃতি, এমনকি সে সময়ের জন্য সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি, তাহলেও তা শুধু বাহ্যতঃ আর পরে তাঁর ক্রিয়ার সৌষ্ঠবের মধ্যে এর সঠিক স্থানে একে দেখা যাবে — এক পূর্ণতর অতিমানসিক দর্শন এমনকি তৎক্ষণাৎ অথবা পূর্বেই দেখতে পাবে এর প্রয়োজনীয়তা কি এবং এ যে শেষ পরিণামের এত বিপরীত এবং এমনকি হয়ত তার সম্পূর্ণ নিষেধাত্মক তার সঙ্গে এর সঠিক সম্পর্ক কি। অথবা আলোক ক্ষীণ থাকার সময় যদি লক্ষ্য বা কর্মের গতি ও পথের ক্রম সম্বন্ধে কোন ভুলবোঝা থাকে তাহলে বিফলতা আসে তা সংশোধন করার জন্য এবং তা স্বীকার করা হয় শান্তভাবে, তাতে সঙ্কল্পের কোন অবসন্নতা বা হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। পরিশেষে দেখা যায় যে বিফলতা বলে কোন জিনিস নেই, আর অন্তঃপুরুষ সকল ঘটনাতেই সম নিষ্ক্রিয় অথবা সক্রিয় আনন্দ পায় যেন এই সব ঘটনা দিব্য সঙ্কল্পের সোপান ও রূপায়ণ। সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, রুচিকর ও অরুচিকর অর্থাৎ মঙ্গল অমঙ্গল, প্রিয় অপ্রিয় — এদেরও সকল রূপের সম্বন্ধে ঐ একই বিকাশ ঘটে।

যেমন ঘটনার বেলায়, তেমন ব্যক্তির বেলাতেও, দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব সম্বন্ধে সমত্ব এক সম্পূর্ণ পরিবর্তন আনে। সম মন ও চিৎপুরুষের প্রথম ফল এই যে এতে সকল ব্যক্তি, ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি, ক্রিয়ার প্রতি উদারতা এবং আন্তর সহিষ্ণুতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, কারণ দেখা যায় যে সকল সত্তার মধ্যেই ভগবান অবস্থিত এবং প্রত্যেকে কাজ করে তার প্রকৃতি, তার স্বভাব ও এর বর্তমান গঠন অনুযায়ী। যখন সদর্থক সম আনন্দ আসে, তখন উদারতা ও সহিষ্ণুতা গভীর হয়ে পরিণত হয় সমবেদনাপূর্ণ বোধে ও পরিশেষে এক সম বিশ্বজনীন প্রেমে। এই সব বিষয়ের দ্বারা এমন কিছু হবার কথা নয় যে আধ্যাত্মিক সঙ্কল্প দ্বারা নির্ধারিত জীবনের প্রয়োজন অনুযায়ী আন্তর মনোভাবের নানাবিধ সম্পর্ক অথবা বিভিন্ন রূপায়ণ নিবারিত হয়, অথবা একই নির্ধারণের দ্বারা একই প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যের জন্য কোন বিশেষ ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি, ক্রিয়াকে অন্যদের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় ও উন্নত করা নিবারিত হয়, অথবা অবধারিত গতিক্রিয়ার পথে যে সব শক্তি অন্তরায়-স্বরূপ হতে প্রচোদিত হয় তাদের বিরুদ্ধে প্রবল বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী প্রতিরোধ, বিরুদ্ধাচরণ ক্রিয়া নিবারিত হয়। আর এমনকি রুদ্রশক্তির প্লাবন এসে মানবীয় বা অন্যবিধ বিঘ্নের উপর জোর করে কাজ করতে পারে অথবা তা চূর্ণ করে দিতে পারে কারণ সেটিই প্রয়োজনীয় তার নিজের ও জগদুদ্দেশ্যের এই উভয়েরই জন্য। কিন্তু এই সব অপেক্ষাকৃত বাহ্য রূপায়ণ দ্বারা সমত্বপূর্ণ অন্তরতম বৃত্তির মূলভাব পরিবর্তিত হবে না বা হ্রাস পাবে না। যখন জ্ঞান, সঙ্কল্প, ক্রিয়া ও প্রেমের শক্তি তার কাজ করতে থাকে এবং কাজের জন্য নানাবিধ রূপ গ্রহণ করে; কিন্তু চিৎপুরুষ, মূল অন্তঃপুরুষ একই

থাকে। আর পরিশেষে সকল কিছু হয়ে ওঠে ভগবানের সত্তার মধ্যে এবং জ্যোর্তিময় আধ্যাত্মিক, এক অবিভক্ত ও বিশ্বময় শক্তির মধ্যে সকল ব্যক্তি, ক্রিয়াশক্তি, বিষয়ের সঙ্গে এক প্রভাস্বর আধ্যাত্মিক ঐক্যের রূপ, আর এর মধ্যে নিজের আপন ক্রিয়া হয়ে ওঠে সকলের ক্রিয়ার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, এ থেকে বিভক্ত হয় না, বরং সুষ্ঠুভাবে অনুভব করে যে সকল সম্পর্কই ভগবানের সঙ্গে এক সম্পর্ক যে ভগবান সকলের মধ্যে আছেন তার বিশ্ব একত্বের জটিল সংজ্ঞাগুলির মধ্যে। এ হল এমন এক পরিপূর্ণতা যা বিভক্তকারী মানসিক যুক্তিবুদ্ধির ভাষায় বর্ননা করা একরকম অসম্ভব, কারণ এ সকল বিপরীতার্থক ভাবনা ব্যবহার করে অথচ সে সব ছাড়িয়ে যায়; আবার একে সীমিত মানসিক মনোবিদ্যার কথাতেও প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এ হল চেতনার অন্য এক রাজ্যের, আমাদের সত্তার অন্য এক লোকের অন্তর্গত।

চতুর্দশ অধ্যায়

বিভিন্ন করণের শক্তি

আত্মসিদ্ধি যোগের দ্বিতীয় অঙ্গ হল আমাদের সাধারণ প্রকৃতির বিভিন্ন করণের সমুন্নত, বৃহৎ ও শুদ্ধ শক্তি। সম মন ও চিৎপুরুষ সুদৃঢ় না হওয়া পর্যন্ত যে এই দ্বিতীয় সিদ্ধির সাধনা বন্ধ রাখতে হবে তা নয়, তবে ওদের সুদৃঢ় অবস্থাতেই এর সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব এবং এ দিব্য দেশনার নিরাপত্তার মধ্যে কার্য করতে সক্ষম। এই সাধনার উদ্দেশ্য হল প্রকৃতিকে দিব্য কর্মের এক যোগ্য যন্ত্রে পরিণত করা। সকল কর্মই করা হয় বীর্যের দ্বারা, শক্তির দ্বারা এবং যেহেতু পূর্ণযোগের উদ্দেশ্য কর্মত্যাগ নয়, বরং সকল কর্মসাধন দিব্য চেতনা থেকে ও পরম দেশনা নিয়ে, সেহেতু বিভিন্ন করণের, মন, প্রাণ ও দেহের বিশিষ্ট শক্তিগুলিকে শুধু যে দোষমুক্ত করা চাই তা নয়, এদের এই মহত্তর ক্রিয়ার সামর্থ্যে উন্নয়ন করা চাই। পরিশেষে তাদের আধ্যাত্মিক ও অতিমানসিক রূপান্তর সাধন আবশ্যক।

আত্মসিদ্ধি সাধনার এই দ্বিতীয় ভাগের চারটি অঙ্গ, আর এদের প্রথমটি হল যথার্থ শক্তি অর্থাৎ বুদ্ধি, হৃদয়, প্রাণময় মন ও দেহের বিভিন্ন শক্তিগুলির সঠিক অবস্থা। এখন শুধু এই চারটির মধ্যে শেষেরটিরই প্রাথমিক সিদ্ধি সম্বন্ধে কিছু বলা সম্ভব হবে, কারণ পূর্ণ সিদ্ধির কথা বলা হবে অতিমানস সম্বন্ধে ও সত্তার অবশিষ্ট অংশের উপর এর প্রভাব সম্বন্ধে আমি বলবার পর। দেহ যে শুধু ক্রিয়ার স্থূলভাগের প্রয়োজনীয় বাহ্য যন্ত্র তা নয়, এই জীবনের নানাবিধ উদ্দেশ্যের জন্য এ হল সকল আন্তর ক্রিয়ারও ভিত্তি বা পাদপীঠ। মন ও চিৎপুরুষের সকল ক্রিয়ারই স্পন্দন থাকে শারীর চেতনায়, সেখানে সে ক্রিয়া নিজেকে অঙ্কিত করে একরূপ গৌণ দেহগত সঙ্কেতলিপিতে এবং অন্ততঃ আংশিকভাবে নিজেকে জড় জগতে প্রকাশিত করে শারীর যন্ত্রের মাধ্যমে। কিন্তু মানুষের দেহের এই সামর্থ্যের স্বাভাবিক সীমা আছে আর এই সব সীমা এ আরোপ করে তার সত্তার উচ্চতর অংশগুলির ক্রীড়ার উপর। আর দ্বিতীয়তঃ এর (অর্থাৎ শরীরের) নিজের এক অবচেতন চৈতন্য আছে যার মধ্যে এ মানসিক ও প্রাণিক সত্তার সব পুরনো অভ্যাস ও পুরনো প্রকৃতি দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে রেখে দেয় আর এই সব স্বতঃই যে কোন বড় ঊর্ধ্বাভিমুখী পরিবর্তনের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় ও তাতে বাধা দেয় অথবা একে অন্ততঃ সমগ্র প্রকৃতির আমূল রূপান্তর হতে নিবারণ করে। এটা স্পষ্ট যে যদি আমাদের এমন স্বচ্ছন্দ দিব্য অথবা আধ্যাত্মিক ও অতিমানসিক ক্রিয়া পেতে হয় যা দিব্যতর ক্রিয়াশক্তির বলের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তার বিশিষ্টতা সাধন করে, তাহলে দৈহিক প্রকৃতির এই বাহ্য স্বরূপে মোটামুটি সম্পূর্ণ রূপান্তর সাধন অবশ্য কর্তব্য। মানুষের শারীরিক সত্তাকে সিদ্ধিপ্রয়াসীরা সর্বদাই এক বাধা ভেবে এসেছে, আর তারা ঘৃণা, অস্বীকৃতি ও বিতৃষ্ণার সঙ্গে এ থেকে

সরে আসতেই অভ্যস্ত আর তার সঙ্গে এই ইচ্ছাও থাকে যে দেহ ও দৈহিক জীবন সম্পূর্ণ অথবা যতদূর সম্ভব দমন করা চাই। কিন্তু পূর্ণযোগের পক্ষে এ সঠিক পদ্ধতি হতে পারে না। দেহ আমাদের দেওয়া হয়েছে আমাদের কর্মের সমগ্রতার পক্ষে প্রয়োজনীয় এক যন্ত্র হিসেবে, একে ব্যবহার করাই দরকার, একে অবহেলা করা, কষ্ট দেওয়া, দমন করা বা ধ্বংস করা উচিত নয়। বলা হবে যে এ হল অপূর্ণ বিরুদ্ধভাবাপন্ন, একগুঁয়ে কিন্তু অন্যান্য অঙ্গগুলি — প্রাণময় সত্তা, হৃদয়, মন, যুক্তিবুদ্ধি এরাও তো ঐরকম। তাদের মতো একেও পরিবর্তিত, সিদ্ধ ও রূপান্তরিত করা চাই। আমাদের যেমন এক নবীন প্রাণ, নবীন হৃদয়, নবীন মন পাওয়া অবশ্য কর্তব্য, তেমন এক অর্থে আমাদের নিজেদের জন্য নির্মাণ করতে হবে এক নবীন দেহ।

দেহকে নিয়ে সঙ্কল্পের যে প্রথম করণীয় কাজ তা হল তার সমগ্র সত্তা, চেতনা, শক্তি এবং বাহ্য ও আন্তর ক্রিয়ার এক নতুন অভ্যাস এর উপর উত্তরোত্তর আরোপ করা। একে শিক্ষা দেওয়া চাই যেন এ প্রথমে উচ্চতর করণগুলির হাতে নিষ্ক্রিয় থাকে এবং পরিশেষে নিষ্ক্রিয় থাকে চিৎপুরুষ ও তার নিয়ন্ত্রী ও অন্তর্যামিনী শক্তির হাতে। একে অভ্যস্ত করতে হবে যেন এ মহত্তর অঙ্গগুলির উপর নিজের সব সীমা আরোপ না করে, বরং এ যেন তাদের দাবী অনুযায়ী তার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া গঠন করে আর বলা যায় এ যেন ফুটিয়ে তোলে এক উচ্চতর স্বরলিপি, প্রতিক্রিয়ার এক উচ্চতর পর্যায়। বর্তমানে ভগবানের এই মানবীয় বীণার সঙ্গীতের উপর দেহ ও শারীর চেতনার স্বরলিপির নির্ধারণী শক্তি অতীব প্রভূত পরিমাণে বিদ্যমান; যে সুরগুলি আমরা পাই চিৎপুরুষ থেকে, চৈত্য অন্তঃপুরুষ থেকে, আমাদের স্থূল প্রাণের পশ্চাতে স্থিত মহত্তর প্রাণ থেকে তারা স্বচ্ছন্দভাবে ভিতরে আসতে অক্ষম, তাদের উচ্চ, শক্তিশালী ও সঠিক গান ফুটিয়ে তুলতে অক্ষম। এই অবস্থার বিপরীত পরিবর্তন আবশ্যক; দেহ ও শারীর চেতনায় এই অভ্যাসের বিকাশ ঘটা চাই যাতে তারা প্রবেশ করতে পারে উচ্চতর সঙ্গীতের মধ্যে এবং সেই অনুযায়ী নিজেদের গঠন করতে, উচ্চতর সঙ্গীত তাদের অনুযায়ী হবে না, বরং আমাদের প্রকৃতির মহত্তর অংশগুলিই নির্ধারণ করবে আমাদের জীবন ও সত্তার সঙ্গীত।

এই পরিবর্তনের দিকে প্রথম সোপান হল মন ও এর ভাবনা ও সঙ্কল্প দ্বারা দেহ ও প্রাণের নিয়ন্ত্রণ। সকল যোগেই এই নিয়ন্ত্রণকে অতি উচ্চ গ্রামে নেওয়া হয়। কিন্তু পরে মনের উচিত নিজেই সরে এসে স্থান দেওয়া চিৎপুরুষকে, আধ্যাত্মিক শক্তিকে, অতিমানস ও অতিমানসিক শক্তিকে। এবং সর্বশেষে দেহেরও কর্তব্য এমন সুষ্ঠু সামর্থ্য বিকাশ করা যাতে চিৎপুরুষের আনা সকল শক্তিই এ ধারণ করতে পারে এবং এর ক্রিয়াকেও ধরে রাখতে পারে যাতে এ না উপচে পড়ে অথবা অযথা না নষ্ট হয় অথবা দেহ নিজেই না ভেঙ্গে পড়ে। যে কোন তীব্র মাত্রার আধ্যাত্মিক অথবা উত্তর মানস ও প্রাণশক্তি যেন একে ভরিয়ে দিয়ে জোরালোভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হয় আর তাতে যেন এর কোন যান্ত্রিক অংশ অন্তঃপ্রবাহ বা চাপের দ্বারা উত্তেজিত, ব্যস্ত, ক্ষতিগ্রস্ত না হয় বা ভেঙ্গে না যায়। যারা প্রস্তুত না হয়ে মূর্খের মতো যোগসাধনা শুরু করে অথবা যে

শক্তিকে তারা বুদ্ধিগতভাবে, প্রাণিকভাবে বা নৈতিকভাবে সহ্য করতে অক্ষম তাকে হঠকারীর মতো আমন্ত্রণ করে, প্রায়ই তাদের মস্তিষ্কের, প্রাণিক স্বাস্থ্যের অথবা নৈতিক প্রকৃতির ক্ষতিসাধন হয়। দেহকে ঐভাবে শক্তিশালী ক'রে যেন তাকে পূর্ণ করা হয় যাতে এ ঐ আধ্যাত্মিক অথবা অন্য কোন অসাধারণ বিকল্প-উৎসের সঙ্কল্প অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে, সঠিকভাবে কাজ করার সামর্থ্য পায় ও তার অভিপ্রায় ও প্রবল প্রেরণা কোনরূপ বিকৃত, ক্ষুণ্ণ অথবা ভ্রান্তভাবে রূপায়িত না হয়। শারীর চেতনায়, শক্তিতে, যন্ত্রে উচ্চতর শক্তি ধারণ করার ক্ষমতা, "ধারণশক্তি" দেহের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধি।

এই সব পরিবর্তনের ফলে দেহ রূপান্তরিত হবে চিৎপুরুষের সুষ্ঠু করণে। দেহ ও দেহের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক শক্তি তার ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোন কার্য যে কোন প্রকারে করতে সক্ষম হবে। এ মনের এবং উচ্চতর অবস্থায় অতিমানসের অসীম ক্রিয়া চালাতে সক্ষম হবে, আর তাতে যে কোনরকম শ্রান্তি, অক্ষমতা, অযোগ্যতা বা মিথ্যাকরণের দ্বারা ক্রিয়ার কিছু ক্ষতি হবে তা-ও নয়। আবার এ সক্ষম হবে দেহের মধ্যে প্রাণশক্তির পূর্ণ প্লাবন বওয়াতে ও সিদ্ধ প্রাণময় সত্তার সহর্ষ বিশাল ক্রিয়া চালাতে, আর সাধারণ প্রাণিক সহজবৃত্তি ও প্রাণসংবেগ যে অপ্রচুর শারীরিক যন্ত্র ব্যবহার করতে বাধ্য হয় তার সঙ্গে ঐ প্রাণিক সহজবৃত্তি ও প্রাণসংবেগের যে বিবাদ ও অসামঞ্জস্যের সম্বন্ধ সে বিবাদ ও অসামঞ্জস্য তাতে থাকবে না। আর আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন চৈত্যপুরুষের পূর্ণ ক্রিয়াও চালাতে এ সক্ষম হবে যে ক্রিয়া দেহের নিম্ন সহজসংস্কারের দ্বারা কোন মিথ্যা বা হীন রূপে পর্যবসিত হয় না অথবা কোন প্রকারে দূষিত হয় না; এ আরো সমর্থ হবে শারীর ক্রিয়া ও প্রকাশকে উচ্চতর সূক্ষ্ম প্রাণের স্বচ্ছন্দ সঙ্কেতলিপি হিসেবে ব্যবহার করতে। আর স্বয়ং দেহেতেই থাকবে ধারণশক্তির মহত্ত্ব, বহির্গামী ও কার্যসাধক শক্তির ক্ষমতা, ক্রিয়াশক্তি ও বলের প্রাচুর্য, স্নায়বিক ও শারীর সত্তার লঘুতা, ক্ষিপ্রতা, অভিযোজ্যতা এবং সমগ্র শরীর যন্ত্রের এবং এর চালিকাশক্তি যন্ত্রসমূহে ধারণ করার ও সাড়া দেওয়ার সামর্থ্য[১]; বর্তমানে শরীর যত বলবান ও সুস্থ হ'ক না কেন, এ এইসব ক্ষমতা ধারণে অসমর্থ।

এই ক্রিয়াশক্তি সারতঃ কোন বাহ্য শারীর বা পেশীগত ক্ষমতা হবে না, এ হবে প্রথমতঃ অফুরন্ত প্রাণশক্তি অথবা প্রাণিকশক্তি এবং দ্বিতীয়তঃ দেহের মধ্যে সক্রিয় এক শ্রেষ্ঠ বা পরমা সঙ্কল্পশক্তি যা এই প্রাণিক শক্তিকে ধারণ ও ব্যবহার করে। দেহের অথবা রূপের প্রাণিক শক্তির ক্রীড়ার জন্যই সকল ক্রিয়া, এমন কি যে ক্রিয়া বাহ্যতঃ অত্যন্ত নিষ্প্রাণ ভৌতিক ক্রিয়া, তা-ও সম্ভব হয়। প্রাচীনরা যেমন জানতেন, বিশ্বপ্রাণই নানা আকারে সকল ভৌতিক জিনিসের মধ্যে — বিদ্যুৎ-অণু, পরমাণু, গ্যাস থেকে আরম্ভ ক'রে সকল ধাতু, উদ্ভিদ্, পশু, স্থূল মানব পর্যন্ত — সকল কিছুর মধ্যে জড় শক্তিকে

[১] মহত্ত্ব, বল, লঘুতা, ধারণ-সামর্থ্য।

ধারণ করে বা চালনা করে। দেহের অথবা দেহের মধ্যে সুষ্ঠুতর সিদ্ধিপ্রয়াসী সকলেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে চেষ্টা করে যেন এই প্রাণিকশক্তি দেহের মধ্যে আরো স্বচ্ছন্দে ও শক্তিশালীভাবে কার্য করে। সাধারণ লোক একে আয়ত্ত করতে চেষ্টা করে যান্ত্রিকভাবে, শারীরিক ব্যায়াম ও অন্যান্য দৈহিক উপায়ের দ্বারা, হঠযোগী আরো বৃহৎ ও নমনীয়ভাবে চেষ্টা করে যান্ত্রিকভাবেই, তবে আসন ও প্রাণায়ামের সাহায্যে; কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্যের জন্য একে আয়ত্ত করা যায় আরো সূক্ষ্ম, মৌলিক ও সুনম্য উপায়ের দ্বারা; প্রথমতঃ তা করা হয় মনোগত সঙ্কল্পের দ্বারা, যে বিরাট প্রাণশক্তি থেকে আমরা শক্তি আহরণ করি তার নিকট এই সঙ্কল্প নিজেকে বিস্তৃতভাবে খুলে ধরে এবং তাকে বীর্যের সঙ্গে ভিতরে আবাহন করে এবং দেহের মধ্যে এর বলবত্তর উপস্থিতি ও আরো শক্তিশালী ক্রিয়াধারা নিবদ্ধ করে; দ্বিতীয়তঃ তা করা হয় মনোগত সঙ্কল্পের দ্বারা যা বরং নিজেকে উন্মুক্ত করে চিৎপুরুষ ও এর শক্তির কাছে, আর ভিতরে আবাহন করে এক ঊর্ধ্বের উচ্চতর প্রাণিক শক্তি, অর্থাৎ এক অতিমানসিক প্রাণিক শক্তি; তৃতীয়তঃ আর এই হল শেষ কাজ, — তা করা হয় চিৎপুরুষের সর্বোত্তম অতিমানসিক সঙ্কল্পের দ্বারা যা দেহের মধ্যে প্রবেশ ক'রে প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করবে দেহ-সিদ্ধির ব্রতটি। বস্তুতঃ সর্বদাই এক আন্তর সঙ্কল্পই প্রাণিক করণটিকে চালায় ও কার্যকরী করে এমনকি যখন এ বাহ্যতঃ শুধু ভৌতিক উপায় ব্যবহার করে তখনো; কিন্তু প্রথমে এ থাকে অবর ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। যখন আমরা আরো উচ্চে উঠি, তখন সম্পর্কটি ক্রমশঃ সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়; তখন এ তার নিজের শক্তিতেই কাজ করতে সক্ষম হয় অথবা সক্ষম হয় বাকী সব কিছুকে চালাতে শুধু এক গৌণ করণব্যবস্থা হিসেবে।

বেশীরভাগ লোকই দেহের মধ্যে এই প্রাণিক শক্তি সম্বন্ধে সচেতন নয় অথবা শক্তির যে আরো ভৌতিক রূপ দেহের মধ্যে অনুস্যূত এবং তার বাহনরূপে ব্যবহৃত হয় তা থেকে একে পৃথকভাবে চিনতে অক্ষম। কিন্তু যোগানুশীলনের ফলে যখন চেতনা আরো সূক্ষ্ম হয় তখন আমরা জানতে পারি যে আমাদের চারিদিকে এক প্রাণিক শক্তির সমুদ্র বর্তমান, তাকে অনুভব করি মানসিক চেতনা দিয়ে, আর মানসিক ইন্দ্রিয় বোধ দিয়ে একে মূর্তভাবে অনুভব করি, এর গতিধারা ও গতিক্রিয়া দেখি, এবং সঙ্কল্পের দ্বারা একে অব্যবহিতভাবে চালনা করি ও তার উপর সক্রিয় হই। কিন্তু যতদিন না আমরা এর সম্বন্ধে জানতে পারি ততদিন আমাদের এক কাজচলা বিশ্বাস, বা অন্ততঃ এক পরীক্ষামূলক বিশ্বাস থাকা চাই যে এ সত্যই বিদ্যমান এবং সঙ্কল্পের এমন শক্তি আছে যার দ্বারা এই প্রাণশক্তিকে আরো সুষ্ঠুভাবে আয়ত্ত ও ব্যবহার করা সম্ভব। যারা বিশ্বাস, সঙ্কল্প ও মানসিক ক্রিয়ার দ্বারা ব্যাধি নিরাময় করে তাদের মতো এক বিশ্বাস, শ্রদ্ধা আবশ্যক যে দেহের অবস্থা ও ক্রিয়ার উপর তার সঙ্কল্প আরোপ করার ক্ষমতা মনের আছে; কিন্তু শুধু এই বা অন্য কোন সীমিত ব্যবহারের জন্য যে আমরা এই নিয়ন্ত্রণ চাইব তা নয়, আমরা তা চাইব সাধারণভাবে বাহ্য ও অবর করণের উপর আন্তর ও মহত্তর করণের ন্যায়সঙ্গত সামর্থ্য হিসেবে। এই বিশ্বাসের পরিপন্থী হল আমাদের মনের অতীত

অভ্যাসগুলি, আমাদের বাস্তব সাধারণ অভিজ্ঞতা যাতে দেখা যায় যে আমাদের বর্তমান অপূর্ণ ব্যবস্থায় এ হল অপেক্ষাকৃত অসহায় এবং দেহ ও শারীর চেতনায় এক বিরুদ্ধ বিশ্বাস। কারণ এদেরও নিজেদের সীমিত শ্রদ্ধা আছে আর যখন মন চায় দেহের উপর এক উচ্চতর, অথচ না-পাওয়া সিদ্ধির বিধান আরোপ করতে, তখন ওদের এই সীমিত শ্রদ্ধা মনের ভাবনাকে বাধা দেয়। কিন্তু যদি আমরা বিশ্বাসে অটল থাকি আর অভিজ্ঞতায় এই শক্তির প্রমাণ পাই তাহলে মনের বিশ্বাস আরো দৃঢ়ভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হবে, তার শক্তিও বৃদ্ধি পাবে আর দেহের মধ্যে বিরুদ্ধ বিশ্বাসেরও পরিবর্তন হবে, যাকে এ প্রথমে অস্বীকার করেছিল তাকে স্বীকার করবে আর তার সব অভ্যাসে নতুন নিয়ন্ত্রণটিকে শুধু যে মেনে নেবে তা নয়, বরং নিজেই এই উচ্চতর ক্রিয়ার জন্য আহ্বান করবে। সবশেষে আমরা এই সত্য উপলব্ধি করি যে এই যে সত্তা আমরা সে তা-ই হয় বা হতে পারে যা হবার জন্য তার বিশ্বাস ও সঙ্কল্প আছে — কারণ বিশ্বাস হল শুধু এক সঙ্কল্প যার লক্ষ্য মহত্তর সত্য — আর তখন আমরা আমাদের সম্ভাবনা সম্বন্ধে গণ্ডি টানা বন্ধ করি অথবা আমাদের মধ্যে পরমাত্মার যোগ্য সর্বশক্তিমত্তা, মানবীয় যন্ত্রের মাধ্যমে সক্রিয় দিব্য সামর্থ্যের সর্বক্ষমতা সম্বন্ধে অস্বীকৃতি জানান বন্ধ করি। তবে অবশ্য, অন্ততঃ ব্যবহারিক শক্তি হিসেবে তা আসে পরে উচ্চসিদ্ধির উন্নত অবস্থায়।

প্রাণ যে শুধু শারীরিক ও জৈবিক ক্রিয়ার শক্তি তা নয়, এ হল মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়ারও অবলম্বন। সুতরাং প্রাণিক শক্তির পূর্ণ ও স্বচ্ছন্দ ক্রিয়া শুধু যে নিম্ন অথচ প্রয়োজনীয় ব্যবহারের জন্য আবশ্যক তা নয়, আমাদের জটিল মানবীয় প্রকৃতির করণব্যবস্থার মধ্যে মন ও অতিমানস ও চিৎপুরুষের স্বচ্ছন্দ ও পূর্ণ ক্রিয়ার জন্যও এ আবশ্যক। প্রাণশক্তি ও এর বিভিন্ন গতির নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রাণায়াম অভ্যাসের মুখ্য অর্থ হল এই; এই অভ্যাস কতকগুলি যোগসাধনার এক গুরুত্বপূর্ণ ও অনিবার্য অঙ্গ। পূর্ণযোগের সাধকেরও কর্তব্য ঐ একই প্রভুত্ব লাভ করা; তবে সে তা পেতে পারে অন্য উপায়ে। কিন্তু কোন সময়েই সে তা পাবার জন্য ও রক্ষার জন্য কোন শারীরিক বা শ্বাসপ্রশ্বাসমূলক ব্যায়ামের উপর নির্ভর করবে না, কারণ তাহলে তখনই এক সঙ্কীর্ণতা ও প্রকৃতির নিকট বশ্যতা এসে পড়বে। পুরুষের দ্বারা প্রকৃতির করণব্যবস্থাকে নমনীয়ভাবে ব্যবহার করা চাই, কিন্তু পুরুষের উপর তার কোন নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। অবশ্য প্রাণিক শক্তির প্রয়োজনীয়তা থাকে এবং তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে আমাদের আত্ম-আলোচনা ও অভিজ্ঞতার কাছে। বৈদিক রূপকে এ হল দেহবদ্ধ মনের ও সঙ্কল্পের অশ্ব ও বাহন। যদি এ বল, ক্ষিপ্রতা ও অন্য সকল শক্তির ঐশ্বর্যে পূর্ণ হয়, তাহলে মনও তার ক্রিয়ার পথে চলতে পারে পূর্ণ ও অকুণ্ঠিত গতিতে। কিন্তু যদি এ পঙ্গু হয় অথবা শীঘ্র ক্লান্ত হয়ে পড়ে অথবা অলস বা দুর্বল হয়, তাহলে সঙ্কল্প সাধন ও মনের ক্রিয়ায় অক্ষমতা এসে পড়ে। যখন অতিমানস প্রথম ক্রিয়ায় আসে তখন তার বেলাতেও এই একই নিয়ম। অবশ্য এমন সব অবস্থা ও ক্রিয়া আছে যাতে মন প্রাণিক শক্তিকে নিজের মধ্যে নেয়,

আর তখন প্রাণের উপর নির্ভরতা আদৌ বোধ হয় না; কিন্তু তখনো শক্তি সেখানে থাকেই যদিও তা থাকে শুদ্ধ মানসিক শক্তির মধ্যে গূঢ়ভাবে। যখন অতিমানস পূর্ণ শক্তি পায়, তখন এ প্রাণিক শক্তি নিয়ে যা খুশী তাই করতে পারে, আর আমরা দেখি যে শেষে এই প্রাণশক্তি রূপান্তরিত হয় বিশিষ্ট অতিমানসিকভাবাপন্ন প্রাণে যা ঐ মহত্তর চেতনার শুধু এক চালক সামর্থ্য। কিন্তু এ হল যোগ সিদ্ধির শেষের দিককার অবস্থার কথা।

এছাড়া আছে প্রাণচেতনা, প্রাণিক মন বা কামপুরুষ; এরও নিজের সিদ্ধি আবশ্যক। এক্ষেত্রেও প্রথম দরকার হল মনে প্রাণসামর্থ্যের পরিপূর্ণতা, এর পরিপূর্ণ কাজ করার শক্তি, এই জীবনে চরিতার্থতার জন্য আমাদের আন্তর প্রাণচেতনাকে দেওয়া সকল প্রচোদনা ও শক্তির অধিকার প্রাপ্তি, এইগুলি ধারণ করা এবং এই সবকে ক্ষমতা, স্বাধীনতা ও সুষ্ঠুতার সঙ্গে সম্পাদন করার উপায় হওয়া। আমাদের সিদ্ধির জন্য আমাদের যে সব জিনিসের প্রয়োজন তাদের অনেক কিছুই, — যেমন সাহস, জীবনে কার্যক্ষম সঙ্কল্পশক্তি, আমরা এখন যাকে চরিত্রের বল ও ব্যক্তিভাবনার বল বলি তার অনেক পদার্থই, নির্ভর করে তাদের সর্বাপেক্ষা সম্পূর্ণ ক্ষমতা এবং তেজোময় ক্রিয়ার উৎসের জন্য প্রাণচেতনার পরিপূর্ণতার উপর। কিন্তু এই পরিপূর্ণতার সাথে দরকার সূক্ষ্ম প্রাণসত্তায় এক সুস্থির প্রসন্নতা, নির্মলতা আর শুদ্ধতা। এই প্রবৃত্তিকে অশান্ত, অতি তীব্র, কোলাহলপূর্ণ, চঞ্চল অথবা অমার্জিতভাবে উগ্রশক্তি হলে চলবে না; শক্তি থাকা চাই, এর ক্রিয়ার উল্লাস থাকা চাই, কিন্তু শক্তি হওয়া চাই নির্মল ও প্রসন্ন ও শুদ্ধ, উল্লাস হওয়া চাই সুস্থির, দৃঢ়প্রতিষ্ঠ ও বিশুদ্ধ। আর এর সিদ্ধির তৃতীয় সর্ত হিসেবে একে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে সম্পূর্ণ সমত্বের মধ্যে। কামপুরুষের উচিত এর সব কামনার কোলাহল, দুরাগ্রহ ও বৈষম্য থেকে মুক্ত হওয়া যাতে এর সব কামনা পূর্ণ হতে পারে ঔচিত্য ও সমতার সঙ্গে এবং সঠিকভাবে এবং শেষ পর্যন্ত দরকার এদের নিঃশেষে কামনার লক্ষণবর্জিত করা এবং রূপান্তরিত করা দিব্য আনন্দের প্রচোদনায়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এর কোন দাবী করা অথবা হৃদয়, মন বা চিৎপুরুষের উপর নিজেকে আরোপ করার চেষ্টা করা চলবে না, তার কর্তব্য হল নিশ্চল মন ও শুদ্ধ হৃদয়ের প্রবাহপ্রণালীর মাধ্যমে চিৎপুরুষ থেকে যা কিছু প্রচোদনা ও আদেশ তার মধ্যে আসে তা-ই গ্রহণ করা দৃঢ় নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় সমত্বের সঙ্গে। আর তার আরো কর্তব্য হল আমাদের সত্তার অধীশ্বর সংবেগের যা কিছু ফল, অল্পবিস্তর, পূর্ণ অথবা শূন্য যা কিছু ভোগ একে দেন তা-ও গ্রহণ করা। সেই সাথে বলা দরকার যে প্রাপ্তি ও ভোগ এর বিধান, কাজ, ব্যবহার, স্বধর্ম। এ যে কোন কিছু বিনষ্ট বা ক্লিষ্ট পদার্থ হবে যার গ্রহণক্ষমতা নিস্তেজ, যা শুষ্ক, নিগৃহীত, পঙ্গু, নিশ্চেষ্ট বা অকর্মণ্য — তা-ও অভিপ্রেত নয়। এর থাকা চাই প্রাপ্তির পূর্ণ শক্তি, ভোগের প্রসন্ন শক্তি, শুদ্ধ ও দিব্য অনুরাগ ও আনন্দের উল্লাসভরা শক্তি। যে ভোগ এ পাবে তা সারতঃ হবে এক আধ্যাত্মিক আনন্দ, তবে এমন কিছু যা নিজের মধ্যে মানসিক, ভাবময়, স্ফুরন্ত প্রাণিক ও শারীরিক হর্ষ নিয়ে তাদের রূপান্তরিত করে; সুতরাং এই সব জিনিসের জন্য এর এক সর্বাঙ্গীণ সামর্থ্য থাকা

চাই, কোন অসামর্থ্য বা ক্লান্তি বা অতিমাত্রার তীব্রতা সহ্য করার অক্ষমতার দ্বারা এ যেন চিৎপুরুষ, মন, হৃদয়, সঙ্কল্প ও দেহকে ব্যর্থ না করে। প্রাণ চেতনার সিদ্ধির চতুরঙ্গ হল পরিপূর্ণতা, বিমল শুদ্ধতা ও প্রসন্নতা, সমত্ব এবং প্রাপ্তি ও ভোগের সামর্থ্য[১]।

এর পর যে করণটির সিদ্ধি প্রয়োজনীয় তা হল চিত্ত; আর চিত্ত সংজ্ঞাটি এখানে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ ক'রে আমরা এর মধ্যে ভাবময় ও শুদ্ধ চৈত্যসত্তাকেও ধরে নিতে পারি। মানুষের এই যে হৃদয় ও চৈত্যসত্তা প্রাণপ্রবৃত্তির তন্ত্রী দ্বারা ওতপ্রোতভাবে গাঁথা, তা এমন কিছু যাতে আছে ভাবাবেগ ও অন্তঃপুরুষ-স্পন্দনের মিশ্রিত ও অস্থায়ী বিভিন্ন রঙ আর এই সব ভাবাবেগ ও স্পন্দন দ্বন্দ্বে ভরা — ভালোমন্দ, সুখময় ও দুঃখময়, তৃপ্ত ও অতৃপ্ত, উদ্বিগ্ন ও শান্ত, উগ্র ও নিস্তেজ। এইভাবে আলোড়িত ও আক্রান্ত হওয়ায় কোন প্রকৃত শান্তি এর অজ্ঞাত, এর সকল শক্তির স্থির সিদ্ধি সাধনে এ থাকে অসমর্থ। শুদ্ধির দ্বারা, সমত্বের দ্বারা, জ্ঞানের আলোকের দ্বারা, সঙ্কল্পের সৌষম্যের দ্বারা একে শান্ত তীব্রতায় ও সিদ্ধিতে আনা সম্ভব। এই শুদ্ধির যে প্রথম দুটি অঙ্গ তা হল একদিকে উচ্চ ও বিশাল মাধুর্য, উন্মুক্ততা, কোমলতা, শান্তি, স্বচ্ছতা এবং অন্যদিকে প্রবল ও নিরতিশয় শক্তি ও তীব্রতা। সাধারণ মানবীয় চরিত্র ও ক্রিয়ার মতো দিব্য চরিত্র ও ক্রিয়াতেও সর্বদা দুইটি ধারা বর্তমান — মাধুর্য ও বল, মৃদুতা ও শক্তি, "সৌম্য" ও "রৌদ্র", যে শক্তি ধারণ করে ও সামঞ্জস্য আনে, আর যে শক্তি আরোপ ও বাধ্য করে, বিষ্ণু ও ঈশান, শিব ও রুদ্র। সুষ্ঠু জগৎক্রিয়ার জন্য এই দুটিই সমান প্রয়োজনীয়। হৃদয়ের মধ্যে রুদ্রশক্তির বিকৃতি হল উত্তাল ভাবাবেগ, ক্রোধ, ভীষণতা ও কঠোরতা, রূঢ়তা, পাশবিকতা, ক্রুরতা, অহমাত্মক উচ্চাভিলাষ এবং হিংসা ও আধিপত্যের প্রতি প্রীতি। এই সব ও অন্যান্য মানবীয় বিকৃতিগুলি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া চাই শান্ত, নির্মল ও মধুর এক চৈত্য সত্তার প্রস্ফুটনের দ্বারা।

কিন্তু অপরদিকে শক্তির অসামর্থ্যও এক অপূর্ণতা। যে ভাবময় ও চৈত্যজীবনে ক্রিয়াশক্তি ও প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা সংযত, অবসন্ন বা বিনষ্ট করা হয়েছে তার শেষ পরিণাম হল চৈত্যসত্তার শিথিলতা ও দুর্বলতা, আত্মপরায়ণতা ও এক প্রকার নিবীর্যতা এবং পঙ্গুতা বা নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রিয়তা। আবার শুধু সহ্য করার ক্ষমতা অথবা শুধু প্রেম, দাক্ষিণ্য, সহিষ্ণুতা, মৃদুতা, নম্রতা ও তিতিক্ষার হৃদয় অনুশীলন সমগ্র সিদ্ধি নয়। সিদ্ধির অন্য দিকটি হল আত্মসংহত ও শান্ত ও অহঙ্কাররহিত চৈত্যশক্তিসম্পন্ন রুদ্রশক্তি, বলবান হৃদয়ের বীর্য যা কোনরূপ সঙ্কোচ না ক'রে ধারণ করতে সক্ষম এক আগ্রহপূর্ণ, বাহ্যতঃ কঠোর অথবা এমনকি, যেখানে দরকার সেখানে প্রচণ্ড ঘোর কর্ম। হৃদয় ও নির্মলতার মাধুর্যের সঙ্গে সুসমঞ্জস কর্মশক্তি, শক্তি, বীর্যের অসীম আলো যে দুই ক্রিয়ায় এক হতে সক্ষম, সোমের অমৃতময় চন্দ্রকিরণমণ্ডল-উদ্ভূত ইন্দ্রের বিদ্যুৎ — এই হল দ্বিবিধ সিদ্ধি। এই যে দুটি জিনিস, "সৌমত্ব ও তেজস্", তাদের উপস্থিতি ও ক্রিয়াকে প্রতিষ্ঠিত হতে

[১] পূর্ণতা, প্রসন্নতা, সমতা, ভোগসামর্থ্য।

হবে স্বভাবের ও সেই চৈত্যপুরুষের দৃঢ় সমত্বের উপর যা সকল অমার্জিতভাব এবং হৃদয়ের শক্তির সকল আধিক্য বা ত্রুটি থেকে মুক্ত।

আর একটি আবশ্যকীয় অঙ্গ হল হৃদয়ে শ্রদ্ধা, বিশ্বকল্যাণে বিশ্বাস ও সঙ্কল্প, বিশ্বানন্দে উন্মুক্ততা। শুদ্ধ চৈত্যপুরুষ আনন্দস্বরূপ, বিশ্বের মধ্যে আনন্দপুরুষ থেকেই এর আগমন; কিন্তু ভাবাবেগের বাহ্য হৃদয় জগতের বৈষম্যময় বাহ্য রূপে অভিভূত হয় এবং ভোগ করে দুঃখ, ভয়, অবসাদ, তীব্র ভাবাবেগ, স্বল্পস্থায়ী ও আংশিক হর্ষের অনেক প্রতিক্রিয়া। সিদ্ধির জন্য এক সম হৃদয়ের প্রয়োজন আছে, কিন্তু শুধু নিষ্ক্রিয় সমত্ব নয়; এই বোধ থাকা চাই যে সকল অভিজ্ঞতার পিছনে এক দিব্য শক্তি মঙ্গলের জন্য সচেষ্ট, এমন শ্রদ্ধা ও সঙ্কল্প থাকা চাই যা জগতের সব গরলকে পরিণত করতে পারে অমৃতে, দেখতে পারে দুঃখের আড়ালে আরো সুখময় আধ্যাত্মিক তাৎপর্য, কষ্টভোগের পিছনে প্রেমের রহস্য, ব্যথার বীজের মধ্যে দিব্য বীর্য ও হর্ষের কুসুম। এই শ্রদ্ধার, "কল্যাণশ্রদ্ধার" প্রয়োজন আছে, যাতে হৃদয় ও সমগ্র প্রকট চৈত্যপুরুষ সাড়া দিতে পারে গূঢ় দিব্য আনন্দে এবং নিজেকে পরিণত করতে পারে এই সত্যকার মূল স্বরূপে। এই শ্রদ্ধা ও সঙ্কল্পের সঙ্গে থাকা চাই প্রেমের জন্য এক অসীম ও সর্বাপেক্ষা ব্যাপ্ত ও তীব্র সামর্থ্য এবং এতে উন্মুক্তও হওয়া চাই। কারণ হৃদয়ের প্রধান কাজ, এর সত্যকার বৃত্তি হল প্রেম। এই হল আমাদের সম্পূর্ণ মিলন ও একত্বের বিধিনির্দিষ্ট করণ; বুদ্ধির দ্বারা জগতে একত্ব দর্শন যথেষ্ট নয় যদি না আমরা তার সঙ্গে হৃদয় ও চৈত্যপুরুষ দিয়েও তা অনুভব করি, আর এর অর্থ "একমেব"-তে আনন্দ, তাঁর মধ্যে অবস্থিত জগতে সর্বভূতে আনন্দ, ভগবানে ও সর্বজীবে প্রেম। কল্যাণে হৃদয়ের বিশ্বাস ও সঙ্কল্পের প্রতিষ্ঠা হল সেই একমাত্র ভগবানের উপলব্ধি যিনি সকল বিষয়ের মধ্যে আবিষ্ট এবং জগৎ পরিচালনায় রত। বিশ্বজনীন প্রেমের প্রতিষ্ঠা হওয়া চাই সর্বঅস্তিত্বের মধ্যে এক ভগবানকে, এক আত্মাকে হৃদয় দিয়ে দেখার উপর, তাদের চৈত্যিক ও ভাবময় বোধের উপর। সকল চার অঙ্গই তখন মিলে এক হবে, এমনকি ন্যায় ও মঙ্গলের জন্য যুদ্ধ-করার রুদ্রশক্তিও কাজ করবে বিশ্বপ্রেমের শক্তির ভিত্তির উপর। এটাই, এই প্রেম সামর্থ্যই হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট সিদ্ধি।

সর্বশেষ সিদ্ধি হল বুদ্ধি ও চিন্তাশীল মনের সিদ্ধি। প্রথম প্রয়োজন হল বুদ্ধির স্বচ্ছতা ও শুদ্ধতা। যে প্রাণময় সত্তার চেষ্টা হল সত্যের স্থানে মনের কামনাকে প্রতিষ্ঠা করা, তার সব দাবী থেকে এবং যে অশান্ত ভাবময় সত্তার প্রয়াস হল সত্যকে ভাবাবেগের রঙ ও আকার দিয়ে রঞ্জিত, বিকৃত, সীমিত ও মিথ্যাময় করা তারও সব দাবী থেকে বুদ্ধিকে মুক্ত করা চাই। নিজেরও ত্রুটি থেকে এর মুক্ত হওয়া কর্তব্য, এই ত্রুটি হল মননশক্তির নিশ্চেষ্টতা, জ্ঞানের নিকট উন্মুক্ত হবার জন্য বাধাদায়ক সঙ্কীর্ণতা ও অনিচ্ছুকতা, চিন্তায় বুদ্ধিগত অসাধুতা, পূর্বধারণা ও অভিরুচি, যুক্তিবুদ্ধিতে স্বৈরিতা, জ্ঞানের প্রতি সঙ্কল্পের মিথ্যা নির্ধারণ। এর একমাত্র সঙ্কল্প হবে নিজেকে সত্যের, এর সারের এবং এর বিভিন্ন রূপের ও মাপের ও সম্বন্ধের অমলিন দর্পণ হওয়া, আর হওয়া

এক নির্মল মুকুর, এক উচিত পরিমাপ, সামঞ্জস্যের এক সুন্দর ও সূক্ষ্ম যন্ত্র, এক অখণ্ড বুদ্ধি। তারপর এই নির্মল ও শুদ্ধ বুদ্ধি হতে পারে এমন কিছু যা প্রশান্ত ও আলোকিত, সত্যসূর্য থেকে নিঃসৃত এক শুদ্ধ ও প্রবল প্রভা। কিন্তু তাছাড়া একে যে শুধু ঘনীভূত শুষ্ক ও শুভ্র আলোর এক বস্তু হতে হবে তা নয়, একে সমর্থ হতে হবে সকল রকম অবধারণ পেতে যা সাবলীল, সমৃদ্ধ ও নমনীয় সকল শিখায় সুদীপ্ত, এবং সত্যের অভিব্যক্তির বিভিন্ন রঙে চিত্রিত, এর সকল রূপের নিকট উন্মুক্ত। আর এই ভাবে সজ্জিত হলে এ সকল সীমা থেকে নিষ্কৃতি পাবে, জ্ঞানের এই বা অন্য কোন বিশেষ শক্তিতে বা রূপে বা ধারায় আবদ্ধ হবে না, বরং এমন এক করণ হবে যা পুরুষের চাহিদা মতো যে কোন কাজ করতে উৎসুক ও সমর্থ। চিন্তাশীল বুদ্ধির চতুর্বিধ সিদ্ধি হল শুদ্ধতা, নির্মল প্রভা, সমৃদ্ধ ও নমনীয় বৈচিত্র্য, সর্বাঙ্গীন সামর্থ্য অর্থাৎ "বিশুদ্ধি, প্রকাশ, বিচিত্রবোধ, সর্বজ্ঞান-সামর্থ্য"।

সাধারণ করণগুলি এই ভাবে সিদ্ধ হলে তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ ধরনে কাজ করবে, পরস্পরের ক্রিয়ায় অযথা হস্তক্ষেপ করবে না এবং সকলে মিলে পুরুষের অপ্রতিহত সঙ্কল্প সাধন করবে আমাদের প্রাকৃত সত্তার সুসমঞ্জস সমগ্রতার মধ্যে। ক্রিয়ার জন্য, এর কর্মধারার ক্রিয়াশক্তি ও শক্তির জন্য এবং সমগ্র প্রকৃতির ক্ষেত্রের এক প্রকার মহত্ত্বের জন্য এই সিদ্ধিকে সর্বদাই তার সামর্থ্যে উন্নত হতে হবে। তখন তারা প্রস্তুত হবে তাদের নিজেদের অতিমানসিক ক্রিয়ায় রূপান্তরের জন্য আর এই অতিমানসিক ক্রিয়ার মধ্যে তারা পাবে সমগ্র সিদ্ধ প্রকৃতির এক আরো একান্ত, একীভূত, ও জ্যোতির্ময় আধ্যাত্মিক সত্য। কি উপায়ে করণগুলি সিদ্ধ হবে তা আমরা পরে বিবেচনা করব; কিন্তু বর্তমানে এটা বলাই যথেষ্ট যে প্রধান উপায়গুলি হল সঙ্কল্প, আত্মনিরীক্ষণ ও আত্মজ্ঞান, এবং আত্মপরিবর্তন ও রূপান্তরের জন্য সতত "অভ্যাস"। পুরুষের ঐ সামর্থ্য আছে; কারণ অন্তরের চিৎপুরুষ সর্বদাই তার প্রকৃতির কর্মধারা পরিবর্তন ও সিদ্ধি সাধনে সক্ষম। কিন্তু মনোময় পুরুষের কর্তব্য পথ মুক্ত করা আর তা করার উপায় হল স্বচ্ছ ও সতর্ক অন্তর্দর্শন, পুঙ্খানুপুঙ্খ ও সূক্ষ্ম আত্মজ্ঞানের নিকট নিজেকে উন্মুক্ত করা যার ফলে প্রাকৃত করণগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান এবং উত্তরোত্তর পরিমাণে প্রভুত্বলাভ হয়, আত্মপরিবর্তন ও আত্মরূপান্তরের অবহিত ও আগ্রহপূর্ণ সঙ্কল্প — কারণ ঐ সঙ্কল্পের নিকটই প্রকৃতিকে শেষ পর্যন্ত সাড়া দিতে হবে, তাতে যতই কষ্ট হ'ক এবং প্রাথমিক বা দীর্ঘস্থায়ী বাধা যাই হ'ক না কেন — এবং অবিচল অভ্যাস যা সর্বদাই বর্জন করবে সকল দোষ ও বিকৃতি এবং তার স্থানে আনবে সঠিক অবস্থা এবং সঠিক ও আরো অধিক ক্রিয়া। যতদিন না আমাদের মানসিক আত্মা অপেক্ষা মহত্তর কোন শক্তি আরো সহজ ও দ্রুত রূপান্তর সাধনের জন্য সরাসরি হস্তক্ষেপ করে ততদিন যে সব জিনিস প্রয়োজনীয় তা হল তপস্যা (askesis), ধৈর্য্য, নিষ্ঠা এবং জ্ঞানের ও সঙ্কল্পের ঋজুতা।

পঞ্চদশ অধ্যায়

জীবাত্মশক্তি ও চতুর্বিধ ব্যক্তিভাবনা

সাধারণ মন, হৃদয়, প্রাণ ও দেহের সিদ্ধি সাধনে আমরা পাই শুধু আমাদের ব্যবহার্য মনোভৌতিক যন্ত্রের সিদ্ধি এবং এতে দিব্যজীবন ও কর্মের উপযোগী সঠিক এক করণগত অবস্থার সৃষ্টি হয় যা জীবনে এবং কর্মে আনে অধিকতর শুদ্ধ, মহৎ, স্বচ্ছ শক্তি ও জ্ঞান। পরবর্তী প্রশ্ন হল সেই মহাশক্তি সম্বন্ধে যা করণগুলির মধ্যে ঢালা হয় এবং সেই পরম এক সম্বন্ধ যিনি তা ব্যবহার করেন তাঁর বিশ্ব-উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। আমাদের মধ্যে সক্রিয়া শক্তি যে ব্যক্ত দিব্যশক্তি তাতে সন্দেহ নেই, এই সেই পরমা বা বিশ্বশক্তি যা মুক্ত জীবপুরুষের মধ্যে প্রকট হয়ে, "পরাপ্রকৃতির্জীবভূতা", সকল ক্রিয়ার কর্তা হবে এবং এই দিব্য জীবনের শক্তি হবে। এই শক্তির পিছনে যে পরম এক তিনিই ঈশ্বর, সর্বসত্তার অধীশ্বর আর আমাদের সিদ্ধিতে তাঁর সঙ্গে আমাদের সকল অস্তিত্ব হবে যুগপৎ সত্তায় একত্বের যোগ এবং যে পরম দেবতা আমাদের অন্তরে আসীন ও যাঁর মধ্যে আমরা বাস করি, বিচরণ করি এবং আমাদের সত্তা অধিগত করি তাঁর সঙ্গে পুরুষ ও এর প্রকৃতির বিবিধ সম্বন্ধের মধ্যে মিলনের যোগ। এই যে মহাশক্তি যাঁর মধ্যে অথবা পশ্চাতে ঈশ্বর আছেন তাঁরই দিব্য উপস্থিতি ও কর্মপ্রণালীকে আমাদের আবাহন করা চাই আমাদের সমগ্র সত্তা ও জীবনের মধ্যে। কারণ এই দিব্য উপস্থিতি ও এই মহত্তর কর্মপ্রণালী ব্যতিরেকে প্রকৃতির শক্তির সিদ্ধি অসম্ভব।

জীবনের মধ্যে মানবের সকল ক্রিয়া হল অন্তঃপুরুষের উপস্থিতি এবং প্রকৃতির সব কর্মের, পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ, পুরুষের উপস্থিতি ও প্রভাবই নিজেকে প্রকৃতির মধ্যে প্রকাশিত করে আমাদের সত্তার এক বিশেষ শক্তিরূপে, আর একেই আমরা আমাদের অব্যবহিত উদ্দেশ্যের জন্য বলতে পারি জীবাত্মশক্তি; এবং সর্বদা এই জীবাত্মশক্তিই যুক্তিবুদ্ধি, মন, প্রাণ ও দেহের বিভিন্ন শক্তির সব কর্মের অবলম্বন এবং আমাদের সচেতন সত্তার গঠনের ও আমাদের প্রকৃতির চরিত্রের নির্ধারক। সাধারণভাবে বিকশিত মানবের তা থাকে নিয়ন্ত্রিত, সংযত, যন্ত্রভাবাপন্ন, আচ্ছন্ন আকারে, তার ধাত ও চরিত্র রূপে; কিন্তু এ হল তার সর্বাপেক্ষা বাহ্য ছাঁচ যার মধ্যে মনে হয় পুরুষ, চিন্ময় পুরুষ বা সত্তা যান্ত্রিক প্রকৃতির দ্বারা সীমিত, পরিচ্ছিন্ন ও কোন আকারে গঠিত। বিকাশমান প্রকৃতি যা কিছু বুদ্ধিগত, নৈতিক, সৌন্দর্যগ্রাহী, স্ফুরন্ত, প্রাণিক ও শারীরিক মন ও চরিত্রের ছাঁচ নেয়, অন্তঃপুরুষ তার মধ্যে প্রবাহিত হয় এবং কাজ করতে সক্ষম হয় শুধু সেইভাবে যেভাবে এই গঠিত প্রকৃতি তার উপর স্থাপন ক'রে তাকে চালায় তার সঙ্কীর্ণ গর্তপথে অথবা অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত গণ্ডির মধ্যে। তখন মানব সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক হয় অথবা এই সব গুণের এক মিশ্রণ হয়, আর তার ধাত হয় শুধু এক প্রকার

সূক্ষ্মতর পুরুষ-রঙ যা তার প্রকৃতির নির্দিষ্ট প্রকারগুলির প্রধান ও সুস্পষ্ট ক্রিয়ায় দেওয়া হয়েছে। যে সব ব্যক্তির শক্তি প্রবল তারা এই জীবাত্মশক্তির অনেকখানি উপরে নিয়ে আসে এবং তা-ই বিকশিত করে যাকে আমরা বলি প্রবল বা মহৎ ব্যক্তিভাবনা, তাদের মধ্যে গীতায় বর্ণিত বিভূতির কিছু থাকে, "বিভূতিমৎ সত্ত্বম্ শ্রীমদ্ উর্জিতম্ এব বা" — অর্থাৎ সত্তার এমন এক উচ্চতর শক্তি যা কোন দিব্য প্রবেগের অথবা পরমদেবতার সাধারণ অভিব্যক্তির অতিরিক্ত কিছুর স্পর্শ প্রায়ই পায় অথবা তাতে পূর্ণ থাকে; অবশ্য সকলের মধ্যেই, সর্বাপেক্ষা দুর্বল অথবা তমসাচ্ছন্ন প্রাণীর মধ্যেও এ বর্তমান থাকে তবে এখানে এর কিছু বিশেষ শক্তি সাধারণ মানবজাতির আবরণের পশ্চাত থেকে বাইরে আসতে শুরু করেছে আর এই সব অনন্যসাধারণ ব্যক্তির মধ্যে এমন কিছু সুন্দর, মনোহর, চমৎকার বা শক্তিশালী থাকে যা উজ্জ্বলভাবে ফুটে ওঠে তাদের ব্যক্তিভাবনায়, চরিত্রে, জীবনে ও কর্মে। এই সব ব্যক্তিও কাজ করে তাদের প্রকৃতিশক্তির বিশিষ্ট ছাঁচে এর গুণ অনুযায়ী কিন্তু তাদের এমন কিছু আছে যা সুস্পষ্ট অথচ সহজে বিশ্লেষণ করা যায় না; বস্তুতঃ এ হল পরমাত্মা ও চিৎপুরুষের প্রত্যক্ষ শক্তি যা কোন প্রবল উদ্দেশ্যের জন্য প্রকৃতির ছাঁচ ও ঝোঁক ব্যবহার করে। এইভাবে প্রকৃতি স্বয়ং ওঠে তার সত্তার এক উচ্চতর পর্যায়ে বা পর্যায়ের দিকে। শক্তির ক্রিয়ায় অনেক কিছুই মনে হয় অহমাত্মক বা এমনকি বিকৃত, কিন্তু দৈবিক, আসুরিক, রাক্ষসিক যে আকারই এ নিক না কেন, তবু তার পিছনে পরমদেবতার স্পর্শই প্রকৃতিকে চালায় এবং তার নিজের মহত্তর উদ্দেশ্যের জন্য ব্যবহার করে। সত্তার আরো অধিকতর বিকশিত শক্তি এই আধ্যাত্মিক উপস্থিতির প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত করবে আর তখন দেখা যাবে যে এ হল নৈর্ব্যক্তিক ও স্বয়ম্ভূ এবং স্বতঃ-সমর্থ কিছু, এক নিছক জীবাত্মশক্তি যা মনঃশক্তি, প্রাণশক্তি, বুদ্ধিশক্তি থেকে ভিন্ন কিন্তু এদের চালনা করে এবং এমনকি যখন এ কিছু পরিমাণে তাদের ক্রিয়া, গুণ, প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে তখনো এ এক প্রাথমিক অতিস্থিতির, নৈর্ব্যক্তিকতার, চিৎপুরুষের শুদ্ধ অগ্নির ছাপ দেয়, এমন কিছু যা আমাদের সাধারণ প্রকৃতির গুণত্রয়ের অতীত। আমাদের মধ্যে চিৎপুরুষ যখন মুক্ত হয় তখন যা এই জীবাত্মশক্তির পশ্চাতে ছিল তা বাইরে আসে তার সকল আলোক, সৌন্দর্য ও মহিমায় মণ্ডিত হয়ে — অর্থাৎ আবির্ভূত হন পরম চিৎপুরুষ, পরমদেবতা যিনি মানবের প্রকৃতি ও অন্তঃপুরুষকে বিশ্বসত্তা ও মন, ক্রিয়া ও জীবনের মাঝে তাঁর প্রতিষ্ঠা ও জীবন্ত প্রতিভূ করেন।

পরমদেবতা, প্রকৃতির মধ্যে অভিব্যক্ত চিৎপুরুষ দেখা দেন অনন্তগুণের সমুদ্রের মাঝে। কিন্তু কার্যসাধিকা বা যান্ত্রিক প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনগুণের সমষ্টি, আর অনন্তগুণ, অনন্তগুণের আধ্যাত্মিক বিলাস নিজেকে এই যান্ত্রিক প্রকৃতির মধ্যে পরিবর্তিত করে এই তিনগুণের চরিত্রে। আর মানুষের মাঝে এই জীবাত্মশক্তির ভিতর প্রকৃতিস্থ পরমদেবতা নিজেকে প্রকাশ করেন চতুর্বিধ কার্যসাধিকা শক্তিরূপে, "চতুর্ব্যূহ" — জ্ঞানের শক্তি, বীর্যের শক্তি (ক্ষত্র-শক্তি), সহযোগিতা এবং সক্রিয় ও উৎপাদনমূলক সম্বন্ধ ও আদানপ্রদানের শক্তি (বৈশ্যশক্তি), কর্ম, শ্রম ও সেবার শক্তি (শূদ্রশক্তি); আর

পরম দেবতার শক্তি সমগ্র মানবজীবনকে এই চতুঃশক্তির বন্ধনে আবদ্ধ করে এবং আন্তর ও বাহ্য ক্রিয়ার ছাঁচে ঢালে। সক্রিয় মানবীয় ব্যক্তিভাবনার ও প্রকৃতির এই চতুর্বিধ চরিত্রের কথা জেনে ভারতবর্ষের প্রাচীন ভাবনা এর থেকে চারি বর্ণের চরিত্র রচনা করেছিল — ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র; এদের প্রত্যেকেরই ছিল নিজস্ব আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তি, নৈতিক আদর্শ, উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা, সমাজে নির্দিষ্ট বৃত্তি এবং চিৎপুরুষের বিবর্তনমূলক শৃঙ্খলায় উপযুক্ত স্থান। আমাদের প্রকৃতির অধিকতর সূক্ষ্ম সত্যগুলিকে যখন আমরা অতিরিক্তভাবে বাহ্যভাবাপন্ন ও যান্ত্রিকভাবাপন্ন করি তখন সর্বদাই যেমন হবার ঝোঁক থাকে, তেমন এও হয়ে উঠল এক কঠোর ধরাবাঁধা ব্যবস্থা যা মানুষের অন্তর্গত সূক্ষ্মতর বিকাশমান চিৎপুরুষের স্বাতন্ত্র্য, ও পরিবর্তনশীলতা ও জটিলতার সঙ্গে সঙ্গতিশূন্য। তবু, এর পিছনের সত্য ঠিকই আছে এবং আমাদের প্রকৃতির শক্তির সিদ্ধিতে এর গুরুত্বও সমধিক, কিন্তু আমাদের একে নেওয়া চাই এর আন্তর দিকে — প্রথমতঃ ব্যক্তিভাবনা, চরিত্র, ধাত, পুরুষ-প্রকারে, তারপরে এর জীবাত্মশক্তিতে যা এ সবের পশ্চাতে থেকে এই রূপগুলি ধারণ করে এবং সর্বশেষে মুক্ত আধ্যাত্মিক শক্তির বিলাসে যার মধ্যে তারা পায় সকল গুণের অতীত তাদের সর্বোচ্চ অবস্থা এবং ঐক্য। কেননা, এই যে স্থূল বাহ্য ভাবনা যে মানুষ কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র হিসেবে জন্মগ্রহণ করে, এটাই আমাদের সত্তার কোন মনস্তাত্ত্বিক সত্য নয়। মনস্তাত্ত্বিক তথ্য এই যে আমাদের মধ্যে চিৎপুরুষের ও এর কার্যসাধিকা শক্তির এই চার সক্রিয় শক্তি ও প্রবণতা বিদ্যমান এবং আমাদের ব্যক্তিভাবনার অধিকতর সুগঠিত অংশের মধ্যে এদের কোন একটির আধিক্য থেকে আমরা পাই আমাদের বিভিন্ন প্রধান প্রবণতাসমূহ আর পাই প্রবল গুণ ও সামর্থ্যগুলি এবং ক্রিয়ায় ও জীবনে সফল প্রবৃত্তি। কিন্তু অল্পবিস্তর পরিমাণে এরা সকল মানুষেই বর্তমান, কোথাও ব্যক্ত কোথাও প্রচ্ছন্ন, কোথাও বিকশিত, কোথাও দমিত অথবা অবসন্ন বা গৌণ; আর সিদ্ধ মানুষের মাঝে এদের এমন পরিপূর্ণতা ও সামঞ্জস্যের স্তরে উন্নীত করা হবে যা আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার মধ্যে প্রস্ফুটিত হবে চিৎপুরুষের অনন্তগুণের স্বচ্ছন্দ লীলায়, আর তা হবে আন্তর ও বাহ্য জীবনে এবং পুরুষের নিজের এবং জগতের প্রকৃতিশক্তির সঙ্গে তার এমন সৃজনক্ষম লীলার মাঝে যা সে নিজেই উপভোগ করে।

এইসব বিষয়ের সবচেয়ে বাহ্য মনস্তাত্ত্বিক রূপ হল কতকগুলি বিশেষ প্রবণতা, সামর্থ্য, বৈশিষ্ট্য, সক্রিয় শক্তির রূপ, মন ও আন্তর জীবনের গুণ, উৎকর্ষবিষয়ক ব্যক্তিভাবনা বা জাতিরূপের দিকে প্রকৃতির গঠন বা প্রবৃত্তি। প্রায়ই প্রবৃত্তি হল বুদ্ধিগত পদার্থের আধিক্যের দিকে এবং সেই সব সামর্থ্যের আধিক্যের দিকে যা সহায়তা করে জ্ঞানের এষণা ও প্রাপ্তিতে বুদ্ধিগত সৃজন বা রচনাশীলতায়, বিভিন্ন ভাবনায় এবং ভাবনা বা জীবনের আলোচনার নিবিষ্টতায় এবং চিন্তামূলক বুদ্ধির জ্ঞানসংগ্রহে এবং বিকাশে। বিকাশের স্তর অনুযায়ী পর পর যে প্রকারের ব্যক্তির গঠন ও চরিত্র উৎপন্ন হয় তার প্রথমে থাকে সক্রিয়, উন্মুক্ত ও জিজ্ঞাসু বুদ্ধির ব্যক্তি, তারপর বুদ্ধিপ্রধান ব্যক্তি এবং

সর্বশেষে আসে মনস্বী, জ্ঞানী ও মনীষী। এই ধাত, ব্যক্তিভাবনা, পুরুষচরিত্রের সম্যক্ উন্নতির দ্বারা যে জীবাত্মশক্তি দেখা দেয় তা হল আলোর এমন মন যা সকল ভাবনায় ও জ্ঞানে ও সত্যের অন্তঃপ্রবাহে উত্তরোত্তর উন্মুক্ত হয়; তার বৈশিষ্ট্য হল জ্ঞানের জন্য, আমাদের মধ্যে এর বৃদ্ধি ও অপরের মধ্যে এর সঞ্চারণের জন্য, জগতের মধ্যে এর রাজত্বের জন্য যুক্তিবুদ্ধি, ও যথার্থতা ও সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার রাজত্বের জন্য এবং আমাদের মহত্তর সত্তার সামঞ্জস্যের উচ্চতর স্তরে, চিৎপুরুষের রাজত্বের ও এর বিশ্ব ঐক্য ও আলোক ও প্রেমের রাজত্বের জন্য ক্ষুধা ও তীব্র অনুরাগ; মনে ও সঙ্কল্পে এই আলোকের এমন এক শক্তি যা সকল জীবনকে অনুগত করে যুক্তিবুদ্ধি ও এর যথার্থতা ও সত্যের নিকট অথবা চিৎপুরুষ ও আধ্যাত্মিক যথার্থতা ও সত্যের নিকট অথবা অবর অঙ্গগুলিকে তাদের মহত্তর বিধানের বশে আনে; স্বভাবে এমন এক স্থিতি যা প্রথম থেকেই ধৈর্য, নিদিধ্যাসন ও শান্তির দিকে, চিন্তা ও ধ্যানের দিকে ফিরে থাকে আর এতে সঙ্কল্প ও প্রচণ্ড ভাবাবেগের ক্ষোভ দমন ক'রে শান্ত করে এবং উচ্চ চিন্তা ও শুদ্ধ জীবনযাপনের সহায় হয়, যা আত্মশাসিত সাত্ত্বিক মন প্রতিষ্ঠা করে, যা উত্তরোত্তর বিকশিত হয় এক মৃদু, উন্নত, নৈর্ব্যক্তিকভাবাপন্ন ও বিশ্বভাবাপন্ন ব্যক্তিভাবনায়। এই হল জ্ঞানের পুরোহিত ব্রাহ্মণের আদর্শ চরিত্র এবং জীবাত্মশক্তি। এই সব বৈশিষ্ট্যগুলি পূর্ণভাবে না থাকলে আমরা পাই চরিত্রের অপূর্ণতা বা বিকৃতি, শুধু এক বুদ্ধিমত্তা বা ভাবনার প্রতি ঔৎসুক্য যা নৈতিক বা অন্য প্রকারের উৎকর্ষবিহীন, কোন এক প্রকার বুদ্ধিগত ক্রিয়ার উপর সঙ্কীর্ণ একাগ্রতা, কিন্তু মন, অন্তঃপুরুষ ও চিৎপুরুষের প্রয়োজনীয় মহত্তর উন্মুক্ততা অনুপস্থিত; অথবা বুদ্ধিমত্তায় আবদ্ধ বুদ্ধিবিলাসীর দাম্ভিকতা ও আত্যন্তিকতা অথবা জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণবিহীন অক্ষম আদর্শবাদ অথবা বুদ্ধিগত, ধার্মিক, বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক মনের অন্য কোন বিশিষ্ট অপূর্ণতা ও সঙ্কীর্ণতা। পথে নিম্নমাত্রার বিকাশ অথবা সাময়িক আত্যন্তিক একাগ্রতা থাকে, কিন্তু মানবের মাঝে জীবাত্মা এবং সত্য ও জ্ঞানের পরিপূর্ণতাই এই ধর্ম বা স্বভাবের সিদ্ধি, এই হল সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণের সংসিদ্ধ ব্রাহ্মণত্ব।

অপরদিকে প্রকৃতির প্রবৃত্তি হতে পারে সঙ্কল্পশক্তি ও সেই সব সামর্থ্যের প্রাবল্যের দিকে যা নিয়ে আসে বীর্য, ক্রিয়াশক্তি, সাহস, নেতৃত্ব, শাসন, সকল প্রকার যুদ্ধে বিজয়, সৃজনমূলক ও গঠনমূলক ক্রিয়া, সঙ্কল্পশক্তি যা জীবনের উপকরণ ও অন্য ব্যক্তির সঙ্কল্পকে আয়ত্ত করে, অথবা আমাদের অন্তঃস্থ মহাশক্তি জীবনের উপর যে সব আকার স্থাপিত করতে চায় সে পারিপার্শ্বিককে সেই সব আকার গ্রহণ করতে বাধ্য করে অথবা যা আছে তা রক্ষা করার জন্য অথবা ধ্বংস ক'রে জগতের পথ বাধামুক্ত করার জন্য, অথবা ভবিষ্যতে যা হবে তা নির্দিষ্ট আকারে প্রকট করার জন্য প্রয়োজনীয় কর্ম অনুযায়ী সতেজে কর্ম সম্পাদন করে। এই সব থাকতে পারে কম বা বেশী শক্তিতে বা রূপে আর এর পর্যায় বা শক্তি অনুযায়ী আমরা পর পর পাই শুধু যোদ্ধা বা কাজের লোক, আত্ম-আরোপকারী সক্রিয় সঙ্কল্প ও ব্যক্তিভাবনার ব্যক্তি, শাসক, বিজেতা, মহৎ কর্মের নেতা,

জীবনের সক্রিয় গঠনের যে কোন ক্ষেত্রে স্রষ্টা, প্রতিষ্ঠাতা। অন্তঃপুরুষ ও মনের নানাবিধ অপূর্ণতা থেকেই আসে এই চরিত্রের বিবিধ অপূর্ণতা ও বিকৃতি — নিছক পাশব সঙ্কল্পশক্তির মানুষ, অন্য কোন আদর্শ বা উচ্চতর উদ্দেশ্যবিহীন শক্তিপূজারী, স্বার্থপর প্রবল ব্যক্তিসত্ত্ব, আক্রমণশীল অত্যাচারী রাজসিক ব্যক্তি, বড় রকমের অহংপূর্ণ ব্যক্তি, দৈত্য, অসুর, রাক্ষস। কিন্তু প্রকৃতির এই প্রকার চরিত্রের যে জীবাত্মশক্তিগুলি উন্নততর পর্যায়ের দিকে উন্মুক্ত সেগুলি আমাদের মানবীয় প্রকৃতির সিদ্ধির জন্য ব্রাহ্মণের জীবাত্মশক্তিরই মতো প্রয়োজনীয়। পরম নির্ভীকতা যা কোন বিঘ্ন বা বিপদে ভীত হয় না এবং যা অনুভব করে যে এর শক্তি মানুষ বা ভাগ্য বা প্রতিকূল দেবতার যে কোন আঘাতের সম্মুখীন হতে ও সহ্য করতে সমকক্ষ, স্ফুরন্ত দুঃসাহসিকতা ও পরাক্রম যার কাছে এমন কোন অভিযান বা দুষ্কর কর্ম নেই যা অসামর্থ্যজনক দুর্বলতা ও ভয় থেকে মুক্ত মানবপুরুষের শক্তির অতীত এবং সেজন্য তা থেকে এরা সঙ্কুচিত হয় না, সম্মান-প্রীতি যা মানবের শ্রেষ্ঠ মহত্ত্বের শিখরে উঠতে চায় আর কোন কিছু ক্ষুদ্র, হীন, নীচ বা দুর্বলের নিম্নস্তরে নামতে চায় না, বরং পরম সাহস, শৌর্য, সত্য, সরলতা, বড় "আমি"র নিকট ছোট "আমি"র বিসর্জন, পরোপকার, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে অবিচল প্রতিরোধ, আত্মসংযম ও প্রভুত্ব, মহৎ নেতৃত্ব, জীবনযাত্রা ও যুদ্ধের কর্মে যোদ্ধৃভাব ও অধ্যক্ষতা, কর্মবীরের পক্ষে অপরিহার্য শক্তি, সামর্থ্য, চরিত্র ও সাহসের আত্মপ্রত্যয়ের উচ্চ আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখে — এই সব বিষয়গুলিই ক্ষত্রিয়ের প্রকৃতি গঠন করে। এই বিষয়গুলিকে তাদের পরাকাষ্ঠায় নেওয়া এবং সেগুলিকে এক প্রকার দিব্যপরিপূর্ণতা, শুদ্ধতা ও মহিমা দেওয়া এই স্বভাব-বিশিষ্ট ও এই ধর্মানুসারী ব্যক্তিগণের সিদ্ধি।

যে তৃতীয় প্রবৃত্তি আছে তাতে প্রাধান্য দেওয়া হয় ব্যবহারিক ও ব্যবস্থাপক বুদ্ধিকে এবং দ্রব্য উৎপাদন, বিনিময়, অধিকার, উপভোগ, উদ্ভাবন ও সুরক্ষা করার জন্য এবং আয় ব্যয় ও আদানপ্রদান এবং অস্তিত্বের বিভিন্ন সক্রিয় সম্বন্ধগুলির সুচারু সংযোগ সাধনের জন্য প্রাণের যে সহজ সংস্কার দেখা যায় তাকে। বাহ্য কর্মে এই শক্তিই হল নিপুণ, রচনাকারী বুদ্ধি, আইনগত, বৃত্তিগত, বাণিজ্যগত, শিল্পগত, অর্থনীতিবিষয়ক, ব্যবহারিক ও বৈজ্ঞানিক, যান্ত্রিক, প্রযুক্ত ও হিতবাদী মন। এই প্রকৃতির পরিপূর্ণতার সাধারণ স্তরে এর সঙ্গে থাকে এমন এক সাধারণ ধাত যা যুগপৎ নিতে ও দিতে চায়, সংগ্রহ ও সঞ্চয়, উপভোগ, প্রদর্শন ও ব্যবহার করতে উৎসুক, জগৎ ও এর পারিপার্শ্বিকের সুদক্ষ ব্যবহারে কৃতসঙ্কল্প কিন্তু আবার ব্যবহারিক পরোপকার, মানবতাবোধ, সুব্যবস্থিত দান কার্যে সুসমর্থ, বিধি অনুযায়ী সুশৃঙ্খল ও নীতিসম্মত, তবে এতে সূক্ষ্মতর নৈতিক বোধের কোন উচ্চ উৎকর্ষ থাকে না, এ হল মাঝামাঝি স্তরের এক মন যা শিখরের দিকে সচেষ্ট নয়, এবং জীবনের পুরাতন ছাঁচ ভেঙ্গে নতুন ছাঁচ গঠনের জন্য ততটা বড় নয় তবে সামর্থ্য অভিযোজনা ও সংযমের গুণে বিশিষ্ট। এই চরিত্রের বিভিন্ন শক্তি, সঙ্কীর্ণতা ও বিকৃতিগুলি আমাদের কাছে বহু পরিচিত কেননা এই মনোভাবেই আমাদের বর্তমান বাণিজ্যগত ও শিল্পগত সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু যদি

আমরা মহত্তর আন্তর সামর্থ্য ও পুরুষ-মূল্যের দিকে দৃষ্টিপাত করি আমরা দেখব যে এখানেও এমন সব বিষয় আছে যেগুলি মানবীয় সিদ্ধির সম্পূর্ণতার অঙ্গ। বর্তমান নিম্ন স্তরে যে শক্তি এইভাবে নিজেকে বাইরে প্রকাশ করে তা এমন এক শক্তি যা জীবনের মহৎ উপযোগিতার মধ্যে নিজেকে নিক্ষেপ করতে পারে এবং যদিও সে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা যে প্রভুত্ব ও আধ্যাত্মিক রাজপদ তা সম্পাদনে নিজেকে নিযুক্ত করে না, তবু এমন কিছুর জন্য সে নিযুক্ত হয় — তার সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ ও ব্যপ্ত রূপে — যা আবার জীবনের পূর্ণতার জন্য, পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য, অন্তঃপুরুষের সঙ্গে অন্তঃপুরুষের, প্রাণের সঙ্গে প্রাণের বিনিময়ের জন্য অত্যাবশ্যক। এর যে বিভিন্ন শক্তি তার প্রথম হল এক নৈপুণ্য, "কৌশল" যা বিধান রচনা ও পালন করে, বিভিন্ন সম্বন্ধের প্রয়োগ ও সীমা চেনে, স্থির ও উন্নতিশীল গতিধারায় নিজেকে অভিযোজন করে, সৃষ্টি ও ক্রিয়া ও জীবনের বাহ্য বিধি নির্মাণ ও সুষ্ঠু করে, প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করে এবং প্রাপ্তি থেকে অগ্রসর হয় বৃদ্ধির দিকে, শৃঙ্খলা সম্বন্ধে সতর্ক এবং উন্নতি সম্বন্ধে সাবধানী, এবং অস্তিত্বের উপাদান ও এর উপায় ও লক্ষ্যের সর্বাপেক্ষা সদ্‌ব্যবহার করে; আর এক শক্তি হল আত্মব্যয়ের শক্তি যা অত্যধিক ব্যয়ে নিপুণ এবং পরিমিত ব্যয়েও নিপুণ, যা আদানপ্রদানের মহান্ বিধান বোঝে এবং সঞ্চয় করে যাতে বেশী লাভের জন্য তা খাটান যায় আর এতে আদানপ্রদানের চলতি পরিমাণ ও জীবনের ফলপ্রসূতা বৃদ্ধি পায়; অন্য এক শক্তি হল দান ও প্রচুর সৃজনশীল বদান্যতার শক্তি, পারস্পরিক উপকারিতা এবং অপরের হিতসাধনের শক্তি যা উন্মুক্ত পুরুষের মধ্যে হয় উচিত দানশীলতা, মানবহিতৈষা ও ব্যবহারিক পরোপকারের উৎস; আর সর্বশেষে এ হল উপভোগের শক্তি, এক উৎপাদনশীল সংগ্রহপরায়ণ সক্রিয় সমৃদ্ধি যা অস্তিত্বের ফলপ্রদ আনন্দে ভরপুর। সহযোগিতার বিশালতা, জীবনের বিভিন্ন সম্বন্ধের উদার পরিপূর্ণতা, মুক্তহস্ত আত্মব্যয় ও আয় এবং অস্তিত্বে ও অস্তিত্বের মধ্যে প্রচুর আদানপ্রদান, ফলপ্রদ ও উৎপাদনশীল জীবনের ছন্দ ও সমতার পূর্ণ উপভোগ ও ব্যবহার — এই সব হল এই স্বভাববিশিষ্ট ও এই ধর্মানুসারী ব্যক্তিগণের সিদ্ধি।

অন্য প্রবৃত্তি হল কর্ম ও সেবার দিকে। প্রাচীন ব্যবস্থায় এ ছিল শূদ্রের ধর্ম বা আত্মিক চরিত্র এবং ঐ ব্যবস্থায় মনে করা হ'ত যে শূদ্র দ্বিজ নয়, সে হীন বর্ণের। অস্তিত্বের মূল্যের আরো আধুনিক বিচারে শ্রমের মর্যাদার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং দেখা হয় যে পরিশ্রমের মধ্যেই আছে মানুষে মানুষে বিভিন্ন সম্বন্ধের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা। এই দুইটি দৃষ্টিভঙ্গিতেই সত্য আছে। কারণ জড় জগতে এই শক্তি স্বভাবতঃই জড় অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠা অথবা আরো সঠিকভাবে এ হল এমন কিছু যার উপর ভর ক'রে এ চলে, প্রাচীন তত্ত্বমূলক উপাখ্যানে এ হল স্রষ্টা ব্রহ্মার পদযুগল; আবার সাথে সাথে এ হল এমন যা জ্ঞান, সহযোগিতা ও বীর্যের দ্বারা উন্নীত নয়, এমন বিষয় যা সহজসংস্কার, কামনা ও নিশ্চেষ্টতার উপর প্রতিষ্ঠিত। সুবিকশিত শূদ্র চরিত্রের লোকের সহজাত সংস্কারই হল কঠোর পরিশ্রম এবং শ্রম ও সেবার সামর্থ্য; কিন্তু যে কঠোর পরিশ্রম সহজ বা

স্বাভাবিক ক্রিয়ার বিরুদ্ধ তা প্রাকৃত মনুষ্যের উপর আরোপ করা হয় আর তা সে সহ্য করে কারণ এ ব্যতীত সে তার অস্তিত্ব রক্ষায় নিশ্চিত হয় না অথবা তার কামনা পূরণ হয় না এবং সে নিজে বাধ্য হয়ে অন্যের দ্বারা বা অবস্থার দ্বারা বাধ্য হয়ে নিজেকে কাজে নিযুক্ত করে। যে স্বভাববশে শূদ্র সে শ্রমের মর্যাদাবোধ বা সেবার উৎসাহ থেকে কাজ করে না — যদিও ধর্মপালন থেকে তা আসে — করে না সে জ্ঞানের মানুষের মত জ্ঞানের আনন্দের জন্য বা জ্ঞানলাভের জন্য, করে না সে একটা সম্মানবোধ থেকে, করে না সে জন্মকারিগর তথা শিল্পীর কর্মপ্রীতি কিংবা শিল্পসৌন্দর্যের প্রতি উৎসাহবোধ থেকে কিংবা সে করে না একটা পারস্পরিক শৃঙ্খলা বা বৃহৎ উপযোগিতার বোধ থেকে, পরন্তু সে করে তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এবং প্রাথমিক অভাবপূরণের জন্য। এই দুটি জিনিস তৃপ্ত হলে, যদি তাকে স্বাধীনতা দেওয়া যায়, সে তার স্বভাবসিদ্ধ অলসতার প্রশ্রয় দেয়। তামসিক গুণজাত এই অলসতা স্বাভাবিক এবং তা আমাদের সবার মধ্যেই আছে, কিন্তু এটা সবচেয়ে স্পষ্টভাবে প্রকট হয় আদিম বা অসভ্য মানুষের ক্ষেত্রে, যখন তাকে কাজ করতে বাধ্য করা হয় না। সুতরাং অনুন্নত শূদ্রের জন্ম যতটা সেবার জন্য, স্বাধীনভাবে পরিশ্রমের জন্য ততটা নয়, আর তার মেজাজের প্রবৃত্তি হল এক নিশ্চেষ্ট অজ্ঞানতার দিকে, সহজাত সংস্কারগুলির স্থূল অবিবেচক তৃপ্তি সাধনপরায়ণতা, দাসত্ব, বিবেচনাহীন আদেশপালনের ভাব ও যন্ত্রের মতো কর্তব্য কর্ম সাধন যার সঙ্গে থাকে আলস্য, কর্মশৈথিল্য, সাময়িক বিদ্রোহ ও সহজপ্রবৃত্তিমূলক অশিক্ষিত জীবন। প্রাচীনদের মতে সকল মানুষই শূদ্র হিসেবে তাদের নিম্ন প্রকৃতিতে জন্মায়, তারা শুধু উন্নত হয় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের দ্বারা, তবে তাদের শ্রেষ্ঠ আন্তর আত্মায় তারা ব্রাহ্মণ, পূর্ণ চিৎপুরুষ ও দেবত্বলাভে সমর্থ; মনে হয় এই মতটি আমাদের প্রকৃতির মনস্তাত্ত্বিক সত্য থেকে বেশী দূরবর্তী নয়।

কিন্তু তবু যখন অন্তঃপুরুষ বিকশিত হয় তখন কর্ম ও সেবার এই স্বভাব ও ধর্মের মধ্যেই পাওয়া যায় আমাদের মহত্তম সিদ্ধির কতকগুলি অত্যাবশ্যক ও সুন্দর তত্ত্ব এবং শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক বিকাশের রহস্যের অনেক কিছুর সন্ধানসূত্র। কারণ আমাদের মধ্যে এই শক্তির পূর্ণ বিকাশের সঙ্গে জড়িত জীবাত্মশক্তিগুলি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ — পরসেবার শক্তি, আমাদের জীবনকে ভগবান ও মানবের কর্ম ও সেবার বিষয় করার জন্য, ও যে কোন মহৎ প্রভাব ও প্রয়োজনীয় অনুশাসন পালন, অনুসরণ ও স্বীকার করার জন্য সঙ্কল্প, প্রেম যা সেবাকে উৎসর্গ করে, এমন প্রেম যা প্রতিদান চায় না, বরং নিজেকে বিলিয়ে দেয় প্রেমাস্পদের তৃপ্তির জন্য, সেই শক্তি যা এই প্রেম ও সেবাকে নামিয়ে নিয়ে আসে জড় ক্ষেত্রের মধ্যে এবং আমাদের অন্তঃপুরুষ ও মন ও সঙ্কল্প ও সামর্থ্যের মতো আমাদের দেহ ও প্রাণকেও ভগবান ও মানবের নিকট দেবার কামনা এবং তার ফলে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের শক্তি যা আধ্যাত্মিক জীবনে নেওয়া হলে হয়ে ওঠে মুক্তি ও সিদ্ধির অন্যতম সর্বাপেক্ষা মহৎ ও প্রকাশক সন্ধানসূত্র। এই সব বিষয়ের মধ্যেই এই ধর্মের সিদ্ধি ও এই স্বভাবের মহত্ত্ব নিহিত। যদি দিব্যশক্তিতে উন্নয়ন করার জন্য মানুষের মধ্যে

তার প্রকৃতির এই উপাদান না থাকত, তাহলে মানুষ সিদ্ধ ও সম্পূর্ণ হতে পারত না।

এই যে চতুর্বিধ ব্যক্তিভাবনা, এদের কোনটিই এমনকি নিজের ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ হতে অক্ষম হয় যদি না এ তার মধ্যে নিয়ে আসে অন্য গুণগুলির কিছুটা। জ্ঞানের মানুষ স্বাধীনতা ও সত্যের সঙ্গে সত্য সেবায় অক্ষম হয় যদি না তার থাকে বুদ্ধিবিষয়ক ও নৈতিক সাহস, সঙ্কল্প, নির্ভীকতা, নতুন রাজ্য উন্মুক্ত ও জয় করার বীর্য, কারণ তা না হলে সে হয়ে ওঠে সীমিত বুদ্ধির দাস, অথবা শুধু এক প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানের সেবক, অথবা বড় জোর এক বিধিবিষয়ক পুরোহিত[১] — সে তার জ্ঞানকে সর্বোত্তমভাবে প্রয়োগ করতে অক্ষম হয় যদি না তার সেই অভিযোজনের নৈপুণ্য থাকে যাতে সত্যগুলিকে সাধন করা যায় জীবনের ব্যবহারের জন্য, তা না হলে সে বাস করে শুধু ভাবনার মধ্যেই — সে তার জ্ঞানের পূর্ণ উৎসর্গে সক্ষম হয় না যদি না তার থাকে মানবজাতির প্রতি, মানুষের মাঝে পরম দেবতা ও তার সত্তার অধীশ্বরের প্রতি সেবার মনোভাব। শক্তিমান মানুষের কর্তব্য হল তার শক্তি ও বীর্যকে দীপ্ত ও উন্নত ও নিয়ন্ত্রণ করা জ্ঞানের দ্বারা, যুক্তিবুদ্ধি বা ধর্ম বা চিৎপুরুষের আলোর দ্বারা, নচেৎ এ হয়ে ওঠে শুধু পরাক্রমশালী অসুর — তার সেই নৈপুণ্য থাকা চাই যা তাকে সব চেয়ে সাহায্য করবে তার বীর্যের ব্যবহারে, প্রয়োগে ও নিয়ন্ত্রণে এবং একে সৃজনক্ষম ও ফলপ্রসূ করায় ও অপরের সঙ্গে বিভিন্ন সম্বন্ধে অভিযোজিত করায় নচেৎ এ হয়ে ওঠে জীবনক্ষেত্রের উপর দিয়ে এক শক্তির সঞ্চালন, এক ঝড় যা বয়ে যায় ও নির্মাণ করার চেয়ে বরং বেশী ধ্বংস সাধন করে — তার কর্তব্য আজ্ঞাপালনেও সমর্থ হওয়া এবং তার বীর্যের প্রয়োগ করা ভগবানের ও মানবের সেবায়, নচেৎ সে হয়ে ওঠে স্বার্থপর প্রভু, উৎপীড়ক এবং জনগণের অন্তঃপুরুষের ও দেহের নির্দয় পরিচালক। উৎপাদনক্ষম মন ও কর্মের মানুষের থাকা চাই এক উন্মুক্ত, জিজ্ঞাসু মন ও ভাবনা ও জ্ঞান, নচেৎ সে বিচরণ করে তার বৃত্তিসমূহের বাঁধাধরা সীমার মধ্যে যাতে পরিবর্ধনের কোন বিকাশ নেই, তার সাহস ও উদ্যম থাকা চাই, আয় ও উৎপাদনের মধ্যে সেবার মনোভাব আনা চাই যাতে সে শুধু পেতে পারে তা নয়, দিতেও পারে, শুধু তার নিজের জীবন সঞ্চয় ও উপভোগ করে না, বরং সে যে পারিপার্শ্বিক জীবন থেকে লাভবান হয় তার ফলপ্রসূতা ও পরিপূর্ণতাকে সাহায্য করে। পরিশ্রমী ও সেবাব্রতী মানুষ হয়ে ওঠে অসহায় গোলাম ও সমাজের দাস যদি-না সে তার কাজের মধ্যে নিয়ে আসে জ্ঞান ও সম্মানবোধ ও আস্পৃহা ও নৈপুণ্য, কারণ শুধু এই ভাবেই সে উন্মুখ মন ও সঙ্কল্প ও জ্ঞানপূর্ণ উপকারিতার দ্বারা উঠতে পারে উচ্চতর ধর্মের মধ্যে। কিন্তু যদিও যে কোন একটি শক্তি প্রধান হয়ে অন্য শক্তিগুলিকে আনতে পারে তাহলেও মানুষের মহত্তর সিদ্ধি আসে যখন সে সকল শক্তিগুলিই অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নিজেকে বৃহৎ করে এবং তার প্রকৃতিকে উত্তরোত্তর

[১] বোধ হয় এই কারণেই ক্ষত্রিয়ই প্রথম আবিষ্কার করেছিল বেদান্তের মহাসত্যগুলি — বোধিত জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির ক্ষেত্রের মধ্যে তার সাহস, নির্ভীকতা ও বিজয়ী মনোভাব এনে।

উন্মুক্ত করে চতুর্বিধ চিৎপুরুষের নিটোল পরিপূর্ণতা এবং বিশ্বময় সামর্থ্যের নিকট। মানুষ যে এই সব ধর্মের যে কোন একটির আত্যন্তিক রূপে গঠিত হয় তা নয়, তার মধ্যে সকল শক্তিগুলিই সক্রিয় থাকে, তবে প্রথমে তারা থাকে অপুষ্ট বিশৃঙ্খলার মধ্যে, কিন্তু জন্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে সে একটি বা অন্যটিকে গঠিত করে, একটি থেকে অন্যটি উন্নীত হয় আর তা হয় এমনকি এক জন্মের মধ্যেই এবং এইভাবে সে তার আন্তর অস্তিত্বের সমগ্র বিকাশের দিকে অগ্রসর হয়। আমাদের জীবন নিজেই এক সাথে সত্য ও জ্ঞানের জন্য অন্বেষণ, আমাদের নিজেদের সঙ্গে ও চারিদিককার শক্তির সঙ্গে এক সংগ্রাম ও যুদ্ধ, এক সতত উৎপাদন, অভিযোজন ও জীবনের উপকরণে নৈপুণ্যের প্রয়োগ এবং এক যজ্ঞ ও সেবা।

যখন অন্তঃপুরুষ প্রকৃতির মাঝে তার শক্তিকে প্রয়োগ করে তখন এই সব তার সাধারণ রূপ, কিন্তু যখন আমরা আমাদের আন্তর আত্মার আরো সমীপবর্তী হই, তখন আমরা আবার এমন কিছুর আভাস ও অনুভূতি পাই যা এই সব রূপের মধ্যে নিগূহিত ছিল কিন্তু নিজেকে মুক্ত ক'রে পশ্চাতে দাঁড়িয়ে এদের চালনা করতে সক্ষম যেন এ এক সাধারণ সান্নিধ্য বা শক্তি যাকে আনা হয়েছে এই জীবন্ত ও চিন্তাশীল যন্ত্রের বিশেষ ক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তারের জন্য। এ হল সেই অন্তঃপুরুষেরই শক্তি যে এর প্রকৃতির সব শক্তিগুলির অধ্যক্ষ ও পূরক। পার্থক্য এই যে প্রথম প্রকারটির রূপ ব্যক্তিগত, এর কার্য ও গঠন সীমিত ও নির্ধারিত, এ হল করণব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল, কিন্তু এখানে এমন কিছু বার হয় যা ব্যক্তিগত রূপের মধ্যে নৈর্ব্যক্তিক, এমনকি করণব্যবস্থাতেও অনধীন ও আত্ম-পর্যাপ্ত, নিজেকে ও বিষয়সমূহকে উভয়কেই নির্ধারণ করলেও নিজে নির্ধারণের অতীত, এমন কিছু যা জগতের উপর কাজ করে আরো মহত্তর শক্তি নিয়ে এবং বিশেষ শক্তিকে ব্যবহার করে শুধু যোগাযোগের এবং মানব ও পরিস্থিতির উপর অভিঘাতের এক প্রণালী হিসেবে। আত্মসিদ্ধি যোগ এই জীবাত্মশক্তিকে বাইরে এনে একে তার বিশালতম ক্ষেত্র দেয়, সকল চতুর্বিধ শক্তিকেই তুলে নিয়ে তাদের নিক্ষেপ করে এক অখণ্ড ও সুসমঞ্জস আধ্যাত্মিক কলনার মুক্ত ক্ষেত্রে। ব্যষ্টি প্রকৃতি যে উচ্চতম শিখরের অবলম্বনরূপ ভিত্তি হতে সক্ষম সেই শিখরে ওঠে জ্ঞানের জীবাত্মশক্তির পরম দেবত্ব। আলোকের এক স্বচ্ছন্দ মন বিকশিত হয় যা সকল প্রকার শ্রুতি, স্মৃতি, বোধি, ভাবনা, বিবেক, চিন্তামূলক সমন্বয়ের নিকট উন্মুক্ত; মনের এক আলোকিত প্রাণ সকল জ্ঞান আয়ত্ত করে আর তার সঙ্গে থাকে প্রাপ্তি ও গ্রহণ ও ধারণের আনন্দ, আধ্যাত্মিক উৎসাহ, তীব্র অনুরাগ বা রভস; আধ্যাত্মিক শক্তি, দীপ্তি ও কর্মের শুদ্ধতায় পূর্ণ এক শক্তির আলোক তার সাম্রাজ্য ব্যক্ত করে, "ব্রহ্মতেজঃ", "ব্রহ্মবর্চঃ", এক অতলস্পর্শী স্থৈর্য ও অসীম শান্তি ধারণ করে সকল দীপ্তি, গতি, ক্রিয়া যেন কোন প্রাচীন পর্বতের উপর, সম, অবিচল, অচ্যুত।

সঙ্কল্প ও বীর্যের জীবাত্মশক্তি দেবত্ব ওঠে সেই অনুরূপ বৃহত্ত্বে ও উচ্চতায়। মুক্ত চিৎপুরুষের এক একান্ত শান্ত নির্ভীকতা, এক অনন্ত স্ফুরন্ত সাহস যাকে কোন বিপদ,

সম্ভাবনার কোন সীমা, বিরুদ্ধ শক্তির কোন প্রাকার, চিৎপুরুষের আরোপিত কোন কর্ম বা আস্পৃহা থেকে নিবৃত্ত করতে অক্ষম, অন্তঃপুরুষ ও সঙ্কল্পের এমন উচ্চ মহত্ত্ব যাকে কোন ক্ষুদ্রতা বা নীচতা স্পর্শ করে না এবং যা একপ্রকার বৃহৎ পদক্ষেপে চলে আধ্যাত্মিক জয়ের দিকে অথবা ভগবৎ-দত্ত কর্মের সাফল্যের দিকে সাময়িক সকল বাধা বা পরাজয় তুচ্ছ ক'রে, এমন মনোভাব যা কখনো অবসন্ন হয় না অথবা সত্তার মধ্যে সক্রিয় শক্তিতে বিশ্বাস ও প্রত্যয় থেকে বিচ্যুত হয় না — এই সব হল এই সিদ্ধির নিদর্শন। আবার এক বিশাল দেবত্বের, পারস্পরিক সহযোগিতার জীবাত্মশক্তির চরিতার্থতা আসে, আসে করণীয় কর্মে মুক্ত আত্মব্যয় এবং দান ও সম্পদের ব্যয় আর মুক্ত হস্তে এই ব্যয় করা হয় উৎপাদন, সৃষ্টি, কার্যসাধন, প্রাপ্তি, লাভ, ব্যবহারযোগ্য ফলের জন্য, আসে এক নৈপুণ্য যা বিধান পালন করে, সম্বন্ধ অভিযোজন করে এবং পরিমাপ রাখে, সকল সত্তা থেকে নিজের মধ্যে এক পর্যাপ্ত পরিগ্রহণ এবং সকলকে নিজের মধ্য থেকে মুক্ত দান, এক দিব্য আদানপ্রদান, জীবনের পারস্পরিক আনন্দের এক বৃহৎ উপভোগ। এবং অবশেষে, আসে সেবার দেবত্বের, জীবাত্মশক্তির সিদ্ধি — সেই বিশ্বপ্রেম যা নিজেকে মুক্তহস্তে দান করে প্রতিদানের দাবী না ক'রে, সেই আলিঙ্গন যা মানবের মধ্যে ভগবানের দেহকে নিজের ক'রে নেয় এবং সাহায্য ও সেবার জন্য কাজ করে, সেই আত্মোৎসর্গ যা প্রভুর বন্ধন সহ্য করতে এবং তাঁর কাছে এবং তাঁর নির্দেশানুসারে তাঁর সৃষ্ট বিষয়ের দাবী ও প্রয়োজনের নিকট জীবনকে স্বচ্ছন্দ দাসত্বে পরিণত করতে প্রস্তুত, আমাদের সত্তার অধীশ্বরের নিকট এবং জগতে তাঁর কর্মের নিকট সমগ্র সত্তার আত্মসমর্পণ। এই বিষয়গুলি মিলিত হয়, পরস্পরকে সহায়তা করে ও পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করে, এক হয়। যে শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ সিদ্ধিলাভে সর্বাপেক্ষা সমর্থ তাদের মধ্যেই পরিপূর্ণ উৎকর্ষ আসে তবে পূর্ণযোগের সকল সাধকেরই কর্তব্য এই চতুর্বিধ জীবাত্মশক্তির কিছু বৃহৎ অভিব্যক্তি চাওয়া এবং তারা তা পেতেও সক্ষম।

কিন্তু এই সব হল নিদর্শন, কিন্তু পশ্চাতে আছে সেই অন্তঃপুরুষ যে এইভাবে নিজেকে প্রকাশ করে প্রকৃতির উৎকর্ষের মধ্যে। আর এই অন্তঃপুরুষ হল মোক্ষপ্রাপ্ত পুরুষের মুক্ত আত্মার বহিঃপ্রকাশ। ঐ আত্মা অনন্ত এবং সেহেতু এর কোন বিশেষত্ব নেই, তবে এ সকল বিশেষত্বের লীলার ধারক ও ভর্তা, এক প্রকার অনন্ত, এক অথচ বহুময় ব্যক্তিভাবনার আশ্রয়, "নির্গুণো গুণী", নিজের অভিব্যক্তিতে অনন্ত গুণে সমর্থ। যে শক্তিকে এ ব্যবহার করে তা হল এক পরমা ও বিশ্বময়ী, ভাগবতী ও অনন্ত শক্তি যা নিজেকে ঢেলে দেয় ব্যষ্টি সত্তার মধ্যে এবং স্বচ্ছন্দভাবে কার্য নির্ধারণ করে ভগবৎ-উদ্দেশ্যের জন্য।

ষোড়শ অধ্যায়

ভাগবতী শক্তি

আত্মসিদ্ধি যোগে যেমন অগ্রসর হওয়া যায় তেমন পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যে সম্পর্কটি বাইরে প্রকট হয় তার কথাই আমাদের যোগের এই অংশে মনোযোগের সঙ্গে প্রণিধান করা আবশ্যক। আমাদের সত্তার আধ্যাত্মিক সত্যে যে শক্তিকে আমরা প্রকৃতি বলি তা সত্তা, চেতনা ও সঙ্কল্পের শক্তি এবং সেজন্য আত্মা, অন্তঃপুরুষ বা পুরুষের আত্ম-অভিব্যক্তি ও আত্মসৃজনের শক্তি। কিন্তু অবিদ্যার মাঝে আমাদের সাধারণ মনের নিকট ও বিষয়সমূহের অভিজ্ঞতার কাছে প্রকৃতির শক্তিকে অন্যরকম দেখায়। যখন আমরা একে দেখি আমাদের বাইরে তার বিশ্বক্রিয়ায়, তখন আমরা একে প্রথম দেখি বিশ্বের মাঝে এক যান্ত্রিক ক্রিয়াশক্তি রূপে যা কাজ করে জড়ের উপর অথবা এর সৃষ্ট জড়রূপের উপর। জড়ের মধ্যে এ বিকশিত করে প্রাণের বিভিন্ন শক্তি ও প্রক্রিয়া এবং প্রাণবন্ত জড়ের মধ্যে এ বিকশিত করে মনের বিভিন্ন শক্তি ও প্রক্রিয়া। এর ক্রিয়ার সকল অবস্থাতেই এর কাজ চলে নির্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী এবং প্রতি প্রকারেরই সৃষ্ট বিষয়ে দেখা যায় নানামাত্রায় শক্তির বিভিন্ন গুণ ও কর্মপ্রণালীর বিভিন্ন বিধান যা জাতি ও উপজাতিকে তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দেয় এবং জাতি ও উপজাতির নিয়ম ভঙ্গ না করেও ব্যষ্টির মধ্যে বিকশিত করে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও পরিবর্তন। প্রকৃতির এই যান্ত্রিক রূপটিতেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক মন ব্যস্ত থাকে, তার কাছে এই হল প্রকৃতির সকল রূপ, আর এ বিষয়ে সে এত নিশ্চিত যে জড় বিজ্ঞান এখনো আশা করে এবং চেষ্টা করে — আর তাতে সামান্য কিছু সফলও হয় — যে প্রাণের সব ঘটনাকেই জড়ের বিধান দিয়ে এবং মনের সব ঘটনাকে প্রাণবন্ত জড়ের বিধান দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এখানে অন্তঃপুরুষ বা চিৎপুরুষের কোন স্থান নেই আর প্রকৃতিকে চিৎপুরুষের শক্তি ব'লে গণ্য করা যায় না। যেহেতু আমাদের সমগ্র অস্তিত্ব যান্ত্রিক, ভৌতিক ও স্বল্পস্থায়ী প্রাণবন্ত চেতনার এক জীববিদ্যামূলক ঘটনার দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং মানুষ জড়শক্তির সৃষ্ট বিষয় ও যন্ত্র, সেহেতু যোগের আধ্যাত্মিক আত্মবিকাশ নিশ্চয়ই এক বিভ্রম, মরীচিকা, মনের এক অস্বাভাবিক অবস্থা অথবা আত্মসম্মোহন মাত্র। যাই হ'ক এ নিজেকে যা প্রতিপন্ন করতে চায় তা হতেই পারে না অর্থাৎ এ যে বলে যে এ হল আমাদের সত্তার শাশ্বত সত্যের আবিষ্কার এবং মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক সীমিত সত্যের ঊর্ধ্বে আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির পূর্ণ সত্যে উত্তরণ, তা নয়।

কিন্তু আমাদের ব্যক্তিসত্ত্ববিহীন বাহ্য যান্ত্রিক প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি না দিয়ে যখন আমরা মানবের, মনোময় পুরুষের আন্তর প্রত্যক্‌বৃত্ত অনুভূতির দিকে দৃষ্টি দিই তখন আমাদের প্রকৃতিকে আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে দেখি। আমরা বুদ্ধিগতভাবে, এমনকি আমাদের প্রত্যক্‌বৃত্ত অস্তিত্ব সম্বন্ধেও, একটা সম্পূর্ণ যান্ত্রিকতার দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাস

রাখতে পারি, তবু তা কাজে লাগাতে বা আত্ম-অনুভূতির ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট সত্য করে তুলতে পারি না। কারণ আমরা এক আমি সম্বন্ধে সচেতন হই, যে আমি মনে হয় আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে অভিন্ন নয় বরং মনে হয় তা থেকে পিছিয়ে দাঁড়াতে সক্ষম; আর নিরাসক্তভাবে তাকে পর্যবেক্ষণ, সমালোচনা ও সৃজনশীলভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম এবং এমন এক সঙ্কল্পে সক্ষম যাকে আমরা সাধারণতঃ ভাবি স্বাধীন সঙ্কল্প ব'লে; এমনকি এ যদি বিভ্রমও হয় তাহলেও আমরা কার্যতঃ এমন আচরণ করতে বাধ্য হই যেন আমরা দায়িত্বশীল মনোময় পুরুষ এবং স্বাধীনভাবে আমাদের কার্য নির্ধারণে সক্ষম, আমাদের প্রকৃতির সদ্ব্যবহার বা অপব্যবহার করতে, মহৎ বা হীন উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করতে সক্ষম। এমনকি মনে হয় আমরা এক পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি ও আমাদের বর্তমান প্রকৃতি, উভয়েরই সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত এবং এমন এক জগতের প্রভুত্ব পেতে সচেষ্ট যা নিজেকে আমাদের উপর আরোপ করে এবং আমাদের আয়ত্ত করে, আবার সেই সাথে আমরা চেষ্টা করি আমরা বর্তমানে যা তার অতিরিক্ত কিছু হবার জন্য। কিন্তু মুস্কিল এই যে আমরা যদি আদৌ আয়ত্ত করি, তা করি শুধু আমাদের এক ক্ষুদ্র অংশকে, বাকী সব অবচেতন বা অধিচেতন এবং আমাদের নিয়ন্ত্রণের অতীত আর আমাদের সঙ্কল্প কাজ করে আমাদের কার্যাবলীর এক ক্ষুদ্র নির্বাচিত পরিধির মধ্যে; বেশীরভাগই এক যান্ত্রিকতা ও অভ্যাসের ধারা, আর যদি আমরা এতটুকু অগ্রসর হতে বা আত্মোন্নতি করতে যাই তাহলে আমাদের কর্তব্য হবে সর্বদাই আমাদের নিজেদের সঙ্গে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করা। মনে হয় আমাদের মধ্যে এক দ্বৈত সত্তা আছে; পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে কিছু মিল আছে আবার কিছু বৈষম্য আছে; পুরুষের উপর প্রকৃতি চাপায় তার যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ, আর পুরুষ চেষ্টা করে প্রকৃতিকে পরিবর্তন ও আয়ত্ত করতে। এখন প্রশ্ন হল — এই দ্বৈতভাবের মূল স্বরূপ কি এবং শেষ পরিণাম কি?

সাংখ্য মতে আমাদের বর্তমান অস্তিত্ব দ্বৈততত্ত্বের অধীন। পুরুষের সংযোগ না পেলে প্রকৃতি নিশ্চেষ্ট, সে কাজ করে শুধু এর সংসর্গে এবং তখনো আবার বিভিন্ন করণ ও গুণের নির্দিষ্ট যান্ত্রিক প্রণালীর মধ্য দিয়ে; পুরুষ যখন প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন তখন সে নিষ্ক্রিয় ও মুক্ত কিন্তু প্রকৃতির সংযোগে ও এর কর্মে অনুমতি দানের দ্বারা সে এই যান্ত্রিক প্রণালীর অধীন হয়, তার অহং-বোধের সঙ্কীর্ণতার মধ্যে বাস করে আর তাকে মুক্ত হতে হবে অনুমতি প্রত্যাহার ক'রে এবং নিজের আপন মূল তত্ত্বে ফিরে গিয়ে। অন্য এক ব্যাখ্যা আছে যা আমাদের অভিজ্ঞতার কিছুটার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ; তা হল এই যে আমাদের মধ্যে দ্বৈত সত্তা আছে, একটি পাশবিক ও জড়গত সত্তা অথবা আরো ব্যাপকভাবে, নিম্ন প্রকৃতিবদ্ধ সত্তা এবং অন্যটি পুরুষ বা আধ্যাত্মিক সত্তা যা মনের দ্বারা জড় অস্তিত্বের মধ্যে বা জগৎ-প্রকৃতির মধ্যে আবদ্ধ; আর মুক্তিলাভের উপায় হল এই বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া অর্থাৎ পুরুষ ফিরে যাবে তার বিভিন্ন স্বধামে অথবা আত্মা বা চিৎপুরুষ ফিরে যাবে শুদ্ধ অস্তিত্বের মধ্যে। তখন পুরুষের সিদ্ধি আদৌ প্রকৃতির মধ্যে পাওয়া যাবে না, তা পাওয়া যাবে প্রকৃতির অতীতে।

কিন্তু আমাদের বর্তমান মানসিক চেতনা অপেক্ষা পরতর চেতনায় আমরা দেখি যে

এই দ্বৈতভাব শুধু এক প্রাতিভাসিক বাহ্যরূপ। অস্তিত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ও আসল সত্য হল এক অবিভক্ত চিৎপুরুষ, পরম পুরুষ, পুরুষোত্তম, আর এই চিৎপুরুষের শক্তিই নিজেকে ব্যক্ত করে এই সবের মধ্যে যাকে আমরা বিশ্ব ব'লে জানি। এই বিশ্বপ্রকৃতি এক নিষ্প্রাণ, নিশ্চেষ্ট বা অচেতন যান্ত্রিক প্রণালী নয়, বরং তার সকল গতিবৃত্তিতেই এ হল বিশ্ব চিৎপুরুষের দ্বারা অনুপ্রাণিত। এর কর্মপ্রণালীর যান্ত্রিকতা শুধু এক বাহ্য রূপ, আর সদ্বস্তু হল পরম চিৎপুরুষ যিনি, প্রকৃতিতে যা কিছু আছে তার মধ্যে তাঁর আপন সত্তা সৃষ্টি বা অভিব্যক্ত করেন তাঁর সত্তার নিজের শক্তি দিয়ে। আমাদের মধ্যেও পুরুষ ও প্রকৃতি একই অস্তিত্বের দুই রূপ মাত্র। বিশ্বশক্তি আমাদের মধ্যে কাজ করে, কিন্তু পুরুষ অহং-বোধের দ্বারা নিজেকে সীমাবদ্ধ করে আর বাস করে প্রকৃতির কর্মপ্রণালীর আংশিক ও বিভক্ত অনুভূতির মধ্যে আর নিজের আত্মপ্রকাশের জন্য ব্যবহার করে প্রকৃতির শক্তির কিছু অংশ এবং এক নির্দিষ্ট ক্রিয়া। বরং মনে হয় যে পুরুষ প্রকৃতির শক্তি ব্যবহার করার বদলে এই শক্তিই পুরুষকে আয়ত্ত ও ব্যবহার করে, কারণ পুরুষ সেই অহং-বোধের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন করে যে অহং-বোধ প্রাকৃত করণব্যবস্থার অংশ এবং পুরুষ বাস করে অহং-অনুভূতির মধ্যে। বস্তুতঃ অহংকে চালায় প্রকৃতির যান্ত্রিকতা যার অংশ এ আর অহং-সঙ্কল্প স্বাধীন সঙ্কল্প নয় আর তা হতেও পারে না। মুক্তি, প্রভুত্ব ও সিদ্ধি পেতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে অন্তঃস্থ আসল আত্মায় ও পুরুষে এবং তার দ্বারা আমাদের পাওয়া চাই আমাদের নিজেদের প্রকৃতির ও বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সত্যকার সব সম্বন্ধ।

আমাদের সক্রিয় সত্তায় এর যা রূপ তাতে এর অর্থ হল আমাদের অহমাত্মক, আমাদের ব্যক্তিগত, আমাদের বিভক্ত ব্যষ্টি সঙ্কল্প ও ক্রিয়াশক্তি সরিয়ে তাদের স্থানে আনা এক বিশ্বময়ী এবং দিব্য সঙ্কল্প ও ক্রিয়াশক্তি যা বিশ্বক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যে আমাদের ক্রিয়া নির্ধারণ করে এবং নিজেকে প্রকট করে পুরুষোত্তমের প্রত্যক্ষ সঙ্কল্প ও সর্বপরিচালিকা শক্তি হিসেবে। আমরা আমাদের সীমিত, অজ্ঞানময়, ও অপূর্ণ ব্যক্তিগত সঙ্কল্প ও ক্রিয়াশক্তির অবর ক্রিয়া সরিয়ে তার বদলে আনি ভাগবতী শক্তির ক্রিয়া। বিশ্বক্রিয়াশক্তির কাছে নিজেদের উন্মুক্ত রাখা আমাদের পক্ষে সর্বদাই সম্ভব, কারণ ওটি আমাদের চারিদিক ঘিরে আছে এবং সর্বদাই আমাদের মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে; ওই হল আমাদের সকল আন্তর ও বাহ্য ক্রিয়ার আশ্রয় ও উৎস এবং বস্তুতঃ কোন বিভক্ত ব্যষ্টি অর্থে আমাদের নিজেদের কোন শক্তি নেই, আছে শুধু এক অবিভক্ত সত্তার রূপায়ণ। আবার অপরপক্ষে এই বিশ্বশক্তি আমাদের নিজেদের মধ্যে বর্তমান, আমাদের মধ্যে ঘনীভূতরূপে অবস্থিত, কারণ যেমন বিশ্বের মধ্যে তেমন প্রতি জীবের মধ্যেই এর সমগ্র শক্তি বর্তমান, আর এমন সব উপায় ও প্রক্রিয়া আছে যার দ্বারা আমরা এর মহত্তর ও যোগ্য অনন্ত শক্তিকে জাগ্রত করতে সক্ষম এবং তাকে মুক্ত করতে সক্ষম তার বৃহত্তর কর্মে।

বিশ্বশক্তির অস্তিত্ব ও উপস্থিতি আমরা অবগত হই তার বল-সামর্থ্যের নানা রূপে।

বর্তমানে আমরা এই সামর্থ্য সম্বন্ধে শুধু সেইটুকু জানি যেটুকু এ রূপায়িত হয় আমাদের স্থূল মনে, স্নায়বিক সত্তায় ও দৈহিক আধারে যেগুলি আমাদের বিবিধ সক্রিয়তার ধারক। কিন্তু যদি আমরা যোগের দ্বারা আমাদের অস্তিত্বের গুপ্ত, গহন, অধিচেতন অংশগুলির কিছুটা উন্মুক্ত ক'রে এই প্রাথমিক রূপায়ণ একবার ছাড়িয়ে যেতে পারি, তাহলে আমরা এমন এক মহত্তর প্রাণিক শক্তির কথা অবগত হই যা দেহকে ধারণ ও পূর্ণ করে এবং সকল শারীরিক ও প্রাণিক ক্রিয়া জোগায় — কারণ শারীরিক ক্রিয়াশক্তি এই শক্তির শুধু এক পরিবর্তিত রূপ — এবং যা আবার নিম্ন থেকে আমাদের সকল মানসিক ক্রিয়া জোগায় ও ধারণ করে। এই শক্তিকে আমরা আমাদের ভিতরেও অনুভব করি, আমাদের চারিদিকে ও উর্ধ্বেও অনুভব করতে সক্ষম, আর এ আমাদের অন্তঃস্থ শক্তির সঙ্গে এক; আমরা আমাদের সাধারণ ক্রিয়া বৃদ্ধি করার জন্য একে ভিতরে ও নিম্নে আকর্ষণ করতে সক্ষম, অথবা একে আবাহন ক'রে আমাদের ভিতরে প্রবাহিত করাতে সক্ষম। এ হল শক্তির এক অসীম সাগর এবং যতখানি আমাদের সত্তার মধ্যে ধরা যায় ততখানি এ নিজেকে ঢেলে দেবে। শারীরিক সূত্রের দ্বারা সীমিত আমাদের বর্তমান বিভিন্ন ক্রিয়াতে আমরা এই প্রাণিক শক্তিকে যেভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম, তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে শক্তিশালীভাবে ও কার্যকরীভাবে আমরা একে ব্যবহার করতে সক্ষম, প্রাণ, দেহ বা মনের যে কোন কার্যের জন্য। যে পরিমাণে আমরা আমাদের দেহবদ্ধ ক্রিয়াশক্তির বদলে প্রাণিক শক্তি ব্যবহারে সক্ষম হই সেই পরিমাণে এই প্রাণিক শক্তির ব্যবহারে আমাদের এই সীমা দূর হয়। একে এমনভাবে ব্যবহার করা সম্ভব যে প্রাণ তার সাহায্যে যে কোন দৈহিক অবস্থা বা ক্রিয়া আরো শক্তিশালীভাবে নির্বাহ করতে অথবা সংশোধন করতে, রোগ সারাতে, ক্লান্তি দূর করতে সক্ষম এবং প্রভূত পরিমাণের মানসিক শ্রম ও সঙ্কল্প বা জ্ঞানের ক্রিয়া আনতে সক্ষম হয়। প্রাণিক শক্তিকে মুক্ত ও নিয়ন্ত্রণ করার পরিচিত যান্ত্রিক উপায় হল বিভিন্ন প্রাণায়াম পদ্ধতি। যে সব চৈত্য, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিগুলি তাদের কার্যের সুযোগের জন্য সাধারণতঃ প্রাণিক শক্তির উপর নির্ভর করে প্রাণায়াম তাদের উন্নত ও মুক্তও করে। কিন্তু ঐ একই কাজ করা যায় মানসিক সঙ্কল্প ও অভ্যাসের দ্বারা অথবা শক্তির পরতর আধ্যাত্মিক সামর্থ্যের কাছে নিজেদের উত্তরোত্তর আরো বেশী উন্মুক্ত ক'রে। এই প্রাণিক শক্তিকে শুধু যে আমাদের নিজেদের উপর প্রয়োগ করা যায় তা নয়, একে কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করা যায় অন্যদের প্রতি অথবা বিষয়সমূহ বা ঘটনাসমূহের উপর আর সঙ্কল্প যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্দেশ দেয় সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তা প্রয়োগ করা সম্ভব। এর কার্যকারিতা প্রভূত, স্বয়ং তা অসীম, এবং তার সীমিত হবার কারণ হল এর উপর যে আধ্যাত্মিক বা অন্য সঙ্কল্প প্রয়োগের জন্য আনা হয়, শুধু তার শক্তি, শুদ্ধতা ও বিশ্বভাবের ত্রুটি; কিন্তু তবু এই শক্তি যতই অধিক ও শক্তিশালী হ'ক না কেন, এ হল এক নিম্ন রূপায়ণ, মন ও দেহের মধ্যে এক যোগসূত্র, একক করণগত শক্তি। এর মধ্যে এক চেতনা আছে, চিৎপুরুষের উপস্থিতি আছে, আর এর সম্বন্ধে আমরা অবগত হই,

শক্তি, শুদ্ধতা ও বিশ্বভাবের ত্রুটি; কিন্তু তবু এই শক্তি যতই অধিক ও শক্তিশালী হ'ক না কেন, এ হল এক নিম্ন রূপায়ণ, মন ও দেহের মধ্যে এক যোগসূত্র, এক করণগত শক্তি। এর মধ্যে এক চেতনা আছে, চিৎপুরুষের উপস্থিতি আছে, আর এর সম্বন্ধে আমরা অবগত হই, কিন্তু এ থাকে কর্মের প্রেরণার মধ্যে আবৃত, নিগূহিত এবং তাতেই নিবিষ্ট। শক্তির এই ক্রিয়ার নিকট আমরা আমাদের ক্রিয়াবলীর সমগ্র ভার ছেড়ে দিতে পারি না; হয় আমরা এর দেওয়া সাহায্যকে ব্যবহার করব আমাদের আপন আলোকিত ব্যক্তিগত সঙ্কল্পের দ্বারা অথবা না হয় এক পরতর নির্দেশের আবাহন করব; কারণ নিজে নিজে এ মহত্তর শক্তি নিয়ে কাজ করবে কিন্তু তবু তা হবে আমাদের অপূর্ণ প্রকৃতির অনুযায়ী এবং প্রধানতঃ আমাদের ভিতরকার প্রাণশক্তির প্রেরণা ও উন্মুখতার দ্বারা, তা শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের বিধান অনুযায়ী হবে না।

যে সাধারণ শক্তির দ্বারা আমরা প্রাণিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করি তা হল দেহবদ্ধ মনের শক্তি। কিন্তু যখন আমরা স্থূল মন ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বে উঠি তখন আমরা প্রাণিক শক্তিরও উপরে এমন এক শুদ্ধ মানসিক শক্তিতে উঠি যা মহাশক্তির এক পরতর রূপায়ণ। সেখানে আমরা এমন এক বিশ্বমানস চেতনার কথা অবগত হই যা আমাদের ভিতরে, চারিদিকে ও আমাদের ঊর্ধ্বে অর্থাৎ আমাদের সাধারণ মানসিক স্থিতির ঊর্ধ্বে এই মানসিক শক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং যা আমাদের সঙ্কল্প ও জ্ঞানের এবং আমাদের বিভিন্ন সংবেগ ও ভাবাবেগের মধ্যস্থিত চৈত্য উপাদানের সকল ধাতু দেয় ও সকল রূপ গঠন করে। মনঃশক্তিকে প্রাণশক্তির উপর কার্য করতে বাধ্য করা যায় এবং এ তার উপর আরোপ করতে পারে আমাদের বিভিন্ন ভাবনার, আমাদের জ্ঞানের, আমাদের আরো আলোকিত ইচ্ছাশক্তির প্রভাব, রঙ, আকার, বৈশিষ্ট্য, প্রবণতা এবং এইভাবে আমাদের প্রাণ ও প্রাণময় পুরুষকে আরো কার্যকরীভাবে আনতে পারে আমাদের সত্তা, আদর্শরাজি ও আধ্যাত্মিক আস্পৃহাসমূহের উচ্চতর শক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যে। আমাদের সাধারণ অবস্থায় এই দুটি — মানসিক ও প্রাণিক সত্তা ও শক্তিসমূহ অতীব মিশ্রিত ও পরস্পরের মধ্যে প্রবিষ্ট আর আমরা এই দুটিকে পৃথকভাবে ভাল করে জানতে সক্ষম হই না অথবা যে কোনটিকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত ক'রে যে নিম্ন তত্ত্বকে উচ্চতর ও আরো বোধপূর্ণ তত্ত্বের দ্বারা কার্যকরীভাবে নিয়ন্ত্রণ করব তা-ও হয় না। কিন্তু যখন আমরা আমাদের স্থূল মনের ঊর্ধ্বে অবস্থান করি, তখন আমরা শক্তির এই দুই রূপকে, আমাদের সত্তার দুই স্তরকে স্পষ্টভাবে পৃথক করতে সক্ষম হই, আর সক্ষম হই তাদের ক্রিয়াকে বিচ্ছিন্ন করতে এবং কাজ করতে আরো স্বচ্ছ ও আরো শক্তিশালী আত্মজ্ঞানের সঙ্গে এবং এক প্রবুদ্ধ ও শুদ্ধতর সঙ্কল্প শক্তির সঙ্গে। তথাপি, যতদিন আমরা মনকেই আমাদের প্রধান দিশারী ও নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি ক'রে কাজ করি, ততদিন নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ, স্বতঃস্ফূর্ত ও অপ্রতিহত হয় না। আমরা দেখি যে মানসিক শক্তি নিজেই অন্য কিছু থেকে উৎপন্ন, চিন্ময় পুরুষের এক নিম্ন ও সঙ্কীর্ণতাজনক শক্তি যা কাজ করে শুধু বিচ্ছিন্ন ও সংযুক্ত দৃষ্টির দ্বারা, অপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ অর্ধ-আলোকের দ্বারা

অথচ এইগুলিকেই আমরা নিই সম্পূর্ণ ও পর্যাপ্ত আলো ব'লে; আর এই কাজে থাকে ভাবনা ও জ্ঞান ও কার্যকরী সঙ্কল্পশক্তির মধ্যে অসঙ্গতি। আর আমরা শীঘ্রই পরম চিৎপুরুষের ও তাঁর শক্তির এক আরো অনেক উচ্চ সামর্থ্যের কথা জানি যা প্রচ্ছন্ন বা ঊর্ধ্বে অবস্থিত, মনের অতিচেতন অথবা মনের মধ্য দিয়ে অংশতঃ সক্রিয় আর এই সব এর শুধু এক অবর উৎপন্ন রূপ।

আমাদের সত্তার অন্যান্য স্তরের মতো মানসিক স্তরেও পুরুষ ও প্রকৃতি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং পরস্পরের মধ্যে অতীব প্রবিষ্ট এবং আমরা স্পষ্ট করে পুরুষ ও প্রকৃতিকে পৃথকভাবে বুঝতে সক্ষম হই না। কিন্তু মনের শুদ্ধতর ধাতুতে আমরা এই দ্বৈতভাব আরো সহজেই বুঝতে সক্ষম। আমরা যেমন দেখেছি, মনোময় পুরুষ স্বভাবতঃই তার নিজের স্বকীয় মানসিক তত্ত্বে প্রকৃতির সব ক্রিয়া থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম আর তখন আমাদের সত্তার মধ্যে এক বিভাজন আসে যাতে একভাগে থাকে এক চেতনা যা পর্যবেক্ষণ করে ও নিজের সঙ্কল্পশক্তিকে সম্বরণ করে, আর অন্য ভাগে থাকে এমন এক ক্রিয়াশক্তি যা চেতনার ধাতুতে পূর্ণ এবং জ্ঞান, সঙ্কল্প ও বেদনার (feeling) বিভিন্ন রূপ নেয়। এই বিচ্ছিন্নতার পরাকাষ্ঠায় মানসিক প্রকৃতির দ্বারা পুরুষের উপর নিয়ন্ত্রণ হতে কিছুটা মুক্তি আসে। কারণ সাধারণতঃ আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায় আমাদের নিজেদের ও বিশ্বের সক্রিয় শক্তির স্রোত, কিছুটা আমরা এর ঢেউয়ে হাবুডুবু খাই আর কিছুটা আমরা সমাহিত মননের দ্বারা ও মানসিক সঙ্কল্পরূপী পেশীর চেষ্টার দ্বারা নিজেদের রক্ষা করি, মনে হয় যেন নিজেদের ঠিক পথে চালিত করি অথবা অন্ততঃ চালিয়ে নিয়ে যাই; কিন্তু এখন আমাদের এমন এক অংশ থাকে যা আত্মার শুদ্ধ স্বরূপের অতীব নিকটবর্তী, স্রোত থেকে স্বতন্ত্র, শান্তভাবে নিরীক্ষণ করতে সক্ষম, আর কিছু পরিমাণে সক্ষম এর অব্যবহিত গতি ও পথ নির্ণয় করতে এবং আরো অধিক পরিমাণে সক্ষম এর অন্তিম গতিধারা নির্ণয় করতে। অবশেষে, চিৎপুরুষের মধ্যে নিহিত স্বকীয় অনুমতি ও নিয়ন্ত্রণের দ্বারা পুরুষ প্রকৃতির উপর কাজ করতে সক্ষম হয় অর্ধবিচ্ছিন্ন হয়ে, তার পিছন থেকে অথবা ঊর্ধ্ব থেকে অধিষ্ঠাতা ব্যক্তি বা শক্তি অর্থাৎ "অধ্যক্ষ" রূপে।

এই আপেক্ষিক স্বাধীনতা নিয়ে আমরা কি করব তা নির্ভর করে — আমাদের শ্রেষ্ঠ আত্মার সঙ্গে, ভগবান ও প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি হবে সে সম্বন্ধে আমাদের আস্পৃহা ও আমাদের ভাবনার উপর। পুরুষ তা ব্যবহার করতে পারে মনোময় লোকেই অবিরত আত্মনিরীক্ষণ, আত্মবিকাশ, আত্মপরিবর্তনের উদ্দেশ্যে যাতে সে প্রকৃতির নতুন রূপায়ণগুলি অনুমোদন, বর্জন, পরিবর্তন করতে পারে ও বাইরে আনতে পারে এবং প্রতিষ্ঠিত করতে পারে শান্ত ও নিঃস্বার্থ ক্রিয়া, তার শক্তির এক উচ্চ ও শুদ্ধ সাত্ত্বিক সমতা ও ছন্দ, সাত্ত্বিক তত্ত্বে সিদ্ধ এমন এক ব্যক্তিভাবনা। এতে আসতে পারে আমাদের বর্তমান বুদ্ধির এবং নৈতিক ও চৈত্যসত্তার এক উচ্চ মানসিকভাবাপন্ন সিদ্ধি, আর না হয় এ আমাদের অন্তঃস্থ মহত্তর আত্মা সম্বন্ধে অবগত হয়ে আত্মসচেতন অস্তিত্বকে এবং এর প্রকৃতির ক্রিয়াকে নৈর্ব্যক্তিকভাবাপন্ন, বিশ্বভাবাপন্ন ও আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন করতে পারে

ও পেতে পারে হয় তার সত্তার আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন মানসিক শক্তির এক বিশাল নিস্তব্ধতা, নয় এক বিশাল সিদ্ধি। আবার, পুরুষ সম্পূর্ণ সরে আসতেও পারে এবং অনুমোদন না দিয়ে মনের সমগ্র স্বাভাবিক ক্রিয়াকে চলতে দিতে পারে যাতে এ নিঃশেষিত হয়, ছুটে অবসন্ন হয় এবং অভ্যস্ত ক্রিয়ার অবশিষ্ট বেগ ব্যয় ক'রে নীরব হয়ে পড়ে। আর না হয়, মানসিক শক্তির ক্রিয়াকে বর্জন করে এবং অবিরত একে শান্ত হবার আদেশ দিয়ে এ তার উপর এই নীরবতা আরোপ করতে পারে। এই শান্তভাব ও মানসিক নীরবতাকে দৃঢ় ক'রে পুরুষ যেতে পারে চিৎপুরুষের কোন অনির্বচনীয় প্রশান্তির মধ্যে এবং প্রকৃতির ক্রিয়াবলীর বিরাট নিবৃত্তির মধ্যে। আবার এও সম্ভব যে সে মনের এই নীরবতাকে এবং নিম্ন প্রকৃতির সব অভ্যাস নিরোধ করার সামর্থ্যকে করবে এক মহত্তর রূপায়ণের, আমাদের সত্তার স্থিতি ও শক্তির এক পরতর পর্যায়ের আবিষ্কারের দিকে প্রথম সোপান এবং উত্তরণ ও রূপান্তরের দ্বারা যাবে চিৎপুরুষের অতিমানসিক শক্তির দিকে। আর, এমনকি সাধারণ মনকে সম্পূর্ণ শান্ত অবস্থাতে না এনেও সে অন্য উপায়ে এই কাজ করতে পারে, তবে আরো কষ্টের সঙ্গে, এই উপায় হল মানসিক শক্তি ও ক্রিয়াগুলিকে তাদের মহত্তর অনুরূপ অতিমানসিক শক্তি ও ক্রিয়াতে অবিচলভাবে ও উত্তরোত্তর রূপান্তরিত ক'রে। কারণ মনের সবকিছুই আসে অতিমানসস্থ কিছু থেকে, যা হল মানসিকতার মধ্যে তার সঙ্কীর্ণ, হীন, হাতড়ানো, আংশিক বা বিকৃত রূপান্তর। কিন্তু অন্য সাহায্য না নিয়ে, মনোময় পুরুষের নিজের একক শক্তিতে এই সব সাধনার কোনটিরই সফল সম্পাদন সম্ভব হয় না, এর জন্য প্রয়োজন দিব্য আত্মার, ঈশ্বরের, পুরুষোত্তমের সাহায্য, শক্তিপাত ও দেশনা। কারণ অতিমানস হল ভাগবত মানস আর অতিমানসিক লোকেই জীব পায় তার সঠিক অখণ্ড, জ্যোতির্ময় ও সুষ্ঠু সম্পর্ক পরম ও বিশ্বাত্মক পুরুষের সঙ্গে এবং পরমা ও বিশ্বাত্মিকা পরা প্রকৃতির সঙ্গে।

যতই মনের শুদ্ধতা, নিস্তব্ধতার সামর্থ্য অথবা তার নিজের সীমিত ক্রিয়াতে নিবিষ্টতা থেকে স্বাতন্ত্র্য বৃদ্ধি পেতে থাকে, ততই মন জানতে পারে আত্মার, পরম ও বিশ্বাত্মক চিৎপুরুষের চিন্ময় সান্নিধ্য আর পারে একে প্রতিফলিত করতে, নিজের মধ্যে আনতে অথবা তার মধ্যে প্রবেশ করতে; আবার এ চিৎপুরুষের এমন সব পর্যায় ও শক্তি জানতে পারে যেগুলি তার নিজের সর্বোচ্চ সব স্তরেরও উচ্চতর। এ জানতে পারে সত্তার চেতনার এক অনন্ত, অসীম চেতনার সকল সামর্থ্যের ও ক্রিয়াশক্তির এক অনন্ত মহাসমুদ্র, আনন্দের, অস্তিত্বের স্বয়ং-চালিত আনন্দের এক অনন্ত মহাসমুদ্র। সম্ভবতঃ এ এই সব বিষয়ের যে কোন একটিকে মাত্র জানে, কারণ উচ্চতর অনুভূতিতে যা "একমেব"-এর অচ্ছেদ্য শক্তিরাজি মনের ক্ষমতা আছে তাদের বিভক্ত করার এবং সুস্পষ্টভাবে ভিন্ন আদি তত্ত্ব হিসেবে অনুভব করার অথবা সম্ভবতঃ এ তাদের অনুভব করে এমন এক ত্রিত্ব বা সম্মিশনের মধ্যে যা তাদের একত্ব প্রকাশ করে বা পায়। হয়ত এ তাকে জানে পুরুষের দিকে অথবা প্রকৃতির দিকে। পুরুষের দিকে এ নিজেকে প্রকাশ করে আত্মা বা চিৎপুরুষরূপে, পুরুষরূপে অথবা একমাত্র অদ্বিতীয় সৎপুরুষ, দিব্য

পুরুষোত্তমরূপে, আর ব্যষ্টি জীবপুরুষ পারে তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একত্বে প্রবেশ করতে তার কালাতীত আত্মায় অথবা তার বিশ্বভাবে অথবা উপভোগ করতে পারে সামীপ্য, অন্তরধিষ্ঠান, পার্থক্যের ব্যবধানরহিত ভেদ, আবার একই সময় অচ্ছেদ্যভাবে সক্রিয় অনুভবকারী প্রকৃতিতে উপভোগ করতে পারে সত্তার একত্ব এবং সম্বন্ধের আনন্দদায়ক ভেদ। প্রকৃতির দিকে চিৎপুরুষের শক্তি ও আনন্দ সম্মুখে আসে এই অনন্তকে ব্যক্ত করতে বিশ্বের বিভিন্ন সত্তা, ও ব্যক্তিসত্ত্বের মধ্যে এবং বিভিন্ন ভাবনা ও রূপ ও শক্তির মধ্যে, আর তখন আমাদের কাছে উপস্থিত হন ভাগবতী মহাশক্তি, আদ্যাশক্তি, পরাপ্রকৃতি যিনি নিজের মধ্যে ধারণ করেন অনন্ত অস্তিত্ব এবং সৃষ্টি করেন বিশ্বের সকল বিস্ময়কর বস্তু। মন সচেতন হয়ে ওঠে মহাশক্তির এই অসীম মহাসমুদ্র সম্বন্ধে অথবা না হয় মনের অনেক উর্ধ্বে তাঁর উপস্থিতি সম্বন্ধে যিনি তাঁর নিজের কিছুটা আমাদের মধ্যে ঢেলে দিচ্ছেন আমরা যা সব হই, চিন্তা ও সঙ্কল্প করি, কার্য ও বোধ ও অনুভব করি, সে সব গঠন করার জন্য, অথবা মন জানতে পারে যে তিনি আমাদের চারিদিকে বিদ্যমান, আর আমাদের ব্যক্তিসত্ত্ব হল চিৎপুরুষের শক্তির মহাসমুদ্রের একটি তরঙ্গ, অথবা আমাদের মধ্যে তাঁর উপস্থিতি ও সেখানে তাঁর ক্রিয়া সম্বন্ধে মন সচেতন হয় আর জানে যে এই ক্রিয়া আমাদের প্রাকৃত অস্তিত্বের বর্তমান রূপের উপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু তার উৎপত্তি উর্ধ্ব থেকে আর এ আমাদের তুলছে পরতর আধ্যাত্মিক স্থিতির দিকে। মন ও তাঁর আনন্ত্যের দিকে উঠে তা স্পর্শ করতে পারে অথবা এর মধ্যে নিজেকে মগ্ন করতে পারে সমাধির তন্ময়তার মধ্যে অথবা নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারে তাঁর বিশ্বভাবের মধ্যে, আর তখন আমাদের ব্যষ্টিত্ব তিরোহিত হয়, আমাদের ক্রিয়ার কেন্দ্র তখন আর আমাদের মধ্যে থাকে না, এ হয় আমাদের দেহগত সব আত্মার বাইরে থাকে, না হয় কোথাও থাকে না; আমাদের মানসিক ক্রিয়াগুলিও তখন আর আমাদের নিজেদের নয়, তবে বিশ্বভাব থেকে এই মন, প্রাণ ও দেহের কাঠামোর মধ্যে আসে, নিজেদের কাজ ক'রে আমাদের উপর কোন ছাপ না রেখেই চলে যায়, আর আমাদের এই কাঠামোও তাঁর বিশ্বময় বিরাটত্বের মাঝে এক তুচ্ছ বিষয় মাত্র। কিন্তু পূর্ণযোগে যে সিদ্ধি চাওয়া হয় তা যে শুধু তাঁর শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক শক্তিতে তাঁর সঙ্গে এক হওয়া এবং তাঁর বিশ্বব্যাপী ক্রিয়ায় তাঁর সঙ্গে এক হওয়া তা নয়, তা হল এই মহাশক্তির পরিপূর্ণতাকে উপলব্ধি ও অধিগত করা আমাদের ব্যষ্টিসত্তায় ও প্রকৃতিতে। কারণ পরম চিৎপুরুষ পুরুষ হিসেবে অথবা প্রকৃতি হিসেবে, চিন্ময় সত্তা অথবা চিন্ময় সত্তার শক্তি হিসেবে এক এবং আত্মা ও চিৎপুরুষের স্বরূপে জীব পরমপুরুষের সঙ্গে এক, সেহেতু প্রকৃতির দিকে আত্মা ও চিৎপুরুষের শক্তিতে সে মহাশক্তির সঙ্গে এক, "পরাপ্রকৃতির্জীবভূতা"। এই দুই একত্ব উপলব্ধি করা অখণ্ড আত্মসিদ্ধির সর্ত। তাহলে জীব হল পরম পুরুষ ও প্রকৃতির একত্বের লীলার মিলনস্থল।

এই সিদ্ধি পেতে হলে আমাদের কর্তব্য হবে এই ভাগবতী শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, তাঁকে আমাদের কাছে আকর্ষণ করা এবং তাঁকে ভিতরে আহ্বান করা যেন তিনি

সমগ্র আধারকে পূর্ণ করেন এবং আমাদের সকল ক্রিয়ার ভার নেন। তখন আর এমন কোন পৃথক ব্যক্তিগত সঙ্কল্প বা ব্যষ্টিশক্তি থাকবে না যে আমাদের কাজ চালাতে চেষ্টা করবে, কর্তারূপী কোন ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত আত্মার বোধও থাকবে না, অথবা এ ত্রিগুণের নিম্নশক্তি, মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক প্রকৃতিও হবে না। ভাগবতী শক্তি আমাদের পূর্ণ করবেন এবং আমাদের সকল আন্তর ক্রিয়ার, আমাদের বাহ্য জীবনের, আমাদের যোগের অধিষ্ঠাত্রী হয়ে সে সবের ভার নেবেন। তিনি তাঁর নিজের নিম্ন গঠন এই মানসিক শক্তির ভার নিয়ে একে উত্তোলন করবেন তার বুদ্ধি ও সঙ্কল্প ও চৈত্য ক্রিয়ার সর্বোচ্চ ও শুদ্ধতম ও পূর্ণতম বিভিন্ন শক্তিতে। মন, প্রাণ ও দেহের যে সব যান্ত্রিক শক্তি এখন আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে, তিনি তাদের রূপান্তরিত করবেন তাঁর নিজের জীবন্ত ও চিন্ময় শক্তি ও উপস্থিতির বিভিন্ন আনন্দপূর্ণ অভিব্যক্তিতে। মন যে নানাবিধ আধ্যাত্মিক অনুভূতিলাভে সমর্থ তিনি সে সকলকে আমাদের মধ্যে ব্যক্ত করবেন এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করবেন। এবং এই প্রক্রিয়ার বিজয়মুকুট স্বরূপ তিনি অতিমানসিক আলোককে নামিয়ে আনবেন বিভিন্ন মানসিক স্তরের মধ্যে, মনের উপাদানকে পরিবর্তিত করবেন অতিমানসের উপাদানে, সকল নিম্ন শক্তিকে রূপান্তরিত করবেন তাঁর অতিমানসিক প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিতে এবং আমাদের উত্তোলন করবেন আমাদের বিজ্ঞানময় সত্তাতে। ভাগবতী শক্তি নিজেকে প্রকট করবেন পুরুষোত্তমের শক্তিরূপে, আর ঈশ্বরই নিজেকে ব্যক্ত করবেন তাঁর অতিমানস ও চিৎপুরুষের শক্তির মধ্যে এবং তিনিই হবেন আমাদের সত্তা, ক্রিয়া, জীবন ও যোগের অধীশ্বর।

সপ্তদশ অধ্যায়

ভাগবতী শক্তির ক্রিয়া

ভাগবতী শক্তির স্বরূপ এই যে এ ভগবানের সেই কালাতীত শক্তি যা নিজেকে ব্যক্ত করে কালের মধ্যে এক বিশ্বশক্তিরূপে যা বিশ্বের সকল গতি ও কর্মপ্রণালী সৃষ্টি, গঠন, রক্ষা ও চালনা করে। এই বিশ্বশক্তি আমাদের কাছে প্রথম প্রতীয়মান হয় অস্তিত্বের বিভিন্ন নিম্নস্তরে যেন এ এক মানসিক, প্রাণিক ও জড়ীয় বিশ্বশক্তি আর আমাদের সকল মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক ক্রিয়া এর কর্ম। এই সত্যকে সম্যক্‌ভাবে প্রণিধান করা আমাদের সাধনার পক্ষে প্রয়োজনীয়, তবেই যদি আমরা সমর্থ হই সঙ্কীর্ণতাজনক অহং-দৃষ্টির চাপ থেকে নিষ্কৃতি পেতে, এবং এমনকি এই সব নিম্নস্তরেও নিজেদের বিশ্বভাবাপন্ন করতে যেখানে সাধারণতঃ অহং রাজত্ব করে পূর্ণ শক্তিতে। আমরা যে ক্রিয়া উৎপন্ন করি না, বরং এই বিশ্বশক্তিই আমাদের মধ্যে ও অন্য সকলের মধ্যে কর্ম করে, আমি এবং অন্যেরা কর্তা নয়, বরং একমাত্র প্রকৃতিই কর্ত্রী — এই দেখা যেমন কর্মযোগের নিয়ম, তেমন এখানকারও সঠিক নিয়ম। অহং-বোধের কাজ হল সীমা টানা, বিভক্ত করা, তীব্রভাবে বিভেদ গড়া, ব্যষ্টিরূপকে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করা, আর এর থাকার কারণ এই যে এ নিম্ন জীবনের বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু যখন আমরা উচ্চতর দিব্য জীবনে উঠতে চাই তখন আমাদের কর্তব্য হবে অহং-এর শক্তিকে শিথিল করা এবং শেষ পর্যন্ত তা দূর করা; নিম্নজীবনের পক্ষে অহং-এর বিকাশ যেমন অপরিহার্য, তেমন উচ্চতর জীবনের জন্য অহং-বিলোপের এই বিপরীত সাধনাও অপরিহার্য। আমাদের সব ক্রিয়াকে আমাদের নিজেদের ক্রিয়া ব'লে না দেখে বরং যদি আমরা দেখি যে এই সব হল চিন্ময় সত্তার অবর স্তরের উপর অপরা প্রকৃতির রূপের মধ্যে কর্মরতা ভাগবতী শক্তিরই ক্রিয়া তাহলে তা এই পরিবর্তনের পক্ষে প্রভূত সহায় হবে। আর যদি আমরা তা করতে সমর্থ হই তাহলে অন্য সব সত্তার মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক চেতনা থেকে আমাদের মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক চেতনার পার্থক্য ক্ষীণ ও কম হয়; অবশ্য এর বিভিন্ন ক্রিয়ার সঙ্কীর্ণতা থেকে যায়, কিন্তু যেগুলি প্রসারিত ও উন্নীত হয় বিশ্ব ক্রিয়ার বিশাল বোধ ও দর্শনের মধ্যে; প্রকৃতির বিশেষক ও ব্যষ্টিত্বসূচক প্রভেদগুলি তাদের নিজেদের উদ্দেশ্যের জন্য থেকে যায়, কিন্তু এরা আর বন্দীশালা নয়। জীব অনুভব করে যে সকল ভেদের মধ্যেও তার মন, প্রাণ ও শারীরিক সত্তা অন্য সকলের সঙ্গে এক এবং প্রকৃতিগত চিৎপুরুষের সমগ্র শক্তির সঙ্গে এক।

কিন্তু এ এক মধ্যবর্তী পর্যায়, সমগ্র সিদ্ধি নয়। অস্তিত্ব যতই অপেক্ষাকৃত বিশাল ও মুক্ত হ'ক না কেন এ তবু অপরাপ্রকৃতির অধীন। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অহং কমে আসে কিন্তু লোপ পায় না; অথবা যদি মনে হয় যে এ চলে গেছে, তবু এ শুধু

আমাদের কাজের অংশে মগ্ন থাকে ত্রিগুণের বিশ্ব ক্রিয়ার মধ্যে, সেখানেই নিগূহিত থেকে তখনো কাজ করতে থাকে গুপ্ত, অবচেতনভাবে এবং যে কোন সময় এ জোর ক'রে সম্মুখে আসতে পারে। সুতরাং সাধকের প্রথম কর্তব্য হল এই সব ক্রিয়ার পশ্চাতে একমাত্র আত্মা বা চিৎপুরুষের ভাবনা রাখা এবং তার উপলব্ধি পাওয়া। প্রকৃতির পশ্চাতে যে একমাত্র পরম ও বিশ্বাত্মক পুরুষ আছেন তাঁকে তার জানা চাই। সবই যে একমাত্র শক্তির, প্রকৃতির আত্মরূপায়ণ — শুধু এটাই তার দেখা ও অনুভব করা হলে চলবে না, তার এও দেখা ও অনুভব করা দরকার যে তার সকল ক্রিয়া সর্বগত ভগবানেরই, সর্বগত একমাত্র পরম দেবতারই বিভিন্ন ক্রিয়া, তা এরা অহং এবং ত্রিগুণের মধ্য দিয়ে আসার দরুন যতই প্রচ্ছন্ন, পরিবর্তিত ও দেখতে বিকৃত হ'ক না কেন — কারণ বিকৃতির কারণ হল নিম্নরূপে পরিবর্তন। এই দেখা ও অনুভবের ফলে অহং-এর প্রকট বা প্রচ্ছন্ন দুরাগ্রহ আরো কমে আসে, আর যদি তা সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করা হয় তাহলে আরো উন্নতি ক্ষুণ্ণ বা বিঘ্নিত করতে পারে এরকমভাবে তার নিজেকে জাহির করা দুরূহ বা অসম্ভব হবে। যদি অহং-বোধ আদৌ হস্তক্ষেপ করে তাহলে সে অহং-বোধ হবে এক বিজাতীয় অবাঞ্ছিত আগন্তুক এবং চেতনা ও এর ক্রিয়ার প্রান্তদেশে সংলগ্ন পুরনো অজ্ঞানতা কুহেলিকার শেষভাগ মাত্র। আর, দ্বিতীয়তঃ বিশ্বশক্তিকে উপলব্ধি করা চাই, দেখা ও অনুভব ও ধারণ করা চাই তার উচ্চতর ক্রিয়া, তার অতিমানসিক ও আধ্যাত্মিক কার্যাবলীর শক্তিশালী শুদ্ধতা। মহাশক্তির সম্বন্ধে এই মহত্তর দর্শনের ফলে আমরা সব গুণের নিয়ন্ত্রণ থেকে নিষ্কৃতি পেতে সমর্থ হব আর সমর্থ হব সে সবকে পরিবর্তিত করতে তাদের দিব্য প্রতিরূপে এবং বাস করতে এমন এক চেতনায় যেখানে পুরুষ ও প্রকৃতি এক ও বিভক্ত নয় অথবা পরস্পরের মধ্যে বা পিছনে প্রচ্ছন্ন নয়। সেখানে শক্তি আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হবে তার প্রতি গতিতে এবং স্বাভাবিকভাবে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে অদম্যভাবে অনুভব করা হবে যে এটি ভগবানের সক্রিয় সান্নিধ্য পরমাত্মা ও চিৎপুরুষের শক্তির আকার ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

এই পরতর পাদে শক্তি নিজেকে প্রকট করে অনন্ত সৎ, চেতনা, সঙ্কল্প, আনন্দের উপস্থিতি বা যোগ্যতা ব'লে, আর যখন একে এইরকম ভাবে দেখা ও অনুভব করা হয়, তখন সত্তা এর দিকে ফেরে তা যে কোন ভাবেই হ'ক — তার আরাধনা নিয়ে, অথবা আস্পৃহার সঙ্কল্প নিয়ে অথবা মহতের প্রতি ক্ষুদ্রের একরকম আকর্ষণ নিয়ে যাতে একে জানা যায়, এর দ্বারা পূর্ণ ও অধিগত হওয়া যায়, এর সঙ্গে এক হওয়া যায় সমগ্র প্রকৃতির বোধে ও ক্রিয়ায়। কিন্তু প্রথমে যখন আমরা তখনো মনের মধ্যে থাকি, তখন বিভাজনের এক ব্যবধান, আর না হয় দুই রকমের ক্রিয়া থেকে যায়। আমাদের মধ্যে মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক শক্তি ও বিশ্বকে অনুভব করা হয় যে এ হল পরমাশক্তি থেকে উৎপন্ন এবং সেই সঙ্গে এক অবর, বিভক্ত এবং কোন অর্থে ভিন্ন ক্রিয়া। প্রকৃত আধ্যাত্মিক শক্তি আমাদের ঊর্ধ্ব থেকে বিভিন্ন নিম্ন স্তরে তার বার্তা অথবা তার উপস্থিতির আলোক ও শক্তি নীচে পাঠাতে পারে, অথবা মাঝে মাঝে অবতরণ ক'রে

এমনকি কিছু সময়ের জন্য অধিকার করতেও পারে, কিন্তু তখন এ অবর ক্রিয়াবলীর সঙ্গে মিশ্রিত হয় এবং তাদের আংশিকভাবে রূপান্তরিত ও আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন করে কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় নিজেই ক্ষীণ ও পরিবর্তিত হয়। প্রকৃতিতে দেখা যায় এক সবিরাম উচ্চতর ক্রিয়া বা দ্বৈতকর্ম। অথবা আমরা দেখি যে শক্তি কিছু সময়ের জন্য সত্তাকে উচ্চতর আধ্যাত্মিক লোকে তোলে এবং তারপর ফিরে নামিয়ে আনে নিম্নস্তরের মধ্যে। মনে করতে হবে যে এই সব আসা-যাওয়া, ওঠা-নামা হল স্বাভাবিক সত্তা থেকে আধ্যাত্মিক সত্তায় রূপান্তরের ধারার স্বাভাবিক অনুক্রম। পূর্ণযোগের পক্ষে রূপান্তর সিদ্ধি পূর্ণ হতে পারে না যতক্ষণ না মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার মধ্যে যোগসূত্র .ঠিত হয় এবং উচ্চতর জ্ঞান প্রয়োগ করা হয় আমাদের অস্তিত্বের সকল ক্রিয়ায়। ঐ যোগসূত্র হল অতিমানসিক বা বিজ্ঞানময় ক্রিয়াশক্তি যার মধ্যে পরম সত্তা, চেতনা, আনন্দের অপরিমেয় অনন্তশক্তি নিজেকে রূপায়িত করে সত্তার মধ্যে এক ব্যবস্থাপক দিব্য সঙ্কল্প ও প্রজ্ঞারূপে, এক আলোক ও শক্তিরূপে আর এটিই সকল মনন, সঙ্কল্প, বেদনা, ক্রিয়া গঠিত করে এবং অনুরূপ সব ব্যষ্টি গতিবৃত্তি সরিয়ে তাদের স্থান নেয়।

এই অতিমানসিক শক্তি নিজেকে স্বয়ং মনের মধ্যেই গঠিত করতে পারে এক আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন বোধিত আলোক ও শক্তি হিসেবে, আর তা এক বড় আধ্যাত্মিক ক্রিয়া, কিন্তু তখনো এ মানসিকভাবে সীমিত। অথবা এ মনকে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত ক'রে সমগ্র সত্তাকে তুলতে পারে অতিমানসিক স্তরে। যাই হ'ক না কেন, যোগের এই অংশের প্রথম কর্তব্য হল কর্তার অহং, অহং-ভাবনা ত্যাগ করা আর এই বোধও ত্যাগ করা যে আমাদের নিজেদের কর্মের শক্তি, ও কর্মের প্রবর্তনা ও কর্মফলের উপর নিয়ন্ত্রণ আছে; আরো কর্তব্য একে নিমজ্জিত করা বিশ্বশক্তির বোধে ও দর্শনে যা নিজের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য উৎপাদন, গঠন, পরিবর্তন করছে আমাদের নিজেদের ও অপর সকলের ও জগতের সকল ব্যক্তির ও শক্তির ক্রিয়া। আর এই উপলব্ধি আমাদের সত্তার সকল অংশে একান্ত ও সম্পূর্ণ হতে পারে, একমাত্র যদি আমরা এর বোধ ও দর্শন পাই এর সকল রূপের মধ্যে, আমাদের সত্তার ও জগৎসত্তার সকল স্তরে যেন এটাই ভগবানের জড়ীয়, প্রাণিক, মানসিক ও অতিমানসিক ক্রিয়াশক্তি, কিন্তু এই সবকে, সকল স্তরের সকল শক্তিকে দেখা ও জানা চাই সত্তায়, চেতনায়, আনন্দে অনন্ত যে একমাত্র আধ্যাত্মিক শক্তি তার আত্মবিভাবনা রূপে। এমন কোন অলঙ্ঘনীয় নিয়ম নেই যে এই শক্তি প্রথমে নিম্ন স্তরে ক্রিয়াশক্তির নিম্নরূপের মধ্যে নিজেকে ব্যক্ত করবে এবং তারপর তার উচ্চতর আধ্যাত্মিক প্রকৃতি প্রকাশ করবে। আর এ ভাবেই যদি সে আসে অর্থাৎ প্রথম আসে তার মানসিক, প্রাণিক বা শারীরিক বিশ্বরূপে, আমাদের সতর্ক হতে হবে যেন আমরা সেখানেই থেমে না যাই। আবার তা না এসে এ একেবারে আসতে পারে তার উচ্চতর বাস্তবতায়, আধ্যাত্মিক জ্যোতির তেজে মণ্ডিত হয়ে। তখন মুস্কিল হবে যে যতদিন না এই শক্তি সত্তার নিম্নতর স্তরের ক্রিয়াশক্তিগুলিকে তার তেজঃপূর্ণ স্পর্শ দিয়ে রূপান্তরিত করে, ততদিন তাকে সহ্য ও ধারণ করা কষ্টকর। এই কষ্ট ততই কম হবে

যতই আমরা বিশাল শান্তি ও সমতা লাভ করতে সমর্থ হই, আর সমর্থ হই সর্বগত একমাত্র শান্ত অক্ষর আত্মাকে উপলব্ধি করতে, অনুভব করতে আর তার মধ্যে বাস করতে, অথবা না হয় সমর্থ হই যোগের দিব্য অধীশ্বরের নিকট নিজেদের অকৃত্রিম ও সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করতে।

ভগবানের যে তিনটি শক্তি সকল প্রাণীর মধ্যে বিদ্যমান ও যাদের সম্বন্ধে আমাদের বিবেচনা দরকার এখানে তাদের সর্বদা মনে রাখা প্রয়োজন। আমাদের সাধারণ চেতনায় আমরা এই তিনটিকে নিজ ব'লে দেখি — অহংরূপে জীব, ভগবান, তা ভগবান সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যাই হ'ক না কেন, এবং প্রকৃতি। আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে আমরা ভগবানকে দেখি পরম আত্মা বা চিৎপুরুষরূপে অথবা পুরুষরূপে যাঁর থেকে আমাদের উৎপত্তি এবং যাঁর মধ্যে আমরা বাস ও বিচরণ করি। প্রকৃতিকে আমরা দেখি যে এ তাঁর শক্তি অথবা এ হল শক্তিরূপে ভগবান, এমন এক চিৎপুরুষ যিনি তাঁর শক্তিতে আমাদের মধ্যে ও জগতের মধ্যে সক্রিয়। তখন জীব স্বয়ং এই আত্মা, চিৎপুরুষ, ভগবান, "সোঽহম্," কারণ সে তার সত্তার ও চেতনার স্বরূপে তাঁর সঙ্গে এক, কিন্তু ব্যষ্টি হিসেবে সে ভগবানের এক অংশ মাত্র, চিৎপুরুষের এক আত্মা, আর তার প্রাকৃত সত্তায় সে মহাশক্তির এক রূপ, গতি ও ক্রিয়ার মধ্যে ভগবানের শক্তি, "পরাপ্রকৃতির্জীবভূতা"। প্রথমে, যখন আমরা ভগবান বা শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হই, তখন তাঁদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের যে অসুবিধাগুলি তার উৎস হল অহং-চেতনা যা আমরা আনি আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের মধ্যে। আমাদের মধ্যে অহং ভগবানের উপর আধ্যাত্মিক দাবী ছাড়া অন্য দাবী করে, আর এক অর্থে এই সব দাবী সঙ্গত, কিন্তু যতদিন ও যে অনুপাতে এই সব দাবী অহমাত্মক রূপ নেয়, ততদিন ও সেই অনুপাতে তাদের অত্যধিক স্থূলতা ও বিভিন্ন বৃহৎ বিকৃতির অধীন হবার সম্ভাবনা থাকে, আর তারা মিথ্যা, অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া এবং তা থেকে আসা অশুভ উপাদানে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে; সম্বন্ধ সম্পূর্ণ সঠিক, সুখময় ও সুষ্ঠু হতে পারে একমাত্র যখন এই দাবীগুলি আধ্যাত্মিক দাবীর অন্তর্গত হয় এবং তাদের অহমাত্মক রূপ ত্যাগ করে। আর, বস্তুতঃ ভগবানের উপর আমাদের সত্তার দাবী একান্তভাবে চরিতার্থ হয় কেবল তখনই যখন এ আর আদৌ দাবী থাকে না, বরং হয়ে ওঠে জীবের মধ্য দিয়ে ভগবানের চরিতার্থতা, যখন আমরা শুধু তাতেই সন্তুষ্ট থাকি আর সন্তুষ্ট থাকি সত্তায় একত্বের আনন্দে এবং নিশ্চিন্ত হই পরমাত্মা ও অস্তিত্বের অধীশ্বরের নিকট সব ছেড়ে দিয়ে যেন তিনি আমাদের উত্তরোত্তর সিদ্ধ প্রকৃতির মাধ্যমে তাঁর একান্ত প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের সঙ্কল্প সাধন করেন। এই হল ভগবানের নিকট ব্যষ্টি আত্মার আত্মসমর্পণের অর্থ। তা থেকে একত্বের আনন্দের জন্য সঙ্কল্প বাদ পড়ে না, আমাদের মধ্যে দিব্য চরিতার্থতার তৃপ্তির জন্য দিব্য চেতনায়, প্রজ্ঞায়, জ্ঞানে, আলোকে, শক্তিতে, পূর্ণতায় অংশগ্রহণের সঙ্কল্পও বাদ পড়ে না, কিন্তু সঙ্কল্প, আস্পৃহা আমাদের, এই কারণে যে এ হল আমাদের মধ্যে তাঁরই সঙ্কল্প। প্রথমে, যতদিন আমাদের নিজেদের ব্যক্তিসত্বের উপর কিছু আগ্রহ থাকে, ততদিন এ শুধু তা প্রতিফলিত করে, কিন্তু উত্তরোত্তর দুয়ের

মধ্যে ভেদের লক্ষণ দৃঢ় হয়, আমাদের সঙ্কল্প কম ব্যক্তিগত হয় এবং পরিশেষে পার্থক্যের লেশমাত্র থাকে না, কারণ আমাদের মধ্যস্থ সঙ্কল্প অভিন্ন হয়ে উঠেছে দিব্য তপসের সঙ্গে, ভাগবতী শক্তির ক্রিয়ার সঙ্গে।

আর, ঠিক সেই রকম যখন আমরা আমাদের ঊর্ধ্বে, অথবা আমাদের চারিদিকে বা মধ্যে অনন্ত শক্তি সম্বন্ধে প্রথম অবগত হই, তখন আমাদের মধ্যকার অহমাত্মক বোধের টান হল একে আয়ত্ত ক'রে এই প্রভূত তেজকে ব্যবহার করা আমাদের অহমাত্মক উদ্দেশ্যের জন্য। এ হল এক অতীব বিপজ্জনক বস্তু, কারণ এ সঙ্গে নিয়ে আসে এক বিপুল, কখনো কখনো দানবীয় শক্তির অনুভব ও এর কিছু অধিক বাস্তবতা, আর রাজসিক অহং এক নতুন বিপুল ক্ষমতার বোধে আনন্দিত হয়ে শুদ্ধ ও রূপান্তরিত হবার জন্য অপেক্ষা না করে বরং নিজেকে বাইরে নিক্ষেপ করে প্রচণ্ড ও অশুদ্ধ ক্রিয়ার মধ্যে আর এমনকি কিছু সময়ের জন্য অথবা আংশিকভাবে আমাদের পরিণত করতে পারে স্বার্থপর ও উদ্ধত অসুরে যে তাকে দেওয়া ক্ষমতাকে ব্যবহার করবে তার নিজের উদ্দেশ্যের জন্য, দিব্য উদ্দেশ্যের জন্য নয়: কিন্তু এই পথে চলতে থাকার পরিণতি হল আধ্যাত্মিক বিনষ্টি ও ঐহিক ধ্বংস। আর এমনকি নিজেকে ভগবানের যন্ত্র মনে করাও পূর্ণ প্রতিকার নয়; কারণ যখন প্রবল অহং এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে, এ আধ্যাত্মিক সম্বন্ধকে মিথ্যা রূপ দেয় এবং নিজেকে ভগবানের যন্ত্র করার আড়ালে বস্তুতঃ ব্রতী হয় বরং ভগবানকে তার যন্ত্র করতে। একমাত্র প্রতিকার হল যেকোন প্রকারের হ'ক সকল অহমাত্মক দাবীকেই নিস্তব্ধ করা, সাত্ত্বিক অহং-ও যে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও পৃথক আয়াস ত্যাগ করতে সক্ষম হয় না তা ক্রমাগত কমিয়ে আনা, আর মহাশক্তিকে আয়ত্ত না ক'রে ও তাঁকে নিজের উদ্দেশ্যের জন্য ব্যবহার না ক'রে বরং মহাশক্তিকেই বলা যে তিনি যেন আমাদের আয়ত্ত ক'রে ব্যবহার করেন দিব্য উদ্দেশ্যের জন্য। এই কাজ অবিলম্বেই সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন করা যায় না, তাছাড়া এ নিরাপদভাবে করাও যায় না যদি এমন হয় যে আমরা যে বিশ্বশক্তিকে জানি তা শুধু নিম্নপ্রকারের, কারণ তখন, যেমন পূর্বে বলা হয়েছে অন্য এক নিয়ন্ত্রণ দরকার, — তা সে মনোময় পুরুষের হ'ক অথবা ঊর্ধ্ব থেকে আসা নিয়ন্ত্রণ হ'ক, কিন্তু তবু এই লক্ষ্যই আমাদের সম্মুখে রাখা উচিত আর এ সম্পূর্ণভাবে নিষ্পন্ন করা যায় যখন আমরা ভাগবতী শক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক উপস্থিতি ও রূপ সম্বন্ধে দুর্বারভাবে অবগত হই। মহাশক্তির নিকট ব্যষ্টি আত্মার সমগ্র ক্রিয়ার এই সমর্পণও বস্তুতঃ ভগবানের নিকট প্রকৃত আত্মসমর্পণের এক রূপ।

দেখা গেছে যে শুদ্ধির এক অতি কার্যকরী উপায় হল মনোময় পুরুষ যেন নিষ্ক্রিয় সাক্ষীরূপে পিছিয়ে আসে, দাঁড়িয়ে থাকে, আর দেখে এবং নিজেকে ও প্রকৃতির ক্রিয়াকে জানে, নিম্ন অর্থাৎ সাধারণ সত্তার মধ্যে; কিন্তু সিদ্ধির জন্য এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া চাই শুদ্ধ প্রকৃতিকে উচ্চতর আধ্যাত্মিক সত্তায় উত্তোলনের সঙ্কল্প। যখন তা করা হয় তখন পুরুষ আর শুধু সাক্ষী থাকে না, সে তখন প্রকৃতির ঈশ্বরও হয়। প্রথমে হয়ত এটি স্পষ্ট হয় না কেমন করে এই সক্রিয় আত্মপ্রভুত্বের আদর্শ এবং আত্মসমর্পণের ও ভাগবতী

শক্তির ইচ্ছুক যন্ত্র হওয়ার আপাত বিপরীত আদর্শ পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিকলোকে সেরকম কোন সমস্যা নেই। জীব বস্তুতঃ ঈশ্বর হতে পারে না যদি না সে সেই পরিমাণে তার পরমাত্মা ভগবানের সঙ্গে একত্ব লাভ করে। আর ঐ একত্বের মাঝে এবং বিশ্বের সঙ্গে তার ঐক্যের মাঝে সে বিশ্বাত্মার মধ্যে সেই সঙ্কল্পের সঙ্গেও এক যা প্রকৃতির সকল ক্রিয়াধারা চালনা করে। কিন্তু আরো বেশী প্রত্যক্ষভাবে ও কম বিশ্বাতীতভাবে সে তার ব্যষ্টিগত ক্রিয়াতেও ভগবানের অংশ এবং নিজের প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব বিষয়ে তার অংশভাক্ হয় যার নিকট সে নিজেকে সমর্পণ করেছে। এমনকি যন্ত্র হিসেবেও সে যান্ত্রিক যন্ত্র নয়, সে এক সচেতন যন্ত্র। তার পুরুষের দিকে সে ভগবানের সঙ্গে এক এবং ঈশ্বরের দিব্য কর্তৃত্বে অংশ গ্রহণ করে। তার প্রকৃতির দিকে সে তার বিশ্বভাবে ভগবানের শক্তির সঙ্গে এক, আর তার ব্যষ্টি প্রাকৃত সত্তায় সে বিশ্বময়ী ভাগবতী শক্তির এক যন্ত্র, কারণ ব্যষ্টিভাবাপন্ন শক্তির কাজ হল বিশ্বশক্তির উদ্দেশ্য পূর্ণ করা। যেমন আগেই দেখা গেছে জীব হল ভগবানের দুই দিকের, প্রকৃতির ও পুরুষের লীলার মিলনস্থল, এবং পরতর আধ্যাত্মিক চেতনায় সে একই সাথে দুইটি দিকেরই সঙ্গে এক হয়, এবং সেখানে সে তাদের পরস্পরের ক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্ট সকল দিব্য সম্বন্ধই নিয়ে যুক্ত করে। এইজন্যই ঐ দুই স্থিতি সম্ভব হয়।

অবশ্য মনোময় পুরুষের নিষ্ক্রিয়তার মধ্য দিয়ে না গিয়েও এই ফল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, আর তার উপায় হল এক আরো দৃঢ় ও প্রধানতঃ গতিসম্পন্ন যোগ। আর না হয় এই দুই প্রক্রিয়াকেই যুক্ত করা যায়, একবার একটিকে এবং পরে অন্যটিকে — এইভাবে পরিবর্তন ক'রে ও শেষে মিশিয়ে দিয়ে। আর এই ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার সমস্যা আরো সরল রূপ ধারণ করে। এই গতিসম্পন্ন সাধনার তিনটি পর্যায়। প্রথম পর্যায়ে জীব পরমাশক্তির কথা জানতে পারে, শক্তিকে নিজের মধ্যে নেয় এবং একে ব্যবহার করে তার নির্দেশ অনুযায়ী, কিছু বোধ থাকে যে সে অধীন কর্তা, এই বোধও থাকে যে কর্মে তার দায়িত্ব কম — এমনকি প্রথমে সে দায়িত্ব সম্ভবতঃ ফলের জন্য; কিন্তু এ চলে যায় কারণ দেখা যায় যে ফল নির্ধারিত হচ্ছে পরতরা শক্তির দ্বারা, শুধু কর্ম সম্বন্ধে অনুভব করা হয় যে এ অংশতঃ তার নিজের। তখন সাধক অনুভব করে যে সেই চিন্তা করছে, ইচ্ছা করছে, কর্ম করছে কিন্তু এও অনুভব করে যে পশ্চাতের ভাগবতী শক্তি বা প্রকৃতি তার সকল চিন্তা, ইচ্ছা, অনুভব ও ক্রিয়া চালনা ও গঠন করছেন: ব্যষ্টি ক্রিয়াশক্তি এক প্রকার তার অধিকারভুক্ত, কিন্তু তবু এ হল বিশ্ব ভাগবতী ক্রিয়াশক্তির এক রূপ ও যন্ত্র মাত্র। মহাশক্তির ক্রিয়ার দ্বারা শক্তির অধীশ্বর কিছু সময়ের জন্য তার কাছ থেকে প্রচ্ছন্ন থাকতে পারেন, অথবা ঈশ্বর যে তার কাছে কখন কখন বা অনবরত ব্যক্ত হচ্ছেন তা সে জানতে পারে। শেষের ক্ষেত্রে তার চেতনায় তিনটি বিষয় উপস্থিত থাকে, — নিজে ঈশ্বরের সেবক, পশ্চাতের মহাশক্তি এক প্রবল সামর্থ্য হিসেবে ক্রিয়াশক্তি সরবরাহ করেন, ক্রিয়া গঠন করেন ও সব পরিণাম রচনা করেন, আর ঊর্ধ্বস্থিত ঈশ্বর তাঁর সঙ্কল্প দ্বারা সমগ্র কর্ম নির্ধারণ করেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যষ্টি কর্তা অন্তর্হিত হয়, কিন্তু সেজন্য যে নিবৃত্তিমূলক নিষ্ক্রিয়তা আসেই তা নয়; এক পূর্ণ গতিসম্পন্ন কর্ম থাকতে পারে, শুধু সবকিছুই করেন মহাশক্তি। তাঁর জ্ঞানের শক্তিই মনে আকার নেয় মনন রূপে; সাধকের এ বোধ থাকে না যে সে চিন্তা করছে, তার বোধ থাকে যে মহাশক্তি তার মাঝে চিন্তা করছেন। সঙ্কল্প, বিভিন্ন অনুভব ও কর্মও সেই মহাশক্তির গঠন, ক্রিয়াধারা ও কার্য ছাড়া অন্য কিছু নয়, আর তা হয় তাঁর অব্যবহিত উপস্থিতিতে এবং সমগ্র আধারকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার ক'রে। সাধক চিন্তা করে না, সঙ্কল্প করে না, কর্ম করে না, অনুভব করে না, তবে চিন্তা, সঙ্কল্প, অনুভব, কর্ম তার আধারে ঘটে। ক্রিয়ার দিকে জীব বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একত্বে তিরোহিত হয়েছে, সে হয়ে উঠেছে ভাগবতী শক্তির এক ব্যষ্টিভাবাপন্ন রূপ ও ক্রিয়া। সে তখনো তার ব্যক্তিগত অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন কিন্তু তা পুরুষ হিসেবে যে সমগ্র ক্রিয়ার ধারক ও দ্রষ্টা, তার আত্মজ্ঞানে এর সম্বন্ধে সচেতন, এবং নিজের অংশগ্রহণের দ্বারা ভাগবতী শক্তিকে সমর্থ করে তার মধ্যে ঈশ্বরের বিভিন্ন কর্ম ও সঙ্কল্প সাধন করতে। শক্তির অধীশ্বর তখন কখনো কখনো প্রচ্ছন্ন থাকেন শক্তির ক্রিয়ার দ্বারা, কখনো কখনো আবির্ভূত হন, একে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং এর বিভিন্ন কর্মধারা প্রবর্তন করেন। এক্ষেত্রেও তিনটি বিষয় চেতনায় উপস্থিত থাকে — মহাশক্তি যিনি ঈশ্বরের জন্য সকল জ্ঞান, মনন, সঙ্কল্প, অনুভব, ক্রিয়া চালনা করেন করণাত্মক মানবীয় রূপে, ঈশ্বর, অস্তিত্বের অধীশ্বর যিনি মহাশক্তির সকল ক্রিয়া শাসন ও প্রবর্তন করেন, আর মহাশক্তির ব্যষ্টি ক্রিয়ার আত্মা, পুরুষ হিসেবে আমরা নিজেরা উপভোগ করি মহাশক্তির দ্বারা সৃষ্ট ঈশ্বরের সঙ্গে সকলপ্রকার সম্পর্ক। এই উপলব্ধির অন্য একটি রূপ আছে — জীব মহাশক্তির মধ্যে বিলীন হয়ে তাঁর সঙ্গে এক হয় আর তখন থাকে শুধু ঈশ্বরের সঙ্গে মহাশক্তির লীলা, মহাদেব ও কালীর, কৃষ্ণ ও রাধার, দেব ও দেবীর লীলা। জীব নিজে যে প্রকৃতির অভিব্যক্তি, ভগবানের সত্তার শক্তি, "পরাপ্রকৃতির্জীবভূতা" — এই উপলব্ধির সম্ভবপর তীব্রতম রূপ হল এই।

তৃতীয় পর্যায় আসে যখন ভগবানের, ঈশ্বরের উত্তরোত্তর অভিব্যক্তি হয় আমাদের সকল সত্তায় ও ক্রিয়ায়। তা ঘটে যখন আমরা সর্বদাই ও অনবরত তাঁর সম্বন্ধে সচেতন থাকি। অনুভব করা হয় যে আমাদের মধ্যে তিনি আমাদের সত্তার অধিকারী এবং আমাদের ঊর্ধ্বে তিনি এর সকল কর্মধারার শাস্তা, আর আমাদের কাছে এই সব হয়ে ওঠে শুধু জীবের অস্তিত্বের মধ্যে তাঁর অভিব্যক্তি, তাছাড়া অন্য কিছু নয়। আমাদের সকল চেতনা তাঁর চেতনা, আমাদের সকল জ্ঞান তাঁর জ্ঞান, আমাদের সকল ভাবনা তাঁর ভাবনা, আমাদের সকল সঙ্কল্প তাঁর সঙ্কল্প, আমাদের সকল বেদনা (feeling) তাঁর আনন্দ ও সত্তার মধ্যে তাঁর আনন্দের রূপ, আমাদের সকল ক্রিয়া তাঁর ক্রিয়া। মহাশক্তি ও ঈশ্বরের মধ্যে পার্থক্য অন্তর্হিত হতে শুরু করে; থাকে শুধু আমাদের মধ্যে ভগবানের সচেতন ক্রিয়া আর থাকে এর পশ্চাতে ও ঊর্ধ্বে ও একে অধিকার ক'রে ভগবানের মহান্ আত্মা; সকল জগৎ ও প্রকৃতিকে দেখা হয় শুধু তা-ই ব'লে, কিন্তু এক্ষেত্রে এ

পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠেছে, অহং-এর মায়া দূর হয়েছে, আর জীব আছে শুধু তার সত্তার সনাতন অংশ রূপে, "অংশ সনাতন" যাকে প্রকট করা হয়েছে দিব্য ব্যষ্টিভাবাপন্নতার ও জীবনযাত্রার আশ্রয় হবার জন্য; এরা এখন সার্থক হয়েছে ভগবানের সম্পূর্ণ উপস্থিতি ও শক্তির মধ্যে, সত্তার মধ্যে অভিব্যক্ত পরম চিৎপুরুষের সম্পূর্ণ আনন্দের মধ্যে। এই হল সক্রিয় একত্বের সিদ্ধি ও আনন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ উপলব্ধি; কারণ এর উজানে থাকতে পারে শুধু অবতারের চেতনা অর্থাৎ স্বয়ং ঈশ্বরের চেতনা যিনি মানুষী নাম ও রূপ ধারণ করেন লীলার মধ্যে ক্রিয়ার জন্য।

অষ্টাদশ অধ্যায়

শ্রদ্ধা ও শক্তি

আমাদের করণগত প্রকৃতির সিদ্ধির যে তিন অংশের সাধারণ লক্ষণগুলি আমরা এ পর্যন্ত আলোচনা করেছি অর্থাৎ বুদ্ধি, হৃদয়, প্রাণিক চেতনা ও দেহের সিদ্ধি, মৌলিক জীবাত্মশক্তির সিদ্ধি, ভাগবতী শক্তির নিকট আমাদের বিভিন্ন করণ ও ক্রিয়ার সমর্পণের সিদ্ধি সেই তিন অংশ তাদের অগ্রসরতার প্রতি মুহূর্তে নির্ভর করে একটি চতুর্থ শক্তির উপর যা প্রচ্ছন্ন ও প্রকট ভাবে সকল প্রয়াস ও ক্রিয়ার কীলককেন্দ্র; এই শক্তি হল শ্রদ্ধা। পূর্ণ শ্রদ্ধা হল সমগ্র সত্তা যে সত্য দেখেছে বা যা তাকে স্বীকৃতির জন্য দেওয়া হয়েছে তাতে তার সম্মতি, আর এর কেন্দ্রীয় ক্রিয়া হল থাকা ও পাওয়া ও পরিণত হওয়া সম্বন্ধে নিজের সঙ্কল্পে এবং আত্মা ও বিষয়সমূহ এবং এর জ্ঞান সম্বন্ধে এর ভাবনায় অন্তঃপুরুষের শ্রদ্ধা; এই শ্রদ্ধার বাহ্য রূপ হল ধীশক্তির বিশ্বাস, হৃদয়ের সম্মতি এবং অধিকার ও বাস্তবায়িত করার জন্য প্রাণমানসের কামনা। যে কোন রূপেই হ'ক অন্তঃপুরুষের এই শ্রদ্ধা সত্তার ক্রিয়ার পক্ষে অপরিহার্য আর এর অভাবে মানুষ জীবনে এক পা-ও চলতে পারে না, এখনো অপ্রাপ্ত সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হবার জন্য কোন পদক্ষেপ করা তো দূরের কথা। এ হল এমন এক কেন্দ্রীয় ও অত্যাবশ্যক বিষয় যে গীতার এই কথা বলা ন্যায়সঙ্গত যে মানুষের যা শ্রদ্ধা সে তা-ই, "যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ" আর এর সঙ্গে আরো বলা যায় যে, নিজের ভিতর যে-বিষয় সম্ভবপর দেখায় ও তার জন্য চেষ্টা করায় তার শ্রদ্ধা আছে, তা-ই সে সৃষ্টি করতে ও হয়ে উঠতে সক্ষম। একপ্রকার শ্রদ্ধা আছে যা পূর্ণযোগের পক্ষে অপরিহার্য বলে চাওয়া হয়, আর একে বলা যায় ভগবানে ও মহাশক্তিতে শ্রদ্ধা, আমাদের মধ্যে ও জগতের মধ্যে ভগবানের উপস্থিতিতে ও সামর্থ্যে শ্রদ্ধা, এই শ্রদ্ধা যে জগতের মধ্যে সবকিছুই একমাত্র ভাগবতী শক্তির ক্রিয়া আর যোগের সকল পদক্ষেপ, যেমন এর বিভিন্ন সফলতা ও তৃপ্তি ও বিজয় তেমন এর বিভিন্ন প্রচেষ্টা ও কষ্টভোগ ও বিফলতা তাঁর কর্মপ্রণালীর পক্ষে হিতকর ও আবশ্যক, আর ভগবানের উপর ও আমাদের মধ্যে অবস্থিত তাঁর মহাশক্তির উপর দৃঢ় ও প্রবল নির্ভরতার দ্বারা এবং তাঁদের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের দ্বারা আমরা পেতে পারি একত্ব ও মুক্তি এবং বিজয় ও সিদ্ধি।

শ্রদ্ধার শত্রু হল সংশয়, তবু সংশয়েরও উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা আছে, কারণ মানুষের অজ্ঞানতার মধ্যে এবং জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হবার জন্য তার উত্তরোত্তর প্রয়াসের মধ্যে তার পক্ষে মাঝে মাঝে সংশয়ের আক্রমণ আসা প্রয়োজনীয়, কারণ তা না হলে সে অজ্ঞানময় বিশ্বাস ও সীমিত জ্ঞানের মধ্যেই দৃঢ়বদ্ধ হয়ে থাকবে, আর তার বিভিন্ন প্রমাদ থেকে নিষ্কৃতি পাবার ক্ষমতা থাকবে না। যখন আমরা যোগের পথে আসি

তখনও সংশয়ের এই উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা একেবারে লোপ পায় না। পূর্ণযোগের লক্ষ্য জ্ঞান, তবে এ জ্ঞান শুধু কোন মৌলিক তত্ত্বের জ্ঞান নয়, বরং এমন এক জানা, এমন এক বিজ্ঞান যা সমগ্র জীবন ও জগৎক্রিয়ায় প্রযুক্ত ও প্রসারিত হবে, আর এই জ্ঞানান্বেষণে আমরা যে পথে যাই তাতে বহুদূর পর্যন্ত থাকে মনের এমন সব অসংস্কৃত কার্য যেগুলি তখনো কোন মহত্তর আলোকের দ্বারা শুদ্ধ ও রূপান্তরিত হয়নি: আমাদের এমন অনেক বুদ্ধিগত বিশ্বাস ও ভাবনা থাকে যাদের সবগুলি কখনই সঠিক ও সুষ্ঠু নয়, আর পরে এমন অনেক নতুন ভাবনা ও ইঙ্গিত আমাদের দেখা দেয় যেগুলি আমাদের বিশ্বাস দাবী করে অথচ তাদের সম্ভবপর প্রমাদ, সঙ্কীর্ণতা বা অপূর্ণতা লক্ষ্য না ক'রে তারা যে আকারে আসে সেই আকারে তাদের গ্রহণ করা ও সর্বদা আঁকড়ে থাকা মৃত্যুর সামিল। আর বস্তুতঃ যোগে এমন এক অবস্থা আসে যখন বুদ্ধিগত কোন ভাবনা বা মতকেই তার বুদ্ধিগত রূপে গ্রহণ করতে অস্বীকার করা প্রয়োজনীয় হয় এবং তখন দরকার হয় তাকে সন্দেহ ক'রে ঝুলিয়ে রাখা যতদিন না অতিমানসিক জ্ঞানের দ্বারা আলোকিত কোন আধ্যাত্মিক সত্যের মধ্যে একে তার সঠিক স্থান ও সত্যের জ্যোতির্ময় আকার দেওয়া হয়। আর এরকম করা আরো প্রয়োজনীয় হয় প্রাণমানসের বিভিন্ন কামনা ও প্রচোদনা সম্বন্ধে যেগুলিকে প্রায়ই অস্থায়ীভাবে গ্রহণ করতে হয় পূর্ণ দেশনা পাবার আগে সাময়িকভাবে প্রয়োজনীয় ক্রিয়ার অব্যবহিত চিহ্নরূপে তবে যেগুলিকে আমরা অন্তঃপুরুষের সম্পূর্ণ সম্মতিসমেত সবসময় আঁকড়ে থাকি না, কারণ শেষ পর্যন্ত এই সমস্ত কামনা ও প্রচোদনাকে বর্জন করা দরকার, আর না হয় তাদের রূপান্তরিত ক'রে তাদের স্থলে আনা দরকার প্রাণের গতিবৃত্তির ভার-নেওয়া দিব্য সঙ্কল্পের বিভিন্ন প্রচোদনা। পথে হৃদয়ের শ্রদ্ধার, ভাবগত বিশ্বাসের, সম্মতিরও প্রয়োজন আছে, কিন্তু পথপ্রদর্শক হিসেবে এদের সম্বন্ধে সর্বদাই নিশ্চিত হওয়া যায় না যতদিন না এদেরও নিয়ে শুদ্ধ ও রূপান্তরিত করা হয় ও পরিশেষে তাদের জায়গায় আসে ভগবৎ-ইচ্ছা ও ভগবৎ-জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত এক দিব্য আনন্দোদ্ভূত দীপ্ত অনুমতিসব। অপরা প্রকৃতির যুক্তিবুদ্ধি থেকে প্রাণিক সঙ্কল্প পর্যন্ত কোন কিছুতেই — যোগসাধক সম্পূর্ণ ও স্থায়ী শ্রদ্ধা রাখবে না, সে তা সবশেষে রাখবে শুধু আধ্যাত্মিক সত্যে, শক্তিতে, আনন্দে যা আধ্যাত্মিক যুক্তিবুদ্ধির মধ্যে হয়ে ওঠে তার ক্রিয়ার একমাত্র পথপ্রদর্শক ও আলোকদাতা ও অধীশ্বর।

কিন্তু তবু, বরাবর ও প্রতি পদক্ষেপে শ্রদ্ধার প্রয়োজন আছে কারণ এ হল অন্তঃপুরুষের প্রয়োজনীয় সম্মতি যার অভাবে কোন উন্নতি সম্ভবপর নয়। প্রথমতঃ আমাদের শ্রদ্ধা দৃঢ় হওয়া চাই যোগের সব মূল সত্যে ও তত্ত্বে, আর এমনকি যদি এ বুদ্ধির মধ্যে আচ্ছন্ন থাকে, হৃদয়ের মধ্যে নিরাশ হয়, প্রাণিক মনের কামনার মধ্যে সতত অস্বীকৃতি ও বিফলতার দ্বারা সম্পূর্ণ ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ে, তাহলেও অন্তরতম আত্মায় এমন কিছু থাকা চাই যা একে আঁকড়ে থাকে ও তাতে ফিরে আসে, কারণ অন্যথায় সম্ভবতঃ আমাদের পথে পদস্খলন হবে অথবা দুর্বলতার দরুন ও সাময়িক

পরাজয়, নৈরাশ্য, বিঘ্ন ও বিপদ সহ্য করতে অক্ষম হওয়ায় আমরা পথ ছেড়ে দেব। যেমন জীবনে, তেমন যোগে যে ব্যক্তি সকলরকম পরাজয় ও মোহভঙ্গ সত্ত্বেও, সকল বিপরীত, বিরোধী ও প্রতিকূল ঘটনা ও শক্তি অগ্রাহ্য ক'রে শেষ পর্যন্ত অক্লান্ত ও অবিচলিত থাকে সে-ই শেষে জয়ী হয় ও দেখে যে তার শ্রদ্ধা সঠিক ব'লে প্রমাণিত হয়েছে, কারণ মানবের মধ্যে অন্তঃপুরুষ ও মহাশক্তির কাছে কিছুই অসম্ভব নয়। সন্দেহবাদীর যে সংশয় আমাদের আধ্যাত্মিক সম্ভাবনাসমূহের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় অথবা সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র সমালোচক সৃজনশক্তিশূন্য বুদ্ধির যে সতত নিন্দা, "অসূয়া" আমাদের প্রচেষ্টাকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে বিফল করতে চায়, তার চেয়ে বরং অন্ধ ও অজ্ঞানময় শ্রদ্ধা থাকাও অনেক ভালো। কিন্তু পূর্ণযোগের সাধকের কর্তব্য এই দুই অপূর্ণতাকেই জয় করা। যে বিষয়ে সে তার সম্মতি দিয়েছে এবং যা নিষ্পন্ন করার জন্য সে তার মন ও হৃদয় ও সঙ্কল্প নিয়োগ করেছে, অর্থাৎ সমগ্র মানবীয় সত্তার দিব্য সিদ্ধিতে সে বিষয় সাধারণ বুদ্ধির কাছে স্পষ্টতঃ অসম্ভব কারণ সকল দূরবর্তী ও দুঃসাধ্য লক্ষ্যের মতো এ হল জীবনের বাস্তব ঘটনাসমূহের বিপরীত এবং অব্যবহিত অভিজ্ঞতা বহুদিন একে খণ্ডন করবে; তাছাড়া অনেকে যারা আধ্যাত্মিক অনুভূতি পেয়েছে তারাও অস্বীকার করে কিন্তু বিশ্বাস করে যে আমাদের বর্তমান প্রকৃতিই দেহের মধ্যে মানবের একমাত্র সম্ভবপর প্রকৃতি, আর শুধু পার্থিব জীবন, এমনকি সকল ব্যষ্টি অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়েই স্বর্গীয় সিদ্ধি অথবা নির্বাণরূপী মোক্ষলাভ সম্ভব। এইরকম এক লক্ষ্যসাধনের পথে বহুদিন ধ'রে অজ্ঞানতাময় কিন্তু নাছোড় সমালোচক যুক্তিবুদ্ধির বিভিন্ন আপত্তি, নিন্দা, "অসূয়ার" অনেক সুযোগ থাকবে, কারণ এই যুক্তিবুদ্ধির সঙ্গত প্রতিষ্ঠা হল তৎকালীন বাহ্যরূপগুলি ও নির্ণীত তথ্য ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার, এ এই সব ছাড়িয়ে যেতে চায় না এবং যে সব সঙ্কেত ও দীপ্তি অগ্রবর্তী পথের ইঙ্গিত দেয় সে সবের যাথার্থ্যে সন্দেহ করে; আর যদি সে এই সব সঙ্কীর্ণ মন্ত্রণায় ভুলে যায় সে হয় তার লক্ষ্যে পৌঁছবে না, নয় তার যাত্রা অত্যন্ত ব্যাহত ও দীর্ঘ বিলম্বিত হবে। অপরপক্ষে শ্রদ্ধায় অজ্ঞানতা ও অন্ধতা বিপুল সাফল্যের প্রতিবন্ধস্বরূপ, এরা অনেক নৈরাশ্য ও মোহভঙ্গ ডেকে আনে, মিথ্যা লক্ষ্যে নিবদ্ধ থাকে এবং সত্য ও সিদ্ধির মহত্তর রূপায়ণগুলিতে অগ্রগতি নিবারণ করে। মহাশক্তি তাঁর ক্রিয়ার ধারায় সকলরূপ অজ্ঞানতা ও অন্ধতায় — এমনকি যা সব তাঁকে ভ্রান্তভাবে ও কুসংস্কারপূর্ণভাবে বিশ্বাস করে সে সবেও নির্দয়ভাবে আঘাত করবেন; আর আমাদের তৈরী থাকা চাই যেন আমরা শ্রদ্ধার বিভিন্ন রূপে অন্যায়রকমের দৃঢ় আসক্তি ত্যাগ করতে পারি, আর আঁকড়ে থাকি একমাত্র পরিত্রাতা সদ্‌বস্তুকে। পূর্ণযোগের পক্ষে প্রয়োজনীয় শ্রদ্ধার স্বরূপ হল এমন এক প্রকৃষ্ট ও ব্যাপক আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিযুক্ত শ্রদ্ধা যা উচ্চসম্ভাবনায় সম্মতিদাতা বৃহত্তর বিচারশক্তির বুদ্ধিতে বুদ্ধিযুক্ত।

এই শ্রদ্ধা — ইংরাজী পদ "faith" এর অর্থ প্রকাশ করার পক্ষে পর্যাপ্ত নয় — বাস্তবিকপক্ষে পরম চিৎপুরুষ থেকে আসা এক প্রভাব, আর এর আলো হল আমাদের

অতিমানসিক সত্তা থেকে আসা এমন এক বার্তা যা অপরা প্রকৃতিকে আহ্বান করছে তার ক্ষুদ্র বর্তমান ছাড়িয়ে আরোহণ করতে এক প্রকৃষ্ট আত্ম-সম্ভূতি ও আত্ম-উত্তরণে। আর যা এই প্রভাব পায় ও আহ্বানে উত্তর দেয় তা ততটা বুদ্ধি কি হৃদয়, কি প্রাণমানস নয়, বরং তা হল আন্তর পুরুষ যা নিজের নিয়তি ও ব্রতের সত্য আরো ভালো জানে। যে সব ঘটনায় উদ্দীপিত হয়ে আমরা এই পথে প্রথম আসি, তারা আমাদের মধ্যে কর্মরত বিষয়ের প্রকৃত নির্দেশ দেয় না। সেখানে হয়ত বুদ্ধি, হৃদয় অথবা প্রাণমানসের বিভিন্ন কামনার, এমনকি আরো সব অচিন্তিত আকস্মিক ঘটনার ও বাহ্য প্রেরণার স্থান প্রধান, কিন্তু এরাই যদি সব হয়, তাহলে আহ্বানে আমাদের নিষ্ঠা সম্বন্ধে অথবা যোগে আমাদের স্থায়ী অধ্যবসায় সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা থাকতে পারে না। যে ভাবনায় বুদ্ধি আকৃষ্ট হয়েছিল তা সে ত্যাগ করতে পারে, হৃদয় অবসন্ন হতে পারে বা আমাদের আর উৎসাহ না দিতে পারে, প্রাণমানসের কামনা অন্য লক্ষ্যের সন্ধানে যেতে পারে। কিন্তু বাহ্য ঘটনাগুলি চিৎপুরুষের আসল ক্রিয়ার শুধু এক আবরণ, আর যদি এই হয় যে চিৎপুরুষই স্পর্শ পেয়েছে, আন্তর পুরুষই আহ্বান শুনেছে তাহলে শ্রদ্ধা দৃঢ় থাকবে, তাকে ব্যর্থ বা ধ্বংস করার সকল প্রয়াস সে প্রতিরোধ করবে। বুদ্ধির সংশয় যে আক্রমণ করবে না, হৃদয় যে দুলবে না, প্রাণমানসের নিরাশ কামনা যে পথের ধারে অবসন্ন হয়ে ধরাশায়ী হবে না, তা নয়। কখনও কখনও, হয়ত প্রায়শঃই, এরকম ঘটা প্রায় অনিবার্য — বিশেষতঃ আমাদের বেলায় যারা এমন এক বুদ্ধিবিলাস ও সংশয়বাদ ও আধ্যাত্মিক সত্যের জড়বাদীয় অস্বীকৃতির যুগের সন্তান যারা এক মহত্তর সদ্‌বস্তুর সূর্যের মুখমণ্ডল থেকে এখনো তার রঙ-করা মেঘ তুলে নেয়নি, আর এখনো আধ্যাত্মিক বোধির ও অন্তরতম অনুভূতির আলোকের বিরোধী। খুব সম্ভব বহুবার সেইসব কষ্টপ্রদ তমোময় অবস্থা আসবে যাদের সম্বন্ধে এমনকি বৈদিক ঋষিরাও অতবার নালিশ করেছেন, "আলো থেকে দীর্ঘ নির্বাসন" ব'লে, আর এরা এত ঘন হতে পারে, অন্তঃপুরুষের উপর রাত্রি এত ঘোর হতে পারে যে মনে হবে আমাদের মধ্য থেকে শ্রদ্ধা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়েছে। কিন্তু এই সবের ভিতর অন্তঃস্থ চিৎপুরুষের অদেখা নিয়ন্ত্রণ সমান থাকবে আর অন্তঃপুরুষ এক নবশক্তি নিয়ে তার সেই প্রত্যয়ে ফিরে আসবে যা শুধু আচ্ছন্ন হয়েছিল কিন্তু নির্বাপিত হয়নি, কারণ তা নির্বাপিত হতে পারে না একবার যখন আন্তর আত্মা জেনেছে ও তার সঙ্কল্পে[১] দৃঢ় হয়েছে। সকল কিছুর ভিতর ভগবান আমাদের হাত ধরে থাকেন, আর যদি মনে হয় যে তিনি আমাদের ফেলে দিচ্ছেন, তাহলে তা শুধু আমাদের আরো উচ্চে তোলবার জন্য। এই পরিত্রাতা প্রত্যাবর্তন আমরা এতবার অনুভব করব যে পরিশেষে সংশয়ের অস্বীকৃতি অসম্ভব হবে, আর একবার যখন সমত্বের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় আর যা আরো ভাল, যখন বিজ্ঞানের সূর্য উদিত হয় তখন সংশয় নিজেই অন্তর্হিত হবে কেননা এর কারণ ও উপকারিতার অবসান হয়েছে।

[১] সঙ্কল্প, ব্যবসায়

তাছাড়া শুধু যে মৌলিক তত্ত্ব ও ভাবনাগুলিতে ও যোগের পথে শ্রদ্ধা দরকার তা নয়, আরো দরকার এক দৈনন্দিন কাজচলা শ্রদ্ধা — লক্ষ্যসাধনের জন্য আমাদের মধ্যে শক্তিতে, পথে আমরা যে সব পদক্ষেপ করেছি তাতে, আমাদের কাছে আসা আধ্যাত্মিক সব অনুভূতিতে, বিভিন্ন বোধিতে, সঙ্কল্প ও প্রচোদনার চালনার নির্দেশে, হৃদয়ের সেইসব আবেগের তীব্রতায়, প্রাণের অভীপ্সায় ও চরিতার্থতায় যারা সহায়স্বরূপ, প্রকৃতির প্রসারের বিভিন্ন ঘটনায় ও অবস্থাতে, অন্তঃপুরুষের বিকাশের বিভিন্ন উদ্দীপকে অথবা সোপানে। সেই সাথে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে আমরা চলেছি অপূর্ণতা ও অজ্ঞানতা থেকে আলো ও পূর্ণতার দিকে আর আমাদের অন্তঃস্থ শ্রদ্ধার পক্ষে দরকার হল আমাদের প্রচেষ্টার বিভিন্ন রূপে ও আমাদের উপলব্ধির বিভিন্ন ক্রমিক পর্যায়ে আসক্তিশূন্য থাকা। অনেক কিছু আছে যা আমাদের মধ্যে প্রবলভাবে তোলা হবে শুধু তাদের বাইরে ফেলে দিয়ে বর্জন করার জন্য, একদিকে অজ্ঞানতা ও অপরা প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তি, আর অন্যদিকে তাদের সরিয়ে যেসব পরতরা শক্তি আনতে হবে — এ দুয়ের মধ্যে এক সংগ্রামও থাকে; কিন্তু শুধু এই নয়, এছাড়াও থাকে এমন বিভিন্ন অনুভূতি, ভাবনা ও বেদনার বিভিন্ন অবস্থা, উপলব্ধির বিভিন্ন রূপ যেগুলি পথে সহায়কর ও যাদের গ্রহণ করা দরকার আর যারা সে সময়ের জন্য মনে হবে আধ্যাত্মিক শেষ লক্ষ্য অথচ পরে দেখা যাবে সেগুলি সংক্রমণের বিভিন্ন সোপান এবং তাদের অতিক্রম করা চাই, আর এদের অবলম্বনস্বরূপ কাজচলা শ্রদ্ধা প্রত্যাহার করা হবে ও এমন সব অন্য ও মহত্তর বিষয় অথবা আরো বিভিন্ন পরিপূর্ণ ও ব্যাপক উপলব্ধি ও অনুভূতি আছে যা সব পূর্বগুলির স্থানে আসে অথবা যাদের মধ্যে এদের নেওয়া হয় এক সম্পূর্ণকারী রূপান্তরে। পূর্ণযোগের সাধকের পক্ষে পথের উপর কোন বিশ্রামস্থলে অথবা মাঝপথের আবাসে আটকে থাকলে চলবে না; সে তৃপ্ত হতে পারে না যতক্ষণ না সে প্রতিষ্ঠিত করে তার সিদ্ধির সকল মহান্ স্থায়ী ভিত্তিগুলি এবং প্রবেশ করে এর বিশাল ও মুক্ত সব আনন্ত্যের মাঝে, আর এমনকি এখানেও তার উচিত সর্বদাই নিজেকে পূর্ণ করা অনন্তের আরো বিভিন্ন অনুভূতি দিয়ে। তার অগ্রগতি হল এক সানু থেকে অন্য সানুতে আরোহণ এবং প্রতি নতুন শিখর নিয়ে আসে আরো যা তখনো করার আছে, "ভূরি কর্ত্ত্বম্", তার অন্যান্য দৃশ্য ও প্রকাশ যতক্ষণ না অবশেষে ভাগবতী শক্তি তার সকল প্রচেষ্টার ভার নেন, আর তখন তার কাজ হল শুধু তাঁর জ্যোতির্ময় ক্রিয়াধারায় সম্মতি দেওয়া এবং সম্মতিপূর্ণ একত্বের দ্বারা তাতে সানন্দে অংশ গ্রহণ করা। এই সব পরিবর্তন, সংগ্রাম, রূপান্তরের মধ্যে যে বিষয়টি তাকে ধরে থাকবে, — কারণ তা না থাকলে ঐসব সম্ভবতঃ তাকে নিরুৎসাহ ও হতবুদ্ধি করত যেহেতু বুদ্ধি ও প্রাণ ও ভাবাবেগ সর্বদাই বড় বেশী জিনিস আঁকড়াতে চায়, অতি সত্বর দৃঢ়নিশ্চিত হয় এবং যে সবে এরা নির্ভর করেছিল তা ত্যাগ করতে বাধ্য হলে ক্লিষ্ট ও অনিচ্ছুক হওয়ার প্রবণতা থাকে — তা হল কর্মরতা মহাশক্তিতে দৃঢ় শ্রদ্ধা ও যোগেশ্বরের দেশনার উপর নির্ভরতা; যোগেশ্বরের প্রজ্ঞা তাড়াহুড়ো করে না, মনের সকল সংশয়ের মধ্যে তাঁর সব

পদক্ষেপ সুনিশ্চিত ও ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত, কারণ এরা আমাদের প্রকৃতির বিভিন্ন প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পূর্ণ জ্ঞানপূর্ণ ব্যবহারের উপর প্রতিষ্ঠিত।

যোগের অগ্রগতির অর্থ এমন এক যাত্রা যা শুরু করে মানসিক অজ্ঞানতা থেকে আর বিভিন্ন অপূর্ণ রূপায়ণের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে জ্ঞানের এক সুষ্ঠু ভিত্তি ও বৃদ্ধির দিকে, আর এর আরো সন্তোষজনক সদর্থক অংশে এর অর্থ আলোক থেকে মহত্তর আলোকে গমন, আর এর সমাপ্তি হতে পারে না যতদিন না আমরা পাই অতিমানসিক জ্ঞানের মহত্তম আলোক। মনের অগ্রগতিতে তার সব গতির সঙ্গে অল্প বা বিস্তর পরিমাণে প্রমাদ মিশে যেতে বাধ্য, আর প্রমাদ দেখতে পেয়ে আমরা যেন আমাদের শ্রদ্ধাকে বিচলিত হতে না দিই অথবা এই না ভাবি যে যেহেতু বুদ্ধির যে বিশ্বাসগুলি আমাদের সাহায্য করেছিল সেগুলি অত্যন্ত দ্রুত ও নিশ্চিত হওয়ায় অসত্য, সেহেতু অন্তঃপুরুষের মধ্যে মৌলিক শ্রদ্ধাও সঠিক নয়। মানবীয় বুদ্ধি প্রমাদকে বড় বেশী ভয় করে আর তার যথার্থ কারণ এই যে এ নিশ্চয়তা সম্বন্ধে এক অতি সত্বর বোধে আর বড় বেশী অন্যায়রকমে আসক্ত এবং এ জ্ঞানের যে অংশ ধরেছে বলে মনে হয় সেইটিই নিশ্চিত শেষ কথা বলতে বড় বেশী অধীরভাবে ব্যগ্র। যেমন আমাদের আত্ম-অনুভূতি বৃদ্ধি পায়, তেমন আমরা দেখব যে এমনকি আমাদের প্রমাদগুলিরও আবশ্যকতা ছিল, তারা তাদের সঙ্গে এনেছিল ও রেখে গেছে সত্য সম্বন্ধে তাদের উপাদান বা আভাসন এবং এক প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টার সন্ধান পেতে সাহায্য করেছিল অথবা তার সমর্থন করেছিল এবং যে নিশ্চিত বিষয়গুলি আমাদের এখন ত্যাগ করতে হচ্ছে সেগুলিরও আমাদের জ্ঞানের অগ্রগতিতে সাময়িক সত্যতা ছিল। আধ্যাত্মিক সত্য ও উপলব্ধির অন্বেষণে বুদ্ধি পর্যাপ্ত দিশারী হতে অক্ষম, কিন্তু তবু আমাদের প্রকৃতির সর্বাঙ্গীণ গতিতে একেও কাজে লাগান চাই। এবং সেজন্য যেমন একদিকে আমাদের বিবশকারী সংশয় বা শুধু বুদ্ধিগত সন্দেহবাদ বর্জন করা চাই, তেমন অন্যদিকে জিজ্ঞাসু বুদ্ধিকে শিক্ষা দেওয়া চাই যেন তাতে থাকে কিছু ব্যাপক জিজ্ঞাসা, এক বুদ্ধিগত ঋজুতা যা অর্ধসত্য, প্রমাদমিশ্রণ বা আসন্ন সত্যে সন্তুষ্ট নয়, আর সবচেয়ে সদর্থক ও সহায়করূপে এ যেন সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকে সর্বদা এগিয়ে যেতে পূর্বে স্বীকৃত ও গৃহীত সব সত্য থেকে এমন সব সত্যে যেগুলি পূর্বের সত্যগুলিকে আরো সংশোধন করে, সম্পূর্ণ করে অথবা তাদের অতিক্রম করে এবং যেগুলির কথা বুদ্ধি প্রথমে ভাবতে পারেনি অথবা, হয়ত ভাবতে চায়নি। বুদ্ধির এক কাজচলা শ্রদ্ধা অপরিহার্য, কিন্তু এ এমন কোন কুসংস্কারপূর্ণ, যুক্তিহীন অথবা সঙ্কীর্ণ বিশ্বাস হবে না যা প্রতিটি অস্থায়ী আশ্রয় বা সূত্রে আসক্ত, এ হবে মহাশক্তির বিভিন্ন ক্রমিক ইঙ্গিত ও সোপানে ব্যাপক স্বীকৃতি, এমন শ্রদ্ধা যা বিভিন্ন সদ্‌বস্তুতে নিবদ্ধ, এগিয়ে চলে বিভিন্ন ক্ষুদ্রতর সদ্‌বস্তু থেকে পূর্ণতর সদ্‌বস্তুতে আর সকল ভারা ফেলে দিয়ে শুধু বৃহৎ ও বর্ধিষ্ণু গঠনটিকে রাখতে প্রস্তুত।

হৃদয় ও প্রাণেরও এক অবিচল শ্রদ্ধা, সম্মতি অপরিহার্য। কিন্তু যতদিন আমরা অপরা প্রকৃতির মধ্যে থাকি, ততদিন হৃদয়ের সম্মতি রঙীন থাকে মানসিক ভাবাবেগের

রঙে এবং প্রাণিক গতিবৃত্তির সঙ্গে থাকে তাদের চাঞ্চল্যকর বা কষ্টকর বিভিন্ন কামনার শেষভাগ, আর মানসিক ভাবাবেগ ও কামনার প্রবণতা থাকে সত্যকে বিক্ষুব্ধ, কম বেশী স্থূল বা সূক্ষ্মভাবে পরিবর্তিত বা বিকৃত করতে এবং এরা সর্বদাই কিছু সঙ্কীর্ণতা ও অপূর্ণতা নিয়ে আসে হৃদয় ও প্রাণের দ্বারা এর বিভিন্ন উপলব্ধির মাঝে। হৃদয়ের বেলাতেও, যখন এ তার বিভিন্ন আসক্তি ও নিশ্চয়তাতে অশান্ত থাকে, পরাজয় ও বিফলতা ও প্রমাদের নিশ্চিত প্রত্যয়ের দ্বারা বিভ্রান্ত হয় অথবা তার বিভিন্ন সুনিশ্চিত স্থান থেকে এগিয়ে যাবার আহ্বানে সংশ্লিষ্ট মল্লযুদ্ধে জড়িত থাকে, তখন তার এমন সব টানাটানি, ক্লান্তি, দুঃখশোক, বিদ্রোহ ও অনিচ্ছা থাকে যাতে অগ্রগতি বিঘ্নিত হয়। এর অভ্যাস করা চাই এমন এক আরো বৃহৎ ও নিশ্চিত শ্রদ্ধা যা বিভিন্ন মানসিক প্রতিক্রিয়ার স্থানে দেবে মহাশক্তির বিভিন্ন প্রণালীতে ও সোপানে এক শান্ত বা আবেগপূর্ণ আধ্যাত্মিক স্বীকৃতি; এই স্বীকৃতি স্বরূপতঃ সকল আবশ্যক গতিবৃত্তিতে গভীর হচ্ছে এমন আনন্দের সম্মতি এবং পুরনো প্রতিষ্ঠিত স্থান ত্যাগে এবং সর্বদাই মহত্তর সিদ্ধির দিকে এগিয়ে যাওয়ায় ঔৎসুক্য। প্রাণমানসের কর্তব্য প্রাণের সেই সব পরপর-আসা প্রবর্তকে, প্রচোদনায়, কার্যে তার সম্মতি দেওয়া যেগুলি চালিকাশক্তি তার উপর আরোপ করে প্রকৃতির বিকাশের সহায় বা ক্ষেত্র হিসেবে এবং আন্তর যোগের পরম্পরাতেও তার সম্মতি দেওয়া কর্তব্য, কিন্তু কোন স্থানেই তার আসক্ত বা নিরস্ত হওয়া চলবে না, তবে সর্বদাই প্রস্তুত থাকতে হবে পুরনো প্রয়োজনীয়তা ত্যাগ করার জন্য এবং পূর্বেকার মত পূর্ণ সম্মতি নিয়ে বিভিন্ন নতুন উচ্চতর গতিবৃত্তি ও ক্রিয়া গ্রহণ করার জন্য আর তার আরো কর্তব্য হল কামনাকে সরিয়ে তার স্থানে সকল অনুভূতি ও ক্রিয়ার মধ্যে বিস্তৃত ও উজ্জ্বল আনন্দ আনতে শেখা। বুদ্ধির শ্রদ্ধার মতো, হৃদয় ও প্রাণমানসের শ্রদ্ধারও সতত সংশোধন, পরিবর্ধন ও রূপান্তরে সমর্থ হওয়া দরকার।

এই শ্রদ্ধা স্বরূপতঃ অন্তঃপুরুষের নিগূঢ় শ্রদ্ধা আর একে উত্তরোত্তর উপরিভাগে এনে সেখানে তৃপ্ত, পুষ্ট ও বর্ধিত করা হয় আধ্যাত্মিক অনুভূতির বর্ধিষ্ণু প্রত্যয় ও নিশ্চয়তার দ্বারা। এখানেও আমাদের মধ্যে শ্রদ্ধা হওয়া চাই নির্লিপ্ত, এমন শ্রদ্ধা যা সত্যের প্রতীক্ষায় থাকে এবং প্রস্তুত থাকে বিভিন্ন আধ্যাত্মিক অনুভূতি সম্বন্ধে নিজের জ্ঞানকে পরিবর্তিত ও বর্ধিত করতে, তাদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত বা অর্ধসত্য ভাবনাগুলিকে সংশোধন করতে, অপর্যাপ্ত বোধিগুলিকে সরিয়ে তাদের স্থলে পর্যাপ্ততর সব বোধি আনতে এবং যে সব অনুভূতিকে সে সময় মনে হয়েছিল অন্তিম ও পর্যাপ্ত সে সবকে নিমজ্জিত করতে বিভিন্ন নতুন অনুভূতি ও মহত্তর বৃহত্ত্ব ও অতিস্থিতির সহযোগে গঠিত আরো পর্যাপ্ত সব অনুভূতিতে। আর বিশেষতঃ সূক্ষ্মপ্রাণিক ও অন্যান্য মধ্যবর্তী প্রদেশে বিভ্রান্তিকর ও প্রায়শঃই মনোহর প্রমাদের সম্ভাবনার যথেষ্ট অবকাশ আছে এবং এক্ষেত্রে কিছু সদর্থক সন্দেহ উপকারী এবং অন্ততঃ যথেষ্ট সতর্কতা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বুদ্ধিবিষয়ক ঋজুতা প্রয়োজনীয়, তবে এ সাধারণ মনের সে সন্দেহ নয় যার অর্থ বিফলতাজনক অস্বীকার। পূর্ণযোগে সূক্ষ্মপ্রাণিক অনুভূতিকে, বিশেষতঃ যাকে প্রায়শঃই গুহ্যবিদ্যা বলা

হয় এবং অলৌকিক বলে মনে হয় তার সঙ্গে যে প্রকারের অনুভূতি সহচরিত, তাকে আধ্যাত্মিক সত্যের সম্পূর্ণ অধীন করা চাই এবং সেই অনুভূতি যেন এই সত্যের প্রতীক্ষায় থাকে তার নিজের ব্যাখ্যা, দীপ্তি ও অনুমোদনের জন্য। কিন্তু এমনকি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক প্রদেশেও এমন সব অনুভূতি আছে যেগুলি আংশিক, আর এরা যতই মনোহর হ'ক, এরা তাদের পূর্ণ প্রামাণ্য, তাৎপর্য অথবা সঠিক প্রয়োগ লাভ করে কেবল তখনই যখন আমরা আরো পূর্ণ অনুভূতিতে অগ্রসর হতে সক্ষম হই। আবার এমন সব অনুভূতি আছে যারা নিজেরা সম্পূর্ণ প্রামাণিক ও পূর্ণ ও অনপেক্ষ, কিন্তু যদি আমরা সে সবেই নিজেদের আবদ্ধ করি তারা আধ্যাত্মিক সত্যের অন্য দিকগুলি ব্যক্ত হতে দেয় না এবং যোগের অখণ্ডতা ছিন্ন করে। যেমন মন নিস্তব্ধ করার ফলে নৈর্ব্যক্তিক প্রশান্তির যে গভীর ও তন্ময়কারী নিশ্চলতা আসে তা নিজে নিজে সম্পূর্ণ ও অনপেক্ষ কিন্তু যদি আমরা শুধু এতেই নিশ্চিন্ত থাকি, তাহলে সহচারী অনপেক্ষতত্ত্ব যে দিব্য ক্রিয়ার আনন্দ তা বাদ পড়ে যদিও এ কম মহান্ ও কম প্রয়োজনীয় ও কম সত্য নয়। এক্ষেত্রেও আমাদের শ্রদ্ধা এমন এক সম্মতি হওয়া চাই যা সকল আধ্যাত্মিক অনুভূতি গ্রহণ করে, তবে যা সর্বদাই আরো আলোক ও সত্যের জন্য প্রশস্তভাবে উন্মুক্ত ও উদ্যত থাকে, যার কোন সঙ্কীর্ণতাজনক আসক্তি থাকে না এবং রূপগুলিতে যার এমন কোন অনুরক্তি থাকে না যা আধ্যাত্মিক সত্তার, চেতনার, জ্ঞানের, শক্তির, ক্রিয়ার এবং এক ও বহুময় আনন্দের সমগ্রতার ও অখণ্ডতার দিকে মহাশক্তির অগ্রগতিকে ব্যাহত করবে না।

সাধারণ তত্ত্ব এবং এর সতত বিশেষ প্রয়োগ — এই উভয়েতে যে শ্রদ্ধা আমাদের নিকট দাবী করা হয় তার অর্থ দাঁড়ায় ভগবান ও মহাশক্তির উপস্থিতি ও দেশনার নিকট সমগ্র সত্তার ও এর সকল অংশে এক বিশাল ও সদা বর্ধিষ্ণু ও অবিরত আরো শুদ্ধ, পরিপূর্ণ ও প্রবল সম্মতি। যতদিন না আমরা মহাশক্তির উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন ও এঁর দ্বারা পরিপূর্ণ হই ততদিন তাঁর প্রতি পূর্বজাত শ্রদ্ধা অথবা অন্ততঃপক্ষে সঙ্গে অবশ্যই থাকা চাই আমাদের নিজেদের আধ্যাত্মিক সঙ্কল্পে ও ক্রিয়াশক্তিতে এবং ঐক্য, মুক্তি ও সিদ্ধির দিকে সাফল্যের সঙ্গে যাবার জন্য আমাদের শক্তিতে এক দৃঢ় ও সতেজ শ্রদ্ধা। মানবকে যে তার নিজের প্রতি ও তার বিভিন্ন ভাবনা ও শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা দেওয়া হয় তার উদ্দেশ্য হল সে যেন কর্ম ও সৃষ্টি করতে পারে এবং মহত্তর সব বিষয়ে উঠতে পারে এবং পরিশেষে তার ক্ষমতাকে পরম চিৎপুরুষের বেদীতে আনতে পারে যোগ্য অর্ঘ্যরূপে। শাস্ত্র বলে, এই চিৎপুরুষকে দুর্বলের দ্বারা অর্জন করা যায় না, "নায়ম্ আত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। সকল বিবশকারী আত্ম-অবিশ্বাসকে, কার্যসিদ্ধি বিষয়ে আমাদের ক্ষমতা সম্বন্ধে সকল সংশয়কে নিরুৎসাহ করা চাই, কারণ তার অর্থ অক্ষমতার মিথ্যা সম্মতি, দুর্বলতার কল্পনা এবং চিৎপুরুষের সর্বশক্তিমত্তার অস্বীকার। বর্তমান অসামর্থ্যের চাপ যতই বেশী মনে হ'ক না কেন, এ হল শুধু শ্রদ্ধার এক পরীক্ষা, ও এক সাময়িক বাধা আর পূর্ণযোগের সাধকের পক্ষে এই অক্ষমতা-বোধে নত হওয়া মূর্খামি, কারণ তার লক্ষ্য সিদ্ধির এমন এক বিকাশ যা পূর্ব থেকেই বিদ্যমান, সত্তার মধ্যে সুপ্ত, কারণ মানব

নিজের মধ্যেই, নিজের চিৎপুরুষের মধ্যেই বহন করে দিব্য জীবনের বীজ, সাধনার মধ্যেই নিহিত ও প্রচ্ছন্ন রয়েছে সাফল্যের সম্ভাবনা, আর বিজয় সুনিশ্চিত কারণ পশ্চাতে আছে এক সর্বসমর্থ শক্তির আহ্বান ও দেশনা। সেই সঙ্গে নিজের প্রতি এই শ্রদ্ধাকে শুদ্ধ করা চাই রাজসিক অহং-ভাব ও আধ্যাত্মিক গর্বের সকল স্পর্শ থেকে। যতদূর সম্ভব সাধকের এই ভাবনা মনে রাখা কর্তব্য যে তার ক্ষমতা অহমাত্মক অর্থে তার নিজের নয়, এই ক্ষমতা ভাগবতী বিশ্বাত্মিকা শক্তির আর তার দ্বারা এর ব্যবহারে যা কিছু অহমাত্মক তা সঙ্কীর্ণতার কারণ ও পরিশেষে এক বাধা হতে বাধ্য। আমাদের আস্পৃহার পশ্চাতে যে ভাগবতী বিশ্বাত্মিকা শক্তির সামর্থ্য আছে তা অপরিসীম এবং যখন একে সঠিকভাবে আবাহন করা হয়, তখন এ নিজেকে আমাদের মধ্যে না ঢেলে এবং এখন বা পরে সকল কিছু অসামর্থ্য ও বাধা দূর না ক'রে পারে না; কারণ যদিও আমাদের সংগ্রামের কাল ও স্থায়িত্ব প্রথম প্রথম করণগতভাবে ও অংশতঃ নির্ভর করে আমাদের শ্রদ্ধা ও আমাদের প্রচেষ্টার ক্ষমতার উপর, তবু শেষ পর্যন্ত তারা থাকে নিগূঢ় পরম চিৎপুরুষের হস্তে যিনি তাদের সব কিছু নির্ধারণ করেন প্রজ্ঞাসহকারে আর একমাত্র তিনিই যোগের অধীশ্বর, ঈশ্বর।

আমাদের ক্ষমতার পিছনে সর্বদাই থাকা চাই ভাগবতী শক্তিতে শ্রদ্ধা এবং যখন তিনি প্রকট হন, তখন তা হতে হবে অথবা হয়ে উঠতে হবে অকুণ্ঠ ও সম্পূর্ণ। যিনি চিন্ময়ী শক্তি ও বিশ্বাত্মিকা দেবী, শাশ্বতকাল থেকে সর্ব-সৃজনশালিনী এবং পরম চিৎপুরুষের সর্বশক্তিমত্তায় সজ্জিতা, তাঁর কাছে এমন কিছু নেই যা অসাধ্য। সকল জ্ঞান, সকল রকমের ক্ষমতা, সকল সাফল্য ও বিজয়, সকল নৈপুণ্য ও কর্ম তাঁর হস্তে, এগুলি পূর্ণ পরম চিৎপুরুষের সকল রত্নে এবং সকল রকম পূর্ণতায় ও সিদ্ধিতে। তিনি মহেশ্বরী, পরম জ্ঞানের দেবী, আর তিনি আমাদের কাছে নিয়ে আসেন সকল প্রকার সত্য ও তাদের প্রশস্ততা, তাঁর আধ্যাত্মিক সঙ্কল্পের ঋজুতা, তাঁর অতিমানসিক বৃহত্ত্বের শান্তি ও তীব্র অনুরাগ, তাঁর দীপ্তির আনন্দ সম্বন্ধে তাঁর দর্শন: তিনি মহাকালী, পরম বীর্যের দেবী, আর তাঁর সঙ্গে আছে সকল সামর্থ্য ও আধ্যাত্মিক শক্তি, তপঃশক্তির উগ্রতম কঠোরতা, আর সংগ্রামে ক্ষিপ্রতা এবং বিজয় ও অট্টহাস্য যা পরাভব ও মৃত্যু ও অবিদ্যার সব শক্তিকে তুচ্ছ করে: তিনি মহালক্ষ্মী, পরম প্রেম ও আনন্দের দেবী, আর তাঁর দান হল চিৎপুরুষের শ্রী ও আনন্দের শোভা ও সৌন্দর্য এবং বরাভয় ও সকল দিব্য ও মানবীয় আশীর্বাদ: তিনি মহাসরস্বতী, দিব্য নৈপুণ্য ও পরম চিৎপুরুষের বিভিন্ন কর্মের দেবী, আর তাঁর যোগ হল সেই যোগ যা সকল কর্মে নৈপুণ্য, "যোগঃ কর্মসু কৌশলম্", দিব্য জ্ঞানের বিভিন্ন হিতসাধন এবং জীবনে চিৎপুরুষের আত্মনিয়োগ এবং নিজের সুষমার সুখ। আর তাঁর সকল শক্তি ও রূপের মধ্যে তিনি নিজের সঙ্গে রাখেন সনাতনী ঈশ্বরীর ঈশনার পরম বোধ, যন্ত্রের কাছে দাবী করা যেতে পারে এমন সকল প্রকার ক্রিয়ার ক্ষিপ্র ও দিব্য সামর্থ্য, সর্বভূতের মধ্যে সকল শক্তির সঙ্গে একত্ব, সহভাগী সমবেদনা, স্বচ্ছন্দ তাদাত্ম্য এবং সেজন্য বিশ্বের মধ্যে সকল দিব্য সঙ্কল্পের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত ও ফলপ্রদ

সামঞ্জস্য। তাঁর উপস্থিতির ও তাঁর বিভিন্ন শক্তির ঘনিষ্ঠ অনুভব এবং আমাদের সত্তার ভিতরে ও চারিদিকে তাঁর সব কর্মে আমাদের সমগ্র সত্তার পরিতৃপ্ত সম্মতি — এই হল মহাশক্তিতে শ্রদ্ধার চরম পরাকাষ্ঠা।

আর মহাশক্তির পিছনে আছেন ঈশ্বর, এবং তাঁতে শ্রদ্ধাই পূর্ণযোগের শ্রদ্ধায় সর্বাপেক্ষা কেন্দ্রীয় বিষয়। এই বিশ্বাস আমাদের রাখা ও পূর্ণভাবে বিকশিত করা চাই যে সকল কিছুই এক পরম আত্মজ্ঞান ও প্রজ্ঞার বিশ্ব অবস্থার মধ্যে ক্রিয়াধারা, আমাদের ভিতরে বা চারিদিকে যা করা হয় তা বৃথা নয় অথবা এমন কিছু নয় যার নির্দিষ্ট স্থান ও উচিত তাৎপর্য নেই, যখন ঈশ্বর আমাদের পরমাত্মা ও চিৎপুরুষ রূপে কাজের ভার নেন তখন সকল কিছুই সম্ভব এবং যা কিছু পূর্বে করা হয়েছে এবং পরে তিনি করবেন সে সব তাঁর অভ্রান্ত ও পূর্বদর্শী দেশনার অংশ, আর তাদের অভিপ্রেত লক্ষ্য হল আমাদের যোগের ও আমাদের সিদ্ধির ও আমাদের জীবনকর্মের সার্থকতা। পরতর জ্ঞান যতই উন্মুক্ত হবে, ততই এই শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর সঠিক প্রমাণিত হবে, আমরা সেই সব বড় ও ছোট তাৎপর্যগুলি দেখতে শুরু করব যেগুলি আমাদের সীমাবদ্ধ মানসিকতায় ধরা পড়েনি, আর শ্রদ্ধা পরিণত হবে জ্ঞানে। তখন আমরা সন্দেহাতীতভাবে দেখব যে সকল কিছুই ঘটে একমাত্র সঙ্কল্পের কর্মপ্রণালীর ভিতরে এবং ঐ সঙ্কল্প আবার প্রজ্ঞা কারণ এ সর্বদাই বিকশিত করে জীবনের ভিতর আত্মা ও প্রকৃতির সত্যকার বিভিন্ন কর্মধারা। সত্তার সম্মতির, শ্রদ্ধার পরাকাষ্ঠা হবে যখন আমরা ঈশ্বরের সান্নিধ্য অনুভব করব, আর অনুভব করব যে আমাদের সকল অস্তিত্ব ও চেতনা ও মনন ও সঙ্কল্প ও ক্রিয়া ঈশ্বরের হাতে, আর সকল বিষয়ে এবং আমাদের আত্মা ও প্রকৃতির প্রতি অংশ দিয়ে সম্মতি দেব পরম চিৎপুরুষের প্রত্যক্ষ ও বিশ্বগত ও অধিষ্ঠাতা সঙ্কল্পে। আর শ্রদ্ধার ঐ শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি আবার হবে এক দিব্য বীর্যের সুযোগ ও সুষ্ঠু ভিত্তি: যখন এ সম্পূর্ণ হবে তখন এ প্রতিষ্ঠিত করবে জ্যোতির্ময় অতিমানসিক মহাশক্তির বিকাশ ও অভিব্যক্তি ও বিভিন্ন কর্ম।

উনবিংশ অধ্যায়

আত্মানসের স্বরূপ

যোগের উদ্দেশ্য হল — সাধারণ মনের যে চেতনা প্রাণিক ও জড়ীয় প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণের অধীন এবং জন্ম ও মৃত্যু ও কাল ও মন, প্রাণ ও দেহের বিভিন্ন প্রয়োজন ও কামনার দ্বারা সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ তা থেকে মানবীয় সত্তাকে উত্তোলন করা চিৎপুরুষের চেতনায় যা নিজের আত্মায় মুক্ত এবং মন, প্রাণ ও দেহের অবস্থাগুলিকে ব্যবহার করে চিৎপুরুষের স্বীকৃত বা স্বয়ং-নির্বাচিত ও আত্ম-রূপায়ণকারী নির্ধারণরূপে আর সে সবকে ব্যবহার করে স্বচ্ছন্দ আত্মজ্ঞানে, সত্তার স্বচ্ছন্দ সঙ্কল্প ও শক্তিতে, সত্তার স্বচ্ছন্দ আনন্দে। যে সাধারণ মর মনে আমরা বাস করি এবং যোগের সর্বোত্তম ফল স্বরূপ আমাদের দিব্য ও অমর সত্তার যে আধ্যাত্মিক চেতনা — এই দুয়ের মধ্যে স্বরূপগত পার্থক্য হল এই। এ হল এমন এক আমূল রূপান্তর যা সেই পরিবর্তনের মতোই মহান্ — ও তারও চেয়ে মহত্তর — যে পরিবর্তন আমাদের ধারণায় বিবর্তনমূলক প্রকৃতি ঘটিয়েছে প্রাণিক পশুচেতনা থেকে পূর্ণ মানসিকভাবাপন্ন মানবচেতনায় উত্তরণে। পশুর সচেতন প্রাণিক মন আছে কিন্তু এর মধ্যে উচ্চতর কোন কিছুর যা কিছু সূত্রপাত থাকুক না কেন তা শুধু সেই বুদ্ধির এক প্রাথমিক আভাস, এক স্থূল ইঙ্গিত যা মানবের মাঝে হয়ে ওঠে মানসিক অবধারণ, সঙ্কল্প, ভাবাবেগ, সৌন্দর্যবোধ ও যুক্তিবুদ্ধির উজ্জ্বল দীপ্তি। মনের সব তীব্রতার দ্বারা মানব উচ্চে উন্নীত হয়ে ও গভীরতা পেয়ে নিজের মধ্যে মহৎ ও দিব্য এমন কিছুর কথা জানতে পারে যার দিকে এই সকলের টান, এমন কিছু যার সম্ভাবনা তার মধ্যে আছে কিন্তু যা সে এখনো হয়নি, আর সে তার মনের বিভিন্ন শক্তি, তার জ্ঞানের শক্তি, তার সঙ্কল্পের শক্তি, তার ভাবাবেগ ও সৌন্দর্যবোধের শক্তি নিয়োগ করে তা খুঁজে বার করার জন্য, এ যা হতে পারে তা ধরার ও বোঝার জন্য, তা হবার জন্য এবং এর মহত্তর চেতনায়, আনন্দে, সত্তায় ও সর্বোচ্চ সম্ভূতির শক্তিতে পুরোপুরি থাকবার জন্য। কিন্তু সে তার সাধারণ মনে এই উচ্চতর অবস্থার যা পায় তা তার অন্তঃস্থ চিৎপুরুষের দীপ্তি, আলো, মহিমা ও দিব্যত্বের শুধু এক বার্তা, এক প্রাথমিক আভাস, স্থূল ইঙ্গিত। এই যে মহত্তর বিষয় যা সে হতে সক্ষম, তাকে নিজের কাছে সম্পূর্ণ বাস্তব, দৃঢ়ভাবে উপস্থিত করতে পারার পূর্বে এবং যা এখন তার কাছে বড় জোর এক ভাস্বর আস্পৃহা তাতে সম্পূর্ণ বাস করতে পারার পূর্বে তার নিকট যা দাবী করা হয় তা হল তার সত্তার সকল অংশেরই সম্পূর্ণ রূপান্তর আধ্যাত্মিক চেতনার বিভিন্ন ছাঁচে ও করণে। তার কর্তব্য হল এক অখণ্ড যোগের দ্বারা এক মহত্তর দিব্য চেতনায় সম্পূর্ণ বিকশিত ও উপচিত হবার সাধনা করা।

এই পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় যে সিদ্ধিযোগ তাতে — যতদূর আমরা বিবেচনা

করেছি — আছে মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক প্রকৃতির এক প্রস্তুতিমূলক শুদ্ধি, অপরা প্রকৃতির গ্রন্থিসমূহ থেকে মুক্তি ও ফলস্বরূপ, কামপুরুষের অজ্ঞানময় ও অশান্ত ক্রিয়ার সর্বদা অধীন যে অহমাত্মক অবস্থা তা সরিয়ে তার স্থলে এমন এক বিশাল ও দীপ্তিময় স্থিতিক সমত্ব অর্জন যা যুক্তিশক্তি, ভাবমানস, প্রাণমানস ও শারীরিক প্রকৃতিকে শান্ত করে আর আমাদের কাছে নিয়ে আসে চিৎপুরুষের শান্তি ও স্বাধীনতা; তাছাড়া এতে অপরা প্রকৃতির ক্রিয়ার পরিবর্তে স্ফুরন্তভাবে স্থাপিত করা হয় ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণে পরমা ও বিশ্বাত্মিকা ভাগবতী শক্তির ক্রিয়া — এমন এক ক্রিয়া যার সম্পূর্ণ সম্পাদনের পূর্বে থাকা চাই প্রাকৃত করণসমূহের সিদ্ধি। আর যদিও এই সব বিষয় মিলিয়ে সমগ্র যোগ হয় না, তবু এরা বর্তমান সাধারণ চেতনা অপেক্ষা এমন অতীব মহত্তর কিছু যা তার ভিত্তিতে আধ্যাত্মিক ও পরিচালিত হয় এক মহত্তর আলো, শক্তি ও আনন্দ দ্বারা; আর অতখানি কাজ হয়ে গেলে আমরা তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে ক্ষান্ত হতে পারি ও দিব্য রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই করা হয়েছে বলে সহজেই ধরে নিতে পারি।

যেমন আলোক বৃদ্ধি পায় তেমন এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ওঠে; প্রশ্নটি এই — মানবীয় সত্তার মধ্যে যে ভাগবতী শক্তি কাজ করবে তা কিসের মাধ্যমে? সে কাজ কি সর্বদাই শুধু মনের মাধ্যমে ও মনোলোকে হবে, না এমন কোন মহত্তর অতিমানসিক বিভাবনার মধ্যে হবে যা দিব্য ক্রিয়ার পক্ষে আরো উপযোগী এবং বিভিন্ন মানসিক কাজগুলি নিয়ে তাদের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হবে। যদি সর্বদা মনই করণ হয়, তাহলে যদিও আমরা জানতে পারব যে এক দিব্যতর শক্তি আমাদের সকল আন্তর ও বাহ্য মানুষী ক্রিয়া প্রবর্তন ও পরিচালনা করছে, তাহলেও, একে তার জ্ঞান, সঙ্কল্প, আনন্দ ও বাকী সব কিছুকে রূপ দিতে হবে মানসিক আকারে, আর তার অর্থ সে সবকে রূপান্তরিত করা এমন এক নিম্ন প্রকারের ব্যাপ্রিয়ায় যা দিব্য চেতনা ও এর শক্তির স্বকীয় পরম কার্যধারা থেকে ভিন্ন। নিজের সীমার মধ্যে আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন, শুদ্ধ, মুক্ত, সিদ্ধ মন যতদূর সম্ভব আসতে পারে এক অবিকল মানসিক রূপের নিকট কিন্তু আমরা দেখব যে মোটের উপর এ হল এক আপেক্ষিক অবিকলতা ও অপূর্ণসিদ্ধি। মনের স্বরূপ এমনই যে এ সম্পূর্ণ সঠিক যথার্থতার সঙ্গে পরিবর্তন করতে অথবা দিব্য জ্ঞান, সঙ্কল্প ও আনন্দের একীভূত সম্পূর্ণতায় কাজ করতে অক্ষম, কারণ এ হল বিভাজনের ভিত্তিতে সান্তের সব বিভাজন নিয়ে কাজ করার যন্ত্র, সেজন্য এ হল এক গৌণ যন্ত্র এবং যে নিম্ন গতিবিধির মধ্যে আমাদের বাস তার জন্য এক প্রকার প্রতিনিধি। মন অনন্তকে প্রতিফলিত করতে সক্ষম, তার মধ্যে এ নিজেকে লীন করতে সক্ষম, বিশাল নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা তার মধ্যে বাস করতে সক্ষম, তার আভাসনগুলি নিয়ে সে সবকে তার নিজের ধরনে কর্মে ফুটিয়ে ওঠাতে সক্ষম, — তবে তার এই ধরন সর্বদাই আংশিক, গৌণ ও অল্পবিস্তর বিকৃতির অধীন — কিন্তু নিজের জ্ঞানে কর্মরত অনন্ত চিৎপুরুষের প্রত্যক্ষ ও সিদ্ধ যন্ত্র হতে এ নিজে অক্ষম। যে দিব্য সঙ্কল্প ও প্রজ্ঞা অনন্ত চেতনার ক্রিয়া সংগঠন করে এবং সকল বিষয় নির্ধারণ করে চিৎপুরুষের সত্য ও এর অভিব্যক্তির বিধান অনুযায়ী তা মানসিক

নয়, তা অতিমানসিক, আর এমনকি তার যে বিভাবনা মনের সবচেয়ে নিকটবর্তী তা-ও তার আলো ও শক্তিতে মানসিক চেতনার তত বেশী উর্ধ্বে যেমন মানবের মানসিক চেতনা নিম্নসৃষ্টির প্রাণিক মনের উর্ধ্বে। প্রশ্ন হল, সিদ্ধ মানবীয় সত্তা কতদূর সক্ষম নিজেকে মনের উর্ধ্বে তুলতে, অতিমানসিক সত্তার সঙ্গে এক প্রকার মিশিয়ে-যাওয়া মিলনে প্রবেশ করতে, এবং নিজের মধ্যে রচনা করতে অতিমানসের স্তর, বিকশিত বিজ্ঞান, যার রূপ ও শক্তির দ্বারা ভাগবতী শক্তি সরাসরি কাজ করতে সক্ষম — তবে মানসিক রূপায়ণের মধ্য দিয়ে নয়, তাঁর অতিমানসিক প্রকৃতিতে সংহতভাবে।

এই বিষয়টি আমাদের ভাবনা ও অনুভূতির সাধারণ ধারা থেকে এত দূরবর্তী যে এখানে প্রথম বলা প্রয়োজন — বিশ্ব বিজ্ঞান বা দিব্য অতিমানস কি, কেমন ক'রে এ বিশ্বের বাস্তব গতিবিধির মধ্যে প্রতিভাত হয় এবং মানবের বর্তমান মনস্তত্ত্বের সঙ্গে এর বিভিন্ন সম্বন্ধ কি কি। তখন এটি সুস্পষ্ট হবে যে যদিও অতিমানস আমাদের বুদ্ধির কাছে যুক্তির অতীত এবং এর সব কর্মপ্রণালী আমাদের বোধের পক্ষে গুহ্য তবু এ অযৌক্তিকভাবে রহস্যময় কিছু নয়, বরং এর অস্তিত্ব ও উদ্‌বর্তন অস্তিত্বের স্বরূপের যুক্তিসিদ্ধ আবশ্যিক তত্ত্ব — অবশ্য যদি আমরা স্বীকার করি যে শুধু জড় বা মন নয়, চিৎপুরুষই মৌলিক সদ্‌বস্তু এবং এটাই সর্বত্র এক বিশ্বব্যাপী উপস্থিতি। সকল বিষয়ই অনন্ত চিৎপুরুষের অভিব্যক্তি, আর তা হয়েছে এর নিজের সত্তার মধ্য থেকে, নিজের চেতনার মধ্য থেকে এবং ঐ চেতনার আত্মোপলব্ধিকারী, আত্মনির্ধারককারী, আত্মসার্থককারী শক্তির দ্বারা। বলা যায় যে অনন্ত এর নিজের সত্তার বিধান বিশ্বের মধ্যে সংগঠন করে নিজের আত্মজ্ঞানের শক্তির দ্বারা, আর এ বিশ্ব যে শুধু আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের নিকট উপস্থিত জড় বিশ্ব তা নয়, এর পিছনে অস্তিত্বের অন্যান্য লোকের উপর যা কিছু আসে সে সবও। সব কিছু সংগঠিত হয় এর দ্বারা, তবে কোন নিশ্চেতন আবশ্যিক নিয়মবশে নয়, অথবা মানসিক কল্পনা বা খেয়াল মতো নয়, তা হয় এর নিজের অনন্ত আধ্যাত্মিক স্বাধীনতায়, এর সত্তার আত্মসত্য অনুযায়ী, এর অনন্ত সব যোগ্যতা অনুযায়ী এবং ঐ সব যোগ্যতার মধ্য থেকে এর আত্মসৃষ্টির সঙ্কল্প অনুযায়ী; আর এই আত্মসত্যের বিধানই সেই আবশ্যিক তত্ত্ব যা প্রতি সৃষ্ট বিষয়কে বাধ্য করে তার স্বীয় প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করতে ও বিকশিত হতে। যে তত্ত্ব এইভাবে নিজের অভিব্যক্তি সংগঠন করে তাকে বলা যেতে পারে দিব্যবুদ্ধি যদিও এই নাম পর্যাপ্ত নয়, অথবা শব্দব্রহ্ম; যে মানসিক বুদ্ধি আমাদের কাছে চেতনার সর্বশ্রেষ্ঠ উপলব্ধ মাত্রা ও প্রকাশ তা অপেক্ষা এই দিব্যবুদ্ধি স্পষ্টতঃই অনন্তগুণে মহত্তর, জ্ঞানে আরো প্রসারিত, আত্মশক্তিতে অমোঘ, এর আত্মঅস্তিত্বের আনন্দে এবং এর সক্রিয় সত্তার ও কর্মের আনন্দে — উভয়েতেই আরো বিশাল। এই বুদ্ধি যে নিজে অনন্ত অথচ স্বচ্ছন্দ সংগঠক ও আত্মসৃষ্টিতে ও সর্ব কর্মে আত্মনির্ধারক ও সুসংহত তাকেই আমরা আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্যের জন্য নাম দিতে পারি দিব্য অতিমানস বা বিজ্ঞান।

এই অতিমানসের মূল স্বরূপ এই যে এর সকল জ্ঞানই মূলতঃ তাদাত্ম্য ও একত্বের

দ্বারা জ্ঞান, আর এমনকি যখন এ নিজের মধ্যে অসংখ্য আপতিক বিভাজন ও পার্থক্যসূচক পরিবর্তন করে, তখনো এর বিভিন্ন ক্রিয়াধারায়, এমনকি এই সব বিভাজনেও যে সকল জ্ঞান সক্রিয় তারও প্রতিষ্ঠা এই তাদাত্ম্য ও একত্বের দ্বারা প্রাপ্ত পূর্ণজ্ঞান আর এর দ্বারাই এই জ্ঞান পুষ্ট ও আলোকিত ও পরিচালিত। পরম চিৎপুরুষ সর্বত্রই এক এবং সকল বিষয়কেই জানে নিজ ব'লে ও নিজের মধ্যে, সুতরাং এ সে সবকে সর্বদাই দেখে এবং সেজন্য তাদের জানে ঘনিষ্ঠভাবে, সম্পূর্ণভাবে, যেমন তাদের অবভাসে তেমন তাদের সদ্‌বস্তুতে, তাদের সত্যে, তাদের বিধানে, তাদের প্রকৃতি ও তাদের বিভিন্ন কর্মধারার সম্পূর্ণ আন্তরভাবে, অর্থে ও আকারে। যখন এ জ্ঞানের বিষয় হিসেবে কোন বিষয় দেখে, তখনো এ তাকে দেখে নিজের সঙ্গে এক করে ও নিজের মধ্যে, এ যে তাকে নিজ থেকে ভিন্ন কিছু অথবা নিজ থেকে বিভক্ত কিছু ব'লে দেখে তা নয়, আর এই কারণে এ যে প্রথমে মনের মতো তার প্রকৃতি, গঠন ও কর্মধারা সম্বন্ধে অজ্ঞ হবে ও সে সব সম্বন্ধে পরে জ্ঞান পেতে হবে তা নয়; মন প্রথমে তার বিষয় সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে, তাকে বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান পেতে হয় কারণ সে তার বিষয় থেকে বিভক্ত থাকে ও তাকে মনে করে, অনুভব করে ও তার সম্মুখীন হয় যেন বিষয়টি তা থেকে অন্য কিছু ও তার আপন সত্তার বাইরে। আমাদের আপন প্রত্যক্‌বৃত্ত অস্তিত্ব ও এর বিভিন্ন গতিবিধি সম্বন্ধে আমাদের যে মানসিক সংবিৎ তাও ঠিক এই তাদাত্ম্য ও আত্মজ্ঞান নয়, যদিও এই সবই এ নির্দেশ করে, কারণ মন যা দেখে তা আমাদের সত্তার মানসিক আকৃতি মাত্র, আমাদের সত্তার অন্তরতম অংশ বা সমগ্র নয়, আর আমাদের কাছে যা প্রতিভাত হয় তা শুধু আমাদের আত্মার এক আংশিক, গৌণ ও বাহ্য ক্রিয়া; সে সময় আমাদের আপন অস্তিত্বের বৃহত্তম ও সর্বাপেক্ষা নিগূঢ়ভাবে নির্ধারক অংশগুলি আমাদের মানসিকতার কাছে গুহ্য। মনোময় পুরুষের যা নেই, অতিমানসিক চিৎপুরুষের তা আছে অর্থাৎ নিজের সম্বন্ধে ও এর সকল বিশ্ব সম্বন্ধে ও বিশ্বের মধ্যে যে সকল বিষয় এর সৃষ্টি ও আত্ম-রূপায়ণ সে সব সম্বন্ধে এর প্রকৃত জ্ঞান আছে কারণ এই হল অন্তরতম ও সমগ্র জ্ঞান।

পরম অতিমানসের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে এর জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান, কারণ এ হল সমগ্র জ্ঞান। প্রথমতঃ এর এক বিশ্বাতীত দর্শন থাকে আর বিশ্বকে এ শুধু যে বিশ্বসংজ্ঞায় দেখে তা নয়, এ বিশ্বকে দেখে — যে পরম ও নিত্য সদ্‌বস্তু থেকে এর উৎপত্তি ও বহিঃপ্রকাশ, তার সঙ্গে এর সঠিক সম্বন্ধে। এ বিশ্বপ্রকাশের আন্তরভাব ও সত্য ও সমগ্র অর্থ জানে কারণ যাকে এ আংশিকভাবে প্রকাশ করে তার সমগ্র স্বরূপতত্ত্ব ও সকল অনন্ত সদ্‌বস্তু এবং তার পরিণামস্বরূপ সকল নিয়ত সম্ভাবনা তার জানা। এ আপেক্ষিককে সঠিকভাবে জানে কারণ এ হল সেই পরম অনপেক্ষ তত্ত্ব ও তার সকল অনপেক্ষ তত্ত্বগুলি জানে যাদের দিকে ঐ আপেক্ষিকগুলি নির্দেশ করে এবং যাদের আংশিক বা পরিবর্তিত বা অস্ফুট রূপ তারা। দ্বিতীয়তঃ এ হল বিশ্বজনীন, তাই সকল ব্যষ্টিকে এ দেখে বিশ্বদৃষ্টিতে এবং সেই সঙ্গে নিজস্ব ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গিতেও এবং সকল

ব্যষ্টিসত্তাকে ধারণ করে বিশ্বপটে তাদের সঠিক ও সমগ্র সম্পর্কের ভিত্তিতে। তৃতীয়তঃ ব্যষ্টি বিষয়গুলি সম্বন্ধে পৃথক পৃথকভাবে এর দৃষ্টি সমগ্র, কারণ এ প্রতি ব্যষ্টিকে জানে তার অন্তরতম স্বরূপে যার পরিণাম হল বাকী সব, আবার এ তাকে জানে তার সমগ্রতায় যা তার সম্পূর্ণ আকার, আবার এ ব্যষ্টিকে জানে তার বিভিন্ন অংশে এবং তাদের পারস্পরিক সংযোগে ও নির্ভরতায় আবার অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ব্যষ্টির সংযোগে ও তাদের উপর তার নির্ভরতায় এবং বিশ্বের সমগ্র গূঢ় ও বাহ্য অর্থের সঙ্গে ব্যষ্টির যোগসূত্রেও এ ব্যষ্টিকে জানে।

অপর পক্ষে মন এই সব দিকে সীমিত ও অশক্ত। পরম অনপেক্ষ তত্ত্ব সম্বন্ধে মন যখন তার বুদ্ধির প্রসারের দ্বারা ধারণা করে, এমনকি তখনো এ তার সঙ্গে তাদাত্ম্যে আসতে সক্ষম হয় না, এ শুধু পারে তার মধ্যে লীন হতে, মূর্ছা অথবা নির্বাণের মধ্যে: কতকগুলি অনপেক্ষ তত্ত্ব সম্বন্ধে এ শুধু এক প্রকার বোধ বা বার্তা পেতে সক্ষম আর মানসিক ভাবনার দ্বারা এ এই সব তত্ত্বগুলিকে এক আপেক্ষিক আকারে স্থাপন করে। এ বিশ্বসত্তাকে ধরতে অক্ষম, এ শুধু তার ভাবের কিছুটা পায় ব্যষ্টির প্রসারের দ্বারা অথবা আপাতভাবে পৃথক বিষয়সমূহের সমবায়ের দ্বারা এবং সেজন্য একে দেখে হয় এক অস্পষ্ট অনন্ত বা নির্বিশেষ বা অর্ধ-সবিশেষ বৃহত্ত্ব হিসেবে আর না হয় একে দেখে শুধু এক বাহ্য পরিকল্পনায় অথবা কল্পিত রূপে। বিশ্বসত্তার যে অবিভাজ্য সত্তা ও ক্রিয়া এর প্রকৃত সত্য তা মনের গ্রহণশক্তিতে ধরা পড়ে না কারণ এর বিভাজনগুলিকে একক হিসেবে নিয়ে এ বিশ্লেষণমূলকভাবে চিন্তা করে এবং সমন্বয়ীভাবে চিন্তা করে এই সব এককের সমবায়ের দ্বারা কিন্তু স্বরূপগত একত্ব ধারণে ও এর সংজ্ঞায় সম্পূর্ণ চিন্তা করতে এ অক্ষম যদিও এ হয়ত তার ভাব ও কতকগুলি গৌণ ফল পায়। আবার, এমনকি এ ব্যষ্টি ও আপতিক পৃথক বিষয়কেও প্রকৃত ও সম্পূর্ণভাবে জানতে অক্ষম কারণ এ চলে সেই একই পথে — বিভিন্ন অংশ ও অবয়ব ও গুণের বিশ্লেষণের দ্বারা এবং সে সবের সমবায়ের দ্বারা আর এইভাবে এ তার এমন একটা ব্যবস্থা খাড়া করে যা শুধু তার বাহ্য আকারমাত্র। এ তার বিষয়ের স্বরূপগত অন্তরতম সত্যের সংবাদ পেতে পারে, কিন্তু তার এ ক্ষমতা নেই যে এ ঐ স্বরূপগত জ্ঞানের মধ্যে সর্বদা ও জ্যোতির্ময়ভাবে বাস করবে এবং ঐ ক্ষমতাও নেই যে এ বাকী সবের উপর ভিতর থেকে বাইরের দিকে এমনভাবে কার্যকরী হবে যাতে বাহ্য অবস্থাগুলিকে দেখা যেতে পারে তাদের অন্তরঙ্গ বাস্তবতায় ও অর্থে আর যে আধ্যাত্মিক কিছু বিষয়টির সদ্‌বস্তু তার অনিবার্য ফল ও প্রকাশ ও রূপ ও ক্রিয়া হিসেবে। মনের পক্ষে এই সব করা অসম্ভব, সে পারে শুধু এ সবের জন্য প্রয়াস করতে ও তাদের এক আকার দিতে, কিন্তু এরা অতিমানসিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বগত ও স্বাভাবিক।

এই প্রভেদ থেকে অতিমানসের যে তৃতীয় বৈশিষ্ট্য উদিত হয় ও যা থেকে আমরা এই দুই প্রকার জ্ঞানের মধ্যে ব্যবহারিক পার্থক্য পাই তা এই যে এ সরাসরি সত্যজ্ঞ, অব্যবহিত, স্বগত ও স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানের এক দিব্যশক্তি, এক দিব্যভাবনা যা সকল

সদ্‌বস্তুকে প্রদীপ্তভাবে ধারণ করে এবং অবিদ্যার শক্তি যে মন তার মতো জানা থেকে অজানায় যাবার জন্য সঙ্কেত ও তর্কসম্মত অথবা অন্যান্য সোপানের উপর নির্ভর করে না। অতিমানস তার সকল জ্ঞান ধারণ করে নিজের মধ্যেই, সে নিজের শ্রেষ্ঠ দিব্য প্রজ্ঞায় সকল সত্যের চিরন্তন অধিকারী, আর এমনকি তার নিম্ন, সীমিত ও ব্যষ্টিভাবাপন্ন রূপগুলিতেও তার কাজ শুধু নিজের মধ্য থেকে সুপ্ত সত্য বাইরে আনা — এ এমন এক অনুভব যাকে প্রাচীন মনীষীরা প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছিলেন এই বলে যে সকল জানাই তার প্রকৃত উৎসে ও স্বভাবে শুধু আন্তরভাবে অবস্থিত জ্ঞানের স্মৃতির জাগরণমাত্র। অতিমানস চিরন্তনভাবে ও সকল স্তরে সত্যজ্ঞ এবং মানসিক ও জড়ীয় স্তরেও গূঢ়ভাবে অবস্থিত, মানসিক অজ্ঞানতার সকল বিষয়কেই, এমনকি সর্বাপেক্ষা অন্ধকারময় বিষয়গুলিকেও পর্যবেক্ষণ করে ও জানে, আর এর বিভিন্ন প্রণালী বোঝে ও তাদের পিছনে থাকে ও নিয়ন্ত্রণ করে, কারণ মনের মধ্যে সব কিছুই আসে অতিমানস থেকে — আর তা এ করবেই কারণ সব কিছু আসে চিৎপুরুষ থেকে। যা কিছু মানসিক সেসব অতিমানসিক সত্যের শুধু এক আংশিক, পরিবর্তিত, চাপা বা আধ-চাপা আকার, এর মহত্তর জ্ঞানের বিকৃতি অথবা গৌণ ও অপূর্ণ আকার। মন শুরু করে অজ্ঞানতা নিয়ে আর অগ্রসর হয় জ্ঞানের দিকে। বস্তুতঃ জড়বিশ্বে এর আবির্ভাব এমন এক প্রাথমিক ও বিশ্ব নিশ্চেতনা থেকে যা আসলে সর্বজ্ঞানী চিৎপুরুষের নিবর্তন; তার নিজের তন্ময় আত্মবিস্মৃত শক্তিতে; এবং সেজন্য এ দেখা দেয় এক বিবর্তনমূলক ধারার অংশ হিসেবে, প্রথমে, এ প্রকাশ্য ইন্দ্রিয়সংবিতের দিকে এক প্রাণিক অনুভব, তারপর ইন্দ্রিয়সংবিতে সমর্থ এক প্রাণিক মনের উদ্‌বর্তন, আর তা থেকে বিকশিত ভাবাবেগ ও কামনার মন, সচেতন সঙ্কল্প, বর্ধিষ্ণু বুদ্ধি। আর প্রতি পর্যায় হল নিগূঢ় অতিমানস ও চিৎপুরুষের মহত্তর চাপা শক্তির উদ্‌বর্তন।

মানবের মন যা নিজের সম্বন্ধে ও এর ভিত্তি ও চারিদিককার বিষয় সম্বন্ধে গভীর চিন্তা ও সুশৃঙ্খল অনুসন্ধান ও অবধারণে সমর্থ, সত্যে কিন্তু উপনীত হয় এক আদি অজ্ঞানতার পটভূমিকায় — এ এমন এক সত্য যা অনিশ্চয়তা ও প্রমাদের সতত ঘিরে-থাকা কুহেলিকার দ্বারা ক্লিষ্ট। এর নিশ্চিতভাবে জানা বিষয়গুলি আপেক্ষিক ও তাদের অধিকাংশই সংশয়ভরা নিশ্চিতবিষয়, আর না হয় স্বরূপগত অনুভূতি নয় এমন এক অপূর্ণ, অসম্পূর্ণ অনুভূতির শুধু সংশয়হীন আংশিক নিশ্চিত বিষয়। এ আবিষ্কারের পর আবিষ্কার করে, ভাবনার পর ভাবনা পায়, অনুভূতির পর অনুভূতি ও পরীক্ষণের পর পরীক্ষণ বৃদ্ধি পায় — কিন্তু চলার পথে এ অনেক কিছু হারায় ও বর্জন করে ও ভুলে যায় ও তাকে আবার অনেক ফিরে পেতে হয় — আর এর প্রয়াস হল এ যা সব জানে তাদের মধ্যে এক সম্বন্ধ স্থাপন করা তর্কসম্মত ও অন্যান্য অনুক্রম, বিভিন্ন তত্ত্ব ও এদের সব অধীন বিষয়, বিভিন্ন সামান্য ভাবনা ও এদের প্রয়োগ খাড়া ক'রে আর এই সব উপায়ে এ এমন এক সংগঠন গড়ে তোলে যার মধ্যে এ মানসিকভাবে বাস করতে, বিচরণ করতে ও কর্ম ও উপভোগ ও পরিশ্রম করতে সক্ষম। এই মানসিক জ্ঞান প্রসারে

সর্বদাই সীমিত: শুধু তাই নয়, এসবের উপর এ এমনকি স্বেচ্ছাকৃত অন্যান্য বাধা খাড়া করে যেজন্য এ মতামতের মানসিক কৌশলের দ্বারা সত্যের কতকগুলি অংশ ও দিক গ্রহণ করে ও বাকী সব বাদ দেয়, কারণ যদি এ সকল ভাবনাকেই স্বচ্ছন্দভাবে আসতে ও কাজ করতে দিত, যদি এ সত্যের বিভিন্ন আনন্ত্যের কাছে নত হত, তাহলে এ নিজেকে হারিয়ে ফেলত সামঞ্জস্যহীন বৈচিত্র্যের মধ্যে, অনির্দিষ্ট বিশালতার মধ্যে আর এর এমন শক্তি থাকত না যাতে এ কাজ ক'রে ব্যবহারিক পরিণাম ও ফলপ্রদ সৃজনে অগ্রসর হতে পারত। আর এমনকি যখন মানসিক জ্ঞান সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত ও সম্পূর্ণ, তখনো এ হল এক পরোক্ষ জ্ঞান, এই জ্ঞান বিষয়ের স্বরূপের জ্ঞান নয়, এই জ্ঞান তার বিভিন্ন আকারের জ্ঞান, বিভিন্ন প্রতিরূপের এক পদ্ধতি, বিভিন্ন সঙ্কেতের এক ব্যবস্থা — অবশ্য সেই সব ক্ষেত্রে তা নয় যেখানে কতকগুলি গতিবিধিতে এ নিজেকে ছাড়িয়ে, মানসিক ভাবনার উজানে আধ্যাত্মিক তাদাত্ম্যে যায়, তবে এ দেখে যে কতিপয় বিচ্ছিন্ন ও তীব্র আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ছাড়া সেখানে যাওয়া অতীব দুরূহ অথবা জ্ঞানের এই সব বিরল তাদাত্ম্যের সঠিক ব্যবহারিক পরিণাম বার করা বা কার্যকরী করা বা সংগঠন করাও অতীব দুরূহ। এই গভীরতম জ্ঞানের আধ্যাত্মিক অবধারণ ও চরিতার্থসাধনের জন্য যুক্তিশক্তি অপেক্ষা এক মহত্তর শক্তি প্রয়োজনীয়।

একমাত্র অতিমানসই, যা অনন্তের সঙ্গে অন্তরঙ্গ, এই কাজ করতে সক্ষম। অতিমানস সত্যের আন্তরভাব ও স্বরূপ, মুখমণ্ডল ও দেহ, ফল ও ক্রিয়া, বিভিন্ন তত্ত্ব ও অধীন বিষয়গুলি প্রত্যক্ষভাবে দেখে এক অবিভাজ্য সমগ্র হিসেবে, আনুষঙ্গিক ফলগুলি উৎপন্ন করে স্বরূপগত জ্ঞানের শক্তিতে, চিৎপুরুষের বিভিন্ন বৈচিত্র্য সাধন করে তার সব তাদাত্ম্যের আলোয়, এর আপতিক বিভাজনগুলি সৃষ্টি করে এর একত্বের সত্যে। অতিমানস তার আপন সত্যের জ্ঞাতা ও স্রষ্টা, কিন্তু মানবের মন যে জ্ঞাতা ও স্রষ্টা তা শুধু মিশ্রিত সত্য ও প্রমাদের অর্ধ-আলোকে ও অর্ধ-অন্ধকারে, আর তাছাড়া এ হল এমন এক বিষয়ের স্রষ্টা যা সে তার চেয়ে মহত্তর ও অতীত কিছু থেকে পায় পরিবর্তিত, রূপান্তরিত ও হ্রস্বীকৃত অবস্থায়। মানব এমন এক মানসিক চেতনার মধ্যে বাস করে যার একদিকে আছে এক বিশাল অবচেতনা যা তার দৃষ্টিতে এক অন্ধকারময় নিশ্চেতনা ও অন্যদিকে আছে এমন এক বিশালতর অতিচেতনা যাকে সে অপর এক তবে জ্যোতির্ময় নিশ্চেতনারূপে নিতে প্রবণ কারণ চেতনা সম্বন্ধে তার ভাবনা তার নিজের যে মধ্যবর্তী সংজ্ঞা অর্থাৎ মানসিক ইন্দ্রিয়সংবিৎ ও বুদ্ধি তার মধ্যেই নিবদ্ধ। ঐ জ্যোতির্ময় অতিচেতনার মধ্যেই অতিমানস ও চিৎপুরুষের বিভিন্ন স্তর বিদ্যমান।

আবার যেহেতু অতিমানস যেমন জানে তেমন কর্ম ও সৃষ্টি করে সেহেতু এ যে শুধু এক প্রত্যক্ষ সত্যচেতনা তা নয়, এ হল আবার এক প্রদীপ্ত, প্রত্যক্ষ ও স্বতঃস্ফূর্ত সত্যসঙ্কল্প। আত্মজ্ঞানী চিৎপুরুষের সঙ্কল্পের ভিতর এর সঙ্কল্প ও এর জ্ঞানের মধ্যে কোন বিরোধ, বিভাজন বা প্রভেদ নেই, আর থাকতে পারে না। আধ্যাত্মিক সঙ্কল্প হল চিৎপুরুষের চিন্ময় সত্তার তপঃ অথবা প্রবুদ্ধ শক্তি যা তার অন্তঃস্থ বিষয়কে অভ্রান্তভাবে

সফল করে; বিষয়সমূহ কাজ করে তাদের আপন আপন প্রকৃতি অনুযায়ী, ক্রিয়াশক্তি ফল ও ঘটনা উৎপন্ন করে তার অন্তঃস্থ শক্তি অনুযায়ী, ক্রিয়া এমন ফল ও ঘটনা সৃষ্টি করে যা তার স্বভাব ও অভিপ্রায়ের মধ্যে নিহিত থাকে; এই সবের এই যে অভ্রান্ত কার্যপ্রণালী একে আমরা তার বিভিন্ন রূপকে নানা নাম দিই, — প্রকৃতি, কর্ম, নিয়তি ও ভাগ্যের বিধান। মনের কাছে এই সব বিষয় তার বাইরে বা ঊর্ধ্বে অবস্থিত এমন এক শক্তির কর্ম যার মধ্যে এ নিজেই নিগৃহিত, আর এ হস্তক্ষেপ করে শুধু এক সহায়কর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা দিয়ে; এই প্রচেষ্টা কতকটা লক্ষ্যে যায় ও সফল হয়, কতকটা বিফল হয় ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় আর এমনকি সফল হলেও এর সফলতা বেশীরভাগই নষ্ট হয় এমন সব ফলের জন্য যেগুলি তার অভিপ্রায় থেকে ভিন্ন অথবা অন্ততঃ মহত্তর ও আরো সুদূরপ্রসারী। মানবের সঙ্কল্প কাজ করে অজ্ঞানতার মাঝে আর তা হয় এক আংশিক আলোর দ্বারা অথবা প্রায়শঃই আলোকের এমন চঞ্চল শিখার দ্বারা যা যেমন উজ্জ্বল করে তেমন বিভ্রান্ত করে। তার মন এক অজ্ঞানতা যা চেষ্টা করে জ্ঞানের বিভিন্ন মান খাড়া করতে, তার সঙ্কল্প এক অজ্ঞানতা যা চেষ্টা করে ন্যায্যতার বিভিন্ন মান খাড়া করতে, আর তার ফলে তার সমগ্র মানসিকতা হয়েছে এমন এক পরিবার যা নিজের বিরুদ্ধেই বিভক্ত — ভাবনার সঙ্গে ভাবনার বিরোধ, ন্যায্যতার বা বুদ্ধিগত জ্ঞানের আদর্শের সঙ্গে প্রায়ই সঙ্কল্পের বিরোধ। সঙ্কল্প নিজেই নানা আকার নেয় — বুদ্ধির সঙ্কল্প, ভাবমানসের বিভিন্ন ইচ্ছা, প্রচণ্ড ভাবাবেগ ও প্রাণিক সত্তার বিভিন্ন কামনা, স্নায়বিক ও অবচেতন প্রকৃতির বিভিন্ন প্রবেগ ও অন্ধ বা অর্ধ-অন্ধ অদম্য প্রবৃত্তি, আর এই সবে কখনই কোন সামঞ্জস্য আসে না, তবে বড় জোর থাকে বিরোধের মধ্যে মিলনের এক অনিশ্চিত সন্ধি। মন ও প্রাণের সঙ্কল্প হল যথার্থ শক্তির, যথার্থ তপস্-এর অন্বেষণে অন্ধের মতো ঘুরে বেড়ান, কিন্তু এই শক্তি, এই তপস্, তার সত্যকার ও সম্পূর্ণ আলোকে ও নির্দেশে পুরোপুরি পাওয়া যায় শুধু আধ্যাত্মিক ও অতিমানসিক সত্তার সঙ্গে একত্বের দ্বারা।

অপরদিকে, অতিমানসিক প্রকৃতি যুক্তিপূর্ণ, সুসমঞ্জস ও এক, সেখানে সঙ্কল্প ও জ্ঞান শুধু চিৎপুরুষের আলো ও চিৎপুরুষের শক্তি, শক্তি আলোকে সফল করে, আলো শক্তিকে দীপ্ত করে। সর্বোচ্চ অতিমানসিকতায়, এরা ঘনিষ্ঠভাবে সম্মিলিত; এমনকি পরস্পরের অনুবর্তী নয়, বরং এরা একই গতিধারা, সঙ্কল্প নিজেকে দীপ্ত করে, জ্ঞান নিজেকে সার্থক করে, উভয়ে মিলিয়ে সত্তার একটিমাত্র ধারা। মন শুধু বর্তমানকে জানে, আর বাস করে তার এক বিচ্ছিন্ন গতিধারায়, যদিও তার প্রয়াস হল অতীতকে স্মরণ করা ও ধরে রাখা আর ভবিষ্যৎকে পূর্বেই অনুমান করা ও প্রকাশ হতে বাধ্য করা। অতিমানসের ত্রিকালদৃষ্টি আছে; এ তিন কালকেই দেখে এক অবিভাজ্য গতি হিসেবে এবং আরো দেখে যে প্রত্যেকটির মধ্যে অন্য দুটি বর্তমান। এ সকল প্রবণতা, ক্রিয়াশক্তি ও শক্তিকে জানে ঐক্যের বিচিত্র লীলা হিসেবে এবং পরস্পরের সঙ্গে তাদের বিভিন্ন সম্বন্ধকে জানে অদ্বিতীয় চিৎপুরুষের একমাত্র অভিন্ন গতিবিধিতে। সুতরাং অতিমানসিক

সঙ্কল্প ও ক্রিয়া হল চিৎপুরুষের স্বতঃস্ফূর্ত আত্মচরিতার্থকর সত্যের সঙ্কল্প ও ক্রিয়া, এক প্রত্যক্ষ ও সমগ্র জ্ঞানের সঠিক গতিবিধি যা তার সর্বোচ্চস্তরে অভ্রান্ত।

পরম ও বিশ্বাত্মক অতিমানস হল মহেশ্বর ও স্রষ্টারূপী পরম ও বিশ্বাত্মক আত্মার সক্রিয় জ্যোতিঃ ও তপস্, এ তা-ই যাকে আমরা যোগে জানি দিব্য প্রজ্ঞা ও শক্তিরূপে, ঈশ্বরের সনাতন জ্ঞান ও সঙ্কল্প হিসেবে। পরম সৎ-এর বিভিন্ন সর্বোচ্চ লোকে যেখানে সব কিছুই জানা যায় এবং সব কিছুই অভিব্যক্ত হয় একমাত্র অস্তিত্বের বিভিন্ন অস্তিত্ব ব'লে, একমাত্র চেতনার চেতনা ব'লে, একমাত্র আনন্দের আনন্দময় আত্মসৃজন ব'লে, একমাত্র সত্যের বহু সত্য ও শক্তি ব'লে সেখানেই আছে তার আধ্যাত্মিক ও অতিমানসিক জ্ঞানের অক্ষত ও অখণ্ড বিলাস। আর আমাদের নিজেদের সত্তার অনুরূপ সব লোকে জীব আধ্যাত্মিক ও অতিমানসিক প্রকৃতির অংশ ভোগ করে এবং বাস করে তার আলোকে ও শক্তিতে ও আনন্দে। এই জগতের মধ্যে আমরা যা তার যতই সমীপে আমরা অবতরণ করি, ততই এই আত্মজ্ঞানের উপস্থিতি ও ক্রিয়া সঙ্কীর্ণ হয়, তবে যখন অতিমানসিক প্রকৃতির ও এর জানার ও সঙ্কল্প ও কাজ করার পদ্ধতির পূর্ণতা থাকে না তখনো তাতে স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সর্বদাই থাকে, কারণ এ তখনো বাস করে চিৎপুরুষের স্বরূপে ও দেহে। যখন আমরা জড়ের দিকে আত্মার অধোগতি অনুসরণ করি, তখন আমরা মনকে দেখি এমন এক উৎপন্ন বস্তু হিসেবে যা আত্মার পরিপূর্ণতা থেকে, এর আলো ও সত্তার পরিপূর্ণতা থেকে দূরে চলে যায়, আর বাস করে বিভাজন ও বিচ্যুতির মাঝে, সূর্যের দেহে নয়, তবে প্রথমে এর সমীপবর্তী ও পরে এর দূরবর্তী রশ্মিতে। এক সর্বোচ্চ বোধিমানস আছে যা আরো কাছাকাছিভাবে অতিমানসিক সত্য গ্রহণ করে, কিন্তু এমনকি এও এমন এক নির্মাণ যা ঐ প্রত্যক্ষ ও মহত্তর প্রকৃত জ্ঞানকে প্রচ্ছন্ন করে। এক বুদ্ধিগত মন আছে যা এক দীপ্তিমান অর্ধ-অস্বচ্ছ ঢাকনা, যা অতিমানসের জানা সত্যকে মাঝপথে রোধ করে এবং একে প্রতিফলিত করে এমন এক বাতাবরণে যা সৃষ্টি করে প্রোজ্জ্বল রূপবিকৃতি ও অবদমন ক'রে পরিবর্তন করে দেয় রূপাবলী। আরো এক নিম্ন মন আছে যা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ভিত্তির উপর নির্মিত আর এর ও জ্ঞানসূর্যের মাঝে থাকে এক ঘন মেঘ, এক ভাবময় ও ইন্দ্রিয়বোধাত্মক কুহেলিকা ও বাষ্প আর মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ও আলোর খেলা। এক প্রাণিক মন আছে যা এমনকি বুদ্ধিগত সত্যেরও আলো থেকে বঞ্চিত এবং আরো নীচে অবমানসিক প্রাণে ও জড়ে চিৎপুরুষ নিজেকে সম্পূর্ণ নিগূহিত করে যেন নিদ্রা ও রাত্রির মধ্যে — এ নিদ্রা মগ্ন থাকে এক অস্পষ্ট অথচ তীব্র স্নায়বিক স্বপ্নে, এই রাত্রি হল নিদ্রার মধ্যে বিচরণ-করা এক যান্ত্রিক ক্রিয়াশক্তির রাত্রি। এই নিম্নতম অবস্থার মধ্য থেকে চিৎপুরুষের পুনর্বিবর্তনের মাঝে আমরা নিজেদের দেখি নিম্ন সৃষ্টির ঊর্ধ্বে, যখন আমরা নিজেদের মধ্যে এই সব তুলে নিয়েছি এবং আমাদের আরোহণে এ যাবৎ পৌঁছেছি শুধু সুবিকশিত মানসিক যুক্তিশক্তির আলো পর্যন্ত। চিৎপুরুষের আত্মজ্ঞানের ও প্রদীপ্ত সঙ্কল্পের বিভিন্ন পূর্ণ শক্তি এখনো আমাদের নাগালের বাইরে — সে সব আছে মন ও যুক্তিশক্তির উপরে অতিমানসিক প্রকৃতিতে।

যদি এই হয় যে চিৎপুরুষ সর্বত্র, এমনকি জড়েও অবস্থিত — বস্তুতঃ জড় নিজেই চিৎপুরুষের শুধু এক অন্ধকারময় রূপ, আর যদি অতিমানস চিৎপুরুষের সর্বব্যাপী আত্মজ্ঞানের এমন বিশ্বশক্তি হয় যা সত্তার সকল অভিব্যক্তি সংগঠন করে, তাহলে জড়ে এবং সর্বত্র এক অতিমানসিক ক্রিয়া উপস্থিত থাকতে বাধ্য আর এ অন্য এক নিম্ন ও আরো আচ্ছন্ন প্রকারের ক্রিয়াধারার দ্বারা যতই প্রচ্ছন্ন হ'ক না কেন, তবু যখন আমরা নিবিষ্টভাবে দেখি তখন আমরা দেখতে পাই যে প্রকৃতপক্ষে অতিমানসই জড়, প্রাণ, মন ও যুক্তিশক্তি সংগঠন করে। আর বাস্তবিকপক্ষে এই জ্ঞানের দিকেই আমরা এখন অগ্রসর হচ্ছি। এমনকি, প্রাণ, জড় ও মনে দৃঢ়স্থায়ী এমন এক সুস্পষ্ট অন্তরঙ্গ ক্রিয়া আছে যা স্পষ্টতঃই অতিমানসিক ক্রিয়া, তবে নিম্ন মাধ্যমের প্রকৃতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী মন্দীভূত, আর একেই আমরা বলি বোধি কারণ তার সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য হল প্রত্যক্ষ দর্শন ও স্বয়ংক্রিয় জ্ঞান, — প্রকৃতপক্ষে এমন এক দর্শন যার উৎপত্তি হয়েছে জ্ঞানের বিষয়ের সঙ্গে কোন নিগূঢ় তাদাত্ম্য থেকে। কিন্তু যাকে আমরা বোধি বলি তা অতিমানসের উপস্থিতির শুধু এক আংশিক সঙ্কেত, আর যদি আমরা এই উপস্থিতি ও শক্তিকে তার প্রশস্ততম প্রকৃতিতে বিবেচনা করি আমরা দেখব যে এ হল এক প্রচ্ছন্ন অতিমানসিক শক্তি যার মধ্যে আত্মসচেতন জ্ঞান নিহিত ও যা জড়শক্তির সমগ্র ক্রিয়া অনুপ্রাণিত করে। যাকে আমরা প্রকৃতির নিয়ম বলি তাকে নির্ধারণ করে এই, প্রতি বিষয়ের নিজস্ব প্রকৃতি অনুযায়ী এ তার ক্রিয়া রক্ষা করে এবং এই সমগ্রকে সুসমঞ্জস ও বিকশিত করে; তা না হলে এসব এমন এক আকস্মিক সৃষ্টি হ'ত, নির্ঋতির মধ্যে যে কোন মুহূর্তে যার ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা থাকত। প্রকৃতির সকল নিয়ম এমন এক বিষয় যা তার ক্রিয়াধারার রীতিতে সঠিক, কিন্তু তবু ঐ রীতির কারণের দিক থেকে এবং বিধির মাপের সমবায়ের অভিপ্রায়ের, ফলের স্থিরতার কারণের দিক থেকে এ হল এমন বিষয় যার ব্যাখ্যা সম্ভব নয়, প্রতিপদে আমরা দেখি এর রহস্য ও অলৌকিকতা, আর তা হতে বাধ্য কারণ হয় এ এমন কিছু যা তার নিয়মিত কার্যেও অযৌক্তিক ও আকস্মিক, আর না হয় এ হল বুদ্ধির অতীত কিছু, এমন কিছু যার সত্য আমাদের বুদ্ধির তত্ত্ব অপেক্ষা মহত্তর কোন তত্ত্বের অন্তর্গত। ঐ তত্ত্ব হল অতিমানসিক তত্ত্ব; অর্থাৎ প্রকৃতির প্রচ্ছন্ন রহস্য হল চিৎপুরুষের স্বপ্রতিষ্ঠ সত্যের অনন্ত যোগ্যতার মধ্য থেকে এমন কিছুর সংগঠন যার স্বরূপ পরিপূর্ণভাবে স্পষ্ট হয় শুধু সেই আদি জ্ঞানের কাছে যার উৎপত্তির ও ক্রিয়ার কারণ হল এক মৌলিক তাদাত্ম্য, চিৎপুরুষের নিত্য আত্ম-অনুভব। প্রাণেরও সকল ক্রিয়া এবং মন ও যুক্তিশক্তিরও সকল ক্রিয়া এই প্রকারের — যুক্তিশক্তিই সত্তার এক মহত্তর যুক্তিশক্তি ও বিধানের ক্রিয়া প্রথম সর্বত্র অনুভব করে, ও চেষ্টা করে একে নিজের প্রত্যয়গত রচনার দ্বারা রূপ দিতে, যদিও এ সর্বদা বোঝে না যে কর্মরত বিষয়টি মানসিক বুদ্ধি নয়, অন্য কিছু, মানসিক শব্দব্রহ্ম নয়, অন্য কিছু। বাস্তবিকপক্ষে এই সব ক্রিয়াধারা তাদের গূঢ় পরিচালনায় আধ্যাত্মিক ও অতিমানসিক, কিন্তু তাদের প্রকাশ্য পদ্ধতিতে মানসিক, প্রাণিক ও ভৌতিক।

অতিমানসের এই যে গুহ্য ক্রিয়া তার বাহ্য জড়, প্রাণ, মনের অধিকারে নেই যদিও এ তাদের বিভিন্ন ক্রিয়ার উপর যে রীতি আরোপ করে তার দ্বারা এরা সর্বদাই অধিগত ও চলতে বাধ্য হয়। এমন কিছু আছে যার সম্বন্ধে আমরা কখনও কখনও বলতে চাই যে এ জড়শক্তি ও পরমাণুর মধ্যে ক্রিয়াশীল বুদ্ধি ও সঙ্কল্প (যদিও এই কথাগুলি ভুল মনে হয়, কারণ এ সত্যই আমাদের আপন বুদ্ধি ও সঙ্কল্প নয়); আমরা একে বলতে পারি আত্ম-অস্তিত্বের কর্মরত গোপন বোধি; কিন্তু পরমাণু ও শক্তি এর কথা জানে না, এরা শুধু সেই জড়ের ও সামর্থ্যের অন্ধকারাচ্ছন্ন দেহ যা সৃষ্ট হয়েছিল তার আত্ম-অভিব্যক্তির প্রথম প্রয়াসের দ্বারা। এরকম এক বোধি যে প্রাণের সকল ক্রিয়াতেই আছে তা আমাদের কাছে আরো স্পষ্ট হয় কেননা এ আমাদের নিজেদের পর্যায়ের আরো সমীপবর্তী। আর যখন প্রাণ প্রকাশ্য ইন্দ্রিয় ও মন বিকশিত করে, যেমন পশু-সৃষ্টিতে হয়, তখন আমরা আরো প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারি যে এমন এক প্রাণিক বোধি আছে যা এর কার্যাবলীর পশ্চাতে অবস্থিত, আর পশুমনে আবির্ভূত হয় সহজাতসংস্কারের স্পষ্ট রূপে — এই সহজসংস্কার হল পশুর মধ্যে স্থাপিত এক স্বয়ংক্রিয় জ্ঞান, যা নিশ্চিত, প্রত্যক্ষ, স্বপ্রতিষ্ঠ, আত্মচালিত, আর যার অর্থ এই যে তার সত্তার কোথাও উদ্দেশ্য, সম্বন্ধ, বিষয় বা অর্থ সম্বন্ধে এক সঠিক জ্ঞান আছে। এ প্রাণশক্তি ও মনের মধ্যে কাজ করে, কিন্তু তবু উপরতলার প্রাণ ও মন এর অধিকারী নয়, এবং এ কি করে সে সম্বন্ধে কোন বিবরণ দিতে অক্ষম অথবা নিজের ইচ্ছা ও খুশীমতো শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ বা প্রসারিত করতে সক্ষম নয়। এখানে আমরা দুটি জিনিস লক্ষ্য করি, প্রথম এই যে প্রকাশ্য বোধি কাজ করে শুধু সীমিত প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যের জন্য আর প্রকৃতির অবশিষ্ট কার্যসমূহে দ্বিবিধ ক্রিয়া বর্তমান, একটি অনিশ্চিত ও উপরভাসা চেতনা সম্বন্ধে অজ্ঞ, আর অপরটি অধিচেতন যাতে বোঝায় এক গূঢ় অবচেতন পন্থা। উপরভাসা চেতনা হাতড়ানো ও খোঁজায় পূর্ণ আর যতই প্রাণ তার পর্যায়ে ঊর্ধ্বে ওঠে ও তার বিভিন্ন সচেতন শক্তির ক্ষেত্রে প্রসার লাভ করে ততই ঐ অন্ধের মতো খোঁজা কম হওয়ার চেয়ে বরং বৃদ্ধি পায়; কিন্তু অন্তঃস্থ গূঢ় আত্মা প্রাণিক মনের হাতড়ানো সত্ত্বেও সত্তার প্রয়োজন, উদ্দেশ্য ও নিয়তির জন্য যে প্রকৃতির ক্রিয়া ও ফল আবশ্যক তা নিশ্চিত করে। উত্তরোত্তর উচ্চ পর্যায়েও মানবীয় যুক্তিশক্তি ও বুদ্ধি পর্যন্ত এটি চলতে থাকে।

মানবের সত্তাও বিভিন্ন শারীরিক, প্রাণিক, ভাবময়, চৈত্য ও স্ফুরন্ত সহজসংস্কার ও বোধিতে পূর্ণ কিন্তু পশুর মতো মানব তাদের উপর নির্ভর করে না — যদিও পশু ও নিম্ন সৃষ্টি অপেক্ষা তার মাঝে সে সবের ক্ষেত্র আরো অনেক বেশী বিস্তৃত ও ক্রিয়া আরো বিশাল হতে সমর্থ, আর তার কারণ হল তার সত্তার মহত্তর বাস্তব বিবর্তনমূলক বিকাশ এবং বিকাশের আরো অধিক যোগ্যতা। সে এসবকে চেপে রেখেছে, পুষ্টি না দিয়ে তাদের পূর্ণ ও প্রকাশ্য ক্রিয়া বন্ধ করেছে — তবে এই সামর্থ্যগুলি যে ধ্বংস হয়েছে তা নয়, এদের বরং পিছনে ধরে রাখা হয়েছে অথবা অধিচেতনার মধ্যে আবার ফেলে দেওয়া হয়েছে — আর এর ফলে, ক্ষুদ্রতর সীমার মধ্যে পশু অপেক্ষা তার সত্তার এই

নিম্ন অংশ নিজের সম্বন্ধে অনেক কম নিশ্চিত, তার প্রকৃতির নির্দেশ সম্বন্ধে অনেক কম আস্থাবান এবং তার বৃহত্তর ক্ষেত্রে অনেক বেশী অন্ধান্বেষী, স্খলনশীল ও ভ্রান্তিপ্রবণ। এরকম হওয়ার কারণ এই যে মানবের প্রকৃত ধর্ম ও সত্তার বিধান হল এক মহত্তর আত্মসচেতন অস্তিত্বের অন্বেষণ আস্পৃহা করা, আর আস্পৃহা করা এমন এক আত্ম-অভিব্যক্তির যা আর অস্পষ্ট থাকবে না, অথবা কোন না-বোঝা রীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে না, বরং প্রদীপ্ত থাকবে, যা নিজেকে প্রকাশ করছে তার সম্বন্ধে সচেতন হবে এবং সমর্থ হবে একে আরো সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করতে। এবং অবশেষে তার চরম পরিণতি হবে তার মহত্তম ও প্রকৃত আত্মার সঙ্গে নিজেকে এক করা এবং কাজ করা অথবা বরং একে কাজ করতে দেওয়া (কারণ তার প্রকৃত অস্তিত্ব হল চিৎপুরুষের প্রকাশের এক করণগত রূপ) তার স্বতঃস্ফূর্ত পূর্ণ সঙ্কল্পে ও জ্ঞানে। এই সংক্রমণের জন্য তার প্রথম করণ হল যুক্তিশক্তি ও যুক্তিময় বুদ্ধির সঙ্কল্প আর যতদূর পর্যন্ত এর বিকাশ হয়েছে ততদূর পর্যন্ত সে তার জ্ঞান ও চলার জন্য এর উপর নির্ভর করতে এবং একে তার সত্তার বাকী অংশের নিয়ন্ত্রণ দিতে প্রবৃত্ত হয়। আর যুক্তিশক্তি যদি আত্মা ও চিৎপুরুষের শ্রেষ্ঠ বিষয় এবং মহত্তম সু-পর্যাপ্ত সাধন হ'ত তাহলে সে সমর্থ হ'ত এর দ্বারা তার প্রকৃতির সকল গতিবিধিকে সম্পূর্ণভাবে জানতে ও সুষ্ঠুভাবে চালাতে। এ সে পুরোপুরি করতে অক্ষম কারণ তার আত্মা তার যুক্তিশক্তি অপেক্ষা বৃহত্তর বিষয় আর যদি সে যুক্তিময় সঙ্কল্প ও বুদ্ধির দ্বারা নিজেকে সীমাবদ্ধ করে, তাহলে সে তার আত্মবিকাশ, আত্মপ্রকাশ, জ্ঞান, ক্রিয়া, আনন্দের উপর প্রসারে ও প্রকারে উভয়ভাবেই আরোপ করে এক স্বেচ্ছাচারমূলক সীমাবন্ধন। তার সত্তার অন্যান্য অংশ আবার এক সম্পূর্ণ প্রকাশ চায় আত্মার বৃহত্ত্বে ও উৎকর্ষে আর তারা তা পায় না যদি যুক্তিময় বুদ্ধির অনমনীয় যন্ত্রের দ্বারা তাদের প্রকাশ অন্য প্রকারে পরিবর্তিত ও কর্তিত হয়, ছিন্ন ও স্বেচ্ছাচারমূলকভাবে গঠিত ও যান্ত্রিকভাবাপন্ন করা হয়। যুক্তিশক্তির দেবতা, বুদ্ধিগত শব্দব্রহ্ম হল মহত্তর অতিমানসিক শব্দব্রহ্মের শুধু এক আংশিক প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্ত বিষয়, আর তার কাজ হল প্রাণীর জীবনের উপর এক প্রাথমিক আংশিক জ্ঞান ও শৃঙ্খলা স্থাপন করা, কিন্তু প্রকৃত, অন্তিম ও সর্বাঙ্গীন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করা যায় শুধু আধ্যাত্মিক অতিমানসের উদ্‌বর্তনের দ্বারা।

অপরা প্রকৃতিতে যে অতিমানস থাকে তার প্রবলতম রূপ হল বোধি, সুতরাং স্বপ্রতিষ্ঠ, স্বতঃস্ফূর্ত ও সরাসরি অতিমানসিক জ্ঞানের দিকে প্রথম পদক্ষেপ নেবার উপায় হল বোধিমানসের বিকাশসাধন। মানবের সকল শারীরিক, প্রাণিক, ভাবময়, চৈত্য, স্ফুরন্ত প্রকৃতি হল এই সব অংশের অধিচেতন বোধিময় আত্মসত্তা থেকে যে সব আভাসন ওঠে সে সবের উপরভাসা গ্রহণ এবং যে প্রকৃতি আন্তর শক্তি ও জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশ্যভাবে আলোকিত হয়নি তার বাহ্য আকার ও সামর্থ্যের ক্রিয়ায় সেই সব আভাসনগুলিকে ফলিত করার জন্য এক চেষ্টা যা সাধারণতঃ অন্ধ অন্বেষণ ও প্রায়ই কুটিলপথগামী। তারা কি পেতে চাইছে তা আবিষ্কার করার এবং তাদের আত্মপ্রকাশের

অভীষ্ট সিদ্ধিতে তাদের নিয়ে যাবার সর্বোত্তম সুযোগ যার আছে তা হল বর্ধিষ্ণু বোধিমানস। যুক্তিশক্তি হল উপরভাসা নিয়ামক বুদ্ধির দ্বারা সেই সব আভাসনের শুধু এক বিশেষ প্রকারের প্রয়োগ যেগুলি বাস্তবিকই আসে বোধিময় চিৎপুরুষের প্রচ্ছন্ন কিন্তু কখনও কখনও আংশিকভাবে প্রকাশ্য ও সক্রিয় সামর্থ্য থেকে। এর সকল ক্রিয়ার মধ্যেই তাদের উৎপত্তির আবৃত বা অর্ধ-আবৃত বিন্দুতে এমন কিছু থাকে যা যুক্তির সৃষ্টি নয় বরং আসে হয় প্রত্যক্ষভাবে বোধি হতে, না হয় পরোক্ষভাবে মনের অন্য কোন অংশের মাধ্যমে যাতে এ তাকে আকার দিতে পারে বুদ্ধিগত রূপে ও প্রণালীতে। যুক্তিপূর্ণ বিচার তার সংক্ষিপ্ত অথবা তার আরো বিস্তৃত সব ক্রিয়ায় যেসব সিদ্ধান্তে আসে এবং তর্কগত বুদ্ধির যে যান্ত্রিক প্রণালী অবলম্বন করে সেসবে প্রচ্ছন্ন থাকে, অথচ সে সময় পরিস্ফুট হয় আমাদের সঙ্কল্প ও চিন্তাকার্যের প্রকৃত উৎস ও স্বকীয় ধাতু। মনের মধ্যে তারাই মহত্তম যাদের মধ্যে এই আবরণ ক্ষীণ হয়ে আসে আর বেশীরভাগই থাকে বোধিময় চিন্তা, আর এর সঙ্গে অবশ্য প্রায়ই থাকে, তবে সর্বদা নয়, বুদ্ধিগত ক্রিয়ার বিশাল সহগামী প্রকাশ। কিন্তু মানবের বর্তমান মনে বোধিময় বুদ্ধি কখনই শুদ্ধ ও সম্পূর্ণ হয় না কারণ এ কাজ করে মনের মাধ্যমে আর তখনই একে ধরে এর উপর দেওয়া হয় মানসিকতার মিশ্রিত উপাদানের প্রলেপ। অন্যান্য মানসিক করণগুলি যে সব কাজ এখন করে সে সবের পক্ষে পর্যাপ্ত হওয়ার জন্য তখনো এর প্রকাশ, বিকাশ ও উৎকর্ষসাধন করা হয় না, আর একে শিক্ষাও দেওয়া হয় না যাতে এ সেসব নিয়ে তাদের পরিবর্তিত বা নিজস্থলাভিষিক্ত করতে পারে সর্বাপেক্ষা পূর্ণ, প্রত্যক্ষ, নিশ্চিত ও পর্যাপ্ত ক্রিয়ায়। অবশ্য এটা করা যায় শুধু যদি আমরা বোধিমানসকে এক মধ্যবর্তী সাধন করি এই উদ্দেশ্যে যে এ যার মনোময় রূপ, সেই গূঢ় অতিমানসকে স্বয়ং বাইরে আনা হবে এবং আমাদের সম্মুখচেতনায় অতিমানসের দেহ ও করণ গঠন করা হবে যাতে আত্মা ও চিৎপুরুষের পক্ষে সম্ভব হবে নিজেকে প্রকাশ করতে নিজের বৃহত্ত্বে ও জ্যোতিতে।

একথা স্মরণ রাখতেই হবে যে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পরম অতিমানস এবং জীব যে অতিমানস লাভ করতে সক্ষম — এই দুয়ের মধ্যে সর্বদাই এক প্রভেদ থাকে। মানবীয় সত্তা উঠেছে অজ্ঞানতার মধ্য থেকে আর যখন সে আরোহণ করে অতিমানসিক প্রকৃতির মধ্যে তখন সে এর মধ্যে দেখবে এর উৎক্রান্তির বিভিন্ন পর্যায়, এবং উচ্চতর শিখরগুলিতে ওঠবার আগে তার প্রথম গঠন করা চাই নিম্নতর পর্যায়গুলি ও সীমিত সোপানসমূহ। পরম চিৎপুরুষের সঙ্গে একত্বের দ্বারা সেখানে সে উপভোগ করবে অনন্ত আত্মার পরিপূর্ণ স্বরূপগত আলোক, শক্তি, আনন্দ, কিন্তু স্ফুরন্ত বহিঃপ্রকাশে এর নিজেকে সবিশেষ ও ব্যষ্টিভাবাপন্ন করা চাই সেইরকম আত্মপ্রকাশ অনুযায়ী যা বিশ্বাতীত ও বিশ্বাত্মক চিৎপুরুষ জীবের মধ্যে ইচ্ছা করেন। আমাদের যোগের, আর বিশেষ করে এর স্ফুরন্ত দিকের উদ্দেশ্য হল ভগবৎ-উপলব্ধি ও ভগবৎপ্রকাশ, এ হল আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের দিব্য আত্মপ্রকাশ, তবে মানবতার বিভিন্ন অবস্থার অধীনে ও দিব্যভাবাপন্ন মানবীয় প্রকৃতির মাধ্যমে।

বিংশ অধ্যায়

বোধিমানস

অতিমানসের মূল স্বরূপ হল অনন্তের এবং বিষয়সমূহের অন্তঃস্থ বিশ্বাত্মক চিৎপুরুষ ও আত্মার আত্মজ্ঞান ও সর্বজ্ঞান যা বিশ্বের ও বিশ্বস্থ সকল বিষয়ের বিকাশ ও নিয়মিত ক্রিয়ার জন্য তার নিজের প্রজ্ঞা ও কার্যকরী সর্বশক্তিমত্তা সংগঠন করে এক প্রত্যক্ষ আত্মজ্ঞানের ভিত্তির উপর এবং এর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী। আমরা বলতে পারি, যে পরম চিৎপুরুষ তার নিজের বিশ্বের অধীশ্বর, এ হল তার অর্থাৎ "আত্মার", "জ্ঞাতার", "ঈশ্বরের" বিজ্ঞান। যেমন এ নিজেকে জানে, তেমন এ সকল বিষয়কেই জানে — কারণ সবই তার নিজের সম্ভূতিমাত্র — প্রত্যক্ষভাবে, সমগ্রভাবে, জানে ভিতর থেকে বাইরের দিকে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতি খুঁটিনাটি ও বিন্যাসে, আর প্রতি বিষয়কে জানে তার নিজের সত্যে ও তার প্রকৃতিতে এবং অন্য সব বিষয়ের সঙ্গে তার সম্বন্ধে। আর সেইরকম এ তার শক্তির সকল ক্রিয়াকে জানে অভিব্যক্তির পূর্বনিমিত্তে বা কারণে ও প্রসঙ্গে ও ফলে ও পরিণামে, সকল বিষয়কে জানে অনন্ত ও সীমিত যোগ্যতায় ও বাস্তবতার নির্বাচনে ও তাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের পরম্পরায়। বিশ্বের মধ্যে এক ভাগবত পুরুষের সংগঠনকারী অতিমানস হবে তাঁর নিজের ক্রিয়ার ও প্রকৃতির ও এর এলাকাভুক্ত সব কিছুর উদ্দেশ্যের জন্য এবং সে সবের ক্ষেত্রের মধ্যে এই সর্বশক্তিমত্তার ও সর্বজ্ঞানের প্রতিনিধি। কোন ব্যষ্টির মধ্যে অতিমানস সেইরকম এক প্রতিনিধি হবে — তা এ যে কোন মাত্রার হ'ক এবং যে কোন এলাকার ভিতর হ'ক। কিন্তু যেখানে দেবতার মধ্যে তা হবে এমন এক সামর্থ্যের প্রত্যক্ষ ও অব্যবহিত প্রতিনিধি যা নিজে অসীম ও শুধু ক্রিয়ায় সীমিত, কিন্তু অন্যথায় ক্রিয়াধারায় অপরিবর্তিত, সত্তার পক্ষে সর্বদা স্বাভাবিক, পরিপূর্ণ ও মুক্ত, সেখানে মানবের মাঝে অতিমানসের কোন উদ্‌বর্তনকে হতে হবে এক উত্তরোত্তর সৃষ্টি, আর প্রথমে তা হবে এক অপূর্ণ সৃষ্টি এবং তার সাধারণ মনে তা হবে অনন্যসাধারণ ও সামান্যোত্তর সঙ্কল্প ও জ্ঞানের কার্যধারা।

প্রথমতঃ এ তার পক্ষে এমন কোন স্বকীয় শক্তি হবে না যা সর্বদাই অবিরাম ভোগ করা যায়, এ হবে এমন এক গূঢ় যোগ্যতা যা আবিষ্কার করতে হবে এবং যার জন্য তার বর্তমান শারীরিক বা মানসিক সংস্থানে কোন অঙ্গ নেই: এর জন্য হয় তাকে কোন নতুন অঙ্গ বিকশিত করতে হবে, আর না হয় বর্তমান অঙ্গগুলিকেই গ্রহণ বা রূপান্তরিত ক'রে কার্যোপযোগী করতে হবে। তার নিগূঢ় সত্তার অধিমানস গুহায় অতিমানসের প্রচ্ছন্ন সূর্যকে অনাবৃত করা অথবা আধ্যাত্মিক গগনে তার মুখমণ্ডল থেকে মানসিক অজ্ঞানতার মেঘ অপসারণ করা যাতে এ তৎক্ষণাৎ উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ হতে পারে তার পূর্ণ

মহিমায়, — এই মাত্র তার কাজ নয়। তার কাজ আরো অনেক জটিল ও দুরূহ, কারণ সে এক বিবর্তনশীল সত্তা আর যে প্রকৃতির সে এক অংশ তার বিবর্তনের দ্বারা তাকে গঠন করা হয়েছে এক নিম্নপ্রকারের জ্ঞানের দ্বারা, আর জ্ঞানের এই নিম্ন শক্তি, মানসিক শক্তি তার দৃঢ় অভ্যস্ত ক্রিয়ার দ্বারা তার নিজের প্রকৃতি অপেক্ষা মহত্তর কোন নূতন গঠনের প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছে। যে শক্তিগুলির জন্য তাকে বর্তমানে অন্যান্য পার্থিব প্রাণী থেকে পৃথক করা হয় তা হল এক সীমিত মানসিক বুদ্ধি যা সীমিত ইন্দ্রিয়গত মনকে আলোকিত করে এবং তার যুক্তিশক্তি ব্যবহারের সামর্থ্য, যদিও তার পর্যাপ্ত বিস্তার সর্বদা সুষ্ঠুভাবে প্রযুক্ত হয় না। এই ইন্দ্রিয়গত মন, এই বুদ্ধি, এই যুক্তিশক্তি যতই কম পর্যাপ্ত হ'ক, এই সব করণগুলিকেই সে বিশ্বাস করতে শিখেছে এবং তাদের সাহায্যে এমন কতকগুলি ভিত্তি নির্মাণ করেছে যাদের সে নাড়াতে চায় না এবং এমন গণ্ডি টেনেছে যার বাইরে সে বোধ করে সব কিছু বিশৃঙ্খলাময়, অনিশ্চিত ও বিপদপূর্ণ দুঃসাহসিক কর্ম ব'লে। উপরন্তু পরতর তত্ত্বে সংক্রমণের অর্থ শুধু যে তার সমগ্র মন, যুক্তিশক্তি ও বুদ্ধির দুরূহ রূপান্তর তা নয়, এ হল এক অর্থে তাদের সকল পদ্ধতির পরাবর্তন। পরিবর্তনের এক বিশেষ সঙ্কটপূর্ণ রেখার উর্ধ্বে আরোহণকারী পুরুষ দেখে যে তার সকল পূর্বতন কার্যধারা হল নিম্ন ও অজ্ঞানময় ক্রিয়া এবং তাকে অন্য এক প্রকার কর্মপ্রণালী সাধন করতে হয় যা যাত্রা শুরু করে এক ভিন্ন বিন্দু থেকে আর যাতে থাকে সত্তার শক্তির সম্পূর্ণ অন্য এক প্রকারের প্রবর্তনা। যদি পশুমনকে বলা হ'ত ইন্দ্রিয়-সংবেগ, ইন্দ্রিয়-বোধ ও সহজসংস্কার ছেড়ে যুক্তিশীল বুদ্ধির বিপদপূর্ণ দুঃসাহসিক অভিযানে আসতে, এ সম্ভবতঃ সন্ত্রস্ত হয়ে ফিরে আসত, আর চেষ্টা করার তার কোন ইচ্ছা থাকত না। এখানে মানবমনকে আহ্বান করা হয় আরো বেশী পরিমাণের পরিবর্তন ঘটাতে আর যদিও এ তার সম্ভাবনার গণ্ডির মধ্যে আত্মসচেতন ও দুঃসাহসী, তবু এই আহ্বানকে সে সম্ভবতঃ মনে করে এ তার গণ্ডি ছাড়িয়ে আর সে এই দুঃসাহসিক কাজটি বর্জন করে, বস্তুতঃ এই পরিবর্তন সম্ভব হয় একমাত্র যদি প্রথমে আমাদের চেতনার বর্তমান স্তরের উপর আধ্যাত্মিক বিকাশ হয় আর এটি নিশ্চিন্তভাবে গ্রহণ করা যায় কেবল তখনই যখন মন অন্তঃস্থ মহত্তর আত্মা সম্বন্ধে সচেতন, অনন্তের প্রেমে মুগ্ধ এবং ভগবান ও তাঁর মহাশক্তির সান্নিধ্য ও দেশনা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছে।

এই রূপান্তরের দুরূহ কাজটির প্রথম পর্যায় হল এক মধ্যবর্তী অবস্থার মধ্য দিয়ে গমন এবং তা হয় এমন এক শক্তির সাহায্যে যা মানবমনের মধ্যে পূর্ব থেকেই কর্মরত এবং যাকে আমরা বুঝতে পারি এমন কিছু ব'লে যা স্বরূপতঃ বা অন্ততঃ মূলে অতিমানসিক অর্থাৎ বোধিশক্তি, এমন এক সামর্থ্য যার উপস্থিতি ও কার্যাবলী আমরা অনুভব করি এবং যখন এ কাজ করে তখন এর মহত্তর দক্ষতা, আলোক, প্রত্যক্ষ চিদাবেশ ও শক্তির দ্বারা মুগ্ধ হই, তবে আমাদের যুক্তিশক্তির কর্মধারাকে আমরা যেমন বুঝি বা বিশ্লেষণ করি এই বোধিকে তেমন বুঝতে বা বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হই না। যুক্তিশক্তি নিজেকে বোঝে, কিন্তু এর উজানে যা আছে তা বোঝে না — তার সম্বন্ধে এ

শুধু এক সাধারণ আকার বা প্রতিরূপ গড়তে সক্ষম; একমাত্র অতিমানসই সক্ষম নিজের বিভিন্ন কাজের পদ্ধতি সম্যক্ জানতে। বর্তমানে বোধির শক্তি আমাদের মধ্যে কাজ করে বেশীরভাগই গুহ্যভাবে, এর কাজ যুক্তিশক্তি ও সাধারণ বুদ্ধির ক্রিয়ার মধ্যে নিগূঢ় ও নিগূহিত থাকে অথবা বেশীরভাগই তার দ্বারা আবৃত থাকে; যেখানে এ স্পষ্ট পৃথক ক্রিয়ারূপে আবির্ভূত হয় সেখানে এ তখনো সাময়িক, আংশিক, খণ্ডিত এবং সবিরাম প্রকৃতির। এ হঠাৎ এক আলো ফেলে, প্রদীপ্ত আভাসন দেয় অথবা একটিমাত্র উজ্জ্বল সন্ধানসূত্র নিক্ষেপ করে অথবা অল্পসংখ্যক বিচ্ছিন্ন বা সম্বন্ধযুক্ত বোধি, ভাস্বর পার্থক্যজ্ঞান, চিদাবেশ বা দিব্য প্রকাশ বিকিরণ করে, আর যুক্তিশক্তি, সঙ্কল্প, মানসিক বোধ বা বুদ্ধিকে সুযোগ দেয় যেন এদের প্রত্যেকে আমাদের সত্তার অন্তঃস্থল বা শিখর থেকে এই যে সাহায্যের বীজ এসেছে তা নিয়ে যা পারে বা ইচ্ছা হয় তা করে। মানসিক শক্তিগুলি তখনই অগ্রসর হয় এইসব বিষয়গুলি আয়ত্ত ক'রে সে সবকে আমাদের মানসিক বা প্রাণিক উদ্দেশ্যের জন্য ব্যবহার করতে ও কাজে লাগাতে, সেগুলিকে নিম্নজ্ঞানের বিভিন্ন রূপের উপযোগী করতে, আর মানসিক উপাদান ও আভাসন দিয়ে তাদের উপর প্রলেপ দিতে অথবা ভিতর ভরিয়ে দিতে; এই প্রণালীতে এরা সে সব বিষয়ের সত্য প্রায়ই বিকৃত করে এবং এই সব বাইরের জিনিস এনে এবং নিম্ন কার্যসাধকের প্রয়োজনের অধীন ক'রে এরা সর্বদাই তাদের আলোক দেওয়া ভব্য শক্তিকে সীমিত করে; আবার প্রায় সর্বদাই এরা বিষয়গুলিকে একই সঙ্গে অত্যন্ত বেশী ছোট ও অত্যন্ত বেশী বড় করে — ছোট করে সেগুলিকে স্থিতিলাভের ও তাদের দীপ্তির পূর্ণ শক্তিকে প্রসার করার সময় না দিয়ে, আর বড় করে সেইগুলির উপর জোর দিয়ে বরং মানসিকতা তাদের যে রূপের ছাঁচে ঢেলে গড়েছে সেই রূপের উপর জোর দিয়ে, যার ফলে বোধিশক্তির আরো সঙ্গত ব্যবহার যা বৃহত্তর সত্য দিতে পারত তা বাদ পড়ে যায়। এইভাবে বোধি সাধারণ মানসিক কার্যগুলির মধ্যে প্রবেশ ক'রে কাজ করে বিদ্যুৎ ঝলকে যা সত্যের কিছু স্থান উজ্জ্বল করে, কিন্তু এ এমন কোন স্থির সূর্যালোক নয় যা আমাদের মনন ও সঙ্কল্প ও বেদনা ও ক্রিয়ার সমগ্র ক্ষেত্র ও রাজ্য নিশ্চিতভাবে আলোকিত করে।

স্পষ্টতঃই, উন্নতির দুইটি আবশ্যকীয় পথ আছে যা আমাদের অনুসরণ করা চাই, আর প্রথমটি হল বোধির ক্রিয়াকে প্রসারিত করা এবং একে আরো স্থির, আরো দীর্ঘস্থায়ী ও নিয়মিত ও সর্বগ্রাহী করা যতক্ষণ না এ আমাদের সত্তার এত অন্তরঙ্গ ও স্বাভাবিক হয় যে এখন সাধারণ মন যে সব কাজ করে সেই সব কাজ নিয়ে সমগ্র আধারের মধ্যে তার স্থান নিতে পারে। এটা সম্পূর্ণভাবে করা যায় না যতদিন সাধারণ মন তার স্বাধীন ক্রিয়া ও হস্তক্ষেপের শক্তি জাহির করে চলে অথবা বোধির আলো ধ'রে একে তার নিজের সব উদ্দেশ্যের জন্য ব্যবহার করার অভ্যাস বজায় রাখে। উচ্চতর মানসিকতা সম্পূর্ণ বা দৃঢ় হতে পারে না যতদিন নিম্ন বুদ্ধি তাকে বিকৃত করতে অথবা এমনকি নিজের মিশ্রণের কিছু তার মধ্যে আনতে সক্ষম হয়। আর তাহলে হয় আমাদের ধী ও বুদ্ধিগত সঙ্কল্প ও

অন্যান্য নিম্ন ক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ নীরব করা চাই আর স্থান রাখা চাই শুধু বোধির ক্রিয়ার জন্য, আর না হয় আমাদের কর্তব্য নিম্ন ক্রিয়াকে আয়ত্ত ক'রে তাকে রূপান্তরিত করা বোধির সতত চাপের দ্বারা। আর না হয় দুইটি পদ্ধতিকে একটির পর অন্যটি এইভাবে নিয়ে তাদের মিলিয়ে কাজ করা চাই, অবশ্য যদি এটাই সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক পথ হয় অথবা তা করা আদৌ সম্ভব হয়। যোগের বাস্তব ক্রিয়াধারায় ও অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে অনেকগুলি পদ্ধতি বা সাধনধারা সম্ভব হলেও, কার্যতঃ এদের কোনটিই একলা সমগ্র ফল উৎপাদনে অক্ষম, অথচ প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে যে ন্যায়মতো প্রত্যেকটিই পর্যাপ্ত হওয়া উচিত বা হতে পারে। আর যখন আমরা কোন বিশেষ পদ্ধতিকেই একমাত্র সঠিক পথ আর অন্যগুলিকে ভুল পথ ব'লে জোর না ক'রে সমগ্র সাধনধারাকেই ছেড়ে দিতে শিখি এক মহত্তর দেশনার নিকট, তখন আমরা দেখি যে যোগের দিব্য প্রভু তাঁর মহাশক্তিকে ভার দেন সত্তা ও প্রকৃতির প্রয়োজন ও প্রবণতা অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে একটি বা অন্য পদ্ধতি ব্যবহার করতে এবং সবগুলিকেই মিলিয়ে ব্যবহার করতে।

প্রথমে মনে হতে পারে যে সরল ও সঠিক পথ হল মনকে সম্পূর্ণ নীরব করা, ধী, মানসিক ও ব্যক্তিগত সঙ্কল্প, কামমানস এবং ভাবাবেগ ও ইন্দ্রিয়সংবিতের মন নীরব করা এবং সেই পূর্ণ নীরবতার মধ্যে পরম আত্মাকে পরম চিৎপুরুষকে, ভগবানকে সুযোগ দেওয়া নিজেকে প্রকট করতে এবং তাঁকেই ভার দিতে যেন তিনি সত্তাকে দীপ্ত করেন অতিমানসিক আলোক ও শক্তি ও আনন্দ দ্বারা। আর বস্তুতঃ এ হল এক বড় শক্তিশালী সাধনা। উত্তেজনা ও ক্রিয়ার মধ্যে অবস্থিত মন অপেক্ষা শান্ত ও নিশ্চল মনই আরো অনেক বেশী দ্রুত এবং আরো অনেক বেশী শুদ্ধতার সঙ্গে অনন্তের নিকট উন্মুক্ত হয়, পরম চিৎপুরুষকে প্রতিফলিত করে, পরমাত্মার দ্বারা পরিপূর্ণ হয় এবং উৎসর্গ-করা ও পবিত্র-করা মন্দিরের মতো প্রতীক্ষা করে আমাদের সকল সত্তার ও প্রকৃতির প্রভুর অবগুণ্ঠন অপসারণের জন্য। একথাও সত্য যে এই নীরবতার মুক্তিতে বোধিময় সত্তার বৃহত্তর লীলা সম্ভব হয় আর যেসব মহান বোধি, চিদাবেশ, দিব্য প্রকাশ ভিতর থেকে উদ্ভূত হয় বা উপর থেকে অবতরণ করে সে সব সহজে প্রবেশ করে কারণ মানসিক অন্ধ-অন্বেষণ ও আক্রমণের বাধা ও অশান্ততা কমে যায়। সুতরাং এ হবে এক প্রভূত লাভ যদি আমরা এই সামর্থ্য অর্জন করতে পারি যাতে আমরা মানসিক ভাবনার অথবা গতিবৃত্তি ও সংক্ষোভের আবশ্যকতা থেকে মুক্ত মনের একান্ত শান্ত অবস্থা ও নীরবতা ইচ্ছামতো আনতে সর্বদাই সক্ষম হই আর এই নীরবতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভাবনা ও সঙ্কল্প ও বেদনাকে আমাদের মধ্যে ঘটতে দিই কেবল তখনই যখন মহাশক্তি তা ইচ্ছে করেন ও দিব্য উদ্দেশ্যের জন্য তা প্রয়োজনীয় হয়। তখন ভাবনা ও সঙ্কল্প ও বেদনার ভঙ্গিমা ও স্বরূপ পরিবর্তিত করা আরো সহজ হয়ে ওঠে। তবু একথা ঠিক নয় যে এই প্রক্রিয়ায় অতিমানসিক আলো অবিলম্বে এসে নিম্ন মন ও চিন্তাশীল যুক্তিশক্তির স্থলাভিষিক্ত হবে। নীরবতার পর যখন আন্তর ক্রিয়া শুরু হয় তখন তা প্রধানতঃ বোধিময় ভাবনা ও ক্রিয়া হলেও, পুরনো শক্তিগুলি তবু ব্যাঘাত ঘটাবে, আর তা ভিতর থেকে না হলেও, বাইরে

থেকে শত শত আভাসন দিয়ে, আর এক নিম্ন মানসিকতা মহত্তর ক্রিয়ার ভিতরে মিশ্রিত হবে, একে সন্দেহ করবে অথবা বাধা দেবে অথবা চেষ্টা করবে একে আয়ত্তে এনে এইভাবে তাকে নিম্নে আনতে বা মলিন বা বিকৃত বা খর্ব করতে। সুতরাং নিম্ন মানসিকতার উচ্ছেদ বা রূপান্তরের কাজ সর্বদা অনিবার্যভাবে প্রয়োজনীয় অথবা হয়ত দুইটি কাজই একসঙ্গে প্রয়োজনীয় — অবর সত্তার যা সব স্বকীয় বস্তু সে সবের উচ্ছেদ অর্থাৎ এর বিরূপকারী উপসর্গগুলি, মূল্য সম্বন্ধে এর সব অবনয়ন ও ধাতু সম্বন্ধে এর বিভিন্ন বিকৃতি এবং বাকী সব যা মহত্তর সত্য আশ্রয় দিতে অক্ষম — এই সবের উচ্ছেদ; এবং অতিমানস ও চিৎপুরুষ থেকে আমাদের মন যে সব মূল জিনিস পায় কিন্তু মানসিক অজ্ঞানতার ধরনে তাদের প্রকাশ করে, সে সবের রূপান্তর।

দ্বিতীয় এক পথ আছে, যারা ভক্তিমার্গের উপযুক্ত প্রেরণা নিয়ে যোগ শুরু করে তাদের কাছে তা স্বাভাবিকভাবে আসে। তাদের পক্ষে স্বাভাবিক কাজ হল ধীশক্তি ও এর ক্রিয়া বর্জন করা এবং বাণীর জন্য উৎকর্ণ থাকা, প্রবেগ বা আদেশের জন্য প্রতীক্ষা করা, তাদের অন্তঃস্থ প্রভুর, প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত ভাগবত আত্মা ও পুরুষের, "ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে"-র ভাবনা ও সঙ্কল্প ও শক্তিকে মান্য করা। এ হল এমন এক কাজ যার উত্তরোত্তর প্রবণতা হবে সমগ্র প্রকৃতিকে বোধিভাবাপন্ন করা, কারণ হৃদিস্থিত গূঢ় পুরুষ থেকে যে সব ভাবনা, সঙ্কল্প, বিভিন্ন প্রবেগ ও অনুভব আসে সে সব সরাসরি বোধিমূলক প্রকৃতির। এই পদ্ধতি আমাদের প্রকৃতির এক বিশেষ সত্যের সঙ্গে সঙ্গত। আমাদের মধ্যে গূঢ় আত্মা এক বোধিময় আত্মা, আর আমাদের সত্তার প্রতি কেন্দ্রে — শারীরিক, স্নায়বিক, ভাববিষয়ক, সঙ্কল্পবিষয়ক, প্রত্যয়বিষয়ক বা জ্ঞানবিষয়ক এবং উচ্চতর আরো সরাসরি আধ্যাত্মিক কেন্দ্রে — এই বোধিময় আত্মা আসীন। আর আমাদের সত্তার প্রতি অংশে এ আমাদের ক্রিয়াবলীর এমন এক গূঢ় বোধিমূলক প্রবর্তনা সঞ্চার করে যা আমাদের বাহ্য মন নিয়ে অপূর্ণভাবে প্রকাশ করে এবং আমাদের প্রকৃতির এই সব অংশের বাহ্য ক্রিয়ার অজ্ঞানতার গতিবৃত্তিতে সে সবকে রূপান্তরিত করে। সাধারণ মানুষের মধ্যে হৃদয় অর্থাৎ চিন্তাশীল কাম-মানসের ভাববিষয়ক কেন্দ্রই সব চেয়ে প্রবল, এটিই চেতনার কাছে বিষয়সমূহ সংগ্রহ ক'রে উপস্থিত করে অথবা তাদের আসাকে প্রভাবান্বিত করে এবং এই হল আধারের মুখ্য কেন্দ্র। সেখান থেকেই সর্বভূতের হৃদ্দেশে আসীন ঈশ্বর মানসিক অজ্ঞানতার মায়ার দ্বারা প্রকৃতি-যন্ত্রারূঢ় প্রাণীদের ঘোরান। সুতরাং এই যে গূঢ় বোধিময় আত্মা ও চিৎপুরুষ যিনি আমাদের অন্তরে সদাবর্তমান পরমদেবতা তাঁর নিকট আমাদের সকল ক্রিয়ার প্রবর্তনার ভার দিয়ে এবং আমাদের ব্যক্তিগত ও মানসিক প্রকৃতির বিভিন্ন প্রবর্তনার স্থলে তাঁর সব প্রভাব এনে নিম্ন বাহ্য মনন ও ক্রিয়া থেকে অন্য এক অর্থাৎ আন্তর ও বোধিময় এবং অতীব আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন প্রকৃতির মনন ও ক্রিয়ায় পৌঁছান সম্ভব। কিন্তু তবু এই কার্যের ফল সম্পূর্ণ হতে পারে না, কারণ হৃদয় আমাদের সত্তার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র নয়, এ অতিমানসিকও নয়, অথবা অতিমানসিক উৎস থেকেও সরাসরি চালিত হয় না। হৃদয় থেকে চালিত

বোধিময় মনন ও ক্রিয়া অত্যন্ত দীপ্ত ও তীব্র হতে পারে, কিন্তু সম্ভবতঃ এ সীমিত হবে, এমনকি এর তীব্রতায় সঙ্কীর্ণ হবে, নিম্ন ভাবময় ক্রিয়ায় মিশ্রিত হবে এবং কমপক্ষে এর ক্রিয়ায় বা অন্ততঃ এর সহচারী অনেক বিষয়ে অলৌকিক বা অস্বাভাবিক প্রকৃতির দ্বারা উত্তেজিত ও অশান্ত হবে এবং সমতাহীন বা অতিরঞ্জন-দুষ্ট হবে — এই সব হল সত্তার সুষম সিদ্ধির পক্ষে ক্ষতিকর। সিদ্ধির জন্য আমাদের সাধনার যা লক্ষ্য অবশ্যই হওয়া চাই তা হল আধ্যাত্মিক ও অতিমানসিক ক্রিয়াকে আর এক অলৌকিক ঘটনা না করা, এমনকি যদি তা ঘন ঘন বা সতত অলৌকিক ব্যাপার হয় অথবা সাধারণ শক্তির অপেক্ষা মহত্তর কোন জ্যোতির্ময় শক্তির আগমন হয়, বরং একে সত্তার পক্ষে স্বাভাবিক এবং এর সকল কর্মপ্রণালীর নিজস্ব স্বরূপ ও বিধান করাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া চাই।

আমাদের দেহবদ্ধ সত্তার এবং দেহের মধ্যে এর ক্রিয়ার সর্বোত্তম সংহত কেন্দ্র হল সেই পরম মানসিক কেন্দ্র যাকে চিত্রিত করা হয় সহস্রদল কমলের যৌগিক প্রতীক দ্বারা, আর এর উপরিভাগে ও সর্বোচ্চ শিখরেই অতিমানসিক স্তরগুলির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ হয়। তখন অন্য এক ও আরো সরাসরি পদ্ধতি অবলম্বন করা সম্ভব হয় আর তা হল আমাদের সকল মনন ও ক্রিয়াকে হৃৎকমলে নিগূঢ় ঈশ্বরের নিকট ভার না দিয়ে বরং মনের ঊর্ধ্বে ভগবানের প্রচ্ছন্ন সত্যের নিকট ভার দেওয়া এবং সকল কিছু গ্রহণ করা উপর থেকে এক প্রকার অবতরণের দ্বারা, আর এ হল এমন এক অবতরণ যার সম্বন্ধে আমরা যে শুধু আধ্যাত্মিকভাবে সচেতন হই তা নয়, ভৌতিকভাবেও সচেতন হই। এই কার্যের সিদ্ধি অর্থাৎ পূর্ণ সফল সমাপন আসতে পারে কেবল তখনই যখন আমরা মনন ও সচেতন ক্রিয়ার কেন্দ্রকে স্থূল মস্তিষ্কের ঊর্ধ্বে তুলতে সক্ষম হই আর সক্ষম হই এই অনুভব করতে যে এটি সূক্ষ্মদেহে চলছে। যদি আমরা অনুভব করতে পারি যে আমরা মস্তিষ্ক দিয়ে চিন্তা করছি না বরং চিন্তা করছি মস্তকের ঊর্ধ্বে ও বাইরে সূক্ষ্ম দেহের মধ্যে, তাহলে তা হবে স্থূল মনের সঙ্কীর্ণতা থেকে বিমুক্তির এক নিশ্চিত ভৌতিক নিদর্শন, আর যদিও এ তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ হবে না অথবা নিজে নিজে অতিমানসিক ক্রিয়া আনবে না, কারণ সূক্ষ্মদেহ হল মানসিক, অতিমানসিক নয়, তবু এ এক সূক্ষ্ম ও শুদ্ধ মানসিকতা এবং অতিমানসিক কেন্দ্রগুলির সঙ্গে যোগাযোগ আরো সহজে করে। বিভিন্ন নিম্ন ক্রিয়া তখনো নিশ্চয়ই আসবে, কিন্তু তখন দেখা যায় যে আরো সহজেই এক ক্ষিপ্র ও সূক্ষ্ম পার্থক্য-জ্ঞান পাওয়া যায় যা নিম্ন বুদ্ধিগত মিশ্রণ থেকে বোধিমূলক মননকে পৃথক ক'রে, একে তার সব মানসিক প্রলেপ থেকে মুক্ত ক'রে এবং শুধুমাত্র মনঃশক্তির ক্ষিপ্রতা যা বোধির রূপ অনুকরণ করে অথচ তার প্রকৃত ধাতুর হয় না, সেসবকে বর্জন ক'রে আমাদের তৎক্ষণাৎ ব'লে দেবে কি প্রভেদ। আরো সহজেই আমরা প্রকৃত অতিমানসিক সত্তার উচ্চতর লোকগুলি দ্রুত বুঝতে পারব এবং বাঞ্ছিত রূপান্তর সাধনের জন্য তাদের শক্তিকে নিম্নে আবাহন করতে পারব এবং সক্ষম হব সকল নিম্ন ক্রিয়াকে মহত্তর শক্তি ও আলোর কাছে তুলে ধরতে যাতে এ বর্জন করতে ও বাদ দিতে পারে, শুদ্ধ করতে ও রূপান্তর ঘটাতে পারে এবং যে সত্য আমাদের

মধ্যে সংগঠন করা চাই তার জন্য সঠিক উপাদান নির্বাচন করতে পারে। এক উচ্চতর স্তর এবং এর আরো উচ্চ ও উচ্চতর লোক উন্মুক্ত করা এবং তার পরিণামস্বরূপ আমাদের সমগ্র চেতনা ও এর ক্রিয়াকে তাদের ছাঁচে ও তাদের শক্তি ও জ্যোতির্ময় ধাতুতে পুনর্গঠন করা — দেখা যাবে যে এই হল কার্যতঃ ভাগবতী শক্তির দ্বারা ব্যবহৃত স্বাভাবিক পদ্ধতির অধিকাংশ।

এক চতুর্থ পদ্ধতি আছে যা বিকশিত বুদ্ধির কাছে স্বাভাবিকভাবে নিজেই উদিত হয় এবং চিন্তাশীল মানবের উপযোগী। এই কাজটি হল আমাদের ধীশক্তিকে বাদ না দিয়ে আরো বিকশিত করা, তবে এর সঙ্কীর্ণতাগুলি পোষণ করার সঙ্কল্প থাকবে না, বরং এই সঙ্কল্প থাকবে যে আমরা এর ক্রিয়ার সামর্থ্য, আলো, তীব্রতা, মাত্রা ও শক্তি উন্নত করব যতক্ষণ না এ তার উজানে অবস্থিত বিষয়ের সীমায় পৌঁছে এবং একে সহজেই তুলে নিয়ে সেই উচ্চতর সচেতন ক্রিয়ায় রূপান্তরিত করা যায়। এই কাজটিও আমাদের প্রকৃতির সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ও সম্পূর্ণ আত্মসিদ্ধি যোগের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ও অগ্রসরতার অন্তর্গত। আমি যা পূর্বেই বলেছি — ঐ ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে আমাদের বিভিন্ন প্রাকৃত করণ ও শক্তিকে উন্নত ও মহৎ করা যতক্ষণ না এরা তাদের শুদ্ধতায় ও স্বরূপগত সম্পূর্ণতায় গড়ে তোলে আমাদের মধ্যে সক্রিয় মহাশক্তির বর্তমান সাধারণ ক্রিয়ার প্রস্তুতিমূলক সিদ্ধি। এই সব শক্তি ও করণের মধ্যে যুক্তিশক্তি ও বুদ্ধিমূলক সঙ্কল্প অর্থাৎ বুদ্ধিই মহত্তম, বিকশিত মানবের মাঝে অবশিষ্ট সবের স্বাভাবিক নেতা, অন্যদের বিকশিত করার কাজে সাহায্যদানে সর্বাপেক্ষা সমর্থ। আমাদের প্রকৃতির সাধারণ ক্রিয়াগুলির সকলেই আমাদের অভীপ্সিত মহত্তর সিদ্ধির পক্ষে প্রয়োজনীয়, তাদের উপাদানে পরিণত হওয়ার জন্যই এরা অভিপ্রেত এবং তাদের বিকাশ যতই অধিক হয়, অতিমানসিক ক্রিয়ার জন্য প্রস্তুতি ততই সমৃদ্ধ হয়।

এটা প্রয়োজনীয় যে যোগে মহাশক্তি বুদ্ধিগত সত্তাকেও নিয়ে তার পূর্ণতম ও সর্বাপেক্ষা উন্নত সব শক্তিতে উত্তোলিত করবেন। পরে ধীশক্তির রূপান্তরসাধন সম্ভবপর কারণ ধীশক্তির সকল ক্রিয়াই গূঢ়ভাবে উৎপন্ন হয় অতিমানস থেকে, প্রতি মনন ও সঙ্কল্পের মধ্যে অতিমানসের কিছু সত্য আছে তা সে সত্য, বুদ্ধির নিম্ন ক্রিয়ার দ্বারা যতই সীমিত ও পরিবর্তিত হ'ক। এই সঙ্কীর্ণতা দূর ক'রে এবং বিকৃতিকারী বা বিভ্রান্তিকারী উপাদান বাদ দিয়ে রূপান্তর সাধন করা যায়। কিন্তু শুধু বুদ্ধিগত ক্রিয়ার উন্নতি ও মহত্ত্বসাধনের দ্বারাই এই কাজ নিষ্পন্ন করা সম্ভব নয়; কারণ তা সর্বদাই সীমিত হবে মানসিক বুদ্ধির মূল স্বগত সব দোষের দ্বারা। যে অতিমানসিক শক্তি মনন ও সঙ্কল্প ও বেদনা সম্বন্ধে এর ঊনতাগুলি আলোকিত ক'রে দূর করতে সক্ষম তার সক্রিয় আগমন প্রয়োজন। এই শক্তিপাতও সম্পূর্ণ কার্যকরী হতে পারে না যদি না অতিমানসিক লোক মনের ঊর্ধ্ব থেকে অভিব্যক্ত ও সক্রিয় হয়, তবে এ যেন আর কোন ঢাকনা বা অবগুণ্ঠনের পিছন থেকে কাজ না করে, তা সে অবগুণ্ঠন যতই ক্ষীণ হয়ে পড়ুক, একে কাজ করতে হবে আরো অবিরতভাবে উন্মুক্ত ও জ্যোতির্ময় ক্রিয়ার সহায়ে যতক্ষণ না দেখা যায় সত্যের পূর্ণ সূর্য, আর কোন মেঘ না থাকে তার প্রভা হ্রাস করতে। তবে এই

শক্তিপাতকে নিম্নে আবাহন করার অথবা এর দ্বারা অতিমানসিক স্তরগুলি উন্মুক্ত করার পূর্বে বুদ্ধিকে পৃথকভাবে সম্পূর্ণ বিকশিত করা আবশ্যাক নয়। এও সম্ভব যে এর পূর্বেই শক্তিপাত এসে তখনই বুদ্ধিগত ক্রিয়াকে বিকশিত করবে এবং বিকশিত করার সাথে সাথে একে পরিণত করবে পরতর বোধিময় রূপে ও ধাতুতে।

মহাশক্তির প্রশস্ততম স্বাভাবিক ক্রিয়া এই সকল পদ্ধতিগুলিকেই মিলিতভাবে ব্যবহার করে। এ কখনও কখনও প্রথমেই, কখনও কখনও কিছু পরবর্তী পর্যায়ে, হয়ত সর্বশেষ পর্যায়ে আধ্যাত্মিক নীরবতার মুক্তি সৃষ্টি করে। এ মনের মধ্যেই গূঢ় বোধিময় সত্তা উন্মীলিত করে এবং আমাদের অভ্যস্ত করে আমাদের সকল মনন ও আমাদের বেদনা ও সঙ্কল্প ও ক্রিয়াকে জ্যোতিঃ ও শক্তিস্বরূপ ভগবানের প্রবর্তনার নিকট স্থাপন করতে যিনি এখন মনের নিভৃত প্রদেশের মর্মলোকে প্রচ্ছন্ন আছেন। যখন আমরা প্রস্তুত হই, তখন এ তার সব কার্যের কেন্দ্র উত্তোলন করে মানসিক শিখরে এবং অতিমানসিক স্তরগুলি উন্মীলিত ক'রে এগিয়ে চলে দুইটি ক্রিয়ার দ্বারা — একটি ক্রিয়া উপর থেকে নিম্নে এসে অপরা প্রকৃতিকে পরিপূর্ণ ও রূপান্তরিত করে, আর অন্যটি নিম্ন থেকে উপরে এসে সকল শক্তিকে উত্তোলন করে তাদের ঊর্ধ্বে অবস্থিত তত্ত্বের নিকট যতক্ষণ না অতিক্রমণ সম্পূর্ণ করা হয় এবং অখণ্ডভাবে সাধিত হয় সমগ্র আধারের পরিবর্তন। বুদ্ধি ও সঙ্কল্প ও অন্যান্য প্রাকৃত শক্তিগুলিকে নিয়ে এ তাদের বিকশিত করে কিন্তু তাদের ক্রিয়াকে পরিবর্তিত ও বৃহৎ করার জন্য অবিরত ভিতরে নিয়ে আসে বোধিমানস ও পরে প্রকৃত অতিমানসিক শক্তি। যুক্তিশীল বুদ্ধির অনমনীয়তা যেমন চাইতে পারে তেমন কোন নির্দিষ্ট ও যন্ত্রের মতো অপরিবর্তনীয় পরম্পরায় এ যে এই কাজগুলি করে তা নয়, এ সে সব করে স্বচ্ছন্দ ও নমনীয়ভাবে এর কর্মের প্রয়োজন এবং প্রকৃতির দাবী অনুযায়ী।

প্রথম ফলটি হবে না প্রকৃত অতিমানসের সৃষ্টি, এ হবে প্রধানতঃ অথবা এমনকি সম্পূর্ণ বোধিময় মানসিকতার এক সংগঠন এবং এ এত পর্যাপ্তভাবে বিকশিত হবে যে এ হবে বিকশিত মানবের সাধারণ মানসিকতা ও ন্যায়গত যুক্তিশীল বুদ্ধির স্থলাভিষিক্ত। সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট পরিবর্তন হবে মননের রূপান্তর; প্রকৃত বোধিময় চিন্তার নিদর্শন যে ঘনীভূত আলোর ঘনীভূত শক্তি, আলো ও শক্তির ঘনীভূত আনন্দের ধাতু এবং সরাসরি নির্ভুলতা — এসবের দ্বারা মনন উন্নত ও পরিপূর্ণ হবে। এই মন যে বিভিন্ন প্রাথমিক আভাসন বা দ্রুত সিদ্ধান্ত দেবে তা নয়, বুদ্ধিগত যুক্তিশক্তি এখন যে সব সংযোগকারী ও বিকাশসাধক ক্রিয়াগুলি করে এ সেই সবও করবে ঐ একই আলো, শক্তি, নিশ্চয়তার আনন্দ এবং সত্যের সরাসরি স্বতঃস্ফূর্ত দৃষ্টির দ্বারা। সঙ্কল্পও এই বোধিময় রূপে পরিবর্তিত হবে, আলো ও শক্তিসহ সোজা কর্তব্য কর্মে অগ্রসর হবে এবং বিভিন্ন সম্ভাবনা ও বাস্তবতার দ্রুত দৃষ্টিপাত সহকারে নির্ধারণ করবে তার ক্রিয়ার ও তার উদ্দেশ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় সমবায়গুলি। বেদনাগুলিও বোধিময় হবে, সঠিক সম্পর্কাবলী অধিগত করবে, কাজ করবে নতুন আলো ও শক্তি এবং প্রসন্ন নিশ্চয়তাসহ, রাখবে শুধু সঠিক ও স্বতঃস্ফূর্ত কামনা ও ভাবাবেগগুলি, তবে যতদিন এই সব স্থায়ী

হয়; আর যখন তারা চলে যাবে সে সবের স্থলে নিয়ে আসবে এক জ্যোতির্ময় ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম এবং এমন এক আনন্দ যা তার বিষয়সমূহের যথার্থ রসটি জানে এবং তৎক্ষণাৎ তাকে অধিকার করে। অন্য সব মানসিক বৃত্তিগুলি এবং এমনকি প্রাণিক ও ইন্দ্রিয়গত বৃত্তিগুলি ও দেহের চেতনাও ঐরকম আলোকিত হবে। আর সাধারণতঃ আন্তর মন ও এর বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সেইসব সূক্ষ্ম শক্তি, সামর্থ্য ও অনুভবের কিছু বিকাশ হবে যেগুলি বাহ্য ইন্দ্রিয় এবং যুক্তিশক্তির উপর নির্ভরশীল নয়। বোধিময় মানসিকতা যে শুধু এক আরো শক্তিশালী ও আরো জ্যোতির্ময় বিষয় হবে তা নয়, বরং যোগের এই বিকাশের পূর্বে এই ব্যক্তির সাধারণ মন যে ক্রিয়াসাধনে সমর্থ হ'ত, বোধিময় মানসিকতা সাধারণতঃ তা অপেক্ষা আরো অনেক ব্যাপক ক্রিয়াসাধনে সমর্থ হবে।

যদি এই বোধিময় মানসিকতাকে তার প্রকৃতিতে সুষ্ঠু করা যেত, আর এ কোন হীন পদার্থের সঙ্গে মিশ্রিত না হ'ত অথচ নিজের সব সীমা সম্বন্ধে ও তার অতীতে অবস্থিত বিষয়টির মহত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকত তাহলে এ পশুর সহজ-প্রবৃত্তিমূলক মনের মতো অথবা মানবের যুক্তিশীল মনের মতো হয়ে উঠত আর একটি সীমাবদ্ধ অবস্থা ও বিরতিস্থান। কিন্তু এর উর্ধ্বে অবস্থিত অতিমানসের উন্মীলনকারী শক্তির সাহায্য ছাড়া বোধিময় মানসিকতাকে দৃঢ়ভাবে সুষ্ঠু ও আত্মনির্ভর করা সম্ভব হয় না, আর এতেই তার বিভিন্ন সঙ্কীর্ণতাগুলি প্রকাশিত হয় এবং এ হয়ে ওঠে বুদ্ধিগত মন ও প্রকৃত অতিমানসিক প্রকৃতির মধ্যে সংক্রমণ অবস্থার এক গৌণ ক্রিয়া। বোধিময় মানসিকতা মনই থাকে, এ বিজ্ঞান নয়। অবশ্য এ অতিমানস থেকে আসা এক আলো কিন্তু যে মনের উপাদানের মধ্যে এ কাজ করে তার দ্বারা এ পরিবর্তিত ও ক্ষীণ হয়, আর মনের উপাদান বলতে সর্বদাই বোঝায় এক অজ্ঞানের ভিত্তি। বোধিমানস এখনো সত্যের বিস্তীর্ণ সূর্যালোক নয় বরং এর ঝলকের অবিরত খেলা যা অজ্ঞানতার অথবা অর্ধ-জ্ঞান ও পরোক্ষজ্ঞানের আধারভূত এক অবস্থাকে আলোকিত রাখে। যতদিন এ অপূর্ণ থাকে ততদিন এ আক্রান্ত হয় অজ্ঞানময় মানসিকতার মিশ্রণের দ্বারা যা এর সত্যের মধ্যে বপন করে প্রমাদের বীজ। এই অন্তর্মিশ্রণ থেকে আরো মুক্ত বিশালতর স্বকীয় ক্রিয়া লাভ করার পরও যতদিন এর কর্মক্ষেত্র অর্থাৎ মনের উপাদান পুরাতন বুদ্ধিগত বা নিম্ন মানসিক অভ্যাসে সমর্থ থাকে, ততদিন নতুন প্রমাদ, আচ্ছন্নতা, নানাপ্রকারের পতন আসার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া, ব্যষ্টিমন একলা ও নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, এ বাস করে সমষ্টি মনের মধ্যে এবং যা কিছু এ বর্জন করে তা নিক্ষিপ্ত হয় এর চারিদিককার সমষ্টি মানস বাতাবরণে এবং এসব তার উপর ফিরে এসে তাকে আক্রমণ করতে চায় পুরনো সব আভাসন দিয়ে এবং পুরনো মানসিক স্বভাবের নানা প্রেরণা দিয়ে। বিকশিত হবার সময় বা বিকশিত হয়েও বোধিমানসের উচিত সর্বদা আক্রমণ ও নতুন অর্জনের বিরুদ্ধে সাবধান থাকা, অন্তর্মিশ্রণকে প্রত্যাখ্যান ও বর্জন বিষয়ে সজাগ থাকা, মনের সমগ্র উপাদানকে উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে বোধিত করায় ব্যস্ত থাকা আর এই কাজের যে একমাত্র পরিণতি সম্ভব তা এই যে এ নিজেই আলোকিত, রূপান্তরিত, উত্তোলিত হবে অতিমানসিক সত্তার পূর্ণ আলোকে।

উপরন্তু এই নতুন মানসিকতা হল প্রত্যেক মানুষের মাঝে তার সত্তার বর্তমান শক্তির বিকাশ আর এর সব বিকাশ যতই নতুন ও বিস্ময়কর হ'ক, এর সংগঠন সামর্থ্যের এক বিশেষ ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অবশ্য এ বর্তমান কাজের এবং চরিতার্থ সামর্থ্যের বর্তমান ক্ষেত্রের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে, কিন্তু যে মন অনন্তের দিকে উন্মীলিত হয়েছে তার স্বভাব হল অগ্রসর হওয়া, এবং পরিবর্তিত ও বৃহৎ হওয়া, কিন্তু ঐ সীমা ছাড়িয়ে যাবার দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হলে এ নতুন বোধিময়.অভ্যাসের দ্বারা যতই পরিবর্তিত হয়ে থাকুক না কেন, এর প্রবণতা হয় অজ্ঞানতার মাঝে পুরনো বুদ্ধিগত অন্বেষণ ফিরে পেতে — যদি না এবং যতক্ষণ না এক পূর্ণতর অতিমানসিক জ্যোতির্ময় শক্তির অভিব্যক্ত ক্রিয়া এর ঊর্ধ্বে অবস্থিত হয়ে একে চালনা করে। বস্তুতঃ এর স্বরূপই এই যে এ বর্তমান মন ও অতিমানসের মধ্যে এক যোগসূত্র ও সংক্রমণের অবস্থা এবং যতক্ষণ না সংক্রমণ সম্পূর্ণ হয়, ততক্ষণ কখনও কখনও নিম্নে যাবার প্রবৃত্তি হয়, কখনও কখনও উপরে যাবার প্রবৃত্তি হয়, এ হল এক দোলায়মান অবস্থা, নিম্ন থেকে আক্রমণ ও আকর্ষণ, উপর থেকে আক্রমণ ও আকর্ষণ এবং বড় জোর দুই মেরুর মধ্যে এক অনিশ্চিত ও সীমিত অবস্থা। যেমন মানবের উচ্চতর বুদ্ধির স্থান হল তার নিম্নস্থ পাশবিক ও অভ্যস্ত মানবীয় মন এবং তার উপরিস্থ আধ্যাত্মিক মনের মধ্যে, তেমন এই প্রথম আধ্যাত্মিক মনের স্থান বুদ্ধিভাবাপন্ন মানবীয় মানসিকতা এবং মহত্তর অতিমানসিক জ্ঞানের মাঝে।

মনের স্বরূপ এই যে এ বাস করে অর্ধ-আলো ও অন্ধকারের মধ্যস্থলে, বিভিন্ন সম্ভাব্য ঘটনা ও সম্ভাবনার মাঝে, আংশিকভাবে আয়ত্ত রূপগুলির মাঝে, বিভিন্ন অনিশ্চিত ও অর্ধ-নিশ্চিত বিষয়ের মাঝে: এ এমন এক অজ্ঞানতা যা জ্ঞান ধরতে চায়, চেষ্টা করে নিজেকে প্রসারিত করতে এবং চাপ দেয় প্রকৃত বিজ্ঞানের প্রচ্ছন্ন দেহের বিরুদ্ধে। অতিমানস অবস্থান করে আধ্যাত্মিক নিশ্চিত বিষয়গুলির মধ্যে: মানবের কাছে এ হল সেই জ্ঞান যা তার নিজের স্বকীয় দীপ্তির বাস্তব দেহ উন্মুক্ত করে। বোধিমানস প্রথমে দেখা দেয় এমন এক তত্ত্ব হিসেবে যা মনের অর্ধ-আলোকগুলিকে, এর বিভিন্ন সম্ভাব্য ঘটনা ও সম্ভাবনাকে, এর বিভিন্ন রূপকে, এর বিভিন্ন অনিশ্চিত নিশ্চিত বিষয়গুলিকে, এর প্রতিরূপগুলিকে আলোকিত করে এবং এইসব বিষয়ের দ্বারা প্রচ্ছন্ন বা অর্ধ-প্রচ্ছন্ন ও অর্ধ-অভিব্যক্ত সত্যকে প্রকাশ করে, আর এর উচ্চতর ক্রিয়ায় এ হচ্ছে অতিমানসিক সত্যের প্রথম আনয়ন — দৃষ্টির নিকটতর প্রত্যক্ষতার দ্বারা, চিৎপুরুষের জ্ঞানের দীপ্তিময় ইঙ্গিত বা স্মৃতির দ্বারা, সত্তার গূঢ় বিশ্বময় আত্মদর্শন ও জ্ঞানের দুয়ারের মধ্য দিয়ে বোধি বা অন্তর্দর্শন দ্বারা। ঐ মহত্তর আলো ও শক্তির এ হল এক প্রাথমিক অপূর্ণ সংগঠন — অপূর্ণ কেননা ঐ সংগঠন হয় মনের মধ্যে, এর নিজের চেতনার স্বকীয় ধাতুর উপর এ প্রতিষ্ঠিত নয়, এ এক অবিরত যোগাযোগ কিন্তু কোন সম্পূর্ণ অব্যবহিত ও সতত উপস্থিতি নয়। পূর্ণ সিদ্ধির স্থান উজানে অতিমানসিক স্তরগুলির উপর, এটি প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই মানসিকতার ও আমাদের সমগ্র প্রকৃতির আরো নিশ্চিত ও সম্পূর্ণ রূপান্তরের উপর।

একবিংশ অধ্যায়

অতিমানসের বিভিন্ন পর্যায়

বোধিমানস হল এক উজ্জ্বল অতিমানসিক ধাতুর দ্বারা অর্ধ-রূপান্তরিত সব মানসিক সংজ্ঞায় সত্যের এক অব্যবহিত রূপান্তর, এমন কোন অনন্ত আত্মজ্ঞানের রূপান্তর যা কাজ করে মনের ঊর্ধ্বে অতিচেতন চিৎপুরুষের মাঝে। ঐ চিৎপুরুষ আমাদের কাছে জ্ঞাত হন এমন এক মহত্তর আত্মারূপে যা যুগপৎ আমাদের ঊর্ধ্বে ও ভিতরে ও চারিদিকে বিদ্যমান, আর আমাদের বর্তমান আত্মা, আমাদের মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক ব্যক্তিসত্ত্ব ও প্রকৃতি এর এক অপূর্ণ অংশ অথবা এক আংশিক উৎপন্ন বিষয় অথবা এক নিম্ন ও অপর্যাপ্ত প্রতীক, এবং যতই আমাদের মধ্যে বোধিমানস বৃদ্ধি পায়, যতই আমাদের সমগ্র সত্তা আরো বেশী পরিমাণে গড়ে ওঠে বোধিময় ধাতুতে, ততই আমরা অনুভব করি এই মহত্তর আত্মা ও চিৎপুরুষের প্রকৃতিতে আমাদের বিভিন্ন অঙ্গের এক প্রকার অর্ধ-রূপান্তর। আমাদের সকল মনন, সঙ্কল্প, সংবেগ, বেদনা, এমনকি অবশেষে আমাদের আরো বাহ্য প্রাণিক ও শারীরিক ইন্দ্রিয়সংবিৎগুলি হয়ে ওঠে চিৎপুরুষ থেকে আসা উত্তরোত্তর প্রত্যক্ষ সব সঞ্চালন এবং এরা হল অন্য এক ও ক্রমশঃ আরো অধিক শুদ্ধ, অক্ষুব্ধ, শক্তিশালী ও দীপ্তিময় প্রকৃতির। এ হল পরিবর্তনের এক দিক; অন্য দিকটি এই — যা কিছু তখনো আমাদের অবর সত্তার অন্তর্গত, যা কিছু তখনো আমাদের মনে হয় বাইরে থেকে আসে, অথবা আমাদের পুরাতন নিম্ন ব্যক্তিসত্ত্বের ক্রিয়ার জীবিত অংশ সেসব পরিবর্তনের চাপ অনুভব করে এবং উত্তরোত্তর প্রবণ হয় নূতন ধাতু ও প্রকৃতিতে নিজেকে পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত করতে। পরতর সত্তা নিম্নে নেমে এসে অবর সত্তার স্থলাভিষিক্ত হয় ব্যাপকভাবে, কিন্তু অবর সত্তাটিও পরিবর্তিত হয় এবং নিজেকে রূপান্তরিত করে পরতরসত্তার ক্রিয়ার উপাদানে ও হয়ে ওঠে তার ধাতুর অংশ।

মনের ঊর্ধ্বে অবস্থিত মহত্তর চিৎপুরুষ প্রথমে দেখা দেয় এক উপস্থিতি, আলোক, শক্তি, উৎস, অনন্তরূপে, কিন্তু এর মধ্যে যা সব আমাদের কাছে জ্ঞানগম্য সে সব প্রথমে সত্তা, চেতনা, চিৎ-শক্তি, আনন্দের এক অনন্ত তাদাত্ম্য। বাকী সব এ থেকে আসে কিন্তু আমাদের ঊর্ধ্বে মনন, সঙ্কল্প বা বেদনার কোন সবিশেষ আকার নেয় না, এ সেই আকার নেয় শুধু বোধিমানসের ভিতর ও তার স্তরের উপর। অথবা আমাদের অনুভব হয় এবং আমরা নানাভাবে অবগত হই এক মহান্ ও অনন্ত পুরুষ সম্বন্ধে যিনি ঐ সত্তা ও উপস্থিতির এক চিরন্তন জীবন্ত সত্য, এক মহৎ ও অনন্ত জ্ঞান যা ঐ আলোক ও চেতনার বীর্য, এক মহৎ ও অনন্ত সঙ্কল্প যা ঐ চিৎ-শক্তির বীর্য, এক মহৎ ও অনন্ত প্রেম যা ঐ আনন্দের বীর্য। কিন্তু এই সব বীর্যগুলি আমরা কোন নির্দিষ্ট প্রকারে জানতে পারি শুধু

সেইভাবে যেভাবে তারা রূপান্তরিত হয় আমাদের বোধিময় সত্তার কাছে এবং এর স্তরের উপর ও বিভিন্ন সীমার মধ্যে — অবশ্য তাদের স্বরূপগত উপস্থিতির প্রবল বাস্তবতা ও ফলের কথা না ধ'রে। কিন্তু যেমন আমরা অগ্রসর হই বা উপচিত হই ঐ চিৎপুরুষ বা পুরুষের আরো জ্যোতির্ময় ও স্ফুরন্ত মিলনের মধ্যে, তেমন জ্ঞান, সঙ্কল্প ও আধ্যাত্মিক বেদনার এক মহত্তর ক্রিয়া ব্যক্ত হয় এবং মনে হয় নিজেকে সংগঠিত করে মনের ঊর্ধ্বে, আর একেই আমরা চিনি প্রকৃত অতিমানস ব'লে এবং অনন্ত জ্ঞান, সঙ্কল্প ও আনন্দের আসল স্বকীয় লীলা ব'লে। তখন বোধিময় মানসিকতা হয়ে ওঠে এক গৌণ ও নিম্ন গতিবৃত্তি যা এই উচ্চতর শক্তির অনুবর্তী হয়, এর সকল দীপ্তি ও আদেশে সাড়া ও সম্মতি দেয়, সে সবকে সঞ্চালন করে নিম্ন অঙ্গগুলিতে এবং যখন তারা পৌঁছয় না অথবা অব্যবহিতভাবে সুস্পষ্ট হয় না তখন এ চেষ্টা করে ঐ উচ্চতর শক্তির স্থান পূরণ করতে, এর ক্রিয়া অনুকরণ করতে এবং যথাসাধ্য সম্পাদন করতে অতিমানসিক প্রকৃতির বিভিন্ন কর্মগুলি। বস্তুতঃ সে অতিমানস তার সম্বন্ধে সেই একই স্থান ও সম্বন্ধ নেয় যা তার নিজের সম্বন্ধে সাধারণ বুদ্ধি নিয়েছিল যোগের এক পূর্বতন অবস্থায়।

আমাদের সত্তার দুই লোকের উপর এই দ্বিবিধ ক্রিয়া প্রথমে বোধিময় মানসিকতাকে সুদৃঢ় করে এক গৌণ ক্রিয়ারূপে এবং একে সাহায্য করে অজ্ঞানতার বিভিন্ন জীবিত অংশ বা আক্রমণ বা নতুন অর্জনকে আরো সম্পূর্ণভাবে বহিষ্ক্রান্ত বা রূপান্তরিত করতে। এবং উত্তরোত্তর এ বোধিময় মানসিকতাকেই তার জ্ঞানের আলোকে তীব্র করে এবং অবশেষে একে রূপান্তরিত করে স্বয়ং অতিমানসেরই প্রতিমূর্তিতে, তবে প্রথমে তা সাধারণতঃ হয় বিজ্ঞানের আরো সীমিত ক্রিয়ায় যখন এ সেই রূপ নেয় যাকে আমরা বলতে পারি ভাস্বর অতিমানসিক বা দিব্য যুক্তিশক্তি। প্রথমে এই দিব্য যুক্তিশক্তিরূপেই অতিমানস নিজে তার ক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারে এবং পরে যখন এ মনকে পরিবর্তিত করেছে তার নিজের প্রতিমূর্তিতে এ নিম্নে নেমে এসে সাধারণ বুদ্ধির ও যুক্তিশক্তির স্থান নেয়। ইতিমধ্যে আরো বেশী মহৎ প্রকারের এক উচ্চতর অতিমানসিক শক্তি নিজেকে ঊর্ধ্বে প্রকট করতে থাকে আর এই সত্তার মধ্যে দিব্য ক্রিয়ার পরম নেতৃত্ব নেয়। দিব্য যুক্তিশক্তি আরো সীমিত প্রকারের কারণ যদিও এ মানসিক প্রকারের নয় আর যদিও এ সরাসরি সত্য ও জ্ঞানের ক্রিয়া, তবু এ এমন বিশেষ কতকগুলি উদ্দেশ্যের জন্য এক ন্যস্ত শক্তি যেগুলি আলোকে মহত্তর কিন্তু তবু কিছু পরিমাণে সাধারণ মানুষী সঙ্কল্প ও যুক্তিশক্তির সব উদ্দেশ্যের অনুরূপ; আরো মহত্তর অতিমানস-স্তরেই মানবীয় সত্তার মধ্যে আবির্ভূত হয় ঈশ্বরের সরাসরি, সম্পূর্ণ প্রকট ও অব্যবহিত ক্রিয়া। বোধিমানস, দিব্য যুক্তিশক্তি ও মহত্তর অতিমানস এবং এই সব পর্যায়ের অন্তবর্তী অন্য সব পর্যায়গুলিও — এদের মধ্যে এই সব পার্থক্য করা প্রয়োজন কারণ শেষে এরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। গোড়ার দিকে যা সব মনের উজান থেকে আসে সে সবকেই মন পার্থক্য না ক'রে গ্রহণ করে পর্যাপ্ত আধ্যাত্মিক দীপ্তি হিসেবে এবং এমনকি আদি অবস্থাগুলিকে ও প্রথম আলোকপাতগুলিকেও এ স্বীকার করে অন্তিম

অবস্থা ব'লে, কিন্তু পরে এ দেখে যে এখানে নিরস্ত হওয়ার অর্থ এক আংশিক উপলব্ধিতে নিরস্ত হওয়া, আর সাধকের কর্তব্য ঊর্ধ্বায়ণ ও প্রসারের কাজে প্রবৃত্ত থাকা যতক্ষণ না দিব্য প্রশস্ততা ও পরিমাণের খানিকটা সম্পূর্ণতা আসে অন্ততঃ।

ধীশক্তির পক্ষে এই সব অতিমানসিক পার্থক্যের অর্থ আদৌ আয়ত্ত করা দুরূহ: যে সব মানসিক সংজ্ঞায় তাদের প্রকাশ সম্ভব সে সবের অভাব অথবা সে সব যথেষ্ট নয়, আর তাদের অবধারণ সম্ভব কেবল কিছু দৃষ্টি বা অনুভূতিতে কিছু নিকটবর্তী বিষয় পাবার পর। বর্তমানে যা দিলে উপকার হয় তা কতকগুলি ইঙ্গিতমাত্র। প্রথমে চিন্তাশীল মন থেকেই কিছু সন্ধানসূত্র নেওয়া যথেষ্ট; কারণ এখানেই পাওয়া যেতে পারে অতিমানসিক ক্রিয়ার কয়েকটি নিকটতম চাবিকাঠি। সত্যের রূপ গঠন করে এমন চারি শক্তির দ্বারাই বোধিমানসের মনন সম্পূর্ণভাবে অগ্রসর হয় — এর ভাবনার আভাসন দেয় এমন এক বোধি, বিবেচনা করে এমন এক বোধি, এমন এক চিদাবেশ যা সত্যের বাক্ ও তার মহত্তর ধাতুর কিছু নিয়ে আসে এবং এক দিব্য প্রকাশ যা দৃষ্টির কাছে গঠন করে সত্যের নিজস্ব আসল মুখমণ্ডল ও দেহ। সাধারণ মানসিক বুদ্ধির যে কতকগুলি গতিবৃত্তি অনুরূপ দেখায় ও আমাদের প্রথম অনভিজ্ঞতায় সহজেই সত্যকার বোধি ব'লে ভুল করা হয় — সেগুলি আর পূর্বোক্ত বিষয়গুলি এক নয়। আভাসন দেয় এমন বোধি ও ক্ষিপ্রবুদ্ধির বুদ্ধিগত অন্তর্দৃষ্টি এক নয়, অথবা বোধিময় বিবেক ও যুক্তিশীল ধীশক্তির দ্রুত বিচার এক নয়; বোধিময় চিদাবেশ ও কল্পনাপ্রবণ বুদ্ধির চিদাবেশযুক্ত ক্রিয়া এক নয়, আবার বোধিময় প্রকাশ এবং অবিমিশ্র মনের ঘনিষ্ঠ গ্রহণ ও অনুভূতির প্রবল আলোক এক নয়।

হয়ত এই কথা বলা সঠিক হবে যে এই সব শেষোক্ত ক্রিয়াগুলি উচ্চতর গতিবৃত্তির মানসিক প্রতিরূপ, ঐ একই বিষয় সম্পাদনের জন্য সাধারণ মনের প্রয়াস, অথবা উচ্চতর প্রকৃতির বিভিন্ন ব্যাপ্রিয়া সম্বন্ধে ধী-শক্তি দিতে পারে এমন সব সম্ভবপর শ্রেষ্ঠ অনুকরণ। সত্যকার বোধিগুলি তাদের আলোকের ধাতুতে, তাদের ক্রিয়াধারায়, তাদের জ্ঞানের পদ্ধতিতে এই সব কার্যকরী কিন্তু নকল বিষয় থেকে পৃথক। বুদ্ধিগত ক্ষিপ্রতা নির্ভর করছে কতটা মনের আদি অজ্ঞানতা সত্যের মনোরূপ বা প্রতিরূপ গ্রহণে সক্ষম এবং এইসব নিজসীমার মধ্যে ও নিজ-উদ্দেশ্যে বেশ কার্যকরী হলেও, নির্ভরযোগ্য হতেই হবে এমন কোন কথা নয় আর তাদের প্রকৃতিতেই তারা নির্ভরযোগ্য নয়। এরা তাদের আবির্ভাবের জন্য নির্ভর করে মানসিক ও ইন্দ্রিয়গত তথ্যের দেওয়া বিভিন্ন আভাসনের উপর অথবা অতীত মানসিক জ্ঞানের সঞ্চয়ের উপর। এরা সত্যকে খোঁজে এক বাইরের জিনিস হিসেবে, পাবার এক বিষয় হিসেবে, এবং দেখার ও সঞ্চয় করার এক সামগ্রী হিসেবে, আর যখন এটি পাওয়া যায় তখন পরীক্ষা করা হয় এর বিভিন্ন উপরিভাগ, আভাসন বা দিক। এই পরীক্ষা কখনই সম্পূর্ণ সমগ্র ও পর্যাপ্ত সত্যভাবনা দিতে পারে না। সে সময় তারা যতই নিশ্চিত মনে হ'ক না কেন, তারা যে কোন সময় অবহেলিত ও ত্যক্ত হতে পারে আর দেখা যেতে পারে যে নতুন জ্ঞানের সঙ্গে তারা অসঙ্গত।

বিপরীত পক্ষে, বোধিময় জ্ঞান তার ক্ষেত্রে বা প্রয়োগে যতই সীমিত হ'ক না কেন, এ ঐ ক্ষেত্রের মধ্যে অব্যবহিত, স্থায়ী ও বিশেষ ক'রে স্বয়ম্প্রকাশ নিশ্চয়তাসহ নিঃসংশয়। এ সূত্রপাত হিসেবে, বরং আলোকিত করার এক বিষয় হিসেবে মন ও ইন্দ্রিয়ের দেওয়া তথ্যগুলি নিয়ে তাদের প্রকাশ করতে পারে তাদের প্রকৃত অর্থে, আর না হয় অতীত মনন ও জ্ঞানের এক পরম্পরাকে প্রদীপ্ত ক'রে দিতে পারে নতুন সব অর্থ ও পরিণাম, কিন্তু এ নিজের ছাড়া অন্য কিছুর উপর নির্ভরশীল নয়, এবং পূর্ববর্তী কোন আভাসন বা তথ্যের অনধীন হয়ে হঠাৎ বার হতে পারে নিজের জ্যোতির ক্ষেত্র থেকে, আর এই প্রকার ক্রিয়া উত্তরোত্তর আরো ঘন ঘন আসে এবং জ্ঞানের নতুন গভীরতা ও প্রদেশ সৃষ্টি করার জন্য অন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। উভয় ক্ষেত্রেই সর্বদাই স্বপ্রতিষ্ঠ সত্যের কিছু উপাদান এবং উৎপত্তির অনপেক্ষতার এক বোধ বর্তমান থাকে যা থেকে বোঝা যায় যে এর উৎস হল চিৎপুরুষের তাদাত্ম্যজ্ঞান। এ হল এমন জ্ঞানের প্রকাশ যা গূঢ় কিন্তু পূর্ব থেকেই সত্তার মধ্যে বর্তমান: এ কোন অর্জন নয়, বরং এমন কিছু যা সর্বদাই সেখানে বর্তমান ও প্রকাশযোগ্য ছিল। এ সত্যকে দেখে ভিতর থেকে এবং ঐ অন্তর্দর্শন দিয়ে বহিরংশগুলি প্রদীপ্ত করে, আর যদি আমরা বোধিময়ভাবে জাগ্রত থাকি তাহলে এ যা কিছু নতুন সত্য আসতে বাকী আছে তার সঙ্গে দ্রুত সমন্বয়সাধনও করে। এই সব বৈশিষ্ট্যগুলি আরো সুস্পষ্ট ও তীব্র হয় পরতর ও সমুচিত অতিমানসিক প্রদেশসমূহে: বোধিমানসে এই সবকে সর্বদাই তাদের শুদ্ধতায় ও সম্পূর্ণতায় চেনা না যেতে পারে কারণ সেখানে থাকে মানসিক উপাদান ও এর নতুন সঞ্চয়ের মিশ্রণ, কিন্তু দিব্য যুক্তিশক্তিতে ও মহত্তর অতিমানসিক ক্রিয়ায় তারা হয়ে ওঠে স্বচ্ছন্দ ও অনপেক্ষ।

আভাসনদায়ক বোধি মানসিকস্তরে সক্রিয় হয়ে সত্যের এক সরাসরি ও আলো-করা আন্তর ভাবনার ব্যঞ্জনা দেয়, এ হল এমন এক ভাবনা যা সত্যের প্রতিমূর্তি ও সূচক, এখনো সম্পূর্ণ উপস্থিত ও সমগ্র দৃষ্টি নয়, বরং কোন সত্যের উজ্জ্বল স্মৃতিস্বরূপ, আত্মার জ্ঞানের এক রহস্যের প্রত্যভিজ্ঞান। এ হল এক প্রতিরূপ, কিন্তু এক জীবন্ত প্রতিরূপ, কোন ভাবনাসূচক প্রতীক নয়, এ হল এক প্রতিবিম্ব, তবে এমন প্রতিবিম্ব যা সত্যের আসল ধাতুর কিছু দিয়ে আলোকিত। বোধিময় বিবেক এমন এক গৌণ ক্রিয়া যা সত্যের এই ভাবনাকে স্থাপন করে তার সঠিক স্থানে ও অন্য সব ভাবনার সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে। আর যতক্ষণ মানসিক হস্তক্ষেপ ও নতুন সঞ্চয়ের অভ্যাস থাকে ততদিন এ আরো যে কাজ করে তা হল উচ্চতর দেখা থেকে মানসিক দেখা পৃথক করা, যে অবর মানসিক উপাদান তার খাদ দিয়ে শুদ্ধ সত্যধাতুকে ক্লিষ্ট করে তাকে বিচ্ছিন্ন করা, এবং এ চেষ্টা করে অজ্ঞানতা ও জ্ঞানের, মিথ্যা ও প্রমাদের ব্যামিশ্র বিশৃঙ্খলকে উন্মোচন করতে। যেমন বোধি এক স্মৃতিস্বরূপ, এক স্বয়ম্প্রকাশ সত্যের ভাস্বর স্মরণস্বরূপ, তেমন চিদাবেশ হল সত্যশ্রবণস্বরূপ: এ হল সত্যের সাক্ষাৎ স্বরের অব্যবহিত গ্রহণ, এ তৎক্ষণাৎ সেই বাক্ নিয়ে আসে যা একে মূর্তিমন্ত করে সুষ্ঠুভাবে আর এ বহন করে তার ভাবনার আলো অপেক্ষা বেশী কিছু; তার আন্তর সদ্‌বস্তুর কিছু ধারা ও তার ধাতুর সুস্পষ্ট আসন্নতা আয়ত্ত করা হয়। দিব্য প্রকাশ হল প্রত্যক্ষ দৃষ্টিস্বরূপ, এ বর্তমান দর্শনের

কাছে সেই বিষয়টির স্বরূপ সুস্পষ্ট করে যার প্রতিরূপ হল তার ভাবনা। এ সত্যের মূল আন্তরভাব ও সত্তা ও সদ্‌বস্তুকে বাইরে নিয়ে আসে আর একে করে চেতনা ও অনুভূতির এক অঙ্গ।

যদি ধরে নেওয়া হয় যে অতিমানসিক প্রকৃতির বিকাশ এক নিয়মিত ক্রমপর্যায় অনুসরণ করে তাহলে দেখা যাবে যে এই বিকাশের বাস্তব ধারায় নিম্নতর দুটি শক্তি প্রথম বাইরে আসে — অবশ্য সেজন্য এদের মধ্যে যে উচ্চতর দুটি শক্তির কোন ক্রিয়া থাকবেই না তা নয় — আর যখন ঐ নিম্ন দুটি শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং স্বাভাবিক ক্রিয়া হয়ে ওঠে, তখন এরা এক প্রকার নিম্ন বোধিজ বিজ্ঞান গঠন করে। এর সম্পূর্ণতার জন্য দুটির একত্র সমবায় প্রয়োজনীয়। যদি বোধিময় বিবেক নিজে নিজে কাজ করে তাহলে এ ধীশক্তির বিভিন্ন ভাবনা ও বোধের উপর একপ্রকার সমালোচক দীপ্তি সৃজন করে এবং সে সবকে নিজেদের উপর এমনভাবে ফেরায় যে মন তাদের প্রমাদ থেকে তাদের সত্য পৃথক করতে সক্ষম হয়। অবশেষে এ বুদ্ধিগত বিচারের স্থলে সৃষ্টি করে ভাস্বর বোধিময় বিচার, এক প্রকার সমালোচক বিজ্ঞান: তবে সম্ভবতঃ এর নতুন প্রকাশপ্রদ জ্ঞান কম হবে অথবা এ সত্যের মাত্র ততখানি বিস্তার সাধন করবে যা প্রমাদ হতে সত্যকে বিচ্ছিন্ন করার স্বাভাবিক পরিণাম। অপর পক্ষে, যদি আভাসনদায়ক বোধি এই বিবেক বিনাই নিজে নিজে কাজ করে, তাহলে অবশ্য বিভিন্ন নতুন সত্য ও নতুন আলোর অবিরত আগমন হয়, কিন্তু বিভিন্ন মানসিক নতুন সঞ্চয়ের দ্বারা তারা সহজেই বেষ্টিত ও ক্লিষ্ট হয় এবং হস্তক্ষেপের জন্য তাদের বিভিন্ন সংযোগ ও সম্বন্ধ অথবা পরস্পরের মধ্য থেকে সুসমঞ্জস বিকাশ আচ্ছন্ন ও ছিন্ন হয়। সক্রিয় বোধিময় অনুভবের এক স্বাভাবিক শক্তির সৃষ্টি হয়, কিন্তু বোধিজ বিজ্ঞানের কোন সম্পূর্ণ ও সুশৃঙ্খল মনের সৃষ্টি হয় না। দুটি মিলে পরস্পরের একক ক্রিয়ার ঊনতা পূরণ করে এবং বোধিময় অনুভব ও বিবেকের এমন এক মন নির্মাণ করে যা স্খলনশীল মানসিক বুদ্ধির কাজ এবং এর চেয়ে আরো বেশী কিছু করতে সক্ষম হয়, আর তা করে আরো সাক্ষাৎ ও স্খলনহীন ভাবনাকার্যের মহত্তর আলোক, নিশ্চিততা ও শক্তি নিয়ে।

এই একই প্রকারে দুটি উচ্চতর শক্তি তৈরী করে এক উচ্চতর বোধিজ বিজ্ঞান। মানসিকতার মাঝে পৃথক শক্তি হিসেবে কাজ করলে, এরাও সহগামী সব ক্রিয়ার অভাবে নিজেরা পর্যাপ্ত হয় না। অবশ্য দিব্যপ্রকাশ বস্তুটি স্বরূপে যা তার সত্যতা ও বিভিন্ন তাদাত্ম্যগুলি উপস্থিত করতে এবং চিন্ময় পুরুষের অনুভূতিতে মহৎ সামর্থ্যের কিছু যোগ করতে পারে, কিন্তু এতে মূর্তিদাত্রী বাক্, বহিঃপ্রকাশক ভাবনা, এর বিভিন্ন সম্বন্ধ ও পরিণামের অবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খলা থাকে না, আর এ আত্মার মধ্যে এক প্রাপ্তি হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু এমন বিষয় হয় না যা বিভিন্ন অঙ্গের ভিতর ও মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত করা যায়। সত্যের উপস্থিতি থাকতে পারে, কিন্তু এর পূর্ণ অভিব্যক্তি থাকে না। চিদাবেশ দিতে পারে সত্যের বাক্ এবং এর প্রবৃত্তি ও গতিবিধির চাঞ্চল্য কিন্তু নিজের মধ্যে এ যা সব বহন করে এবং দীপ্তিময়ভাবে যা সবের নির্দেশ দেয় সে সবের পূর্ণ প্রকাশ ও এর

বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্যে এর সুবিন্যাস বিনা কোন সম্পূর্ণতা আসে না এবং ফলের দিক থেকেও নিশ্চিত হয় না। চিদাবেশযুক্ত বোধিমানস বিদ্যুৎ-ঝলকের এমন এক মন যা অন্ধকারময় অনেক বিষয়কে আলোকিত করে কিন্তু এই আলোককে প্রণালীবদ্ধ ক'রে স্থির প্রভার এমন এক ধারায় নিবিষ্ট করা চাই যা বিশদভাবে সুবিন্যস্ত জ্ঞানের এক সতত শক্তি হবে। উচ্চতর বিজ্ঞান নিজে নিজে তার দুই একক শক্তির সাহায্যে আধ্যাত্মিক জ্যোতির এমন এক মন হবে যা তার নিজের পৃথক রাজ্যে বড় বেশী বাস করে, হয়ত বাইরের জগতের উপর এ অদৃশ্যভাবে তার ফল উৎপাদন করতে পারে কিন্তু এর অন্য সব স্বাভাবিক গতিবৃত্তির সঙ্গে নিম্ন ভাবময় ক্রিয়াজাত গতিবৃত্তির কোন নিবিড় ও সাধারণ যোগাযোগের সূত্র থাকে না। চারিশক্তির সংযুক্ত অথবা সম্মিশিত ও একীকৃত শক্তিই গঠন করে সম্পূর্ণ ও সুদৃঢ় ও সুসজ্জিত বোধিজ বিজ্ঞান।

চারিশক্তির কিছু যুগপৎ অভিব্যক্তি সত্ত্বেও, নিয়মিত বিকাশের ধারায় প্রথমে পর্যাপ্ত ও ব্যাপক পরিমাণে সৃষ্টি হবে নিম্ন আভাসনদায়ী ও সমালোচক বোধিমানস ও তার পর এর উপর বিকশিত হবে চিদাবেশযুক্ত ও প্রকাশক বোধিময় মানসিকতা। এর পর নিম্নতর দুটি শক্তিকেই চিদাবেশের শক্তি ও ক্ষেত্রের মধ্যে নিয়ে সকল ক্রিয়াকে করা হবে যেন এক সৌষম্য যা একসাথে তিনেরই সংযুক্ত ক্রিয়া করে — অথবা এক উচ্চতর তীব্রতায়, সকল ক্রিয়াকে পার্থক্য করা যায় না এমন একমাত্র অবিভাজ্য আলোক রূপে — তিনের একীকৃত ক্রিয়া করে। আর পরিশেষে অনুরূপ এক গতিবৃত্তির দ্বারা এই তিনটিকে বোধিজ বিজ্ঞানের প্রকাশিকা শক্তির মধ্যে নিয়ে এর সঙ্গে সম্মিশিত করা হবে। বস্তুতঃ মানসিক অর্ধ-জ্ঞানের বর্তমান বিভিন্ন গতিবৃত্তির সতত মিশ্রণ ও হস্তক্ষেপের কারণে এবং মানসিক অজ্ঞানতার উপাদানের বাধার জন্য, মানবমনে বিকাশের স্পষ্ট ধারা সম্ভবতঃ সর্বদাই কমবেশী ব্যাহত, বিশৃঙ্খল হয় ও এর গতিপথ অনিয়মিত হয়ে ওঠে আর তাতে থাকে পুনঃপুনঃ পূর্বাবস্থা প্রাপ্তি, অপূর্ণ অগ্রগতি, অসমাপ্ত বা অপূর্ণভাবে সমাপ্ত বিষয়ে প্রত্যাবর্তন। কিন্তু পরিশেষে একটা সময় আসতে পারে যখন, মনের মধ্যে যতদূর সম্ভব ততদূর বিকাশের ধারা সম্পূর্ণ হয় এবং এমন এক পরিমিত অতিমানসিক আলোকের স্পষ্ট গঠন সম্ভব হয় যা এই সকল শক্তি নিয়েই নির্মিত, আর সর্বোচ্চ শক্তিটি নেতৃত্ব করে অথবা অন্য শক্তিগুলিকে আত্মসাৎ করে তার নিজের দেহের মধ্যে। এই ক্ষণেই অর্থাৎ যখন মনোময় পুরুষের মাঝে বোধিমানস পরিপূর্ণভাবে গঠিত হয়েছে এবং তখনো বিবিধ মানসিক ক্রিয়াবলীকে সম্পূর্ণ দখল করতে সমর্থ না হলেও, এর উপর আধিপত্য করার জন্য যথেষ্ট ক্ষমতাবান হয়েছে তখন উন্নতির আর একটি পদক্ষেপ সম্ভবপর হয়, আর তা হল মনের ঊর্ধ্বে ক্রিয়ার কেন্দ্র ও স্তরের উন্নয়ন এবং অতিমানসিক যুক্তিশক্তির আধিপত্য।

এই পরিবর্তনের প্রথম লক্ষণ হল সমগ্র ক্রিয়াধারার সম্পূর্ণ পরাবর্তন অর্থাৎ যাকে প্রায় বলা যায়, উবুড় হয়ে উল্টে যাওয়া। বর্তমানে আমরা বাস করি মনের ভিতর এবং বেশীরভাগই তা শারীরিক (স্থূল) মনে; কিন্তু তবু পশুর মতো সম্পূর্ণভাবে শারীরিক,

প্রাণিক ও ইন্দ্রিয়বোধাত্মক কর্মসমূহে অভিভূত থাকি না। বরং আমরা এমন এক বিশেষ উন্নত স্তরে আরোহণ করেছি যা থেকে আমরা নিম্নে প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও দেহের ক্রিয়ার উপর দৃষ্টিপাত করতে পারি, এদের উপর ফেরাতে পারি উচ্চতর মানসিক আলো, গভীরভাবে চিন্তা করতে, বিচার করতে পারি আর পারি আমাদের সঙ্কল্পকে অবর প্রকৃতির ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করার কাজে ব্যবহার করতে। অপরপক্ষে, আমরা ঐ উচ্চতর স্তর থেকে কম বা বেশী সচেতনভাবে উপর দিকেও তাকাতে পারি উপরিস্থ কিছুর দিকে এবং তা থেকে হয় সরাসরি, না হয় আমাদের অবচেতন বা অধিচেতন সত্তার মধ্য দিয়ে নিতে পারি আমাদের মনন ও সঙ্কল্প ও অন্যান্য ক্রিয়াবলীর কিছু গূঢ় অতিচেতন প্রবেগ। এই যোগাযোগের প্রণালী প্রচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট থাকে এবং কতকগুলি অত্যন্ত বিকশিত প্রকৃতির মানুষ ছাড়া সাধারণতঃ এর কথা লোকে জানে না: কিন্তু যখন আমরা আত্মজ্ঞানে অগ্রসর হই তখন আমরা দেখি যে আমাদের সকল মনন ও সঙ্কল্প উৎপন্ন হয় ঊর্ধ্ব থেকে, যদিও তারা গঠিত হয় মনে এবং সেখানেই প্রথম প্রকাশ্যভাবে সক্রিয় হয়। যে স্থূল মন আমাদিগকে মস্তিষ্ক যন্ত্রের সঙ্গে বদ্ধ রাখে এবং দৈহিক চেতনার সঙ্গে আমাদের অভিন্ন করে তার গ্রন্থিগুলি যদি আমরা মোচন ক'রে শুদ্ধ মানসিকতার মধ্যে বিচরণ করতে সক্ষম হই, তাহলে এই ব্যাপারটি আমাদের অনুভবে সতত স্পষ্ট থাকে।

বোধিময় মানসিকতার বিকাশ এই যোগাযোগকে সরাসরি করে, এ আর তখন অবচেতন ও অস্পষ্ট থাকে না; কিন্তু তবু আমরা তখনো মনের মধ্যে থাকি এবং তখনো মন ঊর্ধ্বে তাকায় এবং অতিমানসিক দান গ্রহণ করে এবং তা প্রেরণ করে অন্যান্য অঙ্গগুলিতে। এরকম করায়, এ আর তার কাছে নেমে-আসা মনন ও সঙ্কল্পের জন্য সম্পূর্ণভাবে নিজের রূপ সৃষ্টি করে না কিন্তু তবু এ সে সবকে পরিবর্তিত ও সঙ্কীর্ণ ও সীমিত করে এবং তার নিজের পদ্ধতির কিছু আরোপ করে। তবু এ মনন ও সঙ্কল্পের গ্রাহক ও সঞ্চালক — যদিও এ সূক্ষ্ম প্রভাবের সাহায্য ব্যতিরেকে অন্যভাবে এখন তাদের গঠন করে না, কারণ এ তাদের প্রদান করে মানসিক উপাদান বা মানসিক সন্নিবেশ ও কাঠামো ও বাতাবরণ। কিন্তু যখন অতিমানসিক যুক্তিশক্তি বিকশিত হয়, তখন পুরুষ মানসিক উচ্চস্তরের ঊর্ধ্বে ওঠে এবং তখন মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, দেহের সমগ্র ক্রিয়ার উপর দৃষ্টিপাত করে সম্পূর্ণ অন্য এক আলো ও বাতাবরণ থেকে, একে দেখে ও জানে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন দর্শন নিয়ে আর মনের মধ্যে আর অভিভূত থাকে না ব'লে দেখে ও জানে স্বচ্ছন্দ ও সত্য জ্ঞানে। বর্তমানে মানব পাশবিক নিগূহন থেকে মাত্র আংশিকভাবে মুক্ত — কারণ তার মন আংশিকভাবে ঊর্ধ্বে উত্তোলিত, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও দেহের দ্বারা আংশিকভাবে নিমগ্ন ও নিয়ন্ত্রিত কিন্তু সে বিভিন্ন মানসিক রূপ ও সীমা থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু অতিমানসিক স্তরে আরোহণ করার পর সে নিম্নতর নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়, আর হয় সমগ্র প্রকৃতির শাসন কর্তা — প্রথমে হয় শুধু স্বরূপগত ও প্রাথমিকভাবে এবং তার সর্বোচ্চ চেতনায় কারণ বাকীসবের রূপান্তর তখনো অবশিষ্ট থাকে — কিন্তু যখন বা যে অনুপাতে এটি করা হয় সে হয়ে ওঠে এক স্বাধীন সত্তা এবং তার মন, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও দেহের অধীশ্বর।

এই পরিবর্তনের দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে মনন ও সঙ্কল্পের গঠন এখন সম্পূর্ণভাবে ঘটতে পারে সম্পূর্ণ অতিমানসিক স্তরে এবং সেজন্য সেখানে প্রবর্তিত হয় এক সম্পূর্ণ জ্যোতির্ময় ও কার্যকরী সঙ্কল্প ও জ্ঞান। প্রারম্ভে অবশ্য আলোক ও শক্তি সম্পূর্ণ হয় না, কারণ অতিমানসিক যুক্তিশক্তি হল অতিমানসের শুধু এক প্রাথমিক ব্যাকৃতি আর এই কারণে যে মন ও অন্যান্য বিভিন্ন অঙ্গসমূহকে তখনো পরিবর্তিত করা দরকার অতিমানসিক প্রকৃতির ছাঁচে। একথা সত্য যে মন এখন আর মনন ও সঙ্কল্প বা অন্য কিছুর আপতিক উৎপাদক বা বিভাবনকারী বা বিচারকর্তারূপে কাজ করে না কিন্তু তবু এ কাজ করে সঞ্চালক প্রণালী হিসেবে এবং সেই অনুপাতে উপর থেকে আসা শক্তি ও আলোকের সঞ্চালনে গ্রাহক হিসেবে এবং কিছু পরিমাণে বাধাদায়ক ও পরিমিতকারী রূপে। যে অতিমানসিক চেতনায় পুরুষ এখন অবস্থান করে, চিন্তা ও সঙ্কল্প করে এবং যে মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক চেতনার মধ্য দিয়ে তাকে তার আলো ও জ্ঞান কার্যকরী করতে হয় — এই দুয়ের মধ্যে এক বৈসাদৃশ্য থাকে। সে বাস করে ও দেখে এক আদর্শ চেতনা নিয়ে কিন্তু তবু তার অবর আত্মাতেই একে পুরোপুরি কার্যকরী ও সফল করা চাই। অন্যথায়, সে শুধু অন্যদের সঙ্গে আভ্যন্তরীণ যোগাযোগের মাধ্যমে কাজ করতে পারে আধ্যাত্মিক স্তরে ও তাঁর দ্বারা সহজপ্রভাবশীল উচ্চতর মানসিক স্তরে কম বা অধিক পরিমাণের আধ্যাত্মিক সফলতাসহ কিন্তু সত্তার অখণ্ড লীলার হীনতা বা অভাবের দ্বারা এই ফল হ্রাস পায় এবং বিলম্বিত হয়। এর প্রতিবিধান করা সম্ভব একমাত্র যদি অতিমানস মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক চেতনাকে নিয়ে তাকে অতিমানসিক ভাবাপন্ন করে — অর্থাৎ রূপান্তরিত করে অতিমানসিক প্রকৃতির ছাঁচে। আমি পূর্বেই অপরা প্রকৃতির বিভিন্ন করণের যে যৌগিক প্রস্তুতির কথা বলেছি তা করা থাকলে ঐ কাজ আরো সহজেই করা যায়; তা না হলে, আদর্শ অতিমানসিকতার এবং মনোময় সঞ্চালক করণগুলির অর্থাৎ মনঃপ্রণালী, হৃদয়, ইন্দ্রিয়, স্নায়বিক ও শারীরিক সত্তার মধ্যে বিরোধ বা অসঙ্গতি দূর করতে অনেক কষ্ট হয়। অতিমানসিক যুক্তিশক্তি এই রূপান্তরের প্রাথমিক কাজ বেশ অনেকটা করতে সমর্থ, কিন্তু পুরোপুরি নয়।

অতিমানসিক যুক্তিশক্তি স্বরূপে এক আধ্যাত্মিক, সরাসরি, স্বয়ংদীপ্ত, স্বয়ংসক্রিয় সঙ্কল্প ও বুদ্ধি, এ "মানসবুদ্ধি" নয়, এ হল অতিমানসিক বুদ্ধি, "বিজ্ঞানবুদ্ধি"। বোধিমানসের মতো, এ সেই একই চার শক্তির দ্বারা কাজ করে কিন্তু এখানে এই শক্তিগুলি স্বরূপের এমন প্রাথমিক পরিপূর্ণতাসহ সক্রিয় যা বুদ্ধির মানসিক উপাদানের দ্বারা পরিমিত হয় না আর শুধু মনকে দীপ্ত করার কাজেই প্রধানতঃ ব্যস্ত থাকে না, বরং তারা কাজ করে তাদের আপন উপযোগী প্রণালীতে এবং নিজেদের স্বকীয় উদ্দেশ্যের জন্য। আর এই চার শক্তির মধ্যে এখানে বিবেককে পৃথক এক শক্তি হিসেবে চিনতে পারা একরকম অসম্ভব, কিন্তু এ অন্য তিনটিতে সর্বদাই নিহিত থাকে এবং তাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রের ও বিভিন্ন সম্পর্কের তাদের নিজেদের সবিশেষকরণ হিসেবে। এই যুক্তিশক্তির মধ্যে তিনটি স্তর আছে — একটি স্তরে সেই জিনিস, যাকে আমরা অতিমানসিক বোধি বলতে পারি, তার ক্রিয়াতে আকার ও প্রধান বৈশিষ্ট্য সৃষ্ট হয়, একটি

আছে যাতে দ্রুত অতিমানসিক চিদাবেশ এবং অন্য একটিতে বৃহৎ অতিমানসিক প্রকাশ অগ্রবর্তী হয়ে সাধারণ স্বভাব দান করে এবং এদের প্রত্যেকেই আমাদের উত্তোলন করে সত্য-সঙ্কল্প ও সত্য-জ্ঞানের আরো ঘনীভূত ধাতুতে ও উচ্চতর আলোক, প্রাচুর্য ও ক্ষেত্রে।

মানসিক যুক্তিশক্তি যা সব কাজ করে অতিমানসিক যুক্তিশক্তি সে সবও করে এবং তার বেশী করে, তবে এর কাজ শুরু হয় অন্য প্রান্ত থেকে এবং তার কার্যপ্রণালীও অনুরূপ। আধ্যাত্মিক যুক্তিশক্তির কাছে আত্মার ও চিৎপুরুষের ও বিষয়সমূহের তত্ত্বের মৌলিক সত্যগুলি এমন সব আচ্ছিন্ন ভাবনা বা সূক্ষ্ম অসার অনুভূতি নয় যাতে এ উপনীত হয় সীমার এক প্রকার উত্তরণের দ্বারা, এই সব এর কাছে এক নিত্য সদ্‌বস্তু, এবং এর সকল ভাবনাকার্যের ও অনুভূতির স্বাভাবিক পটভূমিকা। মনের মতো, এ কষ্ট করে লাভ করে না, বরং অবিলম্বে প্রকাশ করে সত্তা ও চেতনার, আধ্যাত্মিক ও অন্যবিধ ইন্দ্রিয়সংবিৎ ও আনন্দের, শক্তির ও ক্রিয়ার সাধারণ ও সমগ্র ও বিশেষ সত্যগুলি — অর্থাৎ সদ্‌বস্তু ও প্রতিভাস ও প্রতীক, ভূতার্থ, ও সম্ভাবনা ও ধ্রুব পরিণতি, যা নির্ধারিত হয় ও যা নির্ধারণ করে, আর এসব করে স্বয়ং-প্রকাশ প্রমাণসহ। মননের সঙ্গে মননের, শক্তির সঙ্গে শক্তির, ক্রিয়ার সঙ্গে ক্রিয়ার এবং পরস্পরের সঙ্গে এই সকলের বিভিন্ন সম্বন্ধগুলি এ গঠিত ও বিন্যস্ত করে এবং সে সবকে নিক্ষেপ করে সংশয়হীন ও দীপ্তিময় সামঞ্জস্যের মধ্যে। ইন্দ্রিয়ের তথ্যগুলি এ গ্রহণ করে কিন্তু এদের পশ্চাতে যা আছে তার আলোকে এ তাদের অন্য অর্থ দেয় এবং তাদের গণ্য করে শুধু বাহ্যতম সঙ্কেতরূপে: পূর্ব থেকেই এর যে মহত্তর ইন্দ্রিয় আছে তার কাছে আন্তর সত্য জানা। আর এমনকি বিষয়সমূহের ব্যাপারে তাদের নিজেদের ক্ষেত্রেও এ শুধু তাদের উপর নির্ভরশীল নয় অথবা তাদের পরিসরের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। এর নিজের এক আধ্যাত্মিক অর্থ ও ইন্দ্রিয়সংবিৎ আছে এবং ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ আন্তর মনঃ-ইন্দ্রিয়ের তথ্যগুলি নিয়ে এ তার সঙ্গে এদের সম্পর্ক স্থাপন করে। আবার এ চৈত্য অনুভূতির কাছে পরিচিত বিভিন্ন দীপ্তি ও জীবন্ত প্রতীক ও মূর্তিগুলি নিয়ে সে সবকেও সম্পৃক্ত করে আত্মা ও চিৎপুরুষের বিভিন্ন সত্যের সঙ্গে।

আধ্যাত্মিক যুক্তিশক্তি বিভিন্ন ভাবাবেগ ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়সংবিৎগুলিকেও নিয়ে তাদের সম্পৃক্ত করে তাদের আধ্যাত্মিক প্রতিরূপের সঙ্গে এবং যে উচ্চতর চেতনা ও আনন্দ থেকে তাদের উৎপত্তি এবং যার পরিবর্তিত রূপ এরা, তার মূল্য এক নিম্নপ্রকৃতির মাঝে এ সঞ্চারিত করে এবং তাদের বিকৃতিগুলি সংশোধন করে। অনুরূপভাবে এ প্রাণিক সত্তা ও চেতনার বিভিন্ন গতিবৃত্তি নিয়ে সে সবকে সম্পৃক্ত করে আত্মার ও এর তপঃ-শক্তির আধ্যাত্মিক জীবনের গতিবৃত্তিগুলির সঙ্গে এবং এদের দেয় এই জীবনের বিভিন্ন তাৎপর্য। এ শারীরিক চেতনাকেও নিয়ে একে মুক্ত করে এর অন্ধকার ও নিশ্চেষ্টতার তমঃ থেকে এবং একে ক'রে তোলে অতিমানসিক আলো ও শক্তি ও আনন্দের এক উত্তরদায়ী গ্রাহক ও সূক্ষ্মসংবেদনশীল যন্ত্র। মানসিক সঙ্কল্প ও যুক্তিশক্তির মতো, এ প্রাণ ও ক্রিয়া

ও জ্ঞানের সঙ্গে কারবার করে তবে জড়, প্রাণ ও ইন্দ্রিয় ও তাদের সব তথ্য থেকে শুরু না ক'রে এবং এদের সঙ্গে ভাবনার মাধ্যমে উচ্চতর বিষয়সমূহের সত্যকে সম্পৃক্ত না ক'রে, বরং বিপরীত পক্ষে শুরু করে আত্মা ও চিৎপুরুষের সত্য থেকে এবং অন্য সকল অনুভূতিকে এর বিভিন্ন রূপ ও যন্ত্র হিসেবে গণ্য ক'রে সরাসরি আধ্যাত্মিক অনুভূতির মাধ্যমে মন ও অন্তঃপুরুষ ও প্রাণ ও ইন্দ্রিয় ও জড়ের বিষয়গুলিকে সম্পৃক্ত করে আত্মা ও চিৎপুরুষের সত্যের সঙ্গে। বিভিন্ন স্থূল ইন্দ্রিয়ের কারাগারে আবদ্ধ সাধারণ দেহবদ্ধ মন অপেক্ষা আরো অনেক বিশাল পরিসর এর আয়ত্তাধীন এবং এমনকি শুদ্ধ মানসিকতাও যখন তার নিজের সব পরিসরের মধ্যে মুক্ত এবং সূক্ষ্ম মন ও আন্তর ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে কাজ করে তখনো তার যে পরিসর তার চেয়ে আরো বিশাল পরিসর আধ্যাত্মিক যুক্তিশক্তির আয়ত্তাধীন। আর মানসিক সঙ্কল্প ও যুক্তিশক্তি প্রকৃতই আত্মনির্ধারিত এবং বিষয়সমূহের মূল নির্ধারক না হওয়ায় এরা যে শক্তির অধিকারী নয়, আধ্যাত্মিক যুক্তিশক্তি সেই শক্তির অধিকারী অর্থাৎ সে সমগ্র সত্তাকে তার সকল অংশ সমেত চিৎপুরুষের সুসমঞ্জস যন্ত্রে ও অভিব্যক্তিতে রূপান্তরিত করার শক্তির অধিকারী।

সেই সঙ্গে, আধ্যাত্মিক যুক্তিশক্তি প্রধানতঃ কাজ করে চিৎপুরুষস্থ প্রতিনিধিমূলক ভাবনা ও সঙ্কল্পের দ্বারা, যদিও এ এমন এক মহত্তর ও আরো স্বরূপগত সত্যের অধিকারী যা এর নিরন্তর উৎস ও ধারক ও সহায়। তখন এ ঈশ্বরের এক আলোকের শক্তি, কিন্তু সত্তার মধ্যে তার অব্যবহিত উপস্থিতির সাক্ষাৎ আত্মশক্তি নয়। আধ্যাত্মিক যুক্তিশক্তির মধ্যে যা কাজ করে তা তাঁর সূর্যশক্তি, এ তাঁর "আত্মশক্তি" বা "পরা স্বা প্রকৃতি" নয়। অব্যবহিত আত্মশক্তি তার সরাসরি কাজ শুরু করে মহত্তর অতিমানসে এবং দেহে, প্রাণে ও মনে ও বোধিময় সত্তায় ও আধ্যাত্মিক যুক্তিশক্তির দ্বারা এ পর্যন্ত যা সব উপলব্ধ হয়েছে সে সবকে এ তুলে নেয় এবং মনোময় পুরুষের দ্বারা যা সব সৃষ্ট হয়েছে, যা সব সংগৃহীত হয়েছে, অনুভূতির উপাদানে পরিণত হয়েছে এবং চেতনা, ব্যক্তিভাবনা ও প্রকৃতির অংশ করা হয়েছে সে সবকে গঠিত করে চিৎপুরুষের উচ্চ অনন্ত ও বিশ্বময় প্রাণের সঙ্গে সর্বোচ্চ সামঞ্জস্যে। মন অনন্ত ও বিশ্বভাবের স্পর্শ পেতে সক্ষম এবং তাদের মধ্যে নিজেকে প্রতিফলিত করতে ও এমনকি হারিয়ে ফেলতেও সক্ষম কিন্তু একমাত্র অতিমানসই সক্ষম জীবকে বিশ্বময় ও বিশ্বাতীত চিৎপুরুষের সঙ্গে ক্রিয়ায় সম্পূর্ণ এক করতে।

এখানে যে একটি বিষয় সর্বদাই ও নিরন্তর উপস্থিত, যাতে সাধক উপচিত হয়েছে এবং যার মধ্যে সে সর্বদা বাস করে তা হল অনন্ত সত্তা এবং যা কিছু আছে সে সবকে দেখা হয়, অনুভব করা হয়, জানা হয়, তাতে থাকা হয় সেই একমাত্র সত্তার শুধু ধাতু হিসেবে; এ হল অনন্ত চেতনা এবং যা কিছু সচেতন ও সক্রিয় ও বিচরণ করে সে সবকে দেখা হয়, অনুভব করা হয়, লওয়া হয়, জানা হয়, তাতে বাস করা হয় সেই একমাত্র সত্তার আত্ম-অনুভূতি ও ক্রিয়াশক্তি হিসেবে: এ হল অনন্ত আনন্দ এবং যা সব অনুভব করে ও অনুভব করা হয় সে সবকে দেখা হয় ও অনুভব করা হয় ও জানা হয়, গ্রহণ

করা হয় ও তাতে বাস করা হয় সেই এক আনন্দের বিভিন্ন রূপ হিসেবে। অন্য সবকিছু হল আমাদের অস্তিত্বের এই একমাত্র সত্যের শুধু অভিব্যক্তি ও পরিস্থিতি। এটি আর শুধু সকলের মধ্যে আত্মার এবং আত্মার মধ্যে সকলের, সকলের মধ্যে ভগবানের এবং ভগবানের মধ্যে সকলের এবং সকল কিছুকেই ভগবান ব'লে দেখার দৃষ্টি বা জ্ঞান নয়, বরং এসবের এক সাক্ষাৎ অবস্থা, আর এই অবস্থা এখন এমন প্রতিফলনকারী আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন মনের কাছে দেওয়া কোন বিষয় নয়, বরং অতিমানসিক প্রকৃতির মধ্যে এক অখণ্ড, সদা বর্তমান, সদা সক্রিয় উপলব্ধির দ্বারা এই অবস্থা ধারণ করা হয় এবং জীবনে রূপায়িত করা হয়। এখানে মনন ও সঙ্কল্প ও ইন্দ্রিয়সংবিৎ এবং যা কিছু আমাদের প্রকৃতির অন্তর্গত সে সব আছে কিন্তু একে রূপান্তরিত ও উন্নীত করা হয় এক পরতর চেতনায়। এখানে সকল মননকে দেখা ও অনুভব করা হয় যেন এ হল সত্তার ধাতুর এক জ্যোতির্ময় দেহ, শক্তির এক জ্যোতির্ময় গতিবৃত্তি, আনন্দের এক জ্যোতির্ময় তরঙ্গ; এ মনের শূন্য বাতাসের মধ্যে এক ভাবনা নয়, বরং একে অনুভব করা হয় অনন্ত সত্তার সদ্‌বস্তুর মধ্যে এবং অনন্ত সত্তার এক সদ্‌বস্তুর আলোক হিসেবে। অনুরূপভাবে সঙ্কল্প ও প্রবেগসমূহকে অনুভব করা হয় ঈশ্বরের সৎ, চিৎ, আনন্দের যথার্থ শক্তি ও ধাতু রূপে। সকল আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন ইন্দ্রিয়সংবিৎ ও ভাবাবেগকে অনুভব করা হয় চেতনা ও আনন্দের শুদ্ধ ছাঁচরূপে। এমনকি শারীরিক সত্তাকেও অনুভব করা হয় চিৎপুরুষের সচেতন রূপ হিসেবে এবং প্রাণিক সত্তাকে চিৎপুরুষের প্রাণের শক্তি ও সম্পদের বহির্বর্ষণ হিসেবে।

বিকাশসাধনে অতিমানসের ক্রিয়া হল এই সর্বোচ্চ চেতনাকে অভিব্যক্ত ও সংগঠিত করা যাতে এ যে আর শুধু উর্ধ্বে অনন্তের মধ্যে থাকবে ও কাজ করবে এবং ব্যষ্টিসত্তা ও প্রকৃতির মধ্যে কিছু কিছু সীমিত বা প্রচ্ছন্ন বা নিম্ন ও বিকৃত অভিব্যক্তি হবে তা নয়, বরং এ যেন ব্যষ্টির মধ্যে বৃহৎভাবে ও সমগ্রভাবে থাকে ও কাজ করে এক চিন্ময় ও আত্মবিৎ আধ্যাত্মিক সত্তারূপে এবং অনন্ত ও বিরাট চিৎপুরুষের সজীব ও সক্রিয় শক্তিরূপে। এই ক্রিয়ার স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বলা — অবশ্য যতদূর ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব — আরো উপযোগী হবে যখন আমরা পরে ব্রাহ্মী চেতনা ও দর্শনের কথা বলব। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা শুধু ব্যষ্টি প্রকৃতির মধ্যে মনন, সঙ্কল্প ও চৈত্য ও অন্যান্য অনুভূতি বিষয়ক কথা আলোচনা করব। বর্তমানে শুধু এই বলা প্রয়োজনীয় যে এখানেও মনন ও সঙ্কল্পের ক্ষেত্রে ত্রিবিধ ক্রিয়া বর্তমান। আধ্যাত্মিক যুক্তিশক্তিকে এমন এক মহত্তর প্রতিনিধিমূলক ক্রিয়ায় উন্নীত ও প্রশস্ত করা হয় যা আমাদের কাছে প্রধানতঃ ব্যাকৃত করে আমাদের ভিতরে ও চারিদিকে অবস্থিত আত্মার অস্তিত্বের বিভিন্ন ভূতার্থগুলি। তখন অতিমানসিক জ্ঞানের এক উচ্চতর ব্যাখ্যামূলক ক্রিয়া হয় যা ভূতার্থ সম্বন্ধে অনেক কম আগ্রহী এবং উন্মুক্ত করে কাল ও দেশের মধ্যে ও তার অতীতে আরো মহত্তর যোগ্যতাগুলি। এবং সর্বশেষে আছে তাদাত্ম্যের দ্বারা এক শ্রেষ্ঠ জ্ঞান যা ঈশ্বরের স্বরূপগত আত্মসংবিৎ ও সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমত্তার মধ্যে প্রবেশতোরণ।

কিন্তু এই ক্রমন্যস্ত পর্যায়গুলি যে অনুভূতির ভিতর পরস্পরের মধ্যে সম্পূর্ণ বন্ধ তা মনে করা কখনই ঠিক হবে না। আমি যে তাদের উত্তরোত্তর বিকাশের এক নিয়মিত ধারা রূপে স্থাপন করেছি তার কারণ, এইভাবে বুদ্ধিগত বিবরণে বোঝার সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু এমনকি সাধারণ মনেও অনন্ত তার নিজের সব আবরণ বিদীর্ণ ক'রে এবং অবরোহণ ও আরোহণের নিজের বিভাজক রেখাগুলি পার হয়ে প্রায়ই কোন না কোন প্রকারে নিজের সম্বন্ধে বিভিন্ন ইঙ্গিত দেয়। আর এমনকি যখন আমরা বোধিময় মানসিকতার মধ্যে থাকি তখনো উপরের বিষয়গুলি উন্মুক্ত হয়ে আমাদের কাছে অনিয়মিতভাবে আসে এবং তারপর যেমন আমাদের বিকাশ বৃদ্ধি পায়, তেমন এরা ঐ মানসিকতার ঊর্ধ্বে আরো ঘন ঘন ও নিয়মিত ক্রিয়া গঠন করে। যে মুহূর্তে আমরা অতিমানসিক স্তরে প্রবেশ করি তখনই এই পূর্ব-ইঙ্গিতগুলি আরো ব্যাপক হয় ও ঘন ঘন আসে। বিশ্বময় ও অনন্ত চেতনা মনকে সর্বদাই অধিকার করতে ও বেষ্টন করতে সমর্থ আর যখন সে তা করে একপ্রকারের বিরামহীন ও বারংবার ও অধ্যবসায়সহকারে তখনই মন নিজেকে অতি সহজেই রূপান্তরিত করতে পারে বোধিময় মানসিকতায় এবং একে আবার অতিমানসিক ক্রিয়ায়। কেবল যখন আমরা উত্তরণ করি, তখন আমরা অনন্ত চেতনার মধ্যে আরো ঘনিষ্টভাবে ও অখণ্ডভাবে বিকশিত হই আর এ হয়ে ওঠে আরো পরিপূর্ণভাবে আমাদের আপন আত্মা ও প্রকৃতি। আবার অপরপক্ষে যা মনে হবে অস্তিত্বের নিম্ন দিক তা তখন যে শুধু আমাদের নিম্নে হবে তা নয়, তা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতির হবে — এমনকি যখন আমরা অতিমানসিক সত্তার মধ্যে বাস করি এবং এমনকি যখন সমগ্র প্রকৃতি এর ছাঁচে গঠিত হয়েছে তখনও — কিন্তু সেজন্য যে আমরা সাধারণ প্রকৃতির মধ্যে যারা বাস করে তাদের জ্ঞান ও অনুভব থেকে বিচ্ছিন্ন থাকব তার প্রয়োজন নেই। নিম্ন অথবা আরো সীমিত প্রকৃতির পক্ষে উচ্চতর প্রকৃতিকে বুঝতে ও অনুভব করতে কষ্ট হতে পারে কিন্তু যে প্রকৃতি আরো উচ্চ ও কম সীমিত তা ইচ্ছা করলে সর্বদাই নিম্ন প্রকৃতিকে বুঝতে ও তার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করতে সক্ষম। পরম ঈশ্বরও আমাদের থেকে তফাতে থাকেন না; তিনি সকল কিছু জানেন, তাদের মধ্যে বাস করেন, তাদের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন করেন, কিন্তু তবু বিশ্বের মধ্যে মন ও প্রাণ ও শারীরিক সত্তার প্রতিক্রিয়াসমূহের অধীন হন না অথবা এসবের সীমার দ্বারা নিজের জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দে সীমিত হন না।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

অতিমানসিক ভাবনা ও জ্ঞান

মন থেকে অতিমানসের সংক্রমণের অর্থ যে শুধু মনের স্থানে ভাবনা ও জ্ঞানের এক মহত্তর করণের প্রতিষ্ঠা তা নয়, এর অর্থ সমগ্র চেতনার পরিবর্তন ও রূপান্তর। শুধু যে অতিমানসিক ভাবনা বিকশিত হয় তা নয়, অতিমানসিক সঙ্কল্প, ইন্দ্রিয়, বেদনাও বিকশিত হয়, অর্থাৎ যেসব কাজগুলি এখন মন করে সেসবের স্থলে আসে অতিমানসিক ক্রিয়ারাজি। এই সব পরতর ক্রিয়াগুলি প্রথম মনেই অভিব্যক্ত হয় এক মহত্তর শক্তির অবতরণ, স্ফুটন, বার্তা বা অলৌকিক প্রকাশরূপে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এরা মনের আরো সাধারণ ক্রিয়ার সঙ্গে মিশ্রিত থাকে এবং সেজন্য তাদের মহত্তর আলোক ও শক্তি ও হর্ষের লক্ষণ ব্যতিরেকে আমাদের প্রথম অনভিজ্ঞতায় তাদের সহজে পৃথকভাবে জানা যায় না; আর এই পার্থক্য বোঝা আরো কঠিন হয় কারণ মন তাদের ঘন ঘন আগমনে মহৎ বা উদ্দীপ্ত হয়ে তার নিজের ক্রিয়া দ্রুত করে এবং অতিমানসিক ক্রিয়াধারার বাহ্য লক্ষণগুলি অনুকরণ করে; এর নিজস্ব ক্রিয়াধারা আরো ক্ষিপ্র, দীপ্তিময়, জোরালো ও নিশ্চিত করা হয়, আর এমনকি এ এমন এক প্রকার অনুকরণমূলক আর প্রায়ই মিথ্যা বোধিতে উপনীত হয় যা দীপ্তিময়, প্রত্যক্ষ ও স্বপ্রতিষ্ঠ সত্য না হলেও তা হবার চেষ্টা করে। পরবর্তী কাজ হল বোধিময় অনুভূতি, ভাবনা, সঙ্কল্প, বেদনা, ইন্দ্রিয়ের এমন এক দীপ্তিময় মন গঠন করা যা থেকে ক্ষুদ্রতর মন ও অনুকরণমূলক বোধির মিশ্রণ উত্তরোত্তর বাদ দেওয়া হয়: এ হল "শুদ্ধির" প্রক্রিয়া যা নতুন গঠন ও "সিদ্ধির" পক্ষে প্রয়োজনীয়। সেই সঙ্গে মনের ঊর্ধ্বে বোধিময় ক্রিয়ার উৎসের প্রকাশ হয় আর প্রকাশ হয় এমন এক সত্যকার অতিমানসিক চেতনার উত্তরোত্তর সংহত ব্যাপ্রিয়া যা মনের মধ্যে কাজ করে না, কাজ করে তার নিজের পরতর লোকে। যে বোধিময় মানসিকতাকে এ নিজের প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি করেছে তাকে এ পরিশেষে নিজের কাছে টেনে নেয় এবং চেতনার সমগ্র ক্রিয়াবলীর ভার গ্রহণ করে। এই কাজ উত্তরোত্তর করা হয় আর অনেকদিন ধরে ব্যাহত হয় মিশ্রণের দ্বারা এবং এই কারণে যে নিম্ন গতিবৃত্তিগুলি সংশোধন ও রূপান্তর করার জন্য এদের উপর ফিরে আসা প্রয়োজনীয় হয়। কখনও কখনও উচ্চ ও নিম্নশক্তি পালাক্রমে কাজ করে — যে শিখরে উঠেছিল সেখান থেকে চেতনা নিম্নে নেমে আসে তার আগের স্তরে তবে সর্বদাই কিছু পরিবর্তিত হয়ে — তবে কখনও কখনও এক সঙ্গে ও পরস্পরের মধ্যে লেনদেনের ভাব নিয়ে কাজ করে। শেষপর্যন্ত মন সম্পূর্ণ বোধিত হয়ে ওঠে এবং অবস্থান করে অতিমানসিক ক্রিয়ার শুধু এক নিষ্ক্রিয় প্রণালী হিসেবে; কিন্তু এই অবস্থাও আদর্শ নয়, আর তাছাড়া, তখনো এক বিশেষ বাধা উপস্থিত হয়, কারণ উচ্চতর ক্রিয়াকে তখনো

যেতে হয় এমন এক চিন্ময় ধাতুর মধ্য দিয়ে যা বাধা দেয় ও হ্রাস করে অর্থাৎ শারীরিক চেতনার ধাতুর মধ্য দিয়ে। রূপান্তরের অন্তিম পর্যায় আসবে যখন অতিমানস সমগ্র সত্তাকে অধিকার ক'রে অতিমানসিকভাবাপন্ন করে এবং এমনকি প্রাণিক ও শারীরিক কোষগুলিকেও নিজের আপন ছাঁচে রূপান্তরিত করে — জাগ্রত, সূক্ষ্ম ও তার সব শক্তিতে ভরপুর। মানব তখন সম্পূর্ণভাবে হয়ে ওঠে অতিমানব। অন্ততঃ এই হল স্বাভাবিক ও অখণ্ড প্রণালী।

অতিমানসের সমগ্র স্বরূপ সম্বন্ধে এক পর্যাপ্ত বিবরণের মতো কিছু দেওয়ার চেষ্টার অর্থ হবে বর্তমান সীমানার সম্পূর্ণ বাহিরে যাওয়া; আর কোন সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া সম্ভবও হবে না, কারণ অতিমানসের মধ্যে শুধু যে অনন্তের ঐক্য আছে তা নয়, এর মধ্যে অনন্তের বৃহত্ত্ব ও বিভিন্ন বহুত্বও বর্তমান। এখন যা করা প্রয়োজন তা হল যোগে রূপান্তরের বাস্তব প্রণালীর দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু প্রধান লক্ষণের বর্ণনা দেওয়া অর্থাৎ মনের ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের কথা ও পরিবর্তনের কিছু ঘটনার তত্ত্ব সম্বন্ধে বলা। মৌলিক সম্পর্ক এই যে মনের সকল ক্রিয়াই গূঢ় অতিমানস থেকে উৎপন্ন যদিও আমরা একথা জানি না যতক্ষণ না আমরা আমাদের পরতর আত্মাকে জানতে পারি, আর এই সকল ক্রিয়ার মধ্যে সত্য ও মূল্যের যা কিছু আছে তার সবখানিই নেওয়া হয় ঐ উৎস থেকে। আমাদের সকল ভাবনা, সঙ্কল্প, বেদনা, ইন্দ্রিয়-ছবির মধ্যে বা তাদের মূলে সত্যের এক উপাদান বর্তমান আর এই থেকেই তাদের সত্তার উৎপত্তি, এই হল তাদের সত্তার পরিপোষক, যদিও বাস্তবে তারা বিকৃত বা মিথ্যা হতে পারে, আর তাদের পশ্চাতে এমন এক মহত্তর অনায়ত্ত সত্য বর্তমান যাকে তারা আয়ত্ত করতে পারলে তা তাদের শীঘ্র করতে পারত একীভূত, সুসমঞ্জস এবং অন্ততঃ আপেক্ষিকভাবে সম্পূর্ণ। কিন্তু বাস্তবে তাদের যা সত্য আছে তা পরিসরে সঙ্কুচিত, অধঃপতিত হয়ে নিম্ন ক্রিয়ায় পর্যবসিত, খণ্ডতার দ্বারা বিভক্ত ও অসত্যে পরিণত, অসম্পূর্ণতায় ক্লিষ্ট, বিকৃতির দ্বারা দূষিত। মানসিক জ্ঞান অখণ্ড জ্ঞান নয়, এ হল সর্বদাই এক আংশিক জ্ঞান। এ নিরন্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে যোগ করে, কিন্তু এদের সঠিক সম্পর্কে রাখতে কষ্টে পড়ে; এর সমগ্রগুলিও সত্য নয়, এরা অসম্পূর্ণ সমগ্র আর এগুলিকেই এ আরো সত্য ও অখণ্ড জ্ঞানের স্থলে স্থাপন করতে প্রবণ হয়। আর যদি এ কোনরকম অখণ্ড জ্ঞান পায়ও, তাহলেও তা হবে এক প্রকার একত্রীকরণ, একটা মানসিক ও বুদ্ধিগত ব্যবস্থা, এক কৃত্রিম ঐক্য, কোন স্বরূপগত ও প্রকৃত একত্ব নয়। আর এই সবই যদি শেষ কথা হ'ত তাহলে মন হয়ত অখণ্ড জ্ঞানের এক প্রকার অর্ধ-প্রতিফলন, অর্ধ-রূপান্তর পেতে পারত, কিন্তু তবু মূল দোষ হ'ত যে এ আসল জিনিস হ'ত না, বড় জোর হ'ত শুধু এক বুদ্ধিগত প্রতিরূপ। আর মানসিক সত্য সর্বদা তা-ই হতে বাধ্য — এক বুদ্ধিগত, ভাবগত ও ইন্দ্রিয়বোধাত্মক প্রতিরূপ, এ কোন সাক্ষাৎ সত্য হ'ত না, এ তার দেহ ও স্বরূপে স্বয়ং সত্য হ'ত না।

মন যা করে অতিমানস সে সব করতে সক্ষম — ক্ষুদ্র বিষয়গুলিকে আর যা

সবকে বলা যায় বিভাব বা অধীনস্থ সমগ্র সেগুলিকে উপস্থিত ক'রে সংযুক্ত করতে, কিন্তু এ তা করে অন্য প্রকারে এবং অন্য এক ভিত্তিতে। মনের মতো এ বিচ্যুতি, মিথ্যা বিস্তার ও আরোপিত প্রমাদের উপাদান আনে না, তবে এমনকি যখন এ আংশিক জ্ঞানও দেয় এ তা দেয় স্থির ও যথার্থ আলোকে, আর যে মূল সত্যের উপর খুঁটিনাটি বিষয়গুলি ও অধীনস্থ সমগ্রগুলি নির্ভরশীল সর্বদাই তার আভাসন পশ্চাতে থাকে অথবা সেই সত্য চেতনার নিকট উন্মুক্ত থাকে। অতিমানসেরও প্রতিরূপের শক্তি আছে, তবে এর প্রতিরূপগুলি বুদ্ধিগত প্রকারের নয়, এরা স্বরূপতঃ সত্যের আলোকের দেহ ও ধাতুতে পরিপূর্ণ থাকে, এরা সত্যের বাহন, এরা তাদের স্থলে স্থাপিত সঙ্কেত নয়। অতিমানসের প্রতিরূপের এইরকম এক অনন্ত শক্তি বর্তমান, এ সেই দিব্য শক্তি যার এক প্রকার অধঃপতিত প্রতিনিধি হল মানসিক ক্রিয়া। এই প্রতিনিধিমূলক অতিমানসের এক নিম্নতর ক্রিয়া ও এক উচ্চতর ক্রিয়া আছে — নিম্নতর ক্রিয়া থাকে আমার কথিত সেই অতিমানসিক যুক্তিশক্তিতে যা মানসিক যুক্তিশক্তির অতীব নিকটস্থ এবং যার মধ্যে মানসিক যুক্তিশক্তিকে অতি সহজেই তুলে নেওয়া সম্ভব, আর উচ্চতর ক্রিয়া থাকে অখণ্ড অতিমানসের মধ্যে যা সকল বিষয়কে দেখে দিব্য চেতনা ও আত্ম-অস্তিত্বের ঐক্যে ও আনন্ত্যে। কিন্তু যে স্তরেরই হ'ক, অনুরূপ মানসিক ক্রিয়া থেকে এ এক ভিন্ন বিষয় — এ হল অপরোক্ষ, জ্যোতির্ময় ও সুনিশ্চিত। যখন অন্তঃপুরুষ নির্জ্ঞান ও অজ্ঞানতার মধ্যে পড়ার পর আত্মজ্ঞান ফিরে পেতে চেষ্টা করছে কিন্তু তবু তা করছে নির্জ্ঞান ও অজ্ঞানতার ভিত্তির উপর তখনকার অন্তঃপুরুষের ক্রিয়া হবার ফলেই মনের এই সব হীনতার উৎপত্তি। মন এমন এক অজ্ঞানতা যা জানতে চেষ্টা করছে অথবা এ সেই অজ্ঞানতা যা গৌণ জ্ঞান লাভ করে: এ হল অবিদ্যার ক্রিয়া। অতিমানস সর্বদাই এক স্বগত ও স্বপ্রতিষ্ঠ জ্ঞানের প্রকাশ; এ হল বিদ্যার ক্রিয়া।

যে দ্বিতীয় প্রভেদ আমরা জানতে পারি তা হল এক মহত্তর ও স্বতঃস্ফূর্ত সামঞ্জস্য ও ঐক্য। সকল চেতনা অবিভক্ত এক, কিন্তু ক্রিয়ায় এ বহু গতিবৃত্তি নেয় আর এই সব মূল গতিবৃত্তির প্রত্যেকটিরই নানা রূপ ও প্রণালী বর্তমান। মানস চেতনার বিভিন্ন রূপ ও প্রণালীর মধ্যে দেখা যায় মানসিক শক্তি ও গতিবৃত্তির এমন ক্লেশকর ও বিভ্রান্তিকর বিভাজন ও পার্থক্য যার মধ্যে সচেতন মনের আদি ঐক্য মোটেই প্রকট হয় না অথবা প্রকট হয় বিক্ষিপ্তভাবে। সর্বদাই আমরা আমাদের মানসিকতার মধ্যে দেখি বিভিন্ন ভাবনার মধ্যে সংঘর্ষ, আর না হয় বিশৃঙ্খলা এবং সমবায়ের অভাব অথবা এক জোড়াতালি দেওয়া সমবায় আর ঐ একই ব্যাপার ঘটে আমাদের সঙ্কল্প ও কামনার বিভিন্ন গতিবৃত্তির বেলায় এবং আমাদের বিভিন্ন ভাবাবেগ ও বেদনার মধ্যে। আবার আমাদের ভাবনা ও সঙ্কল্প ও বেদনার পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিক সামঞ্জস্য ও একতানের অভাব, তারা কাজ করে তাদের পৃথক শক্তিতে, এমনকি যখন তাদের একত্র কাজ করতে হয় তখনো এবং প্রায়শঃই তারা সংঘর্ষে লিপ্ত অথবা কিছু পরিমাণে প্রতিকূল। তাছাড়া একটির পরিবর্তে অন্য একটির অসম বিকাশ হয়। মন এক বিরোধের বস্তু যার

মধ্যে কোন সন্তোষজনক মিল না হয়ে বরং জীবনের জন্য একটা কাজ-চলাগোছের ব্যবস্থা করে নেওয়া হয়। যুক্তিশক্তির চেষ্টা হল আরো এক ভালো ব্যবস্থা আনা. তার লক্ষ্য আরো ভালো এক নিয়ন্ত্রণ, প্রাপ্তি, এক যুক্তিসম্মত বা আদর্শ সামঞ্জস্য আর এই প্রয়াসে এ হল অতিমানসের প্রতিভূ বা স্থলাভিষিক্ত বিষয় আর অতিমানস যা তার নিজের অধিকারে করতে সক্ষম যুক্তিশক্তি তা শুধু করতে চেষ্টা করছে: কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এ সত্তার বাকী অংশগুলিকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত করতে অক্ষম এবং আমরা আমাদের মননে যে যুক্তিসম্মত বা আদর্শ সামঞ্জস্য সৃষ্টি করি তার সঙ্গে ও জীবনের বিভিন্ন গতিবৃত্তির সঙ্গে সাধারণতঃ প্রভূত প্রভেদ থাকে। এমনকি যুক্তিশক্তির তৈরী সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থাতেও সর্বদাই কিছুটা কৃত্রিমতা ও আরোপ করার কিছু থাকে কারণ শেষে শুধু দুটি স্বতঃস্ফূর্ত সুষম গতিবিধি থাকে — একটি হল নিশ্চেতন অথবা প্রধানতঃ অবচেতন প্রাণের — যে সামঞ্জস্য আমরা দেখি প্রাণিজগতে ও নিম্ন প্রকৃতিতে এবং অপরটি হল চিৎপুরুষের। মানবীয় অবস্থা হল একটি থেকে অন্যটিতে, প্রাকৃত জীবন থেকে আদর্শ বা আধ্যাত্মিক জীবনে যাবার, চেষ্টার ও অসম্পূর্ণতার পর্যায় এবং এ অনিশ্চিত অন্বেষণ ও বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ। মনোময় পুরুষ যে তার নিজের কোন এক প্রকার আপেক্ষিক সামঞ্জস্য পেতে বা বরং গড়ে তুলতে পারে না তা নয়, তবে এ তাকে স্থায়ী করতে অক্ষম কারণ এ চিৎপুরুষের প্রেষণার অধীন। মানব তার অন্তঃস্থ এমন এক মহাশক্তির দ্বারা অল্প বিস্তর সচেতন আত্মবিকাশের প্রয়াসী হতে বাধ্য যা তাকে নিঃসন্দেহে নিয়ে যাবে আত্মকর্তৃত্বে ও আত্মজ্ঞানে।

বিপরীত পক্ষে, অতিমানস তার ক্রিয়ায় ঐক্য ও সামঞ্জস্য ও স্বগত শৃঙ্খলার শক্তি। প্রথমে যখন মানসিকতার উপর ঊর্ধ্ব থেকে চাপ পড়ে তখন এটা বোঝা যায় না, আর এমনকি কিছু সময়ের জন্য এক বিপরীত ঘটনাও দেখা দিতে পারে। নানা কারণে তা হতে পারে। প্রথমতঃ, এক মহত্তর অপরিমেয়-প্রায় শক্তির প্রভাব এক অবর চেতনার উপর পড়লে আর ঐ চেতনা সুস্থভাবে তাতে সাড়া দিতে অথবা হয়ত চাপ সহ্য করতে অসমর্থ হলে, এই প্রভাবের দ্বারা একটা চাঞ্চল্য বা এমনকি মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটতে পারে। দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন শক্তির একসাথে অথচ সামঞ্জস্যহীন কার্যের ফলে, বিশেষতঃ যদি মন তার নিজের পথেই চলতে আগ্রহী হয়, যদি এ অতিমানস ও এর উদ্দেশ্যের নিকট নিজেকে সমর্পণ না ক'রে বরং তার কাছ থেকে লাভবান হতে দৃঢ়ভাবে বা উগ্রভাবে চেষ্টা করে, যদি এ পরতর দেশনার নিকট পর্যাপ্ত পরিমাণে নিষ্ক্রিয় ও অনুগত না হয়, তাহলে দেখা দিতে পারে শক্তির মহতী উদ্দীপনা কিন্তু তার সাথে আরো বেশী বিশৃঙ্খলা। এই জন্যই যোগের প্রয়োজনীয় বিষয় হল পূর্ব প্রস্তুতি ও দীর্ঘ শুদ্ধি, আর এ যত সম্পূর্ণ হয় ততই ভাল, আর দরকার চিৎপুরুষের নিকট শান্তভাবে ও প্রবলভাবে উন্মুক্ত মনের প্রশান্ততা ও সাধারণতঃ নিষ্ক্রিয়তা।

আবার সীমার মধ্যে কাজ করতে অভ্যস্ত মন চেষ্টা করতে পারে তার যে কোন একটি শক্তির ধারা অনুযায়ী নিজেকে অতিমানসিকভাবাপন্ন করতে। হয়ত এ বোধিময়

অর্ধ-অতিমানসিকভাবাপন্ন মনন ও জ্ঞানের প্রচুর শক্তি বিকশিত করে, কিন্তু সঙ্কল্প রূপান্তরিত না হয়ে চিন্তাশীল মনের এই আংশিক অর্ধ-মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গতিশূন্য হয়ে থাকতে পারে, আর সত্তার অন্যান্য অংশও, যেমন ভাবময় ও স্নায়বিক অংশ, হয়ত সমানই বা আরো বেশী অসংস্কৃত অবস্থায় থেকে যায়। অথবা হয়ত বোধিময় বা প্রবলভাবে চিদাবেশযুক্ত সঙ্কল্পের অত্যধিক বিকাশ হয় কিন্তু মনন মানসের বা ভাবময় ও চৈত্য সত্তার অনুরূপ কোন উন্নয়ন হয় না, অথবা বড় জোর ততটুকু উন্নয়ন হয় যতটুকু সঙ্কল্পক্রিয়াকে সম্পূর্ণ ব্যাহত না করার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। হয়ত বা ভাবময় অথবা চৈত্যমানস নিজেকে বোধিত ও অতিমানসিকভাবাপন্ন করতে চেষ্টা করে এবং অনেক পরিমাণে সফলও হয়, অথচ চিন্তাশীল মন রয়ে যেতে পারে সাধারণ — উপাদানে হীন ও আলোকে অস্পষ্ট। হয়ত নৈতিক বা সৌন্দর্যগ্রাহী সত্তায় বোধিমত্তার বিকাশ হয় কিন্তু অবশিষ্ট অংশ অনেকটা পূর্ববৎ থেকে যায়। প্রতিভাশালী ব্যক্তি, কবি, শিল্পী, মনস্বী, সাধু বা রহস্যবাদীর মধ্যে আমরা যে প্রায়ই বিশৃঙ্খলা বা একপেশে ভাব দেখি তার কারণ হল এই। এক আংশিকভাবে বোধিত মানসিকতাকে তার বিশেষ ক্রিয়াধারার ক্ষেত্রের বাইরে অতিমাত্রায় বিকশিত বুদ্ধিগত মন অপেক্ষা অনেক কম সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলার বিষয় ব'লে দেখাতে পারে। প্রয়োজন হল — এক অখণ্ড বিকাশ, মনের সম্পূর্ণ রূপান্তর; তা না হলে ক্রিয়া হবে মনের সেই ক্রিয়ার মতো যা অতিমানসিক অন্তঃপ্রবাহকে ব্যবহার করে তার নিজের লাভের জন্য এবং তার নিজের ছাঁচের ভিতর, আর এই ব্যবস্থাকে মেনে নেওয়া হয় সত্তার মধ্যে ভগবানের অব্যবহিত উদ্দেশ্যের জন্য আর এমনকি এও মনে করা যেতে পারে যে এই এক জীবনের মধ্যে জীবের জন্য এ-ই যথেষ্ট: কিন্তু এ এক অপূর্ণতার অবস্থা, এ সত্তার সম্পূর্ণ ও সফল ক্রমবিকাশ নয়। কিন্তু যদি বোধিমানসের অখণ্ড বিকাশ হয়, দেখা যাবে যে এক বিশাল সামঞ্জস্য তার নিজের ভিত্তি স্থাপন করতে শুরু করেছে। বুদ্ধিগত মনের সৃষ্ট সামঞ্জস্য থেকে অন্যবিধ এই সামঞ্জস্য যা বাস্তবক্ষেত্রে সহজে অনুভবগম্য নাও হতে পারে, অথবা যদি একে অনুভব করা যায় তাহলেও তর্কানুগ মানবের কাছে বোধগম্য না হতে পারে, কারণ এ তার মানসিক প্রণালীর দ্বারা পাওয়া যায়নি অথবা এইভাবে বিশ্লেষণযোগ্য নয়। এ হবে চিৎপুরুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের সামঞ্জস্য।

যখনই আমরা মনের ঊর্ধ্বে অতিমানসে উঠি, তখনই এই প্রাথমিক সামঞ্জস্যের স্থলে আসে এক মহত্তর ও আরো অখণ্ড ঐক্য। অতিমানসিক যুক্তিশক্তির বিভিন্ন ভাবনাগুলি এক সঙ্গে মিলিত হয় এবং পরস্পরকে বোঝে এবং এক স্বাভাবিক ব্যবস্থার মধ্যে এসে পড়ে — এমনকি তখনও যখন তারা সম্পূর্ণ বিপরীত স্থান থেকে যাত্রা শুরু করেছে। সঙ্কল্পের যে সব গতিবৃত্তি মনের মধ্যে বিরোধপূর্ণ, অতিমানসের মধ্যে তারা তাদের সঠিক স্থানে এবং পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কে আসে। অতিমানসিক বেদনাগুলিও তাদের আপন আপন সম্পর্ক খুঁজে পায় এবং এক স্বাভাবিক মিল ও সামঞ্জস্যের মধ্যে এসে পড়ে। আরো উচ্চ অবস্থায় এই সামঞ্জস্য ঐক্যের দিকে তীব্র হয়। জ্ঞান সঙ্কল্প,

বেদনা ও বাকী সব কিছু হয়ে ওঠে একটি মাত্র গতিবৃত্তি। এই ঐক্য তার সম্পূর্ণতার পরাকাষ্ঠা লাভ করে সর্বোচ্চ অতিমানসে। সামঞ্জস্য, ঐক্য অবশ্যম্ভাবী, কারণ অতিমানসের মধ্যে ভিত্তি হল জ্ঞান, এবং বিশিষ্টভাবে আত্মজ্ঞান অর্থাৎ আত্মার জ্ঞান তার সকল বিভাবে। অতিমানসিক সঙ্কল্প হল এই আত্মজ্ঞানের স্ফুরন্ত প্রকাশ, অতিমানসিক বেদনা হল আত্মার জ্যোতির্ময় হর্ষের প্রকাশ, আর অতিমানসের মধ্যে অন্য সব কিছু এই একমাত্র গতিবৃত্তির অংশ। এর সর্বোচ্চ ক্ষেত্রে এ এমন কিছু হয়ে ওঠে যা আমরা যাকে জ্ঞান বলি তার চেয়ে মহত্তর; সেখানে এ আমাদের মধ্যে ভগবানের স্বরূপগত ও অখণ্ড আত্মসংবিৎ, তার সত্তা, চেতনা, তপঃ, আনন্দ এবং সবকিছু ঐ একমাত্র অস্তিত্বের সামঞ্জস্যপূর্ণ, একীভূত, জ্যোতির্ময় গতিবৃত্তি।

এই অতিমানসিক জ্ঞান মুখ্যতঃ বা স্বরূপতঃ কোন ভাবনা জ্ঞান নয়। ধী কোন বিষয় জানে বলে মনে করে না যতক্ষণ না এর সম্বন্ধে তার সংবিৎকে এ ভাবনার সংজ্ঞায় পরিণত করে, অর্থাৎ যতক্ষণ না এ তাকে স্থাপন করে প্রতিনিধিমূলক মানসিক প্রত্যয়ের প্রণালীর মধ্যে, আর এই প্রকার জ্ঞান তার সর্বাপেক্ষা নিঃসংশয় সম্পূর্ণতা পায় যখন একে প্রকাশ করা যায় স্পষ্ট, সঠিক ও নিরূপক ভাষায়। অবশ্য, মন তার জ্ঞান পায় মুখ্যতঃ নানাবিধ ছাপ থেকে; এই সব ছাপ প্রাণিক ও ইন্দ্রিয়গত ছাপ থেকে শুরু ক'রে বোধিময় ছাপ পর্যন্ত হতে পারে; কিন্তু বিকশিত বুদ্ধি এই সবকে নেয় শুধু তথ্য হিসেবে, এই সব নিজেরা তার কাছে অনিশ্চিত ও অস্পষ্ট মনে হয় যতক্ষণ না এদের বাধ্য করা হয় তাদের সকল আন্তর বস্তু উপস্থাপিত করতে ভাবনার নিকট এবং এরা তাদের স্থান নেয় কোন বুদ্ধিগত সম্পর্কের মধ্যে অথবা এক ব্যবস্থিত ভাবনা-শৃঙ্খলার মধ্যে। আবার এও সত্য যে এমন এক প্রকার ভাবনা ও ভাষা আছে যা নিরূপণাত্মক না হয়ে বরং আভাসনদায়ক এবং যা তাদের নিজেদের প্রকারে আন্তর বস্তুতে আরো বেশী শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ, আর এই প্রকার ভাবনা ও ভাষা প্রায় বোধির সীমানাবর্তী: কিন্তু তবু ধী-শক্তির মধ্যে এই দাবী থাকে যে এই সব আভাসনের ভিতর সঠিক বুদ্ধিগত আন্তর বস্তুগুলির মধ্যে স্পষ্ট পরম্পরা ও সম্পর্ক ফুটিয়ে তোলা, আর যতক্ষণ না তা করা হয় ততক্ষণ এর জ্ঞান যে সম্পূর্ণ হয়েছে সে সম্বন্ধে এর তৃপ্তি হয় না। তর্কগত ধী-শক্তির মধ্যে কর্মরত ভাবনাকেই সাধারণতঃ মনে করা হয় মানসিক ক্রিয়া সংহত করার পক্ষে সর্বোপযোগী, এ মনকে তার জ্ঞানে ও তার জ্ঞানের ব্যবহারে এক নিশ্চিত নির্দিষ্টতা, দৃঢ়তা ও সম্পূর্ণতার ভাব দেয়। কিন্তু অতিমানসিক জ্ঞানের পক্ষে এ মোটেই সত্য নয়।

অতিমানস অত্যন্ত সম্পূর্ণভাবে ও দৃঢ়ভাবে জানে, কিন্তু এ ভাবনার দ্বারা জানে না, এ জানে তাদাত্ম্যের দ্বারা, আত্মার মধ্যে ও আত্মার দ্বারা বিষয়সমূহের আত্মসত্যের শুদ্ধ সংবিতের দ্বারা, "আত্মনি আত্মানম্ আত্মনা"। সত্যের সঙ্গে এক হয়েই জ্ঞানের বিষয়ের সঙ্গে এক হয়েই আমি অতিমানসিক জ্ঞান সবচেয়ে ভালোভাবে পাই; যখন জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের মধ্যে আর কোন বিভাজন থাকে না, তখনই সেখানে অতিমানসিক তৃপ্তি ও অখণ্ড আলো সবচেয়ে বেশী থাকে। আমি জ্ঞেয় বিষয়টিকে আমার বাইরের কোন বিষয়

হিসেবে দেখি না, আমি একে দেখি যেন আমি স্বয়ং এ, অথবা এ যেন আমার বিশ্বাত্মার এমন এক অংশ যা আমার সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ চেতনার মধ্যে অবস্থিত। এতেই পাওয়া যায় সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা সম্পূর্ণ জ্ঞান; যেহেতু ভাবনা ও ভাষা প্রতিরূপ মাত্র, চেতনার মধ্যে এই প্রত্যক্ষ প্রাপ্তি নয়, সেহেতু এরা অতিমানসের কাছে জ্ঞানের নিম্নতর রূপ আর যদি ভাবনাকে আধ্যাত্মিক সংবিৎ দ্বারা পূর্ণ করা না হয় এ বস্তুতঃ হয়ে পড়ে অপূর্ণ জ্ঞান। কারণ, একে অতিমানসিক ভাবনা ধরা হলেও এ এমন এক মহত্তর জ্ঞানের আংশিক প্রকাশ হবে যা আত্মার মধ্যে অবস্থিত কিন্তু অব্যবহিতভাবে সক্রিয় চেতনার কাছে সে সময় উপস্থিত নয়। অনন্তের সর্বোচ্চ স্তরে ভাবনার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই কারণ সবই অনুভব করা হবে আধ্যাত্মিকভাবে, ধারাবাহিক রূপে, নিত্যপ্রাপ্তি হিসেবে এবং একান্ত সরাসরি ও সম্পূর্ণভাবে। এই মহত্তর স্বপ্রতিষ্ঠ জ্ঞানের মধ্যে যা লুকনো আছে তাকে আংশিকভাবে অভিব্যক্ত ও উপস্থিত করার শুধু এক উপায় হল ভাবনা। অবশ্য এই পরম প্রকারের জানা তার পূর্ণ প্রসারে ও মাত্রায় আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হবে না যতক্ষণ না আমরা সক্ষম হই অতিমানসের বহু পর্যায়ের মধ্য দিয়ে আরোহণ করতে সেই অনন্তে। কিন্তু তবু অতিমানসিক শক্তি যতই বাইরে এসে তার ক্রিয়া বিস্তৃত করে ততই জ্ঞানের এই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থার কিছুটা আবির্ভূত হয় ও বৃদ্ধি পায় এবং এমনকি মানসিক সত্তার বিভিন্ন অঙ্গগুলিও বোধিত ও অতিমানসিকভাবাপন্ন হবার সাথে সাথে তাদের আপন স্তরে উত্তরোত্তর অনুরূপ ক্রিয়া বিকশিত করে। যে সকল বিষয় ও সত্তা আমাদের চেতনার বিষয় তাদের সঙ্গে এক দীপ্তিময়, প্রাণিক, চৈত্য, ভাবময়, স্ফুরন্ত ও অন্য প্রকারের অভিন্নতার শক্তি বৃদ্ধি পায়, আর বিভক্ত চেতনার এই সব উত্তরণ তাদের সাথে নিয়ে আসে এক সরাসরি জ্ঞানের বহু রূপ ও উপায়।

তাদাত্ম্যের দ্বারা অতিমানসিক জ্ঞান বা অনুভূতির সাথে তার ফল হিসেবে অথবা তার নিজের এক গৌণ অংশ হিসেবে এমন এক অতিমানসিক দর্শন থাকে যার জন্য কোন মূর্তির সমর্থনের প্রয়োজন হয় না, মনের কাছে যা অমূর্ত তাকে মূর্ত করতে পারে আর তার আছে এক প্রকার দৃষ্টি, যদিও তার লক্ষ্যবস্তু হতে পারে সাকার বিষয়ের অদৃশ্য সত্য অথবা নিরাকারের সত্য। কোনরূপ তাদাত্ম্যের পূর্বেই এই দর্শন আসতে সক্ষম — এ থেকে আলোর এক প্রকার পূর্ববর্তী উদ্ভব হিসেবে অথবা এই দর্শন পৃথক শক্তি হিসেবে তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও কাজ করতে সক্ষম। সত্য অথবা জানা বিষয়টি তখন সম্পূর্ণভাবে আমার সঙ্গে এক নয় অথবা তখনো আমার সঙ্গে এক হয়নি, এ হল আমার জ্ঞানের এক বিষয়: কিন্তু তবু এ হল এমন এক বিষয় যা আত্মার মধ্যে দেখা হয় প্রত্যক্‌বৃত্তভাবে অথবা এমনকি যদি এ তখনো জ্ঞাতার কাছে আরো বিচ্ছিন্ন ও পরাক্‌বৃত্তভাবে উপস্থিত থাকে একে আত্মার দ্বারা দেখা হয় — কোন মধ্যবর্তী প্রণালীর দ্বারা নয়, বরং সরাসরি আন্তর গ্রহণের দ্বারা অথবা বিষয়ের সঙ্গে আধ্যাত্মিক চেতনার এমন এক জ্যোতির্ময় সংস্পর্শের দ্বারা যা ভিতরে প্রবেশ করে ও চারিদিকে ঘিরে থাকে। এই জ্যোতির্ময় গ্রহণ ও সংস্পর্শই আধ্যাত্মিকদর্শন, "দৃষ্টি", — আধ্যাত্মিকজ্ঞান সম্বন্ধে

উপনিষদ বারবার বলে "পশ্যতি", "সে দেখে"; সৃষ্টির ভাবনার ভাবুক আত্মা সম্বন্ধে আমরা মনে করি বলা হবে "তিনি ভেবেছিলেন" কিন্তু উপনিষদ তার বদলে বলে, "তিনি দেখেছিলেন"। স্থূল মনের কাছে চক্ষু যা, চিৎপুরুষের কাছে ঐ গ্রহণ ও সংস্পর্শ তা-ই, আর এরূপ বোধ হয় যে দর্শনের অনুরূপ সূক্ষ্ম এক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। যে সব বিষয় সম্বন্ধে ভাবনা শুধু এক ইঙ্গিত বা মানসিক বিবরণ পেয়েছে, স্থূল দৃষ্টি আমাদের কাছে যেমন সে সবের বাস্তব দেহ উপস্থিত করতে সক্ষম আর বিষয়গুলি তখনই আমাদের কাছে বাস্তব ও সুস্পষ্ট, "প্রত্যক্ষ" হয়ে ওঠে, তেমন আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ভাবনার বিভিন্ন ইঙ্গিত বা প্রতিরূপকে ছাড়িয়ে যায় এবং আমাদের কাছে সকল বিষয়ের আত্মা ও সত্যকে উপস্থিত ও সরাসরিভাবে সুস্পষ্ট করতে, "প্রত্যক্ষ" করতে সক্ষম।

ইন্দ্রিয় আমাদের দিতে পারে বিষয়সমূহের শুধু বাহ্য প্রতিমূর্তি, কিন্তু একে পূরণ ও অনুপ্রাণিত করার জন্য ভাবনার সাহায্য এর প্রয়োজন; কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টি আমাদের কাছে বিষয়টিকে তার স্বরূপে এবং এর সম্বন্ধে সকল সত্যকে উপস্থিত করতে সমর্থ। ঋষির কাছে এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টির প্রণালীতে জ্ঞানের উপায় হিসেবে ভাবনার সাহায্যের কোন প্রয়োজন নেই, এর প্রয়োজন শুধু প্রতিরূপ ও প্রকাশের উপায় হিসেবে — তার কাছে ভাবনা এক ক্ষুদ্রতর শক্তি আর ব্যবহার করা হয় এক গৌণ উদ্দেশ্যের জন্য। যদি জ্ঞানের আরো বিস্তার আবশ্যক হয় সে তা পেতে পারে নতুন ক'রে দেখে, যে অপেক্ষাকৃত মন্থর চিন্তাপ্রণালী সত্যের জন্য মানসিক অন্বেষণ ও অনুসন্ধিৎসার অবলম্বনদণ্ড তার প্রয়োজন হয় না, যেমন আমরা চোখ দিয়ে সযত্নে নিরীক্ষণ করি আমাদের প্রথম পর্যবেক্ষণে কি বাদ পড়েছিল তা পাবার জন্য। অতিমানসিক শক্তিগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষতা ও মহানতায় আধ্যাত্মিক দর্শনের দ্বারা প্রাপ্ত এই অনুভূতি ও জ্ঞানের স্থান দ্বিতীয়। এ এমন কিছু যা মানসিক দর্শন অপেক্ষা আরো বেশী নিকটবর্তী, গভীর ও ব্যাপক, কারণ এ আসে সরাসরি তাদাত্ম্যের দ্বারা জ্ঞান থেকে আর এর এই গুণ আছে যে আমরা তখনি যেতে পারি দর্শন থেকে তাদাত্ম্যে যেমন তাদাত্ম্য থেকে আসা যায় দর্শনে। এইরূপ, যখন আধ্যাত্মিক দর্শন ভগবান, আত্মা বা ব্রহ্মকে দেখেছে, তখন অন্তঃপুরুষ তারপরেই আত্মা, ভগবান বা ব্রহ্মের মধ্যে প্রবেশ ক'রে তার সঙ্গে এক হতে পারে।

এ অখণ্ডভাবে করা সম্ভব শুধু অতিমানসিক স্তরে বা এর উপরে, তবে সেই সাথে আধ্যাত্মিক দর্শন তার নিজের এমন সব মানসিক রূপ নিতে পারে যেগুলির প্রতিটি নিজ নিজ ভাবে এই অভিন্নতার কাজে সহায় হয়। মানসিক বোধিময় দর্শন বা আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন মানসিক দৃষ্টি, চৈত্যদর্শন, হৃদয়ের ভাবময় দর্শন, ইন্দ্রিয়মানসে দর্শন — এই সব যৌগিক অনুভূতির অংশ। যদি এই দেখাগুলি কেবলমাত্র মানসিক হয় তাহলে তারা সত্য হতে পারে, কিন্তু সত্য যে হবেই তা নয়, কারণ মন সত্য ও প্রমাদ উভয়ই, সত্য ও মিথ্যা প্রতিরূপ উভয়ই পেতে সমর্থ। কিন্তু যখন মন বোধিত ও অতিমানসিকভাবাপন্ন হয়ে ওঠে, তখন এই সব শক্তিগুলি অতিমানসের অপেক্ষাকৃত বেশী জ্যোতির্ময় ক্রিয়ার দ্বারা শুদ্ধ ও সংশোধিত হয় এবং নিজেরাই হয়ে ওঠে

অতিমানসিক ও সত্যকার দেখার বিভিন্ন রূপ। একথা বলা প্রয়োজন যে অতিমানসিক দর্শন তার সঙ্গে নিয়ে আসে এমন এক পরিপূরক ও সম্পূরক অনুভূতি যাকে বলা যেতে পারে সত্যের — এর স্বরূপের এবং তার মাধ্যমে এর তাৎপর্যের আধ্যাত্মিক শ্রবণ ও স্পর্শ, অর্থাৎ এর গতি, স্পন্দন, ছন্দ গ্রহণ করা হয় আর গ্রহণ করা হয় এর নিবিড় সান্নিধ্য ও সংস্পর্শ ও ধাতু। এই সব শক্তিগুলি আমাদের সেই তত্ত্বের সঙ্গে এক হবার জন্য প্রস্তুত করে যা এইরূপে জ্ঞানের মাধ্যমে আমাদের সমীপবর্তী হয়েছে।

অতিমানসিক ভাবনা হল অতিমানসিক দর্শনের কাছে আনা সত্যের তাদাত্ম্যের দ্বারা জ্ঞানের এক রূপ এবং ভাবের মধ্যে তার বিকাশ। তাদাত্ম্য ও দর্শন এক দৃষ্টিতে দেয় সত্যের স্বরূপ, এর দেহ ও বিভিন্ন অংশ: সত্যের এই সরাসরি চেতনা ও অব্যবহিত শক্তিকে ভাবনা রূপান্তরিত করে ভাব-জ্ঞান ও সঙ্কল্পে। এ নতুন কিছু যোগ করে না অথবা কিছু যোগ করার প্রয়োজন এর থাকে না, এ শুধু জ্ঞানের দেহ পুনরায় রচনা করে, একে স্পষ্টভাবে কথার দ্বারা প্রকাশ করে, এর চারিদিকে ঘোরে। অবশ্য যেখানে তাদাত্ম্য ও দর্শন তখনো অসম্পূর্ণ; সেখানে অতিমানসিক ভাবনার আরো বড় কাজ থাকে, যা সব দেবার জন্য তারা এখনো তৈরী নয় সে সবকে এ প্রকাশ করে, ব্যাখ্যা করে অথবা যেন অন্তঃপুরুষের স্মৃতিতে নিয়ে আসে। আর যেখানে এই মহত্তর অবস্থা ও শক্তিগুলি তখনো অবগুণ্ঠিত থাকে, ভাবনা সামনে এসে অবগুণ্ঠন বিদারণের প্রস্তুতির কাজ করে এবং কিছু পরিমাণে তা সাধনও করে অথবা সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে এর অপসারণে। সুতরাং মানসিক অজ্ঞানতার মধ্য থেকে অতিমানসিক জ্ঞানের মধ্যে বিকাশের বিষয়ে, অতিমানসিক ভাবনা আমাদের কাছে প্রায়ই আসে, যদিও সর্বদাই প্রথম আসে না — যাতে এ দর্শনের পথ উন্মুক্ত করতে পারে অথবা না হয় যাতে এ তাদাত্ম্যের বর্ধিষ্ণু চেতনাকে ও এর মহত্তর জ্ঞানকে দিতে পারে প্রাথমিক অবলম্বন। এই ভাবনা যোগাযোগ ও প্রকাশেরও এক কার্যকরী উপায় এবং নিজের অথবা অপরের অবর মনে ও সত্তায় সত্যের ছাপ দিতে অথবা তা নিবদ্ধ করতে সাহায্য করে। বুদ্ধিগত ভাবনা থেকে অতিমানসিক ভাবনা যে ভিন্ন তার কারণ শুধু এই নয় যে অতিমানসিক ভাবনা প্রত্যক্ষ সত্যভাব, এ অজ্ঞানতার কাছে সত্যের প্রতিরূপ নয় — এ হল চিৎপুরুষের এমন সত্যচেতনা যা সর্বদাই নিজের কাছে তার নিজস্ব সঠিক রূপগুলিকে, বেদের "সত্যম্ ঋতম্"কে উপস্থিত করে — পরন্তু তার প্রবল বাস্তবতা, জ্যোতির্ময় দেহ ও সারধাতুর জন্য।

বুদ্ধিগত ভাবনা পরিশুদ্ধ ও ঊর্ধ্বায়িত করে এক বিরলীকৃত আচ্ছিন্নতায়; আর অতিমানসিক ভাবনা যতই উন্নত হয়, ততই বৃদ্ধি পায় এর আধ্যাত্মিক মূর্ততার পরিমাণ। ধী-শক্তির ভাবনা আমাদের কাছে নিজেকে উপস্থিত করে যেন এ মনঃ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আয়ত্ত-করা কোন বিষয়ের এক আচ্ছিন্ন প্রত্যয় আর একে মনের শূন্য ও সূক্ষ্ম বাতাসে ধারণ করা হয়েছে বুদ্ধির এক স্পর্শাতীত শক্তির দ্বারা। যদি এর ইচ্ছা হয় যে একে আত্মিক ইন্দ্রিয় ও আত্মিক দর্শন আরো মূর্তভাবে অনুভব করুক ও দেখুক তাহলে একে

মনের প্রতিমূর্তি গঠনের শক্তির ব্যবহারের আশ্রয় নিতে হবে। বিপরীত পক্ষে, অতিমানসিক ভাবনা সর্বদাই ভাবকে উপস্থিত করে যেন এ হল সত্তার এমন এক জ্যোতির্ময় ধাতু, চেতনার এমন এক জ্যোতির্ময় উপাদান যা তাৎপর্যপূর্ণ ভাবনারূপ গ্রহণ করে, আর সুতরাং আমরা যেমন মনের মধ্যে ভাব ও সৎ-এর মধ্যে এক ব্যবধান অনুভব করতে প্রবণ, অতিমানসিক ভাবনা তেমন কোন ব্যবধানের বোধ সৃষ্টি করে না, বরং এ নিজেই এক সদ্‌বস্তু, এ হল ভাব-সৎ এবং এক সদ্‌বস্তুর দেহ। ফলে, যখন এ নিজের প্রকৃতি অনুসারে কাজ করে, তখন এর সঙ্গে থাকে আধ্যাত্মিক আলোকের এমন এক ব্যাপার যা বুদ্ধিগত স্বচ্ছতা থেকে ভিন্ন, চরিতার্থ করার এক মহতীশক্তি, এবং এক জ্যোতির্ময় উল্লাস। এ হল সত্তা, চেতনা ও আনন্দের এমন এক স্পন্দন যা তীব্রভাবে অনুভবযোগ্য।

যেমন পূর্বেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, অতিমানসিক ভাবনার তীব্রতার তিনটি উচ্চ স্তর আছে — একটি হল সরাসরি ভাবনা-দর্শনের স্তর, অন্যটি হল ব্যাখ্যামূলক দর্শনের স্তর যা নির্দেশ করে ও প্রস্তুত করে এক মহত্তর প্রকাশক ভাব-দৃষ্টি — তৃতীয়টি হল প্রতিনিধিমূলক দর্শনের স্তর যা চিৎপুরুষের জ্ঞানের কাছে যেন পুনরুত্থাপন করে সেই সত্য যা উচ্চতর শক্তিগুলির দ্বারা আরো শীঘ্র বাইরে প্রকাশ করা হয়। মনের মধ্যে এই বিষয়গুলি বোধিময় মানসিকতার সাধারণ তিনটি শক্তির রূপ নেয় — আভাসনদায়ক ও বিবেকী বোধি, চিদাবেশ, আর সেই ভাবনা যার স্বভাব হল দিব্য প্রকাশ। এরা ঊর্ধ্বে অতিমানসিক সত্তা ও চেতনার তিনটি স্তরের অনুরূপ এবং যেমন আমরা আরোহণ করি, নিম্নতরটি প্রথমে উপরের শক্তি দুটিকে নিজের মধ্যে ডেকে আনে এবং তারপর উচ্চতরগুলির মধ্যে তাদের উপরে নেওয়া হয় যাতে প্রতি স্তরেই তিনটি স্তরের সকলগুলিই পুনর্গঠিত হয় কিন্তু সেখানে সর্বদাই ভাবনা স্বরূপের মধ্যে সেই স্তরের চেতনা ও আধ্যাত্মিক ধাতুর উপযোগী রূপের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্যের আধিপত্য থাকে। একথা মনে রাখা প্রয়োজনীয়; কারণ তা না হলে যখন অতিমানসের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি নিজেদের প্রকাশিত করে তখন মানসিকতা তাদের দিকে তাকিয়ে মনে করতে পারে যে এ সর্বোচ্চ শিখরের দর্শন পেয়েছে, অথচ তখন তার অনুভূতিতে যা আনা হচ্ছে তা শুধু নিম্ন আরোহণের উচ্চতম ক্ষেত্র। প্রতি উচ্চতাতেই, "সানোঃ সানুম্ আরুহৎ", বৃদ্ধি পায় অতিমানসের শক্তিগুলির তীব্রতা, ক্ষেত্র ও সম্পূর্ণতা।

তাছাড়া, এক ভাষা, এক অতিমানসিক বাক্ আছে যার বেশে উচ্চতর জ্ঞান, দর্শন বা ভাবনা আমাদের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে। প্রথমে এ নিম্নে আসতে পারে একটি কথা, বার্তা বা চিদাবেশ রূপে যা ঊর্ধ্ব থেকে আমাদের কাছে অবতরণ করে, অথবা এমনকি মনে হতে পারে এ হল আত্মার বা ঈশ্বরের স্বর, "বাণী, আদেশ"। পরে তার এই পৃথক লক্ষণ আর থাকে না, এটি ভাবনার সাধারণ রূপ হয়ে ওঠে, তখন এ নিজেকে প্রকাশ করে এক আন্তর ভাষার রূপে। আভাসন দেয় বা বিকশিত করে এমন কোন কথার সাহায্য ব্যতিরেকেই ভাবনা নিজেকে প্রকাশ করতে পারে — তবু তা হয়

পুরোপুরি সম্পূর্ণভাবে, স্পষ্টভাবে এবং সমগ্র আন্তর বস্তুসহ অতিমানসিক অনুভবের জ্যোতির্ময় ধাতুতে। যখন এ তত স্পষ্ট নয়, তখন এ হল এমন এক আভাসনদায়ক আন্তর ভাষার সাহায্য নিতে পারে যা এর সঙ্গে থাকে এর সমগ্র তাৎপর্য বাইরে আনার জন্য। অথবা ভাবনাটি নীরব অনুভবরূপে না এসে আসতে পারে এমন এক ভাষারূপে যা সত্য থেকে স্বয়ং-জাত এবং নিজের অধিকারেই সম্পূর্ণ এবং নিজের মধ্যে বহন করে তার আপন দর্শন ও জ্ঞান। তখন এ হল সেই বাক্ যা প্রকাশক, চিদাবেশযুক্ত বা বোধিময় অথবা এমন এক আরো মহত্তর প্রকারের যা উচ্চতর অতিমানস ও চিৎপুরুষের অনন্ত অভিপ্রায় বা আভাসন বহনে সমর্থ। ধীশক্তি ও ইন্দ্রিয়মানসের বিভিন্ন ভাব, অনুভব ও সংবেগ প্রকাশ করতে এখন যে ভাষা ব্যবহৃত হয় এ সেই ভাষাতেই নিজেকে গঠন করতে পারে, তবে এ তা ব্যবহার করে ভিন্নভাবে আর তার সঙ্গে বাইরে ফুটে ওঠে ভাষার সামর্থ্যমতো বোধিময় বা প্রকাশক তাৎপর্যগুলি। অতিমানসিক বাক্ এমন এক আলোক, শক্তি, ভাবনার ছন্দ ও আন্তর শব্দের ছন্দসহ অন্তরে প্রকাশিত হয় যা একে ক'রে তোলে অতিমানসিক ভাবনা ও দর্শনের স্বাভাবিক ও জীবন্ত দেহ আর যদিও ভাষা মানসিক কথোপকথনেরই ভাষা তবু তার মধ্যে এমন এক তাৎপর্য ঢেলে দেয় যা সীমিত বুদ্ধিগত, ভাবময় বা ইন্দ্রিয়বোধাত্মক তাৎপর্য থেকে ভিন্ন। বোধিমানস অথবা অতিমানসেই এ রূপায়িত ও শ্রুত হয় এবং বিশেষ কিছু অতীব ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি ছাড়া অন্যত্র প্রথমে কথায় ও লেখায় সহজে বাইরে আসার এর প্রয়োজন নেই, কিন্তু যখন শারীরিকচেতনা ও অঙ্গগুলি প্রস্তুত করা থাকে তখন তা-ও স্বচ্ছন্দে করা যায় এবং এ হল অখণ্ড সিদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ণতা ও শক্তির এক অংশ।

অতিমানসিক ভাবনা, অনুভূতি ও দর্শনের অন্তর্ভুক্ত জ্ঞানের ক্ষেত্র শুধু যে পার্থিব লোকের উপর মানবীয় চেতনার নিকট উন্মুক্ত সব কিছুর সঙ্গে সমতুল্য হবে তা নয়, অন্যান্য লোকেও ঐসব বিষয়ের সঙ্গে সমতুল্য। তবে এটি উত্তরোত্তর মানসিক চিন্তন ও অনুভূতির বিপরীত ভাবনা নিয়ে কাজ করবে। মানসিক চিন্তনের কেন্দ্র হল অহং, ব্যষ্টি চিন্তক স্বয়ং। বিপরীত পক্ষে অতিমানসিক মানব বেশী চিন্তা করবে বিশ্বমন নিয়ে, আর এমনকি এর উর্ধ্বেও উঠতে পারে, আর তার যে ব্যষ্টিত্ব তা কেন্দ্র অপেক্ষা বরং বিকিরণ ও যোগাযোগের এমন এক আধার হবে যাতে পরম চিৎপুরুষের বিশ্ব ভাবনা ও জ্ঞান একত্র মিলিত হবে। মনোময় মানবের চিন্তার ও কর্মের পরিধি নির্ধারিত হয় তার মানসিকতা ও অনুভূতির ক্ষুদ্রতা বা বৃহত্ত্বের দ্বারা। অতিমানসিক মানবের ক্ষেত্র হবে সকল পৃথিবী এবং সেই সব কিছু যা এর পিছনে অস্তিত্বের অন্যান্য লোকের উপর অবস্থিত। আর সর্বশেষ, মনোময় মানব চিন্তা করে ও দেখে বর্তমান জীবনের স্তরের উপর, যদিও তা হতে পারে উর্ধ্বমুখী আস্পৃহাসহ আর তার দৃষ্টি সকল দিকেই ব্যাহত। তার জ্ঞানের ও কর্মের প্রধান ভিত্তি হল বর্তমান, আর তার সঙ্গে থাকে অতীতের একটু আভাস ও তার স্বল্পার্জিত প্রভাব এবং ভবিষ্যতের দিকে এক অন্ধ দৃষ্টি। সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে পার্থিব অস্তিত্বের বাস্তবায়িত অবস্থাগুলির উপর — প্রথমতঃ বাহ্য

জগতের বিভিন্ন তথ্যের উপর যার সঙ্গে সে তার আন্তর চিন্তন ও অনুভূতির সমগ্র না হলেও দশভাগের নয় ভাগকে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত — আর তারপর প্রতিষ্ঠিত করে তার আন্তর সত্তার আরো বাহ্য অংশের সব পরিবর্তনশীল ভূতার্থের উপর। যেমন তার মন বিকশিত হয়, তেমন সে এই সব ছাড়িয়ে আরো স্বচ্ছন্দে যায় সে সব থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন যোগ্যতায় এবং সেসবও ছাড়িয়ে যায়; তার মন কাজ করে সম্ভাবনাসমূহের আরো বৃহত্তর ক্ষেত্রের সঙ্গে: কিন্তু এগুলির অধিকাংশই তার কাছে পূর্ণ বাস্তবতা পায় শুধু সেই অনুপাতে যে অনুপাতে তারা বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কে আসে এবং এখন বা পরে তাদের এখানে বাস্তব করা সম্ভব হয়। যদি সে আদৌ বিষয়সমূহের স্বরূপ দেখতে প্রবণ হয় তা শুধু তার বাস্তব বিষয়গুলির ফল হিসেবে, তাদের সঙ্গে সম্পর্কে ও তাদের উপর এরা নির্ভরশীল এইভাবে এবং সেজন্য সে সর্বদাই তাদের দেখে মিথ্যা আলোকে অথবা সীমিত পরিমাণে। এই সব বিষয়েই, অতিমানসিক মানবকে অগ্রসর হতে হবে সত্যদর্শনের বিপরীত তত্ত্ব থেকে।

অতিমানসিক সত্তা বিষয়সমূহকে দেখে উপর থেকে বিশাল দেশের মধ্যে, আর তার সর্বোচ্চ অবস্থায় দেখে অনন্তের বিভিন্ন দেশের মধ্যে। তার দৃষ্টি বর্তমানের দৃষ্টিকোণের মধ্যে সীমিত থাকে না, এ দেখতে পায় কালের পরম্পরায় অথবা কালের ঊর্ধ্ব থেকে পরম চিৎপুরুষের অবিভক্ততার মধ্যে। সে সত্যকে দেখে তার সমুচিত ক্রমে — প্রথমে স্বরূপে, দ্বিতীয়তঃ তা থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন যোগ্যতায় এবং শুধু শেষে দেখে বাস্তবতার মধ্যে। তার দৃষ্টিতে স্বরূপগত সত্যগুলি আত্মপ্রতিষ্ঠ, আত্মদৃষ্ট, তাদের প্রামাণিকতার জন্য এই বা অন্য বাস্তব তথ্যের উপর নির্ভরশীল নয়; যোগ্যসত্যগুলি হল সত্তা স্বরূপে ও বিষয়সমূহে স্থিত শক্তির সত্য ও শক্তির আনন্ত্যের বিভিন্ন সত্য এবং এই বা অন্য বাস্তবতার মধ্যে তাদের অতীত বা বর্তমান চরিতার্থতা হ'ক বা না হ'ক অথবা প্রকৃতির সমগ্রতা বলে আমরা যেসব অভ্যাসগত উপরভাসা রূপগুলি গ্রহণ করি তা ছাড়াই ওরা সত্য; সে যে যোগ্যসত্যগুলি দেখে তা থেকে শুধু এক নির্বাচন হল বাস্তব বিষয়গুলি, এই বাস্তব বিষয়গুলি ঐসব যোগ্যসত্যের উপর নির্ভরশীল, সীমিত ও পরিবর্তনশীল। তার ভাবনা ও সঙ্কল্পের উপর বর্তমানের, বাস্তব বিষয়ের, তথ্যসমূহের অব্যবহিত ক্ষেত্রের, ক্রিয়ার অব্যবহিত প্রেষণা ও দাবীর উৎপীড়নের কোন শক্তি থাকে না এবং সেজন্য সে বৃহত্তর জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত এক বৃহত্তর সঙ্কল্পশক্তি পেতে সমর্থ। বর্তমান তথ্য ও ঘটনাসমূহের জঙ্গল দ্বারা বেষ্টিত সব স্তরের উপর অবস্থিত ব্যক্তির মতো সে বিষয়সমূহকে দেখে না, সে দেখে উপর থেকে, সে বাইরে থেকে ও উপরিভাগের দ্বারা বিচার ক'রে দেখে না, সে দেখে ভিতর থেকে, তাদের কেন্দ্রের সত্যের দৃষ্টির দ্বারা; সেজন্য সে দিব্য সর্বজ্ঞতার আরো নিকটবর্তী। সে সঙ্কল্প ও কার্য করে এমন এক শিখর থেকে যেখান থেকে সে আধিপত্য করে এবং কালের মধ্যে আরো দীর্ঘ গতিবৃত্তিসহকারে এবং বীর্যের আরো বৃহৎ ক্ষেত্রসহ; সুতরাং সে দিব্য সর্বশক্তিমত্তার আরো নিকটবর্তী। তার সত্তা ক্ষণসমূহের পরম্পরার মধ্যে আবদ্ধ নয়,

বরং অতীতের পূর্ণ শক্তি তার আছে এবং ভবিষ্যতের মধ্যে বিচরণ করে দৃষ্টি নিয়ে: সে সঙ্কীর্ণ অহং ও ব্যক্তিগত মনের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না বরং বাস করে বিশ্বসত্তার স্বাধীনতার মধ্যে, ভগবানের মধ্যে এবং সকল সত্তা ও সকল বিষয়ের মধ্যে; সে স্থূল মনের নিষ্প্রভ ঘনত্বের মধ্যে বাস করে না, সে বাস করে আত্মার আলোকের মধ্যে, চিৎপুরুষের আনন্ত্যের মধ্যে। সে অন্তঃপুরুষ ও মনকে দেখে শুধু এক শক্তি ও গতি হিসেবে এবং জড়কে দেখে চিৎপুরুষের শুধু এক উৎপন্ন রূপ হিসেবে। তার সকল ভাবনা এমন এক প্রকারের হবে যার উৎপত্তি হয় জ্ঞান থেকে। প্রাতিভাসিক জীবনের বিষয়গুলিকে সে দেখে ও সাধন করে আধ্যাত্মিক সত্তার সদ্‌বস্তুর এবং স্ফুরন্ত আধ্যাত্মিক স্বরূপের শক্তির আলোকে।

প্রথমে, এই মহত্তর পাদে পরিবর্তনের প্রারম্ভে, ভাবনা অপেক্ষাকৃত অল্প বা দীর্ঘ সময়ের জন্য বিচরণ ক'রে চলবে অপেক্ষাকৃত কম বা বেশী পরিমাণে মনের ধারায় তবে তাতে থাকবে অধিকতর আলোক, এবং স্বাধীনতা ও অতিস্থিতির বর্ধিষ্ণু উড্ডয়ন, অবকাশ ও গতি। পরে স্বাধীনতা ও অতিস্থিতির আধিপত্য আসতে শুরু হয়; ভাবনা-মানসের বিভিন্ন গতিতে এক এক ক'রে আসবে ভাবনা-দৃষ্টির বিপরীত ভাব ও ভাবনা-পদ্ধতির পরিবর্তন, তবে বাধা ও পূর্বাবস্থাপ্রাপ্তিও ঘটবে, আর এই রকম চলবে যতক্ষণ না মোটের উপর পাওয়া যায় ও সাধিত হয় সম্পূর্ণ রূপান্তর। সাধারণতঃ অতিমানসিক জ্ঞান প্রথমে ও সর্বাপেক্ষা স্বচ্ছন্দে সংহত হয় শুদ্ধ ভাবনা ও জ্ঞানের পদ্ধতিসমূহে কারণ এখানে মানবমন পূর্বেই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা পেয়েছে এবং এখানেই সর্বাপেক্ষা স্বাধীন। পরে ও কম সহজে সংহত হবে প্রযুক্ত ভাবনা ও জ্ঞানের পদ্ধতিসমূহে কারণ সেখানে মানবের মন যুগপৎ অতীব সক্রিয় এবং তার সব নিম্নতর পদ্ধতিতে বদ্ধ ও আসক্ত। সর্বশেষ ও সর্বাপেক্ষা দুষ্কর জয় হল তিনটি কালের জ্ঞান, "ত্রিকালদৃষ্টি" কারণ এখন এ হল মনের কাছে কল্পনার বিষয় বা অবোধ্য। এই সব তিনটিতেই এই একই লক্ষণ থাকবে যে চিৎপুরুষ সরাসরি দেখছে ও সঙ্কল্প করছে উপরে ও চারিদিকে, শুধু যে এর অধিকৃত দেহে তা নয়, আর সেখানে থাকবে পৃথকভাবে কিংবা যুক্ত গতিতে তাদাত্ম্যলব্ধ অতিমানসিক জ্ঞান, অতিমানসিক দর্শন, অতিমানসিক ভাবনা ও অতিমানসিক কথা।

তাহলে এই হবে অতিমানসিক ভাবনা ও জ্ঞানের সাধারণ লক্ষণ এবং এইগুলিই তার বিভিন্ন প্রধান শক্তি ও ক্রিয়া। এখন বিবেচনা করার আছে — এর বিশেষ করণব্যবস্থা কি, বর্তমান মানবীয় মানসিকতার বিভিন্ন উপাদানে অতিমানসিক কি পরিবর্তন আনবে এবং সেই বিশেষ ক্রিয়াগুলি কি যা ভাবনাকে দেবে এর বিভিন্ন উপকরণ, প্রবর্তকশক্তি ও তথ্য।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

অতিমানসের বিভিন্ন করণ ও ভাবনা-প্রণালী

অতিমানস, দিব্য বিজ্ঞান আমাদের বর্তমান চেতনার সম্পূর্ণ বিজাতীয় কিছু নয়: এ হল চিৎপুরুষের এক শ্রেষ্ঠ করণব্যবস্থা, আর আমাদের সাধারণ চেতনার সকল ক্রিয়াবলী হল অতিমানসিক চেতনা থেকে সীমিত ও হীন উৎপন্ন বিষয়, কারণ এইগুলি হল পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা ও রচনা, আর ওটি (অর্থাৎ অতিমানসিক চেতনা) হল চিৎপুরুষের সুষ্ঠু, স্বতঃস্ফূর্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকৃতি ও ক্রিয়া। সুতরাং যখন আমরা মন থেকে অতিমানসে উত্তরণ করি, তখন চেতনার নতুন শক্তি আমাদের অন্তঃপুরুষ ও মন ও প্রাণের ক্রিয়াবলীকে বর্জন করে না বরং সে সবকে উন্নত, বৃহৎ ও রূপান্তরিত করে। এ তাদের উন্নীত করে এবং তাদের দেয় শক্তি ও কার্যের এক সদা মহত্তর বাস্তবতা। আবার এ মনের ও চৈত্য অংশসমূহের ও প্রাণের বাহ্য শক্তি ও ক্রিয়ার রূপান্তরেই ক্ষান্ত হয় না, বরং যে সব অপেক্ষাকৃত বিরল শক্তি ও বৃহত্তর তেজ ও জ্ঞান আমাদের অধিচেতন আত্মার বিশিষ্ট বস্তু এবং এখন আমাদের কাছে মনে হয় গুহ্য, অদ্ভুতভাবে চৈত্য, অস্বাভাবিক সেগুলিকেও প্রকট ও রূপান্তরিত করে। অতিমানসিক প্রকৃতিতে এই সব মোটেই অস্বাভাবিক থাকে না বরং হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সাধারণ, পৃথকভাবে চৈত্য নয় বরং আধ্যাত্মিক, গুহ্য ও অপরিচিত নয়, বরং এক সরাসরি, সরল, স্বগত ও স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া। চিৎপুরুষ জাগ্রত জড়গত চেতনার মতো সীমিত নয়, আর যখন অতিমানস জাগ্রত চেতনাকে অধিগত করে এ তার জড়ত্ব দূর করে, তার সব সঙ্কীর্ণতা থেকে তাকে মুক্ত করে এবং জড়গত ও চৈত্য অংশকে রূপান্তরিত করে আধ্যাত্মিক সত্তার প্রকৃতিতে।

যেমন পূর্বেই বলা হয়েছে, যে মানসিক ক্রিয়াকে সব চেয়ে দ্রুত সংহত করা যায় তা হল শুদ্ধ ভাবময় জ্ঞান। এটাই উচ্চস্তরে রূপান্তরিত হয় প্রকৃত জ্ঞানে, অতিমানসিক ভাবনায়, অতিমানসিক দর্শনে, তাদাত্ম্যের দ্বারা অতিমানসিক জ্ঞানে। এই অতিমানসিক জ্ঞানের মূল ক্রিয়ার বর্ণনা পূর্ব অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। তবে, কেমন করে এই জ্ঞান বাহ্য প্রয়োগে কাজ করে এবং কেমন করে এ অস্তিত্বের সব তথ্যের সঙ্গে কারবার করে তা-ও দেখা প্রয়োজনীয়। মনের ক্রিয়ার সঙ্গে এর পার্থক্য প্রথমতঃ এই বিষয়ে যে এ স্বাভাবিকভাবে সেই সব কর্মাবলী সম্পন্ন করে যেগুলি মনের কাছে শ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা দুষ্কর, এ ঐসবের মধ্যে বা তাদের উপরে কাজ করে উপর থেকে নিম্নদিকে, মন যেমন ব্যাহত চেষ্টার সঙ্গে উপরদিকে কাজ করে অথবা তার নিজের ও নিম্নতর স্তরগুলির বাধা নিয়ে কাজ করে তেমনভাবে করে না। উচ্চতর ক্রিয়াগুলি নিম্নতর সাহায্যের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং নিম্নতর ক্রিয়াগুলি উচ্চতর ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল, শুধু যে তাদের

পথের নির্দেশের জন্য তা নয়, বরং তাদের অস্তিত্বেরও জন্য সুতরাং রূপান্তরের দ্বারা নিম্নতর মানসিক ক্রিয়াগুলির শুধু যে রূপ বদলায় তা নয়, এরা সম্পূর্ণ অধীন হয়। আর উচ্চতর মানসিক ক্রিয়াগুলিরও রূপ পরিবর্তিত হয় কারণ অতিমানসিকভাবাপন্ন হয়ে তারা তাদের আলো পেতে শুরু করে সরাসরি শ্রেষ্ঠ জ্ঞান থেকে, আত্মজ্ঞান বা অনন্ত জ্ঞান থেকে।

এই উদ্দেশ্যের জন্য, মনের সাধারণ ভাবনা-ক্রিয়াকে তিনটি গতির দ্বারা গঠিত ব'লে দেখা যেতে পারে। দেহস্থিত মনোময় পুরুষের পক্ষে প্রথম ও নিম্নতম ও সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় হল অভ্যাসগত ভাবনামানস যার বিভিন্ন ভাবনার প্রতিষ্ঠা হল ইন্দ্রিয়সমূহের দেওয়া এবং স্নায়বিক ও ভাবময় সত্তার বাহ্য অভিজ্ঞতার দেওয়া বিভিন্ন তথ্য এবং শিক্ষা ও বাহ্য জীবন ও পরিবেশের দ্বারা গঠিত চিরাচরিত বিভিন্ন ধারণা। এই অভ্যাসগত ভাবনার দুইটি ক্রিয়া — একটি হল এক প্রকার নিম্নপ্রবাহ যাতে যন্ত্রের মতো পুনঃপুনঃ-আসা ভাবনা সর্বদাই আবর্তিত হয় একই শারীরিক, প্রাণিক, ভাবময়, ব্যবহারিক সংক্ষিপ্ত বুদ্ধিগত ভাবনা ও অভিজ্ঞতা নিয়ে; অন্যটি, মন যে সব নতুন অভিজ্ঞতা গ্রহণ করতে বাধ্য হয় সে সবের উপর সক্রিয়ভাবে কাজ করে এবং তা করে অভ্যাসগত চিন্তার সূত্রে। সাধারণ মানুষের মানসিকতা এই অভ্যাসগত মনের দ্বারাই সীমাবদ্ধ এবং এর গণ্ডির বাইরে বিচরণ করে অত্যন্ত অপূর্ণভাবে।

চিন্তা-ক্রিয়ার এক দ্বিতীয় পর্যায় হল প্রয়োগকুশল (pragmatic) ভাবনামানস যা নিজেকে জীবনের উর্ধ্বে তোলে এবং সৃজনশীলরূপে কাজ করে যেন এ ভাব ও প্রাণশক্তির মধ্যে, জীবনের সত্য এবং জীবনে এখনো অভিব্যক্ত হয়নি এমন ভাবের সত্যের মধ্যবর্তী বিষয়। জীবন থেকেই এ উপাদান নেয় এবং তার মধ্যে থেকে ও তার উপর নির্মাণ করে এমন সব সৃজনশীল ভাব যা আরো প্রাণ বিকাশের জন্য স্ফুরন্ত হয়ে ওঠে: অন্যদিকে এ মনোময় লোক থেকে অথবা আরো মূলগতভাবে অনন্তের ভাবনাশক্তি থেকে নতুন মনন ও মানসিক অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে এবং তৎক্ষণাৎ একে রূপান্তরিত করে মানসিক ভাবনাশক্তিতে এবং বাস্তব সত্তা ও জীবনধারণের শক্তিতে। এই প্রয়োগকুশল (pragmatic) ভাবনামানসের সমগ্র ঝোঁক হল আন্তর ও বাহ্য ক্রিয়া ও অভিজ্ঞতার দিকে — আন্তর ক্রিয়া ও অভিজ্ঞতা নিজেকে বাহ্যের উপর নিক্ষেপ করে সদ্‌বস্তুর আরো সম্পূর্ণ তৃপ্তির জন্য, আর বাহ্য ক্রিয়া ও অভিজ্ঞতাকে ভিতরে নেওয়া হয় এবং নতুন গঠনের জন্য তা এর উপর ফিরে আসে অঙ্গীভূত ও পরিবর্তিত হয়ে। এই মানসিক স্তরে অন্তঃপুরুষের কাছে মনন যে আগ্রহের বিষয় তা শুধু বা প্রধানতঃ এই কারণে যে এটি কর্ম ও অভিজ্ঞতার এক বিশাল ক্ষেত্রের উপায়।

চিন্তার একটি তৃতীয় পর্যায় আমাদের মধ্যে উন্মুক্ত করে শুদ্ধ ভাবময় মানস যা ভাবনার সত্যের মধ্যে বিবিক্ত হয়ে বাস করে; কর্ম ও অভিজ্ঞতার উপর তার মূল্যের কোন আবশ্যিক নির্ভরতা এ রাখে না। ইন্দ্রিয়সমূহের বিভিন্ন তথ্য এবং বিভিন্ন বাহ্য অনুভূতি এ দেখে, কিন্তু তা করে শুধু এই সব যে ভাবনার, যে সত্যের সাক্ষ্য দেয় তা

খুঁজে পাবার জন্য এবং সে সবকে জ্ঞানের সংজ্ঞায় পরিণত করার জন্য। জীবনের মধ্যে মনের সৃজনশীল ক্রিয়া এ পর্যবেক্ষণ করে সেই একই ভাবে ও সেই একই উদ্দেশ্যের জন্য। এর প্রধান কাজ জ্ঞান, এর সমগ্র উদ্দেশ্য হল ভাবনা-ক্রিয়ার আনন্দ পাওয়া, সত্যের অন্বেষণ, নিজেকে ও জগৎকে এবং নিজের কর্মের ও জগৎকর্মের পিছনে যা সব থাকতে পারে সে সব জানার প্রয়াস। যে বুদ্ধিশক্তি নিজের জন্য, নিজের বৈশিষ্ট্যে, নিজের আপন শক্তিতে ও নিজের আপন উদ্দেশ্যের জন্য কাজ করে তার পরাকাষ্ঠা হল এই ভাবময় মানস।

বুদ্ধির এই তিনটি গতিবৃত্তিকে সঠিকভাবে মিলিয়ে তাদের সুসমঞ্জস করা মানবমনের পক্ষে দুষ্কর। সাধারণ মানব প্রধানতঃ বাস করে অভ্যাসগত মনে, সৃজনশীল ও প্রয়োগকুশল মনে তার কাজ অপেক্ষাকৃত দুর্বল, আর শুদ্ধ ভাবময় মানসিকতার গতিবৃত্তিকে আদৌ ব্যবহার করতে অথবা তাতে প্রবেশ করতে এ অতীব কষ্ট অনুভব করে। সৃজনশীল প্রয়োগকুশল মন সাধারণতঃ নিজের গতিতেই এত ব্যস্ত থাকে যে এ শুদ্ধ ভাবময় লোকের বাতাবরণের মধ্যে স্বচ্ছন্দ ও নিঃস্বার্থভাবে বিচরণ করতে অক্ষম, আবার অপরপক্ষে অভ্যাসগত মানসিকতার দ্বারা আরোপিত সব বাস্তব ঘটনার উপর এবং ঐরকম বিভিন্ন বাধার উপর এবং এ নিজে যা সব গঠন করতে আগ্রহী সেসব ছাড়া অন্য সব প্রয়োগকুশল মনন ও ক্রিয়ার গতিবৃত্তির উপর এর অধিকার প্রায়শঃই কম। শুদ্ধ ভাবময় মানসিকতার ঝোঁক হল সত্যের অমূর্ত ও মনগড়া দর্শন, বুদ্ধিগত ভাগ ও ভাবময় প্রাসাদ গঠন করা, আর হয় সে জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রয়োগকুশল গতিবৃত্তি হারিয়ে বাস করে শুধুমাত্র বা প্রধানতঃ ভাবনার মধ্যে, আর না হয় জীবনক্ষেত্রে যথেষ্ট শক্তি নিয়ে সরাসরিভাবে কাজ করতে অক্ষম হয় এবং আশঙ্কা থাকে যে এ ব্যবহারিক ও অভ্যাসগত মানসিকতার জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে অথবা তাতে দুর্বল হয়ে থাকবে। এক রকমের জোড়াতালি দেওয়া হয় কিন্তু প্রধান ঝোঁকের প্রাবল্যে চিন্তাশীল সত্তার সমগ্রতা ও ঐক্য ব্যাহত হয়। মন এমনকি তার নিজের সমগ্রতা বিষয়েরও নিশ্চিত প্রভু হতে অক্ষম হয় কারণ ঐ সমগ্রতার রহস্য আছে তার উজানে আত্মার স্বচ্ছন্দ ঐক্যের মধ্যে — যে ঐক্য স্বচ্ছন্দ হওয়ায় অনন্ত বহুত্ব ও বৈচিত্র্য ধারণে সমর্থ; তাছাড়া ঐ রহস্য আছে অতিমানসিক শক্তিতে আর একমাত্র এই শক্তিই স্বাভাবিক সুষ্ঠুতায় বাইরে প্রকট করতে পারে আত্মার ঐক্যের সংহত বহুময় গতিবিধি।

অতিমানস তার সম্পূর্ণ অবস্থায় মনের চিন্তার সমস্ত শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ বিপরীত করে দেয়। এ প্রাতিভাসিক বিষয়ের মধ্যে বাস করে না, এ বাস করে মূল তত্ত্বের মধ্যে, আত্মার মধ্যে এবং সকল কিছুকে দেখে আত্মার সত্তা এবং এর শক্তি ও রূপ ও গতি হিসেবে, আর অতিমানসের মধ্যে সকল মনন ও মনন-প্রণালীও ঐরকম হতে বাধ্য। এর সকল মৌলিক ভাবনা-ক্রিয়া হল অতিমানসিক দর্শনের এবং সেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের রূপায়ণ যা কাজ করে সর্বসত্তার সঙ্গে তাদাত্ম্যের দ্বারা। অতএব এ মুখ্যতঃ বিচরণ করে আত্মার ও সত্তার ও চেতনার ও অনন্তশক্তির ও সত্তার আনন্দের (যা সব আমাদের বর্তমান

চেতনায় অ-সত্তা বলে মনে হয় সে সবও বাদ পড়ে না) বিভিন্ন শাশ্বত, স্বরূপগত ও সার্বভৌম সত্যের মধ্যে এবং এর সকল বিশেষ চিন্তার উৎস ও অবলম্বন হল এই সব শাশ্বত সত্যের শক্তি; কিন্তু গৌণতঃ এ সনাতনের সত্তায় বিভিন্ন সত্যের অনন্ত দিক ও প্রয়োগ ও অনুক্রম ও সামঞ্জস্যেরও সঙ্গে সুসঙ্গত। সুতরাং এর পরাকাষ্ঠায় এ সেই সবের মধ্যে বাস করে যেখানে পৌঁছনো বা সেইসব আবিষ্কার করা শুদ্ধ মনের পক্ষে এক প্রয়াস, আর এমনকি এর সব নিম্ন স্তরেও এই সব বিষয়গুলি তার দীপ্তিময় গ্রহিষ্ণুতার কাছে উপস্থিত — সমীপবর্তী বা সুলব্ধ ও সুলভ।

ভাবময় মনের কাছে শ্রেষ্ঠ সত্যগুলি অথবা শুদ্ধ ভাবগুলি আচ্ছিন্ন প্রত্যয় কারণ মন বাস করে অংশতঃ প্রাতিভাসিক বিষয়ের মধ্যে এবং অংশতঃ বুদ্ধিগত রচনার মধ্যে এবং উচ্চতর সব সদ্‌বস্তু পেতে হলে তাকে বিমূর্তনের পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয়, অপরদিকে অতিমানস বাস করে চিৎপুরুষের মধ্যে এবং সেজন্য এই সব ভাব ও সত্য যার প্রতিরূপ অথবা বরং মূলতঃ যা, তার স্বকীয় ধাতুর মধ্যে, এবং এ সে সবকে সত্যই চরিতার্থ করে; শুধু যে চিন্তা করে তা নয়, কিন্তু চিন্তার কাজে এ সেসবের সারপদার্থ অনুভব করে এবং তার সঙ্গে নিজেকে এক করে; এর কাছে তারা হল সম্ভাব্য বাস্তবতম সার পদার্থের অন্তর্গত। অতিমানসের কাছে চেতনার এবং স্বরূপগত সত্তার সত্যগুলি সদ্‌বস্তুর প্রকৃত উপাদান, বাহ্যগতিবৃত্তি ও সত্তার রূপ অপেক্ষা এই সব সত্য আরো অন্তরঙ্গভাবে এবং প্রায় বলা যায় আরো নিবিড়ভাবে বাস্তব, যদিও ঐগুলি তার কাছে সদ্‌বস্তুর গতিবৃত্তি ও রূপ এবং আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন মনের এক বিশেষ ক্রিয়ার কাছে এরা যেমন ভ্রমাত্মক, অতিমানসের কাছে এরা তেমন ভ্রমাত্মক নয়। এর কাছে ভাবও ভাবসৎ, চিন্ময় পুরুষের সদ্‌বস্তুর উপাদান, সত্যের বস্তুগত রূপায়নের শক্তিতে ভরপুর, সেই কারণে সৃষ্টিরত।

আবার যে সময় শুদ্ধ ভাবময় মনের প্রবণতা হল এমন সব মনগড়া দর্শন তৈরী করা যেগুলি সত্যের মানসিক ও আংশিক রচনা, যেখানে অতিমানসিক কোন প্রতিরূপ বা দর্শনের দ্বারা বদ্ধ নয়, যদিও অনন্তের প্রয়োগকুশল বিভিন্ন উদ্দেশ্যের জন্য ভাবময় মনেরও সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে প্রতিরূপ গঠন করতে এবং সত্যের জীবন্ত ধাতুর মধ্যে ব্যবস্থা করতে ও নির্মাণ করতে। যখন মন তার আত্যন্তিকতা, প্রণালীবদ্ধকরণ, নিজের রচনায় আসক্তি থেকে মুক্ত হয়, তখন এ অনন্তের সীমাহীনতার মধ্যে বিমূঢ় হয়ে পড়ে, অনুভব করে যে এ হল এক নির্ঋতি, এমনকি যদিও তা দীপ্তিভরা নির্ঋতি, আর কোন কিছু নির্মাণ করতে এবং সেজন্য নিশ্চিতভাবে চিন্তা ও কর্ম করতে অসমর্থ হয়, কারণ সকল বিষয়ই, এমনকি সর্বাপেক্ষা বিভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী বস্তুগুলিও এই আনন্ত্যের মাঝে কোন সত্য নির্দেশ করে, আর তবু যা কিছু এ ভাবতে পারে তা পুরোপুরি সত্য নয় এবং এর সকল রূপায়ণ ভেঙে যায় অনন্ত থেকে আসা নতুন আভাসনের সামনে। এ জগৎকে দেখতে শুরু করে যেন এ হল এক ছায়াবাজি এবং মনন যেন জ্যোতির্ময় অনির্দিষ্টের স্ফুলিঙ্গের নির্ঋতি। অতিমানসিকের বৃহত্ত্ব ও মুক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মন

নিজেকে হারিয়ে ফেলে ও বৃহত্ত্বের মধ্যে কোন দৃঢ় স্থান পায় না। বিপরীত পক্ষে, অতিমানস তার মুক্ত অবস্থায় সদ্‌বস্তুর দৃঢ় ভূমির উপর রচনা করতে পারে এর মননের বিভিন্ন সামঞ্জস্য এবং সত্তার বহিঃপ্রকাশ অথচ তবু তার অনন্ত বৃহত্ত্বের আত্মার মধ্যে এ ধারণ করে থাকে তার অনন্ত স্বাধীনতা ও আনন্দ। যেমন এ যা সব হয় ও কাজ করে ও চরিতার্থ করে, তেমন যা সব এ চিন্তা করে — সে সব "সত্যম্, ঋতম্, বৃহৎ"-এর অন্তর্গত।

এই সমগ্রতার ফল এই যে অতিমানসের যে স্বচ্ছন্দ স্বরূপগত ভাবনাক্রিয়া মনের শুদ্ধ স্বচ্ছন্দ, নিঃস্বার্থ অসীম ভাবনাক্রিয়ার অনুরূপ তার সঙ্গে অতিমানসের সৃজনশীল, প্রয়োগকুশল উদ্দেশ্যপূর্ণ ও নির্ধারক ভাবনাক্রিয়ার কোন বিভাজন বা অসঙ্গতি নেই। সত্তার আনন্ত্যের স্বাভাবিক ফল হল সম্ভূতির বিভিন্ন সামঞ্জস্যের স্বাচ্ছন্দ্য। অতিমানস সর্বদাই ক্রিয়াকে দেখে পরমাত্মার এক অভিব্যক্তি ও বহিঃপ্রকাশ হিসেবে এবং সৃষ্টিকে দেখে অনন্তের দিব্য প্রকটনরূপে। এর সকল সৃজনশীল ও প্রয়োগকুশল মনন হল অনন্তের সম্ভূতির এক করণ, ঐ উদ্দেশ্যের জন্য দীপ্তির এক শক্তি এবং অসীম সত্তার শাশ্বত তাদাত্ম্য এবং এর অনন্ত অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্য এবং বিভিন্ন জগৎ ও জীবনের মধ্যে এর আত্মপ্রকাশের এক মধ্যস্থ তত্ত্ব। এটাই অতিমানস সর্বদা দেখে এবং মূর্ত করে আর এর ভাবময় দর্শন ও মনন এর কাছে অনন্তের অসীম ঐক্য ও বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করে; এক চিরন্তন তাদাত্ম্যের দ্বারা এ তা-ই আর এর মধ্যেই এ বাস করে এর সত্তা ও সম্ভূতির সকল শক্তিতে; অথচ আবার সেই সময় এর সঙ্গে সর্বদা বিদ্যমান থাকে অনন্ত সঙ্কল্পের এক ক্রিয়া, তপঃ, সত্তার শক্তি যা নির্ধারণ করে এ আনন্ত্যের মধ্য থেকে কালের প্রবাহের মধ্যে কি উপস্থিত করবে, ব্যক্ত করবে বা সৃজন করবে এবং আরো নির্ধারণ করে এখানে ও এখন বা কালের বা জগতের যে কোন ক্ষেত্রে কিভাবে ব্যবহার করবে বিশ্বের মধ্যে আত্মার চিরন্তন সম্ভূতিকে।

অতিমানস এই প্রয়োগকুশল গতিবৃত্তির দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় না এবং এর মনন ও জীবনের মধ্যে এ ঐরকমে যা হয় ও সৃষ্টি করে তার আংশিক গতি বা সম্পূর্ণ ধারাকে এর আত্মার বা অনন্তের সমগ্র সত্য বলে গ্রহণ করে না। বর্তমানকালে বা সত্তার একটি লোকের উপর নির্বাচন অনুযায়ী এ যা হয় ও চিন্তা করে ও কাজ করে, শুধু তার মধ্যেই এ বাস করে না; শুধু বর্তমান হতে বা মুহূর্তের যে অবিরাম পরম্পরার তালকে আমরা ঐ নাম দিই তার থেকে এ তার অস্তিত্ব আহরণ করে না। এ যে শুধু কালের গতি অথবা কালের মধ্যে চেতনার গতি অথবা চিরন্তন সম্ভূতির একটি সৃষ্ট বিষয় — শুধু এই হিসেবে এ নিজেকে দেখে না। এমন এক কালাতীত সত্তা যা অভিব্যক্তির অতীত এবং সকল কিছুই যার অভিব্যক্তি তার কথা এ অবগত, কালের মধ্যে যা চিরন্তন তার কথাও এ অবগত, অস্তিত্বের বহু লোকের কথাও তার জানা, অভিব্যক্তির অতীত সত্যের এবং সত্তার যে অনেক সত্য এখনো ভবিষ্যতে অভিব্যক্ত হতে বাকী আছে অথচ যা সনাতনের আত্মদৃষ্টিতে ইতিপূর্বেই উপস্থিত তার সম্বন্ধেও এ অবগত। যে প্রয়োগকুশল

সদ্‌বস্তু ক্রিয়ার ও পরিবর্তনের সত্য তাকেই এ একমাত্র সত্য ব'লে ভুল করে না, বরং তাকে দেখে যে যা শাশ্বত সৎ এ তার অবিরাম বাস্তবীকরণ। এ জানে যে জড় বা প্রাণ বা মন বা অতিমানসের লোকের উপর সকল সৃষ্টিই শুধু সনাতন সত্যের পূর্বনির্ধারিত আনয়ন, সনাতনের প্রকাশ এবং সনাতনের মধ্যে সকল বিষয়ের পূর্বস্থিতির কথা এর অন্তরঙ্গভাবে জানা। এই দৃষ্টি তার সকল প্রয়োগকুশল মনন এবং তার ফলস্বরূপ ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর অন্তঃস্থ নির্মাণশক্তি দ্রষ্টা ও মনস্বীর এক নির্বাচনী শক্তি, এর আত্ম-গঠনশক্তি আত্মদ্রষ্টার শক্তি, আত্ম-অভিব্যক্তিশীল অন্তঃপুরুষ অনন্ত চিৎপুরুষের শক্তি। অনন্ত আত্মা ও চিৎপুরুষের মধ্য থেকেই এ স্বচ্ছন্দভাবে সৃষ্টি করে এবং ঐ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই তার সৃষ্টি হয় নিশ্চিত ও সন্দেহশূন্য।

সুতরাং এ তার বিশেষ সম্ভূতির মধ্যে আবদ্ধ নয় অথবা তার ক্রিয়ার পাক বা গতির মধ্যে আটক থাকে না। সৃজনশীল সম্ভূতির অন্যান্য সামঞ্জস্যসমূহের সত্যের দিকে এ এমন এক প্রকারে ও মাত্রায় উন্মুক্ত যা মনের অসাধ্য অথচ সে সময় এ নিজের দিক থেকে এক নিশ্চয়াত্মক সঙ্কল্প ও মনন ও ক্রিয়া প্রয়োগ করে। যখন এ কোন সংঘর্ষরূপী ক্রিয়ায় নিযুক্ত অর্থাৎ অতীত বা অপর মনন ও রূপ ও সম্ভূতির স্থানে যা ব্যক্ত করতে নিযুক্ত, তখন এ যা সরাচ্ছে তার সত্য জানে এবং সরাবার সময়ও তার সত্যকে তেমনই সার্থক করে যেমন এ সার্থক করে তার স্থলাভিষিক্ত বিষয়ের সত্যকে। এ তার ব্যক্ত করার, নির্বাচন করার, প্রয়োগকুশল সচেতন ক্রিয়ার দ্বাবা বদ্ধ নয় বরং একই সময়ে তার আছে এক বিশেষপ্রকারের সৃজনশীল মননের এবং ক্রিয়ার নির্বাচনমূলক সূক্ষ্মতার সকল আনন্দ, বিভিন্ন রূপ ও গতির আনন্দ এবং সেই সঙ্গে সমানভাবে নিজের ও অপরদেরও সম্ভূতির আনন্দ। তার জীবন ও ক্রিয়া ও সৃষ্টির সকল মনন ও সঙ্কল্প যা সমৃদ্ধ, বহুবিধ ও অনেক লোকের সত্য একই কেন্দ্রে নিবদ্ধ করে — সে সকলই মুক্ত ও দীপ্ত হয় সনাতনের অপরিসীম সত্যে।

অতিমানসিক মনন ও চেতনার এই সৃজনশীল বা প্রয়োগকুশল গতিবৃত্তি তার সঙ্গে এমন এক ক্রিয়া আনে যা অভ্যাসগত বা যান্ত্রিক মানসিকতার ক্রিয়ার অনুরূপ, অথচ অতীব অন্যবিধ। যে বিষয় সৃষ্ট হয় তা এক সামঞ্জস্যের নির্ধারণ এবং সকল সামঞ্জস্য এগিয়ে চলে পূর্ব দৃষ্ট বা পূর্ব নির্ধারিত ধারায় এবং সঙ্গে বহন করে অবিরত স্পন্দন ও ছন্দোময় পুনরাবৃত্তি। অতিমানসিক জীবের ব্যক্ত অস্তিত্বের সামঞ্জস্য সংগঠন ক'রে অতিমানসিক মনন তাকে প্রতিষ্ঠিত করে শাশ্বত তত্ত্বসমূহের উপর, একে নিক্ষেপ করে যে সত্য অভিব্যক্ত হবে তার সঠিক ধারায়, বিশিষ্ট সুর হিসেবে বাজাতে থাকে অনুভূতি ও ক্রিয়ার মধ্যে সেই সব সতত উপাদানের পুনরাবৃত্তি যা সব সামঞ্জস্য গঠনের পক্ষে প্রয়োজনীয়। ঐ মননের একটা শৃঙ্খলা আছে, সঙ্কল্পের এক নিয়মিত চক্র আছে, গতিতে স্থিরতা আছে। সেই সঙ্গে এর স্বাধীনতা একে অভ্যস্ত ক্রিয়াচক্রে — যা নাকি চিন্তার সীমিত ভাণ্ডারের চারিদিকে সর্বদা যন্ত্রের মতো পুনঃপুনঃ আসতে থাকে — বাঁধা পড়তে দেয় না। অভ্যাসগত মন যেমন চিন্তার কোন একটি নির্দিষ্ট অভ্যস্ত ছাঁচকে ভিত্তি ক'রে

তার মধ্যে সকল নতুন মনন ও অনুভূতিকে আত্মসাৎ করে এ তা করে না। যে ভিত্তি এর উদ্দেশ তা ঊর্ধ্বে, "উপরি বুধ্নে", আত্মার বৃহত্ত্বের মধ্যে অতিমানসিক সত্যের পরম প্রতিষ্ঠার মধ্যে, "বুধ্নে ঋতস্য"। এর মননের শৃঙ্খলা, সঙ্কল্পের নিয়মিত চক্র, অচঞ্চল ক্রিয়ার গতি, যন্ত্রের বা প্রথার কাঠিন্যে পরিণত হয় না, পরন্তু এ সর্বদাই আন্তরভাবে সজীব থাকে, অন্য সহবর্তী বা সম্ভবপর শৃঙ্খলা ও চক্রকে বাদ দিয়ে বা তাদের সঙ্গে বিরোধ করে বাস করে না, বরং যা সবের সঙ্গে এ সংস্পর্শে আসে তাদের কাছ থেকে পুষ্টি আহরণ করে এবং এর নিজস্ব তত্ত্বে আত্মসাৎ করে। এইরকম আধ্যাত্মিক আত্তীকরণ সম্ভব হয় কারণ সকল কিছুই উদ্দেশ করা হয় আত্মার বৃহত্ত্ব ও ঊর্ধ্বের মুক্ত দৃষ্টির দিকে। অতিমানসিক মনন ও সঙ্কল্পের শৃঙ্খলা সর্বদাই ঊর্ধ্ব থেকে নতুন আলো ও শক্তি পাচ্ছে এবং তার গতির মধ্যে তা নিতে তার কোন অসুবিধা থাকে না: অনন্তের শৃঙ্খলার পক্ষে যেমন উপযুক্ত তেমন এ তার গতির স্থিরতার মধ্যে অবর্ণনীয়ভাবে সাবলীল ও নমনীয়, সকল বিষয়ের সম্বন্ধ একের মধ্যে দেখতে ও পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করতে সমর্থ, আর সমর্থ অনন্তের স্বরূপ উত্তরোত্তর বেশী পরিমাণে প্রকাশ করতে এবং পূর্ণতম অবস্থায় এ অনন্তের যা সব বাস্তবিকই প্রকাশযোগ্য তা সব নিজের ভঙ্গিতে প্রকাশ করতে সমর্থ।

সেজন্য, অতিমানসিক জটিল গতির মধ্যে কোন বিরোধ, অসঙ্গতি বা সামঞ্জস্য স্থাপনের অসুবিধা থাকে না, বরং জটিলতার মধ্যে থাকে সরলতা, বহুমুখী প্রাচুর্যের মধ্যে থাকে নিশ্চিত স্বাচ্ছন্দ্য, আর তা আসে চিৎপুরুষের আত্মজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত নিশ্চয়তা ও সমগ্রতা থেকে। মন থেকে অতিমানসে রূপান্তরের কাজে বাধা, অন্তর্সংঘর্ষ, অসঙ্গতি, বিঘ্ন, বিভিন্ন অংশ ও গতিবৃত্তির বৈষম্য ততদিন বর্তমান থাকে যতদিন নির্মাণের নিজস্ব পদ্ধতির উপর আগ্রহী মনের ক্রিয়া, প্রভাব বা চাপ বর্তমান থাকে অথবা এক আদি অজ্ঞানতার ভিত্তির উপর জ্ঞান বা মনন ও ক্রিয়ার সঙ্কল্প নির্মাণের ধারা অতিমানসের সেই বিপরীত ধারাকে বাধা দেয় যাতে সব কিছু সংগঠিত হয় আত্মা এবং এর স্বগত ও শাশ্বত আত্মজ্ঞানের মধ্য থেকে দীপ্তিময় অভিব্যক্তি হিসেবে। এইভাবে অতিমানস চিৎপুরুষের তাদাত্ম্যজ্ঞানের প্রতিনিধিমূলক, ব্যাখ্যাকারী প্রকাশময়ভাবে অলঙ্ঘ্য শক্তি হিসেবে কার্য ক'রে, অনন্ত চেতনার আলোককে স্বচ্ছন্দ ও নিঃসীমভাবে ভাবসৎ-এর ধাতু ও রূপে পরিণত ক'রে, চিন্ময় সত্তার শক্তি ও ভাবসৎ-এর শক্তি থেকে সৃজন ক'রে, যে গতিবৃত্তি নিজের বিধান পালন করে অথচ অনন্তের সাবলীল ও নমনীয় গতিবৃত্তি তাকে স্থির করে, এ তার মনন ও জ্ঞান ও এমন এক সঙ্কল্পকে ব্যবহার করে যা ধাতুতে ও আলোকে সেই জ্ঞানের সঙ্গে অভিন্ন, যে জ্ঞান প্রতি অতিমানসিক জীবের মধ্যে তার নিজস্ব সঠিক ধারায় এক অদ্বিতীয় আত্মা ও চিৎপুরুষের অভিব্যক্তি সংঘটিত করে।

এই ভাবে গঠিত অতিমানসিক জ্ঞানের ক্রিয়া স্পষ্টতঃই মানসিক যুক্তিশক্তির ক্রিয়া অতিক্রম করে, আর আমাদের দেখতে হবে অতিমানসিক রূপান্তরে যুক্তিশক্তির স্থলে কি আসে? মানুষের চিন্তাশীল মন যুক্তিবুদ্ধি ও তর্কবুদ্ধির মধ্যেই পায় তার সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট ও বিশিষ্ট তৃপ্তি এবং সংগঠনী বিষয়ে তার সর্বাপেক্ষা সঠিক ও কার্যকরী তত্ত্ব। একথা

সত্য যে মানুষ তার মননে বা ক্রিয়ায় শুধু যুক্তিশক্তির দ্বারা সম্পূর্ণভাবে চালিত হয় না এবং হতেও পারে না। তার মানসিকতা অচ্ছেদ্যভাবে যুক্তিবুদ্ধি ও অন্য দুটি শক্তির সংযুক্ত, মিশ্রিত ও জটিল ক্রিয়ার অধীন; তন্মধ্যে একটি হল বোধি যা মানবমানসিকতার মাঝে বাস্তবিকই শুধু অর্ধ-দীপ্ত এবং কাজ করে যুক্তিশক্তির অধিকতর দৃশ্যমান ক্রিয়ার পশ্চাতে অথবা প্রচ্ছন্নভাবে ও পরিবর্তিত আকারে সাধারণ বুদ্ধির ক্রিয়ায়; অন্যটি হল ইন্দ্রিয়সংবিৎ, সহজসংস্কার, সংবেগের প্রাণ-মানস যা তার প্রকৃতিতে এক প্রকার অস্পষ্ট অন্তর্গূঢ় বোধি এবং নিম্ন থেকে বুদ্ধিকে তার প্রাথমিক সামগ্রী ও তথ্য সরবরাহ করে। আর এই শক্তিদুটির প্রত্যেকটি নিজ নিজ প্রকারে মন ও প্রাণের ভিতর কর্মরত চিৎপুরুষের এক অন্তরঙ্গ ক্রিয়া এবং যুক্তিবুদ্ধি অপেক্ষা আরো প্রত্যক্ষ ও স্বতঃস্ফূর্ত এবং অনুভব ও ক্রিয়ার জন্য আরো অব্যবহিত শক্তিসম্পন্ন। কিন্তু তবু এই শক্তিগুলির কোনটিই মানুষের জন্য তার মানসিক জীবন গঠনে সমর্থ নয়।

নিম্নসৃষ্টির মধ্যে প্রাণমানস যেমন স্বয়ংপূর্ণ ও প্রবলতম, মানুষের প্রাণমানস — এর বিভিন্ন সহজংস্কার ও সংবেগ — তেমন স্বয়ংপূর্ণ ও প্রবলতম নয় ও হতে পারে না। বুদ্ধি একে আয়ত্তে এনে গভীরভাবে পরিবর্তিত করেছে — এমনকি সেখানেও যেখানে বুদ্ধির বিকাশ অপূর্ণ এবং প্রাণমানস নিজেই তার শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে সব চেয়ে আগ্রহী। এর বোধিময় প্রকৃতির অধিকাংশই হারিয়ে গেছে, এখন অবশ্য সামগ্রী ও তথ্যসমূহের যোগানদার হিসেবে বহুগুণ সমৃদ্ধ, কিন্তু আর এ সম্পূর্ণ নিজে নয় বা তার ক্রিয়ায় স্বচ্ছন্দময় নয় কারণ এ অর্ধ-যুক্তিগত, অন্ততঃপক্ষে যুক্তিবুদ্ধি বা বুদ্ধিগত ক্রিয়ার কিছু অন্তঃসঞ্চারিত উপাদানের উপর নির্ভরশীল — তা এই উপাদান যতই অস্পষ্ট হ'ক না কেন এবং বুদ্ধির সাহায্য বিনা সফলভাবে কাজ করতে অসমর্থ। যে অবচেতনার মধ্য থেকে এর আবির্ভাব সেখানেই এর মূল ও সুষ্ঠুতার স্থান, আর মানুষের কাজ হল উত্তরোত্তর আরো সচেতন জ্ঞান ও ক্রিয়ার অর্থে বৃদ্ধি পাওয়া। যদি মানুষ প্রাণমানসের দ্বারা তার সত্তার শাসনে ফিরে যায় তা হলে সে হয় অযৌক্তিক ও অব্যবস্থিত অথবা বুদ্ধিহীন ও অশক্ত হয়ে পড়ে এবং মানবত্বের বিশিষ্ট প্রকৃতি হারায়।

অপরপক্ষে বোধির মূল ও সুষ্ঠুতার স্থান হল অতিমানসে যা এখন আমাদের কাছে অতিচেতন, আর মনে এর কোন শুদ্ধ ও কোন সুব্যবস্থিত ক্রিয়া থাকে না, বরং যুক্তিবুদ্ধির ক্রিয়ার সঙ্গে অব্যবহিতভাবে মিশে যায়, এ সম্পূর্ণভাবে নিজ নয়, বরং সীমিত, খণ্ডাত্মক, মিশ্রিত ও অশুদ্ধ এবং এ নিজের বিভিন্ন আভাসনের সুশৃঙ্খল ব্যবহার ও সংগঠনের জন্য নির্ভর করে ন্যায়সম্মত যুক্তির উপর। মানব মন কখনই তার সব বোধি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয় না যতদিন না সেগুলিকে যুক্তিবুদ্ধির বিচারে দেখা ও সমর্থন করা হয়: এইখানেই সে নিজেকে মনে করে সবচেয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত ও নিশ্চিন্ত। মানব তার মনন ও প্রাণকে বোধিমানসের দ্বারা গঠন করার জন্য যুক্তিশক্তিকে অতিক্রম করার অর্থ হল সে ইতিমধ্যেই তার মানবত্বের বৈশিষ্ট্য অতিক্রম ক'রে অতিমানবত্ব বিকাশের দিকে অগ্রসর হয়েছে। এই কাজ শুধু ঊর্ধ্বেই করা সম্ভব: কারণ তা নিম্নে

করার প্রয়াসের অর্থ শুধু অপর এক প্রকার অপূর্ণতা সাধন: এখানে মানসিক যুক্তিশক্তি এক প্রয়োজনীয় বিষয়।

যুক্তিবুদ্ধি একটি মধ্যবর্তী কার্যসাধক, এর একদিকে প্রাণমানস ও অন্যদিকে অতিমানসিক বোধি যা এখনো অবিকশিত। এর কাজ মধ্যস্থের কাজ, একদিকে প্রাণমানসকে আলোকিত করা, চেতনাপূর্ণ করা এবং যতদূর সম্ভব তার কার্যকে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করা যতদিন না প্রকৃতি সেই অতিমানসিক শক্তিকে বিকশিত করতে প্রস্তুত হয় যা প্রাণকে আয়ত্তে এনে তার কামনা, ভাবাবেগ, ইন্দ্রিয়সংবিৎ ও ক্রিয়ার সব বিভিন্ন অস্পষ্ট বোধিজ গতিকে আত্মা ও চিৎপুরুষের আধ্যাত্মিকতায় ও প্রদীপ্তভাবে স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণিক অভিব্যক্তিতে রূপান্তরিত ক'রে তার সকল গতিবৃত্তিকে দীপ্ত ও সুষ্ঠু করবে। অপর উচ্চদিকে এর ব্রত হল উপর থেকে আসা আলোর রশ্মিগুলি নিয়ে সেগুলিকে বুদ্ধিময় মানসিকতার সংজ্ঞায় পরিণত করা এবং যে বোধিগুলি আগড় এড়িয়ে অতিচেতনা থেকে মনে অবতরণ করে সেগুলিকে নিয়ে পরীক্ষা করা, বিকশিত করা, বুদ্ধিগতভাবে কাজে লাগান। এই কাজ এ করে যতদিন না মানব নিজ ও তার পরিবেশ ও তার সত্তা সম্বন্ধে উত্তরোত্তর সচেতন হয়ে আরো বোঝে যে যুক্তিশক্তির দ্বারা সে এই সব বিষয় জানতে বাস্তবিকই অক্ষম, সে শুধু সক্ষম বুদ্ধির কাছে তাদের এক মানসিক প্রতিরূপ নির্মাণ করতে।

কিন্তু বুদ্ধিপ্রধান মানবের মাঝে যুক্তিশক্তির ঝোঁক হল তার শক্তি ও বৃত্তিকে উপেক্ষা করা; এর চেষ্টা হল করণ ও কার্যসাধক না হয়ে বরং আত্মা ও চিৎপুরুষের স্থলাভিষিক্ত হওয়া। সাফল্য ও প্রাধান্য দ্বারা, তার নিজের আলোর অপেক্ষাকৃত মহত্ত্বের দ্বারা এ নিজেকে মনে করে এক প্রধান ও অনন্যনির্ভরশীল কিছু, নিজের সম্পূর্ণ সত্যতা ও পর্যাপ্ততা সম্বন্ধে নিশ্চিত এবং মন ও প্রাণের একচ্ছত্র শাসক হবার প্রয়াসী। কিন্তু এই কাজে এ সম্পূর্ণ সফল হয় না কারণ এ তার নিজের প্রকৃত ধাতু ও অস্তিত্বের জন্য সে নির্ভর করে নিম্ন প্রাণ বোধির উপর এবং গূঢ় অতিমানস ও তার বোধিজ সব বার্তার উপর। এ শুধু পারে নিজের কাছে নিজেকে সফল দেখতে কারণ এ তার সব অভিজ্ঞতাকেই পরিণত করে যৌক্তিক সূত্রসমূহে এবং মনন ও ক্রিয়ার পশ্চাতে তাদের যে প্রকৃত স্বরূপ আছে তার অর্ধেকের দিকে ও তার অতীত অসংখ্য তত্ত্বের দিকে চোখ বুজে থাকে। যুক্তিশক্তির আধিক্য জীবনকে শুধু ক'রে তোলে কৃত্রিম ও যুক্তিসম্মতভাবে যান্ত্রিক, তার স্বতঃস্ফূর্তি ও জীবনীশক্তি নষ্ট করে এবং চিৎপুরুষের স্বাধীনতা ও প্রসার রোধ করে। সীমিত ও পরিসীমক যুক্তিশক্তির পক্ষে প্রয়োজন হল নিজেকে পরিবর্তনযোগ্য ও নমনীয় করা, নিজের উৎসের দিকে নিজেকে উন্মুক্ত করা, উপর থেকে আলো নেওয়া, আর নিজেকে অতিক্রম ক'রে রূপান্তরের সহজ হনন-প্রণালীর সহায়ে অতিমানসিক যুক্তিশক্তির ক্ষেত্রে উত্তরিত হওয়া। ইতিমধ্যে একে সামর্থ্য ও নেতৃত্ব দেওয়া হয় যাতে এ বিশিষ্ট মানবীয় স্তরে মনন ও ক্রিয়া সংগঠন করতে পারে। এই মানবীয় স্তর একটি মধ্যবর্তী অবস্থা যার একদিকে আছে চিৎপুরুষের পশুজীবন

নিয়ন্ত্রণকারী সামর্থ্য ও অন্যদিকে আছে চিৎপুরুষের অতিচেতন সামর্থ্য যা সচেতন হয়ে সংগঠন করতে পারে আধ্যাত্মিক অতিমানবত্বের অস্তিত্ব ও জীবন।

পূর্ণ অবস্থায় যুক্তিশক্তির বিশিষ্ট শক্তি হল এমন এক তর্কসম্মত ক্রিয়া যা পর্যবেক্ষণ ও বিন্যাসের দ্বারা সকল প্রাপ্য সামগ্রী ও তথ্য সম্বন্ধে প্রথমে নিজেকে নিশ্চিত করে, পরে এইভাবে লব্ধ জ্ঞানকে সব বিবেচনাশক্তির প্রাথমিক ব্যবহার দ্বারা নিশ্চিত ও প্রসারিত করে এবং সর্বশেষ এর সব ফলের সঠিকতা সম্বন্ধে এমন এক আরো সযত্ন ও প্রণালীসম্মত ক্রিয়ার দ্বারা নিজেকে নিশ্চিত করে যা আরো সাবধানী, সুচিন্তিত, কঠোরভাবে তর্কসম্মত এবং বিবেচনা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা বিকশিত কতকগুলি দৃঢ় মান ও প্রণালী অনুসারে সেগুলিকে পরীক্ষা, বর্জন বা সমর্থন করে। সুতরাং তর্কসম্মত যুক্তিশক্তির প্রথম কাজ হল লভ্য সামগ্রী ও তথ্যগুলির সঠিক, সতর্ক ও সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণ। আমাদের জ্ঞানের কাছে তথ্যসমূহের প্রথম ও সর্বাপেক্ষা সহজ ক্ষেত্র হল প্রাকৃতিক জগৎ অর্থাৎ ভৌতিক পদার্থের জগৎ যা মনের বিভক্ত ক্রিয়ার দ্বারা জ্ঞানের বাইরে করা হয়েছে; এই বিষয়গুলি আমরা নই, সুতরাং সেগুলি শুধু পরোক্ষভাবে জানা যায় আমাদের ইন্দ্রিয়-অনুভবের ব্যাখ্যার দ্বারা, পর্যবেক্ষণ, সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, অনুমান ও বিবেচনাপূর্ণ চিন্তার দ্বারা। অপর একটি ক্ষেত্র হল আমাদের নিজেদের আন্তর সত্তা ও এর সব গতিবৃত্তি যেগুলি স্বাভাবিকভাবেই জানা যায় আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ারত মানসিক বোধের দ্বারা, বোধিময় অনুভব ও সতত অনুভূতির দ্বারা এবং আমাদের প্রকৃতির সব সাক্ষ্যের উপর বিবেচনাপূর্ণ মননের দ্বারা। এমনকি এই সব আন্তর গতিবৃত্তি সম্বন্ধেও যুক্তিশক্তি নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ও সে সবকে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিকভাবে ও পৃথক বস্তু হিসেবে বিবেচনা করলে সবচেয়ে ভাল কাজ করে ও তাদের সর্বাপেক্ষা সঠিকভাবে জানে। জ্ঞানযোগে এই প্রক্রিয়ার দ্বারা পরিণামে আমরা আমাদের সক্রিয় সত্তাকেও অনাত্ম বলে দেখি, দেখি যে এ জগৎ-অস্তিত্বের অবশিষ্টাংশের মতো প্রকৃতির এক যন্ত্রবিশেষ। অন্যান্য চিন্তাশীল ও সচেতন সত্তা সম্বন্ধে জ্ঞান এই দুই ক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত, কিন্তু এও পাওয়া যায় পরোক্ষভাবে — পর্যবেক্ষণ দ্বারা, অভিজ্ঞতার দ্বারা, যোগাযোগের নানাবিধ প্রণালী দ্বারা এবং এদের উপর নির্ভর ক'রে আমাদের আপন প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের সঙ্গে সাদৃশ্যের উপর বহুল পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত বিবেচনা ও অনুমানের দ্বারা। অন্য যে একটি তথ্যের ক্ষেত্র যুক্তিশক্তির পর্যবেক্ষণ করা দরকার তা হল তার নিজের ক্রিয়া এবং সমস্ত মানবীয় বুদ্ধির ক্রিয়া, কারণ এইরূপ পর্যালোচনা ব্যতীত এ নিজের জ্ঞানের যাথার্থ্য সম্বন্ধে অথবা সঠিক পদ্ধতি ও প্রণালী সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারে না। সর্বশেষ, জ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রও আছে যেগুলির জন্য তথ্যসমূহ তত সহজে পাওয়া যায় না এবং যেগুলির জন্য অসাধারণ সব শক্তির বিকাশ দরকার — ভৌতিক জগতের অবভাসের পশ্চাতে বিভিন্ন বিষয়ের ও অস্তিত্বের বিভিন্ন স্তরের আবিষ্কার এবং গূঢ় আত্মার অথবা মানবসত্তার ও প্রকৃতির তত্ত্বের আবিষ্কার। ঠিক যেমন ভৌতিক জগতের বেলায়, তেমন প্রথম কাজটির সম্বন্ধে তর্কগত যুক্তিশক্তি

পরীক্ষাসাপেক্ষে সকল লভ্য তথ্য গ্রহণ ক'রে কাজটি করার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ এ এই সব নিয়ে কারবার করতে অনিচ্ছুক, কারণ এ দেখে এইগুলিকে সন্দেহ ও অস্বীকার করাই আরো সহজ, আর এই ক্ষেত্রে এর কাজ কচিৎ নিশ্চিত বা সফল হয়। দ্বিতীয়টি আবিষ্কার করার প্রয়াসের জন্য সাধারণতঃ তার উপায় হল গঠনমূলক দার্শনিক তর্ক যার প্রতিষ্ঠা হল প্রাণ, মন ও জড়বিষয়ক ব্যাপারের বিশ্লেষণাত্মক ও সংশ্লেষণাত্মক পর্যবেক্ষণ।

এই সকল তথ্যের ক্ষেত্রে তর্কগত যুক্তিশক্তির কার্যপ্রণালী একই। প্রথমে বুদ্ধি পর্যবেক্ষণ, সহচার, প্রত্যক্ষবোধ, স্বীকৃতভাব, প্রত্যয়ের একটি ভাণ্ডার সঞ্চয় করে, বিভিন্ন সম্বন্ধ ও বিষয়গুলিকে তাদের সাদৃশ্য ও বৈষম্য অনুসারে কমবেশী স্পষ্টভাবে সাজায় ও শ্রেণীবিভাগ করে এবং বিভিন্ন ভাব, স্মৃতি, কল্পনা, সিদ্ধান্তের সঞ্চয়মান ভাণ্ডারও সতত বৃদ্ধির দ্বারা তাদের নিয়ে কাজ করে; মুখ্যতঃ এইগুলি নিয়েই আমাদের জ্ঞানের ক্রিয়ার স্বরূপ। নিজের বেগভারে অগ্রসরমান মনের এই বুদ্ধিগত ক্রিয়ার একপ্রকার স্বাভাবিক বিস্তার হয়; এ হল এমন এক বিকাশ যা সচেতন উৎকর্ষের উত্তরোত্তর সাহায্যে পুষ্ট, উৎকর্ষের দ্বারা লব্ধ বিভিন্ন শক্তির শক্তিবৃদ্ধি যা আবার ক্রমে আরো স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হবার সাথে স্বভাবের এক অঙ্গে পরিণত হয়; এর ফলে এক অগ্রসরতা আসে, তবে তা বুদ্ধির বৈশিষ্ট্য ও মূল শক্তির নয়, এ হল তার শক্তির মাত্রার, নমনীয়তার, সামর্থ্যের বৈচিত্র্যের সূক্ষ্মতার অগ্রসরতা। বিভিন্ন ভ্রমের সংশোধন হয়, নিশ্চিত ভাব ও সিদ্ধান্ত সঞ্চিত হয় আর গৃহীত বা গঠিত হয় নতুন জ্ঞান। সেই সাথে বুদ্ধির এমন এক আরো যথার্থ ও নিশ্চিত ক্রিয়ার আবশ্যকতার উদয় হয় যা বুদ্ধির এই সাধারণ পদ্ধতির অগভীরতা থেকে মুক্ত হয়ে প্রতি পদক্ষেপ পরীক্ষা করবে, কঠোরভাবে প্রতি সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য বিচার করবে এবং মনের ক্রিয়াকে পরিণত করবে এক সুপ্রতিষ্ঠিত প্রণালী ও শৃঙ্খলাতে।

এই ক্রিয়ায় তর্কগত মনের বিকাশ হয় এবং বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও শক্তি পরাকাষ্ঠায় ওঠে। অপেক্ষাকৃত স্থূল ও উপরভাসা পর্যবেক্ষণের স্থলে বা এর পরিপূরক হিসেবে আসে পদার্থের গঠনকারী বা এর সঙ্গে সম্পর্কিত সকল প্রণালী, গুণ উপাদান, শক্তির পরীক্ষামূলক বিশ্লেষণ এবং সমগ্রভাবে এর এমন এক সংশ্লেষণাত্মক রচনা যা এর সম্বন্ধে মনের স্বাভাবিক প্রতীতির সঙ্গে যুক্ত হয় বা অনেকাংশে এর স্থান নেয়। অন্য সব পদার্থ থেকে পদার্থটির পার্থক্য আরো সঠিকভাবে নির্দিষ্ট হয় এবং সেই সাথে অন্যদের সঙ্গে এর বিভিন্ন সম্বন্ধ আরো সম্পূর্ণভাবে জানা যায়। তাদের মধ্যে একরূপত্ব বা সাদৃশ্য ও সজাতিত্ব, আবার বৈষম্য ও বিভেদগুলিও স্থির করা হয়, যার ফলে একদিকে আসে সত্তা ও বিশ্বপ্রকৃতির মূলগত ঐক্যের এবং তাদের বিভিন্ন প্রণালীর সাদৃশ্য ও অনুবৃত্তির অনুভব এবং অপরদিকে আসে প্রাণী ও পদার্থসমূহের বিভিন্ন শক্তি ও প্রকারের স্পষ্ট নির্ধারণ ও শ্রেণীভাগ। তর্কগত বুদ্ধির পক্ষে যতদূর সম্ভব ততদূর জ্ঞানের সামগ্রী ও তথ্যসমূহের সংগ্রহ ও বিন্যাসকে পরাকাষ্ঠায় আনা হয়।

মনের অতীত পর্যবেক্ষণগুলি রক্ষা করার জন্য স্মৃতি অপরিহার্য সহায় — শুধু ব্যষ্টির স্মৃতি নয়, জাতিরও স্মৃতি তা সঞ্চিত কাগজপত্রের মধ্যে কৃত্রিমরূপে থাকুক বা সাধারণ জাতিস্মৃতি হ'ক যা এক প্রকার সতত পুনরাবৃত্তি বা নবীকরণের মাধ্যমে তার ফলগুলি রক্ষা করে; এই জাতিস্মৃতির বিষয়টি তেমন সমাদৃত না হলেও এটি এক সুপ্ত স্মৃতি যা নানাবিধ উদ্দীপকের চাপে সমৃদ্ধতর তথ্য ও বুদ্ধির দ্বারা বিচারের জন্য নতুন অবস্থার মধ্যে জ্ঞানের অতীত ক্রিয়াগুলি পুনরাবৃত্তি করতে সক্ষম। বিকশিত তর্কগত মন মানবস্মৃতির ক্রিয়া ও সম্পদগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে তার সামগ্রীগুলিকে সবচেয়ে কাজে লাগাবার জন্য শিক্ষা দেয়। স্বভাবতঃই মানববিচার এই সামগ্রীগুলির উপর দুই প্রণালীতে কাজ করে, যথা, প্রথমতঃ নিরীক্ষণ, অনুমান, সৃজনমূলক বা সমালোচনামূলক সিদ্ধান্ত, অন্তর্দৃষ্টি, অব্যবহিত ভাবনার কমবেশী দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত সমবায় — এ হল প্রধানতঃ মনের এক চেষ্টা যেন সে সোজাসুজি স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করতে সক্ষম হয়, যে কাজ শুধু বোধির উচ্চতর শক্তির দ্বারাই নিরাপদভাবে করা যায় কারণ এই প্রণালী মনের মধ্যে অনেক মিথ্যা বিশ্বাস ও নির্ভরতার অযোগ্য নিশ্চয়তা আনে; দ্বিতীয়তঃ আরো এক মন্থর প্রণালী যা পরিণামে বুদ্ধিগতভাবে আরো নিশ্চিত অন্বেষণ, বিবেচনা ও সিদ্ধান্তের পরীক্ষা এবং এইগুলো বিকশিত হয় সতর্ক বুদ্ধিগত ক্রিয়ায়।

স্মৃতি ও বিচারশক্তি — উভয়ই সাহায্য পায় কল্পনাশক্তি থেকে। কল্পনাশক্তি জ্ঞানের বৃত্তি হিসেবে এমন সব সম্ভাবনার আভাস দেয় যেগুলি অন্যান্য শক্তি উপস্থাপনা বা সমর্থন করে না; এ দৃষ্টির নতুন পথের দুয়ার উন্মুক্ত করে। বিকশিত তর্কগত বুদ্ধি কল্পনাশক্তিকে ব্যবহার করে নতুন আবিষ্কার ও প্রকল্পের আভাসনের জন্য কিন্তু সতর্ক থাকে যেন আভাসনগুলি নিরীক্ষণ ও সংশয়শীল বা অতি সূক্ষ্ম বিচারের দ্বারা পূর্ণভাবে পরীক্ষিত হয়। আবার এ চায় যেন বিচারেরও সকল কাজ যথাসম্ভব পরীক্ষা করা হ'ক; এ অতি দ্রুত-অনুমান পরিহার ক'রে অবরোহ ও আরোহক্রমের সুব্যবস্থিত পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং এর সকল পদক্ষেপ সম্বন্ধে ও সিদ্ধান্তগুলির যুক্তিযুক্ততা, অনুবৃত্তি, সুসঙ্গতি ও দৃঢ়তা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়। অতিমাত্রায় নিয়মনিষ্ঠ তর্কগত মন নিরুৎসাহ করে বিশেষ তাৎক্ষণিক অন্তর্দৃষ্টির ক্রিয়া, যেটা নাকি মনের পক্ষে উচ্চতর বোধির সর্বাপেক্ষা নিকট; কিন্তু তর্কগত বুদ্ধির সমগ্র ক্রিয়ার স্বচ্ছন্দ ব্যবহার বরঞ্চ এই অন্তর্দৃষ্টির ক্রিয়াকেই বর্ধিত করে, যদিও তার ওপর এর নিরঙ্কুশ আস্থা নেই। তর্কগত যুক্তিশক্তির চেষ্টা হল সতত অনাসক্ত, নিঃস্বার্থ ও সুপ্রতিষ্ঠিত পদ্ধতির দ্বারা প্রমাদ, পূর্বসিদ্ধান্ত ও মনের মিথ্যা বিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে নির্ভরযোগ্য নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।

মনের এই যে বিস্তৃত পদ্ধতি যার জন্য এত শ্রম প্রয়োজন, এ সত্যের জন্য যদি সত্যই পর্যাপ্ত হ'ত, তাহলে জ্ঞানের বিকাশের পথে অন্য কোন উচ্চতর সোপানের আবশ্যকতা হ'ত না। বস্তুতঃ এতে মনের নিজের উপর ও নিজের চারিদিককার জগতের উপর প্রভুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং এমন অনেক মহৎ উপকার সাধিত হয় যা অস্বীকার করা যায় না: কিন্তু এ কখনই নিশ্চিত হতে পারে না যে এর তথ্যগুলি তাকে প্রকৃত জ্ঞানের

আকার দেয় কিনা, না শুধু এমন এক আকার দেয় যা মানবমন ও সঙ্কল্পের ক্রিয়ার বর্তমান রূপের পক্ষে উপকারী ও প্রয়োজনীয়। এটা উত্তরোত্তর উপলব্ধি হয় যে বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান বৃদ্ধি পায় কিন্তু এই ভ্রমসঙ্কুল পদ্ধতিতে সত্যের জ্ঞান আসে না। একটা সময় আসতে বাধ্য, ইতিমধ্যেই আসতে আরম্ভ করেছে, — যখন মন উপলব্ধি করে যে তার সাহায্যে বোধিকে এবং এই কথাটি সম্বন্ধে আমাদের অস্পষ্ট প্রয়োগের ও তার তাৎপর্য সম্বন্ধে অনিশ্চিত উপলব্ধির পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন বিভিন্ন শক্তির বিস্তৃত স্তরকে ডাকার ও পূর্ণভাবে বিকশিত করার প্রয়োজন আছে। পরিশেষে এ জানতে বাধ্য যে এই শক্তিগুলি শুধু যে মনের বিশিষ্ট ক্রিয়াকে সাহায্য ও সম্পূর্ণ করে তা নয়, বরং এমনকি এর স্থলাভিষিক্ত হয়। তা-ই হবে চিৎপুরুষের অতিমানসিক শক্তি আবিষ্কারের প্রারম্ভ।

আমরা যেমন দেখেছি, অতিমানস মানসিক চেতনার ক্রিয়াকে বোধির দিকে ও ভিতরে উন্নীত ক'রে, এমন এক মধ্যবর্তী বোধিমানসিকতা সৃষ্টি করে যা নিজে অপর্যাপ্ত হলেও তর্কগত বুদ্ধি অপেক্ষা শক্তিতে বড় এবং তারপর একেও উন্নীত ও রূপান্তরিত করে প্রকৃত অতিমানসিক ক্রিয়ায়। আরোহক্রমে অতিমানসের প্রথম সুসংহত ক্রিয়া হল অতিমানসিক যুক্তিশক্তি — যা উচ্চতর তর্কগত ধীশক্তি নয়, তবে নিবিড়ভাবে প্রত্যক্‌বৃত্ত ও নিবিড়ভাবে পরাক্‌বৃত্ত জ্ঞানের সোজাসুজি দীপ্ত সংগঠন, পরতরা "বুদ্ধি", তর্কগত অথবা বরং শব্দব্রহ্মাত্মক বিজ্ঞান। অতিমানসিক যুক্তিশক্তি যুক্তিবুদ্ধির সকল কাজই করে এবং আরো অনেক কিছু করে, তবে এ সবই করে মহত্তরা শক্তি নিয়ে ও অন্যবিধ প্রকারে। তারপর একেও নেওয়া হয় জ্ঞানশক্তির উচ্চতর স্তরে, আর সেখানেও কিছু নষ্ট হয় না, বরং সব কিছুই আরো উন্নত হয়, তাদের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়, কার্যের শক্তি রূপান্তরিত হয়।

বুদ্ধির সাধারণ ভাষা এই ক্রিয়ার বিবরণ দিতে পর্যাপ্ত নয়, কারণ একই শব্দাবলী ব্যবহার করতে হবে, তাতে কিছু মিল বোঝাবে অথচ বাস্তবিকই সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি বিষয়ের অর্থ অপূর্ণভাবে বোঝাবার জন্য। যেমন অতিমানস এক প্রকার ইন্দ্রিয়ক্রিয়া ব্যবহার করে যা স্থূল অঙ্গসকল নিয়োগ করে, কিন্তু তাদের দ্বারা সীমিত হয় না, যা স্বরূপতঃ রূপচেতনা ও স্পর্শচেতনা, কিন্তু ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে মানসিক ভাবনা ও অনুভূতি এই অতিমানসিকভাবাপন্ন ইন্দ্রিয়চেতনার মৌলিক ও বিশিষ্ট ক্রিয়ার কোন প্রতীতি দিতে অক্ষম। অতিমানসিক ক্রিয়ার ভাবনা মানসিকবুদ্ধির ভাবনা থেকে ভিন্ন এক বিষয়। অতিমানসিক চিন্তনকে মূলে অনুভব করা হয় যে এ হল জ্ঞাত বিষয়ের সত্তার ধাতুর সঙ্গে জ্ঞাতার সত্তার ধাতুর সংস্পর্শ বা মিলন বা তাদাত্ম্যতা, আর এর ভাবনার আকার এমন যাতে মিলন বা একত্বের মাধ্যমে আত্মার জ্ঞানশক্তি বিষয়টির আধেয়, ক্রিয়া, তাৎপর্যের এক জ্ঞানরূপ প্রকাশ করে কারণ এ তার মধ্যেই এই সব বহন করে। সুতরাং অতিমানসের মধ্যে নিরীক্ষণ, স্মৃতি, বিচারেরও প্রত্যেকটির অর্থ মানসিক বুদ্ধির ধারায় এর যে অর্থ তা থেকে ভিন্ন।

বুদ্ধি যা নিরীক্ষণ করে অতিমানসিক যুক্তিশক্তি সেই সবই নিরীক্ষণ করে এবং

আরো বেশী নিরীক্ষণ করে; অর্থাৎ এ জ্ঞেয় বিষয়টিকে বোধক্রিয়ার ক্ষেত্র করে, একে এক প্রকারে পরাক্‌বৃত্ত করে যাতে এর স্বরূপ, স্বভাব, গুণ ও ক্রিয়া বাইরে আসে। কিন্তু এ সেই কৃত্রিম পরাক্‌বৃত্ততা নয় যার দ্বারা যুক্তিশক্তি তার নিরীক্ষণের কাজে ব্যক্তিগত বা প্রত্যক্‌বৃত্ত প্রমাদ দূর করতে চেষ্টা করে। অতিমানস সব কিছু দেখে আত্মার মধ্যে, সুতরাং এর নিরীক্ষণ প্রত্যক্‌বৃত্তভাবে পরাক্‌বৃত্ত হতে বাধ্য; আমরা আমাদের আন্তর ক্রিয়াগুলি যেমন জ্ঞানের বিষয় বলে দেখি, এই নিরীক্ষণ ঠিক সেই রকম না হলেও অনেকটা তার কাছাকাছি। এ যে দেখে তা বিভক্তভাবে ব্যক্তিগত আত্মার বা তার শক্তির দ্বারা নয়, সুতরাং একে ব্যক্তিগত প্রমাদের বিষয় সম্বন্ধে সতর্ক হতে হবে না: এই বিষয়টি ব্যাঘাত দেয় শুধু ততক্ষণ যতক্ষণ মানসিক তল বা পরিবেষ্টনকারী বাতাবরণ থাকে এবং তখনো তার প্রভাব ভিতরে ফেলতে পারে, অথবা ততক্ষণ যতক্ষণ অতিমানস মনের মধ্যে নেমে তাকে পরিবর্তন করার জন্য সক্রিয় রয়েছে। আর প্রমাদ সম্বন্ধে অতিমানসিক পদ্ধতি হল একে বাদ দেওয়া তবে অন্য কোন কৌশলে নয়, অতিমানসিক বিবেচনার বর্ধিষ্ণু স্বতঃস্ফূর্ততার দ্বারা ও নিজের শক্তির সতত উন্নয়নের দ্বারা। অতিমানসের চেতনা হল বিশ্বচেতনা এবং যে বিশ্বচেতনার আত্মার মধ্যে ব্যষ্টি জ্ঞাতার বাস ও যার সঙ্গে সে কমবেশী নিবিড়ভাবে যুক্ত, তার মধ্যেই এ জ্ঞানের বিষয়টিকে তার সম্মুখে ধরে।

নিরীক্ষণের ব্যাপারে জ্ঞাতা এক দ্রষ্টা, কিন্তু এই সম্পর্ক থেকে মনে হয় যেন একটি "অন্য"-ভাব ও প্রভেদ আছে কিন্তু আসল কথা এই যে বাহ্য বিষয়ের মানসিক দর্শনের মতো, এতে সম্পূর্ণ বিভক্ত প্রভেদ থাকে না এবং দৃষ্ট বিষয়টি সম্পূর্ণ অনাত্ম বলে কোন ব্যাবর্তক ভাবনা আসে না। জ্ঞাত বিষয়টির সঙ্গে সর্বদাই একত্বের এক মৌলিক অনুভূতি থাকে কারণ এই একত্ব বিনা কোন অতিমানসিক জ্ঞান সম্ভবপর নয়। জ্ঞাতা বিষয়টিকে তার চেতনার বিশ্বভাবাপন্ন আত্মার মধ্যে নেয় যেন এ তার সাক্ষীদৃষ্টির কেন্দ্রস্থানের সম্মুখে ধৃত এক বিষয় এবং এইভাবে একে তার বৃহত্তর সত্তার অন্তর্ভুক্ত করে। অতিমানসিক নিরীক্ষণ হল বিষয়সমূহের নিরীক্ষণ যাদের সঙ্গে আমরা সত্তার ও চেতনার মধ্যে এক এবং যাদের আমরা ঐ একত্বের বলে জানতে সমর্থ হই যেমন আমরা আমাদের নিজেদের জানি: নিরীক্ষণের ক্রিয়া হল এই সুপ্ত জ্ঞানকে বাইরে আনার এক ক্রিয়া।

তাহলে, সর্বপ্রথম, চেতনার এক মৌলিক ঐক্য থাকে যার শক্তি সব অতিমানসিক স্তরের মধ্যে আমাদের জীবনধারণ, অনুভব ও দেখার প্রগতি, ও উচ্চতা ও গভীরতা অনুযায়ী কম বা বেশী এবং যা তদনুযায়ী কম বা বেশী সম্পূর্ণভাবে এবং অব্যবহিতভাবে তার জ্ঞানসামগ্রীসমূহের প্রকাশক। এই মৌলিক ঐক্যের ফলে জ্ঞাতা ও বিজ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে সচেতন সংযোগের এক স্রোতধারা বা সেতু স্থাপিত হয় — যতই অপূর্ণ হ'ক, এরকম উপমার প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী — এবং এর ফল এমন এক সংস্পর্শ বা সক্রিয় মিলন যাতে জ্ঞাতা বিষয়টির মধ্যে বা সম্বন্ধে যা কিছু জানতে হবে তা

অতিমানসিকভাবে দেখতে, অনুভব করতে, ইন্দ্রিয়বোধ করতে সমর্থ হয়। কখনও কখনও সেই মুহূর্তে সংযোগের এই স্রোতধারা বা সেতু ইন্দ্রিয়গতভাবে অনুভূত হয় না, শুধু সংস্পর্শের ফলগুলি লক্ষ্য করা হয় কিন্তু এ সর্বদাই থাকে এবং এক পরবর্তী স্মৃতি আমাদের সর্বদাই জানাতে সমর্থ হয় যে এ সর্বসময় সত্যই উপস্থিত ছিল: যেমন আমরা অতিমানসিক অবস্থাতে উপচিত হই, তেমনি এ এক স্থায়ী অঙ্গে পরিণত হয়। যখন এই মৌলিক একত্ব সম্পূর্ণ সক্রিয় একত্ব হয়ে ওঠে, তখন আর সংযোগের এই স্রোতধারার বা সেতুর আবশ্যকতা থাকে না। যাকে পতঞ্জলি "সংযম" বলেন তার ভিত্তি এই ধারা। এই সংযম এক একাগ্রতা, চেতনার প্রেরণা বা অবস্থান, যার দ্বারা, পতঞ্জলি বলেন, জ্ঞাতা বিষয়ের মধ্যকার সব কিছু জানতে সমর্থ হয়। কিন্তু একাগ্রতার আবশ্যকতা কমে যায় বা থাকে না যখন সক্রিয় একত্বের উপচয় হয়; বিষয় ও তার সব আধেয়ের দীপ্ত চেতনা আরো স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাভাবিক ও সহজসাধ্য হয়ে ওঠে।

এই প্রকার অতিমানসিক নিরীক্ষণের তিনটি সম্ভবপর ক্রিয়া। প্রথমতঃ জ্ঞাতা চেতনায় নিজেকে বিষয়ের উপর প্রক্ষিপ্ত করতে পারে, অনুভব করতে পারে যে তার বোধ একে স্পর্শ বা আবৃত বা ভেদ করেছে এবং সেইখানে, যেন বিষয়টিরই মধ্যে তার কি জানবার আছে তা জানতে পারে। অথবা স্পর্শের দ্বারাই সে এর মধ্যকার বা আয়ত্তাধীন তথ্য জানতে পারে, যেমন উদাহরণতঃ, অপরের ভাবনা বা বেদনা এসে সে যেখানে তার সাক্ষী কেন্দ্রে দণ্ডায়মান সেখানে তার মধ্যে প্রবেশ করছে। আর না হয়, সে এই রকম কোন প্রক্ষেপ বা প্রবেশ বিনাই তার নিজের সাক্ষী-কেন্দ্রে এক প্রকার অতিমানসিকবোধ দ্বারা শুধু নিজের মধ্যে জানতে পারে। স্থূল বা অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে বিষয়টির উপস্থিতি এরকম নিরীক্ষণের আরম্ভ-বিন্দু বা এর আপতিক ভিত্তি হতে পারে কিন্তু অতিমানসের কাছে এ অপরিহার্য নয়। বরং এর পরিবর্তে বিষয়টির কোন আন্তর প্রতিরূপ বা শুধু তার ভাবনাই এইরকম প্রারম্ভবিন্দু বা ভিত্তি হতে পারে। শুধু জানবার ইচ্ছাই অতিমানসিক চেতনার কাছে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আনতে পারে — অথবা, হতে পারে জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞাত হবার কিংবা যোগাযোগ করার নিজ ইচ্ছাতেই তা সম্ভব।

তর্কগত বুদ্ধি যে বিশ্লেষণাত্মক নিরীক্ষণ ও সংশ্লেষণাত্মক রচনার বিস্তারিত শ্রমসাধ্য পদ্ধতি অবলম্বন করে তা অতিমানসের পদ্ধতি নয়, কিন্তু তবু অনুরূপ এক ক্রিয়া আছে। অতিমানস সরাসরি দৃষ্টির দ্বারাই, মানসিক পদ্ধতির মত টুকরো টুকরো না নিয়েই বিষয়টির বিভিন্ন বিশেষ তথ্য যেমন রূপ, শক্তি, ক্রিয়া, গুণ, মন, অন্তঃপুরুষ ইত্যাদি যাসব তার দৃষ্টিতে আসে তা পৃথক পৃথকভাবে জানে, আবার এ অনুরূপ সরাসরিভাবেই এবং রচনার কোন পদ্ধতি বিনাই এই বিশেষগুলি যে তাৎপর্যপূর্ণ সমগ্রতার গৌণ অঙ্গ তা দেখে। আবার এ বিষয়টি স্বরূপে যা তার সেই স্বভাবও দেখে যার অভিব্যক্তি হল সমগ্রতা ও বিভিন্ন বিশেষ। আবার এ স্বরূপ বা স্বভাব থেকে পৃথকভাবে অথবা তার মাধ্যমে এ যার মৌলিক অভিব্যক্তি — অখণ্ড আত্মা, অখণ্ড সন্মাত্র, চিৎ, সামর্থ্য, শক্তি তাও দেখে। সেই সময়ে এ শুধু বিশেষগুলিই দেখতে পারে, কিন্তু সমগ্রতাও সূচিত হয়,

আবার পাল্টাভাবে, সমগ্রতার দৃষ্টির সাথে বিশেষ সূচিত হয় যেমন উদাহরণস্বরূপ, — মনের সমগ্র অবস্থা যার থেকে কোন ভাবনা বা বেদনার উৎপত্তি হয় — আর বোধ যে কোন একটি থেকে শুরু ক'রে অব্যবহিত আভাসনের দ্বারা তখনই যেতে পারে সূচিত জ্ঞানে। অনুরূপভাবে স্বভাব সূচিত হয় সমগ্রের মধ্যে এবং প্রত্যেক বিশেষ বা সমগ্র বিশেষগুলির মধ্যে, আর সেই একই দ্রুত বা অব্যবহিত বিকল্প বা একান্তর পদ্ধতি থাকতে পারে। অতিমানসের যুক্তি মনের যুক্তি থেকে ভিন্ন: এ সর্বদাই আত্মাকে দেখে স্বরূপে, বিষয়টির স্বভাব দেখে আত্মার সত্তা ও শক্তির মৌলিক প্রকাশ হিসেবে এবং সমগ্র ও বিশেষকে দেখে এই শক্তি ও এর ফলস্বরূপ অভিব্যক্তি ও এর সক্রিয় প্রকাশ হিসেবে। অতিমানসিক চেতনা ও বোধের পূর্ণতায় এই হল স্থির বিধান। ঐক্য, সাদৃশ্য, প্রভেদ, জাতি, অনন্যতার যে সকল বোধ অতিমানসিক যুক্তিশক্তির দ্বারা পাওয়া যায় সে সকলই এই বিধানের অনুবর্তী ও এর উপর নির্ভরশীল।

অতিমানসের এই নিরীক্ষণের ক্রিয়া সকল পদার্থ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। ভৌতিক বিষয় সম্বন্ধে এর যে দৃষ্টি তা শুধু উপর উপর বা বাহ্য দৃষ্টি নয় বা হতে পারে না — এমনকি যখন বাইরের উপর তা একাগ্র হয় তখনো তা হয় না। এ রূপ, ক্রিয়া, বিভিন্ন উপাদান দেখে ও সেই সাথে গুণ বা শক্তি সম্বন্ধেও অবহিত থাকে যাদের এক রূপান্তর হল রূপ; আর এ এইসব দেখে রূপ বা ক্রিয়া থেকে অনুমান বা উপপাদন হিসেবে নয়, বরং তাদের সরাসরি দেখে ও অনুভব করে বিষয়টির সত্তার মধ্যে এবং রূপ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্রিয়ার মতো ঐরকম স্পষ্টভাবেই দেখে ও অনুভব করে — বলা যায় সূক্ষ্ম মূর্ততা ও সূক্ষ্ম সারবত্তা সহ। আবার যে চেতনা নিজেকে অভিব্যক্ত করে গুণে, শক্তিতে, রূপে সে সম্বন্ধেও এ অবহিত। যে সব বিষয়কে আমরা এখন দৃষ্টিগোচর ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলি সেগুলিকে আমরা যেমন সরাসরি ও স্পষ্ট দেখি, তেমন বিভিন্ন শক্তি, প্রবণতা, সংবেগকে ও আমাদের কাছে অমূর্ত বিষয়সমূহকে এ সরাসরি ও স্পষ্ট অনুভব করতে, জানতে, নিরীক্ষণ করতে, দেখতে সমর্থ। ঠিক সেইভাবেই এ বিভিন্ন ব্যক্তি ও সত্তাকে নিরীক্ষণ করে। আরম্ভবিন্দু বা প্রথম ইঙ্গিত হিসেবে এ কথা, ক্রিয়া ও বাহ্য নিদর্শনকে নিতে পারে কিন্তু এ তাদের দ্বারা সীমিত বা তাদের উপর নির্ভরশীল নয়। এ অপরের স্বয়ং আত্মা ও চেতনাকে জানতে ও অনুভব ও নিরীক্ষণ করতে সমর্থ, এ হয় নিদর্শনের মাধ্যমে সরাসরি তার দিকে অগ্রসর হতে পারে আর না হয় তার আরো শক্তিশালী ক্রিয়ায় তাতেই তৎক্ষণাৎ শুরু করতে পারে, আর বাহ্য প্রকাশের সাক্ষ্যের মাধ্যমে আন্তর সত্তাকে জানতে চাওয়া অপেক্ষা বরং আন্তর সত্তার আলোকে সকল বাহ্য প্রকাশকে বুঝতে সমর্থ। এই রকম সম্পূর্ণভাবেই অতিমানসিক জীব তার নিজের আন্তর সত্তা ও প্রকৃতি জানে। অতিমানস সমান শক্তিতে কাজ করতে সমর্থ এবং সরাসরি অনুভূতিতে ভৌতিক ব্যবস্থার পিছনে কি আছে তা-ও নিরীক্ষণ করতে সমর্থ; জড়বিশ্ব ছাড়া এ অন্যান্য লোকেও বিচরণ করতে সমর্থ। এ যে বিষয়সমূহের আত্মাকে ও সদ্‌বস্তুকে জানে তা জানে তাদাত্ম্যের দ্বারা, একত্বের অনুভূতির দ্বারা বা একত্বের সংস্পর্শের দ্বারা এবং

এই সব জিনিসের উপর নির্ভরশীল বা সে সব থেকে প্রাপ্ত অন্তর্দর্শন, দৃষ্টি, উপলব্ধিজনক ভাবনা ও জ্ঞানের দ্বারা; এবং চিৎপুরুষের বিভিন্ন সত্য সম্বন্ধে এর ভাবনামূলক প্রতিপাদন এই প্রকার দৃষ্টি ও অনুভূতির এক প্রকাশ।

অতিমানসিক স্মৃতিশক্তি মানসিক স্মৃতিশক্তি থেকে ভিন্ন, এ অতীত জ্ঞান ও অনুভূতির সঞ্চয় নয়, বরং জ্ঞানের এক স্থায়ী উপস্থিতি আর এই জ্ঞান প্রয়োজনমতো সম্মুখে আনা যায় অথবা আরো বিশিষ্টভাবে নিজেই উপস্থিত হয়: এ মনোযোগ বা সচেতন গ্রহণের উপর নির্ভরশীল নয়, কারণ অতীতের যে সব জিনিস বাস্তবিকই জানা যায়নি বা নিরীক্ষণ করা হয়নি সে সবকে সুপ্ত অবস্থা থেকে ডেকে আনা যায় এমন এক ক্রিয়ার দ্বারা যা তবু মূলতঃ স্মৃতি। বিশেষতঃ একটা স্তরে সকল জ্ঞান নিজেকে উপস্থিত করে এক স্মরণ হিসেবে কারণ সকলই অতিমানসের আত্মার মধ্যে সুপ্ত বা স্বগত থাকে। অতিমানসের মধ্যে জ্ঞানের কাছে, ভবিষ্যৎও অতীতের মতোই পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের স্মৃতি হিসেবে নিজেই উপস্থিত হয়। অতিমানসের মধ্যে কল্পনাশক্তি রূপান্তরিত হয়ে একদিকে কাজ করে যথার্থ প্রতিরূপ ও প্রতীকের শক্তি হিসেবে — এ হল সর্বদাই সত্তার কোন মূল্য বা তাৎপর্য্য বা অন্যসত্যের প্রতিরূপ বা নির্দেশক — আবার অপরদিকে কাজ করে এমন সব সম্ভাবনা ও যোগ্যতার অন্তঃপ্রেরণা বা ব্যাখ্যামূলক দর্শন হিসেবে যেগুলি বাস্তব বা উপলব্ধ বিষয় অপেক্ষা কম সত্য নয়। এইগুলিকে যথাস্থানে স্থাপিত করা হয় — কোন সমবর্তী বোধিময় বা ব্যাখ্যামূলক বিচারের দ্বারা, অথবা প্রতিরূপ, প্রতীক বা যোগ্যতার দর্শনের মধ্যে স্বগত কোন বিচারের দ্বারা, আর না হয় এমন কোন তত্ত্বের সর্বোচ্চ প্রকাশের দ্বারা যা প্রতিরূপ বা প্রতীকের পশ্চাতে অবস্থিত অথবা যা ভব্য এবং বাস্তবতা ও তাদের বিভিন্ন সম্পর্ক নির্ধারণ করে এবং হয়ত তাদের খণ্ডন ও অতিক্রম করে বিভিন্ন চরম সত্য ও পরম ধ্রুবতত্ত্ব আরোপ ক'রে।

অতিমানসিক বিচারশক্তি অতিমানসিক নিরীক্ষণ বা স্মৃতিশক্তির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে কাজ করে, এ তার মধ্যে নিহিত থাকে বিভিন্ন মূল্য, তাৎপর্য, পূর্বগামী তত্ত্ব, পরিণাম সম্বন্ধ ইত্যাদির প্রত্যক্ষ দৃষ্টি বা বোধ হিসেবে; অথবা এ নিরীক্ষণের উপর উপবিষ্ট হয় দীপ্তিময় প্রকাশক ভাবনা বা আভাসন হিসেবে; অথবা এ কোন নিরীক্ষণের উপর নির্ভর না করে পূর্বেই যেতে পারে এবং তারপর বিষয়টি আহূত ও দৃষ্ট হয়ে ভাবনার সত্যকে দৃষ্টিগোচর হিসেবে দৃঢ় করে। কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রে এ নিজের উদ্দেশ্যের পক্ষে পর্যাপ্ত, নিজেই নিজের প্রমাণ এবং নিজের সত্যের জন্য কোন সহায় বা সমর্থনের জন্য বাস্তবিকই নির্ভর করে না। অতিমানসিক যুক্তিশক্তির এক প্রকার তর্কবিধি আছে কিন্তু এর কাজ পরীক্ষা বা সমালোচনা করা নয়, সমর্থন ও প্রমাণ করা অথবা প্রমাদ বার করা ও বর্জন করা নয়। এর কাজ শুধু জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞান যুক্ত করা, বিভিন্ন সামঞ্জস্য ও ব্যবস্থা ও সম্বন্ধ আবিষ্কার করে কাজে লাগান, অতিমানসিক জ্ঞানের ক্রিয়া সংগঠন করা। এ তা করে তবে কোন বাঁধা নিয়ম বা অনুমান রচনার দ্বারা নয়, এ তা করে সংযোগ ও সম্বন্ধকে প্রত্যক্ষ, জীবন্ত ও অব্যবহিতভাবে দেখে ও স্থাপন করে। অতিমানসের মধ্যে

সকল ভাবনা হল বোধি, চিদাবেশ বা দিব্য প্রকাশস্বরূপ এবং জ্ঞানের সকল ন্যূনতা পূরণ করতে হবে এই সব শক্তির আরো ক্রিয়ার দ্বারা; প্রমাদ নিবারিত হয় এক স্বতঃস্ফূর্ত ও দীপ্তিময় বিবেকশক্তির ক্রিয়ার দ্বারা; সকল ক্রিয়া সর্বদাই হয় জ্ঞান থেকে জ্ঞানে। আমাদের অর্থে এ যৌক্তিক নয়, এ হল অতিযৌক্তিক, — মানসিক যুক্তিশক্তি যা খঞ্জের মতো অপূর্ণভাবে করতে চায়, এ তা করে অপ্রতিহতভাবে।

অতিমানসিক যুক্তিশক্তির উপরের যে জ্ঞানের স্তরগুলি একে নেয় ও অতিক্রম করে সেগুলিকে ভালভাবে বর্ণনা করা যায় না, আর সে চেষ্টা করার প্রয়োজনও নেই। এই বলাই যথেষ্ট যে এখানে জ্ঞানের ধারা আলোকে আরো পর্যাপ্ত, প্রখর ও বৃহৎ, আবশ্যিক ও অচিরসিদ্ধ, সক্রিয়জ্ঞানের ক্ষেত্র আরো বিশাল, পদ্ধতি তাদাত্ম্য জ্ঞানের আরো সমীপবর্তী, এর যে ভাবনা তা আত্মসংবিৎ ও সর্বদৃষ্টির ভাস্বর ধাতুতে আরও ভরাট এবং এ আরো স্পষ্টতঃই অন্য কোন অবর আশ্রয় বা সহায়তার অনধীন।

এই কথা স্মরণ রাখা চাই যে এই লক্ষণগুলি বোধিময় মানসিকতার প্রবলতম ক্রিয়াতেও প্রযুক্ত হয় না, সেখানে তাদের শুধু দেখা যায় তাদের প্রথম আভাসে। আবার যতক্ষণ অতিমানসিকতা মানসিক ক্রিয়ার নিম্নস্রোত, মিশ্রণ বা পরিবেশসহ শুধু গঠিত হচ্ছে ততক্ষণ ঐগুলি সম্পূর্ণভাবে বা অমিশ্রিতভাবে স্পষ্ট হয় না। শুধু যখন মানসিকতা অতিক্রান্ত হয় এবং মগ্ন হয় নিষ্ক্রিয় নীরবতায় তখনই সম্ভব অতিমানসিক বিজ্ঞানের পূর্ণ প্রকাশ এবং অপ্রতিহত ও অখণ্ড ক্রিয়া।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

অতিমানসিক ইন্দ্রিয়

অতিমানসিক শক্তির ক্রিয়ার মধ্যে মনের সকল করণের, সকল বৃত্তির অনুরূপ শক্তি আছে, সেখানে তারা উন্নীত ও রূপান্তরিত হয়, তবে সেখানে তাদের অগ্র-পশ্চাতের ক্রম ও প্রয়োজনীয় গুরুত্ব বিপরীত। যেমন অতিমানসিক ভাবনা ও মূল চেতনা আছে, তেমন সেখানে অতিমানসিক ইন্দ্রিয়ও আছে। ইন্দ্রিয় মূলতঃ কতকগুলি শারীরিক অঙ্গের ক্রিয়া নয়, বরং এ চেতনার বিষয়সমূহের সঙ্গে চেতনার সংস্পর্শ, "সংজ্ঞান"।

যখন সত্তার চেতনা সম্পূর্ণভাবে নিজের মধ্যে প্রত্যাহার করা হয়, তখন এ জানে শুধু নিজেকে, নিজের আপন সত্তাকে, নিজের আপন চেতনাকে, নিজের আপন অস্তিত্বের আনন্দকে, নিজের সত্তার আপন একাগ্র-করা শক্তিকে, আর এসবকে জানে তাদের আকারে নয়, তাদের স্বরূপে। যখন এ এই আত্মনিমজ্জনের বাইরে আসে তখন এ জানতে পারে বা এ মুক্ত বা বিকশিত করে সত্তার, চেতনার, আনন্দ ও শক্তির বিভিন্ন বৃত্তি ও আকার। তখনও অতিমানসিক লোকে এর এক প্রাথমিক সংবিৎ থাকে আর তা চিৎপুরুষের আত্মসংবিতের, এক ও অনন্তের আত্মজ্ঞানের স্বকীয় প্রকৃতির ও সম্পূর্ণ বিশিষ্টতামূলক; এ হল এমন এক জ্ঞান যা তার সকল বিষয়, আকার ও ক্রিয়াকে ব্যাপকভাবে জানে আর তা জানে নিজের অনন্ত আত্মার মধ্যে তাদের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে, ঘনিষ্ঠভাবে জানে তাদের আত্মারূপে তাদের মধ্যে তাদের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে, একান্তভাবে জানে নিজের সত্তার সঙ্গে একাত্ম হিসেবে তাদের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে। এর জ্ঞানের অন্য সকল পদ্ধতি এই জ্ঞান থেকে তাদাত্ম্যের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হয় এবং তারা এর বিভিন্ন অংশ বা গতিবৃত্তি, আর নিম্ন পর্যায়ে তারা এর উপর নির্ভর করে তাদের সত্য ও আলোকের জন্য, তার স্পর্শ ও আশ্রয় পায় এমনকি তাদের নিজের ক্রিয়ার পৃথক পদ্ধতিতেও এবং একেই প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে তাদের প্রমাণ ও উৎস হিসেবে উদ্দেশ করে।

যে বৃত্তি তাদাত্ম্যের দ্বারা এই মূল জ্ঞানের নিকটতম তা হল সেই বিশাল সর্বগ্রাহী চেতনা যা অতিমানসিক শক্তির বিশেষ লক্ষণ এবং যা নিজের মধ্যে সকল সত্য ও ভাবনা ও জ্ঞানের বিষয় গ্রহণ করে এবং সেসবকে তৎক্ষণাৎ দেখে তাদের স্বরূপে, সমগ্রতায় এবং বিভিন্ন অংশে — "বিজ্ঞান"। এর ক্রিয়া হল সমগ্র দর্শন ও ধারণ; এ হল জ্ঞানের আত্মার মধ্যে অবধারণ ও অধিকার; আর এ চেতনার বিষয়টিকে আত্মার অংশ হিসেবে অথবা এর সঙ্গে এক ব'লে ধরে, আর এই ঐক্য জ্ঞানের ক্রিয়ার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও সরাসরি উপলব্ধি করা হয়। অন্য একটি অতিমানসিক বৃত্তিতে তাদাত্ম্য

জ্ঞানকে অপেক্ষাকৃত বেশী পিছনে রাখা হয় এবং বেশী জোর দেওয়া হয় জ্ঞাত বিষয়টির পরাক্‌বৃত্ততার উপর। এর বিশিষ্ট ক্রিয়া মনের মধ্যে নেমে হয়ে ওঠে আমাদের মানসিক জ্ঞানের, বুদ্ধির বিশেষ প্রকৃতির উৎস, "প্রজ্ঞান"। মনে বুদ্ধির ক্রিয়ার প্রথমেই আছে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ও ভেদ; কিন্তু অতিমানসে এর যে ক্রিয়া তা তখনো থাকে অনন্ত তাদাত্ম্যের মধ্যে বা অন্ততঃ বিশ্ব একত্বের মধ্যে। শুধু জ্ঞানের আত্মা চেতনার বিষয়কে আদি ও শাশ্বত ঐক্যের আরো অব্যবহিত সামীপ্য থেকে দূরে, তবে সর্বদাই নিজের মধ্যে রেখে একে আবার অন্য একভাবে দেখার আনন্দ উপভোগ করে, আর এর উদ্দেশ্য হল এর সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়ার নানাবিধ সম্বন্ধ স্থাপন করা; এই সম্বন্ধগুলি চেতনার বাদ্যের ঐকতান মধ্যে কতিপয় গৌণ সুর। অতিমানসিক বুদ্ধির এই ক্রিয়া, "প্রজ্ঞান", অতিমানসের এমন এক গৌণ, তৃতীয় ক্রিয়া হয়ে দাঁড়ায় যার পূর্ণতার জন্য ভাবনা ও শব্দের প্রয়োজন হয়। প্রাথমিক ক্রিয়া তাদাত্ম্য জ্ঞানের অথবা চেতনার মধ্যে সর্বগ্রাহী ধারণের প্রকৃতিবিশিষ্ট হওয়ায় এ স্বয়ংপূর্ণ এবং ব্যাকৃতির এই সব উপায়ের প্রয়োজন থাকে না। অতিমানসিক বুদ্ধির স্বরূপ হল সত্য-দর্শন, সত্য-শ্রবণ ও সত্য-স্মৃতি, আর যদিও এক প্রকারে এ স্বয়ংপর্যাপ্ত হতে সমর্থ, তবু এ অনুভব করে যে, ভাবনা ও শব্দের দ্বারা — যে ভাবনা ও শব্দ তাকে প্রকাশের রূপ দেয় — এ আরো সমৃদ্ধভাবে পূর্ণ হয়।

সর্বশেষ, অতিমানসিক চেতনার এক চতুর্থ ক্রিয়ায় অতিমানসিক জ্ঞানের নানাবিধ সম্ভাবনার শেষ হয়। এ জ্ঞেয় বিষয়টির পরাক্‌বৃত্ততা আরো বেশী স্পষ্ট করে, একে অনুভবকারী চেতনার কেন্দ্র থেকে দূরে রাখে এবং আবার একে নিকটে আনে মিলনাত্মক সংযোগের দ্বারা আর এই যে সংযোগ সাধিত হয় তা হয় সরাসরি সামীপ্যে, স্পর্শে, মিলনে কিংবা আরো কম নিবিড়ভাবে — ইতিপূর্বে কথিত সেতুর উপর দিয়ে বা সংযোগকারী চেতনার স্রোতের মধ্য দিয়ে। এই যে অস্তিত্বের, বিভিন্ন উপস্থিতির, বিষয়ের, রূপের, শক্তির, ক্রিয়ার সংযোগ, যে সংযোগ অবশ্য হয় অতিমানসিক সত্তা ও শক্তির উপাদানের মধ্যে, কিন্তু জড়ের বিভাজনের ও স্থূল করণের মধ্য দিয়ে নয়, তাই সৃষ্টি করে অতিমানসিক ইন্দ্রিয়, "সংজ্ঞান"।

যে মানসিকতা প্রসারিত অভিজ্ঞতার দ্বারা অতিমানসিক ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে এখনো পরিচিত নয় তাকে এর স্বরূপ বোঝান কিছু কষ্টকর, কারণ ইন্দ্রিয়ক্রিয়া সম্বন্ধে আমাদের যে ভাবনা তা নিয়ন্ত্রিত হয় স্থূল মনের সীমাকারী অভিজ্ঞতার দ্বারা আর আমরা মনে করি যে এর মধ্যে মূল জিনিস হল দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্পর্শ, আস্বাদনের শারীরিক ইন্দ্রিয়স্থানের উপর বাহ্য বস্তু যে ছাপ দেয় তা-ই আর আমাদের চেতনার বর্তমান কেন্দ্রীয় অঙ্গ যে মন তার কাজ হল এই শারীরিক ছাপ ও তার স্নায়বিক নবরূপায়ণ গ্রহণ করা আর এইভাবে বিষয়টি সম্বন্ধে বুদ্ধিগতভাবে সচেতন হওয়া। অতিমানস সংজ্ঞান বুঝতে হলে প্রথম এই উপলব্ধি করা দরকার যে মনই একমাত্র যথার্থ ইন্দ্রিয়, আর তা এমনকি শারীরিক ক্রিয়াধারাতেও: স্থূল ছাপগুলির উপর এর যে নির্ভরতা তা হল জড়ীয় বিবর্তনের

অবস্থার ফল, এ কোন মূল ও অপরিহার্য বিষয় নয়। মন এমন দৃষ্টিশক্তি পেতে সক্ষম যা স্থূল চক্ষুর অনধীন, এমন শ্রবণশক্তি পেতে সক্ষম যা স্থূল কর্ণের অনধীন, আর অন্য সব ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার বেলাতেও তাই। তাছাড়া, শারীরিক অঙ্গ আনে না বা আভাস দেয় না এমন সব বিষয়ের বোধ পেতেও মন সমর্থ যদিও এই বোধগুলিকে আমাদের অস্পষ্ট ধারণা বলে প্রতীতি জন্মে; এ এমন সব বিভিন্ন সম্বন্ধ, ঘটনা, এমনকি বিভিন্ন আকার ও শক্তির ক্রিয়ার নিকট উন্মুক্ত হয় যেসবে স্থূল অঙ্গগুলি কোন সাক্ষ্য দিতে অপারগ। তখন এই সব বিরল শক্তির কথা জেনে আমরা বলি যে মন এক ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়; কিন্তু বস্তুতঃ এই হল একমাত্র প্রকৃত জ্ঞানেন্দ্রিয় আর অন্যগুলি এর বাহ্য সুবিধাজনক ও গৌণ করণ ব্যতীত আর কিছু নয় যদিও এদের উপর তার নির্ভরতার কারণে এরা হয়ে উঠেছে তার সীমাকারক এবং তার অতিমাত্রায় অত্যাবশ্যক ও একমাত্র বাহন। আমাদের একথাও উপলব্ধি করা দরকার — আর এই বিষয়ে আমাদের সাধারণ ভাবনার পক্ষে একথা স্বীকার করা আরো কষ্টকর — যে মন নিজেই ইন্দ্রিয়ের এক বিশিষ্ট করণ কিন্তু ইন্দ্রিয় নিজে, তার বিশুদ্ধ অবস্থায় যা কিনা সংজ্ঞান, মনের পশ্চাতে ও উজানে অবস্থিত; এ হল আত্মার এক গতিবৃত্তি, এর চেতনার অনন্ত শক্তির এক সরাসরি ও আদি ক্রিয়া। ইন্দ্রিয়ের শুদ্ধ ক্রিয়া হল আধ্যাত্মিক ক্রিয়া এবং বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয় স্বরূপে চিৎপুরুষের এক শক্তি।

আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয় সকল রকমের সকল বস্তুকেই — জড় বস্তু এবং আমাদের কাছে জড় নয় এমন বস্তু, রূপময় ও নীরূপ — সবকেই তার নিজের বিশিষ্ট পদ্ধতিতে জানতে সমর্থ; এই পদ্ধতি অতিমানসিক ভাবনার বা বুদ্ধির বা অতিমানসিক অবধারণের বিজ্ঞানের অথবা তাদাত্ম্যের দ্বারা জ্ঞানের পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। জানার কারণ এই যে সকলই হল সত্তার আধ্যাত্মিক ধাতু, চেতনা ও শক্তির ধাতু, আনন্দের ধাতু; আর আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয় সংজ্ঞান হল চিন্ময় সত্তার আপন আত্মার প্রসারিত ধাতুর এবং এর মধ্যে যে সব অনন্ত বা বিশ্বজনীন ধাতু সে সবের স্পর্শমূলক সারভূত সংবিৎ। শুধু যে সচেতন তাদাত্ম্যের দ্বারা, আত্মার, বিভিন্ন তত্ত্ব ও বিভাবের, শক্তি, ক্রীড়া ও ক্রিয়ার আধ্যাত্মিক অবধারণের দ্বারা, সরাসরি আধ্যাত্মিক, অতিমানসিক ও বোধিময় ভাবনাজ্ঞানের দ্বারা, হৃদয়ের আধ্যাত্মিকভাবে ও অতিমানসিকভাবে দীপ্ত বেদনা, প্রেম, আনন্দের দ্বারা আমাদের পক্ষে চিৎপুরুষকে, আত্মাকে, ভগবানকে, অনন্তকে জানা সম্ভব তা নয়, তাছাড়া আক্ষরিক অর্থে চিৎপুরুষ, আত্মা, ভগবান, অনন্ত সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়বোধও — ইন্দ্রিয়জ্ঞান বা ইন্দ্রিয়সংবিৎ — পাওয়া সম্ভব। উপনিষদে বর্ণিত যে অবস্থায় সাধক ব্রহ্মকে ও শুধু ব্রহ্মকেই দেখে, শোনে, অনুভব করে, স্পর্শ করে, সকল প্রকারে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানে — কারণ চেতনার কাছে সকল বিষয়ই শুধু তাই হয়ে উঠেছে, এদের আর অন্য কোন পৃথক বা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, সে অবস্থা শুধু কথার অলঙ্কার নয়, বরং বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের মূল ক্রিয়ার, শুদ্ধ সংজ্ঞানের আধ্যাত্মিক উদ্দিষ্টের যথাযথ বর্ণনা। আর এই আদি ক্রিয়ায় — যা আমাদের অনুভূতির কাছে ইন্দ্রিয়ের এক রূপান্তরিত মহিমান্বিত অনন্তভাবে আনন্দপূর্ণ ক্রিয়া, আত্মার এক সরাসরি চেষ্টা যাতে এ বাইরে, ভিতরে,

চারিদিকে, সর্বত্র তার বিশ্বসত্তার মধ্যে সব কিছুকে আলিঙ্গন ও স্পর্শ করতে ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করতে পারে — আমরা অনন্তকে ও এর মধ্যে সব কিছুকে জানতে পারি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও আনন্দপূর্ণভাবে এবং সকল সত্তার সঙ্গে আমাদের সত্তার ঘনিষ্ঠ সংযোগের দ্বারা বিশ্বের মধ্যে সকল কিছুর কথা অবগত থাকি।

অতিমানসিক ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ইন্দ্রিয়ের এই আসল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ হল এই শুদ্ধ, আধ্যাত্মিক, অনন্ত, অনপেক্ষ সংজ্ঞানের সংগঠন। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অতিমানস কাজ ক'রে অনুভব করে যে সকল কিছু ভগবান, ভগবানের মধ্যে, সকল কিছুই অনন্তের ব্যক্ত স্পর্শ, দর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন, সৌরভ, সবই এর অনুভূত, দৃষ্ট, সরাসরি উপলব্ধ ধাতু ও সামর্থ্য ও শক্তি ও গতি, লীলা, অনুপ্রবেশ, স্পন্দন, রূপ, সামীপ্য, চাপ, ধাতুগত আদানপ্রদান। এর ইন্দ্রিয়ের কাছে কোন কিছুই অনধীন থাকে না, বরং সকল কিছুকেই অনুভব করা হয় এক সত্তা ও গতি হিসেবে আর প্রত্যেক বিষয়ই বাকী সব থেকে অবিভাজ্য এবং প্রত্যেকের মধ্যে আছে সমগ্র অনন্ত, সমগ্র ভগবান। অতিমানসিক ইন্দ্রিয় সরাসরি অনুভব ও উপলব্ধি পায় — শুধু যে বিভিন্ন রূপের তা নয়, বিভিন্ন শক্তির, বিষয়সমূহের মধ্যে ক্রিয়াশক্তি ও গুণের, আর এক দিব্য ধাতু ও উপস্থিতির যা তাদের ভিতরে ও চারিদিকে বর্তমান এবং যার মধ্যে তারা তাদের গূঢ় সূক্ষ্ম আত্মা ও সব উপাদানে নিজেদের উন্মুক্ত ও প্রসারিত করে আর এইভাবে নিজেদের বিস্তৃত করে অসীমের মাঝে একত্বে। বাস্তবিক অতিমানসিক ইন্দ্রিয়ের কাছে কিছুই সান্ত নয়; এর প্রতিষ্ঠা হল এই অনুভূতিতে যে প্রত্যেকের মধ্যে সব ও সবের মধ্যে প্রত্যেকে বিদ্যমান। যদিও এর ইন্দ্রিয়গত সীমাকরণ মানসিক সীমাকরণ অপেক্ষা আরো সঠিক ও সম্পূর্ণ তবু এ সঙ্কীর্ণতার কোন প্রাচীর তৈরী করে না; এ হল এক সাগরিক ও আকাশীয় ইন্দ্রিয় যার মধ্যে সকল বিশেষ ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়সংবিৎ এক তরঙ্গ বা গতি বা শীকর বা বিন্দু যা অথচ সমগ্র সাগরের এক ঘনীভূত আকার ও সাগর থেকে অচ্ছেদ্য। এর ক্রিয়া সত্তা ও চেতনার বিস্তার ও স্পন্দনের ফল, আর এই বিস্তার ও স্পন্দন হয় আলোকের আকাশাতীত আকাশে, শক্তির আকাশে, আনন্দের অর্থাৎ উপনিষদের আনন্দ আকাশে যা আত্মার বিশ্ব-অভিব্যক্তির গর্ভ ও আধার — যদিও দেহে ও মনে তা অনুভূত হয় শুধু সীমিত বিস্তারে ও স্পন্দনে — এবং যা এর সত্যকার অনুভূতির মাধ্যম। নিম্নতম শক্তিতেও এই ইন্দ্রিয় এমন এক প্রকাশক আলোকে দীপ্তিময় যা তার মধ্যে বহন করে এর অনুভূত বিষয়ের গূঢ় তত্ত্ব এবং সেজন্য এ অতিমানসিক জ্ঞানের বাকী সবের অর্থাৎ অতিমানসিক ভাবনার, অতিমানসিক বুদ্ধি ও অবধারণের, সচেতন তাদাত্ম্যের আরম্ভবিন্দু ও ভিত্তি হতে সমর্থ; আর এর সর্বোচ্চ ভূমিতে বা ক্রিয়ার পূর্ণতম প্রখরতায় এ এই সব বিষয়ের মধ্যে উন্মুক্ত হয় বা তাদের ধারণ করে ও তৎক্ষণাৎ মুক্ত করে। এ হল এমন এক দীপ্তিময় শক্তিতে শক্তিমান যার মধ্যে আছে আত্ম-উপলব্ধির শক্তি এবং প্রখর বা অনন্ত কার্যকারিতা; আর সেজন্য এ আধ্যাত্মিক ও অতিমানসিক সঙ্কল্প ও জ্ঞানের সৃজনশীল বা সার্থককারী ক্রিয়ার জন্য প্রবেগের আরম্ভ বিন্দু হতে পারে। এ এমন এক

শক্তিমান ও দীপ্তিময় আনন্দের উল্লাসে ভরা যা একে, সকল ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়সংবিৎকে ক'রে তোলে দিব্য ও অনন্ত আনন্দের চাবিকাঠি বা পাত্র।

অতিমানসিক ইন্দ্রিয় তার আপন শক্তিতে কাজ করতে সমর্থ এবং দেহ ও স্থূলপ্রাণ ও বহির্মনের অনধীন এবং এ আন্তর মন ও এর বিভিন্ন অনুভূতিরও উর্ধ্বে। এ সর্ববিষয় জানতে সমর্থ তা তারা যে কোন জগতের, যে কোন লোকের, বিশ্বচেতনার যে কোন গঠনের অন্তর্ভুক্ত হ'ক না কেন। এমনকি সমাধির তন্ময় অবস্থাতেও এ জাগতিক বিশ্বের বিষয়সমূহ জানতে সমর্থ, স্থূল ইন্দ্রিয়ের কাছে তারা যেমন বা যেমন মনে হয় সেইভাবেই এ জানতে সমর্থ যেমন এ জানে অনুভূতির অন্যান্য অবস্থাকে অর্থাৎ বিষয়সমূহের শুদ্ধ প্রাণিক, মানসিক, চৈত্যিক, অতিমানসিক রূপকে। স্থূলচেতনার জাগ্রত অবস্থাতে এ আমাদের কাছে এমন সব বিষয় উপস্থিত করতে পারে যা সীমিত গ্রহণশীলতা থেকে প্রচ্ছন্ন থাকে অথবা শারীরিক সব অঙ্গের ক্ষেত্রের অতীত, দূরবর্তী রূপাবলী, দৃশ্যাবলী ও ঘটনাপুঞ্জ, এমন সব বিষয় যেগুলি ভৌতিক অস্তিত্ব থেকে চলে গিয়েছে অথবা এখনো ভৌতিক অস্তিত্বে আসেনি, প্রাণিক, চৈত্যিক, মানসিক, অতিমানসিক, আধ্যাত্মিক জগৎসমূহের বিভিন্ন দৃশ্য, রূপ, ঘটনা, প্রতীক, আর এই সব উপস্থিত করে যেমন তাদের বাহ্যরূপে তেমন তাদের আসল বা তাৎপর্যপূর্ণ সত্যে। এ ইন্দ্রিয়চেতনার অন্যান্য অবস্থাগুলিকে এবং তাদের উপযুক্ত ইন্দ্রিয় ও অঙ্গগুলিকেও ব্যবহার করতে পারে এবং তা পারে যা তাদের নেই তা তাদের দিয়ে, তাদের ভুল ঠিক ক'রে ও ন্যূনতা পূরণ ক'রে: কারণ অন্যগুলির উৎস হল এ এবং তারা শুধু এই পরতর ইন্দ্রিয়ের, এই প্রকৃত ও অসীম সংজ্ঞানের অবর উৎপন্ন বিষয়।

২

মন থেকে অতিমানসের চেতনার স্তরের উন্নয়ন এবং তার পরিণাম স্বরূপ সত্তার রূপান্তর, মনোময় পুরুষের অবস্থা থেকে অতিমানসিক পুরুষ — এই কাজ সম্পূর্ণ হতে হলে এর সঙ্গে আসা চাই প্রকৃতির সকল অংশের ও সকল ক্রিয়ার রূপান্তর। সমগ্র মন শুধু যে অতিমানসিক ক্রিয়াবলীর এক নিষ্ক্রিয় প্রবাহপ্রণালীতে এবং প্রাণ ও দেহের মধ্যে তাদের অধঃপ্রবাহের এবং তাদের বহিঃপ্রবাহের অর্থাৎ বহির্জগৎ বা জাগতিক অস্তিত্বের সঙ্গে যোগাযোগের নিষ্ক্রিয় প্রবাহপ্রণালীতে পরিণত হয় তা নয় — যা শুধু এই পরিণাম ধারার প্রাথমিক পর্যায় — এ আবার তার সকল করণসহ নিজেই অতিমানসিকভাবাপন্ন হয়। সেজন্য স্থূল ইন্দ্রিয়েও এক পরিবর্তন, এক গভীর রূপান্তর আসে। শারীরিক দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ইত্যাদির অতিমানসিকভাবাপন্নতা সাধিত হয় এবং তার ফলে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টি সৃষ্ট হয়, শুধু যে জীবন ও এর অর্থ সম্বন্ধেই নয়, এমনকি জড় জগৎ ও তার সকল রূপ ও দিক সম্বন্ধেও। অতিমানস শারীরিক অঙ্গগুলিকে ব্যবহার করে এবং তাদের ক্রিয়ার পদ্ধতি দৃঢ় করে কিন্তু সেই সঙ্গে আন্তর ও গভীরতর ইন্দ্রিয়গুলিও তাদের

পশ্চাতে বিকশিত করে এবং শারীরিক অঙ্গসমূহ থেকে প্রচ্ছন্ন তত্ত্বসমূহ দেখে; এবং তাছাড়া যে নতুন দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি সৃষ্ট হয়েছে সেগুলিকে নিজের ছাঁচে ও ইন্দ্রিয়ানুভবের প্রণালীতে ফেলে তাদের রূপান্তরিত করে। এই পরিবর্তন এমন যা বিষয়টির ভৌতিক সত্য থেকে কিছু বাদ দেয় না বরং তাতে যোগ দেয় এর অতিভৌতিক সত্য এবং ভৌতিক সঙ্কীর্ণতা দূর ক'রে অনুভূতির জাগতিক প্রণালীর মধ্যে মিথ্যার যে উপাদান থাকে তা অপনয়ন করে।

স্থূল ইন্দ্রিয়ের অতিমানসীকরণের সঙ্গে এমন এক ফল আসে যা এই ক্ষেত্রে ভাবনা ও চেতনার রূপান্তরে আমরা যে ফল ভোগ করি তার অনুরূপ। উদাহরণস্বরূপ, যখনই দৃষ্টিশক্তি অতিমানসিক দর্শনের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়, তখনই চোখ সব বিষয় ও আমাদের চারিদিককার জগৎ সম্বন্ধে এক নতুন ও রূপান্তরিত দর্শন পায়। এর দৃষ্টি এমন এক অসাধারণ সমগ্রতা ও অব্যবহিত ও সর্বগ্রাহী যথার্থতা লাভ করে যার মধ্যে সমগ্র ও প্রতি ক্ষুদ্র অংশ তখনই সেই সম্পূর্ণ সুষমা ও স্পষ্টতায় প্রকট হয় যা প্রকৃতি বিষয়ের মধ্যে ও সফল সারবান সত্তার মধ্যে নিজের রূপ-ভাবনার উপলব্ধির জন্য অভিপ্রায় করে। এ যেন অস্পষ্ট বা তুচ্ছ না-দেখা সাধারণ দর্শনের স্থানে কবি ও শিল্পীর দৃষ্টি যা বরং অসামান্যভাবে আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন ও মহিমময় — যেন আমরা পাই পরম দিব্য কবি ও শিল্পীর দৃষ্টি আর আমাদের দেওয়া হয়েছে বিশ্বের ও বিশ্বের মধ্যে প্রতি বিষয় সম্বন্ধে তাঁর পরিকল্পনায় তাঁর সত্য ও অভিপ্রায়ের পূর্ণ দর্শন। এমন এক অসীম তীব্রতা আসে যা সকল দেখা বিষয়কে করে তোলে গুণ ও ভাবনা ও রূপ ও রঙের মহিমার প্রকাশ। তখন মনে হয় যে স্থূল চক্ষুর সাথে এমন এক চিৎপুরুষ ও চেতনা থাকে যা বিষয়টির শুধু ভৌতিক দিক দেখে না, যা আরো দেখে এর মধ্যকার গুণের অন্তঃপুরুষ, শক্তির স্পন্দন, এর উপাদানস্বরূপ আলোক ও শক্তি ও আধ্যাত্মিক ধাতু। এইভাবে স্থূল ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে দর্শনের ভিতরে ও পশ্চাতে চেতনার সমগ্র ইন্দ্রিয়ে আসে দেখা বিষয়ের অন্তঃপুরুষের প্রকাশ ও যে বিরাট পুরুষ তার আপন চিন্ময় সত্তার এই পরাক্‌বৃত্তরূপে নিজেকে ব্যক্ত করছে তার প্রকাশ।

এই সাথে এমন এক সূক্ষ্ম পরিবর্তন আসে যা দৃষ্টিশক্তিকে একপ্রকার চতুর্মাত্রায় দেখতে সমর্থ করে, যার বিশেষ লক্ষণ হল এক প্রকার অন্তর্মুখিতা, শুধু উপরিভাগ ও বাহ্য রূপ দেখা নয়, কিন্তু সে জিনিসটিরও দেখা যা এর ভিতরে অনুস্যূত এবং এর চারিদিকে সূক্ষ্মভাবে বিস্তৃত থাকে। এই দৃষ্টিশক্তির কাছে জড়বস্তু আমরা এখন যা দেখি তা থেকে ভিন্ন বস্তু হয়ে দাঁড়ায়, তা প্রকৃতির অবশিষ্টাংশের পটভূমিকায় বা পরিবেশের মধ্যে কোন পৃথক বস্তু নয় বরং এক অবিভাজ্য অংশ, আর এমনকি, আমরা যা সব দেখি এক সূক্ষ্মভাবে তার ঐক্যের এক প্রকাশ। আর কেবল সূক্ষ্মতর চেতনায় নয়, এমনকি ইন্দ্রিয়ের কাছেও, দীপ্ত স্থূলদৃষ্টির মধ্যেই এই আমাদের দেখা ঐক্য হয়ে ওঠে সনাতনের তাদাত্ম্য, ব্রহ্মের ঐক্য। কারণ অতিমানসিকভাবাপন্ন দৃষ্টির কাছে জড়জগৎ ও দেশ ও জড়বস্তুসমূহ আর সে রকম জড় থাকে না যেরকমভাবে আমরা তাদের এখন আমাদের

সীমিত শারীরিক সব অঙ্গের ও তাদের মধ্য দিয়ে শারীরিক চেতনার একমাত্র সাক্ষ্যের জোরে আমাদের স্থূল অনুভব ব'লে গ্রহণ করি এবং জড় সম্বন্ধে আমাদের ভাবনা ব'লে বুঝি। একে এবং সেসবকে মনে হয় ও দেখা যায় স্বয়ং চিৎপুরুষ ব'লে তার নিজেরই এক আকারে ও চিন্ময় বিস্তারে। সমগ্রই এক ঐক্য; এই একত্ব বস্তুসমূহের ও সূক্ষ্ম অংশের বাহুল্যে ক্ষুণ্ণ হয় না; এই ঐক্যকে রাখা হয় চেতনার মধ্যে ও চেতনার দ্বারা আর তা থাকে আধ্যাত্মিক দেশে এবং সেখানে সকল ধাতু চিন্ময় ধাতু। এই পরিবর্তনের ও দৃষ্টিভঙ্গীর সমগ্রতা আসে যখন আমাদের বর্তমান স্থূল ইন্দ্রিয়ের সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করা হয়, কারণ সূক্ষ্ম বা চৈত্যিক চক্ষুর শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে স্থূল চক্ষুর মধ্যে, আবার দৃষ্টির এই চৈত্যভৌতিক শক্তির মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি, শুদ্ধ ইন্দ্রিয়, অতিমানসিক সংজ্ঞান।

অন্য ইন্দ্রিয়গুলিরও এই রকম রূপান্তর আসে। যা কিছু কর্ণ শোনে তা এর শব্দ-অবয়বের ও শব্দতাৎপর্যের সমগ্রতা ও এর স্পন্দনের সকল সুর প্রকট করে এবং তাছাড়া একটি পূর্ণাঙ্গ শ্রবণের কাছে প্রকট করে শব্দের গুণ, ছন্দোময় শক্তি, অন্তঃপুরুষ এবং অখণ্ড বিরাট পুরুষের অভিব্যক্তি। সেই একই অন্তর্মুখিতা থাকে, — ইন্দ্রিয় যায় শব্দের গভীরতার মধ্যে এবং সেখানে দেখে যা একে অনুস্যূত করে এবং যা সকল শব্দের সুষমার সঙ্গে এবং সেই সঙ্গে সকল নীরবতার সুষমার সঙ্গে ঐক্যে একে বিস্তৃত করে যাতে কর্ণ সর্বদাই শুনতে থাকে অনন্তকে তার শ্রুত প্রকাশে ও তার নীরবতার স্বরে। অতিমানসিকভাবাপন্ন কর্ণের কাছে সকল শব্দ হয়ে ওঠে ভগবানের স্বর — যে ভগবান স্বয়ং জন্ম নিয়েছেন শব্দের মধ্যে, আর হয়ে ওঠে বিশ্বএকতানতার সাম্যের ছন্দ। আর সেই একই সম্পূর্ণতা, স্পষ্টতা, তীব্রতা, শ্রুত বিষয়ের আত্মার প্রকাশ এবং শ্রবণে আত্মার আধ্যাত্মিক তৃপ্তি — এসবও আছে। অতিমানসিকভাবাপন্ন স্পর্শও ভগবানের স্পর্শের সংযোগে আসে বা তাঁর স্পর্শে পায় এবং সংযোগের মধ্যে চিন্ময় আত্মার মাধ্যমে সকল জিনিসকে জানে ভগবান ব'লে: এবং আরো থাকে সেই একই সমগ্রতা, তীব্রতা, অনুভবকারী চেতনার কাছে স্পর্শের মধ্যে ও পশ্চাতে যা সব আছে তার প্রকাশ। অন্য ইন্দ্রিয়গুলিরও অনুরূপ রূপান্তর আসে।

সেই সাথে সকল ইন্দ্রিয়েরই বিভিন্ন নতুন শক্তির বিকাশ হয় — আর হয় ক্ষেত্রের বিস্তৃতি, শারীরিক চেতনার প্রসার, আর এসবের সামর্থ্য এত বেশী হয় যে তা স্বপ্নের অগোচর। তাছাড়া অতিমানসিক রূপান্তর শারীরিক চেতনাকে দেহের সীমা ছাড়িয়ে অনেক দূর বিস্তৃত করে এবং দূরবর্তী জিনিসের স্থূল সংযোগ সম্পূর্ণ নিরেটভাবে পেতে সমর্থ করে। আর শারীরিক অঙ্গগুলি সমর্থ হয় চৈত্য ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলির প্রণালী হিসেবে কাজ করতে যাতে আমরা স্থূল জাগ্রত চক্ষু দিয়ে সেই সব জিনিস দেখতে পাই যা শুধু সাধারণতঃ প্রকট হয় অস্বাভাবিক অবস্থায় এবং চৈত্যিক দর্শন, শ্রবণ ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়জ্ঞানের কাছে। যা দেখে ও ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করে তা হল চিৎপুরুষ বা অন্তঃপুরুষ, কিন্তু দেহ ও এর বিভিন্ন শক্তি নিজেরাই আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন হয়ে সরাসরি

অনুভূতির অংশীদার হয়। সমগ্র জড় ইন্দ্রিয়সংবিৎ অতিমানসিকভাবাপন্ন হয় এবং বিভিন্ন শক্তি ও গতি সম্বন্ধে এবং বিষয় ও সত্তাগুলির ভৌতিক, প্রাণিক, ভাবগত, মানসিক স্পন্দন সম্বন্ধে অবগত হয় আর তা হয় সরাসরি এবং তাতে স্থূলরূপে ভাগ নিয়ে এবং সর্বশেষে সূক্ষ্মতর করণব্যবস্থার সঙ্গে ঐক্যে এবং এ তাদের সম্বন্ধে অনুভব করে — শুধু আধ্যাত্মিকভাবে বা মানসিকভাবে নয়, শারীরিকভাবেও, যে তারা আত্মার মধ্যে অবস্থিত ও এই সকল বহু দেহের মধ্যে তারা একই আত্মার বিভিন্ন গতি। দেহ ও এর বিভিন্ন ইন্দ্রিয় আমাদের চারিদিকে যে প্রাচীর নির্মাণ করেছে তা লোপ পায়— এমনকি দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহেও, আর তার স্থানে আসে শাশ্বত একত্বের স্বচ্ছন্দ যোগাযোগ। সকল ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়সংবিৎ ভরে যায় দিব্য আলোয়, অনুভূতির দিব্য শক্তি ও তীব্রতায়, দিব্য হর্ষে, ব্রহ্মের আনন্দে। আর এমনকি যা এখন আমাদের কাছে বেসুরো ও ইন্দ্রিয়ের নিকট কর্কশ তা-ও স্থান পায় বিশ্বগতির বিশ্বসাম্যের মধ্যে, প্রকট করে তার রস, অর্থ, পরিকল্পনা এবং দিব্যচেতনার ও তার বিধান ও ধর্মের বিকাশের মধ্যে এর অভিপ্রায়ে আনন্দের দ্বারা, সমগ্র আত্মার সঙ্গে এর সামঞ্জস্যের দ্বারা, ভাগবতসত্তার অভিব্যক্তির মধ্যে এর স্থানের দ্বারা সকলই অন্তঃপুরুষের অনুভূতির কাছে সুন্দর ও সুখী হয়ে ওঠে। সকল ইন্দ্রিয়সংবিৎ-ই হয়ে ওঠে (দিব্য) আনন্দ।

আমাদের মধ্যস্থিত দেহধারী মন সাধারণতঃ জড়েন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমেই সচেতন থাকে, তাও আবার শুধুমাত্র তাদের বিষয় ও আন্তর অনুভূতি সম্বন্ধে যেগুলির শুরু মনে হয় শারীর অনুভূতি থেকে আর যারা এই ইন্দ্রিয়দেরকেই তাদের ভিত্তিমূল ও গঠনের কাঠাম বলে ভেবে বসে, তা সে যত দূরগতভাবেই হোক না কেন। বাকী সব, যা সব স্থূল তথ্যের সঙ্গে সঙ্গত নয় বা তাদের অংশ নয় বা তাদের দ্বারা যাদের যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়নি মনের কাছে সেসব যেন বাস্তব অপেক্ষা কল্পনা মনে হয় এবং শুধু অস্বাভাবিক অবস্থাতেই এ উন্মুক্ত হয় অপর সব প্রকারের সচেতন অনুভূতিতে। কিন্তু বস্তুতঃ পশ্চাতে বিশাল সব ক্ষেত্র আছে যাদের সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি যদি আমরা আমাদের আন্তর সত্তার দুয়ার উন্মুক্ত করি। এই সব ক্ষেত্রগুলি ইতিপূর্বেই সক্রিয় রয়েছে এবং আমাদের মধ্যে অধিচেতন আত্মার নিকট তারা জ্ঞাত আর এমনকি আমাদের উপরিস্থ চেতনার অনেক কিছু জিনিসই তাদের থেকে সরাসরিভাবে প্রক্ষিপ্ত হয় আর আমাদের অজ্ঞাতেই সেসব জিনিস বিষয় সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্বৃত্ত অনুভূতিকে প্রভাবিত করে। প্রাণিকভাবাপন্ন শারীর চেতনার বাহ্য ক্রিয়ার পশ্চাতে ও অধিচেতনভাবে ও এর থেকে ভিন্ন স্বতন্ত্র প্রাণিক অনুভূতির এক ক্ষেত্র বিদ্যমান। আর যখন এই ক্ষেত্র নিজেকে উন্মুক্ত করে বা কোনভাবে সক্রিয় হয়, তখন জাগ্রত মনের কাছে ব্যক্ত হয় এক প্রাণিক চেতনার ঘটনাবলী, এক প্রাণিক বোধি, এক প্রাণিক ইন্দ্রিয় যা দেহ ও তার করণের অধীন নয় যদিও এ সে সবকে ব্যবহার করতে পারে গৌণ মাধ্যম বা লিপিকার হিসেবে। এই ক্ষেত্রটিকে সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত করা সম্ভব আর যখন আমরা তা করি আমরা দেখি যে এর কার্য আমাদের মধ্যে এমন এক ব্যষ্টিভাবাপন্ন সচেতন প্রাণশক্তির কার্য এবং তার

সঙ্গে বিশ্বপ্রাণশক্তির ও বিভিন্ন বিষয়, ঘটনা ও ব্যক্তির মধ্যে এর কার্যাবলীর সংযোগ আছে। সকল বিষয়ের মধ্যে স্থিত প্রাণচেতনার কথা মন জানতে পারে, আমাদের প্রাণচেতনার মধ্য দিয়ে এ এমন অব্যবহিত সরাসরিভাবে সাড়া দেয় যে এ দেহ ও তার অঙ্গগুলির মাধ্যমে সাধারণ যোগাযোগের মত সীমিত হয় না; মন এর বোধিগুলি লিপিবদ্ধ করে, আর অস্তিত্বকে অনুভব করতে সমর্থ হয় বিশ্বপ্রাণের রূপান্তর হিসেবে। যে ক্ষেত্র সম্বন্ধে প্রাণিক চেতনা ও প্রাণিক ইন্দ্রিয় মুখ্যতঃ অবগত তা রূপের ক্ষেত্র নয় বরং সরাসরিভাবে বিভিন্ন শক্তির ক্ষেত্র: এর জগৎ বিভিন্ন শক্তির ক্রীড়ার জগৎ এবং রূপ ও ঘটনা সম্বন্ধে যে ইন্দ্রিয়-বোধ হয় তা হয় শুধু গৌণতঃ বিভিন্ন শক্তির পরিণাম ও মূর্ততা হিসেবে। স্থূল ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে কর্মরত মন শুধু এই ধরনের এক দৃষ্টি ও জ্ঞান নির্মাণ করতে পারে বুদ্ধির মধ্যে ভাবনা হিসেবে কিন্তু এ শক্তিসমূহের ভৌতিক রূপান্তরের উজানে যেতে অক্ষম, আর সুতরাং প্রাণের আসল স্বভাব সম্বন্ধে এর কোন সত্যকার বা সরাসরি অনুভূতি নেই, প্রাণশক্তি ও প্রাণপুরুষ সম্বন্ধে কোন বাস্তব উপলব্ধি নেই। অন্তরে এই অন্য স্তর বা গভীর প্রদেশ উন্মুক্ত করেই এবং প্রাণিক চেতনা ও প্রাণিক ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রবেশ করেই মন পেতে পারে সত্যকার ও সরাসরি অনুভূতি। তবু তখনো, যতদিন এ মানসিক স্তরে থাকে ততদিন অনুভূতি সীমিত থাকে প্রাণিক সব সংজ্ঞা ও তাদের মানসিক রূপান্তরের দ্বারা এবং এই বর্ধিত ইন্দ্রিয় ও জ্ঞানের মধ্যেও অস্পষ্টতা থাকে। অতিমানসিক রূপান্তর প্রাণকে অতিপ্রাণিকভাবাপন্ন করে, একে প্রকাশ করে চিৎপুরুষের প্রবৃত্তি হিসেবে এবং প্রাণশক্তি ও প্রাণপুরুষের পিছনে ও ভিতরে অবস্থিত সমগ্র আধ্যাত্মিক সদ্‌বস্তুকে ও এর সকল আধ্যাত্মিক ও মানসিক ও শুদ্ধ প্রাণিক সত্য ও তাৎপর্যকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ক'রে প্রকৃতভাবে প্রকাশ করে।

অতিমানস শারীরিক সত্তার মধ্যে অবতরণ করার সময় আমাদের অধিকাংশের মধ্যে অবগুণ্ঠিত বা তমসাচ্ছন্ন চেতনাকে জাগ্রত করে যদি না তা আগেই পূর্বের যৌগিক সাধনার দ্বারা জাগ্রত হয়ে থাকে আর এই চেতনাই প্রাণকোষ ধারণ ও গঠন করে। যখন এ জাগ্রত হয়, তখন আর আমরা শুধু স্থূল দেহের মধ্যে বাস করি না, আমরা আরো বাস করি এক প্রাণিক দেহের মধ্যে যা স্থূল শরীরের ভিতরে যায় ও একে ঘিরে রাখে এবং তা সংবেদনশীল এক অন্যপ্রকার আঘাতে, এক প্রাণিক শক্তিসমূহের ক্রীড়ায় — আমাদের চারপাশে যে প্রাণিক শক্তি কিংবা বিশ্ব হতে আমাদের উপর এসে-পড়া প্রাণিক শক্তি অথবা বিশেষ সব ব্যক্তি বা সমষ্টি জীবন বা বস্তুরাজি কিংবা ভৌতিক জগতের অন্তরালে স্থিত প্রাণিক স্তর ও জগৎসমূহ হতে আগত শক্তিরাজি। এই আঘাতগুলিকে আমরা এখনো অনুভব করি তবে তা করি তাদের পরিণামে ও কতকগুলি স্পর্শে ও মিথ্যা ভাবে কিন্তু তাদের উৎসে বা আসার পথে তাদের মোটেই অনুভব করি না বা যৎসামান্যই অনুভব করি। প্রাণিক দেহের মধ্যে জাগ্রত চেতনা এসবকে তখনি অনুভব করে, ভৌতিক শক্তির অতিরিক্ত অন্য এক ব্যাপক প্রাণিক শক্তির কথা অবগত হয়, প্রাণিক শক্তির বৃদ্ধি ও বিভিন্ন ভৌতিক শক্তির ধারণের জন্য এর থেকে আহরণ করে, এই

প্রাণিক অন্তঃপ্রবাহের সাহায্যে বা বিভিন্ন প্রাণধারা চালনা ক'রে স্বাস্থ্য ও রোগের বিষয় ও কারণগুলির সঙ্গে সরাসরি মোকাবিলা করতে পারে আর জানতে পারে অপরজনের প্রাণিক ও প্রাণাবেগময় পরিমণ্ডল এবং মোকাবিলা করতে সক্ষম হয় তার সব আদানপ্রদানের সঙ্গে ও সেই সঙ্গে অন্য অনেক বিষয়ের সঙ্গে যেগুলি আমাদের বাহ্য চেতনায় অননুভূত বা অস্পষ্ট থাকে কিন্তু এখানে সচেতন ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়। এ আমাদের মধ্যে ও অন্যদের মধ্যে প্রাণময় পুরুষ ও প্রাণ-শরীরের কথা তীব্রভাবে অবগত হয়। অতিমানস এই প্রাণিক চেতনা ও প্রাণিক ইন্দ্রিয়কে নিয়ে তার সঠিক ভিত্তির উপর তাকে স্থাপন করে এবং একে রূপান্তরিত করে আর তা করা হয় সেই প্রাণশক্তিকে চিৎপুরুষের নিজ শক্তি হিসেবে এখানে প্রকাশ ক'রে যে প্রাণশক্তিকে স্ফুরন্ত করা হয়েছে সূক্ষ্ম ও স্থূল জড়ের উপর নিবিড় ও প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার জন্য ও জড়বিশ্বে গঠন ও ক্রিয়ার জন্য।

প্রথম ফল এই যে আমাদের ব্যষ্টি জীবনের সঙ্কীর্ণতাগুলি ভেঙে যায় এবং আমরা আর ব্যক্তিগত প্রাণশক্তি নিয়ে সর্বদা বা সাধারণতঃ বাস করি না, আমরা তখন বাস করি বিশ্বপ্রাণশক্তির ভিতরে ও তার দ্বারা। সকল বিশ্বপ্রাণই আমাদের ভিতরে ও মধ্য দিয়ে সচেতনভাবে স্রোতের মতো আসে, সেখানে এক স্ফুরন্ত নিরন্তর আবর্ত, এর শক্তির এক অবিচ্ছিন্ন কেন্দ্র, সঞ্চয় ও আদানপ্রদানের এক স্পন্দনশীল স্থান রাখে, একে তার বিভিন্ন শক্তি দিয়ে সর্বদাই পূর্ণ করে এবং সক্রিয়তার মধ্যে তাদের বাইরে ঢেলে দেয় আমাদের চারিদিকে জগতের উপর। আবার এই প্রাণশক্তিকে আমরা অনুভব করি শুধু এক প্রাণসমুদ্র ও বিভিন্ন স্রোতধারা হিসেবে নয়, আরো অনুভব করি যে এটি এক প্রাণিক পথ ও আকার ও দেহ, এক চিন্ময়ী বিশ্বশক্তির বহির্বর্ষণ আর এই সচেতন শক্তি নিজেকে প্রকাশ করে ভগবানের চিৎশক্তি ব'লে, সেই বিশ্বাতীত ও বিশ্বাত্মক আত্মা ও পুরুষের শক্তি হিসেবে যার, বা আরও সঠিকভাবে যাঁর এক যন্ত্র ও প্রবাহপ্রণালী হল আমাদের বিশ্বভাবাপন্ন ব্যষ্টিত্ব। এর ফলে আমরা বোধ করি যে আমরা অন্য সকলের সঙ্গে প্রাণে এক এবং সমগ্র প্রকৃতির এবং বিশ্বের মধ্যে সকল বিষয়ের প্রাণের সঙ্গে এক। আমাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল প্রাণশক্তির স্বচ্ছন্দ ও সচেতন আদানপ্রদান হয় বিশ্বের মধ্যে ক্রিয়াশীল সেই একই শক্তির সঙ্গে। আমরা অবগত হই যে তাদের জীবন আমাদেরই আপন জীবন অথবা অন্ততঃ তাদের উপর আমাদের এবং আমাদের উপর তাদের প্রাণসত্তার স্পর্শ, চাপ ও সঞ্চালিত গতি বুঝতে পারি। আমাদের মধ্যকার প্রাণিক ইন্দ্রিয় শক্তিশালী ও তীব্র হয়, এ তার সকল লোকেরই — ভৌতিক ও অতিভৌতিক, প্রাণিক ও অতিপ্রাণিক — সকল লোকেরই উপর এই প্রাণ জগতের ক্ষুদ্র বা বড়, সূক্ষ্ম বা বিশাল স্পন্দনগুলি সহ্য করতে সমর্থ হয়, এর সকল গতি ও আনন্দে পুলকিত হয় এবং সকল শক্তিরই কথা জানে এবং তাদের দিকে উন্মুক্ত থাকে। অতিমানস অনুভূতির এই বিশাল ক্ষেত্রকে অধিকার করে, এর সমগ্রকে দীপ্তিময় ও সুসমঞ্জস করে, একে অনুভূত করায় তবে অস্পষ্ট বা আংশিকভাবে নয় অথবা মানসিক অজ্ঞানতার ক্রিয়ার ফল যেসব সঙ্কীর্ণতা ও

প্রমাদ তাদের অধীন না করে বরং একে অর্থাৎ — একে ও এর প্রতি গতিকে প্রকাশিত করে এর সত্যে এবং শক্তি ও আনন্দের সমগ্রতায় এবং প্রাণ-প্রবৃত্তির বিরাট ও এখন অসীম সব শক্তি ও সামর্থ্যকে এর সকল ক্ষেত্রের উপর চালনা করে আমাদের জীবনের মধ্যে ভগবানের সরল অথচ জটিল, অনাবিল ও স্বতঃস্ফূর্ত অথচ অভ্রান্তভাবে রহস্যপূর্ণ সঙ্কল্প অনুযায়ী। যেমন স্থূল ইন্দ্রিয় ভৌতিক বিশ্বের বিভিন্ন রূপ ও ইন্দ্রিয়সংবিৎ জানার এক উপায়, তেমন এ প্রাণিক ইন্দ্রিয়কে ক'রে তোলে আমাদের চারিদিকে বিভিন্ন প্রাণশক্তি জানার এক সুষ্ঠু উপায়, আবার যে সক্রিয় প্রাণশক্তি আমাদের মধ্য দিয়ে আত্ম-অভিব্যক্তির যন্ত্র হিসেবে কাজ করে তাকে তার সব প্রতিক্রিয়ার সুষ্ঠু প্রবাহপ্রণালীতেও পরিণত করে।

৩

এই প্রাণিক চেতনা ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি, ভৌতিক শক্তি ছাড়া অন্য সব সূক্ষ্মশক্তির ক্রীড়ার এই সরাসরি ইন্দ্রিয়সংবিৎ ও বোধ ও তাতে সাড়া দেওয়া — এগুলিকে প্রায়ই কোন পার্থক্য না করেই "চৈত্যিক বিষয়াবলী" হিসেবে একই শ্রেণীর অন্তর্গত করা হয়। যে চৈত্যসত্তা, আভ্যন্তরীণ অন্তঃপুরুষ এখন প্রচ্ছন্ন থাকাতে স্থূল মন ও ইন্দ্রিয়গুলির বাহ্য ক্রিয়ার দ্বারা সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ বা আংশিকভাবে আবৃত — এ হল এক অর্থে তার জাগরণ, আর এই জাগরণ উপরে নিয়ে আসে নিমজ্জিত বা অধিচেতন আন্তর প্রাণিক চেতনা ও আরো নিয়ে আসে এক আন্তর বা অধিচেতন মানসিক চেতনা ও ইন্দ্রিয় যা শুধু সব প্রাণশক্তি ও তাদের ক্রীড়া ও সব ফল ও বিষয় নয়, যা বিভিন্ন মানসিক ও চৈত্য জগৎ, তারা যা কিছু ধারণ করে সে সব এবং সেই জগতের বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়া, স্পন্দন, বিষয়, রূপ ও প্রতিরূপও সরাসরিভাবে বোধ ও অনুভব করতে সমর্থ এবং তাছাড়া স্থূল অঙ্গগুলির সাহায্য বিনাই এবং তারা আমাদের চেতনার উপর যে সব সঙ্কীর্ণতা আরোপ করে সেসব ব্যতিরেকেই এক মনের সঙ্গে অন্য মনের সরাসরি আদানপ্রদান স্থাপনেও সমর্থ। কিন্তু চেতনার এই সব আন্তর ক্ষেত্রের দুই বিভিন্ন প্রকারের ক্রিয়া আছে। প্রথম প্রকারের ক্রিয়া বেশী বাহ্যধর্মী ও জাগরণশীল অধিচেতন মন ও প্রাণের বিশৃঙ্খল ক্রিয়া যা মন ও প্রাণসত্তার স্থূলতর সব কামনা ও ভ্রান্তির দ্বারা অবরুদ্ধ ও তাদের অধীন এবং যা তার অনুভূতি ও শক্তি ও বিভিন্ন সামর্থ্যের ব্যাপকতর ক্ষেত্র সত্ত্বেও সঙ্কল্প ও জ্ঞানের বিপুল পরিমাণের প্রমাদ ও বিকৃতির দ্বারা দূষিত, মিথ্যা আভাসন ও প্রতিমূর্তিতে, মিথ্যা ও বিকৃত সব বোধি ও চিদাবেশ ও সংবেগে পূর্ণ, আবার এই শেষেরটি এমনকি প্রায়ই কলুষিত ও ভ্রষ্ট, এবং স্থূল মন ও তার সব অস্পষ্টতার প্রভাবে দূষিত। এ হল এক নিকৃষ্ট স্তরের ক্রিয়া আর এর প্রতিই অতীন্দ্রিয়বাদী, সূক্ষ্মতত্ত্ববাদী, প্রেতাত্মবাদী, গুহ্যবাদী, শক্তি ও সিদ্ধি অন্বেষুরা বেশী প্রবণ, আর এই প্রকার অন্বেষণের বিপদ ও প্রমাদের সম্বন্ধে যে সব সতর্কবাণী দেওয়া হয় তা এই ক্রিয়ার

প্রতি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এই বিপজ্জনক এলাকা একেবারে এড়ান সম্ভব না হলে আধ্যাত্মিক সিদ্ধির সাধকের কর্তব্য হল একে যথাসম্ভব শীঘ্র অতিক্রম করা আর এখানে নিরাপদ বিধি হল এই সব জিনিসের কোনটাতেই আসক্ত না হওয়া, বরং নিয়ম হল আধ্যাত্মিক উন্নতিকেই একমাত্র প্রকৃত উদ্দেশ্য করা আর অন্য কোন বিষয় নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস না করা যতক্ষণ না মন ও প্রাণপুরুষ শুদ্ধ হয়, আর চিৎপুরুষ ও অতিমানসের আলো বা অন্ততঃ আধ্যাত্মিক প্রভাস মন ও অন্তঃপুরুষের আলো এসে পড়ে অনুভূতির এই সব আন্তর ক্ষেত্রে। কারণ যখন মনকে শান্ত ও শুদ্ধ করা হয় ও শুদ্ধ চৈত্যসত্তা কামপুরুষের জেদ থেকে মুক্ত হয়, তখন এই সব অনুভূতির বড় বিপদ কেটে যায় — অবশ্য এই ছাড়া তারা যে সঙ্কীর্ণতা ও কিছু পরিমাণ প্রমাদের বশে থাকে, সেগুলিকে সম্পূর্ণ দূর করা যায় না যতক্ষণ অন্তঃপুরুষ অনুভব ও কাজ করে মানসিক স্তরে। কারণ তখন আসে প্রকৃত চৈত্য চেতনা ও তার সব শক্তির শুদ্ধ ক্রিয়া, পাওয়া যায় এমন চৈত্য অনুভূতি যা নিকৃষ্ট বিকৃতির মধ্যেও নিজে শুদ্ধ, যদিও প্রতিফলনকারী মনের সঙ্কীর্ণতার অধীন থাকে এবং উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিকভাবাপন্নতা ও আলোকে সমর্থ। তবে সম্পূর্ণ শক্তি ও সত্য আসার একমাত্র উপায় হল অতিমানসের উন্মুক্ততা এবং মানসিক ও চৈত্য অনুভূতির অতিমানসীকরণে।

চৈত্য চেতনা ও এর সব অনুভূতির ক্ষেত্র প্রায় অসীম এবং এর সব বিষয়ের বৈচিত্র্য ও জটিলতা প্রায় অনন্ত। এখানে কেবল উল্লেখ করা যায় কতকগুলি স্থূল রেখা ও প্রধান লক্ষণ। প্রথম ও শ্রেষ্ঠ ক্রিয়া হল চৈত্য ইন্দ্রিয়গুলির; এদের মধ্যে দৃষ্টিই সাধারণতঃ সর্বাপেক্ষা বিকশিত এবং যখন বাহ্য চেতনার মধ্যে তন্ময়তার যে আবরণ আন্তর-দর্শন রোধ করে তা ছিন্ন হয় তখন এই বন্ধনহীন বিপুলতায় প্রথম নিজেকে প্রকট করে। কিন্তু সব স্থূল ইন্দ্রিয়েরই অনুরূপ শক্তি থাকে চৈত্যসত্তার মধ্যে — চৈত্য শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, আস্বাদন আছে: বস্তুতঃ স্থূল ইন্দ্রিয়গুলি নিজেরাই প্রকৃতপক্ষে আন্তর ইন্দ্রিয়ের প্রক্ষেপ এই সীমিত ও বহির্ভাবাপন্ন ক্রিয়ার মধ্যে, যে ক্রিয়া কাজ করে স্থূল জড়জগতে — তার ভিতরে, তার মাধ্যমে ও তার উপর। চৈত্য দৃষ্টি বিশিষ্টভাবে সেই সব প্রতিমূর্তি পায় যা সব গঠিত হয় মানসিক ও চৈত্য আকাশের, "চিত্তাকাশের" সূক্ষ্ম জড়ে। বিভিন্ন ভৌতিক বস্তু, ব্যক্তি, দৃশ্য, ঘটনা, স্থূল জগতে যা কিছু আছে, ছিল, হবে বা হতে পারে সে সবের অনুলিপি বা ছাপ এরা হতে পারে। এই প্রতিমূর্তিগুলি নানাভাবে ও সকলবিধ অবস্থার মধ্যেই দেখা যায়, সমাধিতে বা জাগ্রত অবস্থাতে দেখা যায় আর জাগ্রত অবস্থাতে শারীর চক্ষু বন্ধ ক'রে বা খুলে, কোন স্থূল বিষয় বা মাধ্যমের উপরে বা ভিতরে প্রক্ষিপ্ত হয়ে, অথবা দেখা যায় যেন তারা ভৌতিক বাতাবরণে জড়ভাবাপন্ন হয়েছে অথবা শুধু চিত্ত আকাশে যা নিজেকে প্রকাশ করে এই স্থূলতর ভৌতিক বাতাবরণে; অথবা তাদের দেখা যেতে পারে স্থূল চক্ষু দিয়েই গৌণ যন্ত্র হিসেবে স্থূল দর্শনের মতই অথবা শুধু চৈত্যদর্শন দিয়েই এবং "দেশ"-এর সঙ্গে আমাদের সাধারণ দৃষ্টির বিভিন্ন সম্বন্ধের অনধীন হয়ে। প্রকৃত কার্যসাধক সর্বদাই চৈত্য দৃষ্টি আর এই শক্তি

সূচিত করে যে চৈত্য শরীরের মধ্যে চেতনা কমবেশী কতটা জাগ্রত — মাঝে মাঝে না অনবরত এবং মোটামুটি সুষ্ঠুভাবে। স্থূল দৃষ্টির সীমার বাইরে যে কোন দূরত্বে এইভাবে বিষয়সমূহের অনুলিপি বা ছাপ অথবা অতীত বা ভবিষ্যতের প্রতিরূপ দেখা সম্ভব।

এইসব অনুলিপি বা ছাপ ছাড়া চৈত্য দর্শন সেই সব ভাবনা-প্রতিমূর্তি ও অন্যান্য রূপ পায় যা সব সৃষ্ট হয় আমাদের নিজেদের মধ্যে অথবা অপর মানুষের মধ্যে চেতনার নিরন্তর ক্রিয়ার দ্বারা, আর এইগুলি ক্রিয়ার চরিত্র অনুযায়ী সত্যের বা মিথ্যার অথবা মিশ্রিত বিষয়ের — কিছু সত্য, কিছু মিথ্যার — প্রতিমূর্তি হতে পারে, আবার এরা শুধু বাইরের আবরণ ও প্রতিরূপ হতে পারে আর না হয় এমন প্রতিমূর্তি হতে পারে যেগুলি অস্থায়ী প্রাণ ও চেতনায় অনুপ্রাণিত, আর সময় সময় তাদের সঙ্গে একভাবে বা অন্যভাবে কোন প্রকার মঙ্গলজনক বা অমঙ্গলজনক ক্রিয়া আমাদের মন বা প্রাণিক সত্তার উপর অথবা তাদের মধ্য দিয়ে এমনকি দেহের উপর কোন ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত প্রভাব আসে। এমনও সম্ভব যে চেতনার এই সব অনুলিপি, ছাপ, ভাবনা-প্রতিমূর্তি, প্রাণ-প্রতিমূর্তি, প্রক্ষেপ ভৌতিক জগতের প্রতিরূপ বা সৃষ্টি নয়, পরন্তু এরা আমাদের জগদতীত বিভিন্ন প্রাণিক, চৈত্য বা মানসিক জগতের এমন প্রতিরূপ ও সৃষ্টি যা আমাদের নিজেদের মনে দেখা হয়েছে অথবা মানুষ ছাড়া অন্যদের কাছ থেকে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। আর যেমন এই চৈত্যদর্শন আছে যার কতকগুলি অপেক্ষাকৃত বাহ্য ও সাধারণ অভিব্যক্তি অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি নামে সুপরিচিত তেমন চৈত্য শ্রবণ ও চৈত্য স্পর্শ, আস্বাদন ও ঘ্রাণ আছে — যাদের অপেক্ষাকৃত বাহ্য অভিব্যক্তি হল অতীন্দ্রিয় শ্রবণ, অতীন্দ্রিয় বোধ; আর এদের প্রত্যেকের নিজ নিজ প্রকারের ঠিক সেই রকম পরিসর এবং বিষয় সম্বন্ধে সেই একই ক্ষেত্র ও রীতি ও অবস্থা ও বৈচিত্র্য থাকে।

এই সব ও অন্য সব বিষয় চৈত্য অনুভূতির এক পরোক্ষ প্রতিনিধিমূলক পরিসর সৃষ্টি করে; কিন্তু চৈত্য ইন্দ্রিয়েরও এমন শক্তি আছে যাতে আমাদের আরো সরাসরি যোগাযোগ হয় পার্থিব বা অতি-পার্থিব সত্তার সঙ্গে তাদের চৈত্য আত্মার বা চৈত্য দেহের মাধ্যমে, অথবা এমনকি বিভিন্ন বস্তুরও সঙ্গে, কারণ বস্তুসমূহেরও অবলম্বনস্বরূপ চৈত্য সদ্‌বস্তু ও অন্তঃপুরুষ বা উপস্থিতি থাকে এবং আমাদের চৈত্য চেতনার সঙ্গে যোগাযোগে সমর্থ। অধিকতর শক্তিশালী, যদিও বিরলতর, ঘটনার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নানাবিধ কার্যের জন্য চেতনার বহির্গমন — স্থূলদেহের কাজ হতে ভিন্ন এবং তা দেহ ছাড়া অন্যত্র; চৈত্য দেহে বা তার কোন বিভূতি কিংবা প্রতিমূর্তিতে আদানপ্রদানের ক্ষমতা এবং তা প্রায়ই, যদিও সর্বদা নয়, নিদ্রা কিংবা সমাধির অবস্থায়; এবং অস্তিত্বের অন্য কোন লোকের অধিবাসীর সঙ্গে নানা উপায়ে বিভিন্ন সম্বন্ধ বা যোগাযোগ স্থাপন।

কারণ চেতনার বিভিন্ন লোকের এক অবিচ্ছিন্ন পর্যায় আছে: এর আদিতে আছে পৃথ্বীলোকের সঙ্গে সংযুক্ত ও এর উপর নির্ভরশীল চৈত্য ও অন্যান্য স্তর আর তারপর প্রকৃত স্বতন্ত্র প্রাণময় ও চৈত্য জগৎসমূহের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে দেবতাদের জগতে

এবং অস্তিত্বের সর্বোচ্চ অতিমানসিক ও আধ্যাত্মিক লোকে। আর এইগুলি বস্তুতঃ আমাদের জাগ্রত মনের অজ্ঞাতে সর্বদাই আমাদের অধিচেতন আত্মার উপর সক্রিয় এবং আমাদের জীবন ও প্রকৃতির উপর এর প্রভাব অত্যধিক। স্থূল মন আমাদের শুধু এক অতি অল্প অংশ, আর আমাদের সত্তার আরো অনেক বিশাল ক্ষেত্র আছে যাদের মধ্যে অন্যান্য লোকের উপস্থিতি, প্রভাব ও শক্তি আমাদের উপর সক্রিয় এবং আমাদের বাহ্য সত্তা ও তার ক্রিয়াবলী গঠনে সহায়কর। চৈত্যচেতনার জাগরণে আমাদের ভিতরে ও চারিদিকে এই সব শক্তি, উপস্থিতি ও প্রভাবের কথা আমরা অবগত হই; আর যদিও অশুদ্ধ বা এখনো অজ্ঞানময় ও অপূর্ণ মনের অবস্থায় এই অনাবৃত সংযোগের বিপদ আছে তবু আবার ঠিকমত ব্যবহৃত ও চালিত হলে এই সংযোগের প্রভাবে আমরা আর সে সবের অধীন থাকি না বরং তাদের প্রভু হই এবং আমাদের প্রকৃতির বিভিন্ন আন্তর রহস্যের সচেতন ও আত্ম-নিয়ন্ত্রিত অধিকারে আসি। চৈত্য চেতনা আন্তর ও বাহ্য লোকগুলির মধ্যে, এই জগৎ ও অন্যান্য জগতের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রকট করে — আর তা করে কিছুটা আমাদের আন্তর ভাবনা ও চিন্ময় সত্তার উপর তাদের অভিঘাত, আভাসন ও বার্তা সম্বন্ধে এবং সেখানে এদের উপর প্রতিক্রিয়ার সামর্থ্য সম্বন্ধে এক সংবিতের দ্বারা যা সম্ভবতঃ অতিস্থির, বিশাল ও স্পষ্ট; আর কিছুটা করে বিভিন্ন চৈত্য ইন্দ্রিয়ের নিকট দেওয়া বহু রকমের প্রতীকমূলক, অনুলিপিমূলক বা প্রতিনিধিমূলক প্রতিমূর্তির মাধ্যমে। কিন্তু আবার অন্যান্য জগৎ ও লোকের বিভিন্ন সামর্থ্য, শক্তি ও সত্তাদের সঙ্গে এমন এক যোগাযোগ হওয়ার সম্ভাবনা আছে যা আরো সরাসরি, মূর্তভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, প্রায় জড়ীয়, কখনো কখনো সক্রিয়ভাবে জড়ীয় — মনে হয় অস্থায়ী হলেও এক সম্পূর্ণ ভৌতিক জড়ীভূত হওয়াও সম্ভব। এমনকি ভৌতিক চেতনা ও জড়ীয় অস্তিত্বের সীমাও সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হওয়া সম্ভব।

চৈত্য চেতনার জাগরণের ফলে আমাদের মধ্যে মনকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় হিসেবে সরাসরি ব্যবহারের পথ খুলে যায় আর এই শক্তিকে নিত্য ও স্বাভাবিক করা সম্ভব। স্থূল চেতনা যে অপরের মনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বা আমাদের চারিদিককার জগতের বিভিন্ন ঘটনা জানতে সমর্থ হয় তা একমাত্র বাহ্য উপায়, চিহ্ন ও সঙ্কেতের সাহায্যে, আর এই সীমিত ক্রিয়ার বাইরে মনের আরো সরাসরি সামর্থ্যগুলিকে এ খুব অস্পষ্ট ও এলোমেলোভাবে ব্যবহার করে আর এ যে সব সাময়িক প্রাগনুভব, বোধি ও বার্তার পরিসর তাও সঙ্কীর্ণ। বস্তুতঃ আমাদের মন নিরন্তর অপরদের মনের উপর কাজ করছে আর তাদের মনও আমাদের উপর কাজ করছে আর তা হয় আমাদের অজ্ঞাত প্রচ্ছন্ন স্রোতধারার মধ্য দিয়ে কিন্তু এই সব কার্যসাধক সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান নেই অথবা এদের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। চৈত্য চেতনা বিকশিত হলে আমরা জানতে পারি যে সকল প্রকারের কি বিপুল পরিমাণ ভাবনা, বেদনা, আভাসন, সঙ্কল্প, সংঘাত, প্রভাব আমরা অপরদের কাছ থেকে পাচ্ছি বা অপরদের নিকট পাঠাচ্ছি বা আমাদের চারিদিককার সাধারণ মনের পরিমণ্ডল থেকে ভিতরে গ্রহণ করছি বা তার মধ্যে নিক্ষেপ

করছি। যতই এর শক্তি, যাথার্থ্য ও স্পষ্টতা বিকশিত হয় ততই আমরা সমর্থ হই তাদের উৎসের সন্ধান পেতে অথবা অবিলম্বে তাদের উৎপত্তি ও আমাদের নিকট তাদের সংক্রমণ অনুভব করতে এবং আরো সমর্থ হই সচেতনভাবে ও বুদ্ধিযুক্ত সঙ্কল্পের সঙ্গে আমাদের নিজেদের বার্তা প্রেরণ করতে। স্থূলভাবে আমাদের নিকটবর্তী অথবা দূরবর্তী সব মনের ক্রিয়াবলী কম বেশী সঠিকভাবে ও বিবেচনার সঙ্গে জানা, তাদের ধাত, চরিত্র, বিভিন্ন ভাবনা, বেদনা, প্রতিক্রিয়া বোঝা, অনুভব করা বা তাদের সঙ্গে একাত্ম হওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে আর তা সম্ভব হয় কোন চৈত্য ইন্দ্রিয় দ্বারা অথবা কোন সরাসরি মানসিক বোধের দ্বারা অথবা আমাদের মনের মধ্যে কিংবা তার অঙ্কনকারী পৃষ্ঠের উপর স্পষ্ট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে ও সময় সময় তা অতি তীব্রভাবে তাদের গ্রহণের দ্বারা। সেই একই সময় আমরা অপরদের আন্তর আত্মাকে এবং যদি তারা পর্যাপ্ত পরিমাণে সংবেদনশীল হয় তাদের বাহ্য মনকেও আমাদের নিজেদের আন্তর মানসিক বা চৈত্য আত্মার কথা জানাতে এবং ওদের কাছে এর বিভিন্ন ভাবনা, আভাসন, প্রভাব সম্বন্ধেও নমনীয় করতে সচেতনভাবে সক্ষম হই, অথবা এমনকি সক্ষম হই একে বা এর সক্রিয় প্রতিমূর্তিকে প্রবলভাবে নিক্ষেপ করতে তাদের প্রত্যক্‌বৃত্ত সত্তার মধ্যে, এমনকি তাদের প্রাণিক ও শারীরিক সত্তার মধ্যেও যেন এ সেখানে কাজ করতে পারে এক সহায়কর বা গঠনকারী বা প্রভাবশালী শক্তি ও উপস্থিতি হিসেবে।

চৈত্য চেতনার এই সব শক্তিগুলির মানসিক উপযোগিতা ও তাৎপর্য ভিন্ন বেশী কিছু থাকার প্রয়োজন নেই আর প্রায়ই থাকেও না, তবে একে আধ্যাত্মিক ভাব, আলো ও অভিপ্রায় সহ আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যের জন্যও ব্যবহার করা যায়। অপরদের সঙ্গে আমাদের চৈত্য আদানপ্রদানে এক আধ্যাত্মিক অর্থ ও উপযোগ প্রয়োগ ক'রে তা করা সম্ভব হয় আর প্রধানতঃ এই প্রকারের চৈত্য-আধ্যাত্মিক আদানপ্রদানের দ্বারাই যোগ-গুরু তাঁর শিষ্যকে সাহায্য করেন। আমাদের আন্তর অধিচেতন ও চৈত্য প্রকৃতির, সেখানকার বিভিন্ন শক্তি ও উপস্থিতি ও প্রভাবের জ্ঞানকে এবং অন্যান্য বিভিন্ন লোক ও তাদের সব শক্তি ও সত্তার সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষমতাকে মানসিক বা লৌকিক উদ্দেশ্য ছাড়া শ্রেয়তর অন্য সব উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করা যেতে পারে আর ব্যবহার করা যেতে পারে আমাদের সমগ্র প্রকৃতিকে অধিকার ও আয়ত্ত করার জন্য এবং সত্তার পরম আধ্যাত্মিক শিখরে যাবার পথে মধ্যবর্তী লোকগুলি অতিক্রম করার জন্য। কিন্তু চৈত্য চেতনার সর্বাপেক্ষা সরাসরি আধ্যাত্মিক ব্যবহার হল একে ভগবানের সঙ্গে সংযোগ, কথাবার্তা ও মিলনের যন্ত্র করা। প্রকাশক ও শক্তিশালী ও জীবন্ত রূপ ও যন্ত্রস্বরূপ বিভিন্ন চৈত্য-আধ্যাত্মিক প্রতীকের এক জগৎ সহজেই উন্মুক্ত হয় আর এইগুলিকে করা যায় আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের প্রকাশক, আমাদের আধ্যাত্মিক উপচয়ের এবং আধ্যাত্মিক সামর্থ্য ও অনুভূতির বিকাশের অবলম্বন, আধ্যাত্মিক শক্তি, জ্ঞান বা আনন্দ প্রাপ্তির উপায়। মন্ত্র হল এই রকম এক চৈত্য-আধ্যাত্মিক উপায় যা দিব্য অভিব্যক্তির জন্য যুগপৎ একটি প্রতীক, যন্ত্র ও নাদ-শরীর, আর সেই একই প্রকারের হল ভগবানের এবং

তাঁর বিভিন্ন রূপ বা শক্তির মূর্তিগুলি যা যোগে ব্যবহার করা হয় ধ্যান বা আরাধনার জন্য। ভগবানের বিভিন্ন মহান্ রূপ বা বিগ্রহ প্রকাশিত হয় আর এদের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের কাছে তাঁর জীবন্ত উপস্থিতি প্রকাশ করেন এবং এদের সাহায্যে আমরা আরো সহজেই তাঁকে নিবিড়ভাবে জানতে ও আরাধনা করতে এবং তাঁর নিকট নিজেদের নিবেদন করতে সমর্থ হই, আর প্রবেশ করতে পারি তাঁর আবাস ও উপস্থিতির বিভিন্ন লোকে, জগতে যেখানে আমরা বাস করতে পারি তাঁর সত্তার আলোকের মধ্যে। তাঁর বাণী, আদেশ, উপস্থিতি, স্পর্শ, দেশনা আমাদের কাছে আসতে পারে আমাদের আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন চৈত্য চেতনার মধ্য দিয়ে এবং চিৎপুরুষের এই সূক্ষ্ম কিন্তু নিবিড় সঞ্চারণের উপায় দ্বারা এ আমাদের দিতে পারে আমাদের চৈত্য ইন্দ্রিয়সকলের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে এক অন্তরঙ্গ যোগ ও সান্নিধ্য। এইগুলি ও আরো অনেক হল চৈত্য চেতনা ও ইন্দ্রিয়ের আধ্যাত্মিক ব্যবহার এবং যদিও তাদের সঙ্কীর্ণতা ও বিকৃতি আসা সম্ভব, — কারণ আমাদের মনের আত্যন্তিক আত্ম-সীমাকরণের ক্ষমতার দরুন সকল গৌণ করণই আংশিক উপলব্ধির উপায় হতে পারে আবার সেই সঙ্গে আরো অখণ্ড উপলব্ধির বিঘ্নও হতে পারে — তারা আধ্যাত্মিক সিদ্ধির পথে অতীব উপযোগী এবং পরে আমাদের মনের সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত হলে এবং রূপান্তরিত ও অতিমানসভাবাপন্ন হয়ে তারা হয় আধ্যাত্মিক আনন্দের এক বৈচিত্র্যময় সমৃদ্ধ উপাদান।

শারীরিক ও প্রাণিক চেতনা ও ইন্দ্রিয়ের মতো, চৈত্য চেতনা ও ইন্দ্রিয়ও অতিমানসিক রূপান্তরে সমর্থ ও এর দ্বারা তারা পায় তাদের আপন অখণ্ড পূর্ণতা ও তাৎপর্য। অতিমানস চৈত্যসত্তাকে অধিকারে এনে তার মধ্যে অবতরণ করে, একে নিজ প্রকৃতির ছাঁচে পরিবর্তিত করে এবং উত্তোলন করে যাতে এ হতে পারে অতিমানসিক ক্রিয়া ও অবস্থার এক অংশ, বিজ্ঞানপুরুষের অতি-চৈত্য সত্তা। এই পরিবর্তনের প্রথম ফল হল চৈত্য চেতনার বিষয়গুলিকে তাদের সত্যকার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা আর তা করার উপায় হল অপরদের মন ও অন্তঃপুরুষের সঙ্গেহত এবং বিশ্বপ্রকৃতির মন ও অন্তঃপুরুষের সঙ্গে একত্বের স্থায়ী বোধ, সম্পূর্ণ উপলব্ধি ও দৃঢ় অধিকার আনা। কারণ সর্বদাই অতিমানসিক উপচয়ের ফল হল ব্যষ্টি চেতনাকে বিশ্বভাবাপন্ন করা। যেমন এ এমনকি আমাদের ব্যষ্টি প্রাণিক ক্রিয়ায় ও আমাদের চারিদিককার সকলের সঙ্গে এর বিভিন্ন সম্পর্ক বিষয়ে আমাদিগকে বিশ্বপ্রাণের সঙ্গে জীবন ধারণ করতে সমর্থ করে, তেমন এ আমাদের সমর্থ করে বিশ্ব মন ও চৈত্য সত্তার সঙ্গে চিন্তা ও অনুভব ও ইন্দ্রিয়বোধ করতে যদিও তা হয় এক ব্যষ্টিগত কেন্দ্র বা করণের মাধ্যমে। এর দুইটি ফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমতঃ চৈত্য চেতনা ও মনের বিষয়গুলির খণ্ডতা ও অসঙ্গতি দূর হয় কিংবা আরো দূর হয় দুরূহ নিয়ন্ত্রণ এবং অনুবর্তী প্রায়শই এক কৃত্রিমসম শৃঙ্খলা — এই কৃত্রিম শৃঙ্খলা অনুধাবন আমাদের আরো স্বাভাবিক বাহ্য মানসিকতার ক্রিয়াবলীতে যতটা প্রযুক্ত হয় তার চেয়েও এখানে বেশী; এই সব দূর হলে ঐ বিষয়গুলি হয়ে ওঠে

আমাদের মধ্যকার বিশ্ব আন্তর মন ও অন্তঃপুরুষের সুসঙ্গত ক্রীড়া, তারা ধারণ করে তাদের সত্য বিধান এবং সঠিক রূপ ও সম্পর্কগুলি এবং প্রকট করে তাদের যথার্থ তাৎপর্য। এমনকি মানসিক স্তরেও সাধক মনের অধ্যাত্মীকরণের দ্বারা অন্তঃপুরুষ একত্বের কিছু উপলব্ধি পেতে পারে, কিন্তু তা কখনই সত্যকারের সম্পূর্ণ নয় — অন্ততঃ প্রয়োগে সম্পূর্ণ নয় এবং এই প্রকৃত ও সমগ্র বিধান, রূপ, সম্পর্ক, তার বিভিন্ন তাৎপর্যের সম্পূর্ণ ও অভ্রান্ত সত্য ও যাথার্থ্য অর্জন করে না। আর দ্বিতীয়তঃ চৈত্য চেতনার ক্রিয়াবলী থেকে অস্বাভাবিকতার, অসামান্য, অনিয়মিত ও এমনকি বিপজ্জনক অতি-স্বাভাবিক ক্রিয়ার — যাতে প্রায়ই আসে জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণের অভাব এবং সত্তার অন্যান্য অংশে বিক্ষোভ বা ক্ষতি — সকল লক্ষণ লোপ পায়। এ যে শুধু তার নিজের মধ্যে আপন সঠিক সম্পর্ক লাভ করে তা নয়, এ একদিকে ভৌতিক জীবনের সঙ্গে সঠিক সম্বন্ধ লাভ করে আর অন্যদিকে লাভ করে সত্তার আধ্যাত্মিক সত্যের সঙ্গে সঠিক সম্বন্ধ আর সমগ্র হয়ে ওঠে দেহধারী চিৎপুরুষের এক সুসঙ্গত অভিব্যক্তি। উৎপাদক অতিমানসের মধ্যেই আছে আমাদের সত্তার অন্যান্য অংশের প্রকৃত সব মূল্য, তাৎপর্য ও সম্পর্ক এবং একমাত্র এর প্রকাশেই সম্ভব হয় আমাদের আত্মা ও প্রকৃতির অখণ্ড অধিকার।

আমরা সম্পূর্ণ রূপান্তর পাই একটা বিশেষ পরিবর্তনের দ্বারা — শুধু আমাদের সাক্ষী চিন্ময় আত্মার স্থিতিভঙ্গী বা স্তরের পরিবর্তনের দ্বারা নয়, অথবা এমনকি এর ধর্ম ও চরিত্রের দ্বারা নয়, আমরা তা পাই আমাদের চিন্ময়সত্তার সমগ্র ধাতুর পরিবর্তনের দ্বারা। যতদিন তা না করা হয়, ততদিন অতিমানসিক চেতনা ব্যক্ত হয় মানসিক ও চৈত্য পরিমণ্ডলের উপরে — যার মধ্যে ভৌতিক চেতনা ইতিপূর্বেই হয়ে উঠেছে আমাদের আত্মার প্রকাশের জন্য এক গৌণ এবং অনেক পরিমাণে অধীন পদ্ধতি — আর এ নিম্নে এর শক্তি, আলো ও প্রভাব পাঠিয়ে দেয় একে ভাস্বর ও রূপান্তরিত করতে। তবে একমাত্র যখন নিম্ন চেতনার ধাতু পরিবর্তিত হয়েছে, শক্তিশালীভাবে পূর্ণ, আশ্চর্যজনকভাবে রূপান্তরিত হয়েছে এবং যেন গ্রাস করা হয়েছে সত্তার মহত্তর শক্তি ও ইন্দ্রিয়ে, "মহান্, বৃহৎ"-এ, যার উৎপন্ন দ্রব্য ও প্রক্ষেপ এ, কেবল তখনই আমরা পাই সিদ্ধ, সম্পূর্ণ ও সতত অতিমানসিক চেতনা। সত্তার যে ধাতুর, যে চিন্ময় আকাশের মধ্যে মানসিক বা চৈত্য চেতনা ও ইন্দ্রিয় বাস করে ও দেখে ও বোধ করে ও অনুভূতি পায় তা স্থূল মন ও ইন্দ্রিয়ের ধাতু বা চিন্ময় আকাশ অপেক্ষা আরো বেশী সূক্ষ্ম, স্বচ্ছন্দ ও নমনীয়। যতদিন আমরা স্থূলমন ও ইন্দ্রিয়ের প্রভাবে থাকি ততদিন চৈত্য বিষয়গুলি মনে হতে পারে কম বাস্তব ও এমনকি কুহকপূর্ণ কিন্তু যতই আমরা চৈত্য চেতনার সঙ্গে ও সত্তার যে আকাশ এর আবাস তার সঙ্গে নিজেদের উপযোগী করি ততই আমরা সকল বিষয়ের সেই মহত্তর সত্য দেখতে ও আরো বেশী আধ্যাত্মিকভাবে নিবিড় ধাতু অনুভব করতে শুরু করি যার সাক্ষ্য হল এর অনুভূতির বৃহত্তর ও স্বচ্ছন্দতর প্রণালী। এমনকি ভৌতিক সত্তাও নিজের কাছে মনে হতে পারে অবাস্তব ও কুহকপূর্ণ — কিন্তু কেন্দ্রের

স্থানান্তরের জন্য এবং মন ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার পরিবর্তনের জন্য এ হল এক অতিরঞ্জন ও নতুন ভ্রান্তিকর আত্যন্তিকতা — আর না হয় অন্ততঃ মনে হতে পারে এর বাস্তবতা আরো কম জোরালো। কিন্তু যখন চৈত্য ও ভৌতিক অনুভূতিগুলি তাদের সঠিক পরিমাপে সুষ্ঠুভাবে সংযুক্ত হয়, তখন আমরা আমাদের সত্তার দুই অনুপূরক জগতে একই সাথে বাস করি; এদের প্রত্যেকের নিজ নিজ বাস্তবতা থাকে কিন্তু চৈত্য জগৎ প্রকাশ করে ভৌতিক জগতের পিছনে অবস্থিত সব কিছুকে, অন্তঃপুরুষের দৃষ্টি ও অনুভূতি প্রাধান্য পায় এবং ভৌতিক দৃষ্টি ও অনুভূতিকে আলোকিত ও ব্যাখ্যা করে। আবার অতিমানসিক রূপান্তর আমাদের চেতনার সমগ্র ধাতু পরিবর্তিত করে; এ নিয়ে আসে এক মহত্তর সত্তা, চেতনা, ইন্দ্রিয়, প্রাণের আকাশ যাতে প্রমাণিত হয় যে চৈত্য আকাশও অপ্রচুর আর দেখায় যে নিজে নিজে এ এক অপূর্ণ সদ্‌বস্তু এবং আমরা যা সব আছি ও হয়ে উঠি ও দেখি সে সবের শুধু এক আংশিক সত্য।

অবশ্য, চৈত্যচেতনার সব অনুভূতিকেই অতিমানসিক চেতনা ও শক্তির মধ্যে গ্রহণ ক'রে ধ'রে রাখা হয় কিন্তু তারা ভরে যায় এক মহত্তর সত্যের আলোকে, এক মহত্তর চিৎপুরুষের ধাতুতে। চৈত্যচেতনা প্রথম ধৃত ও আলোকিত হয়, পরে পূর্ণ ও অধিকৃত হয় অতিমানসিক আলোক ও শক্তিতে এবং তার সব স্পন্দনের প্রকাশক তীব্রতায়। যা কিছু অতিরঞ্জন, বিচ্ছিন্নতা-জাত প্রমাদ, অপ্রচুরভাবে দীপ্ত সংস্কার, ব্যক্তিগত আভাসন, ভ্রান্তিকর প্রভাব ও অভিপ্রায় অথবা অন্য কারণ, সঙ্কীর্ণতার বা বিকৃতির, মানসিক ও চৈত্য অনুভূতি ও জ্ঞানের সত্যে হস্তক্ষেপ করে থাকে, সে সব এখানে প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং সংশোধিত বা বিলুপ্ত হয় কারণ তারা বর্তমানের মহত্তর বৃহত্ত্বের উপযোগী সব বিষয়, ব্যক্তি, ঘটনা, ইঙ্গিত, প্রতিরূপের যে আত্মসত্য (সত্যম্ ঋতম্-এর) আলোকের মধ্যে থাকতে অক্ষম হয়। সমস্ত চৈত্য বার্তা, অনুলিপি, ছাপ, প্রতীক, প্রতিমূর্তি তাদের সত্যকার মূল্য পায়, তাদের সঠিক স্থান গ্রহণ করে, সে সবকে তাদের উপযুক্ত সম্পর্কে রাখা হয়। চৈত্যবুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সংবিৎ আলোকিত হয় অতিমানসিক ইন্দ্রিয়বোধ ও জ্ঞানে আর তাদের বিষয়গুলি — যেগুলি আধ্যাত্মিক ও জড় জগতের মধ্যবর্তী — শুরু করে স্বতঃই তাদের নিজেদের সত্য ও অর্থ এবং সেই সঙ্গে সেই সত্য ও তাৎপর্যের সঙ্কীর্ণতাও প্রকাশ করতে। আন্তর দর্শন, শ্রবণ ও সকল প্রকারের ইন্দ্রিয়সংবিতের নিকট যে প্রতিমূর্তিগুলি উপস্থাপিত হয় সেগুলি এক বিপুল পরিমাণের আরো বৃহৎ ও দীপ্ত স্পন্দনের দ্বারা, আলোক ও তীব্রতার এক মহত্তর ধাতুর দ্বারা অধিকৃত হয় অথবা সে সবের মধ্যে তারা ধৃত হয় আর এর ফলে প্রতিমূর্তিগুলির মধ্যে আসে সেই একই পরিবর্তন যা আসে স্থূল ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলিতে অর্থাৎ এক মহত্তর সমগ্রতা, এক যথার্থতা, প্রতিমূর্তিতে উপস্থিত ইন্দ্রিয়জ্ঞানের এক প্রকাশক শক্তি। আর সর্বশেষে সকল কিছুকেই তুলে নিয়ে গ্রহণ করা হয় অতিমানসের মধ্যে আর করা হয় বিজ্ঞানময় পুরুষের অনন্তগুণ দীপ্ত চেতনা, জ্ঞান ও অনুভূতির অঙ্গ।

এই অতিমানসিক রূপান্তরের পর সত্তার যে অবস্থা হবে তা তার চেতনার ও

জ্ঞানের সকল অংশে বিশ্বভাবাপন্ন ব্যষ্টিপুরুষের মধ্য দিয়ে সক্রিয় এক অনন্ত ও বিশ্বচেতনার অবস্থা। মূল শক্তি হবে তাদাত্ম্যের সংবিৎ, তাদাত্ম্যের দ্বারা জ্ঞান — সত্তার তাদাত্ম্য, চেতনার তাদাত্ম্য, সত্তা ও চেতনার শক্তির তাদাত্ম্য, সত্তার আনন্দের তাদাত্ম্য, তাদাত্ম্য অনন্তের সঙ্গে, ভগবানের সঙ্গে এবং যা সব অনন্তের মধ্যে আছে ও যা সব ভগবানের প্রকাশ ও অভিব্যক্তি সেসবের সঙ্গে। এই সংবিৎ ও জ্ঞান তার উপায় ও করণরূপে ব্যবহার করবে তাদাত্ম্যের দ্বারা জ্ঞান যা সব প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ সে সবের আধ্যাত্মিক দর্শন, এক অতিমানসিক ভাব-সৎ ও ভাবনা যার স্বরূপ হল সাক্ষাৎ ভাবনা-দর্শন, ভাবনা-শ্রবণ, ভাবনা-স্মৃতি যা সংবিতের নিকট প্রকাশ করে, ব্যাখ্যা করে সকল বিষয়ের সত্য বা এই সত্যের প্রতিরূপ আনে, এবং এক আন্তর সত্য কথন যা এ প্রকাশ করে এবং সর্বশেষ এক অতিমানসিক ইন্দ্রিয় যা অস্তিত্বের সকল লোকের মধ্যে সকল বিষয় ও ব্যক্তি ও সামর্থ্য ও শক্তির সঙ্গে দেয় সত্তার ধাতুতে সংস্পর্শের এক সম্পর্ক।

অতিমানস করণব্যবস্থার উপর নির্ভর করবে না; উদাহরণস্বরূপ স্থূল মন যেমন আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির সাক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল, ইহা ইন্দ্রিয়ের করণব্যবস্থার উপর তেমন নয়, যদিও এ জ্ঞানের উচ্চতর রূপের জন্য এদের যাত্রারম্ভের স্থান করতে সমর্থ আবার এ এই সব রূপের মধ্য দিয়ে সরাসরি যেতেও সমর্থ হবে, ইন্দ্রিয়কে রূপায়ণ ও পরাক্‌বৃত্ত প্রকাশের শুধু এক উপায়স্বরূপ করে। সেই সাথে বিজ্ঞানময় সত্তা রূপান্তরিত করবে ও নিজের মধ্যে নেবে মনের বর্তমান চিন্তন যা রূপান্তরিত হয়েছে তাদাত্ম্যের দ্বারা জাত এক বিশাল বৃহত্তর জ্ঞানে, সমগ্র অবধারণের দ্বারা জাত জ্ঞানে, ক্ষুদ্র অংশ ও সম্পর্কের নিবিড় বোধের দ্বারা জাত জ্ঞানে, আর এসবই — সরাসরি, অব্যবহিত, স্বতঃস্ফূর্ত, এবং সকলই আত্মার পূর্বস্থিত শাশ্বত জ্ঞানের প্রকাশ। স্থূল ইন্দ্রিয়কে, মনের সব ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ক্ষমতাকে, এবং চৈত্য চেতনা ও তার ইন্দ্রিয়গুলিকে এ গ্রহণ ক'রে রূপান্তরিত ও অতিমানসিকভাবাপন্ন করবে এবং তাদের ব্যবহার করবে অনুভূতির এক চরম আন্তর পরাক্‌বৃত্ততার উপায় হিসেবে। এর কাছে কোন কিছুই প্রকৃতভাবে বাহ্য হবে না, কারণ এ সকল কিছু অনুভব করবে বিশ্বচেতনার ঐক্যের মধ্যে যা হবে তার নিজের চেতনা, অনন্তের সত্তার ঐক্যের মধ্যে যা হবে তার নিজের সত্তা। এ জড়কে অনুভব করবে — শুধু স্থূল জড়কে নয়, সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতম জড়কেও — চিৎপুরুষের ধাতু ও রূপ হিসেবে, প্রাণ ও সকল প্রকার শক্তিকে অনুভব করবে চিৎপুরুষের প্রবৃত্তি হিসেবে, অতিমানসিকভাবাপন্ন মনকে অনুভব করবে চিৎপুরুষের জ্ঞানের এক উপায় বা প্রণালী হিসেবে, অতিমানসকে অনুভব করবে চিৎপুরুষের জ্ঞানের অনন্ত আত্মারূপে তার জ্ঞানের শক্তিরূপে ও তার জ্ঞানের আনন্দরূপে।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

অতিমানসিক কালদৃষ্টির দিকে

সকল সত্তা, চেতনা ও জ্ঞানের গতি হল অস্তিত্বের দুইটি অবস্থা ও শক্তির মধ্যে — একটি হল কালাতীত অনন্তের অবস্থা আর অন্যটি হল নিজের মধ্যে অনন্তের লীলায়িত হওয়ার ও কালের মধ্যে সকল বিষয়ের সংগঠন করার অবস্থা। আমাদের বর্তমান বাহ্য সংবিতের পক্ষে এই গতির কাজ চলে গুপ্ত ভাবে, আর এ ছাড়িয়ে যখন আমরা আধ্যাত্মিক ও অতিমানসিক স্তরে আরোহণ করি তখন তা চলে প্রকাশ্যভাবে। এই দুটি অবস্থা শুধু আমাদের মানসিক তর্কশক্তির পক্ষে পরস্পরবিরুদ্ধ ও অসঙ্গত কারণ এই তর্ক সর্বদাই বিব্রত হয়ে খঞ্জের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে চিরন্তন বিপরীতের বিরোধ ও বৈষম্যের ভ্রান্ত ধারণার চারিধারে। বস্তুতঃ, এই দুটি হল অনন্তের একই সত্যের শুধু সমবর্তী ও সমগামী অবস্থা ও গতিবৃত্তি আর তা আমরা জানতে পারি যখন আমরা বিষয়সমূহকে দেখি সেই জ্ঞান নিয়ে যার প্রতিষ্ঠা হল অতিমানসিক তাদাত্ম্য ও দর্শন এবং চিন্তা করি এই জ্ঞানের উপযোগী মহান্, গভীর ও নমনীয় তর্কশক্তি নিয়ে। কালাতীত অনন্ত এই অভিব্যক্তির অতীতে তার সত্তার শাশ্বত সত্যে নিজের মধ্যে সেই সব ধারণ করে যা এ ব্যক্ত করে কালের মধ্যে। এর কাল চেতনাও নিজে অনন্ত আর এ নিজের মধ্যে ধারণ করে যুগপৎ সম্পূর্ণ-দৃষ্টি ও অংশ-দৃষ্টি, চলমান পরম্পরা বা ক্ষণ-দর্শন ও পূর্ণ স্থির-দৃষ্টি বা স্থায়ী সমগ্র-দর্শন — আর এটা আমাদের কাছে মনে হয় বিষয়সমূহের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।

কালাতীত অনন্তের চেতনা আমাদের বোধগম্য করা যায় নানাভাবে, কিন্তু অতি সাধারণতঃ এ আমাদের মানসিকতার উপর আরোপিত হয় এর প্রতিফলনের এবং জোরালো ছাপের দ্বারা, আর না হয় একে আমাদের কাছে উপস্থিত করা হয় মনের ঊর্ধ্বে কিছু হিসেবে, তার জানা কিছু হিসেবে যার দিকে এ ওঠে কিন্তু যার মধ্যে এ প্রবেশ করতে অক্ষম কারণ এ বাস করে শুধু কাল-বোধের মাঝে ও ক্ষণ-পরম্পরায়। যদি আমাদের বর্তমান মন অতিমানসিক প্রভাবের দ্বারা রূপান্তরিত না হয়ে কালাতীতের মধ্যে প্রবেশ করতে চেষ্টা করে তাহলে হয় এ সমাধির তন্ময়তার মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে বিলুপ্ত হয়, আর না হয় জাগ্রত থেকে অনুভব করে যে এ অনন্তের মধ্যে বিকীর্ণ হয়েছে যেখানে হয়ত অতিভৌতিক দেশের, বিশালতার, চেতনার অসীম প্রসারতার বোধ বর্তমান কিন্তু কোন কাল-আত্মা, কাল-গতি বা কাল-ক্রম নেই। আর যদি মনোময় পুরুষ কালস্থিত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে যন্ত্রবৎ সচেতন থাকেই, তবু সেখানে সে স্বধারায় কাজ করতে অক্ষম আর অক্ষম কালাতীত তত্ত্ব ও কালগত বিষয়সমূহের মধ্যে সত্য সম্পর্কে স্থাপন করতে এবং নিজের অনির্দিষ্ট অনন্তের মধ্য থেকে কাজ ও সঙ্কল্প করতে। তখন

মনোময় পুরুষের পক্ষে যে কাজ সম্ভব তা হল শুধু প্রকৃতির করণগুলির যান্ত্রিক ক্রিয়া, যা চলতে থাকে পুরনো প্রবেগ ও অভ্যাসের জোরে অথবা অতীত শক্তির "প্রারব্ধে"র চলতে-থাকা প্রবর্তনার জোরে, অন্যথায় এক বিশৃঙ্খল, অনিয়ন্ত্রিত, অসম্বদ্ধ ক্রিয়া — এক শক্তির এলোমেলো বিবেচনাহীন ক্রিয়া যার আর কোন সচেতন কেন্দ্র নেই।

অপর পক্ষে অতিমানসিক চেতনা প্রতিষ্ঠিত হল কালাতীত অনন্তের পরম চেতনার উপর, আবার কালের মধ্যে অনন্তশক্তির লীলায়নের রহস্যও এর আছে। এ হয় কালচেতনায় স্থিত হয়ে কালাতীত অনন্তকে রাখতে পারে তার সেই পরম ও আদি সত্তার পটভূমিকা হিসেবে যা থেকে এ তার সকল সংগঠনকারী জ্ঞান, সঙ্কল্প ও ক্রিয়া লাভ করে, আর না হয় মূল সত্তায় কেন্দ্রগত হয়ে বাস করতে পারে কালাতীতের মধ্যে, কিন্তু আবার বাস করতে পারে কালের মধ্যে, অভিব্যক্তিরও মধ্যে যাকে সে অনুভব করে ও দেখে অনন্ত ব'লে ও সেই একই অনন্ত ব'লে এবং একটির মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে, পোষণ ও বিকাশ করতে পারে যা সে ধারণ করে দিব্যভাবে অন্যটির মাঝে। সুতরাং এর কালচেতনা মনোময় পুরুষের কালচেতনা থেকে ভিন্ন হবে, ক্ষণপ্রবাহের উপর অসহায়ভাবে বাহিত হবে না, আর প্রতি ক্ষণকেই এক আশ্রয় ও দ্রুত বিলীয়মান স্থিতিভূমি হিসেবে আঁকড়ে থাকবে না, বরং এ প্রতিষ্ঠিত হবে প্রথমতঃ কালপরিবর্তনের অতীত তার শাশ্বত তাদাত্ম্যের উপর এবং দ্বিতীয়তঃ কালের এককালীন নিত্যতার উপর যার মধ্যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিত্য একত্র থাকে সনাতনের আত্মজ্ঞান ও আত্মশক্তিতে; তৃতীয়তঃ এ প্রতিষ্ঠিত হবে তিনটি কালেরই এক সমগ্র দৃষ্টির উপর একটি গতি হিসেবে যা এমনকি তাদের পর্যায়, বিভাগ, যুগচক্রের মধ্যেও দৃষ্ট হয় এক ও অবিভাজ্য হিসেবে; সর্বশেষ এ প্রতিষ্ঠিত হবে — আর তা শুধু করণগত চেতনায় — ক্ষণগুলির ক্রমিক বিবর্তনের উপর। সুতরাং এর তিনটি কালেরই দৃষ্টি থাকবে, "ত্রিকালদৃষ্টি", যা প্রাচীনকালে দ্রষ্টা ও ঋষিদের সর্বোচ্চ চিহ্ন ব'লে গণ্য করা হ'ত। এর এই ত্রিকালদৃষ্টি কোন অস্বাভাবিক শক্তি হবে না, বরঞ্চ হবে তার কালজ্ঞানের স্বাভাবিক শক্তি।

এই একীকৃত ও অনন্ত কালচেতনা এবং এই দর্শন ও জ্ঞান অতিমানসিক পুরুষের ঐশ্বর্য তার নিজের পরম জ্যোতির্লোকে এবং এ সম্পূর্ণ হয় শুধু অতিমানসিক প্রকৃতির সর্বোচ্চ স্তরে। কিন্তু উন্নয়নকারী ও রূপান্তরকারী বিবর্তনমূলক যোগ-পদ্ধতির মধ্য দিয়ে — অর্থাৎ আত্ম-মোচনকারী, আত্ম-বিকাশক, উত্তরোত্তর আত্ম-সিদ্ধিকারী যোগপদ্ধতির মধ্য দিয়ে মানবচেতনার উত্তরণে আমাদের তিনটি ক্রমিক অবস্থার কথা বিবেচনা করতে হবে; এদের সবগুলিকেই অতিক্রম করতে হবে তবে যদি আমরা পরে সমর্থ হই সর্বোচ্চ স্তরগুলির উপর বিচরণ করতে। আমাদের চেতনার যে প্রথম অবস্থা অর্থাৎ যে চেতনার মধ্যে আমরা এখন বিচরণ করি তা হল অজ্ঞানতার এই মন যার উদ্ভব হয়েছে জড় প্রকৃতির অচিতি ও নির্জ্ঞান থেকে; এই মন অজ্ঞ কিন্তু তবে জ্ঞান-অন্বেষণে সমর্থ এবং তা এ পেয়ে থাকে অনেকগুলি মানসিক প্রতিরূপে যেগুলিকে প্রকৃত সত্যের সন্ধানসূত্র

করা যায়; উপর থেকে আলোকের প্রভাব, অন্তঃপ্রবেশ ও অবতরণের দ্বারা মন উত্তরোত্তর আরো সংস্কৃত ও দীপ্ত ও স্বচ্ছ হয়ে বুদ্ধিকে প্রস্তুত করে প্রকৃত জ্ঞানের সামর্থ্য উন্মেষের জন্য। এই মনের কাছে সকল সত্য এমন এক জিনিস যা তার গোড়ায় ছিল না আর যা তাকে অর্জন করতে হয়েছে অথবা এখনো অর্জন করতে হবে, এমন জিনিস যা তাকে আহরণ করতে হবে অভিজ্ঞতার দ্বারা অথবা অনুসন্ধান, গণনা, আবিষ্কৃত বিধানের প্রয়োগ, চিহ্ন ও সঙ্কেতসমূহের ব্যাখ্যা প্রভৃতির কতকগুলি নিরূপিত পদ্ধতি ও বিধির দ্বারা। এর যে জ্ঞান তাতেই সূচিত হয় যে এর পূর্বাবস্থা ছিল নির্জ্ঞান; এ অবিদ্যার এক করণ।

চেতনার দ্বিতীয় অবস্থা শুধু মানবের পক্ষেই ভব্য এবং তা পাওয়া যায় অজ্ঞানতার মনকে আন্তরভাবে আলোকিত ও রূপান্তরিত ক'রে; এ হল সেই অবস্থা যার মধ্যে মন বাইরে অপেক্ষা বরং ভিতরেই খোঁজে তার জ্ঞানের উৎসের জন্য আর যে কোন উপায়েই হ'ক এ তার নিজের অনুভব ও আত্ম-অনুভূতির কাছে এমন এক মন হয়ে ওঠে যা মূল অজ্ঞানের নয়, বরং তা হল আত্ম-বিস্মৃত জ্ঞানের। এই মন জানে যে সকল বিষয়ের জ্ঞান লুক্কায়িত আছে তার মধ্যে অথবা অন্ততঃ সত্তার মধ্যে কোন এক জায়গায়, তবে তা যেন আবৃত ও বিস্মৃত অবস্থায় এবং তার কাছে জ্ঞান আসে বাইরে থেকে অর্জিত কোন বিষয় হিসেবে নয়, তা আসে এমন বিষয় হিসেবে যা সর্বদাই সেখানে গূঢ়ভাবে ছিল ও এখন স্মরণে এসেছে এবং যাকে তৎক্ষণাৎ জানা যায় সত্য ব'লে — এতে প্রতি বিষয়টি থাকে তার নিজের স্থানে, মাত্রায়, প্রকারে ও পরিমাপে। এমনকি যখন জ্ঞানের উপলক্ষ হল কোন বাহ্য অনুভূতি, চিহ্ন বা সঙ্কেত, তখনো জ্ঞানের প্রতি এই তার ভাব, কারণ তার কাছে এটি উপলক্ষ মাত্র আর জ্ঞানের সত্যের জন্য সে বাহ্য সঙ্কেতের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে আন্তর সমর্থনকারী সাক্ষীর উপর। সত্যকার মন হল আমাদের মধ্যে বিশ্ব মন, আর ব্যষ্টি মন হল এক উপরভাসা প্রক্ষেপ; সুতরাং চেতনার দ্বিতীয় অবস্থা আমরা সেই সময় পাই যে সময় হয় ব্যষ্টি মন ক্রমশঃ আরো অন্তরাভিমুখে যায় এবং সর্বদাই সচেতনভাবে বা অবচেতনভাবে বিশ্বমানসিকতার সব স্পর্শের সমীপে থাকে ও তাদের প্রতি সংবেদনশীল হয় — এই বিশ্বমানসিকতার মধ্যেই সকল কিছু নিহিত থাকে, গৃহীত হয় এবং সকল কিছু ব্যক্ত হতে সমর্থ; আর না হয়, আরো বেশী প্রবলভাবে আমরা এই চেতনা পাই যখন আমরা বিশ্বমনের চেতনায় বাস করি আর ব্যক্তিগত মানসিকতা হয় শুধু উপরভাগে এক প্রক্ষেপ, চিহ্ন দেওয়ার কাষ্ঠখণ্ড অথবা কার্যারম্ভের যন্ত্র (Switch)।

চেতনার তৃতীয় অবস্থা হল জ্ঞানের সেই মন যার মধ্যে সকল বিষয় ও সকল সত্য দেখা ও অনুভূত হয় এই ব'লে যে তারা ইতিপূর্বেই উপস্থিত ও জানা ও অবিলম্বে লভ্য শুধু তাদের উপর আন্তর আলো নিক্ষেপ ক'রে যেমন কোন ব্যক্তি ঘরের মধ্যে জানা ও পরিচিত সব জিনিসের উপর নেত্রপাত করে — যদিও জিনিসগুলি সর্বদাই তার দৃষ্টিতে থাকে না কারণ দৃষ্টি মনোযোগী হয় না — আর সে সবকে মন লক্ষ্য করে পূর্ব-অবস্থিত জ্ঞানের বিষয় ব'লে। চেতনার দ্বিতীয় আত্ম-বিস্মৃত অবস্থা থেকে এই অবস্থার পার্থক্য

এই যে এখানে কোন প্রয়াস বা অন্বেষণের প্রয়োজন হয় না, শুধু প্রয়োজন হল যে কোন জ্ঞানের ক্ষেত্রে আন্তর আলোকে ঘুরিয়ে ফেলা অথবা খুলে দেওয়া, আর সুতরাং এ হল বিস্মৃত ও মন থেকে আত্ম-লুক্কায়িত বিষয়সমূহের স্মরণ নয়, বরং যে সব বিষয় পূর্ব থেকেই উপস্থিত, প্রস্তুত ও লভ্য তাদের দীপ্ত উপস্থাপনা। এই সর্বশেষ অবস্থা সম্ভব হবার একমাত্র উপায় হল বোধিমানসিকতাকে আংশিকভাবে অতিমানসভাবাপন্ন করা ও অতিমানসিক স্তর সমূহ থেকে আসা সব বার্তার প্রতিটির দিকে তাকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রাখা। জ্ঞানের এই মন স্বরূপে ভব্য সর্বশক্তিমত্তার সামর্থ্য, কিন্তু মনের স্তরে বাস্তব ক্রিয়ায় এ পরিসরে ও ক্ষেত্রে সীমিত। যখন অতিমানস মানসিক স্তরে নেমে এসে মানসিকতার আরো অল্প ধাতুর মধ্যে কাজ করে এবং তা নিজের ভাবে এবং শক্তি ও আলোর দেহে কাজ করলেও মানসিক সঙ্কীর্ণতার লক্ষণ তাতে বর্তায় এবং তা চলতে থাকে এমনকি অতিমানসিক যুক্তিশক্তির ক্রিয়াতেও। নিজের সব ক্ষেত্রে সক্রিয় একমাত্র পরতর অতিমানসিক শক্তিরই সঙ্কল্প ও জ্ঞান সর্বদা কাজ করে সীমাহীন আলোর মধ্যে অথবা জ্ঞানের অপরিমেয় বিস্তারের স্বচ্ছন্দ সামর্থ্যের সঙ্গে, তবে শুধু সেই সব সঙ্কীর্ণতা থাকে যেগুলি চিৎপুরুষ নিজের উপর স্বেচ্ছায় আরোপ করে তার নিজের সব উদ্দেশ্যের জন্য।

অতিমানসে বিকশিত হবার সময় মানবমনকে যেতে হবে এই সকল পর্যায়ের মধ্য দিয়ে এবং এর উত্তরণে ও বিস্তারে এ তার কালচেতনা ও কালজ্ঞানের বিভিন্ন শক্তির ও সম্ভাবনার অনেক পরিবর্তন ও নানাবিধ বিন্যাস অনুভব করতে পারে। প্রথমে মানুষ অজ্ঞানতার মনে অনন্ত কালচেতনাতেও বাস করতে অক্ষম আবার ত্রিকালজ্ঞানের কোন সরাসরি বাস্তবশক্তি আয়ত্তও করতে অক্ষম। অজ্ঞানতার মন কালের অবিভাজ্য অনুবৃত্তির মধ্যে বাস করে না, এ বাস করে পর পর প্রতি ক্ষণের মধ্যে। আত্মার নিত্যতা এবং অনুভূতির স্বরূপগত অনুবৃত্তি সম্বন্ধে এর এক অস্পষ্ট বোধ আছে, কিন্তু এ সেই আত্মার মধ্যে বাস করে না, আবার কোন সত্যকার কাল অনুবৃত্তির মধ্যেও বাস করে না, তবে এই অস্পষ্ট কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রবল সংবিৎকে ব্যবহার করে এক পটভূমিকা, আশ্রয়, আশ্বাস হিসেবে এমন কিছুর মধ্যে যা অন্যথায় হবে তার সত্তার এক সতত ভিত্তিহীন প্রবাহ। এর ব্যবহারিক ক্রিয়ায় এর একমাত্র অবলম্বন হল বর্তমানের মধ্যে তার স্থিতিভূমি ছাড়া সেই রেখা যা অতীত পিছনে ফেলে গিয়েছে এবং স্মৃতিতে রাখা হয়েছে, আর পূর্বের সব অভিজ্ঞতার দ্বারা সঞ্চিত বিপুল পরিমাণ সংস্কার এবং ভবিষ্যতের জন্য অভিজ্ঞতার নিয়মিত ভাব সম্বন্ধে আশ্বাস এবং এমন এক অনিশ্চিত পূর্বাভাসের শক্তি যার ভিত্তি হল কিছুটা পুনঃপুনঃ অভিজ্ঞতা এবং সুপ্রতিষ্ঠিত অনুমান এবং কিছুটা হল কল্পনামূলক রচনা ও আন্দাজ। অজ্ঞানতার মন নির্ভর করে বিভিন্ন আপেক্ষিক বা নৈতিক নিশ্চিততার কিছুটা ভিত্তি বা উপাদানের উপর কিন্তু বাকী সবের জন্য সম্ভবপর ও সম্ভাবনার সঙ্গে কারবারই তার প্রধান সম্বল।

এর কারণ এই যে অবিদ্যার মধ্যে মন বাস করে মুহূর্তের মধ্যে এবং চলে এক প্রহর

থেকে অন্য প্রহরে এমন এক পথিকের মতো যে শুধু তা-ই দেখে যা তার অব্যবহিত অবস্থানভূমির নিকটে থাকে এবং চারিদিকে দেখা যায় এবং যে অপূর্ণভাবে তাই স্মরণ করে যার মধ্য দিয়ে সে পূর্বে চলে এসেছে কিন্তু তার অব্যবহিত দৃষ্টি ছাড়িয়ে সম্মুখে যা কিছু আছে সে সকল অ-দেখা ও অ-জানা যার সম্বন্ধে তার এখনো অভিজ্ঞতা পেতে হবে। সুতরাং যেমন বৌদ্ধরা দেখেছিল, আত্ম-অজ্ঞানতায় কালের মধ্যে বিচরণশীল মানুষ বাস করে শুধু বিভিন্ন ভাবনা ও ইন্দ্রিয়সংবিতের মধ্যে এবং তার ভাবনা ও ইন্দ্রিয়ের নিকট উপস্থিত সব বাহ্য রূপের পরম্পরার মধ্যে। তার কাছে শুধু তার বর্তমান ক্ষণিক আত্মা সত্য, তার দ্বিতীয় আত্মা মৃত বা বিলীয়মান অথবা রাখা হয় শুধু স্মৃতিতে, পরিণামে ও সংস্কারে, তার ভবিষ্যৎ আত্মা সম্পূর্ণ অস্তিত্ব-হীন অথবা থাকে শুধু সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় বা তৈরী হচ্ছে জন্মের জন্য। আর তার চারিদিকের যে জগৎ তা অনুভবের একই বিধির অধীন। শুধু জগতের বাস্তব রূপ এবং বিভিন্ন ঘটনা ও বিষয়ের সমষ্টি তার কাছে উপস্থিত ও সম্পূর্ণ সত্য, এর অতীতের আর কোন অস্তিত্ব নেই অথবা থাকে শুধু স্মৃতিতে ও লেখায় আর শুধু সেইটুকুই থাকে যা মৃত স্মারক হিসেবে ত্যক্ত হয়েছে অথবা বর্তমানের মধ্যে জীবিত থাকে, ভবিষ্যৎ এখনো আদৌ অস্তিত্বে নেই।

কিন্তু একথা মনে রাখা চাই যে বর্তমান সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যদি স্থূল মন ও ইন্দ্রিয়ের উপর আমাদের নির্ভরতার দ্বারা সীমিত না হ'ত তাহলে এই পরিণাম সম্পূর্ণ অনিবার্য হ'ত না। যদি আমরা সমস্ত বর্তমান, বর্তমান মুহূর্তের বিভিন্ন ভৌতিক, প্রাণিক, মানসিক শক্তির সকল ক্রিয়া জানতে পারতাম, তাহলে মনে করা যেতে পারে যে আমরা তাদের ভিতর সংবৃত্ত অতীতও দেখতে পারতাম এবং দেখতে পারতাম তাদের সুপ্ত ভবিষ্যৎ, অথবা অন্ততঃ সক্ষম হতাম বর্তমান থেকে অতীত ও ভবিষ্যৎ জ্ঞানে যেতে। আর কতকগুলি বিশেষ অবস্থার মধ্যে এ তৈরী করতে পারে এক বাস্তব ও নিত্য-উপস্থিত অবিচ্ছিন্ন কালধারার বোধ ও বর্তমানের মতো পশ্চাতে ও সম্মুখে জীবনধারণ, আর এক পা অগ্রসর হলে আমরা পেতে পারি অনন্ত কালের মধ্যে ও আমাদের কালাতীত আত্মার মধ্যে আমাদের অস্তিত্বের এক নিত্য-উপস্থিত বোধ আর তখন শাশ্বতকালে এই আত্মার অভিব্যক্তি আমাদের কাছে সত্য হয়ে উঠতে পারে; তাছাড়া আমরা অনুভব করতে পারি বিভিন্ন জগতের পিছনে কালাতীত পরমাত্মাকে এবং তাঁর চিরন্তন জগৎ-অভিব্যক্তির সত্যতাকে। যাই হ'ক, বর্তমানে আমাদের যে কালচেতনা সে ছাড়া অন্য একপ্রকারের কালচেতনা ও ত্রিকাল জ্ঞান সম্ভব হয় যদি আমরা সমর্থ হই স্থূল মন ও ইন্দ্রিয়ের উপযোগী চেতনা ছাড়া অন্য চেতনা বিকাশ করতে এবং ক্ষণের মধ্যে ও ইন্দ্রিয়সংবিৎ, স্মৃতি, অনুমান ও আন্দাজের সঙ্কীর্ণতাসহ অজ্ঞানময় মনের মধ্যে কারাবন্ধন ভেঙে ফেলতে।

বাস্তবক্ষেত্রে, মানব শুধু বর্তমানেই বাস ক'রে সন্তুষ্ট থাকে না, যদিও এটাই সে করে অতি প্রবল সুস্পষ্টতা ও আগ্রহের সঙ্গে। তার প্রবৃত্তি হল সামনে ও পিছনে তাকান, অতীতের যত বেশী সম্ভব তত জানা ও ভবিষ্যতের মধ্যে যতদূর সম্ভব, তা যতই

অস্পষ্টভাবে হ'ক প্রবেশ করতে চেষ্টা করা। আর এই প্রয়াস বিষয়ে তার কতকগুলি সহায়ক আছে যাদের কতকগুলি নির্ভর করে তার উপরভাসা মনের উপর, আর অপরগুলি উন্মুক্ত থাকে মহত্তর, সূক্ষ্মতর ও আরো নিশ্চিত জ্ঞানের অধিকারী অন্য এক অধিচেতন বা অতিচেতন আত্মার বার্তার দিকে। তার প্রথম সহায়ক হল যুক্তিবুদ্ধি যা সামনে চলে কারণ থেকে কার্যে ও পিছনে চলে কার্য থেকে কারণে, বিভিন্ন শক্তির ও তাদের নিশ্চিত যান্ত্রিক ধারা আবিষ্কার করে, ধরে নেয় যে প্রকৃতির গতিবৃত্তি চিরকাল একইরকম থাকবে, প্রকৃতির কালের পরিমাপ নির্দিষ্ট করে এবং এইভাবে সাধারণ ক্রিয়াধারার ও নিশ্চিতফলের প্রাকৃত বিজ্ঞানের ভিত্তিতে নির্ণয় করে অতীত ও ভবিষ্যৎ। এই পদ্ধতির দ্বারা ভৌতিক জগতের ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণ সীমিত কিন্তু যথেষ্ট চমৎকার সাফল্য পাওয়া গেছে, আর মনে হতে পারে যে মন ও প্রাণের ক্রিয়াতে শেষপর্যন্ত এই একই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা যেতে পারে, আর যাই হ'ক না কেন, যে কোন ক্ষেত্রে সঠিকভাবে পিছনে ও সামনে তাকাবার পক্ষে মানবের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপায় হল এই। কিন্তু বস্তুতঃ ভৌতিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে নিশ্চিত বিধান থেকে অনুমান ও গণনার যে উপায় প্রয়োগ করা হয় তা প্রাণিক প্রকৃতি ও আরো বেশী পরিমাণে মানসিক প্রকৃতির ব্যাপারসমূহে প্রয়োগ করা যায় না: এদের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা যেতে পারে শুধু নিয়মিত ব্যাপার ও বিষয়ের সীমিত ক্ষেত্রে আর বাকী সবের ক্ষেত্রে আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই থাকি অর্থাৎ বিভিন্ন আপেক্ষিক নিশ্চয়তা, অনিশ্চিত সম্ভাব্য ও অনির্ণেয় সম্ভাবনাপূর্ণ বিষয়সমূহের মিশ্রিত স্তূপের মধ্যে।

এর কারণ মন ও প্রাণ যে কোন ক্রিয়াকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল ক'রে তোলে, প্রতি সংসিদ্ধ ক্রিয়াতে থাকে বিভিন্ন শক্তির জটিল সমবায়, আর এমনকি যদি আমরা এই সবগুলিকে পৃথক করতেও পারি — অর্থাৎ সেইসব যেগুলি উপরিভাগে বা তার কাছাকাছি শুধু বাস্তব হয়ে উঠেছে, তা হলেও আমরা তখনো বাকী যে সব শক্তি অস্পষ্ট বা সুপ্ত আছে তাদের দ্বারা বিফল হব; এই সব শক্তি হল — প্রচ্ছন্ন কিন্তু তবু শক্তিশালী কারণ, গুপ্ত গতি ও প্রবর্তক শক্তি, অনিয়োজিত সব সম্ভাবনা, পরিবর্তনের অনির্ণীত ও অনির্ণেয় সম্ভাবনাগুলি। ভৌতিক ক্ষেত্রের মতো নির্দিষ্ট কারণ থেকে নির্দিষ্ট ফল অর্থাৎ বর্তমান অবস্থার এক লব্ধ দৃষ্টিগোচর সমবায় থেকে পরবর্তী অবস্থার এক অনিবার্য পরিণাম অথবা পরবর্তী অবস্থার এক আবশ্যিক পূর্বাবস্থা সঠিক ও নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা আমাদের সীমিত বুদ্ধির পক্ষে এক্ষেত্রে কার্যকরীভাবে সম্ভব হয় না। এই কারণেই মানববুদ্ধির ভবিষ্যদ্‌বাণী ও পূর্বদৃষ্টি — এমনকি যখন তথ্যগুলি দেখা হয় তাদের সবচেয়ে ব্যাপকভাবে ও সম্ভবপর পরিণাম সম্বন্ধে তাদের পর্যালোচনা করা হয় অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তখনও — সর্বদাই বাস্তব ঘটনার দ্বারা বিফল ও খণ্ডিত হয়। প্রাণ ও মন হল চিৎপুরুষ ও জড়ের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন সম্ভাবনার সতত প্রবাহ ও প্রতি পদে তারা অনন্ত না হলেও অন্ততঃ অনির্দিষ্ট পরিমাণের সম্ভাবনা নিয়ে আসে আর এটাই সকল তার্কিক নির্ণয়কে অনিশ্চিত ও আপেক্ষিক করতে যথেষ্ট। কিন্তু এর উপর তাদের

পশ্চাতে বিরাজিত আছে মানবমনের অনির্ণেয় এক পরম প্রভাবশালী বিষয় — অন্তঃপুরুষ ও গূঢ় চিৎপুরুষের সঙ্কল্প; প্রথমটি অনির্দিষ্টভাবে পরিবর্তনীয় তরল ও পলায়নপর, দ্বিতীয়টি অনন্ত ও অচিন্ত্যভাবে বিধায়ক, আর এ যদি আদৌ বদ্ধ হয় তা হবে শুধু নিজের দ্বারা ও অনন্তের মধ্যকার সঙ্কল্প দ্বারা। সুতরাং উপরভাসা স্থূল মন থেকে পিছনে চৈত্য ও আধ্যাত্মিক চেতনায় গেলেই সম্পূর্ণ সম্ভব হতে পারে ত্রিকালের দৃষ্টি ও জ্ঞান, ক্ষণের মধ্যে অবস্থান ও দৃষ্টির পরিসরের যে আমাদের সীমাবদ্ধতা তার অতিক্রমণ।

ইতিমধ্যে আন্তর চেতনা থেকে বহিশ্চেতনায় আসার এমন কতকগুলি দুয়ার আছে যা দিয়ে এমনকি স্থূল মনেও অতীতের পশ্চাৎ-দর্শন, বর্তমানের পরিদর্শন, ভবিষ্যতের পূর্বদর্শন লাভের শক্তি মাঝে মাঝে তবে অপ্রচুরভাবে আসার সম্ভাবনা সহজ হয়। প্রথমতঃ মন-ইন্দ্রিয় ও প্রাণিক চেতনার এমন কতকগুলি গতিবৃত্তি আছে যেগুলি এই প্রকারের — এদের মধ্যে এক শ্রেণীকে বলা হয় প্রাক্-অনুভব আর তা আমাদের বোধকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছে। এই সব গতিবৃত্তি হল ইন্দ্রিয়মানস ও প্রাণিকসত্তার সহজ বোধ, অস্পষ্ট বোধি যেগুলিকে মানসিকবুদ্ধির সর্বগ্রাসী ক্রিয়া বিশ্বাসের অযোগ্য ব'লে চেপে রেখেছে, বিরল অথবা হেয় করেছে। যদি এগুলিকে কাজ করার স্বাধীনতা দেওয়া হয় তাহলে তারা এমন সব সামগ্রী বিকশিত ও সরবরাহ করতে পারে যেগুলি সাধারণ যুক্তিবুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের অপ্রাপ্য। কিন্তু তবু তারা নিজে নিজে সম্পূর্ণ উপযোগী অথবা বিশ্বাসযোগ্য নির্দেশক হবে না যদি না তাদের অস্পষ্টতা আলোকিত করা হয় এমন ব্যাখ্যা ও দেশনার দ্বারা যা সাধারণ বুদ্ধি দিতে অক্ষম তবে এক উচ্চতর বোধি দিতে সক্ষম। তাহলে বোধি হল আমাদের লভ্য দ্বিতীয় ও আরো গুরুত্বপূর্ণ সম্ভবপর উপায়, আর বাস্তবিকই এ এই দুরূহ ক্ষেত্রে কখন কখন সাময়িক আলো ও দেশনা দিতে পারে ও দেয়ও। কিন্তু আমাদের বর্তমান মানসিকতার মধ্যে কাজ করার সময় এ এই অসুবিধার অধীন যে তা ক্রিয়ায় অনিশ্চিত, ব্যাপ্রিয়ায় অপূর্ণ, কল্পনা ও ভ্রমের অধীন, মানসিক বিচারের মিথ্যা অনুকরণাত্মক গতিবৃত্তির দ্বারা তমসাচ্ছন্ন এবং সর্বদা ভ্রান্তিপ্রবণ মনের সাধারণ ক্রিয়ার আয়ত্তাধীন এবং তার দ্বারা দূষিত ও বিকৃত। উচ্চতর দীপ্ত বুদ্ধির ব্যাপ্রিয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি ও সুনিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন হবে এই সব ত্রুটি থেকে শুদ্ধ-করা এক সংহত বোধিমূলক মানসিকতার গঠন।

মানুষ বাধা পায় বুদ্ধির এই অক্ষমতায় আবার তবুও সে ভবিষ্যতের জ্ঞান সম্বন্ধে ব্যগ্র; সেজন্য সে অতীত ও ভবিষ্যৎ জ্ঞানের জন্য অপর ও বাহ্য উপায়ের আশ্রয় নিয়েছে যেমন শকুনবিদ্যা, নির্বাচনমূলক প্রক্রিয়া, স্বপ্ন, ফলিত জ্যোতিষ এবং অন্য অনেক তথাকথিত তথ্য যেগুলি আরো কম সংশয়বাদী যুগে নিশ্চয়াত্মক বিজ্ঞান হিসেবে রচিত হয়েছিল। সংশয়াত্মক যুক্তিশক্তির দ্বারা অভিযুক্ত ও নিন্দিত হয়েও তারা এখনো আমাদের মন আকর্ষণ করতে থাকে এবং নিজের অধিকার বজায় রাখে, আর তাদের সমর্থন করে কামনা ও বিশ্বাসপ্রবণতা ও কুসংস্কার; কিন্তু তাদের দাবীর কিছু পরিমাণ

সত্য সম্বন্ধে আমরা অপূর্ণ হলেও যে সাক্ষ্য প্রায়ই পাই তা-ও ঐগুলিকে সমর্থন করে। এক উচ্চতর চৈত্যজ্ঞান আমাদের দেখায় যে বস্তুতঃ জগৎ নানাবিধ বার্তা বিনিময় ও নির্দেশক শ্রেণীতে পূর্ণ আর এই সব বিষয়কে মানববুদ্ধি যতই অপব্যবহার করুক না কেন, এরা তাদের উপযুক্ত স্থানে ও সঠিক অবস্থার মধ্যে অতি-ভৌতিক জ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের সঠিক তথ্য দিতে সক্ষম। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে একমাত্র বোধিমূলক জ্ঞানই সক্ষম এই সবকে আবিষ্কার ও বিধিবদ্ধ করতে — যেমন বস্তুতঃ চৈত্য ও বোধিমানসই গোড়ায় নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের এই সব প্রণালীকে বিধিবদ্ধ করেছিল — আর কার্যতঃ এটা দেখা যাবে যে একমাত্র বোধিমূলক জ্ঞানই এই সব সঙ্কেতের যথাযথ প্রয়োগ সুনিশ্চিত করতে সক্ষম — শুধু ঐতিহ্যগত বা অনিয়মিত ব্যাখ্যার অথবা যান্ত্রিক বিধি বা সূত্রের ব্যবহার তা করতে অক্ষম। তা না হলে উপরভাসা বুদ্ধির হাতে, এইসব সম্ভবতঃ পরিণত হবে প্রমাদের ঘন জঙ্গলে।

চৈত্যচেতনা ও বিভিন্ন চৈত্যশক্তির উন্মেষের সাথে সাথেই শুরু হয় অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা দর্শন। চৈত্য চেতনা হল তা-ই যাকে অধুনা প্রায়শঃই বলা হয় অধিচেতন আত্মা, ভারতীয় মনোবিদ্যার সূক্ষ্ম বা স্বপ্ন আত্মা, আর এর ভব্য জ্ঞানের যে ক্ষেত্র প্রায় অনন্ত — আর একথা পূর্ব অধ্যায়েই বলা হয়েছে — তার মধ্যে আছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিভিন্ন সম্ভাবনা ও নির্দিষ্ট বাস্তব তথ্যের ভিতর এমন অন্তর্দৃষ্টি যার শক্তি অতীব বিশাল ও রূপ বহুবিধ। এর প্রথম শক্তি হল — আর তা অতি সহজেই মনোযোগ আকর্ষণ করে — চৈত্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কাল ও দেশের মধ্যে সকল বিষয়ের প্রতিমূর্তি দেখার শক্তি। এই যে শক্তিকে অতীন্দ্রিয়-দর্শী, অতিভৌতিক বার্তাবহ ও অন্যান্যেরা ব্যবহার করে তা প্রায়ই এবং বাস্তবিকই সাধারণতঃ এক বিশেষ শক্তি যা ক্রিয়ায় সীমাবদ্ধ হলেও যথাযথ ও সঠিক আর এর দ্বারা বোঝায় না যে আন্তর পুরুষ বা আধ্যাত্মিক সত্তা বা উচ্চতর বুদ্ধির কোন বিকাশ হয়েছে। এ হল এমন এক দুয়ার যা জাগ্রত মন ও অধিচেতন মনের মধ্যে হঠাৎ বা কোন সহজাত প্রতিভা বা কোনরকম চাপের দ্বারা খুলে গেছে আর প্রবিষ্ট হয়েছে অধিচেতন মনের শুধু উপরিভাগে বা প্রান্তে। গূঢ় বিশ্বমনের এক বিশেষ শক্তি ও ক্রিয়ায় সকল বিষয়ই প্রতিমূর্তির দ্বারা চিত্রিত করা হয় আর এই সব প্রতিমূর্তি শুধু চাক্ষুষ নয়, এরা — অবশ্য এই পদ প্রযোজ্য হলে — শ্রোতব্য ও অন্যবিধ প্রতিমূর্তিও; আর যদি সূক্ষ্ম বা চৈত্য ইন্দ্রিয়গুলির এক বিশেষ প্রকার বিকাশ হয়, যদি রচনাকারী মনের ও এর সব কল্পনার কোন হস্তক্ষেপ না থাকে অর্থাৎ যদি কৃত্রিম বা মিথ্যাকারী মানসিক প্রতিমূর্তি মধ্যে না আসে আর যদি চৈত্য ইন্দ্রিয় মুক্ত, অকৃত্রিম ও নিষ্ক্রিয় হয় তাহলে এই সব প্রতিরূপ বা প্রতিলিখনকে সম্পূর্ণ সঠিকভাবে নেওয়া সম্ভব হয়; আর স্থূল ইন্দ্রিয়ের নাগালের বাইরে ভবিষ্যদ্বাণী করা অপেক্ষা বরং এদের নিজ সব সঠিক প্রতিমূর্তিতে দেখাও সম্ভব হয়। এই প্রকার দেখা সঠিক হয় যদি তা দৃষ্ট বিষয়ের বিবরণেই সীমিত থাকে, আর অনুমান, ব্যাখ্যা বা অন্যপ্রকারে চাক্ষুষ জ্ঞান ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলে, অনেক প্রমাদ

আসা সম্ভব — অবশ্য যদি না এর সঙ্গে থাকে এক প্রবল, নির্মল, সূক্ষ্ম ও বিশুদ্ধ চৈত্য বোধি অথবা প্রদীপ্ত বোধিময় বুদ্ধির উন্নত বিকাশ।

চৈত্য চেতনার আরো সম্পূর্ণ উন্মেষে আমরা প্রতিমূর্তির দ্বারা দর্শনের এই শক্তি ছাড়িয়ে অনেক দূর যাই আর তাতে অবশ্য আমরা যে কোন নতুন কালচেতনা পাই তা নয়, তবে ত্রিকালজ্ঞানের অনেক প্রণালী জানা যায়। অধিচেতন বা চৈত্য আত্মা চেতনা ও অনুভূতির অতীত অবস্থা ফিরিয়ে আনতে অথবা নিজেকে তাদের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করতে সক্ষম আর এমনকি — যদিও এটা সাধারণতঃ কম হয় — চেতনা ও অনুভূতির ভবিষ্যৎ অবস্থার মধ্যেও এ নিজেকে প্রবলভাবে প্রক্ষিপ্ত করতে সক্ষম। তা করার উপায় হল অতীত ও ভবিষ্যতের যে সব নিত্য অবস্থা বা প্রতিমূর্তি আমাদের মানসিকতার পশ্চাতে শাশ্বত কালচেতনায় রাখা হয় অথবা অতিমানসের নিত্যতার দ্বারা নিক্ষিপ্ত কালদৃষ্টির অবিভাজ্য অবিচ্ছিন্নতার মধ্যে সাময়িকভাবে প্রবেশ করা অথবা তাদের সঙ্গে তার সত্তার বা জ্ঞানানুভবের শক্তির একাত্মতা লাভ। অথবা এ এই সব বিষয়ের ছাপ গ্রহণ ক'রে তাদের এক প্রতিলেখনাত্মক অনুভূতি রচনা করতে পারে চৈত্য সত্তার সূক্ষ্ম আকাশে। আর না হয়, এ অতীতকে অবচেতন স্মৃতি থেকে — যেখানে তা সর্বদা সুপ্ত থাকে — উপরে তুলে এনে নিজের মধ্যে একে দিতে পারে এক জীবন্ত রূপ অথবা নতুন স্মৃতিমূলক অস্তিত্ব; আর ঠিক সমানভাবেই এ ভবিষ্যৎকে সুপ্তির গহন থেকে — যেখানে পূর্বেই এর সত্তা নির্মিত হয়েছে — তুলে এনে অনুরূপভাবে নিজের কাছে একে গঠন ও অনুভব করতে পারে। একপ্রকার চৈত্য ভাবনা দর্শন বা অন্তঃপুরুষের বোধির দ্বারা — যা প্রদীপ্ত বোধিময় বুদ্ধির সূক্ষ্মতর ও কম-মূর্ত ভাবনাদর্শনের সঙ্গে এক নয় — ভবিষ্যৎকে পূর্বেই দেখা বা জানাও এর পক্ষে সম্ভব; অথবা যে অতীত আবরণের পশ্চাতে চলে গেছে তার মধ্যে এই অন্তঃপুরুষের বোধির প্রভা নিক্ষেপ ক'রে একে বর্তমান জ্ঞানের জন্য পুনর্লাভ করাও এর পক্ষে সম্ভব। এ এক প্রতীকাত্মক দৃষ্টি বিকশিত করতে সক্ষম যা বিভিন্ন শক্তি ও তাৎপর্যের এক দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে অতীত ও ভবিষ্যৎকে বহন করে — যদিও এই শক্তিরাজি ও তাৎপর্যাবলী অতিভৌতিক লোকের অন্তর্গত, তবু জড়জগতে সৃজনকার্যে শক্তিশালী। ভগবানের অভিপ্রায়, দেবতাদের মন, সেই সব বিষয় ও তাদের চিহ্ন ও সঙ্কেত যেগুলি অন্তঃপুরুষের মধ্যে অবতরণ করে ও বিভিন্ন শক্তির জটিল গতিবৃত্তি নির্ধারণ করে — এই সব এ অনুভব করতে সক্ষম। আবার এ সেইসব বিভিন্ন শক্তিরও গতিবৃত্তি অনুভব করতে সক্ষম যেগুলি আমাদের জীবনের সঙ্গে নিজেদের জড়িত করে এমন সব মানসিক, প্রাণিক ও অন্যান্য জগতের সত্তাদের প্রতিনিধিমূলক বা তাদের চাপে সাড়া দেয় — যেমন এ জানতে সক্ষম তাদের উপস্থিতি ও ক্রিয়া। ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের মধ্যে বিভিন্ন ঘটনার সকল প্রকার সঙ্কেত — এ সকল দিক থেকে আহরণ করতে সক্ষম। এ তার দৃষ্টির সম্মুখে সেই "আকাশ লিপি"ও গ্রহণ করতে সক্ষম যা সকল অতীতের সকল বিষয় অঙ্কিত রাখে, বর্তমানে যা ঘটছে সে সবের প্রতিলিখন করে, ভবিষ্যৎকে লিপিবদ্ধ করে।

এইসকল ও বহুবিধ অন্যান্য বিভিন্ন শক্তি আমাদের অধিচেতন সত্তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে এবং সে সবকে উপরিভাগে আনা যায় চৈত্য চেতনার জাগরণের সঙ্গে। আমাদের অতীত জীবনসমূহের জ্ঞান — অন্তঃপুরুষ অবস্থার, বিভিন্ন ব্যক্তিসত্ত্বের, দৃশ্যের, ঘটনার, অন্যদের সঙ্গে সম্বন্ধের — এ সকল কিছুরই জ্ঞান, — অন্যদের অতীত জীবনসমূহের জ্ঞান, জগতের অতীতের, ভবিষ্যতের, আমাদের স্থূলদৃষ্টির সীমার বাইরে অথবা বাহ্য বুদ্ধির নিকট উন্মুক্ত জ্ঞানের বিভিন্ন উপায়ের নাগালের অতীত বর্তমান বিষয়ের জ্ঞান, শুধু ভৌতিক বিষয়ের নয়, আমাদের মধ্যে ও অন্যদের মধ্যে অতীত ও বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মন এবং প্রাণ এবং অন্তঃপুরুষের ক্রিয়াধারারও বোধি ও বিভিন্ন ছাপ, শুধু এই জগতের জ্ঞান নয়, অন্যান্য সব জগৎ বা চেতনার লোকের ও কালের মধ্যে তাদের অভিব্যক্তির এবং পৃথিবীর উপর ও এর সব দেহবদ্ধ পুরুষ এবং তাদের নিয়তির উপর তাদের শক্তিপাত ও ক্রিয়াঘটিত জ্ঞান — এই সব আমাদের চৈত্যসত্তার নিকট উন্মুক্ত থাকে কারণ এ হল বিশ্বসত্তার বার্তার সমীপবর্তী, প্রধানতঃ অব্যবহিত বর্তমানেই নিবিষ্ট থাকে না এবং নিছক ব্যক্তিগত ও ভৌতিক অনুভূতির সঙ্কীর্ণ গণ্ডির ভিতর আবদ্ধ নয়।

সেই সাথে এই শক্তিগুলির এই অসুবিধা যে তারা বিশৃঙ্খলা ও প্রমাদের সম্ভাবনা থেকে কোন ক্রমেই মুক্ত নয় আর বিশেষ করে চৈত্য চেতনার নিম্নস্তরগুলি ও আরো বাহ্য সব ক্রিয়াধারা বিভিন্ন বিপজ্জনক প্রভাবের প্রবল ভ্রমের ও এমন সব আভাসন ও প্রতিমূর্তির অধীন হয় যেগুলি ভুল পথে নিয়ে যায়, দুষিত ও বিকৃত করে। কলুষ ও প্রমাদ থেকে রক্ষা করার বিষয়ে শুদ্ধীকৃত মন ও হৃদয় এবং প্রবল ও সূক্ষ্ম চৈত্য বোধি অনেক সাহায্য করতে পারে কিন্তু সর্বাপেক্ষা উন্নতভাবে বিকশিত চৈত্য চেতনাও সম্পূর্ণ নিরাপদ নয় যদি না তার চেয়ে উচ্চতর কোন শক্তি একে প্রদীপ্ত ও উত্তোলন করে আর ভাস্বর বোধিমানস একে স্পর্শ ও জোরালো করে এবং যদি না আবার এই বোধিমানসও উত্তোলিত হয় চিৎপুরুষের অতিমানসিক শক্তির দিকে। চৈত্য চেতনার যে কালজ্ঞান তা চিৎপুরুষের অবিভাজ্য অবিচ্ছিন্নতার মধ্যে প্রত্যক্ষ নিবাস থেকে পায় না, আর তাকে চালনা করার জন্য কোন সুষ্ঠু বোধিময় বিবেচনাশক্তি বা উচ্চতর ঋতচেতনার কোন অনপেক্ষ আলো তার নেই। মনের মতো, এ তার কালবোধ পায় শুধু আংশিকভাবে ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে, সকল প্রকার আভাসনের কাছে উন্মুক্ত থাকে এবং যেহেতু তার সত্যের ক্ষেত্র ঐ কারণে আরো প্রশস্ত, সেহেতু তার প্রমাদের সব উৎসও বহুবিধ। আর তার কাছে অতীত থেকে যা আসে তা শুধু যা ঘটেছিল তা নয়, বরং যা সব হতে পারত অথবা হবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারেনি সেগুলিও আসে, বর্তমান থেকে আসে শুধু যে যা ঘটছে তা নয়, বরং যা সব হতে পারে বা হতে ইচ্ছা করে সে সবও ভীড় করে, ভবিষ্যৎ থেকে আসে শুধু যে যা হবে তা নয়, বরং নানাপ্রকার সম্ভাবনার আভাসন, বোধি, দর্শন ও প্রতিমূর্তিও। আর সর্বদা এ সম্ভাবনাও থাকে যে চৈত্য অনুভূতির উপস্থাপনের মধ্যে বিভিন্ন মানসিক রচনা ও মানসিক প্রতিমূর্তি এসে বিষয়সমূহের প্রকৃত সত্যে হস্তক্ষেপ করবে।

অধিচেতন আত্মার বিভিন্ন বার্তার উপরিভাগে আগমন এবং চৈত্য চেতনার ক্রিয়া সাহায্য করে আমরা যে অজ্ঞানতার মন নিয়ে শুরু করি তাকে উত্তরোত্তর, যদিও সম্পূর্ণভাবে নয়, পরিণত হতে এমন এক আত্মহারা জ্ঞানমানসে যা সর্বদাই প্রদীপ্ত হয় অন্তরাত্মা-থেকে-আসা বিভিন্ন বার্তা ও উৎসরণ দ্বারা এবং তাছাড়া এমন সব রশ্মি দ্বারা যেগুলি আসে তার সমগ্র আত্মা ও অনন্ত আধেয়ের এখনো প্রচ্ছন্ন সংবিৎ থেকে আর আসে সনাতন চিৎপুরুষের দ্বারা নিজের মধ্যে সর্বদা-রাখা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের স্বগত ও স্থায়ী কিন্তু গুপ্ত জ্ঞানের সংবিৎ থেকে — যা নিজেকে এখানে প্রতিভাত করে একপ্রকার স্মৃতি, পুনরুদ্‌ঘাটন বা বাইরে আনয়ন ব'লে। কিন্তু যেহেতু আমরা দেহবদ্ধ ও স্থূল চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত সেহেতু অজ্ঞানতার মন তখনও রয়ে যায় এক প্রভাবশালী পরিবেশ ব'লে, বাইরে-থেকে-আসা সামর্থ্য ও সীমাকারী অভ্যাসগত শক্তি হিসেবে যা নতুন গঠনে বাধা দেয় ও তার সঙ্গে মিশে যায় অথবা এমনকি ব্যাপক দীপ্তির সময়েও এ এক সীমানা-প্রাচীর এবং দৃঢ় অধঃস্তররূপে কাজ করে এবং আরোপ করে তার বিভিন্ন অসামর্থ্য ও প্রমাদ। আর এই জের থাকার প্রতীকার কল্পে, মনে হয় প্রথম আবশ্যক হবে এমন এক ভাস্বর বোধিময় বুদ্ধি শক্তির বিকাশ যা কালের ও তার বিভিন্ন ঘটনার সত্যকে এবং অন্যান্য সত্যকে দেখে বোধিময় ভাবনা, ইন্দ্রিয় ও দর্শনের দ্বারা এবং তাছাড়া তার স্বকীয় বিবেকের আলোর দ্বারা মূল্যবোধের অক্ষমতা ও প্রমাদের সব আক্রমণ খুঁজে বার ক'রে দূরে নিক্ষেপ করে।

সকল বোধিময় জ্ঞান কম বেশী সরাসরি আসে আত্মসংবিৎ সম্পন্ন চিৎপুরুষের আলো থেকে যা মনের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়; এই চিৎপুরুষ মনের পিছনে প্রচ্ছন্ন থাকে এবং নিজের স্বরূপের মধ্যে ও তার সকল আত্মার মধ্যে "সকল কিছু" সম্বন্ধে সচেতন, এ হল সর্বজ্ঞ এবং তার "সর্বজ্ঞতার" মধ্য থেকে বিরল বা সতত দীপ্তির দ্বারা অথবা অবিচলিত অন্তঃপ্রবহমান আলোর দ্বারা অজ্ঞানময় বা আত্ম-বিস্মৃত মনকে দীপ্ত করতে সমর্থ। এই "সকল কিছুর" মধ্যে আছে সেই সব যা কালের ভিতর ছিল, আছে বা হবে আর এই "সর্বজ্ঞতা" ত্রিকাল আমাদের মানসিক বিভাজনের দ্বারা সীমিত, ব্যাহত ও নিষ্ফল হয় না, আবার এক মৃত ও এখন অবিদ্যমান ও অল্প মনে-আসা বা বিস্মৃত অতীতের ও এখনো অস্তিত্বশূন্য এবং সেজন্য অজ্ঞেয় ভবিষ্যতের যে ভাবনা ও অনুভূতি অজ্ঞানতার মাঝে অবস্থিত মনের পক্ষে অত্যাবশ্যক তা-ও ঐ সর্বজ্ঞতাকে সীমিত, ব্যাহত বা নিষ্ফল করে না। সেই রকম এক বোধিমানসের উপচয় তার সঙ্গে আনতে পারে এমন এক কালজ্ঞানের সামর্থ্য যা তার কাছে বাইরের সঙ্কেত থেকে আসে না বরং আসে বিষয়সমূহের বিশ্ব পুরুষের মধ্য থেকে, অতীত সম্বন্ধে এর চিরন্তন স্মৃতি থেকে, বর্তমান বিষয়সমূহের অসীম ভাণ্ডার থেকে এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এর পূর্বদৃষ্টি থেকে অথবা যেমন কূটভাবে কিন্তু অর্থ-সূচকভাবে বলা হয়েছে, এর ভবিষ্যতের স্মৃতি থেকে। কিন্তু এই সামর্থ্য প্রথমে কাজ করে অনিয়মিত ও অনিশ্চিতভাবে, কোন সংহতভাবে নয়। যেমন বোধিময় জ্ঞানের শক্তি বৃদ্ধি পায়, তেমন এই সামর্থ্যের ব্যবহারকে আয়ত্তে আনা এবং

এর ব্যাপ্রিয়া ও নানাবিধ গতিবৃত্তিকে কিছু পরিমাণে নিয়মিত করা আরো সম্ভব হয়। ত্রিকালের মধ্যে বিষয়সমূহের বিভিন্ন উপাদান এবং প্রধান বা সবিস্তার জ্ঞান আয়ত্ত করার এক অর্জিত শক্তি স্থাপন করা যায় কিন্তু সাধারণতঃ এ নিজেকে গঠন করে এক বিশেষ বা অস্বাভাবিক শক্তি ব'লে আর মানসিকতার স্বাভাবিক ক্রিয়া বা এর অধিকাংশ তখনো রয়ে যায় অজ্ঞানময় মনের ক্রিয়া হিসেবেই। স্পষ্টতঃই এ এক অপূর্ণতা ও সীমিতভাব, আর একমাত্র যখন এই শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয় সম্পূর্ণভাবে বোধিত মনের সাধারণ ও স্বাভাবিক ক্রিয়া হিসেবে, কেবল তখনই বলা যায় যে ত্রিকালজ্ঞানের সামর্থ্যের পূর্ণতা এসেছে — অবশ্য যতদূর তা মনোময় সত্তায় সম্ভব।

বুদ্ধির সাধারণ ক্রিয়ার উত্তরোত্তর বহিষ্কার, বোধিময় আত্মার উপর সম্পূর্ণ ও সমগ্র নির্ভরতা অর্জন এবং পরিণামস্বরূপ মনোময় সত্তার সকল অংশের বোধিকরণ — এই সব উপায়ের দ্বারাই অজ্ঞানময় মনের স্থলে তখনও সম্পূর্ণভাবে না হলেও, আরো সাফল্যের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করা যায় আত্মনিহিত জ্ঞানের মন। কিন্তু, — আর বিশেষতঃ এই প্রকার জ্ঞানের জন্য যা প্রয়োজনীয় তা হল অজ্ঞানময় মনের ভিত্তির উপর নির্মিত সব মানসিক রচনার অবসান। সাধারণ মন ও বোধি মানসের মধ্যে পার্থক্য এই যে পূর্বেরটি অন্ধকারের মধ্যে অথবা বড় জোর নিজের চঞ্চল বর্তিকালোকের দ্বারা খুঁজে, প্রথমতঃ বিষয়সমূহকে তেমন দেখে যেমন সেই আলোকে তাদের দেখান হয় শুধু সেইভাবে; আর দ্বিতীয়তঃ যেখানে এ জানে না, সেখানে এ কল্পনা, অনিশ্চিত অনুমান, অন্যান্য সহায় ও সাময়িক উপায়ের দ্বারা এমন সব বিষয় রচনা করে যেগুলিকে তখনই সত্য ব'লে গ্রহণ করে অর্থাৎ বিভিন্ন ছায়াময় প্রক্ষেপ, মেঘ-সৌধ, অসত্য বিস্তার, ভ্রান্তিকর পূর্ববোধ, সম্ভাবনা ও সম্ভবপর বিষয় — আর এসব হয় নৈশ্চিত্যবোধ সমেত। বোধিমানস এরকম কৃত্রিমভাবে কিছু রচনা করে না বরং নিজেকে আলোকের গ্রহীতা করে আর সত্যকে দেয় তার মধ্যে ব্যক্ত হয়ে তার নিজের রচনা সংগঠিত করতে। কিন্তু যতদিন কোন মিশ্র ক্রিয়া থাকে এবং সব মানসিক রচনা ও অনুমানকে কাজ করতে দেওয়া হয় ততদিন উচ্চতর আলোকের নিকট অর্থাৎ সত্য জ্যোতির নিকট বোধিমানসের এই নিষ্ক্রিয়তা সম্পূর্ণ বা দৃঢ়ভাবে প্রভাবশালী হতে পারে না এবং সেজন্য ত্রিকালজ্ঞানের কোন সুদৃঢ় সংগঠন সম্ভব হয় না। এই বাধা ও মিশ্রণের জন্যই কালদর্শন, পশ্চাৎ-দৃষ্টি ও পরিদৃষ্টি ও পুরোদৃষ্টির শক্তি, যা কখনো কখনো প্রভাস মানসের বিশিষ্টতা, তা যে কেবল মানসিক ক্রিয়ার অঙ্গাঙ্গী অংশ হয়ে যাওয়ার পরিবর্তে অন্যসবের মধ্যে কেবল এক অস্বাভাবিক শক্তি হয়েছে তা-ই নয়, এ হল আবার অনিয়ত, অত্যন্ত আংশিক এবং প্রায়ই দূষিত হয় প্রমাদের অনাবিষ্কৃত অন্তর্মিশ্রণের দ্বারা অথবা প্রমাদ-রচিত কোন বিকল্পের হস্তক্ষেপে।

যে মানসিক রচনাগুলি হস্তক্ষেপ করে তারা প্রধানতঃ দুই প্রকারের, প্রথম ও সর্বাপেক্ষা প্রবল বিকৃতিকারী রচনাগুলি হল সেই সব যা উৎপন্ন হয় সঙ্কল্পের চাপ থেকে; এই সঙ্কল্প দাবী করে যে এ-ই দেখবে ও নির্ধারণ করবে, এবং জ্ঞানে ব্যাঘাত

ঘটায় এবং বোধিকে সত্য জ্যোতির নিকট নিষ্ক্রিয় হতে ও তার নিরপেক্ষ ও বিশুদ্ধ প্রবাহপ্রণালী হতে দেয় না। ব্যক্তিগত সঙ্কল্প যে রূপই গ্রহণ করুক — ভাবাবেগ ও হৃদয়ের ইচ্ছার অথবা প্রাণিক কামনার অথবা প্রবল স্ফুরন্ত অভিলাষের অথবা বুদ্ধির স্বেচ্ছাকৃত অভিরুচি — বিকৃতির এক সুস্পষ্ট উৎস হয়ে ওঠে যখন তারা চেষ্টা করে — সাধারণতঃ তারা সফলও হয় — জ্ঞানের উপর নিজেদের আরোপ করতে এবং যা জিনিস ছিল, আছে বা হতে বাধ্য তার বদলে যা আমরা কামনা বা সঙ্কল্প করি তা-ই আমাদের নেওয়ায়। কারণ তারা হয় প্রকৃত জ্ঞানকে কাজ করতে দেয় না, নয় যদি আদৌ তা নিজে উপস্থিত হয় তাকে কবলিত ক'রে বেঁকিয়ে বিকৃত করে এবং এই উদ্ভূত বিকৃতিকে করে রাশি রাশি সঙ্কল্প-সৃষ্ট মিথ্যার সমর্থনে এক ভিত্তি। ব্যক্তিগত সঙ্কল্পকে হয় ত্যাগ করতে হবে, না হয় এর সব আভাসনকে তাদের স্থানে রাখা চাই যতদিন না উচ্চতর নৈর্ব্যক্তিক আলোর নিকট পরম নির্দেশ চাওয়া যায় এবং তারপর তাকে অনুমোদন বা বর্জন করতে হবে সেই সত্য অনুযায়ী যা মনের চেয়ে বরং অন্তরের আরো গভীর প্রদেশ থেকে আসে অথবা আসে উর্ধ্বের উচ্চতর প্রদেশ থেকে। তবে ব্যক্তিগত সঙ্কল্পকে কার্যকরী না করা হলেও ও মনকে গ্রহণের জন্য নিষ্ক্রিয় করা হলেও, নানাবিধ শক্তি ও সম্ভাবনা থেকে বিভিন্ন আভাসন এসে একে আক্রমণ ক'রে এর উপর চেপে বসতে পারে; এই সব শক্তি ও সম্ভাবনা চেষ্টা করে জগতের মধ্যে নিজেদের চরিতার্থ করার জন্য আর আভাসনগুলি সেই সব বিষয়ের প্রতিনিধি হয়ে আসে যা সব এরা নিক্ষেপ করেছে নিজেদের ব্যক্ত হবার সঙ্কল্প-প্রবাহের উপর অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের সত্য হিসেবে। আর যদি মন এই সব প্রতারক আভাসনকে প্রশ্রয় দেয়, তাদের আত্ম-মূল্যায়ন গ্রহণ করে এবং তাদের ত্যাগও করে না অথবা সত্য-জ্যোতির নির্দেশ নেয় না, তাহলে সেই একই ফল — সত্যের নিবারণ বা বিকৃতি অনিবার্য। একটা সম্ভাবনা থাকে যে সঙ্কল্পের উপাদানটি সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হবে আর মনকে করা হবে উচ্চতর দীপ্তিময় জ্ঞানের এক নীরব ও নিষ্ক্রিয় লিপি, আর তাহলে কাল-বোধিসমূহের আরো অনেক বেশী সঠিক গ্রহণ সম্ভব হয়ে ওঠে। কিন্তু সত্তার অখণ্ডতার দাবী হল সঙ্কল্প-ক্রিয়া, শুধু নিষ্ক্রিয় জানা নয়, সুতরাং আরো ব্যাপক ও সুষ্ঠু প্রতীকার হবে ব্যক্তিগত সঙ্কল্পকে উত্তরোত্তর সরিয়ে তার স্থানে এক বিশ্বভাবাপন্ন সঙ্কল্প আনা, যা উচ্চতর আলো থেকে আসা নিশ্চিতভাবে উপলব্ধ বোধি, চিদাবেশ বা অলৌকিক প্রকাশ ছাড়া আর কোনও কিছুকেই আমল দেয় না এবং যেখানে সঙ্কল্প জ্ঞানের সঙ্গে এক।

দ্বিতীয় প্রকারের মানসিক রচনার কারণ হল আমাদের মন ও বুদ্ধির স্বরূপ এবং কালের মধ্যে বিষয়সমূহের সঙ্গে তার ব্যবহার। মন এখানে সব কিছুকে দেখে এমন এক সমষ্টি ব'লে যাতে আছে বিভিন্ন সংসিদ্ধ বাস্তব ঘটনা ও তাদের পূর্ববর্তী ঘটনা ও স্বাভাবিক পরিণাম, বিভিন্ন সম্ভাবনার অনির্দিষ্টতা আর মনে হয়, যদিও এর সম্বন্ধে মন নিশ্চিত নয়, পশ্চাতে নির্ধারক কিছু — এক সঙ্কল্প, নিয়তি বা শক্তি যা অনেক সম্ভবপর বিষয় থেকে কিছু বর্জন করে এবং অন্যদের অনুমোদন করে অথবা তাদের বাধ্য করে

প্রকট হতে। সুতরাং এর সব রচনায় কিছু আছে অতীতের ও বর্তমানের — উভয়েরই বাস্তব ঘটনা থেকে অনুমিতি, কিছু আছে বিভিন্ন সম্ভাবনার এক অভিলাষমূলক বা কল্পনামূলক ও আন্দাজমতো নির্বাচন ও সমবায় এবং কিছু আছে নিশ্চয়াত্মক যুক্তি বা অভিরুচি-অনুযায়ী সিদ্ধান্ত অথবা আগ্রহপূর্ণ সৃজনশীল সঙ্কল্প-বুদ্ধি — এসবেরই চেষ্টা বাস্তব ও সম্ভবপর বিষয় থেকে সেই সুনিশ্চিত সত্য নির্দিষ্ট করতে যা আবিষ্কার বা নির্ধারণ করার জন্য মন প্রয়াস করে চলেছে। মনের মধ্যে আমাদের ভাবনা ও ক্রিয়ার জন্য অপরিহার্য এইসব বর্জন বা রূপান্তরিত করা চাই তবে যদি বোধিময় জ্ঞান সুযোগ পায় নিজেকে সংহত করতে দৃঢ় ভিত্তির উপর। রূপান্তর সম্ভব কেন না বোধিমানসকে সেই একই কাজ করতে হয় আর তাদের কর্মক্ষেত্রও একই তবে এ উপাদানগুলিকে ব্যবহার করে অন্যভাবে এবং তাদের তাৎপর্যের উপর অন্য আলো দেয়। বর্জন সম্ভব কেননা বাস্তবিকই সকল কিছুই নিহিত আছে ঊর্ধ্বের সত্যচেতনার মধ্যে আর অজ্ঞানময় মনকে নীরব করা ও এক সম্ভাবনাময় গ্রহিষ্ণুতা আমাদের সামর্থ্যের বাইরে নয়; যে বোধিগুলি সত্যচেতনা থেকে নেমে আসে তাদের এর মধ্যে নেওয়া সম্ভব সূক্ষ্ম বা তীব্র যথার্থতার সঙ্গে আর জ্ঞানের সকল উপাদানকে দেখা সম্ভব তাদের সঠিক স্থানে ও সত্যকার অনুপাতে। কার্যতঃ দেখা যাবে যে একপ্রকার মানসিকতা থেকে অন্যপ্রকারে সংক্রমণ সাধনের জন্য দুইটি পদ্ধতিই ব্যবহার করা হয় পর পর অথবা একসঙ্গে।

ত্রিকালগতিবৃত্তির সঙ্গে ব্যবহারে বোধিমানসের পক্ষে প্রয়োজনীয় হল ভাবনামূলক ইন্দ্রিয় ও দর্শনে তিনটি বিষয়কে সঠিকভাবে দেখা — বিভিন্ন বাস্তব ঘটনা, সম্ভাবনা ও অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। প্রথম, এক প্রাথমিক বোধিময় ক্রিয়া বিকশিত হয় যা সাধারণ মনের মতোই মুখ্যতঃ কালের মধ্যে ক্রমায়াত বাস্তব ঘটনার প্রবাহ দেখে তবে সত্যের এক অব্যবহিত প্রত্যক্ষতা ও স্বতঃস্ফূর্ত সঠিকতার সঙ্গে যা সাধারণ মন পেতে অসমর্থ। প্রথম এ সে সব দেখে এক বোধের দ্বারা, ভাবনামূলক ক্রিয়া, ভাবনামূলক ইন্দ্রিয়, ভাবনামূলক দর্শনের দ্বারা যা তৎক্ষণাৎ বিভিন্ন ব্যক্তি ও বিষয়ের উপর ক্রিয়ারত শক্তিগুলিকে আবিষ্কার করে, আর আবিষ্কার করে তাদের ভিতরকার ও চারিদিককার বিভিন্ন ভাবনা, অভিপ্রায়, প্রবেগ, শক্তি, প্রভাব, যেগুলি তাদের মধ্যে পূর্বেই রূপায়িত হয়েছে এবং যেগুলি রূপায়ণের ধারার মধ্যে রয়েছে আর সেগুলিও আবিষ্কার করে যেগুলি পরিবেশ থেকে অথবা সাধারণ মনের অদৃশ্য সব গূঢ় উৎস থেকে তাদের মধ্যে বা উপরে আসছে বা আসতে উদ্যত; এই দেখা সম্ভব হয় দ্রুত বোধিময় বিশ্লেষণ দ্বারা, এবং তাতে অন্বেষণ বা শ্রম থাকে না, অথবা এক সমন্বয়ী সমগ্র দৃষ্টির দ্বারা — তাতে করে ওইসব শক্তিসমবায়ের জটিলতা চেনা যায় এবং নিষ্ফল বা অংশতঃ ফলপ্রদ শক্তিসমূহ থেকে ফলপ্রসূ শক্তিসমূহকে পৃথকভাবে নির্ণয় করা যায় ও ভাবী ফল সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। বাস্তব ঘটনা সম্বন্ধে বোধিময় দর্শনের অখণ্ড পদ্ধতি হল এই তবে অন্য সব পদ্ধতিও আছে যারা স্বরূপতঃ কম সম্পূর্ণ। কারণ এমন এক শক্তি বিকশিত হতে পারে যাতে ক্রিয়ারত শক্তিগুলির কোন পূর্ববর্তী বা সমকালীন বোধ বিনাই পরিণাম দেখা যায়

অথবা শক্তিগুলি দেখা যায় শুধু পরে, আর একমাত্র পরিণামই তৎক্ষণাৎ ও সর্বপ্রথম জ্ঞানের মধ্যে সহসা উদ্ভাসিত হয়। অপরপক্ষে, শক্তিগুলির জটিল সমবায় সম্বন্ধে এক আংশিক বা সম্পূর্ণ বোধ হতে পারে কিন্তু চরম ফল সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা থাকতে পারে অথবা এমন নিশ্চয়তা থাকে যা ধীরে ধীরে আসে অথবা আপেক্ষিক হয়। বাস্তব ঘটনাসমূহ সম্বন্ধে এক সমগ্র ও একীকৃত দর্শনের সামর্থ্য বিকাশের বিভিন্ন পর্যায় এইগুলি।

এই প্রকার বোধিময় জ্ঞান কালজ্ঞানের সম্পূর্ণ সুষ্ঠু যন্ত্র নয়। এ বর্তমানের প্রবাহে চলে সাধারণতঃ এবং এক এক ক্ষণে সঠিকভাবে দেখে শুধু বর্তমান, অব্যবহিত অতীত ও অব্যবহিত ভবিষ্যৎ। একথা সত্য যে এ নিজেকে পিছনে প্রক্ষিপ্ত ক'রে সেই একই শক্তি ও পদ্ধতির দ্বারা কোন অতীত ক্রিয়াকে সঠিকভাবে পুনর্গঠন করতে পারে অথবা নিজেকে সম্মুখে প্রক্ষিপ্ত ক'রে সঠিকভাবে পুনর্গঠন করতে পারে আরো দূরবর্তী ভবিষ্যতের কোন বিষয়। কিন্তু ভাবনামূলক দর্শনের সাধারণ শক্তির পক্ষে এ অপেক্ষাকৃত বেশী বিরল ও দুরূহ প্রয়াস এবং সাধারণতঃ এই আত্ম-প্রক্ষেপের আরো স্বচ্ছন্দ ব্যবহারের জন্য চৈত্যদর্শনের সহায় ও আশ্রয়ের প্রয়োজন। উপরন্তু, এ দেখতে সক্ষম শুধু সেইটুকু যা বাস্তব ঘটনাসমূহের অবিক্ষুব্ধ ধারার মধ্যে উপনীত হবে এবং এর দর্শন আর কার্যকরী হয় না যদি কিছু অদৃষ্টপূর্ব শক্তির প্রবলধারা বা হস্তক্ষেপকারী শক্তি কোন বিশালতর যোগ্যতার প্রদেশ থেকে নীচে নেমে এসে অবস্থাসমূহের সংঘাতকে পরিবর্তিত করে, আর এ হল এমন এক বিষয় যা কালগতির মধ্যে শক্তিসমূহের ক্রিয়ায় অনবরতই ঘটে। এ তার নিজের সাহায্যের জন্য সেই সব চিদাবেশ গ্রহণ করে যে সব তার কাছে ঐ যোগ্যতাগুলি আলোকিত করে আর গ্রহণ করে সেই সব অবশ্যম্ভাবী দিব্যপ্রকাশ যা তাদের নির্ণায়ক তত্ত্ব ও তার সব অনুক্রম প্রকাশ করে, আর এই দুই শক্তির দ্বারা বাস্তব ঘটনার বোধিমানসের বিভিন্ন সঙ্কীর্ণতা সংশোধন করে। তবে দর্শনের এই সব মহত্তর উৎসের সঙ্গে কারবার করার জন্য এই প্রাথমিক বোধিময় ক্রিয়ার সামর্থ্য কখনই সম্পূর্ণ সুষ্ঠু নয় আর এরকম সর্বদাই হতে বাধ্য যখন কোন নিম্নতর শক্তি কাজ করে মহত্তর শক্তি থেকে প্রাপ্ত উপাদান নিয়ে। এর স্বভাব সর্বদাই এই হতে বাধ্য যে এ অব্যবহিত বাস্তব ঘটনার প্রবাহের উপর জোর দেবে আর তার ফল হবে দর্শনের প্রভূত সঙ্কীর্ণতা।

কিন্তু এমন এক জ্যোতির্ময় চিদাবেশের মন বিকশিত করা সম্ভব যা কালগতির সব মহত্তর যোগ্যতার মধ্যে আরো স্বচ্ছন্দ হবে, আরো সহজে দেখবে দূরবর্তী বিষয়সমূহ এবং সেই সাথে নিজের মধ্যে, তার আরো উজ্জ্বল, ব্যাপক ও শক্তিশালী আলোর মধ্যে গ্রহণ করবে বাস্তব ঘটনাসমূহের বোধিময় জ্ঞান। এই চিদাবিষ্ট মন বিষয়সমূহকে দেখবে জগতের বৃহত্তর যোগ্যতাসমূহের আলোকে, আর বাস্তবতার প্রবাহকে লক্ষ্য করবে বিভিন্ন শক্তিশালী সম্ভাব্য-স্তূপ থেকে এক নির্বাচন ও পরিণামরূপে। কিন্তু যদি এর সাথে অবশ্যম্ভাবী সব তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রচুর প্রকাশক জ্ঞান না থাকে, তাহলে কালগতির বিবিধ

ভব্য ধারার মধ্যে নির্ধারক দৃষ্টি সম্বন্ধে ইতস্ততঃ করার বা স্থগিত রাখার প্রবণতা থাকে অথবা এমনকি এই প্রবণতাও থাকে যে এ অন্তিম বাস্তবতার ধারা থেকে সরে এসে অন্য এমন এক অনুক্রম অনুসরণ করবে যা এখনো প্রযোজ্য হয়নি। এই সঙ্কীর্ণতা হ্রাস করার জন্য অবশ্যম্ভাবী দিব্য প্রকাশের সাহায্য উপকারে আসবে কিন্তু এখানেও আবার সেই অসুবিধা যে এক নিম্নতর শক্তি কাজ করবে এমন সব উপাদান নিয়ে যা তাকে দেওয়া হয়েছে এক উচ্চতর আলোক ও শক্তির কোষাগার থেকে। কিন্তু জ্যোতির্ময় দিব্য প্রকাশের মনও বিকশিত করা সম্ভব; এ নিজের মধ্যে দুই নিম্নতর গতিবৃত্তি নিয়ে দেখে বিভিন্ন ভব্য ও বাস্তব ঘটনাসমূহের ক্রীড়ার পশ্চাতে কি নির্ধারিত রয়েছে আর এই শেষোক্ত বাস্তব ঘটনাগুলিকে দেখে তার অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধান্ত প্রকট করার উপায় রূপে। এই ভাবে গঠিত বোধিমানস সক্রিয় চৈত্য চেতনার সাহায্য পেলে কালজ্ঞানের এক অত্যাশ্চর্য শক্তিকে আয়ত্তে আনতে পারে।

সেই সঙ্গে এটা দেখা যাবে যে তথাপি এ এক সীমিত যন্ত্র। প্রথমতঃ এ এমন এক মহত্তর জ্ঞান প্রতিভাত করবে যা মনের উপাদানের মধ্যে কর্মরত, বিভিন্ন মানসিক রূপের ছাঁচে নির্মিত এবং তখনো মানসিক অবস্থা ও সঙ্কীর্ণতাসমূহের অধীন। এ পশ্চাতে ও সম্মুখে যতদূরই বিচরণ করুক না কেন তার জ্ঞানের ক্রম ও পরম্পরার ভিত্তি হিসেবে সর্বদাই মুখ্যতঃ নির্ভর করবে বর্তমান ক্ষণসমূহের পরম্পরার উপর — এমনকি তার উচ্চতর প্রকাশক ক্রিয়াতেও এ বিচরণ করবে কালের প্রবাহের মধ্যে এবং গতিকে ঊর্ধ্ব থেকে বা শাশ্বতকালের সেই সব স্থিরতার মধ্যে দেখবে না যাদের দর্শনের পরিসর বিশাল এবং সেজন্য এ সর্বদাই আবদ্ধ থাকবে এক গৌণ ও সীমিত ক্রিয়ার মধ্যে এবং তার ক্রিয়াবলীতে কিছু মিশ্রণ, ব্যতিক্রম ও আপেক্ষিকতার মধ্যে। তাছাড়া, এর জানায় জ্ঞান অধিগত হবে না, তা হবে জ্ঞানের গ্রহণ, বড় জোর এ অজ্ঞানময় মনের স্থলে সৃষ্টি করবে এক আত্ম-বিস্মৃত মন যাকে অবিরতই মনে করান হয় ও আলোকিত করা হয় এক সুপ্ত আত্মসংবিৎ ও সর্ব-সংবিৎ থেকে। জ্ঞানের ক্রিয়ার ক্ষেত্র, ব্যাপ্তি, বিভিন্ন সাধারণ ধারা বিকাশ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হবে কিন্তু তা কখনই অতীব প্রবল সব সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত হবে না। আর এই সঙ্কীর্ণতার দরুন, যে অজ্ঞানময় মন এখনো চারিদিকে ঘিরে আছে অথবা অবচেতনভাবে বেঁচে আছে তা প্রবণ হবে নিজেকে আবার প্রতিষ্ঠিত করতে, ভিতরে বা উপরে ছুটে আসতে, যেখানে বোধিময় জ্ঞান কাজ করতে অস্বীকার করে অথবা অসমর্থ হয় সেখানে সক্রিয় হবে এবং আবার তার সঙ্গে নিয়ে আসবে তার বিশৃঙ্খলা, মিশ্রণ ও প্রমাদ। একমাত্র নিরাপত্তা হল যতক্ষণ না অথবা যদি না উচ্চতর আলো নীচে নেমে এসে তার ক্রিয়া বিস্তার করে ততক্ষণ জানবার চেষ্টা করতে অস্বীকার করা অথবা অন্ততঃ জ্ঞানের প্রয়াস স্থগিত রাখা। এই আত্মসংযম মনের পক্ষে দুরূহ, আর যদি তা অত্যন্ত আত্মসন্তুষ্টের ভাব নিয়ে পালন করা হয়, তাহলে অন্বেষু সাধকের বিকাশ সীমাবদ্ধ হতে পারে। অপর পক্ষে যদি আবার অজ্ঞানময় মনকে উপরে এসে নিজের স্খলনশীল অপূর্ণ শক্তিতে অন্বেষণ করতে দেওয়া হয় তাহলে আপেক্ষিক হলেও এক

নির্দিষ্ট সিদ্ধির স্থলে আসতে পারে দুটি অবস্থার মধ্যে এক অবিরত দোলায়মান অবস্থা অথবা দুটি শক্তির মিশ্রিত ক্রিয়া।

এই সঙ্কট থেকে বার হবার উপায় হল এক মহত্তর সিদ্ধিলাভ; বোধিমানস, চিদাবিষ্টমানস ও সত্য-প্রকাশক মানসের গঠন হল এর জন্য শুধু এক প্রস্তুতিমূলক পর্যায়, আর এ লাভের উপায় হল সমগ্র মানসিক সত্তার মধ্যে অতিমানসিক আলো ও শক্তির উত্তরোত্তর অবিরত অন্তঃপ্রবাহ ও অবতরণ এবং বোধি ও এর সব শক্তির নিরন্তর উত্তোলন অতিমানসিক প্রকৃতির উন্মুক্ত মহিমার মধ্যস্থিত তাদের উৎসের দিকে। তখন দুইটি ক্রিয়ার উৎপত্তি হয় — একটি হল বোধিমানসের যা তার উর্ধ্বস্থিত আলো সম্বন্ধে সচেতন, তার দিকে উন্মীলিত থাকে এবং সর্বদাই তার কাছে নিজের জ্ঞান নিবেদন করে সমর্থন ও অনুমোদনের জন্য; আর একটি হল ঐ আলোর নিজেরই ক্রিয়া যা এক শ্রেষ্ঠ জ্ঞানময় মন সৃষ্টি করে — আর এ হল বাস্তবিকই এক অতিমানসিক ক্রিয়া যা চলে মনের এক উত্তরোত্তর রূপান্তরিত উপাদানের মধ্যে এবং মানসিক অবস্থার নিকট বশ্যতা ক্রমশঃ কম প্রবল হওয়ার অবস্থার ভিতর। এইভাবে গঠিত হয় এক ক্ষুদ্র অতিমানসিক ক্রিয়া, এক জ্ঞানময় মন যার সতত প্রবণতা হল জ্ঞানের সত্যকার অতিমানসে রূপান্তরিত হওয়া। অজ্ঞানময় মন উত্তরোত্তর সুনিশ্চিতভাবে নিষ্কাশিত হয়, এর স্থান নেয় এমন এক আত্মবিস্মৃতিপূর্ণ জ্ঞানের মন যা প্রদীপ্ত হয় বোধির দ্বারা, আর বোধি নিজেই আরো সুষ্ঠুভাবে সংহত হয়ে সমর্থ হয়ে ওঠে ক্রমশঃ বৃহৎ হতে বৃহত্তর আহ্বানের উত্তর দানে। বর্ধিষ্ণু জ্ঞানময় মন কাজ করে এক মধ্যস্থ শক্তি হিসেবে এবং যখন এ নিজেকে গঠন করে তখন অন্যটির উপর কাজ করতে থাকে, তাকে রূপান্তরিত করে বা এর স্থান অধিকার করে, আর, যে আরো অধিক পরিবর্তন মন থেকে অতিমানসে সংক্রমণ সাধন করে তা আসতে বাধ্য করে। এইখানেই কালচেতনা ও কালজ্ঞানের মধ্যে এক পরিবর্তন আসতে শুরু করে, আর এই কালজ্ঞান তার ভিত্তি ও সম্পূর্ণ বাস্তবতা ও তাৎপর্য পায় শুধু অতিমানসিক স্তরসমূহেরই উপর। সুতরাং অতিমানসের সত্যের সম্পর্কেই এর সব কর্মধারাকে আরো ফলপ্রদভাবে বিশদ করা যায়: কারণ জ্ঞানের মন হল শুধু এক প্রক্ষেপ এবং অতিমানসিক প্রকৃতির দিকে উত্তরণের এক অন্তিম সোপানমাত্র।